গল্প-ভারতী

সপ্তদশ বর্ষ। পৌষ। ১৩৬৮

এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ—

ভারতীয় শিল্প মেলা
শিল্প-সাহিত্য
বিশ্ব বৃহৎ চিত্র

গল্প-ভারতী

পৌষ—১৩৬৮

সম্পাদক :

সহঃ সম্পাদক : শ্রীকল্যাণ রায়

মূল্য—এক টাকা

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড ২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে
শ্রীসুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত এবং কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড,
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

"..... কেশ পরিচর্যা নিত্য নেবে?"

নোমা

সাদা চুলকে চিরস্থায়ী কালো ক'রতে—অদ্বিতীয়—

সোল এজেন্ট :—
এম. এম. খাম্বাটওয়ালা
আমেদাবাদ—১

এজেন্ট :—
শাহ বাভিসী এণ্ড কোং
১২৯, রাধাবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১

ফোন :- ২২-১০১৮

সোল এজেন্ট :এম. এম. খাম্বাটওয়ালা, আমেদাবাদ

* * * *

এজেন্ট :—শা বভিসী এণ্ড কোং
১২৯ রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

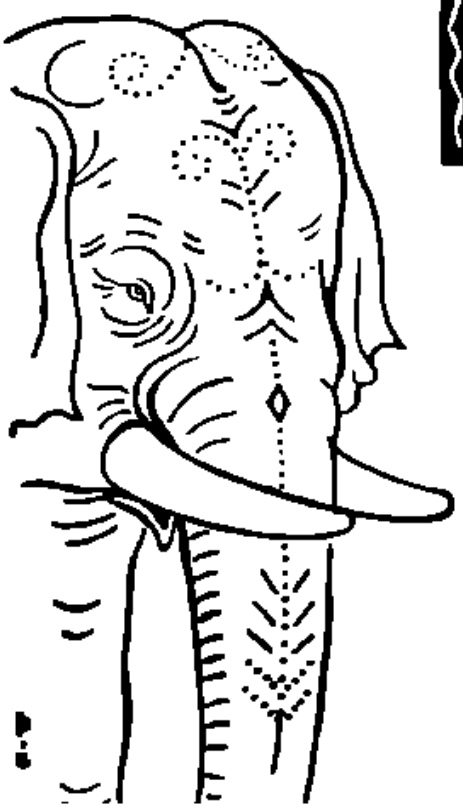

Lord's

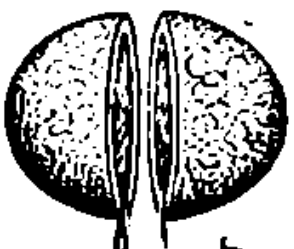

যে কোন উপলক্ষেই

লর্ডের

লজেন্স
ও
টফি

এই সংখ্যায়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্মকথা— ৬২৭
একজন আর কয়েকজন—অনিলকুমার ভট্টাচার্য ৬২৯
রম্যাণি বীক্ষ্য—শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী ৬৩৩
দেশ-বিদেশ— ৬৪০
খেলাধূলা— ৬৪৩
বিশ্ব ব্যঙ্গ চিত্র— ৬৪৯

ভারতীয় শিল্প মেলা

ভারতীয় শিল্প মেলা—সুদর্শন পাল ৩
ভারতবর্ষ— ৫
রাশিয়া— ৭
আমেরিকা— ৯
বৃটেন— ১০
জার্মানী— ১২
ফ্রান্স— ১৪
ইটালী— ১৫
জাপান— ১৭
ভারতীয় শিল্প মেলা—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮

নতুন
জীবনের
নতুন
প্রয়োজন

পূরণ করতে নবজাতকের
জননীকে পুষ্টিকর
টনিকের ওপর নির্ভর
করতে হয়।
সুনির্বাচিত উপাদানে সমৃদ্ধ
ভাইনো-মল্ট
ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, হজমক্রিয়ায়
সাহায্য করে
এবং দ্রুত স্বাস্থ্য ও শক্তি
ফিরিয়ে আনে।

ভাইনো-মল্ট

বেঙ্গল
ইমিউনিটি
কোং, লিঃ

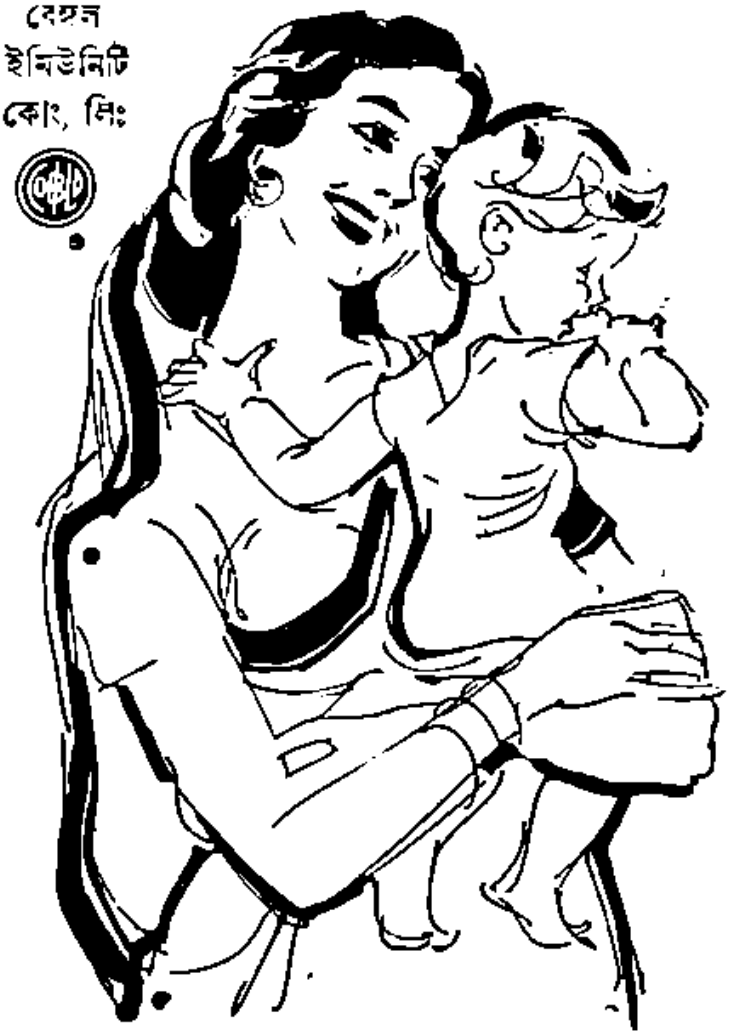

সপ্তদশ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা ॥ পৌষ ১৩৬৮

754.3
.009/3

সম্পাদকীয়

৭ পৌষের মেলা ॥

গল্প-ভারতীর পৌষ সংখ্যায় জনসাধারণকে জানানো দরকার কেন ভিড় করে এত লোক পৌষ মেলায় বোলপুর যায়। ১৮৪৩ সনের ২২।২৩ ডিসেম্বরে পড়ে ৭ পৌষ; সেই পুণ্য দিনে রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮১৭-১৯০৫] রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন; তারপর পিতামহ দ্বারকানাথ বিলাতে শেষ-যাত্রা করেন; তারপর লণ্ডনে ১৮৪৬ সনে হঠাৎ মারা যান।

১৮৪৩ থেকে ১৮৪৮ পর্যন্ত অর্থাৎ পুরো পাঁচ বছর ধরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহন সম্পাদিত [১৮৪৮] উপনিষদগুলি পাঠ করে, শেষে ১৮৪৫ সনে ব্রাহ্মধর্ম নামক অপূর্ব গ্রন্থ সংকলন শেষ করে ছেপেছেন। তার মধ্যে মূল বৈদিকমন্ত্রগুলি লাল অক্ষরে এবং তার বঙ্গানুবাদ কালো কালিতে ছাপা। সেই অধুনা দুষ্প্রাপ্য সংস্করণ আমার কাছেই ছিল [খোয়া গেছে] এবং রবীন্দ্রনাথের কাছেও দেখেছি যখন ১৯১১ সনে তাঁর ৫০তম জন্মোৎসবে প্রথম শান্তিনিকেতনে যাই। পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল ভেবেই মনে পড়ল তারও দশ বছর আগে [১৯০১] মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় বা ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সঙ্গে জোটেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় [১৮৬১-১৯০৭] যিনি রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি সম্বোধন প্রথম করেছিলেন। ঠাকুর জমিদারীর জ্ঞানদানন্দ রায় ও পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে ছিলেন। তাঁদের ১৯১১ সনের উৎসবে দেখেছি; কিন্তু অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেনকে [কাব্য-গ্রন্থের সম্পাদক] দেখি নি; তাঁর আত্মীয় অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনকে দেখেছি ও Presidency Collegeএ তাঁর সহকর্মী অধ্যাপক পদার্থবিদ কবি সুরেন মৈত্রকেও গল্প করতে দেখেছি কত কঠিন সমস্যার মধ্যে [অর্থ-সমস্যা কম নয়]। সেই প্রথম দফাকে [১৯০১-১৯১১] রবীন্দ্রনাথ ফুল চালিয়ে গেছেন। সেই সংগ্রামের মধ্যে গড়ে ওঠা শান্তিনিকেতন যেন আমরা ভুলে না যাই।

পিতার সঙ্গে প্রথম হিমালয় যাত্রার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ, ১৮৭৩ সনে নগণ্য গ্রাম বোলপুরে হাজির হন। তাঁদের সারিতে ঘেরা "ভুবন ডাঙার" বাঁধ পেরিয়ে ১১ বছরের কবি 'শৈশব সঙ্গীত'-এর সূচনা এই খানেই করেন। সে যুগের রচনা অচলিত সংগ্রহে ছাপা হলেও অনেকে জানেন না যে ব্রহ্মবান্ধব তাঁর কোনও দাদা আদি ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় [১৮৪৩—১৯২৩] রবীন্দ্রনাথের নাম না দিয়ে—"দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক এক বালকের রচনা" বলে 'অভিলাষ' ও 'প্রকৃতির খেদ' ছাপেন [এ বিষয়ে প্রবাসীতে আমি লিখেছি]।

বোলপুর ষ্টেশন থেকে দেড় মাইল দূরে ২০ বিঘা মাত্র জমি কিনে দেবেন্দ্রনাথ একখানি বাড়ি করে নাম দেন "শান্তিনিকেতন"। ১৮৭৭ সনে তাঁর ৭০ বৎসরে পীড়িত হয়ে তিনি উদ্বেগের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ [১৮৪০—১৯২৬] ও তৎপুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথাদির নাম দিয়ে পাকা দলিল "ন্যাসপত্র" সই করে যান [৮ মার্চ, ১৮৮৮]।

সেই তেপান্তরের মাঠে শুধু একটি পাকা বাড়ি তথা অতিথিশালা [বিনা খরচে তিন দিন থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থাও হয়েছিল] গড়ে ওঠে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই সেই বাড়ির কাছে ব্রহ্মমন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেন; তাঁর শিল্পী নাতি অবনীন্দ্রনাথকে পরিকল্পনার কাজে বোলপুরে পাঠান। ১৮৯৭ সনে তাঁর ৮০ বর্ষ পূর্তির আগে—বহু সাধক সেই অতিথিশালায় থেকে 'ছাতিমতলা'র বেদীর কাছে বসে 'প্রাণের আরাম' পেয়েছিলেন—যেমন পান মহর্ষি নিজেও এই উদার প্রান্তরে।

১৯০১ সনে ৪০ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শিলাইদা ছেড়ে শান্তিনিকেতনে বাস শুরু করলেন। 'নৈবেদ্য' 'খেয়া' ও 'গীতাঞ্জলি'র অধিকাংশ রচনা এই শান্তিনিকেতনে। ৭ পৌষ দীক্ষা দিনের উপাসনার বাবে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে জনসাধারণের মেলাটি ক্রমশ বড় হয়ে উঠলো। যাত্রা, কীর্তন, বাউল গান থেকে শুরু করে গ্রামের ছেলেদের খেলা কুচকাওয়াজ এমন কি সাঁওতাল গ্রামবাসী সর্দারদের তীর-সন্ধান ও পুরস্কার বিতরণ সব আমরাও ৫০ বছর আগে দেখেছি। আমরা এখান থেকে সেখানে ভক্তকবি জয়দেবের সাধনাপীঠ কেন্দুলীর মেলা দেখেছি। সেখানে শিল্পাচার্য নন্দলাল ও তাঁর দলে শুধু ছবির কর নন, প্রতিমা দেবী ও ছাত্রীদের নিয়ে কেন্দুলী মেলা তাঁরা দেখে এসেছেন। বীরভূমের জয়দেব কবিকে কতকাল স্মরণ করে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ। আর তাঁর ছন্দ-লালিত্যে কতই না মুগ্ধ ছিলেন তিনি। তাই আশা রাখি যে জয়দেব-মেলার মত রবীন্দ্র-মেলাও সহস্রাধিক বৎসর ধরে জাতির প্রাণে প্রেরণা দেবে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত যেমন শান্তিনিকেতন থেকে সারাভারতে ছড়িয়ে পড়েছে, তেমনি রবীন্দ্র-সাহিত্য ও তাঁর ভাবধারা প্রবাহিত হবে—শুধু শহরে ও বৈঠকে নয়—গ্রামে গ্রামান্তরে। সেই আশা করেছিলেন মহাত্মাজীও; তাই ১৯১৫ সনে প্রথম বোলপুরে পদার্পণ করার পর ১৯৪০ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে কতবার গান্ধীজী এসেছেন ও তার ভবিষ্যৎ স্থায়িত্ব নিয়ে ভেবেছেন। গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ বাউলের সুরে মুগ্ধ করেছে দেশ-বিদেশের মানুষকে।

আউল-বাউলদের গান ও সাধন-ধারা অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বসেই 'মানুষের ধর্ম' [Religion of man] প্রভৃতি অমূল্য রচনা লিখে শুধু বাংলা নয়, বিশ্বসাহিত্যকেও পরিপুষ্ট করেছেন। প্রথম শতাব্দী উৎসবের ঘিড়িকে এসব ভাববার সময় মেলে নি; দ্বিতীয় শতকে মহামানব রবীন্দ্রনাথকে হয়তো চিনতে পারা যাবে।

'পালের বনে জ্যোৎস্না হাওয়া' আমাদের মনকে যেমন মাতিয়েছিল তেমনি অন্যান্য নরনারীদেরও

ভবিষ্যতে মাতাবে, যদি ইট-কাঠের ইমারত ছাড়িয়ে, কবিগুরুর মতো ; 'বনবাণী' শুনতে না ভুলি এবং কঠিন মাটির তলায় জীবও শিকড় ও প্রাণের বীজকেই যদি আমরা ভালবাসি। রবীন্দ্রনাথ শাশ্বত জীবন-যাত্রার কবি, তাই তাঁর গ্রামের বাউলেরই মতো চিরন্তন মানুষকে অতি সরল কথায় তিনি বলে গেছেন হয়তো কোনও বৈরাগীর গান শুনে ; পৌষ মেলায় কবিগুরু গেয়ে গেছেন—

"ও আমার মন যখন জাগলি নারে
তোর মনের মানুষ এল দ্বারে।
তার চলে যাবার শব্দ শুনে
ভাঙল রে ঘুম
ও তোর ভাঙল রে ঘুম অন্ধকারে॥"

পূর্ব ও পশ্চিম : গোয়া-কষ্টিপাথর

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অন্তরতাপী স্মরণে Unesco তাঁর হাতে আঁকা ছবি ও প্রস্তাদি প্রকাশ করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে সাদায় কালোয় ভেদ নাই।

কিন্তু গোয়ার চিরন্তন অধিকার প্রমাণ করে পণ্ডিত নেহেরু যেই সেখানে শান্তি স্থাপনে মন দিয়েছেন অমনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট-পত্নী শ্রীমতী কেনেডী ভারতে না-আসা সিদ্ধান্ত করেছেন কারণ U. S. ও U. K.-এর দাগী বর্ণ-চোরাদের চক্রান্ত ঘনিয়ে উঠছে। তাঁদের দল-বল ক্ষুদ্র পর্তুগালের সাহায্যে যদি "ভারত আক্রমণ" শুরু হয় তাহলে ধ্বংসের আগুন জ্বলবে [Hell in the world]। এই ভাষায় নেহেরুজী তার আভাষ দিয়েছেন।

Goa, Daman, Diu তিনটা অঞ্চলই 'স্বাধীন ভারতে' ফিরে এসেছে। সেজন্য শুধু ভারতবাসী আমরাই নয় পরন্তু U. A. R. Indonesia [৯০ মিলিয়ন] ও লাল-চীন [৩০০ মিলিয়ন] আমাদের সমর্থন করেছে ; হয়তো Macao এবং Hongkong-এর পালা এল—এটাই এখন ইংরেজদের ভয়। Irian বা পশ্চিম নিউগিনী Dutch-দের অন্যায় কবল থেকে উদ্ধারে Soekarno সমর আয়োজন শুরু করেছেন, Australia-র ১০ মিলিয়ন শাদাদের তাই ভয়।

বেলজিয়াম Congoতে আজও আলিয়ে পুড়িয়ে চলেছে, শান্তি নেই ! পর্তুগীজ আফ্রিকাতেও সেই দুর্নীতি চলছে শাদাদের প্ররোচনা ও অর্থবলে।

সবই আমরা বুঝেছি তাই মাথা ঠাণ্ডা রেখে দেশরক্ষা ও আত্মরক্ষার কাজে সবাইকে নামতে হবে। উচ্চ নীচ ছোট বড়, সব বিভেদ ভুলে এক অখণ্ড স্বাধীন ভারতের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে।

'গোরক্ষক' দল বা উপদল নয়, বিশাল পশ্চিম ভারতের উপকূল ও প্রাণকেন্দ্রগুলি রক্ষা করতে হবে। এবং যেমন Suez-এর জন্য বিশ্ব লড়ে করী হয়েছে ভারতের গোয়া যেন তেমনই আদর্শ স্থল হয়, এই আমাদের প্রার্থনা। U S S R-সভাপতি Brezhnev তাঁর পূর্ণ সহানুভূতি ভারতে বসেই জানিয়ে গেছেন। দেশে ফেরার পর বাস্তবিক ভাবে তাঁরা কি করবেন তারও আভাষ দিয়েছেন Soviet প্রতিনিধি U N-এর সভায়। ভারতের ৪০০ মিলিয়ন নরনারী উন্মুখ হয়ে সব শুনছে ও প্রস্তুত হচ্ছে—বর্ষ শেষে এই আশা নববর্ষে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক, এই আমাদের প্রার্থনা ; রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজীর দেশের সকল নরনারীর একান্ত কামনা।

ইতিহাসের মন্থন থেকে বার হয় রাষ্ট্র-সমস্যা ঘনীভূত হয়েছিল দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত সাগরের বুকে; তার পরপারেই গড়ে উঠছে দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা। সেখান থেকেই হিন্দু-Pilot নিয়ে, Vasco-da-gama ১৪৯৮ সনে, এদেশে আসেন। তাঁর কবর Lisbon গির্জার দেখে এসেছি ও পর্তুগীজ কবি Camoens রচিত মহাকাব্য Luciadও পড়েছি। কিন্তু তাঁরা কেউ জানতেন না যে, গোয়ার পণ্ডিত Pissulankar অনেক প্রাচীন দলিল ঘেঁটেছেন ও প্রাচীন গোয়ার রাজবংশে 'কদম্ব-কুল' [Moreas রচিত গ্রন্থ] পাঠ করলে নূতন করে সবাই জানবেন। কদম্ব বংশের প্রতিষ্ঠাতা ব্রাহ্মণ মযূর শর্মা ও তাঁর প্রপৌত্র কাকুস্থ-বর্ম, পল্লব রাজকে পরাভূত করে অশ্বমেধ-যজ্ঞ উদ্‌যাপিত করেন [ডাঃ হীরেশচন্দ্র সরকার J. I. H. 1936 দ্রষ্টব্য] বিখ্যাত শাতবাহন Anahra সাম্রাজ্য পতনের পর এই প্রাচীন "গোমন্তক" [Goa] দল গৌরবের ইতিহাস রচনা করেন। "হাল" রাজের প্রাকৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি ও কুণ্ডল শাতকর্ণীর কাহিনী বাৎস্যায়ন রচিত কামসূত্রে পেলেও, সবিস্তার ঐতিহাসিক রচনা এবার শুরু হবে। গোয়ার স্বাধীনতা তখন নূতন তাৎপর্য গ্রহণ করবে। কর্ণাট-কন্নড় মহারাষ্ট্র প্রাকৃতাদি উপাখ্যান থেকে এই বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাস উদ্ধার করতে হবে: Archaeological Survey শতাব্দী উৎসবে সানন্দে যোগ দিয়ে ও দিল্লীতে গোয়া-বিজয়ের কথা শুনে এই সব প্রশ্ন মনে জেগেছিল। বঙ্গের বীরনারী শ্রীমতী অরুণা দেবী [Mrs Asaf Ali]-কেও এই প্রসঙ্গে গভীর শ্রদ্ধা জানাই। তাঁর প্রেরণায় নরনারী অকথ্য নির্যাতন সহ্য করে এবার স্বাধীন হয়েছে। বন্দেমাতরম্!

পল্লীবাসী

অন্ততঃ ভারতবর্ষে এমন একদিন ছিল যখন পল্লীবাসী অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে দেশের জনসাধারণ কেবল যে দেশের ধনের ভাণ্ডার ছিল তা নয়, দেশের বিদ্যাও তারা পেয়েছে নানা প্রণালী দিয়ে। এরা ধর্মকে শ্রদ্ধা করেছে, অন্যায় করতে ভয় পেয়েছে, পরস্পরের প্রতি সামাজিক কর্তব্য সাধনের দায়িত্ব স্বীকার করেছে। দেশের জ্ঞান ও ধর্মের সাধনা ছিল এদের সকলের মাঝখানে এদের সকলকে নিয়ে। সেই দেওয়া নেওয়ার সর্বব্যাপী সম্বন্ধ আজ শিথিল। এই সম্বন্ধ-ত্রুটির মধ্যেই আছে অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের সূচনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংবাদপত্রের শতবার্ষিকী।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় সর্বপ্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। উহা ইংরেজী ভাষায় পরিচালিত। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোন ভারতীয় ভাষায় সংবাদপত্র পরিচালিত হয় নাই। ওই বৎসর শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টধর্মযাজকরা সর্বপ্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। ওই পত্র বাংলায় প্রকাশিত—এবং উহার নাম "সমাচার দর্পণ"। তবে এবিষয়ে এখনও কিছু মতভেদ আছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলেন যে, গঙ্গাকিশোর [অথবা গঙ্গাধর] ভট্টাচার্য শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টধর্ম যাজকদিগের ছাপাখানায় কাজ করিতেন। তাঁহারা সংবাদপত্র প্রকাশ করিবেন জানিতে পারিয়া গঙ্গাকিশোর তাহার কিছু পূর্বেই কলিকাতা হইতে প্রথম পত্র প্রকাশ করেন। কিন্তু, শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টধর্মযাজকরা ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, পাদ্রী মার্শম্যান "সমাচার দর্পণে"র প্রথম সংখ্যা প্রস্তুত করিয়া বলেন তাহার ইংরেজী সার সংগ্রহ সহ তিনি উহা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতার কর্মচারীদিগের নিকট পাঠাইয়া দিবেন—যদি তাঁহারা ইহাতে আপত্তি না করেন, তবেই সপ্তাহে সপ্তাহে "সমাচার দর্পণ" প্রকাশিত হইবে। লর্ড হেষ্টিংস তখন পিণ্ডারী যুদ্ধে ব্যাপৃত। ফিরিয়া আসিয়া তিনি এই নূতন পরিকল্পনায় আনন্দ প্রকাশ করেন। তখন হইতে "সমাচার দর্পণ" যথারীতি প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে যে প্রথম ভারতীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কাজেই সংবাদপত্রের শতবার্ষিকী ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে হইয়া গিয়াছে। ভিগবীর মতে বাঙালীর কৌতূহলই এদেশে দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের কারণ। ইহার বহুদিন পরে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বাংলা সংবাদপত্র "সাধারণী" প্রকাশিত হয়। অক্ষয়চন্দ্র সরকার উহার সম্পাদক এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অন্যতম লেখক।

"সোমপ্রকাশ" ইহার কিছু পূর্ববর্তী। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইহার প্রবর্তক। এবং দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ইহার সম্পাদক রূপে প্রকট হইয়াছিলেন।

"অমৃতবাজার পত্রিকা" রাতারাতি ইংরেজী হইলে লর্ড লিটনের আইনের কোপে "সোমপ্রকাশ"কেই পতিত হইতে হয়। "সাধারণী"তে শিক্ষানবিশী করিয়া যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু "বঙ্গবাসী" প্রকাশ করেন। "বঙ্গবাসী"ই ক্রমে বাংলার সর্বপ্রধান সংবাদপত্র হইয়া উঠে। তখন বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি "বঙ্গবাসীর" নিয়মিত লেখক ছিলেন। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধে আপত্তি তুলে "বঙ্গবাসী"র ব্রাহ্ম লেখকদিগের কয়জন "বঙ্গবাসী" ত্যাগ করিয়া "সঞ্জিবনী" প্রকাশ করেন। ক্রমে "বঙ্গবাসী" রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের মুখপত্র হইয়া দাঁড়ায় এবং সহবাস-সম্মতি আইন সম্বন্ধে কয়টি প্রবন্ধের জন্য ইংরেজ সরকার ইহাকে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। ইহাই এদেশে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে প্রথম রাজদ্রোহের মামলা।

আইনে গোল দেখিয়া ইংরেজ সরকার যখন মামলা মিটাইয়া ফেলিতে ইচ্ছুক হন তখন জমিদার সভার চেষ্টায় "বঙ্গবাসী"র সম্পাদক প্রভৃতি প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলে মামলা প্রত্যাহৃত হয়। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাহাতে প্রথম কংগ্রেসের মুখপত্র হিসাবে বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশের প্রস্তাব হয়। কংগ্রেসের কর্তারা "বঙ্গবাসী"কেই মুখপত্র করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু "বঙ্গবাসী"র অধিকারী তাহাতে সম্মত না হওয়ায় কংগ্রেসের

মুখপত্ররূপে যৌথ কারবার হিসাবে "হিতবাদী" প্রকাশিত হয়। তখন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ইহার সম্পাদক এবং রবীন্দ্রনাথ অন্যতম লেখক। রবীন্দ্রনাথের প্রথম লিখিত কয়টি ছোটগল্প "হিতবাদী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পরে "হিতবাদী" হস্তান্তরিত হয় এবং কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ইহার সম্পাদক হইলে "বঙ্গবাসী"র সহিত "হিতবাদী"র প্রবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। ইতোমধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় রামকৃষ্ণ ভক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "বসুমতী" প্রচার করিতে থাকেন।

তখন সাপ্তাহিকের যুগ। দেশীয় ভাষায় দৈনিক পত্র প্রচার লাভজনক হয় নাই। "বঙ্গবাসী"র অধিকারী লোকসান দিয়া বহুদিন 'দৈনিক' দৈনিক পত্র প্রচার করিয়া তাহা বন্ধ করিতে বাধ্য হন। ইংরেজী সংবাদপত্র "ইংলিশম্যান"-এর অধিকারীরা পরীক্ষামূলক ভাবে "সুপ্রভাত" বাংলা দৈনিক প্রকাশিত করেন। চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ উহার সম্পাদক ছিলেন। উহাও অল্পদিনে অচল হয়। যখন কোন প্রচারক একখানি দৈনিকপত্র প্রকাশ করেন। উহার মূল্য অর্ধ পয়সা ছিল এবং বিক্রেতারা হাঁকিত "আধেলা হামারা মাল হ্যায়" অর্থাৎ এক পয়সা দিলে কাগজের সঙ্গে তাহারা আধ পয়সা ফেরৎ দিবে। সুরেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন তাঁহার সাপ্তাহিক ইংরেজী সংবাদপত্র "বেঙ্গলী" সম্বন্ধে কোন পাঠক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তিনি এক সপ্তাহ ধরিয়া একসংখ্যা "বেঙ্গলী" পাঠ করেন, উহা যদি দৈনিক হইত তবে তিনি কি করিতেন বুঝিতে পারেন না। তখন কলিকাতায় ইংরেজদিগের তিনখানি দৈনিক সংবাদপত্র "ইংলিশম্যান" "ফ্রেইলী নিউজ" ও "স্টেটসম্যান"; আর বাঙ্গালীদিগের একমাত্র ইংরেজী দৈনিকপত্র "ইণ্ডিয়ান মিরর"। পরে "অমৃতবাজার" এবং তাহারও পরে "বেঙ্গলী" দৈনিকপত্রে পরিণত হয়।

যদিও ইংরেজ সরকার [বর্তমান জাতীয় সরকারের মত] এদেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করেন নাই তথাপি বাঙ্গালীর অন্নসমস্যা বৃদ্ধি পাইতেছিল। তাহারই সুযোগ লইয়া চতুর ব্যবসায়ী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রথম বিদ্যুৎ আবিষ্কৃত হইবার পরদিনই 'দৈনিক বসুমতী' প্রচার আরম্ভ করেন। ক্রমে ইহার প্রচার এত অধিক হয় যে, রোটারী প্রেস ব্যতীত আবশ্যক সংখ্যক পত্র ছাপা অসম্ভব হয়। সেইজন্য 'দৈনিক বসুমতী' সর্বপ্রথম ভারতীয় ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্রের সঙ্গে রোটারী প্রেস ব্যবহার আরম্ভ করেন। 'অ্যাসোসিয়েটেড' প্রেসের সংবাদও সর্বপ্রথম 'বসুমতী' ব্যবহার করিতে থাকেন। ইহার পর সুরেশচন্দ্র মজুমদার মৃণালকান্তি ঘোষের সহযোগে 'আনন্দবাজার' পত্রিকা পুনরুজ্জীবিত করিয়া দৈনিক পত্রে পরিণত করেন। 'যুগান্তর' তাহার পরবর্তী। পূর্ববর্তী প্রধানতঃ 'নায়ক'। কিন্তু এই সকলের মূলে ছিল 'সন্ধ্যা'র প্রেরণা। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে—স্বদেশী আন্দোলন পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। তাহার পূর্বেই উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব 'সন্ধ্যা' প্রচার করেন। "সন্ধ্যা"র প্রচার বিস্ময়কর রূপ অধিক হয় এবং 'সন্ধ্যা'কেই নবযুগের প্রবর্তক বলা যাইতে পারে। এই 'সন্ধ্যা'র সম্পাদক উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ইংরেজের আদালতে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে বলিয়াছিলেন, তিনি আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করিবেন না কারণ ঈশ্বর-নির্দিষ্ট স্বরাজের কাজে তিনি যাহা করিতেছেন তাহার জন্য তিনি বিদেশী সরকারের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহেন। এই উক্তি নবযুগের সূচনায় তূর্যনিনাদ।

হিন্দীতে প্রথম প্রভাবশালী সংবাদপত্র 'হিন্দী বঙ্গবাসী'। ইহার সম্পাদক বাঙ্গালী অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় হিন্দী ভাষায় এত শক্তিশালী লেখক ছিলেন যে, বোম্বাই প্রদেশে যখন প্রথম হিন্দী পত্র 'বেঙ্কটেশ্বর সমাচার' প্রকাশিত হয় তখন তাঁহাকেই উহার সম্পাদক করা হইয়াছিল।

আজ ভারতবর্ষের সর্বত্র ইংরেজী পত্র থাকিলেও ভারতীয় ভাষায় প্রচারিত পত্রের সংখ্যা অল্প নহে। মাদ্রাজ 'হিন্দু' পত্রের সম্পাদক জি. এস. আয়ার ইংরেজীতে অসাধারণ শক্তিশালী লেখক হইলেও পরিণত বয়সে ভারতীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রচার করিতে থাকেন। কয়টি কারণে এদেশে ভারতীয় ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্রেরও প্রচার সীমাবদ্ধ—

(১) প্রদেশে প্রদেশে ভিন্ন ভাষা
(২) লোকের দারিদ্র্য
(৩) শিক্ষার অভাব

তথাপি এই সকল পত্রের প্রচার ও প্রভাব অসাধারণ। সম্প্রতি দুইজন রাজনীতিক সংবাদপত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু মনে করেন তিনি সর্বজ্ঞ এবং যে কোন বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে পারেন। তিনি উর্দু সংবাদপত্র সম্বন্ধে বলেন—বাংলা তামিল মারাঠি ও গুজরাটি সংবাদপত্রের প্রচার আধিক্যের কারণ এই যে—

সেই সকল পত্রের ভাষার সহিত কথ্য ভাষার প্রভেদ বৎসামান্য। তিনি বলেন যে, রবীন্দ্রনাথের গান যে গীত এবং তাঁহার পুস্তক যে গ্রামেও পঠিত হয় তাহার কারণ সে সকলের ভাষা কৃত্রিমতা শূন্য এবং চলিত ভাষার নিকটবর্তী। ইহা যে বিরাট অজ্ঞতার পরিচায়ক তাহা রবীন্দ্রনাথের 'অয়ি ভুবন মনোমোহিনী' গানটি পাঠ করিলেই জানা যায়। উহাতে আছে "নির্মল সূর্য্য করোজ্জ্বল ধরণী," "অম্বর চুম্বিত ভাল হিমাচল শুভ্রতুষার—কিরিটিনী"। পণ্ডিত জওহরলাল বাংলা জানেন না সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথের গান ও রচনা সম্বন্ধে ভ্রান্ত উক্তি করিয়াছেন—অর্থাৎ নিজের মতের সমর্থনের জন্য রবীন্দ্রনাথের ভাষা সম্বন্ধে অযথা কথা বলিয়াছেন। আমরা বাংলা সংবাদপত্রের কথা বলিতে পারি। বাংলা সংবাদপত্রকে যাঁহারা বহুল প্রচারিত করিয়াছিলেন তাঁহারা এক একজন সাহিত্যের এক এক দিকের দিকপাল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—ইঁহারা ভাষার জাদুকর এবং ইঁহারা কখনই ভোলেন নাই যে, সাংবাদিকের ধর্ম এই যে, যে উপকরণ পাওয়া যায়বে তাহার মধ্য হইতে যাহা লোকের চিত্তাকর্ষক তাহাই বাছিয়া লইয়া সরল, প্রাঞ্জল ও প্রবলভাবে তাহা লিখিতে হইবে। তাঁহাদিগের আদর্শই তাঁহাদিগের পরবর্তীদিগকে প্রেরণা দিয়াছে। সংবাদপত্রের ভাষা কি হইবে না হইবে সে বিষয়ে জওহরলালের মতের মূল্য তত অধিক বলিয়া মনে করা যায় না। গত ১২শে অক্টোবর দিল্লীতে জওহরলালের এই উক্তির পরে ২৯শে তারিখে নৈনীতালে সাংবাদিক সম্মেলনে উত্তর প্রদেশের প্রধান সচিব শ্রীচন্দ্রভানু গুপ্ত বলিয়াছেন যেসে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে, জাতীয় ঐক্য রক্ষা করিতে এবং সরকারের পরিকল্পনা সমূহ লোকের গোচর করিতে—সংবাদপত্রসমূহ যেন সর্বদাই আগ্রহ প্রকাশ করেন। সংবাদপত্রের এই প্রয়োজন যদি সরকার স্বীকার করেন তবে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, তাঁহারা কি ইচ্ছা করিয়াই সংবাদপত্রের প্রচার হ্রাস করাইবার চেষ্টা করিতেছেন না? যেদেশের লোক প্রাথমিক শিক্ষায় বঞ্চিত সেদেশে সংবাদপত্রের প্রচার অল্প হওয়া অনিবার্য—এবং সেজন্য সরকারই দায়ী। কারণ তাঁহারা বার্ষিক বৎসরেও প্রাথমিক শিক্ষা সকলের অধিগম্য করেন নাই। কেহ কেহ মনে করেন যে তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতেছেন না। কারণ যেখানে লোক অজ্ঞ তথায় অনাচার করা চলে কিন্তু যেক্ষেত্রে শিক্ষা ও অভাব সন্নিহিত হয় সেইখানেই অগ্নি জ্বলিয়া উঠে।

———

রবীন্দ্র যুগ

শ্রীকালিদাস নাগ।

নভেম্বর ১৯১৩ তে রবীন্দ্রনাথ বিশাল প্রাচ্যখণ্ডে প্রথম Nobel পুরস্কার এনে এশিয়া তথা ভারতের নবজাগরণের নূতন সৌরব এনে দিলেন। সেই নভেম্বরে special ট্রেন চেপে আমরা শান্তিনিকেতনে পৌছলাম। আমাদের অগ্রণী হয়ে চলেছেন কবি-বন্ধু আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার নীলরতন সরকার, যোগেন্দ্র বসু [কুন্তলীন বোস] প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তি। তাঁদের পিছনে আমাদের 'রাবীন্দ্রিক' দল : চারু বন্দ্যো, সত্যেন দত্ত, মণি গাঙ্গুলী প্রভৃতি প্রবাসী ও ভারতীর লেখক লেখিকা—কত নাম করব। বিপক্ষদলেরও কেউ কেউ গেছেন—কবির দৃষ্টি এড়ায় নি। তাই বন্ধুদের প্রীতি-অর্ঘ্য বিনম্রভাবে গ্রহণ করে তাঁর ভাষণের মধ্যে এক জায়গায় তাঁর প্রচ্ছন্ন উষ্মা প্রকাশ করে ফেলেছিলেন; কারণ কবি হলেও তিনি রক্তমাংসে গড়া মানুষ। সাময়িক বাংলা পত্রিকায় সে সব ছাপা হয়ে গেছে কিন্তু যেসব যাঁরা কিছু না খেয়ে বোলপুরের ট্রেনে কিরলেন তাঁদের ভাল রকম শিক্ষা দেন 'নারায়ণ' প্রতিষ্ঠাতা চিত্তরঞ্জন দাশের বন্ধু বিপিনচন্দ্র পাল; তাঁর লেখাটি আজও আমাদের মনে আছে কিন্তু 'বিপিন পাল শতাব্দী' উপলক্ষে ছাপা হয় নি। ১৯১৪ থেকে জামাতা প্রমথ চৌধুরীকে নিয়ে যেমন রবীন্দ্রনাথ সবুজ-পত্র শুরু করলেন, তেমনি বিপিনচন্দ্র ও দেশবন্ধু প্রকাশ করেন 'নারায়ণ' পত্রিকা; আজ সেগুলি দুষ্প্রাপ্য, তাই গবেষণার বস্তু হয়ে আছে। শরৎচন্দ্র রীতিমত 'ভারতবর্ষ' আলো করার কিছু আগেই 'নারায়ণ' পত্রিকায় সত্যেন গুপ্ত 'কমলের দুঃখ' লিখে অনেককে দুঃখ দেন, অনেক তর্কবিতর্ক হয়—'চরিত্রহীনে'র বহু আগে। সাহিত্যে ভদ্র ও অভদ্র এই শ্রেণী বিভাগ চলে কিনা এ বিচার শরৎচন্দ্র প্রকাশের আগেই উঠেছিল, 'সাগর সঙ্গীত' রচয়িতা চিত্তরঞ্জনের বেনামী রচনায় ও সত্যেন গুপ্তের উপন্যাসে। সে তর্ক 'চরিত্রহীন' থেকে কল্লোল-যুগের কাঁচা লেখক-গোষ্ঠি—গোকুল নাগ, অচিন্ত্য ও বুদ্ধদেব বসু পর্যন্ত চলেছিল। বঙ্কিমী গদ্যরীতি ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ কথ্য ভাষায় লিখছেন "স্ত্রীর পত্র" তার জবাব দিয়েছেন বিপিন পাল 'নারায়ণে'। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ [আগস্ট ১৯১৪] ঘনিয়ে উঠার আগেই বাংলার মানসিক দ্বন্দ্ব যুদ্ধ—Nobel Prizeএর সঙ্গেই—যেন শুরু হল। তখন থেকে অর্ধশতাব্দী পার হয়ে গেছে—কিন্তু তথ্যপূর্ণ বিচার গ্রন্থ রচিত হয় নি। আমার ছোট ভাই গোকুল নাগ তার 'পথিক' ও অচিন্ত্য তার 'বেদে' লিখে কবে পাশ খেলেন কিন্তু প্রবীণ দীনেশ সেন এবং শরৎ চট্টোপাধ্যায় তাঁদের আশীর্বাদ ও উৎসাহ দিয়ে গেছেন। হিন্দী সাহিত্যে ছায়াবাদী নাম ধরে আধুনিক লেখকরা দেখা দিলেন। তাঁরা জানতেন না যে রবীন্দ্রনাথই 'খেয়া' কাব্যে বহু আগে তার শুরু করেন আবার তিনিই Nobel Prizeএর আগে রূপক নাট্য 'রাজা' ও 'ডাকঘরে' Symbolist রূপেও বহু রচনা করে গেছেন। 'তপোবন' রচনা ও শান্তিনিকেতন গঠন ও ৬০ বছর আগেকার কথা সেটি স্মরণ করাই গল্প-ভারতীর পৌষ সংখ্যায়।

সেই আশ্রমে ১৯১৫ সনে, দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে নতুন হয়ে—বোলপুরে নামলেন মহাত্মা গান্ধী সপরিবারে। তিনি আদর্শবাদী অথচ এই কঠিন মাটিতে পা রেখে আজীবন তিনি অহিংস সংগ্রাম

করেছেন। জগতে Real কি তা গান্ধি ও রবীন্দ্রনাথ দু'জনেই জানেন; তবু তর্ক উঠলো "রবীন্দ্র-রচনা" বস্তুতান্ত্রিক কি না? দার্শনিক প্রশ্ন তুললেন বিপিন পাল, তার পালটা জবাব দিলেন তাঁরই বন্ধু-পুত্র অজিত চক্রবর্তী যিনি শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ তথা আধুনিক Realism নিয়ে আলোচনা করেন; সে সব এখনো 'প্রবাসী'র মধ্যে বন্দী হয়ে আছে, আশা করি এবার ছাপা হবে। প্রবাসী ৬০ বছর ধরে বাংলা দেশ ও সাহিত্য নিয়ে কতো মূল্যবান প্রবন্ধ ছেপেছে ও রবীন্দ্র-প্রচার করেছে, সেটি জানা যাবে যদি বিষয়-নির্ঘণ্ট [Subject Index] ছাপান হয়; সেই সঙ্গে সুরেশ সমাজপতির 'সাহিত্য' ও কবিবন্ধু নাটোর মহারাজ ও প্রভাত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মানসী ও মর্মবাণী'ও দেখা দরকার। কিছু কিছু উদ্ধৃতি [quotations] প্রত্যেক সজীব মাসিক-পত্রে ছাপালে গ্রাহক ও সাধারণের উপকারে আসবে। সেই আশা করে রবীন্দ্র-যুগের সাহিত্যিক পত্রিকার এক বিশেষ স্থান আছে এটি মনে করালাম। সংবাদ সরবরাহ ব্যাপারে জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক চাহিদার ফলে বিরাট business গড়ে উঠেছে কিন্তু সংবাদ-সাহিত্য বহুদূরে চলে যাচ্ছে সাহিত্য থেকে, যদিও সাহিত্যিকদের শোচনীয় অবস্থার কিছু লাঘব তাঁরা করেছেন। তবে 'পূজা সংখ্যা'র হিড়িকে কিছু টাকা আনার ব্যবস্থা প্রশ্রয় না দিয়ে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ বিষয়ে আমাদের মন দিতে হবে। শুধু টাকার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গোরা' বা 'শেষের কবিতা' প্রবাসীতে ছাপেন নি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ও সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার অবদানও এখানে স্মরণীয়। প্রথম সভাপতি রমেশদাও ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের সহকর্মী। ১৮৯৪ সনে বঙ্কিম তিরোধান হতেই রমেশচন্দ্র প্রথম Bengal Academy ও Lettersকে স্বদেশী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রূপান্তরিত করেন ও স্বদেশী-যুগের দাতাকর্ণ মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ইমারতের জন্য ভূমি দান করেন। লালগোলার মহারাজ 'পদকল্পতরু' নামে বৈষ্ণব তথা বাঙালীর গানের বিরাট সংগ্রহ প্রকাশ করে বহু লক্ষ টাকা দান করেন ও তাঁর আত্মীয় অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সাহিত্য পরিষদের সেবা করে অমর হয়ে গেছেন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তৎশিষ্য নগেন্দ্রনাথ বসু ['বিশ্বকোষ' সম্পাদক] ও বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ—'বৌদ্ধগান ও দোহা', 'কৃষ্ণ কীর্তনাদি' প্রাচীন বাংলা পুঁথির পুনরুদ্ধার করেন ও তার ফলে বন্ধুবর ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১০০০ বছরের পুরাণ বাংলার উপর তাঁর বিরাট গ্রন্থ লিখে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। বঙ্কিম-যুগ [১৮৩৮-১৮৯৪] থেকে শুরু করে তাঁর এই সব উত্তরসাধকদের সঙ্গেও বিদগ্ধ কবি রবীন্দ্রনাথ যোগ রক্ষা করে গেছেন এটা যেন না ভুলে যাই। তাঁরই উৎসাহে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী শুধু বৈদিক সাহিত্য নয় বৌদ্ধ পালিভাষা ও সাহিত্যের চর্চাও শুরু করেন শান্তিনিকেতনে দেখেছি এবং তাঁর সতীর্থ পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীও কবীর, দাদু প্রভৃতি মধ্যযুগের হিন্দী সন্ত-সাহিত্য বাংলায় প্রচার করে গেছেন —হিন্দী রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের বহু পূর্বে [১৯০৬-১৯১৬] তার প্রথম সাড়া পাশ্চাত্যে পৌঁছল যখন Nobel Prize এর পর রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলীর মত ইংরেজী ভাষায় Poems of Kabir ছাপলেন, যার মূল্য আজ হয়তো বোঝা যায়। শুধু ছাপার অক্ষরে নয় অলিখিত সাহিত্যও বাংলায় আছে তার সন্ধান রবীন্দ্রনাথ দেন—তাঁর ছেলে-ভুলানো ছড়া ও মেয়েলী মৌখিক রচনার নমুনা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ছাপেন। তারপর 'হারামণি' নামে কত মূল্যবান মৌখিক রত্নের পুনরুদ্ধার করে গেছেন বহু লেখক ও লেখিকা তাঁদের সকৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করি, বিশেষ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৪২-১৯২০] ও তাঁর সুগৃহিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল থেকে স্নেহসিঞ্চনে তাঁকে 'জাত কবি'

রূপেও দেখে গেছেন। ছোটদের জন্য প্রথম পত্রিকা 'বালক' জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ও রবীন্দ্রনাথই প্রকাশ করেন পরে 'সখা ও সাথী' 'মুকুল' 'সন্দেশ' ও 'মৌচাক' প্রভৃতি বহু পত্রিকার মাধ্যমে আমরা যোগেন গুপ্তের 'শিশু-ভারতী'তে পৌঁছেছি। ছেলে-ভুলানো ছড়ার ও আউল-বাউল গানের যে সাহিত্যিক মূল্য আছে সে শিক্ষা রবীন্দ্রনাথই দিয়ে গেছেন, তাঁর কাছে এসব বিচিত্রক্ষেত্রে ঋণ স্বীকার রবীন্দ্র শতাব্দীর মধ্যেও হয় নি, তাই সংক্ষেপে তার উল্লেখ করলাম।

অকালে যে বন্ধুকে হারিয়েছি সেই মনীষী সুকুমার রায়কে এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে স্মরণ করি। তাঁর একমাত্র পুত্র সত্যজিতের সম্বর্ধনায় সে কথা কিছু বলেছিলাম। তার বাবা সুকুমার সুকবি ও শিল্পী উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, B.sc. পাশ করে U. Roy & Co. টেকনিসিয়ন হিসাবে শুরুপ্রসন্ন বৃত্তি লাভ করে বিলাতে যান ১৯১৩ সনে। দেশে ফিরে ভাল ব্লক ছেপে পত্রিকা মহলে খুব সুনাম পান, সেই সঙ্গে বন্ধীয় হিতসাধন মণ্ডলী প্রদর্শনীতে তাঁর বিচিত্র হাস্যরসসিক্ত ছবিগুলি দেখিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেন। অফুরন্ত হাসির ভাণ্ডারী ছিলেন তিনি আমাদের ষণ্ডে-ভাবে [Monday Club, 1911-21]। তার বিবরণটি প্রকাশ হয় নি কিন্তু ১৯১৩ সনে অকালমৃত্যুর আগে 'আবোল তাবোল' 'হ-য-ব-র-ল' ইত্যাদি লিখে ছোট বড় সবাইকে সুকুমার রায় মুগ্ধ করে গেছেন। তাঁর সহধর্মিণী 'রামায়ণ পাঁচালী' স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শুনে খুশি হয়ে 'বিচিত্রা' ভবনে তাঁর বৈকুণ্ঠের খাতার সঙ্গে সুকুমারের রচনাও সবাইকে শোনান।

"তুমি জান ক্ষুদ্র যাহা ক্ষুদ্র তাহা নয়"—এই গভীর সত্য রবীন্দ্রনাথই আমাদের শিখিয়ে গেছেন ও শেষ বয়সে 'ছড়া ও ছবি' আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন। নিজে শেষ দশ বছরে [১৯৩১-৪১] প্রায় দু' হাজার ছবি এঁকে জগৎপ্রসিদ্ধ শিল্পী বলে স্বীকৃতি পেয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের শিল্প—আদি-সত্তার ভগীরথও তিনি; ১৮৮৪ সনে যখন লেখেন তাঁর 'ছবি ও গান' তখন কি স্বপ্নেও একথা ভেবেছিলেন? এমনি কত অলি-গলিতে পদযাত্রা করলে তবেই রবীন্দ্রজীবনীর পূর্ণ তাৎপর্য আমরা বুঝব।

আমাদের 'গল্প-ভারতী'র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় স্মরণ করিয়েছি যে ৭ অগ্রহায়ণে রবীন্দ্রনাথ হারিয়েছিলেন তাঁর সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীকে [১৯০২] আবার ওই তারিখেই হারান তাঁর প্রিয়তম শিশুপুত্র শমীন্দ্রনাথকে [১৮৯৪-১৯০৭]। ১৯০৩-৪ সনে মোহিতচন্দ্র সেন যে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন তাতেই প্রথম ছাপা হয় রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' কবিতাগুলি, যার মধ্যে তাঁর চোখের জল ছন্দের বাঁধন এড়িয়ে যেন উপচে পড়েছিল। গীতাঞ্জলির গানেও তার গভীর আভাষ পাই। জন্ম-শতাব্দীর উৎসবে যেন আমরা এসব ভুলে না যাই। আশ্রমের ছেলেদের নিয়ে অভিনয় করেন 'মুকুট' নাটিকা [১২৯২ বালক পত্রিকায়] প্রকাশিত। সেই ১২৯৮ সনে লেখেন প্রায়শ্চিত্ত নাটকে বাউলের গান 'বাঁচান বাঁচি যারেন যদি বল ভাই বন্ধু হরি'।

রবীন্দ্রনাট্যে মৃত্যুবিজয়ী এই বাউলের ভূমিকা ঠাকুর্দা বা সন্ন্যাসী নামে দেখি রাজা ও ডাকঘর অচলায়তন [১৯১০-১২] ও ফাল্গুনী [১৯১৬] রূপক-নাট্যে। নটের গুরু রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গভীর আলোচনা প্রয়োজন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ ব্রজকিশোর গুহ ও কলিকাতার নগরপাল উপানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সাদর নিমন্ত্রণে দু'বার ওই বিষয়ে ভাষণ দিয়েছি ও লিখেছি কিন্তু অভিনয় দর্পণের রঙ্গনাথ রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে নাট্যরচনা করে তার প্রয়োগ বিজ্ঞান দেখিয়ে গেছেন তার গতি এখনি ক্ষীণ হতে শুরু করেছে; রবীন্দ্র-ভারতী এদিকে দৃষ্টি রেখে কবিকে সহ যদি photo সংগ্রহ করেন

বিশেষ উপকার হবে। অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য এ বিষয়ে প্রবীণ উদ্যোক্তা ছিলেন তিনিও চলে গেলেন, কিছু লিখে গেছেন কিনা তা আমাদের অজ্ঞাত। এ বিষয়ে গবেষণার উদার ক্ষেত্র পড়ে আছে। বন্ধুবর শিশির ভাদুড়ি থাকলে তাঁকে দিয়েও সেখানো যেত কারণ বহুকাল তিনি রবীন্দ্রকাব্যের বিশেষ নাটকের পরিবেষণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দুই গুণী ভাইপো গগনেন্দ্রনাথ [১৮৬৭-১৯৩৮] ও শিল্পাচার্য অবনীন্দ্র নাথকেও [১৮৭১-১৯৫১] এই সঙ্গে স্মরণ করি। অনেক ভূমিকায় তাঁরা খুড়োমশায়ের সঙ্গে উচ্চাঙ্গের অভিনয় দেখিয়েছেন; রাজোচিত গরিমায় গগনেন্দ্র এবং উদ্ভট-রস পরিবেষণে নটশ্রেষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথ আমাদের মুগ্ধ করতেন; তাঁদের কাছেই শুনেছি আমাদের Top Comedian অর্ধেন্দু মুস্তফীর অভিনয় নৈপুণ্যের কথা। তাঁদের 'বামধেয়ালী' ক্লাবের বহু কথা আমাদের শোনাতেন সমরেন্দ্র ঠাকুর মহাশয় [১৮৭০-৫১] তাঁর সরস ও নীরব অভিনয়ও দেখেছি। এমন নাট্য-প্রতিভার সমাবেশ ঘরের মধ্যে হয়েছিল ও দাদা জ্যোতিরিন্দ্র [১৮৪৯-১৯১৫] 'নাটুকে গোছী'র মধ্যমণি ছিলেন বলেই বাংলা নাটক, আজ নিখিল ভারতীয় নাট্য প্রযোজনায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। 'হাসি কান্নার ঢৌরা পাল্লা ঝলক দিয়ে উঠছে রাজা নাটকে। শান্তিনিকেতনে চাষরের মধ্যে দেখেছি বর্তমান বিশ্ব-ভারতীর উপাচার্য শ্রীসুধীরঞ্জন দাসও সেকালে (নারী শিল্পীর অভাবে) রাণী সুদর্শনা সেজে আমাদের আনন্দ দিয়েছেন। আশা করি এখনকার শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের সেই উচ্চাঙ্গের অভিনয় শিক্ষা দিয়ে যাবেন। শান্তিনিকেতন রঙ্গমঞ্চ [Stage-craft] নিয়ে কেউ থীসিস্ লিখুন এই অনুরোধ করি। কারণ বলাকা [১৯১৪-১৬] রচনার মধ্যে পড়েছিল Shakespeare মৃত্যুর তৃতীয় শতাব্দী [১৯১৬, সনেট দ্রষ্টব্য] আর ১৯৬৪ সনের ফাল্গুনে আসছে তাঁর জন্ম ত্রিশতাব্দী [Tri-centenary]। সেই বিশ্বনাট্যকার বাংলা তথা ভারতীয় নাট্যের সুহৃদ্বার বললেই হয়, কারণ বিদ্যাসাগর তাঁর 'ভ্রান্তি বিলাস' লেখেন Comedy of Errors অবলম্বনে। তেমনি কবি হেমচন্দ্র লেখেন রোমিও-জুলিয়েট এবং নলিনী-বসন্ত [Tempest]। হয়তো বাংলার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ও হয়েছে। গিরীশ ঘোষ মহাশয় ম্যাকবেথ অনুবাদ ও সার্থক অভিনয় করে গেছেন। তাঁর প্রেরণায় Othello প্রভৃতি অনেক কিছুর অভিনয় শুরু হয়েছে; উৎপল দত্তের ওথেলো অভিনয় দেখে আশা হয়েছে যে শেকস্‌পীয়র ৪০০ জন্মশতাব্দীতে বাংলার নট ও নটী উপযুক্ত অর্ঘ দেবেন ও মনে রাখবেন বালক রবীন্দ্রনাথ ম্যাকবেথ পড়ে কিছু ভাব অনুবাদ করেন তার মধ্যে রক্ষা পেয়েছে শুধু 'ডাইনীর গান'গুলি।

প্রার্থি

মানুষের ধর্মবোধ তাকে নিয়তই শিক্ষা দিচ্ছে তোমার আমিই একান্ত নয়। তোমার আমিকে সমাজ-আমির মধ্যে মুক্তি দাও। অর্থাৎ তোমার বিশেষত্বকে অতি বিশেষের অভিমুখে নিয়ে চলো।

রবীন্দ্রনাথ

রৌদ্র-ছায়ার খেলা ॥

জগদীশ ভৌমিক

ডিরেক্টর, টেক্‌নিশিয়ান্ এবং অন্যান্য অভিনেতারা আগের ট্রেনে চলে গেছে। চিত্রলেখারও একই সঙ্গে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অলক মজুমদারের জন্যেই তা হয়ে ওঠেনি। দুষ্টুমি করে লোকটা অথথা তাকে দেরী করিয়ে দিয়েছে।

লোকটির ছেলেমানুষী আর খামখেয়ালীর অন্ত নেই। আজ সাতসকালে চিত্রলেখার বাড়িতে গাড়ি নিয়ে হাজির হয়ে বলে, চলুন মিস সেন একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

সে প্রথমটায় রাজি হয় নি। আজ যে আউটডোরে শুটিং-এর জন্যে সকাল সাড়ে ন'টার ট্রেনে তাকে বাইরে যেতে হবে—এ কথা বলে সে অলক মজুমদারকে এড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু লোকটি একেবারে নাছোড়। তাকে যথাসময়ে বাড়ি পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে শেষ পর্যন্ত নিয়েই গিয়েছিল সঙ্গে করে। তারপর ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে তারা অনেকদূর চলে গিয়েছিল।

প্রথমটায় সে রাজী হয় নি বটে, কিন্তু অলক মজুমদারের পাশে ব'সে শান্ত পল্লী প্রকৃতির ভেতর দিয়ে গাড়ি করে যেতে যেতে আজকের সকালটা তার কাছে মন্দ লাগছিল না। অলক মজুমদারের বিস্তারিত হাতের ওপর মাথা রেখে গল্প করতে তারও যেন সময় জ্ঞান লোপ পেয়েছিল। তারপর যখন বাড়ি ফিরল তখন আর নিখিল ট্রেনটা ধরার সময় হাতে ছিল না।

তাই পরের ট্রেনটাতে সে চলেছে।

দলের লোকদের সঙ্গে যাওয়া হয়ে ওঠে নি বলে এমনিতে তার মনটা ভাল ছিল না। তার ওপর ট্রেনে ভিড় দেখে মেজাজটা আরও খিঁচড়ে উঠেছে। সেকেণ্ড ক্লাশ কম্পার্টমেণ্টেও যে এতো ভিড় হবে তা সে ধারনা করে পারে নি। সে যে বার্থটায় বসেছে সেটায় যদিও আর কেউ বসে নি, তবু কম্পার্টমেণ্টের অন্য বার্থ দুটোয় যে পরিবারটি লটবহর কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে দখল করে বসে আছে, তাদের চ্যাচামেচি হই হট্টগোলে কান ঝালাপালা। তার ওপর আছে হকারদের চীৎকার। বিরক্তিতে সে তো তখন একটা হকার ছোঁড়াকে মারতেই বসেছিল।

এক ঝাঁকা জাদরেল মাথায় নিয়ে সেই বিশ্রী চেহারার ছেলেটা এই কম্পার্টমেণ্টে উঠেছিল। পিচুর খোলার মতো খস্‌খসে চামড়া, পরনের জামা আর ইজেরটা ঘামে ময়লায় চিটচিটে। সমস্ত গা বেয়ে দরদর ক'রে ঘাম ঝরছিল। গা থেকে একটা বিশ্রী ঝাঁপটে গন্ধ বেরুচ্ছিল। সেই গন্ধে চিত্রলেখার ভেতরটা যেন পাক দিয়ে উঠছিল। তার ওপর ছেলেটার কর্কশ গলার চ্যাচানি কানের পর্দায় বড়ো বিশ্রীভাবে বাজছিল।

সে ছেলেটাকে কয়েকবার একটু তফাতে স'রে দাঁড়াতে বলেছিল। ছেলেটা তার কথা কানে নেয় নি। সে তখন রেগে গিয়ে ছেলেটাকে একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিল। ট্রেনের কম্পার্টমেণ্টে অন্য কেউ না থাকলে হয়তো ছেলেটাকে মেরেই বসতো, কিম্বা ঘাড় ধ'রে ট্রেন থেকে নামিয়ে দিত।

ছেলেটা অবিশ্যি তখন কিছু বলে নি। শুধু একবার ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে মুখ বুজে ট্রেন থেকে নেমে পড়লো। কিন্তু আড়ালে গিয়ে কিছুক্ষণের ভেতর কি যে কসি ঝাঁটলো, তারপর দেখা গেল

কোনো স্টেশনে এসে ট্রেন থামলেই চিত্রলেখার জানালার কাছে হকারদের ভিড় এবং হাঁকাহাঁকি শুরু হয়ে যায়।

সামনের বার্থের ভদ্রলোক অনেকক্ষণ থেকে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলেন। এক সময় তাকে বললেন,—কাজটা আপনি মোটেই ভালো করেন নি। ওসব ছোটলোকদের কি অমন ক'রে খাঁটাতে আছে! আজকাল তো ওদেরই রাজত্ব।

সে বললো,—দেখছেন তো জানোয়ারদের মতো কি রকম অসভ্যতা শুরু করেছে। ওদের ঘরে আদ্যোপান্ত হুইপ্ করা উচিত।

ভদ্রলোক বললেন,—আপনার বড়ো অসুবিধে হচ্ছে, আপনি বরঞ্চ মাঝের বার্থটায় এসে শুন।

না—তার দরকার নেই। —বলে সে জানালার শার্সিটা ফেলে দিল। তারপর সঙ্গে করে যে সিনেমা পত্রিকাটি এনেছিল, তার পাতা ওল্টাতে লাগলো।

এপক্ষকে অন্যমনস্ক হ'তে দেখে হকারদের উৎসাহও আর বেশীক্ষণ থাকলো না।

অন্যমনস্কতার ভাণ ক'রতে গিয়ে সে সত্যিই যেন কখন বড়ো অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। কতখানি পথ এলো বা কখন কোন্ স্টেশনে এসে ট্রেন থামলো তা ওর মোটেই খেয়াল ছিল না। সেই অন্যমনস্কতার ভেতরেই এক সময় সে জানলা দিয়ে তাকাতে গিয়ে চমকে উঠলো।

যেখানে এসে ট্রেনটা এইমাত্র থামলো। সেই স্টেশনটার নাম এবং তার চেনা চেহারাটা দেখামাত্রই সে চমকে উঠলো এবং মুহূর্তের ভেতর কেমন যেন সম্মোহিতও হয়ে পড়লো।

সে দেখলো, লাল কাঁকর বিছানো প্ল্যাটফরমের ওপর কৃষ্ণচূড়া গাছগুলি আর স্টেশনের বাইরে বটগাছটা ঠিক তেমনই আছে। দশবছর আগেও যেমনি দেখা যেত, আজও তেমনি দেখতে পেল, বটের ছায়ায় দুই লাগানো গোরুর গাড়ি কয়েকটি পড়ে আছে, গাড়োয়ানরা ব'সে বিড়ি টানছে, গোরুগুলো ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে জাবর কাটছে। বটগাছের তলা দিয়ে যে লাল খোয়ার রাস্তাটা মাঠের মধ্যে দিয়ে গ্রামে গিয়ে মিশেছে, সেই রাস্তাটা আজও ঠিক তেমনি আছে।

যতো দেখতে লাগলো ততই যেন কি এক আকর্ষণবোধে তার বুকের ভেতরটা মোচড় দিতে লাগলো। একটা বেদনা বোধে সে যেন বড়ো অস্থির হয়ে পড়লো।

তারপর সেই অস্থির অপ্রকৃতিস্থ মুহূর্তে কি যে ক'রে ফেললো তা বুঝি ওর নিজেরই খেয়াল ছিল না।

আশ্চর্য!

জায়গাটার নাম আর তার চেনা চেহারা দেখে দশ বছর আগের অতীত যে হঠাৎ এমন জীবন্ত হয়ে উঠবে, মনটাকে বেদনায় বিহ্বল ক'রে তুলবে তা সে কোনোদিন ধারণাও করতে পারে নি।

দশ বছর আগের সে জীবন তো অতীতের সঙ্গেই বিলীন হয়ে গেছে। দশবছর ধ'রে নতুন জীবনের সাধনায় সে তো সে-জীবনটাকে ভুলতেই চেয়েছে, এবং একরকম ভুলেই থেকেছে—বর্তমান জীবনের নিত্য নতুন মনোহারিত্বে এবং ব্যস্ততায়। অতীত জীবনের জন্যে কোনোদিন তো এমন বেদনা অনুভব করে নি, এমন কি এতটুকু বিচলিতও হয় নি।

মনে যদি তেমন দুর্বলতাই থাকতো তাহলে তো সে এপথে আসতো না। কারণ সে তো জানতোই মণিরামপুর স্টেশনটা এই পথে পড়বে, এবং জানা থাকা সত্ত্বেও তো ট্রেনে চাপার আগে বা ট্রেনে চেপে তার মনের স্বাচ্ছন্দ্য এতোটুকু ব্যাহত হয় নি!

এমনকি এই ব্যাপারটা ঘটবার কয়েক সেকেণ্ড আগেও তো সে এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। তার চিন্তা ভাবনাগুলো একেবারে ভিন্ন একটা জগতে বিচরণ করছিল। বাঙ্কের ওপর পরম আয়েসে গা এলিয়ে দিয়ে সিনেমা সাপ্তাহিকটার পাতা উল্টাতে উল্টাতে সে ভাবছিল অলক মজুমদারের কথা। ভাবছিল, লোকটা কেমন—। ওর ওপর কতখানি ভরসা করা যায়। আজ সকালে বেড়াতে গিয়ে ডায়মণ্ডহারবার রোডের সেই হেলটি সাহেবের দ্বারায় গাড়ি থামিয়ে তার সঙ্গে ঘণ্টাখানেক ধরে যে সব কথাবার্তা হয়েছে তার ভেতর কতখানি সত্যতা আছে। যে লোকটা যে তার রূপের মোহে পড়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওর স্বাস্থ্যটি বেশ এবং কথাবার্তার ধরণধারণগুলো বড়ো চমৎকার।

বাঙ্কের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে চিত্রলেখা এইসব কথাই ভাবছিল এবং তন্ময় হয়ে পড়েছিল। সেই তন্ময়তার ভেতরেই একসময় তার দৃষ্টিটা অজান্তে বাইরে চ'লে গিয়েছিল। এবং যাওয়ামাত্রই সে চমকে উঠেছিল।

তারপর মুহূর্তের ভেতরেই তার মনে এই বিপর্যয় ঘটে গেল।···

গাড়ি থেকে নেমে সে কিছু বড়ো ইতস্তত বোধ করতে লাগলো। ভাবলো, ছি ছি—একি ছেলে-মানুষের মতো কাজ ক'রে বসলুম। কেনই বা ট্রেন থেকে নামলুম! দশ বছর আগে একদিন যাদের হেলায় ফেলে একটা উটকো লোকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলুম, আর কি তাদের সামনে যাওয়া যায়! আর গিয়েই বা কি করবো! কি কথা বলবো! কিছুই তো আমার বলার নেই, এবং করারও নেই কিছু। তবু—তবু কেন এমন একটা অসম্ভব কাজ ক'রে বসলুম!

প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে সে যখন এই সব কথা ভাবতে লাগলো তখন আর কিছু করারও উপায় নেই। ট্রেনটা ততক্ষণে হোম্-সিগন্যাল ছাড়িয়ে আরও অনেকখানি চলে গেছে।

গাড়িটার দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে অবশেষে বিমূঢ়ের মতোই স্টেশন থেকে বেরিয়ে সেই বটগাছটার ছায়ায় এসে দাঁড়াল।

আশপাশের কিছু লোক তার দিকে তাকিয়েছিল। সে বুঝতে পারলো, তার চেহারা আর বেশবাস গ্রামের লোকগুলোর মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে।

এইভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে সে বড়ো অস্বস্তি বোধ করছিল। তাই সে লাল খোয়ার রাস্তাটা ধ'রে পায়ে পায়ে এগিয়ে চললো।

মাথার ওপরে সূর্য আগুন ছড়াচ্ছে। সমস্ত মাঠঘাট রুক্ষ, রিক্ত। বৈশাখ-দুপুরের অসহ্য দাবদাহে সমস্ত প্রকৃতি ঝলসে গেছে। গাছের পাতাগুলি ম্রিয়মান। বর্ষার কলধারায় পাওয়ার জন্যে ওদের সারা অন্তরে যেন কি এক আকুলতা। তার মনে হচ্ছিল, গ্রামের সেই দুঃখী মানুষ দুটির অন্তরের বেদনা আর দীর্ঘশ্বাসই যেন এখানকার গাছের পাতায় এবং সারা প্রকৃতিতে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।

গ্রামের পথে চলতে চলতে কিছুক্ষণ আগের সেই বাস্তব-সচেতনতা লোপ পেয়ে তার মন আবার বিহ্বল হয়ে পড়লো। সেই বিহ্বলতায় সে ভাবতে লাগলো, সেই মানুষ দুটির কথা, যাদের সে দশবছর আগে ফেলে চলে গিয়েছিল।

·····সেই আধাবয়সী প্রাইমারী স্কুলের টিচারটি, যে এই দশবছরে হয়তো আরও খানিকটা বুড়িয়ে গেছে। আর তিন বছরের সেই বাচ্চাটি, যে এখন তেরো বছরের কিশোর হয়েছে। কি জানি কেমন এবং কার মতোন দেখতে হয়েছে। এবং কেমনই বা তারা আছে।

সে ভাবছিল, দশ বছর আগে একদিন সকালে উঠে ছেলেটা যখন তার মাকে দেখতে পায় নি সেদিন তার মনে কি প্রশ্ন জেগেছিল, এবং সেই আধাবয়সী দরদে মানুষটিই বা তাকে কি বলে সান্ত্বনা দিয়েছিল এবং নিজেকেই বা সে কতখানি শান্ত রাখতে পেরেছিল। দুঃখে বেদনায় মানুষটার জীবন হয়তো আরও জর্জরিত হ'য়ে উঠেছিল। তারপর,—কি জানি হয়তো—

হাঁটতে হাঁটতে চিত্রলেখা মাঠ পেরিয়ে গ্রামের সীমানায় পৌঁছে গিয়েছিল। রাস্তার ধারে একটা টিউবওয়েলে গ্রামের কয়েকজন বউ-ঝি জল তুলছিল। তাকে দূর থেকে দেখে তাদের পরস্পরের ভেতর একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন শুরু হলো। খানিকক্ষণের জন্যে তাদের কাজ থেমে রইলো। সবাই বিস্ফারিত চোখে তার দিকে চেয়ে রইলো। কেউ কেউ ঘোমটাটা একটুখা টেনে দাঁড়াল।

তাদের বেশবাস চেহারা এবং চাউনী দেখে সে ভাবতে লাগলো, একদিন সেও তো এদের মতোই ছিল। আজকের সঙ্গে তার সেদিনকার সবকিছুর কত পার্থক্য; রব করা চুল, শিফনের শাড়ি এবং চোখে সানগ্লাস আঁটা আজকের চিত্রলেখা সেনের ভেতর সেদিনের কস্তাপেড়ে শাড়ি পরা মাহার'পী গুপ্ত নামে একটি গ্রাম্যবধূর কোথাও এতোটুকু মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সত্যি কি অভাবনীয় রূপান্তর!

জীবনের একটা পরিবর্তন সবসময় সে চেয়েছিল, কিন্তু এতোটা যে হবে ধারণা করতে পারে নি।

ছেলেবেলা থেকে সে মামার বাড়িতে এমন একটা আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছিল, যেখানে শত দারিদ্র্য থাকা সত্ত্বেও শহুরে জীবনের নানারকম চমকপ্রদ পরিবেশে তার মনের আশা আকাংখা এবং আনন্দের পরিধি বেড়ে গিয়েছিল। সেখানে যেন একটা বিরাট আকাশের স্বাদ পেয়েছিল। তাই বিয়ের পর নিরানন্দময় গ্রাম্যজীবনের ছোট্ট গণ্ডীর ভেতর পরিমিত আশা আকাংখা নিয়ে সে যেন কিছুতেই খুশি হ'তে পারছিল না। তা ছাড়া সেই আধাবয়সী লোকটির প্রাণপ্রাচুর্যের অভাবও তাকে নিয়ত পীড়া দিত। জীবনের সেই ছোট্ট গণ্ডীর ভেতর মনটা পাখা ঝাপটে মরতো। তখন তার কেবলই মনে হতো, জীবনে কত বৈচিত্র্য কত আনন্দ আছে, অথচ এই সবকিছু থেকে তাকে সারাজীবন বঞ্চিত হয়ে থাকতে হবে। এই বঞ্চনার বেদনাই এক এক সময় তার মনকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে তুলতো।

জীবনের এমনি একটা অবস্থায় মৃগাংক নামে সেই যুবকটির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সেই গ্রামীন জীবনে মৃগাংক যেন তার মনে একটা চমক জাগিয়ে তুলেছিল। মৃগাংকের বেশবাস চলন-বলন কোন কিছুর সঙ্গেই যেন গ্রামের মানুষগুলির এতোটুকু মিল ছিল না। মৃগাংক কলকাতায় থেকে কি একটা করতো। মাঝে মাঝে গ্রামে আসতো। এক পাড়ায় বাস, তা ছাড়া নিশিকান্তর কাছে ছেলেবেলায় পড়েছিল। সেই সূত্রেই মাঝে মাঝে বাড়িতে আসতো। প্রথম থেকেই তারা পরস্পরের প্রতি কেমন যেন একটা আকর্ষণ অনুভব করতো। এই আকর্ষণ বোধেই একদিন তারা দুঃসাহসিক হয়ে উঠেছিল।

.....কোলকাতায় এসে মৃগাংকর সঙ্গে কয়েকটা মাস বেশ ভালোভাবেই কেটেছিল। উত্তর কোলকাতায় একটা বাসা ভাড়া নিয়ে তারা দু'জন স্বামীস্ত্রীর মতোই সংসার পেতেছিল। সিনেমা, থিয়েটার, বেড়ানো, বন্ধুবান্ধব নিয়ে মৃগাংক বেশ ফুর্তিতেই ছিল, এবং তাকেও রেখেছিল।

কিন্তু তারপর লোকটার কি যে হলো; বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ একদিন কোথায় উধাও হলো।

..... তারপর প্রায় বছর চারেক পরে চিত্রলেখা একদিন তার দেখা পেয়েছিল। ততদিনে সে শহর

জীবনের নানা গোলক ধাঁধার ঘুরে অভিনয় করতে এসেছে, এবং একটু আধটু নামও করেছে। টাকা পয়সাও কিছু আসছে।

এসব খবর পেয়েই বুঝি সুধাংক তার কাছে এসেছিল সাহায্যপ্রার্থী হয়ে। নানা বিপাকে পড়ে তখন তার বড় দুরবস্থায় দিন কাটছে।

সুধাংকর সেই করুণ গলার প্রার্থনায় তার মন কিন্তু সেদিন এতোটুকু টলে নি। ততদিনে নগরজীবনের কঠোর বাস্তবতায় দয়া-দাক্ষিণ্য ক্ষমা নামক মনের দুর্বল বৃত্তিগুলি লোপ পেয়েছে। সেদিন সে তাকে কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিয়েছে।

.....তারপর দিনে দিনে তার জীবনে কত পরিবর্তনই না হয়ে গেল। প্রতিপত্তি হ'লো, অর্থ জুটলো, সেই সঙ্গে স্তাবক এবং চাটুকারের দলও বাড়তে লাগলো। তাদের নিয়ে তার জীবন কত বৈচিত্র্যের মাঝকটায় ভ'রে উঠলো।

জীবনের সেই মাধুর্যটা এবং বাস্তবতার অতীতটা যেন তার মন থেকে একেবারে মুছেই গিয়েছিল। আজ তা কি আকস্মিকভাবেই না তার সামনে এসে হাজির হয়েছে। শুধু আসেনি, মনে দুর্বলতা জাগিয়ে তাকে রীতিমত বিচলিতও ক'রে তুলেছে। তাকে সবকিছু ভুলিয়ে, বাস্তব সচেতনতা লোপ পাইয়ে এতোদূর টেনে এনেছে।

চেনা পথঘাটের দিকে তাকাতে তাকাতে সে কেমন যেন সম্মোহিতের মতোই এগিয়ে চলছিল। মনে হচ্ছিল, যেন দীর্ঘকাল পরবাসে থেকে আবার নিজ বাসভূমে ফিরে এসেছে। সব কিছু কত চেনা, কত আপন বলে মনে হচ্ছে।

এই তো পাড়াবাবুদের সেই পুকুর, এর পরেই আছে পোড়ো শিবমন্দির দুটি। সেই মন্দিরদুটিকে বাঁয়ে রেখে যে সংকীর্ণ পথটা ডানদিকে গেছে, সেই রাস্তা ধ'রে খানিকটা এগোলেই তো আমগাছের ছায়ায় ঘেরা সেই মাটির ঘরটি, যেখানে আছে সেই নিরীহ মানুষটি, ক্ষমা সহিষ্ণুতা বিশ্বাস আর সততার জন্যই যে এই পাটোয়ারীযুগে বঞ্চিত অবহেলিত উপেক্ষিত হয়ে রইলো। আর আছে একমাথা চুল এবং বড় বড় দুটি ডাগর চোখ নিয়ে সেই আদুরে দুরন্ত ছেলেটি। যে আধো আধো সুরে কথা বলতো, সে রান্না করতে বা কোনো কাজে বসলে যে পিছন থেকে এসে গলা জড়িয়ে ধ'রে পিঠের ওপর সেঁটে থাকতো, একটু বকলেই অভিমানে ঠোঁট ফুলোতো, আর সেই অভিমান ভাঙাতে তাকে ঘুষে ঘুষে হাতের অনেক রোঁয়াপা সইতে হতো। হাস্তিরে আবার সেই দুরন্ত ছেলেটাকেই একেবারে শান্ত নিরীহ মনে হতো; রোজ ঘুমুতে এসে বাবার গলা জড়িয়ে গল্প শোনার আবদার ধরতো। তাকে রোজ আনোয়ার বক্তিয়ার-দানোর গল্প শোনাতে হতো। গল্প শোনার সময় ভীত সন্ত্রস্তের মতো সে তার বুকের সঙ্গে সেঁটে থাকতো। তারপর গল্প শুনতে শুনতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়তো।

আজ অতীতের সেই মধুর স্মৃতিগুলি বিচ্ছিন্নভাবে ধরা দিয়ে মনে কেমন যেন এক অবিচ্ছিন্ন আবেশ সৃষ্টি করেছিল। সে সেই আবিষ্ট মন নিয়ে পথ চলছিল।

শিবমন্দির পর্যন্ত কেন এগিয়ে গেল। কিন্তু তারপরেই ডানদিকের পথটায় ঢুকতে গিয়ে তার মনটা হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে থেমে পড়লো। থেমে প'ড়ে সে ভাবতে লাগলো, এ কি করছি! সেখানে কেন যাচ্ছি। গিয়ে কি করবো—কি কথা বলবো তাদের। শুধু একটু চোখের দেখা পাওয়ার জন্যই কি এমনি ক'রে ছুটে এলুম।

সেইটুকুই বা কম কি!—রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে করতে সে ভাবলো, একটু দেখতে পেলে, একটু স্পর্শ করতে পারলেও তো মনটা কম শান্ত হবে না। তবে যাই না কেন। গেলে তো কেউ আর মাথাটা কেটে নেবে না।

এই ভেবে সে পায়ে পায়ে আবার এগোতে লাগলো।

কিন্তু কাছে এসে আমবাগানের ছায়ায় ঘেরা সেই ঘরটির চেহারা দেখে সে চম্‌কে উঠলো। ভাবলো, ঘরটার এমন অবস্থা কেন! তবে কি কেউ থাকে না!

হতাশায় তার মন একটু মুষড়ে পড়লো। তবু সে আমবাগানের পথটুকু পেরিয়ে পাঁচিলের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেল। দরজার কবাটে ঠেলা দিতে একটা বিকট শব্দ হ'লো। খোলা দরজা দিয়ে সে দেখলো, সারা উঠোনটা লম্বা ঘাস আর জংলা কাঁটালতায় ছেয়ে আছে। ঘরের চালার একটা অংশ ফাঁকা; একদিকের দেওয়াল খানিকটা ধসে গেছে। সামনের দাওয়ায় কিছু আবর্জনার সঙ্গে কিশোর গায়ের উপযোগী একজোড়া ছেঁড়া কেড্‌স্ প'ড়ে আছে। সেই কেড্‌স্ জোড়ার দিকে সে অপলকে তাকিয়ে রইলো। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার চোখের সামনে যেন গ্রামের একটি দুঃখী কিশোরের ছবি ভেসে উঠলো; অনেকদিনের না-ছাঁটা একমাথা চুল, দারিদ্র্যক্লিষ্ট মুখ, ডাগর দুটি চোখ, জীর্ণ বেশবাস, ছেঁড়া কেড্‌সের ভেতর থেকে পায়ের কড়ে আঙুল দুটি বেরিয়ে পড়েছে।

হঠাৎ বুকটা ব্যথায় টন্ টন্ করে উঠলো। গলার কাছে শক্ত ডেলার মতো কি একটা আটকে রইলো।

কেউ নেই, তবু কী এক আকর্ষণে সে সেই খোলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলো।

তাকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গ্রামের একজন বৃদ্ধ পথ দিয়ে যেতে যেতে থেমে পড়লো। কৌতূহলে কাছে এগিয়ে এসে বললো, মালক্ষী এখানে কি করছেন?

কিছু না।—সে একটা ঢোক গিলে জবাব দিল।

—তা আপনাকে তো চিনলাম না, কোথায় থাকা হয় মা?

—কোলকাতায়।

—তা এখানে?

—এমনি এদিকে বেড়াতে এসেছিলাম।

—অ!—বলে কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটিয়ে বৃদ্ধটি আবার নিজের কাজে চ'লে যাচ্ছিল। কি ভেবে ক'রে চিত্রলেখা পেছন থেকে তাকে ডাক দিল,—এই যে, আপনি একটু শুনুন।

কেন মা?—বলে বৃদ্ধটি ফিরে তাকালো।

চিত্রলেখা তাঁর দিকে এগিয়ে এসে বললো,—আচ্ছা, আপনি তো এই গ্রামেই থাকেন?

হ্যাঁ—কেন?—বৃদ্ধের চোখে জিজ্ঞাসা ফুটে উঠলো।

চিত্রলেখা খানিকক্ষণ ইতস্তত ক'রে কেমন যেন সংশয়াকুল গলায় জিজ্ঞেস করলো,—আচ্ছা এই গ্রামে নিশিকান্ত গুপ্ত নামে এক মাস্টার মশায় থাকতেন—তাঁর কোনো খবর রাখেন?

অ,—আমাদের নিশি বক্সির কথা বলছেন, এই তো তার বাড়ি। সে তো আজ দু'বছর হ'লো মারা গেছে।

—মারা গেছে!

—হ্যাঁ।

একটু দম নিয়ে চিত্রলেখা আবার জিজ্ঞেস করলো,—আচ্ছা ওঁর তো এক ছেলেও ছিল, ছেলেটার খবর কি ?

—ছেলেটার খবর আর কি বলবো, নিশির তো সাহকুলে কেউ ছিল না, তাই বাপ মারা যাওয়ার পর ছেলেটা বড়ো বিপাকে পড়েছিল। কোনোদিন খাওয়া জুটতো, কোনোদিন জুটতো না। শেষপর্যন্ত ছেলেটা নিজেই পেট চালানোর একটা ফিকির খুঁজে নিয়েছে। রেলগাড়িতে চানাচুর বেচী ক'রে বেড়ায়। আগে মাঝে মাঝে গ্রামে আসতো, খোঁজ খবর পেতুম। কিন্তু বছরখানেক থেকে আর আসে না, কোনো খোঁজ খবরও পাই না।

বৃদ্ধ লোকটির মুখে কথাগুলি শুনতে শুনতে চিত্রলেখার সমস্ত বোধশক্তি কেমন যেন লোপ পেয়েছিল। হতাশার আর আঘাতে সে মুষড়ে পড়েছিল। তারপর গ্রাম থেকে স্টেশনের পথটুকু যে কিভাবে এসেছিল তা ওর নিজেরই খেয়াল ছিল না। স্টেশনে এসে ক'লকাতাগামী একটা ট্রেনে উঠে পড়েছিল।

কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো অবস্থা হয়ে গিয়েছিল তার। ট্রেনে অন্তঃসত্ত্বা কোনো স্ত্রীলোক দেখলেই ভাবছিল, এ-ই বুঝি সে!

এই ভেবে জিনিস কেনার অছিলায় তাদের কাছে ডাকছিল। কাছে বসিয়ে জিনিস কিনতে কিনতে সন্দিগ্ধ চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাদের দেখছিল। নানারকম প্রশ্ন করছিল।

এইভাবে কতজনকে যে ডাকলো, কত রকমের কত জিনিস কিনলো তার ঠিক নেই। সারাটা পথ শুধু এমনি করলো। তারপর ট্রেন থেকে নামার আগে সেই স্তূপীকৃত সওদাগুলি জানলা দিয়ে ফেলে দিতে দিতে তার চোখ দুটি জলে ভরে উঠলো।

বিশ্ববিখ্যাত লেখক স্যার আর্থার কোনান ডয়েল হঠাৎ টেলিগ্রাম করে বসলেন বাছা বাছা বারো জন বিশিষ্ট ভদ্রলোককে। হ্যাঁ, তাঁরা সব সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি এবং সভ্যতার জন্য সুবিদিত।

টেলিগ্রামের ভাষায় ছিল গভীর ইঙ্গিত: এক্ষুনি পালিয়ে যান, সব ফাঁস হয়ে গেছে, সব ধরা পড়লো বলে।

শোনা যায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বারো জন ভদ্রলোকই দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

পাথরে বাঁধানো উঁচু-নিচু সংকীর্ণ রাস্তাটার শেষে বাঁদিকে বাঁক নিতেই চৌকো মতন মাঝারি আকারের একটি ঘর দেখা গেলো। সামনেই সদ্যতন বর্ষ সভা লেখা একটি টিনের সাইন বোর্ড লটকানো আছে। পঞ্চায়েতী সভার বৈঠক বসে এখানেই। ওরা গিয়ে ঢুকলো। সভায় তিল ধারণের স্থান নেই এমনি ভিড়। কিন্তু কর্ণাককে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে ঠেলা ঠেলি ক'রে জায়গা ক'রে দিলো। তারপর সবারই চোখ গিয়ে পড়লো পরমরাজ আর ফুলমুর মুখের ওপর। যেন সভা আলো ক'রে দিলো ওরা দুজনে। পর্ণার লম্বা-চওড়া মজবুত পেটানো চেহারা, টকটকে রং, ধারালো নাক, ঝকঝকে উজ্জ্বল চোখ, আর ফুলমুর নাক-চোখ মুখের যেন তুলনাই হয়না। মুখের ডৌল যেমন সুন্দর তেমনি নয়নীয়। আর রং যেন পাকা সোনালী গমের চেয়েও সুন্দর। একটা মৃদু অস্ফুট গুঞ্জন চার দেয়ালের ভেতর ঘুরপাক খেয়ে মিলিয়ে গেলো। অর্থাৎ কিনা, এরা দুজন কারা? এদের তো চিনতে পারছি না। পর্ণা লক্ষ্য করলো, ঘরের ঠিক মাঝখানে আসামী দুজন মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকাই রীতি। একজন জোয়ান, আর একজন প্রায় প্রৌঢ়। মাথা নিচু ক'রে ওরা দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু ওদের চোখে মুখে তেমন কিছু ভীত সচকিত ভাব পরমরাজের চোখে পড়লো না। এতক্ষণ ঘর শুদ্ধ জনতার নজর অপরাধী দুজনের ওপর ছিলো, এখন সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে ফুলমুর মুখের ওপর। শুধু ফুলমু নয়, পর্ণাও প্রচুর অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। ও বুঝলো, কেন ফুলমু তখন সভায় আসতে ইতস্তত করছিলো। পুরুষের ছদ্মবেশ নিয়ে ওকে ঠিক মরদই দেখাচ্ছে বটে—কিন্তু তাই বলে পুরুষালি গড়ন তো আর হয়ে যায়নি। এই ভিড়, এই গুঁতোগুঁতি থেকে ওই চাদরের আড়াল ফুলমুর শরীরকে কতটুকু রক্ষে করবে! চিন্তিত পর্ণা স্থান বদল করলো ফুলমুর সঙ্গে। ফুলমু আগে, আর তার পেছন ছিলো পর্ণা। ওর ঠিক পেছনে ফুলমুকে আড় করিয়ে, সমস্ত লোকের ভিড় আর ধাক্কা থেকে ফুলমুর শরীরটাকে রক্ষে করতে লাগলো। ফুলমু অত ছোটো নয় যে বুঝতে পারবে না। নিজের মনে হেসে নিলো একটু। তারপর ওকে দুই হাতে পেয়ে বসলো। নিজের শরীরটাকে প্রায় মিশিয়ে দিলো পর্ণার পিঠের সঙ্গে। যেন নিরুপায় ও, এমনি ভঙ্গি। পরমরাজ নিজে যে কতখানি নিরুপায় হয়ে পড়লো, ওর মনের আর শরীরের খবর একমাত্র ভগবানই জানতে পারলেন, আর কেউ নয়।

ততোক্ষণে কর্ণাক তার মোড়লের আসনে সমাসীন। এবং আর চারজন সহকারী মাতব্বর ওর গা ঘেঁসে একটা বেঞ্চিতে বসেছে। কর্ণাক তার ঘুসর মাথা নেড়ে কণ্ঠ দিয়ে যেন একটা পিলে চমকানী আওয়াজ বার করলো,—"বলো এবার কী ব্যাপার?"

পর্ণা, ফুলমু, কর্ণাকর এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে পরিচিত নয়—দু'জনেই চমকে উঠ্‌লো। আর এই চমকানীর পরেই, ফুলমু দু' হাত দিয়ে পেছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরলো পর্ণাকে। চকিতে দেহের প্রতিটি কোষে কোষে যেন একটি চকল আলোড়ন উঠলো পর্ণার।

পর্ণার পক্ষপরাজ নিজেকে এমন অসহায় আর কোনোদিন বোধ করে নি। হাতি পাকে পড়লে ব্যাঙেও লাথি মারে—এই কথাটাই ওর মনে হচ্ছিলো তখন। একি সোজা সংকট! ওকে খুব কায়দায় পেয়ে গেছে ফুলমু। ধাক্কা দিয়ে ফুলমুর শরীরটাকে সরিয়েও দিতে পারছে না, এই এক ভিড় লোকের মধ্যে যদি ফুলমুর ছদ্মবেশ হঠাৎ প্রকাশ হয়ে যায় তাহলে আর রক্ষে নেই। দাঁতে দাঁত পিষে অস্পষ্ট রাগি গলা একবার বার করলো,

"ফিলরাজ, ও কী হচ্ছে?"

কিন্তু, পাহাড়ী মেয়ে অত সহজে ঘাবড়ায় না, হাতের বেষ্টনী আরো যেন একটু শক্ত হলো।

একজন বৃদ্ধ গোছের পাহাড়ী, অপরাধী দু'জনের অপরাধ দাখিল করলো। প্রথম যেটা বর্ণনা করলো, প্রায়-প্রৌঢ় শাহ্ সিং সেই অপরাধে অপরাধী।...শাহ সিং এর ঘরের পাশেই থাকে বুড়ি বতীয়া। খুব গরীব। গাই বকরী কিছু নেই ওর। আর সংসারে ওর কেউ নেই। একটা লেড়কা লেড়কিও নেই, আর বয়স তো সেই কোন যুগে যারা গেছে। বতীয়ার সম্বলের মধ্যে ছিলো একটি কুড়াল। ও, জঙ্গল থেকে ডালপালা কেটে এনে, তাই বাজারে বিক্রী ক'রে দুখানা রুটির সংস্থান করতো। শাহ সিং সাতদিন আগে বতীয়ার কাছ থেকে এক ঘণ্টার জন্য কুড়ালটা চেয়ে নিয়েছিলো—কিন্তু আজ পর্যন্ত ফেরৎ দেয় নি। রোজই বলে কাল দেব। ওদিকে বতীয়া উপোস দিয়ে মরছে...।

দ্বিতীয় অপরাধী জোয়ান শের-সিং। ওর অপরাধ অত ছোটো নয়। ওর আমা মারা গেছে আজ বশদিন হলো। ওদের এই অশৌচকালটা অত্যন্ত সংযমী হয়ে থাকতে হয়। অশৌচকালের মেয়াদ হলো বোলোদিন। শের সিং এরমধ্যেই কুলাঙ্গার সন্তান মা'র মৃত্যুর মাত্র দু'দিন পরেই অন্যপাড়ার গিয়ে চন্দ্রকলাকে নিয়ে ঘর বেঁধেছে। চন্দ্রকলা শের সিং-এর খুড়তুতো ভাইয়ের স্ত্রী ছিলো। খুড়তুতো ভাইয়ের নাম ধনা সিং। ধনা সিং-এর সঙ্গে তার স্ত্রীর দাম বাবদ টাকা পয়সার রফা অবশ্য অনেক আগেই হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে স্ত্রীর মূল্যের অর্ধেক টাকা ধনা সিং-এর হাত দিয়ে গুঁড়ির দোকানে চলেও গেছে। এদিক দিয়ে অবশ্য বে-আইনী হয় নি কিছু। ধনা সিং বরং প্রসন্ন মুখেই চন্দ্রকলাকে বার বার তাগাদা দিয়েছে শের সিং কে নিয়ে ঘর বাঁধবার জন্য। কিন্তু, ধনা সিং-এর প্রসন্ন সম্মতি মিললেই তো শুধু চলবে না, সমাজের সম্মতি চাই। আর যতটা দিন যাবে চন্দ্রকলাকে নিয়ে ঘর বাঁধলে ক্ষতিটা কী ছিলো শের সিং-এর। নাকি, শের সিং-এর ভয় ধরেছিলো—ওই ক'দিনেই চন্দ্রকলার যৌবনের ভাটা ধরবে.....।

বৃদ্ধের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিটকিরির হর্রা পড়ে গেলো সভাঘরের মধ্যে। ছি—ছি—ছি!

কর্ণাকর জলদ কণ্ঠস্বর কানে যেতেই সবাই একেবারে চুপ মেরে গেলো: কী রায় দেয়, কেমন শাসিনী হয়—সবাই উৎকর্ণ হয়ে রইলো। যেন মস্ত একটা তামাসা হবে এখুনি ওদের সামনে। এমনি উদ্‌গ্রীব ভাব সকলের চোখে মুখে।

বিলম্বিত লয়ে গলায় পর্ণা চড়িয়ে কর্ণাকর শাহ সিংকে উদ্দেশ্য ক'রে বললো,

"তোমার কিছু বলার আছে সাধ সিং ?"

"আছে মোড়ল"—প্রৌঢ় সাধ সিং এর নির্ভীক কণ্ঠস্বর।

কর্ণাক ভ্রুকুটি ক'রে বললো,

"বলো, তোমার কী বলার আছে—।"

সাধ সিং হাতজোড় ক'রে বললো,

"মোড়ল, আমার কোনো সাক্ষীসাবুদ নেই, তার দরকারও নেই। আমি আগাগোড়া তোমাকে সব জানাচ্ছি তুমি বিবেচনা ক'রে দেখো আমি কোনো অপরাধ করেছি কি না—, কানাই রাজের হালুয়া ভাইএর (ছোড়দার) শাদী হলো। ওদের ভোজ রান্নার সমস্ত লাকড়ি দেবার ভার আমি নিয়েছিলাম। কানাই রাজদের বাড়ির ভোজ মানেই মস্ত বড় ভোজ, আর তার জন্য লাকড়িরও দরকার অনেক।"

কাংড়ার কানাই রাজদের অনেকেই চেনে। মোড়লরা সকলেই ওদের চেনে। বেশ অবস্থাপন্ন পাহাড়ী গৃহস্থ ওরা। ওদের বাড়িতে উৎসবগুলি বেশ বড় রকমেরই হয়—।

সাধ সিং বলে চললো,

"আমি তো ঘোট বই, তাই আমার কুড়োল নেই। বস্তীয়ার কাছ থেকে কুড়োল চেয়ে নিয়ে গেলাম বেলা আন্দাজ ন'টায়, এক ঘণ্টা পরে ফেরৎ দেব—একথা কবুল করি নি,—বলেছিলাম সন্ধে নাগাদ ফেরৎ দেব। দিন ভোর প্রায় একগাড়ি লাকড়ি কাটলাম। আমার এক দোস্তের কাছ থেকে একটা গাড্ডা চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। লাকড়িগুলো অর্ধেক গাড্ডায় বোঝাই করেছি, চোখে আঁধার নেমে এলো, মাথা ঘুরতে লাগলো, মাথা টিপে ধরে জঙ্গলের মধ্যেই অনেকক্ষণ বসে রইলাম। দেখি, গাছের মাথাগুলো থেকে আলো সরে যাচ্ছে। সন্ধ্যা নামলো ব'লে। দরীদা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাকি লাকড়িগুলো গাড্ডায় তুলে—তাড়াতাড়ি জঙ্গল ছেড়ে নেমে এলাম। আধ মাইলটাক কোনোমতে আসার পর, আবার বসে পড়লাম মাথা ঘুরিয়ে। তখনো এক মাইলের ওপর বাকি। সারা দুপুরের তেজী রোদটা মাথার ওপর দিয়ে গেছে, শুধু মাথার যন্ত্রণা নয় গলা শুকিয়ে একেবারে কাঠ। আমি যেখানে বসে পড়েছিলাম তার পাশেই ছিলো একটা পানাপুকুর। একটুখানি সোয়াব খেয়ে নিলেই দ্রুত আসবে শরীরে তা বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু, আমার কাছে পয়সা কড়ি কিছু ছিলো না। অনেক ভাবার পর মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। পানাপুকুরে বস্তীয়ার কুড়োলটা দু'আনায় বাঁধা রেখে কিছুটা সোয়াব খেয়ে নিলাম। তারপর লাকড়ি কানাই রাজদের বাড়িতে জমা করে দিয়ে বাড়ি ফিরলাম। ভেবেছিলাম লাকড়ির দামটা পেলে কুড়োল ছাড়িয়ে নিয়ে বস্তীয়াকে ফেরৎ দিয়ে দেব। কিন্তু এখনো লাকড়ির দাম মেলে নি,—তাই কুড়োলও বাঁধা পড়ে আছে, ছাড়িয়ে আনতে পারি নি। এদিকে, তিন দিন জ্বরে বেহুঁস হয়ে পড়েছিলাম ঘোট বইতে পারি নি, নিজের এক্তেয়ালা রুটির পয়সাই জোটে নি তা কুড়োল ছাড়িয়ে আনবো কী করে ?"

প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ কর্ণাক নয়, অপর চারজন সেক্রেটারীর মধ্যে একজন ছড়ি নাড়লো.

"তাই ব'লে তুমি অন্যের জিনিস বাঁধা দিয়ে সোয়াব খাবে নাকি ?"

"হুজুর, উৎসবে পরবে সোয়াব খাই ফুর্তির জন্য, কিন্তু তখন তো বেমক্ত খাই নি, প্রাণ বাঁচাবার জন্য খেয়েছি—। মরেই যদি যেতাম হুজুর, তাহলে কোনোদিন কী আর বস্তীয়ার হাতে কুড়োল পৌঁছোতো ?" সাধ সিং বললো।

"তা বটে। তা বটে।" মাথা ঝাঁকিয়ে এক সঙ্গে চার মাতব্বর সায় দিলো।

সাহস পেয়ে সাধ সিংএর সাহস বেড়ে গেলো অনেক। বললো,—"হুজুর, গরীবের দুঃখকষ্ট তো বড়লোক বোঝে না, কানাই রাজবের বাড়িতে কত ঘুরঘাম ক'রে খাওয়া দাওয়া হলো, কত গ্যাসের বাতি জ্বললো, নাচ-গান হলো, বাজি পোড়ালো—কত পয়সাই খরচ করলো হুজুর, কিন্তু আমার লাকড়ির চারটে টাকা আজও মিটিয়ে দিলো না হুজুর—"

"আচ্ছা, তুমি এবার থামো—"কর্ণাক্ষ ধমক দিয়ে উঠলো, "কানাইরাজারা যে তোমাকে টাকা দেয় নি তার প্রমাণ কী? হয়তো তুমি মাল্ [মাংস] আর সোরাব খেয়ে সে টাকা উড়িয়ে ব'সে আছো- "

"হুজুর, ধর্মাবতার, যদি আমি মিছে কথা বলে থাকি, তা হলে যেন আমি কোড়ি [কুষ্ঠ রোগী] বনে যাই—"

"শোনো এখন—" কর্ণাক্ষর কণ্ঠস্বর আর এক পর্দা চড়লো,—"যতদিন তুমি বত্তীয়াকে কুড়োল ফেরৎ দিতে না পারছো, ওর দু'বেলার রুটি তুমি যেমন ক'রে পারো যোগাবে, আর এই অপরাধের জন্য তোমার দু'টাকা জরিমানা ধার্য করা হলো—"

"হুজুর, দু'টাকা আমি এখন কোথা থেকে দেবো—" সাধ সিং-এর আর্ত স্বর।

"তা হলে আটক থাকো—, শের সিং সামনে এসে দাঁড়াও,"—বাজি তাড়ানোর মতো সাধ সিংএর কথাটাকে উড়িয়ে শের সিং এর দিকে তাকালো কর্ণাক্ষ।

শের সিং এগিয়ে এলো। শক্ত সোক্ত খাটো মানুষটার মুখের ওপর এবার সকলের কৌতূহলী চোখ গিয়ে পড়লো। এই অবসরে সাধ সিং তার কম্বলের পকেট থেকে দুটো টাকা বার করে নিলো। কর্ণাক্ষর পায়ের কাছে নোট দুটো রেখে সবিনয়ে সাধ সিং বললো,

"হুজুর, লোটা বিক্রী করে এ দুটো টাকা যোগাড় করেছিলাম এই রাখলাম হুজুর আমার জরিমানার টাকা, এবার আজ্ঞা করুন, আমি চলে যাই—"

কর্ণাক্ষ চোখ দুটো কুটিল ক'রে কয়েক মুহূর্ত সাধ সিংএর দিকে চেয়ে রইলো, ওর চোখের দৃষ্টি যেন বলতে লাগলো : তুমি যে বাজু লোক তা আমি আগেই বুঝেছি।

বত্তীয়া ভিড়ের মধ্যেই ছিলো। ছুটে এসে সাধ সিংএর কম্বলের পকেট চেপে ধরলো,

"বেমাস, হারামজাদ্! তবে না তোর কাছে টাকা নেই।"

"আরে বুড়ি! তুই কি ক্ষেপ্‌লি নাকি? সত্যিকারে লাগিয়েছিস কী? আচ্ছা চল্ চল্, এখুনি কুড়োল ছাড়িয়ে তোর হাতে পৌঁছে দিচ্ছি—" সাধ সিং কম্বলের পকেট শুদ্ধ বত্তীয়ার হাত ধরে টানতে টানতে সভাঘর ছেড়ে চলে গেলো।

এত দ্রুত ঘটনাটা ঘটে গেলো, সভাঘরের জনতা প্রথমটা একমুহূর্ত হকচকিয়ে গিয়ে তারপর হো হো করে হেসে উঠলো। কর্ণাক্ষ গৌর চুন্নরে একপলক মাতব্বরদের মুখের দিকে চেয়ে নিলো। ওর চোখের ভাষখানা এই : দেখলে তো কেমন লোক চিনি। শের সিং-এর দিকে চোখ ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গেই, কর্ণাক্ষ চোখের দৃষ্টি কঠিন করে নিয়েছে,

"শের সিং, বলো এবার, তোমার কী বলার আছে?"

শের সিং মুখ গোঁজ ক'রে বললো,

"আমার কিছু বলার নেই—"

পেছনে মৃদু একটা গুঞ্জন উঠলো, সেদিকে কঠিন চোখে কর্ণাক্ষ একবার তাকিয়ে নিয়ে অনড় গলায় বললো,

"শের সিং, তোমার নাম শের, আর তোমার শরীরও তো মজবুত খুব, অথচ তুমি শেয়ালের মতো খুব ছোটো কাজ করেছো। তোমার নাম তো ডোবালেই তুমি, আমাদের পাহাড়ী সমাজকেও ডুবালে। আজ আমরা বিচার ক'রে তোমাকে শাস্তি দেব, জরিমানা করবো,—কিন্তু তাতে সমাজের ক্ষতির বদ্ধ হয় না। রাজার আইন ভঙ্গ করার চেয়েও সামাজিক আইন ভঙ্গ করার অপরাধ আমার কাছে আরো অনেক বেশী। সমাজের রীতি নীতি মন দিয়ে মানতে হবে, মর্যাদার সঙ্গে পালতে হবে—, তোমাদের আজকালকার জোয়ানদের যা হালচাল, মোটাই সহ্য করতে পারছি, তোমাদের জন্য অনবরত তাদি লাগাতে লাগাতে আমাদের সমাজের চেহারা একেবারে অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে, কদাকার, কুৎসিৎ…"

কর্ণাক্ষর কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ পর্দায় পর্দায় চড়লো।

মাতব্বর চারজন ঘাড় নেড়ে বললো,

"ঠিক, ঠিক।"

কর্ণাক্ষ বললো,

"শোনো শের সিং, তুমি আর চন্দ্রকলা দু'জনেই অপরাধী, জরিমানা দিলে এ অপরাধের খণ্ডন হয় না। প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তোমাদের। পরশু ভালো দিন আছে। নবরাত্রির যোগ। তুমি আর চন্দ্রকলা বানগঙ্গায় স্নান করে ভবনের [অতি প্রাচীন তীর্থস্থান] উদ্দেশে রওনা দেবে। সেখানে গিয়ে পুজো দিতে হবে বজ্রেশ্বরী মাতা দেবীকে। পুজোর আগে তোমরা কিছু খাবে না, শরীর শুদ্ধ রাখবে। সেখানে গিয়ে তোমরা ব্রাহ্মণকে [পুরোহিত] বলবে বলি-পুজোর ব্যবস্থা করতে। বকরী, মুরগা, শুয়র আর নারিয়েল বলি দেয়ার পর তোমরা খানাপিনা করবে। তারপর, ফাংড়ায় ফিরে এসে, তারপর দিন ভোজ দেবে আমাদের।"

মিনিট খানেক রাগের অধিকেই মুখ গোঁজ ক'রে রইলো শের সিং, তারপর বললো,

"হুজুর, তাই হবে। কাল আমরা গঙ্গা স্নান করে, উপোস করে ভবনে গিয়ে বলি পুজো দিয়ে আসবো, তারপর পরশু ভোজ দেবো—"

"হুররা……!" যারা ভোজ খাবে না তারাও উল্লাস ক'রে উঠলো।

তার পরই সভাঘরের তীব্র পাতলা হতে লাগলো।

সভাঘর খালি হলো, ফুলমুর মুঠিও শিথিল হলো। এতক্ষণ পর্দা যেন পিঁজরার আটকানো বাঘের মতো ভেতরে ভেতরে ফুঁসছিলো। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে, থাবা দিয়ে ফুলমুর বাঁ-কাঁধটা আঁকড়ে ধরে কঠিন হাতে ঝাঁকিয়ে দিলো, দাঁতে দাঁতে চেপে বললো,

"কী হচ্ছিলো কী এতক্ষণ শুনি ?"

কর্ণাক্ষ সামনে এসে গেছে, বললো,

"কী রে পর্দা, মাথা গরম করছিস কেন ? দিলরাজ করেছে কী ?"

পর্দা রাগি গলায় বললো,

"অনেক কষ্ট এই দিলরাজ, সারাক্ষণ আলাতন করছে আমাকে। চাচা, কোনো লোক চাষার খাবে কিনা খোঁজ রেখো তো ? যদি কেউ আজ যায় তো আমই পাঠিয়ে দেবো ওকে—"

"কেন রে? দিলরাজ চাষার ঘরে বসে বাসনা ভুলেছে বুঝি?"

"হ্যাঁ। ওই রকমই। নানান বায়নাক্কা দিলরাজের—ওকে সঙ্গে আনাই আমার ভুল হয়েছে।"

ফুল্লু করুণ মুখ ক'রে বললো,

"না চাচাজী, আমি এখন চাষা হ'বো না। কাংড়ার দুর্গ দেখবো, শহর দেখবো, বজ্রেশ্বরী মাতার মন্দির দর্শন করবো, বৈজনাথের মন্দির দর্শন করবো, তারপর সর্দারের সঙ্গেই চাষায় ফিরবো।"

পর্দা শুধু কটমটিয়ে তাকালো ফুল্লুর দিকে।

কর্দার অন্তরঙ্গ গলায় বললো,

"সেটাই তো ঠিক বেটা, তবে তুই গোলমাল লাগিয়েছিস কেন?"

ফুল্লু বলে ফেললো,

"আমি তো কিছু গোলমাল করি নি, সরাইয়ের ভিড়ের চাপে দর্দারকে জড়িয়ে ধরেছিলাম শুধু—"

"তাতে কী হয়েছে?" কর্দার অবাক হয়ে তাকালো পরমহারের মুখের দিকে।

পর্দা কী উত্তর দেবে ঠিক করতে না পেরে আগুন চোখে ফুল্লুর দিকে তাকালো। তারপর একটা কিছু জবাব দেওয়া উচিত মনে ক'রে বললো,

"এমন জোরে আমার গলা জড়িয়ে ধরেছিলো দিলরাজ আর একটু হলেই আমার ফাঁস লেগে যেতো—"

কর্দার ফুল্লুর দিকে সন্দেহে একবার চেয়ে নিয়ে কৌতুক গলায় বললো,

"তুই কেমন পাহাড়ী বল রে পর্দা? এত অল্পেই তোর গলায় ফাঁস লাগে? তুই না সংসার রাজের বেটা?" আর একবার ফুল্লুর দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে পর্দা ভেতরে ভেতরে গজরাতে লাগলো। কোন জবাব দিলো না।

কাংড়া দুর্গ অভিমুখে ওরা এবার রওনা দিলো। সনাতন ধর্মসভা থেকে কাংড়া দুর্গ মাইল আড়াই হবে। কাংড়া দুর্গ মানে বিরাট একটি ভগ্নস্তূপ। প্রায় সাড়ে তিন বর্গ মাইল জুড়ে এই ভগ্নস্তূপটি।

কর্দার কিছুক্ষণ লাঠি ঠক ঠকিয়ে চলার পর, দু'জনের মুখের দিকে একে একে তাকিয়ে নিয়ে বললো,

"কী রে বেটা! তোরা সব চুপ মেরে গেলি যে—"

পর্দা যেমন চলছিলো, সেই ভাবেই নীরবে চলতে লাগলো। ফুল্লু ভাবলো, একেবারে মুখ বন্ধ ক'রে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না। একটু ভেবে নিয়ে বললো,

"আচ্ছা চাচাজী তুমি যে তখন বললে,—বজ্রেশ্বরী মাতার মূর্তি খাওয়াস খাঁন নিয়ে চলে গেলো দিল্লীতে, তাহলে তখনে বজ্রেশ্বরীর মন্দিরে এখন কার পূজো হয়? কার কাছে লোক দিয়ে বলি পূজো দেবে?

"তোর খুব মাথা রে দিলরাজ, তোর বুদ্ধিতে আমি খুশি হয়েছি খুব—" অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠলো কর্দার, বললে,

"মন্দিরে এখন কোনো মূর্তি নেই। একটা কালো পাথর আমাদের মা হয়ে মন্দিরে আছেন। মাও নতুন, মন্দিরও নতুন। তখনের পুরানো মন্দির ভূমিকম্পে ভেঙে গেছে। তারপর নির্মাণ হয়েছে—এই নতুন মন্দির। আগের মন্দিরের কারুকার্য আরো অনেক সুন্দর ছিলো,

মন্দিরের চূড়োটা সোনার গিল্টি করা পাতে মোড়ানো ছিলো। অনেকদূর থেকে চূড়োর রোশনাই, সবাই দেখতে পেতো তখন।"

কিছুটা পথ চুপ চাপ চলে ফুলু আবার বললো,

"চাচা, বানগঙ্গাটা কোথায়?"

কর্ণাকর কণ্ঠ দিয়ে অস্পষ্ট একটা ধ্বনি বার হলো, বোঝা গেলো ও খুশি হয়েছে। বললো,

"আমরা এখন যেখানে যাচ্ছি, সেখানে বানগঙ্গা দেখতে পাবিরে ফিলরাজ। কাংড়া দুর্গের পূবদিকে প্রায় তিনশ' ফুট নিচে হলো গিয়ে বান গঙ্গা। আর দুর্গের পশ্চিম দিকে প্রায় ছ'শ ফিট নিচে আর একটা গঙ্গা আছে, তার নাম পাতাল গঙ্গা।—"

একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেললো কর্ণাক,

"যে রাজা, দুর্গ তৈরির জন্য প্রথমে জায়গাটা বেছেছিলেন তাঁর যে কী পরিমাণ যুদ্ধনীতি-জ্ঞান ছিলো, তাই মাঝে মাঝে ভাবি।" কর্ণাক আর একটা নিঃশ্বাস ফেলে নীরব হয়ে গেলো।

কাংড়া দুর্গের কাছ বরাবর না আসা পর্যন্ত কর্ণাক চুপ করেই রইলো। ওরাও চুপ। শুধু কর্ণাকের লাঠির ঠুকুর ঠুকুর আওয়াজ শোনা যেতে লাগলো।

কর্ণাক দুর্গের পুরোনো গাইড। দুর্গ প্রবেশের অনুমতি নিয়ে ওদের সঙ্গে ক'রে ঢুকে পড়লো। উত্তর দিক দিয়ে ঢুকলো ওরা। প্রথম তোরণ পার হলো। পর্ণা লক্ষ্য করলো, তোরণের বিরাট দরজাটা কাঠের। কিন্তু যেমন মজবুত তেমনি পুরু। সেই সুরক্ষিত দরজা পার হয়ে ওরা প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালো। আগেকার ঝিমিয়ে পড়া ভাবটা সম্পূর্ণ কেটে গেছে কর্ণাকের। ও এখন প্রদর্শক, আর কিছু নয়।

"এই যে আমরা তোরণ পার হয়ে এলাম"—বুড়ো কর্ণাকের নীরস গলায় কেমন যেন একটা আবেগময় সুর এসে গেলো, "এটা বানিয়েছিলেন মহারাজা রণজিৎ সিং, তাঁর আদেশে তৈরি হয়েছিল এটা। এই প্রথম তোরণের নাম ফতক। আর তোমাদের সামনেই এই যে দ্বিতীয় তোরণ, এর নাম ধরওয়াজা। চলো, এবার আমরা ধরওয়াজা দিয়ে ভেতরে যাই।"

ধরওয়াজা পার হয়ে আসতেই, ওরা এসে পড়লো একটা পথে। পাথরে বাঁধানো সংকীর্ণ একটা পথ। সে পথ ধরে কিছুটা হাঁটার পর, ওরা পর পর আরো দুটো তোরণ পার হলো।

"এ দুটো তোরণ বানিয়েছিলেন, কাংড়ার প্রথম মোগল দুর্গকর্তা নবাব আলিফ খাঁন। এ দুটোর প্রথম তোরণের নাম—আহানি ধরওয়াজা, আর দ্বিতীয়টির নাম—আমীরী ধরওয়াজা। এবার আমরা আস্তে আস্তে দুর্গ-চূড়োয় উঠতে আরম্ভ করবো।"

কর্ণাকের হাঁফ ধরেছিলো। ওরা খুব আস্তে আস্তে উঠতে শুরু করলো। পাথরে বাঁধানো সোজা পথ দিয়ে ওরা একটু একটু ক'রে উঠছে। প্রায় পাঁচশ' ফুট লম্বা এই পথ। তারপর ওরা ডানদিকে ঘুরতেই একটা তোরণ সামনে পড়লো। সেটার নাম জাহাঙ্গীর ধরওয়াজা। তার পর আরো দুটো ধরওয়াজা,—আন্ধেরী ধরওয়াজা আর ফর্শনী ধরওয়াজা পার হয়ে, ওরা দুর্গের সর্বোচ্চ অংশে, রাজপ্রাসাদের অংশস্তূপে এসে দাঁড়ালো। বড় বড় তিনটে পাথরের চিবি। সে দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো পর্ণা।

কর্ণাক আঙুল বাড়িয়ে চিবিগুলির পরিচয় দিলো, "এই যে সামনেরটা, এটা ছিলো শিষমহল, খুব উঁচু ছিলো এই শিষমহল, ভিন তলা ছিলো। তার পরের অংশস্তূপটা হলো রংমহল। কাটোচ রাজারা এ

বহরে এসে ফূর্তি করতেন, নাচগান শুনতেন, আর তৃতীয় স্তম্ভের নাম ছিলো বারবারী, এখানে কাটোচ পুরনারীরা অবসর যাপন করতেন।"

কর্ণাক বিষাদ করুণ গলায় কাংড়া দুর্গের ইতিহাস শেষ করলো।

ওরা আবার নামতে লাগলো। পর্ণা সন্ধানীচোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে চললো। ঘুরে ফিরে সব দেখা শেষ করে ফটক দিয়ে বেরিয়ে এসেই পথের ওপর ধপ করে বসে পড়লো ফুল্লু,

"চাচাজী, আমি একটু বসি। আমার মাথায় বড্ড ধরম হচ্ছে"—ফুল্লুর কাতর কণ্ঠস্বরে পর্ণা যেন চমক খেলো একটু। এতক্ষণ পরে ওর দিকে তাকালো। দেখলো, ফুল্লুর মুখের রং অস্বাভাবিক লাল। আর চোখ দুটো একটু একটু ক'রে কাঁপছে। পর্ণার বিশ্রী রাগটা এক নিমেষে উবে গেলো। বেশ বাড়ছে গেলো ও। এতখানি পথ হেঁটে কেমন ক'রে ও চলে বাড়ি ফিরবে ফুল্লু!

কর্ণাকও ফুল্লুর পাশে বসে পড়ে বললো, "ফিলরাজের নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে। সেটা একেবারে ছেলেমানুষ, আর ওর শরীর বড় নরম; সবাই তো আর সমান শক্ত হয় না"—পাছে পর্ণা ফিলরাজের ওপর বেশী চ'টে যায়, সেজন্য শেষের কথাটা বললো কর্ণাক।

পরমরাজ কিছু বললো না। ভুরু কুঁচকে ও যেন কি ভাবছে। আকাশের দিকে একবার তাকালো,—না, নির্মেঘ আকাশ, ছিটে ফোঁটা মেঘ আকাশের আশেপাশে কোথাও নেই। ঠিক মাথার ওপর সূর্য। এই আগুনে পুড়ে পুড়ে কেমন ক'রে তিন মাইল পথ হেঁটে যাবে ফুল্লু—আবার সে কথা ভাবলো পরমরাজ।

"চাচা, তোমরা ওই সামনের গাছের নিচে গিয়ে বসো, দেখি আমি কিছু খাবার যোগাড় করতে পারি কিনা"—পরমরাজ লম্বা লম্বা পা ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেলো ওদের সামনে থেকে।

ওরা উঠে সামনের বুড়ো উইলো গাছটার নিচে গিয়ে বসলো। হাল্কা ছায়া পেয়ে ওরা দু'জনেই খুশি হলো একটু। গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসলো ফুল্লু। চোখ বুজলো। কয়েকটা ঘন্‌কা ঘাতাস বাপটা লাগালো ওদের। ঝুরঝুরিয়ে কতগুলি শুকনো পাকানো উইলো পাতা চারপাশে পড়লো। তবু, রোদের কী অসহ্য তাপরে বাবা—ফুল্লু চোখ বুজেই বিড় বিড় করলো। কর্ণাক তার পরম বন্ধু নিয়ে ব্যস্ত। অনেকক্ষণ হবে গেছে, তামাকু খাওয়া ওর হয় নি। পেট ফুলে গেছে। পথে ঘাটে চিল্‌মেই ও তামাকু সেবন সেরে নেয়। পকেট থেকে চিল্‌ম [কল্‌কি], তামাকু ও তার আনুষঙ্গিক উপকরণ বার হলো।

ঘুম্ ঘুম্ শব্দ শুনে ফুল্লু চোখ খুললো। দুর্গের দক্ষিণ দিক ঘেঁসে উঁচু নিচু পথ দিয়ে চলেছে কয়েকটি ছোটো ছোটো পাহাড়ী ঘোড়া আর অশ্বতর। তাদের গলায় ঘুঙুর আর পিঠে মাল বোঝাই। দু'জন পাহাড়ী জোয়ান রয়েছে তাদের সঙ্গে। ঘুঙুরের শব্দ আর ঘুরের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলো পাথরের পথ বেয়ে। ফুল্লু আবার চোখ বুজলো। হঠাৎ এত দুর্বল কেন বোধ করছে ও—ভেবে নিজেই অবাক হলো ফুল্লু। কাল সারারাত ঘুম হয় নি তাই বোধহয়। কিন্তু এমন তো কত রাত জেগে কাটিয়েছে। এই খররোদে সর্দার কোথায় গেলো ওর জন্য খাবার সংগ্রহ করতে কে জানে। সত্যি, ও সঙ্গে এসে খুব বিপদে ফেলেছে সর্দারকে।

সর্দার ওকে খুব ভাল ক'রে বুঝিয়েছিলো,—ওকে পুরোপুরি ফিলরাজ বনে যেতে হবে। কিন্তু, ও, এই কদিনেই বুঝে নিয়েছে তা ও কোনদিনও হতে পারবে না। পর্ণা কাছে এলেই ওর একটা অদম্য ইচ্ছে জাগে, পর্ণাকে জড়িয়ে ধরবার। কাল রাত্রে পর্ণা যখন শুয়ে পড়লো, ওর অনাবৃত বুকের দিকে

তাকিয়ে তাকিয়ে কী ভয়ানক লোভ হচ্ছিল ফুলমুর। পর্দার বুকে মাথা গুঁজে, মুখ গুঁজে শুয়ে থাকার লোভ। কর্দারচাচা সামনে বসা না থাকলে ও ওর লোভ সামলাতে পারতো কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে ফুলমুর। যখন দিলরাজ ও কিছুতেই হতে পারবে না,—যতই কেননা চুল ছাঁটুক আর কোর্তা পায়জামা গায়ে চড়াক—তখন খামাখা ও পর্দারের সঙ্গে থেকে ওর কাজের বাধা হবে কেন? পরমরাজ ওকে বোঝাতে কম বোঝায় নি—নানা ভাবে বুঝিয়েছে,—ওর পথ একেবারে অন্য পথ।

সহজ পথ নয়। সে পথে লেড়কি সাথে নিয়ে চলা যায় না। পরমরাজ ওর অনেক উপকার করেছে,—অনেক। তার প্রতিদান কী ফুলমু এই ভাবে দেবে নাকি! না, ফুলমু অত ছোটো হবে না। কালই ও চাষা ফিরে যাবে। কোনো সঙ্গী-সাথী ওর লাগবে না। আর, ওর যত সঙ্গীই তো রয়েছে ওর বুকের মধ্যে,—পর্দারের ছোরা, আবার লাগে কী। না, ও কালই চলে যাবে চাষায়।

ফুলমু চোখবুজে এইসব ভাবনা ভাবছে, তখন আর একটা কাণ্ড ঘটছে ওর দশ বারো হাত দূরে। দু'জন সাহেব ওর দিকে একবার ক'রে তাকাচ্ছে আর নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করছে। এক জনের কাঁধে ঝোলানো বন্দুক, অন্য জনের এক কাঁধে ক্যামেরা, আর এক কাঁধে একটা নক্‌শা আঁকা থলিতে কয়েকটা ওলিবিদ্ধ রামচকোর পাখি। ওরা পেছনের একটা পাকদণ্ডী দিয়ে তরতরিয়ে উঠে এসেছে এখানে। কিছুদূরে একটা ওকগাছের ডালে কয়েকটা মনাল ব'সে আছে। ওদের লক্ষ্য ছিলো সেখানে। কিন্তু ওপরে উঠেই ওরা গাছে হেলান দেওয়া ফুলমুকে দেখে ফেলেছে। পুরুষের পোষাক পরা থাকলেও ফুলমুকে চিনতে ওদের এক মুহূর্ত বিলম্ব হয় নি। মনালের মাংসের চেয়ে ফুলমুর শরীরের স্বাদ আরো অনেক বেশী লোভনীয়। কাজেই মনালগুলিকে ওরা নিরাপদে উড়ে যেতে দিলো।

নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ পরামর্শ করার পর ওরা ঠিক করলো, ওই বুড়োটার সঙ্গে কিছু কথা বলা যাক। তা হলে ফুলমুর আরো কাছে যাওয়া যাবে, আর ওদের ঠিকানাও মিলবে। এক-পা এগিয়েই, একজন সাহেব আর একজনের কাঁধ ধরে আকর্ষণ ক'রে বললো,

'ওই ছাখো—'

তারপর দু'জনেই দ্রুত পিছিয়ে গিয়ে নিজেদেরকে আড়াল করলো। যাকে দেখে সাহেব দু'জন পিছিয়ে গেলো,—সে আর কেউ নয়, স্বয়ং পরমরাজ। লাল সাহেব আর ডিক্ যখন চাষা শহরে বেড়াতে গিয়েছিলো, তখন সেখানে দিন পাঁচেক ছিলো। ওই পাঁচদিনেই পর্দার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় জেনে এসেছে। পর্দারকে দু' বারের বেশী দেখে নি, কিন্তু তাই যথেষ্ট। পর্দার চেহারা ভোলার নয়। পর্দার শক্তির এত গল্প শুনেছে লালসাহেব আর ডিক্, ওরা তাই সামনা সামনি ধাঁটানোটা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলো না। তবে, ফুলমুকে লালসাহেবের চাই। ওর দাঁতের কামড়ের শোধ তুলবে, ওর ইজ্জত নিয়ে।

পর্দার গম্ভীর মুখে হন হনিয়ে আসছে। তার পেছন পেছন একটা পাহাড়ী ছেলেকে ছোটো একটা ঘোড়া সঙ্গে নিয়ে আসতে দেখা গেলো। পর্দার এক হাতে একটা বড় নতুন কম্বল করা মগ, আর এক হাতে একটা কাগজের মোড়ক। ফুলমুর সামনে দুধ-ভরা কম্বলকরা মগটা নামিয়ে কাগজের মোড়কটা খুললো পর্দার। হাতে তৈরি গোল গোল তিনটে পাউরুটি বার হলো।

'নাও, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, ঘোড়াওয়ালা বেশীক্ষণ দাঁড়াবে না'—পরমরাজ বসে পড়ে বললো।

ফুলমু অবাক হলো,

'ঘোড়া দিয়ে কী হবে?'

'ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি যাবে তুমি, আমার হবে কী !'

ফুলমু খিল্ খিল্ ক'রে ভয় ভুলে হেসে উঠলো। ঠিক এমনি মিষ্টি ঝিন ঝিনে হাসি পর্ণা শুনেছিলো মিত্রর পরবের দিন। কিন্তু, তখন তো ফুলমু, ফুলমু ছিলো। এখন দিলরাজ হয়ে এমন মিষ্টি হাসির লহর তুললে চলে! পর্ণার কপালে আড়াআড়ি কয়েকটা রেখা পড়লো।

ফুলমু হেসে ফেলেই বুঝেছে ওর অন্যায় হয়েছে, ও থতমত খেয়ে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেলো। পর্ণার মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে রুটিগুলো তুলে নিলো হাতে। চাচার হাতে একটা দিলো, পর্ণার দিকে একখানা বাড়িয়ে ধরতেই, এক ঘেঁক লাগালো পর্ণা,

'আমাদের হাত আছে, আমরা নিতে জানি। তুমি খেয়ে সুস্থ হলেই আমরা এখন যাই—'

ফুলমু তাড়াতাড়ি দুধে ডিবিয়ে রুটিতে কামড় বসালো। দুধ রুটি খেয়ে কর্ণাক্তও খুশি। চিন্নু, তামাকু কোর্তার পকেটে পুরতে পুরতে খুশি গলায় বললো,

'রুটি দুধ এনে তুই খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছিস পর্ণা, না হলে তোর ভাইয়াকে আর বাড়ি ফিরিয়ে নিতে হতো না। চাচার তুই একজন সর্দার, তুই সবাইকে কসরৎ শেখাস, আর তোর ভাই দিলরাজের শরীর তুই গড়ে দিতে পারিস্ নি কেন রে? ঠিক যেন মেড়কীর মত নরম শরীর, হাসে তাও যেন মেড়কীর মত—'

পর্ণার বঙ্কিম চোখের সঙ্গে ফুলমুর একবার চোখাচোখি হলো। ওর বুকটা দুরদুর করছে,—সেবকালে কি ও ধরাই প'ড়ে গেলো। ওর নিজের তাতে ভয়ের কিছু নেই, কিন্তু সর্দার সকলের চোখে তা হলে ছোটো হয়ে যাবে যে—

এক লাফে উঠে দাঁড়ালো ফুলমু। তারপর লাফিয়ে লাফিয়ে পথের ওপর নেমে এলো।—না, ঘোড়ায় ও চড়বে না কিছুতেই। ওর মাথায় এখন পাগ্‌ড়ী-টাগ্‌ড়ী কিছু নেই। তা ছাড়া ঘোড়ায় চেপে বাড়ি ফিরলে শুধু কর্ণাক্ত চাচার নয় আরো অনেকেরই সন্দেহ হতে পারে।

ঘোড়াওয়ালাকে বারে বারে ফিরে যেতে বললো ফুলমু। কিন্তু ঘোড়াওয়ালা মানলো না। দাঁড়িয়ে রইলো। সোওয়ারী না গেলেও, ও এতখানি পথ এসে শুধু হাতে ফিরে যাবে নাকি। পাছে পর্ণা ফুলমুকে জোর ক'রে ঘোড়ায় চাপিয়ে নিয়ে যায়, সেজন্য ফুলমু ওর হাতে ধরা নকুন কলাইকরা মগটা ঘোড়াওয়ালার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো,

'ঘোড়াওয়ালা, তুমি এইটে নিয়ে ফিরে যাও। আমাদের কাছে এখন আর পয়সা কড়ি কিছু নেই—।'

ঘোড়াওয়ালা কি বুঝলো কে জানে, আর আপত্তি করলো না। ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেলো।

পর্ণা এসে অবাক হয়ে গেলো: ঘোড়া গেলো কোথায়? ঘোড়া, ঘোড়াওয়ালা কারুরই তো টিকি দেখা যাচ্ছে না।

'কোথায় গেলো ওরা?' ফুলমুর দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলো পর্ণা। কর্ণাক্তও পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

ফুলমু মুখের চেহারা নিরীহ ক'রে বললো,

'ঘোড়াওয়ালা ঘোড়া নিয়ে চলে গেছে। আমি বললাম কিনা যে আমাদের ঘোড়ার দরকার নেই, তাই—'

[ক্রমশঃ]

মন্থরা ॥

সংযুক্তা মিত্র

দুধের প্যান হাতে মানদা ঘরে ঢুকতেই রমলা যেন ঝাঁকিয়ে উঠলো,—এতক্ষণে তোমার সময় হোল মানোদিদি? কচি ছেলে কোলে সেই থেকে বসে আছি হা পিত্যেশ করে। জানো ছেলে আমার রোগা। এত বড় অসুখে ভুগে উঠলো, ডাক্তারে বারবার বলে দিয়েছে, সময়মত দুধ করবেন। ওদিকে তোমার ছোড়দাদা আপিস যাবার সময় আমাকে না দেখলে তুলকালাম কাণ্ড করে। হাতের কাছে প্রত্যেকটি জিনিস গুছিয়ে দেওয়া চাই। তা, আমি কোন্‌দিকে যাই, আর কি করি।—রমলা উত্তেজিত ভাবে বলতে থাকে।—তোমরা কেউ কি একটু সাহায্য করতে পার না আমায়?—রমলার চোখে জল ভরে আসে। গলা ধরে আসে। কোলে তার ছমাসের শিশুপুত্র।

মানদা সাবধানে আঁচল দিয়ে ঘরে সরষ দুধের প্যান মেঝের নামিয়ে রেখে মাদুরের এককোণে বসে পড়ে বলে,—দাও, আমার কোলে দাও। এই দিচ্ছি খাইয়ে। দেরি কি আর সাধে হোল ছোট বৌদি—?

রমলা সাবধানে ছেলেকে মানদার কোলে নামিয়ে দিতে দিতে বলে,—থাক, তোমাকে আর ব্যাখ্যানি দিতে হবে না। বুঝেছি।

—আহা হা, কি বুঝলে গো? আমার ওপর রাগ কর কেন বাছা? আমি দুধ গরম করে সেই তখনই চলে আসছিলুম। তা' এদিকে বাবলু, টুবলু ভাত খেতে বসেছে। বামুন ঠাকরুণ মাছের ঝোল রাঁধে না। মাছ ভাজা দাও।—মানদা কৈফিয়তে তৎপর হয়।

—থাক্, আর কচি ছেলের ঘাড়ে দোষ চাপাতে হবে না। ছোটরা অমনি বামুন ঠাকরুণের কাছেই থাকে। তুমি তো বলতে পারতে যে—

রমলা উঠে পড়তে চায়। মনোক্ষুণ্ণ রমলাকে নিতান্ত অন্তরঙ্গ পরমাত্মীয়ের মত সুখ করে মানদা বলে,—আহা, তাই কি বলছি বাছা? তাদের কে দোষ দিচ্ছে? বলছিল তো বড়বৌ।

রমলা হঠাৎ ঘুরে বসে—বড়দি? কি বলছিলেন?

মানদা কোলের ছেলের মুখে চকু করে এক ঝিনুক দুধ ঢেলে দিয়ে বলে,—না, না, কি আর বলবে? তুমি তো দিদি দিদি করে অস্থির। কতদিন তোমাকে বলেছি, তা গরীবের কথায় কেয়াছিই করো না। তুমিও তো ছেলের মা, না কি? যেদিন হাড়ে হাড়ে বুঝবে সেদিন আর তো পথ পাবে না।—মানদা মুখ ভার করে নিজের কাজে তৎপর হয়।

রমলা বলে,—তুমি মানোদিদি শ্বশুরের আমলের লোক। তোমাদের দাদাবাবুদের কোলে পিঠে করে মানুষ করেছ। ঘরে শাশুড়ি নেই। পুরোনো বুড়ো মানুষ তুমিই তো আছ মাথার ওপর—ভালো মন্দ বুঝতে। তোমাকে কখন অবিশ্বাস করলুম? তা' বড়দি কি বলেছেন? স্বরে তার স্পষ্ট কৌতূহল।

ওদিকে পাশের ঘর থেকে মনোতোষের গলা শোনা যায়—কই, কোথায় গেলে? শার্টের বোতামটা যে ছিঁড়ে গেল।

সেদিকে কান না দিয়ে রমলা আবার বললে,—কই, বললে না বড়দি কি বলেছেন?

মানদা গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললে,—যাও বাছা, মনোদাদা আবার বকাবকি করবে। বড়বৌ কি বলেছে সে কথা শুনে আর কি হবে?

রমলা তবু দাঁড়িয়ে থাকে। বলে,—তোমাই তোমার মানোদিদি। যা বলবে তাড়াতাড়ি বল। ওদিক থেকে মনোতোষের আবার আর একটা হাঁক শোনা যায়।

মানদার এবার দুধ খাওয়ানো শেষ। কাঁধের উপর বাবুয়াকে তুলে ঘরে তার পিঠ চাপড়ে চাপড়ে বলে,—নেহাৎ তুমি জিদ করছ, তাই বলছি। এ কথা আবার পাঁচ কান কোর না বাছা। বলছিল যে, ছোট বৌয়ের আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচি নে। ছেলে যেন আর কারো হয় না? একটু এদিক ওদিক চলে হয় কি? গেরস্ত ঘরে পাঁচজনে বাস। অত ঘড়ির কাঁটা—না মানলে হয় কি? তা আমি বাছা বললুম যে ছোট বৌয়ের বাপ যত ডাক্তার কি না! তা' কি বললে জান? বললে,—থাক্, বাপের গুনোর আর দেখিও না। আসলে পয়সার ঠ্যাকার।

রমলা স্তম্ভিত নিষ্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে বলে, বড়দি এইসব কথা বললেন? কই, তাঁর ব্যবহার তো এমন কখনো দেখি নি? বাবুয়াকে যে বড্ড ভালবাসেন মনে হয়।

—যত মধু সব মুখে। বুঝলে ছোট বৌদিদি? বুড়ো মানুষের কথাটা একটু শুনো—মানদা ব্যস্ত হয়ে হিটৈষিনীর আশ্বাসে বলে,—নাও, যাও যাও। ছোড়দার আবার বেরি হয়ে যাবে।

কথাটা তখনকার মত সেইখানে চাপা পড়ে গেল। কিন্তু খেতে বসে সেদিন একটি কথাও বললে না রমলা। কোনমতে গম্ভীর মুখে হুঁ হাঁ বলে খেয়েই আঁচিয়ে নিয়ে ছেলে কাঁদার ছুতো করে উপরে উঠে গেল। জয়ন্তী অত্যন্ত বিস্মিত বোধ করলেন। মেয়ে চাকে বললেন,—উমা, রমলা কেন এত গম্ভীর হয়ে রইল? কি হয়েছে ওর? রমলা ভালবাসে বলে আজ সকালে নিজে হাতে করে ভাপা দই রাঁধলুম। ভাল করে মুখেও তুললে না।

উমা অন্যমনস্কের মত বলল,—কি জানি বড়দি। আর তো কোন কারণ নেই। ঠাকুরপোর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করেছে হয়ত। এখন মন খারাপ হয়েছে। যাই বল, বড্ড ছেলেমানুষ ও।

মানদা তিন বৌয়ের খাওয়ার তদ্বির করে দুবেলাই। পরলোকগত শ্বশুরের আমলের বহু পুরোনো আশ্রিতা সে এ সংসারে। বৌয়েরা তাকে মান্যগণ্য করে। ঠিক ঝির মত তার স্থান নয় এ বাড়িতে। তিনটি ছেলেকেই সে ছোট থেকে মানুষ করেছে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে। তাদের বিয়ের সময় বৌএর বাপের বাড়ি আশীর্বাদী গহনা হাতে অন্য বিয়েদের সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্ব করতে গেছে। কর্তা তাকেও একটা গরদের শাড়ি দিয়েছেন বৌএর হাত দিয়ে। বামুনের ঘরের মেয়ে সে। শাশুড়ির অন্তে এ সংসারে তার একছত্র আধিপত্য।

তাতের কাঁসিখানা রান্নাঘরে নামিয়ে এসে বৌদের খাওয়ার টেবিলের একধারে দাঁড়িয়ে সে বললে,—তা যা তুমি মত দেয়াপ দিয়েই রাঁধ। ছোট বৌয়ের কি আর এসব মুখে রোচে? নেহাৎ এখনো নতুন তাই মুখের উপর কিছু বলে না। তা আমাকে তো সেদিন বলছিল যে—

উমা আর জয়ন্তী অবাক ব্যগ্রতায় একসঙ্গে বলে উঠলেন,—কি? কি বলছিল রমলা?

যাও বাছা, সেকথা শুনে আর কি হবে? কথায় বলে কথার বড় শত্রুর নেই।—মানদা মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

—না, না বল—দুজনেই সমান উপর।

—হ্যাঁ, আমি বলি আর তোমরা শেষে আমারই দোষ ধরবে যে তোমাদের সোহাগী ছোট বৌয়ের আমি খুঁত কাড়ছি।—মানদা তেমনই নিস্পৃহভাবে বলে।

উমা তাকে বোঝায়—ছেলেমানুষ! দোষ ত্রুটি তো থাকবেই। কদিন আর সংসারে ঢুকেছে বল? তবু কোন কথা শুনলে যদি বুঝি যে তার ভুল হয়েছে, বুঝিয়ে দিলেই হোল। এমনিতে রমলা মেয়েটি বড় ভাল, কি বল বড়দি?

জয়ন্তীও সায় দেয়,—হ্যাঁ, তাই তো।

মানদা ম্লান হেসে বলে,—নেহাৎ শুনবেই, তো শোন। সেদিন মাসকাবারী সওদা আনার পর ছোট বৌদি বললে, এ বাড়িতে এত দালদা খায়। মাগো! আমার গা শিরশির করে। নিতান্ত এখনো নতুন। তাই মুখে তো কিছু বলতে পারি না। দালদায় আবার রান্না। তার আবার বাহাদুরি।

ঠিক এই ধরণের একটা কথা শোনার জন্য জয়ন্তী বা উমা কেউই যেন প্রস্তুত ছিল না। হতবাক্ হয়ে গেল দুজনেই। শেষে অনেকক্ষণ পর বহু কষ্টে নিঃশ্বাস নিয়ে জয়ন্তী বলে উঠলেন, দুগ্গা-দুগ্গা। উমার মুখে কোন কথাই এল না।

এরপর দিন পাঁচ ছয় না জয়ন্তী না রমলা কেউ যেন পরস্পরের দিকে ভালো করে চোখ তুলে তাকাতেই পারল না। জয়ন্তীর দিকে চোখ পড়লেই রমলার বুকে অভিমানের ঢেউ উথাল পাথাল করে। বড়দি এমন করে বললেন? অথচ মুখে কত মিষ্টি কথা বলেন। নিজে নিঃসন্তান কিনা। সন্তানের দরদ কতটুকু বুঝবেন?

আর রমলার দিকে চেয়ে জয়ন্তী একটা উদ্গত সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস বুকে চেপে ধরেন। এ সংসারে এসেছেন কম দিন নয়। সমস্ত সংসারের যত ঝামেলা দায়িত্ব তো তাঁরই মাথার উপর। নিজের কোল ভরে দেন নি ভগবান। কিন্তু সেইজন্য সবটুকু মাতৃত্বের স্নেহ তাঁর ওই দেওর, জা, আর তাদের ছেলেমেয়েদের ঘিরে।

মানদা এ সংসারের আধিপত্যের খাতিরে সকলেরই হিতৈষী। যাকে যা করা দরকার প্রাণ দিয়ে তার বেশী সে করে। যাকে যা বলা উচিত মনে করে তাও শুনিয়ে দেয় মুখের উপর। আবার নিজের বুদ্ধিমত সকলকে পরামর্শ দিয়ে তুষ্ট করতে চায় সে। সামান্য কথাকে রং ফলিয়ে নিজের ছাঁচমত গুছিয়ে নেয় সে। বয়স তার হয়েছে বৈকি। কিন্তু বয়সের ভারে বুদ্ধিতে যে তার ঘুন ধরতে পারে সে কথা সে নিজের কাছেই স্বীকার করে না। অত্যন্ত বিশ্বাসী আচরণে। কাজেই তার কথায়ও কেউ চট্ করে অবিশ্বাসের কথা ভাবতে পারে না।

ছোট বৌএর কাছে গিয়ে গভীর আশ্বাসে সে বলে,—দুদিন চুপ করে থাক, ছোটবৌদি। তারপর সবই তো তোমার হাতেই আসবে।

রান্নাঘরে গুম্ হয়ে বসে থাকা বড়বৌকে সে বলে,—আজকালকার মেয়ে বড়বৌ। কি আর করবে?

এক একসময় জয়ন্তী শিবতোষের কাছে বসে আক্ষেপ করেন,—আমিই সাধ করে ছোট বৌকে নিজে পছন্দ করে ঘরে এনেছি। —নিজহাতে পরিপাটি রান্না করতে ও পরিতৃপ্ত করে অপরকে খাওয়ানোয় তিনি গভীর আনন্দ পান। সেই জায়গায় যে আঘাত দেয় সে ব্যথা তিনি সহজে সহ্য করতে পারেন না।

শিবতোষ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন,—আঃ তুমি না সবার বড়?

আসল রহস্য অনাবিষ্কৃত থাকে। অকারণে মেঘ ঘনিয়ে ওঠে দত্ত পরিবারের নির্মল আকাশের ঈশান কোণে।

মেজ ভাই প্রাণতোষ বদলী চাকরি করেন। কলকাতায় তাঁর বছর দুই কেটে গেছে। এবার তাঁর ট্রান্সফারের অর্ডার এলো উত্তর প্রদেশের আগ্রা অঞ্চলে। ক'দিন পরই তাঁরা চলে যাবেন। সেই উপলক্ষে তিনি একদিন বাড়ির সকলকে নিয়ে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এলেন রঙ্গি থ্রেডিয়ামে। গিন্নির কাছে সবই শুনেছেন। শুধু তাঁকে হেসে বলেছিলেন আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে এত মিল যে লোকে আগে বলত রামলক্ষ্মণের জুটির দল। ও কিছু নয়। এত তুচ্ছ কারণে মান অভিমান দু'দিনেই কেটে যাবে দেখ।

উমা বলেছিল,—না গো, ঠিক তা নয়। তা থাকুগে। আমরা তো দুদিন বাদে চলেই যাব।

ফাংসান দেখে আসার পরদিন দুপুরের পর উমা তার ঘরে বসে বাক্স গোছাচ্ছে। সাহায্য করছে মানদা। স্বামী বড় চাকুরে। যথেষ্ট পাকি, গহনা তার। একটা একটা করে পাট করে করে জর্জেট, শিফন, মুর্শিদাবাদী, ঔরঙ্গাবাদী সে বাক্সে তুলছে। গহনার কেস গুছিয়ে রাখছে মানদা! হঠাৎ একটা নেক্লেস হার হাতে তুলে নিয়ে সে হেসে বলে,—হ্যাঁ, মেজবৌদি, এ হার ছড়ায় কত ওজন হবে? কেমন বেশ হাল্কি হাল্কি।

উমা হেসে বলে,—হ্যাঁ, আজকাল হাল্কা গহনা ফ্যাসান কি না। আমার সব গহনাই প্রায় ওই ধরনের।

—ও! তাই সেদিন শুনলুম। —মানদা হঠাৎ যেন কি বলতে গিয়ে থেমে যায়। উমা বাক্স গোছান থামিয়ে তার দিকে ফিরে বলল—কি শুনলে? কে কি বলছিল গো?

—ছ্যাঃ, একেই বড়র ছোটর মন কষাকষি চলছে। তার উপর আমি আবার ঘুনোর গন্ধ আনি।

উমা আরো কৌতূহলী হয়। বলে,—অমন আবধানা না বলে, না বললেই পারতে।

মানদা মুখ ভার করে বলে ওঠে—আমি বুড়ো হাবড়া মানুষ। আমার সামনে সবাই সব কথা বলে। আমার আবার তোমাদের সবার উপর সমান দরদ গো। আমি সে কথা ফেলতেও পারি না। আমারই তাই যত জ্বালা।

উমা এবার প্রশ্রয়ের ধমক দেয় মানদাকে—জনিতা রাখ মানোদিদি।

মানদা বলে,—তুমি সেদিন কাজে কর্মে কোনদিকে ছিলে, তাই কথাটা শোন নি। বাবুদার মুখে ভাতের তত্ত্ব দেখে বড়বৌ ছোটবৌকে বলেছিল,—তোমার বাপের বাড়ির নজর খুব উঁচু। গহনা জিনিসপত্তর তো মেজবৌয়েরও আছে। কিন্তু কিসে আর কিসে।

উমা কথাটা যেন সহজে বিশ্বাস করতে চায় না। বলে,—বুড়ো মানুষ, কি শুনতে কি শুনেছ। মানদা তত্তোধিক জোর দিয়ে বলে,—চিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। এখন যা শুনি, ঠিকই শুনি। তবে মোহাই তোমার, তুমি এ'কথা পাঁচ কান কোর না। কি হবে ছোট কথায় থেকে মা?

এর দিন দুই পরেই প্রাণতোষ বৌ, ছেলে নিয়ে তার কর্মস্থলে চলে গেল। যাবার সময় মুখ তার করে রইল দু'জনেই। জয়ন্তী বাবলু, টুবলুকে জড়িয়ে ধরে চোখের জল ফেললেন। মানদা তাঁকে ধরে ধরে নিয়ে গেল। বলল,—পরের ছেলেকে অমন আঁকড়ে ধোর না বাছা। মেজ বৌ পছন্দ করে না। বলে—দৃষ্টি লাগবে।

জয়ন্তী ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন। —দিনে দিনে কত শুনব গো।

মানদা পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয়—কি আর করবে বাছা। সবই অদৃষ্ট।

পূর্বপ্রকাশিতের পর

গডউইনের মৃত্যুর পরের দিন থেকেই শান্ত নিরিবিলি পারোয়া সমাজে মৃদু গুঞ্জনের ঢেউ উঠতে শুরু করেছিল। একটা নিস্তরঙ্গ পুকুরে একটা ঢিল পড়লে যেমন ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠতে থাকে ঠিক তেমনি। শহরের একমাথা থেকে অপর মাথা পর্যন্ত যেসীর ভাগ লোকের মুখে মুখে কেবল একটা সংবাদই ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে ছিল, গডউইন কার্নাগো মারা গেছেন, আর তাঁর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছে তাঁর ছেলে এন্টনী কার্নাগো।

এ সমস্ত খবরই এন্টনীর কানে এসে পৌঁচেছিল যথাসময়েই। বাপের মৃত্যুর পর বাড়িটা অসম্ভব ফাঁকা লাগছিল এন্টনীর। ওই অতবড় বাড়িটার মধ্যে তখন একমাত্র তার সময় কাটাবার জায়গা ছিল লাইব্রেরী ঘরটা। বাইরে সে কদাচিৎ যায় হত। বাড়ির মধ্যেকার চত্বরটা পেরিয়ে ওপারের অংশটাতে তার বাবার আশ্রিত সংসারগুলি যেমন সাধারণ নিয়মে চলবার তেমনি ঠিক চলতো। তাদের হাসি-কান্না, তাদের চড়াগলার বাদ-বিসম্বাদ সবই এসে পড়ত এ বাড়িতে। কিন্তু এন্টনীর সে সব কানে যেত না আদপেই। সে এ ক'দিন কেবল ভাবছিল নিজের কথা। তার মধ্যে একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল ইদানীং। বিক্ষোভটা এতো প্রচণ্ড ছিল যে তার বাবার কেবল্‌টা সে যখন লণ্ডনে পায় তখনও সে এতটা বিচলিত হয় নি। এবার সে রীতিমতো বিচলিত হয়েছে তার ভবিষ্যৎ ভেবে। মৃত্যু পথযাত্রী, যন্ত্রণাকাতর তার বাবাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে সে তাঁর সম্পত্তির সমস্ত দায়ভার গ্রহণ করবে বলে কথা দিয়েছে। কথা দেবার সময় সে তার বাবার যন্ত্রণাটাই দেখেছিল। মনে প্রাণে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে সে তখন দেখবার অবসরই পায় নি যে সে কথা দেওয়ায় তাকে কতখানি ত্যাগ করতে হবে।

ছেলেবেলা থেকেই সে বাইরের উন্মুক্ত আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে উঠেছে। পারোয়া সমাজের রীতি-নীতি মেনে, এই চার্চের আর পুরোহিতের বাঁধা বুলি শুনে, এখানকার এই সমাজের একটি মেয়েকে জীবন সঙ্গিনী করে তাকে এখানে চিরকালের মতো সমাধিস্থ হতে হবে একথা সে কিছুতেই ভাবতে পারেনি। রাশি রাশি অর্থ, রাশি রাশি বিলাসের উপকরণ, একপাল সন্তান ও তাদের মুলকায়া এক জননী, এই বিরাট প্রাসাদোপম অট্টালিকা, দু' দু'খানা বিরাট বিরাট মোটর গাড়ি—এসবের তলায় তলিয়ে যাবে লণ্ডনের লায়ন হার্টেড্‌ এন্টনী।

তাকে লায়নহার্টেড্‌ নাম দিয়েছিলেন ডক্টর সিন্‌হা। হঠাৎ ডক্টর-সিন্‌হার কথা মনে পড়েছিল এন্টনীর। রাসেল স্কোয়ারে তাঁর একটা ছোট্ট বইএর দোকান ছিল। বই বেচার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তারত

থেকে আসা প্রত্যেকটি ছেলেকে দিতেন জাতীয়তাবাদে দীক্ষা। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্রদের সবাই প্রায় তখন এসে জুটতো তাঁর দোকানে। বই কেনবার জন্যে সব সময়ে নয়। ডক্টর সিন্‌হার কাছ থেকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নেবার জন্যে। কি আগুনটাই না বুকের ভিতর জ্বলতো ডক্টর সিন্‌হার। বিগত যুগের বিপ্লবী সিন্‌হা বুড়ি বালামের তীরে বাঘা যতীনের পতন হবার পর তাঁরা মন নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন লণ্ডনে। সেখানে বসে সেই মধ্য বয়সী ভদ্রলোক ব্রত নিয়েছিলেন ভারত স্বাধীন করার। তিনি বলতেন —ভারত স্বাধীন না হলে আমাদের খেয়ে সুখ নেই, আমাদের ঘুমিয়ে সুখ নেই। এক কথায় আমাদের বেঁচেই কোন সুখ নেই। আমাদের বাঁচার কোন অর্থই হয় না স্বাধীনতা ছাড়া।

তাঁর কথার মধ্যে এটর্নী আগুয়াজ শুনতে পেত ভুস্‌কুড়ির চিনাখর শিল্পের। চিনাখর শিল্পের কথা মনে হতেই এটর্নীর সারাবুক জুড়ে একটা প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসেছিল। সেই ব্যাঘ্রের মতো দীর্ঘবান, তেজস্বী দেশপ্রেমিকের সারা চেহারাটা তার মানসপটে ভেসে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছিল তাঁর রোগশয্যায় তাঁর শেষের কথাগুলি—স্বাধীন ভারতের মাটিতে আমি মরতে পারলাম না।

চিনাখর শিল্পে এটর্নীর মনে চিরকালের উপাস্য হয়ে আছেন। সেই জন্যেই সে অত সহজে ভিড়ে পড়তে পেরেছিল ডক্টর সিন্‌হার দলে। ১৯৩৯ সনে সে বিলেত যাবার কয়েকমাসের মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। জার্মানীর হিটলার তখন সুতীব্র হিংস্রতায় লণ্ডন শহরকে বোমার ঘায়ে চুরমার করতে উঠে পড়ে লেগে ছিলেন। সারা লণ্ডন শহরের অর্ধেকটা মাঠ হয়ে গিয়েছিল বোমার আঘাতে আর অর্ধেকটা জ্বলছিল দাউ দাউ করে।

যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনের জাতীয়তাবাদী ভারতীয়েরা বদ্ধ নিয়েছিল তাদের স্বাধীনতা দাবিকে দৃঢ় মুষ্টিতে ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের সম্মুখে আর একবার তুলে ধরবার। তার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলেন ডক্টর সিন্‌হা আর ভি. কে. কৃষ্ণ মেনন। তাঁদের দাবিকে সমর্থন করছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রমিক দলের নেতারা—এ্যাটলী, প্যাথিক লরেন্স, সোরেন সেনের দল।

সেই সময়ে প্রয়োজন হয়েছিল অক্লান্ত সংগঠনের, বিরামহীন পরিশ্রমের। এটর্নী নিয়েছিল সেই ভার। তাদের গাওয়ার স্ট্রীটের ছোট বাড়িতে ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেন্টস ব্যুরোর অধিবেশন বসাতো এটর্নী প্রতি সপ্তাহে তিন চার দিন করে। লোক ধরে ধরে নিয়ে আসতো এটর্নী—ভারতীয় অ-ভারতীয় নির্বিশেষে। সেই বাড়িটা তখন তার তীর্থক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বোমার আঘাতে যখন লণ্ডন শহর ছারখার হয়ে যাচ্ছে তখনও এটর্নীর কাজের বিরাম নেই। বোমার ভয়ে লণ্ডন ছেড়ে ভারতীয়রা দলে দলে পালাতে লাগল ক্রান্সে, স্পেনে, পর্তুগালে। এটর্নীর কিন্তু এতটুকু ভয় ছিল না সেদিন। চোখের সামনে সে দেখতে পেত লণ্ডনের ওপর বোমাবর্ষণ হচ্ছে। তাদের বাড়ির মতো বিরাট বিরাট অট্টালিকাগুলি ভয়ংকর শব্দে ভেঙে পড়ছে। শত্রুযন্ত্রের আওয়াজে আকাশ, বাতাস, পৃথিবী থরথর করে কাঁপছে। কিন্তু তবু সে লণ্ডন ছাড়লো না। ছাড়লো না গাওয়ার স্ট্রীটের আস্তানা। সেখানে ছিল ভারত স্বাধীন করার পরিকল্পনার খসড়া। তার সঙ্গে ছিল বিভিন্ন ভারতীয় ছাত্রদের দেশের স্বাধীনতা আনবার জন্যে বিভিন্ন মতামত। সেগুলির মূল্য বুঝতো এটর্নী। তাই তাদের ছেড়ে সে কোথাও যেতে পারতো না।

এর মধ্যে একদিন গাওয়ার স্ট্রীটেই বোমা পড়লো দারুণ ভাবে। যে বাড়িতে স্টুডেন্টস্ ব্যুরোর অধিবেশন বসতো সেই বাড়িটাই গেল বুলেটির সঙ্গে লুটিয়ে। খবর পেয়ে ডক্টর সিন্‌হা গেলেন তাড়াতাড়ি

দেখতে। বাড়ির আসবাবপত্র সরিয়ে তিনি দেখেন ঘরের মেঝেতে একটা ট্রেঞ্চ কাটা। সেই ট্রেঞ্চের মধ্যে এন্টনী একটা স্যুটকেশ আগলে নিয়ে বসে আছে। এদিকে তার জামা কাপড় ভেসে যাচ্ছে রক্তে, এন্টনীর তা গ্রাহ্যও ছিল না।

সেই থেকে ডক্টর সিন্‌হা তাকে ডাকতেন লায়নহার্টেড্‌ বলে।

ভাবতে লাগলো এন্টনী। আজ তাকে তার সমস্ত অতীত জীবনের প্রবৃত্তি বিসর্জন দিয়ে এই অন্ধকার বাড়িটার মধ্যে একটা নিতান্ত গতানুগতিক পশু জীবন যাপন করতে হবে। অথচ সে প্রতিজ্ঞা করেছে তার মুমূর্ষু বাপের কাছে তাঁর সম্পত্তির অছিগিরি করার।

একটা বিশ্রী রকম মানসিক অশান্তিতে ভুগতে লাগলো এন্টনী। বার বার তার মনে পড়তে লাগলো তার লণ্ডনের জীবন। ইদানীং সে তার বাপের কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিল। স্বপ্নেও সে চিন্তা করত না তার বাপের কথা অথবা তাঁর ঐশ্বর্যের। তার স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের পুরস্কার সে পেয়েছিল। ভারত যখন স্বাধীন হল গত বছরে, তখন প্রথম ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হলেন ভি. কে. কৃষ্ণ মেনন। অক্সটইচে ভারতীয় দূতাবাসের দপ্তরখানা বসলো। ভারত সরকার এন্টনীকে ভালো চাকুরীতেই নিযুক্ত করলেন। জানালেন যে সে ইচ্ছে করলে ভারতবর্ষেও চলে আসতে পারে। কিন্তু সেদিন এন্টনী লণ্ডনে থাকাটাই বেশী পছন্দ করেছিল। প্রথম কারণ ছিল তার বাপের জন্যে দেশে না ফেরার ইচ্ছা। দ্বিতীয় কারণ ছিল মেরী বলে। তার ইংরেজ স্টেনোগ্রাফার মেরী তখন সবে তার বুলসানো মনে একটু একটু রং ধরাতে শুরু করেছিল।

এ রকম ভাবে তাকে যে ভারতে কখনো আসতে হবে আর এসে এমনভাবে আটকে পড়তে হবে তা সে ভাবে নি। তাই মনে মনে লাইব্রেরী ঘরের মধ্যে বসে সে চিন্তা করছিল এখন কী করা যায়?

ছিন্না আইয়া [ছোট কথা]—

মারিয়া দাসনের ডাক শুনে এন্টনী চিন্তা থেকে জেগে উঠলো। বিলেত থেকে ফিরে আসার পর মারিয়া দাসন তাকে ছিন্না আইয়া বলে ডাকে। এই মারিয়া দাসন তাকে আগেকার দিনে গ্রাহ্যই করতো না। সে ছিল গডউইনের সেবায়েত চাকর। চেহারায় সে প্রায় গডউইনের কাছাকাছি যেত। গায়ের জোরেও। মারিয়া দাসন হার মানতো একমাত্র তার প্রভুর কাছে। গডউইন ছাড়া এই সারা ভূভূকুড়িতে তাকে গায়ের জোরে কেউ হারাতে পারতো না। এই মারিয়া দাসন ছিল গডউইনের সব রকম বদ খেয়ালের সঙ্গী। কিন্তু এখন মারিয়া দাসন বুড়ো হয়েছে। এই বয়সে এই নিশ্চিন্ত আরামের চাকুরী ছেড়ে যেতে কেইবা চায়? তাই মারিয়া দাসনকে এন্টনীর মন জুগিয়ে চলতে হয়। তা ছাড়া মারিয়া দাসন ভালোভাবেই জানে যখন যে মনিব তখন তার মন জুগিয়ে চলা দরকার। মজার কথা হল এই যে এন্টনী মারিয়া দাসনের এই পরিবর্তনটুকু আসেই ধরে ফেলেছে। মনে মনে সে এটাকে উপভোগও করছে।

ছিন্না আইয়া—, আবার ডাক দিল মারিয়া দাসন।

বইএর পাতা থেকে মুখ তুললো এন্টনী। আসলে বইটা একটা ছলনা। সে চিন্তা করছিল নিজের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা, বইএর আড়ালে মুখ লুকিয়ে।

কি বলছো মারিয়া দাসন?—প্রশ্ন করলো এন্টনী।

মারিয়া দাসন হাঁ করে হাসলো। বীভৎস দেখায় এই হাসিতে মারিয়া দাসনকে। তার মুখের অনেকগুলো দাঁত পড়ে গেছে, উপরের মাড়িটা যেন সামনের দিকে অনেকটা ঠেলে এসেছে। তার উপর

হাসলে মারিয়া দাসনের হাঁএর গর্তটা প্রায় কান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। সেই রকম ভাবে হাসতে হাসতেই মারিয়া দাসন বললো—ছিয়া আইয়া, শুনতে পেলাম স্বামী নাকি তোমার নামে সব বিষয় সম্পত্তি উইল করে দিয়ে গেছেন ?

এষ্টনী হাঁ বা না কিছুই বললো না। শুধু বললো—কোথায় শুনলে ?

আজ্ঞে এই কনকমণি বাড়ারের কাঠের আড়তে গিয়েছিলাম আজ সকালে, সেখানেই শুনলাম। তা আজ্ঞে সারা তুতুকুড়িতে এখবর শুনতে বাকি নেই আইয়া !

তাই নাকি ?

আজ্ঞে হাঁ।—বলেই মারিয়া দাসন এষ্টনীর কাছ ঘেঁসে গলা নামিয়ে ফিস ফিস করে বললে—আর সেই জন্যেই তো আপনি অনেকের বুকের শূল হয়েছেন। কনকমণি বাড়ারের কাঠের আড়তের ম্যানেজারের সঙ্গে আমাদের কার্ডোজা কর্তার কনকপিল্লে [ম্যানেজার] সুব্রামনিয়াম আয়ার কি সব মতলব আঁটছিল আজ সকালে। আমি ঘরে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালুম বাইরের চৌকাঠে—আপনার আর স্বর্গগে যাওয়া স্বামীর নাম শুনে। তা শুনি সুব্রামনিয়াম আবার পরামর্শ দিচ্ছে কাঠের মেনার ধারে কনকমণি আপনার কটা তোনী নৌকো আটক করবে। আর আপনি একে ছেলেমানুষ, তার বেশীর ভাগ বিদেশে বিদেশে ঘুরেছেন, আপনার তো এসব কিছুই জানাশোনা নেই কাজেই—

এষ্টনীর মুখ অপ্রসন্নতায় ভরে গেল। সে যা ভেবেছিল তাই হতে শুরু করেছে। জ্ঞাতিরা, আত্মীয় কুটুম্বরা শত্রুতা করতে শুরু করেছে। নিজের ভাবনার উপর এ এক বিষম ভাবনা জুটলো। মুখে সে শুধালো—কেন আমাদের কনকপিল্লে রাম আয়েঙ্গার তো পুরনো লোক। তিনি তো সব জানেন, কর্তার কোথায় কি দেনা আছে না আছে।

তারপর একটু বিস্মিত হয়ে শুধালো—আচ্ছা রাম আয়েঙ্গারকে এ ক'দিন দেখি না কেন ?

মারিয়া দাসন মাথায় হাত চাপড়ালো—হা কপাল, রাম আয়েঙ্গার এ বাড়ি ছেড়েছে সেকি আজকের কথা ! সে আজ প্রায় বেশ ক'বছর হতে চললো। একদিন কী জানি বাপু কর্তার সঙ্গে কি নিয়ে কথা কাটাকাটি হল। কর্তা ঘরের ভিতর থেকে শক্কের মাছের চাবুক এনে রাম আয়েঙ্গারকে আগা পাশতলা চেঁদালেন। সেই থেকে তিনি এ বাড়ি ছাড়া। তারপর থেকে এ বাড়িতে কনকপিল্লে মহল হয়েছে অনবরত। এই মাত্র কয়েকমাস আগে এক ছোকরা এসেছে। কর্তার কাছে শুনেছি সে নাকি লোক ভালো, বিশ্বাসী। কাজ কর্মও ভালো করে। নিজের থেকেই গরজ করে সিলোনে গেছে কর্তার সম্পত্তির একটা মোটামুটি হিসেব করতে। তা'ছাড়া সেখানের বাজারে কর্তার অনেক টাকা পাওনা পড়ে আছে, সেগুলোর আদায়ের ব্যবস্থা করতে। তা সেখানে গিয়ে সেই যে আটকে পড়েছে যেচারা কর্তার শেষ সময়টা পর্যন্ত সে এখানে থাকতে পারলো না।

এষ্টনী জিজ্ঞাসা করলো—কি নাম নতুন কনকপিল্লের ? কোথাকার লোক ?

নাম হল সেতু রমন আয়ার। বাড়ি বোধ হয় পুদুকোট্টাই স্টেটে। কর্তার উকিল রামচন্দ্র আয়ার ছোকরাকে স্বামীর কাছে পাঠিয়ে ছিলেন। ছোকরা নাকি কলেজের পাশ করা। কিন্তু আমাদের ঘরের যেসব শত্রুর আছে তারা কেউই নতুন কনকপিল্লেকে পছন্দ করে না।

এষ্টনী অবাক হয়ে শুধালো—ঘরের শত্রু আবার কে ?

মারিয়া দাসনের গলায় রাজ্যের বিস্ময় ভেঙে পড়লো—আইয়ো, আইয়ো, আইয়ো, [হায় হায়

হায়] আইয়া তাও জানেন না? যারা স্বর্গে যাওয়া স্বামীর অন্যত্র বিয়ে করেছে বসে বসে তারাই তো ঘরের শত্রু।

বলে মুখ বাড়িয়ে চোখ ঠেরে উঠোনের ওপারে গডউইনের আশ্রিতদের এলাকাটা দেখিয়ে দিল মারিয়া দাসন। তারপর আপনমনেই বলে চললে' ওই যে কটা-চোখি লুইসের পরিবার। সে একদিন কর্তার কাছে আদর কাঁড়াতে এলো, তার ছেলে স্যামুয়েলকে কনকপিল্লের কাজে বাহাল করতে হবে। বুড়ি মাগীর বয়স হয়েছে তবু তার চং কী? এদিকে তো চেহারা হয়েছে একটা পিপের মতো। যখন বয়স ছেল তখন কর্তা কাছে ডেকেছেন। তার বদলে দিয়েছেনও হাত ভরে। যার জন্যে বুড়ির আজও সোনাদানার ঘর ভর্তি। লুইস তো বরাবর বসে বসে কর্তার পয়সায় খেয়েছে, মদ টেনেছে আর এদিক ওদিক ফুর্তি করেছে। তার ছেলে স্যামুয়েল সে বাপেরই পদের। তার চরিত্তিরের দৌলতে লুইসের ঘরের আস-পাশের লোকেরা মেয়ে বৌ নিয়ে ওটস্থ। নেশায় সে তুতু-কুড়ির যে কোন লোককে টেক্কা দিতে পারে, বুড়ি বলে কিনা তাকে করো কনকপিল্লে। আইয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে আমি তো ঠাট্টা তামাসা করতাম। তা একদিন বললুম—কজন না কর্তা স্যামুয়েলকেই কনকপিল্লে। এক বাড়ির লোক তো। তা ছাড়া—কর্তার তখন গলাং ঘাটা সবে দেখা দিয়েছে। বিছানায় শুয়ে ছিলেন। আমার কথায় উঠে বসলেন। বললেন—কনকপিল্লের কাজ বংশ পরম্পরায় বামুনেরাই করে আসছে। এরাই নাকি এ কাজে সবচেয়ে পটু। শুধু হিসেব রাখতেই নয়, গোপন খবর গোপনে রাখতে আর বিশ্বাস রাখতে বামুনদের মতো এমন জাত আর নেই।

তা কথাটা সত্যি আইয়া। তামাম সব পারোয়া ব্যবসাদারদের দেখবেন বামুন কনকপিল্লে। নাড়ারদেরও প্রায় তাই-ই। কিন্তু আসল কথাটা কর্তা সেদিন ভাংলেন না আমার কাছে আমি টের পেলুম তার প্রায় হপ্তা খানেক পরে। কর্তা আগেই সেটা আঁচ করেছিলেন। তাই লুইসের পরিবারকে বলেছিলেন—

মারিয়া দাসন এখানে এসে থমকে গেল। একটু ইতস্তত করলো। ভাবলো এন্টনীর সামনে কথাটা বলা যায় কি না। এন্টনী অবাক হয়ে শুধালো—কি বলেছিলেন?

মারিয়া দাসন একটু অপ্রতিভ ভাবে এন্টনীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—থাকগে আইয়া, ওকথা আপনার শুনে দরকার নেই। আমাকে হপ্তাখানেক পরে ডেকে বললেন—স্যামুয়েলের একটা বিয়ের সম্বন্ধ করেছে বুড়ি। সিলোনের এক ডাক্তারের মেয়ে। তাদের কাছে বলেছে যে স্যামুয়েল এখন গডউইনের কনকপিল্লে। ওই কথা রটিয়ে তাদের কাছ থেকে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা যৌতুক নেবার ব্যবস্থা করেছে। এদিকে মেয়েমানুষ জানে না সেই ডাক্তার কর্তার বিশেষ বন্ধু।

মারিয়া দাসন তার বিশ্রী মুখখানা ছড়িয়ে হা-হা করে হাসতে লাগলো। একটু পরে হাসি থামিয়ে বললে—সে বিয়ে হয় নি হুজুর। তাই লুইসের বৌ কর্তার অসুখের কথা জেনেও আক্রোশে তাঁকে একবার দেখতে পর্যন্ত আসে নি। এদিকে স্যামুয়েল ছোকরাকে হাত করেছে কার্ভোজা কর্তা। সেই-ই এখন এ বাড়ির ভিতরের সব খবর সুলোচনা কার্ভোজাকে জোগায়। আমি সব কথাই জানি। তাই পারত পক্ষে স্যামুয়েলটাকে এধারে ঘেঁসতে দিই না। দেখবেন আইয়া ছোকরা যেন ফট্ করে আপনার সঙ্গে দেখা করতে ঘরে না ঢুকে বসে। অতি ভয়ংকর পাজি শয়তান।

মারিয়া দাসনের মুখে পরনিন্দা শুনতে শুনতে এন্টনী এক সময়ে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো। একটু রূঢ় ভাবেই বললে—ওসব কথা এখন থাক মারিয়া দাসন।

মারিয়া দাসন এষ্টনীর এই মেজাজ পরিবর্তনে একটু থতমত খেয়ে গেল। তারপর হাত কচলাতে কচলাতে বললে—আইয়া আপনার এখানে এখন অনেক শত্রু। কর্তামশায় মারা যাবার আগের দিন আমাকে ডেকে বলেছিলেন—দাসন এষ্টনী এখানকার হালচাল কিছু জানে না। ওকে দেখিস। আমি আইয়া কর্তা মশাইকে কথা দিয়েছি আমার জান থাকতে আপনার অমঙ্গল কেউ করতে পারবে না। তাই তো আপনাকে আজ এত কথা শোনাচ্ছি।

বলতে বলতে মারিয়া দাসনের গলা ধরে এলো। দু'চোখ প্রায় জলে ভরে আসবার উপক্রম হল। এষ্টনী তখনও অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো। তারপর মারিয়া দাসনের মুখের দিকে প্রসন্ন দু'চোখ মেলে বললে—তা মারিয়া দাসন, তোমাকে আমি আঘাত করবার জন্ত কিছু বলি নি। আজ এমনিতেই আমার মেজাজটা অনেক খারাপ ছিল। তাই,—তা যাক্‌গে, তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

বলতে বলতে এষ্টনী মারিয়া দাসনকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। বুড়ো মারিয়া দাসন নরমে নরমে যেতে লাগলো এষ্টনীর আলিঙ্গনের মধ্যে। ছাড়া পেয়ে সে এষ্টনীর পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়ে বললে—অমন কথা বলবেন না কর্তা। আমি আপনাদের শ্রীচরণের দাস।

এষ্টনী বললে—আমি অনেকদিন বাইরে বার হই নি। আমি একটু বাইরে যাবো।

মারিয়া দাসন বললে—তা হলে হুজুর ধর্মরাজনকে বুইক্ গাড়ীটা বার করতে বলি?

এষ্টনী বললে—না, আমি পায়ে হেঁটেই বার হবো।

মারিয়া দাসনের মুখটা বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে সামলে নিয়ে বললে—হুজুর পায়ে হেঁটে যাবেন। এখানে যে আপনার অনেক শত্রু।

এষ্টনী বললে—এখানে আমাকে চেনে ক'টা লোকে যে আমার সঙ্গে সরাসরি শত্রুতা করবে? ওরা আমার নামটাই শুনেছে, আমাকে তো দেখে নি।

মারিয়া দাসন চুপ করে রইলো মুখখানা ভার করে। এষ্টনী তৈরি হয়ে বার হবার মুখেই মারিয়া দাসন তাঁর সঙ্গ নিল।

এষ্টনী বললে—কি হল, তুমি আমার সঙ্গে কোথায় যাচ্ছ?

মারিয়া দাসন অবাক হয়ে বললে—কেন আপনি যেখানে যাবেন। আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গেই যাবো।

তারপর হাত কচলাতে কচলাতে বললে—হুজুর, এখানকার খানদানী ঘরের ছেলেদের পায়ে হেঁটে রাস্তায় যাওয়ার রেওয়াজ নেই। আপনি হুজুর এদেশে এই বংশের সন্তান তায় বিলেত ফেরৎ বিদ্বান লোক, আপনি পায়ে হেঁটে রাস্তায় বার হলে লোকে এ বাড়ির নামে বলবে কি হুজুর। বলবে বুড়োকর্তা কাবার হতে না হতেই এ বাড়ীর মান ইজ্জত সব গেল। তা ছাড়া ওই ধর্মরাজন ব্রাইতার। ও হল নাড়ারের ছেলে। গাড়িতে না চড়লে ও গিয়ে ওদের আতভাইএর কাছে গল্প করবে এই সব কথা। কনকমণি নাড়ার, শিবসম্ভু নাড়ারের কাঠের আড়তে এই সব নিয়ে কেচ্ছা হবে। না হুজুর আপনি এ কাজ করবেন না। এতে স্বর্গগে গিয়েও কর্তা শান্তি পাবেন না।

এষ্টনীর মনটা আবার অপ্রসন্নতায় ছেয়ে গেল। সে তার এই এতদিনের জীবনে যে মিথ্যা অহংকার, মিথ্যা আড়ম্বর থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে, তারাই আবার দু'হাত ধরে এসে জড়াতে চায়। এ বাড়িতে বাস করতে গেলে, তার বাবার সম্পত্তি ভোগ করতে গেলে তাকে তার বাবার সমস্ত বাহ্যিক আড়ম্বর

অনুষ্ঠানকে মেনে চলতে হবে। নইলে এই আবিয়া হাসন থেকে শহরের প্রত্যেকটি প্রাণী তাকে এই বাড়ির উপযুক্ত সন্তান বলে মেনে নেবে না। তার পিছনে তারা হাসাহাসি করবে, হাততালি দেবে। শেষে বংশের কুলাঙ্গার নাম দিয়ে তাকে তারা দূর থেকে আঙুল দেখিয়ে ঘেন্না করবে। কিন্তু সেই গতানুগতিক জীবনকে মেনে নেওয়াও এস্টনীর পক্ষে কি ভয়ানক! দারুণ একটা দ্বিধায় পড়ে গেল এস্টনী। তার আর বাইরে যাওয়া হল না। নিজের সঙ্গে লড়াই করতে করতে এক সময়ে এসে আবার পড়ার ঘরের ইজি চেয়ারটাতে আড় হয়ে শুয়ে পড়লো।

কিছুই তার ভালো লাগছে না। লাগার কথাও নয়। এতদিন ধরে যে এস্টনী তার নিজের জীবনকে স্বাধীন মুক্ত পথে নিয়ে যাবার জন্যে সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছিল, বাপের বিশাল সম্পত্তির লোভ এড়িয়ে যে বার হয়ে গিয়েছিল সবছেড়ে, তার আজ কী দুর্দশা! তার দারুণ সন্দেহ হতে লাগলো। যে বাপকে ফাঁকি দিয়ে সে একদিন এই বাড়ি থেকে উধাও হয়েছিল, সেই বাপই কি তার সঙ্গে মরার সময় এই চরম শত্রুতা করে গেল? হয়তো তাঁর আত্মা স্বর্গে বসে এস্টনীর দশা দেখছে আর কুটিল হাসি হাসছে। হয়তো বলছে—কেমন, আমাকে ফাঁকি দিয়েছ একবার, এখন দেখ কি অবস্থা হয় তোমার!

এস্টনী অস্থির হয়ে ঘরময় পায়চারি করতে শুরু করে দিল। কি করা যায়! পালাবে এখান থেকে? কিন্তু তা তো হবার যো নেই। উকিল রামচন্দ্র আয়ার গত কালই বলে গেছেন, এখন উইলের প্রোবেট নিতে হবে। তার জন্যে তাকে এখন এই ভুতুড়েবাড়িতেই আপাততঃ থাকতে হবে বেশ কিছুদিন। সেই সূত্রে সে লণ্ডন হাই কমিশনারের দপ্তরে চিঠিও লিখেছে ছুটি বাড়াবার দরখাস্ত করে। এখন পালাবার তো কোন পথ নেই। ভবিষ্যতে যা হয় হবে, কিন্তু এই মুহূর্তে এস্টনীর পালাবার কোন উপায় নেই।

এস্টনী আর ভাবতে পারলো না। উঠে পড়ে প্যান্ট-শার্ট ছেড়ে একটা লুঙ্গি (লুঙ্গির মত ধুতি) পরে নিল। কোমরে থাকতে চায় না ধুতিটা। বেল্ট দিয়ে আটকাতে হল তাকে। তারপর একটু এদিক সেদিক দেখে নিয়ে ঘর থেকে বার হয়ে পড়লো। বাড়ির বড় গেটে বন্দুক নিয়ে যে মারোয়া দরোয়ানটা পাহারা দিচ্ছিল, সে তার দিকে কেবল একবার চোখের দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিল। চিনতে পারলো না তার প্রভু বলে। এস্টনী সটান গিয়ে গলিতে পড়লো।

সেই চিরাচরিত ভুতুড়েবাড়ির গলি। সরু ঘিঞ্জি। দু'দিকের বড় বড় বাড়ি ওপরে উঠে আলো আসার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। প্রস্রাবের গন্ধ আর নোংরায় ভরা। আনাচের খোসা থেকে গলির বাসিন্দাদের যাবতীয় ময়লা এখানে ঢালা হয়। দুর্গন্ধে তার বমি আসার উপক্রম হল। সেই সব জঞ্জালের স্তূপের মধ্যে দলে দলে ছোট বড় মাঝারি আকারের শুওর অত্যন্ত তাবে খোঁজা খুঁজি করছে, তোলপাড় করছে, খাচ্ছে, লড়াইপড়ি দিচ্ছে। এস্টনীর সারা দেহ এই দৃশ্যে ঘুলিয়ে উঠলো। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে সে গলিটুকু পার হয়ে গেল। গলিটা এসে পড়েছে বড় রাস্তায়। গ্রেট কটন রোড। দু'পাশে সারি সারি দোকান। রাস্তা দিয়ে ছুটছে ঘোড়ার গাড়ি, মোটর, বাস, সাইকেল রিক্সা। রাস্তার আর ফুটপাথে চলেছে দলে দলে লোক। মানুষের সঙ্গে মিশে আছে গাধার পাল। বর্ষের ষাঁড়ের মতো ছাড়া পাওয়া গাধা এখানে অসংখ্য। আর তাদের চরবার জায়গাই হল বড় রাস্তা। গাধা, আর শুওর। মনে মনে ভাবলো এস্টনী। এ শহরের এমব্লেম্ যদি কেউ আঁকতে চায় তো সেরু একটা গাধা আর একটা শুওর আঁকলেই যথেষ্ট। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে তার বার বার ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়তে লাগলো। মনে

পড়লো তার বাল্যবন্ধু পিটারের কথা। পিটার সেই অল্প বয়সেই কতো ভারিকে ছিল। বলতো—গাধাকে অবজ্ঞা করতে নেই। ওদের ডাক হল বন্ধুদের চিহ্ন—কালুয়ে দস্তবদ্। কোন কাজে তুমি যাচ্ছ হঠাৎ গাধা ডেকে উঠলো। তক্ষুনি বুঝতে হবে তোমার কাজে সাফল্য অনিবার্য। পিটারের অগাধ বিশ্বাস ছিল—এই গাধার ডাকের ওপর। তাই পরীক্ষার দিন বাড়ি থেকে বার হয়ে এসে আগেই সে খোঁজ করতো একটা গাধার। তারপর তার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতো বেশ কয়েক ঘণ্টা—যতক্ষণ না সে ডাকে। গাধার ডাক শুনে তার পর সে পরীক্ষায় বসতে যেত। অবশ্য পাশ সে কোন রকমে করতো। পড়াশুনার খুব একটা ভালো কিছু ছিল না। সে কথা মনে করে এন্টনীর হাসি পেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো পিটারের বন্ধুত্বের কথা। ওই বয়সে এমন মন সে আর দেখে নি।

মনে পড়লো আর এক দিনের ঘটনা। পিটার আর সে দু'জনে একটা জেলে ডিঙি চুরি করে চুপচাপ সরে পড়েছিল হেরার আইল্যাণ্ডে। তখন বয়স কতই বা আর হবে! মাত্র দশ কি এগারো। জেলেটা এসে নালিশ করে দিল স্কুলের হেড মাস্টারের কাছে এন্টনীর নামে; মতলব ছিল গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে কিছু টাকা বাগাবার। হেডমাস্টার তলব করতেই পিটার এগিয়ে গিয়ে বলেছিল—স্যার, এন্টনী এ ব্যাপারে কিছু জানতো না। নৌকোটা আমিই আগে নিয়ে গিয়েছিলাম পরে এন্টনী আমার সঙ্গী হয়। এর ফলে একটা আস্ত বেত সেদিন হেডমাস্টার ভেঙেছিলেন পিটারের পিঠে। পিটার মার খেয়ে চোখে জল, মুখে হাসি নিয়ে ফিরে এসেছিল। এন্টনী জিজ্ঞাসা করেছিল—তুই শুধু শুধু একলা মার খেলি কেন?

পিটার বললে—তুই ও-মার সহ্য করতে পারতিস না। তা ছাড়া জেলেটিকে তুই চিনিস না। ও তালে ছিল তোর বাবার কাছে গিয়ে নৌকো ভেঙেছে বলে কিছু টাকা আদায় করতে। আমি ওর বাড়া ভাতে ছাই দিলাম। ওঃ, হেডমাস্টারটা যা মার মেরেছে!

এন্টনী তার পিঠের জামাটা তুলে দেখলো সেখানে চামড়া কেটে কেটে গিয়ে দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুলে উঠেছে। সে সহ্য করতে পারে নি সে দৃশ্য। পিটারকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিল সেদিন।

পিটারের কথা খুব বেশী মনে পড়েছিল এন্টনীর। তারই চিন্তায় সে বুঁদ হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলো বন্দরের দিকে। গ্রেট কটন রোড সরাসরি চলে গেছে বন্দর অভিমুখে পুব দিকে। সে দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিলো এন্টনী। হঠাৎ সাউথ রাজা স্ট্রীটের কাছে আসতেই একটা গাধা চি-পো চি-পো করে উৎকট ডাক ছাড়তে ছাড়তে সোজা উত্তর থেকে দক্ষিণে সাউথ-রাজা স্ট্রীটের দিকে তীব্র বেগে দৌড়ে গেল। তার ফলে ঘটলো এক বিষম বিপর্যয়। সাউথ রাজা স্ট্রীট মানুষে, ঠেলা, মোটর লরী, ঘোড়ার গাড়িতে ঠাসা ছিল। এটা হল শহরের বড় বাজার। বস্ত্র ব্যবসায়ীর গদি হল এখানে। বিলিতি বীমার কোম্পানীর এজেণ্টদের অফিসও এখানে। তা ছাড়া হার্ডওয়ার মার্চেণ্টদের গদি, পেঁয়াজ—ডাল আর শুঁটকি মাছের ব্যবসায়ীদের গদি। বড় বড় গুদোমেও সারা সাউথ রাজা স্ট্রীটটা ঠাসা। তাই এখানে অনবরত গাড়ি ঘোড়ার ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যে একটা লরী ঘোড় ঘুরছিল। তারই পাশ দিয়ে গাধাটা দৌড়ে চলে গেল। মুহূর্তের মধ্যে গাধার ধাক্কায় একটি লোক গিয়ে ছিটকে পড়লো লরীটার চাকার তলায় এন্টনীর চোখের সামনে। এন্টনী হৈ হৈ করে দু'হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার লোকেরাও। ড্রাইভার ব্রেক কষতে কষতেই লোকটার একটা হাত চাকার নিচে চলে গেল বোধ হয়। এন্টনী পাগলের মতো দৌড়ে গিয়ে তাকে গাড়ির তলা থেকে টেনে বার করে নিয়ে এলো। খুব বেঁচে গেছে লোকটা।

একটা পাগল। লম্বা লম্বা জট বাঁধা চুল দাড়ি গোঁফে মুখটা ভরা। পরনে চিট ময়লা একটি ছেঁড়া কেপ্টি। লোকটা যে গাড়ির তলায় চাপা পড়েছিল তা তাকে দেখলে যেন মনেই হয় না। [হেসে এন্টনীর মুখের দিকে এমন ভ্রূভঙ্গী করে তাকাতে লাগলো যেন এন্টনী একটা মস্ত অপরাধ করেছে তাকে উদ্ধার করে]। সে বিড় বিড় করে কী সব বকছিল। চারদিকে লোক জমা হয়ে গিয়েছিল। আস-পাশের অফিস আর গদীর থেকে সব লোক মুখ বাড়িয়ে দেখছিল। তারা বললে—যাক পাগলা খুব বেঁচে গেলি। পাগল কিন্তু অদ্ভুত। কারুর দিকে না তাকিয়ে-ই তার ডান হাতটা সুন্যে ছুড়তে আরম্ভ করল। —এই নেঃ, কতো চাস? পঞ্চাশ হাজার? এই নে। তুই কতো চাস? এক লাখ? এই নে। তুই? তুই কতো চাস? পাঁচ লাখ? এই নেঃ! —বলে আর সুন্যে ছুড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে হাত ছোড়ে। শেষে সে দৌড়তে লাগলো বন্দরের দিকে। চীৎকার করে বলতে লাগলো—বেরো বেরো বদমায়েস, শয়তানের দল। এত দিলুম তবু চাই? চাওয়া আর ফুরোয় না? বেরো বেরো—দূর হ শয়তানের বাচ্চারা।

এন্টনী ভাবলো অদ্ভুত পাগল তো—

[ক্রমশঃ]

সম্প্রতি বড় বড় উপন্যাস রচনার একটা প্রবণতা লেখকদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য উপন্যাস ১৯৩৮ সনে প্রকাশিত 'গন্ উইথ্ দি উইণ্ড্'—৪,১২,০০০টি শব্দ এতে আছে।

রিচার্ডসনের 'পামেলা' উপন্যাসটিতে আছে ৫,২৪,০০০টি শব্দ। ডিকেন্সের 'ডেভিড কপারফিল্ড' তাঁর আত্মকাহিনী ব্যক্ত করতে ৩,৯০,০০০ শব্দের আশ্রয় নিয়েছে।

১৮৩০ সন থেকে ১৮৮০ সন পর্যন্ত এই অর্ধশতাব্দী ধরে ইংলণ্ডে তিন-ভল্যুমে উপন্যাস রচনার রেওয়াজ ছিল, এদেশে সরকারী বাস যেমন 'ডবল্ ডেকার', ওই সব উপন্যাসকেও বলা হত 'থ্রী ডেকার'। প্রকাশন-ব্যয় অত্যন্ত বেশী হওয়ার ফলে বর্তমানে ইংলণ্ডে তিন ভল্যুমের অতিকায় উপন্যাস এসে দাঁড়িয়েছে ৮০,০০০ থেকে ১০০,০০০ শব্দের মধ্যে এক ভল্যুমের ছিমছাম উপন্যাসে।

ইতিহাসের পাতা থেকে

বিজ্ঞান-সাধকের অপমৃত্যু ॥

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও আবিষ্কারক। তাঁর জীবনের সে অপ্রত্যাশিত আকস্মিক ও চাঞ্চল্যকর পরিণতি ঘটেছিল সে সম্বন্ধেও মাত্র কয়েকদিন কাগজে কাগজে নানা লেখা বেরিয়েছিল, তার পর কেউই আর সে বিষয়ে মাথা ঘামানো প্রয়োজন বোধ করে নি।

১৯১৩ সনের ২৯শে সেপ্টেম্বর ডাঃ রুডল্‌ফ্‌ ডিজেল ইংলিশ চ্যানেল পার হচ্ছিলেন। লণ্ডনে বড় বড় ব্যবসায়ীদের এক সভায় যোগদান এবং সেই সঙ্গে নৌ-বিভাগের কর্তাদের সঙ্গে জরুরি কয়েকটা আলোচনার জন্যে তিনি প্যারিস থেকে লণ্ডনে যাচ্ছিলেন। রাত দশটায় বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে তিনি তাঁর কেবিনে গেলেন। পরদিন সকালে তাঁর দেখা পাওয়া গেল না। অনেক খোঁজা, অনেক তল্লাস—সবই ব্যর্থ হল। তাঁর অন্তর্ধানে কয়েকদিনের জন্য সারা পৃথিবীতে এক আন্তর্জাতিক সোরগোল আর চাঞ্চল্য জেগে উঠলো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন বাধলো তখন গুজব রটলো যে জার্মান গুপ্তচররা তাঁর জাহাজে উঠে গোপনে তাঁকে হত্যা করে গুম করেছে যাতে তিনি তাঁর বিখ্যাত ইঞ্জিন ও সেই সম্বন্ধে আরও সব মূল্যবান গুপ্ত তথ্য ইংরেজদের জানাতে না পারেন।

তাঁর মৃত্যুর সেই অসমাধিত রহস্য ক্রমে লোক ভুলে গেল। ডাঃ ডিজেল বা তাঁর জীবন সম্বন্ধে বর্তমান কালের নাগরিক কতোটুকু খোঁজ রাখেন। অথচ নিঃসংশয়ে তিনি ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক—আবিষ্কারকদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর নাম বিশে শতাব্দীতে সাধারণ বিশেষ্য (common noun) রূপে পরিগণিত হয়েছে। ডিজেল এঞ্জিন পৃথিবীর যন্ত্রশালাকে আজ নানা ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে। ডিজেল লাইনার সপ্ত সমুদ্রে বন্দর করে বেড়াচ্ছে। ডিজেল লরি পৃথিবীর পথঘাট প্রকম্পিত করে ছুটে চলেছে। ডিজেল বিমান দেশ-দেশান্তরের আকাশের বুকে উড়ছে। ডিজেল ট্রাক্টর মাঠে চষছে বিভিন্ন দেশে।

১৮৫৮ সনে এক জার্মান কারিগরের ঘরে ডিজেলের জন্ম। বিশ বছর বয়সে মিউনিক কারিগরি শিক্ষালয়ের সমস্ত পরীক্ষায় তিনি রেকর্ড তদকারী নম্বর সংগ্রহ করেন। সেই বিদ্যায়তনের চমৎকৃত শিক্ষকবৃন্দ ও কর্তৃপক্ষ একযোগে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর কৃতিত্বের কদর করেন।

তারপর শুরু হোল তাঁর সাধনা। দিন যায়, রাত্রি আসে কিন্তু সাধকের খেয়াল নেই। টেবিলের উপর স্তূপাকার কাগজপত্র আর ছোটখাটো যন্ত্রপাতি নিয়ে ডিজেল মাসের পর মাস তাঁর সাধনায় মগ্ন হয়ে রইলেন। ১৮৯০ সনে তিনি একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলেন। তার মধ্যে তাঁর নবাবিষ্কৃত এঞ্জিন সম্বন্ধে সারতথ্য উদ্‌ঘাটিত হল। কিন্তু সেই সুমহৎ সাধনার অর্থ উপলব্ধি করার লোক কোথায়? অনেকে তো তাঁকে পাগল বলে উড়িয়ে দিলে। তাঁর নাম দিলে "কাণ্ডজে—আবিষ্কারক", তাঁর ইঞ্জিনের নাম দিল "কাণ্ডজে ইঞ্জিন"।

টাকা চাই, অনেক টাকা। তা না হোলে তাঁর সাধনা ব্যর্থ হবে। অন্ততঃ তিন চার রকমের মডেল ইঞ্জিন তৈরি করে পরীক্ষা করতে হবে। প্রয়োজন মোটা টাকার। বিখ্যাত ব্যবসায়ী ক্রুপ ডিজেলের

কাগজপত্র দেখে আকৃষ্ট হয়ে টাকা লাগাতে রাজী হলেন। ১৮৯০ সনে প্রথম ডিজেল মোটর ধোঁয়া ছেড়ে রাস্তায় বেরুলো। সেদিন চারিদিকে কি কলরব আর উত্তেজনা। আবেগ আর অস্থিরতায় ডিজেল প্রায় মূর্ছাপন্ন হলেন। পরীক্ষা সফল হোল। সার্থক হোল বৈজ্ঞানিকের সাধনা। চার বছরের মধ্যে সারা বিশ্বে স্বীকৃতি পেল তাঁর অসাধারণ কর্মকৌশল-প্রসূত ডিজেল-মোটর।

তার পর পনেরো বছর ধরে তিনি নিরলস অধ্যবসায়ের সঙ্গে নানা আকারের যন্ত্র তৈরি করলেন। যশ পেলেন প্রচুর। অর্থ প্রচুরতর। স্বল্পপরিসর বাসা থেকে উঠে এলেন নিজের নবনির্মিত প্রাসাদোপম সুরম্য সদনে। মিউনিকের শ্রেষ্ঠ নাগরিক রূপে সম্বর্ধিত হলেন। বিভিন্ন দেশে তাঁর ব্যবসায়ের কেন্দ্র স্থাপিত হোল। টাকা আমদানীর যেন আর বিরাম রইলো না।

১৯১২ সনে ডিজেল মার্কিন মুলুক সফর করলেন। তাঁর তখন জগৎ জোড়া খ্যাতি। কিন্তু তখন কে জানতো কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর জীবনে নেমে আসবে চিরকালের কালো যবনিকা।

দুই বন্ধু সঙ্গে নিয়ে তিনি সেদিন ইংলিশ চ্যানেলের উপর দিয়ে লণ্ডন চলেছেন। এক বন্ধুর নাম জর্জ কারেলস। বেল্ট শহরে অবস্থিত ডিজেল ফ্যাক্টরির কর্তা ক্যারেলস্ ছিলেন ডিজেলের অন্তরঙ্গতম বন্ধু। তিন বন্ধুতে নৈশ ভোজ শেষ করে কিছুক্ষণ ডেকের উপর গল্প করে বেড়ালেন। তারপর যে যাঁর কেবিনের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন।

কয়েক মিনিট পরে ক্যারেলস-এর কেবিনে টোকা দিয়ে ডিজেল ওঁকে ডাক দিলেন। বন্ধু দরজা খুলে দাঁড়াতেই ডিজেল আবেগের সঙ্গে করমর্দন করলেন। স্নেহের সুরে শুভরাত্রি জানালেন। তাঁর সেই আকস্মিক আবেগপূর্ণ আচরণে ক্যারেলস কিছু বিস্মিত হলেন। "কাল সকালে দেখা হবে", বললেন ডিজেল। তারপরে দ্রুত প্রস্থান করলেন।

ব্যস্! সেই তাঁর শেষ কথা। সকালে তাঁর দেখা পাওয়া গেল না। দেখা গেল তাঁর রাতের জামাটি পাট করে রাখা আছে বালিশের উপর। ঘড়িটি ঝুলছে মাথার শিয়রে দেয়ালের গায়ে।

সপ্তাহ খানেক পরে একটি ডাচ্ জাহাজ একটি ভাসমান মৃতদেহ টেনে তুললে। চেনবার উপায় নেই। বিকৃত বিক্ষত দেহ। পাতলুনের পকেট থেকে পাওয়া গেল মানিব্যাগ, চশমার খাপ, আর নাম খোদাই করা—ছোট ছুরি। ডিজেলের দেহ।

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুদ্বেগে নানা গুজব ছুটলো। জার্মান গুপ্ত বিভাগের লোকেরা ওঁকে নাকি সুবিধা পেয়ে জলে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। কোন এক জার্মান কাগজে নাকি লেখা হল দেশদ্রোহী ডিজেল তাঁর উচিত প্রাপ্য পেয়েছেন। এমনি ধরণের নানা কাল্পনিক কাহিনী শোনা যেতে লাগলো।

আসল তথ্য প্রকাশ পেল বহু বছর বাদে তাঁর ছেলে ইউজেন ডিজেলের লেখা "পিতার জীবন চরিত"এর পৃষ্ঠায়। শেষের দিকে বাহ্যিক প্রাচুর্যে আড়ম্বর আর অর্থসৌভাগ্যের আড়ালে ডিজেল অতি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত জীবন যাপন করেছিলেন। শেষের বছরে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাঁধা পড়েছিল। আসন্ন অপমানের আত্মগ্লানিতে দিশেহারা হয়েছিলেন তিনি। আরও টাকার নেশায় ব্যবসাকে আরও সম্প্রসারিত করবার উচ্চাশায় তিনি জুয়ো খেলে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর পর জানা যায় ১৫০০০ পাউণ্ড তাঁর ঋণ। অবশিষ্ট সম্পত্তির মূল্য ২০০০ পাউণ্ডের বেশী নয়। মর্মাহত হয়ে বলেছিলেন তাঁর এক ধনী-ব্যবসায়ী বন্ধু, "ডিজেল যদি ঘুনাক্ষরে তাঁর অভাবের কথা আমাকে একবার জানাতেন"। অনেকেই বলেছিল ওই কথা। ধনী বন্ধুর অভাব ছিল না তাঁর। কিন্তু গর্ব আর আত্মাভিমান গ্রাস করে রেখেছিল তাঁকে শেষ পর্যন্ত। কেমন করে কি কি উপায়ে মানুষ আত্মহত্যা করে সে সম্বন্ধে পিতা-পুত্রে কয়েক সপ্তাহ আগে এক দিন আলোচনা হয়েছিল। সরল ভাবে ছেলে মতপ্রকাশ করে যে সমুদ্রে চলন্ত জাহাজ থেকে ঝাঁপ দিয়ে মরাই সব চেয়ে সহজ।

তখন সে কি জানতো তার বাপের মনে কি সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া চলেছে!

———

আতান্তর ॥

নির্মলেন্দু যাত্রা

ওরে আর ভাবনার সর্বমঙ্গলা শিউরে উঠলেন, প্রায় চীৎকার করে বললেন, তা হলে আমি কি করে বাড়ি ফিরবো দাদাভাই ?

শক্তিব্রত একটু গম্ভীর হয়ে বলল, এখনো রেল চলছে, তবে—

ওই কথা আটকে যাওয়াটাই মারাত্মক, নিশ্চয় ও চেপে যাচ্ছে সব খবর, হয়তো আরো সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে, বাঁধ ভেঙে সব ভেসেই গেছে।

সর্বমঙ্গলা করুণ অনুনয়ে বললেন, কি লিখেছে তাই ঠিক করে বলো না একটিবার, রাণাপাড়া আছে না ডুবেছে, আমার যে বুক কাঁপছে, আমাকে যে এখুনি রওয়ানা দিতে হবে।

—না, মানে বাড়ির কিছু হয় নি, তবে ফিরে থাকতে বাড়ি গিয়ে অবস্থা বুঝে অন্য জায়গায় সরে পড়াই ভালো। যেন বিজ্ঞের মত পরামর্শ দিল শক্তিব্রত, চশমার কাঁচ মুছলো রুমালের খুঁটে।

—আমি আর কোথা যাবো দাদাভাই, আমার যে তিনকুলে কেউ নেই, কপালটায় হাত রেখালেন সর্বমঙ্গলা ; সব এইখেনের নেকা দাদাভাই, বাপের ভিটের এক কোণে পড়ে আছি, যান যদি আসে তো সেটুকুও যাবে, আমার কি হবে দাদাভাই। ভগমান আমার শেষ আশ্রয়টুকু কেড়ে নেবে।

প্রভাসিনী ঘরে ঢুকলেন, বললেন, পিসি, গঙ্গাচানে যাবে বলছিলে না ক'দিন ধরে ?

—ওই যেখ, ভুলে গেছি গো মা, সর্বমঙ্গলা হাত উল্টোলেন, আজ যে ভাদুরে আমাবস্যি, আজ যাবুনি মা ?

উঠে পড়লেন তিনি, প্রভাসিনীর পেছনে যেতে যেতে বললেন, তা হ্যাঁ মা, কাল সংক্রান্তি, ছেলে তোমার কারখানা করেছে—বিশ্বকর্মা পুজো করবে যেন ?

প্রভাসিনী গম্ভীর হয়ে গেলেন, সে ওই জানে পিসি, কারবারের কি যে করছে আমায় কি কিছু বলে ? এখন ওর লোহা কেটে পয়সা হয়েছে।

কথাটা বলে ফেললেন বটে কিন্তু খারাপ শোনালো, বাপের বাড়ির সম্পর্কে পিসি, দু'চার দিনের জন্যে তীর্থ-ধর্ম করতে এসেছে, তার কাছে সংসারের গোপন বিষয় ফাঁস করা ঠিক না। ঘুরিয়ে ফের বললেন প্রভা, কাজ আর কাজ, সারাদিনে তো কথা কইবার ফুরসুত হয় না।

সে কথায় সর্বমঙ্গলা কান দিলেন কিনা বোঝা গেল না। তিনি ফের ফিরে গেছেন শক্তিব্রতর ঘরে, এ বাড়ির বাসিন্দা হয়ে বুঝে নিয়েছেন সকাল আটটার মধ্যেই শক্তি বেরিয়ে যাবে, ফলের চাকা বাকি আটটা থেকেই ঘোরে, যারা দিনমানে ছেলেটাকে আর কাছে পাওয়া যাবে না, তাই ঘোরগোড়ায় ছাড়ি ধরে পড়লেন মঙ্গলা, দাদাভাই, আমার কি হবে ? গঙ্গাচান করে এসে রেলগাড়ি পাবুনি ?

শক্তিব্রত বললে, সে কী দিদিমা, এসেছ যখন বাকি তীর্থগুলো সেরে নাও, ওদিকে কালীঘাট দক্ষিণেশ্বর করলেই কি হবে ? এদিকে হাওড়ার হাত কালী, শঙ্করাচার্যের মঠ, নবনারী—কত কী রয়েছে—বাদুঘর, চিড়িয়াখানা। তুমি তো তোমার নিজের বাড়িতেই আছ।

শেষের খাপছাড়া কথাটায় হৃদয়ের সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে ঘা পড়ল, যা সর্বমঙ্গলা কখনো শোনেন নি অথচ চিরকাল শোনবার প্রত্যাশা করে এসেছেন তাই যেন শুনলেন। দু' চোখ ভরে জল এসে গেল তাঁর, বললেন, দাদাভাই, সেই মন করেই তো এয়েছিনু, আমার মনটা খালি হু হু করে, আমার কি কেউ নেই! কেউ নেই। তোমার মায়ের মুখটা মনে পড়লো দাদাভাই, এই এতটুকু বেলায় দেখেছিনু, আহা, রাজার ঘরে বিয়ে হোল, ভগমান আমায় রাজবাড়ির পথ দেখিয়ে দিলেন—

আঁচলের খুঁটে চোখ মুছলেন মঙ্গলা। দৈনিকটায় ক্ষত চোখ বোলাতে বোলাতে শক্তি একবার সেদিকে চাইলে আর টোস্টে কামড় বসালে। মঙ্গলা ফের বললেন, তা আমি জেনে গেনু আমার এই পিথিমীতে সোয়ামী নেই, বাপ নেই, কেউ নেই, কিন্তুক তোমরা আমার আছো, দাদাভাই, শ্যামোদরে যদি আমায় সব নেয় তবু জানবো আমার সব আছে। তা হ্যাঁ ভাই, আমি তা হলে কখন যাবো?

শক্তিব্রত ভেবে বললে, দুপুরের ট্রেনে গেলে অবশ্য হয় তবে কিনা রাত হতে পারে।

—তা হলে কাল সন্ধ্যেলেই যাবো ভাই, চিন্তিত ভাবে সর্বমঙ্গলা বললেন, বয়েস হয়েচে, রাত্তিরে আবার বিপদে পড়বো, তোমার বিশ্বকর্মা ঠাকুর দেখার বড্ড ইচ্ছে ছিল ভাই আর ওই মা দুগ্গার পুজো, আবার বাঁচি তো হবে, আহা, বেঁচে থাক, রাজরাজেশ্বর হও, তা ভাই, আবার জিজ্ঞেস করচি, বাপের ভিটেটুকু বাঁচবে না? নদীর জল খুব বেড়েচে? আমার সব্বস্ব গেচে, বেটুকু আছে তাও যাবে, এই তো কপালের লেখা, বলে না,—ওরে নয় শ্যামোদর, তোকে নিয়ে আতান্তর, তুই আমার বিপদ, তুই আমার সব্বোনাশ।

ঘরে ঢুকলেন প্রভাসিনী, তাড়া লাগালেন, রাত্রি হৌকে তোমার সঙ্গে দিচ্ছি, ফিরো তাড়াতাড়ি।

—বাঁচালে মা, আমি তো ভাবছিনু এ হাওড়া শহরে বুঝি বা একাই বেরুতে হয়, সর্বমঙ্গলা হাত বাড়ালেন, আমার কমণ্ডলুটা এগিয়ে দে মা। একটু থেমে আবার কি ভেবে বললেন, একটা তুলসী গাছ করিস নি মা? শহরে থাকিস তো কি হয়েছে, মানুষ তো আর পালটে যাস নি।

একপ্রস্থ খান কাপড়, গঙ্গাজলের কলসী, গঙ্গামাটির ঘটি আর চারটি চাল নিয়ে বেশ উচ্চকণ্ঠে হরিনাম জপতে জপতে সর্বমঙ্গলা বেরিয়ে যেতেই শক্তিব্রত প্রভাসিনীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। অনেক আগেই হাওয়া টের পেয়েছিলেন তিনি, ছেলের দিকে একটু চেয়ে বললেন, তাতের যেরি হবে, বিকেলের জলখাবারটা—মানে রাত্রি আজ দু'ঘণ্টার আগে ফিরবে না, নতুন বি আবার রাঁধতে জানে না, আমাকেই সব ঠেলতে হবে—বলি কি কষ!

বেরোবার মুখে বড় ছেলে জানিয়ে গেল, এ বেলা আর সে খেতে আসছে না। প্রভাসিনী গজ গজ করতে লাগলেন, তা আমি কি করবো, যত রাগ আমার ওপর।

• • •

আপনমনে পথ হাঁটছিলেন সর্বমঙ্গলা। অনেক চিন্তা একসঙ্গে তাঁর মনে আসছিল, বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই স্বামীকে বোড়া সাপে কাটল, দু'দিন ধরে রোজা এসে ঝাড় ফুঁক করলে, তারপর তারা এলে দিতে শ্বশুর গঙ্গাপারের বড় শহরে বড় কলেজে নিয়ে গেল, ডাক্তার নাকি বলেছিল, বড্ড যেরি হয়ে গেছে, কলেজে ভর্তি হওয়ার তিনদিন পরেই সব শেষ। কত কান্নাকাটি করলেন তিনি, না, শেষ চোখের দেখাটাই দেখতে পেলেন না, পেটি তখন শক্ত এসেছে, গঙ্গা পেরোতে নেই, আর সব সাধ আহ্লাদ ফুরিয়ে যেতে বাপ শহরে নিয়ে এল কিনা শ্রাদ্ধশান্তি করিয়ে ঘাট পরাতে।

শোকে-দুঃখে শরীর একেবারে ভেঙে পড়ল, ভগবান তাঁর সব নেবে বলে বোধ হয় ঠিক করেছিল, তাই না একটি যুদ্ধসন্তান পাঠিয়ে দিলে, দিন কতক ঘরে মানুষে টানাটানি চলল, তা যম তাঁকে ফেলে চলে গেল, ছেলের শোকে শঙ্কর স্থির রাখলেন, বাপ নিয়ে এসে কাছে রাখলে, একটা প্রাণীর চলে যাবার মতো অবিজয়া দিয়ে দিলে, তার পর সেও চোখ বুজল।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সর্বমঙ্গলা।

শঙ্করের বিয়ে-আশায় সব ভাসুরপো'রা ঠকিয়ে নিল, পাছে তিনি ভাগ বসান তাই তাঁকে দেখলে সব মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। আর বাপ জমি দিয়েছে, তাই ভাই-ভাইপোদের কি রাগ, খালি দিন শুনছে কবে তিনি মরবেন।

না, কেউ নেই তাঁর, কেউ নেই,—সব মরে গেল, সব বেঁচে থেকেও পর হয়ে গেল।

পাশ থেকে রাত্রি বৌ হাঁকার দিলে, একটু দেখে চলো গো মা, বড় রাস্তায় এসে পড়েছি, বড্ড গাড়িঘোড়া।

মঙ্গলা বললেন, আমার কি আর মরণ হবে মা !

বাসে উঠলেন, কি ভিড়! সব ঝুলতে ঝুলতে কাজে যাচ্ছে। একটু সরে বসে সামনের লোকটিকে বললেন, বোস না বাবা, তুমি তো আমার ছেলের বয়সী।

কথাটা আপনি বেরিয়ে যেতেই বুকটা ধড়াস করে উঠলো। ছেলেকে তিনি চোখেও দেখেন নি। তখন তো ঘোর অচৈতন্য অবস্থা।

যত দিন যাচ্ছে কি যেন হচ্ছে তাঁর। একটা ক্ষুধা, মানুষকে কাছে পাবার একটা প্রবল পিপাসা, সবাইকে আপন করে নেবার একটা দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি তাঁকে পেয়ে বসেছে। কি যেন এক বাসনা বুক ঠেলে উঠছে। একটা তরলতা গাঢ় লটিয়ে উঠেছে, আহা, ও থাক। কোথাকার একটা বেড়ালছানা ছুটেছে, আহা, ওটাও থাকুক। কার ছেলে নেটিয়ে-পেটিয়ে মানুষ হচ্ছে, আহা-হা ওকে দিয়ে যারে, বুকের মাঝখানটায় ধরে রাখি—এই খালি মনটা বলে।

হাওড়া স্টেশনের বাসস্ট্যাণ্ডে গাড়ি থামলো। কাগজওলা দিতে দিতে কাগজ নিয়ে ছুটোছুটি করছে। সেদিকে চোখ পড়ল সর্বমঙ্গলার। ওই ছেলেটি তা হলে সব খবর জেনে রেখেছে, ওর কাছেই সব জানতে পারা যাবে। কিন্তু তাই কি! ছেলেটার কপালে ঘামের ফোঁটা। এতো কাগজ নিয়ে কী ছুটোছুটিই না করছে। ও তা হলে কিছু জানে না, জানতে পায় না বেচারা।

একটা লোক কাগজ কিনছে। সর্বমঙ্গলা তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি লিখেছে বাছা, নদীর জল আরো বাড়বে ?

প্যান্টলুন-পরা লোকটি মোটা শেল ফ্রেমের চশমার ফাঁক দিয়ে একবার দেখার ভান করলো তাঁর দিকে, দুটি চোখের আকুল জিজ্ঞাসা যেন তাঁকে সামান্য স্পর্শ করলো, কাগজের ওপর চোখ রাখলো সে, বললো, হ্যাঁ, তাই বটে।

—দুর্গা দুর্গা, আতঙ্কে কাঁপতে লাগলেন সর্বমঙ্গলা, ও রাত্রি বৌ, আমার ঘর, আমার হাত পা সব কেমন হয়ে আসছে, সে যে আমার বাপ চোদ্দপুরুষের ভিটে, আমি আজই বাড়ি যাবো।

কোনক্রমে রাস্তাটুকু পার হয়েছেন। যা বড় বড় গাড়ি, দত্যির মত চাপা দিতে আসে। হাঁফ ধরেছে তাঁর। কলকাতা যাওয়ার বাসগুলোর পাশে চওড়া জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে শ্বাস টানতে

লাগলেন তিনি। ঘোড়ে আমার সঙ্গে একটা কি রকম ভয় মিশে বুকের এইখানটায় উথাল পাথাল কষ্ট দিচ্ছে। নদীর জল বাড়ছে হু-হু করে। নদীর এ-বেলা এক রকম রূপ, ও-বেলা এক রকম। বাঁধের গায়ে ধাক্কা মারছে। সরু সরু ফাটল দেখা দিয়েছে। ঝির্ ঝির্ করে জল পড়ছে। যদি একবার কোন ক্রমে বাঁধ ভাঙে তাদের নিচু জমি জায়গা ঘর বাড়ি সব ভেসে ভেসে চলে যাবে।

একটা ভয়ানক আতঙ্কের ছবি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন সর্বমঙ্গলা। তাঁর মনের পটে সব একে একে ভেসে উঠছে। ওতো নদী নয়, ওযে নয়, ওর পাগলামিতে প্রলয় ঘটে।

—কি হবে আমার! অস্ফুট স্বরে বললেন তিনি। মনে মনে ভাবলেন, আমার সব গেছে, এরা তো আছে।

অনেকখানি বল পেলেন নিজের মধ্যে। এখনো সময় আছে, এখনো সুযোগ বয়ে যায় নি। বান আসবার আগেই যথাসর্বস্ব নিয়ে তিনি চলে আসবেন। ভেতালার ওই ঠাকুরঘরের ছোট কুঠরিটা হলেই তাঁর চলে যাবে। বন্যার জল নেমে গেলে ওই শক্তিস্তবকেই ধরবেন, দাও ভাই, আমার— ঘরটা বেঁধে দাও।

সিঁড়ি দিয়ে ঘাটে নামবার মুখেই চোখ পড়ে গেল—দুটো তিখিরী ছেলে আর গোটা তিনেক ঘিয়ে-ভাজা কুকুর ঘুর ঘুর করছে। আবার দাঁড়িয়ে পড়লেন সর্বমঙ্গলা, সেদিকে তাকালেন, সামনের দোকান থেকে লোকগুলো পুরি তরকারী আর গরম জিলিপি খেয়ে খেয়ে শালপাতাগুলো ফেলে দিচ্ছে আর ছেলে দুটো তাই কুড়িয়ে নিয়ে চাটছে সুধার্ত আগ্রহে, কুকুরগুলো একবার করে তাকাচ্ছে আর কেউ কেউ করছে।

রাঙ্গি বৌ সকলের ছোঁয়া বাঁচিয়ে সরে দাঁড়াল, ঘৃণায় বিরক্তিতে তার মুখটা বেঁকে উঠেছে, কী নোংরা, কী নোংরা, এখানে আবার মানুষ দাঁড়ায়!

—এখানে দাঁড়ালেই সব ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যাবে না। সে বলে উঠলো, লোক সব চান করে ফিরে পড়ছে. তোমার আবার পুজো আছে না।

সেদিকে কান নেই মঙ্গলার। পুরি কিনে ছেলে দুটিকে দিলেন, গম্ভীর মেয়ে বললেন, নে নে, খেয়ে নে। তারা প্রথমটায় যেন বিশ্বাস করতে পারে নি। তারপর মাথা নিচু করে খেতে শুরু করে দিল। কতক্ষণ তাদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তিনি।

কুকুরগুলো কাছে ছুটে এসেছে। চাপাটি কিনে টুকরো টুকরো করলেন দু'হাতে। ছুঁড়ে ছড়িয়ে দিলেন তাদের দিকে। সেই এক দৃষ্টি নিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

এবার শুধু বিরক্তি নয়, কাণ্ডকারখানা দেখে মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে রাঙ্গি বৌ। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললো, সব ছোঁয়াছুঁয়ি করে এলে তো মা!

—গঙ্গায় বান আসবে যে?

—বেরী আছে।

—না না বেরী নেই, সব ময়লা ভাসিয়ে নে যাবে মা গঙ্গে। কোন দিক ভ্রূক্ষেপ না করে বললেন সর্বমঙ্গলা, চল্ মা, এবের চল্, বানের জলে ডুব গালি।

হাসছেন তিনি, অতি প্রশান্ত উদার হাসি, অ বৌ, এ কোন্‌দিক দিয়ে নামতে হবে গো? এ যে দু'দিকেই সিঁড়ি দেখছি।

একটা পুলিশ টুলে বসে গোঁফে তা দিচ্ছিল, তার কাছ থেকেই হাঁকটা এল, ইধারমে জেনানা।

মঙ্গলা নিচে নামতে লাগলেন সাবধানে, রেলিং ধরে ধরে, জলে জলময় সিঁড়ি, এ যে পাতালে যাচ্ছি বৌ।

বৌ হাসলো, হ্যাঁ মা, সাবধানে নামো, মাও, ওইখানটায় কাপড় ছেড়ে গঙ্গায় চলে যাও, আমি কাপড় আগলে দাঁড়াই, তুমি এলে আমি আবার যাবো।

—মা, মাগো, অনেক ভাগ্যে তোমার দর্শন পেনু মা, বলতে বলতে মঙ্গলা পা টিপে টিপে এগোলেন, আস্তে আস্তে জলস্পর্শ করলেন, মাথায় জল ছিটালেন তিনবার। একপা একপা করে নামতে লাগলেন, মনটা আজ অকারণে প্রসন্ন হয়ে উঠেছে, এমন অহেতুক আনন্দবোধ তিনি কদাচিৎ পেয়েছেন, সবাই যেন তাঁর আপনার, অতি আপনজন।

চোখ তুলে তাকালেন তিনি। মাথনের মত নরম পলি। তারই ওপর একটা ঢেলে গড়াগুটি দিচ্ছে ঘুরে। ঠিক অমনি ভাবে সব আপনার করে পেতে ইচ্ছে করছে। একটুখানি মাটি উঠলো তাঁর কাঁপা কাঁপা আঙুলে। কপালের বলিরেখায় অঙ্কিত হল একটি কৌটার ভাঙাচোরা বৃত্ত।

ঘাটে লোকজনের বেশী ভিড় নেই। ভালোই হয়েছে। ভালো করে চানটা করতে পারবেন তাঁকায়। নদীর আর একটু গভীরে নামলেন মঙ্গলা।

—ও ঠাকুমা, তুমি কোথা থেকে গো—চেনা গলার আওয়াজ যেন ভেসে এল, মঙ্গলা ঘুরে দাঁড়ালেন। পাশের গাঁয়ের বৌ গিরিবালা ছুটে আসছে তাঁকে দেখে। ওমা। গোড়ারমুখী ছিল কোথায় গো এতক্ষণ।

—কেমন আছিস গো গিরি? মঙ্গলা হাসলেন, ভাগ্যি ভালো তোর পাড়াগাঁয়ে ঠাকুমাকে মনে রেখেছিস।

—কি যে বলো ঠাকুমা, তোমায় কেউ ভুলতে পারে, বাক্ খুব জোর দেখা হয়ে গেছে, আমি প্রায়ই গঙ্গায় আসি, তোমার ছেলে যে এই কাছেই শালকের বাসা নিয়েছে, আমার বাপু হয়েছে বিপদ, বাড়িতে ওই অতটুকু জলে কুলিয়ে ওঠে না, ভালো করে চানই হয় না সব দিন। আর তা ছাড়া গঙ্গাচানের এমন সুযোগ কে ছাড়ে বলো! একরাশ কথা উড়িয়ে গিরিবালা থামলো।

কি যেন মনে পড়ে গেল মঙ্গলার, বললেন, হ্যাঁরে, আমাদের গাঁয়ের খবর জানিস?

—তা আবার জানি না? গিরিবালা হাসলেন, আজ সকালেই তো তোমার ছেলে দেশ থেকে এলো, জল নেই গো জল নেই, আকাশেও নেই, বাসোদরেও নেই, কত লেখালেখি হচ্ছে, ছোটাছুটি চলছে, ওপর বাঁধ থেকে জল না ছাড়লে আর নদীতে জল আসবে কোত্থেকে। তাই দেখ না ঠাকুরমা, ভাদর শেষ হল, একটু মাপার জল না পড়লে কি চারাধান বাড়ে! কি যে হবে ঠাকুরমা তাই তো ভাবনা।

তা হলে বাড়ি ঘরদোর ভেবে বার জন্য নেই। বাক্ বাঁচা গেল। মঙ্গলা হাসতে গেলেন। আর তার পরমুহূর্তেই কি যেন মনে পড়ে গেল। পাথর হয়ে গেলেন তিনি। বুকের মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা—যাদের তিনি ভেবে ছিলেন সবচেয়ে নিজের, একান্ত আপনার জন—তারাই—হ্যাঁ হ্যাঁ—ওরাই তা হলে তাঁকে বিদায় করবার জন্য ছলনার আশ্রয় নিয়েছিল। যাদের কাছে তিনি ভেবেছিলেন বিপদের দিনে এতটুকু বাসার উষ্ণ নিশ্চিন্ততা মিলবে তারাই আসলে নির্বিকার চিত্তে বলে গেছে ভিত্তিহীন কথাটা। তাঁর জন্যে, তাঁর বাড়ি ঘরদোরের জন্যে অন্তরের কোথাও তাদের ছিল না এতটুকু করুণার আন্দোলন।

পায়ের তলায় একটা যেন তীব্র স্রোত বইছে, মঙ্গলা টের পেলেন মাটি আলগা হয়ে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। তিনি যেন ক্রমেই অসহায় অসাড় হয়ে পড়ছেন, এখনি বোধ হয় ভেসে যাবেন, স্রোত, স্রোত—

চতুর্দিকে সামাল সামাল রব। গিরিবালা চিৎকার করতে গেল, চলে এস ঠাকুমা, জোয়ার। কিন্তু তার আগেই চোখ পড়ে গেল দূরে। উঁচু উঁচু ঢেউ ফুলে ফুঁসে ছুটে আসছে আর আসন্ন সর্বনাশের মুখে সর্বমঙ্গলা কেমন উদাসীন ভাবে স্থির হয়ে গেছেন।

মঙ্গলার হাতটা ধরে টান দিল সে, টানতে টানতে নিয়ে চলল, দূর থেকে ছুটে ছুটে আসছে শুধু ঢেউ—আর ঢেউ।

ওপর সিঁড়িতে উঠে হাঁফাতে হাঁফাতে গিরিবালা বলল, কি বিপদটা হত বলতো ঠাকুমা?

বড় করুণ হাসি হাসলেন সর্বমঙ্গলা, অস্ফুট কণ্ঠে কেঁদে উঠলেন, আর কি সর্বনাশ হবে আমার। এর চেয়ে যে মুখে মরা ছিলো ভালো। আমি যে জেনে শুনে আমার তোরা চাস না, আমায় তোরা তাড়িয়ে দিলি, তোরা আমার কেউ নোস···কেউ নোস·····

কি বেভুল বকছ গো ঠাকুমা? গিরিবালা মুখটা নামিয়ে আনল, কি বলছ বুঝছি নি।

জোয়ারের প্রবল হিংসা গর্জন করে পায়ের কাছে ছোবল মারলে, সব শব্দ চেকে গেল, মুছে গেল, রইল শুধু স্রোতের আক্রোশ ধ্বনি আর হাওয়ার হাহাকার·····

বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কট প্রচুর পড়াশোনা করতেন। বই শুধু লেখা নয়, বই রাখার দিকেও তার সমান নজর ছিল। শোনা যায় কোন এক পুস্তক-গ্রহীতাকে তিনি লিখেছিলেন:

দয়া করে বইটি ফেরত দেবেন। আপনি ভাবতে পারেন যে এ একটা খুব তাচ্ছব অনুরোধ। কিন্তু আমি দেখছি যে আমার অনেক বন্ধুই অঙ্কে খুব কাঁচা হয়েও বুক-কিপার হিসেবে খুব পাকা।

চলতি দুনিয়া

দক্ষিণ ভারতের চারটি রাজ্যে Southern Languages Book Trust একটি অনুসন্ধান কার্য চালিয়েছিলেন, জনসাধারণের বই পড়ার অভ্যাস সম্বন্ধে। সমীক্ষার ফলে চমকপ্রদ তথ্য জানা গেছে।

সাধারণ বিষয়ের ওপর লিখিত বইগুলি শিক্ষকেরা সবচেয়ে কম পড়েন। মাদ্রাজে পুরুষদের চেয়ে স্ত্রীলোকেরা বেশী বই পড়েন। বছরে যাঁদের আয় হাজার টাকার কম তাঁরা বেশী বই পড়েন, আবার বছরে যাঁদের আয় দু'হাজার টাকার বেশী তারা এক হাজার থেকে দু'হাজার টাকা বার্ষিক আয় সম্পন্ন ব্যক্তিদের চেয়ে অধিক সংখ্যায় বই পড়েন। ধার করে চেয়ে চিন্তে নিয়েই বই পড়া হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর শতকরা নব্বই ভাগ বই ধার দিলেও শতকরা পঞ্চাশ ভাগের মত বই ফেরত পাওয়া যায়।

• • •

ইটালীর মিলান শহরে মোটর দৌড় প্রতিযোগিতা চলছিল। পথের ধারে অসংখ্য মানুষের ভিড়। তারা এসেছে খেলা দেখতে, আনন্দ করতে।

প্রতিযোগীবৃন্দের মধ্যে ছিলেন জার্মানীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মোটরচালক Wolfgang Von Trips. তিনি চ্যাম্পিয়ান হবার চেষ্টা করছিলেন প্রাণপণে। তাঁর গাড়িটি ঘণ্টায় ১৪০ মাইল বেগে ছুটছিল।

রাস্তার একটা বাঁকের মুখে প্রবল গর্জনে আর একটা মোটরকে পাশ কাটাতে গেলেন তিনি, অকস্মাৎ দ্বিতীয় গাড়িটির চাকার সঙ্গে তাঁর গাড়ির চাকার সংঘর্ষ, পরমুহূর্তেই ট্রিপসের মোটরটা দাউ দাউ আগুন জ্বলে উঠলো, বোঁ করে বাঁ দিক ঘুরে পড়েই বেড়ার গায়ে ধাক্কা মেরেই বারুদ ভিড়ের মধ্যে একটা বীভৎস হাঙ্গামা করলো গাড়িখানা।

ট্রিপস্ সঙ্গে সঙ্গে নিহত হলেন।

চৌদ্দজন দর্শকও প্রাণ হারালেন।

১৯৫৭ সনে একটি মোটর দৌড় প্রতিযোগিতার দুর্ঘটনার ফলে ১৪ জন দর্শক মারা যান।

১৯৫৪ সনে ৮২ জন ও ১০৫ জন আহত। [যেন একটা ছোটখাট রণক্ষেত্রের খবর]।

তাই আজ রব উঠেছে এ সর্বনাশ প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে হবে। —লিংক্।

• • •

আজকের তরুণীরা অনেক কিছুই আয়ত্ত করার চেষ্টা করছেন কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁরা আশ্চর্য রকম নিষ্ক্রিয়—সেটি হোল ঘর গেরস্থালীর কাজকর্ম শিখে নেওয়া। অথচ মেয়েদের জীবনে সবচেয়ে প্রয়োজন তো উপযুক্ত স্ত্রী ও মা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা।

ভারতীয় সংসারে এমন স্বামী খুব কমই আছেন যিনি একটি ব্যয়বহুল স্ত্রী পুষবেন যাঁর কাজ শুধু আত্মসুখ সন্ধান। আসল শিক্ষা হচ্ছে সকলকে দিয়ে শেষে নিজে গ্রহণ করা, সংসারের সকলের কথা আগে চিন্তা করে শেষে নিজের সুখসুবিধা দেখা। তরুণদের পক্ষে চিন্তার স্বাধীনতা ও বাক্ স্বাধীনতা ভালো কিন্তু সেই সঙ্গে চাই কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও নীতিশিক্ষা। —কেমিনা।

• • •

পুরুষ ভাবে সে নারী সম্বন্ধে যা কিছু জানার জেনে গেছে। হায়, কি ভ্রান্তি! নারী—যাদের মনে হয় সহজ সরল, তাদের মতো ছলনাময়ী দুনিয়ায় কিছু নেই।

আজকের দিনে পুরুষ প্রথমেই নারীর দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয় তার গাত্রবর্ণ দেখে। কর্সা উজ্জ্বল কোমল তার দেহ বর্ণ।

কিন্তু পুরুষ জানে না প্রতি রাত্রে এর জন্যে নারীকে কত কৌটা ক্রীম, কত শিশি লোশন, কত টিন পাউডার, কত বাক্স সাবান ইত্যাদি ঘষতে হয়েছে। সে জানতে পারে পরে, যখন তার নিজের গায়ের কড়ি খসতে থাকে। হায়, তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে, তার আগেই বেজে গেছে বিয়ের সানাই। —ফেমিনা।

• • •

পুতুল পা-পা হাঁটে, কাঁদে, দাঁত করালে চোখ চায়, শোয়ালে চোখ বুজে ফেলে, এ সব আমরা জানি। সম্প্রতি প্যারিসে এক ধরনের পুতুল বেরিয়েছে যার মানুষের মত মুখের ভাব পরিবর্তন হয়। একটু খোঁচড় দিলেই পুতুলটি সদ্যোজাত শিশুর মতো কাঁদতে থাকে, আবার এক খোঁচড়েই হেসে ওঠে। শিশুমহলে এখন খুব চাহিদা এর। —ইভস্ উইকলি।

• • •

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস্ এঞ্জেলেস 'কাইজার হসপিটাল' নামে একটি অদ্ভুত হাসপাতাল তৈরি হয়েছে যার ভেতরটা হাসপাতালের মতো নয়—বরং বলা যায় আরামপ্রদ আধুনিক হোটেলের মতো।

ওয়ার্ড বলে এখানে কিছু নেই। ব্যবস্থাপনা এমনই যে রোগীকে কখনোই ভাবতে দেওয়া হয় না নার্স নামক একটি প্রাণীর খেয়াল খুশির ওপর প্রাণটা সঁপে দিয়ে সে বসে আছে। বিছানা উঁচু নিচু করতে, আলো জ্বালতে, জানলা বন্ধ করতে, জল খেতে কিংবা ওই জাতীয় অন্যান্য টুকিটাকি কাজ সারার জন্যে রোগীকে যা করতে হয় তা হোলো একটি সুইচ টিপে দেওয়া। ব্যস্, সব আপনা আপনি হয়ে যায়।

মেটার্নিটি বিভাগে শিশুকে রাখা হয় একটি ড্রয়ারে। প্রসূতির শয্যাপার্শ্বে একটি ড্রয়ার থাকে। দেওয়ালের ওপাশে ওটিই হোল কাইলিং ক্যাবিনেট। অর্থাৎ দেওয়ালের দু' দিক থেকেই যে কেউ ড্রয়ার টেনে শিশু পরিচর্যায় রত হতে পারে।

বাচ্চা কাঁদছে? বিরক্তিকর? ড্রয়ার বন্ধ করে দিলেই আর কোন শব্দ নেই। কারণ এটি শব্দ নিরোধক। অন্য দিকে ততক্ষণ লাল আলো জ্বলে উঠেছে, নার্সের হেফাজতে চলে গেছে শিশু। মায়েরা ইচ্ছে করলে হাসপাতালের সর্বোচ্চ তলায় চলে যেতে পারেন, সেখানের রেস্টুরেন্টে খেতে পারেন ইচ্ছামতো, ঘুমোতে পারেন যতক্ষণ খুশি, লাউঞ্জে বসে টেলিভিশন দেখতে পারেন, এমনকি খেলতেও পারেন ইচ্ছে করলে। —ইভস্ উইকলি।

• • •

অবশেষে আণবিক বোমাও উপকারী যন্ত্ররূপে দেখা দিচ্ছে। শীঘ্রই নিউ মেক্সিকোর 'সল্ট কেভ'-এ এক আণবিক বোমা নামানো হচ্ছে। এর সঙ্গে অস্ত্র পরীক্ষা বা অস্ত্র প্রতিযোগিতা জাতীয় মারাত্মক কোন ব্যাপারের সম্পর্ক নেই। শক্তি উৎপাদনের সমস্ত প্রচলিত ক্ষেত্র যখন নিঃশেষিত হয়ে যাবে তখন কিভাবে আণবিক শক্তিকে মানুষের প্রয়োজনে লাগানো যাবে সে বিষয়ে গবেষণার জন্যই এই বিস্ফোরণের আয়োজন।

পৃথিবীর এক গভীর স্তরে বোমাটিকে স্থাপন করা হবে, এটির চারপাশে সোডা থাকবে নানা যন্ত্রপাতি। কয়েকটা টানেলে ও বোরিং-এর সাহায্যে ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে বিস্ফোরণ স্থলের যোগাযোগ রাখা হবে। বিস্ফোরণের ফলে গুহাটি আকারে অনেক বড় হয়ে যাবে আর উচ্চ লবণ দ্রবের সৃষ্টি হবে। ভূপৃষ্ঠ থেকে জল পাম্প করে পাঠানো হবে নিচে। প্রচণ্ড উত্তাপে সেই জল বাষ্পাকারে ফিরে যাবে অধিত বেগে, ফলে বাষ্প শক্তির দ্বারা চালিত হবে বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্রসমূহ। অবশ্য প্রথম পরীক্ষায় বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য উত্থিত বাষ্প ব্যবহৃত হবে না; কিন্তু গবেষণা চলবে কিভাবে এর সব চেয়ে ভালো ব্যবহার সম্ভব। —লাইফ

ছন্দা ॥

শীলা চট্টোপাধ্যায়

সুব্রত ওয়ারেন হেস্টিংস সম্বন্ধে যে বইটা পড়ছিল সেটা নামিয়ে রাখলো। তার পড়ার ব্যাঘাত করেছে লম্বা হাসিমুখ মেয়েটি, যে এসে তার পাশে বসেছে ধপ্ করে টেবিলের ওপর এক ভারি ছবিওয়ালা এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ফেলে। আসার সময়ে ছাপাখানা লাইব্রেরীর পুরু কার্পেটের ওপর তার পায়ের শব্দ শোনা যায়নি। সে যে কথা বলছে তা নয়। কিন্তু এখানে যে সে পাশে বসে হয়েছে এই যথেষ্ট, ছাপা নীল ভয়েল শাড়িতে সুন্দর আর বরঝরে দেখাচ্ছে, কাঁধ অবধি কাটা লম্বা চুল ইণ্ডিপেণ্ডেনসের মতন। সুব্রত তার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল মোটা ফ্রেমের পুরু কাঁচের চশমার ভেতর দিয়ে।

মেয়েটি তাকে দেখেনি। সে যে গুন্‌গুন্ করে একটা গান গাইছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যদিও খুব চাপা গলায় তবু সুব্রত তার গলা শুনতে পেল, আর চতুর্দিকে ছাপা অনুরোধ আছে, নিস্তব্ধতা বজায় রাখার জন্যে। সে কি ভাবছে সে নিজের বসবার ঘরে আছে? সুব্রত এখন ভীষণ বিরক্ত হোল। এক মুহূর্তে তাকে চিনে নিল। কোন বড়লোকের ঘরের আদুরে আহ্লাদে মেয়ে, সমাজের পরগাছা। তারপর সে বিতৃষ্ণায় নাক সিঁটকলো, এসেন্সের গন্ধে মেয়েটা ভরপুর, বিদেশী ফুলের গন্ধ, মিষ্টি আরাম-দায়ক গন্ধ। এখানে আসার তার সত্যিকার কোন দরকার হতে পারে না।

মেয়েটি বোধহয় তার চাউনির বিতৃষ্ণা বুঝতে পারল, কারণ সে পাশের দিকে চেয়ে হাসল, যেন বহুকালের চেনা।

—'ওটা কী পড়ছেন? ইয়া মোটা একটা পুরনো বই না?'

—'আমি রিসার্চ স্কলার। এখানে পড়তে আসি।' সুব্রত আড়ষ্ট হয়ে জবাব দিলে।

বই থেকে মন সরে যেতে সুব্রতর খেয়াল হল তার ভীষণ খিদে পেয়েছে। কলেজ থেকে সোজা লাইব্রেরি চলে এসেছে। ভোর থেকে শুরু হয়েছে তার খাটুনি। একটা প্রাইভেট টিউশনি, তারপর কলেজে লেক্‌চার দেওয়া, সেখান থেকে লাইব্রেরি। সে একটা থীসিস লিখছে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ওপর ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবের বিষয়ে।

—'আমার বন্ধুর সঙ্গে একটা বাজি রেখেছি। মিতা বললে ডাইনোসর বলে কোন প্রাণী কখনো ছিল না। তাই আমি এন্‌সাইক্লোপিডিয়া থেকে লাইনগুলো টুকে নিয়ে যাচ্ছি, পাতার নম্বর, সমস্ত কিছু। যদি হারে ত আমাকে আট আনা দেবে। আমরা সব সময়ে বাজি রাখি, কতবার তার ঠিকানা নেই। ভীষণ মজা হয়।'

—'রেসের মাঠে যান না কেন এর বদলে। এখানে কথাবার্তা বলা নিয়ম নয়। যারা পড়ছে তাদের অসুবিধে হয়।' সুব্রত তাকাল চার জন যুবক ও দুজন পাকা চুল প্রবীণ ভদ্রলোকের দিকে।

—'কিন্তু আমরা ফিস্‌ফিস্ করে কথা বললে ওরা শুনতে পাবে না।'

মেয়েটার মাথায় বোধ কোন বুদ্ধি নেই মনে হল।

—'আমিও ওদের মধ্যে একজন,' বই পড়বার জন্যেই এসেছি।'

—'ও হ্যাঁ, তা আমি জানি। ওটা কী বই পড়ছেন বলুন না? নিশ্চয় খুব বিচ্ছিরি আর শক্ত। আহা! আপনার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে। আমি খালি গল্পের বই পড়ি।'

সুব্রত ওয়ারেন হেস্টিংসকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চশমাটা খুলে ফেলল। এখন মেয়েটা তার চোখের সামনে ঝাপসা আবছা কুয়াশা হয়ে গেল।

—'পৃথিবীতে এমন লোকও আছে যারা আনন্দের জন্যে বই পড়ে, জানবার জন্যে পড়ে, বাধ্য হয়ে ধারে পড়ে নয়, কারণ বই পড়াতেই তাদের একমাত্র সুখ। আমি আপনার কথা ভেবে দুঃখিত যে সিনেমা আর পার্টির সংকীর্ণ জগতে থেকে আপনার ধারণা হয়েছে লেখাপড়া আর পাঁচটা জিনিষের মতন শিখতে হয় যা সাজানো বাহার বলে।'

যাক্, কথাগুলো বেরিয়ে গেল তার মন থেকে, রাগে শরীর গরম হয়ে উঠল। কয়েকজন লোক অবাক হয়ে তার দিকে ফিরে তাকাল। বইয়ের জগৎ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসায় এখন ও পার্থিব জগতে কী হচ্ছে না হচ্ছে তারা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিল না। সুব্রত অপ্রস্তুত হোল। নিজের বিরক্তি চাপতে না পেরে সে ওদের পড়ায় ব্যাঘাত করেছে। লাইব্রেরিয়ানকে বইটা ফেরত দিয়ে দন্‌দন্ করে পড়ার ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল।

—'ষত আপদ।' বললে রেগে, কোম্পানীর আমলের চওড়া সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে।

সিঠটা ব্যথা করছিল, টান হয়ে ছাড়িয়ে নিলে। যখন বাগানে নামল, গতি কমিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। আকাশে চাঁদ ভাসছে। এখানে চারিদিক খুব নিস্তব্ধ আর শান্তিভরা, অফুরন্ত খোলা বাতাস। সব সময়ে অনিচ্ছার সঙ্গে সে ফিরে যায় শাঁখারিটোলার ছোট গাদাগাদি করা ফ্ল্যাটটাতে।

লাল পাড়ের আওয়াজ এল তার পেছনে, আর সেই বিদেশী ফুলের সুগন্ধ, বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে মিশে আরো স্নিগ্ধ হয়ে।

—'আমার জন্যে কি আপনি চলে গেলেন?' নীল জরির পরা মেয়েটি জিজ্ঞেস করল।

—'আমি বড়ো বক্‌বক্ করি, না? বাড়িতে সবাই তাই বলে। কিন্তু আমার কথা বলতে খুব ভাল লাগে, নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করতে। আফিসে বসে খুবখুবে টাইপ করতে আমার যে কী অসোয়াস্তি হয়, বলবার নয়।'

—'কি, আপনি কাজ করেন? কেন?'

—'রোজগারের জন্যে, আবার কেন! আমার একটি ছোট ভাই আর দুই বোন আছে, স্কুলে পড়ে, দেখবে কে তাদের?'

—'কেন, আপনার বাবা বেঁচে নেই?'

—'হ্যাঁ, আছেন। বাবা রোজগারও করেন, কিন্তু সব বাইরে খরচা করে ফেলেন। আমরা জমিদার বাড়ির, বুঝছেন না? আমার বাবার অভাব অনটন সহ্য করার বা চাকরির অভ্যাস ত ছিল না। তিনি একটু মদ খেতে ভালবাসেন। তাতেই টাকা উড়ে যায় রোজগারের সঙ্গে সঙ্গে।'

—'তাই বুঝতে পারছি আপনাকে কেন অত রকম দেখতে। আপনার বাবা কী করে টাকার অপচয় করতে পারেন যখন আপনি ওঁর মেয়ে হয়ে সংসার খরচা চালান?'

কথাগুলো খোলাখুলি বলে মেয়েটির এবার সঙ্কোচ হচ্ছে মনে হল।—'আমার বাবা বড়ো

চমৎকার লোক, এত সুন্দর ওঁর ব্যবহার! ওঁর সম্বন্ধে আপনি ভুল ধারণা করছেন। আমার নিজেরও ভাল জিনিষের শখ আছে যতটা পারার ফুলিয়ে উঠতে পারি। রুচি, খোকন, কলার আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িটা মনে নেই। ওরা পরিষ্কার কাপড় জামাও পরে থাকতে চায় না।

দুজনে নিঃশব্দে খানিকটা হাঁটল। সুব্রতর লজ্জা হল মেয়েটাকে ভুল বোঝার জন্য।

—'আমার কলেজে পড়ার ইচ্ছে ছিল। কাউকে বলিনি, কিন্তু সত্যি বড়ো ইচ্ছে ছিল। টাকা কোথায়? তাই আমি শর্টহ্যাণ্ড আর টেনোগ্রাফি শিখলাম তার বদলে। সেইটেই বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছিল, ঠিক না?'

—'চলুন, আমি চা খাইনি। আমরা কোথাও গিয়ে একটু চা খেয়ে আসি;'—

সুব্রত বললে,—তার আগের খারাপ ব্যবহারের ক্ষতিপূরণ হবে ভেবে। মেয়েটার জন্যে তার সত্যিই দুঃখ হল।

মেয়েটা আনন্দের সঙ্গে রাজি। 'কিন্তু ঐ সব দামী জায়গায় নয়। এক গাদা টাকা খরচা করবেন না যেন।'

* * * *

গ্যারাভাইস্ কাফেতে চা আর ওমলেট খাবার সময় সুব্রত মেয়েটির পুরো জীবনী জেনে ফেলল। সে বললে তার নাম ছন্দা। তার জীবন সাধারণ, কোন বিশেষত্ব নেই, এক আট বছর বয়সে ভাল অবস্থা থেকে গরীব হয়ে যাওয়া ছাড়া। জীবনের দৈনন্দিন সাধারণ খুঁটিনাটি ঘটনা সমস্ত কিছু তার বলার ভঙ্গীতে আর কথা বলার বয়সে মজার গল্প হয়ে ওঠে।

—'আপনি কি রোজ লাইব্রেরিতে পড়তে আসেন?'

—'হ্যাঁ, তা নইলে আমি স্টেনো কি করে?'

—'ওঃ। আপনি কি ভীষণ বিদ্বান! হয়ত আমার সঙ্গে কথা বলতে আপনার ভাল লাগছে না। আপনার তুলনায় আমি ত একদম মূর্খ।' কথাটা শেষ করল উচ্ছল হাসির স্রোতে। তাতে বুঝিয়ে দিল আসলে সে সুব্রতকে তার চেয়ে কোন অংশে বড়ো বা নিজেকে সুব্রতর চেয়ে ছোট মনে করে না।

সুব্রতও তার ছোঁয়া লেগে আরম্ভ করল এই অকারণ হাসি।

—'যখন আপনার স্টেনো লেখা হয়ে যাবে তখন আপনি কী করবেন?'

—'এখন যা তাই। কলেজের প্রোফেসারি, আবার কী?'

—'তাহলে আপনার কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। আমার আছে, অ—নেক। আমি সব সময়ে স্বপ্ন দেখি আবার বড়োলোক হলে আমি কী কী করব। প্রথমেই আমার অফিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের মোটা পেটে জোরসে একটা ঘুষি মারব, তারপর নালিশ করলে তার জন্যে টাকা দেব। আর কত যে গাড়ি কিনব! আর একটা গাড়ি, গাড়িটা সবার আগে কিনব। ভিড়ের ট্রাম বাসে যেতে আমার এত খারাপ লাগে!' সে হেসে হেসে আকুল।

—'হয়ত আপনার স্বপ্ন সত্যি হবে। আপনি ত মেয়েমানুষ, আপনার পক্ষে সহজই। একজন বড়োলোককে বিয়ে করলেই হল, তারপর আর ভাবনা নেই। আপনাকে দেখতে ভাল, খুব কিছু অসুবিধে হবে না।'

—'আর পনের টাকা চাইলে? যদি আমার সব স্বপ্ন সত্যি হয়ে যায় তাহলে কী ভয়ংকর অবস্থা হবে! তাহলে আর কিছু আশা করার, স্বপ্ন দেখার, সব চেয়ে থাকার থাকবে না।' ছন্দা চোখ বিস্ফারিত করে সামনেই এক ভীষণ বিপজ্জনক পরিস্থিতি দেখতে পেল যেন আরাম ও স্বচ্ছলতার।

—'তাহলে একজন গরিব লোককে বিয়ে করে নিজের স্বপ্নগুলো গোটা রাখুন,'—সুব্রত বলল হেসে।

—'আপনাকে যদি বিয়ে করি, আপনি বিয়ের পরেও আমায় কাজ করতে দেবেন?'

সুব্রত এত আশ্চর্য হয়ে গেল যে মুখ দিয়ে তার কথা বেরোল না। মোটা একটা চীনে মাটির পেয়ালা তার হাত লেগে উল্টে পড়ল।

ছন্দা কাপটা উঠিয়ে পিরিচে ঠিক করে বসিয়ে দিলে।

—'না, ভাঙেনি, মোটা জিনিষ। আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন? জানি এখুনি আপনি আমাকে বিয়ে করতে চাইবেন না। মাত্র দুঘণ্টা আগে ত দেখা হল। আর আপনার তখন আমাকে ভালও লাগেনি। কিন্তু আমাদের অনেক বার দেখা হবার পর অনেকদিন কাটতে থাকার পর হয়ত আপনার ইচ্ছে হবে আমাকে বিয়ে করতে। নির্ঘাত হবে বলতে পারি। সবারই হয়।'

—'কাদের হয়?' সুব্রত রেগে এবার সোজা হয়ে বসল। মেয়েটা সবাইকে এরকম নাচিয়ে বেড়ায় নাকি, ওপর ওপর হাল্কা প্রেম করে? সমস্ত দোষ ওর বাবার। সে লোকটা কড়া নয়, মেয়েকে একা বাইরে টাকা রোজগার করতে পাঠায়। রাগের মাথায় সুব্রত ভুলে গেল, তার আদর্শ হচ্ছে মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সমান হয়ে পাশাপাশি রোজগার করবে।

—'আপনি তাদের চিনবেন না। আমার সঙ্গে আলাপ হয়, এমন সব লোক।'

—'এত লোকের সঙ্গে ভাব করার তোমার কোন দরকার নেই।'

—'বারে। কী করে তাদের এড়াব? আমি ত আর ঘরের কোনে অন্ধকারে পর্দার বসে নেই। আমাকে যে পেটের দায়ে রোজগার করতে হয়।'

—'তাহলে আর করবে না—আমি তোমাকে বিয়ে করার পর। কৈলাসচন্দ্র কলেজের চেয়ে ভাল জায়গায় একটা কাজ যোগাড় করব। হয়ত প্রোফেসারি ছেড়ে দেব।'

ছন্দা গালিশ ওঠা টেবিলে হাত রেখে হেসে হেসে অস্থির।

—'আমি ত আপনাকে আমার নিজের কথা সব বললুম, কিন্তু আপনি আমায় আপনার কথা কিছু বলেন নি। আমি কি একজন অচেনা লোককে বিয়ে করব? হয়ত বাড়িতে আপনার বৌ আর তিন ছেলে মেয়ে আছে।'

—'তুমি কি মনে কর যে আমি জোচ্চোর?' সুব্রত চেঁচিয়ে উঠল ভীষণ রেগে।

—'না।...আমি আমার স্বপ্নগুলো মন থেকে বের করে একটু বাইরের হাওয়ায় নেড়েচেড়ে বেড়ে নিলাম। ছন্দা আমার আসল নাম নয়। আপনার স্মৃতিতে আমায় যে কোন নামে মনে রাখতে পারবেন। দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি চলি এখন।'

টেবিল থেকে ব্যাগ তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। সুব্রত হাত বাড়ালে ওকে আটকাতে, তারপর মনে পড়ল যে সত্যি মাত্র দুঘণ্টা আগে ওর সঙ্গে দেখা।

—'আপনার স্বপ্নগুলো আলাদা থাকে রাখবেন, বাস্তবের সঙ্গে গুলিয়ে দেবেন না। এই করেই বেঁচে থাকা যায়।'

সুব্রত ঠিক বুঝতে পারল না, বোধ হয় যাবার সময়ে মেয়েটা তার ডান হাতটা আলতো বুলিয়ে গেল। তার উচ্ছল হাসি অন্ধকার রাতে মিলিয়ে যেতে শুনল। এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল দুটো চীনে মাটির পেয়ালা আর দুটো ঝাল্‌মা-চকচকে এঁটো প্লেটের দিকে, যাতে ওদের ওমলেট দিয়েছিল। মেয়েটার জীবনের কথা—ওসব কি বানিয়ে বলেছি, না সত্যি? যদি সুযোগ হোত ভাল করে আলাপ পরিচয় করার তবে কি সে ওকে বিয়ে করত, না করত না?

কাফের চাকর বিল আনল। সুব্রত অন্যমনস্ক ভাবে দাম চোকাল।

আনমনা হয়ে ভাবতে ভাবতে আর আধঘণ্টা ওখানে বসে রইল। মেয়েটার কড়া এসেন্সের গন্ধ কিংবা একটু আভাস বাতাসে পাচ্ছিল তখনও। তারপর আর সুগন্ধটা চেষ্টা করেও মনে করতে পারল না। ওয়ারেন হেস্টিংসের চিন্তা অলক্ষিতে আস্তে আস্তে ফিরে এল তার মাথায়।

সুব্রত হাই তুলে উঠে পড়ল যাবার জন্যে।

মনে করুন জাহাজ ডুবি হয়ে গেছে, ভূপোর মত উঠেছেন কোন এক দ্বীপে, তখন, জীবনের একমাত্র প্রিয় সঙ্গী হিসেবে কোন বই চাইবেন?

এ প্রশ্ন সাহিত্যিকদের করা হয়েছিল, বিচিত্র সব উত্তর মিলেছে।

বাইবেল ও শেক্সপীয়ার চেয়েছেন অনেকে।

কথা সাহিত্যিক আঁদ্রে জিদ্ জানিয়েছেন, এক্ষেত্রে তিন মাস অন্তর তালিকা পাল্টাবে কারণ পরিবর্তন হচ্ছে তবে কোন উপন্যাস থাকবে না সঙ্গে।

ইংলণ্ডের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী স্ট্যানলি বল্ডউইন বলেছেন, নির্জন দ্বীপে একখানি অক্সফোর্ড ডিক্‌শনারি হলেই তাঁর চলবে।

এই প্রসঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত সব লেখকের শত শত গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হয়েছে।

জি, কে, চেস্টারটন হচ্ছেন ইংরেজী রসসাহিত্যের এক অদ্বিতীয় স্রষ্টা। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল—জনহীন দ্বীপে আপনার মনোমত বই কোনটি?—তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করলেন, সে অবস্থায় আমি বিশ্বসাহিত্য থেকে বেছে নেব টমাস রচিত 'জাহাজ নির্মাণের প্রকৃত পদ্ধতি'।

সেকালের সভা সমিতি

উনবিংশ শতকে দেশে বহু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। তখন নব জাগরণের যুগ। প্রত্যেকের মধ্যেই জাতীয়তার মুক্তির মোচনের ও প্রাচীন কুসংস্কারগুলি ত্যাগ করার প্রবণতা দেখা যায়। তখন এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির নামও অর্থদ্যোতক হইত।

সঞ্জীবনী সভা ॥ ১৮৭৬

ঠনঠনের একটা পোড়ো বাড়িতে এই সভা বসিত। এ বাড়িতে পূর্বে নাকি একটি স্কুল ছিল শুনা যায়। বাড়ির মালিক কে বা কাহারা তাহা সভার উদ্যোক্তাদের কেহই জানিতেন না। সভার আসবাবপত্রের মধ্যে ছিল, তাঙ্গা ছোট টেবিল একখানি, কয়েকখানা ভাঙ্গা চেয়ার ও আধখানা ছোট টানা-পাখা—তারও আবার একদিক ঝুলিয়া পড়িয়াছিল।

জাতীয় হিতকর ও উন্নতিকর সমস্ত কার্যই এই সভায় অনুষ্ঠিত হইবে, ইহাই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যেদিন নূতন কোনও সভ্য এই সভায় দীক্ষিত হইতেন, সেদিন অধ্যক্ষ মহাশয় লাল পট্টবস্ত্র পরিয়া সভায় আসিতেন। সভার নিয়মাবলী অনেকই ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান ছিল, মন্ত্রগুপ্তি; অর্থাৎ এ সভায় যাহা কথিত হইবে, যাহা কৃত হইবে, এবং যাহা শ্রুত হইবে, তাহা অ-সভ্যদের নিকট কখনও প্রকাশ করিবার কাহারও অধিকার ছিল না।

ইহার দীক্ষা অনুষ্ঠানে একটা ভীষণ-গাম্ভীর্য ছিল। দীক্ষাকালে, নবদীক্ষার্থীর সর্বাঙ্গ একটা অজ্ঞাত ভাবাবেশে শিহরিয়া উঠিত। কারণ, আদি ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকাগার হইতে লাল রেশমে জড়ান বেদমন্ত্রের একখানা পুঁথি, এই সভায় আনিয়া রাখা হইয়াছিল। টেবিলের দুই পাশে দুইটি মড়ার মাথা থাকিত, তাহার দুইটি চক্ষু কোটরে দুইটি মোমবাতি বসান ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত ভারতের সাংকেতিক চিহ্ন। বাতি দুইটি জ্বালাইবার অর্থ এই যে, মৃত ভারতের প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে ও তাঁহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এ ব্যাপারের ইহাই মূল কল্পনা। সভার প্রারম্ভে বেদমন্ত্র গীত হইত—"সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্"। সকলে সমস্বরে এই বেদমন্ত্র গান করার পর, সভার কার্য [অর্থাৎ কিনা গল্প-গুজব] আরম্ভ হইত। সঞ্জীবনী সভাকে সভ্যদের মধ্যে গুপ্ত ভাষায় "হাক্ পাম্ হাক্" [হা ম্ চু পা ম্ হা ক্] বলা হইত।

এই সভার প্রধান উদ্যোক্তা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। অধ্যক্ষ কৃত রাজনারায়ণ বসু। কিশোর রবীন্দ্রনাথও এ সভার সভ্য ছিলেন।

প্রথম প্রথম সভার কার্য ভাল ভাবেই চলিত। যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইত তাহা কখনই কার্যে পরিণত হইত না। কারণ সকল প্রস্তাবই উদ্ভট কল্পনা প্রসূত। একসময় সভায় প্রস্তাব গৃহীত হইল, ভারতবর্ষে সার্বজাতিক ঐক্য সাধন করিতে গেলে, একটা সার্বজনিক পোষাক হওয়া আবশ্যক। প্রস্তাব পরিকল্পনায় গৃহীত হইল যে, মালকোঁচা মারিয়া কাপড় পরিলে যেমন হয়, ঐরূপ একটা পোষাক ও মাথায়

যাহাতে রৌদ্র বৃষ্টি না লাগে এইরূপ একটা পোলার টুপির উপর পাগড়ি বসাইয়া একটা শিরস্ত্রাণ—এই বেশ সার্বজনীন পরিচ্ছদরূপে গৃহীত হইতে পারে।

যথাসময়ে পোশাক প্রস্তুত হইল। কিন্তু কে এ অভিনব পোশাক পরিয়া পথে বাহির হইবে। শেষে প্রস্তাবক জ্যোতিরিন্দ্রনাথই একদিন মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে সার্বজনিক ঐক্যসাধক এই পোশাক পরিয়া কলিকাতা নগর ঘুরিয়া আসিলেন। লোকে এ পোশাকের অন্তর্গূঢ় হিতকর উদ্দেশ্য বুঝিল না কেবল পরিহাস বিদ্রূপই করিল।

দেশে শিল্প বাণিজ্যের কল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার প্রতি সভা বিশেষ মনোযোগী হইল। সর্বপ্রথম দিয়াশলাইয়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইল। বহু আয়াসে ও অর্থ ব্যয়ে কয়েক বাক্স দিয়াশলাই প্রস্তুত হইল বটে, কিন্তু সে পদার্থ সাধারণের পক্ষে ক্রয়সাধ্য বা ব্যবহারের মোটেই উপযোগী হইল না। লোকে এই দিয়াশলাই মোটেই পছন্দ করিল না। তখন সভ্যগণ দেশের অন্য কোন মঙ্গলকর কার্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত বিবেচনা করিয়া নূতন কাগজের কল আনানো হইল। সভ্যদের উৎসাহ বাড়িল। অনেক পরিকল্পনা হইল,—আরও নূতন কল বসাইতে হইবে, বাড়ি তৈয়ারী করিতে হইবে ইত্যাদি। অবশেষে সভা প্রতিষ্ঠিত এই নূতন কলে একদিন একখানি গামছা প্রস্তুত হইল। সভার অন্যতম সভ্য ব্রজবাবু সেই গামছাখানি মাথায় বাঁধিয়া উন্মত্তের মত তাণ্ডব নৃত্য শুরু করিয়া দিলেন। সভার সে এক স্মরণীয় দিন। একে একে প্রায় সকল সভ্যই শেষে তাঁহার সঙ্গে নৃত্যে যোগ দিলেন। তারপর কল উঠিয়া গেল। এই গামছাখানি ছাড়া, অন্য আর কিছুই সে কলে প্রস্তুত হয় নাই।

এই সঞ্জীবনী সভার সভ্যগণের মধ্যে জাতিবর্ণ নির্বিচারে আহারেরও একটি বিধি ছিল। সভার মধ্যে নানা জাতি বর্ণের লোক ছিল, কুলীন ব্রাহ্মণ হইতে শুঁড়ি পর্যন্ত।

সঞ্জীবনী সভার শিল্প বাণিজ্যের কল প্রস্তুত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কথায়, আমাদের এক বাক্স দেশলাই তৈরি করিতে যে খরচ পড়িতে লাগিল তাহাতে একটা পল্লীর সমৎসরের চুলা-ধরানো চলিত। কাগজ কল সম্পর্কে বলিয়াছেন, সেটা কোনো কাজের জিনিস হইতেছে কিনা তাহা কিছুমাত্র বুঝিবার শক্তি আমাদের কাহারও ছিল না— কিন্তু বিশ্বাস করিবার ও আশা করিবার শক্তিতে আমরা কাহারো চেয়ে খাটো ছিলাম না।

এই সমস্ত করিতে সভার প্রচুর দেনা হইল। পরে তাহা শোধও হইল। আনন্দের কথা যে সেই সময় দুটি একটি সুবুদ্ধি সম্পন্ন লোক আসিয়া সঞ্জীবনী সভার দলে ভিড়িলেন, অন্যান্য সভ্যদিগকে জ্ঞান বৃক্ষের ফল খাওয়াইলেন এবং এই স্বর্গলোক ভাঙিয়া গেল।

हिंदी भाषा

সাহিত্য-সংবাদ

সমধর্মী-প্রীতি ও সমারসেট মম্ ॥

লেখক হতে সাহায্য করেছেন লেখা দেখে দিয়ে এবং সে-লেখা প্রকাশ করতে এমন সমধর্মী লেখক-পৃষ্ঠপোষক যে নেই এমন নয়। আছেন কিছু কিছু। লেখক বৃত্তির জন্যে দারিদ্র্যের জ্বালা সহ্য করতে হয় অনেক সময়। লেখা যে এত ত্যাগ সত্ত্বেও অনেক সময়ই লেখককে অমূল্য সম্পদ এনে দেয় না অর্থের আকারে বা যশের আকারে, সাহিত্য ক্ষেত্রে এ সত্য বেশি লক্ষিত হয়। দরিদ্র, দুরারোগ্য, আর্থিক কষ্টে চিত্ত-প্রপীড়িত মন যখন লেখক এবং স্ব-পরিবারের বিচার সে পীড়নকে যখন ক্রমশঃ তীব্র থেকে তীব্রতর করে নিতে চলে, তখন অন্য অপেক্ষাকৃত অথবা আশাতীতরকম স্বচ্ছল সাহিত্যিক তাঁর সমধর্মী সাহিত্যসাধককে কোন রকমভাবে সাহায্য করবেন সে মনোবৃত্তি তাঁর ভিতরে বিন্দুমাত্র জাগে না। এমন কি নিরিকার হাস্যে সমধর্মীর দারিদ্র্যকে করুণা প্রদর্শন করেন। আমাদের দেশে এ ধরনের দৃষ্টান্ত বহু। সাহিত্যিককে বিপদে আপদে সহানুভূতি প্রদর্শন করা বা ক্ষমতা সত্ত্বেও সাহায্য করা এ বোধ জমিদার বা রাজাদের বা সংবাদপত্রের মালিকদের ভেতর যতটুকু দেখা যায় সমধর্মী একজন বাড়ি-গাড়ি বাগানো সাহিত্যিকের মধ্যে তা একেবারেই দেখা যায় না। ধনী লেখকদের প্রসংগেই একথা বলা হচ্ছে।

কিন্তু ৮৭ বছরের বৃদ্ধ লেখক সমারসেট মম্ এ বিষয়ে অর্থাৎ সমধর্মের সাধকদের প্রতি প্রীতি দেখানোর বিষয়ে এক গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন। এ বছর অক্টোবর মাসে লণ্ডনে সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তির বেশি অংশই ব্যয়িত হবে রুগ্ন অথবা অর্থ কষ্ট ভোগ করছেন এমন সাহিত্যসেবিদের কাজে। এর জন্য একটি ফাণ্ড তৈরি হবে। এ ফাণ্ডটি পরিচালনা করবেন ইন্‌কর্পোরেটেড সোসাইটি অফ অথারস্, প্লেরাইটস এণ্ড কম্পোজারস্।

বিশ্বখ্যাত এই সাহিত্যিক বলেছেন,……there are a lot of younger writers who are hard-up and would be glad of a holiday. There are other writers who are old and ill who need help too, and I will be glad to think that the society can come to the rescue.

প্রতিশ্রুতিবান তরুণ লেখকরা যাতে দেশ ভ্রমণ করতে পারেন, তার জন্যে ৫০০ পাউণ্ড মূল্যের 'সমারসেট মম্ এওয়ার্ড' পূর্বেই ঘোষিত হয়েছে।

ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকার সমারসেট মম্ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী লেখক বলে বিবেচিত। বিশ্বের প্রায় সব ভাষাতেই তাঁর বই অনূদিত হয়। রাশিয়াতেও তাঁর বই বেশ ভাল চলে। সমস্ত রয়েলটিগুলো থেকে রয়েলটির পরিমাণ অকল্পনীয়। তা ছাড়া তাঁর কাছে ছবির যে সংগ্রহ আছে, তার মূল্য প্রায় ৭০ লক্ষ পাউণ্ড। রিভিয়েরাতে তাঁর একটি সৌখিন ভবনও আছে। তিনি এখন রিভিয়েরা ছেড়ে ইংল্যাণ্ডেই বাস করার কথা ভাবছেন।

সাহিত্যকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসলেই তবে সাহিত্যসাধকদের সুখদুঃখের কথা ভাবা যায়, এর সুন্দর এবং অনুপম দৃষ্টান্ত খাড়া করেছেন মম্। সারা বিশ্বের ধনী সাহিত্যিকরা সমারসেট মমের এবম্বিধ দৃষ্টান্তে, আশা করি অনুপ্রাণিত হবেন।

প্রকাশন-বিদ্যালয়।

'For some reason which I cannot pretend to explain, world wars stimulate an interest in Russian literature. We did our part in ministering to that demand···

A problem which deeply concerned me and was uppermost in the minds of thoughtful people at that time was the future of Germany, and we published a number of books on the subject. Only second in importance was the question of self-Government in India, a subject likewise reflected in our list··· ···' [The truth about a Publisher by Sir Stanley Unwin]

উপরের উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে বিখ্যাত প্রকাশন-প্রতিষ্ঠান Allen and Unwin-এর প্রতিষ্ঠাতার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থখানি থেকে। উদ্ধৃত অংশ থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, প্রকাশনক্ষেত্রে নামতে গেলে শুধু ব্যবসাবুদ্ধিই সম্বল হলে চলে না, এর জন্যে দরকার আছে সমর-চেতনা, সম্পাদনাক্ষমতা, সৃষ্টিধর্মী এবং সর্বোপরি একটি শিক্ষিত মন। বাংলাদেশের প্রকাশনী ব্যবসার একটি দুর্নাম আছে, প্রচারের বাহুল্য এবং পুস্তক বাঁধাই প্রভৃতি ব্যাপারে দক্ষতা সত্ত্বেও প্রকাশকরা লেখকবধ করেন এবং মুনাফা লুটেন। তার জন্যে যে কোন পুস্তকে তাদের বুদ্ধি বিঘাগ্রস্ত হয় না, মূল লক্ষ্যটি মিটলেই হল। কিন্তু জনসমাজের বুদ্ধিকে লালন করা, কৌতূহলকে উদ্দীপ্ত করা, রুচিকে উন্নত করা এবং চিন্তা করতে সাহায্য করা প্রভৃতি বিষয়ে এ দেশীয় প্রকাশকেরা মাথা ঘামান না। এজন্যে সাহিত্য বুঝেন না এমন প্রকাশকের সংখ্যাটই বেশি। তাঁরা সংখ্যায় নিতান্ত কম নন। শতকরা ৯৫ জনই এ পর্যায়ে পড়েন আর বাকী যারা আছেন অর্থাৎ যাদের প্রয়োজনীয় মানসিকতার অধিকার আছে তারা অন্যান্যদের মত আসুন ব্যবসা করতে এসে ভুলে এ ব্যবসায় ঢুকেছেন তা নয়। এদের পরিশীলিত মনের দিকে লক্ষ্য আছে, পাঠক সমাজের প্রতি দায়িত্ব বোধ করেন এবং ভাবেন প্রকাশন-ব্যবসা একটি পবিত্র কর্ম। কিন্তু তাঁদের আবার যা নেই তা হল ব্যবসাবুদ্ধি এবং প্রকাশন ব্যবসায়ে প্রয়োজনীয় দীক্ষা।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত লণ্ডন ম্যাগাজিন পত্রিকার সম্পাদক মিঃ লেম্যান একজন সফল প্রকাশক-ও। তিনি সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য প্রকাশে বেশি পক্ষপাতী। যুদ্ধের সময় তাঁর Penguin New Writing মাসে ৮০,০০০ কপি করে বিক্রি হয়েছে। তাঁর নজর লেখক তৈরি করার দিকে, তরুণদের উপর তাঁর বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি। তরুণ কবি এবং প্রাবন্ধিকরাই তাঁর প্রিয় পাত্র। শুধু তা নয় আরো অনেক ভাল বই যেগুলো ধীরে ধীরে বিস্মৃতির অতলে চাপা পড়ে গিয়েছে লেম্যান সেগুলো আবার প্রকাশ করেন। অথচ সমালোচক হিসাবে লেম্যান একজন ধুরন্ধর পুরুষ। অডেন, কনোলী, আরওয়েল প্রভৃতি ইংরেজ সাহিত্যিকদের তিনি একজন সমালোচক। তিনি অর্থাৎ প্রকাশক লেম্যান একটি সুন্দর বই লিখেছেন, 'I Am My Brother'। এই বইটিতে প্রকাশক হিসেবে তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত জ্ঞানবাহী সিদ্ধান্ত সহকারে বর্ণিত হয়েছে।

আরেকজন বিখ্যাত প্রকাশক ফ্রেডরিক ওয়ারবার্গ-ও একটি বই লিখেছেন 'An Occupation for Gentlemen'। এ বইটি থেকে জানা যায়, ওয়ারবার্গ কীভাবে এ ব্যবসায়ে নামেন এবং কীরকম ঝুঁকি নিয়ে বই প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রকাশিত বইগুলো দেখলে বুঝা যায়, তাঁর নজর শুধুমাত্রই ব্যবসায় মুনাফা লুটন করা নয়। যেমন তিনি ছেপেছেন, টমাস মান, এইচ. জি. ওয়েলস্, জিড্, অরওয়েল, লুইস ম্যাকনেইস, সিওয়েল ট্রিলিং।

প্রকাশন-ব্যবসায় আমেরিকার ভূমিকা ব্যাপক, বহু প্রকাশক প্রতিষ্ঠান সেখানে গড়ে উঠেছে। প্রত্যেকটিই বেশ ভালভাবে টিঁকে আছে। বছরে প্রায় ২৫০,০০০,০০০ বই বিক্রি করেন আমেরিকার প্রতিষ্ঠানগুলো সবাই মিলে। এর মধ্যে মূলত মূল্যের পুস্তকের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ। বিভিন্ন মুদ্রণ স্থানের সভ্য-সংখ্যা প্রায় ১০ মিলিয়ন। সেখানে ধীরে ধীরে প্রকাশকরা সমগ্র সমাজ জীবনে প্রভাব বিস্তার করে চলেছেন।

যেহেতু প্রকাশকের প্রভাব বাড়ছে, যেহেতু তাদের ব্যবসায় বহু প্রতিযোগীর আবির্ভাব হয়েছে, সেহেতু প্রকাশন-কর্মীর সামনে বহুবিধ সমস্যা দেখা দিয়েছে। বই প্রকাশন, প্রকাশিত বইয়ের বিতরণ, সম্পাদনা প্রভৃতি ব্যাপারে বিশেষ দক্ষতায় প্রতিটি প্রকাশন-কর্মীকে শিক্ষিত করার দরকার হয়ে পড়েছে। প্রকাশন শিক্ষা দেবার জন্যে সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দিল। এ প্রয়োজনের দিকে শিক্ষাব্রতীদেরও নজর পড়ে। এ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষাব্রতী ও নিউইয়র্ক শহরের প্রকাশক প্রতিষ্ঠান সমূহের যুগ্ম উদ্যোগে সেখানে গড়ে উঠেছে 'New York University's Graduate Institute of book Publishing.'। ১৯৫৮ সনে এটি স্থাপিত হয়েছে। অল্প কয়েক বছরে এ প্রতিষ্ঠানটি যথেষ্ট সুনাম কিনেছেন। শুধু আমেরিকাবাসী তরুণ শিক্ষার্থী নন, এশিয়ার দেশগুলো থেকেও বহু ছাত্র সেখানে পাঠ নিচ্ছেন।

এখন নিউইয়র্ক শহরের বহু আমেরিকান প্রকাশক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন এই ইনষ্টিটিউট। উপদেষ্টামণ্ডলীতে আছেন প্রকাশক প্রতিষ্ঠান এবং ২৭টি প্রতিষ্ঠান। ছাত্রদের প্রাথমিক হাতে-নাতে শিক্ষাদান কার্যের ব্যবস্থা করেছেন। ইনষ্টিটিউটে শিক্ষারত ছাত্রদের বই প্রকাশের বিভিন্নদিকের সংগে পরিচিত করানো হয়: (১) কীভাবে সম্পাদনা করতে হয়; (২) লেখকের সংগে কীভাবে কথাবার্তা বলতে হয়; (৩) কী করে বাজেট তৈরি করতে হয়; (৪) কী করে বইটি ছাপাতে হয়। এখানকার ছাত্রেরা বহু প্রকাশকের সংগে সাক্ষাৎ করেন, বহু বিখ্যাত এবং অভিজ্ঞ প্রকাশক অতিথি বক্তৃতা দিতে যান এখানে এসে এবং প্রধান প্রধান প্রকাশন-প্রতিষ্ঠানে ছাত্রেরা গিয়ে কাজ দেখেন।

ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর ডঃ জন টেবেল এ বছর ইনস্টিটিউটকে বিভিন্নভাবে বাড়াবার কথা ভাবছেন। সে সম্পর্কে তিনি বলছেন: We hope to have an even larger international representation. We are now studying ways to bring the benefits of our programme in publishing to training personnel from newly independent nations."

বর্তমানে যে সমস্ত ছাত্র কার্যক্ষেত্রে শিক্ষানবীশ হিসেবে আছেন তাঁরা কোন বেতন পান না। কিন্তু প্রকাশন-প্রতিষ্ঠানসমূহ তাঁদের পড়ার 'ফি' যোগান। সে 'ফি'র পরিমাণ বছরে কম নয়। বছরে প্রায় এক হাজার ডলার তাদের ফি হিসেবে দেওয়া হয়।

পৃথিবীর বিভিন্নদেশে বিশেষ করে অনুন্নত দেশসমূহে যখন পড়াশুনার চর্চা এত বেশি বেড়ে যাচ্ছে যে, সংস্কৃতির এ বিশেষ ক্ষেত্রটিকে কেবলমাত্র ব্যবসায়ীর দৃষ্টিতে দেখলে চলছে না। একজন শিক্ষাব্রতীর ভূমিকার মতই এক্ষেত্রের কারবারীদের। সুতরাং শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপক ভূমিকা স্মরণ করে এ ক্ষেত্রটিকে উন্নত করা দরকার। আজ আমেরিকায় যা স্থাপিত হয়েছে, অনুন্নত দেশে এর প্রয়োজন সব চাইতে বেশী হয়ে দেখা দিয়েছে। ভারতবর্ষের প্রকাশন-ব্যবসার কথা স্মরণ করলে সে প্রয়োজন এখানে যত তাড়াতাড়ি মেটে, ততই ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গল।

সূর্যাস্তে দক্ষিণে যাবার আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘদিনের শিশুরলিনার। উত্তরের বন্ধুর পার্বত্যভূমি আর শীতের কামড়ের হাত থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে এগারো বছরের মেয়ে সালকাকে নিয়ে বেরিয়েছিল একটু আশ্রয় এবং নিরাপত্তার খোঁজে। কিন্তু সম্বল বলতে তো মাত্র চার ক্রাউন। তাই বাধ্য হয়েই উত্তরের ওসেরি বন্দরে নেমে যেতে হলো জাহাজ ছেড়ে।

মৃ-উচ্চ পর্বতমালা বেষ্টিত সমুদ্রতীরবর্তী ছোট শহর ওসেরি। ছবির মতো সুন্দর হোলেও বেঁচে থাকবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। জীবন যাত্রার মানও খুব নিচু। মাছের ব্যবসাই প্রধান উপজীবিকা। উত্তুরে শীতের দুরন্ত হাওয়া বাধা মানে না, ক্ষমা করে না দরিদ্র বলে। এর মধ্যে বেঁচে থাকা নয় টিকে থাকাই দুর্বহ। মেয়ে সালকাকে নিয়ে শিশুরলিনা দোরে দোরে ঘুরে বেড়ায় একটু আশ্রয় আর নিরাপত্তার খোঁজে।

শিশুরলিনা, সালকা যেদিকে তাকায় দেখে লোভ, কামনা আর বাসনায় এই জনপদবাসীরা আচ্ছন্ন। এদের সমাজের পর্বতরেই ঘুণ ধরেছে। এই ছোট শহর ওসেরির লোকগুলোই তো কত বিচিত্র চরিত্র। স্যালভেশান আর্মির সদস্য হামবড়া জনসন, সংকীর্ণ চেতনা আর যত উৎসাহ তার যৌন জীবন সম্পর্কে, ধনী ব্যবসাদার বোগেসেন, ওসেরির সব কিছুর ওপর যার মালিকানা হয়েছে, লালচে ছুঁচলো দাঁড়ি রেষ্টর ভদ্রলোক তার কথা শুনলে মনে হয় মুখের বদলে একটি ফাঁপা মস্তিষ্ক গহ্বর থেকে নির্গত হচ্ছে ক্লান্তিকর একঘেয়ে স্বর। লম্বাটে, হাড়-সর্বস্ব, লালচে গোঁফ ডাক্তার, যার জীবনদর্শন বলতে—'কোনো কিছুতেই কিছু হবার নয়'। এ ধরনের জীবন দর্শন একমাত্র তাদের পক্ষেই সম্ভব যাদের জীবনভোর তাদের রকম সব রোগের মুখোমুখী হতে হয়েছে। আশ্রয়লাভে সব জায়গায় ব্যর্থ হবার পর শেষ পর্যন্ত নাবিক স্টেইনটর স্টেইনসন তার বাড়িতে আশ্রয় দিতে এগিয়ে এলো।

শিশুরলিনা আর স্টেইনটরের অন্তরঙ্গতা দিন দিনই স্পষ্ট হয়ে উঠল। আর এগারো বছরের সালকা তার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা চিন্তা করে ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

বইটির প্রথম অংশ সালকা, শিশুরলিনা এবং স্টেইনটরের কাহিনী। সালকা ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছে। কথা বলে ধীর গম্ভীর স্বরে। দুঃখ, দারিদ্র আর অপমানকর এই দিন যাপনের মধ্যেও তার জীবনের প্রতি মমতাবোধ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে।

স্পর্শকাতর দুর্বল চরিত্র শিশুরলিনা পুরুষের দাবি, জীবনের দাবির কাছে মাথা নত করে। মাতাল স্টেইনটর স্টেইনসন যেন ওসেরির লোভ কামনা আর বাসনার প্রতিমূর্তি। কৃতকর্মের জন্য পাপবোধ বা অনুতাপ যার কুষ্ঠিতে লেখে নি।

একবার একান্তে সালকাকে অন্তরঙ্গ করে পাবার বাসনায় অকৃতকার্য হয়ে স্টেইনটর ওসেরি ছেড়ে পালাল। প্রায় বছর দুই পরে যখন সে ফিরে এল তখন শিশুরলিনার শিশুটি মারা গেছে। যথাপূর্বং শিশুরলিনা আবার সেই স্টেইনটরের কণ্ঠলগ্না হল। চার্চ থেকে এবার দুজনে ঘোষণা করল ওরা বিয়ে করছে। এদিকে ঠিক এক সপ্তাহ আগে স্টেইনটর আবার পালিয়ে গেল। আর শিশুরলিনা সমুদ্রের জলে ডুবে আত্মহত্যা করল বিবাহের জন্য নির্ধারিত দিনে।

দ্বিতীয় অংশ সালকাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। সালকা এখন বড় হয়েছে। পুষ্পিত সে জীবন সম্পর্কে ধারণাও তার অনেক পরিণত। এ বয়সের পক্ষে একটু বেশীই সে অভিজ্ঞা। জীবনে দীর্ঘ বন্ধুর পথ পরিক্রমায় তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়েছে। সমুদ্রগামী জাহাজের নাবিকদের এখন সে সঙ্গে

কর্ত্রী। ছেলেবেলায় ভালবাসত আর্নালদুরকে। সেই আর্নালদুর আবার ফিরে এসেছে তার জীবনে। আর্নালদুর বিপ্লবী। তার আগমনে এই জনপদ যেন অনেকদিনের ঘুম থেকে জেগে উঠল বিদ্রোহ আর বিপ্লবের মন্ত্রে। নতুন জীবনের স্পন্দনে সঞ্জীবিত হল এই জনপদবাসীরা। আর্নালদুর সালকার চোখে স্বপ্ন দেখে ওই নীল সমুদ্রের। হয়ত তাদের সমুদ্রের মতই বুঝি অতলান্ত আর রহস্যময় ওই দুটি চোখ। সালকার জীবন কানায় কানায় পূর্ণ বুঝি সার্থক হয়ে উঠল। কিন্তু মানুষ যা ভাবে তা হয় না। সালকার জীবনে দুর্ভাগ্যই বারে বারে এসে সব স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে।

'সালকা ভলকা' উপন্যাসের শেষ হল সালকার আত্মত্যাগে। ভাগ্যান্বেষণে আর্নালদুর চলে যাচ্ছে দক্ষিণে। নিজের জীবন থেকে, বলা যেতে পারে বন্ধন থেকে স্বেচ্ছায় আর্নালদুরকে সে বিদায় জানাল।

প্রধান ও মূল চরিত্র সালকা, আত্মবিশ্বাসে অটল পরিশ্রমী, নিজের এবং পারিপার্শ্বিকের ওপর তাঁর পূর্ণ কর্তৃত্ব। ল্যাকসনেসের 'সালকা ভলকা', কাহিনী উপস্থাপনায়, জটিল মানসিকতার বিশ্লেষণে, পরিণতির অনিবার্যতায়, ব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধ একটি সার্থক ট্রাজেডি।

'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পীপল' ইসলাণ্ডের পটভূমিতে লিখিত এরিক ঘর্মী একটি সুবৃহৎ সামাজিক ইতিবৃত্ত। বিংশ শতাব্দী এর সময়কাল।

এই উপন্যাসটি একটি মানুষের কাহিনী যে সমস্ত কুসংস্কার আর প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভ্রূকুটিকে অস্বীকার করে জীবনব্যাপী সংগ্রাম করেছে। তার নিঃসঙ্গ এবং স্বাধীনতা স্পৃহা পুরা কাহিনীর মতো বিস্ময়কর।

উপন্যাসের শুরু কোলুকিল্লির রূপক কাহিনী দিয়ে। এই উপত্যকার উপর তার অভিশাপ রয়েছে। আবহমানকাল ধরে একের পর এক অভিশাপ বার বার বিভিন্ন রূপে বাধা দিয়েছে, কখন ধ্বংসের মধ্যে কখন হিংসার রূপে কিন্তু স্বাধীনতাকামী আত্মবিশ্বাসী মানুষ সে সব কিছুকে অগ্রাহ্য করে আপন মহিমায় স্বাধিকার প্রচেষ্টায় সচেষ্ট থেকেছে। শতাব্দীব্যাপী এই উপত্যকার ইতিহাস স্বাধীনচেতা মানুষেরই ইতিহাস।

আঠারো বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে বিয়ার্তুর এই উপত্যকাভূমির অধিকার পেল। অবশ্য আগামী বারো বছর ধরে তাকে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করতে হবে। এবং তখনই সে এই জমির মালিক হতে পারবে।

উপন্যাসের আদি-মধ্য-অন্ত পর্ব জুড়ে বিয়ার্তুরের ঘনঘটাময় জীবন-কাহিনী বিবৃত হয়েছে। কত বাধার সম্মুখীন তাকে হতে হয়েছে। স্ত্রীর মৃত্যু, কন্যা আস্টার জন্ম কাহিনী, তাঁর দুই পুত্র যারা সাবালকত্ব প্রাপ্তির পর আলাদা হোল স্বাধীনতা স্পৃহায়, চলে গেলো দক্ষিণে। আস্টাকে পরিত্যাগ করল বিয়ার্তুর এবং শেষ পর্যন্ত তার অনেক কষ্টে গড়ে তোলা খামার বাড়িও ঋণের দায়ে হাতছাড়া হোল।

বিয়ার্তুর জীবন শুরু করেছিলো একা। দীর্ঘ জীবনকালে অনেকেই এসেছিল, তারা একে একে হারিয়ে গেলো তার জীবন থেকে। পরম প্রচেষ্টায় গড়ে তোলা সম্পদ বার বার হাতছাড়া হোল। তবুও অদম্য স্বাধীনতার স্পৃহায় সে দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে বারবার সংগ্রাম করেছে। সে একাই জীবন শুরু করেছিলো। জীবনভর ব্যর্থতা, নৈঃসঙ্গতা তাকে ঘিরিয়ে রেখে নি। মানুষ তো একাই আসে, যায় একাই।

এগিয়ে চলার নামই জীবন। নিজের জীবনে পূর্ণ শক্তি অর্জন করাই বিয়ার্কুর'য়ের জীবন সাধনা। ইসল্যাণ্ডের সামাজিক পরিবর্তনের ধারাটির সঙ্গে এই এপিকধর্মী উপন্যাসটির চরিত্রগুলির ভাবনা কর্মকাণ্ড সম্পর্কযুক্ত। বিয়ার্কুর এ যুগের একটি জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক।

আমাদের সাময়িকতার খণ্ডিত জগতে হয়তো বিয়ার্কুর, সালকা ভুল'ভ, কিন্তু অবাস্তব নয়। এরা পূর্ণতার, সার্থকতার প্রতিভূ। মননশীলতায়, ব্যাপ্ত কল্পনায়, গভীর মানবিকবোধে উদ্দীপ্ত এই দুটি উপন্যাস ল্যাক্‌স্‌নেসের সাহিত্যপ্রতিভাকে বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে স্মরণীয় করেছে।

শেকস্‌পীয়রের জন্মদিন ২৩শে এপ্রিল। এই ২৩শে এপ্রিল, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন স্কালডোর ল্যাক্‌স্‌নেস রেকিয়াভিকের এক স্বচ্ছল পরিবারে। পিতামাতার ইচ্ছা ছিলো পুত্রকে সঙ্গীতে পারদর্শী করা। ষোলো বছর বয়সে পিয়ানো শেখা ছেড়ে আরম্ভ করলেন লিখতে। প্রথম গল্প [অনেকের মতে উপন্যাস] 'চাইল্ড অব নেচার' মাত্র সতেরো বছরে বয়সে লিখিত।

রেকিয়াভিকের কলেজ থেকে মাতৃক উপাধি লাভ করবার পর বেশ ভ্রমণে বের হলেন। স্ক্যানডিনেভিয়ার দেশগুলি এবং জার্মানি, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স পরিদর্শনান্তে তিনি লুক্সেমবার্গের এক মঠে এসে উপস্থিত হলেন। এখানেই তিনি ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। 'এ্যাট দি হোলি মাউন্টেন' তাঁর এই সময়কার রচনা। ধর্মীয় আকর্ষণে তিনি অতঃপর লণ্ডন এবং পারীতে জেসুইট পাদ্রীদের অধীনে কিছুদিন পড়াশুনো করেন। খ্রীষ্টীয় ধর্মবোধে কিন্তু তিনি সান্ত্বনা পেলেন না। ১৯২৭-এ প্রকাশিত আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'দি গ্রেট ওয়েভার অব কাশ্মীর' তাঁর মত পরিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে।

কিছুদিন স্বদেশে কাটাবার পর ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় এলেন। এখানেই আপটন সিনক্লেয়ারের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে লিখিত একটি প্রবন্ধে মার্কিনী সংস্কৃতির অবনতি বিষয়ে তিনি সমালোচনা করেন। এর ফলে যে সংকটজনক অবস্থায় তাকে পড়তে হয় তার ফলেই তিনি আমেরিকা ত্যাগ করে ইসল্যাণ্ডে ফিরে আসেন। এবং তারপর থেকে তিনি রেকিয়াভিকে দ্বিতীয় স্ত্রীসহ বসবাস করছেন। তাঁর এই সময়কার একটি উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

"I arrived there as a rather conservative European but getting acquainted with America I turned socialist, finding it the only thinkable reaction of an intelligent being to the state of affairs in that country."

অতি অশান্ত শিল্পী মনের অস্থিরতা তাঁর স্বভাবের ধর্মে।

সুকুমার ঘোষ

———

ইলিয়া এরেনবুর্গ একজন নিঃসঙ্গ পুরুষ ॥

স্বভাবতই এমন স্বভাব প্রকাশে আমাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা থাকে না যে, শিল্পীকে সমাজ ঘটনার চেউ—দুহাতে সরিয়ে দিতে হবে এবং নিজের রাজত্ব এমন একজায়গায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যেখানে শিল্পীর চিত্ত ক্ষতবিক্ষত হবে না, সেখানে শিল্পী দু'চোখের অন্তরে আপন ভাবনাতেই মুগ্ধ হয়ে থাকবেন।

আমাদের এমন ধারণা করার অবকাশ যে যুগে ছিল, সে যুগ বর্তমান জগতের রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছে সর্বপ্রকারে। এখন আমাদের সময় দ্রুত পড়িয়ে যায় এবং সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে ভাবতে তারো চেয়ে দ্রুততর গতিতে ছুটে চলে ঘটনাস্রোত। একটি ঘটনার চেউ সামলাতে না সামলাতেই আরেক ঘটনার ধাক্কায় চিত্ত তছ-নছ হতে থাকে। সুতরাং শিল্পীর পক্ষে 'নির্লিপ্ত', 'ঘটনানিরপেক্ষ', 'কমলবন' প্রভৃতি শব্দের প্রতি মোহ থাকা বাঞ্ছনীয় নয় মোটেই। অন্তত বর্তমান কালের শিল্পীর পক্ষে। বর্তমান কালেই একথা খাটে সবচেয়ে বেশি সত্য করে, যেহেতু একালের জীবন প্রতি পলে, প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি অনুভূতিতে ঘটনার কাছে একটা প্রতিজ্ঞা পালন করতে বাধ্য। সে প্রতিজ্ঞা হল, ঘটনার প্রতিক্রিয়ার আপন ভঙ্গীতে প্রতিক্রীত হওয়া। ইলিয়া এরেনবুর্গ সম্পর্কে এ-কথাগুলো প্রযোজ্য হয় ঠিক খাপে খাপে। তিনি দুরন্ত বন্যাকে প্রত্যক্ষ করেছেন সারা জীবন ধরে এবং সে বন্যার ধা'রে তিনি সতর্ক থেকে আপন ভূমিকা পালন করে আসছেন। তাতে অনেকের কাছে এমন কি স্বদেশীয় বন্ধুদের কাছে তিনি ভুলভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছেন। আর পশ্চিমী সে সমস্ত সমালোচকেরাও সুযোগ পেয়ে তাঁকে খণ্ড খণ্ড করতে ছাড়েন নি।

এরেনবুর্গ একজন দায়িত্বশীল পুরুষ বিশ্বসাহিত্যক্ষেত্রে। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের প্রাবল্যে তিনি কারো কাছে নতি স্বীকার করেন নি। হয়তো কখনো কখনো সংশয়িত হয়েছে তাঁর দুরন্ত জীবনের প্রহরগুলো। আর পশ্চিমী সমালোচকেরা সে সংশয়িত জীবনকে নানা স্বকল্পিত সিদ্ধান্তে রহস্যাবৃত করেছেন। কিন্তু যা বলতে চেয়েছি তা হ'ল প্রতিজ্ঞার প্রতি নতভাবে ভক্তবৎ আচরণ করার মধ্যেই দায়িত্বশীলতার স্পষ্ট লক্ষণ বর্তমান। ঘটনার কাছে প্রতিষ্ঠা গ্রহণ করা। এরেনবুর্গ সে প্রতিজ্ঞা পালন করার জন্য বহুভাবে আন্দোলিত হয়েছেন, কখনো কখনো জীবনে সংশয় উপস্থিত হয়েছিল, কিন্তু তিনি নিছক নির্লিপ্ত দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। এ-যুগের শিল্পীর পক্ষে যা একান্তই আবশ্যক এবং যে আবশ্যকতা অনিবার্যভাবে স্বীকার্য তা এই নির্লিপ্ত না-থাকা, এরেনবুর্গ সে দিক দিয়ে একজন সার্থক এ-যুগের পুরুষ এবং সে পুরুষ মনে প্রাণে একজন শিল্পী।

॥ ২ ॥

১৮৯১ সালে এরেনবুর্গ রাশিয়ার 'কিয়েভ'-এ উচ্চ-মধ্যবিত্ত ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই এরেনবুর্গ ছিলেন খুব একজন প্রত্যয়বান মানুষ। অন্যায় অবিচার সহ্য করা তাঁর ধাতে কোনদিন ছিল না। বিদ্যালয়ের ছাত্র তখনবিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন। এবং সে-ই ছাত্র এরেনবুর্গ ১৯০৭ সালে ১৭ বছর বয়সে ধরা পড়েন। কিছুদিন পরে প্যারলে মুক্তি পেলেন বটে, কিন্তু আন্দোলনের হাতছানি এড়িয়ে নির্বিকার ভাল-মানুষটি হয়ে থাকবেন, এমন ছেলে তিনি ছিলেন না মোটেই। তাই আবার গুপ্ত-আন্দোলনের কর্মী হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। রাশিয়ার নানা

শহরে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াতে লাগলেন। অবশেষে নিজে থেকে যেদিন ধরা দিলেন আবার, সেদিন জারের পুলিসের হাতে থেকে তাঁর পিতা ৫০০ শত রুবল জামিনে মুক্ত করলেন দুরন্ত ছেলেকে। ১৯০৮ সালে এরেনবুর্গ মস্কো ছেড়ে অনতিক্রান্ত ১৮ বছর বয়সে প্যারিসে চলে আসেন। প্যারিসে বিপ্লবীগুরু লেনিনের সংগে দেখা করেন, কিন্তু সক্রিয় রাজনীতি ছাড়লেন। তিনি ডুবে গেলেন শিল্পকলার রম্যভূমি ফ্রান্সের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির আলোচনায়। তারপর ১৯১৪ সালে ২০ বছর বয়সে তিনি ফরাসী সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে গেলেন। কিন্তু স্বাস্থ্য তাঁর প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তিনি সৈনিক হতে পারলেন না। তারপর কিছুদিন নানা পেশায় কাটাবার পর ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে ইংল্যাণ্ড, নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড ঘুরে তিনি রাশিয়ায় ফিরলেন। ১৯০৮ সাল থেকে ১৯১৭ সাল এই দীর্ঘ ন'বছর তিনি রাজনীতি মুক্ত হয়ে কাটিয়েছেন বটে, কিন্তু নিশ্চেষ্ট নিষ্কর্মার সাধারণ ভাবনা-চিন্তাহীন জীবন তাঁরা নি। কখনো প্যারিসে বিপ্লবের কর্মে নিরন্তর ব্যস্ত রাশিয়ান বিপ্লবীদের সংগে সময় কাটিয়েছেন; কখনো কখনো এবং মূলতঃ অধিকাংশ সময় পাশ্চাত্য সাহিত্যপাঠে কাটিয়েছেন। ফলে পাশ্চাত্য সাহিত্য তাঁর চষে খাওয়া। শিল্পকলা বিশেষতঃ পিকাসোতে-ও অত্যন্ত আসক্ত হয়েছিলেন তিনি এ-সময়েই। শুধুই আসক্ত বললে সবটা বলা হয় না। মস্কোর ৮ নং লোকী ষ্ট্রীটের আটতলায় এরেনবুর্গের ঘরে পিকাসোর ছবি প্রেরণার স্বাক্ষরস্বরূপ টাঙান আছে। যাহোক ন'বছরের প্রবাসে প্যারিসের দিনগুলোতে এরেনবুর্গ যাঁর সৈনিক উত্তপ্ত হয়েছিল রাজনীতির হুজুগে, তৈরী হয়ে গেলেন আরেক মানুষ। রাজনীতিকর্মী বিপ্লবী যৌবনে পরিণত হলেন শিল্পীতে। পরিপুষ্ট সাহিত্যমন নিয়ে তিনি ফিরলেন রাশিয়ার মস্কোতে ১৯১৭ সালে। কিন্তু কাটালেন সেখানে মাত্র ১৯২১ সাল পর্যন্ত। প্যারিসে তিনি লিখেছিলেন রাশিয়ান কবিতার বই। নাম Dandelion। কবিতায় তাঁর আদর্শ ছিলেন মালার্মে। মস্কোয় ফিরে তিনি কবিতা-সাময়িকী প্রকাশ করলেন মহিলাকবি Jeevelaeva-র সংগে। এ ৪।৫ বছর এরেনবুর্গ খুব অস্থিরতার সংগে কাটান। তাঁকে ১৯২০ সালে হাতকড়া পড়তে হয় গুপ্তচরবৃত্তির সন্দেহে। কিন্তু সে সন্দেহ মিথ্যে প্রমাণিত হলে তিনি ১৯২১ সালে স্ত্রীকে নিয়ে মস্কো ছেড়ে চলে আসেন। ১৯২২ সালে প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে খুব আদৃত উপন্যাস Julio Jurenito। বার্লিনে প্রকাশিত হয়। বেলজিয়ামে বইটি লেখেন। এই উপন্যাসটিতে লেখক জাতীয়তাবাদের অন্ধতা, পশ্চিমী বুর্জোয়া সমাজ, সোভিয়েট পুলিশী ব্যবস্থা প্রভৃতিকে দারুণ তীক্ষ্ণতার সহিত ব্যঙ্গ করেন। এই উপন্যাসটিই তাঁকে পশ্চিমী সাহিত্যিক মহলে পরিচিত করে দিল। বইটি ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হলেও সোভিয়েট ইউনিয়নে আজো তা প্রকাশিত হয়নি। অনেকের মতে Julio Jurenito তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। সে সম্পর্কে তিনি নিজে একজন জার্মান সাংবাদিকের কাছে বলেন, 'A little mischievous, but very amusing.'

বার্লিনে বছর দুয়েক কাটিয়ে প্রাগ ঘুরে মস্কোয় গিয়ে আবার ১৯২৪ সালে মস্কোর বাইরে চলে আসেন। ইটালী, প্যারিস ঘুরে বেড়াবার পর ১৯২৬ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নে পুনর্বার যান। ১৯২৭ সালে ছত্রিশ বছর বয়সে তিনি আরেকটি বই লেখেন। 'Roitsob wanix'। প্যারিসে বসে এই বইটি লেখেন। এই উপন্যাসটি-ও রাশিয়াতে প্রকাশিত হয়নি। রাশিয়ার বাইরে আগের বইটির মত এ-বইটি-ও যথেষ্ট আদর পায়। তারপর একে একে লিখেছেন: দি সেকেণ্ড ডে, দি লাইফ অফ অটোলোবাইলস্, দি ফল অফ প্যারিস, স্টর্ম, দি থ প্রভৃতি।

ইতিমধ্যে ১৯৪১ সালে যুদ্ধের দুর্যোগ সময় কেটেছে তাঁর দিবারাত্রির অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে। ১৯৪১ সালে হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করলে তিনি প্রাভদায় ১৪ আগস্ট লেখেন, 'I am Russian and a Russian writer, but Hitler has reminded me of something additional. My mother's name was Hannah. I am a Jew. I say this with pride. We are those whom Hitler hates most, and this hatred honours me.....' যুদ্ধের সময় Jewish Anti-Fascist Committee গঠিত হলে, তিনি অন্যতম ডিরেক্টর নির্বাচিত হয়েছিলেন। বলতে ভুল হবে, এরেনবুর্গ ১৯৪১ সালে মস্কোতে ফিরে আসেন এবং তারপর থেকে তাঁকে আর পূর্বের মত বারে বারে দেশত্যাগের বিড়ম্বনা ঘটাতে হয় নি। এরেনবুর্গ রাশিয়ার একজন সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হলেন। বহির্বিশ্বে তিনি বহু শান্তি কংগ্রেসে যোগদান করেছেন সোভিয়েটের সরকারী প্রতিনিধি হিসেবে।

॥ ৩ ॥

এরেনবুর্গ তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাসটিতে যেমন সোভিয়েট জীবন যাপন পদ্ধতির প্রতি কটাক্ষ করেছিলেন যদি-ও, কিন্তু স্টালিনের আমলে তাঁর বিশেষ কিছু বলা ছিল না। তবু 'রাইটার এণ্ড হিজ ক্র্যাফট' বইটিতে তিনি যে ভাব ব্যক্ত করেন, সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির সাহিত্য-শাখার গোঁড়া মতের সঙ্গে তার মিল নেই। গোঁড়ামী সহ্য করা তাঁর ধাতে ছিল না, তিনি সাহিত্য-সম্পর্কে কম্যুনিষ্ট গোঁড়ামীর এখন একজন বড় বিরোধী। এখানে সংক্ষেপে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মত তুলে ধরা হলো। তাতে এরেনবুর্গ সম্পর্কে সাহিত্য রসিকজন খানিকটা আলোকিত হবেন বলে আশা করি।

পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদের চাইতে বর্তমান শতকের সাহিত্যিকদের লেখা কষ্টসাধ্য বলে তিনি মনে করেন। 'রাইটার এণ্ড হিজ ক্র্যাফট' বইটিতে একজায়গায় বলছেন; 'আমাদের চাইতে আমাদের প্রবীণ পুরোগামীদের পক্ষে লেখা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল কারণ তাঁরা এমন একটি সমাজের বর্ণনা দিয়েছেন যার পরিবর্তন অত্যন্ত ধীরগতিতে হয়েছে।'

তিনি একই বইটিতে বলছেন, 'টলস্টয়, টুর্গেনিভ, গোন্চারভ ও চেকভ তাঁদের নায়কনায়িকার সেই অনুভূতি ও আচরণ পরিষ্কার জানতেন। কিন্তু সোভিয়েট লেখকদের পক্ষে তাঁদের দ্রুত পরিবর্তনশীল সঙ্গীসাথীদের ভাবধারা ও অনুভূতি উপলব্ধি করা কষ্টসাধ্য। সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজের চিত্রাঙ্কন বা কেবলমাত্র বর্ণনা দেওয়া আর যে-সমাজ ইতিহাসে অভূতপূর্ব যার সংগঠন এখনো চলছে ও সেই সংগঠনে লেখককে-ও অংশ নিতে হচ্ছে, সেই সমাজের চিত্রাঙ্কন অতুলনীয় এ দুয়ের তুলনা হয় না।'

তাঁর মতে 'পরিকল্পনা মতো সাহিত্য-সৃষ্টি কালে-ও আমরা যেন মানুষটিকে—ভাবপ্রবণ অনুভূতিময় গোটা মানুষটিকে না ভুলি।'

এরেনবুর্গ উপন্যাস লিখলে-ও সমালোচনাতে-ও তাঁর অধিকার বিষয় মহলে স্বীকৃত। তিনি উপরিকথিত বইটিতেই বলছেন, 'দুর্ভাগ্যবশত, আজো আমাদের প্রথম শ্রেণীর সমালোচক খুব কমই আছেন। সাহিত্যিক পরিকল্পনা-ও কম।' এবং এ তাঁর উক্তিটি-ও চিন্তাযোগ্য : 'ঔপন্যাসিকের শিল্প-নৈপুণ্য যে সমাজে তিনি বাস করেন, তা দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হয়। আমি কোন কোন সমালোচকের এসব কথা বুঝতে পারিনে যখন তাঁরা বলেন, অমুক লেখক জলপাই ডুমখাল, বস্ত্রশিল্প অথবা শান্তির জন্যে সংগ্রামের কথা না লেখার অপরাধ করেছেন। অন্তরের প্রেরণা না পেয়ে যদি কেউ বই লেখেন, সে-বই না লিখলে-ও তাঁর বেশ চলে

যেত, সে-বই লেখার জন্য তাঁকে তৎসনা করা কি আর-ও ভাল নয়? শিল্পোৎপাদনে পরিসংখ্যানের স্থান আছে, সাহিত্যে তার কোন স্থান নেই। একশ বাজে উপন্যাসের চাইতে একটি ভাল উপন্যাসের মূল্য অনেক বেশি।'

এরেনবুর্গ আরো যখন বলেন, 'এমন লেখক কমই আছেন যাঁর স্বাতন্ত্র্য নেই, এবং সব বিষয়ে যিনি এমন উদাসীন যে, তাঁকে বলে দিতে হবে তিনি কি বিষয়ে লিখবেন। এমন বই কে চায়, যে-বই লেখকের আবেগসঞ্জাত নয়, যে-বই কোন পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের নির্দেশপ্রসূত?' তখন আমাদের চোখের সামনে বাংলাদেশের সাহিত্যের চিন্তাদৈন্যের ঘোরতর অন্ধকার যদি ভাসে তবে তাতে আমরা আশ্চর্য হব না।

এরেনবুর্গের উপরের উদ্ধৃত কথাগুলো ভাববার মতো। অত্যন্ত মুক্তচিত্তে তিনি কথাগুলো বলেছেন। তার মতে সোভিয়েট লেখক সঙ্ঘের সেক্রেটারী সুরকভ তাঁকে ছেড়ে কথা বলেন না। সুরকভ এরেনবুর্গের সম্পর্কে বলেন, তিনি হলেন Suicides of Socialist Realism-এর একজন। তিনি যা লেখেন, তাই নাকি সুরকভের মতে 'Paradoxical Rubbish.'

১৯৫৮ সালে একজন জার্মান সাংবাদিকের সঙ্গে এরেনবুর্গের তাঁর মস্কোস্থিত ভবনে সাক্ষাত হয়। সাক্ষাতের বিবরণী ও বছরেই 'এনকাউন্টারে'র অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সে বিবরণীতে এরেনবুর্গের চিন্তার স্বাতন্ত্র্য ও বুদ্ধির দীপ্তি ঝলমল্। সংক্ষেপে এরেনবুর্গের কিছু মতবা তুলে দিলাম জিজ্ঞাসু সাহিত্য পাঠকদের জন্য।

পাস্টেরনাক সম্পর্কে তিনি বলেন, 'He is the most egocentric person I know, but not unpleasantly so, just like a child, and certainly it does not detract from his qualities as a writer. He is one of the greatest living poets in the world. Even his prose is always poetic, always not quite in the ground, but it is always great prose, full of poetic images.'

ইলিয়া এরেনবুর্গের মতে সোভিয়েট সাহিত্যের তিনটি স্তর আছে। একটি হলো, ১৯১৭ সালে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার পাঠকগণ ছিলেন বলতে গেলে প্রাকবিপ্লব কালের মতই। অর্থাৎ সাহিত্য পাঠক ছিল সীমিত এবং সাহিত্য রচিত হতো যেন শুধু বুদ্ধিজীবী বিদগ্ধ পাঠকদের জন্য। দ্বিতীয়টি হলো, কিছুদিন পরে আস্তে আস্তে নূতন পাঠক তৈরীর দিকে নজর গেল। ফলে কঠিন জটিল ভাষায় এবং ভাবে সাহিত্যরচনার বদলে সরল ও সাবলীল ভঙ্গি দেখা দিল। তৃতীয়টি হলো এখন স্তর, যে স্তরে পাঠক তৈরী হয়েছে এবং বিচার বিবেচনা করার যোগ্য অধিকারী পাঠক।

সোভিয়েট লেখক সংঘের মুখপত্র 'The Literaturnaya Gazeta' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এরেনবুর্গ বলেন, 'What the Literatur naya Gazeta write is not necessarily the last word.... As you see I am alive. What the officials say or do is not necessarily the most important question. Life has many sides. Of course, socialism must be constructed but the house of socialism has many mansions. Some people build hotels like the Ukraine or the Leningrad, and they build them with the best of intentions because they believe that this is the sort of house that socialism needs. I am of a different opinion and I think they are dreadful. It has to be recognised that there are varieties of

temperament and taste. The superficial impression that many foreigners take away with them is deceptive. Some of them depict our country as a hell, others as a paradise. Both descriptions are flat, without depth or relief··· Literature is not the province of officials and of the Writers' Union alone.'

এই ৭০ বছরের বৃদ্ধ সাহিত্যিক এখনো মনে প্রাণে তরুণ। তাঁর তারুণ্য তাঁকে ক্লান্ত হতে দেয় নি এবং সংগে সংগে ক্লান্ত হন নি তাঁর পশ্চিমী ও স্বদেশীয় সমালোচকরা। তাঁর তারুণ্য যেখানে একলা চলার পথ নিয়েছে, সেখানে আর সবাই যুথবদ্ধতায় সে তারুণ্যকে আক্রমণ করছে। কিন্তু এ আক্রমণ এবৃদ্ধকে কাবু করতে পারবে না। বৃদ্ধ নিজের জীবনে দেখেছেন জারের প্রতাপ এবং চালনা করেছেন নিজেকে বিদ্রোহে, দেখেছেন লেনিনের পরিচালনায় রাশিয়ার বিপ্লব, দেখেছেন চোখের সামনে প্যারিসের বুকে হিটলারি পৈশাচী কাণ্ড কারখানা, দেখেছেন হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেছেন, দেখেছেন স্ট্যালিনকে। অভিজ্ঞতায় বৃদ্ধ চিরসৈনিক মনেপ্রাণে তরুণ এরেনবুর্গ আজো বহু বরে বন্ধার সৃষ্টি করে চলেছেন।

স্রষ্টা ও সৃষ্টি

বিশ্ববিশ্রুত লেখক এডগার অ্যালেন পো বসেছেন কবিতা রচনা করতে। খুব করুণ সুরের একটি কবিতা লিখেছেন তিনি, তার প্রতি শব্দে যেন জীবনের বিষণ্ণতা ফুটে ওঠে।

কি সেই শব্দ—সেই ধ্বনি—যার উচ্চারণ মাত্রেই স্নায়ুতন্ত্রীতে ঘা পড়বে!

সুরু হোল বিচিত্র অন্বেষণ।

খুঁজে পাওয়া গেল একটি ধ্বনি : ওর (Ore)।

কবিতার কয়েকটি কথা যেন অশনি ছেয়ে উঠল মনের মধ্যে : নেভার মোর (Never more)।

নায়িকার নামটিও আস্তে আস্তে রূপ নিল : লেনোর (Lenore)

সৃষ্টি হোল প্রসিদ্ধ কবিতা 'দি র‍্যাভেন' (The Raven)।

কবিরা হলেন শব্দযোগী, একটি যথার্থ কথার জন্য তাঁরা তপস্যা করেন।

সমাজ ও সাহিত্য

সাহিত্য সম্মেলন ॥

নারায়ণ চৌধুরী

প্রতি ইংরেজী বৎসরান্তে, বড়দিনের ছুটিতে, সাহিত্যের কতকগুলি সম্মেলন হওয়া রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে। এই বৎসরেও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। এই উপলক্ষ্যে সাহিত্যামোদী মহলে সঙ্গত কারণেই উৎসাহ দেখা দেয়। এই বৎসরের সম্মেলন সাহিত্যামোদীদের নিকট আরও মনোযোগের কারণ হয়েছে এই জন্য যে, এবারকার নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন খাস কলকাতা শহরেই অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তা অনুষ্ঠিত হয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিপূত রবীন্দ্র-ভারতী ভবনে। বাইরে থেকে আগত এবং কলকাতার প্রতিনিধিবর্গ মিলে প্রায় পাঁচশত জন—সাহিত্যিক, সাহিত্যামোদী ও সাহিত্য-সংশ্লিষ্ট তিন শ্রেণীর মানুষই তাঁদের মধ্যে ছিলেন—সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। তিন দিনের সম্মেলনে, সকালে-বিকালে, কয়েকটি শাখার অনুষ্ঠান মিলে অনেকগুলি অধিবেশন হয়।

বৎসরে একবার করে এই-জাতীয় সম্মেলনের উপযোগিতা আমরা স্বীকার করি। এতে পরস্পরের মধ্যে দেখা-শোনা, জানা-চেনার সুযোগ উন্মুক্ত হয় এবং ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্র প্রশস্ততর হয়। এতে লেখকদের মধ্যে যে সামাজিকতার পিপাসা রয়েছে, সেটি পরিতৃপ্ত হয়। লেখকগণ সারা বছর লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, একমনে সাহিত্য সাধনা করেন—ওই সময়ে তাঁদের পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ খুব কমই হয়। বিশেষতঃ যে-সকল লেখক বাইরে একে অন্যের থেকে দূরে থাকেন, তাঁদের পক্ষে পরস্পর সম্মিলিত হওয়ার কোন সুযোগই মেলে না। বাৎসরিক সাহিত্য সম্মেলন সেই প্রার্থিত সুযোগটি এনে দেয় লেখকদের হাতের মুঠোয়। এই দিক দিয়ে সম্মেলনের যে একটি বিশেষ সার্থকতা আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

তবে এবিষয়ে একটি কথা আছে। সাহিত্য সম্মেলন আহ্বানের নামে সামাজিকতার চর্চাটাই যেন সম্মেলনে বড় না হয়ে ওঠে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। এ-জাতীয় সম্মেলনের এক শ্রেণীর প্রতিনিধির কাছে সামাজিকতার সুযোগটাই সম্মেলনে যোগদানের মুখ্য প্রেরণা বলে মনে হয়; সাহিত্য তাঁদের নিকট গৌণ ব্যাপার। এরকম হওয়া উচিত নয়, বলাই বাহুল্য।

সম্মেলনের মাধ্যমে আরও একটি কাজ হয়। সম্মেলনের মূল সভাপতির ভাষণে এবং বিভিন্ন শাখা-সভাপতিদের ভাষণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গত এক বছরের একটি হিসাব-নিকাশের ধারণা পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি অর্থাৎ সাহিত্যের হাওয়া কোন্ দিকে বইছে তা নিরূপণ করবারও একটা ভিত্তি মেলে। এর দাম যথেষ্ট। খতিয়ে দেখতে গেলে, উপরে কথিত সামাজিকতা অপেক্ষা এর মূল্য অনেক বেশী। এর থেকে সাম্প্রতিক সাহিত্যের ধারা-ধরনের একটা মোটামুটি আন্দাজ পাওয়া যায়। এই আন্দাজ আশাব্যঞ্জকও হতে পারে আবার নৈরাশ্যজনকও হতে পারে কিন্তু আন্দাজ যে পাওয়া যায় সেইটেই আসল কথা। সম্মেলনের সামাজিক উপযোগিতা লেখক ও প্রতিনিধিবর্গের নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, আর এই বাৎসরিক সাহিত্য-মূল্যায়নের তাৎপর্য সারা দেশের নিকট।

এবারকার মূল সভাপতির ভাষণে বর্ষীয়ান কবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় মহাশয় সমকালীন বাংলা সাহিত্যের পরিস্থিতি বেশ বিস্তৃতভাবেই বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণের মধ্যে যথোচিত উদার দৃষ্টি,

গুণগ্রাহিতা ও সাহিত্যপ্রীতি এই তিনটি লক্ষণ বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সাহিত্যের পুরাতন ধারা ও নবীন ধারা এই দুই ধারার অনুবর্তী লেখকদেরই তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্য ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে বলে তাঁর মনে হয়েছে। বর্তমান যুগের কথাসাহিত্যিকদের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—'ইঁহারা সমাজের সোপান বাহিয়া নামিতে নামিতে নিম্নতর স্তর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছেন। ফলে সর্ববিধ দুর্গতি, দুর্দশা, দুর্মতি, ঘৃণ্যতা, অনুচিতা, কুশ্রীতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে ইঁহাদের। সেজন্য যথেষ্ট সহনশীলতা, ক্ষমা, ধৈর্য, উদারতা, সহৃদয়তা ও দরদের প্রয়োজন হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত দুর্গতের মূক মুখে ভাষা দিতে ও শুষ্ক বুকে আশার সঞ্চার করিতে হইয়াছে। ইঁহাদের কেহ কেহ বীভৎসতাকেও রসে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইঁহারা শুধু সৃষ্টিমূলক কল্পনার উপর নির্ভর না করিয়া প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়াছেন। ফলে ইঁহাদের সৃষ্ট চরিত্রগুলি ভাব-বিগ্রহ নয়, রক্ত-মাংসের জীবন্ত মানুষ। ইঁহাদের সৃষ্টির স্থানকালপাত্রগত পরিধিও ঢের বাড়িয়া গিয়াছে। ভৌগোলিক পরিধি বাংলার সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। কালগত সীমা অতীতের নানা যুগে চলিয়া গিয়াছে—আর পাত্রগত পরিধি সর্বশ্রেণীর মানুষকে বলয়িত করিয়াছে।'

বাংলার সমকালীন কথাসাহিত্যের এই মূল্যায়নের মধ্যে মূল সভাপতি মহাশয়ের যথেষ্ট উদারতা ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় মেলে সত্য, কিন্তু আমরা তাঁর তুয়োজ্ঞান ও বিচারপরায়ণতার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা রেখেই বলব, এতে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের আংশিক পরিচয় মাত্র প্রকটিত হয়েছে, সম্পূর্ণ পরিচয় প্রকটিত হয় নি। বাংলা কথাসাহিত্যের একশ্রেণীর লেখকের রচনায় যে উচ্ছৃঙ্খল অসংযত মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, এবং যে উন্মার্গগামিতার আচরণটিকে বাহবা দেবার মত সমালোচকেরও আজ অভাব নেই আমাদের দেশে, সাহিত্যের এই দুর্লক্ষণটিকে রায় মহাশয় যেন দেখেও দেখেন নি এমি ভঙ্গিমায় কথা-সাহিত্যের ঢালাও প্রশংসায় তাঁর লেখনী অবারিত হয়েছে। এ সাহিত্যের প্রতি দায়িত্ব পালন নয়, ভাল-মন্দ নির্বিশেষে সকলকেই পিঠ-চাপড়ানোর নির্বিচার প্রীতি থেকে এর উদ্ভব। অপ্রবীণ বা তরুণ বয়সী কথাসাহিত্যিকদের প্রতি স্নেহ থাকা ভালো, কিন্তু সেই স্নেহের অনুশীলনে কোথাও না কোথাও হাড়ি টানতে হয়ই। সমাজের ঘাতে সুস্পষ্ট ক্ষতি, পাঠকসমাজের একাংশের যেখানে বিপথে চালিত হওয়ার সম্ভাবনা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, সেখানে স্নেহের সামগ্রিক কল্যাণের কথা চিন্তা করেই অপরিমিত স্নেহচর্চার রাশ কথঞ্চিৎ পরিমাণে টেনে ধরা দরকার।

আমাদের দেশের প্রবীণবয়সী সমালোচকদের মধ্যে এক ধরনের মানুষ আছেন যাঁদের চোখে এ-ও ভালো, তা-ও ভালো। কোন উপলক্ষেই তাঁরা নিন্দা-মন্দ উচ্চারণ করবেন না এমি সুদৃঢ় পণ করে বসে আছেন। যে-সব সাহিত্য প্রচারের ফলে সমাজের অশেষবিধ ক্ষতি হতে পারে সে-সব ক্ষেত্রে এই সকল রচনার সমূহ অনিষ্ট-সম্ভাবনার কথা জেনেও তাঁরা চুপ করে থাকেন অথবা মুখে হাসি টেনে সে সকল রচনার তারিফ করেন। এর মূলে আর কিছুই নয়, রয়েছে: সর্বজনপ্রিয় হবার আকাঙ্ক্ষা, ফলত নির্বিশেষে সকল স্তরের সাহিত্যিকবর্গের নিকট ভালো মানুষ রূপে নাম কেনার দুর্বলতা। সাহিত্য সর্বসাধারণের উপভোগের বিষয়, সুতরাং সাহিত্যের বিচার ক্রিয়াও সাধারণ সাহিত্যধর্মের মানদণ্ডেই নিষ্পন্ন হওয়া উচিত। তার মধ্যে ব্যক্তি-সম্পর্কের আবিলতা যত কম প্রবেশ করে ততই মঙ্গল।

সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্যের এই নৈরাজ্যবাদী অসংযমের দিকটি সম্পর্কে আমরা সাবধান বাণী ঘোষণার প্রয়োজন বোধ করতুম না যদি মেনে নিতুম এটি বর্তমান কথাসাহিত্যের মুষ্টিমেয় লেখক-

প্রতিনিধিত্বেই একটি বাসন মাত্র, তাঁদের এই বাসনের ছাপ পাঠকসমাজের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, জনমন এই প্রভাবের বিষক্রিয়া থেকে মুক্ত। কিন্তু ব্যাপার তা নয়। ইতোমধ্যেই এই অপসাহিত্যের পরিব্যাপ্তকীর্তি ও বিস্তৃতি যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ সৃষ্টি করেছে, এবং যে কথা একটু আগে বলেছি, এক শ্রেণীর সমালোচক ও দলবিশেষ কর্তৃক এই-জাতীয় রচনাদর্শ অভিনন্দিত হওয়ায় তার অনিষ্টকারিতা আরও বহুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে সমাজ-কল্যাণকামী ব্যক্তিমাত্রকেই রীতিমত ভাবিত করে তুলেছে। এই অপসাহিত্যের প্রচার-প্রসারকে এখন আর কিছু নয় বলে উড়িয়ে দেবার যো নেই।

কাজেই সাহিত্যজগতের ধারা-ধরন সম্পর্কে সবিশেষ অভিজ্ঞ কোন শ্রদ্ধেয় সাহিত্যসেবী যখন সমকালীন বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করতে বসে ওই চেষ্টার সূত্রে সাহিত্যের খতিয়ান রচনা করেন, তখন আমরা তাঁর ক'ছ থেকে এইটেই প্রত্যাশা করব যে তিনি সাহিত্যের শুভ দিকটির প্রতি যেমন সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন তেমনি অশুভ দিকটি সম্পর্কে অঙ্গুলিনির্দেশ করে পাঠকসমাজকে সচেতন করে তুলতেও পশ্চাৎপদ হবেন না। সাহিত্যের একজন প্রবীণ ব্যক্তি হিসাবে এ তাঁর কর্তব্য এ তাঁর দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে ত্রুটী ঘটলে সাহিত্যের বিচারক্রিয়ারও ত্রুটী অবশ্যম্ভাবী। এরকম একতরফা বিচারে সমাজের হিত অপেক্ষা অহিতেরই সম্ভাবনা বেশী।

সভাপতি মহাশয় যে বলেছেন 'ইঁহাদের কেহ কেহ বীভৎসতাকেও রসে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন', তিনি সে কথা কাঁদের রচনা মনে করে লিখেছেন? দু'একটি দৃষ্টান্ত দিলে আমাদের পক্ষে তাঁর বক্তব্য অনুধাবন করা সহজ হত। তিনি জিনিসটাকে ধামাচা রাখায় বস্তুতঃ কোন-কিছুই প্রতিপন্ন হয় নি। আমাদের তো অভিজ্ঞতা বরং অন্যরকম। আমরা দেখছি, একাধিক লেখায় বীভৎসতাকে শুধু কচলানোই সার হচ্ছে, তা থেকে রসের কোন মূর্তি দানা বাঁধছে না। রস নামে যা পরিবেষিত হচ্ছে তা আসলে রসের গাঁজলা, পরিচ্ছন্ন শিল্পরসের সঙ্গে সে বস্তুর নামগন্ধ সম্পর্কও নেই। অবশ্য এই রকমের অপরসের এক প্রধান তাত্ত্বিক রায় মহাশয় কি তাঁর কথা ভেবে কথাটা লিখেছেন? যদি লিখে থাকেন তো বলব, তাঁর সকলের মন জয় করবার চেষ্টা প্রায় হাস্যকরতার কোঠায় গিয়ে উপনীত হয়েছে।

অন্যপক্ষে, আধুনিক কবিতা সম্পর্কে মূল সভাপতির বক্তব্য অবধান করুন। তিনি বলেছেন—'কবিগুরুর জীবদ্দশাতেই কয়েকজন শক্তিশালী কবি রবীন্দ্রজালের কুহক এড়াইয়া নবেন্দ্রজালের বিস্তার করিয়াছেন। এই নূতন ধারাকে আমি অভিনন্দিত করিয়েছি। শতাধিক কবি এই নূতন ধারায় কবিতা লিখিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের পর অল্পদিনের মধ্যে কবিতার অভিনব ধারার প্রবর্তন ও প্রতিপত্তি হইবে ইহা আমরা কল্পনা করি নাই।

এই বাক্যসংক্তিগুলির মধ্যেও নূতন ধারার কবিদের খুশী করবার মনোবৃত্তি অতি পরিস্ফুট। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সর্বাত্মক প্রভাব থেকে দূরে থেকে স্বতন্ত্র ধারায় কাব্যরচনা করে যাঁরা কবির জীবদ্দশায় খ্যাতিলাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও কাজী নজরুল ইসলাম। এর পর প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ কবির কবিতার মধ্যে একটা নতুন সুর, নতুন তন্ত্রীর দ্যোতনা আমরা লক্ষ্য করেছিলাম, যাতে বাস্তবিকই বৈচিত্র্যের স্বাদ পাওয়া গিয়েছিল। তার পরই অভিনবত্বের নেশায়, একটা 'নতুন কিছু করোর' তাড়নায় বাংলার সমসাময়িক কাব্য-সাহিত্যের এলাকায় এমন একটা ন্যাপাদির হাওয়া এল, যার ঝাপটে বাংলা কাব্যের পূর্বতন শুভ সংস্কার ও ঐতিহ্যাশ্রিত মূল্যবোধ ভেঙে যাবার উপক্রম হল। অর্থহীনতা ও দুর্বোধ্যতা আধুনিক বাংলা কবিতার গোত্রলক্ষণ হয়ে উঠল। বিদেশীয় কাব্য-কলার আঙ্গিক, রীতি-প্রকরণ, রূপকল্প ইত্যাদির বহুল অনুকরণ করতে গিয়ে নতুন

ধারার কবিরা দেশীয় কাব্যসংস্কার থেকে এতটাই বিযুক্ত হয়ে পড়লেন যে তাঁদের অনেকের কবিতাকে এক অক্ষরমালার সাদৃশ্যলক্ষণ ছাড়া বাংলা কবিতা বলে চেনার উপায় রইল না। আধুনিক বাংলা কবিতা নামধেয় রচনাগুলিতে নৈরাজ্য, অদ্ভুতত্ব, উচ্ছৃঙ্খলতা মূর্তি পরিগ্রহ করল।

এই নতুন ধারার কবিতাকেই কিনা কবিশেখর কালিদাস রায় 'অভিনন্দিত করিতেছি' বলিয়া সার্টিফিকেট জারি করেছেন? এটা কি তাঁর মনের কথা, না কি মূল সভাপতির উচ্চমঞ্চে আরূঢ় হয়ে তিনি কাউকেই চটাবেন না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন? এই যদি তাঁর অন্তরের কথা না হয় তবে প্রকাশ্যে আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্য তত্ত্ব ও তদ্রোধিক দুর্বোধ্য ভাষের সমালোচনা করার সংসাহস তাঁর নেই কেন? আধুনিক কবিদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর স্নেহভাজন ও প্রীতিভাজন। স্নেহভাজন বা প্রীতিভাজনদের বিরুদ্ধে অপ্রিয় সত্য বলতে ইতস্তত করা খুবই স্বাভাবিক, বিশেষতঃ একান্ত পরিণত বয়সে ভাল-মন্দ নির্বিশেষে সকল বস্তুর প্রতি একটা সমদৃষ্টির প্রবণতা নাকি জন্মায়। কিন্তু ওই সমদৃষ্টি কি সত্যদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে না? তা যদি হয় তো বলব, এক্ষেত্রে বার্ধক্যোচিত স্নেহ জয়ী হয়েছে, ক্ষমা জয়ী হয়েছে, কিন্তু বিচার জয়ী হয় নি। স্নেহের কোমলতার তলায় সত্যের অপক্ষপাত কাঠিন্য চাপা পড়েছে। যেখানে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের মঙ্গলামঙ্গল নিয়ে প্রশ্ন, নবীন কবিযশোপ্রার্থীদের সামনে একটি সুস্থির কাব্যাদর্শ রেখে তাঁদের যথাযথ পথে চালিত করবার প্রশ্ন, সেক্ষেত্রে স্নেহ বা ক্ষমাপ্রভাবিত ভালোমানুষীর কোন অর্থ হয় না। এই রকম ক্ষেত্রে নিষ্করুণ নিরপেক্ষতার অনুশীলনেই সঠিক মঙ্গল নিহিত। ব্যক্তিগত সম্পর্ক লালিত অপরিমিত স্নেহের চর্চায় সাহিত্যের হিত অপেক্ষা অহিতই হয় বেশি।

বরং কাব্য শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় তাঁর ভাষণে আধুনিক বাংলা কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রকৃত গলদের স্থানটিতে তাঁর অভ্রান্ত হস্ত রক্ষা করেছেন দেখতে পাই। আধুনিক কবিদের খুশি করবার জন্যে তিনি মন-রাখা কথা বলেন নি, উচিত কথাই বলেছেন। তিনি বলছেন—'আজকাল যে কোনও সাময়িক পত্র, বিশেষ করিয়া একান্ত ভাবে কবিতার নামে উৎসর্গিত পত্রিকা খুলিলেই কবিতা শিরোনামায় বহু বিচিত্র বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় যাহার কোনটি পাটিগণিত, কোনটি ইতিহাস, কোনটি গল্পনিবন্ধ, আবার কোনটি বিজ্ঞাপনের খাতে প্রকাশিত হইলেই সঙ্গত ও শোভন হইত। ইহার মধ্যে জাল ও ভেজালের সংখ্যাই বেশি।'

ভাষণের উপসংহারে তিনি আরও বলছেন, 'নকলকে ফাঁকিকে লোকে স্বভাবতঃই অনুকরণ করিতে চায়। কঠিন এবং দুরূহকে এড়াইতে গিয়া বাংলাদেশের তরুণ সম্প্রদায় কাব্যের নামে এই যে নিশ্চিত মূঢ়তার উপাসনা করিতেছেন এবং একটা ভ্রান্ত সহজিয়া কাণ্ড খাড়া করিয়া সেই সূত্রে সকলকেই দীক্ষিত করিতে চাহিতেছেন, তাহাতেই আশঙ্কান্বিত হইয়া সাবধান বাণী উচ্চারণ করিতেছি।'

মূল সভাপতি এবং কাব্য শাখার সভাপতি দুজনাই সুপরিচিত কবি, অথচ তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কত পার্থক্য! কেন এরকম পার্থক্য হয় সেটি সকলেরই ধীরচিত্তে অনুধাবন করে দেখা দরকার। সাহিত্য বা অন্য যে-কোন প্রকারের সম্মেলনের উচ্চমঞ্চে আরূঢ় হলে সেই সভাধিকারীর উপর অনেকগুলি বাহ্যিক বর্তায় নিঃসন্দেহ, কিন্তু এ বিষয়েও কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে, উচিত স্থানে সমালোচনার দায় এড়ানো সেই দায়িত্ব সমূহের অন্যতম নয়।

তবু যা হোক মূল সভাপতি মহাশয় তাঁর অভিভাষণের শেষাংশে কিঞ্চিৎ হক্ কথা বলবার প্রয়াস করেছেন। কথাগুলি ভালো লাগল। তিনি সাহিত্যিকদের উদ্দেশে আবেদন জানিয়ে বলেন—'এই সম্মেলনে

জাতিকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও দেহমনে প্রকৃতিস্থ করিয়া আপনাদেরই গড়িয়া তুলিতে হইবে। কেবল নরনারীর বিশেষ করিয়া যুবকযুবতীর অবসর কাল বিনোদনের উপচার যোগানো সাহিত্যের যদি ব্রত হয়—তাহা হইলে সাহিত্যের যে কোন অঙ্গকল্পের দ্বারাই তাহা সাধিত হইতে পারে। তাহাতে সাহিত্যিকদের মর্যাদা হারাইয়া বাণিকরের পর্যায়ে নামিয়া যাইতে হইবে। পাঠক পাঠিকাদের রুচিপ্রবৃত্তির আনুগত্য না করিয়া তাহাদের রুচিপ্রবৃত্তির সংস্কার সাধন আপনারাই করিতে পারেন।'

এটি খোঁচা কথা। তবে এই সতর্কবাণী ভাষণের একবারেই সমাপ্তির দিকে উচ্চারিত হয়েছে। আধুনিক সাহিত্যের বিচার-ক্রিয়ায় এটি যদি বিচারের মূল সূত্র হত তবে ভাষণটি আরও অনেক সারগর্ভ হতে পারত।

মূল সভাপতি মহাশয়ের আরও একটি কথার প্রতি আমরা পাঠক পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তিনি তাঁর সুবিস্তৃত ভাষণের এক জায়গায় বলেছেন যে, বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির পক্ষে সাহিত্যের উপর সরকারের 'কৃপাদৃষ্টিই' যথেষ্ট নয়, 'কৃপাবৃষ্টি'ও সমপরিমাণে দরকার। এই কথা দুটি আজকের দিনের চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে একেবারেই বেমানান। এই কথাদুটির মধ্যে যে আত্মমর্যাদার অভাব নিহিত আছে, যে ভিক্ষাবৃত্তির মনোভাব ফুটে উঠেছে, তা সর্বথা ধিক্কারযোগ্য। আমরা ঠিক এর উল্টো কথাই বলব। আমরা বলব, সাহিত্যের উপর আমরা সরকারের 'কৃপাবৃষ্টি' তো চাইই না, বরং সাহিত্যের উপর থেকে তাঁদের কৃপাদৃষ্টিটুকু সরিয়ে নিলে সমধিক খুশি হই। কৃপাদৃষ্টি বর্ষণের নামে সাহিত্যের উপর সরকারী হস্তক্ষেপজাত প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের আমরা ঘোরতর বিরোধী। এর দ্বারা সাহিত্যের স্বতন্ত্র মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, তা অন্ত দশটা ব্যাপারের মত সরকারের অভিপ্রায় পূরণের একটি যন্ত্রমাত্রে পর্যবসিত হয়। এই লক্ষণ ইতিমধ্যেই প্রকট হয়ে উঠেছে, আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে লক্ষ্য করছি। কংগ্রেস সরকারের হাত থেকে পুরস্কার লাভের বিনিময়ে স্বধর্মচ্যুত হয়ে কংগ্রেসের জয়গান করবার একটা মাত্রাতিরিক্ত আকুলতা কোন-কোন ক্ষমতালোলুপ লেখকের মধ্যে দৃষ্টি-গ্রাহ্য ভাবেই চোখে পড়েছে। সরকার পুরস্কার দিয়ে অথবা পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে প্রকারান্তরে এদের বিবেক কিনে নিচ্ছেন। 'প্রকারান্তরে' বললাম এইজন্য যে, ঠিক যে জ্ঞাতসারে সরকার এই কুট অভি-প্রায়ের দ্বারা চালিত হয়ে লেখকদের বশীভূত করবার চেষ্টা করছেন তা নয়, তবে তাঁদের কাজের সাকুল্য ফল তা-ই দাঁড়াচ্ছে। তাঁদের পৃষ্ঠপোষণের দ্বারা তাঁরা লেখকদের জ্ঞানিত বা অজ্ঞানিত ভাবে আপনাদের শিবির-ভুক্ত করে ফেলছেন। পোষণের ঋণ শোধ করতে গিয়ে লেখকেরা তোষণের অভিমুখে ঝুঁকে পড়েছেন।

এ সব প্রক্রিয়া মূল সভাপতি মহাশয়ের লক্ষ্য করবার কথা নয়। তিনি সাবেকী ধ্যান-ধারণার মানুষ, আধুনিক রাষ্ট্রের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সংহারকারী স্বরূপের খবর তিনি কেমন করে রাখবেন? আধুনিক রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী প্রভাব ইদানীং শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও আত্মপ্রসারশীল হয়ে উঠতে চাইছে। এ শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্র, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এই লক্ষণ প্রকট। এই লক্ষণ সম্বন্ধে অবহিত না থাকলে রাষ্ট্রকে শিল্প-সাহিত্যের উপকারী ভেবে তার কাছে নতি স্বীকার করার আকুলতা বোধ করা স্বাভাবিক, যেমন শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় বর্তমান ক্ষেত্রে করেছেন। এতে যে-কোন তথাকথিত কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের প্রকৃত রূপ সম্পর্কে অচেতনতারই শুধু প্রমাণ মেলে। আগের কালে সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক রূপে রাজা-মহারাজা-জমিদারের ভজনা করা হত, এখন রাজা মহারাজা জমিদার নেই, তাই সরকারের কৃপাদৃষ্টির জন্য ধরনা দেওয়া হচ্ছে। দিন পালটেছে, কিন্তু দীনতার মনোভাব সেই একই আছে। সরকারের উপর একান্ত নির্ভরশীলতা ঘোষণা করে সাহিত্যের প্রতিনিধিস্থানীয় মাত্র ব্যক্তি সর্বসমক্ষে নিজেদের অসহায়তা প্রচার করছেন। যেন বাংলা সাহিত্য কোনকালেই নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবে না, কখনও রাজা-জমিদারদের কখনও তাঁদের স্থলাভিষিক্ত বর্তমান জাতীয় সরকারের পিছে-পাড়ী হয়ে থাকবে। বাংলা সাহিত্যের মত একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্যযুক্ত গৌরবান্বিত সাহিত্যের পক্ষে এ আশার বা সন্তোষের কথা নয় আদৌ।

———

ভারত-প্রেমিক

আগাথা ক্রীষ্টি।

অনেক আশা আর আকাঙ্ক্ষার বুক বেঁধে সারাজীবন অক্লান্তভাবে লেখালেখির পরও যাঁরা লেখক হিসেবে স্বীকৃতি পান নি—সাহিত্যজগতে সে রকম ব্যক্তির অভাব নেই। এমনকি যোলকর সংখ্যায় তাঁদের বলই ভারী। আবার আর একদল দেখা যায়, লেখক হিসেবে নাম-ডাক-প্রতিষ্ঠা হবে এরকম আগে কোনো আশা বা বাসনা হয়তো ছিল না, কিন্তু ঘটনাক্রমে এক-আধটা লিখে ফেলবার পর অকস্মাৎ তাঁর লেখার জন্য পাঠক ও প্রকাশক সমানভাবে আগ্রহশীল হয়ে উঠলো। সে ব্যক্তিকে তখন হয়তো বাধ্য হয়েই আর একটা কিছু লিখতে হ'লো। তারপর আবার আর একটা। তারপর এক সময় দেখা গেলো লেখাই তাঁর পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। লেখাই জীবনের প্রধানতম কাজ হয়ে পড়েছে। এ শতাব্দীর প্রখ্যাত ডিটেকটিভ উপন্যাসের লেখিকা আগাথা ক্রীষ্টি এই শেষোক্ত দলের।

আগাথার (Agatha Mary Clarissa Christie, born in 1891) বাবা মারা যান খুব অল্পবয়সে। ভাই বোনদের মধ্যে উনিই ছিলেন সবার ছোট, তার ওপর ছিল ঠাণ্ডার ধাত, একটুতেই সর্দি-কাশি লেগে যেতো। তাই তাঁর মা ঠিক করলেন, স্কুলে না পাঠিয়ে বাড়িতেই মেয়েকে লেখাপড়া শেখাবেন। শুধু ঠিক করা নয়, নিজে তার দায়িত্বও নিলেন। মায়ের তত্ত্বাবধানে একেবারে বাল্যবয়স থেকে বাড়িতে বসে পড়াশুনো শুরু করেছিলেন আগাথা। বইপত্রের বাঁধাধরা পড়াশুনো ছাড়াও মায়ের মুখ থেকে নিত্য নূতন গল্প শুনতেন আগাথা। বাড়িতে সবার ছোট, সঙ্গী সাথী বলতে ছিল না কেউ। তাই আগাথা তাঁর একটি আত্মকথামূলক রচনায় লিখেছেন যে একেবারেই বালিকা বয়স থেকেই মনে মনে গল্প রচনা করবার চেষ্টা করতেন। সময় কাটাবার এবং নিঃসঙ্গ বাল্য ও কৈশোর সরগরম করে তুলবার জন্য এইটেই সে সময় ওঁর একমাত্র খেলা ছিল বলা যায়।

আগাথা যখন কিশোরী বয়সের—ওঁর মা যদিও তখন থেকেই ওঁকে অনুপ্রাণিত করবার চেষ্টা করেছেন কাগজ কলম নিয়ে লেখা শুরু করবার জন্য, কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত মনে মনেই বল পান নি আগাথা। তাই লিখতেও আরম্ভ করেন নি। তবে পড়াশুনো, বিশেষ করে যেন বিদেশের ডিটেকটিভ উপন্যাস অবিশ্রান্ত পড়ে যেতে লাগলেন।

আগাথার খুব বাসনা ছিল গায়িকা হিসেবে খ্যাতি লাভের জন্য। তাই ওঁর মা প্যারিসের এক গানের স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু দেখা গেল ওঁর গলাটা ততো ভালো নয়। কাজেই নিরুৎসাহ হয়ে আগাথা গান শেখার ইচ্ছা ছিলেন।

তেইশ বছর বয়সে আগাথার বিয়ে হয়েছিল এক মিলিটারি অফিসারের সঙ্গে। তাঁর নাম ছিল কর্ণেল আর্চিবল্ড ক্রীষ্টি। চোদ্দ বছর পর এই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। কিন্তু লেখার জগতে আগাথা এখানেই তাঁর প্রথম স্বামীর পদবী ব্যবহার করেন। দু' বছর পর অর্থাৎ ১৯৩০ সালে আগাথা দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এই স্বামীর নাম ম্যাক্স ম্যালোয়ান।

এইবার লেখার কথায় আসা যাক। ১৯১৭ সালের কথা। তখন পঁচিশ বছর বয়স আগাথার। এটা হ'চ্ছে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। স্বামী কর্ণেল ক্রীষ্টি যুদ্ধের কাজে ফ্রান্সে রয়েছেন ক'বছর ধরে। আগাথাও

স্বামীর ছোট একটা শহরে হাসপাতালের কাজে ঢুকে পড়েছেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সুযোগ পেলেই ডিটেকটিভ নভেল পড়ার কাজ সমানে চলছে সেই কিশোরী বয়স থেকে। কাজেই অনেক সময়ই অনেক বিচিত্র চিন্তা মনের আনাচে কানাচে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে যায়। এই রকমভাবেই একদিন একটা 'প্লট' ওঁর মাথায় এসে গিয়েছিল। অবিলম্বে লেখা আরম্ভ করলেন আগাথা। লেখা অবশ্য আরো চার-পাঁচ বছর আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু সে সব লেখায় আগাথার কোনও নিজস্বতা ছিল না। অতি সাধারণ প্রেমের গল্প। যা'র কয়েকটা সাময়িক পত্রিকাতে প্রকাশিতও হয়েছিল। কিন্তু এবার একখানা আস্ত বই লিখে ফেললেন আগাথা—যে রচনায় ভবিষ্যতের আগাথা ক্রীষ্টির সমস্ত রকম বিশিষ্টতা বর্তমান। আগাথা এ বইয়ের নাম দিলেন "দি মিস্টিরিয়াস এ্যাফেয়ার্স এ্যাট স্টাইল্‌স্ ("The Mysterious Affairs At Styles.")

মহা উৎসাহে আগাথা ক্রীষ্টি তাঁর প্রথম ডিটেকটিভ নভেলখানা এক বিখ্যাত প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু সে পাণ্ডুলিপি অমনোনীত হয়ে ফেরৎ এলো কয়েকদিনের মধ্যেই। কিন্তু এতে হতাশ হ'লেন না আগাথা। আবার আর এক প্রকাশকের কাছে পাঠালেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁরাও ফেরৎ দিলেন। তারপর আরো কয়েক জায়গায় পাঠালেন কিন্তু তাঁরাও যথারীতি ফেরৎ পাঠাতে লাগলেন। এবার সত্যি নিরাশ হয়ে পড়লেন আগাথা ক্রীষ্টি। কারণ ঠিক লেখকা হিসাবে নাম-ধাম-খ্যাতি ইত্যাদির বাসনা না থাকলেও, লোকের মাথায় একখানা বই যখন লেখা হয়েই গেছে সে খানাকে ছাপার অক্ষরে দেখবার একটা আশা ছিল বই কি।

শেষপর্যন্ত আর এক প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে আগাথা ভুলেই গিয়েছিলেন তাঁর প্রথম বইয়ের পাণ্ডুলিপির কথা। এদিকে যুদ্ধ থেমে গেছে। স্বামী ফিরে এসেছেন ঘরে। পূর্বোদ্যমে সংসার নিয়ে ব্যস্ত আগাথা, এমন সময়, প্রায় এক বছর বাদে হঠাৎ প্রকাশকের কাছ থেকে একখানা চিঠি এলো—তাঁরা আগাথাকে দেখা করতে বলছেন এবং খুব শীগগির করে একদিন। দারুণ অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রকাশকের অফিসে এলেন আগাথা এবং সেইদিনই ওঁর বইখানা প্রকাশের জন্য চুক্তিবদ্ধ হলেন উনি। সঙ্গে সঙ্গে নগদ উপার্জন হ'লো, এমন কি এই প্রকাশক বড়ো শীঘ্র সম্ভব অন্য বইও চাইলেন।

শুরু হ'লো লেখা পূর্বোদ্যমে। অনেকগুলি ডিটেকটিভ নভেলই রচনা করেছেন আগাথা ক্রীষ্টি এর পর থেকে। যার মধ্যে অন্ততঃ দশখানা বইয়ের পাঠক সভ্যসমাজের সব দেশেই পাওয়া যাবে। Poirot Investigates; Peril At End House; Murder in the Calais Coach; Dead Man's Mirror; And there were none; The crooked House; A Murder is Announced; They came to Baghdad এবং Funerals are so Fatal.

ডিটেকটিভ নভেল লিখে প্রথম বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন কোনান ডয়েল। কোনান ডয়েলের Sherlock Holmes এর চরিত্রটি মানুষের মনে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে ডিটেকটিভ চরিত্র হিসেবে। আগাথা ক্রীষ্টির ডিটেকটিভের নাম Heronle Poirot। এই দু'টি ডিটেকটিভের ভেতর কোনটি বেশী বাস্তব এবং জীবন্ত এবং স্বাভাবিক তা' নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে এবং এখনো চলছে। কাজেই ডিটেকটিভ নভেল-এর লেখিকা হিসেবে আগাথা ক্রীষ্টি নিজের স্থান কতো সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, কোনান ডয়েলের সঙ্গে তাঁর তুলনা থেকেই তা' বোঝা যায়।

সুনীলকুমার নাগ

গ্রন্থ-পরিচয়

রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য : শিশিরকুমার ঘোষ। মিত্রালয়, কলকাতা বারো। দাম আট টাকা।

যেমন জীবনের সঙ্গে, ভালোবাসার সঙ্গে, তেমনি কাব্যের প্রসঙ্গে নদীর উপমা একটি প্রচলিত প্রয়োগ-রীতি। কাব্যের ক্ষেত্রে, অন্তত আমাদের দেশে, নদীর চিত্রকল্পটি রবীন্দ্ররচনা প্রসঙ্গে যতোটা সার্থক, এমন আর কার-ও নয়। নদীর তিনটি স্তর : প্রাথমিক-মাধ্যমিক-নিম্নমুখী, অবশেষে সমুদ্রে তার বিপুল বিস্তৃতি। রবীন্দ্র-রচনাবলীরও তিনটি বড়ো পর্যায় : রোমান্টিক-দার্শনিক-রিয়েলিস্ট। প্রথম পর্বের আবেগ-চাঞ্চল্য ও বহু-পিপাসা রেখার চূড়ান্ত বিদ্যুতে উপনীত হয়ে মিস্টিক চেতনাকে স্পর্শ করেছে। দ্বিতীয় পর্বের সুরু প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বলাকা-পূরবী যুগে, যেখানে দার্শনিক চেতনার স্থির আলোয় নিজেকে ও পরকে নতুন করে দেখার গতিমুখর এষণা। উত্তরতিরিশের পুনশ্চ কাব্য থেকে তাঁর শিল্পী জীবনের তৃতীয় পর্ব. নতুনতর দিগন্ত, নতুনতর প্রত্যয় ও প্রকরণ। এতদিন নদীর শরীর বহন হয়েছে, কিন্তু একটি সুবিহিত অববাহিকা বেয়ে এগিয়ে এসেছে : মোহনায় সে শতধা-বিচ্ছিন্ন-বহুমুখী, সে তীব্র ও তীক্ষ্ণ, তার সামনে অনন্ত পারাবার। শেষ দশ বছরের রবীন্দ্রকাব্যের সুরুতে নদীর মোহনারূপ, অন্তিমে সব মিলে মহাসাগরের গভীরতা ও ব্যাপ্তি। প্রত্যয়ে ও প্রকরণে, শিল্পবোধ ও শৈল্পিক অভিব্যক্তিতে এ আর এক নতুন সৃষ্টি, যার কেন্দ্রপুরুষ রবীন্দ্রনাথও গোধূলিবেলার উজ্জ্বল আলোয় নবদীপ্ত।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় [হয়তো আশ্চর্যের নয়] রবীন্দ্রানুরাগী অগ্রজ সমালোচকসমাজ পাঠকদের মতোই উত্তরতিরিশের রবীন্দ্রকাব্য থেকে নিরাপদ দূরত্বে থেকেছেন। ক্রমে অগ্রবীণ পাঠক ও সমালোচকদের দৃষ্টি পড়েছে এদিকে, শতবর্ষের বলয়ে অনেক অনালোচিত বিষয় ও দিকের ধারাপাত হয়েছে। তবু পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এখনও হয় নি। এই অভাব পূরণের চেষ্টার জন্যে 'রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য' প্রসঙ্গের লেখক শিশিরকুমার ঘোষ ও প্রকাশক 'মিত্রালয়' কাব্যজনক ব্যক্তিমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ।

মূল রচনাটি ছিল ইংরেজিতে অবাঙালী পাঠকসমাজের জন্যে লেখা। বাঙলা গ্রন্থটি তারই বিস্তৃত রূপ। লেখকের মৌল উদ্দেশ্যটি সাধু আন্তরিকতায় সুরক্ষিত।

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের সীমানা 'পুনশ্চ' থেকে। 'রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য' গ্রন্থের সীমানা সুরু হয়েছে 'প্রান্তিক' থেকে। পুনশ্চ কাব্য দিয়ে সূত্রপাত হলে অভাববোধ অনেকটা মিটত, অনালোচিত আরও অনেক গ্রন্থের সৌন্দর্য ধরা পড়ত। কিন্তু বক্তব্যের সংহতির জন্যে লেখক আর একটু এগিয়ে গ্রন্থ সূচনা করেছেন এবং ধারাবাহিক আলোচনার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের শেষ লেখায়, মোহনার শেষ চেউয়ে উপনীত হয়েছেন। ভূমিকায় তিনি প্রান্তিকের পূর্ববর্তী কাব্যধারার পরিচয় দিয়েছেন, পুনশ্চ এবং তার অনুসৃত গদ্য-কবিতাগুলি সেই প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। ফলে, আলোচিত কাব্যগুলির পূর্ব পটভূমিকাটি যেমন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তেমনি আলোচনা তথা আস্বাদনও গভীরে অবগাহনের সুযোগ পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কাব্যপ্রবাহ সম্পর্কে বিবিধ বিপরীতমুখী সমালোচনা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, এই গ্রন্থে সেগুলিরও উল্লেখ ও বিচার করা হয়েছে। কোন নির্দিষ্ট মত বা ছকের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত হয় নি, লেখকের কথন-ভঙ্গিতে রসধর্মী সমালোচনার পদ্ধতিই মুখ্যত অনুসৃত হয়েছে। এবং তাঁর মুখ্য বক্তব্য কাব্যবস্তু ও কবিমানস। শেষ পর্বের রবীন্দ্রনাথ পূর্ব পূর্ব পর্বে রবীন্দ্রনাথের সমাহার; যেখানে 'অঙ্কে অঙ্কে চৈতন্যের ধীরে ধীরে প্রকাশের পালা'। এই চৈতন্যের অন্তর্লোকে পাই বিচিত্র বৈপরীত্য—একপক্ষে বর্তমানমুখিনতা অন্যপক্ষে স্মৃতিচারণ, একদিকে আত্মিকের জনান্তিক আত্মবিশ্লেষণ অন্যদিকে জনতার সঙ্গপিপাসা। কবি-কণ্ঠ কোথাও নৈরাশ্যে অবসাদে ব্যথাতুর, কোথাও সংগ্রামী চেতনায় উদ্বেলিত, কোথাও নিকট-অতীতের স্বপ্নদর্শনে মুগ্ধ, কোথাওবা ভবিষ্যতের নির্মোহ দার্শনিকতায় স্নিগ্ধ। রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য গ্রন্থের লেখক এই মোহনা-উপল বিচিত্রমুখী অভিব্যক্তিকে তুলে ধরেছেন বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও সংখ্যাহীন দৃষ্টান্তের সাহায্যে।

বাগর্থ প্রতিপাদনে তিনি সচেতন, কাব্যরস পরিক্রমায় ধনিই, এবং বাগ্‌ভঙ্গিতে ধীরললিত। তাঁর আলোচনায় বিনয় শ্রদ্ধা যেমন আছে, তেমনি স্বগত বক্তব্যের উপস্থাপনায় তিনি দ্বিধাহীন। তাই সবটুকু কবি-প্রীতি নিয়েও রবীন্দ্রনাথের ত্রুটি ও দুর্বলতার উল্লেখ করেছেন, যেখানেই তাদের সাক্ষাৎ পেয়েছেন বলে তাঁর মনে হয়েছে। অথচ এই ত্রুটি প্রদর্শন রবীন্দ্রবিরোধিতার নামান্তর নয়, সমালোচকের সততার পরিচায়িকা। গ্রন্থটির অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ এটি।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি এতো বিপুল ও বিচিত্র যে, তার সুবিহিত রস-অনুভব দীর্ঘ দিনের অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে। তার ওপর, আলোচকদের দৃষ্টিভঙ্গির যোজনবিধায়ী ব্যবধানও স্বতঃ। সুতরাং এই গ্রন্থের অনেক অভিমতের সঙ্গে অনেকের ঐকমত্য নাও হতে পারে। যেমন, 'রবীন্দ্রনাথ যতক্ষণ অনৈতিহাসিক ততক্ষণই তিনি রবীন্দ্রনাথ। ইতিহাসের সাধনাসামনি হলেই তিনি বিভ্রান্ত, নৈতিকতা, অলৌকিকতা, অধিলৌকিকতার আড়ালে আশ্রয়প্রার্থী'—লেখকের এই দুটি উক্তির যাথার্থ্য সহজগ্রাহ্য নয়। এছাড়া, আরও অনেকগুলি বিষয় আলোচনার অবকাশ ছিল। যথা: প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহের যৌল স্বরূপ ও শেষ পর্বের সঙ্গে যোগ-বিয়োগ, সমকালীন পরিপার্শ্বের চিত্র, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও রবীন্দ্র-চিত্রকলার সাযুজ্য এবং প্রকরণ তথা ছন্দ ও চিত্রকল্প। গ্রন্থশেষে, যেখানে লেখক উত্তরকাব্যের সামগ্রিক বিশ্লেষণ করেছেন, সেখানে রবীন্দ্রেতর, সম্ভব হলে, রবীন্দ্রোত্তর কাব্য-কলার উপস্থিতিও অযাচিত হত না।

এগুলি অবশ্য অপ্রাপ্তির বেদনা, গ্রন্থের নঞর্থক লক্ষণ নয়। বিশেষত 'যেখানে দেবদূতেরা পা ফেলতে ভয় পান,' সেখানে যে লেখক অনায়াসে বিচরণ করেছেন এবং উত্তরপর্বের রবীন্দ্রকবিতার একটি বিস্তৃত আলোচনার প্রাথমিক ও সাহসিক সূত্রপাত করেছেন, না-পাওয়ার মরুভূমিতে এই তো অনেক পাওয়া।

গ্রন্থটির প্রচ্ছদ মুদ্রণ বাঁধাই ইত্যাদি সম্পর্কে গতানুগতিক কথা নাইবা বললাম। সাহিত্যের বিষয় নির্বাচন ও অলঙ্করণের ইতিহাসে বিশ্বালয়ের সুনাম অপরিচিত নয়।

উত্তরনায়িকা: মনোরমা সিংহ রায়। গ্রন্থবিতান। কলকাতা। বার দু টাকা।

সাহিত্য অথবা শিল্প, ধর্ম অথবা দর্শনের আলোচনায় অনেকে এখনও 'চিরন্তন,' 'শাশ্বত' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। আমিও-যে মাঝে মধ্যে করিনা, তাও নয়। কিন্তু মনকে না লুকিয়ে সত্য কথা বলতে গেলে, এই জাতীয় শব্দের প্রয়োগ-সার্থকতা সম্বন্ধে আমি কোন দিনই

নিঃসংশয় নই। বিশেষতঃ জীবনের ইতিহাস ও ভূগোলের দিকে চোখ রাখলে সংশয়ের পরিধি ও গভীরতা ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে। যেমন: ভালোবাসা। ভালোবাসা একটি বোধ-বৃত্তি। কালের সিঁড়ি পেরিয়ে পেরিয়ে মানুষের সৃষ্টিতে প্রেমের অভিব্যক্তি নীরব। তবু আজও এর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি মানুষের জীবনে ও মানসে অনুরান। সে-কি শাশ্বত ব'লে, না, পরিপার্শ্ব ও মনের সমতালে সে কেবলই সাজ-বদল ভাব-বদল করে ব'লে? রবীন্দ্রকাব্যের একটি প্রধান বিষয়—ভালোবাসা; আবার রবীন্দ্র-বিরোধী আধুনিক কবিতারও অন্যতম প্রধান বিষয়—ভালোবাসা। দুয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। আবার, যেহেতু আজকের জীবন 'সংঘবদ্ধ' হলেও মনগুলি ক্রমেই বিচ্ছিন্ন স্ব-স্থ দ্বীপ, সেই হেতু বোধের-বৃত্তির অনুভবের ও প্রকাশের ব্যবধানও ব্যক্তিগত। আধুনিক প্রেমের কবিতা তাই স্বাদে বিচিত্র।

এই বিচিত্র স্বাদের ব্যক্তিগত প্রকাশ মনোরমা সিংহরায় রচিত 'উত্তরনায়িকা' কবিতা-সংকলন গ্রন্থটিতেও। শ্রীমতী সিংহরায় কাব্যজগতে নবাগতা নন, এক দশকেরও আগে থেকে তিনি কবিতার নিয়মিত অনুশীলন করে আসছেন। বিভিন্ন পত্রিকায় মুদ্রিত তাঁর কবিতাগুলির বিষয় নানাবিধ। কিন্তু অধুনা প্রকাশিত 'উত্তরনায়িকা' মুখ্যত প্রেমের কাব্য। পথ চলতে চলতে হঠাৎ ভালোবাসার মুখোমুখি হয় অনভিজ্ঞ মন, তার অন্তরে বাইরে নতুন দৃষ্টির জোয়ার জাগে, নিজেকে এবং আর সকলকে সব কিছুকে নতুনতর বলে মনে হয়। তারপর প্রথম ভাগ পেরিয়ে অভিজ্ঞ মন ক্রমেই স্থির হতে থাকে, সন্ধি বিগ্রহের টানা-পড়েনে আনন্দ-বেদনার দোলায় দুলতে থাকে। শেষে পৌঁছয় সেই বিন্দুতে, পথের যেখানে অনিবার্য সমাপ্তি। বিচ্ছিন্ন কতকগুলি রচনা নয়, অনুভবের এই প্রবহমান সূত্র-গতি 'উত্তরনায়িকা'র কবিতাগুলিকে একটি সুরভিত মালার আকার দিয়েছে। ভালোবাসার আবেগই কবির মৌল বক্তব্য; তার বেগ আছে, তবু সে নিছক আবেগ নয়, সংযত ও সংহত মানসিকতা, কখনও কখনও মননের বিদ্যুতে দীপ্তও। নতুন বোধের আকর্ষণে কবির চিত্ত বিবচনের পরিধিতে যেমন পরিব্রাজক, তেমনি তার বাইরে যে বিপুল-বিশাল প্রকৃতি ও লোকালয় সেখানেও যাত্রিনী হতে তাঁর দ্বিধা নেই অনাস্থা নেই। ভাবে ও ভঙ্গীতে কবিতাগুলি তাই গতিশীল ও মধুরকণ্ঠী, যেখানে সত্তার অবারিত প্রকাশ, যেখানে 'নীরবতা কথা হয়ে ওঠে'।

অবশ্য কয়েকটি রচনায় অন্যমনস্কতা ও ঈষৎ তীক্ষ্ণতা চোখে পড়ে। তবু অধিকাংশ কবিতাই নিষ্ঠা ও সহজতায়, দ্বিধতা ও বোধে হৃদয়গ্রাহিনী। কবিতাগুলি অন্তরের স্বগতোক্তি—কখনোও তারা স্মৃতিনির্ভর, কখনও তাৎক্ষণিক, কখনও মনই কেন্দ্র, কখনোবা কেন্দ্রকে মাঝখানে রেখে মুহূর্তের মনঃ-পরিক্রমা। কবির অনুভব ও অভিব্যক্তি আন্তরিক ও আন্তিক। তবু তিনি প্রকৃতি বা আত্মকেন্দ্রেই আবদ্ধ নন, ভালোবাসাকে নিয়ে এসেছেন জনতার এলোমেলো ভিড়েও। তিনি দেখেছেন জীবনের রিক্ততার বেদনাকে, গ্লানিকে, তার 'চোখে ভাসে সেই ছবি যারা আজ পথে গৃহহারা'। তখন 'সেতারের সুর কাটে পদাবলী মিথ্যা হয়ে যায়'। তবু তিনি আশাবাদিনী, তিনি বিশ্বাস রাখেন, 'কাঁটায় কাঁটায় ফুল, আকাশে নতুন দিন':

তাই দাঁড়ালাম তোমার পাশেই এসে,
নতুন পৃথিবী রচনায় তার নিলে।

তুমি আর আমি এখানে নিরর্থক,
আমাদের নাম মিছিলে গিয়েছে মিলে। [মিছিল]

প্রকরণের ক্ষেত্রে কবি সাহসিক প্রয়োগে অনীহ নন, সিদ্ধিও তাঁর অনায়ত্ত নয়। তবু অভিব্যক্তির আঙ্গিকের পথেই তাঁর সহজ গতি। যার ফলে ছবিগুলি স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। যেমন দুটি বিভিন্ন বোধের চিত্র :

নীরবে ফিরে এলাম আমি,
উদ্বেলিত বুক তখন কাঁপছে থরো থরো। '[তুমি লিখছিলে বসে]
তারই দিকে চেয়ে
পিছু ফিরে দরজা ভেজিয়ে
আবার এলাম চলে। [উপলাশ]

ছন্দের বিভিন্ন রূপ-লোকেও কবির ভ্রমণ স্বচ্ছন্দ। গদ্য গদ্য, এমন কি পরীক্ষামূলক মুক্তবন্ধেও তাঁর কবিতা সমান উজ্জ্বল। মিত্রের তির্যক যমন ও প্রকাশ এখানে দুর্লক্ষ্য হলেও অনুপস্থিত নয়। 'জীবনানন্দকে' ও 'ঘুম আসছে না' স্মরণে করিয়ে দেয় যথাক্রমে জীবনানন্দ দাশ ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে। রবীন্দ্রনাথও আছেন 'একটি গান'-এ। রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত এই কাব্যটিতে কবিপ্রণাম 'পঁচিশে বৈশাখ', হৃদয়নিষ্ঠ রচনা—'তবু রাখি ফুল এক, একটি প্রণাম'।

উত্তরনায়িকার ভালো লাগবার মতো কবিতা সংখ্যাগুরু। মণীন্দ্র মিত্রের আঁকা প্রচ্ছদ এবং প্রকাশক-মুদ্রকের ললিত যত্ন তাদের শ্রীসৌষ্ঠব দিয়েছে। তবু একথা না বলে পারছি না যে ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে 'পিপাসা' কবিতাটি :

তোমরা দেখেছো সমুদ্রে ঝোড়ো হাওয়া
দেখেছো কেনিল উচ্ছল উন্মাদনা ?
মেঘে আর মেঘে অন্ধকারে সে কি
বাতাসে বাতাসে ভয়ানক ঝনঝনা ॥

গুরুদাস ভট্টাচার্য

বিশ্ব-শান্তি ও সঙ্গীত ।

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শিক্ষা ও সংস্কৃতির উদ্দেশ্য জগতে শান্তি স্থাপন ও মানবের কল্যাণ বিধান। অসভ্য ও অনার্য জাতির মধ্যে নিত্য ঈর্ষা ; দ্বন্দ্ব বর্তমান ছিল, এবং তারা ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত থাকত এরূপ দৃষ্টান্ত আদিম যুগের ইতিহাস বা কাহিনীতে পাওয়া যায় কিন্তু সভ্যতার আলোক ও শিক্ষার ফলে মানব জাতির মধ্যে সামগ্রিক ভাবে মৈত্রী ও শান্তি বিরাজ করবে এবং মানুষের চিন্তাধারা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বিশ্ব কল্যাণে নিয়োজিত হবে এরূপ আশা করাই সমীচীন। জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীতাদি শিল্প চিরদিনই মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে গঠনমূলক ও সংস্কারকার্যে এবং বিদ্বেষ, ধ্বংসের কবল ও সকল প্রকার কলুষতা থেকে মুক্তির নির্দেশ দিয়েছে। জগতের মহামানবগণ যুগে যুগে প্রচার করেছেন অমোঘ বাণী—মৈত্রী দ্বারা ঈর্ষাকে জয় করতে, কল্যাণ দ্বারা অকল্যাণকে জয় করতে এবং শান্তির দ্বারা অশান্তিকে জয় করতে। মানুষের মনোবিকার, দানববৃত্তি, সে সকল মহামানবের নিকট পরাজয় মেনেছে। তাঁদের দীক্ষায় মানুষের সুকীর্তি ও মহিমা অনেক ক্ষেত্রে রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু জগতে নিছক ভালো একেবারে সম্ভব নয়। ভালর সঙ্গে মন্দ চিরদিনই এ জগতে জড়িয়ে আছে। শ্রেষ্ঠ পথে রহ যারা। যা শ্রেষ্ঠ যা কল্যাণ তার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করে বিধাতা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। দেবতা, দানব, এই দুইই মানুষের অন্তরে মধ্যে রত, দানবকে জয় করার শক্তি মানুষের যেমন আছে তেমন দানব দ্বারা পরাভূত হবার আশঙ্কাও মানুষের আছে। তাই আবহমান কাল এই দুই শক্তির—অবিরাম দ্বন্দ্ব চলেছে। জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কবি, গীতিকার চিরদিনই মানুষকে এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্তির পথের সন্ধান দিয়েছেন। দেশ, জাতি বর্ণ নির্বিশেষে তাঁরা ঐক্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করেছেন। বর্তমান পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কারের মূলে আছে কত ধ্বংসাত্মক নিষ্ঠুর লীলার প্রবৃত্তি। এর প্রতিবিধান একমাত্র হতে পারে যদি জগতের মনীষিগণ সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত এবং অন্যান্য চারুশিল্পের মহান আদর্শ গ্রহণ করেন এবং মানব চিত্তে তাদের প্রভাব যথার্থ ভাবে বিস্তার করে জাতির কল্যাণে ব্রতী হন। যার ফলস্বরূপ বৈজ্ঞানিক মহান্ আবিষ্কারের ভয়াবহতা দূরীভূত হয়ে জগতের মঙ্গলসাধনে নিয়োজিত হতে পারে। সঙ্গীত জাতিগত বা ব্যক্তিগত বৈষম্য দূর করে এরূপ বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষাঙ্কে ভারত যখন সাম্প্রদায়িক ঘৃণ্য হত্যালীলায় কলুষিত, তখন শিল্প-জগত সে কলুষতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। সে সময় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিল্পীরা একত্রে সঙ্গীত সাধনায় বা পরিবেষণে মগ্ন। যথার্থ শিল্পীদের উদার মনোবৃত্তি হওয়াই স্বাভাবিক। তাই ভারতের সেই দুঃসময়ে যে ব্যথাকাতর এক সম্প্রদায়ের শিল্পী অন্য সম্প্রদায়ের শিল্পীকে যোগ্য সম্মান দিয়েছেন এবং সকল প্রকার বিপদ থেকে রক্ষা করে যথার্থ শিল্পী মনের পরিচয় দিয়েছেন এমন কি কোন শিল্পকলা প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকও এই নিষ্ঠুরতার থেকে মুক্ত ছিল এবং নির্ভয়ে দিন কাটিয়েছিল।

একমাত্র লোকরঞ্জনই সঙ্গীতের ধর্ম নয় যদিও মনোরঞ্জন করা সঙ্গীতাদি শিল্পের প্রধান প্রয়োজনীয়। সঙ্গীত দ্বারা লোকশিক্ষা, শুচিতা, নিয়মানুবর্তিতা এবং সমাজ ও জাতির নানাবিধ কল্যাণ কার্য সাধিত হতে

পারে। অধুনা সঙ্গীত জলসা বা so called conference অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসার সামগ্রী। অনেকে আছেন যাঁদের ব্যবসার অন্য পথ বন্ধ তাঁরা শিল্পীদের wholesale rate-এ ব্যবস্থা করে retail-রেট অংশে লভ্যবান হন। বিদেশীয় cultural delegation আমাদের দেশে আসেন কিরূপ উদার মনোবৃত্তি ও রুচি নিয়ে। বিদেশী সরকার সাংস্কৃতিক দলকে পাঠান; তাঁদের সংস্কৃতির আদর্শ প্রচার করতে এবং সে প্রচারের ভার পড়ে সুযোগ্য, বিচক্ষণ ও যথার্থ সাধক শিল্পীদের ওপর। তাঁদের দেশ ভ্রমণ, শিল্প পরিবেশন এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের ব্যবস্থা সেই সকল দেশের সরকার কর্তৃক অতি প্রণালীবদ্ধভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাদের দেশের সরকার কর্তৃক বিদেশে প্রেরিত সাংস্কৃতিক দল সম্বন্ধে বিশদ সমাজ সন্দিহান। সাংস্কৃতিক দল কোন আদর্শ বা শিক্ষামূলক বিষয় প্রচার করেছেন কি না বা সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান কার্যে যোগ্যতা দেখিয়েছেন কি না সে সম্বন্ধে কোন সঠিক বিবৃতি নেই। অনেক সময় দলীয় তোষণ নীতি বা আত্মীয় পোষণ এই সকল কার্যের প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। অর্থ প্রত্যাশায় গান, বাজনা, শুনিয়ে বা নাচ দেখিয়ে বিদেশের শিল্প সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সম্ভবত ঠিক সম্মান পাওয়া যায় না।

সঙ্গীত দ্বারা মৈত্রী প্রচার, সঙ্গীত দ্বারা তার আদর্শ ও সাধনার মাধ্যমে প্রেমের বাণী প্রচার—প্রত্যেক সঙ্গীত-গুণীর ও সঙ্গীত-সেবীর কর্তব্য। যেমন একদিন শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তি ও প্রেমের মন্ত্র বিলিয়েছিলেন সমগ্র ভারতে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে—মানুষকে দিয়েছিলেন সমান অধিকার। যেমন কবীর, নানক, সুরদাস, তুলসীদাস, মীরা মানুষকে বেঁধেছিলেন ঐক্যের মন্ত্রে, যেমন সাধক স্বামী হরিদাস, তানসেন, সঙ্গীতের রূপ ধ্যানে অরূপ রতনের সন্ধান পেয়েছিলেন এবং যে রতন আজও শিল্প জগতে অশেষ কল্যাণ সাধন করেছে।

সঙ্গীতের আদর্শ অতি মহান্। সঙ্গীত সাধনার ক্ষেত্র সীমাহীন।

আজ সারা বিশ্বে সঙ্গীত-সাধকরা সঙ্গীতের মহান্ আদর্শে দীক্ষিত হয়ে যদি বিশ্বশান্তি প্রচারে ব্রতী হন তা'হলে মানুষের মন থেকে হিংসা দ্বেষ ঘৃণা দূর হয়ে সত্যকার বিশ্বপ্রেম, সাম্যবাদ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব নয়।

কাফি সিন্ধু—দাদ্রা

আপনারে আপনি দেখ, যেও না মন কারো ঘরে—
যা চাবে এখানে পাবে খোঁজ নিজ অন্তপুরে॥
পরমধন পরশমণি অসংখ্য ধন দিতে পারে
কত মণি পড়ে আছে
চিন্তামণির নাচদুয়ারে॥
কি দেখ কমলাকান্ত মিছে বাজি এ-সংসারে
বাজিকরে চিন্‌লে না সে
তোমার ঘটে বিরাজ করে॥

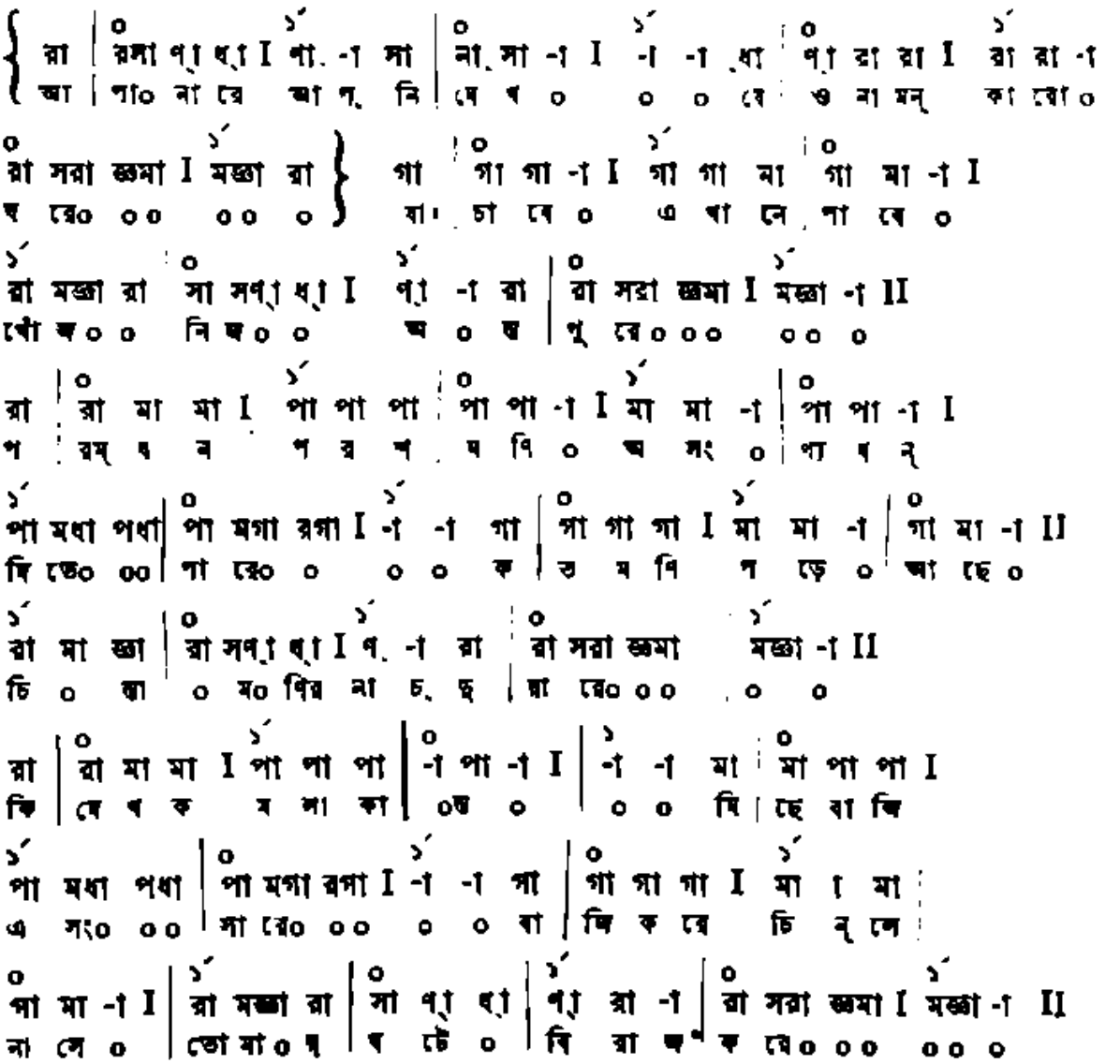

অমৃত কথা ও কাহিনী

বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী

বুদ্ধদেব যে চারিটি সত্য নির্ণয় করিয়াছেন তাহা আর্য সত্য চতুষ্টয় নামে খ্যাত। ইহার মধ্যে প্রথম—এই জগৎ দুঃখময়, দ্বিতীয়—দুঃখের কারণ নির্ণয়, তৃতীয়—দুঃখনিরোধ বা দুঃখনাশের সম্ভাব্যতা এবং চতুর্থ—দুঃখনাশের পন্থা। বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী এই চারিটি আর্য সত্যকে কেন্দ্র করিয়া বিবৃত হইয়াছে।

দুঃখ

মানুষের জীবন দুঃখময়। এই দুঃখ যাহাতে না আসিতে পারে তাহারই চেষ্টা করা কর্তব্য।

দুঃখ সমুদায়

দুঃখের কারণ নির্ণয়ই দুঃখ সমুদায়। এই জগৎ প্রত্যয়ের অর্থাৎ কারণ সমূহেরই ফল, কারণ সমূহ হইতেই কার্যসমূহের জন্মলাভ হয়, এজন্য আর অন্য কোন চেতনের কর্তৃত্ব বা অবস্থার আবশ্যক করে না, যেমন বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি।

দুঃখ কারণ সমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মূল কারণ অবিদ্যা, অবিদ্যার জন্য সংস্কার, সংস্কারের জন্য বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে মনসহ পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, তাহার পর স্পর্শ, বা বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ, ইহার ফলে সুখ-দুঃখাদি বেদনা, বেদনা হইতে বস্তু লাভের জন্য ইচ্ছা বা তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে জন্মলাভের ইচ্ছা বা ভব, ইচ্ছা হইতে পুনর্জন্ম বা জাতি, তাহার পর জরা, মরণ প্রভৃতি। ইহার মধ্যে প্রথম দুইটি পূর্ব জীবন হইতে আগত এবং পরের দুইটি জন্মলাভের পর, মধ্যস্থ আটটি বর্তমান গর্ভেই ঘটিয়া থাকে। ইহারাই দুঃখের কারণ বলিয়া নির্ণীত।

দুঃখ নিরোধ

যদি নিজেকে জরা মরণাদি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় তবেই ইহার নিরোধ সম্ভব। নির্বাণ অর্থাৎ বিশিষ্ট বা সম্যক জ্ঞানলাভ দ্বারা দুঃখ বিনাশ হইতে পারে। ঐ নির্বাণ একেবারে সমাপ্ত হওয়া নহে, ইহা দুঃখের স্বরূপ জ্ঞানের পর অনাসক্ত অবস্থা।

দুঃখ-নিরোধ মার্গ

প্রজ্ঞা বা প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে বিশিষ্ট স্বরূপ—জ্ঞানই দুঃখ নিরোধের পথ।

যখন প্রজ্ঞা চক্ষু দ্বারা সমস্ত সংস্কার অনিত্য বলিয়া দেখে তখনই মানব দুঃখসমূহ সম্বন্ধে নির্বেদ (নিস্পৃহতা) প্রাপ্ত হয়।

যে ব্যক্তিতে ধ্যান ও প্রজ্ঞা আছে, নির্বাণ তাহার কাছেই উপস্থিত হয়।

কর্ম, বিদ্যা, ধর্ম ও শীল অর্থাৎ নৈতিক আচারই মানুষের জীবনকে উন্নীত করে। ইহা দ্বারাই সর্বশ্রেষ্ঠ শুদ্ধিলাভ করে, ধন বা ধনের দ্বারা ইহা হয় না।

রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ হইতে ইন্দ্রিয়কে রক্ষা কর, ইন্দ্রিয় সংযম কর। এই সকল দ্বার খোলা থাকিলে অরক্ষিত, অবারিতদ্বার গৃহ হইতে যেরূপ পরস্বাপহারী চোর সব নিয়া যায়, সেভাবে তোমার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে।

অরণ্য বন্য বা মৃগের মত চিত্ত চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিও না। বালকের মত হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ও উন্মত্ত হইও না।

India and India's Missions [ভারত ও ভারতের ধর্ম সম্প্রদায় সকল] প্রবন্ধে হিন্দুধর্ম এবং তৎসম্বন্ধে কৃতজ্ঞতার পাশ কাটাইয়া, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তীব্র আক্রমণ ও কটূক্তি বর্ষণ করিতে কুণ্ঠিত হন নি।

এই ঘটনায় দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে খুবই আঘাত লাগিয়াছিল। তাঁর হৃদয়ে ডফ্ সাহেব কর্তৃক ব্রাহ্মসমাজের প্রতি নিন্দাবাদের প্রতিবাদ করার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। কিন্তু সে সময়ে না ছিল এমন কোন কাগজ যাতে তিনি আপনার মনোভাব সকল ব্যক্ত করতে পারতেন। আর না ছিল এমন কোন বন্ধু-বান্ধব যাদের সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে পরামর্শ করতে পারতেন। ১৭৬১ শকে [১৮৩৯ খৃঃ] তত্ত্ববোধিনী সভা সংঘোত্র স্থাপিত হয়েছিল। পরে যখন ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্মিলনের ফলে তত্ত্ববোধিনী সভা সুপ্রতিষ্ঠিত হোল এবং সেই সঙ্গে অন্ততঃ ছোটখাটো একটি দল বেঁধে গেল, তখন দেবেন্দ্রনাথ একখানি মাসিকপত্র প্রকাশের প্রস্তাব করতে সাহসী হলেন। এই পত্রিকার নাম হোল, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। ১৭৮৪ শকের ১ লা ভাদ্র ইহার শুভ জন্মদিবস।

নামে অবশ্য ইহা তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র এবং সেই সভার তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা দেবেন্দ্রনাথের নিজস্ব ছিল। তিনিই ইহার সমুদয় ব্যয়ভার বহন করতেন। এই পত্রিকা প্রকাশ করায়, দেবেন্দ্রনাথের অল্প সাহস ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় নি। সে সময়ে বঙ্গসাহিত্যের এবং বঙ্গসাহিত্যানুরাগী পাঠকেরও সম্পূর্ণ অভাব ছিল। দেবেন্দ্রনাথের এটা বেশ জানা ছিল যে, এই পত্রিকাদ্বারা বঙ্গসাহিত্যও যেমন গড়ে তুলতে হবে, তেমনি বঙ্গসাহিত্যেরও পাঠকের সৃষ্টি করতে হবে। বঙ্গদেশের পক্ষে এরূপ একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করা বলতে গেলে একটি সম্পূর্ণ নূতন ঘটনা। যে সকল উদ্দেশ্য নিয়ে পত্রিকা জন্মগ্রহণ করেছিল, পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই একটি ঘোষণাপত্রে সেই উদ্দেশ্যগুলি বিবৃত হয়েছে। কি উচ্চ আদর্শ নিয়ে যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হয়েছিল, তাহা সেই ঘোষণাপত্রেই সুপরিস্ফুট হয়েছে।

পত্রিকার সেই উদ্দেশ্য পরিচায়ক ঘোষণাপত্র নিম্নে উদ্ধৃত হোল—

'কোন নূতন পত্র প্রকাশ হইলে, সেই পত্র প্রকাশের তাৎপর্য অবগত হইতে অনেকে অভিলাষ করেন, অতএব তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষেরা যে অভিপ্রায়ে এতৎ পত্রিকার সৃষ্টি করিলেন, তাহার মূল বৃত্তান্ত এ-স্থলে অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাইতেছে'।

'তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য পরস্পর দূর দূর স্থানী প্রযুক্ত সভার সমুদয় উপস্থিত কার্য সর্বদা জ্ঞাত হইতে পারেন না, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন এবং উন্নতি কি প্রকারে হইবেক? অতএব তাঁহাদের এ সকল বিষয়ের অবগতির জন্য এই পত্রিকাতে সভার প্রচলিত কার্যবিষয়ক বিবরণ প্রচার হইবেক।

'অনেক সভ্য দূরদেশবশতঃ বা শরীরগত অসুস্থতাহেতু বা কোন কার্যক্রমে অথবা অন্য কোন দৈব বিপাকে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইতে অশক্ত হয়েন, বিশেষতঃ তাঁহাদিগের নিমিত্ত উক্ত সমাজের ব্যাখ্যান, সময়ে সময়ে এই পত্রিকাতে প্রকাশিত হইবেক।

'মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে এই ক্ষণে সাধারণের আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে এবং অনেকে তাহার মর্ম জানিতে বাসনা করেন। অতএব সেই সকল গ্রন্থ এবং অন্য যে কোন গ্রন্থ, যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসঙ্গ আছে, তাহা এই পত্রিকাতে উদ্ধৃত হইবেক। [ক্রমশঃ]

একজনে আর কয়েকজনে

অমিলকুমার ভট্টাচার্য

সংস্কারের বিশ্বাস আর যুক্তির বিশ্বাসে লড়াই চললেও সংস্কার তার কাজ ঠিক মতই চালিয়ে যায়। সংস্কার তখন ইঁট খার হওয়া জীর্ণ মন্দির নয় সদ্য সংস্কারের চুন-সুরকির মেরামতে চুনকাম করা রং দেওয়া নতুন তাজমহল।

উপেন্দ্রনাথ সংস্কারে বিশ্বাসী নন; তিনি যুক্তিবাদী। ভিক্টোরিয়ার মেধাবী ছাত্র বৈজ্ঞানিক উপেন্দ্রনাথ জীবন এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে সবসময়েই যুক্তির কাঁচি চালান। বলেন, প্রত্যক্ষের প্রতীতিই হচ্ছে আসল সত্য।

কিন্তু প্রত্যক্ষ কী শুধু দুই চোখের দেখা? সে কী শুধুমাত্র বস্তু বিজ্ঞান? সাহিত্যে কল্পনার সত্যকে উপেন্দ্রনাথকে স্বীকার করতে দেখেছি। উপেন্দ্রনাথ বলেন, 'বাস্তব এবং কল্পনা মিশিয়ে সাহিত্য গড়ে তোলাই হচ্ছে প্রকৃত শক্তিমান সাহিত্যিকের কাজ। সাহিত্য জীবনের হুবহু প্রতিচ্ছবি, এই উক্তি যাঁরা প্রচার করেন অথবা বিশ্বাস করেন, অর্ধ-সত্যের সঙ্গে তাঁদের পরিচয়।'

এই প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ Anatole France-এর মতকে প্রামাণ্য মেন: Truth is not the objective of Art. It is the science we must appeal to for that, as it is what they aim at; not to literature, which has, and can have, no objective but beauty.....If we are to have a really pretty story, the bounds of everyday experience and usage must needs be a little over-stepped.'

যুক্তির বিশ্বাসকে তাই জীবনেও তিনি মাঝে মাঝে অতিক্রম করতেন। ধর্ম বিশ্বাসে যুক্তিকে দাঁড় করিয়ে উপেন্দ্রনাথের নাস্তিকতার সুর তাঁর রচিত উপন্যাসের চরিত্রে দেখা গিয়েছে। তাঁর সহধর্মিনীকে এই নিয়ে প্রায়ই তিনি দ্বন্দ্বে আহ্বান করতেন।

উপেন্দ্র-জায়া শ্রীযুক্তা বিভাবতী দেবী মনে প্রাণে ধর্ম বিশ্বাসী। ঘরে তাঁর গৃহ-দেবতা। বারো মাসে তেরো পার্বণ। ঘটা করে পূজা-অর্চনা নিত্যই লেগে আছে উপেন্দ্রনাথের সংসারে। তা নিয়ে উপেন্দ্রনাথের কৌতুকের আর অন্ত নেই।

আমরা প্রশ্ন করি,—'দাদা সত্যিই কি আপনি বৌদির ধর্ম-বিশ্বাসের অনুরাগী নন?'

উপেন্দ্রনাথ উত্তর দেন 'প্রকাশ্যে না বলার সাধ্য নেই; কিন্তু সত্যি কথা যদি জানতে চাও, তা হলে বলি তোমাদের ওই ঠাকুর দেবতায় আমার বিশ্বাস নেই।'

বলি, 'তা হলে এই সংস্কারের শর্ষের ভূতকে আশ্রয় দেন কেমন করে?'

উপেন্দ্রনাথ বলেন, 'কলমূল মিষ্টি খাওয়ার লোভে। এই দেখো তোমরা পাঁচজনে ধরা করে আনো, তোমাদের মিষ্টি মুখ করাতেও তো সাধ যায়। তা ঠাকুরের নামে ঠাকুরের প্রসাদ—অপব্যয়ের জন্যে মন খচখচানি নেই।'

এটি পরিহাসের কথা। পরিহাসপ্রিয় উপেন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ ভাষণ। মেয়েলি ধর্ম-সংস্কারকে তিনি হয়ত মানতেন না, কিন্তু তার থেকে রস নেওয়ার ক্ষতি কী? সমুদ্র-তীরে কয়েকদিন থাকবার মানসে উপেন্দ্রনাথ চলেছেন পুরীধাম। তাঁর সমগ্র পরিবারের সঙ্গে আমরাও আছি। মহা কলরব করতে করতে চলেছি আমরা নাগপুর প্যাসেঞ্জারের একটি কামরাকে মুখর করে। শরতের একটি প্রসন্ন সকাল প্রসন্ন-মধুর আমাদের সমুদ্র-যাত্রায়।

লুচি, আলুর দম এবং সন্দেশ তারপর গরম চা। সবাই পরিতৃপ্ত। হঠাৎ উপেন্দ্রনাথ বলে উঠলেন তাঁর পুত্রবধূ গোপা দেবীকে উদ্দেশ করে,—'হ্যাঁ বৌমা, তোমরা সকলে তো বেশ খেলে দেলে, কিন্তু বানেশ্বর? বানেশ্বর কি উপবাসী আছেন?

বানেশ্বর প্রসঙ্গে আমাদের সহযাত্রী ডাঃ রুদ্রেন্দ্র পাল ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন, 'বানেশ্বর! বানেশ্বর আবার কে দাদা?'

উপেন্দ্র-জায়া বৌদি সচকিত হয়ে উঠলেন।

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'বানেশ্বরকে চেনো না?'

ডাক্তার পাল চারিদিকে অনুসন্ধানের দৃষ্টি মেললেন।

উপেন্দ্রনাথ ইঙ্গিত করলেন বৌদির হস্তস্থিত একটি রৌপ্যাধারের দিকে। আমরা সবাই সকৌতুকে সেদিকে তাকালাম। উপেন্দ্র-জায়ার গৃহ-দেবতা বানেশ্বর রৌপ্যাধারে আশ্রিত হয়ে চলেছেন আমাদের সহযাত্রী হয়ে পুরীধাম সমুদ্র পরিদর্শনে।

বৌদির সংস্কারগত বিশ্বাস হৃদ-রোগগ্রস্ত স্বামী এবং অন্যান্য পরিজন বর্গের নিরাপত্তা বিধান করবেন সহযাত্রী দেবতা বানেশ্বর। উপেন্দ্রনাথের বিশ্বাস তা অবশ্য নয়, তবে পুরীধাম ষোড়শোপচারে পূজার নৈবেদ্য আনন্দবর্ধন করবে। আরো মঙ্গলময়ের মাঙ্গলিকী সৌন্দর্য বর্ধন করে পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করে।

উপনিষদ এবং গীতা উপেন্দ্রনাথের কাছে দর্শন। ধর্মের সংস্কারে তিনি উপনিষদ এবং গীতা পাঠ করেন না, করেন মানসিক ভাবে। প্রত্যূষে ওঠা তাঁর নিত্য-নৈমিত্তিক অভ্যাস। সূর্যোদয়ের পূর্বে উঠে গীতা পাঠ করতেন উপেন্দ্রনাথ। এটাকে তিনি ধর্মাচরণ বলতেন না। বলতেন, জীবন আরম্ভের প্রথমে জীবন দর্শনের বাণীতে উদ্বুদ্ধ হওয়া। গীতার বাণীতে উদয়-সূর্যের অরুণ আভা। যুক্তি দিয়ে গীতা পাঠের সার্থকতাকে তিনি প্রকাশ করতেন।

একদিন এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম।

সেদিন অতি প্রত্যূষেই উঠেছিলাম। আর কি একটা কাজে গিয়েছিলাম বালিগঞ্জ প্লেসের উপেন্দ্র-সদনে। দোতলায় তাঁর ঘরে ঢুকতেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। দেখলাম, এক বয়োবৃদ্ধ ভদ্রলোককে পাশে বসিয়ে তিনি ইষ্ট নামের গূঢ় ধর্মতত্ত্ব প্রণালী শেখাচ্ছেন।

অবিশ্বাসী অধার্মিক বিশেষ করে যারা গুরুদীক্ষাহীন তাদের সামনে এই নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ করা সমীচীন নয়। উপেন্দ্রনাথ আমাকে ইঙ্গিতে অন্যত্র অপেক্ষা করতে বললেন। আমি বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে বয়স্ক ভদ্রলোক সে-ঘর থেকে বার হয়ে এলেন। আমি ঘরে ঢুকলাম।

স্মিত হাসি হেসে উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'কী বুঝলে?'

বললাম, 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর।'

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'ঠিক তাই। ভদ্রলোকের ধারণা আমি নৈষ্ঠিক সদ্ ব্রাহ্মণ, ধর্মীয় আচার-

অনুষ্ঠানে আমি সাত্ত্বিক। তাই আমার কাছে আসেন ধর্ম-অনুশীলন করতে। আমি তাঁর এই বিশ্বাসকে কি করে আঘাত করি বলতো' ?

বললাম, 'আমার মতে ঠিক ; কিন্তু বিষ্ণু নাগ তো বলবেন হিপোক্রেসী'।

'তা অবশ্যই বলবেন। আচ্ছা ; বিশ্বাসের কথা বাদ দাও, আনন্দের দিকটা ভাবিয়ে দেখোতো! একজন বিশিষ্ট প্রবীন ভদ্রলোক ধর্মচর্চার ছুতোয় এসে যদি কিছু আনন্দও সঞ্চয় করেন, তবে আমার পক্ষে তাঁকে কী ফিরিয়ে দেওয়া উচিত ?'

উপেন্দ্রনাথের কথায় মনে পড়লো আর একটি দিনের ঘটনা।

একজন বৈষয়িক ভদ্রলোককে মাঝে মাঝে আসতে দেখতাম তাঁর কাছে। জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে সেই ভদ্রলোক উপেন্দ্রনাথের কাছ থেকে পরামর্শ নিতেন। ভাবতাম বিষয় ব্যাপারে উকিলের পরামর্শ নেওয়া সমীচীন বলেই বুঝি বা ভদ্রলোক আসেন।

একদিনের ঘটনায় বিশেষ বিস্ময় বোধ করলাম। উপেন্দ্রনাথের ঘরে দেখলাম একটি প্ল্যানের নক্সায় তিনি মগ্নচিত্ত হয়ে রয়েছেন। বিছানার ওপর পাতা বাড়ির নক্সার কাগজ। হাতে তাঁর ড্রয়িং পেন্সিল—আশে পাশে স্কেল, ইরেজার ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বললাম, 'দাদা ব্যাপার কী' ?

বললেন, 'বাড়ির প্ল্যান আঁকছি। এই শেষ হয়ে এলো—তুমি না হয় ওঘরে গিয়ে একটু অপেক্ষা করো'।

এ-ব্যাপারেও উপেন্দ্রনাথ ঠিক একই কথা বলেছিলেন, 'ভদ্রলোকের ধারণা জমি-জমা, বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে আমি একজন পাকা ওস্তাদ। প্ল্যান-মেকারের প্রতি তাঁর বিশ্বাস নেই। কষ্ট করে সঞ্চয় করে তিনি এক টুকরো জমি কিনেছেন এই দুর্মূল্য কলকাতা শহরে। আমার নক্সায় তাঁর জমির কোন অপচয় ঘটবে না—তাই বার বার আসেন আমার কাছে। ভদ্রলোকের এ-বিশ্বাসকে আঘাত করি কেমন করে বলো!'

বললাম, 'দাদা আপনার জয় হোক!'

বললেন, 'জয় অবশ্যই হয়েছে। এই দেখো না, নিজের বাড়ির নক্সা না এঁকে অপরের বাড়ির নক্সা আঁকি। একি কম কথা!

প্রাণখোলা হাসি হাসলেন উপেন্দ্রনাথ। সে হাসিতে কোন ভেজাল নেই। আমি দেখলাম, সংস্কারের কাছে যুক্তি কতো ছোট। এ-সংস্কার নিছক সংস্কার নয়। বুদ্ধিজাত সংস্কার। যাকে আমরা বলতে পারি সংস্কৃতি। মানুষকে আনন্দ দেওয়ার সংস্কৃতি। কাউকে বিমুখ না করার সংস্কৃতি। সবাইকে গ্রহণ করার সংস্কৃতি।

ছন্দ-পতন-কবিতার নবীন কবি এসে কবিতার খাতা রেখে যায়। উপেন্দ্রনাথ ছন্দ শুদ্ধ করে দিয়ে বলেন, 'অনুশীলন করো। আরো লেখো এবং আবার এসো'।

নবীন গল্পলেখকের কাহিনীকে সাজিয়ে গুছিয়ে দেন।

ধর্ম-অনুসন্ধিৎসুর কাছে ধর্মের কথা বলেন ; গৃহহকে গৃহস্থাপনার পরামর্শ দেন, পরের বাড়ির নক্সা আঁকেন।

আরো একবার একটি অদ্ভুত কাজ করতে তাঁকে দেখেছি—শর্ত-সাপেক্ষ কাজ। উপেন্দ্রনাথের

পরম প্রিয়জন সাহিত্যিক আশীষ গুপ্ত একদিন এলেন। উপেন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে সস্নেহে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন,—কী হে দুপুরের ফুল।

সলজ্জ হাসিতে আশীষবাবু বললেন, 'কী যে ঝঞ্ঝাট দাদা, তাইতো আসতে পারি না'।

উপেন্দ্রনাথ আমার দিকে তাকিয়ে রহস্য করে শোনালেন, 'শোন অ'নল, আশীষ ঝঞ্ঝাটের মানুষ, তাই আসতে পারেন না; আরো তার জন্যে একটি লেখাও আর লিখতে পারেন না'।

'সত্যিই দাদা, কী যে ঝুঝিল,' এ রকম ঝুঝিলে পড়লে লেখা আর দেখা-সাক্ষাৎ তো দূরের কথা—বেঁচে থাকাই চলে কি না সন্দেহ।'

আশীষবাবুর কথায় উপেন্দ্রনাথ নিজেই বললেন, 'বাড়ি নিয়ে তো'!

'ঠিক তাই। আর শুধু কি বাড়ি, তার সঙ্গে খোকনের এ্যাডমিশন নিয়েও।'

উপেন্দ্রনাথ আশ্বাস দিলেন, 'দুটোই ঠিক করে দেবো। কথা দাও!'

আশীষবাবু বললেন, 'কী কথা বলুন।'

'বলো, তা হলে লিখবে!'

'তাহলে তো বেঁচে যাই দাদা। কতো কথা যে গল্প গল্প করছে; কিন্তু এই সব দুশ্চিন্তায় লেখার ধারের কাছে ঘেঁসতে চাইছে না।'

উপেন্দ্রনাথ হাসলেন। বললেন, 'তারপরের ঝঞ্ঝাটটাকে মহড়া দিয়ে রাখো আশীষ'।

বলা বাহুল্য দুটি ঝঞ্ঝাট থেকেই আশীষবাবু মুক্তি পেয়েছেন। উপেন্দ্রনাথ নিজে তদ্বির করেছিলেন দৃঢ় এবং ভালো কলেজে খোকনকে ভর্তি করবার ব্যাপারে। বাড়ির সমস্যা সমাধানের পর তাঁর প্রিয় খোকন বি. এস-সি'তে অনার্স নিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করলে তার জন্যে মিষ্টিমুখ করে এসেছি; কিন্তু আশীষবাবু আজো কলম ধরেন নি।

উপেন্দ্রনাথের সর্তকে আশীষবাবু মর্যাদাই দিতে চান। তাই মুক্তিলের আসান এত সহজেই করতে তিনি রাজি নন। 'ইহাই নিয়ম'—এই নিয়ম সাহিত্যের স্থায়ী কথা।

উপেন্দ্রনাথ নিজের সৃষ্টিতে যেমন সজাগ—সৃষ্টি করো, সৃষ্টির মর্যাদা রেখে বিচার করে তুমি নিজেকে মেলে ধরো সকলের মধ্যে—সাহিত্যের সার্বজনীনতার জন্যেই সাহিত্য সৃষ্টি—সে শুধু ক্ষণকালের ছবি নয়—ফটোগ্রাফির স্ন্যাপ-শটও নয়।

সাহিত্যিক আশীষ গুপ্ত উপেন্দ্র সাহিত্য-নীতির উপাসক। যে নীতিকে বলা যায় সাহিত্যার্থে সাহিত্য।

———

রম্যাণি বীক্ষ্য

উৎকল পর্ব

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

[ষোল]

রাজধানী এলাকাটি যেন নূতন একটি শহর। পুরনো শহর থেকে বিভিন্ন ভাবে গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের নানা স্থানে এখন এই রকম হচ্ছে। শুধু রাজধানীর প্রয়োজনে নয় বাসস্থানের প্রয়োজনেও। এ সমস্ত শহর মন্দ লাগে না। একধারে পুরনো ঘিঞ্জি বস্তি ধোঁয়ায় ও ধুলোয় মলিন, অন্য ধারে প্রশস্ত রাজপথের দু'পাশে একই রকমের সৌধশ্রেণী। বিশ্বকর্মা যেন একরাতে একটি নগর নির্মাণ করেছেন।

আর এক রকমের শহর আছে, যেগুলি প্রয়োজন মতো বাড়ছে। যেখানে একটুখানি ফাঁকা জায়গা সেইখানেই একটা বাড়ি করছে। একখানা অতি সেকেলে ভাঙা বাড়ির পাশে হাল আমলের সৌখিন সৌধ। যেন তাজমহলের বাগানের ভিতর আকাশচুম্বী আধুনিক অট্টালিকা। সরকারের কানুন আছে, রুচির প্রশ্ন নেই। পয়সা দিয়েও রুচি কেনা যায় না। এ যুগে সুরুচির এত অভাব।

রামানন্দবাবু উঁচু হয়ে বসে রাস্তার দু'ধারটা ভাল করে দেখছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন: কী কাণ্ড করেছে দেখেছেন?

না।

না-কি মশাই, বসে বসে কী করছেন তা হলে।

উবু পিরি যাচ্ছি।

সে তো বাস আপনাকে নিয়ে যাচ্ছে, আপনি কী করছেন?

আমি বাসে বসে আছি।

রামানন্দবাবু বিরক্ত ভাবে বললেন, সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

সামনে থেকে হাসি চাপার শব্দ আসছিল। এবারে সেই শব্দ স্পষ্ট হল। খতা হাসছে।

আমি বললুম: তবে আর জিজ্ঞেস করছেন কেন?

রামানন্দবাবু বললেন: আপনার কাণ্ড দেখে সবাই হাসছে।

খতা নতুন করে আবার হেসে উঠলো।

তার বৌদি বললেন: কী হচ্ছে।

খতা তখনি উত্তর দিল: এই বাড়িগুলো মন্ত্রীদের বাড়ি বলে মনে হচ্ছে।

হাসির সঙ্গে মন্ত্রীর কোন যোগ নেই। শুধু তার বৌদি বললেন: কেন?

দেখছনা, বাড়ির সামনে কেমন তিন রঙা পতাকা উড়ছে।

তাতে হাসবার কী হল?

যেন স্বাধীন হয়ে কত সুখ হয়েছে বল। রাজার ছেলে না হয়ে রাজা হবার কথা কেউ ভাবতে পারতো কি! আজকাল ঘুঁটে কুড়োনির ছেলেও রাজা হতে পারে। আর মন্ত্রীতো—

খদ্দরধারী এক ভদ্রলোক মাথার গান্ধী টুপি খুলে হাওয়া খাচ্ছিলেন। তাঁর কঠিন দৃষ্টির দিকে চেয়ে খতা থেমে গেল।

রামানন্দবাবু এতক্ষণ নিঃশব্দে খতার কথা শুনছিলেন। এইবারে সে থামতেই বললেন: আপনার চেহারাটি দেখছি মন্ত্রীর মতো।

প্রশ্ন করলুম: সেকালের না একালের মন্ত্রী?

সেকালের মন্ত্রী কি আর খদ্দর পরতেন। আমি একালের কথাই বলছি।

একালের মন্ত্রীর তো এক একজনের এক একরকম চেহারা। ঠিক কার মতো বলবেন কী?

রামানন্দবাবু আবার বিরক্ত হলেন বললেন: আপনাকে নিয়ে তো ভারি বিপদ মশাই, বড় বেশি তর্ক করেন।

সামনে থেকে খতার হাসি আবার শোনা গেল।

রামানন্দবাবু বললেন: দেখছেন তো, আপনার কাণ্ড দেখে সবাই হাসছে কিনা।

আমার তো মনে হয়, আপনারই কাণ্ড দেখে সবাই হাসছেন।

আমার কাণ্ড!

রামানন্দবাবু সোজা হয়ে বসলেন।

হেসে বললুম: আমারই তো হাসি পাচ্ছে।

ভদ্রলোক নিজের দিকে দেখে বললেন: আমাকে দেখে হাসি পাচ্ছে?

আপনাকে দেখে নয়, আপনার কাণ্ড দেখে। আপনার কথা শুনেও।

ভদ্রলোক যেন মর্মাহত হলেন, খানিকক্ষণ পরেই দুঃখ হল। বললুম: আপনি নিতান্ত ভাল মানুষ।

কেন?

কেন বুঝতে পারছেন না?

না।

সকলের শ্রবণ বাঁচিয়ে বললুম: কেউ হাসে নি। ঐ মেয়েটার নিজেরই মাথা খারাপ। তাই থেকে থেকে হাসছে।

ভদ্রলোক খুবই বিস্মিত হলেন, বললেন: সত্যি নাকি?

দেখছেন না, ওর বৌদি কী রকম সামলাচ্ছেন ওকে?

খানিকক্ষণ ভেবে ভদ্রলোক সমর্থন করলেন, বললেন: আমারও তাই মনে হচ্ছিল।

হেসে বললুম: তবেই দেখুন।

উৎসাহিত হয়ে ভদ্রলোক বললেন: আপনাকে যখন দাঁড়কাক বলেছেন, তখনই আমার সন্দেহ হয়েছে। দাঁড়কাকের সঙ্গে কি মানুষের তুলনা হয়, তাও আবার আপনার সঙ্গে।

নিজের দিকে আর একবার তাকিয়ে বললেন: আমাকে বললে তবু একটা কথা ছিল।

আপনাকেই বা কেন বলবেন ?

তাও বলা উচিত নয়।

তা হলেই বুঝুন।

চিন্তিত ভাবে রামানন্দবাবু বললেন : মেয়েদের চরিত্র বড় বিচিত্র।

সত্যি।

ভদ্রলোক নিজের চারিধারে একবার দেখলেন, গলাটা আরও নামালেন, তারপর উত্তর দিলেন : হাড়ে হাড়ে তা বুঝতে পারছি মশাই, কী আর আপনাকে বলবো।

আপনি বুঝি বিবাহিত ?

তা হলে আর ল্যাটা ছিল কি ?

তবে আমার মতো নির্বিকার থাকলেই পারেন।

ভদ্রলোক মুখ ভেংচে বললেন : বেশ উপদেশ দিয়েছেন। একেবারে শেয়ালের যুক্তি।

কী রকম ?

সেই আঙুরের খোকার গল্প হল যে। খেতে পাচ্ছিনে বলে টক !

আপনি তো চেখে দেখেছেন বললেন।

ভদ্রলোক রুখে উঠলেন : মুখ সামলে কথা বলবেন বলছি।

কী বিপদ !

নিজেই তো বিপদ ডাকছেন। মেয়ে মানুষ চেখে দেখবার কথা আমি আপনাকে বলেছি।

না।

তবে ?

আপনি তো মন্তব্য করলেন, মেয়েদের চরিত্র বড় বিচিত্র। সে-কি না দেখেই, না উপন্যাস পড়ে ?

এ একটা সত্য মন্তব্য। আর চেখে দেখার মধ্যে একটা অসভ্য ইঙ্গিত আছে।

কী বিপদ। আমি আপনাকে আঙুর চাখার কথা বলেছি।

ভদ্রলোক এক মুহূর্তে জল হয়ে গেলেন, বললেন : তাই বলুন।

সামনে থেকে খতার হাসি আবার শোনা গেল। বিব্রত ভাবে রামানন্দবাবু আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললুম : আপনিও হাসুন না।

ভদ্রলোক চুপিচুপি বললেন : আমাদের কথা বোধহয় শুনতে পেয়েছে।

তা পাক না।

ছি ছি, কী লজ্জার কথা।

লজ্জা কিসের ?

মেয়েদের চরিত্র নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম।

আমি তো করিনি, করছেন আপনি ?

ভদ্রলোক ফোঁস করে উঠলেন : আপনি তো সাংঘাতিক লোক মশাই।

আমি আবার কী করলাম ?

অকারণে আমাকে এর মধ্যে জড়ালেন।

অকারণে নয়, আপনি নিজেই এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ছেন।

আমি?

আপনি ছাড়া আর কে দায়ী বলুন। বাস শুদ্ধ সবাই চলেছে নিঃশব্দে। কেউ ভেতরে চুলছে কেউ বাইরেটা দেখছে। আর আপনি আমার সঙ্গে মেয়েদের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করতে চাইছেন।

ভদ্রলোক আমার কথে উঠলেন, বললেন: মুখ সামলে কথা বলবেন।

তা হলে কথাই বলবেন না।

বেশ বলেছেন, আপনি আমাকে যা-তা বলবেন, আর আমি মুখ বুঁজে সহ্য করব।

বেশ, আমি আর কিছুই বলব না।

আমার উপর দোষ চাপিয়ে নিজে এখন চুপ করবেন বৈকি।

এ কথার উত্তর আমি দিলুম না। কিন্তু রামানন্দবাবু নিবৃত্তি দিলেন না। বললেন: কী কথা কইছেন না যে?

আমি নিরুত্তর।

রামানন্দবাবু বললেন: চালাকি চলবে না।

সপাঙ্গে ঝতা হেসে উঠল।

বিব্রত বোধ করলেন রামানন্দবাবু।

ঝতার বৌদি বললেন: কী ছেলেমানুষি হচ্ছে।

ঝতা বলল: হাতাবে পাখির ঝগড়া দেখলে না?

আঃ!

মনে নেই, আমাদের বাগানে সেই ঝগড়ার কথা? আমার বেশ লাগে।

রামানন্দবাবু করুণ ভাবে আমার চোখের দিকে তাকালেন। তারপরে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

নূতন রাজধানী কখন আমরা ছেড়ে গেছি খেয়াল করি নি। শহর শেষ হয়ে গেছে। এখন আমরা অরণ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। দু' পাশের গাছ ক্রমে গভীর হবে। পথ উঠবে উপরের দিকে। পর্বতের পাদদেশে এসে আমাদের বাস স্থির হবে। তার আর বিলম্ব নেই। মনে মনে আমরা পাহাড়ে উঠবার জন্য তৈরি হলুম। রামানন্দবাবুকে বড় কঠিন দেখাচ্ছে।

[সতেরো]

ভুবনেশ্বরের নূতন রাজধানী থেকে উদয়গিরি খণ্ডগিরির দূরত্ব হবে তিন মাইল। এই তিন মাইল পথ কলহ করেই কেটেছে। এবার একটু আরামের আশায় অন্যদিকে মুখ ফেরালুম।

আমাদের বাস এসে দুই পাহাড়ের মাঝে একটি গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়েছিল। বাঁয়ে খণ্ডগিরি দক্ষিণে উদয়গিরি। বাস থেকে নেমে দেখলুম, উদয়গিরির উচ্চতা তত বেশি নয়। কে একজন বলল, একশো দশ ফুট মাত্র উঁচু। সামনে দাঁড়িয়ে তার চেয়েও কম মনে হচ্ছে। অপর প্রান্তে খণ্ডগিরি খাড়া উঠেছে। তার উপরে একটা জায়গা থেকে নাকি ভুবনেশ্বরের দৃশ্য সুন্দর দেখা যায়। বাসের অনেক আরোহী সেই দিকে এগিয়ে গেল।

আমি রামানন্দবাবুকে দেখছিলুম। তিনি যেদিকে যাবেন, তার উল্টোদিকে আমাকে যেতে হবে। একদিকে গেলেই আবার বিপদ বাধবে।

রামানন্দবাবু যে গুহাকে লক্ষ্য করছিলেন; তা দেখে ফেললুম। গুহারা সেই খণ্ডগিরির দিকে পা বাড়াল, তিনিও অমনি তাদের সঙ্গে চললেন। নিশ্চিন্ত-মনে আমি এগোলুম উদয়গিরির দিকে।

সিঁড়ি দিয়ে খানিকটা উঠে স্বর্গ-পুরী গুহা। উল্লেখযোগ্য কোন শিল্পকর্ম নেই, কিছু ভগ্নস্তূপ ও একটি হাতিকে বড় জীবন্ত মনে হল।

খানিকটা এগিয়ে রাণী-গুম্ফা। রাণী কা নৌর, মানে রাণীর প্রাসাদ। এটি দোতলা বাড়ি। জানা গেল যে দ্বিতীয় পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে জৈনরাজা খরবেলা তাঁর রাণীর জন্য এটি নির্মাণ করেছেন। দেওয়ালে কিছু কারুকার্য আছে। একস্থানে একটি রাজা-রাণীর মূর্তি উৎকীর্ণ দেখলুম। কিন্তু সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম কোথাও নেই।

পাহাড়ের উপর অনেকটা উঠে গণেশ গুম্ফা। দুটি ঘর ও একটি বারান্দাওয়ালা একতলা গুহা। স্তম্ভগাত্রে অসংখ্য নারী মূর্তি, আর সিঁড়ির ধাপে নড়ন্ত হাতি। দেওয়ালেও বিচিত্র কারুকার্য। এই উন্নতি দেখে গুহাটিকে রাণী-গুম্ফার পরবর্তী কালের বলে মনে হবে। ঘর দুটির মাঝখানে একটি বোধিবৃক্ষ আছে, আর একটি গুহার নাম বৈকুণ্ঠ গুহা। এ-সব সমসাময়িক।

হাতি গুহায় একটি অবিস্মরণীয় শিলালিপি আছে। রাজা খরবেলার জীবন চরিত। মাত্র পনর বৎসর বয়সে খরবেলা সর্বশাস্ত্রজ্ঞ হয়েছিলেন—অর্থ, ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি প্রভৃতি সকল বিদ্যায় পারদর্শী হয়েছিলেন। চব্বিশ বৎসর বয়সে যুবরাজ ও তার কিছু পরেই রাজা হন। রাজত্ব লাভের পরেই তিনি রাজ্য জয়ে বাহির হন। উত্তর পশ্চিম ও সুদূর দক্ষিণে তিনি রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। প্রজাদের মঙ্গলের চিন্তা তাঁর বেশি ছিল। তাই রাজ্যজয়ের চেয়ে প্রজার উপকার তিনি বেশি করেছিলেন। তিনশো বছর আগে যে সব খাল কাটা হয়েছিল, সেগুলোর তিনি উন্নতি সাধন করেন। প্রচুর জলাশয় খনন করেন। উদ্যানও প্রতিষ্ঠা করেন অনেক। রাজা খরবেলার তের বৎসরের রাজত্ব কাহিনী এই শিলালিপিতে বর্ণিত হয়েছে। তার পরের কোন ঘটনা জানা যায় না। জানবার উপায়ও নেই।

জনকয়েক সরকারী কর্মচারীকে এক জায়গায় দেখতে পেলুম। টেবিল চেয়ারে বসে তারা কিছু কাজ করছিলেন। কাছে গিয়ে দেখলুম, তাঁরা এইসব গুহার নক্সা তৈরি করছেন। হয়তো কোন পুস্তিকা প্রকাশিত হবে, কিংবা এই সব রক্ষণাবেক্ষণের কোন সুবন্দোবস্ত হবে। প্রাচীন কীর্তির প্রতি সরকারের দৃষ্টি ক্রমবর্ধমান, তার পরিচয় আমরা নানাস্থানে পেয়েছি।

আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করলুম : এই রকম গুহা আরও কতদূর পর্যন্ত আছে?

তিনি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন : এগিয়ে যান।

হাতে সময় থাকলে এগিয়েই যেতুম, আপনাকে কষ্ট দিতুম না।

তবে ফিরে যান।

অত্যন্ত সদুপদেশ তাতে সন্দেহ নেই। আপনি কি সরকারী কর্মচারী?

কেন?

সাধারণের কাছে এমন উত্তর পাওয়া যায় না। ধন্যবাদ।

আপনি কি আমাদের উপহাস করছেন?

না না, সে দুঃসাহস আমার নেই।

নজার উপর থেকে চোখ তুলে অন্য ভদ্রলোক বললেন: কী হয়েছে?

আমাদের সঙ্গী যাত্রীদের দু একজন আমার মতোই অপেক্ষা করছিলেন। এখন পর্যন্ত মুগ্ধ হবার মতো চোখে কিছুই পড়েনি। অথচ সেই আশাতেই আমরা এতদূর এসেছি। আমার মতো তাঁদেরও সেই একই কৌতূহল—আরও এগোলে শ্রম সার্থক হবে কিনা। যতদূর এসেছি, ফিরতেও সময় লাগবে। তারপরে আছে খণ্ডগিরির পাহাড়, সেও পরিশ্রম সাপেক্ষ। এইসব ভেবেই বোধহয় একজন উত্তর দিলেন: সামনে আরও কিছু দেখবার আছে কিনা জানতে চাইছি।

এ ভদ্রলোকের অন্যরকম মেজাজ। বললেন: আছে বৈকি। এই পথই বনের ভিতর দিয়ে খণ্ডগিরি পৌঁচেছে। পথের ধারে সংলগ্ন গোটা তিরিশেক গুহা দেখতে পাবেন। এগিয়ে যাননা, একেবারে খণ্ডগিরি পাহাড় হয়ে নামবেন।

কত সময় লাগবে?

ঠিক বলতে পারিনে, তবে ঘণ্টা খানেক বোধহয় লাগবে।

ঘণ্টা খানেক!

আর একজন যাত্রী বললেন: বাস কি ততক্ষণ দাঁড়াবে?

একজন বললেন: দাঁড়াবে না।

আর একজন বললেন: কেন দাঁড়াবে না? ভাড়া দিইনি আমরা?

আমি এই বিতর্কে যোগ না দিয়ে কেরাই শ্রেয় মনে করলুম। খানিকক্ষণ চলবার পরে মুখ ফিরিয়ে দেখলুম, আমাকেই সবাই অনুসরণ করছেন।

এমনিই হয়। দলের যে মানুষ এগিয়ে চলে, বাকি সবাই তাকে অনুসরণ করে। কতকটা অন্ধ ভাবেই অনুসরণ করে। এগিয়ে চলতে সাহসের দরকার, দরকার শ্রম ও চিন্তার। সাধারণ মানুষের নেই চিন্তার সময়, নেই সাহসের সঞ্চয়। শ্রমে বিমুখ তারা। তাই একজনকে অনুসরণের প্রবৃত্তি প্রবল হয়। সামনের মানুষকে দেখে নিজের কর্তব্য স্থির করা খুবই সহজ হয়।

বাসের সেই ভদ্রলোককে আমি দেখতে পেলুম না। মহাস্থির সঙ্গে যিনি তর্ক করেছিলেন তাঁকে। আমার উপরেও অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তিনি আমাকে মহাস্থবের গল্প শোনাতে চেয়েছিলেন। আমি ধৃষ্টতার সঙ্গে বাজে গল্প জুড়ে তাঁকে নিরাশ করেছি। হয়তো তিনি অপমান বোধও করেছেন। কিন্তু আমি তাঁকে অপমান করতে চাইনি। মানুষকে অপমান করে আমি আনন্দ পাই না। আমি তাঁকে নিরস্ত করতে চেয়েছিলুম। এই সময় তিনি কাছে থাকলে আমি তাঁকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করতুম। উদয় গিরি ও খণ্ড গিরির পৌরাণিক কথা, প্রাগৈতিহাসিক কথা। খারবেলার কাল তো খ্রীষ্টের জন্মের দু'শো বছর আগে। ভারতে তখন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রসার হচ্ছে। এই যুগটাকে আমাদের চোখের সামনে কেউ ধরে দেননি।

উঁচু নিচু পথের উপর দিয়ে আমরা ফিরে আসছিলুম। দৃষ্টি ছিল পথের উপর কিন্তু মন গিয়েছিল অতীতের উদ্ধারে। বর্তমান পৃথিবীর ইতিহাস শুরু হয়েছে যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিন থেকে। তার আগের কোন ইতিহাস পাশ্চাত্যে নেই। হুটো পেরিগ্রাস মেগাস্থিনিস প্রভৃতি জন কয়েক পণ্ডিত ও মেলে না জন্মালে তার আগের ইতিহাস সবাই অস্বীকার করত।

ভারতের নিজস্ব ইতিহাস কত সহস্র বৎসরের আজও তার হিসাব হয়নি। নিজেদের লিখিত ইতিহাস নিজেরাই আমরা অস্বীকার করছি। পৃথিবীর লোকে তো করবেই! রাম অযোধ্যায় রাজত্ব করেন নি, কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ হয়নি কুরুক্ষেত্রে—রামায়ণ ও মহাভারত আমাদের মহাকাব্য, ইতিহাস নয়। এইতো এ যুগের সভ্য ভারতীয়ের মন্তব্য।

এ কথা অনেকবার ভেবেছি, বলেছিও অনেকবার। থাক এ কথা।

হিউ এন সাঙের ভারত ভ্রমণের কথা মনে পড়ল। তিনিও এসেছিলেন, তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে পুষ্পগিরি নামে সংঘারামের উল্লেখ আছে। অনেকে অনুমান করেন যে এই সংঘারামটি উদয় গিরির উপরে কিংবা নিকটেই কোনখানে ছিল। খরবেলা জৈন রাজা ছিলেন। কিন্তু এই গুহাগুলিতে নাকি বহু বৌদ্ধ ভিক্ষুর বাস ছিল। দেশ দেশান্তর থেকে বৌদ্ধ শ্রমনেরা এখানে আসতেন। বৌদ্ধ ধর্মের চর্চা হত এইসব সংঘারামে।

তারপর যুগের পরিবর্তন হল। পরিত্যক্ত হল এইসব নির্জন গুহা। মানুষের বাসস্থান হল বন্য শ্বাপদের আবাস। এখন অরণ্যে অগ্রসর হতে গা ছমছম করে। আমরা পিছিয়ে এসেছি।

একজন বলছিলেন: বৌদ্ধ নয় এগুলি জৈন গুহা।

প্রমাণ কী?

ভদ্রলোক যোধদের পরিচয় ফলক থেকে কিছু টুকে নিয়েছিলেন। পকেট থেকে নোট বুক বার করে বললেন: এক নম্বর গুহা হল ছোট হাতি গুম্ফা। দ্বিতীয় পূর্ব খ্রীষ্টাব্দের। Cell for a Jain work.

আমি যেন প্রথম গুহার নাম শুনেছিলুম স্বর্গপুরী গুহা।

দ্বিতীয় গুহার স্থানীয় নাম অলকাপুরী গুহা। এই দুটোকে যোধরা স্বর্গ পুরী বলে।

এঁদের কাছে একটি নূতন নাম শোনা গেল। শালভঞ্জিকা। সাঁচীর মতো নারী মূর্তি। দেহ বল্লরী জড়িয়ে পেলবলতা।

এঁরা এই গুহায় আরও একটি মূর্তি দেখালেন। এ একজন নারী একটি টিয়ে পাখিকে আদর করছে। এ রকম মূর্তি নাকি অমরাবতীতে আছে।

যাবার সময় এ সব আমি দেখতে পাইনি। দেখলুম ফেরার সময়। তাও অন্য লোক দেখিয়ে দিল। পৃথিবীতে অনেক জিনিষই আমাদের চোখে পড়ে না। হয়তো বেশির ভাগ জিনিষই আমরা দেখতে পাইনে। দেখবার চোখ সকলের এক রকম নয়। এক একজন এক একরকম দেখে। কেউ বেশি, কেউ কম। অন্ধ না হয়েও অনেকে কিছুই দেখতে পায় না। অন্যে দেখিয়ে দিলে তবে দেখে। আমরা যে কত জিনিষ দেখতে পাইনে, তা আমরা নিজেরাই জানিনা।

গুহা থেকে নেমে এসে আমি খণ্ড গিরির দিকে তাকালুম। সেখান থেকে সবাই নেমে আসছেন। সবাইকে চিনতে পারছি না। শুধু রামানন্দবাবুকে চিনলুম। তিনি প্রায় নিচে নেমে এসেছিলেন।

আশা করেছিলুম, গুহাকে কাছে দেখতে পাব। কিন্তু তা পেলুম না। হয়তো পিছনে আছে। কিংবা আড়ালে। রামানন্দবাবু খুব তাড়াতাড়ি আসছেন।

পাশ দিয়ে যাবার সময় জিজ্ঞাসা করলুম: তারা কোথায়?

জানিনে।

কোঁস করে রামানন্দবাবুর একটা নিঃশ্বাস পড়ল।

আরও খানিকটা উপরে উঠে গুহার দাদা বৌদির সাক্ষাৎ পেলুম। তাঁরাও আসছিলেন। আমাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: গুহাকে দেখেছেন?

না তো।

নীরদবাবু ব্যস্ত হলেন। তাঁর স্ত্রী বললেন: ভয় নেই। অত বড় বোন তোমার হারাবে না।

রামানন্দবাবু তাহলে গুহাকে খুঁজছেন।　　(ক্রমশঃ)

করেন। ১৯৬০ সালের মে মাসে সুপ্রীম সোভিয়েটের পঞ্চম অধিবেশনে ব্রেজনেভকে সর্বোচ্চ পদে গ্রহণ করা হয়। ১৯৬১ সালে তিনি 'সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক শ্রমবীর' এই গৌরবময় সম্মান লাভ করেন।

ঘূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও শিল্প সমালোচক ঘূর্জটিপ্রসাদ ৬৭ বছর বয়সে ৫ ডিসেম্বর কলকাতায় লোকান্তরিত হয়েছেন।

১৮৯৪ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি ও ইতিহাস উভয় বিষয়েই এম. এ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯২২ সালে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯৫৪ সালে অর্থনীতি ও সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের দীর্ঘ অধ্যাপকের পদে থাকাকালীন তিনি লক্ষ্ণৌ থেকে অবসর নেন। লক্ষ্ণৌর জীবনে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে প্রচুর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। সেখান থেকে অবসর নেওয়ার পর ডঃ জাকির হোসেনের অনুরোধে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং সেখানে ঘূর্জটিপ্রসাদ অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ খুলেন। সে বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করার পর তিনি ১৯৫৯ সালে সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের চার দেয়ালের ভেতর তিনি সীমিত থাকেন নি। ১৯২৭ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত উত্তর প্রদেশ সরকারের 'প্রতিনিধিত্বে প্রেস এডভাইসার এণ্ড ডিরেক্টর অব্ পাব্লিক ইনফোরমেশন ছিলেন। ১৯৫৯-৬০ সালে তিনি ওই প্রাদেশিক সরকারের অবৈতনিক অর্থনীতি বিষয়ে উপদেষ্টা ছিলেন। ১৯৫৪ সালে তিনি হল্যাণ্ডের হেগ, আমস্টারডাম এবং লিডেন বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে সেখানে যান। ১৯১০ সালে মস্কোতে অর্থনীতি সম্মেলনে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি প্যারিসে ইউনেস্কোর এক সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন এবং যাদুঘর সম্মেলনে সমবায়ের ওপর সেমিনারটি পরিচালনা করেন। এ বছর অর্থাৎ ১৯৬২ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁর আমেরিকায় অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান সম্মেলনে যোগদান করার কথা ছিল। তিনি এ সম্মেলনের সহ সভাপতি ছিলেন।

ঘূর্জটিপ্রসাদ সঙ্গীতের একজন বিশিষ্ট রসিক ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একত্রে 'সুর-ও সঙ্গীত' বইটি লেখেন। বইটি চিঠিতে সঙ্গীত বিষয়ে আলোচনা। 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত' ও 'মোহানা' তাঁর ত্রয়ী উপন্যাস। বাংলা গদ্যরীতিতে একটি বিশিষ্ট ভঙ্গীর স্রষ্টা ছিলেন প্রমথ চৌধুরীর শিষ্য ঘূর্জটিপ্রসাদ। তিনি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়' পত্রগোষ্ঠীর একজন ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর যে অনুসন্ধিৎসা এবং সে বিষয়ে অধিগত করার জন্য তাঁর যে 'সিরিয়াসনেস' লক্ষ্যিত, এটা তিনি প্রেরণা স্বরূপ পেয়েছিলেন আচার্য ব্রজেন শীলের জীবন থেকে। বিভিন্ন বিষয়ে এই বিদ্যা চর্চা তাঁর রচনাকে দিয়েছে বিরল বৈদগ্ধ্য রস। বাংলা লেখনী জগতে চিন্তা আন্দোলনের একটি বিশিষ্ট রীতি প্রবর্তন করেন। তাঁর পরলোক গমনে বাংলা চিন্তা জগতের একজন মননশীল রসবোধে ঋদ্ধবৃত্তিতে উজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত জিজ্ঞাসায় নিরন্তর ব্যস্ত ঘূর্জটিপ্রসাদের মত অতুলনীয় ব্যক্তিকে হারালাম। তাঁর রচিত অন্যান্য বইয়ের মধ্যে Personality and Social Science, Basic concept of Sociology, Modern Indian Culture, Problems of youth, Diversities, An Introduction to Indian Music প্রভৃতিই উল্লেখযোগ্য।

নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত :

গত ১৯ ডিসেম্বর ভুবনেশ্বরে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্ নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত মারা গেলেন।

শ্রীসিদ্ধান্ত ব্রাহ্ম পরিবারে ১৮৯৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। কাকার কাছে মানুষ তিনি। অল্প বয়স থেকেই মেধাবী ছিলেন। স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে তাঁর কলেজ জীবন কাটে। ইংরেজী সাহিত্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হয়ে এম. এ. পাশ করেন এবং গ্রিফিথ পুরস্কার লাভ করেন। তারপর কেম্ব্রিজে যান এবং সেখানেও প্রতিভার পরিচয় দেন। প্রায় একবছর তিনি লণ্ডন স্কুল অব্ ওরিয়েন্টাল ষ্টাডিজ-এ শিক্ষকতা করেন। তারপর ভারতে ফিরে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীর অধ্যাপক হন এবং কিছুদিন ইতিহাসের অধ্যাপনাও করেছিলেন। ১৯৩৮ সালে রাধাকৃষ্ণন কমিশনের সদস্য-সেক্রেটারীর পদ অলংকৃত করেন। ১৯৪১ সালে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনে তাঁকে নেওয়া হয়। চার বছর পরে এপদে ইস্তাফা দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন। ১৯৬০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার নির্বাচিত হন। ১৯৫৯ সালে তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দ্বারা সৌরবময় স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রান্টস্ কমিশন, সর্ব ভারতীয় স্পোর্টস কাউন্সিল প্রভৃতি আরো বহু কমিটির সদস্য পদে অক্লান্ত ভাবে কাজ করে যান।

উত্তরমেরুর স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া কেন্দ্র

মার্কিন আবহাওয়া বিজ্ঞানী মিঃ এন. ডি. রকনী সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন: যে উত্তরমেরু অঞ্চলে যে ঝড়ের সৃষ্টি হয়, কয়েকদিনের মধ্যেই তা প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে এবং তার ধাক্কা নিয়ে কাঁপে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই। নয়াদিল্লীতে সাম্প্রতিক ভারতীয় শিল্প মেলায় আবহাওয়া বিষয়ক প্রদর্শনীতে দুইটি আকর্ষনীয় বস্তু রয়েছে। একটি হচ্ছে মহাকাশে প্রক্ষিপ্ত যুক্তরাষ্ট্রের কৃত্রিম উপগ্রহ ৩নং টাইরোস এর একটি অনুকৃতি। অপরটি উত্তর মেরুতে স্থাপিত যুক্তরাষ্ট্রের স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া কেন্দ্রের একটি ক্ষুদ্র অনুকৃতি। আবহাওয়া সংক্রান্ত নির্ভুল ও মূল্যবান তথ্যাদি পাওয়া যাচ্ছে দুইটির কাছ থেকেই।

৩নং টাইরোস উপগ্রহটি গত ১২ জুলাই ফ্লোরিডার কেপ কেনাভেরাল থেকে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। পৃথিবী থেকে ৫০০ মাইল দূর দিয়ে এই উপগ্রহটি প্রতি ৯০ মিনিটে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে। পৃথিবীর চারপাশের নানাজাতির নানারকম মেঘের হাজার হাজার ছবি তুলে পাঠিয়েছে এই ৩নং টাইরোস। ঝড় এবং আবহাওয়া সংক্রান্ত নানা বিষয়ের পূর্ব্বাভাস নির্ণয়ে বিজ্ঞানীদের বিশেষ সাহায্য করছে।

অনন্ত মহাসমুদ্র এবং জনমানবহীন মরুপ্রান্তরের আবহাওয়ার পূর্ব্বাভাষ লাভের কোনও উপায় এর আগে মানুষের হাতে প্রায় ছিলই না। ৩নং টাইরোসের সাহায্যে তা লাভ করা সম্ভব হয়েছে। মিঃ রকনী আশা প্রকাশ করেছেন যে আর দশ বছরের মধ্যেই তাঁরা আবহাওয়ার নির্ভুলতার পূর্ব্বাভাস দিতে পারবেন হয়ত বা তাঁরা আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণেও সক্ষম হবেন।

উত্তরমেরু অঞ্চলের স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া কেন্দ্রটি প্রতি তিন ঘণ্টা পর পর ঐ এলাকার আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি বেতারযোগে ওয়াশিংটনে পাঠাচ্ছে। যন্ত্রটি চালানোর জন্য কোন লোকের প্রয়োজন হয় না। মিঃ রকনী আশা করেন যে অন্ততঃ দুই বছর যন্ত্রটি কাজ করে যাবে।

খেলাধূলা

ভারতের টেষ্ট জয়

১৯৬২ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে ঐতিহাসিক ইডেন উদ্যানে চতুর্থ টেষ্টে ভারত ১৮৭ রানে ইংলণ্ডকে পরাজিত করে বিজয়লক্ষ্মীর বরমাল্য লাভ করেছে। এই দিনটি ভারতের ক্রিকেটের ইতিহাসে একটি বিশেষভাবে স্মরণীয় দিন হয়ে রইল। ১৯৬১—৬২ সালের টেষ্ট সিরিজের পঞ্চম বা শেষ দিনে প্রায় অর্ধলক্ষ ক্রীড়ামোদীর বিপুল আনন্দধ্বনি ও অভূতপূর্ব উদ্দীপনার মধ্যে ভারত নির্ধারিত সময়ের দু ঘণ্টা পূর্বে অর্থাৎ চা-পানের ৩০ মিনিট পূর্বে বেলা ২টা ১২ মিনিটে ভারত সফলতা লাভ করে। ১৯৩২ সাল সাল থেকে ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে টেষ্ট ম্যাচ সুরু হয়েছে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে ভারত ইংলণ্ড দলের বিরুদ্ধে এই দ্বিতীয়বার জয়লাভ করল। ভারত মাদ্রাজে ১৯৫১—৫২ সালে হাজারের নেতৃত্বে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম সাফল্যলাভ করেছিল।

এই খেলায় পলি উম্রিগড় যে নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা সহজাত—স্বতঃস্ফূর্ত। ভারতের জয়লাভের পেছনে তাঁর নিপুণ নেতৃত্ব কাজ করেছে। খেলার শেষভাগে দুরানী ও উম্রিগড়ের বল করতে আসাটি হয়েছিল নেতৃত্বের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। দুরানী ডেভিড শিপের উইকেট নিয়ে খেলার যবনিকা টেনে দেন।

আলোচ্য খেলাটি ইতিহাসের পাতায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ ম্যাচ হিসেবে সমাদৃত হবে। ভারতীয় ক্রিকেট দলকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এবার ভারতের খেলোয়াড়বৃন্দ ইংলণ্ডের হাত থেকে দুর্লভ রাবার অর্জনের গৌরব লাভ করে মাদ্রাজ টেষ্টকে ক্রিকেটের ইতিহাসে স্মরণীয় করুন—এই কামনা রইল আমাদের।

স্কোর বোর্ড

ভারত : প্রথম ইনিংস : ৩৮০

[মেহেরা ৬২, পতৌদির নবাব ৬৫, বোর্দে ৬৮, দুরানী ৪৩ ; এ্যালেন ৬৭ রানে ৫ উই:, লক ৬০ রানে ২ উই:]।

ইংলণ্ড : প্রথম ইনিংস : ২১২

[রিচার্ডসন ৬২, ডেক্সটার ৬৭ ; দুরানী ৪৭ রানে ৫ উই:, বোর্দে ৬৩ রানে ৪ উই:]।

ভারত : দ্বিতীয় ইনিংস

জয়সীমা			ব	লক	৩৬
কন্ট্রাক্টর	ষ্ট্যাম্পড	মিলম্যান	ব	এলেন	১১
মঞ্জরেকার	ষ্ট্যাম্পড	মিলম্যান	ব	লক	২৭
পতৌদির নবাব	ক	মিলম্যান	ব	লক	৩২
ইঞ্জিনীয়ার	ক	মিলম্যান	ব	এ্যালেন	৯
উম্রিগড়			ব	এ্যালেন	৩৬
দুরানী	ক	পারফিট	ব	লক	৩
বোর্দে	ক	ব্যারিংটন	ব	এ্যালেন	৬১
সেনাই	ক	পারফিট	ব	নাইট	২৯
রঙ্গানে	ক	লক	ব	নাইট	৩
মেহেরা	নট আউট				৭
অতিরিক্ত [লেগবাই ৩, নোবল ১]					৪
				মোট	২৫২

উইকেট পতন : ১। ৩১ [কন্ট্রাক্টর], ২। ৫৫ [জয়সীমা], ৩। ১০২ [মঞ্জেরেকার], ৪। ১১৯ [ইঞ্জিনীয়ার], ৫। ১১৯ [পটৌদি], ৬। ১১৯ [দুরানী], ৭। ১৯২ [উমরিগড়], ৮। ২৩৩ [দেশাই], ৯। ২৩৩ [রঞ্জানে], ১০। ২৪২ [বোর্দে]।

বোলিং : এ্যালেন ৪৩—২—১৬—২৫—৪ ;
ডি আর কে শিখ : ৩—০—১৫—০ ;
লক : ৪৬—১৫—১১১—৪ ;
বার্বার : ২—০—৯—০ ;
বেরী নাইট : ১—২—১৮—২।

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় ইনিংস

রিচার্ডসন			ব	উমরিগড়	৪২
রাসেল			ব	রঞ্জানে	৯
ব্যারিংটন	ক	দুরানী	ব	দেশাই	৩
ডেক্সটার		এল,বি ডব্লিউ	ব	দুরানী	৬২
বার্বার	ক	জয়সীমা	ব	দুরানী	৬
পারফিট		এল বি ডব্লিউ	ব	উমরিগড়	৪৬
বেরী নাইট	নট আউট				৩৯
এ্যালেন	ক	মঞ্জেরেকার	ব	দেশাই	৭
মিলম্যান			ব	রঞ্জানে	৪
লক	রান আউট				১
শিখ	ক	মঞ্জেরেকার	ব	দুরানী	২
অতিরিক্ত [বাই ১, লেগবাই ১১]					১২
				মোট :	২৩৩

উইকেট পতন : ১। ২০ [রাসেল], ২। ২৭ [ব্যারিংটন], ৩। ৯২ [রিচার্ডসন], ৪। ১০১ [বার্বার], ৫। ১১৯ [ডেক্সটার], ৬। ১৯৪ [পারফিট], ৭। ২০৮ [এ্যালেন], ৮। ২১৭ [মিলম্যান], ৯। ২২৪ [লক], ১০। ২৩৩ [শিখ]।

বোলিং : দেশাই : ১৭—৪—৩২—২ ;
রঞ্জানে : ১৪—৩—৩১—২ ;
বোর্দে : ২২—১০—৪৬—০ ;
দুরানী : ৩০—৭—১২—৩৬—৩ ;
উমরিগড় : ৩০—১০—৪৩—২।

—ক্রীড়ামোদী

Our sincerest laughter
With some pain is fraught.

—Shelley,
To a Skylark

॥ বিশ্ব-ব্যঙ্গচিত্র ॥

[ইংলণ্ড]

Why, man, he doth bestride the narrow world
Like a Colossus; and we petty men
Walk under his huge legs, and peep about
To find ourselves dishonourable graves

JULIUS CAESAR, ACT I SCENE II

শৃঙ্খলমুক্ত পারমাণবিক শক্তির ভয়াবহ আস্ফালনের পরিপ্রেক্ষিতে
ফ্র্যাঙ্কলিন্ অঙ্কিত একটি ব্যঙ্গচিত্র।

—ডেলি মিররের সৌজন্যে

॥ বিশ্ব-ব্যঙ্গচিত্র ॥

[ইংলণ্ড]

(পুলিশ কার্টুন)

(স্যুল কার্টুন)

"...and this is Simpkins, our geography master!"

"...আর ইনি হচ্ছেন মিস্টার সিম্পকিন্স্, আমাদের ভিয়োগ্রাফী টিচার!"

॥ বিশ্ব-ব্যঙ্গচিত্র ॥

(স্পোর্টস্ কার্টুন) [জার্মানী]

'না: · লোকসান তো হয়নি···
নাকটা তো আবার মুখের
ওপর ফিরে এসেছে···'

বোঝঃ কম্পিটিশন (ফ্যামিলি কার্টুন)

'ওগো, মনে পড়ে,
ঠিক দশ বছর আগে
এমনি এক সন্ধ্যায়
ভর্তি ঘরে
তোমায় আমায়
প্রথম দেখা...'

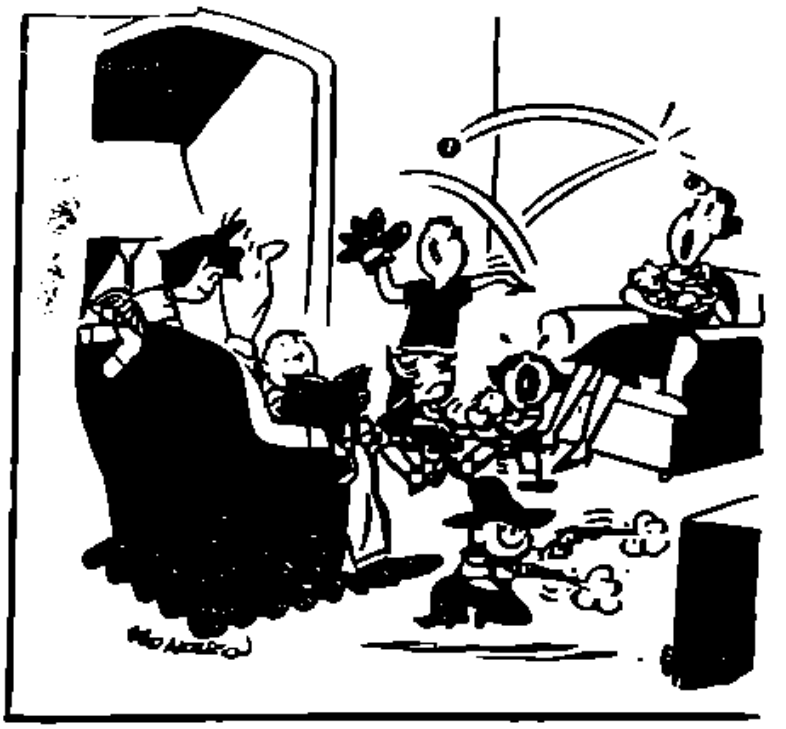

(মেডিক্যাল কার্টুন) [হাঙ্গেরী]

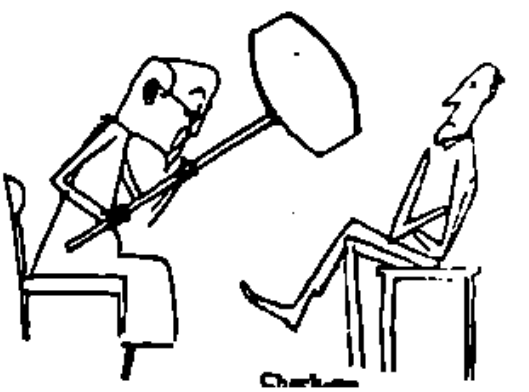

ভারতীয় শিল্প মেলা

১৯৬১

অতীতের বিচিত্র ঐতিহাসিক পটভূমিকায়

আজকের বল্লভগড়

বল্লভগড় শিল্পী যেমন এঁকে রাখতে পারেন তাঁর তুলির প্রত্যেক টানে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের মিলন ঘটিয়েছেন। এই শিল্পীর কাছে বল্লভগড় শুধু ঐতিহাসিক শহরই নয়, এখানে গুডইয়ারের সর্বাধুনিক টায়ার তৈরির কারখানাও তাঁর কাছে ঐতিহাসিক মর্যাদা পাবে ভবিষ্যতের জন্যে।

অতীত-ঐতিহ্যের রঙ মেখে আজকের বল্লভগড় আমাদের চোখে উঠেছে নতুন চেহারায় সেজে—এখানে গুডইয়ারের সর্বাধুনিক টায়ার গড়ে-তোলা বিরাট কারখানার ছবি রঙের ঐশ্বর্যে—

৬৮ বছরের বিপুল অভিজ্ঞতা। এই কারখানায় যুক্তরাষ্ট্রের গুডইয়ার-এর উদ্ভাবিত একমাত্র ট্রু-টি প্রোসেস প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে এবং যন্ত্রে বিভিন্ন মাপের টায়ার ও টিউব তৈরী হচ্ছে। দেশে দেশে গড়ে-তোলা গুডইয়ার কারখানাগুলির চেয়ে বল্লভগড় কারখানা এগিয়ে। গুডইয়ারের নিরবিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা, নিত্য-নতুন ও বাস্তবিকী প্রতিভার সমন্বয়ে গড়া গবেষণা ও পরীক্ষার কারখানা এটি।

বল্লভগড় কারখানা শুধু গুডইয়ারের প্রগতির প্রতীক নয়, এটি ভারত ঐতিহ্যের আজির দেশে বিশ্বায়তন শিল্পচেতনার সার্থক পরিচয়।

GOODYEAR

ভারতীয় শিল্পমেলা ।

সুদর্শন পাল

'মেলা' এমন এক ধরনের অনুষ্ঠান যাতে প্রচুর আনন্দ মেলে এবং সে আনন্দ যেমন দেবার তেমনি জানার ও বোঝার। ভারতীয় শিল্পমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে দিল্লীর মথুরা রোড প্রদর্শনী ক্ষেত্রে। সে মেলার চরিত্র আন্তর্জাতিক। এতে বিজ্ঞানের আধুনিকতম বিস্ময়গুলো চোখে পড়ে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান সমৃদ্ধ দেশগুলো যেমন রাশিয়া, আমেরিকা, বৃটেন, জার্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশগুলো তাদের শ্রেষ্ঠ ও আধুনিকতম বিজ্ঞান কুশল সমস্ত এ মেলায় হাজির করেছেন। এতে আমাদের মত একটি অনুন্নত দেশের নাগরিকগণ বিস্ময়ে যেমন আপ্লুত হয়েছেন, তেমনি আনন্দিত হয়েছেন মানব সভ্যতার এই শাখার আশ্চর্যজনক আবিষ্কারসমূহ দেখে। আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা কারিগররা কর্মক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ পরিধি দেখে নিজেদের চিন্তা, কল্পনা, বুদ্ধি ও কর্মকে দিগন্তে বিস্তারিত করার প্রেরণা বোধ করেন। তুলনামূলক বিচার তাদের জ্ঞানকে করে আলোকিত এবং দেশের অগ্রগতির কামনা তাদের সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষাকে দেয় কল্পনার প্রসারতা।

ভারতে এই ১৯৬১ সালের শিল্পমেলা প্রথম অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। এ নিয়ে দু'বার হল দিল্লীতে শিল্পমেলা। প্রথমবার হয়েছিল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রারম্ভে ১৯৫৬ সালে। আর এটা অর্থাৎ দ্বিতীয়টা হচ্ছে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শুরুতে। প্রথম শিল্পমেলার পর থেকে দ্বিতীয়টির মধ্যবর্তীকালে ভারতের শিল্পের অগ্রগতি জাতীয় অর্থনীতিকে অনেকখানি সমৃদ্ধ করেছে। তিনটি নতুন শিল্পনগরী—ভিলাই, রুরকেল্লা ও দুর্গাপুর—আমাদের শিল্পজীবনের গর্বের বস্তু। তাছাড়া শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রে-ও নতুন নতুন সংযোজন-ও লক্ষ্য করার মত। তৃতীয় পরিকল্পনায় ভারতকে আরো শিল্পসমৃদ্ধ করার ব্যাপক কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে। ঠিক সে পরিপ্রেক্ষিতে এ শিল্পমেলার সার্থকতা ও গুরুত্ব অনুধাবনযোগ্য। শিল্পপ্রগতির পথে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশগুলোর পাশাপাশি এগিয়ে যাবার দৃঢ় সংকল্পকে বাস্তব রূপদানে ভারতের কারিগর ও বিজ্ঞানীকে অনেকখানি প্রেরণা, চিন্তার খোরাক এবং নূতন নূতন পরিকল্পনার তাগিদ দেবে এই শিল্পমেলা। গতবারের মত এবার-ও এ-মেলার আয়োজন করেন ফেডারেশন অফ্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রী।

এশিয়ার বৃহত্তম শিল্পমেলা হিসেবে একে পরিগণিত করা যায় এই শিল্পমেলাকে। ১৮০ একর জমি জুড়ে এই শিল্পমেলার প্রাংগণ রচিত হয়েছে। ১৯৫৫ সালের প্রদর্শনী প্রাংগণ ছিল ৭২ একর জমি জুড়ে। সেবার বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়েছিল ৫৬০০ কিলোওয়াট এবং এবার হয়েছে তার দ্বিগুণ অর্থাৎ ১২০০ কিলোওয়াট। মেলার কেন্দ্রস্থলে আছে একহাজার ফুট লম্বা এবং ৩০ ফুট চওড়া একটি হ্রদ যাতে নৌবিহারের ব্যবস্থা আছে। যিনি শিল্পমেলার প্রতিটি খুঁটিনাটি দিক দেখতে চান—তার বিভিন্ন প্রদর্শনীকেন্দ্র এবং ষ্টলসমূহ —সে-ই উৎসাহী দর্শককে মোটামুটিভাবে বলা যায় ৩৪ মাইল রাস্তা হাঁটতে হবে।

এ-দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে যে সমস্ত জিনিষ প্রদর্শনীর জন্যে এসেছে, সে-গুলো বাদ দিলে বিদেশ থেকে যে সমস্ত জিনিষ এসেছে তার মূল্যই ২৫ কোটি টাকা। ভারতীয় রেলওয়ে এ-যাবৎ১৫০০০ টন মাল বহন করেছে এবং তার জন্য ১০০০ ওয়াগন ব্যবহৃত হয়েছে। গতবছরের চেয়ে এবার অনেক বেশি জিনিষ প্রদর্শিত হচ্ছে।

গতবারে আরব রিপাব্লিক ও উত্তর ভিয়েতনাম যোগদান করেনি। এবার এ-দুটো দেশ যোগ দিয়েছে। তাদের দ্রব্য সমূহ রাশিয়া, আমেরিকা, বৃটেন, ইটালী, জাপান, পশ্চিমজার্মানি প্রভৃতি আরো ইউরোপীয় এবং এশিয়ান দেশগুলোর সংগে প্রদর্শিত হচ্ছে।

আমেরিকা আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যতগুলো শিল্পমেলায় যোগদান করেছে, সমস্ত স্থানের চেয়ে বড় এবং সবচেয়ে আকর্ষণীয় মণ্ডপ তৈরী করেছে এবার ভারতীয় শিল্পমেলায়। শিল্পমেলায় বৃহত্তম মণ্ডপ তৈরী করেছে বৃটেন। তারপরে আমেরিকা এবং তৃতীয় স্থানে রাশিয়া।

আমেরিকার মণ্ডপে বহুবিধ দেখবার বস্তুর ভেতর যেটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য সেটি হল, এয়োমোবিল। ভবিষ্যতের যানরূপে এটি আবিষ্কৃত। গাড়ীটিতে চাকা-ও নেই, পাখা-ও নেই। গাড়ীর তলদেশে বহু ব্লেডের সাহায্যে হাওয়া সৃষ্টি করা হয়। এ-গুলোর সাহায্যে সৃষ্ট বায়ুস্তরের উপর ভর দিয়ে মাটি থেকে কয়েক ইঞ্চি উপর দিয়ে গাড়িটি চলতে পারে। এর বেগ ঘণ্টায় ৫০ মাইল পর্যন্ত হতে পারে। নব-উদ্ভাবিত এই যন্ত্রটি এখনো পরীক্ষায় সম্পূর্ণ পাশ করতে পারে নি। চলছে এখনো এর পরীক্ষা।

রাশিয়ার মণ্ডপে তিন নম্বর স্পুটনিকের একটি মডেল রাখা হয়েছে। বৃটেনের মণ্ডপে নাইলন যুবতী এবং পশ্চিম জার্মানির মণ্ডপে কাঁচের নারী-ও আকর্ষনীয়।

মণ্ডপের ক্ষেত্র ছাড়া-ও এর বাইরে বিভিন্ন রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ষ্টলগুলোর ও মণ্ডপগুলোর নির্মানকৌশলে ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের প্রতিভার সুস্থ পরিচয় ফুটে উঠেছে।

শিল্পমেলার ক্ষেত্র দিয়ে যেমন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের তথা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সহযোগিতার—বিশাল সুযোগ তৈরী হয়েছে, তেমনি হয়েছে বিভিন্ন দেশের ভেতর। ভারতের সংগে ত বটেই, বহিরাগত দেশগুলোর নিজেদের পরস্পরের ভেতর-ও সেটা স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে। শিল্পমেলায় এটা একটা বড় লাভ। শুধু বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে এই লাভ সীমাবদ্ধ নয়, এই ভারতের প্রাংগণে সাংস্কৃতিক মিলনের বড় ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে, এটা-ও কম মধুর তাৎপর্য নয়। আর এই শিল্পমেলা ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিল্পসাফল্যের জন্য অনেক উপকরণ হাজির করেছে। ভারতীয় বিজ্ঞানী ও কারিগরদের উপর নির্ভর করে আছি ভবিষ্যতে উন্নত শিল্পায়নের স্বার্থে এই উপকরণগুলোকে সার্থকভাবে কাজে লাগান। ভারতের মত অনুন্নত দেশে শিল্পমেলার অনুষ্ঠান একটি বিরাট তাৎপর্য বহন করে।

ভারতবর্ষ ॥

ভারতবর্ষের মত দেশে শিল্পায়ন অবশ্যই প্রয়োজন। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যা কিছু লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছিল, তার কত অংশ অর্জিত হয়েছে এ প্রশ্ন নিয়ে মারামারি কাটাকাটি করে আসল সমস্যাকে দূর করা যাবে না। আসল সমস্যা এক নয় বহুবিধ: মারাত্মক রকম বেশি হারে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে; আহরণকারী দেশের জনসাধারণের যেমন তেমি ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ বর্ধমান অর্থাৎ জীবন যাত্রার মান বাড়ানোর তাগিদ প্রবল হয়ে উঠেছে অথচ সে তাগিদ মোটেই ফলবতী হচ্ছে না; বেকার সংখ্যা বেড়ে চলেছে এবং দেশব্যাপী একটি অসন্তোষ সমস্বরে গর্জে আছে। এ অবস্থায় শিল্পায়নের ভেতর দিয়েই অনেকখানি আশার আলো দেখা যিতে পারে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিল্পোৎপাদন বেড়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উৎপাদন আরো ৭০ ভাগ বাড়াবার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে যে পরিমাণ শিল্পোৎপাদন ছিল, তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তাবে প্রধান লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়েছে: "To expand basic industries like steel, chemical industries, fuel and power, and especially machine-building capacity, so that the needs of further industrialisation can be met within, say, 10 years, mainly from the country's own resources."

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ সমস্ত শিল্পের দিকে বেশি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে: লৌহ ও ইস্পাত, শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি, সার, মূল রাসায়নিক, তৈল পরিশোধন, অত্যাবশ্যক ধাতু প্রভৃতি শিল্প।

ভারতবর্ষে বর্তমানে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের দু'টি কারখানা রয়েছে। টিস্কো, ইস্কো ও মহীশূর আয়রন ও ষ্টীল কারখানা তিনটি আগে থেকেই ছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আরো তিনটি কারখানা হয়েছে—১) ভিলাইতে রাশিয়ানদের সংগে যুগ্মভাবে ২) দুরকেলায় জার্মানদের সংগে ৩) দুর্গাপুরে ব্রিটিশ কার্মদের সংগে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রোকারোতে ষ্টীল প্লান্ট এবং বাত্রাবে নেইভেলীতে পিগ আয়রন প্রোজেক্ট তৈরী হবে। আর এছাড়া ছোটখাটো কিছু কিছু কারখানা রয়েছে।

ইস্পাতের যা চাহিদা ভারতে আছে, এবং শিল্পজগতের বর্তমান অবস্থায় সে চাহিদা মাথাপিছু বছরে ৮ পাউণ্ড, সেখানে আমেরিকায় ৪৬০ পাউণ্ড, বৃটেনে ৪২০ পাউণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়ার ৪১০ পর্যন্ত। ভারত কিন্তু এই উপহসনীয় চাহিদাটুকু-ও মেটাতে পারছে না। শিল্পায়ন যত হবে, তত আরো বেশি চাহিদা হবে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে-ও ভারতের ন্যূনতম ঘাটী মিটবেনা। বাইরে থেকে এখন যেমন আমদানী করতে হয়, তেমিভাবে কদিন চলবে কে জানে।

শিল্প পরিকল্পনায় রাঁচীতে অবস্থিত ভারী যন্ত্রশিল্পের কারখানাটির প্রসারের প্রস্তাবটি সফল হলে ভবিষ্যতের ভারতের শিল্প চেহারায় অনেকখানি পরিবর্তন আসবে। তিনটি ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি প্রস্তুতের প্রোজেক্ট যাতে ১৯৭১ সাল থেকে বছরে ২ মিলিয়ন কিলোওয়াট সরবরাহ করতে পারে তৃতীয় পরিকল্পনায় সে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে।

পেট্রোলিয়ম সংক্রান্ত প্রস্তাবটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। গৌহাটি, বারাউনি এবং গুজরাটে তৈল পরিশোধনাগার স্থাপিত হবে। পাইপ লাইন খোলা হবে যাতে শিল্পাঞ্চলে এবং শহরাঞ্চলে পেট্রোল সরবরাহ করা যায়।

বিদ্যুৎশক্তিতে আজো আমাদের দেশ উন্নত হতে পারেনি। বৈদ্যুতিক শক্তির প্রচুর উৎপাদন ব্যতীত শিল্পায়ন কখনো সফল হতে পারে না। তৃতীয় পরিকল্পনায় বৈদ্যুতিকশক্তি উৎপাদন বাড়াবার যে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম।

বিশাখাপত্তনমের জাহাজ নির্মাণ কারখানাটি ভারতের একমাত্র কারখানা। ওখান থেকে আজ পর্যন্ত যত জাহাজ তৈরী হয়েছে দেশের প্রয়োজনের তুলনায় তা অত্যন্ত কম। জাপানের নিজস্ব জাহাজ থাকাতে ১ টন মাল জাপান থেকে নিউইয়র্কে যেতে ১৬০ টাকা ভাড়া লাগে। আর ভারতের নিজস্ব জাহাজ না থাকাতে বিদেশী জাহাজগুলোকে ১ টন মালের জন্য ৩০০ টাকা দিতে হয়। তাহলে বুঝুন কী পরিমাণ টাকা বিদেশীদের হাতে চলে যায়। বোম্বে ও কলকাতায় জাহাজ মেরামতের কারখানা আছে, কিন্তু জাহাজ তৈরীর কারখানা ভারতে এই একখানি।

মোটর গাড়ীর কারখানা ভারতের মধ্যে বোম্বের ঘাটকপার এবং কলকাতার কাছে কোন্নগরে আছে। বাইরে থেকে অংশগুলো আমদানী করে এখানে জোড়া দেওয়া হয়। তবে কোন্নগরের কারখানায় মোটরের ইঞ্জিন তৈরী হয় এবং প্রায় অন্য সকল অংশ-ও নাকি তৈরী হয়।

ভারতের বস্ত্রশিল্প প্রায় সমস্তই দক্ষিণ ভারতেই অবস্থিত। ভারতে মোট সাড়ে চার শ' কাপড়ের কলের তিন শ'র অধিক কল দক্ষিণের দিকে অবস্থিত। আমেদাবাদ ও বোম্বে এ-ই দুটি স্থানে প্রায় ১৩৬টি কল রয়েছে। ভারতের বস্ত্র শিল্প পৃথিবীতে জাপানের পরেই স্থান দখল করেছে।

কাগজশিল্প প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গেই অবস্থিত। তবে এ শিল্প এখনো উন্নত হতে পারেনি, যার দ্বারা ভারতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটতে পারে। বাইরে থেকে ভারতকে কাগজ আমদানী করতে হয়। নিউজ প্রিন্টের একটি কারখানা মধ্যপ্রদেশের নেপানগরে অবস্থিত। এ নিউজ প্রিন্ট-এ বিরাট চাহিদার সামান্য অংশমাত্র মেটাতে পারে। দুঃখের মনে হয়, ভারত সরকার-ও এ শিল্পটির উন্নতির জন্যে কিছু ভাবছেন না।

বস্ত্র ও পাটশিল্প ভারতের গর্বের বস্তু। কিন্তু রাসায়নিক শিল্প যা Basic Industry-র মধ্যে পড়ে, সে শিল্প একেবারেই উন্নত নয় এদেশে। ভারতে শিল্পকারখানার কাজ দ্রুত সফল করতে গেলে বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা ছাড়া তা আদপেই সম্ভব নয়। প্রচুর কাঁচা মাল অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে।

ভারতের শিল্পায়ন যদি ঘর সরকারে আরম্ভ হত, তবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহে ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশে বাণিজ্য বিস্তারের প্রচুর সম্ভাবনা ছিল। শুধু আফ্রিকা কেন, ইউরোপের দেশগুলো যারা ভারত থেকে কাঁচা মাল নিয়ে শিল্পোন্নত হয়ে উঠেছে, ভারত থেকে শিল্পদ্রব্য কিনতে পারত। এবং এখনো সে সুযোগ প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। তবে বর্তমান হারে শিল্পোন্নয়ন হলে কস্মিনে সে অবস্থা ভারতের হবে,—এ একমাত্র ভবিষ্যতই বলতে পারে।

কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চিত্র

	১৯৫৯	(লাখ টাকা)	১৯৬০	
	আমদানী	রপ্তানী	আমদানী	রপ্তানী
বৃটেন	১৮৪১৮	১৭১৭১	২০১৫২	১৭৪৩৯
আমেরিকা	২১৭৮৫	৯৫২৪	২৪০০২	১০১৬৪
জাপান	৪১৭৪	৩৪২৭	৫৪২০	৩৪২৮
পশ্চিম জার্মান	১২০৮১	১৯৫৪	১৮১৩	৮৬৯
ফ্রান্স	২১১১	৮২১	১১২৭০	১৯৫৯
ইটালী	২৮৭৪	৪৬৮	২৪৩৮	৪৩২
রাশিয়া	১৭৮৯	৩০০৪	১৩২৭	২৯৯৪
পূর্ব জার্মানী	৩২১	২৫০	২৮৩	৩৯৭

রাশিয়া ॥

অতি অল্পকালের মধ্যেই সোভিয়েট ইউনিয়ন নিজেদের শিল্পসম্পদ আশ্চর্যজনকভাবে বর্ধিত করেছে। বৃটেন, জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি একদা শিল্পপ্রধান দেশগুলোকে পেছনে ফেলে এখন আমেরিকার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে রাশিয়া। রাশিয়ার ভূভাগ যেমন বিশাল, তেমনি এর খনিজসম্পদও অপরিমেয়। খনিজসম্পদের উৎপাদনে এর স্থান আমেরিকার পরেই। উরাল পর্বত, ককেসাস পর্বতমালা, কোলা উপদ্বীপ, ক্রিভয়রগ, বৈকাল হ্রদ অঞ্চল ও আমুর উপত্যকা-ই হচ্ছে প্রধানতঃ রাশিয়ার শিল্প ও খনিজ অঞ্চল।

বিপ্লবের পরে মহান বিপ্লবী লেনিনের অলৌকিক ব্যক্তিত্বের উত্তাপে সোভিয়েট জনগনের মধ্যে এক আশ্চর্য উৎসাহ, উদ্দীপনার সাড়া পড়ে যায়। দেশগঠনের সাড়া। লেনিনের 'গোয়েলরো প্ল্যান' এ প্রসংগে লক্ষ্য করার মত। তাতে তিনি বলেছেন, "Communism is soviet power plus electrification of the entire country." রাশিয়াকে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে সজ্জিত করার জন্যে এই প্ল্যান রচিত হয়েছিল। কথা হচ্ছে, লেনিনের উক্তি থেকেই বোঝা যায়, পরিকল্পনাকে জাতীয় শক্তির সংগে এক অচ্ছিন্ন সম্পর্কের ব্যাখ্যায় রচনা করা হয় সেখানে। আজ সোভিয়েট রাশিয়ার বছরে ৩০০,০০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়। বিদ্যুৎ সরবরাহে এখন আমেরিকার পরেই তার স্থান। জারের আমলে রাশিয়া যখন ছিল, তখন তার কোন স্থান ছিল না বিশ্বের শিল্পক্ষেত্রে। এখন ভাবুন, কীরকম দ্রুত এবং আশ্চর্য উন্নতি সেখানে সম্ভব হয়েছে।

লৌহ, ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, যানবাহন, বস্ত্র, কাগজ, পশম প্রভৃতি শিল্পে রাশিয়া এখন স্বাবলম্বী। শুধু তাই নয়, এ সমস্ত শিল্পে ব্যবহৃত হয় এমন সমস্ত কাঁচামালের জন্যে রাশিয়াকে বাইরের দেশগুলোর ওপর নির্ভর করতে হয় না। এব্যাপারে স্বাবলম্বন রাশিয়ার পক্ষে জীবন ধারণের প্রয়োজনের মতই দরকার। কারণ, রাজনৈতিক কারণে বহির্জগতের সংগে বাণিজ্য চালান এদেশের পক্ষে ভীষণ অসুবিধের সামিল। আর কাঁচা মাল মইলে শিল্পোন্নতির কথা একটি প্রহসন ছাড়া অন্য কিছু নয়।

রাশিয়ার শিল্পাঞ্চল বলতে প্রধানতঃ ৭টি অঞ্চলকে বোঝায়। (১) মস্কো টুলা অঞ্চল—কাপড় বয়নশিল্প, মোটর গাড়ী, ইঞ্জিন ও বিমান শিল্প আছে। টুলার কয়লাখনি থেকে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয়। (২) ভল্গা অববাহিকা—লৌহশিল্পের প্রধান অঞ্চল বলে এদের খুব খ্যাতি। কাছেই লৌহখনি ও কয়লাখনি প্রচুর মেলে। স্ট্যালিনো ও মাগনেতোগর্স্ক দুটি লৌহ শিল্পের কেন্দ্র। ওডেসায় জাহাজ নির্মান-শিল্প, স্টালিন গ্রাডের ট্রাক্টরের শিল্প, রাস্তোভের কৃষিযন্ত্রশিল্প এ অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য শিল্পকেন্দ্র। বৈদ্যুতিক ব্যাটারি-ও তৈরী হয়। (৩) লেনিনগ্রাড—লিনেন, কাগজ ও জাহাজ নির্মানশিল্পের জন্য বিখ্যাত। (৪) উরাল অঞ্চল—অফুরন্ত খনিজ ভাণ্ডার থাকার দরুণ এ অঞ্চলের সর্বত্র প্রায় বহু শিল্প কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। (৫) ককেসাস—বাকু ও গ্রজনির খনিজ তৈল এখানে রাসায়নিক শিল্প গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। (৬) কুজনেৎস —এখানে বড় বড় ইস্পাত ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প গড়ে উঠেছে। (৭) তুর্কীস্থান—টাসকেন্ট প্রভৃতি স্থানে বস্ত্রশিল্প ও রাসায়নিক সারের কারখানা রয়েছে।

২২শ সোভিয়েট পার্টি কংগ্রেসে বিরাট যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, তা যদি সাফল্য লাভ করে তবে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী দেশ বলে পরিগণিত হবে রাশিয়া।

ভারতবর্ষের উন্নয়ন পরিকল্পনায় সাহায্য করতে রাশিয়া এগিয়ে এসেছে। ভারত রাশিয়ার যুগ্ম পরিচালনায় সংগঠিত ভিলাই লৌহ-ইস্পাত কারখানা এখন জাতীয় গর্বের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ দুই

দেশের অন্যতম প্রধান দুগ্ধ-প্রচেষ্টা চলছে দুর্গাপুরে। খনিসমূহের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা দুর্গাপুরে নির্মিত হচ্ছে। রাশিয়ার দক্ষ কারিগররা এই নূতন শিল্পটিকে নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। এ-ছাড়া তৈল অনুসন্ধানে, পাথর উৎপাদনে রাশিয়ান যন্ত্রীগণ কাজ করছেন।

ভারতের যে কয়েকটি অনুকূল বাণিজ্য-সম্পর্কযুক্ত দেশ রয়েছে তার মধ্যে রাশিয়া একটি প্রধান দেশ। ভারত হতে রাশিয়ায় যায় যে-সমস্ত দ্রব্য তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: চা, কফি, পাটজাতদ্রব্য, অভ্র, চামড়া, তামাক, কাঠ, উদ্ভাস্তীয় কাপড়, তৈলবীজ। রাশিয়া থেকে ভারতে আসে এ-গুলো: ট্রাক্টর, বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি, লৌহ, ইস্পাত, রাসায়নিক উপকরণ, সার, নিউজপ্রিন্ট প্রভৃতি। ১৯৫২ সালে ভারত থেকে ২ কোটি টাকা মূল্যের জিনিষ যেত এবং ১৯৬০ সালে তা বেড়ে দাঁড়াল ২৯'৯৪ কোটি টাকা মূল্যের। রাশিয়া থেকে আসত ১৯৫২ সালে ৮৩ লাখ টাকা মূল্যের জিনিষ এবং ১৯৬০ সালে তার পরিমাণ দাঁড়াল ১৩'২৭ কোটি টাকার জিনিষে। ১৯৫৮ সালের ভূল-ভারত বাণিজ্যচুক্তিতে দু'দেশের বাণিজ্য বন্টন পরিমাণ এ-রকম ভাবে বেড়ে গেল।

রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেস্কো) কর্তৃক প্রকাশিত এক রিপোর্ট হইতে জানা যায়: বৎসরে সমগ্র পৃথিবীতে মোট যতো পুস্তক প্রকাশিত হয় তাহার পাঁচ ভাগের এক ভাগ প্রকাশিত হয় শুধু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র হইতেই। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের জাতি-অধিজাতিগুলির মোট ৮৯টি ভাষায় প্রতিদিন (রবিবার ছাড়া) প্রতি মিনিটে তিন হাজার কপি পুস্তক ও প্রায় দুই হাজার কপি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সোভিয়েত দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতি বছরে মাথা পিছু গড়পড়তা দশ কপি বই ও সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

পাঠক সংখ্যার দিক দিয়াও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সর্বাগ্রগণ্য দেশ। গড়ে একজন সোভিয়েত নাগরিক বৎসরে ২৪টিরও বেশি পুস্তক (স্কুল-কলেজের পাঠ্য পুস্তক বাদ দিয়া) ও প্রায় ৩০টি বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা পাঠ করিয়া থাকে।

আমেরিকা ॥

আমেরিকা এখন বিশ্বঅধিপতি শিল্পক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে এদেশের উন্নতি আশ্চর্য জনক। পৃথিবীর আর কোন দেশ এখনো পর্যন্ত আমেরিকার ধারে কাছে এগোতে পারেনি। রাশিয়াই একমাত্র দেশ যে নাকি অদূর ভবিষ্যতে শিল্পোন্নতির দৌড়ে আমেরিকাকে ধরে ফেলবে ব'লে পণ করেছে।

কয়লা হচ্ছে শক্তির সর্বপ্রধান উৎস। কয়লা উৎপাদনে আমেরিকার তুল্য আর কোন দেশ নেই। শুধু কয়লা নয়, খনিজ তৈল, জলবৈদ্যুতিক শক্তি ও স্বাভাবিক গ্যাস সবক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতায় আমেরিকা অদ্বিতীয়। অপরিমেয় শক্তির অধিকারী এদেশ যে শিল্পায়নে অনন্য হয়ে উঠবে, এ আর বিচিত্র কি। বছরে আমেরিকার কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ ৪৭ কোটি টন।

আমেরিকার চারটি লৌহ ও ইস্পাত শিল্পাঞ্চলই প্রধান বলা চলে। (১) বৃহৎ হ্রদগুলোর দক্ষিণ দিকের শিকাগো-গ্যারি, ডেট্রয়েট, ক্লিভল্যাণ্ড অঞ্চল। (২) পেনসিলভানিয়ার পিটসবার্গ বেথেলহেম লেবানন অঞ্চল। (৩) আলবামার বার্মিংহাম অঞ্চল এবং (৪) আটলান্টিকের পারে ফিলাডেলফিয়া ও বাল্টিমোর অঞ্চল। এগুলো বাদ দিলেও প্রশান্ত মহাসাগরের পারে ক্ষুদ্র ইস্পাতশিল্প কিছু কিছু আছে। আমেরিকায় বছরে ১০ কোটি টনের বেশি ইস্পাত তৈরী হয়।

উত্তর পূর্ব অঞ্চলটাই যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে সমৃদ্ধ। ফিলাডেলফিয়া অঞ্চলে জাহাজনির্মান, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, বস্ত্রশিল্প ও পশম শিল্প ভাল রকম তৈরী হয়েছে। ডেট্রয়েটে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের সাথে সাথে মোটর গাড়ী ও অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পও গড়ে উঠেছে।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে আমেরিকা পৃথিবীতে অদ্বিতীয় থাকার ফলে, নানারকম যন্ত্রপাতি ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প উত্তর পূর্ব অঞ্চলে প্রায় প্রতিটি শহরে কিছু না কিছু তৈরী হয়ে উঠেছে। যানবাহন সংক্রান্ত বিভিন্ন রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং জীবনের প্রয়জাতীয় সমস্ত ব্যাপারকেই সহজতর করার জন্যে আমেরিকাতে যে পরিমাণ প্রচেষ্টা চলে, এমন আর কোন দেশে হয় কিনা সন্দেহ। পৃথিবীতে এমন দেশ কমই আছে যেখানে আমেরিকার মোটর গাড়ী, রেলইঞ্জিন, জাহাজ ও খুঁটি নাটি যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয় না।

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমেরিকার সাহায্য অনেকখানি। গ্রামাঞ্চলের অবস্থার উন্নতির জন্যে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের বহুবিধ সাহায্য অনেকখানি কাজে লাগছে। ভারত-মার্কিণ সহযোগিতায় বাঁধ নির্মান, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন, বন্যানিয়ন্ত্রন, অধিক খাদ্য উৎপাদনে মার্কিন কারিগরী মিশনের অবদান স্মরণযোগ্য।

ভারতের বাইরে বৃটেনের পরেই আমেরিকা হল দ্বিতীয় ভারতীয় দ্রব্যের ক্রেতা। অকম্যুনিষ্ট জগতের শ্রমশিল্পজাত দ্রব্যাদির অর্ধেক তৈরী হয় আমেরিকায়। ১৯৫২ সালে আমেরিকায় প্রেরিত ভারতীয় জিনিষ সর্বাপেক্ষা বেশি ছিল। সেবছর ভারতীয় জিনিষ আমেরিকায় গিয়াছিল ১১৭'৪৭ কোটি টাকার। এবং ভারতে এসেছিল মার্কিন জিনিষ ২৭৬'৫৮কোটি টাকার। ১৯৫৭ সালে খানিকটা ভারতীয় রপ্তানী জাতীয় দ্রব্যের পরিমাণ বেড়েছিল। ১৯৬০ সালে অবস্থা দাঁড়িয়েছে এরকম : ভারতে আমেরিকা থেকে এসেছে ২৪০ কোটি টাকার জিনিষ এবং ভারত থেকে গিয়েছে প্রায় ১৯৫৭ সালের মতই অর্থাৎ ১৩২ কোটির টাকার জিনিষ।

আমেরিকায় ভারত থেকে যায় মুখ্যতঃ পাটজাত জিনিষ, চা, ম্যাঙ্গানিজ। পাটজাত জিনিষের পরিমাণ আমেরিকায় মোট ভারতীয় রপ্তানী দ্রব্যের শতকরা ৪০ ভাগ। বছরে প্রায় দু'কোটি মূল্যের চা সেখানে যায়। অল্পদিন হল সেলাইকল রপ্তানী হচ্ছে আমেরিকায়। ১৯৬০ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিল সেখান থেকে ঘুরে এসে বলেছেন যে, ভারতে যদি হাল্কা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকে উন্নত করা যায় তবে আমেরিকায় এ শিল্পের কদর পাবার প্রচুর অবকাশ আছে।

বৃটেন ।

ইউরোপের মধ্যে ইংল্যাণ্ডেই প্রথম শিল্প বিপ্লবের সূত্রপাত হয় এবং এর ফলে ইংল্যাণ্ডের সর্বত্রই বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠেছে। তাছাড়া, খনিজ সম্পদের মধ্যে কয়লায় ইউরোপে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী এবং লৌহখনির পরিমাণও নেহাৎ কম নয়। এর সংগে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপনিবেশ-শাসনকারী দেশ হিসেবে এককালে বিখ্যাত ছিল বৃটেন। সেদিক দিয়ে ভারতবর্ষ থেকে প্রচুর পরিমাণ আনীত কাঁচা মাল সাম্রাজ্যিক সুবিধার কৌলিন্যে বৃটেনের স্থানীয় শিল্পগুলোকে পরিপুষ্ট করতে অনেকখানি সহায়তা করেছে। এ ছাড়া, আরো উপনিবেশ ও রয়েছেই। বলতে গেলে, উপনিবেশগুলোর সহায়তা শিল্পবিপ্লবের সৃষ্টিকারী দেশ ইংল্যাণ্ড পুরো সুবিধা নিয়ে আপন শিল্পোন্নতির কাজকে সম্ভব করেছে বর্তমান সমৃদ্ধ চরিত্রে। তারপরও আস্তে আস্তে উপনিবেশগুলো খসে যেতে থাকলে-ও, এখনো তাদের শিল্পোন্নত অবস্থা অনেক দেশের ঈর্ষার কারণস্বরূপ। তবে এত ঠিক কথাই যে, এশিয়ায় জাপানের প্রভূত শিল্পোন্নতি, জার্মানি ও আমেরিকার অকল্পনীয় অগ্রগতি শিল্প জগতে বৃটেনকে প্রবল প্রতিযোগিতার মুখোমুখি ফেলে দিয়েছে। তারপরে বৃটেনে নতুন ভাবে সৃষ্ট এই অবস্থার সাথাসাথি দাঁড়িয়ে সেখানকার বিভিন্ন শিল্পকে নতুন ধারায় সাজাবার চেষ্টা চলছে। সে-চেষ্টার ক্ষেত্রে বৃটেনের ভূমিকা অনেকের পক্ষে আদর্শ।

এখানে বৃটেনের বর্তমান শিল্পজগতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল। আগেই বলা হয়েছে, বৃটেনের প্রায় সর্বত্রই কোন না কোন প্রকারের শিল্প গড়ে উঠেছে। লৌহ ও ইস্পাতশিল্প পৃথিবীর মধ্যে বৃটেনের স্থান তৃতীয়। বৎসরে ২ কোটি টনের ওপর অধিক ইস্পাতদ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বৃটেনের বৃহত্তম শিল্প বিশেষ। ছয়টি অঞ্চলে প্রধানতঃ লৌহ ও কয়লা প্রচুর মেলে বলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়ে উঠেছে। (১) রুহ অঞ্চল—বার্মিংহাম, কভেন্ট্রি, ডার্বলি প্রভৃতি বিখ্যাত কেন্দ্র এ অঞ্চলে অবস্থিত। মোটর, সাইকেল, রেলগাড়ীর যন্ত্রপাতি, সূঁচ, শিকল প্রভৃতি এ অঞ্চলে প্রভূত পরিমাণে তৈরী হয়। (২) শেফিল্ড—ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি নির্মানের জন্যে বিখ্যাত। (৩) নিউক্যাসল, সাণ্ডারল্যাণ্ড প্রভৃতি নিয়ে সংগঠিত অঞ্চলে লৌহশিল্পের পাশাপাশি জাহাজ শিল্পও গড়ে উঠেছে। (৪) হারনেস অঞ্চলে ব্যারো কেন্দ্রে জাহাজ নির্মান-শিল্প, ইস্পাতশিল্প অবস্থিত। (৫) দক্ষিণ ওয়েলস অঞ্চলে বৃহৎ টিনপ্লেট ও অন্যান্য ধাতুশিল্প গড়ে উঠেছে। (৬) গ্লাসগো—বৃহৎ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প এখানে গড়ে উঠেছে। জাহাজ নির্মানশিল্প এ অঞ্চলকে বিখ্যাত করেছে।

পশমশিল্পও বৃটেনের লিডস্, বেডফোর্ড, হ্যালিফাক্স প্রভৃতি স্থানে গড়ে উঠেছে।

বস্ত্রবয়ন-শিল্পের জন্য ম্যাঞ্চেষ্টার বিখ্যাত। এক সময় ছিল যখন বস্ত্র-বাণিজ্যে বৃটেন পৃথিবীর বাজার দখল করেছিল। এখন ভারতবর্ষ, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশের সংগে প্রতিযোগিতায় বৃটেনকে হটে যেতে হয়েছে। ফলে বৃটেনের কাপড় উৎপাদন না করে কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি উৎপাদন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

এখন ভারতের সংগে সহযোগিতা করে ভারতবর্ষকে কী রকম শিল্পোন্নয়নে সহায়তা করছে বৃটেন সংক্ষেপে তার বিবরণ দেওয়া যাক। দুর্গাপুরে ইস্পাতের ভূমিকা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ইংলিশ

ইলেকট্রিক কোম্পানীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানও এ-সংগে স্মরণযোগ্য। রোলস্-রোয়েস প্রতিষ্ঠানের সংগে 'ভার্ট' বিমান ইঞ্জিন তৈরী করার চুক্তি হয়েছে ভারত সরকারের। এটি তৈরী হবে বাঙ্গালোরে হিন্দুস্থান এয়ার ক্র্যাফ্‌ট লিঃ কারখানায়। বোম্বের কোন একটি ফার্মের সংগে 'বুল' কোম্পানী যুগ্মভাবে রেডিও রিসিভার তৈরী করছেন। রাসায়নিক ও ঔষধজাতীয় দ্রব্য প্রস্তুতকারী বিখ্যাত মে এণ্ড বেকার-ও এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য। এ প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে মে এণ্ড বেকার (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ নামে কাজ করছে। বোম্বের ওরেলি অঞ্চলে একটি প্রস্তুতকেন্দ্র এদের আছে। সেদিন আবার আনন্দপুরেও আরেকটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে। রেলওয়ের জন্য ফটোগ্রাফ এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈরীর কাজে বিখ্যাত জে. স্টোন সম্প্রদায়ের অবদান-ও নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষের রেলব্যবস্থার উন্নতির প্রসংগে স্মরণযোগ্য। ভারতে এদের একটি কারখানাকেন্দ্র আছে। এগুলো ছাড়াও আরো বহু আছে।

ভারত থেকে যতকিছু বাইরের যতগুলো দেশে যায় তারমধ্যে বৃটেনই সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রেতা। সমগ্র ভারতের রপ্তানী জাতীয় দ্রব্যের ১ চতুর্থাংশ বৃটেনই নেয়। ১৯৪৮ সালে যেত ১০০ কোটি টাকার জিনিষ এবং ১৯৫১ সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪০ কোটি টাকার জিনিষে। ১৯৬০ সালে তা আবার কমে যায়। এই সময় ভারতের রপ্তানীর পরিমাণ আমদানীর পরিমাণের চেয়ে ২৭ কোটি টাকার বেশি। European Common Market-এ বৃটেনের যোগদানের পর ভারত থেকে বৃটেনে রপ্তানীর পরিমাণ কমে যেতে পারে এমন আশংকা অনেকেই করছেন। বাণিজ্যের ব্যাপারে ভারত-বৃটেন সম্পর্ক এখন পর্যন্ত পৃথিবীর অন্যসব দেশগুলোর চেয়ে ঘনিষ্ঠতম।

———

বিজ্ঞানকে কতভাবেই লাগাচ্ছে মানববুদ্ধি। বিজ্ঞানের গতি বাড়ছে আর বাড়ছে মানুষের কাজের গতি। মানুষ আজ চাচ্ছে অল্প সময়ে বেশি কাজ। তাই সময়-মূল্য এত বেশি জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। রাশিয়ানরা সময়-মূল্যকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছেন। মস্কো সিটি ইকনোমিক কাউন্সিল ঠিক করেছেন একটি Computing Centre খোলার। এ কেন্দ্রটিতে একটি অতি দ্রুত গতিশীল বৈদ্যুতিক কম্পুটার মেসিন থাকবে। শিল্পজগতের খুঁটিনাটি তথ্যজ্ঞাপক ২৪০ মিলিয়ন প্রতীক থাকবে। এতে শিল্প পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক—শিল্পগড়া, শিল্প-উৎপাদন জাতীয় পরিকল্পনা রচনা করবে বিভিন্ন শিল্প কারখানার জন্য। বিভিন্ন শিল্পে কি রকম অগ্রগতি চলছে—তারো তথ্য রাখা হবে এই যন্ত্রটির সাহায্যে। মেসিনে দ্রুত খবর রাখা হবে এবং খবর জোগান দেওয়া হবে শিল্প জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে। প্রতিটি কলকারখানাকে খবর দিয়ে জাত রাখা হবে। এতে সময় কম লাগবে, এর কাজ হবে ব্যাপকভাবে জাতীয় আকারে এবং শিল্প জীবনে এ ধাপ একটি নবতম অধ্যায় রচনা করবে নিঃসন্দেহে।

জার্মানী ।

একসময়ে জার্মানী ছিল ইউরোপের শিল্পক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দেশ। বৃটেনের পরেই ছিল তার স্থান। হিটলারের যুদ্ধে জার্মানী পরিণামে পেল বিরাট আঘাত। দেশটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তছনছ হয়ে যায়। রাশিয়া গেল এগিয়ে। বৃটেন পড়ল পিছিয়ে। জার্মানী এল আরো পিছিয়ে ফ্রান্সের পরে। পূর্ব-জার্মানী ও পশ্চিম জার্মানীতে বিভক্ত হল দেশ। অল্পকালের মধ্যেই পশ্চিম জার্মানী পুনর্গঠনের কাজ শেষ করল। ১৯৫৬ সালে। পশ্চিম জার্মানী ফ্রান্সকে এবার পিছে ফেলে দিল পিছে। পূর্ব জার্মানী রয়ে গেছে এখনো পঞ্চম স্থানে। ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলোকে ক্রমপর্যায়ে দাঁড় করালে নীচের মত হয়—প্রথম, রাশিয়া ; দ্বিতীয়, বৃটেন ; তৃতীয়, পশ্চিম জার্মানী ; চতুর্থ, ফ্রান্স ; পঞ্চম, পূর্ব জার্মানী।

জার্মান জাতের মধ্যে প্রচুর প্রাণশক্তি লুকিয়ে আছে। নতুবা কী-করে তারা অল্পকালের মধ্যে অতবড় যুদ্ধের ধাক্কা খেয়ে বিধ্বস্ত অবস্থা থেকে নিজেদের দেশকে পুনরায় সাজাতে পারলেন। এ-এক আশ্চর্য ব্যাপার। বোমার বর্ষণে প্রধানতঃ শিল্পাঞ্চলগুলোই ধ্বংস হয়েছিল।

জার্মানীর শিল্পোন্নতির প্রধান কারণ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য প্রধানতঃ প্রয়োজন চার : আকরীয় লৌহ, চুণ এবং কয়লা। রুর অঞ্চলটি এদিক দিয়ে সমৃদ্ধ। একক অঞ্চল হিসেবে রুরের মত সমৃদ্ধ অঞ্চল বিশেষ করে খনি ও শিল্পের বিচারে পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। এই অঞ্চলটি নয় ওয়েষ্টফালিয়া একটি বিশাল শিল্পকেন্দ্র। ডর্টমুণ্ড, ডাসেলডর্ফ ও এসেন এই শিল্পাঞ্চলের প্রধান প্রধান কেন্দ্র। জার্মানীতে যে সমস্ত শিল্প প্রধানতঃ উন্নত হয়ে গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে লৌহ, ইস্পাত, জাহাজ নির্মান, রাসায়নিক প্রভৃতিই উল্লেখযোগ্য। এ-ছাড়া বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, রেশম, পশম শিল্প-ও গড়ে উঠেছে। হামবুর্গ জাহাজনির্মান শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এখানে ভারতের জন্য জাহাজ তৈরী হয়। ভাজনি অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়ে উঠেছে এবং এর সংগে তুলাজাত দ্রব্যের-ও কেন্দ্র রয়েছে। হ্যানবুর্গে পাটশিল্পের কেন্দ্র রয়েছে।

আগেই বলেছি, জার্মান দেশ দু'ভাগে বিভক্ত হওয়ায় শিল্পোন্নতি সেখানে ব্যাহত হয়েছে। রুর অঞ্চলটি পশ্চিম জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে যুদ্ধের ভয়াবহ ক্ষতির মুখ থেকে পুনর্গঠিত করার ব্যাপারে পশ্চিম জার্মানী অনেক সুবিধে পেয়েছে। সেদিক দিয়ে পূর্বজার্মানী দুর্ভাগ্যের ভারে পীড়িত। যেমন ধরা যাক, দেশ যখন দু'ভাগ হল এবং প্রতিটি অংশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের দায়িত্ব নিজ নিজ কাঁধে এসে পড়ল তখন দেখা গেল পূর্ব জার্মানীতে অকেজো বহু পুরানো ৭টি কারখানা রয়েছে এবং পশ্চিম জার্মানীতে ১২০টি। এবং এই ১২০টি প্রায় নবচরিত্রের। ফলে পূর্ব জার্মানী থেকে পশ্চিম জার্মানী ৬২ ভাগ বেশী Pig iron উৎপাদন করতে আরম্ভ করল। পূর্ব জার্মানী সাত বছর ব্যাপী পরিকল্পনা দ্বারা আপন অবস্থা উন্নত করার বৈপ্লবিক সংকল্প গ্রহণ করেছে। পশ্চিম জার্মানীর ইস্পাত উৎপাদন ২ কোটি টনের উপরে গিয়েছে। মোটরগাড়ী ও সাইকেল উৎপাদনে এই জার্মানী এখন বৃটেনের সমকক্ষ এবং রপ্তানীতে বৃটেনকে-ও ছাড়িয়ে গিয়েছে। E. Common Market তৈরী করে এই জার্মানী আবার মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে।

পূর্ব জার্মানীতে ইস্পাত, রাসায়নিক শিল্প পুনর্গঠিত হয়েছে এবং যথেষ্ট উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রাসায়নিক শিল্পে কৃত্রিম রাবার এবং কৃত্রিম পেট্রোলিয়াম তৈরী শিল্পই উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষের শিল্পোন্নয়নে দু'জার্মানীই এগিয়ে এসেছে। বিখ্যাত রুরকেল্লার লৌহ ও ইস্পাত কারখানাটি পশ্চিম জার্মানীর Kruppe-এর সংগে যুগ্ম পরিচালনায় নির্মিত হয়েছে এবং কাজ চলছে। সেখানেই এসেনের Koppers রাসায়নিকশিল্প কেন্দ্র খুলেছে। 'বাই প্রোডাক্টস্'-এর কারখানা বলা যায়। কলোনের একটি প্রতিষ্ঠান মহীশূরে হটীন ফটো নির্মানকেন্দ্র খুলেছে যুগ্ম-পরিচালনা। বিখ্যাত আগফা প্রতিষ্ঠান একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সংগে যৌথভাবে ক্যামেরা তৈরী করছেন। চারটি পশ্চিম জার্মানীর রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান বোম্বেতে একটি রাসায়নিক কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন ভারতীয় একটি প্রতিষ্ঠানের সংগে যৌথভাবে। করিমাবাদে মেসার্স কালানী ব্রাদার্সের সংগে একটি জার্মান প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে নির্মান করেছেন Gedore Tools (India) Private Ltd.। তাছাড়া জার্মান বহুগণ মহীশূরে লৌহ ও ইস্পাত কারখানা, বার্নপুরে 'ইকো' এবং জামসেদপুরের টাটা প্রভৃতি স্থানের প্রসার পরিকল্পনায় কাজ করছেন।

পূর্ব জার্মানীর একটি প্রতিষ্ঠানের সংগে বোম্বের 'গদরেজ এণ্ড বয়েস' প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারিত যৌথ চুক্তিতে টাইপরাইটার তৈরীর ব্যবস্থা হয়েছে। হিন্দী টাইপরাইটার তৈরী হবে।

পূর্ব জার্মানীর সংগে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্কে ভারতের পক্ষে অনুকূল। ১৯৫৭ সালে পূর্ব জার্মানী থেকে আসে ১৪'৩ মিলিয়ন টাকা মূল্যের জিনিষ এবং ১৯৬০ সালে ৬৪'৩ মিলিয়ন টাকা মূল্যের জিনিষ।

ভারত থেকে সেখানে ১৯৫৭ সালে যায় ৪১'৩ মিলিয়ন টাকা মূল্যের জিনিষ এবং ১৯৬০ সালে সে অংক দাঁড়ায় ৭৮'৭ মিলিয়ন মূল্যের জিনিষে।

পশ্চিম জার্মানী থেকে ভারতে আসে ১৯৫৯ এবং ১৯৬০ সালে যথাক্রমে ১২০ কোটি এবং ১১৩ কোটি টাকা মূল্যের। ভারত থেকে এ-দু'বছরই যায় ২০ কোটি টাকার জিনিষ।

ভারত থেকে জার্মানীতে প্রধানতঃ যায় কাপড়, চা, কফি এবং পাটজাত দ্রব্যই। জার্মানী থেকে আসে বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, ফটো পেপার, ফিল্ম, কাগজ প্রভৃতি।

———

পঞ্চাশ বছর আগে আমেরিকার রাস্তাঘাট এখনকার মত এত উন্নত হয়নি, বিজ্ঞান তার শ্রেষ্ঠ সাধককে তখনো তৈরী করে নি, তখনো ঘরে ঘরে বিজ্ঞান হাত পা ছড়িয়ে বসে নি। তখন আমেরিকার রাস্তায় ২০০,০০০ মোটর গাড়ী দেখে কোন কোন তত্ত্বেশীয় অর্থনীতিবিদ বলেছিলেন, আমেরিকার চূড়ান্ত শক্তি নিরোজিত হয়েছে। কিন্তু তারা ভুল বলেছিলেন। আজ পঞ্চাশ বছর পরে আমেরিকায় মোটর গাড়ীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৪ মিলিয়ন অর্থাৎ ৬,৪০,০০০,০০। এর মধ্যে হল ৬১ মিলিয়ন লোকবাহী মোটর গাড়ী। আশ্চর্য ক্ষমতা আছে আমেরিকানদের।

ফ্রান্স ॥

শিল্পাঞ্চলগুলো গড়ে তোলার পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজন কয়লা। কয়লার অভাবে বৈদ্যুতিকশক্তির ব্যবহার অনেকটা ক্ষতিপূরণ করে বটে, তবে লৌহ ও ইস্পাতশিল্প গড়ে তুলতে গেলে কয়লা ছাড়া খুবই অসুবিধে হয়। ফ্রান্সের লোরেন অঞ্চলে প্রচুর লৌহশিলা পাওয়া গেলে-ও কয়লার অসুবিধে ফ্রান্সের লৌহশিল্প জার্মানী বা বৃটেনের মত গড়ে উঠতে পারেনি। কয়লার অসুবিধে অর্থাৎ লৌহ যেখানে পাওয়া যায় সেখান থেকে কয়লাখনি অনেক দূরে থাকাজনিত অসুবিধে লৌহ ও ইস্পাতশিল্প প্রতিবেশী দেশগুলোর মত এখানে তৈরী হয়নি। ফ্রান্সে বছরে ১৩০ লক্ষ টন ইস্পাতদ্রব্য তৈরী হয়। কলকব্জা ও মোটরগাড়ী প্রধান শিল্পজাত দ্রব্য। কার্পাস ও রেশম বয়নশিল্পে ফ্রান্সের স্থান পৃথিবীতে মোটামুটি মন্দ নয়। প্যারিসে পশমবয়নশিল্প, ঘড়ি নির্মাণশিল্প, মার্সেলস-এ চর্মশিল্প অবস্থিত। প্যারিসে এ-ছাড়া বিলাসদ্রব্য, যন্ত্রপাতি মোটরগাড়ী শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। যন্ত্র-প্রস্তুত-শিল্প ফ্রান্সের প্রধান শিল্প। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যন্ত্র রপ্তানীকারক দেশ হল ফ্রান্স। কাঁচশিল্প এদেশে গড়ে উঠেছে বিশেষ করে উত্তর ফ্রান্সে।

ফ্রান্সের সংগে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক যুদ্ধের পর অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। ফ্রান্সে ভারতীয় দ্রব্য যেগুলো যায় তন্মধ্যে তৈল, কাপড়, পাট, কাতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকার কতকগুলো দেশের সংগে ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠায়, সে সমস্ত দেশে শক্তিশালী বস্ত্রশিল্প গড়ে উঠায় এবং ম্যাঙ্গানীজ প্রচুর পরিমাণে মেলে বলে ১৯৫৯ সালের পর থেকেই সে ফ্রান্সের সংগে ভারতের বাণিজ্যাবস্থা খারাপের দিকে যায়। ১৯৫৭ সালে ভারতের ১০ কোটি টাকার পরিমাণের জিনিষ যেত এবং ১৯৫৯ সালে সে পরিমাণ দাঁড়ায় ৮ কোটিতে। ১৯৬০ সালে খানিকটা বেড়ে হয়েছে ৮·৭ কোটি টাকার জিনিষে। পূর্বে এ-দেশে আন্তরকামূলক রক্ষণশীল মনোভাব থাকত বলে আমদানী খুবই কম করত। এখন অনেকখানি উদার এবং আবেগের মনোভাব কাটিয়ে ওঠাতে ফ্রান্সের আমদানী-মনোবৃত্তি বেড়েছে।

আমেরিকায় বইয়ের উৎপাদন বাড়ছে রীতিমত ব্যাপক হারে। জানবার স্পৃহা যেখানে প্রবল সেখানে বইয়ের উৎপাদন বাড়বেই। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ভয় পেয়ে গেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থগারিক বলছেন, যে হারে বই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছে সেভাবে যদি ভবিষ্যতে-ও আসতে থাকে তবে শীগগীর বই-ই জায়গা কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের তাড়াবে সেখান থেকে। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বছরে দু'মাইল পরিমাণ জায়গা বাড়ান বুকসেলফের শুধু বইয়ের স্থানে দেবার জন্য। জ্ঞানের স্পৃহা বাড়ে, কিন্তু এমনই বেড়েছে সেখানে ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে।

ইটালী।

১৮৬১ সালে সর্বপ্রথম ইটালীতে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়। বহু বছরের আত্মকলহে লিপ্ত থাকার পর ঐ বছরই ঐক্যবদ্ধ ইটালীর স্বপ্ন বাস্তব রূপ নেয়। ঐক্যবদ্ধ জীবনের যে পূর্ণ সাফল্য সেখানে অর্জিত হল, তা বিচার করে অনেকে বলেন, ইটালীতে দ্বিতীয় রেনেসাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮৬১ সালে। এখন ১৯৬১ সাল। এই একশ বছরের ইটালীর শিল্পকরণের ইতিহাস খুব বৈচিত্র্যপূর্ণ। আধুনিক শিল্পোন্নত ইটালীর জন্ম শুরু হয়েছে ১৯১৯ সাল থেকে। এই এগারো বারো বছরে সেখানকার শিল্পে অগ্রগতি দ্রুত সম্ভব হয়েছে।

সংক্ষেপে বিভিন্ন বিভাগে এদেশের বর্তমান অবস্থা লক্ষ্য করা যাক। বৈদ্যুতিক সরবরাহের ক্ষেত্রে ইটালীর সাফল্য কম নয়; ১৯৩৮ সালে যাসে যেখানে গড়পড়তায় ১৯০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ হত ১৯৬০ সালের হিসাবে দেখা গেছে সেই অংক হয়েছে ৪৬৮০ কিলোওয়াট। পেট্রোলিয়াম উৎপন্ন ১৯৪৮ সালে যেখানে হত মাসে ৩৪,০০০টন, ১৯৬০ সালে সে অংক দাঁড়িয়েছে মাসে২,১২৩,৫০০ টন। ধাতুশিল্পে যুদ্ধ পূর্বেকার অবস্থার থেকে এখন অনেকগুণ ভাল হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প হয়েছে বিগুন উন্নত প্রায় যুদ্ধকালীন অবস্থার তুলনায়। বিশেষ করে, মোটর এবং মোটর সাইকেলের ক্ষেত্রে এ উন্নতি চোখে পড়ে বেশি। ১৯৪৮ সালে মোটর এবং মোটর সাইকেল যথাক্রমে তৈরী হত মাসে ৫,০০০ এবং ৫,০০০, সেখানে ১৯৬০ সালে তা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৪১,৬৫৯ এবং ৪৪,৫০৭। রাসায়নিক শিল্পে ইটালীর অবস্থা ১৯৪৮ সালের অবস্থার চেয়ে পাঁচ গুণের বেশি উন্নত হয়েছে। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে যদি ১৯৩২ সালকে ভিত্তি হিসাবে বিচার করা যায় তবে দেখা যায়, ১৯৬০ সালে যথেষ্ট অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। ১৯৩২ সালে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প উৎপাদনের পরিমান যথাক্রমে ছিল ১,৯৫০,০০০ টন এবং ৪,৬০০,০০০ টন এবং ১৯৬০ সালে সেগুলো দাঁড়িয়েছে ২,৬৮২,০০০ টন এবং ৮,২৩০,০০০ টন। মোটর ট্রাক নির্মানেও ইটালী এগিয়ে গেছে। এমনি আর আর শিল্পক্ষেত্র সম্পর্কেও একথা বলা যায়।

ওপরের পরিবেষিত তথ্য থেকে নিশ্চয়ই পরিষ্কার হচ্ছে যে, যুদ্ধের পর ১৯৪৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত যে উন্নতি সেখানে অর্জন করা সম্ভব হয়েছে, সত্যিই লক্ষ্য করার মত। ইটালী-ভারত সম্পর্ক যে ক্রমবর্ধমান সৌহার্দের ওপর প্রতিষ্ঠিত তার প্রমাণ এ দু'দেশের যুগ্ম পরিচালনায় শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টা। ভারতের মত অনুন্নত দেশে অর্থনৈতিক জীবনকে উন্নত করতে অন্যান্য দেশের মত ইটালীও এগিয়ে এসেছে। যুগ্ম পরিচালনায় সম্পাদিত হচ্ছে এমন কতকগুলো প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত তালিকা নীচে দেওয়া গেল।

সিন্ধ্রীতে যে সার উৎপাদন কারখানাটি রয়েছে ১৯৫৫ সালে সেটি প্রসারের প্রয়োজন দেখা দিল। জানুয়ারী মাসে মিলান শহরের বিখ্যাত ইটালীয় শিল্পপতি Montecatini চুক্তি নিয়ে ভারতে এলেন। সিন্ধ্রীর কারখানাটিকে যাতে আরো বিস্তৃত করা যায়—এ চুক্তি নিয়ে ওই শিল্পপতি কাজ আরম্ভ করেন। আরো একটি ইটালীয় প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এলেন। সেটি হ'ল জেনোয়া শহরের ফার্ম Ansaldo। এ দুটি প্রতিষ্ঠান ১৯৫৯ সালে আরো একটি কাজ নিলেন। মাদ্রাজে নেভেলি সার কারখানায় লিগনাইট থেকে ইউরিয়া উৎপাদনের জন্যে একটি বিশেষ ব্যবস্থা করার জন্য এ দুটি ফার্ম দ্বিতীয় চুক্তিটি নিয়ে কাজ আরম্ভ করেন।

Montecatini ফার্মটি ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসে মাদ্রাজে এলুমিনিয়ম কোম্পানীর সঙ্গে আরো একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এ কোম্পানীর কেন্দ্র মেটুর-এ অবস্থিত।

এ ছাড়া কোয়েম্বাটোরে অবস্থিত সাউথ ইণ্ডিয়া ভিসকোজ লিঃ এর সঙ্গে ইটালভিসকোজা ইটার্ণ ট্রেডিং কোম্পানী যুগ্ম পরিচালনার কাজে নামেন।

বিখ্যাত FIAT 1100 গাড়ী এখন ভারতেই তৈরী হচ্ছে। এটি তৈরী করছেন বোম্বের প্রিমিয়ার অটোমোবাইল্স্ লিঃ ফ্রান্সের FIAT কোম্পানীর সঙ্গে যুগ্ম পরিচালনায়। বোম্বের কারখানাটি অবস্থিত কুর্লাতে। তারদেও অবস্থিত বোম্বে অটোমোবাইল্স্ প্রোডাক্টস্ ইটালীর মিলান শহরের ইনোসেন্টি কোম্পানীর সংগে যুগ্মভাবে Lambretta স্কুটার তৈরী করছেন। Vespa স্কুটার তৈরী করছেন বোম্বের বাজাজ অটো কোং জেনোয়ার Piaggio & Co. সংগে যৌথ কারবারে। ১৯৫৭ সালে বোম্বের টাটা কোং ফ্রান্সের CEAT Gomma প্রতিষ্ঠানের সংগে যৌথভাবে CEAT Tyres of India Ltd. প্রতিষ্ঠানটি গঠন করেন। ভারতস্থ ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেকেই বহু ইটালীয় প্রতিষ্ঠানের সংগে যুগ্ম সংগঠন তৈরী করেছেন।

ইস্টার্ণ রেলওয়ে হাওড়া বর্ধমান রেল লাইন বৈদ্যুতিক করণের কাজ করেছেন ইটালীর প্রতিষ্ঠান। আসানসোল—গয়া লাইনের কাজও তারা নিয়েছেন। পেট্রোলিয়ম প্রোজেক্টগুলোতেও ইটালীর প্রতিষ্ঠান ভারত সরকারের সংগে যৌথ পরিচালনার চুক্তি নিয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানটি হল ইটালীর বিখ্যাত Ente Nazionale Idrocarburi। বারাউনি থেকে দিল্লী এবং বারাউনি থেকে কলকাতা—এ দু' স্থানে পেট্রোল পাইপ লাইন বসাবার দায়িত্ব নিয়েছেন এঁরা। এছি আরো বহু ক্ষেত্রে ইটালী প্রতিষ্ঠানগুলো ভারতকে নানাভাবে সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছেন।

ভারত-ইটালী বাণিজ্য সম্পর্কও অল্পের প্রয়োজনীয়তার সূত্রে আবদ্ধ। ভারত থেকে ইটালীতে ৮০ মিলিয়ন টাকার জিনিষ যায় এবং ইটালী থেকে ভারতে ২৪৫ মিলিয়ন টাকার জিনিষ আসে। এটা ১৯৬০ সালের হিসেব।

ভারত থেকে ইটালীতে যায়: লৌহ-এবং ম্যাঙ্গানিজ আকর, মাইকা, কফি, চা, কাঠ, চামড়া ইত্যাদিই মুখ্য।

ইটালী থেকে আসে: যান্ত্রর উপকরণ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, যানবাহনের উপকরণ, রাসায়নিক, ফার্মাসিউটিক্যাল দ্রব্য, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আরো কিছু জিনিষ।

ভারত-ইটালী বাণিজ্যে ভারতের ঘাটতির পরিমাণ ১৬২ মিলিয়ন টাকার। ১৯৫৭ সালে এ-অঙ্ক ছিল ২৩১ মিলিয়ন টাকা। ধীরে ধীরে ভারতের অবস্থা উন্নততর হচ্ছে।

পশ্চিম জার্মানীর বাডেন্-ভুরেরটেম্বার্গ প্রদেশের রাজধানী ষ্টুটগার্টের একটি পুস্তক প্রকাশক সংস্থা, ফ্রান্জ্ই ষ্টাইনার, লাটিন অক্ষরে সংক্ষেপে সংস্কৃত মূল বচনসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটি জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। ও দেশের অনেকেই বহুদিন থেকে এমনি একটি বইয়ের প্রয়োজন বোধ করছিলেন; এবার ঠিক বড়দিনের আগে তাদের সে আশা পূরণ হয়েছে। পশ্চিম-জার্মানীর ইন্দোজার্মান সোসাইটির বহু সভ্যই ইতিমধ্যে বইটি কিনে ফেলেছেন। গীতার এই অনুবাদ গ্রন্থটির মুখপত্র রচনা করেছেন বাঙ্গালোরের ডঃ অনন্ত রমন, যিনি গতবছর পশ্চিম জার্মানীতে বক্তৃতা করে ওখানে খুব নাম করেছিলেন।

জাপান ॥

পূর্বদিগন্তে জাপানের জাগরণ একসময় পশ্চিমী শক্তির ভয়ের কারণ ছিল। গত যুদ্ধে মার খেয়ে কিছুদিনের জন্য জাপান মাথা নীচু করলেও এশিয়ার মধ্যে জাপানের শিল্পোন্নয়নের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যে কোন পশ্চিমী দেশের সংগে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম কোন দেশ যদি এশিয়াতে থেকে থাকে, সে হ'ল একমাত্র জাপান।

জাপানে এমন কোন শিল্প নেই, যা নাকি সমৃদ্ধ হয় নি। বস্ত্র শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, কাগজশিল্প রেশম শিল্প, দেশলাই শিল্প প্রভৃতি নিয়ে জাপানের অধিকার আজ একবাক্যে স্বীকৃত।

বস্ত্রশিল্পে জাপানের আবির্ভাব এককালের সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনকে এশিয়া আফ্রিকার বুক থেকে সরিয়ে দিয়েছে। মজুরী কম লাগে বলে কাপড়ের দাম কম পড়ে এবং ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অন্য যে কোন দেশকে বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় জাপান হারাতে পারবে এ আর আশ্চর্যের কি। সত্যি সত্যিই এ শিল্পে জাপান অদ্বিতীয়। ওসাকা জাপানের ম্যাঞ্চেষ্টার। বাস্তব পক্ষে ওসাকা ম্যাঞ্চেষ্টারের চেয়ে বড় শহর এবং কার্পাস শিল্পের কেন্দ্র। কাপড়ের কল নাগোয়া এবং কোবে অঞ্চলেও রয়েছে। জাপানকে ভারত, পাকিস্থান,মিশর, আমেরিকা থেকে তুলাটা আনতে হয়। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প কিউহু অঞ্চলে প্রধানতঃ অবস্থিত। এশিয়ার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ইস্পাত উৎপাদক দেশ হল জাপান। ইয়াওয়াটার বিশাল ইস্পাত কারখানা এশিয়ার বৃহত্তম কারখানা। ভারতবর্ষের টাটা কারখানার চেয়েও অনেক বড়। এ ছাড়া জাপানের প্রধান বন্দরগুলোতে ইস্পাতের কারখানা রয়েছে। ওসাকা, কোবে, ইয়োকোহামা প্রভৃতি স্থানে নানাপ্রকার ইঞ্জিন, কলকারখানার যন্ত্রপাতি, যানবাহন প্রভৃতি তৈরী হয়। জাপান বর্তমানে বৎসরে ১ কোটি টনের বেশি ইস্পাত উৎপাদন করে।

জাহাজ-নির্মাণ-শিল্প জাপানের নাগাসাকি, কোবে, ওসাকা, ইয়োকোহামা প্রভৃতি অঞ্চলেই গড়ে উঠেছে। জাপানী জাহাজ শ্রমিকগণ খুব দক্ষ ও এদের মজুরী পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম। একসময় ছিল যখন জাহাজ নির্মাণে জাপানের কাছে বৃটেনকে পর্যন্ত হার মানতে হয়েছিল। বর্তমানে এ শিল্প অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। আগের মত আর এ শিল্পের দাপট সেখানে নেই। শিমোনোসেকি কাগজ শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। তাছাড়া বিভিন্ন রকম বাসন দ্রব্যাদি, ছাতা, খেলনা প্রভৃতি শিল্পও সেখানে প্রচুর তৈরী হয় এবং বিদেশে রপ্তানী হয়।

বৃটেন ও আমেরিকার পরে ভারতীয় দ্রব্যের তৃতীয় বড় ক্রেতা হল জাপান। ১৯৫২ সালের আগে তৃতীয় বড় ক্রেতা ছিল অষ্ট্রেলিয়া। ১৯৬৮ সাল থেকে জাপানের বাজারে ভারতীয় দ্রব্যের পরিমাণ বাড়তে আরম্ভ করেছে। ভারত থেকে জাপানে প্রধানতঃ যায় শিল্পজ ও কৃষিজ কাঁচা মাল। যেমন লৌহশিলা, ম্যাঙ্গানীজ, তুলা, কয়লা, লবণ, অভ্র প্রভৃতি। ভারত থেকে লৌহশিলা (Iron ore) বাইরে যায়, তার দু তৃতীয়াংশ জাপানে যায়। তুলা ভারত থেকে যত রপ্তানী হয়, তার ৮০ ভাগ যায় জাপানে। ভারত থেকে ম্যাঙ্গানীজের আমদানীকারক দেশগুলোর মধ্যে আমেরিকার পরেই জাপানের স্থান। জাপানের মোট প্রয়োজনের ৬০ ভাগ ম্যাঙ্গানীজ ভারত থেকে যায় অর্থাৎ বছরে গড়ে ২ কোটি টাকার মূল্যের ম্যাঙ্গানীজ। ম্যাঙ্গানীজের বাজারে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী হল, রাশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন ও ফিজি দ্বীপপুঞ্জ। ভারত জাপানে চা, কফি, আকরীয় লৌহও রপ্তানী করা আরম্ভ করেছে। ১৯৬০ সালে জাপানে ভারতীয় দ্রব্য যায় ৩৪·২৮ কোটি টাকার।

জাপান থেকে ভারতে আসে ১৯৬০ সালে ৪৪·২৮ কোটি টাকার মিনিস, জাহাজ, নানারকম ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, কাগজ, খেলনা প্রভৃতি।

ভারতীয় শিল্পমেলা ॥

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে মার্কিনযাত্রার (ইউ-এস-আই-এস) আমন্ত্রণে পূর্বাঞ্চলের (বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম) একদল সাংবাদিকের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে দিল্লীতে ভারতীয় শিল্পমেলা দেখার সুযোগ আমার হয়। আমাদের শিল্পমেলার সূচী ছিল মাত্র তিনদিনের মধ্যে সীমিত এবং এই তিন দিনের পুরো একটি দিন শুধু মার্কিন মণ্ডপ দর্শনেই অতিবাহিত হয়। কাজেই এই বহুবিস্তৃত শিল্পমেলা পূর্ণাঙ্গরূপে দেখার সুযোগ আমার হয় নি। তাই আমার এ বিবরণীতে শিল্পমেলার পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরা সম্ভব হবে না। তিন দিনের স্বল্প সময়ের মধ্যে শিল্পমেলার যতটুকু আমি দেখিছি এবং তা দেখে যা আমার মনে হয়েছে সে কথাই এখানে পেশ করেছি।

১৯৬১র ১৬ই নভেম্বর উপ-রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণন কর্তৃক উদ্বোধিত এই ভারতীয় শিল্পমেলাটি হচ্ছে এবিষয় মেলার ইতিহাসে দ্বিতীয়। প্রথম ভারতীয় শিল্পমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ৬ বছর আগে ১৯৫৫ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রারম্ভালে। আর তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সূচনায় অনুষ্ঠিত হলো এই দ্বিতীয় ভারতীয় শিল্পমেলা। এই শিল্পমেলার সঙ্গে 'ভারতীয়' কথাটি যুক্ত হলেও এর রূপটি কিন্তু আন্তর্জাতিক। চীন ও পাকীস্তান ছাড়া বিশ্বের ১৮টি রাষ্ট্র এই শিল্পমেলায় অংশ গ্রহণ করেছে। ১৮টি বিদেশী রাষ্ট্রের মধ্যে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, পূর্ব জার্মানী, পশ্চিম জার্মানী, ইতালী, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, অস্ট্রিয়া, জাপান, পোলাণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ড। প্রথম ভারতীয় শিল্পমেলায় চীন ও পাকীস্তান অংশ গ্রহণ করেছিল, এবার তাদের অনুপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

এই দ্বিতীয় শিল্পমেলাটি হচ্ছে ভারতে ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত মেলাগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ। বিশালতার দিক থেকে মাত্র ৬ বছরের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত দুটি শিল্পমেলার মধ্যে পার্থক্য অনেক। প্রথম ভারতীয় শিল্প মেলার আয়তন ছিল ৭২ একর আর এবারের এই দ্বিতীয় শিল্পমেলার আয়তন হচ্ছে ১৮০ একরেরও বেশি এবং মেলার সমুদয় মণ্ডপ ও স্টল সম্পূর্ণরূপে পরিদর্শন করতে ৩৪ মাইল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়। আর একটি কথায় এই শিল্পমেলার সুবিশালতা উপলব্ধি করা যাবে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আনীত জিনিসপত্র ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র বিদেশী রাষ্ট্রসমূহ থেকে আনীত প্রদর্শনী দ্রব্যের মোট মূল্য হচ্ছে প্রায় ২৪ কোটি টাকা এবং ভারতীয় রেলপথের এক হাজারটি ওয়াগন ১৩ হাজার টন প্রদর্শনী-দ্রব্য মেলায় বহন করে এনেছে।

এই মেলাটির নাম যখন শিল্পমেলা তখন স্বভাবতই ধরে নেওয়া যায়, এটি হচ্ছে মূলত শিল্প সামগ্রীরই প্রদর্শনী। কিন্তু শুধু শিল্পসামগ্রী নয়, আরও বহু বিচিত্র দ্রব্যসম্ভার প্রদর্শিত হয়েছে এই মেলাতে। ভারতীয় উদ্যোগের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যা এই মেলায় প্রদর্শিত হয় নি—সরকারী বেসরকারী, ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্ব প্রকার উদ্যোগই এতে স্থান পেয়েছে। এই মেলায় একদিকে যেমন দেখা গেছে আধুনিক

বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার প্রগতির চিহ্ন, অপর দিকে তেমনি ক্রমোন্নত শিল্পসমূহের বহু বিচিত্র সম্ভার। স্পুটনিক ও এরোমোবিলের মডেল যেমন আছে, তেমনি আছে বৃহদাকার যন্ত্রপাতি থেকে অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের সমাবেশ এবং তার পাশাপাশি আছে নয়নবিমোহন নকসা ও বিচিত্রবর্ণ হস্ত শিল্পদ্রব্য।

ভারতীয় শিল্পমেলায় অংশ গ্রহণকারী বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বৃহত্তম মণ্ডপটি হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। এই মণ্ডপটি প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এর শিল্পীমনোচিত বিন্যাসের ধরন। আর একটা বিশেষ কারণে এই মার্কিন প্রদর্শনী মনে রেখাপাত করে। সেটা হচ্ছে এই মণ্ডপে এমন সব যন্ত্র ও যন্ত্রপাতি দেখানো হয়েছে যেগুলি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারতের কাজে লাগবে ও ভারতীয়দের মনে আগ্রহ সঞ্চার করবে। এই মণ্ডপে যন্ত্রগুলি কেবলমাত্র প্রদর্শন করা হচ্ছে না, সেগুলি চালিয়ে দেখানোও হচ্ছে। বিদ্যুৎ ও জলচালিত লিফট ট্রাক থেকে আরম্ভ করে পুরানো জীর্ণ টায়ারকে নতুন করার প্রক্রিয়া, আধুনিক মুদ্রণ যন্ত্রপাতি, ছোট বড় ট্রাকটর, ঢালাই-এর সামগ্রিক প্রক্রিয়া, প্লাষ্টিক পাইপ তৈরী, নবাবিষ্কৃত সিলিকোনের বিচিত্র ব্যবহার ইত্যাদি সব কিছুই হাতে কলমে করে দেখানো হচ্ছে। এ জিনিসটা আমার খুব ভালো লেগেছে। মার্কিন মণ্ডপের সবচেয়ে আকর্ষনীয় বস্তুটি হচ্ছে 'এরোমোবিল' নামে অভিহিত বিচিত্র যানটি। এই যানের চাকাও নেই বা পাখাও নেই। যানের তলদেশে বহু ব্লেডের সাহায্যে বাতাস সৃষ্টি করা হয়। এই সৃষ্ট বায়ুস্তরের উপর ভর দিয়ে মাটি থেকে কয়েক ইঞ্চি উপর যানটি চলতে পারে। এ ছাড়া যে মার্কারি ক্যাপসুলযোগে শেপার্ড ও গ্রিসম মহাকাশ পরিভ্রমণ করেছিলেন তার মডেলটি এ মণ্ডপে প্রদর্শিত হয়েছে এবং এ মডেলটি দেখবার জন্যে জনসাধারণকে দীর্ঘ লাইনে ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে।

সোভিয়েট মণ্ডপ যেদিন দেখতে যাই, সেদিন সেদিন সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ব্রেজনেভ সে মণ্ডপ পরিদর্শন করতে এসেছিলেন। তাই মণ্ডপের সামনে দেখলুম বিপুল জনসমাগম। এই মণ্ডপ পরিদর্শন করলে বোঝা যায়, আগামী ২৪ বছরে সোভিয়েট অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও তার কর্মসূচীর এক সামগ্রিক চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে অগণিত যন্ত্রপাতি ও মডেলের সাহায্যে। বস্ত্রশিল্প, কৃষিকার্য, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইত্যাদিতে ব্যবহার্য নানারকম মেশিন ও যন্ত্রপাতির সমাবেশ দেখলুম। এই মণ্ডপের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তুটি হচ্ছে গাগারিন যে 'ভোস্তক' মহাশূন্য যানে মহাকাশ পরিক্রমা করেছিলেন হুবহু সেই রকমের একটি পূর্ণাঙ্গ মডেল। আর একটি আকর্ষণীয় বস্তু হচ্ছে সৌরশক্তি মানুষের নানা কাজে ব্যবহারের প্রদর্শনী।

প্রদর্শনী বিন্যাসের দিক থেকে মার্কিন মণ্ডপের পর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যুক্তরাজ্য বা ব্রিটেনের মণ্ডপটি। এই প্রদর্শনী গঠনে যে মূল কথাটি ব্যক্ত হয়েছে তা হচ্ছে ভারতের উন্নয়নের নানা ক্ষেত্রে ব্রিটেনের সহযোগ। এই সহযোগ রূপায়িত হয়েছে শিল্পে, অর্থনীতিতে, স্বাস্থ্যোন্নয়নে, যোগাযোগ ব্যবস্থায়, উৎপাদন ও জ্ঞান বিস্তারে। এ ছাড়া, আছে জলে স্থলে আকাশে পরিবহনের সহযোগ। ১৮২৫ সালে ব্রিটেন থেকে ভারতে সর্বপ্রথম আগত বাষ্পীয় যানের চিত্রটি এই বিভাগের একটি বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু।

ফ্রান্সের মণ্ডপে প্রধানত প্রদর্শিত হয়েছে বিবিধ বিমান যান ও বিমান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'কারাভেল' নামে অভিহিত যাত্রী জেট বিমান যান এবং 'অ্যালোয়েত্তি' নামে অভিহিত হেলিকপ্টার।

পশ্চিম জার্মানী, পূর্ব জার্মানী, পোলাণ্ড, হাঙ্গেরী, ইতালী, জাপান, প্রভৃতি বিদেশী রাষ্ট্রগুলির

মণ্ডপে নানাবিধ মেশিন ও যন্ত্রপাতিই মূলত প্রদর্শিত হয়েছে। এই সব মণ্ডপ দেখতে দেখতে একটা কথা বার বার মনে হচ্ছিল, ভারতের তুলনায় কত ক্ষুদ্র এই দেশগুলি, অথচ সূক্ষ্ম ও নানাবিধ যন্ত্রপাতি নির্মাণের দিক থেকে এরা ভারতকে পেছনে ফেলে কত এগিয়ে গেছে!

ভারতের মণ্ডপ বহু শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে এর সববিভাগ পূর্ণাঙ্গরূপে দেখা সম্ভব নয়। যেটুকু আমি দেখেছি তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো লেগেছে পরমাণু-শক্তি সংস্থার মণ্ডপ। এই মণ্ডপে ভারতের তিনটি পরমাণুচুল্লী অপসরা, কানাডা-ভারত রিয়াক্টর এবং 'ভারলীনা'র মডেল প্রদর্শিত হয়েছে। এ ছাড়া, শান্তির কাজে পরমাণু শক্তির বিবিধ ব্যবহার, এবং পারমাণবিক খনিজ সংক্রান্ত প্রদর্শনী বস্তুগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারতের খনিজ তেল, প্রতিরক্ষা এবং রেলওয়ে মণ্ডপগুলিও দর্শনীয়।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্য তাদের দ্রব্যসামগ্রী এই মেলায় প্রদর্শন করেছে। তার মধ্যে সবচেয়ে 'দীন' মনে হলো আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মণ্ডপ। বাংলাদেশের ময়ূরপঙ্খী নৌকার সৌসাদৃশ্যে গঠিত এই মণ্ডপটির বহির্বিন্যাস যেমন মনকে পুলকিত করে, ঠিক তেমনি আঘাহত করে এর অন্তর্ভাগের 'রিক্ত' রূপ। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পদ্রব্যের শ্রেষ্ঠ উপকরণগুলিও এই মণ্ডপে তুলে ধরা হয় নি। বাংলার তাঁতশিল্প, মৃৎশিল্প, পুতুল শিল্পের সাধারণ স্তরের কয়েকটি নিদর্শন এখানে প্রদর্শিত হয়েছে। জন্মভূমির এই 'দীনা হীনা' রূপ দেখে আমি যেমন ব্যথিত হয়েছি তেমনি মর্মাহত হয়েছেন অপর যে কোনো বাঙালীমাত্রই (নিজের জননী-জন্মভূমিকে কোন্ সন্তানই বা মহিমান্বিত ঐশ্বর্যময়ী রূপে দেখতে চায়!)

পরিশেষে, এই শিল্পমেলার উপযোগিতা ও সার্থকতা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলে উপসংহার করতে চাই। পূর্বেই বলেছি এই শিল্পমেলা 'ভারতীয়' নামে আখ্যাত হলেও এর রূপ আন্তর্জাতিক। সেদিক থেকে এই শিল্পমেলা বিশ্বের সর্বপ্রান্তের শিল্পব্যবসায়ী ও প্রস্তুতকারকদের মিলনক্ষেত্রের পথ প্রসারিত করেছে। একদিকে এই শিল্পমেলা যেমন বিদেশী ক্রেতাদের দৃষ্টি ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট করেছে, অপর দিকে তেমনি ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মনে নব নব ক্ষেত্রে শিল্পোদ্যোগ ও প্রচেষ্টার প্রেরণা যুগিয়েছে। সর্বোপরি, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মানুষদের মধ্যে ভাববিনিময়, মৈত্রী ও সৌভ্রাত্রের বন্ধন রচনা করেছে এই শিল্পমেলা। এবং এইখানেই ভারতীয় শিল্পমেলার সর্বাপেক্ষা সার্থকতা ও উপযোগিতা। উপ-রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণান এই প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—'The agencies of material development will not fulfil their full purpose; if they do not help a wider appreciation of the processes of economic growth and better understanding among the peoples of the world.'

মডার্ণ ডেকরেটরস
৬৫-এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ফোন-৫৫-২৫৮৯

গল্প-ভারতী

মাঘ—১৩৬৮

সম্পাদক :

সহঃ সম্পাদক : শ্রীকল্যাণ রায়

মূল্য—এক টাকা

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড ২১৯বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে
শ্রীসুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত এবং কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড,
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

.....কেশ পরিপোষে ঈদৃশ কেন?

লোমা

সাদা চুলকে চিরস্থায়ী কালো ক'রতে—অদ্বিতীয়—

সোল এজেন্ট :এম, এম, খাম্বাটওয়ালা, আমেদাবাদ

এজেন্ট :—শা বভিসী এণ্ড কোং
১২৯ রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

সোল এজেন্টস্ :—
এম. এম. খাম্বাটওয়ালা
আমেদাবাদ—১

এজেন্ট :—
শাহ বাভিশী এণ্ড কোং
১২৯, রাধাবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—

ফোন :- ২২-১০১৮

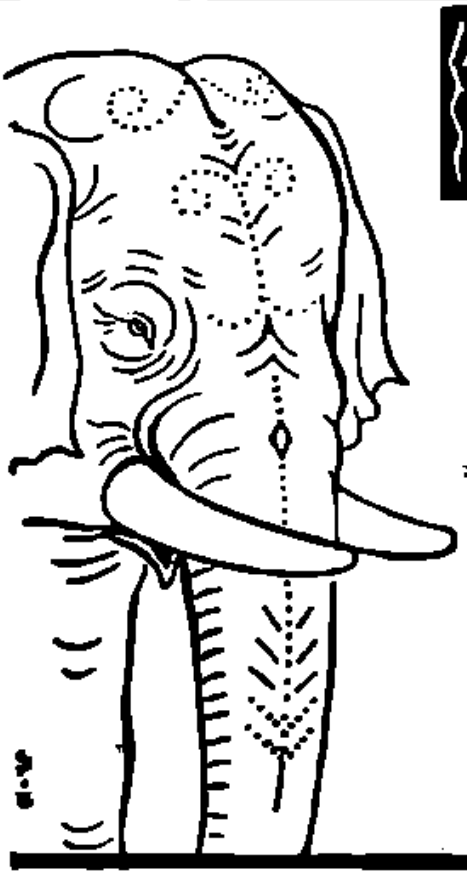

Lord's

যে কোন উপলক্ষেই

লর্ডের

লজেন্স
ও
টফি

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়	৬৪৭
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—শ্রীকালিদাস নাগ	৬৫০
ঢেউ—দিলীপকুমার দাশগুপ্ত	৬৫৪
পাহাড়ী গাঁয়ের কথা—নীলিমা দাশগুপ্ত	৬৬০
চলতি দুনিয়া—	৬৬৬
জাপান দেশে সংস্কৃত ভাষার চর্চা—অধ্যাপক অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৬৬৮
এ জন্মের ইতিহাস (উপন্যাস)—সুশীল সিংহ	৬৭১
অমৃত কথা ও কাহিনী—	৭৩৪
সাহিত্য সংবাদ—	৭৩৬
বাঙ্গালা ভাষা—স্বামী বিবেকানন্দ	৭৩৮
সাহিত্য ও সাহিত্যিক—শ্রীসুদর্শন পাল	৭৪০
সমাজ ও সাহিত্য—নারায়ণ চৌধুরী	৭৪৩

দেহের রোগ প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তুলুন !

সর্দিকাশি লেগেই আছে..হরদম হজমের গোলমাল...শরীরে অবসাদ, দুর্বলতা—এ সব লক্ষণগুলোকে অবহেলা করবেন না। কারণ, এগুলো আরও কোন গুরুতর পীড়ার সংকেত হতে পারে। আজ থেকেই নিয়মিত মাল্ট ইমালশন খেয়ে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলুন।

সহজে শরীর সুস্থ ও সবল করে তুলতে হলে এই সুসংবাদ: ইমালশনটির মত এমন জিনিস আর নেই।

MANDH
মাল্ট

ইমালশন

মার্টিন অ্যাণ্ড হ্যারিস (প্রাইভেট) লিমিটেড

কলিকাতা · বোম্বাই · নিউদিল্লী · মাদ্রাজ

এই সংখ্যায়

ভারত ভ্রমণে—সুনীল কুমার নাগ ৭৪৯
গ্রন্থ-পরিচয়— ৭৫১
শুক্তি-সৈকত—বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয় ৭৫৪
ইতিহাসের পাতা থেকে— ৭৬০
সেকালের সভা-সমিতি— ৭৬৩
পুরাতন পাতা— ৭৬৫
উপেন্দ্রনাথ স্মরণে— ৭৬৭
দেশ-বিদেশ— ৭৬৯
শিল্পীর তুলিতে— ৭৭৩
স্বামী বিবেকানন্দ স্মরণে— ৭৭৫
সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ— ৭৭৭
প্রাণি-জগৎ— ৭৭৮

অব্যাহত গতি

এককালে মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত রচনা করিয়া ইহাকে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য একজন লেখকের খোঁজ করিতেছিলেন। কিন্তু কেহই এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ সম্মত হইলেন না। অবশেষে পার্বতী-তনয় গণেশ এই শর্ত রাজি হইলেন যে তাঁর লেখনী মুহূর্তের জন্যও থামিবে না।

আধুনিক যুগের লেখকগণও চান যে তাঁদের লেখার গতি কোনক্রমেই ব্যাহত না হয়। আর এই অব্যাহত গতির জন্যই সুলেখা আজ এত জনপ্রিয়

সুলেখা ওয়ার্কস্ লিঃ ; কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

পীলো তো থোড় ম্হারী গোরী পাণী হে বালী
সারো হী গাম লুভায়ো গড়া মাহ্মী
অল্লা নে পল্লা সাহিব মোর পর্পয়া
পূংঘট ঊপর নণদল বাই রো বীর

মনোহর লাবণ্য

রাজস্থানের সুন্দরী যুবতী, আঁচলায় মহুয়া ও কোকিলের মনোরম নক্সা-বিশিষ্ট "পীলো" শাড়ীটি দিয়ে নিজের গৌরদেহ আচ্ছাদিত ক'রে জল আনতে চলেছে। আর সমগ্র গ্রাম অবাক হ'য়ে চেয়ে আছে তার পানে।

হস্তচালিত তাঁত

সপ্তদশ বর্ষ ॥ ষষ্ঠ সংখ্যা. মাঘ ১৩৬৮

গল্প-ভারতী

সম্পাদকীয়

স্বামিজি ও নেতাজী

বিবেকানন্দ উৎসব শুরু হয়েছে তাঁর ১৯৩ম জন্মদিন থেকেই এবং পূর্ণ হবে ১৯৬৩-৬৪ শীতকালে। ৩ নং গৌর মুখার্জী লেনে শিমুলিয়া দত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে নরেন্দ্র দত্ত পারিবারিক অশান্তি ও অর্থকষ্ট সহ্য করেন। ফলে ১৮৭৩-১৮৮৩ এই ১০ বছর মামলা মকদ্দমায় বড় বাড়িটি বিভক্ত হয়ে যায়, তার কাহিনী আদালতের দলিলপত্র থেকে উদ্ধার করা উচিত, কিন্তু করা হয় নি। 'উদ্বোধন' পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় আমি এসব কথা তুলেছি ও জেনেছি তাঁদের প্রকাশিত বিবেকানন্দ-পত্রাবলী শতবার্ষিকী সংস্করণে— ২২৯ খানি পত্রের স্থলে ৫৫৩ খানি চিঠি ছাপা হবে। তা ছাড়া নরেন্দ্রের দুই ভ্রাতা মহেন্দ্র ও ভূপেন্দ্র দত্তদের চিঠি ও রচনাদি থেকেও বহু তথ্য মিলবে। স্বামীজি-শতাব্দী-কমিটির সদস্য রূপে এসব প্রস্তাব তুলেছি ও অন্য ভাষায় অনুবাদ হবার আগে কলিকাতা থেকে definitive texts of the collected works of Swami Vivekananda—অর্থাৎ স্বামীজির সংশোধিত পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ ছাপা উচিত। ইংরেজী থেকে প্রথম বাংলার পরে হিন্দী তামিল প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ করা যাবে। তার জন্য কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার টাকা দেবেন। কিন্তু শুধু টাকায় নয় দক্ষ মানুষদের দিয়ে বিবেকানন্দ 'খোঁজ পরিষদ' অবিলম্বে তাঁর জন্মস্থান কলিকাতায় গড়া দরকার। তবেই 'ঋষিঋণ' কথঞ্চিৎ শোধ হবে। মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে স্বামীজি চলে গেছেন। তাঁকে দেখে তাঁর বাণী শুনে যাঁরা মিশনে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা সবাই প্রায় চলে গেছেন। শেষ গেলেন বেলুড়ের অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দ। তাঁর অভাব গভীর ভাবে অনুভব করি ও স্বামী শিবানন্দকে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। কারণ তাঁকে অনুরোধ করায় তিনি সমগ্র গ্রন্থাবলী ও 'কথামৃত' 'লীলা প্রসঙ্গ' প্রভৃতি বই ফরাসী মনীষী Romain Rolland [1866-1944]-কে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে রম্যা রলাঁ রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ এই দুটি ফরাসী ভাষা থেকে বহু ভাষায় অনুবাদ হয়েছে [১৯২৫-৩৫]। সে যুগের চিঠিপত্র মাদাম রলাঁর কাছে কিছু আছে। কিন্তু বেলুড় মঠের থেকে পত্রাদির কপি তাঁর সহধর্মিণী [Rolland Centre, 69 Bould. Montparnasse. Paris.] এ পর্যন্ত পান নি ; তাঁর অনুরোধ বিবেকানন্দ শিক্ষদের জানিয়েছি। আশা করি তাঁরা তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা দেবেন। মাদাম রলাঁ যেমন এ বছর Tagore & Rolland ছেপেছেন তেমনি আগামী বছর Vivekananda & Rollanda [সটীক] ছাপাতে রাজী আছেন। আমাদের দায়িত্ব বেলুড় তথা ভারতীয় উপাদান সংগ্রহ করে উল্লিখিত ঠিকানায় মাদাম রলাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া। বিবেকানন্দ শতাব্দী উৎসব ও বক্তৃতাদির হিড়িকে পাছে এই অতি প্রয়োজনীয় কাজ

অনবধানে থেকে যায় তাই সাধারণকে এ কথা জানানোয়। উৎসবের সম্পাদক স্বামী সত্যজ্ঞানন্দজীর Publications কমিটি ও অদ্বৈত আশ্রমের স্বামী গম্ভীরানন্দজীর সাহচর্যও আমাদের বাঞ্ছনীয়।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বিবেকানন্দের প্রেরণায় জীবন গঠন করে দেশমাতৃকার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে গেছেন। তাঁকেও এই শতাব্দী উৎসবে বারবার স্মরণ করব। দেশনায়ক সুভাষচন্দ্রের জন্মদিবস ২৩শে জানুয়ারী দেশের স্মরণীয় দিন।

৺ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামিজির কনিষ্ঠ সহোদর, ৮৩ বছর বয়সে চলে গেলেন—বিবেকানন্দ শতবার্ষিকীর প্রারম্ভে। তাঁর বহু পরিশ্রমের ফল—বিবেকানন্দের জীবনী সম্বন্ধে পাঠ করা উচিত ও 'যুগান্তর' প্রভৃতি পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে তাঁর কথা ছাপলে আমরা সুখী হব। কংগ্রেস জন্মের আগেই ভূপেন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন ও আদি যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক রূপে স্বদেশীযুগে কারাবরণ করেন। 'পত্রিকা' অফিসের সঙ্গে কর্মীদল তখন থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত একটি ধারাবাহিক বিবরণী ছাপাতে পারেন। মার্কস-বাদী পণ্ডিতরূপে পরিজ্ঞাত হলেও U. S. A. ও ইউরোপে বহুকাল অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন [১৯০৯ ২৪]; Indian Social Policy, Land Economies of India, Indian art in relation to culture, Dialectics of Hindu Spiritualism এবং সর্বোপরি Vivekananda the Patriot-Prophet সবাইকে পাঠ করতে অনুরোধ করি। বেলুড়-মিশনের সঙ্গে যোগরক্ষা করতে না পারলেও ভূপেন্দ্র ও তাঁর মেজদাদা মহেন্দ্রনাথ সভীর পাণ্ডিত্যের ও গবেষণার পরিচয় দিয়ে গেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের অগ্রজ বিবেকানন্দের তাঁরা 'উত্তর সাধক'। তাই শতাব্দী উপলক্ষে তাঁদের সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করি। তাঁদের উদ্বাসন বাড়িটি কি হবে? উত্তরাধিকারী কেউ নেই। হয়তো পশ্চিমবঙ্গ সরকার—রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এটারও দায়িত্ব নেবেন। তবে এই কাজে দেরি হচ্ছে কেন?

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শতবার্ষিকী [১৮৬১—১৯৬১]

অধ্যক্ষ অমলানন্দ ঘোষ প্রভূত দক্ষতা ও সময়ের সঙ্গে Indian Archaeological Survey Centenary সুসম্পন্ন করলেন। সেজন্য তাঁকে ও তাঁর সহকর্মীদের অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই। পক্ষাধিক কাল দারুণ শীতে দিল্লীতে কাটিয়ে মস্ত লাভ হল। আমার প্রায় অর্ধশতাব্দী ব্যাপী ঐতিহাসিক পরিক্রমায় বহু সাক্ষীদের সঙ্গে এবার দেখা হল: লণ্ডন প্যারিস বার্লিন ইতালী গ্রীস থেকে শুরু ক'রে এশিয়া আফ্রিকা আমেরিকা ও পলিনেশিয়ার বন্ধুদের অনেকে এবার আমাদের সঙ্গে Asoka বা Ambassador হোটেলে ছিলেন। তাই বক্তৃতা ও আলোচনাদির ফাঁকে তাঁদের সঙ্গে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস নিয়ে নির্ভীক আলাপের সুযোগ পাই, যেমন ১৯৪৬ সনে পেয়েছিলাম Sir W. Jones [1746-1794] Bi-centenary বৈঠকে এবং Moscow আন্তর্জাতিক প্রাচ্য বিদ্যা সম্মেলনে [১৯৬০]। Prof. Tolstov এর প্রবন্ধ আমি Modern Review তে ছাপি; তিনি শক-কুষাণ যুগের বিশেষজ্ঞ Syr Darya অঞ্চলে খনন করে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। তাঁর বিদুষী স্ত্রীও নৃতত্ত্বে অভিজ্ঞা ও আমার পরলোকগত বন্ধু ডা: বিরজাশঙ্কর গুহের সমজদার। তেমনি মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণের সময় [১৯৫০-৫১] আমি ইরান-ইরাকে দেখি Prof Mallowan এর নাম সর্বত্র। এখন London University-র অধ্যাপক]। তিনিও সস্ত্রীক দিল্লী এসেছিলেন কিন্তু কলিকাতা যেতে পারেন নাই। তাই তাঁদের আমন্ত্রণ করে এলাম আগামী শীতে Jones এর Asiatic Society [১৭৮৪ প্রতিষ্ঠিত] ও Indian Museum দেখতে। সেখানে এত অমূল্য গ্রন্থ সম্ভার আছে যে তাঁদের মত বিশেষজ্ঞরাও বিস্মিত হবেন। খিদিরপুর ঘাট থেকে Supreme

Court পর্যন্ত Jones হেঁটে আসতেন ও "বগী" গাড়িতে ফিরতেন। গঙ্গা ভালবেসে গঙ্গাতীরের এই কলিকাতায় প্রথম সংস্কৃত শিক্ষা ও বৈদিক দেবতার উপর Edwin Arnold রচিত ইংরেজী কবিতা Light of Asia-র শতবর্ষ পূর্বে Jones শকুন্তলা প্রকাশ করে অমর হয়ে গেছেন। এই সব গল্প করছি Prof. Mallowan-কে মনে টানতে। তাঁর প্রখ্যাতা পত্নী Agatha Christie [Pen নাম] মন দিয়ে শুনছেন, তাঁকেও নিমন্ত্রণ করে জানালাম যে শুধু আমার তিন মেয়ে নয় বহু ভারতীয় College girls [গল্প-ভারতীয় বাড়িতেও] Agatha Christie রচিত Detective novels উন্মুখ হয়ে পড়ে। হয়তো রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রও পড়ে গেছেন। তাঁর স্বামী মাটি খুঁড়ে ইতিহাস রচনা করেন আর বিদুষী স্ত্রী মনটা খুঁড়ে অবচেতন স্তর থেকে 'অদ্ভুত রস কিম্‌দুকুষ' থেকে "স্বপ্ন প্রয়াণ" কাব্য গল্পে লিখে যাচ্ছেন। পাঁচকড়ি দের ডিটেকটিভ কাহিনী আমরা ছেলেবেলায় পড়েছি আর শেষ বয়সে ঐ সাহিত্যের সাম্রাজ্ঞী Agatha Christie-কে কাছে পেয়ে মুগ্ধ হলাম। আমার গুরুজী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন প্রত্নতত্ত্বের ঔপন্যাসিক। তাঁর কৃপায় আমরা খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকের Alexander যুগ থেকে ৫০০০ Proto-History-তে পৌঁছেছি সে যুগের Mohenjo Daro, Amri, Nal' প্রভৃতি পাকিস্তানে গেলেও Harappan Culture ছড়িয়ে পড়েছিল কাশ্মীর সিমলা-দিল্লী থেকে কাথিয়াওয়াড় [Lothal বন্দর] গুজরাট—রাজস্থান বিকানীর ও আদিগঙ্গা পর্যন্ত। এই সব অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারের ফলে দেশবিদেশের প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছেও ভারত 'তীর্থস্থান' হয়েছে এক নূতন তাৎপর্য নিয়ে। বিশাল চীন থেকে কেউ দিল্লীতে আসেন নি Himalayan Blunder-এর ফলে। কিন্তু ভুলটা কার? তাদের না আমাদের? Fa-hien [400] থেকে হিউয়েন সাঙ ও ই-চিঙ [700] পর্যন্ত চীনারা গোবি-মরু পার হয়ে ভারততীর্থ পরিক্রমা করেছে প্রায় হাজার বছর ধরে কিন্তু তাদের ধরে রাখতে আমরা পারলাম না; আজ ভারত-শত্রুরা তাদের কাজে লাগাচ্ছে। জাপানী ও মার্কিন বন্ধুদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ হল। আমি Indian Archaeology and Soviet Horizons ইত্যাদি বিষয়ে ভাষণ দিয়ে সুখী হলাম। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও রাখালদাসের স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা বাঙালীর অবিলম্বে করা উচিত। কারণ অক্ষয়কুমার মৈত্র—শতাব্দী এই ১৯৬১-৬২ সাল। রাজেন্দ্রলালের 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' পত্রিকা থেকে পণ্ডিত হরপ্রসাদ ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও প্রেরণা পেয়ে স্বীকার করে গেছেন।

বাঙালীর বাণিজ্য-যাত্রা

সখের যাত্রা ও পালা-গান ছিল সেযুগে বাঙালীর প্রাণ। কিন্তু গত ৫০ বছরে সেগুলি মৃতপ্রায়। তাই তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে থিয়েটার ও সিনেমা; এই প্রবল ও অভিনব মাধ্যমগুলি যদি অর্থ লুটতরাজ না করে বাণিজ্য লক্ষ্মীর সাধনায় বাঙালীকে ফেরাতে পারে তাহলে 'অর্থমনর্থম্' শ্লোক আউড়ে শোক করব না। কিন্তু বাংলা সিনেমায় সরস্বতী পূজার কিছু ঘটা থাকলেও লক্ষ্মীর আরাধনা যেন শুরুও হয় নি তাই মাতব্বর ডা: বিধানচন্দ্র রায় সেদিন তাঁর ভাষণে অনুযোগ করে বলেন যে capital বিরোধী তত্ত্বকথা যতই যুব-সমাজে চলুক capital formation বাদ দিলে, অলক্ষ্মী বিদায় নেবে না এই হতভাগ্য বাঙালী সংসার থেকে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আজ থাকলে তাঁর "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" নব-রূপে পরিবেষণ করতেন। তাঁর 'তাসের দেশ'খানি উৎসর্গ করে গেছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে, যিনি প্রথম National Planning কমিশন গড়তে চেষ্টা করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় Plan উৎরে তৃতীয় Planএ এখন

নামছি আমরা প্রধানত কোটি কোটি টাকা ধার করে। Deficit financing যতই চটকদার নাওক, আজ-যাহে-কাল ধার শোধ করতেই হবে; তখন রবীন্দ্রনাথের 'ঋণ শোধ' অভিনয় করলে বিদেশী পাওনাদারগণ আমাদের ছাড়বেন না। সেকথা প্রধানমন্ত্রী নেহেরু ও তাঁর নাতি রাজীবও জানেন। তাই বহুভাবে বহুকাল নির্যাতিত বাঙালীদের কোমর-বেঁধে কাজে নামতে হবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, তবেই বেকার সমস্যা মিটবে। আইনে না ও হওয়ারণোও নয় এ বিষয়ে গঠনমূলক পরিকল্পনা সংক্ষেপে লিখে পাঠালে আমরা পল্লীভারতীতে ছাপব। এখন ব্যঙ্গ-চিত্র ছেপে মনটাকে আগাতে চেষ্টা করছি। কিন্তু বাঙালী-জীবনের চলচ্চিত্র এমনই নিষ্ঠুর [অর্থের অভাবে] যে একটু প্রাচুর্য দেখে গেলে আমরা সুখী হব; সেজন্য চাই "অর্থশাস্ত্র"। পরে ভোগশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্র যথাযথভাবে আসবে। পৃথিবীর সঙ্গে সগৌরবে আমরা মহাভারত-যুগে অর্থশাস্ত্র। প্রকাশ করেছি এবার প্রয়োগ করতে হবে। তখন দুর্বাসা চাণক্য মুনিও হয়তো প্রসন্ন হয়ে বাঙালীদের আশীর্বাদ করবেন ও গ্রিল দ্বারকানাথ তাঁর পৌত্রের রহস্য সঙ্গীতে যোগ দেবেন—

আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল।
সবাই করছি টলমল—
কিন্তু 'বাণিজ্যেতে যাবই' এই প্রাণঘাতান সুর

'তালের তেলে' প্রাণের প্রাচুর্য আনবে। বাঙালী ছেলেমেয়ে তখন শুধু সরস্বতী নয় লক্ষ্মীপূজাও করে ধন্য হবে।

প্রকাশচন্দ্র শেঠ

Bengal National Chamber of Commerce and Industries—জাতীয় প্রতিষ্ঠান; তাঁদের ৭৫ বর্ষ পূর্তি উৎসবে যোগ দিয়ে দুঃখের সঙ্গে জানলাম তাঁদের সদস্য প্রকাশচন্দ্র শেঠের অকালমৃত্যু হয়েছে। তিনি ও তাঁর সুযোগ্য ভ্রাতা প্রবোধচন্দ্র আমাকে দুই বার তাঁদের কারখানা মুরারিপুকুর অঞ্চলে নিয়ে গেছেন ও বারীন ঘোষের বোমা-কারখানার আস্তানা দেখিয়েছিলেন।

মাত্র ৫৭ বছরে তিনি গেলেন অথচ তিনি প্রায় ২৪।৩০ বছর কঠিন পরিশ্রম করে শিল্প সাধনাকে সার্থক করেন। ১৯০৫-৬ সালের স্বাধীনতাই নৈরোজীর কংগ্রেসের সময় প্রকাশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। অনুশীলন-সমিতি থেকে শুরু করে যুক্তি সংঘ, নারী সমাজ ও ব্যবসায়ী দল তিনি হাওড়ায় এবং বড়বাজারে গড়ে তোলেন। তাঁর পুত্র কন্যা ও পরিজনদের সমবেদনা ও সহানুভূতি জানাই।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

শ্রীকালিদাস নাগ

সংবাদসাহিত্যের দিকপাল হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বিদায় নিলেন। গল্পভারতীও স্নেহশীল পিতৃতুল্য গুভানুধ্যায়ীকে হারাল। তাঁর উদ্দেশে আমাদের বেদনা এবং শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করি।

তিনি আজীবন খাঁটি বাংলালী ছিলেন ও বাঙলার কল্যাণ কিসে হবে এই চিন্তাই করে গেছেন। তাঁর দীর্ঘ জীবনে গড়ে তোলা Home Library-র মূল্য জানার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ, সেটি রক্ষার আশু ব্যবস্থা করুন। প্রায় কংগ্রেসের জন্মকাল থেকে এ পর্যন্ত কত পত্র পত্রিকা থেকে মূলক কাঁচি চালিয়ে তিনি ইতিহাসের উপাদান রেখে গেছেন। বাংলার এক সংকটময় যুগের ইতিহাস তা থেকে হয়তো লেখা হবে।

তাঁর বন্ধু ও সতীর্থ ডাঃ হরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় হেমেন্দ্রপ্রসাদের কঠিন রোগে ঘুমের ব্যাঘাত না হয় সেজন্য তাঁর বাড়ির রাস্তাগুলি ঘাস বিছিয়ে নিঃশব্দ করেছিলেন। গভর্নর-বন্ধুর সেই সেবার কথা হেমেন্দ্রবাবু সর্বদা বলতেন ও সেই সঙ্গে গল্প শোনাতেন। স্কুল থেকে পাশ করে, Presidency কলেজে কত বিখ্যাত অধ্যাপকদের কাছে দু'জনে পড়েছেন। আশা করি সেই কলেজের ছাত্ররাও তাঁর স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের Journalism ক্লাশ গড়ে তুলতে হেমেন্দ্রবাবু অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন ও সেইখানেই ছাত্র-ছাত্রীরা, আমাদের সঙ্গে মিলে, তাঁর ৮০ বর্ষপূর্তি উৎসব করেন।

১৮৭৬ সনে যখন তিনি যশোহরে জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁর গুরু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গদর্শন' 'প্রথম পর্ব' শেষ করেন ও জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ী থেকে 'ভারতী' পত্রিকার আবির্ভাব হয়। যশোহরের কবিস্থৃতি মাইকেলের সহযাত্রী [১৮৬২] সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে শিশুভ্রাতা রবীন্দ্রনাথকে রেখে বিলেত যান তাঁর বাড়ির অনেকের সঙ্গে হেমেন্দ্রবাবুর বন্ধুত্ব ছিল এবং তাঁর পত্নী যে কাবুলীওয়ালা গল্পের 'মিনি' হয়ে দেখা দেন সে গল্পও শুনেছি।

১৮৮৯ সালে ১৩ বছরের বালক হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। তার আগে তাঁর শিক্ষারম্ভ কৃষ্ণনগরে। সেখানে দুই বিখ্যাত বাগ্মী লালমোহন ঘোষ ও মনোমোহন ঘোষ তাঁকে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রেরণা দেন। তাঁর প্রথম কাব্যসংগ্রহের ভূমিকা লেখেন কবিবর নবীনচন্দ্র সেন যাঁর স্মারক সভায় সভাপতি ছিলেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ। তিনি আজীবন বঙ্কিম-ভক্ত। কারণ বিশ্বস্তর সেন-পদক তাঁকে নিজ হাতে দিয়েছিলেন [১৮৯৩] বঙ্কিমচন্দ্র, চৈতন্য লাইব্রেরী বার্ষিক সভায়,—সেকথা আমাদের নিজেই শুনিয়ে গেছেন। যশোহরের মহাত্মা শিশির ঘোষ হেমেন্দ্রপ্রসাদকে সংবাদ-সাহিত্যক্ষেত্রে নামতে প্রেরণা দেন। তাই অমৃতবাজার পত্রিকা থেকে শুরু ক'রে সুরেশ সমাজপতির "সাহিত্য" ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রদীপ' ও 'প্রবাসী' পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখে গেছেন। সব খুঁজে [Bibliography অনুসারে] হেমেন্দ্র-গ্রন্থাবলী শীঘ্র প্রকাশ করা উচিৎ।

১৯০৫-৬ সনের স্বদেশী যুগের প্রায় সব শ্রেষ্ঠ পত্রিকাতেই তিনি ইংরেজী ও বাংলায় লিখে গেছেন। উপাধ্যায়ের "সন্ধ্যা", বিপিন পাল ও শ্রীঅরবিন্দের "বন্দেমাতরম্" ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রকাশিত পত্রিকাদি খুঁজে তাঁর অতীত লেখার তালিকা তৈরি করতে হবে। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত "বসুমতী"র

কর্ণধার রূপে তিনি পত্রিকার প্রসার করে Rotary মুদ্রাযন্ত্র আমদানি করে নবযুগের সূত্রপাত করেন। পরবর্তীকালে ইংরেজ-শাসনের কড়া সমালোচক হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হেমেন্দ্রবাবু War Correspondent রূপে মধ্যপ্রাচ্যে ও ইওরোপের যুদ্ধক্ষেত্রাদি পরিদর্শন [১৯১৭-১৮] করে প্রবন্ধ লেখেন। কিন্তু তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে বাঙালী সাংবাদিক বহু টাকা খরচ করতে এগিয়ে আসেন নি। বহু বিখ্যাত সাংবাদিক ও বিদেশী নেতা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। তাঁদের নাম অপ্রকাশিত "ডায়েরী" থেকে উদ্ধার করা উচিত যেমন যশোহর-খুর্ণ Dr. P. C. Roy শতবার্ষিকীতেও করা আজ প্রয়োজন। এ বিষয়ে তাঁর স্মৃতিসভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা লাইব্রেরী রক্ষার কথাও তুলেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে [১৯৪৫] তাঁকে All India Newspaper Editors সম্মেলনের সভাপতি করে সম্মান দেখান হয়। তখন থেকে ভারত তথা বাংলা বিভাগের বিষময় ফল দেখে তাঁর সতর্কবাণী হেমেন্দ্রবাবু আমাদের শুনিয়ে গেছেন। নেতাজী সুভাষের কর্মপ্রণালীর পূর্ণ সমর্থন তিনি করে গেছেন ও শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর গভীর মিল ছিল। মোহাবাগানের বাড়িতে রাজ্যপাল হরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় থেকে কত দলের কত নেতা ও কর্মী হেমেন্দ্রবাবুর পরামর্শ নিতে আসতেন তা স্বচক্ষে দেখেছি। "অব্যবসায়ী" বাঙালী কাউকে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখলে তিনি দুর্বল-শরীরেও উৎসাহ দিতে যেতেন। তাঁদেরও অনুরোধ করি হেমেন্দ্র-স্মৃতি রক্ষাকল্পে কিছু করবার। এক্ষেত্রে ৪০।৫০ বছর ধরে তিনি ভেবে এসেছেন ও আমাদের ভাবিয়েছেন, তার প্রমাণ পাই গল্পভারতীর মধ্যে প্রকাশিত তাঁর শেষ রচনাগুলিতে। গল্প-ভারতীর প্রতিটি কাজে তাঁর সহযোগিতা পেয়েছি। বাঙালীর সভাসমিতি, অনুষ্ঠান নিয়ে মনোজ্ঞ প্রবন্ধ তিনি লিখতেন। তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করার লোক আর নেই, সেই কথা ব্যথিত হৃদয়ে স্মরণ করে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ আজ নিবেদন করি।

কবি ও সাহিত্যিক হেমেন্দ্রপ্রসাদকে ভুলতে বসলেও সাংবাদিক-শ্রেষ্ঠ তাঁকে বহুকাল বহুজন মনে রাখবেন তাঁর অভাব দিয়েছেন শুধু দেশীয় পত্রিকাগুলি নয়, বিদেশী সাংবাদিকগণও। আমি তাঁর সাহচর্য পেয়ে ধন্য হই যখন দুইজন শ্রেষ্ঠ বাঙালী সাংবাদিকের স্মৃতি স্থাপন করে ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলাম। কবি ঈশ্বর গুপ্ত 'সম্বাদ প্রভাকর' প্রকাশ করে আমাদের ধন্য করে গেছেন অথচ তাঁর ছবি ছিল না। তাই সেই ছবি বহুকষ্টে উদ্ধার করে ঈশ্বর গুপ্তের জন্মভূমি বর্ধমান কল্যাণী" সংলগ্ন তাদা ভিতের উপর আমরা যখন স্মৃতি-সভা করি, হেমেন্দ্রবাবু আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দেন ও দুঃখ করে বলেন আর একজন প্রতিকৃতিহীন বীর সাংবাদিক 'Hindu Patriot' প্রতিষ্ঠাতা হরিশ মুখার্জি, যিনি নীলকরদের উচ্ছেদ করেছিলেন। কিন্তু দেশের লোক চাঁদা তুললেও তাঁর প্রতিকৃতি বা Photo পর্যন্ত রাখেন নি। এই ত্রুটি তাঁকে বাথা দিত। তাই জাতীয় গ্রন্থাগারের বন্ধু-সহায়ে বহু চেষ্টা করেও হরিশ মুখার্জির ফটো বা ছেচ কিছু পেলাম না। 'ছবির আড়িগঙ্গা—এই বাঙলা' প্রবন্ধ লিখতে একথা বারবার স্মরণ করেছি।

'গল্প-ভারতী'তে তাঁর শেষ রচনাটি "সংবাদপত্রের শতবার্ষিকী" প্রবন্ধ সবাইকে পড়তে অনুরোধ করি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণ সহযোগ দিয়ে 'হেমেন্দ্রপ্রসাদ বক্তৃতামালা' শুরু করুন এই প্রার্থনা জানাই। তাঁর গ্রন্থাগার তথা মানসিক ঔদার্য বাংলার সংবাদ-সাহিত্যকে বহুকাল পুষ্ট করে এসেছে। এখন তাঁর উপযুক্ত কিছু করা আমাদের কর্তব্য। হাস্যমুখে অমৃতলোকে তিনি পরিহাস করে গেছেন। তাঁর স্নিগ্ধ হাস্যোজ্জ্বল মুখ বহুকাল মনে থাকবে।

ঢেউ।

দিলীপকুমার দাশগুপ্ত

দুঃখটা আমার চেয়ে মণিমালা সরকারের বেশি হওয়া স্বাভাবিক। কেননা সে মেয়ে। তার জীবনের সুযোগ সুবিধা সীমাবদ্ধ।

আমি পুরুষ মানুষ। যখন তখন কোনারক যেতে পারবো। আমার জীবনের প্রথম কুড়িটি বছর বাদ দিলে বাকি আট বছর অন্ততঃ বারো বার এসেছি এখানে। এর মাঝে একবারও কোনারক যাওয়া হয় নি। কোন দৈব দুর্ঘটনা কিম্বা আকস্মিকতা নয়। এমনি।

মণিমালা বলেছিলেন,—কালীনাথবাবু, আপনি একেবারে হোপলেস লোক। বারো বার এখানে এসেছেন, অথচ সূর্য মন্দির দেখতে যান নি?

কেন যাই নি তা বলতে পারবো না। সমুদ্র ভালো লাগে। তাই বার বার আমি কোলকাতার ব্যবসা-পত্তর ফেলে। আরো আসবো। তা ছাড়া এবার মাকে নিয়ে এসেছি। সিংহদ্বারে বাসা ভাড়া করেছি তাঁর জন্য। এ-বয়সে মা এখানে থাকতে চান কিছুদিন। কালই ও-বাসাতে উঠে যাবো। আর রাত্রে চাপবো কোলকাতার এক্সপ্রেসে। ছোট ভাই এসে মা'র ভারতক করবে। মাত্র সাত দিনের ছুটি পেয়েছে সে। সাতদিন বাদে আমাকে আবার আসতে হবে।

তবু এবার কোনারক যাবো ঠিক করেছিলুম। আমার চেয়ে মণিমালা আর তার ছোট ভাই আঠারো বছরের সুবীরের ঝোঁক বেশি। তাঁরা বললেন, আপনাকে যেতেই হবে। আপনি না গেলে আমাদের যাওয়া হয় না।

বললুম, সে কি সুবীরবাবু। আমাকে ঠাওরালে কি? আমি নিজে যাই নি ওখানে।

মণিমালা বললেন, তা যান নি। কিন্তু আপনি না গেলে, মা আমাদের যেতে দিচ্ছেন না। সেদিন আপনি ভিড়েও যে রকমভাবে জগন্নাথদেবকে প্রদক্ষিণ করার ব্যবস্থা করে দিলেন, তাতে মা আপনার উপর ভরসা করছেন খুব।

বললুম, নিন্ সরকার। ওতে আমার বাহাদুরি নেই। ওটা পাণ্ডাজীর।

তা বটে! কিন্তু পাণ্ডাজী আপনার পরিচিত ছিলেন বলেই ওটা হয়েছে। যেদিন আমরা পুজো দিতে গেলুম, কই সেদিন তো পাণ্ডাজী ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করাতে পারলেন না?

সুবীর বললে, সেদিন অত ভিড় ছিল কেন?

জবাব দিলুম,—সুবীরবাবু, তোমাকে অনেকবার বলেছি যে গঙ্গাসাগর স্নানের পরে এখানে যথেষ্ট ভিড় হয়ে থাকে। সাধারণতঃ তীর্থ যাত্রীরা গঙ্গাসাগর ঘুরে এসে 'প্রভু জগন্নাথ'কে দর্শন করে যান।

আমার স্মরণ-শক্তি বড্ডো কম! ছেলে মানুষের মত সুবীর বলল।

বলতে গেলে ওদের টানা হ্যাঁচড়াতে পড়েই কোনারক যেতে রাজী হয়েছিলুম। আগামীকাল সকালে মাকে নিয়ে ভাড়াটে বাসাতে যেতেই হবে। আর রাত্রে কোলকাতার এক্সপ্রেস। তাছাড়া মণিমালারাও কাল সকালে যাচ্ছেন ভুবনেশ্বর। দু'দিন ওখানে থেকে কোলকাতা ফিরবেন। কাজেই কোনারক যাবার দিন স্থির হয়েছিল আজকে।

কিন্তু যাওয়া হয় নি।

তেতলার বারান্দার ছাদ নেই। ও কোনে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছিলুম। হাওড়া প্যাসেন্জার ট্রেন যাত্রীর রিক্সা এসে থামতে শুরু করেছে এ বাড়ির ফটকের সামনে। একটা হোটেলের একজন লোক যাত্রীদের কাছে তার হোটেলের বিজ্ঞাপনের কাগজ বিলি করছেন। আর বলছেন। কি বলছেন, শুনতে পাচ্ছি না এখান থেকে। কিন্তু ওর বক্তব্য আমার জানা। অনেকবার শুনেছি। প্রতি মিলের কি দাম, খাদ্য তালিকা, রান্না ইত্যাদি। ফাউকে হয়তো পেছন ফিরে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন হোটেলটি।

মণিমালা কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন টের পাই নি।

তিনি বললেন, ওই লোকটাকে দেখলেই আমার আপাদ-মস্তক জ্বলে ওঠে। বিমলবাবু আর লোক পেলেন না। অমন অপদার্থকে হোটেলের ম্যানেজার করেছেন। কাজেও অপদার্থ, দেখতেও তাই।

বললুম, মিস্ সরকার! ওকে দিয়ে নিশ্চয়ই কিছু হচ্ছে। না হলে, কেন ম্যানেজার করে রাখা? আর দেখতে কেমন, তা না তোলাই ভালো।

কেন? মণিমালা যেন ঝাঁঝিয়ে উঠলেন।

মিস্ সরকার, ওটা ওর বয়েস। আর রঙের কথা? তা আপনার আমার হাতের বাইরে। ওর বয়সে আমি যখন পৌঁছুবো, তখন আমার রাগটাও ওর চেয়ে ভালো হবে বলে মনে হয় না। ওই সব শরীরের পেশীগুলো কুঁচকে যাবে, নিচের ঠোঁটটি ঝুলে পড়বে। নাকও বসে যাবে হয়তো, আর মুখের ওপরে বলিরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

মণিমালা বললেন, কিন্তু আমি হলপ করে বলতে পারি, আপনার চোখের মণি সে-বয়সে ওর মত ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইবে না। অমন রাঙাও হবে না।

হতেও পারে।

হবে না। আপনি তো আর গাঁজা খান না।

বুঝলুম, মণিমালা গাঁজার কথাটাই মনে করে রেখেছেন। কাল চায়ের দোকানের ভদ্রলোকও বলেছিলেন, ওই বুড়োকে বিশ্বাস করাই আপনাদের অন্যায় হয়েছে। গাঁজার নেশায় সকাল-বিকেল বুঁদ হয়ে বসে থাকে। দু'আনা গাঁজার জন্য বালির মধ্যে দু'ঘণ্টা ছুটোছুটি করতেও আপত্তি করবে না ও। আপনারা যেমন—

মণিমালা আর সুধীর আমাকে দোষ দিতে পারবেন না। আসলে বুড়ো ম্যানেজার যে এমনভাবে সব ভণ্ডুল করে দেবেন তা বুঝি নি। কন্ট্রাক্ট সার্ভিসের গাড়ি রোজই কোনারক যায়। আমরা যেদিন যাবো, সেদিনকার গাড়ি গত চারদিন আগে থেকেই কোণারকে একটা দল রিজার্ভ করে বসে আছে। সুতরাং বাইরের প্যাসেন্জার নেওয়া চলবে না। ম্যানেজার তারিখের গণ্ডগোল করে মণিমালা আর সুধীরবাবুকে ডুবিয়ে দিলেন। বাস রিজার্ভ হওয়ার সংবাদটা আগে পেলে সার্ভিস বাসে যেতে পারতুম। সেখানে ভাড়াও এক টাকা বারো আনা কম।

আমি অবশ্য ঠিক করেছিলুম, সকালে সূর্যোদয় দেখে রিক্সাতে সিংহদ্বার গিয়ে বাসে চাপবো। কিন্তু সমস্ত প্রোগ্রামটা নষ্ট হয়ে গেছে।

গতকাল দুপুরের রোদটা যেন আচমকা বড্ডো কড়া মনে হয়েছিল। বাইরে না বেরিয়ে ঘুমুচ্ছিলুম। মণিমালা আর সুধীর গেছেন সমুদ্রের ঢেউ শুনতে। ম্যানেজারবাবু ঠিক তখন তাদের পাকড়াও করেছেন। তারপর ওদের সঙ্গে এসে আমার ঘুম ভাঙালেন।

মণিমালা বললেন, ম্যানেজারবাবু বলছেন ওদের গাড়িতে যেতে।

শুধিয়েছিলুম, আপনাদের গাড়ি যাবে তো?

উনি বললেন, নিশ্চয়ই যাবে। রোজ যায়।

মণিমালা বললেন, সেটাই ভালো হবে কালীনাথবাবু। আবার সিংহদ্বার গিয়ে বাসে চাপা, সে এক ঝামেলা। সার্ভিস বাসে সময়ও নাকি বেশি লাগে। অনেক জায়গাতে থামতে থামতে যায়। আমাদের এটাতেই সুবিধে।

সন্দেহভরে শুধু শুধালুম, শেষে ডুবাবেন না তো ম্যানেজারবাবু?

না না, মোটেই না। আমাদের কন্ট্রাক্ট সার্ভিস। যে ক'টি সিট রয়েছে, ঠিক সেই ক'টি প্যাসেঞ্জার নেবো। কেন মিছিমিছি সার্ভিস বাসে ঢুঁকতে ঢুঁকতে যাবেন? কন্ট্রাক্ট সার্ভিসের প্রোপ্রাইটার দিবানাথ আমার ভাগনে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

তা পারি নি। এদের বাস আপিস আমি চিনি। স্বর্ণদ্বারের মোড়ের ওপরে। দিবানাথ রায়ের সঙ্গে একটু আধটু আলাপও আছে। তিন তিন বার তার আপিসে হানা দিলুম। কিন্তু একবারও সাক্ষাৎ পেলুম না।

আজকে বাসের জন্য রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে ছিলুম সাড়ে আটটা পর্যন্ত। সাতটাতে বাস আসার কথা। প্রতিটি মুহূর্তে আশা করেছি, এই বুঝি এলো। কয়েকবার আপিসটাও ঘুরে এলুম। দিবানাথ রায়ের দেখা নেই। পৌনে আটটাতেও যদি বুদ্ধি করে সিংহদ্বারে গিয়ে সার্ভিস বাস ধরতুম, তবে যাওয়া হতো। কিন্তু ম্যানেজারবাবুর আশ্বাসে তাও করি নি। তিনি তখনও বলছেন, আরে ভাবছেন কেন? বাস ঠিক আসবে। নানা জায়গা থেকে লোক তুলবে। তাই একটু দেরি হচ্ছে।

লোকটার ওপরে তখনও রাগ করেন নি মণিমালা। বরং আশার কথাটা ভালোই লেগেছিল। কিন্তু সব নির্মূল করে দিল দিবানাথবাবু নিজে। তিনি এলেন পৌনে ন'টায়। তাঁর কাছে অভিযোগ জানাতেই তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। সমস্ত ব্যাপারটা শুনে বললেন, আপনাদের দিনটাই মাটি হয়ে গেল মামার জন্য।

তার মানে? মণিমালা প্রশ্ন করলেন।

আজকের গাড়ি চলে গেছে। মামা আপনাদের ডুবিয়েছেন। গাড়ি রিজার্ভ করে অন্য চলে গেছে। আজকের জন্যে তো কারুর কাছে থেকে টাকা নেওয়া হয় নি?

সুবীর এরই মধ্যে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। সে বললো, কিন্তু আমাদের কাছে থেকে নিয়েছেন আপনার মামা। এই দেখুন রসিদ।

দিবানাথবাবু ডাকলেন তার মামাকে। ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন বিড়ি টানতে টানতে।

মামা, আপনি জানতেন না যে ষোলরা তারিখ গাড়ি রিজার্ভ রয়েছে?

ম্যানেজারের মুখের কোঁচকানো চামড়া আরো কুঁচকে গেল। ভ্রূ দুটি হলো কুঞ্চিত। বললেন, নিশ্চয়ই জানি।

আজকে কতো তারিখ? দিবানাথবাবু শুধালেন।

কেন,—পনরো? ওইতো, ওই হোটেলের কয়েকজন কালকে যেতে চেয়েছিলেন। তাদের বলনুম, কাল যাওয়া হবে না। আমাদের গাড়ি কালকের জন্য রিজার্ভড্। তা আজকে গাড়ি কেন এলো না তা বলো এখন। এরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

সুবীর চেঁচিয়ে উঠলো, হোপলেস। আজকেই যে মশাই দুই তারিখ।

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে ম্যানেজারবাবু সুবীরের দিকে তাকালেন।

বিধানাথবাবু বললেন,—মামা, কাল দুপুরে বুঝি বেশ করে গাঁজা টেনেছিলেন?

গাঁজা। হুঁ, তোর যেমন কথা বিধানাথ। শুনলেও পিত্তি জ্বলে যায়। সব সময় তুই এমনি করে আমার প্রেস্টিজ ডাউন করছিস্। তা, তোর গাড়ির কি হলো বল্।

সুবীর আবার বললো, ম্যানেজারবাবু, আজকে দুই তারিখ।

বিধানাথবাবু আক্ষেপ করলেন, মামা, আপনার জন্য আমার ব্যবসাটা মাটি হবে। মিছামিছি বদনাম কিনতে হচ্ছে আমাকে।

তারপর আমাকে বললেন, আপনি মশাই প্রায়ই তো এদিকে আসেন। আমাকে একবার বলতে পারতেন। আপনার তো অচেনা নয় আমার আপিসটা?

কাল তিনবার চেষ্টা করেও তাঁকে পাই নি একথা জানালুম।

মণিমালার জন্য আমার করুণা হয়। বেচারী কোনদিন হয়তো আসতে পারবে না আর। কার ঘরণী হয়ে কোথায় যাবে কে জানে। মেয়েদের সব সময়, সব জায়গায় যাওয়া হয়ে ওঠে না।

সুবীরের কাছে শুনেছি, মণিমালা নাকি কালাপাহাড় সম্বন্ধে প্রচুর পড়াশুনা করেছেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মত, কোনারকের মন্দির কালাপাহাড় ধ্বংস করেননি। ওটা ধ্বংসের কারণ মন্দিরের ওপরের প্রবল ক্ষমতাশালী চুম্বক। ওর টানে জাহাজ কম্পাস হারিয়ে এখানে এসে ঠোকর খেত। তাই পর্তুগীজরা মন্দিরটা ধ্বংস করেছে। মণিমালা এ কথা বিশ্বাস করেন না। তাঁর মতের স্বপক্ষে অনেক জোরালো প্রমাণ রয়েছে। এ সম্বন্ধে মণিমালার কিছু লিখবার ইচ্ছা আছে নাকি।

তেতলার ওপরে পরপর চারখানি ঘর। দু'খানি আমাদের আর মণিমালাদের দখলে। বাকি দুখানাতে যারা রয়েছেন, সমুদ্র স্নান থেকে ফিরে আসেননি এখনও। মণিমালার মা আমার মায়ের সঙ্গে গল্প করছেন।

আমি বারান্দায় এ কোনে। এ জায়গা বেশ লাগে। বলতে গেলে, গোটা সকালটা এখানে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দেই। দেখি ভাঁওতা আর ডুবিডার খেলা। সকালের দিকেই স্নান-যাত্রার ভিড়। যত তীর্থযাত্রী এসে ওঠে ধর্মশালাতে, সকাল বেলায় এই রাস্তা দিয়ে তারা আসে স্নান করতে। তার আগেই ভিখারির দল এসে জাকড়া আর চট বিছিয়ে বসে যায়। স্নান করে ফেলে দলকে দল। কেউ-কেউ পয়সা আর চাল ছড়াতে ছড়াতে যায়। সকালের ভিড় দেখে বুঝেছি, বাঙালীরা তীর্থ করতে জানে না। জানে এরা—এই বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ আর রাজস্থানের লোকেরা। মাথা মুড়াবার নিয়ম যাদের আছে, তারা ন্যাড়া হয়ে সমুদ্রে স্নান করতে আসে। জলে নারকেল ভাসিয়ে নাইতে নামে। তারপর পাঁচ সিকে পয়সা দিয়ে সমাধা করে গো-দান। একই গো-বৎস নিবেদিত হচ্ছে বার বার। কারুর অভিযোগ নেই। স্নান পর্ব সমাধার জন্য চীৎকার, হৈ-হৈ, হুড়োহুড়ি। গো-দান শেষ করে ফেরার পথে ভিখারিদের স্নান। রাস্তার ডান দিকে বিছানো চট কিম্বা জাকড়ার ওপরে চাল পয়সার ছড়াছড়ি। মেয়ে হাত-পা নিয়ে ভিখারিরা অবিশ্রান্ত চীৎকার করে। কতস্থানের জাকড়া ভিজে যেন রক্ত উপচে পড়ছে। মাছি উড়ছে, বসছে।

স্বর্গদ্বার আর সিংহদ্বার। স্বর্গদ্বারের রূপ সমুদ্রের। সিংহদ্বারে পাণ্ডা আর ভিখারির শোষণ। তবু সিংহদ্বারেরও রূপ আছে। নাস্তিকের চোখে ধরা পড়বে না। তাদের মনে রেখাপাত করবে না সে সৌন্দর্য। সিংহদ্বারের রূপ মন্দিরের। প্রভু জগন্নাথের। মহিমা ভগবানের।

কিন্তু এই স্বর্গদ্বার আর সিংহদ্বারের মাঝে নরক। বিশ্রি রাস্তার দু'পাশে ভিখারির মেলা। এক সৌধর্ব থেকে অপর সৌধর্বে শেষ। স্বর্গদ্বার আর সিংহদ্বারের মধ্যকার জায়গাটুকুতে লোভ আর ভনিতার মেলা।

সকালবেলায় তেতালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই লোভ আর ভনিতাকে আমি দেখি। রাস্তার পাশে শুয়ে আপাদমস্তক নোংরা কাপড়ে ঢেকে যেসব পা কিম্বা হাতকে ঘির ঘির করে কাঁপাতে কাঁপাতে করুণ চীৎকারে পুণ্যকামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে যারা, স্নানের ভিড় কমে গেলে তাদের উঠে বসতে দেখেছি। দেখছি তাদের সুস্থ আর স্বাভাবিক শরীর। শুনেছি অন্তর কণ্ঠস্বর। তারা উঠে বসছে, গল্প-করছে। বিড়ি খুঁকছে।

পুণ্যকামীর ভিড় সাড়ে ন'টার মধ্যে কমে যায়। ভিখারিরা সেরেস্তা গুটায়। পয়সার হিসেব করে। তারপর শরীরের কত জায়গার উপর থেকে ন্যাকড়ার প্যাচ খুলতে থাকে। একের পর এক। সব খোলা হয়ে গেলে দেখি কত কিম্বা ঘা নেই। নেই কোন খুঁত। নিরোগ অঙ্গ। যার সত্যিকারের কিছু আছে, সে বাঁধন খোলে না। স্বর্গদ্বার পর্যন্ত সত্যিকারের রুগ্ন যাত্র দুটি কয়েক নজরে পড়েছে।

নিজেদের স্বার্থে ইংরেজ সুস্থ চীনাদের রোগা করতে শিখিয়েছিল। কিন্তু তীর্থযাত্রীরা এদের ভিখারি বানালে কোন্ স্বার্থে তা আমার কাছে আজও পরিষ্কার হল না। এই দানশ আশ্রমেও না। তাদের কাছ থেকে প্রশ্রয় পাওয়া যায় বলেই সুস্থ মানুষ রোগগ্রস্তের অভিনয় করছে। ভিক্ষা না পেলে ওরা খেটে খাবার চেষ্টা করতো। পুণ্যকামীর এতে কি পুণ্য-লাভ হবে?

দানের তৃপ্তি আছে জানি। কিন্তু যে-দান সুস্থ মানুষকে লোভী আর রুগ্ন হ'তে শিক্ষা দেয়, সে দানে পুণ্যলাভ হয় কিনা আমার জানা নেই।

বিকেলে রাস্তাঘাটকে অনেক শান্ত আর নম্র মনে হয়। সন্ধ্যার খানিক পরে হাওড়া প্যাসেন্জারের যাত্রীর টিকশা এসে থামে আশ্রমের ফটকের সামনে। তখন থেকেই কানের কাছে ঘ্যান-ঘ্যান করেন হোটেলের ম্যানেজার। আমি সাধারণত এ সময়তে সমুদ্রের বালুর ওপরে বসে থাকি। আর এখানকার অস্থায়ী সংসারের জিনিসপত্তর কিনতে হয়েছে বলে আজ আর সমুদ্রের ধারে যেতে পারি নি। ও কাজ সেরে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছি। খানিক বাদেই মণিমালা এসেছেন। উনি আজকে বোধ হয় বেড়াতে যান নি। তা হলে ফিরতে দেখতুম।

সমস্ত যাত্রী আশ্রমের ভেতরে ঢুকতেই ম্যানেজারবাবু ফিরে গেছেন। রাস্তাটাকে তখন ফাঁকাই বলা যায়।

ম্যানেজার চলে যেতেই ও প্রসঙ্গের সমাপ্তি ঘটেছে।

কাল তা হলে আপনারা যাচ্ছেন, মিস্ সরকার?

হ্যাঁ। কেমন ভিজে ভিজে ওর কণ্ঠস্বর।

কোনারক তা হলে এ যাত্রাতে যাচ্ছেন না? মণিমালা প্রশ্ন করলেন।

ভবিষ্যতের কোন যাত্রায় যাওয়া হবে কিনা, তা-ও জানা নেই। বললুম।

আমাদের সঙ্গে ভুবনেশ্বর চলুন না?

উপায় নেই মিস্ সরকার। ব্যবসাপত্তর গোছাতে যাবে তা হলে।

মণিমালা চুপ করে গেলেন। আমিও তখন থেকে চলে আসবো ভাবছিলুম।

হঠাৎ মণিমালা বললেন,—এ ক'দিনের স্মৃতি মনে থাকবে ?

কোলকাতায় আমাদের বাড়িতে যাবেন সময় করে।

বললুম,—এখানে দেখছেন অকাজে ডুবে রয়েছি। ওখানে অনেক কাজ। ব্যবসায়ী লোক। নানা ধান্ধায় ঘুরতে হয়। কথা দেওয়া মুশকিল।

কয়েক সেকেণ্ড বিরতির পরে মণিমালা আবার মুখ খুললেন,—আমাকে মনে থাকবে ?

মণিমালার স্বর যেন কেঁপে উঠেছে। যেন কান্নার মতো শুনালো।

আমি কাশীনাথ বসু। হোঁচট খেয়ে খেয়ে কোন রকমে ইণ্টারমিডিয়েটের চৌকাঠটা ডিঙিয়েছি। চাকরি না পেয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের উপদেশগুলো ঝালিয়ে নিয়ে ব্যবসাতে নেমেছি। কোলকাতার কয়েকটা হাসপাতালে চাল-ডাল-তরকারি-মাছ-মাংস সরবরাহ করি। কাজ আমার দিন রাত সাইকেল নিয়ে চৌ-চৌ করা। আর মণ-সেরের হিসেব রাখা। মেয়েদের মনের হিসেব করবার সুযোগ কখনও পাই নি।

মণিমালার দিকে তাকালুম। রেলিংএ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছেন উনি। চাঁদের আলো কোনাকুনি ওর মুখের ওপরে পড়ে একটু পাশ উদ্ভাসিত করে অপরকে অস্পষ্ট করে দিয়েছে। দেখলুম, ওর ঠোঁট কাঁপছে। হাত দু'টিকে বুকের নিচে ভাঁজ করে দাঁড়িয়েছেন মণিমালা। বাঁ হাতের আংটির ইংলিস কাটিং এর কমল হীরেটা অনেকগুলি উজ্জ্বল বিন্দুতে ঝিলমিল করছে।

দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে সামনে তাকালুম। শোঁ-শোঁ করে বাতাস আসছে সমুদ্রের। এখানে দাঁড়িয়েই সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি। চাঁদের আলোতে ঝলমল করছে বঙ্গোপসাগর। বেলাভূমির কাছে এসে ঢেউগুলি ভেঙে অজস্র শুভ্র বুদবুদ মুক্ত দিয়ে আছড়ে পড়ছে বালুর ওপরে।

আমাকে মনে থাকবে ? মণিমালা ফিস্‌ফিসিয়ে আবার শুধালেন।

আমি ব্যবসায়ী কাশীনাথ বসু। মেয়েমানুষের মনের কিনারায় পৌঁছতে চাই নি কোনদিন। আজ যেন প্রচণ্ড ঢেউ আকস্মিকভাবে আমাকে কিনারাতে এনে ফেললো।

সে এক আশ্চর্য অনুভূতি। মনে হল, আমার শরীরের সমস্ত রক্তে বঙ্গোপসাগরের মতো ঢেউ খেলতে শুরু করেছে। ভৌগোলিকদের মতে বঙ্গোপসাগর নাকি ঠাণ্ডা সমুদ্র। তাই যদি হবে তো আমার মনটা এমন উত্তাল হয়ে উঠলো কেন ? বুঝি ভেঙে-চুরে গেছে আমার ব্যবসায়ী মনটা। নতুন এক অনুভূতি আর সুর মণ-সেরের হিসেবের মাঝে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে।

মণিমালা এগিয়ে এসে আমার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছেন।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

'সেকী! তারপর পথের মাঝে আবার যদি তুমি মাথা ঘুরিয়ে ব'সে পড়ো তখন উপায় হবে কী? এই দীর্ঘ চড়াই ওৎরাই তোমাকে কাঁধে করে আমার ওঠা নামা করতে হবে দেখতে পাচ্ছি—' মুখ থম থমে ক'রে পর্ণা জবাব দিলো।

ফুলমু ছিলো পর্ণার পাশে দাঁড়ানো। মুখটা নামিয়ে এবং গলা তার চেয়েও নামিয়ে আস্তে বলে ফেললো,

'অত ভাগ্য আমার কোনোদিনও হবে না—'

কর্ণাক গলা বাড়িয়ে পর্ণাকে জিগ্যেস করলো,

'বিলরাজ কী বললো রে বেটা?'

পর্ণা, ফুলমুর কথা শুনতে পায় নি, এমন ভঙ্গি ক'রে মুখ ঘুরিয়ে উইলো গাছের একটা শুকনো ডাল নিরীক্ষণ করছিলো। কর্ণাকর প্রশ্ন শুনে ওর কানের দু'পাশটা একটু গরম হলো। মুখ ঘুরিয়ে হেলা-ফেলা ভাব দেখিয়ে বললো,

'ও পাগলের কথার কী কোনো মাথামুণ্ডু আছে নাকি। চলো এবার আমরা যাই—।'

ওরা এখন ওৎরাই পথে নামতে লাগলো। একটু পথ নেমেই পর্ণার একটা কথা খেয়াল হলো। ওদের শুনিয়েই সেটা বললো, 'ঘোড়াআলা কোনো পয়সা না নিয়েই চলে গেলো, ভারি আশ্চর্য ব্যাপার তো!'

ফুলমু পর্ণার দিকে চেয়ে বললো,

'পয়সা চেয়েছিলো ঘোড়াবালা। আমার কাছে তো পয়সা কড়ি কিছু ছিলো না, নতুন মগটা দিয়ে ঘোড়াবালাকে বিদায় করেছি'—কথা শেষ ক'রে ফুলমু সুন্দর হাসি হাসলো। এমন মন ভোলানো হাসি মেয়েরাই শুধু হাসতে পারে। আর ওর হাসিটা যেন অনুনয় করলো পর্ণাকে—

: অনেক তো বকেছো আমাকে, আর বকো না।

পর্ণা এবার না হেসে পারলো না। হেসে বললো,

'বেশ করেছো বিলরাজ, ভালোই করেছো।'

কর্ণাক কিন্তু খানিকটা বকাবকি না করে ছাড়লো না।

পর্ণারা দুর্গের আড়াল হতেই, লালসাহেব আর ডিক্ উইলো গাছের কাছে এসে দাঁড়ালো। এরা দু'জনেই কাংড়া উপত্যকায় একসঙ্গে ব্যবসা শুরু করেছিলো। লালসাহেব চায়ের আর ডিক্ সিনকোনার। সিনকোনার ব্যবসায় তেমন লাভ না হওয়াতে ডিক অনেককাল আগেই ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছে। চায়ের ব্যবসায় কিন্তু লালে লাল লালসাহেব। লালসাহেবের চা-বাগিচা পালমপুরের আশ্চর্যায়। কাংড়া থেকে পালমপুরের দূরত্ব চল্লিশ মাইল। আজকাল কিছুদিন ধরে ওদের দু'জনকে ঘন ঘন মোটরে

ক'রে কাংড়ায় আসতে দেখা যাচ্ছে। সকলে ভাবে শিকারের নেশায় আর ফটো তোলার নেশায় ওরা কাংড়ায় আসে। এগুলো উদ্দেশ্য থাকলেও গৌণ। আসল উদ্দেশ্য হলো,—কাংড়ার ছোটো ছোটো সব কিছু ব্যবস্থা করবে লালসাহেব। বাবলা চা-বাগিচার নাম ডাক খুব। কাংড়া উপত্যকায় চা-বাগিচা অসংখ্য। কাংড়ার আবহাওয়া এবং জমি, চা চাষের পক্ষে খুবই অনুকূল। ছোটো বড়ো মিলিয়ে আড়াই হাজারের ওপর চা-বাগিচা আছে এখানে। আর এই বাবলা চা-বাগিচা কাংড়া উপত্যকার মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম বাগিচা। কাজেই ডিক ও ব্যাপারে বন্ধুকে মুরুব্বী ধরেছে।

লালসাহেব আর ডিক দ্রুত পথে নেমে এলো। দেখলো ওরা তিন জন আস্তে আস্তে ওৎরাই পথে নেমে যাচ্ছে। ডিকের কাঁধে বন্দুক। ও বন্দুকটা ভাগ্ করে এক নজর দেখে নিলো। তারপর, বন্দুক নামিয়ে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে হেসে বললো,—'বন্দুকের পাল্লার মধ্যেই ওরা এখনো আছে, দিন কাল খারাপ, না হ'লে বুড়ো আর সর্দারের বুক ছেঁদা ক'রে এখুনি তোমার ফিয়াসেকে এনে দিতাম তোমার হাতে।'

লালসাহেব পকেট থেকে একটা রঙীন পানীয়ের ছোট বোতল বার ক'রে, ছিপি খুলে একেবারে সবটা মুখে ঢেলে দিলো। গাল ফুলিয়ে বিশ্রীরকম একটা ঢেকুর তুলে সজোরে ডিকের কাঁধ চাপড়ে দিলো, 'সাবাস্! তা হলে ডিক, গুলিবিদ্ধ না করতে পারো, একটা কিছু উপায় করো। ওই যৌবনবতীকে কোনোমতেই আজ রাত্রে পাওয়া যায় না?'

ডিক্ বন্ধুর দিকে তাকিয়ে হাসলো,

'মাত্রাটা একটু বেশী হয়ে গেছে হে! শেষের বোতলটা না গিললেই পারতে—'

'আরে না, না,—আমি ঠিক আছি। কোয়াইট ও-কে!'

ঠাট্টা নয়, আমি ঠাণ্ডা মেজাজেই বলছি—

'ওই রূপবতীকে আজ রাত্রেই যদি পাইয়ে দাও, তা হলে কালকেই তোমাকে একটা চা-বাগিচার কর্তা ক'রে দেব সিওর।'

ডিক বললো,

'অত অস্থির হয়ো না লাল, সব হবে তা হলে—। রূপবতীকে তুমি পাবেই, মনে করু পেয়েই গেছো। কিন্তু, আমাকে সময় দিতে হবে সাত দিন। ঘাঁটি ঘাট বেঁধে এগোতে হবে তো। কেমন একটি এডিকং রূপবতীর সঙ্গে ঘুরছে, সেটা ভুলে যাচ্ছো কেন? আচ্ছা লাল, আমাদের তো ভুলও হতে পারে। হয়তো এ, সেই রূপবতীর ভাই, টুইনের একজন—'

হো-হো ক'রে হেসে উঠলো লালসাহেব,

'তোমার অবজারভেশন বড় ফিকে ডিক্, দেখছো না, এই গরমে গায়ে একটা মোটা চাদর পেঁচিয়েছে—'

'হো-হো—'। ডিকও বন্ধুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসতে লাগলো,

'বথ্‌রা আমিও পাবো তো?'

'ও সিওর!' ডিকের কাঁধ আবার চাপড়ে দিলো লালসাহেব।

ফুলমু আর কর্ণাক কথা বলে বলে নামছিলো। কিন্তু পর্দা একেবারে চুপ। দুর্গের চারিদিক ঘিরে উঁচু পাষাণ প্রাচীর। ভূমিকম্পের পর প্রাচীরের অনেকখানি ভেঙে গেছে। তবু কিছু কিছু অংশ এখনো দাঁড়িয়ে আছে সোজা হয়ে। এই অংশগুলো দেখিয়ে কর্ণাক বললো,

'বেটা, দেখেছিস, দুর্গপ্রাচীর কী মজবুত ছিলো!'

ফুল্লু কিছুক্ষণ প্রাচীরের অন্তর অংশটা নিরীক্ষণ করলো, প্রাচীরের মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো খুপ্‌রির মতো ছিলো, ফুল্লু আঙুল দিয়ে দেখালো,

'চাচাজী, ও গুলো কী?'

'ও-গুলোকে বলে মোরচা, রক্ষিবাহিনী ওখানে দাঁড়িয়ে বাইরেটা পর্যবেক্ষণ করতো। আর ওই যে প্রাচীরের ওপর দেখা যাচ্ছে ছোটো ছোটো ছেঁদা, দূর থেকে অত ছোটো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ফুটোগুলো খুব ছোটো নয়,—শত্রু দুর্গ আক্রমণ করলে, দুর্গের ভেতর থেকে ওই ছেঁদা দিয়ে বাধা দিতো।'

আনমনা পর্ণার কানে কিছু কিছু গেল, ও মন দিয়ে কর্ণাকর কথা শুনতে চাইলো, শুনতে চাইছে, কিন্তু মনটা যেন আজ ওর নাগালের বাইরে, কিছুতেই ধরা দিচ্ছে না। না হলে দুর্গের আরো অনেক কিছু জানবার, জেনে নেবার ছিলো। ওর তীক্ষ্ণ চোখ নিরীক্ষণ করেছিলো, বিরাট বাঁধানো একটা চত্বর, চত্বরের একদিকের খানিকটা জায়গা অনেকখানি উঁচু, চত্বরের একপাশে মোটা মোটা মাথা ভাঙা কতগুলি থাম,—বোধ হয় এটা কাটোচ রাজাদের দরবার ঘর ছিলো, কর্ণাক চাচা এর পরিচয় হয়তো ইতিমধ্যে দিয়েছে, ও তখন অন্যমনস্ক ছিলো,—মনের এমন অসীম ক্ষমতা, ওর এতবড় তাগড়া শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়েও ওকে ঠেকানো যায় না, ফেরানো যায় না, যেন আজই সেটা বিশেষ ক'রে উপলব্ধি করলো পরমরাজ। দুর্গ চূড়ো থেকে নেমে আসার সময়, কর্ণাক কতগুলি কূপ দেখিয়েছিলো, দীঘি দেখিয়েছিলো,—পর্ণা এখন জেগে দেখলো, সে সবের একটা নামও ও এখন মনে করতে পারছে না।—এমন ঘটনা এর আগে ওর জীবনে আর কখনো হয় নি। পাথরে-পাড় বাঁধানো একটা মস্তবড় জলাশয়ের নাম এবার ওর মনে পড়লো—কর্পূর সাগর। বোধ হয় এইজন্য মনে পড়লো যে কর্পূরের গন্ধটা ও ছোটোবেলা থেকে খুব পছন্দ করে। ফুল্লু কর্পূর সাগরের জলে হাতমুখ ধুয়েছিলো। সবুজ পানায় ঢাকা কর্পূর সাগরের এত ফটফটে জল, ফুল্লু হাত দিয়ে পানা না সরালে বোঝাই যেতো না। এত পরিষ্কার জল, জলের নিচের নুড়িগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো, ফুল্লুর হাতখানা যেন পদ্ম হয়ে ফুটেছিলো কর্পূর সাগরের বুকে···।

'এই পর্ণা, ভাবছিস কী? বানগঙ্গা, পাতাল গঙ্গা দেখে নে—' কর্ণাকর কণ্ঠস্বরে পর্ণা যেন চমকে চোখ তুললো।

বান গঙ্গাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখান থেকে, পাতাল গঙ্গা কিছু অস্পষ্ট। ফুল্লু দাঁড়িয়ে পড়লো। ওরাও দাঁড়ালো। ফুল্লু বললো,

'চাচাজী, পাতালগঙ্গার জল যেন লাল পানা বলে মনে হচ্ছে—'

'হাঁ। একেবারে লাল। যেন রক্তের মতো লাল—' কর্ণাক জবাব দিলো। সকলেরই নজর পাতাল গঙ্গার দিকে।

ফুল্লু আর কর্ণাক পাশাপাশি সামনে দাঁড়ালো, আর ওদের একটু পেছনে পর্ণা। হঠাৎ ওপর থেকে একটা বড় পাথরের চাঁই গড়াতে গড়াতে ছিটকে এসে পর্ণার বাম কাঁধে পড়লো। পর্ণার শরীরটা একটা চক্কর খেয়ে পড়ে গেলো, আর মুখ দিয়ে আওয়াজ বার হলো,

"অ,-মা-গা—"

ফুল্লু ছুটে এসে পর্ণাকে দু' হাত দিয়ে ধরে এমন ক'রে কেঁদে উঠলো, ওর সেই বুকফাটা

আর্তনাদ তখুনি মিলিয়ে গেলো না ; এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে মিলালো। পর্ণা তার অসহ্য ব্যথা ভুলে চোখ বড় ক'রে ফুলমুর মুখের দিকে চেয়ে রইলো একটু কাল। তারপর উঠে দাঁড়ালো। যন্ত্রণা চেপে মুখে একটু হাসিও ফোটালো পর্ণা,

'ঠিক আছে। চলো যাই—।'

কর্ণাক বিশ্বাস করলো, কিন্তু ফুলমু বিশ্বাস করলো না। ও পিছিয়ে গিয়ে পর্ণার পেছন পেছন চলতে লাগলো। কর্ণাক রইলো সামনে আর পর্ণা মাঝখানে। পর্ণা একবারও পেছন ফিরলো না। কিন্তু যেমন না তাকিয়েও, না কান পেতেও কিছু কিছু জিনিস দেখা যায়, কোনো কোনো শব্দ শোনা যায়,—তেমনি ক'রেই পর্ণা সারা পথে ফুলমুর কান্না শুনতে পেলো, দেখতে পেলো।

বাড়ি ফিরে ফুলমুর জবরদস্তিতে কোর্তা খুলে কাঁধ দেখাতেই হলো পর্ণাকে। শুধু ফুলমু নয়, কর্ণাক পর্যন্ত চম্‌কে উঠলো,—কাঁধ ফুলে একেবারে ঢোল হয়ে গেছে।

কর্ণাক বললো,

'এঃ, পর্ণা, কাঁধ ফুলিয়ে বস্‌লি, পরশুর ভোজে তা হলে যাবি কী ক'রে ?'

ফুলমু মনে মনে কর্ণাকর ওপর ভয়ানক খেপে গেলো,

: বুড়ো হলে এমনি বাহাত্তুরেই ধরে। অমন চোট খেলো, সর্দারের তার জন্য কোনো আক্ষেপ নেই, দাওয়াই বাতানো নেই ;—না, পরশুর ভোজে যাবি কী ক'রে ? লোতী পেটুক কোথাকার।

পরদিন,—দুপুরে কিছু খাবে না, ব'লে—বিছানা বিছিয়ে,—কোলা জায়গায় একটা জলপট্টি লাগিয়ে শুয়ে পড়লো। ফুলমুকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কয়েকটা রুটি বানাতে হলো—। বুড়ো ভাষাকু টানতে টানতে বললো,

'দিলরাজ, তোরা থাকতে, এই বুড়ো বয়সে আমি আর হাত পুড়িয়ে খানা পাকাবো কেন ?'

কর্ণাক ফরমাস মতো ছলির (ভুট্টার) রুটি বানালো ফুলমু। দশ খানা বানালো। সর্দারের জন্য সরিয়ে রাখলো দু'খানা, নিজে দু'খানা খেলো, জোর করে জল দিয়ে দিয়ে খেলো—ওর শরীর ঠিক রাখতেই হবে, দুর্বল হলে চলবে না।—আর কর্ণাক খেলো ছ'খানা।

দুপুর বেলা কর্ণাক যখন ঘুমিয়ে পড়লো, ফুলমু পর্ণার পাশে এসে দাঁড়ালো। পর্ণার ঘুমোচ্ছে। জলপট্টিটা শুকিয়ে গেছে। ফুলমু পট্টিটা আস্তে ক'রে তুলে নিলো। ফোলা একটুও কমে নি, বরং আরো বেড়েছে। অনেকক্ষণ ফোলার দিকে তাকিয়ে একেবারে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো ফুলমু। তারপর পাশের ঘরে গিয়ে ওর নিজের ছোট্ট পোঁটলাটা খুললো। পোঁটলা হাতড়ে কী যেন বার ক'রে নিয়ে কোর্তার পকেটে পুরলো, তারপর নিঃশব্দে পা টিপে টিপে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

পর্ণার ঘুম ভাঙলো কর্ণাকের থক্ থকানি কাশিতে। চোখ মেলে ও যেন আচ্ছন্নের ঘোরে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো।

—এ কোথায় ও শুয়ে আছে ? এত অন্ধকার কেন ?

একটু নড়তে গিয়েই ব্যথাটা চাটিয়ে উঠলো আর তখুনি ওর মনে পড়ে গেল সব।—এটা চাষা নয়, এটা ওর নিজের ঘর নয়। এটা কাংড়া, এটা কর্ণাক-চাচার ঘর। শুধু কাঁধ নয়, বাঁ হাতটাও খুব টাটাচ্ছে। ওর এই এতখানি বয়েসে, ও কখনো কোনো দাওয়াই খায় নি, বাড়তুক করে নি,—সেজন্য ব্যথাটাকে তেমন আমল দেয়নি ও। ভেবেছিলো জলপট্টি দিলেই নরম হয়ে যাবে ব্যথা। কিন্তু, ফোলাটাকে অবহেলা করা

ঠিক হয় নি। চৌরাশী গাঁয়ের ওঝারাজ ওঝা শুনেছি খুব গুণী লোক। ও, ঝাড়ফুঁক ক'রে শুধু অপদেবতাই তাড়ায় না, অসুখ সারায়, ব্যথা সারায়। কিন্তু, পর্ণা তাকে এখন পাচ্ছে কোথায়……?

'ঝিলরাজ, বেটা—। দাচিস্‌টা কোথায় রাখ্‌লি, দিয়ে যা—'

কর্ণাঢ্যর হাঁক ডাক শুনে পর্ণা বিছানায় আস্তে আস্তে উঠে বসলো। বাঁ হাতটা তুলতে গিয়ে দেখলো নাড়তে পারছে না একেবারে। কেমন যেন একটু অসহায় বোধ করতে লাগলো পরমরাজ।

কর্ণাঢ্য গলা চড়িয়ে আর একবার ঝিলরাজকে ডাক দিলো কোন সাড়া নেই।

'গেলো কোথায় বেটা—' কর্ণাঢ্যর গলায় একরাশ বিরক্তি ঝরলো।

—তাইতো, ফুল্‌মু গেল কোথায়। —পর্ণাও ভাবলো এ কথাটা।

—আরে, এ ই তো দাচিস্—কাঠকয়লার বস্তার পাশ থেকে দাচিস্‌টা টেনে নিয়ে খুশি গলায় বললো কর্ণাঢ্য, তার পর মাথা নেড়ে বলতে লাগলো,

'বেটা নিশ্চয়ই শহর ঢুঁড়তে গেছে, বেটার খুব নজর আছে, জানবার আগ্রহ আছে,—এটা ভালো, খুব ভালো'।

পরমরাজ কিন্তু খুশি হতে পারলো না। বেশ ভাবিত হয়ে পড়লো। অচেনা শহরে ফুল্‌মুর একা একা যাওয়াটা আদৌ ঠিক হয় নি—যন্ত্রণা ভুলে এই কথাটাই বারে বারে মনে হতে লাগলো পর্ণার। দরজার দিকে তাকিয়ে রইলো।

যেন এক ঝলক বাতাসের মতো ঘরে ঢুকলো ফুল্‌মু। কপাটের সামনে থেকে কাকে যেন জোর ক'রে তাড়িয়ে দিলো। মনে হলো যে আসছিলো তার যেন কিছুতেই ফেরার ইচ্ছে ছিলো না—ফুল্‌মুর জবরদস্তিতে ফিরে গেলো ক্ষুণ্ণ হয়ে।

পর্ণা জিগ্যেস করলো,

'কাকে তাড়ালে ঝিলরাজ? কেন আসতে দিলে না?'

কর্ণাঢ্যও সেই একই প্রশ্ন করলো।

'বলছি, পাঁচ মিনিট পরে সব বলছি—' ছড় মুড়িয়ে ফুল্‌মু সামনের ছোট্ট ঘেরা বারান্দা, যেখানে রান্না হয় কর্ণাঢ্যর, সেখানে গিয়ে ঢুকলো। ওই আবছা অন্ধকারের মধ্যেই পর্ণার চোখে পড়লো, ফুল্‌মুর কাঁধে একটা নতুন ঝোলা আর ঝোলার পেটটা বেশ মোটা। প্রথমে ফুল্‌মু একটা লণ্ঠন জালিয়ে ঘরের দাওয়ানে রেখে গেলো। তার মিনিটখানেক পরেই, বাঁ হাতের তালুতে কতকগুলো পাতা নিয়ে ডান হাত দিয়ে ডলতে ডলতে পর্ণার সামনে এসে দাঁড়ালো। বললো,

'সর্দার, শুয়ে পড়ো দাওয়াই লাগাবো—'

পর্ণা খুব কৌতুকে জিগ্যেস করলো,

'কী দাওয়াই শুনি?'

'পরে শুনো সর্দার, শিগ্‌গির শোও, শুকিয়ে যাচ্ছে—'

পরমরাজ আর কিছু না ব'লে শুয়ে পড়লো। একেবারে পর্ণার বুক ঘেঁসে বসলো ফুল্‌মু। পর্ণা জানে যে আর একটু দূরে বসেও কাঁধে ওষুধ লাগানো যায়,—কিন্তু, ফুল্‌মুকে সে সব বলা বা বোঝানো নিরর্থক। কাজেই অন্য কোনো উপায় না দেখে পর্ণা চোখ বুজলো। আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে পর্ণার কোলা জায়গায় পাতার রস লাগিয়ে দিতে লাগলো ফুল্‌মু। চোখ বুজে ফুল্‌মুকে না দেখা ঠেকানো যায়

কিন্তু ফুলমুর স্পর্শ? পাতার রসের প্রত্যেকটা কোঁটা যেন বিন্দু বিন্দু প্রেম হয়ে ঝরছে। ওর মতো সর্দারের শরীর এত স্পর্শ সচেতন কেন, নিজের শরীরের এই দুর্বলতায় নিজের ওপর নিজের বিরক্ত হলো পরমরাজ।

'সর্দার। তোমার কী খুব কষ্ট হচ্ছে?' দিলরাজের প্রশ্ন নয় এটা, এটা ফুলমুর। পর্দাকে চোখ খুলতেই হলো। ব্যথার কথা কিছু বলতে গিয়েই ও অনুভব করলো, যেন জাদু মন্ত্রে ওর ব্যথার উপশম হয়েছে,—নেই বললেই হয়। এতক্ষণ ওর মনে হচ্ছিলো, কাঁধের ওপর যেন খসখসি একটা জলপাই পাথর চাপানো রয়েছে। এখন কাঁধটা হাল্কা একেবারে। তারি আশ্চর্য ওষুধ তো ফুলমুর!

চোখ খুলে হাসলো পরমরাজ, বললো,

'না, দিলরাজ। এখন, আর আমার কোনো কষ্ট নেই'—

একটা দীর্ঘ নিশ্চিন্তের নিঃশ্বাস ফেলে ডাইনে বাঁয়ে মাথা দুলিয়ে একটু আহ্লাদের হাসি হেসে নিলো ফুলমু। তারপর লাফিয়ে উঠে আবার ঢাকা বারান্দায় চলে গেল। একটু পরে ঘরে ঢুকলো দু'হাতে দুটো ধূমায়িত চায়ের বাটি নিয়ে। এক বাটি কর্দারু-চাচার হাতে দিয়ে, আর এক বাটি পর্দার পাশে নামিয়ে রেখে বললো,

'সর্দার। উঠে চা খাও'—আবার ছুটে চলে গেলো ভেতরে। পেতলের থালায় ক'রে রুটির রুটি দু'খানা গরম ক'রে নিয়ে এলো, আর নিজের জন্য এক বাটি চা। পর্দাকে রুটি দিয়ে নিজের চায়ের বাটি নিয়ে পর্দার সামনেই বসে পড়লো। পর্দা চা খেতে খেতে, ফুলমুর ছুটোছুটি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো। ফুলমুর ওষুধে কাঁধের যন্ত্রণা এক নিমেষে কমে যাওয়াতে, ও বেশ কিছুটা অভিভূত। তারপর চায়ে চুমুক দিয়ে মনে হলো, এইটেই ওর শরীর চাইছিলো এখন। তারপর রুটির রুটি খেতে খেতে মনে হলো, কী দারুণ খিদে পেয়েছিলো ওর, ওর শরীর এইটেই চাইছিলো। কৃতজ্ঞ চোখে ফুলমুর দিকে তাকালো পর্দা। ফুলমুর মিষ্টি গালে টোল পড়লো। অর্ধ-স্বগতোক্তির মতো বললো ফুলমু—'ওষুধটা আর একবার লাগাতে হবে, কোলাটা সবটা কমে নি'। কর্দারু চায়ের বাটি নামিয়ে রেখে বললো,

'তুই বড় ভালো চা বানাস দিলরাজ'—

ফুলমু বললো,

'আমি মাংসও খুব ভালো বানাই চাচাজী, খেয়ে দেখো'—

'মাংস,.....মাংস কোথায় পাবো?' কর্দারু বোকা বোকা মুখ ক'রে বললো।

'এখানেই পাবে। এই ঘরে বসেই আজ মাংস দিয়ে রুটি খাবে'—

'বলিস কীরে দিলরাজ? মাংস কোথায় পেলি'?

আনন্দ উত্তেজনায় কর্দারু কোমর সোজা ক'রে উঠে দাঁড়ালো। ফুলমু কর্দারুর কথার জবাব না দিয়ে পর্দার দিকে চেয়ে বললো, সর্দার তুমি আবার শুয়ে পড়ো। মাংস রুটি না হওয়া পর্যন্ত তুমি শুয়ে আরো একটু বিশ্রাম করো।

[ক্রমশঃ

চলতি দুনিয়া

ইউরোপ আমেরিকার সুসভ্য অধিবাসীদের আজ জীবন যাত্রার প্রাচুর্যের অন্ত নেই। যতদূর সম্ভব আরামে তারা বাস করতে চায়। গল্পগুজব করার জন্যে শুধু বসার ঘর হলেই তাদের চলে না, চাই সুন্দর সুন্দর বাগান, ঘাসে ছাওয়া লন, সেই সঙ্গে আরামের প্রভূত উপকরণ।

কিন্তু আজকাল কি হয়েছে ওদেশের মানুষগুলির, একটু সময় পেলেই তারা সব ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে চাইছে দূরে, অনেক দূরে। যেখানে শহরের কোলাহল নেই, নেই লোকালয়ের বিলাস বাহুল্য। তার বদলে রয়েছে কেবল প্রকৃতির উদার আকাশ, মুক্ত বাতাস, পাখির কূজন আর সবুজ বৃক্ষের শোভা যা কোন মানুষ কোন উদ্যানে ফুটিয়ে তুলতে পারে না।

একটু অবসর পেলেই ওরা তাই বেরিয়ে পড়ছে—মোটরে, পায়ে হেঁটে, সাইকেলযোগে। একা একা নয়—সংসারের সকলকে নিয়েই। প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর প্রাচীনতম ঐশ্বর্য আর তাকেই বিস্মৃত হয়ে কৃত্রিমতার স্বর্গ রচনা করতে চেয়েছিল মানুষ। তাদের ভুল ভেঙেছে। আজ নতুন তীর্থযাত্রীর দল যন্ত্রসর্বস্ব সভ্যতাকে পরিহার করে মুক্ত প্রকৃতির আশ্রয় প্রার্থনা করছে। —ওম্যান্।

• • • •

মানুষের আকাশ-মনের ইচ্ছা অনেক কালের। তাই একালের মানুষ কেবল বিমানে পরিভ্রমণ করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না, রকেটের সাহায্যে মহাশূন্যে যেতে চাইছে।

কিন্তু সে কেবল অত্যাধুনিক বহুবিধ যন্ত্রযোগে।

মিক ওয়াল্টনের ইচ্ছেটা একটু বিচিত্র ধরনের। ছেইশ বছরের এই যুবকটি চান শরীরে ডানা লাগিয়ে পাখির মতো উড়তে। তাই তাঁর নামকরণ হয়েছে বার্ডম্যান বা পক্ষীমানব।

ঘরে তৈরি এক জোড়া ডানা দেহে ধারণ করে ১০০ ফুট উঁচু ক্লিফ বারো পাহাড় থেকে তিনি সত্যিই নিচের দিকে ছুটতে থাকেন প্রয়োজনীয় গতিবেগ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে। বড় বড় পাখা দুটি আন্দোলিত হতে থাকে ডানার মতোই। কিন্তু উৎসাহী দর্শকদের সম্মুখে তারপরই ঘটে এক দুর্ঘটনা। ১০০ গজ যেতে না যেতেই সামনে পড়ে যায় গোরুর পাল আর তাই সামলাতে গিয়ে কাঠের ডানা যায় ভেঙে।

তাঁর আশা পূর্ণ হবে কিনা সে বিষয়ে তিনিও কিছু জানেন না। তবে শীঘ্রই আবার তিনি ওড়বার চেষ্টা করবেন। —ডেলি মিরর

• • • •

জন-জানোয়ার সোষা মানুষের শখ। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে এই শখ শেষ পর্যন্ত উদ্ভট সব খেয়ালে পরিণত হয়। আর তার জন্যে ভোগান্তিটাও কম হয় না।

মিঃ বুথ, ইংলণ্ডের জনৈক শ্রমিক, শখ করে পুষেছেন বিষাক্ত সাপ। একদিন সাপকে খাওয়াতে খাওয়াতে তিনি নিজেই সাপের ছোবল খেলেন।

তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর স্ত্রী জ্যানেটকে বলেন, আমায় সাপে কামড়েছে, এখনি হাসপাতাল যেতে হবে।

পায়ে হেঁটে বাস স্ট্যাণ্ডে গেলেন তিনি, সেখান থেকে বাসে করে গেলেন ন'মাইল দূরের হাসপাতালে।

ডাক্তার দেখলেন—মহা বিপদ! ঠিক সিরাম এখনি না পেলে ওর মৃত্যু ঘটবে।

তখন তিনি লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় ফোন করলেন।

মোটর এবং বিমানযোগে সিরাম এসে পৌঁছল।

এখন মিঃ জন বুথ আরোগ্যলাভের পথে।

কিন্তু তেষট্টি বছরের বৃদ্ধা বাড়িওয়ালী মিসেস সারা রিড মহাক্যাপাদ বাধিয়েছেন এই বলে যে, তিনি কিছুতেই তাঁর বাড়িতে বিষাক্ত সাপ সহ্য করবেন না। কাউন্সিল স্বাস্থ্য বিভাগকেও তিনি এ কথা জানাবেন।

সম্ভবতঃ সাপটিকে বিদায় নিতে হবে। —ডেলি মিরর

• • • •

ব্রিটেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী Tamara Karsavina বলেছেন যে ব্যালে নৃত্য অত্যন্ত কঠিন শিল্প। একে আয়ত্ত করতে হলে প্রতিদিন কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করতে হবে। একজন অলিম্পিক রানার যতখানি মেহনত করেন ঠিক ততখানি শ্রমসাধ্য দায়িত্ব পালন করতে হয় শিল্পীকে এবং সেই পরিমাণেই তার পুষ্টিকর খাদ্য চাই। শরীরের ভারসাম্য রক্ষা ও মাংসপেশী নিয়ন্ত্রণের জন্য শিক্ষার্থীকে বছরের পর বছর কঠিন সাধনা করে যেতে হয়। তবেই দেহে আসে ছন্দ, চলনে লালিত্য,—সমস্ত শরীর যেন পাখির মতো উড়ে যেতে চায়। —ডেলি মিরর

• • • •

সোভিয়েট ইউনিয়নে নিপার নদীর খাত থেকে বালি তুলে স্তূপ করা হয়েছিল। ফলে একটা উঁচু দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছিল। পর্যটকরা এর ওপর হেঁটে বেড়াতে বেড়াতে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন যে, যখন তাঁরা এর ওপর দিয়ে চলেন তখন বালি যেন গান করতে থাকে। সকালে খুব বেশি চড়া, আর সন্ধ্যায় তা নেমে আসে যায়ে। বালিতে জল থাকার জন্যে এরকম হয়েছে। তবে একটা পরিমাণ মত জল থাকা চাই, খুব বেশি নয়, খুব কমও নয়।

ফটল্যাণ্ডের আইস দ্বীপেও ঘুরেলা ধাতুর সন্ধান পাওয়া গেছে। —ইভ্‌নিং উইক্‌লি

• • • •

অধ্যাপক জি. ক্রুস্তিনোভের নেতৃত্বে কয়েকজন বুলগেরিয় চিকিৎসক সোফিয়া শহরে একজন যুবককে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

গত ৩০শে অক্টোবর তারিখে স্লিভনিৎসা গ্রামের দোইচিন দোইচিনোভ নামে একটি যুবক সোফিয়া শহরের কাছাকাছি কোন জায়গায় কাজ করবার সময় সাংঘাতিকভাবে তড়িতাহত হয় এবং তৎক্ষণাৎ তার জীবনাবসান হয়। এর প্রায় পঁচিশ মিনিট পরে তার বন্ধু ও সহকর্মীরা তাকে শহরের হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে মৃত্যুর সঙ্গে দুর্ধর্ষ সংগ্রাম করে অধ্যাপক জি. ক্রুস্তিনোভ, ডাঃ ই. ক্রুস্তেভ, ডাঃ টি. মানালোভা, ডাঃ এস. কিলিশোভ্‌ এবং ডাঃ এ. দোইচোভ যুবকটির হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ও শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি ফিরিয়ে আনেন। বুকের বাঁ দিকটা চিরে অধ্যাপক ক্রুস্তিনোভ্‌ হাত দিয়ে তালে তালে যুবকটির হৃৎপিণ্ড মালিশ করতে থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে পাঁচ মিনিট ধরে মালিশ করবার পর হৃৎপিণ্ডে প্রথম সংকোচনের লক্ষণ দেখা যায় এবং ক্রমশঃ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া নিয়মিত হয়ে আসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই যুবকটি স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে শুরু করে।

পুনর্জীবন লাভ করার পর তৃতীয় দিনে যুবকটির হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ও শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় এবং তার মুখে গোলাপী রং ফিরে আসে। মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্কের প্রতিবর্তমূলক ক্রিয়াও আংশিকভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। রোগী এ অবস্থায় তরল পদার্থ পান করতে পারে এবং লক্ষ্য করা যায় যে তার চোখের প্রতিবর্তমূলক ক্রিয়াও ক্রমশঃ ফিরে আসছে।

মৃত্যুর পর পুনর্জীবন প্রাপ্ত দোইচিনোভ্‌কে এখনও ডাক্তার ও নার্সদের সতর্ক তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে এবং তার চিকিৎসার জন্য সবচেয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে।

জাপান দেশে সংস্কৃত ভাষার চর্চা।

অধ্যাপক অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ভাষা ও শিল্পকলা এশিয়ার নানাদেশে প্রসার লাভ করে। সেই প্রসারের ইতিহাস অতীব বিচিত্র ও কৌতূহলপ্রদ। বুদ্ধদেবের অমৃতবাণীর সুমধুর রজ্জুতে এশিয়ার নানা প্রদেশ—ঐক্যের বন্ধনে বাঁধা পড়েছিল আজও তাহার বন্ধন ছিন্ন হয় নাই। সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে চীন দেশ বুদ্ধের বাণী ও বুদ্ধের মূর্তি পূজা সসম্মানে গ্রহণ করেছিল—ক্রমে চীন থেকে কোরিয়া, কোরিয়া থেকে জাপানে—বৌদ্ধধর্মের শান্তিপূর্ণ পদক্ষেপ মন্দিরে, মঠে ও মূর্তিতে তাহার অসংখ্য চিহ্ন রেখে গেছে,—তাহার রূপ ও আকৃতি অত্যন্ত সুন্দর এবং চিত্তহারী। এইসব বুদ্ধ পূজার অলৌকিক চাক্ষুষ নিদর্শন—এশিয়ার শিল্পকলার এক বিচিত্র ও উজ্জ্বল অধ্যায়—যাহার দর্শনীয় নিদর্শনগুলি বিশ্বের রূপরসিকদের চিত্তহরণ করেছে। ভারতের যে সব প্রবণ ও সন্ন্যাসীরা বুদ্ধধর্মের প্রচার করেন চীনদেশে, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বোধিধর্ম—যাঁহার জনপ্রিয় চৈনিক নাম—"তামো" বা "দারুমা"। এই মহাশ্রমণের নানা প্রতিমূর্তি চিত্রে ও ভাস্কর্যে রচিত হয়েছে—চীনদেশের শিল্পীদের নিপুণ শিল্পকলায়।

জাপানের সহিত ভারতের সম্পর্কের ইতিহাস বড়ই বিচিত্র। কেবল ধর্মপ্রচারের পথ ছাড়াও অন্যপথে জাপান ভারতের সংস্পর্শ পেয়েছে।

৭৯৯ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে একজন বিদেশী একখানি ক্ষুদ্র নৌকাতে আরোহণ করে উপস্থিত হন জাপানের মিকাবো জিলার দক্ষিণ দেশের সমুদ্রকূলে। তাঁহার দেহে এক টুকরো কাপড়ের আবরণী ছাড়া আর কোনও পরিধান ছিল না। তাঁহার স্কন্ধে ছিল একখণ্ড নীল বর্ণের বস্ত্র, তাহাতে বাঁধা ছিল—কিছু কার্পাস তুলার বীজ। এই বীজ অবলম্বন করে জাপানে তুলার চাষ প্রথম প্রচলিত হয়। তিনি যখন জাপানের সমুদ্রের উপকূলে উপস্থিত হলেন তখন তাঁহার ভাষা কেহই বুঝিতে পারে নাই। ক্রমে যখন তিনি জাপানী ভাষা কিছু কিছু বলতে শিখলেন তখন প্রকাশ হল যে তিনি গিয়েছিলেন ভারতবর্ষ থেকে। তখন জাপানীরা জানতে পারল যে তাঁহার জন্মস্থান—"তেন্—জিকু"—বা ভারতবর্ষ।

কিন্তু, ভারত জাপানে কেবল মাত্র তুলার বীজই প্রেরণ করে নাই—আরও অনেক প্রকার বীজমন্ত্র প্রেরণ করেছিল তাহার ইতিহাস অতীব বিচিত্র।

জাপানে বৌদ্ধধর্মের বীজবপন করা হয়েছিল খৃষ্টীয় ছয় শতকের দ্বিতীয় পাদে। ৫৫৮ খৃষ্টাব্দে কোরিয়ার রাজা জাপানের রাজাকে কয়েকটি উপহার পাঠিয়েছিল তাহার মধ্যে ছিল—একটি বুদ্ধ প্রতিমা, একখানি বৌদ্ধসূত্রের পুথি, কয়েকখানি রেশমের পট। এইসব উপহারের সহিত একটি বাণী পাঠিয়েছিলেন কোরিয়া দেশের রাজা—এই বাণীতে বলা হয়েছিল—যে বৌদ্ধধর্ম সকল ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠ ধর্ম—এই ধর্ম অবলম্বন করিলে জাপানের প্রজাদের প্রভূত কল্যাণ হইবে। ইহার কিছু কাল পরে জাপানের রাজকুমার শোতোকু জাপানে বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্র অধ্যয়ন করিতে কয়েকজন জাপানী বিদ্যার্থীকে চীনদেশে পাঠিয়েছিলেন। তাঁহারা জাপানে ফিরে এসে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচার করিলেন। নানাস্থানে বৌদ্ধমন্দির রচিত হইল এবং সেখানে পূজাপাঠ ও সাধনার জন্য অসংখ্য পুরোহিত ও ধর্মযাজক নিযুক্ত হইল।

—এজমের ইতিহাস

উপন্যাস

সুশীল সিংহ

প্রথম যৌবন যেন তানপুরা। হাওয়া লাগলে এর তার কেঁপে ওঠে, বাজে। এর স্বভাবের মধ্যে সুর আছে।

পরিচিত মহলে অনেকের প্রথম যৌবনের নানা রঙের দিনগুলি ফুটে উঠতে দেখেছি। হরমোহন ঘোষকে যখন আলাদা করে চিনলাম তখন তার ছত্রিশ চলছে। তার সঙ্গে ভালোমতো চেনা জানা হওয়ার দেড় বছর আগেও আমি জানতাম না যে ইতিপূর্বে তার বিয়ে দেওয়ার বহু চেষ্টা হয়েছে। আর তার মধ্যে দু'বার তার বিয়েটা হয়েও হয় নি। কারণ সকলেই জানে। পারবেলিয়াতে কোন একটি পরিবারের কর্তা বিয়েতে কন্যাপণ হিসেবে দুটো শূওর দিতে চেয়েছিলেন। বিয়েতে এ হেন যৌতুক কল্পনা করাও কঠিন। সকলেই আন্দাজ করেছিল যে হরমোহন এতে রাজী হবে না। কিন্তু তার সিদ্ধান্ত ছিল অন্য সকলের অনুমানের উল্টো দিকে। সে রাজী হয়েছিল। তবে পাকা দেখার দিন কনের বাপ হবু জামাই দেখে—অর্থাৎ তাকে দেখে—বাতিল করে। এ ঘটনায় সে হতাশ হয় নি। হতাশা তাকে ছুঁতে পারে না। আর তাই, এর পরও তার বিয়ে নিয়ে কৌতূহলপ্রিয় উদ্যোগী পাঁচ জনের উৎসাহে ভাটা পড়েনি। একদিক থেকে তার চয়ন হয়ে গেছে। রক্তিবাটি ক্যাম্পে সত্যি তার বিয়ে হয়েছিল। বাসর রাতের ভোরবেলায় হরমোহনের ঘুম ভাংলে সে স্পষ্ট দেখেছিল যে তার বউ তখনো ঘুমোচ্ছে। ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেছে। তবে কিনা সন্ধ্যা বেলায় বিয়ের সময় যেটা মেয়ে ছিল, এখন দেখা যাচ্ছে সেটা মেয়ের 'ম' ও নয়। ছেলে। রক্তিবাটি ক্যাম্পের চৌদ্দ বছরের রিফুজী ছেলেটা পাঁচ টাকা পেয়ে মেয়ে সেজেছিল। বিয়েতেও বাধা দেয় নি। বাসর রাত সকাল হলে পাঁচ জনের সামনে দাঁড়িয়ে হরমোহন তার চিরকালের হাসি হেসে [তার সামনের পাটির দাঁত নিশ্চয়ই বার হয়ে পড়েছিল] বলেছিল, দূর!

—কি দূর?

—কি হলো কি, হরমোহন?

—আর, তোমার বউ কেমন হয়েছে?

—রাতটা কেমন কাটালে বলো।

—কিছু রসের কথা ছাড়ো বাবা।

হরমোহন রাগ করলো না, হাত পা ছুঁড়লো না, এমন কি মুখ তার পর্যন্ত করলো না। ওর দু'আনা বাইনে বাড়ার দিন যেমন হেসেছিল, অস্থায়ী চাকরীটা স্থায়ী হয়ে গেছে জেনে যে ভাবে হেসেছিল, যার সঙ্গে ওর বিয়ে হল সে মেয়েই নয় জেনে ও অবিকল তেমনিভাবে হাসতে থাকলো। সবাই ভেবেছিল রাগে ফেটে পড়বে, খাঁচড়ে কামড়ে দেবে। সে নিশ্চিন্ত মনে দিব্যি বিড়ি ধরালো। অন্য কোন দিকেও গেল না।

যাকে নিয়ে এই মজা সেই মূল গায়েন এমন ঠাণ্ডা হলে মজা জমে না। ওকে তাতিয়ে তোলার চেষ্টায় একজন ফুট কাটলো, হরমোহনের বউ কিন্তু রে হয়েছে বাপু।

—হ্যাঁ রে, বউ নাকি বদলে গেছে ?

এই 'বদলে গেছে' কথাটা শুনে হরমোহনের চোখ দুটো নাকি চক্‌চকে হয়েছিল।

—আহ্ হা বদলেছে মানে ?

গলা বাড়াল আর একজন।

—বদলেছে।

—বলি হ্যাঁরে হরমোহন, ভালো করে দেখেছিলি তো ?

—ওকি আর কাঁচা হে ! নাকি বলো—

—ওর বউর নাকি পরে বাড়ি গজাত।

—বউর বাড়ি ?

খুব জোরে টিন বাজাতে শুরু করেছিল ওরা। রতিবাটি ক্যাম্প থেকে নিমচা ওরা টিন বাজাতে বাজাতে এসেছিল দল বেঁধে, পায়ে হেঁটে। সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা, হরমোহনও ওদের সঙ্গে চললো। ফলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো যেন যাকে নিয়ে ওরা এ'যেন কৌতুক গল্প তুলেছিল তাকে যেন ওরা ঘটনাস্থলেই ফেলে এসেছে। সে লোক যে সঙ্গে চলেছে, তা কে বলবে ? টিনের বাজনা, কোমর দুলিয়ে নাচ ইত্যাদি কেমন তাৎপর্যহীন হয়ে গেল।

গোড়াতেই বলেছি যে হরমোহনের সঙ্গে আমার যখন আলাপ তখন তার প্রথম যৌবন কোন্ তেপান্তরে চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে। তার যৌবন—যৌবন ? কোন দিন কি সে যৌবন পেয়েছে ?

নির্বিকার হরমোহন। নির্লিপ্ত। তাই বলে নিস্পৃহ নয়। যে কোন অবস্থায় যে কোন ঘটনায় তার কোন বিকারের বিন্দুমাত্র আমি দেখি নি। এর চেয়েও বিস্ময়কর তার নির্লিপ্ততা। কারখানার কাজের ফাঁকে ফাঁকে দিনের পর দিন খুব কাছে থেকে তাকে আমি দেখেছি। তাকে দেখতে দেখতে আমার প্রায়ই আমাদের স্কুলের এক সহপাঠীকে মনে পড়ে। মনে আছে ক্লাসের সবাই তার নাম দিয়েছিল : 'খন্তী'। খন্তীনাথের ইতিহাসের পিছনে অবয়বের কোন বৈশিষ্ট্য বা কোন ঘটনা ছিল কিনা আমার মনে নেই, এমনকি তার আসল নামটাও ভুলে গেছি। শুধু মনে আছে সেই সহপাঠীর ওপর অনেক ছেলে অকারণে বড় নিষ্ঠুর ছিল। খন্তী কোন কোন দিন কাঁদতো। টেচাত, লাফাতো, হেডমাস্টার মশাইকে বলে দিত, বাড়ি থেকে আবার চিঠি পর্যন্ত এনেছিল। তারপর একদিন আড়াল থেকে তাক্ করে কার যেন মাথায় ইঁট মেরেছিল। ফার্স্ট ক্লাশে খন্তী তাই স্বাভাবিক ভাবেই বলে গিয়ে গিয়েছিল। বলা বাহুল্য, এই ইঁট মারতে পেরেছিল বলেই।

ভাবছি, বহুর মধ্যে থেকেও হরমোহনের এই একেবারে আলাদা একা একা, তার এই চিরকেলে খন্তীর দশা দূর হবে কবে ? কবে ঘুচবে তার এই নির্বাসন ? বিয়ে হলে ?

আমার মনে হয় হরমোহন সেই জাতের লোক—একবার দেখলেই যে ফুরিয়ে যায় না। তার মধ্যে যে অনন্ত কিছু দেখবার আছে এ কথাটা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু চোখে যার পড়ে দেখে দেখে তার আর ফুরোয় না। বার বার দেখতে হয়। বহুদিন দেখতে হয়। ইচ্ছে হয়, সকলকে ডেকে হরমোহনের গল্প শোনাই। এই শতকের মুখোমুখি দাঁড়ানো যায় এমন যদি কোন মঞ্চ থাকত, তাহলে তার ওপর তাকে একবার দাঁড় করাতাম। আর কিছু নয়। সে তার নিজস্ব ভঙ্গীতে একবার মাত্র হাসতো। বলা যায় না, হয়তো বা কস্ করে একটা বিড়িও ধরিয়ে ফেলতো। ঠিক তখনই ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ না কেউ ডেকে উঠতো, ধারা সিং।

—হো ধারা সিং।

হরমোহন আবার হাসতো। অনেকেই তাকে ধারা সিং বলে ডাকে। যাকে মজা পায় তারা, তাকে এই নামে ডেকে।

বস্তুতঃ ধারা সিং মস্ত পালোয়ান। পৃথিবী জানে সেই নাম। মাথায় ছ'ফুট সে। পেশায় তার হাতি। ওজন কয়েক মণ।

আর হরমোহন?

বলছি। মাথায় বড় জোর চার ফুট দু' ইঞ্চি। পাতলা চুলে সিঁথির বালাই নেই। ওর পকেটে সব সময়েই যে লাল চিরুনিটা থাকে তা দিয়ে ওলটানো চুল আর একবার উলটে নেয়। ছোট্ট মানুষ। হাত, পা, মুখ সবই মানানসই ছোট। বড় কেবল দু'হাতের নখ। নখগুলি মহলা। মুখের ধাচটা পেয়ারার মতো লম্বাটে। থুতনির দিকটা ছুঁচলো। চোয়াল আবডাঙা। ওপরের পাটির সামনের কয়েকটা দাঁত বড় বড়। হাসলে পর বার হবেই হবে। আর কথায় কথায় হরমোহন হাসবেই হাসবে। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে যাবে, বার হয়ে আসবে দাঁত। দাঁতগুলো হলদেটে। হাসিটা চোখ থেকে ছড়িয়ে যাবে দাঁতে। যাবেই। মুখের গড়নের তুলনায় বেমানান বড় কান দুটো তখন চোখে পড়ে। মনে হয়, হয়তো ওগুলো এখুনি নিজের থেকে পাখা করার মতো দুলে উঠবে।

সারা মুখে দাড়ি গোঁফ খুঁজে নিলে তবে দেখা যায়। গোঁফের অংশে একজন বছর ষোলোর ছেলের মতো মসৃচ্ছন্ন ভাব। হরমোহন যখন কোন কোন দিন সেটাকে সেলুনে বসে কামিয়ে ফেলে তখন কিছুদিন খোঁচা খোঁচা, তারপর হপ্তা দুই তিন পরে আবার সেই বছর ষোলোর অবস্থা। দাড়ি বলতে থুতনির কাছে কিছু আছে। সেগুলির প্রত্যেকটিকে আলাদা করে বাছা যায়।

হরমোহনের সঙ্গে কাজ করে যজ্ঞেশ্বর কাহার। দু'জনেই মুইপার। ধারা কাচ কাটে তাদের ক্যালেট (collet) বীন উপচে উঠলে, হাতের বুরুশে করে ওদের সাফ করতে হয়। আর সব সময় সে সব বীন যেন উপচেই আছে। যজ্ঞেশ্বরের দৃঢ় ধারণা যে হরমোহনের মতো ফাঁকিবাজ আর নেই। একবার সে খইনি ডাগ করবার সময় 'দেখি দেখি তোর মুখে কি লেগেছে' বলে হরমোহনের একটা দাড়ি গোড়াশুদ্ধ তুলে দিয়েছিল। দাড়ি তুলে দিয়েছে বলে হৈ চৈ করবে হরমোহন তেমন লোকই নয়। যজ্ঞেশ্বর নিজেই পকমুখে কথাটা রাষ্ট্র করে দিয়েছে।

হরমোহনের বয়স যদি ছত্রিশ, যজ্ঞেশ্বর তবে নিঃসন্দেহে বাহান্ন। দু'জনের মধ্যে বয়সের ব্যবধান এক যুগেরও বেশি। তা হোক। ওরা দু'জনেই কারিগর। আর তাই দু'জনের মধ্যে সব সময়েই এক অদৃশ্য প্রতিযোগিতা আছে। হরমোহন বলে যে যজ্ঞেশ্বরের মুখ ভরা গোঁফই সার। ওর মাথায় বুদ্ধি বলতে কিছু নেই। সব গোবর।

আর যজ্ঞেশ্বর রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে হরমোহনের মুখের ওপর বলে, কাজ যা করার প্রায় সবটাই সে করে। হরমোহন ফাঁকি দিয়ে হারাবের পয়লা খায়।

কথা শুনে হরমোহন তার হাসিটি হাসে। যেন যজ্ঞেশ্বর নিতান্ত অবোধ শিশু, না জেনে কি বলেছে। হাসি দিয়ে ক্ষমা করা গেল। যজ্ঞেশ্বরই যেন হারাম।

যজ্ঞেশ্বরের জীবনের কথাও কৌতুককর, সভ্য জগতকে শোনানোর মতো। তার বিস্তারিত বিবরণ থাক। তবে যজ্ঞেশ্বর কাহারের জীবনের সেই সব ঘটনার দুই একটা না জানলে হরমোহন ঘোষের এ জন্মের ইতিহাস ঠিক ঠিক জানা হয় না।

যজ্ঞেশ্বরকে দেখলেই বোঝা যায় যে এককালে তার চেহারা দশাসই ছিল। সে একদিন অন্তর সন্ধ্যাবেলায় সিকি বোতল দেশী মদ খায়। তাই তার মেজাজটা চিলে, বেশ একটা ঝুরঝুরে ভাব। লোকটা অবস্থার তুলনায় বেশ শৌখিন। ঘাটার জুতো জোড়া পুরানো বটে, দু'চারটে তালিও আছে, তবে ঝকঝকে। পরনে হ্যাক প্যাণ্ট, হাফ শার্ট। পরিষ্কার, কামানো মুখ। ছাঁটা, চওড়া গোঁফ। মাথায় কাঁচা পাকা চুলে সিঁথি। হাঁটে বুক চিতিয়ে। কণ্ঠস্বর সামান্য ভাঙা। কথা বলে একটু হেঁকে। বিনয় আছে, অথচ সব মিলিয়ে হরমোহনের তুলনায় বেশ একটা 'হাম ছায়' ভাব। জনশ্রুতি এই যে হরমোহনের দারা সিং নামটা ওরই দেওয়া।

যজ্ঞেশ্বরের কাছ থেকে জরুরী কাজ নিতে বলে বলতে হয়, "আরে তুমি আর ও। কাজের কিছু জানে ও। কিস্সু জানে না। তোমার কি ধারিণা জান! সে সব ওর আছে? হেঃ, তোমার কত 'এসপিরিন্'—

এসপিরিন্, মানে 'এক্সপেরিয়েন্স'। অভিজ্ঞতা।

আর বলতে হয় না। গদগদ হয়ে যজ্ঞেশ্বর তখন বলে,—তবু, বলিয়ে হজুর।

—তুমি যদি বলো

—কা?

—তুমি বললে, তুমি যদি চাও, ওর চাকরি এখুনি চলে যেতে পারে। তা জানো?

পরম বৈষ্ণবের সামনে জীবহত্যার প্রস্তাব করলে সে যেমন চমকে ওঠে, তেমনি ভাবে চোখ দুটো প্রায় বুজে যজ্ঞেশ্বর বলে ওঠে, ছোড় দিজিয়ে সাব। গরীব কা রোটি রহে দিজিয়ে। হম্ সমঝা লেগা।

আর দেখতে হয় না। সে একাই তিনজনের কাজ করে যেয়।

নিজেকে নিয়ে যজ্ঞেশ্বরের অহংকার হলো তার 'এসপিরিন্' অনেক। সে রেলে ফিটারের কাজ করতো। আজ সাত বছর ধরে কাচ কারখানার 'ওয়ার হাউসে' (Ware House) সে ভাঙা টুকরা কাচ সাফ করছে, ছাঁটে দিচ্ছে, ময়দানের মতো বিরাট সিমেন্টের মেঝের সকাল বিকেলে ঝাঁকরি দিয়ে জল ছিটিয়ে ধুলো মারছে। আসলে কিন্তু ও রেলের ফিটার। গত সাত বছরে সে বারো চোদ্দ বার সে তার রেলের কাগজপত্র নিয়ে এসেছে, একে ওকে দেখিয়েছে। আমিতো দেখেছি। তার বিশ্বাস, এ অধর্ম চলবে না। রেল তাকে আবার ডেকে নেবে। নিতেই হবে ডেকে, মালিক ভগবান যে আছে মাথার ওপর।

হরমোহন বলে হেসে, কাজ করেছিস না কচু। কাজ করলে তোকে তাগায়? তোর মাথায় গোবরও নেই। আছে এইটা—

এই বলে নিজের বুড়ো আঙুলটা যজ্ঞেশ্বরকে দেখায়।

দু'জনের কথা বলার ধরণ একেবারে উলটো। যজ্ঞেশ্বর কথা বলে হেঁকে। আর হরমোহন যেন হাঁপিয়ে ওঠে। মনে হয় সে যেন কঠিন কোন অসুখ থেকে উঠেছে অথবা শারীরিক কোন যন্ত্রণাকে চেপে কোন রকমে কথা বলছে। তার কথার ভঙ্গী বীর, একথা বললে ঠিক বলা হয় না। দু'বছর একটানা তাকে দেখছি। দু'বছর কারো অসুখ থেকে ওঠার অবস্থা থাকতে পারে না। বুঝেছি এটাই ওর কথার ধরণ। আসলে পৃথিবীতে হরমোহনের কোন পক্ষ নেই। যন্ত্র নেই। একটা বিশেষ ক্ষেত্রে ওকে নিয়ে অনেকে আছে। অনেকের তাই নানারকমের রকম ফের। চেহারায় কণ্ঠস্বরে হাসিতে বিভিন্নরানোয়—সব অবস্থাতেই হরমোহন এক।

ওর নিজের মতো করে বলা কথায়, বুড়ো আঙুল দেখানোয় আর তারপর সেই হাসিতে যজ্ঞেশ্বরের গা জ্বলে যায়। গদগদ করে ডাকে, 'হড়মোহন'—

—কি হয়েছে কি। ঠিকই তো বলেছি। না হলে তোকে রেল কুম্পানী তাগাবে কেন? তবে কি তুই চুরি করেছিলি?

কথা হচ্ছিল দু'জনের মধ্যে। অথচ যজ্ঞেশ্বর নাকি রেলে কাজ করার সময় বল্টু চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল, এ কথাটা রটনা হয়ে গেছে। রটনা করেছে হরমোহন। যজ্ঞেশ্বর ওর নাম দিয়েছে: ধারা সিং। ঠিক না। এই রটনা তারই বদলা।

প্রায় সাত আট বছর আগে রেলে যজ্ঞেশ্বরের চাকরি দশ বছর পুরোনো হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় কোন্ সূত্রে সেটা ঠিক জানে না ও, ওর তিনমাস ছুটি হয়ে গেল। ছুটি না ছুটি। ছুটি থেকে ফিরে তাকে আর কাজ করতে হল না। বাবুদের কথামতো সে তিন চারটে ছাপান ইংরেজী লেখা কাগজের ওপর সে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের টিপছাপ লাগালো। সাতশো টাকা পেল।

ব্যাস! হয়ে গেল। তার নাকি রিটায়ার হয়ে গেছে।

ব্যাপারটা বুঝতে যজ্ঞেশ্বরের লাগলো আরো দু'মাস। সে ছিল কিটার খালাসী। আর একজন এই নামের লোক ছিল, সেও কিটার খালাসী। সেই লোকটার অবসর নেওয়ার কথা। কিন্তু বাবুদের টাকা খাইয়ে সে তার কাজ বজায় রাখলে। আর ও গেল বাদ। রেলের বাবুরা চোর। তার কিছুই করবার নেই।

হরমোহন বলে, কারুর বউ কেড়ে নিলে তার কি কোন ইজ্জত থাকে?

কোম্পানীকে 'কুম্পানী', ইজ্জতকে 'ইজ্জুত' বলে হরমোহন।

যজ্ঞেশ্বর হাসে, তোকে তো কেউ বেরেই দেয় না। তুই তার কি বুঝবি?

—আর চাকরি কেড়ে নিলে ইজ্জুত বাড়ে? কি রে বুড়া?

প্রায়ই যজ্ঞেশ্বরকে বুড়া ডাকে হরমোহন।

বুড়া একথার উত্তর দেয় না। হরমোহন বিড়ি ধরায়। সারা দিনে আঠাশ থেকে আটত্রিশটা বিড়ি খায় ও।

॥ দুই ॥

"শিবের কথায় যেমন নন্দী ভৃঙ্গীর কথা আসে, হরমোহনের জীবন-চরিতে সেইভাবে যজ্ঞেশ্বরের কথা না এসে যায় না", এই বলে বন্ধুবর গল্প শোনাতে শোনাতে সকলের দিকে চাইলেন। বললেন, "ভোলা মহেশ্বরের বিয়ে করতে যাওয়ার প্রসঙ্গে রবি ঠাকুর কি লিখেছেন মনে আছে তো? লিখেছেন—

যবে বিবাহে চলিলা ত্রিলোচন
তার কত শত ছিল আয়োজন।
তার জটপট করে বাঘছাল
তার ঘনঘন বাজে গাল
তার ঘুর রহি রহি গরজে
যত ভূতদল তরজে—

ধাঁড়টির পর্যন্ত উল্লেখ করতে কবি ছাড়েন নি। হরমোহনের বিয়ের গল্প শোনাবো কথা দিয়েছি। তার আগে সাধ মিটিয়ে ঘর আর তার সাজ-পাজর বর্ণনা করতে দাও। অধৈর্য হয়ো না।

শ্রোতাদের একজন বললো, তবে ব্যাপারটা কি জানো? আভাসে মনে হচ্ছে ভারতবর্ষে সত্যিকার সমাজতন্ত্র আমার মতো তোমার গল্পের বিয়েটাও অনেক দূর। চট্ করে একজন নায়িকার আমদানী করে ফেলো না বাবা।

চরিত্রকার বন্ধুবর বললেন, তার মানে তুমি উমুকের কায়দায় বানাতে বলছো?

একজন—সেটা কি রকম?

অন্যজন—উনি চমৎকার লেখেন।

—আরে আমিও তো তাই বলছি। লিখতে আরম্ভ করলেন যেন, 'ভাবছি মেহাদির কথা লিখব। কিন্তু সে কথা লিখতে হলেই তেঁতুলাদির কথা চলে আসবে। তেঁতুলাদির নামেই জিবের ভেতরটা টক্ টক্ লাগছে। অথচ তেঁতুলাদির কথা, লিখতে হলে তার আগে ইমলি কলাগেের সেই নার্স মহিলাটির কথা লিখতে হয়।.....' গল্পের সুরুতেই এই সব পড়ে পাঠকের মনে হয়েছে, 'ইস্। এতগুলো মেয়ে!' পাতাকলে ইঁদুরের মত পাঠক জমে গেছে। সত্যি, ওঁর ষ্টাইলটা বেশ। যা ইচ্ছে তাই লেখার ব্যাপারে ওঁর তুলনা হয় না।

একজন সিগারেটের প্যাকেট বার করে সকলকে দিয়ে বলল, শান্ত হও। পরচর্চা ছাড়। তারপর চালাও—

ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঘরটায় মধ্যে অবিলম্বে আদর্শ পরিবেশ গড়ে উঠল।

অতিক্রান্ত হরমোহনের বিচার প্রসঙ্গে আমার কথা দিয়ে চরিত্রকার আবার সুরু করলেন—

আমরা যখন সূর্যের দিকে তাকাই তখন ডান হাতের আঙুলগুলো একত্র করে, হাতের পাতা সামান্য ভাঁজ করার মত করে কপালের উপর রাখি। হরমোহনের সেলাম করার ভঙ্গীটা হুবহু সেই রকম। যেন ওর চোখের সামনে তেমন কিছু এসে গেছে। চোখ খানিকটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা। বাধ্য হয়ে তাকাতেও হচ্ছে। এর নাম সেলাম।

সেদিন শ্রাবণ মাসের সকালবেলা আকাশ উপুড় করা বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টি। বৃষ্টি। ঝম্‌ঝম্ করে বাজনা হচ্ছে ধারাপাতের। থেকে থেকে গুরু গুরু করে মেঘ ডেকে উঠছে। খল্ খল্ করে জল ছুটেছে নালি দিয়ে। ওপরের ছাদ থেকে বিপুল তোড়ে জল গড়িয়ে নামছে। বৃষ্টির দিকে চেয়ে চেয়ে কি দেখার ছিল কে জানে। সে বৃষ্টি দেখছিল। এক থেকে দুনম্বর ওএর হাউসে যাবার যে ঢাকা সরু পথ তারই পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল সে। অদূরে যে নতুন শেড তৈরী হচ্ছিল বৃষ্টির দাপটে কিছুক্ষণ তার কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। তিনটি কামিন ওই কোণায় দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কলবল্ করছে। হরমোহন আদি বৃষ্টি দেখার নামে আড়চোখে ওই তিনটি টগর, সোসা, যুথিকে দেখত, তাহলে কোন কথা ছিল না। সে বৃষ্টি দেখছিল।

এই সময় ডিপার্টমেন্টাল বড় সাহেব মিঃ ব্র্যাড্‌লে সেইখানটায় এলেন। ছ'ফুটেরও বেশী লম্বা, লালচে রং সাহেব। হরমোহন ওঁর চোখেও পড়ল না। তিনটি কামিনকে চোখের সামনে দেখে ওঁর মুহূর্ত দিশ বন্ধ হয়ে গেল। তিনিও মিনিট দুয়েকের মত বৃষ্টিতে চোখ রাখলেন। ধরা পড়ে যাবার ভয়ে হরমোহন গুটি গুটি এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ান সাহেবের ঠিক পিছনটিতে। তার তুলনায় সাহেব যেন পাঁচিল। সাহেবের মাথা ডিঙিয়ে, শরীরের পাশ বেয়ে বৃষ্টি তার গায়ে লাগতে পেল না। এ হেন অতিজ্ঞতায় মহা খুসী হয়ে সে কামিন তিনটির দিকে চেয়ে তার সেই হাসি হাসল।

সাহেব দেখে তারা যদিও বা চুপ করে ছিল, হি হি করে হাসিতে ভেঙে পড়ল এখন। হাসির ধমকে

তিনটি দেহ দুলে দুলে উঠছে। শরীরে স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য নাচানাচি করছে। বৃষ্টির বাজনা বাজছে। সাহেবের চোখ থেমে গেল। হয়তো বা আধমিনিট। যেন পায়ে কিছু লেগেছে এই ভাবে পিছন ফিরে চাইতেই ব্র্যাড্‌লে সাহেব দেখলো হরমোহনকে। ততক্ষণে সে সাহেবকে সেলাম করে ফেলেছে। এবং হেসেছে। হাসিটা যথারীতি চোখ থেকে ছড়িয়ে গেছে দাঁতে।

অবাকবিহি চাওয়া দূরের কথা। সাহেবও ফিরে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে তারই ভঙ্গীতে কপালে হাত ঠেকিয়ে ভাঙা ভাঙা ভাবে বললে, সেলাম।

সাহেব চলে গেল। বৃষ্টির যাদু লেগেছে তার চলনে।

ছুটি হয়ে গেল। বৃষ্টির বেগটা কমেছে। ঝির ঝির করে ঝরছে এখনো। মেঘে মেঘে চারদিক ঝাপসা, আঁধার হয়ে আছে। ক্লক কার্ড পাঞ্চ করে কারখানা গেটের বাইরে এসে দাঁড়াল হরমোহন। রাস্তার ওপর সার সার চা খাবারের দোকান। দুটো মুদিখানা, দেশুন, বস্তির দোকান, ওপাশে। তেতারতি চালায় অনেকে। পাঞ্জাবী আর সিন্ধীর চা-খাবারের দোকানে ঘর যুগো ভীড়টা ভাঙা ভাঙা হয়ে ছটলা হয়ে পাকিয়ে তুলেছে। গরম চায়ের সদুম পেয়ালা, পকৌড়ি আর রেডিওতে 'মেরা দিলমে আনা রে' তারস্বরে চেঁচাচ্ছে।

বর্ষাকালের বৃষ্টিতে গা বাঁচে না। তবু অনেকে সে চেষ্টাতেই দ্রুত কদমে হাঁটছে। যারা ছাতা এনেছে তারা তো আপাততঃ নিশ্চিন্ত। হরমোহনের ছাতার বালাই নেই। বৃষ্টি থেকে বাঁচবার কোন চেষ্টাও নেই। তার নিজের কণ্ঠস্বরের মত ঢিমে তালে সে এগিয়ে চলল।

রাস্তার এদিকে বসে প্রকাশ্যে একজন একটা মুরগী কাটছে। তারই আয়োজন চলেছে। বাদলা দিন। গরম গরম মুরগীর মাংস পাঞ্জাবীর দোকানে পড়তে পাবে না। হোটেলের লোকটা একাই কাটবে। কারো সাহায্য নেবে না। লোকটার পাগড়ীটা ঢিলে হয়ে গেছে। মুরগীটা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে।

হরমোহন দাঁড়িয়ে গেল।

মুরগীটা দু'খণ্ড হয়ে গেছে। পাইপে আগুনকা ফুটো হয়ে গেলে যেমন জল যার হয়, তেমনি ভাবে ওর গলা থেকে রক্ত বার হয়ে আসতে চাইছে। লোকটা বুড়ো আঙুলে করে সেই মুখটা চেপে ধরেছে। কাটা মুরগীটা এখনো ঝাপটাচ্ছে। লোকটার হাতে রক্ত লেগে গেছে। মুখটা হাঁ করে পড়ে আছে।

—কত করে দেবে হে?

হরমোহন তার নিজস্ব ভঙ্গীতে জানতে চাইল।

লোকটা উত্তর দিল না।

—চার আনার পাওয়া যাবে?

—কা?

—সন্ধ্যে বেলায় আসব। চার আনায় রেখে দিও, এই বলে হরমোহন হাসল।

লোকটা বলল, কা হাত ক্যালাতা হায়?

হেসেই বলল, রাগ কেন করতা হায়? মানুষের ইচ্ছে তো হায়। বুঝলে? পাঁচজনকে দিয়ে একটুকরো আর ঝোল একটু ফেলে রেখে দিও। এই চার আনায়। ঠিক তো?

লোকটা যেন কান করলো না।

হরমোহন এগিয়ে গেলে পিছন থেকে ডাকল, এই ?

ওটি ওটি ফিরে এলো সে। —কি ?

পাঞ্জাবী হিন্দীতে বাঙলা মিশিয়ে লোকটা জানতে চাইল, কবে পাওনা টাকা শোধ করবি ?

তিলমাত্র উদ্বিগ্ন না হয়ে সে পাল্টা প্রশ্ন করল , কত পাবে কত ?

—সাড়ে ছ। কতবার বলতে হবে ?

—ও ! দোব, দোব।

ঘুরপী আর ছুরি নিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে লোকটা বলল, সামনের হপ্তা পেয়ে যদি না দিবি, তবে সুদ ধরব টাকায় এক আনা করে।

—ইঃ

—কা ?

—যেন, যেন। টাকা না দিলে সুদ দোব। আর আমি যে কথাটা বললাম—

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরে দাঁড়াল লোকটা।

—একটুকরো রেখে দিও। চার আনার মত। কেমন ? হেঃ—

ইতিমধ্যে সেই কামিন তিনজন—টগর, সোনা আর যুথনি—তাকে পিছনে রেখে এগিয়ে গেছে। ওদের ধরে ফেলার জন্যে সে যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি হাঁটার চেষ্টা করল। একটু আগে রাস্তার একপাশে ওরা দাঁড়িয়ে গেছে। কাছাকাছি আসতে সে-ও দেখতে পেল যে রাস্তার ওপর পিচের সঙ্গে একটা কুকুর পিষে গেছে।

তাকে দেখে নিজেদের মধ্যে চলাচলি করে উঠল কামিনী তিনটে।

—আ মলো। চলানির কি হয়েছে রে ?

তারা তিনজনে তাকে গ্রাহ্যই করল না। হাতে হাত দিয়ে হাঁটা দিল।

—একটা কুকুর মরেছে। আর ওরা এ-ওর পায়ে চলছে। সাধে বলে মেয়েমানুষ, সে বিড়বিড় করল নিজের মনে।

সামনে এগিয়ে যাওয়া তিনজনের একজন চলতে চলতে খেমে রাস্তায় ঝুঁকে একটা নতুন এক পয়সা তুলে নিলে। হাত থেকে পড়ে গেছে কিম্বা পড়েছিল। সাথে একটা ফুটো করে নিলেই নাকের গয়না হবে।

সেই ঝুঁকে নেমে আসা স্ত্রী মূর্তির দিকে চেয়ে একটা বিড়ির জন্যে পকেটে হাত দিয়ে সে টের পেলো যে বিড়ি ফুরিয়ে গেছে।

॥ তিন ॥

রাস্তা পার হল হরমোহন।

সামনে পূজারী বাবার বাড়ী। বাঁ পাশে রেলের লেভেল ক্রসিং। এর মাঝ দিয়ে ছাইফেলা মাটির রাস্তা। রাস্তার মাটি তুলে বিষ্টি কাদা হয়ে গেছে। পায়ের ছোপ। পা ঢুকে যায়। হরমোহনের কেডসের অর্ধেক গেল ঢুকে। লাল মোজায় লাগল ছিটে।

মিনিট সাতেকের পথ। তারপর যার যার কোয়ার্টার।

মোট নটা ব্লক। সাত ব্লক ব্যাচেলার্স কোয়ার্টার। দু' ব্লক ফ্যামিলি।

ব্যাচেলার্সরা পায় একটা ঘরের আধখানা। একটা ব্লকে পনেরো খানা ঘর। হিসেব মত প্রতি ব্লকে ত্রিশ জন কুমারের আস্তানা। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে দু পাঁচজনকে ভজিয়ে হরমোহন ঘোষের সহোদর দাদা মণীন্দ্র ঘোষ একটা পুরো ঘর নিজের দখলে এনে ফেলেছে। নিজেদের মধ্যে আপোষ বন্দোবস্ত আর কি।

ঘরটি লম্বা হাত বারো আর চওড়ায় হাত দশেক হবে। সামনে সওয়া দুহাত চওড়া বারান্দা। নানা কাঠের জোড়াতালি দিয়ে অনেকেই সে বারান্দা ঘিরে নিয়েছে। মণীন্দ্র ঘোষের ওভার টাইম, বোনাস ইত্যাদি মিলিয়ে উপার্জন কোন মাসেই দেড়শো টাকার কম নয়। কিন্তু তার চারটি ছেলে। সে আর তার স্ত্রী। মোট ছটা প্রাণী। আবার তার স্ত্রীর সন্তান হবে। প্রতি দেড় বছর তার বৌ বাচ্চা বিয়োয়। কামাই নেই। চাকরী করে হরমোহনও তার দাদার সংসারে এক হাঁড়িতে ছিল। রাত্রে ঘুমোত ঘেরা বারান্দায়। গতকাল রাত থেকে মণীন্দ্র তাকে জবাব দিয়ে দিয়েছে। অন্যত্র তাকে জায়গা খুঁজে নিতে বলেছে।

হরমোহন দুঃখ করে দু'একজনকে বলেছে, মায়ের পেটের দাদা আমার। এই বিচার করল।

মণীন্দ্র বলেছে, আমি ছেলে বউ নিয়ে ঘর করি। ওর খাওয়া যে কি পরিমাণ তাতো পাঁচজনে জানে। নিত্যি ওই পুকুর ভরানো আমার কর্ম নয়। ভাইএর উপার্জনে আমার কাজ নেই।

তা সত্যি। খাওয়া বটে। অনেকেই দেখেছে। পেটে পুকুর না থাক, কিছু একটা আছে। না হলে ওই শরীরে অত খাবার যায় কোথায়? কারখানা ক্যান্টিনে সকাল বেলায় পাঁচ আনায় ভাত, তরকারী, ডাল পাওয়া যায়। একটুকরো মাছও থাকে। কাঁচা পিঁয়াজ বা কাগজি আধখানা থাকে। যার যেমন পেট সে তেমন খায়। হরমোহন বসে আগে, ওঠে শেষের দিকে। কিছু না হোক, তিনজন প্রমাণ মানুষের ভাত ও একলা মেরে দিতে পারে। পেটে বোধ হয় কৃমী আছে।

—কৃমী কিমি নয় গো, পেটে খাবার ধরিত্রী আছে। ধরিত্রী, বলে মণীন্দ্র ঘোষের বউ, হরমোহনের বৌদি।

একবার এই খাওয়া নিয়ে পাঁচজনে পরামর্শ করে হরমোহনকে বাজীতে হারিয়েছিল। সবাই বলেছিল পাঞ্জাবীর দোকানে চারপ্লেট ভাত মাংস সে কিছুতেই খেতে পারবে না।

—পারবো।

—কখ্খনো না।

—মাংস থাকলে খুব পারব।

—বেশ তাহলে হয়ে যাক আজ দুপুর বেলায়।

হরমোহন হেসে বলে, হোক।

—দশ টাকা বাজী।

—ও, বড্ড বেশি।

—তবে?

—যে হারবে সে খাবারের দাম দেবে, হরমোহন বললে।

চারপ্লেট ভাত যাংসের দাম হয় ছটাকা। ওরা লুকিয়ে পাঞ্জাবীকে বলেছিল যে চারপ্লেটে যেন ছ'প্লেট পরিমাণ ভাত দেওয়া হয়। মোট দাম তাহলে সাড়ে ছ'টাকা। ভাতের পরিমাণে এই কারচুপি হরমোহন জানতো না। জেনেছিল পরে—দাম শুনে। খেতে বসে চতুর্থ প্লেটটা সে আর শেষ করতে পারলো না। হেরে গেল। সেই থেকে পাঞ্জীর কাছে ধার হয়ে গেছে। রাস্তায় দেখা হলেই ব্যাটা তেড়ে আসে।

গতকাল রাত্রে সে তাই যাদার কাছে কথাটা তুলেছিল। বলেছিল, সামনের হপ্তায় আমার সাতটা টাকা লাগবে।

—পাস তো বারো টাকা। আমার কাছে যাবো কেন?

—তা কি করবো। আমিতো এখনো টেম্পোরারী।

—তুই চেষ্টা করিস? কাউকে বলেছিস?

—কত বাবুকে তো বলেছি সি, এল, (C. L.) করে দিতে। তাহলে মজুরীটা যাবে আর বোনাসও পাই।

মণীন্দ্র ঘোষ তখন আমানি আর নুন দিয়ে মাখা ভাতের গোগ্রাসটি মুখে পুরে দিয়েছে।

হরমোহন বলল, সব বাবু বলে যে আমার সি, এল, হবে না।

—কেন?

—বলে আমার ওজন কম, মোট ছাব্বিশ সের। মেডিকেলে আমি ফেল হয়ে যাব, এই বলে হরমোহন হাসল।

—হাসছিস? রাস্কালা, হাসতে লজ্জা করে না?

হরমোহন নির্বিকার ভাবে বলল, বৌদি চারটি ভাত দাও আরো।

মণীন্দ্র ঘোষের রাগ তখন তাকে ভেতরে ভেতরে কাঁপিয়ে তুলেছে। বলল, তোর ওজন ছাব্বিশ সের, তা জগৎ সুদ্ধু লোক জানল কি করে?

—ওরা সব বলছে।

—ওরা কারা?

—সেদিন সবাই মিলে আমার ওজন করলো না?

ঘটনাটা মণীন্দ্রও জানে। সেদিন পাঞ্জাবীর দোকানে খাওয়ার পর সবাই মিলে হরমোহনকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল মিসিরজীর চাল ডালের দোকানে। কি হবে না, হরমোহনের ওজন হবে। মিসিরজীর দোকানের দাঁড়ি পাল্লা দাঁড়ান। তাতে মণ মণ জিনিষ ওজন হয়। তাতে হরমোহন গিয়ে দাঁড়াল। ওজন হলো ছাব্বিশ সের, এক পো, তিন ছটাক।

দাঁড়িপাল্লা থেকে নেমে হরমোহন বলল, ও সেঠ পাথর নেই তো?

সেই ওজন নেওয়ার কথা উঠতেই মণীন্দ্র আর নিজেকে সামলাতে পারল না। তার মুখের আগল রইল না। বলল, ওজন নিয়েছিস? সঙ্ সাজতে গেছিস?

ঠিক তখনই হরমোহনের বৌদি মোটা চালের একথালা ভাত তার থালায় ঢেলে দিয়ে বলল, আর নেই গো। চেয়ে যেন লোক হাসিও না।

মণীন্দ্র ঘোষ তখন নিজের থালা উল্টে দিয়ে চেঁচাচ্ছে, মর, শালা ভুর মর।

আর তার বৌদি বলছে, যাওনা গো। তোমার সেই থিয়েটারের দিদিমণির কাছে থাকো না আবার।

এসব কাল রাত্রের ঘটনা। কাল রাতটুকুও হরমোহন তার যাদার বারান্দায় কাটিয়েছে।

॥ চার ॥

বাড়ীর কাছে খানিকক্ষণ ঘুর ঘুর করল হরমোহন। এখুনি ঘরে গিয়ে বসতে পারলে আর এক গ্লাস চা পেলে সে বাঁচে। পা দুটো হরদুর করে ঢুকে পড়তে চায় অথচ সরছে না। কারখানা থেকে যারা এসেছে তারা চলে গেছে কাল।

কল পায়খানার ব্যবস্থা বেশ। দোতলা। নীচে পুরুষদের খোলা স্নান ঘর। পনেরোটা কলে পনেরোজন স্নান করতে পারে। জল প্রচুর। ওপর তলায় ঢাকা বারান্দা আর লাগান আটটি পায়খানা। দুটি মেয়েদের।

ঝিরঝিরে বৃষ্টিটা আর ধরছে না। কোন কোন বাড়ীতে সদ্য ধরানো উনুনের ধোঁয়া পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওপর দিকে উঠছে।

অবশেষে ঢুকল।

বারান্দায় এখনো কোলের বছর ছয়েকের ছেলেটা হেগেছে। সেই জায়গার ওপর বসে হাতে করে মুত থাপড়াচ্ছে। বত্তকগুলি মাছি ভন্ ভন্ করছে ওর চারপাশে। ছেলেটার মুখে চোখে পরমানন্দ। কোমরে কালো কারে মাদুলি দুলছে। তাকে দেখে হাত বাড়াল ছেলেটা। ডাকল, কা—

আরো কটা ছুটে এসে তাকে ঘিরে চেঁচাতে লাগল। কাকা। কাকা।

—দাঁড়া দাঁড়া, বলে তাদের থামিয়ে হরমোহন কোলের ছেলেটাকে তুলে নিল। তার মনটায় তখন কিছু আশার সঞ্চার হয়েছে। সকালে মুখ থেকে উঠে হাত মুখ না ধুয়ে দাঁতে কিছু না কেটেই বার হয়েছিল। অন্যদিন ছোলা, মুড়ি, চা খেয়ে যায়। আজ সে সব পাওয়ার ভরসা করেনি। দুপুরে ক্যান্টিনে পেটে দিয়েছে। মনে মনে ভয় ছিল যে বারান্দায় পা দেওয়া মাত্র বৌদি রণমূর্তিতে তাকে দূর করে দেবে। দাদা অবশ্য এখন ওভার টাইম করছে। বাড়ী আসে নি।

কোলের ছেলেটা তুলে নিয়ে তার ময়লা পরিষ্কার করে দিয়ে, মুছিয়ে তাকে মেঝের বসিয়ে দিল। এসব কাজ করা তার খুব অভ্যাস আছে। তারপর ঘরে ঢুকে দাদার যেখানে বিড়ি থাকে সেখান থেকে একটা বিড়ি নিয়ে এসে উনুনের কয়লায় ধরিয়ে চুপ করে বসলো।

ঠিক তখনই বাইরে থেকে ঘরে এলো বৌদি।

হরমোহন তো অন্য কিছু জানে না। শুধু হাসতে জানে। হাসল।

মণীন্দ্র ঘোষের বৌর মুখখানা যেন হলদে পানা হয়ে গেছে। চোখের কোল কুঁচকে যেখা যাবে সেখানটা সাদা দোপাটির মত ক্যাকাসে। কিন্তু তার স্বামী চোখে হাত দিয়ে তার শরীর বুকতে চাইবে তেমন ভাগ্য সে করেনি।

—হাসলে যে।

—একটু চা খাও না।

—এই, এই জন্যে তোমার দাদা আমায় বিষেস করে না। ঘরে কালসাপ গো। বাড়ীর মানুষ বাড়ী নেই। তাদের চোকে চোকে চেয়ে সোমত্ত দেওরের হাসি?

—যাঃ

—যাঃ? দাঁড়াও ডাকছি পাঁচজন মানুষকে। তারা এসে তোমার হাসি দেখুক। সাক্ষী থাকুক তারা। আমি বারে বারে ভাতারের মার খাবো　　ন

মণীন্দ্র ঘোষ তার স্ত্রীকে মোটেই বিশ্বাস করে না। হরমোহন জানে তার দাদা হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে ছেলেগুলোর মত মাঝে মাঝে তার বৌদিকেও পেটায়। একবার দাদাকে ঠেকাতে গিয়ে সে দাদার ঠেলায় নিজেই উল্টে গিয়েছিল। কপালে কালশিটে পড়েছিল তার। হরমোহন জানে, যে হপ্তায় নিশ্চিত ওভারটাইম থাকে, সে সপ্তাহে দু'একদিন তার দাদা পাঞ্জাবী কিংবা সিল্কীর দোকানে দু'চার চোক খেয়ে যায়। জলখাবারের মত মদের দাম খাতায় লেখা থাকে। হপ্তা গেলে শোধ দেয়। ওভারটাইম তো। দাদার আজও ওভারটাইম আছে। রাত্রি বাড়ী এসে না জানি কি হয়ে যায় আজ।

—বৌদি চেঁচামেচি করো না। শোন—

—কি? আবার আবার যুক্তোন হচ্ছে? না, আমি ডাকবো পাঁচজনকে।

—মহা ফ্যাসাদ তো! যাও ডাকোগে তবে, এই বলে হরমোহন খুব রেগে সজোরে একটা লম্ফ করতে চাইল। কিন্তু সেটা দাঁড়াল না।

—মুখে আগুন, আবার দাঁত দেখানো হচ্ছে।

হরমোহনের হাতের বিড়িটা নিভে গিয়েছিল। সে ক্লান্ত হয়েছিল। তার খিদে পেয়েছিল। একটু হাত পা ধুয়ে একটু চা পেলে সে বর্তে যেত। তার চোখে, মুখে কোন ভাবটাই বোধহয় ঠিক ঠিক ফোটে না। রাগ, অনুরাগ, অসহায়তা, কোনটাই না। যদি ফুটত, তাহলে কি আর তার মুখের দিকে চেয়ে ছেলেপুলের মা বৌদির একটু দয়া হতো না?

ছেলেপুলের মা। এই পর্যন্তই। মায়ের মন কইগো তোমার। বয়স বিয়ানী গাই তুমি একটি, দাদার কথাটা মনে মনে ভাবল হরমোহন। মুখে কিছু বলল না। কিযে বলে।

কি বলবে না জেনে শেষ চেষ্টা করার মত ডাকল, বৌদি।

কোন উত্তর না দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল বৌদি। যদি পারত ঘাটি মাড়িয়ে হেঁটে যেত সে। তার বৌদির পা ফেলার কোন জোর নেই। যেন সোনার পা। একটু হড়কে গেলেই টালঘাটাল হয়ে উঠবে। তবু তেজ যেখানে খুব।

তেজের তখনো সবটুকু দেখেনি হরমোহন।

একটা পোঁটলা যেন ছমড়ি খেয়ে এসে পড়ল তার সামনে। সন্দেহ নেই যে এটি তারই সম্পত্তি। —'ও', এই বলে সেটিকে তুলে নিয়ে যেখানে ধুলো লেগেছে সেখানের ধুলো ঝাড়ল। ঝেড়ে আবার রেখে দিল সেখানেই।

বারান্দায়—বারান্দার প্রসঙ্গ বলা যেতে পারত—স্বল্পতম পরিসরে তারা কেউ কোন কথা বলছে না। না হরমোহন। না তার বৌদি। না ওই কুচোগুলো। পর পর তিনবার বিড়িটানার চেষ্টা করে একটা কিছু কাজ করতে হয়েছে। তা-ও আগুন নেই। হরমোহন হয়তো চেয়েই বসতো, একটু আগুন দাওনা বৌদি। তারপর যাচ্ছি।

কিন্তু তার আগেই বড় ভাইপোটা গুটি গুটি এগিয়ে এসে তার হাত ধরে টানাটানি আরম্ভ করলে। বড় ভাইপো—কতই বা বয়স হবে? বছর ছয়—? চোখে মুখে একটা গোঁ। কাকাকে ভিতরের দিকে টানছে।

কোথা দিয়ে কি যে হয়ে গেল। কোলের উপরের বাচ্চাটা ঢিল চীৎকার করে কেঁদে উঠল। চোখ মুখ নীল হয়ে গেছে। বৌদি তার গলাটা টিপে ধরেছে।

বাচ্চাটা যখন কোঁ-ও-ও-ও—করে আর কোন শব্দ করতে পারল না, যখন শুকনো হিক্কার মতো মুখ বিকৃত করল ও তারপর যখন আবার কাঁদতে পারল তখন হরমোহন শুধু বলল, আচ্ছা।

তার কথাটা কেউ শুনতে পেলনা। তখন চারদিকে ব্যাপার দেখে অন্য কুচোগুলোও একযোগে কান্না আরম্ভ করে দিয়েছে। হরমোহন চলে যাওয়ার আগে তার বৌদি সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আমি তাড়াচ্ছি না গো তোমায়। তোমার দাদা। এই যে দশ দেখায়ে তোমার দাদা দিয়েছে। পেটে ধরেছি। আমার ধরছি। ধরবো। আর তোমায় যে তাড়ালুম, তা-ও তোমার দাদা বলেছে, তাই। বলতো ঠাকুরপো, আমি কি সতী নই?

সুস্থ ঘরের বৌকি পাগলা হয়? বলা নেই, কওয়া নেই, অমনি হট্ করে খারাপ হয়ে গেল? বৌদি কাঁদছে কেন তবে? বাচ্চাটাকে মারছে বলে না আমায় তাড়াচ্ছে বলে?

চারদিকে বাচ্চাগুলো কাঁদছে। বৌদির মুখ চোখ অন্যরকম দেখাচ্ছে। কিছু না বললেও চলত। শুধু যেন বাইরে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে; একটু পরে ফিরবে, এইভাবে কোনদিকে না চেয়ে 'চলিরে' বলে হরমোহন বার হয়ে পড়ল।

॥ পাঁচ ॥

বার হয়ে পড়ল বটে, কিন্তু যাবে কোথায়? কারখানা আর বাড়ী। বাড়ী আর কারখানা। এইতো তার রাগ। সিনেমায় তার রুচি নেই। থিয়েটার সে বোঝেনা। তবে হ্যাঁ, একবার থিয়েটারের সূত্র ধরেই সে একজায়গায় গিয়েছিল। পাঁচ কাণের কাছে বলতে নেই—সে জায়গাটা খারাপ।

থিয়েটারের সেই দিদিমণির কাছেই আজ একবার যাবে নাকি? একবার দেখতে ইচ্ছে করছে।

মেঘে মেঘে আকাশ আঁধার হয়ে আছে। বেলা পড়ে এলো। ছিপছিপে, ঝিরঝিরে, কখনো বা ইলশে গুঁড়ি ধরণের বৃষ্টিটা একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। মনে আছে যেন অনন্তকাল আগে এই বৃষ্টিটা সুরু হয়েছিল। যেন সেই থেকে দিন রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে এ-বৃষ্টিটাও আছে।

কোয়াটার পাড়ায় হরমোহন এদিক ওদিক ঘুরল। সবাই কত সহজে সময় কাটায়। তাসের আড্ডা বসিয়েছে কেউ। মুড়ি মেখে চা খেয়ে ঘড়ির খাটিয়ায় লম্বা হয়েছে কেউ। খেলছে, শুয়েছে গল্প করছে, হাসাহাসি করছে, গান করার নামে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে ঘরে ঘরে।

ঠুক ঠুক করে হেঁটে হরমোহন রাস্তায় এলো। তার সময় আর কাটেনা। বিড়ি খাওয়া তার চলেনা। একবেলা ভাত না খাও, কোনরকম করে চালাতেই হবে। কিন্তু বিড়ি? ওরে বাবা—

অথচ বুদ্ধি করে দাদার জায়গা থেকে কটা বিড়ি সে তুলেও আনেনি। উপায়?

রাস্তার পাশে প্রথম দোকানটার সামনে এসে দাঁড়ায়। মাঝে মাঝে এখান থেকেও সে সওদা করে।

—যে এক বাণ্ডিল বিড়ি দে।

—গান্ধিজী মার্কা?

—না না, সবুজ সুতো।

এই কথাটা বলে হাসার কিছু ছিল না। তবু সে হাসল। এই বিশেষ হাসি বুঝি এর রোগ। যথারীতি হাসিটা ছড়িয়ে পড়ল চোখ থেকে দাঁতে। আর আশ্চর্য! হাসিটা তার কি কেউ সহ্য করতে পারে

না? সকলেরই কি গা জলে যায়? বিড়িওয়ালাও চোখে মুখে স্পষ্ট বিরক্তি দেখাল। তারপর এক বাণ্ডিল সবুজ সুতো বাড়িয়ে বলল, নে।

বিড়ির বাণ্ডিল নিয়ে হরমোহন বলল, সালাই একটা।

দেশলাই এলো। তাই নিয়ে দিব্যি মৌজ করে হরমোহন সেখানে দাঁড়িয়ে বিড়ি ধরাল। বেশি টানায় খানিকটা ধন ধোঁয়া মুখ দিয়ে নাকদিয়ে ছিটকে, উদ্গারের মত বার হয়ে এলো। চোখে ধোঁয়া লাগায় চোখ দুটো কুঁচকে ছোট হয়ে গেল। যেন দেখতে পাচ্ছে না কিছুই, এমনি ভাবে হাতড়ে পথ চলার মত পা বাড়াতেই পিছন থেকে হ্যাঁচকা টানে থেঁকিয়ে উঠল দোকানদার। বলল, এই পয়সা?

—দোব। দোব।

'দোব দোব,' ভেঙচে উঠলো দোকানদার বেহারী উচ্চারণের অনুকরণ মেশানো বাঙলায়।

—কখন দিবি?

—হপ্তা রোজ।

এই কথা শুনে দোকানদার তার নিজস্ব বেহারী হিন্দীতে যা জানাল তার কিছু ছোট ছোট বাঙলা করে যা দাঁড়ায় তা অনেকটা এই রকম—

যদি হপ্তা রোজ পয়সা না দেয় তাহলে সে হরমোহনকে ও তার বাপ চৌদ্দপুরুষকে নির্ঘাত কিছু করে বসবে। এমনকি তার মাকে-ও ছেড়ে কথা কইবে না।

মা তুলে কথা বললে ঠাণ্ডা মানুষ-ও খেপে ওঠে। হরমোহন শুধু বিড় বিড় করে বলল,

ও যে তোর রসলা
বলি সাবান দেনা॥

রামপ্রসাদের অনুকরণে স্বরচিত ছড়া হরমোহনের। তা বুঝল দোকানদার। বলল—কা?

'হপ্তা রোজ' বলায় এত রেগে ওঠার কিছু কারণ আছে দোকানদারের। বিড়ির জন্য মাঝে মাঝে বাকী রাখতেই হয় হরমোহনকে। তার আশ্চর্য স্বভাব আর অভ্যাস এই যে বাকী রাখার দরকার হলেই সে এই দোকানটাতে আসে। আর যখন নগদ কোন তখন গিয়ে হাজির হয় ওই মোড়ের দোকানে। দাঁত বার করে হাসে। ঠুন করে পয়সা দেয়।

কেন?

ও দোকানদারের ডাগর মেয়েটা থাকে দোকানে। খদ্দের এঁটে যায়। বার করতে 'ইনসাট'—মানে, মানে যাবে।

ওই দোকানদারের মেয়ে আছে সত্যি। সে মেয়েকে মাঝে মাঝে দোকানের পাশে দেখা যায় এ-ও সত্যি। কিন্তু তাই বলেই হরমোহন ওখান থেকে নগদ নেয়, এ কথা সে নিজে বিশ্বাস করে না। আসলে পকেট ফাঁকা থাকলে পা যেন আর চলতে চায় না। সবচেয়ে কাছের এই দোকানটায় নেয় ধারে। তাছাড়া —তাছাড়া? থিয়েটারের সেই দিদিমণিকে দেখার পর মেয়ে আর চোখে লাগে না। ওঃ। সেতো আকাশের চাঁদ। মাঝে মাঝে মনে মনে সেই চাঁদ দেখার তার বাসনা হয়। আজ যেমন খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু ইচ্ছে হলেই বা কি? যাবে না হরমোহন। গিয়ে বলবে কি? কোথায় সে কারখানার এক কাড়ুয়ার। আর সে থিয়েটারের দিদিমণি। রামোচন্দর। গতকাল তার বৌদি খোঁচা দিয়ে বলেছে, 'যাওনা গো। তোমার সেই থিয়েটারের দিদিমণির কাছে গিয়ে থাকোগে না'। বলুক বৌদি

ছিল বটে হরমোহন। দশ দিন। দশ দিন? যেন বিশ্বাস হয় না। মনে হয় যেন এক দিন। দশ দিন মিলিয়ে এক। সেই একটি দিনের পরতে পরতে অনেক নিভৃত, নিঃসঙ্গ আকুল আর্তনাদের ইতিহাস মূক হয়ে আছে।……থিয়েটারের মিথিলেশের কথা মনে হলেই সে যে নিজে কাতুর এই কথাটা তার বিশেষ করে মনে পড়ে।

হরমোহনকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দোকানদারটা তখন নতুন করে খিস্তী সুরু করেছে। বিশেষ ভাবে যে দোকানের সে নগদ নেয়, সেই দোকান মেয়ে ইত্যাদি মিলিয়ে এক রামায়ণ আরম্ভ করেছে সে। দোকানদারটা বোঝে না 'হপ্তা রোজ' দোব বললেই কি কি বার ঠিক দেওয়া যায়? বিড়ির পয়সা আসে কোথা থেকে? দু' এক হপ্তা দেরী হলেই তো পারে বাপু।

ওপরের কথাগুলো নিজের মনে আউড়ে সে প্রকাশ্যে বলল, কাহে গাল মন্দ করতা হ্যায়?

সে যেন ধমক দিতে চাইছে।

—তব কা করে গা? সওগাত করে গা তেরা?

এই বলে সে আবার বিশ্রী গালি দিল।

—সে জন্যেই তো বোলতা হ্যায়, হরমোহন বলে চলল,—যে মুখ দিয়ে গাল দেতা হ্যায়, ওই জিবমে অনেক ময়লা হ্যায়। ধোয়া সাবুন লাগাও। না হলে চিত্রগুপ্ত সব লিখে নেতা হ্যায়।

এই বলে সে আর দাঁড়াল না। অন্য কেউ হলে, এই কথার পর চলে যাওয়ার ভঙ্গী দেখে মনে হত, আসর মাত করে বার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আগেই বলেছি তার চলনে চলনে কোন ভঙ্গীই ঠিক ঠিক ফোটে না। উপরন্তু এবারও সে হেসেছিল। সে হাসি দোকানদারের চোখে পড়েনি। হরমোহন ক'পা এগিয়ে যাওয়ার পর সে শুধু বলল, শা—ল—!

পাঞ্জাবীর দোকানের কাছাকাছি আসতে দেখে আবার খুরপী কাটছে লোকটা। একটা কাটা পড়ে আছে। ঘড় থেকে বিচ্ছিন্ন মাথাটা তখনো থেকে থেকে শেষ খাবি খাচ্ছে। ছুরির প্যাঁচে আর একটা কাটা হলো। জায়গাটার ভেজা ঘাসের ওপর কালচে ছোপ ছোপ রক্ত লেগে রয়েছে। পালক ছিটিয়ে আছে এখানে ওখানে।

হরমোহন লোকটার পিছন দিকে একেবারে ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। পেট চিরে ছাল ছাড়ানোর সময় লোকটার কষ্টই লাগল তার হাঁটুতে। লোকটা একবার চেয়ে আবার তার নিজের কাজে মন দিল। তার দাঁড়িয়ে থাকাটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। বরং বলল, হট।

যেন কোন জানোয়ার তার খোলা বার করেছে। তাকে বলল, হট্।

হরমোহন তার পাশে উবু হয়ে বসল। বলল, ওই যে একটু আগে একটা কাটলে সেটা কি সেষ হো গিয়া হ্যায়?

লোকটার পিছু পিছু সে-ও দোকানে এলো। কারবানা ছুটি হওয়ার পর যে ভীড়টা হয়েছিল তার তুলনায় দোকান একটু পাতলা হয়েছে ঠিকই, তবে যারা আছে তারা যেন জমে গেছে।

দুটো উনুনে গন্ গন্ করছে আঁচ। এখানে ওখানে নীলাচে দু'চারটি শিখা আগুনের সোহাগ হয়ে ফুলের মত দুলছে। পকৌড়ি, সিঙারা ইত্যাদি নানা ভাজা খাবার-তিন চারটে তামার থালার ওপর খদ্দেরের পথ চেয়ে আছে। আরো ভাজা হচ্ছে।

চারদিকে খাবার আর কারো কারো হাতে গরম চা দেখে প্রথমটায় তার জিবে জল এসে গেল।

পেটের মধ্যে একবার কণ্ডুলী পাকিয়ে উঠল। সামান্য কতকগুলো ধ্বনিত হলো যেন। তারপর—খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তার মাথাটা ঘুরল। চোখ দুটো ধপ্ ধপ্ করে উঠল।

দোকানের মালিকের সামনে একটা লোক বসেছিল যেন মাটির সঙ্গে মিশে। আর পাঞ্জাবী মালিক তার বিশাল বপু মাঝে মাঝে টলবলে সেই লোকটাকে কি সব বলছিল। আসলে ধার চাইছে লোকটা।

ধার-ও পেয়ে যাবে। ধার চাইলে হরমোহন-ও পায়। কিন্তু ধারের পথ-ও মাড়ায় না। এরা সব পঁচিশ টাকা দিয়ে চল্লিশ নেবার। সেই চল্লিশ টাকার ওপর প্রতি সপ্তাহে টাকায় এক আনা করে চল্লিশ আনা সুদ চায়। মূল চায় না। সুদ না পেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা জানে, কুম্পনীর অফিসাররা জানে, সবাই জানে, তবু ওরা কারবার চালায়। কেউ ওদের কিছু করে না। বলে না।

সামনে বসা সেই সঙ্কুচিত লোকটাকে আচমকা হরমোহন বলল, এই তোর আশা হবে।

—মানে?

—বুঝতে পারবি না। ধরবি।

ততক্ষণে পাঞ্জাবী কটমটে চোখে তার দিকে তাকিয়েছে। সে চাহনির থেকে হকাতে যাওয়ার জন্য যা অস্ত্র যে কোন কারণে সে দোকানের মধ্যে সরে এল।

দোকানটায় ভেতরে হাওয়ায় কাঁবাল গন্ধ ভাসছে। 'ঘরটি' চলছে। ভিতরে একটা ঘুপসি ঘর আছে। সেই ঘুপসি ঘরটাকে আড়াল করা হয়েছে ময়লায়, তেলচিট-চিটে একটা চাদর ঝুলিয়ে। পর্দা। ভেতরে মদ চলছে। মেয়ে মানুষের গলাও পাওয়া যাচ্ছে মাঝে মাঝে। একটা মেয়ে মানুষ। পুরুষ বোধহয় তিনজন। গলা শুনে তাই মনে হয়।

পাঞ্জাবীর দোকানে আজ কিছুই পড়তে পাবে না। মুরগী সব চেটে পুটে সাফ।

হরমোহন নিজের মনে হেসে ফেলল। হেসে সে বিড়ি ধরালো একটা।

তাকে বিড়ি ধরাতে দেখে দোকানের একজন বলল, এই, কুছ লেগা তু?

সে ফস্ করে ভেবেছিল কিছু খেয়ে নিয়ে বাকী রাখলে কেমন হয়? আগে তো খেয়ে নেওয়া যাক। তারপর পকেটে পয়সা না থাকলে বাকী না রেখে দোকানী করবে কি?

তবু সেটাতে তার মন সায় দিল না। পাঞ্জাবীর চোখ। একে তো সেই বাকীর টাকার জন্যে তার ওপর তেলে বেগুনে হয়ে আছে।

সে শুধু বলল, না।

—তো ভাগ্।

বাইরে এসে দাঁড়াল সে। আর তার আবার মনে হল একবার থিয়েটারের দিদিমণির কাছে ঘুরে আসি। আজ তার চেনা, অল্প চেনা সবাই যেন সমস্বরে এক যোগে তাকে ঘুর ঘুর করছে। যদি থিয়েটারের দিদিমণির কাছে গিয়ে দাঁড়াই, তাহলে সে আর বেশি কি করবে? এদেরই কথাটা হয়তো নিজের মত করে বলবে, 'কি চাই? এখানে কেন? যাও। চলে যাও। খবরদার বলছি এখানে আর এসো না।'

তবু যাওয়া যাক। অনেকটা পথ এখান থেকে। পায়ে হেঁটে গেলে দেড় ঘণ্টার মত।

হরমোহন হাঁটতে লাগল।

॥ ছয় ॥

থিয়েটারের ঘিঘিপিকে হরমোহন প্রথম দেখে গত বিশ্বকর্মা পুজোর সময় কারখানার থিয়েটারের এক রিহার্সালের দিন।

থিয়েটার কারখানায় প্রতিবারই হয়। তবু সেবার যে বিশেষভাবে নাটক নিয়ে সাড়া পড়েছে তার কারণ দুটো। প্রথমতঃ যে নাটক মকস্থ হয়েছে তা কারখানার একজন কর্মীর লেখা। পরিচালনার দায়িত্ব তাঁরই।

কিন্তু এ বাহ্য।

যে জিনিসটা রিহার্সাল জমানোর ব্যাপারে চুম্বকের মত কাজ করছে তা হল যে নাটকে নায়িকার পার্ট করবার জন্য কোন মেয়েলি ধাঁচের নটকে, গোঁফ কামিয়ে কৃত্রিম মিহি গলায়, পুরু পেইন্ট মেখে স্টেজে নামতে হবে না। সত্যিকারের মেয়ে করবে নায়িকার পার্ট। কলকাতায় এ হাওয়া অনেকদিন চলেছে। সেবার কারখানাতেও এসে লাগল। নায়িকার ভূমিকায় নারী ছাড়া সেবারের উদ্যোক্তারা অন্য কিছু ভাবতেও পারেন না।

নাটক লেখা হয়েছে সৌখিন নাট্যসম্প্রদায়ের নানা সুবিধা অসুবিধা ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি রেখেই। স্ত্রী চরিত্র বলতে আগাগোড়া একজন নায়িকার পার্ট। আর একজন আছেন নায়কের পিসিমা। শেষ দৃশ্যে একবার তাঁকে আসতে হবে। সেই রোলটা পুরবে করবে। ছোট তো।

নায়িকার ভূমিকা দেওয়া হয়েছে এ শহরের এ্যামেচার সম্প্রদায়ের মক্ষীরাণীকে। শহরে নাটুকে দল অজস্র। নায়িকার বড় অভাব। বলতে গেলে তাকে নিয়ে টানাটানি।

'সিরাজের বেগম' থেকে 'ছেড়া তার' 'থামাও রক্তপাত' থেকে পাণ্ডুলিপির অগ্নিগর্ভ প্রতিভা তাকে রকেটের চেয়েও তীব্র গতিবেগে পরিক্রমা করতে হয় রাতের পর রাত। মক্ষীরাণীর অবস্থাটা সেশাদারদের চেয়েও অসাধ্য। উৎসাহ বাড়কও বটে। নাটক মকস্থ করার উপলক্ষের অভাব নেই। ছাপা নাটকের অভাব নেই। পাণ্ডুলিপির অভাব তার চেয়েও কম।

মক্ষীরাণী তাই তার মুখে একাধারে হাসি, কৃত্রিম কোপ আর বিরক্তির ভঙ্গি-ফুটিয়ে বলে, আটটা রিহার্সাল? কম করুন। প্লীজ।

প্লীজ উচ্চারণে অন্তে জেড্ (z) চলে আসে। কেননা বিদ্যার দৌড় তার সদাগরা পৃথিবী উল্টে দেওয়ার মতো।

সপ্রতিভ উদ্যোক্তা হলে বলে, আটটা রিহার্সাল তো কম বলেছি। দরকার হলে আরো খান তিনেক দিতে হবে।

—বলেন কি? এ-গা-রো-টা? আপনারা কি আমায় মেরে ফেলবেন।

এই বলে মক্ষীরাণী চিত্রা রায় দুই এর মাঝে অর্ধবৃত্ত ভঙ্গি করে।

—বালাই ষাট। আপনি মরতে যাবেন কেন?

এই বলে উদ্যোক্তা মুখ তুলে চোখে চোখে চায়। তারপর যোগ করে, স্বার্থপরের মত বলি, আপনি মরে গেলে আমাদের চলবে কি করে?

অর্থাৎ চলার কথাটা হলো মক্ষীরাণী চিত্রা রায় না হলে এ শহরের সৌখিন নাট্যজগতের মধুরা আঁধার।

কথাটা মিথ্যে নয় একবারে। কেবলমাত্র বয়সের যৌবন নিয়ে অভিনয়ের অপচেষ্টায় চিত্রা রায় যেমন মঞ্চ থেকে মঞ্চান্তরে উড়ে বেড়াচ্ছে এমন সাহস আছে ক'জনের?

কিন্তু চিত্রা রায় সে সব কথায় আসে না। শুধু বলে, নাকি?

—নয়? আমাদের কথা বাদ দিন। আপনার ভক্ত সংখ্যা কত জানেন?

—ভক্ত, না ফ্যান।

হঠাৎ যেন সবকিছু ঝেড়ে ফেলে দেওয়ার মত ভঙ্গি করে চিত্রা রায় বলে উদ্যোক্তাদের মুখের ওপর, কিন্তু অতগুলো রিহার্সাল আমার কি দরকার বলতে পারেন?

—দরকার আপনার নয়। দরকার আমাদের। আপনি তো স্টেজে নেমেই চালাতে পারেন। সবাই তো তা পারে না। আর টীম ওয়ার্ক না হলে ড্রামা জমে না।

উদ্যোক্তাদের কথা দিয়ে এমনি প্রচ্ছন্ন স্তুতি লুকোন থাকে। স্তুতি অভিনেত্রীকে নয়, এমনকি চিত্রারায়ের অভিনয় ক্ষমতাকেও নয়। তার যে আরো অভিনয় করার ক্ষমতা আছে, তা-ই অনেকে স্বীকার করতে চায় না। স্তুতি এক্ষেত্রে একটা খোঁচা। সেই খোঁচায় চিত্রারায়ের আগুনটাকে খুঁচিয়ে দেওয়া। সেই কৌশলই তো তার একমাত্র পুঁজি।

—তাই বলে এ-গা-রো-টা রিহার্সাল?

—বেশ তো আপনি কিছু টাকা না হয় আমাদের কাছে বেশি নিন।

স্পষ্ট, সাফ কথা বলে বসে সপ্রতিভ উদ্যোক্তা।

—দেখুন,

যেন খুব রাগ হয়েছে, যেন টাকার কথা তোলায় চিত্রার মান গিয়েছে এমন একটা ভাব করে সে বলে, আমি ঠিক শুধু টাকার জন্য অভিনয় করি না। ঠিক আছে, যতগুলো পারি ততগুলি রিহার্সালই আমি দোব।

এ-ও এক গর্ব চিত্রা রায়ের। সে টাকার জন্য অভিনয় করে না। এ'কথাটা সে কথার ছলে সুবিধে মত সব জায়গায় জাহির করে। না জানলে স্বস্তি বোধ হয় না তার। তৃপ্তি পায় না।

তাহলে অভিনয় করে কেন? একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্র পরিবারের মেয়ে রাতের পর রাত অভিনয় করে কেন তবে?

সোজা কথা। অভিনয়, নাটক ভালোবাসি বলে। কতলোকে কত নিন্দে করে। করুক। যারা এগিয়ে এসে সাহস করে উচিত কাজে হাত দেয়, নিন্দা তাদের প্রথম দিকে প্রাপ্য। চিত্রা রায় তাই ওসব আদপে গ্রাহ্যই করে না।

চিত্রা রায় এ-সব কথা খুব জোর দিয়ে বলে। কেননা নৌখিন দলের অভিনয়ই তার অন্ন।

মোট কথা, যে কোন নাটকের মহড়ায় ঘন ঘন চিত্রা রায়কে আনতে হলে উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে খানিকটা সাধ্য সাধনা সে উপরি পাওনা হিসেবে আদায় করে নেয়।

নায়িকার ভূমিকায় চিত্রা রায়। কারখানার রিহার্সাল তাই খুব জমজমাট। বসার জায়গা দেওয়া যেত না সবাইকে।

সেদিন হরমোহন গেল রিহার্সাল শুনতে। প্রথমে বাইরে থেকে উঁকি দিল। ছোট্ট মানুষ। এর ওর শরীরের ফাঁক দিয়ে কোনমতে চাইছে। কে যেন তাকে ঠেলে এগিয়ে দিল।

আর সেই মুহূর্তে অদৃশ্যলোক থেকে হরমোহনের ভাগ্যবিধাতা হরমোহনের এ জন্মের ইতিহাস সম্পূর্ণ করার জন্যে আপন মনে মুচকি হাসলেন।

এই পর্যন্ত বলে চরিতকার বন্ধুবর একবার থামলেন। থেমে নীরবে সভায় সকলের মুখে একবার চাইলেন।

শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, ইউরেকা।

—কি পেয়েছিস ?

—নায়িকা।

—Billy। শুনে যা।

—হরমোহনের বিয়েটা কতদূর রে ?

চরিতকার বন্ধু আবার সুরু করার আগেই একজন বলল, হরমোহনকে না হয় তুই কারখানায় নিত্যি দেখছিস। কিন্তু বাপু চিত্রা রায় সম্পর্কে এতকথা তুমি জানলে কোথা থেকে ?

চরিতকার বন্ধুবর হাতের দেশলাইটা বিশেষ কায়দায় নেড়ে বললেন, বঙ্কিমচন্দ্র কি বলেছেন জানিস ? সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ? লেখকরা গল্পের পাত্র পাত্রীদের সব কিছু ঈশ্বরের মত অদৃশ্য থেকেও দেখতে পায়। যাক্, সে বিখ্যাত উক্তি আমি আর স্মরণ করবো না। কেবল তোদের অবগতির জন্যে জানাই যে এবার কারখানার বিয়েটারে আমিও ছিলাম। সুতরাং চিত্রা রায়কেও বহুবার কাছ থেকেই দেখেছি। কিন্তু চুলোয় যাক চিত্রা রায়। আমরা এবার হরমোহনের কথায় ফিরে আসব।

আড্ডার সমালোচক বন্ধু ছাড়ল না। সে চেপে ধরল চরিতকারকে। বলল, চিত্রা রায়কে নিয়ে এই যে দীর্ঘ ভূমিকাটা ফাঁদলে এর নিশ্চয়ই কোন তাৎপর্য আছে ?

—যদি তাৎপর্য আছে ভাবলে তোমাদের সুবিধে হয়, তাহলে ভাবো আছে। যদি নেই ভাবলে ভালো লাগে, তাহলে ভাবো নেই। যেমন তোমাদের ইচ্ছে। শুধু আর একবার বলি, হরমোহন যখন শিছনের ঠ্যালায় হুমড়ি খেয়ে বহড়া কক্ষে গিয়ে পড়ল তখন বহড়া চির খেয়ে গেল এক-দেড় মিনিটের জন্য। কে যেন বলল, বোস, বোস, একপাশে যা।

এই 'একপাশে যা' কথাটা বলতে ও একপাশে যেতে যেতে যে সময়টুকু গেল তারই মধ্যে মেঘলোকের ওপরে কোন অদৃশ্যলোকে হরমোহনের ভাগ্যবিধাতা একবার মুচকি হেসে নিলেন।

॥ সাত ॥

একটা বছর আটেকের ছেলের মেলার মধ্যে খেলনার দোকানের সামনে সবেমাত্র দাঁড়িয়ে যে অবস্থা হয় হরমোহনের অবস্থাটা হল যেন সেইরকম। চিত্রা রায়ের চুলে টাসল ছিল কিনা তা বোঝা তার সাধ্য নয়। ঘোড়া বেশী, অভিনয়রত মঞ্চীয়রাণীর সঞ্চালনের সঙ্গে সঞ্চালিত হচ্ছিল। এ একটা খেলনা। তার চকা প্রসাধনের প্রলেপে ভরা মুখ কোন একটা অভিব্যক্তিতে জল্ জল্ করছিল। সেই মুখ আর এক খেলনা। তার সিল্কের শাড়ি, তার বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে লম্বা নখ, নখে রং—সবই খেলনা। অদ্ভুত। মনোহারী। আশ্চর্য একটা খেলনা ভরা মনোহারী দোকানের সামনে যেন 'থ' হয়ে গেল সে।

—হাঁ করে কি দেখছিস্ ?

তাকে ঠেলা দিল একজন।

—হে, হরমোহন হাসল। সেই হাসি। হাসিটা মধ্যবর্তী ছড়িয়ে গেল চোখ থেকে দাঁতে।

—হাসছিস ?

—নাগর যে আমার।

কে একজন চুপি চুপি বলার চেষ্টা করে ফিস ফিসে গলায় বলল, একে বিয়ে করবি হরমোহন ? পছন্দ হয় ?

—কেঃ

সে আবার হাসল।

এই চাপা কথায় স্পষ্টই বিরক্ত হল অভিনেত্রী একজন। আয়ত বাঁকা চোখে তাকাল যেদিক থেকে গুঞ্জন উঠেছে সেই কোণে। অমনোযোগের জন্য পাণ্ডুলিপির পাতা পিছলে একটা কর কর শব্দ হল। পার্ট ছেড়ে বাঁকিয়ে উঠল নট, কথা বললে পার্ট করা যায় না।

—সত্যি। এত কথা কিসের ?

আর একজন বলল।

—কথা বলতে হয়, বাইরে গিয়ে বলো না বাপু।

কোতুক ছিল আর একজন। সবাই যেন গলা ছেড়ে কথা বলার জন্য মুখিয়ে ছিল এতক্ষণ। গোল গোল উঠলো অচিরে।

হরমোহনের কানে কানে ফিস ফিস করে যে সব চেয়ে বেশি অসুবিধা ঘটিয়েছিল সে নির্বিকার বসে রইল, এই ছায়া সিংটার জন্যে।

চিত্রা রায় অভিনয় থামিয়ে এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। 'ছায়া সিং' নামটা শুনে সে বোধ হয় হাসাই চেহারার কোন যুনো ব্যক্তিত্ব অনুমান করে থাকবে। নামেরও তো একটা ওজন আছে। চিত্রা দেখল মানুষটার ওজন নামের ওজনের চেয়েও কম। মাথায় কত ছোট ? ও হরি, এ যে একটা লিলিপুট। বড় জোর চিত্রার কাঁধ পর্যন্ত হবে।

সেই প্রথম চিত্রা রায় হরমোহনের দিকে সোজা তাকাল। চোখে চোখে।

কে একজন ফুট কাটল, যেখানে যাবি, সেখানেই একটা কাণ্ড করবি বাবা ? ও বাবা ছায়াসিং। আয়, তুই এদিকে এসে বোস।

ছায়াসিং ওরফে হরমোহনকে নিয়ে টানাটানি করে কে কতটা মক্ষীরাণীর চোখে পড়তে পারে সবাই সেই চালাকি দেখাতে গিয়ে কে যেন হরমোহনের হাত ধরে টেনে নিল।

চিত্রা তাকে দেখছে বলে সে হেসেছিল। তাকে নিয়ে পাঁচজনে টানাটানি করছে বলে আবার হাসল। দাঁত বার করে বলল, কই, আমিতো কিছু বলি নি। শুধু শুনছিলুম—

—তা হাসবার কি আছে ?

একটা চাপা বিরক্তি যেন কেটে পড়ল নাট্য সম্পাদকের গলায়। মহড়া ঘরে তামাশা যেন তার সহ্যের সীমার শেষ পর্যায়ে পৌঁচেছে।

—ইনিও কি আপনাদের একজন অভিনেতা নাকি ?

মক্ষীরাণী জিজ্ঞাসা করল ভ্রু বেঁকিয়ে।

—না না। ও—

মুখে এসেছিল 'ও সুইপার' কিন্তু ও ভাবে বললে উপস্থিত অন্যান্য শ্রমিকদের আত্মসম্মানে লাগতে পারে। তেমন কিছু হলে আবার অনেক গোলমাল। চাইকি থিয়েটার না হতেও পারে। আর স্ত্রী-লোকের সামনে যে কোন পুরুষের আত্মসম্মানবোধ বড় তীব্র হয়েই থাকে। যত তীব্র, তত ঠুনকো। যেন কাচের পেয়ালা। সামান্য নাড়া খেলেই ভেঙে যায়। সামলে নিয়ে ভদ্রলোক বললে, নূনা। ও কারখানায় কাজ করে। রিহার্সাল শুনতে এসেছে আর কি।

—অর্ডার, অর্ডার, বলল একজন।

নাট্য সম্পাদক এবার মিনতি মাখা গলায়, দু'চোখে ক্রোধ মেলে বলল, আপনারা দয়া করুন, আর না হলে বন্ধ করে দি।

নায়ক আবার ঝুঁকে পড়ল পাণ্ডুলিপির ওপর। সেই থেই ধরে দেবার জন্য বলল—

'অনুপম : কিন্তু সান্ত্বনা এই রক্তপলাশের কোন দোষ নেই—'

কিন্তু নায়কের অনুসরণ করে অনুপমের ভূমিকায়ত নট তার পাট বললো না। চিত্রা আবার দাঁড়িয়েছে পোজ নিয়ে।

—কি হল ? জানতে চাইল নাট্য সম্পাদক।

খুব গম্ভীর কণ্ঠে অনুপমের ভূমিকায়ত ছেলেটি বলল, আগে সকলের গপ্‌পো শেষ হোক। তার পর তো রিহার্সাল।

অনুপমের পার্ট করেছে যে সে ওরই মধ্যে সুদর্শন। সেহেতু নায়ক। টিপু সুলতানে টিপুর ভূমিকা করে ও কোথায় যেন আসর শুদ্ধ লোকের রক্তে নাড়া দিয়ে জাগিয়েছে ও কাঁদিয়েছে। মেজেল পাওয়া গেয়ার। কারখানায় বই করার আগেও চিত্রার সঙ্গে সে দু'একবার নেমেছে। অতএব কায়দা খুব।

সে যাই হোক, একফোঁপে চাপা কণ্ঠে যে কথা চলছিল এতক্ষণে সেটা থেমে গেল একেবারে। মহড়া শুরু হল আবার। জমেও উঠল।

নট : কেন পারোনা ? কে মনে রেখেছে তোমার অতীত ? কবে তোমার বিয়ে হয়েছিল সে খোঁজে আমার কাজ নেই। তুমি বিধবা, এই খবরটা বার বার আমার কানের কাছে দিয়ে একটা মরা মানুষের ওপর তুমি আমার মনে ঈর্ষা জাগিয়ে তুলতে চাও ?

চিত্রা : (সুদর্শন নটের খুব কাছে এগিয়ে এসে, তার হাত দুটি ধরে, ওপর দিকে মুখ তুলে মিনতি মাখা গলায়) থামো, লক্ষীটি—

নট : আমি জানি, তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে, ছিনিয়ে নিতে পারি না বলেই আমি কিছু পাইনে। ভালবাসা মাত্রই মানুষকে খানিকটা পশু করে তোলে। আমার মধ্যের সেই পশুটা কেন যে তুলিয়ে তোমার দিকে থাবা বাড়ায়নি বলেই তুমি আমায় সামান্য উপহার ফিরিয়ে দিতে পারো।

(চিত্রার হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিতে চাইল নট। কিন্তু সান্ত্বনা বেশী চিত্রা সে হাত ছাড়ল না। আবার যেন ঝাঁকিয়ে ধরল। বলল—)

চিত্রা : ছিঃ। ছেলেমানুষি করো না। তুমিতো সবাইকার মতো নও। তুমি যে অনেকের চেয়ে বড়ো। অনেক বড়ো তুমি। (ডায়লগ বলার সময় চিত্রা রায় অনুপমবেশী সুদর্শন নটের দু'হাত ধরে আদুরে মেয়ের মত দোলাচ্ছিল।)

আর অবাক হয়ে দেখেছে হরমোহন। শুধু দেখছে বললে ভুল বলা হয়। তার সমস্ত বোধ যেন তার দৃষ্টিতে এসে সংহত হয়েছে। কোন কিছু নিয়ে যে এত মনোযোগী হওয়া যায়, তা সে কোনদিন জানতো না। আজও সে তার নিজের মনোযোগ টের পাচ্ছিল না। অনেকক্ষণ বিড়ি খায় নি সে। এই ঘরে আসার পর বিড়ির জন্য পকেট পর্যন্ত হাতড়ায় নি।

তার সামনে একি প্রকাণ্ড কাণ্ড। একি বিস্ময়কর ব্যাপার?

চিত্রা রায়কে তার প্রথম দর্শনেই তিলোত্তমা মনে হয়েছিল। এত রূপ। এত!

সেই তিলোত্তমা এক ঘর লোকের চোখের সামনে হাঁটছে, হাসছে, কথা বলছে, হাত ধরছে, পুরুষের বুকের কাছে সরে আসছে। তার বিস্ময়ের আর অন্ত নেই। সে হাঁ করে বোকা মেরে গেছে।

(আদুরে মেয়ের মত হাত দোলাতে দোলাতে চোখের পলকে পিছন ফিরে চিত্রা রায় অনুপমের বুকের মাঝে নিজে দাঁড়াল।) চিত্রা: অনুপম—

নট: সান্ত্বনা—

চিত্রা: যাও, ফুল যাও অনুপম—

(আবেশ লাগল চিত্রার গলায়। একটা কম্পিত সুর যেন কালতো ভাবে অনুপম বসিয়ে দিচ্ছে সান্ত্বনার কালো কেশে।) হরমোহনের চোখ মুখ চিক্ চিক্ করছে। (মাথায় ফুল বসিয়ে দিয়ে হাতের কায়দায় আবার সান্ত্বনাকে আনল তার মুখোমুখি। হয়তো সে সান্ত্বনাকে আদর করতো। কিন্তু তার আগেই অনুপমের বুকে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সান্ত্বনা। অনুপম তার পিঠে সোহাগের ভাবে হাত বুলোতে বুলোতে মৃদু কণ্ঠে ডাকল—)

নট: সান্ত্বনা—

(চিত্রা যেন চুকরে কেঁদে উঠল এবার)

নট: (গভীর ভারি কণ্ঠে) সান্ত্বনা—

চিত্রা: আজ আমার নতুন জন্ম হলো অনুপম। (চোখ মুছলো চিত্রা। তারপর ধরাসা গলায় বলল—) এই মুহূর্তে আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না আমার বৈধব্য। আমি, আমি যে বিধবা, এই কথাটা প্রাণভরে মনে করার জন্যে আজ তুমি আমায় ছুটি দাও অনুপম। আমার বৈধব্যের মৃত্যু, তার অন্তিমকাল আমায় দেখতে দাও। —(এই বলে ছুটে যায় হতে যায় সান্ত্বনা। অনুপমের আকুল, দৃঢ় মুষ্টি তার আগেই তাকে ধরে ফেলে। আবেগে অনুপম বলে—)

নট: সান্ত্বনা, যাবে যাও। আমি তোমায় পিছু ডাকব না। কিন্তু আমি যদি অপরাধ করে থাকি, যদি ব্যথা দিয়ে থাকি তোমায়, তুমি—তুমি আমায় ক্ষমা করো।

(ছুটে আসে সান্ত্বনা। স্টেজ ক্রী মঞ্চরাণী এই কথায় দুই হাতে আলিঙ্গনে বাঁধে সুদর্শন নটকে। আবেগে, উত্তাপে যেন প্রথমটায় হকচকিয়ে যায় অনুপম। তারপর সেও বাহু বিস্তার করে।)

মহড়া মাফিক জমে উঠেছে। নায়কের কাছে নিবেদিতা নায়িকা। কিন্তু বৈধব্য মিলনের অন্তরায়। যেমন যেখানে বাঁশীর মত বেজে উঠেছে, ওই ব্যথা সেখানে টানছে পিছন থেকে। সেই পুরোনো কায়দা আর কি। সেই খোড় বড়ি খাড়া। খাড়া বড়ি খোড়। তবু জমেছে। সত্য সিন। প্রাণঢালা অভিনয়ে জমিয়েছে। হরমোহনের মাঝের ওপায় একটা মশা বসেছে; ফুল ফুটিয়েছে। সে তা টের পায় নি। দেখছে। শুনছে।

নাটক আরো জমবে অনতিপরেই। ঘরের মধ্যে আলিঙ্গনাবদ্ধ নায়ক নায়িকা। ঠিক তখনই চৌকাঠে অকস্মাৎ এসে দাঁড়াবে সাধনার দেবর। তীব্র কণ্ঠে ধিক্কার দেবে, ডাকবে : বৌদি।

(দেবরের ভূমিকায় অভিনয় রত লোকটি এসে দাঁড়িয়েছে। সে ডাকবে এবার।)

কিন্তু তার আগেই মহড়া ঘরে চেঁচিয়ে উঠল হরমোহন, এই ?

এমন ভাবে চেঁচাল যেন ব্যাপার দেখে তারই ভালো লাগে নি। হয় নায়ক নায়িকাকে কিম্বা দেবরকে সে ধমকে উঠেছে। তার এই ধমকে কান্না যেন একসঙ্গে হি-হি করে হেসে উঠল।

মহড়ায় বাধা পড়ল আবার। বাধা পড়ল তার জন্যই।

নাট্য সম্পাদক ছেড়ে এসে বললো, কি ? এটা কি ইয়ার্কি মারার জায়গা নাকি

—আমায় চিমটি কেটেছে পিছন থেকে।

বিজয় ভঙ্গীতে ধীরে ছেড়ে ছেড়ে কথাগুলি বলে হরমোহন হাসল। হাসিটা যথারীতি চোখ থেকে ছড়িয়ে গেল দাঁতে।

সত্যি তাকে চিমটি কাটা হয়েছিল। আলিঙ্গনাবদ্ধ নায়ক নায়িকা রিহার্সাল রুমে যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, ওই চিমটি ঘোষণার তার অনিবার্য ফল। হরমোহনের ওপর দিয়ে গেল। কিন্তু কেউ তার কথা গ্রাহ্য করল না। বিশ্বাস করল কিনা কে জানে।

এবার চিত্রা রায় বলল, মাপ করুন। এখন আমার আর মুড্ নেই।

মক্ষীরাণীর মুড নেই যখন তখন আর জোর করা যায় না। মহড়ায় সাময়িক বিরতি হল। বিরতি ঘোষণা হবার আগেই গুন্ গুন্ শুরু হয়েছিল। এবার যেন একরাশ মাছি ভন্ ভন্ করতে লাগল। চিত্রা রায়ের চারপাশে অনেকগুলো সিগারেট একসঙ্গে জ্বলে উঠল। যেন একটা ধোঁয়ার বেড়া করে ফেলতে চাইছে।

হরমোহন যেখানটায় ছিল, দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই। সে তার পাশের লোককে কিছু জিজ্ঞাসা করল। যাকে বলল, সে উত্তর দেওয়ার বদলে প্রথমে একচোট হেসে নিল। তারপর সবাইকে শুনিয়ে বলল, আরে হরমোহন কি বলছে শোন।

—কি বলে ?

—ওকেই জিগ্যেস করো না।

—কি ?

জানতে চাইল নাট্য সম্পাদক।

হরমোহন কিছু বলার আগে সেইভাবে হাসল। তারপর বিড় বিড় করে কিছু বলল। শোনা গেল না। আর পারল না নাট্য সম্পাদক। বলল, এদিকে আয়। কি বলছিস, গলা খুলে বল্।

'তুই' ডাকলো হরমোহনকে। আর কেউ নয়। সচেতন নাট্য সম্পাদক স্বয়ং।

তাতে কি হয়েছে ? নির্বিকার সে। নির্লিপ্ত। চিত্রা রায়কে ঘিরে ঘটনার কাছাকাছি এসে সে বলল, বলছিলাম—উনি কি বিধবা ?

কথার শেষে টক্ খাওয়ার মত ঘিরে একটা শব্দ করে সে যেন লজ্জা পেয়েছে এই ভাবে মাথা নামিয়ে নিল।

—কি ?

চিত্রা রায়ের চোখ মুখ ফুঁসে উঠল। কিন্তু মুখে কোন কথা জোগাল না।

অম্লান বদনে হরমোহন বলল, উনি নিজে বললেন কিনা 'আমি বিধবা'। তাই—

যেন আরো লজ্জা পেয়েছে এই ভাবে মাথা নামিয়ে নিল।

—তোর মুণ্ডু

—ইডিয়ট্ কোথাকার।

—তোঁদারাম।

—এটা থিয়েটার। বুঝলি?

—বড় সব আপদ।

—আশ্চর্য মাইরি।

চিত্রা রায়কে ঘিরে কথাগুলো গুঞ্জরিত হতে থাকল। আর তারই মাঝখানে আলস্যের ভঙ্গিতে এক হাত ডানার মত ওপর দিকে আধখানা মেলে মক্ষীরাণী বলল, এক গ্লাস জল দেবেন?

কেউ হুকুম করল, জল আন্ হরমোহন।

নিজের মত ধীরে পা ফেলে হরমোহন জল নিয়ে এলো। তার হাত থেকে গ্লাস নেওয়ার সময় সামান্য যেন লেগে গেল চিত্রা রায়ের হাতে। গ্লাসটা তাই হাত থেকে নামিয়ে একবার সে জায়গাটা দেখল চিত্রা। যেন মংলা লেগেছে। তারপর জল খেয়ে গ্লাস ফিরিয়ে মক্ষীরাণী বলল, ধন্যবাদ।

হরমোহনের হাসি তখন দাঁতে ছড়িয়ে গেছে। সেই অবস্থায় হাত বাড়িয়ে গ্লাস নিয়ে বলল, আজ্ঞে?

—তেষ্টা পেয়েছিল। জল দিলেন আপনি। তাই ধন্যবাদ।

উত্তরে সেলাম করল হরমোহন। সেই সেলাম। ডান হাতের আঙুল একত্র করে, হাতের পাতা সামান্য ভাঁজ করে কপালের ওপর রাখল সে। যেন ওর চোখের সামনে কিছু এসেছে, যা দেখে ওর চোখ ঝলসে যাওয়ার মত হচ্ছে। আবার তাকাতেও হচ্ছে।

গ্লাস রেখে দিয়ে সেদিন আর মহড়া ঘরে দাঁড়াল না হরমোহন। বাইরে হাওয়ায় এসে এতক্ষণে সে বিড়ি ধরাল।

শত রজনী অতিনয় করেছে চিত্রা রায়। শত রজনীর প্রস্তুতিতে বিভিন্ন ভাবে মহড়া ঘরে মাত্র একুশ বছরের মেয়েটা সহস্র সন্ধ্যা কাটিয়েছে। সেই হাজার সন্ধ্যার একটিতে হরমোহনের সঙ্গে এই তার প্রথম দেখা হল।

হরমোহন ফিরে চলেছে দাদার কোয়ার্টারের দিকে। একা। কাল আবার এসে হবে। এই কথাটাই চলতে চলতে নিজের মনে মনে ভাবছে সে। আর অদৃশ্যলোকে তার ভাগ্যবিধাতা একবার হো হো করে অট্টহাস্য করে নিয়েছে।

॥ আট ॥

—আমায় একটা পার্ট দেবেন বাবু?

—কি-সে-রে?

—থেটারে।

—হাসালি। দেখি। সব তো দেওয়া হয়ে গেছে।

—চাকরের পার্ট একটা দিন না।

—বটে ?

—হ্যাঁ, জল টল আনা।

নিঃসংকোচে সবার সামনে দাঁড়িয়ে নাট্য-সম্পাদকের কাছে মনোবাসনা নিবেদন করেছিল সে।

মক্কীরাণী সেদিনও মহড়ায় উপস্থিত। সে বলল, আহা, দিন না ওকে একটা রোল। বেশ গালপাট্টা আর চওড়া গোঁফ দিয়ে দারোগার সাজাবেন। চমৎকার মানাবে।

কথা বলার শেষে চিত্রার ঠোঁটের উপর দিয়ে যেন একটা পিঁপড়ে হেঁটে গেল। ঠোঁট কাঁপল। হাসি চাপা দিচ্ছে সে। অবশেষে মুখ ফিরিয়ে নিল।

কেবল কৌতুক তাকে নিয়ে। কৌতুক আর কৌতুক। হাজারো।

কিন্তু হরমোহন তা বুঝল না। বোঝে না। ও সব কিছু সরল মনে বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে। ওর ছোট শরীর আর মাথার তুলনায় যেমানান বড় কান দুটো, যে দুটোর দিকে খানিক চেয়ে থাকলে হঠাৎ পাখা করার মত দুলে উঠবে বলে ভ্রম হয়। সেই দুই কানে সে উৎকর্ণ হয়ে শুনল মক্কীরাণীর সুপারিশ। তারপর বলল, যা বলেছেন।

লুকাস সাহেবের বউ তাকে নিয়ে কৌতুক করেছিল গতবার কারখানা স্পোর্টস মাঠে।

দৌড়, ঝাঁপ, সাইকেল রেস খেলা হচ্ছে। সে গিয়েছিল সেই খেলা দেখতে। বাবুরা সব ফিটফাট হয়ে সেজে এসেছে। যারা দৌড় ঝাঁপ দেবে, তারা অনেকেই খাটো কালো প্যান্ট পরে আছে। তাদের বন্ধু বান্ধবরা সমাদর করে একটি ঝাঁঝালো তেল মাখিয়ে তাদের পা ডলে দিচ্ছে। 'ওটি কি হে' জানতে চেয়ে এক জায়গায় তাড়া খেল সে।

সে মাঠের বাইরে ঘুর ঘুর করে সব কিছু দেখছিল।

কিন্তু দৌড় ঝাঁপের খেলা, প্রতিযোগী, সাহেব, মেম, চিনে বাদাম, রং বেরংএর বেলুন, এ সব ছাড়িয়েও যা তার মনকে সবচেয়ে বেশি টানছিল তা বাবুসাহেবদের কাঁধে ঝোলান ক্যামেরা।

একটা লোহার চাকতি ক'জনে পর পর পালা করে ছুঁড়ছে। আর ক্যামেরা বাবুরা কেউ উবু হয়ে বসে, কেউ কোমরের উপরের দিকে ধনুকের মত বাঁকিয়ে, কেউ বা ঠাকুর আসনে প্রণাম করার আগের মত হাঁটু মুড়ে বসে 'ক্লিক' 'ক্লিক' করে ছবি তুলছে।

আজ থিয়েটারে পার্ট চাইবার সময় যেমন, সেদিনও তেমনি মাঠে সে একজন ক্যামেরা বাবুকে বলেছিল, আমার একটা ফটোক তুলবেন ?

—ফটোক ? ও ছবি ? তোমার ?

হেসেছিল সে। হেসে বলেছিল, হ্যাঁ, একটা ফটোক।

বাবু বলেছিল, তুলতাম হরমোহন। তবে কি জানো, আমার তো বেশি ফিল্ম নেই। এই সব মেলার ছবি তুলতে হবে।

—তা বটে।

বলে আবার হেসেছিল।

কাছেই ছিল লুকাস সাহেবের বউ। মাঠের ভেতরে বাইরে যেন প্রজাপতির মত উড়ে বেড়াচ্ছিল।

ক'জনে সত্যিকারের মেমসাহেব। তারা কেউ সিগারেট খাচ্ছিল। কেউ পাশের সাহেবের হাতে হাত জড়িয়ে কথা বলার সময় গায়ের ওপর পড়ে যাচ্ছিল।

লুকাস সাহেবের বউএর পরনে ছিল শর্টস আর একটা জামার মতো। পায়ে জুতো। গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ধব ধব করছে দু'খানা পা। অমনি দুধের মত খোলা দু'খানা হাত। লাল টকটকে মুখ। মাথার চিনে ঘাসগুলির মতো রঙের ঝকঝকে চুল। ক্যামেরা ছিল লুকাস সাহেবের বউএর কাছেও। এগিয়ে এসে কি যেন বলল সেই ক্যামেরা সহ বাঙালী সাহেবকে। তাদের দু'জনের মধ্যে কি সব কথাবার্তা হলো। তারপর তার দিকে ফিরে বলেছিল সেই বাঙালী সাহেব, দাঁড়াও হরমোহন। মেমসাহেব তোমার ছবি তুলবে।

হকচকিয়ে যাওয়া ঘুরে থাক। সেখানেই গোল আর পরিমল মিলে দাঁড়াল সে। ক্যামেরাটা চোখে নিয়ে খানিক কি দেখে হাতের ইসারা করল মেমসাহেব। সে বুঝল না। তখন মেমসাহেব নিজেই তর তর করে এগিয়ে এসে তার হাত দুটো ধরে টেনে আরো দশ হাত তফাতে দাঁড় করিয়ে দিল।

মেমসাহেব যখন তার খুব কাছে এলো তখন তীব্র অথচ খুব মিষ্টি একটা গন্ধ নাকে এসে লাগল তার। খুব কাছ থেকে সে যেমন যে দূর থেকে যে হাত দুটো ধব ধবে দুধের মত শাদা মনে হয়েছিল সেই দুই হাত ভর্তি গোলাপে তিলের মত রয়েছে। একবার ভেবেছিল সাহেবদের চুলি বোধহয় এই রকম হয়। একবার মনে হয়েছিল দাদার বিয়ের পর তার বৌদি নতুন নতুন যেমন কোন কোনদিন বিকেলে গা ধুয়ে চুলের কাঁটার আগায় কুম-কুম দিয়ে কপালে দিত ওরা বোধহয় তেমনি হাতে অনেক ছোট ছোট কৌটা কাটে। অবশ্য সব সংশয়ের মীমাংসা করে দিয়েছিল যজ্ঞেশ্বর কাহার।

যজ্ঞেশ্বরকে সে বলেছিল, দাদ হোনেসে এয়সি হোতা হ্যায়। নাকি খুড়া?

—বুড়বক্। গোল্ড খানেসে এইসা হোতা হ্যায়। গোল্ড। অয় সীতারাম। খুঃ—

লুকাস সাহেবের বউ তাকে ধরে টেনে জায়গা মত দাঁড় করানোর পর হরমোহনকে ঘিরে থাকা ভিড়টাও সরে এসে তাকে ঘিরে খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে রইল। লুকাস সাহেবের বউ ছবি তোলার যন্ত্রটা এবার নাভির কাছে ধরে মুখ নামিয়ে মনোযোগের সঙ্গে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

ভিড়ের একজন বলল, সেলাম কর হরমোহন।

নিজস্ব সেলাম রচনা করল সে কপালে হাত রেখে।

—ও' নো, নো।

—সেট হিম্

বলল সেই বাঙালী সাহেব। তারপর তাকে বলল, এইভাবে থাকো। আবার নড়ো না যেন।

মেমসাহেব একটু ঝুঁকে ছবি নেবার জন্ত তৈরি হয়েছে। সোজা তাকিয়ে আছে হরমোহন। দেখছে। মেমসাহেবের লালচে চুলের একটা গোছা সামনে ঝুলে দুলছে। আর—

পাঞ্জাবীর দোকানে মাখন কটি পাওয়া যায়। নতুন মাখনের টিন কাটার পর নিষ্টাজ মাখন সে সেখানে দেখেছে। ছবি তোলার সময় ঝুঁকে নামা মেমসাহেবের দুই কাঁধের নীচে যেন তেমনি কিছু সে এখন দেখছে।

—হিম্।

—থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ স্পোর্টস।

সেই মেয়েটি সেদিন মাঠময় ঘুরে খেলার ছবি ছাড়াও নিজের ভিন্নটে ছবি তুলেছিল। বাসের মধ্যে একটা মস্ত ফড়িং হঠাৎ চোখে পড়েছিল তার। 'কি সুন্দর' 'কি অপূর্ব' 'কি আশ্চর্য' ইত্যাদি হাউ মাউ করে বলে সে সেটার ছবি নিয়েছিল। খেলার মাঠের আশেপাশের কোন সভ্য সাধারণ মানুষের বয়স চারেকের উলঙ্গ ছেলে চলে এসেছিল মাঠে। সেও হয়েছিল ছবির মালমশ্লা। যেমন হরমোহনও।

হরমোহন বহুদিন মনে মনে ছুঁক ছুঁক করছে ছবিটা দেখবে বলে। কিন্তু কাকে নিয়ে যে লুকাস সাহেবের বাংলোয় যাওয়া যায়, ছবি দেখা যায় তা সে বুঝে উঠতে পারে নি। ছবির কপি পাওয়া তো দূরের কথা। তাঁর এ্যালবামে ফড়াকড়িং আর উলঙ্গ নির্বোধ ছেলের মাঝখানে তার ছবিটাও আছে। চার বছর পর এখানকার টার্ম শেষ হলে সাহেব-মেমসাহেব যখন দেশে ফিরে যাবে, তখন প্রতিবেশী, বন্ধু, আত্মীয় সকলে ইতিহাস গল্প করার সময় ছবির এ্যালবাম খুলবে। আর তখন হয়তো রক্তরঞ্জিত নখর সেলাম করা হরমোহনের পেয়ারা খাঁচের দাঁত বেরকরা লম্বাটে মুখের ওপর রেখে বলবে, Look there is Mr. Sports.

সেদিন মাঠে ছবি তোলার পর একজন ঘনিষ্ঠ হয়ে বলেছিল, এ একরকম ভালোই হলো তোর। বিয়ের কথাবার্তা হলে ছবি পাঠালেই চলবে। নে, নে, একটা বিড়ি ছাড় দেখি—

ছবি তোলা হয়েছে বলে মহা খুশী হয়ে সে বিড়ি তো দিয়েই ছিল উপরন্তু সেই লোকটাকে একটা মনের কথা বলেছিল। অবশ্য এমনি করে এমন কথা বলতে পৃথিবীতে একমাত্র সে-ই পারে। বলেছিল, এমন জানলে—

—এমন জানলে, কি? সেজে আসতিস?

—দাড়িটা তো কামিয়ে আসতাম।

দাড়ি নেই তো আবার দাড়ি কামানো। কিন্তু সে কথা বলে কে। উপরন্তু লোকটা রসান দিয়েছিল, চুলটাও কেটে আসতাম। দিব্যি হতো তা হলে।

মোট কথা, ছবি তোলা হলেও সে ছবি সে দেখে নি। থিয়েটারে পার্ট চেয়ে মক্কীরাণীর সুপারিশ মত দারোগানের ভূমিকা পেয়েও মঞ্চে নামা তার ঘটে ওঠেনি। সে ভেবেছিল সে সত্যি পার্ট করবে। মেক-আপও নিয়েছিল। মক্কীরাণী জানত, নাট্য সম্পাদক জানত, পরিচালক, উদ্যোক্তাদের এ, ও, সে, সবাই জানত যে স্টেজে সে আদৌ নামবে না। একে মেক-আপ দেওয়া হবে মস্করা করার জন্যে। সবাই জানত তা। শুধু সে জানত না।

কিন্তু পৃথিবীর নাটমঞ্চে তার জন্য সেদিন সন্ধ্যায় ভূমিকা নির্দিষ্ট ছিল। বাপা রোল। নড় চড় হবার জো নেই। সে-ও দারোগানের পার্ট। এবার সে কথাটাই বলি।

॥ সপ্ত ॥

কারখানার কার্পণ্য নেই। স্পোর্টস বলো, নাটক বলো সব কিছুরই আয়োজন এলাহি বলা যায়। ব্যবস্থা খুব। থিয়েটারের দিন সকাল থেকে একটা গাড়ি যাচ্ছে আর আসছে। সাজিয়ানা রে, ত্রিপল রে, সবই আসছে এই গাড়িতে। অঢেল পেট্রোল পুড়ছে।

থিয়েটারে পার্ট আছে বলে নাট্য-সম্পাদক ডিপার্টমেণ্টাল ম্যানেজারকে বলে হরমোহনের ছুটি করিয়ে দিয়েছেন। সকাল থেকে তার ডিউটি পড়েছে অডিটোরিয়ামে। প্যাণ্ডেল, মঞ্চ তৈরি করেছে যারা, তাদের ফাইফরমাস খাটা। সিগারেট আনছে। চা আনছে। মাঝে মাঝে নিজেও ভাগ পাচ্ছে। ডিপার্টমেণ্টে থাকলে যে পরিমাণ কাজ তাকে করতে হয় তার দ্বিগুণেরও বেশী কাজ সে করে যাচ্ছে পরমানন্দে। হাসিটি তার মুখে বড় ঘন ঘন দেখা যাচ্ছে। সামান্য নেশা করলে যেমন ভাব হয়, সকাল থেকে তার চাল চলন হয়ে উঠেছে যেন তেমনি।

বিকাল তিনটে আন্দাজ যখন মোটরে করে ড্রেস পেইণ্ট এসে পৌছল, তখন প্যাণ্ডেল ছেড়ে সে নামিয়ে বসল সেখানেই। থিয়েটারে সাজতে হলে মাথায় সাবান দিয়ে চুল নরম করতে হয়, এ কথাটা তাকে কেউ বলে দিয়ে থাকবে। ইতিমধ্যে তাই সে স্নান করার সময় কাপড় কাচা সাবান দিয়ে মাথাটা খুব করে ঘসেছে। মাথার চামড়া টনটন করছে। তার ওপর রোদ লাগায় মাথাটা ধরেছে। একজন ড্রেসারকে ডেকে ও বলল, কখনো প্লে করিনি তো। তাই আজ শরীরটা কেমন কেমন লাগছে।

এই বলে সে ড্রেসারকে একটা বিড়ি দিল। নাটক বলে সন্ধ্যার দিকে সে এক বাণ্ডিল বেশি কিনেছিল। বিড়িটা হাত বাড়িয়ে নিতে নিতে ড্রেসারটি চোখ কুঁচকে তাকে একবার দেখল। তারপর বলল, আপনিও পার্ট করছেন নাকি ?

—হ্যাঁ, গদ গদ হয়ে জানালো সে।

তারপর একটু থেমে এদিক ওদিক চেয়ে অন্তরঙ্গ গলায় বলার চেষ্টা করল, এখনো তো সব আসে নি। আপনি হাতের কাজটা একটু এগিয়ে রাখুন না ভাই।

চিত্রা রায় কথা বলার সময় হঠাৎ এই 'ভাই' শব্দটা বলে। বেশ সুর দিয়ে বলে। শব্দটা কতদিন ব্যবহার করবে বলে হরমোহন ছট ফট করেছে। আজ বলল।

—কি কাজ ? জানতে চাইল ড্রেসার।

—কি আর ? আমায় সাজিয়ে দিন, তারপর নিজেই যোগ করল : দারোয়ান।

—এই যে আপনারা সব এসে গেছেন। যাক একটা চিন্তা গেল, এই কথা বলতে বলতে নাট্য-সম্পাদক যেন মাটি ফুঁড়ে সেখানে হাজির হলেন। ভদ্রলোক যে সারাদিন কোথায় আছেন আর কোথায় নেই তা তাঁর নিজের পক্ষেই বুঝি বলা অসম্ভব। নাট্য-সম্পাদকের উপস্থিতিতে ড্রেসার সেইণ্টার একটু অনুপ্রাণিত হবার ভঙ্গি করল।

—আপনারা চা খেয়েছেন ?

—বিড়ি দিয়েছে বাবু।

হরমোহন যাকে বিড়ি দিয়েছিল সে ছাড়া আর দু'জন মুখোমুখি চাইল।

—চা খাওয়াবি তো। যা, যা, চা নিয়ে আয়।

যেন হরমোহন থিয়েটার পার্টির কিম্বা সম্পাদকের বাইনে করা বাঁধা লোক এমনি ভাবে নির্দেশ দেওয়া হল তাকে। পা বাড়াবার আগে সে শুধু বলল, বাবু একটা কথা ছিল।

—বল্ বল্ তাড়াতাড়ি বল্।

—আমার সাজটা ?

—হবে। তা তুই দাড়ি কামিয়েছিস কোথায় রে ?

—ক্ষৌরী হতে হবে ?

—দাড়ি গোঁফ সব কামিয়ে আয়। তাই বলে মাথা ন্যাড়া নি যেন। তবে শোন, তার আগে এঁদের চা খাইয়ে দে। বুঝলি ?

চিত্রা রায় যখন গাড়ি থেকে এসে নামল তখন বেলা পাঁচটা বাজে বাজে।

গাড়ি থেকে নামল চিত্রা। যেখানে নামল সেখানে হরমোহন দাঁড়িয়ে। সে এক দৃশ্য। মেক আপ তার হয়ে গেছে। চুলগুলোকে ঘেড় দিয়ে একটা চওড়া ছোট কাপড় পাগড়ির মত করে বাঁধা। দু'দিকের ঝুলপি পর্যন্ত চওড়া গোঁফ। গোঁফের শেষ ভাগ ঘষাঘষা সুতোয় করে দারোয়ানী ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। দু'কানে দুই মাকড়ি। গলায় কার। কোন প্যাণ্টই তার মাপ মতো হয় নি। পরনে তাই নিজস্ব ধুতি। একটা খাকির কোটকে ভেতরে ভেতরে সেফটিপিন এঁটে লং কোট করে পরানো হয়েছে। পায়ে তার নিজস্ব লাল কেডস্। হাতে একটা লাঠি নিয়েছে। সেটি তার মাথা ছাড়িয়ে হাত দেড়েক উঠে গেছে।

হাওয়ায় সিল্ক ভাসিয়ে গাড়ি থেকে নেমে হাসিতে মক্কীরাণী ভেঙে পড়ে আর কি। তার আগেই হরমোহন এগিয়ে এসে চিত্রার হাত থেকে এ্যাটাচিটা নিয়ে নিল। কাজটা কেউ তাকে দেয় নি। বলেওনি করতে। সত্যি কথা বলতে কি মক্কীরাণীর এ্যাটাচি বইবার জন্য উপস্থিত অনেকগুলি হাত ভিতরে ভিতরে তৈরি ছিল। কিন্তু চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে এগিয়ে যেতে পারে নি কেউ। সে গেল সবার আগে।

কোনদিকে না চেয়ে আগে আগে চলেছে চিত্রা রায়। সোজা গ্রীন রুমে।

চারপাশে চেয়ে দারোয়ান চলছে পিছনে পিছনে। গ্রীন রুমে।

কে একজন বলল, বা—রে দারা সিং—

হরমোহন হাসল।

গ্রীনরুম গম্ গম্ করছে। কে যে কুশীলব, কে কর্মী আর কে বা কি তা বোঝার উপায় নেই। উপায় আছে ঠিকই, তবে উপায় থাকলেও কিছু করার নেই। কেন না কারখানার রিহেটার। কোম্পানীর পয়সায় এইসব হচ্ছে। অতএব সাজ ঘরে যার খুশি, যতবার খুশি সে আসতে পারে যেকি। আসছে। আসবে। আসবৎ।

মেজাজ রী রী করছে সম্পাদকের। কত আর বাবা, বাছা, ভাই, বন্ধু বলে ভালো কথায় ভিড় সামলানো যায়। ওর মধ্যে আবার ক'জন বিশেষ কেউ যেন সাজঘরে একটা উৎপাত না বাধিয়ে ছাড়বে না। রাগটা তার ঠোঁটের আগায় ছট্ ফট্ করছে।

—এই ! কেন ঘুর ঘুর করছিস এখানে ওখানে ? বস এক জায়গায়।

অন্য কাউকে নয়। নাট্য সম্পাদকের ধমক এসে পড়ল হরমোহনের ওপর।

আর এক ঘর লোকের সামনে ধমক খেয়ে সে সেইভাবে হাসল।

—হাসবি না। হাসি হাসি আমার ভালো লাগছে না। বোস এক জায়গায়।

যেন সে চুপ করে বসলেই সব গোলমাল শেষ হয়। আসলে মহড়া ঘরে চিত্রা রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে হরমোহনকে নিয়ে সবাই যে চালাকির প্রতিযোগিতা চালাত, এখানেও সেটা চলেছে পুরো মাত্রায়। কেউ পাগড়ি নাড়ছে, কেউ হাত মেলার চেষ্টা করছে গোঁফে, কেউবা কোটের ঝুলটা ঠিক ক' আঙুল নেমেছে তাই মাপছে।

—বেশ সং সেজেছে মাইরি। বেড়ে।

একজন বলে বসল।

চিত্রা রায়ের পেইন্ট শেষ হয়েছে। এককোণে বসে সামনে আয়না নিয়ে কিছুটা নিজে ও কিছুটা পেইন্টারের সাহায্যে শেষ করছে সে। পরিচালক এসে নায়িকার পেইন্টের শেড ঠিক হয়েছে কি না আলোর বিপরীতে তাকে দাঁড় করিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। লক্ষ্মী মেয়ের মত দাঁড়িয়ে আছে চিত্রা। কোন ভেজ দেখাচ্ছে না। একবার চিবুকে, একবার নাকের আগায় আলতো করে আঙুল ছুঁইয়ে পরিচালক বলল, ঠিক আছে।

অদূরে বসে বসে দেখছিল হরমোহন। আর তার মনে হচ্ছিল চিত্রা রায়কে এখন যেন মুকার্জি সাহেবের বউয়ের মত টুকটুকে লাগছে। না, তার চেয়েও সুন্দর। পরিচালক যতক্ষণ পেইন্ট পরীক্ষা করল, হরমোহন একদৃষ্টে সেই দিকে যতক্ষণ দেখল, ততক্ষণ তার পাশে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পরে একজন দর্শক প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সিস দিল।

নায়িকা নিরীক্ষণ হয়ে গেলে পরিচালকের কাছে এগিয়ে গিয়ে হরমোহন বলল, বাবু আমার সাজটা ঠিক হয়েছে কিনা আপনি তো দেখলেন না।

—দেখেছি তো। খুব ভালো হয়েছে।

তারপর ড্রেসারদের একজনের দিকে ফিরে বলল, এর নাকের বাঁ পাশে একটা বড় আঁচিল বসিয়ে দিয়তো।

আঁচিলটা তখুনি বসিয়ে দেওয়ার জন্য সে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করল। কিন্তু থিয়েটার কোম্পানীর লোকেদের তখন সেদিকে মন দেওয়ার একটুও অবসর ছিল না। কেন না মক্ষীরাণী স্বয়ং তখন তাদের বলল, কিগো বিধবা বলে কি এই পোশাক নাকি।

—তা ছাড়া আবার কি? শাদা থান।

—শাদা থান! সুতি তো, যেন ভেংচি কাটার মত বললো সে।

—তুমি কি শাদা সিল্ক পরে বিধবা সাজবে নাকি?

হরমোহন স্পষ্ট শুনল চিত্রা রায়কে 'তুমি' বলল ওই লোকটা। প্রায় প্রতি মঞ্চেই তো ওদের দেখা। তবু ড্রেসারটাও ওকে 'তুমি' বলে? আশ্চর্য।

—তা সাজবো না কেন? বিধবারা কি সিল্ক পরে না?

অনেকটা তার বৌদির মত গলায় আর ভঙ্গিতে চিত্রা রায় বলল, আ মর্!

শাদা থান হাতে নিয়ে নাট্য-সম্পাদকের উদ্দেশে চিত্রা রায় বলল, ও মুখার্জি বাবু, আমার কি একঘর লোকের সামনে কাপড় ছাড়তে হবে নাকি? কোন ব্যবস্থাই তো দেখছি না তাই আপনাদের—

—আছে, আছে। ব্যবস্থা আছে।

—কই দেখছি না তো। সিপল মেয়া গ্রীনরুমে পুরুষ মানুষের চলতে পারে, আমি চালাই কি করে? তাই তো আপনাদের বলেছিলাম সিনেমা হল ভাড়া নিয়ে করুন, কোন ঝামেলা নেই।

—ঝামেলা এখানেও নেই। আসুন এদিকে।

গ্রীনরুমের মেয়া যেখানে শেষ, সেখানে এক দরজা। সেই দরজার কাছে মক্ষীরাণীকে নিয়ে গিয়ে

সম্পাদক বলল, দরজা ঠেলে ভেতরে চলে যান। একটা ঘর পাবেন। ঘরটার সব ক'টা খিল লাগিয়ে আপনি ব্যবস্থা করুন। আশা করি আপনার কোন অসুবিধাই হবে না।

তাদের পিছু পিছু হরমোহনও সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছিল। তার দিকে চেয়ে সম্পাদক খেঁকিয়ে উঠল, কি করছিস এখানে? যা!

মক্কীরাণী দরজার ওপারে চলে গেল।

মেয়েদের পার্ট করার ব্যাপার আছে বলেই ওই ঘর বেঁধে হিসেব মত মক আর সাজঘর করা হয়েছিল। কিন্তু উদ্যোক্তারা জানত না যে মক্কীরাণীকে নিয়ে যে সব ধর্ষনার্থী মস্তানরা খুবই উৎসাহিত হয়েছিল তারা দরজার ছিটকিনিতে এমন এক কারসাজি করে রেখেছিল যে সেটা ঠিকমত লাগে না। তা ছাড়াও যাতে বাইরে থেকে চোখ রেখে ভিতর দেখা যায় এমনি ভাবে দরজার কাটলে সামান্য ছেঁদা করা হয়েছিল একটা।

বিভিন্ন সৌখিন দলের সঙ্গে অভিনয় করে করে এ সব ছ্যাঁচড়া বদমাইসির ব্যাপারে তার অনেক অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করার সময় সে ছেঁদাটা দেখতে পেল। হাতের রুমালটা জায়গামত গুঁজে দিল সে। সেটা একটু পরে মেঝেয় পড়ল।

স্কুল কলেজের দেওয়ালে যারা লুকিয়ে লুকিয়ে অশ্রাব্য কথা লেখে পরিশ্রম করে, রেলের স্যাভাটরী, সিনেমার পাবলিক যাদের মন্তব্যে কোন কোন জায়গায় নরক হয়ে থাকে, তারা তো পৃথিবীর বাইরের লোক নয়। তারাই এখান ওখানে ছিটিয়ে আছে। তারা দু'একজন নিঃসন্দেহে কারখানাতেও ছিল।

সাজ ঘরে ভিড়টা যেন একটু পাতলা হয়েছে। মক্কীরাণী ঢুকে গেছে দরজার আড়ালে। মাঝে মাঝে দুই একজন ওই দরজার কাছে যাচ্ছে আবার সরে আসছে। দু'একজন ওখানে আছেই। এমন সময় সবাই যেন ঘরটার কাছ থেকে উঠে গেল। আর পরক্ষণেই খুলে গেল দরজাটা। পাল্লার ফাঁক দিয়ে গলা বাড়াল চিত্রা রায়। 'আপনাদের কি মা বোন নেই' এই ধরনের কিছু একটা সে বোধ হয় বলতে চেয়ে থাকবে। কিন্তু গলা বাড়িয়ে কাছাকাছি সে কাউকে দেখতে পেল না। ম্যানেজার, সেইন্টার আর দু'চারজন নিরীহ যথার্থ ভদ্র কুশীলব দরজার সঙ্গে লাগান ত্রিপল ঘেরা স্ক্রীনরুমে বসে আছে। এক কোনে বসে আছে হরমোহন।

—এই?

একজন খোঁচা দিয়ে যেন জাগিয়ে দিল তাকে।

—এই?

হাতের ইসারায় হরমোহনকেই ডাকছে চিত্রা। সে দরজার কাছে গেল।

—আমি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি এসো।

ভেতরে গেল সে।

দরজা বন্ধ করল মক্কীরাণী। সকাল থেকে সামান্য নেশার ভাব লেগেছিল তার। এখন যেন আকণ্ঠ নেশায় মাথা টলে আসছে তার। সোজা হয়ে দাঁড়াতে যেন টাল খেয়ে যাচ্ছে।

চিত্রা তখন বললে, শোন লিলিপুট, তোমায় একটা কাজ করতে হবে।

তার মুখ দিয়ে কথা সরলো না।

—ছিটকিনিটা হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকো চেপে। খুরোরগুলো ঠ্যালা দিলে খুলে যাচ্ছে। আর এই এখানটায় মাথা দিয়ে দাঁড়াও। না হলে কুকুরগুলো এখান দিয়ে জিব বার করছে।

এই বলে মক্ষীরাণী বোতামে হাত দিল।

লোকে কি সাহপালা, পশুপাখির সামনে কোন সংকোচ করে? বোতামে হাত দিয়ে চিত্রা রায় বলল, খবরদার লিলিপুট, তুমি কিন্তু চোখ বন্ধ করে থাকবে। তুমি খুব ভালো। চোখ খুলতে নেই, বুঝলে?

যেন কোন অবোধ শিশুকে নীতিবোধের প্রথম পাঠ বলে দেওয়া হচ্ছে। আর সেশার যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল মক্ষীরাণীর লিলিপুট। ডান হাতে ছরজার পিকল চেপে রইল সে। মাঝে মাঝে ছরজার ওপর থেকে তার মাথার কাপড়ের ফেটির ওপর খোঁচা পড়তে লাগল। চোখ খুললে সে দেখতে পেত তার তিলোত্তমার কণ্ঠার হাড় কত উঁচু, কনুইগুলো কত কোনা। কিন্তু সে একবারও চোখ খুলল না। হয়তো খুলতে পারল না। ছারোয়ানের মেক-আপ নিয়ে লোকটা সত্যিই চোখ বুজে বসে আছে দেখে মক্ষীরাণী অবাক হল।

বেশ কিছুক্ষণ পর ছরজার ওপরে মৃদু টোকা পড়ল। অচেনা কণ্ঠ শোনা গেল, চিত্রা, তোমার কি দেরী হবে?

—কে?

—আমি। শৌরীন।

—দাঁড়াও।

চোখ খুলে হরমোহন দেখল মক্ষীরাণীর সাজা হয়ে গেছে। শাদা ব্লাউজ, শাদা খান, তাকে একেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছে।

ছরজা খুলল মক্ষীরাণী। তার আড়ালে লিলিপুট দাঁড়িয়ে।

—বাঃ। বেশ লাগছে তো, চোখ মুখ যেন উপচে উঠল শৌরীনের। সুর পাল্টে বলল, তোমায় ডিসটার্ব করলাম না তো?

—তা একটু করলে বৈকি।

—দুঃখিত, এইদিকে কাজে এসেছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ল আজ এখানে তোমার প্লে আছে। তাই দেখা করে গেলাম।

—হঠাৎ মনে পড়ল তোমার? হঠাৎ? ডায়েরিতে লেখা ছিল না? কত মিথ্যে বলবে?

—বিশ্বাস হলো না কথাটা?

—ছরজায় টোকা দিয়ে ডাকাডাকি না করলেই পারতে। থিয়েটারের মেয়েরও সম্মান আছে একটা। সেটা যেন না হয়।

—খুব চটেছো মনে হচ্ছে। কিংছো ক'টায়?

—প্লে শেষ হলেই।

ব্র বাঁকিয়ে কথা বলতে বলতে ছরজা ছেড়ে এগিয়ে এল চিত্রা রায়। পিছনে হরমোহন।

—আরে এটি কে? ভিতরে ঢুকিয়েছিলে নাকি?

—হ্যাঁ। কুকুর তাড়াচ্ছিল।

—তা কাজটা মন্দ নয়। ভাগ্যবান বলতে হবে।

—তোমার চেয়েও ?

ঠেস দিয়ে অথচ খুব আস্তে বলল চিত্রা। যদিও হরমোহন তা শুনতে পেল।

—নাম কি ভাগ্যবানটির ?

—ওর, নাম ?

মুখের চেহারা যেন চকিতে বদলে গেল চিত্রা রায়ের। একগাল হেসে বলল, ওর নাম খুব ভালো। লিলিপুট। আমি দিয়েছি।

হরমোহনের আসল নামটা মক্কীরাণী জানত না। শুনলেও খেয়াল করে নি। শৌরীন কিছু বলার আগে, চিত্রাই আবার বলল, ওকে আমি খুব ভালোবাসি।

ঠিক এই কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শৌরীনের দিকে চেয়ে হরমোহন হাসল। চওড়া গোঁফের আড়ালেও হাসিটা যথারীতি ছড়িয়ে গেল চোখ থেকে দাঁতে।

—বাঃ। হাসিটিতো বেশ।

বলে হো হো করে হেসে উঠল শৌরীন।

—তা তুমি অমন করে হাসছো কেন ? হাসিটা তো ওর সত্যি ভালো। কত সরল দেখেছো ?

এই বলে চিত্রা রায় তার দিকে তাকাতেই হরমোহনের হাসি দীর্ঘতর হয়ে গেল।

শৌরীন বেশীক্ষণ দাঁড়াল না। ছট্‌ফট করার মত সাজঘরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াল। ড্রেসার, সেইটারদের সঙ্গে তার বেশ আলাপ আছে, তা বেশ বোঝা গেল। চিত্রার সঙ্গে তার পরিচয় যে বিশেষ তা বুঝতে কোন বুদ্ধির দরকার ছিল না। ড্রেসার, নাট্যনির্দেশককে সে বার বার জিজ্ঞাসা করল, গ্রে ক'টায় শেষ হবে ? আন্দাজ ?

হরমোহনকে একান্তে ডেকে শৌরীন বলল, তোমার নাম কি ?

—নাম ?

অবাক হয়ে গেছে হরমোহন। এমন করে তার নাম জানতে চায় নি কেউ।

—হ্যাঁ নাম।

নির্দ্বিধায় উত্তর এলো, হরমোহন ঘোষ।

একটু পরেই 'আচ্ছা চলি' বলে বিদায় নিয়ে চলে গেল শৌরীন।

সেই রাত্রেই শৌরীনের সঙ্গে লিলিপুটের দেখা হল মক্কীরাণীর বাড়িতে।

॥ দশ ॥

থিয়েটার শুরু হয়ে গেছে। সময় সরে যাচ্ছে। গ্রীনরুমের এক জায়গায় চুপ হয়ে বসে আছে হরমোহন। যাকে একবার কাকে যেন জিজ্ঞাসা করেছিল, আমার কখন ?

উত্তরে ফরমাস করেছিল সেই ভদ্রলোক। চা কিম্বা অন্য কিছু এনে দেওয়ার জন্য। এনে দিয়েছিল। যেন একটা ঘোরের মধ্যে বসে আছে সে। নাটক ভাঙল যার নাম শুনে এগারোটায়। একবারও তার ডাক পড়ল না। পরিচালক বলল, ডেকেছিলাম। কই, তুই তো গেলি না।

—তা'হলে আমি শুনতে পাই নি। শরীরটা বেতাব ছিল কিনা।

—কেন রে? তোর আবার শরীরের কি হল?

—কই কিছু না তো।

নাটক শেষ হওয়ার পর সাজঘরে শৃঙ্খলা রাখার আর কোন দায়িত্ব নেই। উৎসাহও না। সিকটার তার জিনিসপত্র সামলাচ্ছে। লাইটম্যান তার পয়েন্টেড কোকাস ইত্যাদি বন্ধ করে বাকসে রাখছে। ড্রেসার জিনিস বিলিয়ে তুলছে। কুশীলবরা পোশাক ছাড়ছে। মুখে নারকেল তেল ঘষছে কেউ কেউ। 'খুব ভালো' 'বেশ হয়েছে' 'চমৎকার' ইত্যাদি কথা, হাসি ঝড়মুড় করে একটা আর একটার গায়ে বেসামাল হয়ে চলাচলি করছে। মক্ষীরাণীকে দেখার জন্ত চুক চুক করছে কারো দৃষ্টি। কিন্তু দরজার কাছে গিয়ে উঁকি দেওয়ার বা যে কোন রকম অনুবিধা করার উৎসাহ নেই কারো। বোধ হয় এ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ক'জন আগেই চলে গেছে। এরই মাঝে আবার সিকন উড়িয়ে চিত্রা রায় আবির্ভূত হলো।

চরিতকার বন্ধুবর একটু থেমে বললেন, সেদিন থিয়েটারের শেষে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন ছিল। মাংস ভাত। সেখানে মক্ষীরাণীকে খাওয়ানোর জন্ত তার হাত ধরে কেউ টেনেছিল কিনা ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ আমি ধসড়ায় অপ্রয়োজনীয় বোধে পার করে যাচ্ছি। অবস্থাটা আর পরিবেশটা তোমরা অনুমান করে নাও। তার ক'টা জিনিস তোমাদের মনে রাখা ভালো। যথা—মাংস ভাত সেদিন হরমোহন খেতে পারে নি। এটাচি কেসটা সে সব সময় বয়েছিল। তার সামনে পাঁচ খানা দশ টাকার নোট নাট্য-সম্পাদক দিয়েছিল চিত্রা রায়কে।

—সই করতে হবে না?

—সই? কেন?

—অন্ত জায়গায় পেমেন্ট করলেই সই করিয়ে নেয়। না হলে আমি মামলা করতে পারি তো।

—মামলা? বেশ তো করবেন। তাতে বরং আবার দেখা হবে।

একটা হাই তুলে মক্ষীরাণী বলল, এবার বাপু আমার বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। সারারাত আমায় আটকে রাখবেন নাকি তাই?

—এখুনি পৌঁছে দিচ্ছি। একজন কাউকে সঙ্গে দিতে হবে তো।

—নুনা। লোক আর খুঁজতে হবে না। আমার সঙ্গে যাওয়ার লোক আছে।

—কে?

—এই তো। ও-ই যাবে।

অনেকক্ষণ পর আবার হাসল হরমোহন। সেই হাসি।

আজন্ম সমালোচক বন্ধু বাধা দিয়ে বলল, তুমি আবার শুরু করার আগে একটা কথা ওঠে। যে ভাবে তুমি ধারাসিংকে গ্রীনরুমে এক পরিস্থিতির মধ্যে ফেললে তারপর যেভাবে লিলিপুট, লিলিপুট করে মক্ষীরাণীর পিছনে জুড়ে দিচ্ছ, তাতে সব জিনিসটা যেন বড্ড জত হয়ে যাচ্ছে। তাই না?

চরিতকার বন্ধুবর চটুল উত্তর দিলেন, আরে আমার এ লেখা তো ছাপা হচ্ছে না যে সাইকো এ্যানালিসিসের ছুতোয় কর্ষার পর কর্ষার পর বাড়িয়ে পাঁজির মত বই লিখতে হবে। তার চেয়ে সোজা কথা শোন, রবীন্দ্রনাথের পুনশ্চর সেই কবিতাটি মনে আছে? যেখানে কবি বলছেন যে,

আকাশের নক্ষত্রগুলোকে পাশাপাশি বসিয়ে একটা হার বানালে সে হার বিশ্বেশ্বরের হাতে চড়া দামে বিকোয় বটে তবে যেটা ফাঁকা থাকে সেটা আকাশের উপস্থিতি। আমি হরমোহনের আকাশখানা আদৌ বাধ দিতে চাই না। তার জীবনের আকাশে দুই একটা তারার মাঝখানে যদি ফাঁক থাকে তবে তোমরা মনে মনে তা ভরে নাও। তবু তোমাদের তৃপ্তির জন্য শুনে রাখো যে, মনোরমা এই লোকটির সংসর্গে অভিভূত হয়েছিল। কৃতজ্ঞ হয়েছিল বলা চলে। এবার বলতে পারি?

দু'জন এক সঙ্গে সোৎসাহে বলে উঠল, চালাও। ব্রেক চালিয়ে যাও।

চরিতকার বললেন, এবার চিত্রা রায়কে একটু বেশী করে চিত্রিত করবো।

—কেন? কেন? কেন?

—এমনি। শোন।

কারখানার গাড়ি ওদের নামিয়ে দিল এক জায়গায়। এরপর আর গাড়ির রাস্তা নেই। সামের হিসেবমার পিছু পিছু চলেছে সে। মাঠের এই দিকটা গ্রামের মতো। মাটির ঘর মাঝে মাঝে। ইঁট বের করা দেওয়াল। টিমটিমে আলো অনেক, অনেক দূরে দূর। শিমুল গাছের মাথায় ডানা কাপটাল কোন পাখি।

—ফিরতে পারবে রাত্রে?

—আমি? হ্যাঁ। পারব।

—বোকা,

বলে একটু হাসল চিত্রা। তারপর বললো, এই রাত্রে এখান দিয়ে কেউ একলা ফেরে? থাকো কোথায়?

—কারখানার কোয়ার্টারে। দাদার কাছে।

—তবে? সে জায়গা কি এখানে? গাড়িও তো চলে গেছে।

ওরা পাশাপাশি হাঁটছে। এ্যাটাচিটা দুলছে হরমোহনের হাতে।

—তোমায় লিলিপুট বলেছি বলে রাগ করেছো নাকি?

—কি যে বলেন।

অন্ধকারে ঠোকর খেল হরমোহন। তার হাসিটা দেখা গেল না।

আড়াইখানা ঘরের একটি ছোট বারান্দার গিয়ে দাঁড়াল ওরা। কড়া নাড়ার আগেই দরজা খুলে গেল টুক করে। ভিতরে হ্যারিকেন জ্বলছে। দরজা খুলল শৌরীন।

—তুমি।

—কতবার জানতে চাইলাম কখন যে শেষ হচ্ছে। তা তো আর জানালে না।

—জানা যায় নাকি? জানলে কি করতে?

—সঙ্গে করে নিয়ে আসতাম।

—তাই নাকি? পুরোনো সাহস আবার ফিরে পাচ্ছ মনে হচ্ছে।

—আরে হরমোহন যে। এসো এসো।

—এ্যাটাচিটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিয়ে শৌরীনকে সেলাম করল হরমোহন।

—নামটাও জেনে ফেলেছ দেখছি।

চিত্রা বলল।

—জানতে হবে না? লোকটা আমার রাইভাল হয় কিনা কে বলতে পারে? রাইভাল বোঝ তো হরমোহন?

—আজ্ঞে?

—রাইভাল।

—রাইফেল? আজ্ঞে হ্যাঁ—

হো হো করে হেসে উঠত বোধহয় শৌরীন। তার আগেই চিত্রা বলল, আমাকে এই ভাবে অপমান করতে তোমার লজ্জা করে না একটুও?

—তোমায় অপমান? তা কি পারি? এতো একটু ঠাট্টা হচ্ছে। হাসতেও পারো না?

—হাসতে চাও, ঠাট্টা করতে চাও বিয়ে করো আগে—

কথাটা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল চিত্রা। তারের যন্ত্র মনোযোগের সঙ্গে বাজাতে বাজাতে মাঝপথে হঠাৎ ছেড়ে দেওয়ার মতো। কথা ঘুরিয়ে হাতের ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে আগের গলায় বলল, এই নাও তোমার কমিশন।

—তোমার কাছে টাকা নোব বলে এই রাত দুপুরে এসেছি মনে কর?

—ঠিক তাই-ই। তুমি, তুমি একটা—

—বলো, থামলে কেন? আরে, ও আছে তো কি হয়েছে? ওতো মানুষই নয়। ওর সামনে যখন পোশাক বদল করতে পারো, তখন ওর সামনে আমার দু'চার কথা বলতে পারবে না? বলেই ফেলো।

—অনেক রাত হয়েছে শৌরীন। হয় টাকা নাও, না হয় তুমি এসো।

আর কোন কথা না বলে পথে নামল শৌরীন। এবার চিত্রা ডাকল পিছন থেকে, শোন।

এই ছোট্ট 'শোন' কথাটা এমন ভাবে ছাওয়ার ডাকল, যেন মনে হল কেউ যত্ন করে রেশমের পোশাক পরিয়ে বুকের খাঁচা থেকে আলতো ভাবে পাখীটা বার করেছে। শৌরীনের পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল চিত্রা। বলল, সাবধানে যেও তুমি। রাত অনেক হয়েছে।

কোন কথা না বলে হরমোহনের চোখের সামনে চিত্রা রায়ের পিঠে একটা মৃদু চাপ দিয়ে শৌরীন হন্ হন্ করে অন্ধকারে হারিয়ে গেল। হরমোহন চেয়ে দেখল হ্যারিকেনের আলোয় চিত্র রায়ের ছায়াটা স্বাস্থ্যের মত এক জায়গায় বোবা মেরে গেছে।

—দিদিমণি!

এই প্রথম চিত্রাকে নিজের মত সম্বোধন করল সে।

—এঁ্যা?

—আপনি যে আসার সময় আমায় বললেন এই পথ দিয়ে এই রাতে কেউ একলা যেতে পারে না। উনি যে গেলেন।

নিজস্ব ভঙ্গিতে ধীরে ছেড়ে ছেড়ে কথাগুলো বলল সে। যেন সত্যি হাঁপিয়ে উঠেছে।

—ওর অনেক সাহস। ও অমন যায়।

এই কথার পিঠে হরমোহন একেবারে অন্য কথা বলল।

—একটা কথা বলব আপনাকে দিদিমণি ?

এই 'দিদিমণি' উচ্চারণের স্বাদটা যেন তার জিবে জড়িয়ে যাচ্ছে।

—বল।

—ওর সঙ্গে আপনার বিয়ে হলে, বেশ হবে।

চিত্রা রায় একবার তার দিকে তাকাল। তারপর বলল, ধ্যেৎ।

হাত থেকে এ্যাটাচিটা নিয়ে বলল, বুঝলে লিলিপুট আমার বিয়ে হবে না। আমার মত মেয়ের বিয়ে হয় না। আমি একদিন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হব।

যেন আজ কারখানার থিয়েটার পার্টটাই আবার নতুন করে বিড় বিড় করছে চিত্রা। সবলকে শুনিয়ে বলতে হয় বলে সেখানে জোরে বলছিল। আর এখানে বলছে আস্তে আস্তে।

বাইরের ওই আড়াই হাত বারান্দায় তার শোবার জায়গা হল। একটা শতরঞ্জি আর বালিশের বিছানা।

—ভয় করবে না তো ?

—না। ভয় কিসের ?

চিত্রা দরজা বন্ধ করে দিতেই তার সামনে একরাশ অন্ধকার। আকাশের এখানে ওখানে ঝিক-মিকে দু'চারটি তারা তার সামনে এসে দাঁড়াবে। তবু সে দ্বিতীয় বার বললো, ভয় কিসের করবে ?

—আচ্ছা কোন দরকার পড়লে আমায় ডেকো। আমি এ ঘরটায় আছি।

হরমোহনের মুখের ওপর দরজা বন্ধ হওয়ার আগেই ভিতরে আর একটি নারী কণ্ঠ শোনা গেল। সেই কণ্ঠ বলল, ভেবেছিলাম রাত দুপুরে আর কিছু বলব না। কিন্তু এ সব ব্যাপার কি ?

—ব্যাপার আবার কি ? দেখছ তো এখুনি এলাম।

—তা আবার কোথাকার কে ওই লোকটাকে রাতভোর দুয়ারে শুইয়ে রাখা কেন ?

বেশ করেছি। বেশী যদি বকবে, তো ওকে আমি ঘরে এনে তুলবো ?

—তা তুমি পারো বাবা। তোমার ফুরে ফুরে দণ্ডবৎ। তুমি বাড়িতেই বাজার বসাতে পারো।

—কি বললে ?

—ঠিকই তো বলেছি গো। অত রোক কিসের তোমার ? রাত দুপুরে এসে তোমার নাম ধরে ডাকাডাকি করে বাইরের লোক। আমায় দরজা খুলতে হয়। বাড়ি নেই বললে, সে মানুষ বসে থাকে। বলবো না ?

—তার দরকার ছিল।

—ওরে আমার কি দরকার রে। তোমার বাপকে বলবো এখানে তোমার. আর তোমার ভাইকে রেখে যেন আমাদের নিয়ে অন্য কোথাও উঠে যায়।

—তার মুরোদ আছে তোমাদের ? বাজার বসিয়ে আমি যে টাকা আনি সেটা না হলে তোমাদের চলে ?

হয়তো দেখতে দেখতে এই ঝগড়া দারুণ হয়ে উঠত। কিন্তু তার আগেই একটি পুরুষের গলা খাঁকারি শোনা গেল। তারপর চুপ। হ্যারিকেনের আলো নিভল। মশারা ঐক্যতানে বাজিয়ে চলল। একরাশ জোনাকি রাত্রির নিভৃত উল্লাস হয়ে জ্বলা নেভা করতে লাগল।

অনেক পর খুব সাবধানে একটা বিড়ি ধরাল হরমোহন। তারপর তার মনে কি হল কে জানে। সে নিজের মনে একবার হাসল।

॥ এগারো ॥

এক একটা মন্দিরে কোন কোন ভক্ত হত্যা দিয়ে পড়ে থাকে না? সারা দিন রাত তারা সেখানেই পড়ে থাকতে চায়, যদি দু'বেলা দুটি প্রসাদ পায়। হরমোহনের অবস্থাটা হলো সেই রকম।

সকাল হলেই সে এদের ঘরের ব্যাপার টের পেয়েছিল কিছু কিছু। দশ দিনে জেনেছিল বিস্তর। চিত্রা যায় ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়েছে। সেই সময় তার মা মারা গিয়েছে। তার ভাইটা তখন বছর আটেকের; সংসার সামলাবে বলে পড়া ছেড়েছিল। তাদের বাবা কাজ করত একটা দোকানে। এখনো করে। সারা বছরের ভাত কাপড় তাতে স্বচ্ছন্দে হয় না। না হলে হবে কি? বউ মারা যাবার দু'বছরের মধ্যেই সে তার ছেলে মেয়েকে লুকিয়ে আবার বিয়ে করে বসল। বাবা যখন বিয়ে করে নতুন মাকে নিয়ে এলো তখন কি ভাবে সে 'ঘুর' 'ঘুর' করে ঘেড়ে গিয়েছিল তা পাড়ার লোকে দেখেছে। দেখতে দেখতে তাদের নতুন মা, চারটি ছেলে মেয়ের আপন মা হয়েছে।

আর এদিকে চিত্রার দেহে বয়সের দোলুস লেগেছে। অযত্নে বাড়া লাউডগার মত চিকণ হয়েছে সে-ও। শৌরীনের মধ্যস্থতায় শৌখীন দলে পার্ট নিয়েছে সে। পুরু পাউডার মাখতে শিখেছে। বাইরে যার হতে হলে কয়েকটা নিত্য ইত্যাদি শাড়ি দরকার তা বুঝেছে। করিয়েও ফেলেছে। দেখতে দেখতে এই শহরে আরো তিনটি মেয়ে শৌখিন দলে অভিনয় আরম্ভ করেছে। লীনা, পলি, ছবি। ধীরে ধীরে তাদেরও পসার জমছে। শৌরীন আছে বলেই বেশীর ভাগ রোল সে আজও পায়। তার জন্য সামান্য কদিনের নেয় শৌরীন।

সকাল হওয়ার আগেই বারান্দায় উঠে বসেছিল হরমোহন। রোদ ফোটার একটু পরেই সে টের পেল যে ঘরের ভেতরটাও ফুটছে। চিত্রার ভয়ে পাড়ায় নাকি আর কান পাতা যাচ্ছে না। ওই শৌরীন ছেলেটা দিনরাত যখন তখন আসছে আর যাচ্ছে। সোমত্ত মেয়ে থিয়েটারে পার্ট করে দু'পয়সা আনে বলে এ কি রকম ব্যবহার?—ইত্যাদি।

—বেশ করবে আসবে। শৌরীন আসবে। পৃথিবীর সবাই আসবে। তোমি পাড়ার লোক আমার কি করে, আর তুমি কি কর। খেতে দেবার নাম নেই কিল মারবার গোঁসাই।

এই বলতে বলতে চিত্রা হরমা খুলল।

হরমোহন হাসতে চেয়েছিল রাত্রি শেষের প্রথম সম্ভাষণ হিসেবে। কিন্তু হাসিটা সম্পূর্ণ ফুটে ওঠার আগেই ফুঁসে ওঠা চোখ মুখ নিয়ে চিত্রা ডাকল, ভিতরে আয়।

এক রাত্রির ব্যবধানে 'তুমি' নেমে এলে তুইতে। সে কি সত্যিই অনেক আপনার হয়ে গেল?

ভেতরে গেল হরমোহন।

সেই দিন চিত্রা আর তার মা'র হাঁড়ি আলাদা হয়ে গেল।

—পাড়ার লোকদের বলে দিও, আমি তোমার কেউ নই। আমি আলাদা করে রান্না করে খাই। যদি তোমাদের মন চায়, অন্য বাড়িতে উঠে যেও, আমি একলা থাকব।

হ্যাঁ, সবাই জানুক, চিত্রা স্বাধীনা। তার চলা ফেরার জন্য সে-ই দায়ী। সংসার আলাদা হল। চিত্রা আর তার ভাই একভাগে। অন্যেরা অন্য ভাগে। চিত্রা বলল, তুই আমার কাছে থাকবি?

তার অবস্থাটা ভেতরে ভেতরে ছিল মন্দিরে পড়ে থাকতে চাওয়া ভক্তের মতন। সে রাজী হয়ে গেল।

পর পর দু'দিন কারখানা কামাই করল সে। একটা চাকরের যত রকম কাজ হতে পারে সবই

পড়ল তার আগে। ঝাঁট দেওয়া, উনুন ধরানো, বা জোকে কিছু বাজার করা, দুধের কুয়ো থেকে দুধ ও পানের জল তুলে আনা। সব।

দু'দিন পরে সে কারখানায় কাজে গেল। কিন্তু সারাদিন কারখানায় যেন তার মন দাঁড়াতে পারল না। তার দাদা মণীন্দ্র ঘোষ তাকে ধরে বলল, হাঁরে হরা, তুই নাকি সেই থিয়েটারের মেয়েমানুষটার কাছে গিয়ে পড়ে আছিস?

—কই, না।

—মিথ্যে কথা বলছিস শালা। এক পাগলে বাপের নাম ডুবিয়ে দোব তোর। কি গিয়েছিস?

—হ্যাঁ

—অ। এর বেলায় টাকা পাস কোথায় রে?

—টাকা তো লাগছে না। দু'বেলায় খাওয়া এমনি দিচ্ছে, তাই—

—একেবারে শ্বশুর বাড়িতে আছিস তুই। ওখানের লাথি খেয়ে একবার আয় তুই, তারপর দেখাবো তোকে মজা।

একজন বাবু খাটো গলায় বললেন, কি হে হরমোহন? কি সব শুনছি?

—ও'সব বাজে কথা বাবু, এই বলে সে হাতের যুক্তন উঠিয়ে নিল।

—সব বলছে যে —

—বলতে দিন, এই বলে সে হাসল।

যজ্ঞেশ্বর জানতে চাইল হিন্দীতে, কি হয়েছে রে?

—কি আবার হোগা?

—খারাপ ধারগায় ফেঁসে গেছিস তুই?

হরমোহনের ইচ্ছে হল সে একবার কানে আঙুল দেয়। কিন্তু দিল না। বরং সবাই যা ভাবছে বলছে, তাই যেন ঠিক এমনি ভাব করে যজ্ঞেশ্বর কাহারের মুখের ওপর বলল, বয়স কালে এমন দু'চার কেস, তোমার ভি তো হুয়া হ্যায়। নাকি ঝুটা?

—জয় সীয়ারাম। কভি নেহি।

হেঁকে উঠল যজ্ঞেশ্বর। হেঁসেও ফেলল। দু'জনেই হাসল।

কারখানা থেকে এতটা পথ পায়ে হেঁটে ফিরে সে প্রায়ই দেখতো দিদিমণি রিহার্সালে বার হয়ে গেছে। আর তার ভাই গেছে খেলতে। ভাই খেলা থেকে ফিরলেই তাকে দুধ বিস্কুট দিতে হবে। দিদিমণির কড়া হুকুম। আর তার সৎ ভাই বোনেরা যদি এদিকে চলে আসে তা হলে তাদের তাড়াতে হবে। যদি দরকার হয় চড় চাপড়ও লাগান চলতে পারে। এ হুকুমও দিদিমণির দেওয়া আছে।

তা দিদিমণি, ভাইকে ভালবাসে বাপু। রাতে নিজের কাছে নিয়ে শোয়। সকালে পড়তে বসার জন্যে তাড়াতাড়ি উঠিয়ে দেয়। পড়া করেছে কিনা বারবার জানতে চায়। দুধের রোজ ব্যবস্থা করেছে, বিস্কুটের টিন।

দিদিমণির সৎ ভাই-বোনদের হরমোহন দূর দূর করে না। পারলে পরে লুকিয়ে একটি বিস্কুট চার টুকরো করে ওদের চার হাতে দেয়। ওরা যেন অনেকটা ওর বাবার ছেলেগুলোর মত।

হরমোহন ঘর ঝাঁট দেয়। বই ক'টা রোজ সাজায়। 'পথিক' 'ছেঁড়াতার' 'সিরাজের বেগম'

'কবরের কান্না' এই সব নাটকের বই। অনেক। বানান করে করে সে নামগুলো পড়ে। দেখতে দেখতে রাত হয়। চিত্রার তাই দেবু ঘুমিয়ে পড়ে। অবশেষে রিহার্সাল থেকে ফেরে চিত্রা। দিদিমণিকে দরজা খুলে দেয়। কত জায়গায় যে পার্ট আছে তার। সন্ধ্যায় বাড়ি থাকে না বললেই চলে। রোজই কেউ না কেউ পৌঁছে দিয়ে যায়।

একদিন সে বলল, দিদিমণি একটা কথা বলবো ?

—বল্।

—বলছিলাম কি, আমি আপনার সঙ্গে গেলে হয় না ?

—কোথায় ?

—এই 'সন্ধ্যে' বেলায়

—কোন দরকার নেই। ভাগ্—

সন্ধ্যায় যেদিন থাকে সেদিনও চিত্রা কারো সঙ্গে বড় একটা কথা বলে না। তার সঙ্গে তো নয়-ই। বসে বসে পার্ট মুখস্থ করে। কখনো শুয়ে থাকে। অগোছালে শুদিতে। চেয়ে থাকে হরমোহন।

এই ভাবে দশদিন কেটে গেল। যেন একটা দিন। স্নান করার পর মক্কীরাণীকে চুল আঁচড়াতে দেখল সে। দু'চোখ ভরে চেয়ে চেয়ে দেখল। রাত্রে ঘুম আসার আগে মুখের সামনে হাই তুলতে দেখল। কত, কতবার। যে সন্ধ্যায় রিহার্সাল নেই, পাতলা পোশাকে তার তিলোত্তমাকে চোখের সামনে বসে থাকতে দেখল। আর শেষের দিকে পর পর দু'রাত্রি হরমোহন ঘাবরাতে উঠে জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়েছে। অন্ধকারে তার দৃষ্টি অন্ধ হয়েছে। কেউ তা জানে না।

এদিকে, যে বিষের ফলে, যে কার্যকারণের মধ্যে চিত্রা আলাদা হয়েছিল সে বিদ্বেষের উত্তাপ যেন আর নেই। নতুন মার হাতের ডাল, ঘট, প্রায়ই আসছে এদের খাওয়ার থালায়। অবশ্য হরমোহন বাদে। যদিও বিস্কুট দিয়ে হরমোহনই এত কাণ্ডটা বাধিয়েছে।

অন্ধ সেই রাত্রি—যেদিন হরমোহন এখানে এল—তা'র পর থেকে গৌরীন আর কোনদিন এ-বাড়ি আসে নি। চিত্রা তাই তার ভাইকে পাঠিয়েছিল গৌরীনের খবর নিতে। সন্ধ্যার সময় খবর নিয়ে ফিরল দেবু। বলল, জানিস দিদি। গৌরীনদা, পরশুদিন বিকেলে আমাদের বাড়ি আসছিল।

—তা কি হল ? জানতে চাইল দিদি।

—পাড়ার ছেলেরা ওকে মেরেছে।

—কে বললে ?

পাড়ার ছেলেরা আমায় বলল, তোর দিদিকে বলে দিস—

ঠিক এই সময় চৌকাঠে এসে দাঁড়াল গৌরীন। বলল, দিদিকে কি বলতে বলেছে দেবু ?

ঘরটার মধ্যে মুহূর্তে যেন খুশির হাওয়া ছড়িয়ে গেল। চিত্রা রায়ের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল বিদ্যুতে। কেউ কোন কথা বলছে না। হঠাৎ হরমোহন বলল, দিদিমণি এইতো জামাইদা এসে গেছে—

ঘরের খুশিকে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে দিয়ে কণ্ঠে গৌরীন বলল, কি ? কি বললি ? রাস্কেল, ইডিয়ট কোথাকার—

—আজ্ঞে ?

এই বলে তার হলদেটে দাঁত বার করে হরমোহন হাসার চেষ্টা করল।

শৌরীন এগিয়ে এসে তাকে ধাক্কা মারল একটা। হয়তো আবার মারতো। কিন্তু তার আগেই চিত্রা তার হাতখানা ধরে ফেলল। বলল, কি করছো? থামো।

—তুমি জানো, এই সমস্ত লোকগুলোর জন্যেই স্কাণ্ডাল ছড়ায়।

চিত্রা কোনমতে নিরস্ত করল শৌরীনকে।

শৌরীন বলল, ঠিক আছে। কিন্তু এই আপদটাকে তুমি এখুনি এখান থেকে তাড়াও। বলে দাও, যেন আর কোনদিন ভুলেও না এদিকে আসে।

নতুন মার সঙ্গে ঝগড়া করে যেমন রূপ করে এক সকালবেলা 'তুই' বলে তাকে ভেতরে ডেকে নিয়েছিল চিত্রা, আজ তেমনি এক সন্ধ্যায় শৌরীনের মন রাখতে রূপ করে ঠিক তার মুখের ওপর 'আর এসো না' বলে দরজা বন্ধ করে দিল।

ঠিক রূপ করে বন্ধ করল না। একটা পুরোনো এক টাকার নোট তার সামনে ধরে বলল, নাও। এটা রাখো, আর কোনদিন এসো না।

টাকাটা হাত বাড়িয়ে নিল হরমোহন। এবং তারপর সত্যিই হাসলো। হলদেটে দাঁতগুলো বার হয়ে পড়ল। তারপর টক্ খাওয়ার মত জিবে একটা শব্দ করে বলল, 'আচ্-ছা'।

আচ্ছা বলে, সূর্যের তেজ থেকে চোখ আড়াল করার জন্যে হাতের পাতা একত্র করে কপালের ওপর রাখার মত রেখে সেলাম করল সে। তারপর টুক টুক করে পথে নেমে পড়ল।

॥ বারো ॥

ঝিনিমণির ওখান থেকে ফেরার পর—অর্থাৎ এই থিয়েটারের সূত্র ধরেই—সে এক জায়গায় গিয়েছিল। পাঁচজনের কাছে বলতে নেই, জায়গাটা খারাপ।

পাঁচজনের কাছে বলতে নেই বটে, কিন্তু আমার কাছে সে বলেছিল।

এই বলে চরিতকার একটু দম নেওয়ার জন্য থামলেন।

তোমরা হয়তো ভাবছ যে এই ঘটনাটা সে স্বেচ্ছায় আমায় জানিয়েছে। তা নয়। যে ঘটনা তোমাদের বলতে যাচ্ছি, তা জানবার জন্য আমায় রীতি মতো কৌশল করতে হয়েছে।

আড্ডায় একজন বলল, কৌশল কিসি কিসি কি যাবা?

—বলছি। আমি একবার হরমোহনের হাত দেখেছিলাম।

—হাত? তুমি? হঠাৎ?

—সেটাই তো কৌশল।

তোমাদের একেবারে গোড়াতেই বলেছি যে, হরমোহন ঘোষ এমন একটা লোক যাকে দেখে দেখার কিছু আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু চোখে যার পড়ে তার আর দেখে দেখে ফুরোয় না। আমার দশা হয়েছে তাই। লোকটাকে দেখতে দেখতে, জানতে জানতে আরো দেখার আগ্রহ, আরো জানার কৌতূহল আমার কেবলই বেড়েছে। অথচ সব কথাতো সরাসরি জানতে চাওয়া যায় না। এমন অনেক প্রসঙ্গ আছে যা কথার কায়দায় তোলা যায় না ওর বন্ধুদের কাছেও। তবু তার সেই সব গোপন ব্যক্তিগত কথাও কিছু কিছু জানা দরকার। তাই হাত দেখার অছিলা। কেবল সেই সব কথা কোনরকম আড়াল না রেখে বলে যাব বলে।

—জানতে চেয়েছিলে ?

—হ্যাঁ।

—উত্তর দিয়েছিল ?

—অবশ্য।

—নিজের গোপন কথা ?

—ঠিক তাই।

ষোলো আনা ইডিয়ট রে।

সমালোচক এতক্ষণে বলল, কি কি জানতে চেয়েছিলে এবং কি ভাবে ? যথা—

—তার ডানহাতের পাতা নিজের হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ দেখলাম। পৃথিবীর সব প্রশংকার যেমন হাতের গঠন খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে, সেই ভাবে। মানুষটা মাথায় যেমন খাটো, তার হাতের গঠনও তেমনি ছোট। পাঁচটা আঙুলে কেবল অনেক কড়া পড়ে গেছে। অনেক, অনেকক্ষণ গভীর মনোযোগের ভাণ করে তার হাতখানা নাড়াচাড়া করলাম। আর ততক্ষণ একদৃষ্টে সে আমার দিকে চেয়ে রইল।

'হুম্' আমি বললাম।

এ কথায় হাসির কিছু ছিল না। সে হাসল।

—তোমার ছোটবেলার কথা কিছু কিছু বলে দোব ?

—বলুন বাবু।

—তোমার বয়স যখন আট, তখন তোমার বাবা মারা যান।

এ সবই আমি তার মায়ের কাছে জেনে নিয়েছি।

—তোমার বয়স যখন সাড়ে পাঁচ-ছয়, তখন তুমি জ্যৈষ্ঠ মাসে গাঁয়ের কুয়ায় পড়ে গিয়েছিলে। জল খুব কম ছিল, না হলে তোমায় বাঁচানো যেতো না।

সে অবাক।

—তোমার এখন বয়স কতো বলে দোব ?

—বলুন বাবু।

—কোম্পানীর খাতায় তুমি পাঁচ বছর কম লিখিয়েছ। তোমার এখন ছত্রিশ চলছে। তাই না ?

এ সবই আমি জেনে নিয়েছি কথায় কথায় তার মায়ের কাছ থেকে। কিন্তু কেবল মাত্র হাতের রেখা খুঁটিয়ে নির্ভুল অতীত বলায় আমার ক্ষমতা দেখে সে হাঁ হয়ে গেছে। তার মুগ্ধতার সাক্ষী স্বরূপ হাসিটি চোখ থেকে ছড়িয়ে গেছে দাঁতে।

—হরমোহন।

—হাত দেখাতে এসে কিছু লুকোবেনা।

—না বাবু।

—যা জানতে চাইব ঠিক ঠিক উত্তর দেবে।

—দোব বাবু।

—একটিও মিথ্যে বলবে না।

—না বাবু।

—সব কথা সত্যি বলবে।

—হ্যাঁ বাবু।

তার অবস্থাটা তখন প্রথম কাঠগড়ায় ওঠা নরম সাঁওতাল আসামীর মত হয়েছে। ঠোঁট দুটি সামান্য কাঁপছে। সওয়াল করার আগে বুঝি সব কবুল করে বসে।

এমনকি কোন পাখি আছে ঝড়ের হাসটে যে পাখির পাখার কোন একটা পালক খসে গেলেও ডানায় মোচড় লাগলেও ঝড়ের পূর্বাভাসে ডানা গুটিয়ে যে বাসায় ফেরে না? বরং ঝড়কে ডেকে আনবে বলে উর্ধ্বে উঠে যায়? পালক খসার অভিজ্ঞতা আবার আস্বাদ করবে বলে ঝড়ের মুখে নিজেকে খানিকটা ছেড়ে দেয়? তেমন কোন পাখী আছে কিনা আমার জানা নেই। যদি থাকতো তা হলে হরমোহনের মনটা বোঝাবার জন্য সে পাখির নাম আমি উপমা হিসেবে ব্যবহার করতাম।

হাত দেখার ছলে আমি এইবার নির্দ্বিধায় সোজা বললাম, তোমার ভাগ্য এতদিন ফেরা উচিত ছিল। কপাল পাথর চাপা আছে কেন জান?

—কেন বাবু?

বলে সে হাসল।

—তুমি খারাপ জায়গায়, খারাপ মেয়ে মানুষের কাছে গিয়েছিলে। তাই না?

—হ্যাঁ বাবু।

—কবে?

সঙ্গে সঙ্গে সে উত্তর দিতে পারল না। উত্তর দিতে বোধ হয় তার কথা বেধে যাচ্ছিল। সংকোচ, জড়তায়, হাসিটাই সে বিলম্বিত করে রাখল।

—হাসছো যে?

তাকে নিয়ে গল্পের উপকরণ সংগ্রহে আগ্রাহী আমি বুঝি খানিকটা অধৈর্য হয়ে পড়েছিলাম।

এবার আমার আশ্চর্য হওয়ার পালা। আমার ধারণা ছিল যে, খারাপ জায়গার কথা আমি বলতে চেয়েছি সেইখানে যাওয়ার অভিজ্ঞতা তার নতুন নিশ্চয় নয়। চারপাশে কিছু কিছু অভ্রসন্ধানদের তো দেখেছি। আর মাথায় খাটো এই ছত্রিশ বছরের অশিক্ষিত মানুষটা তো সামান্য দুইপায়ে ধারা দিং। তা হলেই বা। আমি অভিভূত হলাম এই কথা জেনে যে এইমাত্র সেদিন সে প্রথম গেছে। জীবনে প্রথম। থিয়েটারের দিন মক্কীরাণী যখন তাকে নিজস্ব সাজঘরে ডেকে নিল সেই তখন থেকে একটানা দশ দিন যে দারুণ তুফানে সকলের অলক্ষ্যে তার পাখার পালক খসেছে, ডানায় মোচড় লেগেছে, সেই তুফানটাই পুরো মাত্রায় বাজার থেকে সওদা করার লোভে গিয়েছিল সে।

চরিত্রকার বললেন, আমাদের গল্পের নায়ক যদি লেখক হতো কিংবা সাহিত্যের সৌখিন পাঠক হতো তাহলে যে বাজারে সে গেল সেখানের পরিবেশ ইত্যাদির একটা মোটামুটি বর্ণনা আমরা পেতাম। সে সব তোমরা কল্পনা করে নাও। আর ধরে নাও, যে মেয়েটির কাছে সে গিয়েছিল, তার নাম গোলাপ।

হরমোহন তখন বলছে, আমি চলে এলাম।

—কেন?

—আমার কাছে জানতে চাইল আমি বিয়ে করেছি কি না।

আড্ডায় একজন গল্পে বাধা দিয়ে হাসতে হাসতে বলল, সবাই দেখছি ওকে এক প্রশ্নই করে।

চরিতকার বললেন, হরমোহন আর গোলাপের মধ্যে যে সব কথাবার্তা হয়েছিল তা আমি মোটামুটি নাটকের মত সাজিয়ে দিচ্ছি। হয়তো হুবহু 'ডায়লগ' বলতে পারবো না। তবে কথা দিচ্ছি, কোন রং চড়াবো না।

গোলাপ—বিয়ে করবে না তুমি ?

হর—হুঁ। [কথাটা বলে সে নিশ্চয়ই হেসেছে]

গোলাপ—আমার কিন্তু অসুখ আছে।

হর—তা আমি কি করবো ?

গোলাপ—রোগ তোমারও হবে।

হর—কেন ?

গোলাপ—বারে, আমার কাছে এসেছো যে। তোমার থেকে তোমার বউর হবে। বউর হলে তোমার ছেলেরও জন্ম থেকে অসুখ হবে।

হর—কি অসুখ ?

গোলাপ— কানা বা অন্ধ হবে। [হরমোহন প্রস্থানোদ্যত] ওকি, চললে যে। এখানে সব্বাইকার রোগ আছে। আমি মুখ ফুটে বললাম কিনা। সবাই লুকিয়ে রাখবে।

হর—আমি বাড়ি চলে যাবো।

গোলাপ—এতক্ষণ যে বসে বসে গল্প করলে। টাকা দেবে না ? মাগো, খাবো কি ?

হর—টাকা লাগবে বুঝি ? আচ্ছা—[সে কাপড়ের খুঁটে হাত দিল]

সমালোচক বন্ধু প্রশ্ন করল, ঘটনার তাৎপর্য কি ? মেয়েটাও ব্লাক দিল ওকে ? কেন ?

চরিতকার বললেন, তোমার দেখছি তাৎপর্য বাতিক আছে হে। সুতরাং তুমি ওসব খোঁজো। আমি শুধু ভাবছি যাযাবর খাটো মানুষটা এক জায়গায় কত সীরিয়স। এই সব জায়গায় এসে যদি তার রোগ হয়, আর তাই যদি তার ভবিষ্যত বংশধরেরা অন্ধকানা বা অন্ধাদ্ধ হয়, এই কথা মনে হওয়া মাত্র যে পাঁকের মধ্যে নেমেছিল, নিমেষে নিজেকে উঠিয়ে নিল সেখান থেকে। কেবলমাত্র অজানা ভবিষ্যতের কথা ভেবে ও তাকে সুন্দর করার জন্য যে লোক নিজেকে শাসন করে, নিয়মে বাঁধে তাকেই তো চরিত্রবান বলে।

সমালোচক বলল, যদিও হরমোহন, তাহলেও এই ব্যাপারটায় তার মধ্যে একটা ক্লাসিকাল দৃষ্টিভংগি দেখা যাচ্ছে।

চরিতকার বললেন, হাত দেখাতে বসে এই ভাবে সে কিছুই গোপন করল না। গিয়েছিল কেবল টাকা দিয়ে চলে এসেছে। বর্ষিতঃ সত্যি বলল সে। আমি ওর অতীত বলে দিয়েছি। অনাগত ভবিষ্যতের সব বলে দিতে পারি, এই বিশ্বাস, এই ভরসায় আমার হাতের মধ্যে নিজের হাত রেখে চোখ তুলে বলল, 'আর তো কোনদিন যাই নি বাবু। এতেই কি পাপ হলো' ?

সে কথার উত্তর না দিয়ে বললাম, তুমি একটা শাঁখের আংটি পরো যে। তোমার ভালো হবে।

শাঁখের আংটি সে পরদিন ধারণ করেছিল। গত ক'মাস কাজ করার সময় পর পর চারটে আংটি ভাঙার পর, আর সে কেনে নি।

সেদিন হাত দেখার শেষ পর্যায়ে সে আমায় যে প্রশ্ন করেছিল একমাত্র সে-ই তা পারে। বলেছিল, আমার বিয়েটা কবে দেখলেন না ?

—হবে। এই সামান্য মেরী।

চরিত্রকার বললেন, হাসিটা যদি তোমরা দেখতে।

* * *

এ সব অনেকদিন আগের কথা। এই বিশেষ ঘটনার কথা কেউ জানে না। আমি ছাড়া।

সবাই অবশ্য এ কথা জানে যে সে থিয়েটারের দিদিমণির বাড়িতে কদিন ছিল। এই তার দোষ। তাইতো গতকাল তার বউদি, খোঁটা দিয়ে বলেছে, 'যাও না গো, তোমার সেই থিয়েটারের দিদিমণির কাছে গিয়ে থাকো না।'

॥ তেরো ॥

ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে একটা পথ হেঁটে তার জামা কাপড় ভিজেছে। গা-ও। স্নান করার পর ভেজা গামছা নিংড়ে নিলে যেমন হয় তার কাপড় জামার অবস্থা হয়েছে অনেকটা সেই রকম। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। এতটা পথ হেঁটে পেটের ক্ষিদে কুই কুই করা বন্ধ করে যেন হঠাৎ মেরে গেছে। বিড়ি আর ভালো লাগছে না। জিবে খস্ খস্ করছে। এদিকে বিড়ি না ধরালে যেন পা আর চলতে চাইছে না। বিড়ি খাচ্ছে। খালি পেটে ধোঁয়া গিয়ে যেন মাঝে মাঝে পাক দিয়ে উঠছে।

প্রায় সওয়া ঘণ্টার মত পথ হেঁটে যজ্ঞেশ্বরের বাড়ির কাছে এলো সে। যাবো কি যাবো না ভেবে, ডাকবো কি ডাকবো না চিন্তা করতে করতে অবশেষে ডেকেই বসল, খুড়া, খুড়া হায়?

যজ্ঞেশ্বর ছিল।

ঘরের মধ্যে পা দিয়েই হরমোহনের যেন শীত করার মত হলো। রান্না ঘরে চুলোর ধারে গিয়ে তাবীজির সামনে দাঁত বার করে বসল সে। তারপর হাত সেঁকতে লাগল। আঙুলগুলো জলে সাদা হয়ে কুঁকড়ে কুঁকড়ে গেছে। আগুন না পেলে সোজা হবে না।

—চা উ পিবো?

—হলে তো ভালোই হয় খুড়া।

বৌদির ছুঁড়ে দেওয়া পুঁটলিটা সঙ্গে আনে নি বলে এতক্ষণে একবার আফশোষ হল হরমোহনের। পুঁটলিটার মধ্যে আর একটা জামা কাপড় নিশ্চয়ই আছে। ও এক জামা কাপড়ে এক সপ্তাহ চালায়। শনিবার দিন ময়লা কেচে রোববার সকালে আগের সপ্তাহের কাচাগুলো গায়ে চড়িয়ে এদিক ওদিক ঘুর ঘুর করে। সপ্তাহের ডিউটি করে সেই পোষাকেই।

লাল কেডস্‌টায় কাদা লেগেছিল। সেটা সে জল দিয়ে আচ্ছা করে ধুয়ে ফেলল। তার পর একটু ইতস্তত: করে সরাসরি বলেই ফেলল যজ্ঞেশ্বরকে।

বলল, তোমার একটা কাপড় আর কোর্তা দেবে?

—কাহে?

—দেখছো না, আজ লাগছে।

—তো বৈঠ। চা পিলে। আজ ছুট্টা রহেগা।

—আর নাহে খুড়া, আমি এখন কুটুম বাড়ি যাবেগা।

—কৈ ?

—আরে ছার। সে একঠো ছার।

সহজে যজ্ঞেশ্বর রাজী হয় নি। কোথায় কুটুম, কেমন কুটুম, সে কথা দারা সিং তার কাছে ভেঙে বলে নি বলে সে তো রীতিমতো গোসা করল। তারপর হরমোহন যখন কবুল করল যে আজ রাতেই কুটুম বাড়ি থেকে ফেরার পথে সে যজ্ঞেশ্বরের জামা কাপড় এখানে রেখে দিয়ে যাবে, তখন গেল।

আহা, কি বাহারে জামা রে! খাকির হাফ সার্ট এখানে ওখানে সাদা সুতোর তিপ্পু করা। সেদিন যজ্ঞেশ্বর তা তাঁজ করে রেখে দিয়েছিল কোন একটা কিছুর তলায়। সেই জামা হরমোহনের হাঁটু ছাড়িয়ে নামল। গায়ে হল হল করছে। করুক। বুতিটাও বদলে নিল। তারপর একটা ভাঙা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে নতুন করে চুল আঁচড়ালো।

তার সাজ পোশাক দেখে আদর করার ভাগিতে যজ্ঞেশ্বর বলল, বারে, চিক্কিয়া।

চা এল এর পর।

—বুড়ি, তাজি উজি নেই যে ?

অন্দরের উদ্দেশে জানতে চাইল যজ্ঞেশ্বর।

হঠাৎ যেন তাড়া লেগে গেল হরমোহনের। বলল, না, না। আর কিছু নেই লাগে গা। এই অনেক ছার।

খালি পেটে চা গিয়ে পড়ল যেন ছ্যাক করে। পেতলের গেলাসে চা দিয়েছে যজ্ঞেশ্বরের বউ। গ্লাসটাও গরম লাগছে। জামার প্রান্ত দিয়ে গ্লাস ধরেছে সে। ফুঁ দিয়ে দিয়ে চুমুক দিচ্ছে। আর মাঝে মাঝে হলদেটে দাঁত বার করে কিক্ কিক্ করে হাসছে। সবটা চা পেটে গেল তার। মনে হলো যেন কোন কালে তার খিদে পায় নি। পেট যেন তার ভরা।

চিন্তা রায় বাড়িতেই ছিল।

সেই পায়ে চলা পথ দিয়ে টুক টুক করে এগিয়ে, খড়ছাওয়া মাটির ঘর, ইট বেরকরা বাড়ি, শিমু গাছ, বোপ ইত্যাদি দু'পাশে রেখে সে বাড়িটার কাছাকাছি পৌঁছে গেল। কোম্পানির লেবার কোয়ার্টারে যাবার মতই ঝিমঝিমির বাড়ি যাবার রাস্তাটাতেও কাদা হয়েছে। সামলে চলতে হচ্ছে তাকে।

সেই আড়াইকুঠির বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে হরমোহন ইতস্তত: করতে লাগল। ওইতো সামনে সেই বারান্দা। ওই বারান্দায় শতরঞ্জের বিছানায় কত নির্জন মধ্যরাতে ও একা বসে জেগেছে। নিশাচর পাখি, ভাঙা চাঁদ, ছিটোনো নক্ষত্র, গাছপালার রোমশ অন্ধকার মাথায় ছোট মানুষটাকে ভয় দেখায় নি। মুহ্যমান করে নি। হরমোহনের বৌদি যেমন ভাবে শিল নোড়া দিয়ে পিষে পিষে মশলা বাটে, এই বারান্দায় সেই সব রাত্রে তার মনে হতো তার বুকের মধ্যে কে যেন অমনি ভাবে কি যেন পিষে পিষে বাটছে। এমনি দুঃসহ দু'রাত্রে অন্ধের মত সে এই অন্ধকারের এক জানালায় উঁকি দিয়েছে।

দরজার একটা পাল্লা সামান্য খোলা। ভিতরে মানুষ আছে বোঝা যায়। কিন্তু দেখা যায় না। একটু এগিয়ে দরজায় সামান্য কড়া নাড়লে বা কারুর নাম ধরে ডাকলে তবেই না ভেতরের মানুষ এগিয়ে এসে দরজা খুলে দেবে ? সে ওসব কিছুই করল না। দরজা থেকে ধীরে ধীরে জানালার দিকে এগিয়ে গেল। ঠিক জানালার পাশে গিয়েও দাঁড়াল না। বলা চলে সে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার বড় বড় কান দুটো খাড়া হয়ে উঠল আপনি। ঘরের মধ্যে খিল্ খিল্ করে হাসছে ঝিমঝিমি। হাসছে 'জামাইবা'। আবার জামাইবা ? গলা চিনতে তার একটুও ভুল হলো না।

এতক্ষণে, এই প্রথম তার মনে হল, কেন এলাম ?

—কে ? কে এখানে ?

দরজা খুলে বাইরে এলো শৌরীন।

—আমি, এই বলে সে হাসল। চুল আঁচড়ানোর জন্ত তার মুখখানা লম্বাটে লাগছে আরো।

আরে, এসো এসো। ভিতরে এসো, স্বাগত জানাল শৌরীন। তার পর ভিতরের দিকে মুখ করে বলল, দেখে যেখো, কে এসেছে।

চিত্রা শৌরীনের পাশে এসে দাঁড়াল।

—এসো হরমোহন। কি খবর। ভেতরে এসো।

আবার হেসে দু'জনকে একই সঙ্গে সেলাম করল সে। যেভাবে শৌরীন দরজায় এসে তাকে গ্রহণ করল, ও যেভাবে চিত্রাকে ডাকল তাতে চিত্রার মাথায় সিঁদুর, হাতে নোয়া দেখলে হরমোহনও বোধহয় আশ্চর্য হতো না। কিন্তু কোথায় কি ? দিদিমণি যে কে সেই। রঙ্, চঙ্, মাখা নেই বলে মুখটা ঘাটা ঘাটা লাগছে, এই যা তফাৎ। আর দিদিমণির চেহারাটা যেন আরো একটু রোগা কাহিল দেখাচ্ছে। খালি খালি লাগছে আগের চেয়ে।

—এতদিন আসোনি যে, চিত্রা বলল।

যেন তাকে বারবার অনুরোধ করা হয়েছিল এখানে আসার জন্ত। তাই এই অনুযোগ। যদি সে দিনের সেই কথা সে আর একবার মনে করিয়ে দেয় তাহলে ওদের এই হাসি হাসি মুখে আপ্যায়নের ঘটা থাকে কোথায় ? কিন্তু ওরা বোধহয় জানতো যে হরমোহন সে কথা তুলবে না। তুললও না। আর আপ্যায়নের ঘটা দিয়ে ওরা বুঝি পরোক্ষভাবে সেই ঘটনার সবকিছু ভুলে যেতে অনুরোধ করল।

শুধু বলল, আসা হয় নি। আপনার কি শরীর খারাপ হয়েছিল ?

চিত্রা বলল, মেরেয় কেন ? বারে, তুমি ওই মোড়াটায় বসো।

—আপনারা ?

—এই তো বসলাম।

তক্তাপোষের একটা কোনায় বসল চিত্রা।

—আমাদের ওপর রাগ করেছিলে বুঝি ?

চোখ তুলে তাকাল চিত্রা। ওর চোখ দুটি বড় বড়। চোখের পল্লব বেশ ঘন। সেদিকে একবার চেয়ে সে চোখ নামিয়ে নিল। প্রথম দিন রিহার্সাল রুমে মক্ষীরাণীকে দেখে তার মুখ যেমন কর্কশ, অনিন্দ্য মনে হয়েছিল, এই মুহূর্তে চিত্রার প্রসাধনহীন মুখখানা তার মনের চোখে তেমনি ঝল ঝল করতে লাগল। তাকে যে কি জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তা যেন পুরো তার কানে গেল না। সে দেখল শৌরীনবাবু ঘরটার মধ্যে পায়চারী করছে। থিয়েটারের দিন সাজঘরেও শৌরীনবাবু এমনি ছটফট করার মত হাঁটছিল।

পুরোনো কথার জের ধরে তার নিলজ্জ ওজিতে ধীরে, ছেড়ে ছেড়ে, হাঁফ ধরার মত গলায় সে বলল, কই বললেন না তো। আপনার কি, অসুখ বিসুখ করেছিল ?

হঠাৎ শৌরীন বলল, না হে আনন্দে।

—আজ্ঞে ?

—তোমার দিদিমণির শরীর খারাপ হয়েছে আনন্দে।

—আনবে ?

—তোমার ঝিঝিমণির যে বিয়ে গো।

এই কথা বলতে বলতে গৌরীন চিত্রার পাশ ঘেঁষে তক্তাপোষের ওপর বসে পড়ল। গৌরীন এমন কিছু বলবে বলে চিত্রা বোধহয় প্রস্তুত ছিল না। সে দাঁতে করে ঠোঁট কামড়ে গৌরীনের দিকে ভ্রূকুটির তর্জনী করল। মেঘের আড়ালে সূর্য হঠাৎ চলে গেলে যেমন হয় হরমোহনের মনে হল, তার সামনে যেন তেমনি গাঢ়তর আঁধার হল। চিত্রা বলল, তোমার জামাইবাবুও তো বিয়ে হরমোহন।

'জামাইবা' কথাটা বলার সময় গলাটা যেন খেলিয়ে দিল চিত্রা।

বিয়েটারের দিন হরমোহনের যে নেশার ঘোর লেগেছিল এখন যেন সেই নেশার অবসাদ তার মাথায় চেপে বসেছে। ক্যাল ক্যাল করে চেয়ে সে বলল, তাই বুঝি ? কোথায় ?

—বলতো, কোথায় ? বলে হাসি মুখে এগিয়ে এলো গৌরীন।

—আজ্ঞে, আমি কেমন করে জানবো বলুন।

—পারলে না তো ?

—না।

—বেশ। এঁকে ঝিঝিমণি বলবে না বৌদি বলবে সেটাই তুমি আগে ঠিক করে নাও।

চিত্রা তার হাতের মুঠি দিয়ে একটা কিল বসাল গৌরীনের পিঠে।

—বুঝলে ?

এতক্ষণে তার সব কটি দাঁত বার করে হাসল হরমোহন।

সে হো হো করে হাসতে লাগল গৌরীন।

তার হাসির রেশ শেষ হওয়ার আগেই উঠে দাঁড়িয়ে মক্কীরানীর লিলিপুট বলল, আমি তা হলে চলি আজ।

—সেকি, কেন এসেছিলে বললে না তো, চিত্রা আগ্রহ দেখাল।

—বলবো ?

—নিশ্চয়ই বলবে।

—আপনারা যদি হাসেন।

—না। না। হাসবো না। বলো।

—বলছিলাম কি,—অর্ধপথে থেমে গেল সে।

—বারে, তুমি নিজেই তো হাসছো।

—বলছিলাম কি, আপনাদের বিয়ের দিন আমায় বলবেন।

এবার আর চিত্রা উত্তর দিল না। গৌরীন বলল, ও, এই কথা ? তোমার নেমন্তন্ন আজই রইল। আমি নিজে আবার তোমায় বলে আসবো।

—আচ্ছা, তাহলে আজ যাই বাবু।

এই বলে সে যাবার উদ্যোগ করতেই গৌরীন বলল, শোন, শোন—

—বলুন।

—বিয়ের কথা তো তুমি এখানে এসে শুনলে। সেই কথাটাই বলতে এসেছিলে যাদে ?

শৌরীনই সরব করে দিল। বলল, তোমার অত কোন কথা ছিল। চেপে যাচ্ছ কেন বাপু?

—কথা একটা ছিল, কোনমতে বলল সে।

—তা বলো তোমার কথা।

—কথাটা দিদিমণির কাছে।

—ওহ, গো, তোমারও দেখি প্রাইভেট কথা। আচ্ছা চিত্রা, এই শহরের সবাই কি তোমার সঙ্গে কানে কানে কথা বলে?

—শৌরীন।

—কি হলো, আমি কি মিথ্যে বলেছি? বেশতো, একেই জিগ্যেস করো না। কি হে এঁর সঙ্গে প্রাইভেট কথা আছে না?

—পাইরেট?

—দেখেছো, এ ঠিক কেবার রায়ে তোমার সোনার রোল দেখেছে। 'কারতালো' আর পাইরেট গুলিয়ে ফেলেছে বোধ হয়। সত্যি চিত্রা, সোনার পার্টে তোমায় একেবারে সোনার প্রতিমার মত দেখায়। তাই না হরমোহন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—দেখেছো তো, লোকটা একগাল হাসছে।

চাপা গলায় আবার ফুঁসে উঠল চিত্রা, ছিঃ। ছোট। তুমি খুব ছোট শৌরীন।

হাসতে হাসতে শৌরীন বলল, কোনটা? আমি খুব ছোট লোক? না আমি খুব ছুটি?

কোনমতে একটু খানি হাসল চিত্রা।

—দেখলে তো। কত সহজে তোমায় রাগানো যায়। আমি তো ভাবছিলুম এই বুঝি আমার সঙ্গেই বাত্তিক নিয়ে বন্ধক কিম্বা বক্তৃতা দাও।

বলতে বলতে শৌরীন আবার হাসল।

এই ভাবে তার সামনেই চিত্রা আর শৌরীন তোদের জীবনের ভিতরের কুঠরীর যেটা চাপা পড়ে আছে তার তালাটা একটু খুলেই আবার বন্ধ করে দিল। দু'জনেই হাসছে।

চিত্রা বললো, কই, বলো হরমোহন।

বললো হরমোহন। বলার আগে পর্যন্ত জানত না যে এই কথাটাই সে বলবে। এই কথাটাই মাথার মধ্যে ঘুরিয়ে যাবে। এবার আর কোন ভূমিকা না করে অবলীলায় বলল, আমার চাকরিটা পাকা করে দিতে পারেন কুম্পানীতে?

তোমার চাকরি আমি পাকা করবো কি করে?

জানেন দিদিমণি,

অর্ধপথে থেমে একবার সেই নিঃশব্দ হাসি হেসে বলল, আমি বেডিকেলে আশঙ্কিত হয়ে যাই। ওষুধে খুব রুচি কিম্বা। আপনার সঙ্গে তো অনেকের চেনা জানা আছে। যদি ডাক্তার বাবুকে আমার জন্যে একবার বলে দেন।

বার চারেক থেমে কথাটা বলল সে। বলা যাচ্ছে কথা শেষ করে সে হাসল।

চরিত্রকার বন্ধুরা বললেন, মক্কীরাণী সেদিন তাকে চা খাওয়ার জন্য বলেছিল। কিন্তু তা সে গ্রহণ করে নি। একটু ঘুরে ঘরোয়ানো মেরি করে রাত সাড়ে নটা আন্দাজ সে গিয়েছিল যজ্ঞেশ্বর কাহারের বাড়িতে। কুটুম বাড়ী থেকে আসছে বলে সেখানেও তার কোন খাওয়া হয়নি। সারা রাত সে খালি পেটে পড়ে থাকল, কাহারের বাড়িতে। বলল, রাত তো অনেক হয়া, আজ আবার কোথায় যাবেগা, খুড়া ?

যজ্ঞেশ্বর বলল, হাঁ হাঁ, এহি শো যা। 'আরাম কর্'।

দাদার ঘরে থেকে বিতাড়িত, অভুক্ত হরমোহন সেদিন সারারাত এক পেট খিদে নিয়ে যজ্ঞেশ্বরের দাওয়ায় কাটিয়ে পরদিন আবার টুকটুক করে হেঁটে কারখানায় কাজ করতে গেল।

মক্কীরাণী কোম্পানীর ডাক্তারকে চিনত কিনা, চিনলেও তার জন্য সুপারিশ করেছিল কিনা তা আমরা জানি না। হয়তো করেছিল। হয়তো করে নি। কিন্তু এই ঘটনার সাতদিন পরেই চাকরি পাকা হলো হরমোহনের। কোরম্যানরা সকলেই তো পছন্দ করে এই মজার লোকটাকে। পাকা হওয়ায় বোনাস, ফ্রি এই সব মিলিয়ে সপ্তাহে দশ টাকার মত বাড়ল তার। দাদাও তাকে আবার ডেকে নিয়ে গেল। হরমোহন বলল, ভাকবে না ? আমার যে ঘর এখন বাড়লো গো।

অ্যাঙ্গ্লো একজন বলল, ঠিকই বলেছে। বাংলা দেশের ছেলেরা পাত্র। হলেই বা সুইপার, আজকাল কারখানার লোকেদের বিয়ের বাজারের দাম বেশি, জানো ? চট করে যাও ওর বিয়ে।

চরিত্রকার বললেন, আহা, একটা বিয়ে তো বারো আনা সেরেই দিলাম হে। হরমোহনের বিয়েটাও যথা সময়ে দিচ্ছি।

দু'জন এক সঙ্গে বলল, বিয়ে চাই। বিয়ে। হরমোহনের বিয়ে।

সমালোচক বাধা দিয়ে বলল, সৌরীন আর চিত্রার ব্যাপারটা তুমি বারো আনা সেরে রাখলে বটে তবে আকাশে মনে হচ্ছে ওদের বিয়ের আকাশে অনেক মেঘ জমে আছে। বিয়ের বাঁশী না বেজে হঠাৎ বাজও পড়তে পারে। ঠিক আছে, তুমি চালিয়ে যাও।

॥ চৌদ্দ ॥

চরিত্রকার বললেন, এখান থেকে এই উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের শুরু। ধরে নাও, প্রথম পাঠের নাম যদি হয় 'চাকরী স্থায়ী হওয়ার আগে', তাহলে এই পর্বের নাম 'চাকরী স্থায়ী হওয়ার পর।' আজ তোমাদের মুখে মুখে যা শোনাচ্ছি তাতো একটা খসড়া মাত্র। দিনের পর দিন কারখানার খুব কাছথেকে তাকে দেখে নানা গল্প করে, আর চারপাশের পরিচিত পাঁচজনের কাছে তার জীবনের নানা ঘটনার কথা শুনে তবে এই খসড়াটা খাড়া করছি। এমন কি এর জন্য মক্কীরাণীর বাড়ীতে সম্প্রতি বার দুই তিন গেছি।

—চিত্রার বাড়ীতে তুমিও গেছ ?

—সম্প্রতি।

—হলেই বা সম্প্রতি। গেছে তো। ব্যাপার কি ?

—এবার যে গল্পটার অন্যরকম গন্ধ ছাড়ছে হে। এই নাও সিগারেট। খাঁ করে খুলে বলতো।

—বৎস, ধীরে। বল, বললেই তো আমি গল্পের শেষটা দুধ করে বলে দিতে পারি না।

পৃষ্ঠকর্তার চঙে সুর দিয়ে চরিত্রকার বললেন, ধৈর্য ধর হে চিত্তে ফিলব মুরারী।

মাস ছয়েক পর একদিন সকাল দশটার সময় ডিপার্টমেন্টে ভীষণ হৈ হৈ। হাসি, কথা, যেন কাজের মধ্যে ঢিলেমি এনে দিয়েছে। কি যেন এক মজা নিয়ে মেতে উঠেছে সবাই। কি ব্যাপার? হলো কি?

হরমোহনের সিক্ রিপোর্টটা লেখা হয়েছে বাংলায়। আবেদনকারীর বক্তব্য শুদ্ধ ইংরেজীতে লেখা বোধ হয় কারো ক্ষমতায় কুলোয়নি। তাই, আগাগোড়া লেখা বাংলায়। হরমোহন মুখে বলেছে। সেই কথা গুলোই কেউ লিখে দিয়ে থাকবে। দরখাস্তটা এই—

মাননীয় মহাশয়,

অধীনের বিনীত নিবেদন এই যে, আমি এইমাত্র জানিতে পারিলাম যে আজই আমার বিবাহ। সে কারণে আমি নিতান্তই অসুস্থ বোধ করিতেছি। শরীর এত অসুস্থ হইয়াছে যে আমার ভয় হয়, আমি হয়তো দ্বিতীয়ার্ধে, অর্থাৎ বেলা একটার পর আজ আর কাজে আসিতে পারিব না। অসুস্থতার জন্য এই অনুপস্থিতি আপনি নিজগুণে মার্জনা করিবেন ও আজকের এই অর্ধদিবস আমায় 'সিক্‌লিভ' দিবেন। আরও একটি প্রার্থনা আছে। আগামী কাল ও পরশু এই দুই দিন অনুগ্রহ করিয়া আমায় ছুটি মঞ্জুর করিবেন। কেন না বিবাহের কারণে দুই দিন ছুটি না পাইলে যারা যাইব।

ইতি। আপনার বিশ্বস্ত হরমোহন ঘোষ।

বাঁকা বাঁকা কাঁচা অক্ষরে নাম সই করেছে। বলা বাহুল্য বাংলায়। ডিপার্টমেন্টাল ম্যানেজারের টেবিলে দরখাস্তখানা পড়ে আছে স্বচক্ষে দেখলাম। ভাবলাম, ওর দাদাকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখি ব্যাপারটা কি।

মণীন্দ্র ঘোষকে বললাম, চারদিকে হৈ হৈ। হরমোহনের কি সত্যি বিয়ে নাকি?

—আর বলবেন না। ওর বিয়ে দিচ্ছি।

সুপুরি খাওয়ার জন্য হোক বা অন্য যে কোন কারণে মণীন্দ্র ঘোষের ঠোঁটের দুইপ্রান্ত কষে, লাল হওয়ার মত লাল হয়ে গেছে।

আমি বললাম, এটা কি ভালো হচ্ছে? এই তো সবে পার্মানেন্ট হলো। তা ছাড়া হঠাৎ ক' ঘণ্টার মধ্যে বিয়েই বা ঠিক হয় কি করে?

ব্যাপারটা শোনা গেল। আজ নাকি বিয়ের লগ আছে। আর এই লগে কাছাকাছি রিফুজী কলোনীর এক বাপ তার এক মেয়ের বিয়ের আয়োজন করেছে। এক মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করলে হবে কি, তার পরের মেয়েটি গলার কাঁটা হয়ে ঝুলছে। এই অঞ্চলের পাড়া প্রতিবেশীদের দু'পাঁচ জনকে বলেছে, যদি এই লগে এই মেয়েটাকেও দিতে পারতুম, তা হলে মন শান্ত হতো। এই উদ্বাস্তু কলোনী থেকে কয়েকজন কারখানায় কাজ করতে আসে। তারা কথা দিয়েছে যে, দ্বিতীয়টির জন্য আজ সন্ধ্যার লগে পাত্র আনার তারা খুব চেষ্টা করবে। উদ্যোগ করে তারা কোমর বেঁধে লেগেছে। চাকরি করে, দু'বেলা দু'মুঠো ভাত মেয়েটাকে দিতে পারবে এমন পাত্র পেলেই হলো। হরমোহনের আগে ওরা তিন জনকে ধরেছে। তারা তো আর হরমোহন নয়। সবাই 'না' করেছে স্পষ্ট। কেবল হরমোহন বলেছে, তোমরা দাদাকে বলো।

—আর আপনি রাজী হয়ে গেলেন -

আমি মণীন্দ্র ঘোষকে জিজ্ঞাসা করলাম।

—পাঁচ জনে ধরেছে, কি করি বলুন। এতগুলো লোকের কথা তো আর ঠেলতে পারি না।

ভালো। হবেও বা। মনে মনে ভাবলাম।

মণীন্দ্র ঘোষ আরও বলল, তা ছাড়া কি জানেন, ভাইএর বিয়ে না দিলে আমার কর্তব্য থাকে না। মেয়ের বাপ যদি একশো টাকা দেয়, তা হলে আর আমি 'না' করবো না। দেখি। বিয়ে হলে তো আজই হবে। আর পাকা দেখা, দেনা পাওনা সব আজ হবে। তা ছাড়া দশ পনেরো জন লোকও তো যাবে বিয়ে দিতে।

আমার দিকে চেয়ে মণীন্দ্র ঘোষ বলল, আপনিও চলুন না।

—মাপ করুন ভাই। আমার অনেক কাজ আছে।

হরমোহনের বিয়ে তা হলে সত্যিই হচ্ছে। আজই। মনে মনে শিউরে উঠলাম। এখনো লোকটা কোয়ার্টার পায় নি। নিজে বারান্দায় রাত কাটায়। ওর বউকে নিয়ে হয়তো ওখানেই শোবে। ওই তো দাদা। ওই তো বউদি। কবে দেয় তাড়িয়ে ঘর থেকে। পাঁচভূতে মেয়েটাকে ছিঁড়বে আর কি।

হরমোহন ছুটি নিলে। তার মানেও। নেমন্তন্ন হয় নি তখনো কারোই। পাকা কথা হওয়ার পর, বিকেলে এসে মণীন্দ্র বিশেষ দশ পনেরো জনকে বলে যাবে। কিন্তু নিমন্ত্রণ না হলেও আরো জন দশ সিক রিপোর্ট করে ডুব মেরে ছিল। তারা হবু বর ও বরকর্তার পিছু পিছু গিয়ে ঘটনার আগাগোড়া বিস্তারিত ভাবে দেখতে চায়। বিশেষ, বিয়েটা যখন 'দাদা সিং' এর। কেবলমাত্র একজনকে হবু বর নিজে চুপি চুপি বলেছিল, তুমিও আমার সঙ্গে চলো খুড়ো। সিক্ লাগাও।

—'যবে বিবাহে চলিলা ত্রিলোচন
তার কত শত ছিল আয়োজন……'

চুল ছাঁটা হলো। ঘাড় চেঁছে উঠে গেল মাথার অর্ধেক পর্যন্ত। গোটা মুখে ক্ষুর বুলোনো হল। ওরই মধ্যে পরিষ্কার একটা জামা চড়িয়ে পায়ে জুতো দিয়ে চলল হরমোহন। বয়ের চেয়ে বরকর্তার সাজটাই চোখে লাগছে বেশী। মণীন্দ্র ঘোষ তার বহুদিনের পুরোনো সিল্কের পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়েছে। দশ বারো জন যারা জুটেছে, তারা চলেছে ওদের বিয়ে।

কনের বাড়ি পৌঁছে ওরা কাছাকাছি একটা বাড়িতে বসলো। ব্যবস্থা কনের বাবাই করেছিল। একটু পরেই বরের দাদাকে কনের বাপ পরম সমাদর করে ডেকে নিয়ে গেল পাকা দেখা আর পাকা কথা সারতে। সেই অবসরে বরকে ঘিরে বসা অনাহূত কিন্তু আগত বরযাত্রীর দল বলল, একটা গান শোনা হরমোহন।

—গান?

—হ্যাঁরে, বিয়ের আগে গাইতে হয়।

আর বলতে হলো না। কোন্ আদিকালে গ্রামের যাত্রা দলের কাছে ছেলেবেলায় স্বাভাবিক কৌতূহলে ঘুর ঘুর করে ও তুলে নিয়েছিল একখানা গান। সেই যাত্রাদলের সখিদের চেয়েও মর্মান্তিক গলায় ও সুরে ও ধরল, 'যমুনা পুলিনে, বিজনে বিপিনে, কাঁদে রাধা বিরহিনী।'

—জোরে গা। কনে শুনছে।

সে আরো জোরে চেঁচাতে লাগল।

ইয়ার বক্সীদের কেউ একজন বাইরে থেকে এলো টুকটুকে লাল এক ছোট্ট পোশাক নিয়ে। বন্ধের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এটা রাখ রে।

—কি হবে?

—রাখ না, রাখ। রাখতে হয়।

একজন উৎসাহভরে সেই ফুলটা নিয়ে ওর কানে গুঁজে দিল। হাসল হরমোহন।

চরিতকার বললেন, বারবার আমি গল্পের মাঝখানে নিজের কথা জুড়ে বাধা দিচ্ছি বলে, আমার নিজেরই খারাপ লাগছে। এই গল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে আমি নিজেই নানা দিক থেকে এসে গেছি বলেই এমনটা হচ্ছে। একবার হরমোহন আমায় এক গল্প শুনিয়েছিল।

অসুস্থ একজন অধৈর্য হয়ে বলল, কত আর ওকে নাকে ঘড়ি দিয়ে ঘোরাবে বাবা? বিয়ে কিংবা—ওর নাম কি—ভালোবাসা, কোনটা যে হয়েও হয় না। যে কোনটা শেষ করো আগে।

—আমি কি আর ইচ্ছে করে ওকে নাকে ঘড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছি? ওর জীবনের কথা যথাসাধ্য যথাযথ করে তোমাদের শোনাচ্ছি বলেই তোমাদের ধৈর্য থাকছে না। দেখো, সত্যকে অবিশ্বাস করাই সবচেয়ে সহজ। কেননা তার মত আশ্চর্য আর কিছুই নেই। শোনই না, হরমোহনের শোনানো গল্পটা। হয়তো তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। কি হে, সমালোচক?

—শুরু করুন বাবু, কলুর ছেলের গল্প।

—কলুর ছেলের গল্প?

—হ্যাঁ বাবু।

এক দেশে এক রাজা ছিল। সেই রাজার অনেক জমি, অনেক টাকা, অনেক সব কিছু। সেই রাজারই এক গাঁয়ে এক কলু ছিল। সেই কলুর ঘরে ঘানি ছিল, আর বলতে ঘানি টানত। কলুর বড় ছেলের বয়স ছিল সতেরো। সে ঘানির কাঠের ওপর 'চিৎপটাং' হয়ে শুয়ে শুয়ে গান গাইত। একদিন রাজার হাতি চলেছে, রাজা চলেছেন, সেই গ্রামের কলুর বাড়ির কাছ দিয়ে। রাজা বললেন, 'কে গান গায়'?

সবাই বললে, কলুর ছেলে।

রাজা বললেন, বেশ বেশ।

পরদিন হুকুম এলো ছেলেকে নিয়ে কলুকে রাজসভায় যেতে হবে। রাজামশায় গান শুনবেন। সবাই বললে, কলুর ভাগ্য ফিরলো।

রাজসভার সাজানো আসরে বাপ আর বেটা বসল। রাজা বললেন, গান করো।

গাইতে গিয়ে মুখ দিয়ে আর আওয়াজ বার হয় না। মুখে যেন ফুলুপ পড়েছে।

—কই, গা, বাপ বললো।

—কি হল হে, জানতে চাইল সভার লোকেরা।

—গান করো। ভয় কি? রাজা বললেন।

ভ্যাঁ করে আওয়াজ বার হলো। গান নয়। কাঁদছে। তাই দেখে তার বাপ তাকে এই মারে তো সেই মারে। রাজা মশায় তাকে কাছে ডেকে আদর করে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে রে?

কলুর ছেলে বলল, হুজুর আমি ঘানির ওপর না হলে গাইতে পারি না।

হরমোহন বলল, তাই বলছিলুম কি বাবু, আপনি হলেন সেই রাজার মত অনেকটা।

আমি বললাম, রাম কহো। কোথায় রাজা আর কোথায় আমি? কি কথার কি উত্তর। তোমার কাছে জানতে চাইলাম সবাই তোমায় বিয়ে নিয়ে খেপায় কেন? তোমার কি বিয়ে করার খুব ইচ্ছে?

—বোকলেন না?

—না বাপু। বুঝিনি।

—দেখুন বাবু, চাকরি যতক্ষণ করি বিয়ের কথা আমার মনে থাকে না। কিন্তু বাড়ি ফিরে গেলেই মন ছুঁক ছুঁক করে। বাঁচতে হলে চাকরি করতে হবে। চাকরি করলে বাড়ি যেতে হবে। বাড়ি গেলে এই সব মনে পড়বে। ওই জন্যই ভাবি, শালা বিয়ে একটি করেই ফেলি। মাপ করবেন ফস্ করে 'শালা' বার হয়ে গেল।

কথা শেষ হওয়ার আগেই হাসিতে তার দাঁত বার হয়ে পড়েছে।

চরিতকার বললেন, আবার আমরা পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরে যাই। সিকৃরিগোর্ট করে হরমোহন যাবার পিছু পিছু গেল কনের বাড়ি। সেখানে গান ধরল। বিয়ে কিন্তু হলো না। তার বাবা মণীন্দ্র ঘোষ বলে, ভাইএর বিয়েতে বাবি বলতে সে একশো টাকাই তো চেয়েছিল। মেয়ের বাপের দুখের কথা যদি মিটি হত, তাহলে এক পয়সা না নিয়েও ভাইএর বিয়ে সে এখানেই দিত। কিন্তু দুখের কথা আর ব্যাভার যার ভালো নয়, তেমন লোককে সে কুটুম করবে না।

কিন্তু খেজুর যারা বর আর বরকর্তার পিছু পিছু গিয়েছিল তারা অন্য কথা বলে। তারা বলে—

সেই পুরোনো কথা আর কি। পায়ের খুঁত নিয়ে ব্যাপার।

পরদিন নিজের সেই হাসিটি নিয়ে যথাসময়ে কারখানায় হাজিরা দিল হরমোহন। সে বিয়ে করতে যাওয়ার যত গল্প হয়েছিল, পরদিন আবার ডিটেল আসার গল্প হল তার চেয়েও বেশি। বিয়ে করতে যাওয়ার সময় সে হেসেছিল। বিয়ে বাতিল হবার পরও কারখানাতে এসেও হাসছে। একই হাসি। হাসিটা যথারীতি ছড়িয়ে গেছে চোখ থেকে দাঁতে।

॥ পনেরো ॥

চরিতকার আবার শুরু করার আগে আমাদের আড্ডা ঘরে একটি ছেলে এলো। ছেলেটির বয়স বছর চৌদ্দ। সে ঘরে ঢোকা মাত্র চরিতকার বললেন, আরে বেণু যে। এখানে? কি ব্যাপার?

—দিদি আমায় আপনার কাছে পাঠালেন। একবার চলুন।

—এ জায়গাটা তুমি জানলে কি করে? বসো।

বেণু বসল। বসে বলল, আপনাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। আপনার ভাই বলল, আপনি এখানে আছেন। রাস্তা জেনে নিলাম।

—আর তুমি এখানেই চলে এলে?

—দিদি বলেছে, আপনাকে খুঁজে আনতে। চলুন।

এই বলে দেবু দাঁড়াল।

যাবার আগে দেবু আবার বলল, ঠিক যাবেন।

আচ্ছায় সকলে চোখ বুঁজকে বসেছিল। চলে যেতেই চেপে ধরল চরিতকারকে। বলল, দেবু কে হে? চিত্রার ভাই নাকি?

—হ্যাঁ।

আরো নানা প্রশ্ন ঠেলে এলো।

চরিতকার বললেন, ওসব পরে হবে। সব কথার উত্তর একটু পরেই দিচ্ছি। তার আগে হরমোহন ঘোষের এ'জন্মের ইতিহাসের খসড়াটা আমায় শেষ করতে দাও।

তার বিয়ে নিয়ে এই তামাসা আর হৈ হৈ এর মাস দেড়েক পরেই মণীন্দ্র ঘোষের বউ মারা গেল। হরমোহনের বৌদি। মৃত্যু সম্বন্ধে তোমাদের কার কি রকম অভিজ্ঞতা আছে জানি না। বলা বাহুল্য সেই স্ত্রীলোকটি অন্তঃসত্ত্বা ছিল। সেদিন ওভারটাইম সেরে রাত দশটায় বাড়ি এসেছিল মণীন্দ্র। এসে দেখল বউ তার ছেলে মেয়েদের সঙ্গে মেঝেয় ঘুমোচ্ছে। এক বস্ত্রে শুয়ে আছে সে। বারান্দায় ঘুমন্ত হরমোহন। কাঠের জোড়াতালি দেওয়া বারান্দার দরজাটা ভেজান।

মণীন্দ্র সামান্য খেয়ে এসেছিল। ঠেলে তুলল বউকে। বলল, ঘুমোচ্ছিস?

—হ্যাঁ।

—ওরে আমার সোহাগী রে। আমি ব্যাটা খেটে মরছি আর উনি দরজা খুলে রেখে ঘুমোচ্ছেন। দরজা বন্ধ করে শুতে পারিস না?

বউ কোন উত্তর দিল না। তাতে তার রাগ আরো চড়ে গেল। বলল, কি, কথা বলছিস না যে।

কথা বলল তার বউ। বলল, দরজা বন্ধ করলে তো বলতে দরজা বন্ধ করে শুয়েছি কেন? ঘরে দেওর আছে যে।

—তাই বলে রাত্রি শুদ্ধ লোকের জন্যে দরজা খুলে শুবি?

এ'কথার কোন উত্তর না দিয়ে তার বউ হাতের শাখাটা কপালে ঠুকে মট্ করে ভেঙে ফেলল।

—অ! আবার ভেক দেখানো হচ্ছে!

তার বউ বলল, আর যদি বলবে তবে গায়ের কাপড় মেঝেয় নামিয়ে রেখে আমি সবার সামনে গিয়ে দাঁড়াব।

মণীন্দ্র আচমকা ঠাস্ করে চড় মারল তার গালে।

আর পোলার মত হাল্কা গায়ে দাঁড়ান রক্তহীন স্ত্রীলোকটা টাল সামলাতে না পেরে ধপ্ করে মেঝেয় পড়ে গেল।

বাচ্চারা জেগে গেল। বারান্দায় হরমোহন। কিন্তু কেউ কোন কথা বলল না। কোন শব্দই হলো না। হরমোহন দেখল তার বৌদি দাদাকে খেতে দিল। নিজেও চারটি ভাত আর কি একটা তরকারি নিয়ে এক কোনে বসে হাতে করে খাওয়াতে লাগল।

তারপর দাদার ঘর যথারীতি অন্ধকার।

আধঘণ্টার মধ্যেই হয় তো আবার চোখের পাতা বুজে এসেছিল হরমোহনের। ঘুম আসার আগে পাতলা তন্দ্রার মধ্যে তার কানে গেল দাদা বলছে, এ-গুলো কি বার হচ্ছে কি? এ্যাঁ? চট চট করছে—

—কি হয়েছে কি? আবার বলল তার দাদা। তারপর ঘরের একমাত্র আলোটা জ্বালিয়ে দিল।

রক্ত!

প্রতি বেড় বছরে ছেলে বিয়োনী মণীন্দ্র ঘোষের রক্তহীন, হলদেটে শরীরের বউর নাক থেকে রক্ত বার হচ্ছে। তেল চিটচিটে বালিশ বেয়ে মেঝের পাতা শতরঞ্চের ওপর পড়েছে। আর কিছু পরে হয় তো বা কুণ্ডলি পাকিয়ে মেঝের দিকে ঠেলে যাবে।

—হরা, হরা, শোন, শুনে যা—চীৎকার করে ডাকল দাদা।

বারান্দায় উঠে বসেছিল হরমোহন। ত্রস্ত ভেতরে গেল। বৌদি বার দুই তার বাঁ হাতের তেলো দিয়ে মুখ মুছেছে। হাতের রক্ত মুছেছে বুকের আঁচলে। ওর চারটে বাচ্চা যে বুকের দুধ খেয়েছে কাপড়ে রক্ত লেগে, সরে, তারই খানিকটা অনাবৃত করে দিয়েছে। দেখে ভয়ংকর ঘাবড়ে গেল হরমোহন। 'বৌদি গো' বলে ডেকে সে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

—এই হরা, কাঁদছিস কেন? মারব কেপে এক থাপ্পড়।

যাদুর মত কান্না বন্ধ হয়ে গেল তার। কান্না থামিয়ে দাদাকে সন্তুষ্ট করে সে গম্ভীর হওয়ার ভাব করল। কিন্তু সেটা দেখাল হাসির মত।

সে চুপ করার পরই তার দাদা মণীন্দ্র খানিকক্ষণ বোকার মত তার স্ত্রীর মুখের দিকে বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, আমার দিকে অমন করে দেখছো কেন বউ?

এই বলে সে তাইএর দিকে চোখ তুলল। তার সমস্ত শরীর শীত লাগার মত কেঁপে উঠল। টপ্, টপ্, করে জল পড়ল তার চোখ কেটে। চারটি সন্তানের মধ্যে এখনো কোলেরটি মার পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। অন্য তিন জন জেগে গেছে। কাকাকে কাঁদতে দেখে বাবা যখন বকল তখন তারাও ভয়ে সিটিয়ে গিয়েছিল। এখন বাবার চোখে জল দেখে তাদের কান্না আর বাধা মানল না। তারা পাড়া জাগিয়ে দিল।

কাউকে কিছু না বলে হরমোহন গেল বাইরে। তারপর মাঠে এখানে ওখানে ঘুরে সে খানিক খুঁজল। কোয়ার্টারে কারো গোবর নেই যে টাটকা গোবর নিয়ে আসবে। 'এখন কি আর টাটকা থাকে'—বিড় বিড় করল সে। শুধু ওরই মধ্যে দেখে সে খানিকটা তুলে নিল।

ইতিমধ্যে মণীন্দ্র ঘোষের ঘরে দু'চারজন জমা হয়েছে।

এগিয়ে গিয়ে হাতের গোবরটা বৌদির নাকের কাছে ধরতেই বৌদি নাকমুখ কুঁচকে হেঁচকি তোলার মত করে মাথাটা সামান্য বাঁকাল।

—ও-সব দিও না, পরামর্শ দিল কেউ।

অগত্যা হরমোহন হাতটা সরিয়ে নিল।

কারখানা শহর থেকে অনেক দূরে। এক প্রান্তে। মূল শহর সেখান থেকে অন্তত কয়েক মাইল। কাছাকাছি দু'একটা কোলিয়ারীতে দু'একজন ডাক্তার আছে। পায়ে হেঁটে গিয়ে তাদের ডেকে আনতে কিছু না হোক দু'ঘণ্টা। রাত্রিবেলায় গাড়ি ঘোড়া নেই। কারখানায় গিয়ে বলতেই টাইম বাবু টেলিফোনের বই দেখে শহরের কিছু না হোক এক জন ডাক্তারকে ডাকাডাকি করল। কিন্তু কেউ আসতে রাজী হল না। কোন ব্যাপারই না অনেকে।

এত দুঃখের মধ্যেও হরমোহনের হঠাৎ একবার মনে হল যে দিদিমণির বাড়িতে যদি টেলিফোন থাকত আর তাকে যদি খবর দেওয়া হতো তাহলে সে একজন ডাক্তারকে পাঠাত নিশ্চয়ই।

সময় নেই। একেবারেই নেই সময়। বাচ্চাগুলোর কান্না থামানোর জন্য সে বৌদির উঁড়োর খুঁজে দু'জনের হাতে খানিকটা করে গুড় দিয়েছে। বড়টাকেও দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সে নেয় নি। এগিয়ে এসে মার গা লেপ্‌টে ছেলেটা বসেছে। মা তার পিঠে হাত বুলোচ্ছে। চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে মা'র। আর ছেলেটা মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে উঠছে।

কান্না যেন উদ্যোগ করে গিয়ে কোলিয়ারির একজন ডাক্তারকে ডেকে এনেছিল ঘটে। কিন্তু তখন মোমের সলতের শেষটুকু পুড়ে গলানো মোমের ওপর শিখাটুকু খাবি খাচ্ছে।

ভোর হওয়ার আগেই ওরা রওনা হয়ে গেল। খাট খরচ বলতে মণীন্দ্রর বউর বিশেষ কিছু লাগল না। কোম্পানির ট্রাকে পাওয়া গেল। কাঠও। কিনতে হলো কেরোসিন তেল খানিকটা। কলসী। আর টুকি টাকি সামান্য কিছু। কোয়ার্টার পাড়ায় যারা থাকে তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ল যাত্রা করার আগে। বিশেষত বউরা। মাথায় লেপা সিঁদুর আর মগ্‌মগে আলতা থেকে তারা সতীর ছোঁয়া সংগ্রহ করে নিল। পায়ের একটা ছাপ লাগিয়ে দিল ঘরের দেওয়ালে। মণীন্দ্রর সঙ্গে তার নিজের বলতে গেল তার বড় ছেলে। মা'র মুখে আগুন দেবে। হরমোহন রইল অন্য তিন জনকে নিয়ে।

দিন চলতে লাগল। ছেলেগুলো যাথা কাবাল। মাঝে মাঝে ওরা ঘরের দেওয়ালে পায়ের ছাপটাকে ঘিরে কলরব করে। বলে 'আমাদের মায়ের পা'। মণীন্দ্র দু'চারদিন উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াল। তাই বলে কাজ কামাই করল না বেশিদিন। তিনদিনের দিন কারখানায় গিয়ে বিশেষত বাবুদের সামনা সামনি হলেই বলল, খবর শুনেছেন?

—কি খবর?

—শোনেন নি?

—ওঃ! হাঁ, সত্যি খুব দুঃখের ব্যাপার। কি আর করবে ভাই, জীবনে শোক, দুঃখ আছে। .....ইত্যাদি।

দিন ডেকে আনে আর এক দিনকে। হরমোহন হয়ে উঠল ওদের মা। বড়টাই যা একটু ডাগর হয়েছে। অন্য তিনটে তো নেহাতই বাচ্চা। কোলেরটা এখনো দুধ ছাড়ে নি। এই চারজনকে সামলানো কি কম কথা? তাদের খাওয়া দাওয়া থেকে ময়লা পরিষ্কার করা পর্যন্ত রাজ্যের হাজারো কাজ সেই তাকে করতে হয়। তাই বলে কারখানা কামাই করতে পারে না সে-ও। কখন যে রান্না করে আর কখন যা কাজ, তা সে কেবল সে-ই জানে। তবু কারখানায় আসে। কোলের বাচ্চাটার জন্যে মন আঁকু পাঁকু করে। কিন্তু উপায় কি?

পনেরো দিনের মাথায় একজন ঠিকে কি খুঁজে আনা হলো। ঠিক কি নয়। কিন্তু কি ছাড়া অন্য কি! বছর তিরিশ বয়স। বাঙালী ঘরের বিধবা। সে সকালে এসে ঘর দোর সাফ, রান্না এই সব কাজ করে বেলা দুটো পর্যন্ত থাকবে ঠিক হলো। বিকালের দিকে সব কাজের ভার হরমোহনের।

কারখানার দু'একজন বলল, বিয়েটা যদি করে রাখতিস হরমোহন, তাহলে এখন আর কি রাখতে হতো না। সেই চালাত।

—সে তো ঠিকই। কিন্তু কি করবো? অদৃষ্ট!

এই বলে সে আকাশের দিকে আঙুল তোলে। হাসিটা অনিবার্য ভাবে আপনি আসে।

হরমোহন দেখল যে বৌদি মারা গেছে বটে, তবু মেয়েমানুষের ওপর মায়ার টান কমেনি। যে জিনিষ বেশী ছুটোয় চলে যাওয়ার কথা সে তো একটা গোটা রাত থেকেই গেল।

হরমোহন বলল, ওকে তুমি বিয়ে করো দাদা।

—ওকে?

—হ্যাঁ। করো না?

—ওই বিধবাটাকে?

—তাতে কি হয়েছে? ওর পুরুষ ছিল। নেই। তোমারও তো তাই।

—পাঁচজনে কি বলবে?

—পাঁচজন তো আর তোমার ঘর সামলাবে না।

—বিয়ে করলে অনেক খরচ।

—খরচ কেন করবো আমরা? এতো আর 'সম্ভোষ' নয়।

—তবে?

—পাঁচজনকে ডাকবো আমরা। তাদের সামনে তোমরা মালা বদল করবে। না হয় কাগজে লিখে নেবে। হবে বিয়ে।

—নারে সেটা ঠিক নয়।

চরিতকার বললেন, জীবনের অনেক জটিল ব্যাপারে হরমোহনের সিদ্ধান্ত এত সহজ। কিন্তু তার পরামর্শ মনে ধরল না মণীন্দ্রর। আবার ওটি ওটি ঠুক ঠুক করে দিন গেল ক'টা। তারপর আর একদিন হরমোহন সেই কথাটা তুলল। বলল, বলছিলাম কি—

—কি বল্।

—সেই যে আমার 'সম্ভোষো'টা এসেছিল, সেটা আর একবার দেখলে হয় না?

—কোন্‌টা?

কট-মটে চোখে তাকাল মণীন্দ্র। তার সেই চোখের দিকে চেয়ে একটু যেন চুপ্‌সে গেল তার ভাই। তবু কোনমতে বলল, সবাই বলছিল কিনা, তাই।

—কি বলছিলো সবাই?

—সেইখানেই আমার বিয়েটা—,

—মজা বিয়ের ভাবনা হয়েছে, না? চারটে ছেলে নিয়ে আমি শালা মাথার ঘামে কুকুর পাগল হয়েছি, খেঁকিয়ে উঠল মণীন্দ্র। তারপর কি মনে হলো গলা নামিয়ে বললো, কোন্‌খানে?

এইবার খিখি হেসে ফেলল হরমোহন।

বলল, সেই যে আমি সিক্ রিপোর্ট করে গেলাম। ঘুমিও গেলে। কারখানার বাবুরা তোমায় ডেকে খোঁজাল। তারপর আমরা চলে এলাম। টাকার কলের বাপ রাজী হলো না। তা বলছিলাম কি—

—কি?

—টাকাটা না হয় তুমি ছেড়ে দাও।

মণীন্দ্র বলল, মেয়ের বাপ তোকে পছন্দ করে নি। টাকা নয়। বুঝলি? ক্যাচ ক্যাচ করিস নি। যা।

রিফুজী কলোনীতে যে মেয়েটিকে বিয়ে করবে বলে সিকৃরিপোর্ট দিয়ে গিয়েছিল হরমোহন, বাপের গলার কাঁটা যে মেয়েটি, বাপের গলা থেকে মেয়ে মণীন্দ্র ঘোষের দ্বিতীয় পক্ষ হয়ে এক কুঠরির কোয়ার্টারে এলো আড়াই মাসের মাথায়।

চারটিছেলেকে তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে নতুন বউর দেওর বলল, বৌদি এদের তুমি দেখো। এদের তো মা ছিল না।

এই বলে সে হাসল। হাসিটা যথারীতি ছড়িয়ে গেল চোখ থেকে দাঁতে।

মণীন্দ্র ঘোষের মনটা ভালো ছিল। সে বলল, আর আমার এই ভাইটাকেও ঘর ছোরো।

হরমোহন তখনো হাসছে।

কে একজন বলল, হ্যাঁরে, তোর বৌদিকে প্রণাম করলি না?

নতুন বউ সব জানত। মাথার ঘাটো এই লোকটা তার পায়ে হাত রাখতেই সে কোনমতে বলল, থাক্ থাক্।

মেজ মেয়েটা তাদের নতুন মার হাত ধরে টানতে টানতে বলল, এই দ্যাখো। আমাদের মায়ের পায়ের ছাপ।

॥ ষোলো ॥

আড্ডার সমালোচক বন্ধু উৎসুক হয়ে বলল, তার পর?

—তারপর বলছি।

এই কথা বলে চরিত্তকার নতুন এক সিগারেট ধরিয়ে তাতে লম্বা টান দিলেন। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে শেষের দিকে কতকগুলো ধোঁয়ার আংটি করলেন। ঘরটার মধ্যে খানিক স্তব্ধতা হওয়ায় ঘর ভরেছে। নীরবতা। শ্রোতাদের সকলের মুখের দিকে চরিত্তকার আলাদা আলাদা করে চাইলেন।

—এই সব ঘটনার পর গয়ায় গিয়ে পিতৃপুরুষকে পিণ্ড দেওয়ার জন্যে হরমোহনের একটা ঝোঁক চাপল। এই কথাটাই সে অহরহ মনে মনে নাড়াচাড়া করতে লাগল। কারখানায় কাজ করা আর ধারার খালায় রাত কাটানোর মধ্যে এই পর্যায়ে এ ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য কিছু নেই।

এই সময় একদিন টাইম অফিস থেকে ডিপার্টমেন্টে ফোন এলো যে হরমোহন ঘোষ যেন কারখানার গেটে একবার যায়, তাকে একজন ভদ্রলোক ডাকছেন।

তাকেও বাইরের লোক ডাকে?

হাতের ব্রুশ এককোণে দাঁড় করিয়ে সে গেল গেটে।

খুব অবাক হল। হাসল। হাসিটা ছড়িয়ে গেল। গৌরীন। বলা বাহুল্য, হরমোহন সেলাম করতে গেল তাকে।

সেলাম সে প্রায় করেই ফেলেছে তবু শৌরীন তার হাতটা ধরে বলল, আরে, এসব আবার কি। এর পর তোমাকেই আমায় সেলাম করতে হবে।

হরমোহন মানে বুঝল না।

শৌরীন বলল, তোমায় একবার যেতে হবে।

—কোথায় ?

—আমার সঙ্গে।

—এখন ?

—এখুনি। চলো।

—আমি যে ডিউটি করছি।

—ছুটি নাও।

—ছুটি ?

—নাও না।

—যদি বিকেল যাই ?

—সে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

শৌরীন একবার হাসল। দেখল। তারপর বলল চাপা গলায়, চিত্রা তোমায় ডেকে পাঠিয়েছে।

—কে ?

—চিত্রা।

—মিমিমণি ?

শৌরীনও একটু হাসল। বলল, হ্যাঁ। চিত্রা।

—কেন ?

—সে তুমি ওখানে গিয়ে শুনবে।

—আচ্ছা দাঁড়ান। ছুটি নিয়ে আসি।

পা বাড়াল সে। পিছন থেকে শৌরীন ডাকল, শোন—

—বলুন।

—আমাদের সঙ্গে তোমায় এক জায়গায় যেতে হবে।

—কোথায় ?

—কলকাতায়।

—কেন ?

—খুব কাজ আছে। আরে, ভালো কথা হরমোহন, তোমার তো 'ইয়ে' হয়নি, না ?

—কি ?

—বিয়ে ?

এই দাদাবাবুও তার বিয়ের কথা বলে। সে হেসে বলল, না।

শৌরীন বলল, যাও ছুটি নিয়ে এসো। তোমায় কলকাতায় দু'চারদিন থাকতে হবে। বাড়ির লোকেদের বলে যাও।

—কাউকে বলতে হবে না।

—এখুনি চলে যাবে ?

—হুঁ।

যেখানে ইচ্ছে, যখন ইচ্ছে চলে যেতে পারে এমনি একটা ভাব করে সে ছুটি আনতে গেল। সিক্ রিপোর্ট করলো সে। হরযাত্ত সেখাতে ছুটি মঞ্জুর করাতে তার লাগল আধ ঘণ্টার মতো। আর এই আধ ঘণ্টা শৌরীন অপেক্ষা করে রইল কারখানার গেটের বাইরে।

চরিত্রকার বললেন, শৌরীনকে আমি বার তিন দেখেছি। কিছু কিছু শুনেছি তার সম্পর্কে। ভেঙে পড়া মধ্যবিত্ত ঘরের পোড় খাওয়া ছেলে। কথার মধ্যে খুব চেকনাই আছে। লোকের সঙ্গে চোখে মুখে কথা বলে। বর্তমান বয়স উনত্রিশের মতো। ছেলেবেলায় গানের গলা ছিল তার। স্কুল এইট নাইন পড়ার সময় সিনেমার গানগুলো সে তুলতো। পাড়ার জলসায় সুযোগও পেয়েছিল দু'একবার। ভবিষ্যতে একজন আধুনিক সঙ্গীত শিল্পী হবার স্বপ্ন দেখতো সে কোনকালে। অনেকেই তো আছে। শিল্পীদের বিভিন্ন দলের সঙ্গে তার যোগাযোগটা সেই থেকেই থাকা। স্কুলের সিঁড়ি পার হতে পারেনি। ক্লাস নাইনে ইতি।

চরিত্রকার বললেন, যে খসড়া তোমাদের আজ শোনাচ্ছি, যা নিয়ে বৃহৎ এক উপন্যাস লেখার কল্পনা আমার আছে, এই পরিকল্পনা যদি তখন থাকতো তাহলে সেদিন কারখানা গেটের বাইরে শৌরীন যখন হরমোহনের জন্য আধঘণ্টা অপেক্ষা করিয়ে তখন তাকে একবার দেখে আসতাম। সেই আধঘণ্টা তার মুখ চোখ কেমন দেখাচ্ছিল তার বর্ণনাটা তোমাদের তাহলে দিতে পারতাম।

—ছুটি নিয়ে বাইরে এলো হরমোহন। সে বলেছিল বটে কাউকে কিছু বলার নেই কিন্তু শৌরীনের সঙ্গে যাওয়ার আগে সে বলল, একবার ওদের দেখে আসি।

—কাদের ?

—ছেলেমেয়েদের।

—মানে ?

পাঁচজনের কাছে হরমোহন সম্পর্কে প্রচুর খোঁজ খবর সংগ্রহ করেছিল শৌরীন। পাঁচজনের কাছে যা জানতে চেয়েছিল, তা জানে। হরমোহনের কাছে আসার তা কেনে নিয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। তবু যেন ছেলেমেয়েদের কথায় চমকে উঠলো সে।

হরমোহন বলল, বাসার ছেলেগুলো। একবার দেখে আসি। কদিন কলকাতায় থাকবো তো।

দেখা করে আসতে আরো আধ ঘণ্টা গেল।

বাজারের দোকানে প্রচুর খাওয়ালো শৌরীন। নতুন জুতো, ধুতি, জামা, এইসব বাজার মুখে তার বাপ মত কিনে দিল। হরমোহন বলল, আমার জন্যে কিনছেন ? কেন ?

—নাও না। তোমার লাগবে।

বাজারের একটা দোকানে তাকে দু'ঘণ্টার মত বসিয়ে রেখে কোথা থেকে যেন ঘুরে এলো শৌরীন। ঘুরে এসে বলল, চলো।

জুতো, জামা কাপড়ের পোটলাটা বগলে নিয়ে চলল হরমোহন।

ওরা এলো ষ্টেশনে।

হরমোহন বলল, মিহিমণি কোথায়?

—আগের ট্রেনে গেছে। আমাদের দেরী হলো কিনা।

—দেরী তো আপনি করলেন।

হরমোহন জানতো না সেই ট্রেনেই ছিল চিত্রা। অন্য বগীতে।

চরিতকার আবার থামলেন। তারপর কপাল কুঁচকে এক কোণে চেয়ে রইলেন। তারপর প্রতিটি শব্দ ছেড়ে ছেড়ে বলে যেন এই দেওয়ালটার উদ্দেশ্যে জানতে চাইল, কলকাতায় পৌঁছোনোর পরের পর দিন চিত্রার সঙ্গে হরমোহনের রেজিষ্ট্রী বিয়ে হলো, এ'কথা কি তোমরা বিশ্বাস করবে?

আজ্ঞে বোধা মেরে গেছে। চরিতকার আপন মনে বললেন, রেজিষ্ট্রীর সময় সৌরীন সেখানে ছিল। আর তিনজন যারা ছিল হরমোহন তাদের চেনে না। বিয়ের পর ওরা বর কনেকে একটা চাকা কিটনে তুলে দিয়ে বলল, আমরা গাড়ীতে যাচ্ছি।

বিয়ে হল সকাল এগারোটায়। গড়পারে যে বস্তীর মত ঘরে ওরা উঠেছিল সেখানে পৌঁছল পৌনে বারোটায়। পৌঁছে দেখল সৌরীন আর তার সঙ্গীরা সব আগেই এসেছে।

পথে কিটনে হরমোহন তার বৌকে একটি মাত্র কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। বলেছিল, তোমার ছেলে পুলে হবে। না?

—উঃ, এই বলে বুকের ওপর দুই হাতের পাতা রেখে কুঁকড়ে গিয়েছিল চিত্রা।

হরমোহন বললো, তার কোন রোগ হবে না তো?

—কার?

—ছেলেটার। কানা কিম্বা অন্ধ হবে না তো?

আজ্ঞে'র সমালোচকের জিব নিস্ নিস্ করছিল কোন প্রশ্ন করার জন্য। তার আগেই চরিতকার বললেন, আমি তোমাদের মোটামুটি গল্পটা বলেছি। কিন্তু কোন সময় ঘটনাটা ঘটলো তা বলিনি। যেদিন হরমোহন বিয়ে হয় সেদিন কলকাতায় খাদ্য আন্দোলন—

খাদ্য আন্দোলনের কথা তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে। সেই আন্দোলন সেদিন চরম পর্যায় পৌঁচেছে। বেলা একটার সময় হরমোহন গড়পার থেকে বার হলো কলকাতায় একটু বেড়াবে বলে। ধর্মতলায় এসে যখন পৌঁছল তখন সেখানে লোক লোকারণ্য। সভা হচ্ছে একটু আগেই। প্রথমে সে এর ওর শরীরের ফাঁক দিয়ে 'ব্যাপার কি' দেখার জন্য উঁকি দিল। যেমন দিয়েছিল প্রথম দিন রিহার্সাল দেখতে গিয়ে। তারপর দেখতে দেখতে সে এসে গেল সভার আগের দিকে। তারপর লোকের চাপ, ঠেলা ঠেলিতে পৌঁছে গেল বিক্ষোভ মিছিলের আগায়।

ঠিক এই সময় বেবু আবার এলো। বোঝা যায় যে সে খানিকটা দৌড়ে এসেছে। ঘরে পৌঁছে সে তার হাঁপ গোপন করার খুব চেষ্টা করল।

—কি হলো বেবু? আবার এলে যে—

সঙ্কুচিত কণ্ঠে বেবু জানাল, মিমি আবার পাঠাল।

—তুমি এগিয়ে যাও। আমি আসছি। মিহিমিহি কষ্ট করে ডাকতে এসো না। আমি একটু পরেই যাচ্ছি।

বেবু বার হয়ে গেল আবার।

ছেলেটি সত্যই চলে গেল কিনা দেখার জন্ত চরিত্রকার উঠে দরজার কাছ পর্যন্ত গেলেন। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, একবার ঘুরেই আসি ওদের বাড়ী থেকে। বুঝলে? কেন যাই জান? সৌরীন আজকাল স্কুলেও চিত্রার কাছে আসে না। তাতে কোন ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এ্যাম্বেচার ক্লাবের বিতি তোল সৌরীন এখন লীনা, পলি, মেরিকে নেচে খবর দিয়ে আসে। কোলে ছেলে নিয়ে উপার্জন বন্ধ হলে সেচারার চলে কি করে? আমি তাই ভেবে করি সৌরীন হলে ওকেও দু'চারটে পার্ট জোগাড় করে দিতে। তাছাড়া চিত্রাকে নিয়েও উপন্যাস লেখার আমার খুব ইচ্ছে আছে। হরমোহনকে যেমন খুঁচে খুঁচে উপকরণ সংগ্রহ করেছি। ওর কাছ থেকেও পরোক্ষ ভাবে তাই করার ভরসা রাখি। কাজটা অবশ্য শক্ত। তবে যাকগে যা মেয়েছে তো মেয়েটা। তাই একটু একটু করে চিত্রাকেও চিনতে পারছি। অনহারের মত ও খানিকটা আমার ওপর নির্ভর করছে। এবার তাইকোঁটার দেবুর আগে আমায় কোঁটা দিয়ে প্রণাম করেছিল। এই সব কারণেই যাওয়া। তা ছাড়া—

—তা ছাড়া কি?

সমালোচক জানতে চাইল।

অত্যন্ত নির্বিকার ভাবে—হরমোহন যেমন নির্লিপ্ত ছিল, বিকারহীন ছিল বা যে কোন অবস্থায় যে কোন কথা বলার সময় যেমন উত্তাপহীন ছিল অনেকটা সেই ভঙ্গীতে—চরিত্রকার বললেন, হরমোহনকে সনাক্ত তার স্ত্রীই করেছিল। গুলী খেয়ে রাজপথে লুটিয়ে পড়ার পর তার শেষ হাসিটা যথারীতি চোখ থেকে দাঁতে ছড়িয়ে গিয়েছিল কিনা এ'কথাটা বহুবার জিজ্ঞাসা করবো করবো করেও কোনদিন বলতে পারিনি। একদিন তা-ও জেনে নিতে হবে।

চরিত্রকার চলে গেলেন।

যে মেয়ে আত্মহত্যা করতে পারেনি, যে মেয়ের লোকবল, অর্থবল, সামাজিক প্রতিষ্ঠা কিছুই নেই একটা বাতিল হওয়া খেলনার মত যাকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে, আবার যাকে এ্যাম্বেচার ক্লাবের ঘোরে ঘোরে ঘুরতে হচ্ছে সেই চিত্রার কাহিনীটা আর শোনা হলো না। বোধহয় চরিত্রকারের উপন্যাসে তা এক সম্পূর্ণ রূপ নেবে।

অত্যন্ত বেখাপ্পা ভাবে আমার কেবল একটি কথা মনে পড়ে গেল। সেই অনেকদিন আগে, কোন এক কারখানায় বিশ্বকর্মা পুজোর থিয়েটারের মহড়া ঘরে চিত্রাকে ঘিরে থাকা উৎসাহী জটলার কাছাকাছি এসে সে বলেছিল, উনি কি বিধবা?

কি আশ্চর্য। সরাসরি না হলেও চিত্রার সঙ্গে এই তার প্রথম কথা। এই তার প্রথম কৌতূহল।

সমাপ্ত

অমৃত কথা ও কাহিনী

শঙ্করাচার্যের কাহিনী

গঙ্গাতীরে যাইবার পথে একদিন শংকর এক চণ্ডালের সম্মুখীন হইলেন। চণ্ডাল চারিটি কুকুর লইয়া মাতাল অবস্থায় পথ জুড়িয়া আসিতেছিল। কুকুর ও চণ্ডালের স্পর্শভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া শংকর পথের একপাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া চণ্ডালকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু চণ্ডাল পূর্ববৎ চলিতে চলিতে বেদান্তের গুহ্যতত্ত্ব বলিতে লাগিল। সে বলিল, 'কে কাহাকে স্পর্শ করিবে? এক বই দুই বস্তু কোথায়? তুমি কাহার স্পর্শভয়ে সঙ্কুচিত হইতেছ? আত্মা তো কাহাকেও স্পর্শ করেন না; তাঁকেও কেহ স্পর্শ করিতে পারে না।' চণ্ডালের মুখে এইরূপ জ্ঞানের কথা শুনিয়া, শংকর, অদ্বৈতবোধ ও তাঁহার ব্যবহারের অসংগতি লক্ষ্য করিয়া, লজ্জিত হইলেন। তিনি গুরুজ্ঞানে চণ্ডালের চরণে প্রণত হইলে সে রজত-গিরিনিভ শ্বেতকায় সদাশিবের রূপ ধারণ করিল। শংকরের দৃষ্টি শিবের উপর পতিত হইবামাত্র তিনি সমস্ত জগৎ শিবময় দেখিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, জগতের সবই চৈতন্যময়, জড় কিছুই নাই; যেমন কুণ্ডল বলয় প্রভৃতি এক স্বর্ণের দ্বারা নির্মিত, ঠিক তেমনই এক চৈতন্যে সৃষ্টির সকল বস্তু নির্মিত; চারিদিকের মন্দিরসমূহ জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে, কাঠ-পাথর এমন কি ধূলিকণা পর্যন্ত জীবন্ত জাগ্রত হইয়া আছে।

তিনি যে দিকে চাহিলেন, চেতন ব্যতীত অচেতন কিছুই দেখিতে পাইলেন না। নিজের দেহ, মন, বুদ্ধি, সবই চৈতন্যময় বোধ করিলেন। কোথায় যেন একটু 'আমি-আমি' বোধ থাকার নানা বস্তুর আকার দেখাইতেছে, এইটুকু 'আমি' এক নিমিষে লোপ হইয়া সব অনুভবের বিরাম এখনই হইতে পারে। নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মকেই আর একরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া শংকর আনন্দে আত্মহারা হইলেন। অনুভবের প্রথম বেগ প্রশমিত হইলে মহাদেব শংকরকে আশীর্বাদ করিলেন এবং বেদান্ত প্রচারে প্রবৃত্ত হইবার উপদেশ দিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

• • •

একদিন গিরি নামক একজন শাস্ত্রনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ আসিয়া শংকরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। আসিয়াই তিনি গুরুসেবার সমুদয় ভার নিজস্কন্ধে লইয়া গুরুভ্রাতাদিগকে সাধন ভজন ও অধ্যয়নের অবসর দিলেন। ••• তাই জ্ঞানাভিমানী গুরুভ্রাতাগণ তাঁহাকে একটু অবজ্ঞার চক্ষেই দেখিতেন। ••• একদিন শিষ্যগণ বেদান্ত পাঠের জন্য প্রস্তুত হইলে শংকর বলিলেন, 'তোমরা একটু অপেক্ষা কর, গিরি নদীতে গিয়াছে, সে আসিলে পাঠ আরম্ভ হইবে।' কেহ কেহ ইহাতে বিরক্ত হইলেন, কেহ বা মুখ ফুটিয়াই গিরির সম্বন্ধে অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। গুরুসেবা, গুরুভক্তি, জ্ঞানলাভের এক প্রধান উপায়; ইহারা বেদ-বেদাংগপারদর্শী তপস্বী হইয়াও অহংকারে এমনই অন্ধ হইয়াছেন যে, গুরুসেবাকে অবজ্ঞা করিতেছেন; ইহা লক্ষ্য করিয়া আচার্য দুঃখিত হইলেন। কিন্তু কোনও কথা না বলিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন এবং মনে মনে গিরিকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিলেন।

গিরি নদী হইতে কাপড় ধুইয়া আসিতেছিলেন। তিনি সহসা অনুভব করিলেন, যেন তাঁহার অনুভব শক্তির উপর হইতে এক আবরণ সরিয়া গেল, আর তিনি সমস্ত জগৎ চৈতন্যময় বোধ করিতে লাগিলেন। গুরু কৃপায় অল্পকালের মধ্যে তিনি সর্বশাস্ত্রের সার অবগত হইলেন, সকল সাধনার ফল লাভ করিলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল ব্রহ্মতেজে বিভাময় হইয়া উঠিল। তিনি আচার্য সমীপে উপস্থিত হইয়া তোটকছন্দে বেদান্তের সারমর্ম প্রকাশক কতকগুলি শ্লোক মুখে মুখে রচনা করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। গুরুভ্রাতাগণ অবাক হইলেন। তাঁহাদের দর্প চূর্ণ হইল। তদবধি গুরুসেবাপরায়ণ গিরির নাম হইল তোটকাচার্য।

বিজ্ঞান

সাহিত্য সংবাদ

ইংলণ্ডের ক্রুদ্ধ লেখকটি।

.I can't go on laughing at the idiocies of the people who rule our lives. We have been laughing at their gay little madnesses, my dear, at their point-to-points, at their postural slump of the well-off and mentally under-privileged, at their stooping shoulders and strained accents, at their waffling cant, for too long. They are no longer funny, because they are not merely dangerous, they are murderous.' ফ্লিট স্ট্রীটের বাসিন্দা এবং রাজনীতিকদের প্রতি যিনি দুর্ধাক্রোধে ফুঁসে উঠে আক্রমণের বাণ ছুঁড়েছেন, তিনি ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত লেখক জন অসবোর্ন। 'অ্যাংরি ইয়ংম্যান' শিরোনামে প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়ে যাঁরা বিশেষিত হয়েছেন, অসবোর্ন তাঁদের মধ্যে অগ্রণী। ইংল্যাণ্ডের যুবরাজ অভিষেকে তিনি প্রতিবাদ-পত্র টাইম্‌স্‌-এ পাঠালে, ওই পত্রিকা তা ছাপেন নি। রাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর তীব্র কটাক্ষ রক্ষণশীলদের বুকে মর্মান্তিক আঘাতের মত গিয়ে বেজেছিল। 'My objection to the royal symbol is that it is dead; it is the gold filling in a mouthful of decay.' এবং তারস্বরে রক্ষণশীলরা প্রমাদ গণলেন। নানাভাবে এই ক্রুদ্ধ লোকটিকে শায়েস্তার পথ নিয়েছিলেন এবং এখনো চলছে। অসবোর্ন ১৯৫৭ সনের সেপ্টেম্বরের উপরিউক্ত মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড়ে আজো থামেন নি। থামার রাস্তা তাঁর নয়। কারণ, তিনি মনে করেন তাঁর ব্রত খুব দায়িত্বপূর্ণ। 'Establishment'-এর বাবুদের মজ্জায় তিনি অবক্ষয়ের চিহ্ন স্পষ্ট দেখতে পান। তাঁর ব্রত সম্পর্কে তিনি বলছেন, 'I want to make people feel, to give them lessons in feeling. They can think afterwards.' এবং যেহেতু অন্যায়ের ঝড়ের শব্দ দূর থেকে লেখক শুনতে পান তাই তিনি বলেন, 'A writer can demonstrate feeling. It takes an extra ordinary human being to demonstrate action as well.' ঠিক সেকারণেই রক্ষণশীল ব্রিটনদেশীয় বুদ্ধিজীবী রাজনীতিকদের তুমুল আক্রমণের পরেও ১৯৬১ সনের আগস্ট মাসে তিনি ফের Tribune-এ চিঠি লেখেন, 'Damn you, England.' বার্লিন সংকট ঘনিয়ে আসছে দেখে অসবোর্ন বিশ্বদুনিয়ার ধ্বংস দেখতে পেয়েছিলেন সেদিন। সে ধ্বংসলীলায় অসবোর্ন ব্রিটেনের ভূমিকাকে খাটো করে দেখবার সংকীর্ণ চেষ্টা করেন নি। তাঁর ক্রোধ যারপরনাই উদ্দীপ্ত এবং উত্তপ্ত হয়ে কলমের মুখ দিয়ে বেরোল: 'Damn you, England·····there's little left in my brain but the thoughts of murder of you···' অসবোর্নের এরকম উক্তি অত্যন্ত উদ্ভট বলে অনেকের কাছে ঠেকেছে। শুধু ঠেকেছে নয়, বয়স্ক বয়েল আর্টিলারির একজন মেজর তাঁর 'অ্যালসেসিয়ান' কুকুরটি নিয়ে অসবোর্নের বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেন। উদ্দেশ্য, অসবোর্নকে মাপ চাওয়াতে বাধ্য করা। অসবোর্ন এ মেজরটির সংগে দেখা করতে অস্বীকার করলেন এবং মন্তব্য করলেন, 'Upper class clown.' মেজরের ঘোড় ওই পর্যন্তই ছিল। সুতরাং অবশেষে পলায়নে শান্তি খুঁজে পান। 'Telegraph'-পত্রে অনেক সাংবাদিক পরামর্শ দেন, অসবোর্নকে জেলে পাঠাতে। অসবোর্ন এ নিয়ে মাথা ঘামান না। উপরন্তু তাঁর সর্বশেষ নাটক 'Luther' যথেষ্ট জনপ্রিয় অর্জন করে চলেছে।

পুলিটজার পুরস্কার অধিকারিণী হার্পার লী।

১৯৬১ সনের সাহিত্যে পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছিলেন শ্রীমতী হার্পার লী। পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাসটি হ'ল, 'To Kill a Mockinghird'। এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস। এ উপন্যাসটি পুরস্কার পাবার আগেই 'বেষ্ট সেলার' খ্যাতি অর্জন করেছিল। শ্রীমতী লীর প্রিয় স্বদেশীয় লেখক হলেন 'মার্ক টোয়েন'।

তাঁর উপন্যাসটিতে শ্রীমতী লী সংস্কার, দারিদ্র্য, ভুল বোঝাবুঝি, সহৃদয়তা এবং উদারতা প্রভৃতি সুন্দরভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। মূলতঃ লেখিকা মানুষের সারল্যের এবং অকৃত্রিম গুণগুলোর জয়গান গেয়েছেন। এক জায়গায় সৌম্য অভিজ্ঞ এটিকাসের মুখ দিয়ে লেখিকা বলেছেন, 'You never really understand a person until you consider things from his point of view.··· Until you climb into his skin and walk around it.' কথাগুলো এটিকাস বলছেন তাঁর মেয়েকে। এই এটিকাস চরিত্রটি শ্রীমতী লীর পিতৃচরিত্রের অনুকৃতি।

শ্রীমতী লী লেখা আরম্ভ করেন সাত বছর বয়সে। আলবামা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু ডিগ্রির আগেই তিনি পড়াশুনা ছেড়ে দেন শ্রীমতী লীর মতে আইন পড়া নাকি 'good training for writers.'। তার পর তিনি হুইয়র্কে কোন বিমান কোম্পানীর রিজার্ভেশন এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন।

তার পর অনেক সাহস করে তিনি দু'টি প্রবন্ধ ও তিনটি ছোট গল্প কোন সাহিত্য প্রকাশককে দেখান। তিনি একটি গল্প পছন্দ করেন এবং শ্রীমতী লীকে বলেন, এ গল্পটিকে বইএর আকার দিতে। এ বইটিই হল, 'To kill a Mockingbird'।

শ্রীমতীর কল্পনায় আরেকটি উপন্যাসের প্লট ঘুরছে। তিনি শীগ্‌গিরই তা শেষ করবেন। এ বইটির ঘটনাস্থলরূপে বেছে নিয়েছেন দক্ষিণাঞ্চল। কারণ, তিনি বলেন, 'The South is the last refuge of genuine eccentries. Its people are a little larger than life. They have had time and room to develop their own individuality.'

ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সাহিত্য-পুরস্কার।

Prix Goncourt ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সাহিত্য-পুরস্কার হিসেবে পরিগণিত। ১৯৬১ সনের জন্য এ পুরস্কার লাভ করেছেন Jean Can. যে বইটির জন্যে এ পুরস্কার তিনি লাভ করেছেন,তা হ'ল La Pitie de Dieu. Jean Can এক সময় জাঁ পল্ সার্ত্‌র-এর ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। বর্তমানে তিনি বামপন্থী সাপ্তাহিক L'Express-এর সংগে যুক্ত। সাংবাদিকহিসেবে তিনি যথেষ্ট উচুদরের বলে খ্যাতি লাভ করেছেন।

এ পুরস্কার যাঁরা দেন তাঁদের পক্ষপাতিত্ব নাকি প্রগতিপন্থীদের প্রতি। কয়েক বছর ধরে প্রগতিপন্থী বুদ্ধিজীবীরাই এ পুরস্কার লাভ করে আসছেন। এ জন্যে ফরাসী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের একটি অংশ খুবই ক্ষুব্ধ। তাঁদের ধারণায়, এ পুরস্কার এবার পাওয়া উচিত ছিল জর্জেস বুইসের। তাঁর প্রথম উপন্যাস La Grotte নাকি একটি প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস। Jean Can-এর বইটির চেয়েও তাঁর এ বইটি উৎকৃষ্টতর। Prix Goncourt-এর কর্তাদের নাকি চরম দক্ষিণপন্থীরা ভয় দেখিয়েছিলেন জর্জেসকে পুরস্কারটি দেওয়ার ব্যাপারে। এ রকম ভয়ের চালু হওয়ার যথেষ্ট কারণও আছে। জর্জেস তাঁর বইয়েতে আলজিরিয়ায় আরবদের সমর্থনে চরিত্রসৃষ্টি করেছেন বলে দক্ষিণবাদী চরমপন্থীরা বইটির বিরুদ্ধে ভয় দেখাবেন এ আর বিচিত্র কি! কিন্তু সাহিত্য পুরস্কার কি রাজনীতিকদের দ্বারা চালিত হবে? গত বছরেও এই পুরস্কারটি দেওয়ার ব্যাপারে গোলমাল হয়েছিল। গত বছরে প্রথমে পুরস্কারটি পান Vintilia Horia. কিন্তু কিছুদিন পরে জানা গেল, তিনি নাৎসীবাদী। ফলে তিনি পুরস্কারটি হারালেন।

রাজনীতি আজকাল সর্বত্র আপন বিকট গ্রাস বিস্তার করে চলেছে। এমন ভাবে পুরস্কার বিতরণ করা হলে, পুরস্কারের আভিজাত্য আর অবশিষ্ট থাকে কি?

বাঙ্গালা ভাষা

স্বামী বিবেকানন্দ

আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতর সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুণ, বিদ্বান্ এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরা "লোকহিতায়" এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট, কিন্তু কটমট ভাষা, যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্প-নৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূত-কিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয়, ত নিজের মনে এবং পাঁচজনে, ও-সকল তত্ত্ববিচার কেমন করে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই,—তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাষ, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষায় যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সে দিকে ফেরে, তেমন তেমন কোন তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেন সাফ্ ইস্পাত, মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার বে-কে-নেই, এক চোটে পাথর কেটে যেন, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল—ঐ এক চাল—নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ।

যদি বল তবকথা বেশ; তবে বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করবো? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ এক কল্‌কেতার ভাষা। পূর্বপশ্চিম, যে দিক্ হতেই আসুক না, একবার কল্‌কেতার হাওয়া খেলেই দেখ্‌ছি, সেই ভাষাই লোকে কয়। তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্ ভাষা লিখতে হবে, যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে, তত পূর্বপশ্চিমে ভেদ উঠে যাবে এবং চট্টগ্রাম হতে বৈদ্যনাথ পর্যন্ত ঐ কল্‌কেতার ভাষাই চল্‌বে। কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতর বেশী নিকট, সে কথা হচ্ছে না—কোন্ ভাষা জিত্‌ছে সেইটি দেখ। যখন দেখ্‌তে পাচ্ছি যে কল্‌কেতার ভাষাই অল্প দিনে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা কওয়া ভাষা এক করতে হয়, ত বুদ্ধিমান অবশ্যই কল্‌কেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন। এখায় গ্রাম্য ইঁয়াটিকেও জলে ভাসান দিতে হবে। সমস্ত দেশের যাতে কল্যাণ, সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের গ্রাম্যত্বটি ভুলে যেতে হবে। ভাষা—ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান, ভাষা পরে। হীরে মতির সাজ পরানো ঘোড়ার উপর, বাঁদর বসালে কি ভালো দেখায়? সংস্কৃতর দিকে দেখ গিয়ি। ব্রাহ্মণের সংস্কৃত দেখ, শবর স্বামীর মীমাংসাভাষ্য দেখ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য দেখ, শেষ—আচার্য শঙ্করের মায়াভাষ্য দেখ, আর অর্বাচীন কালের সংস্কৃত দেখ।—এখুনি বুঝ্‌তে পারবে যে, যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন বেশ-কথা কয়, মরে গেলে, মরা-ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তা-

শক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু একটা পচাভাব রাশীকৃত ফুল চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপ্‌রে, সে কি ধুম্—বড় পাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম করে—"রাজা আসীৎ"!!! আহাহা! কি প্যাচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ!!—ও সব ঘড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্নে যেতে আরম্ভ হল তখন এই সব চিহ্ন উদয় হল। ওটি শুধু ভাষায় নয়, সকল শিল্পতেই এল। বাড়ীটার না আছে ভাব, না ভঙ্গি; থাম্‌গুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা করে দিলে। গহনাটা নাক ফুঁড়ে ঘাড় ফুঁড়ে ব্রহ্মরাক্ষসী সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গহনায় লতা-পাতা চিত্র বিচিত্রর কি ধুম্!! গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি বগড়া হচ্ছে—তার কি কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভারত ঋষিও বুঝ্‌তে পারেন না; আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কি ধুম্! সে কি আঁকা বাঁকা ডামা ডোল্—ছত্রিশ নাড়ীর টান তার রে বাপ্। তার উপর মুসলমান ওস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত চেপে, নাকের মধ্য দিয়ে আওয়াজে সে গানের আবির্ভাব। এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝ্‌বে যে, সেটা ভাবহীন, প্রাণহীন—সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত—কোনও কাজের নয়। এখন বুঝ্‌বে যে, জাতীয় জীবনে যেমন বল আসবে, তেমন ভাষা শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নেই। তখন দেবতার মূর্তি দেখলেই ভক্তি, গহনাপরা মেয়েমাত্রই দেবী বলে বোধ হবে, আর বাড়ী ঘর দোর সব প্রাণস্পন্দনে ভগ্‌মগ্ করবে।

[১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে রামকৃষ্ণ মঠ পরিচালিত 'উদ্বোধন' পত্রের সম্পাদককে স্বামিজী যে পত্র লিখেন, তাহা হইতে উদ্ধৃত।]

বিখ্যাত লেখক হেনরিক ভ্যান লুনের কাকা ভ্যান্ গগের একখানি ছোট স্কেচ কিনে এনেছেন। আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং পরিচিত ব্যক্তির নীরব ও সরব ভর্ৎসনা তাঁর ওপর বর্ষিত হতে লাগল—আরে করেছ কি! ঐ উন্মাদের আঁকা ছবির কোন মূল্য আছে!

কিছুকাল পরের কথা। নিউইয়র্কের মাদুঘরে ভ্যান্ গগের চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সারা দেশের মানুষ যেন পাগল হয়ে ছুটে এসেছে প্রদর্শনী দেখতে। চতুর্দিকে দারুণ উত্তেজনা। শেষ পর্যন্ত পুলিশ ডেকে ভীড় সামলাতে হল।

শিল্পের ক্ষেত্রে শেষ বিচার বলে কিছু নেই।

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

টি. এস. এলিয়ট।

সমকালীন ইংরেজ কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি এলিয়ট, এ ব্যাপারে মতানৈক্য একেবারেই অনুপস্থিত। সবচেয়ে বড় কথা হল, এলিয়ট এমন একজন পুরুষ, যিনি তাঁর নিজের যুগের দ্বিধা, সংশয়, যন্ত্রণা, জিজ্ঞাসা প্রভৃতি মৌলিক মানসলক্ষণকে আত্মস্থ করতে পেরেছেন। তাঁর চিন্তা বা কাব্যজিজ্ঞাসা অনেকের ভেতর তর্কের ঢেউ তুলেছে হয়ত, কিন্তু সব তর্ক স্বীকার করেও এটা বলতে দ্বিধা থাকা উচিত নয় তিনি একজন মস্ত বড় প্রভাবশালী কবি। এবং এমন কবি যিনি দেশে-বিদেশের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে অনেক মৌলিক জিজ্ঞাসা তুলে দিয়েছেন। সে জিজ্ঞাসার ঝড়ে কারো কারো রুচির পরিবর্তন ঘটেছে, কারো কারো বা কাব্যদৃষ্টির পরিধি বেড়েছে। সম্ভবতঃ আধুনিক তরুণ কবির দলে অধিকাংশই এলিয়ট-পাঠে দারুণ আসক্ত। এ হেন এমন কথনে যদি স্পর্ধা ফেলে তবে অতিকথনের মূর্খতায় তা নিশ্চয়ই পর্যবসিত হবে না,—ভারতীয় কবিকুলের মধ্যে আমরা এলিয়টকে কাব্যগুরু হিসেবে না দেখলে আমাদের ক্ষতি নেই। কিন্তু যেখানে তাঁকে জীবনভাষ্যে অনুভব করার প্রয়োজন স্পষ্ট, সে হল একজন কবিমানুষের সমগ্র জীবনজিজ্ঞাসায়। আংশিক বা খণ্ড খণ্ড অনুভূতির দাস হওয়াতেই আধুনিক ভারতবর্ষীয় শিল্পী জীবনের ধ্যান ভেঙ্গে, একথা রবীন্দ্রনাথের পরেও বলতে হয় বলে দুঃখের শেষ নেই? তবু এটা সত্য। এলিয়ট একজন তেমন জীবিত বৃদ্ধ ৭২ বছরের কবি, যাঁর তারুণ্য এখনো চকল উত্তপ্ত এ যুগের সমগ্র চরিত্রের সংশয়িত, দ্বিধাগ্রস্ত, আতংকিত রূপ-জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজার মধ্যে।

॥ ২ ॥

মিসিসিপি উপত্যকার সেন্ট লুইস নামক স্থানে ১৮৮৮ সনে এলিয়টের জন্ম হয়। এলিয়ট-পরিবার আমেরিকার শিক্ষার জীবনে গত দু'শ বছর ধরে নেতৃত্ব করে এসেছেন। হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানী গুণী হিসেবে এ-পরিবারের অনেকেই নামডাক অর্জন করেছেন। ১৯১৪ সনে তিনি ইংল্যাণ্ডে এসে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। এর আগে ফ্রান্স ও জার্মানী উভয় দেশে পড়াশুনা করেন। প্রথম মহাযুদ্ধে বিশ্বে একটা পরিবর্তন দেখা দিল। চিন্তা এবং জীবনাচরণ উভয়বিধ ব্যাপারে সে পরিবর্তনের স্রোত এলিয়টকে নাড়া দিল। তিনি এ পরিবর্তনের স্রোতে আন্দোলিত নবজীবনের স্পষ্ট আভাস দেখায় ধরতে পেরেছিলেন। এ নবজীবনের পরিচয় সহজতার বদলে জটিলতায় ভেতর, নিশ্চয়তার পরিবর্তে সংশয়ের এবং এ জটিলতা আর সংশয়—প্রথম মহাযুদ্ধে ধ্বস্ত বিভ্রান্তচিত্ত মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল। সমালোচক এলিয়ট প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন। তারপর তাঁর Prufrock and Other Observations ১৯১৭ সনে বেরুল। ওই একই বছরে তিনি 'Egotist' কাগজের সহকারী সম্পাদকের পদে গৃহীত হলেন। ১৯১৯ সন পর্যন্ত ওই কাগজের সহকারী সম্পাদকের কাজ করার পর নিজে 'Criterion' কাগজ বের করলেন। ১৯২২ সনে 'Criterion' বেরুল এবং চলল ১৯৩৯ সন পর্যন্ত। এলিয়ট Faber & Faber প্রকাশন-সংস্থাতে যোগদান করলেন ১৯২৩ সনে। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'The Waste Land' বেরুল ১৯২২ সনে। এই বইটিই তাঁকে বিশ্বখ্যাতি এনে দিল। "দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড" বেরোয় তাঁর 'Criterion'-এ। "ওয়েস্ট ল্যাণ্ড" বেরুবার পরেই তিনি ইংরেজী সাহিত্যে একজন মাথা ব্যক্তি বলে পড়লেন। আজ পর্যন্ত তাঁর সে অধিকার কেড়ে নেবার মত দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি দেখা

যেননি। এলিয়ট শুধু একজন কবি বা সাংবাদিকই ছিলেন না। গদ্য লেখক এবং সমালোচক হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা বিশ্বস্বীকৃতি এনে দিয়েছে। ১৯২০ সনে তাঁর সমালোচনা-সংকলন 'The Sacred Wood' বেরোয়। ১৯৪৪ সনে তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'Four Quartets' প্রকাশিত হল।

The use of Poetry and the use of Criticism, The Idea of a Christian Society, এবং Notes towards the Definition of Culture তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গদ্যগ্রন্থ। ১৯৪৮ সনে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর প্রায় প্রতিটি বই-ই বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। পৃথিবীর সবদেশের তরুণ সাহিত্যসেবীদের ওপর এলিয়টের প্রভাব ব্যাপকভাবে অনুভূত।

নাটক লিখেও এলিয়ট স্বাতন্ত্র্য ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। 'Murder in the Cathedral' নাটকটি তাঁর বহুল অভিনীত হয়েছে, যদিও ক্যাথেড্রালগুলোতে অভিনয়ের জন্য বিশেষ করে রচিত হয়েছে। কাব্যনাটিকায় এলিয়টের রীতি-নীতি আধুনিক তরুণ কবিকুল বহুলাংশে অনুসরণ করেছেন। অডেনের কাব্যনাটিকাতে এলিয়টির ছাপ সুস্পষ্ট।

॥ ৩ ॥

এলিয়ট সম্পর্কে একটি কথা সহজেই বলা যেতে পারে যা সমকালীন কবিরা শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষ্য করতে পারেন। তা হ'ল বিশ শতকের গর্ভে নানাবিধ বিশেষতঃ জীবনসম্পর্কীয় যে আন্দোলন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে শুরু করে নিরন্তর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এমনকি এখনো পর্যন্ত, সে বিরাট আন্তর্জাতিক আন্দোলনের তিনি হলেন সচেতন এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন আন্তর্জাতিক নাগরিক। ইংল্যাণ্ড তাঁর বাসভূমি হতে পারে, ইউরোপীয় সাহিত্যের ঐতিহ্য স্বীকারে তিনি নিষ্ঠাবান হতে পারেন, কিন্তু তাঁর চিন্তার ভেতর একটি সর্বজনীন ভাব লুকিয়ে রয়েছে। প্রত্যেকেরই চিন্তার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার্য এবং যেহেতু চিন্তার স্বাতন্ত্র্যের ফলে পারস্পরিক মতানৈক্য দুর্গান্তরকম প্রকট বলে এলিয়টের সঙ্গে চিন্তার বিরোধ আছে অনেকের সাথে, কিন্তু এ-সর্বজনীন ভাব বিশ শতকের উৎপাদন। এলিয়ট বিশ শতকের উৎপাদন, এ-বিশেষ সর্বজনীন ভাবকে পুরোপুরি আত্মসাৎ করে লেখার ভেতর সে-ছাপকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই তাঁর লেখার কদর আন্তর্জাতিক। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় তাই তিনি সমাদরে গৃহীত, পঠিত এবং অনুকৃত-ও হয়েছেন। ভারতবর্ষে তেমন একজন পুরুষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আর এ সর্বজনীন ভাব সাহিত্যের জিজ্ঞাসায় অন্তত বিশ শতকের সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রীতিমত প্রয়োজন।

নিজস্ব বিশ্বাস গড়ে তুলতে না পারলে ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর ভুয়ায় পরিণত হয়ে যায়। এলিয়টের এ-বিশ্বাস তীব্র আছে। চার্চের দিকে তিনি মুখ ফিরিয়েছেন নিজ বাড়ির লোকদের বিশ্বাসের বাইরে। ইংল্যাণ্ডে এসে তিনি চার্চে নিয়মিত যেতে শুরু করেছেন। তিনি ধর্মীয়ভাবে সমাজ-নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী।..... the only possibility of control and balance is a religious control and balance; that the only hopeful course for a society which would thrive and continue its creative activity in the arts of civilisation is to become Christian.' উদ্ধৃত অংশটিতে লেখক এলিয়টের ধর্ম-বিশ্বাসের স্বরূপ রীতিমত সুস্পষ্ট। তবে তাঁর The Idea of a Christian Society থেকে এটাও সুস্পষ্ট হয়, ক্রিশ্চিয়ানিটির নিষ্ঠাবান 'ভক্ত' হতে পারেন তিনি, কিন্তু গোঁড়ামি তাঁকে বশীভূত করে নি। দু'দুটো মহাযুদ্ধে আত্মিক বিশ্বাসের সংকট দেখা দিয়েছে এবং তার থেকে আস্তে আস্তে সে সংকট সর্বত্র নাক গলিয়ে এখনকার মানুষের জীবন করে তুলেছে আস্থাহীন। এ-ধরণের সমস্যা সম্পর্কে উপরের বইটিতে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। এবং এলিয়টের এ-বইটি সর্বত্র সমাদর পেয়েছে।

কবি এলিয়ট সাংবাদিকতাতেও একটি বিশিষ্ট চরিত্র আরোপ করেছেন বিশেষতঃ স্বপ্রতিষ্ঠিত The Criterion সম্পাদনা করতে গিয়ে। এ কাগজটি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ১৯২২ থেকে ১৯৩৯ সন পর্যন্ত সম্পাদনা করেছিলেন। এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিও যথেষ্ট কুড়িয়েছিলেন। এ কাগজটি সম্পাদনা করতে গিয়ে তিনি দুটি বিষয়ের দিকে বিশেষতঃ নজর দিয়েছিলেন। যেমন, তাঁর নিজের ভাষায়—

'.....first to find out who were the best writers, unknown or little known outside of their own country, whose work deserved to be known more widely. Second I tried to establish relation with those literary periodicals abroad, the aims of which corresponded most nearly to my own.'

সমালোচক এলিয়ট বিশ্বসাহিত্যে অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে সমাদৃত। সমালোচনা কী লক্ষ্য নিয়ে চালিত হবে, এ সম্পর্কে এলিয়ট বলছেন, 'Criticism must always profess an end in view, which, roughly speaking, appears to be the elucidation of works of art and the correction of taste.....The critic, one would suppose, if he is to justify his existence, should endeavour to discipline his personal prejudices and cranks—tares to which we are all subject—and compose his differences with as many of his fellows as possible, in the common pursuit of true judgement.' তিনি আরো বলেছেন, Comparison and analysis are the chief tools of the critic.'

উপরের অংশগুলো থেকে সমালোচক এলিয়টের ব্যক্তিত্বের স্পষ্ট পরিচয় মেলে।

এলিয়ট ঐতিহ্যের অনুকৃতিকে পছন্দ করতেন না, কিন্তু ঐতিহ্যের ধারাকে স্বীকার করতেন। এ ঐতিহ্যের ধারা তাঁর সমাগ ব্যক্তিসত্তাকে পশ্চাদ্ধাবনে তৎপর করে নি, বরং বর্তমানের চেতনাকে করেছে সমৃদ্ধ, পুষ্টপুষ্ট এবং দিয়েছে সম্মুখদৃষ্টি ও গতি। কবির দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি অনুপম ভঙ্গিতে এবং ভাষায় যা বলেন তা চিত্তাযোগ্য। তিনি বলেছেন: The emotion of art is impersonal, And the poet cannot reach this impersonality without surrendering himself wholly to be work done. And he is not likely to know what is to be done unless he lives in what is not merely the present, but the present moment of the past, unless he is conscious, not of what is dead, but of what is already living.'

এলিয়ট সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সত্যই বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'তাঁর গদ্যে পদ্যে যতখানি জিজ্ঞাসার সন্ধান পেয়েছি, তা আধুনিক কালে একান্ত দুর্লভ। হয়তো এই অর্থে বর্তমান ইংরেজী সাহিত্যে তাঁর প্রভাব এত পরিব্যাপ্ত, হয়তো এই অর্থে তিনি ভবিষ্যতের পূজ্য।' বাংলা সাহিত্যের হট্টগোলে যারা ক্ষুব্ধ লোভে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে কাণ্ডজ্ঞানহীন এবং মতপায়ক হয়ে সাহিত্যিকের আভিজাত্য কুড়ানোতেই সর্বপণ, তাদের দৃষ্টি- এবং রুচি পরিশীলনের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এবং সে অর্থে এলিয়ট-পাঠ অতি আবশ্যক।

শ্রীসুদর্শন পাল

সমাজ ও সাহিত্য

আদর্শবাদী সাহিত্যের অপ্রতুলতা। — নারায়ণ চৌধুরী

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের কতকগুলি লক্ষণ নিয়ে আজ আলোচনা করব। পূর্বের যুগের তুলনায় আজ লেখকের সংখ্যা অনেক বেশী; তাঁদের রচনার বৈচিত্র্য ও বিস্তারও চোখে পড়বার মত। নানা বিষয় নিয়ে আজ বই লেখা হচ্ছে এবং লেখায় তথ্যের প্রতি মনোযোগও বেড়েছে পূর্বের তুলনায় অনেকগুণ বেশী। এক সময়ে সমাজের উচ্চ স্তরের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা নিয়ে বই লেখাটাই ছিল রেওয়াজ। অভিজাত ও ধনবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষদের সুখ-দুঃখের কাহিনী সাহিত্য রচনায় সবিশেষ স্থান জুড়ে থাকত। এখন আর সে কথা বলা যায় না। এখন নিম্নবর্গের ও অনুন্নত সমাজের মানুষদের নিয়েও বই লেখা হচ্ছে বিস্তর। গত পঁচিশ বছরের ভিতর এক জেলে-মালো শ্রেণীর লোকদের জীবন নিয়েই পাঁচ-ছয় খানা বই লেখা হয়েছে দেখতে পাই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' দিয়ে যে প্রক্রিয়ার শুরু, অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম,' সমরেশ বসুর 'পদ্মা', আবদুল জব্বারের 'ইলিশ মারির চর' প্রভৃতি বইয়ে সে ধারাটি আরও বেশ কিছুদূর সম্প্রসারিত হয়েছে।

তার উপর, বিষয়ের বৈচিত্র্য ও পরিধানকীর্তির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ভূগোলেরও বিস্তার ঘটেছে। এখন আর বাংলা ভাষায় নাগাদের অথবা রাজস্থানীদের অথবা পাঞ্জাবী মেহাতীদের নিয়ে উপন্যাস-গ্রন্থ রচনা করা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। বস্তুতঃ এই-জাতীয় গ্রন্থ ইতোমধ্যেই দুই-চারি খানি লেখা হয়েছে। হয়তো এ সমস্ত বইয়ের ভিতর দৃষ্টিভঙ্গীর অগভীরত'র ছাপ স্পষ্ট, চিত্রিত বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচয়ও যথেষ্ট নিবিড় নয়; তা হলেও ওই নূতন খাতে চেষ্টাটারই একটা দাম আছে। বাংলা ভাষার লেখকদের কূপমণ্ডূকতার অখ্যাতি এতে আস্তে আস্তে কমে যাবার পথ প্রশস্ত হচ্ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অজানার আকর্ষণ মনুষ্যস্বভাবের একটি অন্তর্নিহিত বৃত্তি। মানুষ সাহিত্যপাঠে এই অজানার আকর্ষণকে বিশেষভাবেই চরিতার্থ করতে চায়। এতে তার চিত্তের বিস্তার হয়। সুতরাং বর্তমানের অগভীরতা মেনে নিয়েও বলতে হয়, সাহিত্যের ভৌগোলিক পরিধির সম্প্রসারণ ঘটায় সাহিত্যের অগ্রগতিই সূচিত হচ্ছে।

কিন্তু সব লাভের পিঠেই একটা ক্ষতির দিক থাকে। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। তবে এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় এই যে, ক্ষতির পরিমাণ লাভকেও ছাড়িয়ে যাবার মত হয়েছে; শুধুমাত্র ব্যতিক্রম-দৃষ্টান্ত মনে করে এ ব্যাপারে সান্ত্বনা লাভের উপায় নেই। কোন এই ক্ষোভ প্রকাশ করছি সেটি একটু বিশ্লেষণ করে বোঝাবার অপেক্ষা রাখে।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের রচনাকীর্তি ঘটেছে; বিষয়বৈচিত্র্য বেড়েছে, ভৌগোলিক পরিধির সম্প্রসারণ হয়েছে—এ-সব খুবই সত্য কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু সাহিত্যের মর্মবস্তুর প্রকৃতি ও চরিত্রের মাপকাঠিতে যদি সাহিত্যের বিচার করতে হয় তা হলে বলতেই হবে যে, সমকালীন বাংলা সাহিত্যের বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সুস্পষ্ট নিম্নগামিতা ঘটেছে। বাংলা সাহিত্য থেকে আদর্শবাদী মনোভাব ও অতীপ্সা বলতে যে জিনিস বোঝায়, তা লোপ পাবার মত হয়েছে। জাতিগঠন, দেশগঠন, মানুষগঠনের কোন সংকেত আজকের সাহিত্য থেকে পাবার যো নেই। এখনকার লেখকবর্গ সাহিত্যের এই দিকটি নিয়ে বিশেষ কিছু মাথা ঘামান বলেও মনে হয় না।

আমাদের নিকট জাতিগঠন সমাজগঠন মানুষ-গঠন সাহিত্যকর্মের অত্যাবশ্যক এবং অতিশয় মূল্যবান এক দিক। আজকের দিনের বেশীরভাগ লেখক বোধহয় সাহিত্যের এই ধারণা স্বীকার করেন না। তাঁরা তাঁদের রচিত সাহিত্যের ভিতর সমাজের ভাল-মন্দে-মেশানো যথার্থ ছবিটি ফুটিয়ে তুলতে পারলেই মনে করেন তাঁদের দায়িত্ব তাঁরা যথাযথ ভাবে পালন করলেন। বড়জোর তাঁরা সাহিত্যের সৌন্দর্য বা আনন্দের তত্ত্বটিকে স্বীকার করেন; তার বাইরে তাঁদের দৃষ্টি পৌঁছয় না। অন্তত কালীন সাহিত্যিকবর্গ বাস্তবতার আদর্শে বিশ্বাসী, ঔচিত্যানৌচিত্যের ধারণা তাঁদের মনে স্থান পায় বলে বোধ হয় না। অর্থাৎ সমাজের প্রকৃত রূপ যা, সেইটে বিকৃত হোক কুৎসিত হোক তাকেই ফোটোগ্রাফারের দক্ষতায় নির্ভুল ভাবে পরিবেশনে এঁরা সচেষ্ট, সুকুমারমতি পাঠকদের মনে এর কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা ভেবে দেখবার মত কল্পনা-শক্তি এঁদের অনেকের নেই। সমাজের মঙ্গলামঙ্গল নিয়ে চিন্তা করাটা যেন এঁরা সাহিত্যের বহির্ভূত বিষয় বলে মনে করেন।

পূর্বে এরকম ছিল না। আগেকার যুগে বাংলা সাহিত্য কেবলমাত্র নন্দনবাদী বা তাত্ত্বিক কলাকৈবল্যবাদী [Art for Art's sake] ধারণা নিয়ে চলত না, তার ভিতর আদর্শবাদী অভীপ্সারও সযত্ন প্রণোদনা ছিল। আমাদের পুরাতন লেখকেরা জাতিগঠনকে সাহিত্যের বহির্ভূত বিষয় বলে গণ্য করতেন না, বরং এই দুইয়ের মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে এই বিশ্বাস করতেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর 'চরিত-কথা' গ্রন্থে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আলোচনা প্রসঙ্গে এইরূপ মত প্রকাশ করেছেন যে, আমাদের দেশে সাহিত্য বস্তুটি ধর্ম থেকে বিশ্লিষ্ট ছিল না। বৃহত্তর অর্থে সাহিত্য ধর্মেরই এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। এই অর্থে রামেন্দ্রসুন্দর দেবেন্দ্রনাথকে একজন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক আখ্যা দিয়েছেন।

এই অর্থ অযথার্থ নয়। আমাদের পুরাতন প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থগুলির মর্ম একটু বিশ্লেষণ করে দেখলেই বোঝা যাবে যে, সমাজকল্যাণের আদর্শের সঙ্গে তাদের ওতপ্রোত সম্পর্ক ছিল। রামায়ণ-মহাভারতের কথা ছেড়েই দিলাম, এমন যে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য ও আনন্দের আধার কালিদাসের কাব্য, ওই কাব্যেও আমরা দেখি যে কী নিপুণ হস্তেই না মহাকবি সেখানে সুন্দরের সঙ্গে শিবের মিলন ঘটিয়েছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অভিজ্ঞান শকুন্তলা ও কুমারসম্ভব কাব্যদ্বয়ের দৃষ্টান্ত দিয়ে এই কথাটি আমাদের ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

আধুনিক কালের পটভূমিতে এসেও আমরা দেখতে পাই যে, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচনা সমাজকল্যাণের আদর্শের দ্বারা গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল সমাজকল্যাণ। অনেকে এই বলে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পমানসের সমালোচনা করে থাকেন যে, তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে শিল্পের দাবিকে অবদমিত করে নীতির দাবি তথা সমাজের দাবি বড় হয়ে উঠেছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে', 'চন্দ্রশেখরে' তিনি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উর্ধ্বে সমাজকে স্থান দিয়ে প্রকারান্তরে শিল্পের উর্ধ্বে নীতির স্থান নির্দেশ করেছেন। কিন্তু এই সমালোচনা ভ্রান্ত ভাসা-ভাসা সমালোচনা মাত্র। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন লেখক। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে সৌন্দর্য ও সমাজকল্যাণের অদ্বয়ী সমন্বয় সাধিত হয়েছিল। তাঁর মত উচ্চাঙ্গের সৌন্দর্যস্রষ্টা আমাদের কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে আর কে হয়েছেন? বিরুদ্ধবাদী সমালোচকেরা যে বলেন বঙ্কিমের ভিতর নীতিবাদের আধিক্য ছিল, তাঁদের সেই সমালোচনাকে এক কথায় নিরস্ত করা যায় এই বলে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় এতবড় কবি বাংলা সাহিত্যের মূলতঃ গদ্যলেখকদের মধ্যে আর জন্মায় নি।

প্রকৃত প্রস্তাবে, দ্বিজ কবি-সমালোচক মোহিতলালের একটা প্রধান পীড়াদায়ই ছিল এই যে, বঙ্কিম প্রথমে কবি, তারপর গদ্যলেখক। তাঁর গদ্য, কাব্যের শ্রেষ্ঠোৎকর্ষের লক্ষণমণ্ডিত। প্রমাণ 'কপালকুণ্ডলা', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'মৃণালিনী', 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রভৃতি গ্রন্থ।

সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে নীতিবাদ তথা আদর্শবাদের আত্যন্তিক প্রভাবের অভিযোগ টেকে না। যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন পূর্ণাঙ্গ লেখক সেহেতু বঙ্কিমের চিত্তে একই কালে আমরা সৌন্দর্য প্রাণতা ও সমাজবোধের স্ফূর্তি লক্ষ্য করি। সাহিত্য তাঁর নিকট নিতান্ত মুনাফা চর্চার উপলক্ষ্য ছিল না; তিনি গভীর শিল্পপ্রাণ লেখক হয়েও জাতিগঠন তথা মনুষ্যত্বের সাধনার আদর্শকে তাঁর রচনায় অতি উচ্চমূল্য দান করেছেন। বস্তুতঃ প্রথম শ্রেণীর লেখকদের একটি লক্ষণই এই যে, তাঁরা শিল্প ও সমাজকে যুগপৎ তাঁদের রচনায় সার্থক সমাহারে সমাবিষ্ট করেন। তাঁদের লেখনীতে শিব ও সুন্দরের পাশাপাশি অবস্থান। এবং, বলাই বাহুল্য, সত্য শিব-সুন্দরের সহচর।

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের মূলবাণী দেশাত্মবোধের বাণী, মনুষ্যত্ব সাধনার বাণী! অথচ কে না জানে যে উপন্যাস হিসাবেও এই গ্রন্থের দাবি অগ্রগণ্য? 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে ও পরে 'দেবীচৌধুরাণী' গ্রন্থে হিন্দু-দাম্পত্য আদর্শের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষিত হয়েছে, তা বলে ওই দুটি গ্রন্থের শিল্পমূল্য কি কিছু কম? 'কৃষ্ণকান্তের উইল' আর 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে দাম্পত্য-বিশ্বাসহীনতা আর অসংযমের অমঙ্গলকর পরিণাম বর্ণিত হয়েছে তা বলে কি ওই দুই উপন্যাসের সৌন্দর্যের আবেদন, শিল্পোৎকর্ষের দাবি খাটো হয়ে গেছে? মোটেইতা নয়। আসলে বঙ্কিম এখনকার লেখকদের তুলনায় অনেক, অনেক বেশী পূর্ণতাপ্রয়াসী লেখক ছিলেন। তাই তিনি শিল্পকেও উপেক্ষা করেন নি, সমাজকেও উপেক্ষা করেন নি। তাঁর শিল্পদৃষ্টিতে সমগ্র দেশ ও সমাজ সংহত হয়ে ধরা দিয়েছিল। এখনকার ক্ষুদ্রপ্রাণ একান্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিযুক্ত তথাকথিত শিল্পমনস্ক লেখকেরা সেই উদার বৃহৎ আদর্শের মহিমা কেমন করে উপলব্ধি করবেন?

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বেলায়ও আমরা দেখি যে, তাঁর শিল্পচৈতন্যের পশ্চাতেও একটি উদার বৃহৎ জাতিচেতনার পটভূমিকা ছিল। শুধু তাই নয়, ওই জাতিচেতনা ক্রমপ্রসারিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিকতায় পর্যবসিত হয়েছিল। জাতিপ্রেম দিয়ে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিণত জীবনের ভাবনায় ও মানবিকতায় বিশ্বমৈত্রীর উদার-বিস্তৃত আঙিনায় গিয়ে উপনীত হয়েছিলেন। যদিও রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি এবং সর্বকালের বরণীয় একজন মহাকবি, তা হলেও এই জাতিপ্রেম তথা বিশ্বপ্রেমের পৃষ্ঠপটটি বাদ দিলে তাঁকে সামান্যই বোঝা যাবে। আদর্শবাদী অভীপ্সার দ্বারা কবির শিল্পী-মানস নীরন্ধ্র ভাবে ভরপুর ছিল। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ তো এখনকার সংকীর্ণ খণ্ডিত শিল্পাদর্শের সাজার্থেই কবিধাত্র ছিলেন না; তিনি ছিলেন জাতীয় ভাবনা তথা বিশ্বভাবনার কবি। রবীন্দ্রনাথের সাধনায় সমগ্র ভারতবর্ষের আত্মা তাঁর শ্রেষ্ঠ বাণীরূপ লাভ করেছিল। শেষের দিকের রচনায় তিনি পৃথিবীর কবি হয়ে উঠেছিলেন। কবির ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের ভিতর আদর্শবাদী মনোভাবের প্রভাব ব্যতিরেকে এ জিনিস কখনও সম্ভব হত কি না সন্দেহ। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথের মত একাল-সেকালের আর যাঁরা মহাকবি ছিলেন তাঁদের নিয়তিই এই যে, তাঁরা তাঁদের কাব্যে মনুষ্যত্বের জয়গান গাইবেন। যে কোন দেশের যুগজীবনে একজন মহাকবির ভূমিকা হচ্ছে তৎকালীন যুগচেতনাকে তাঁর রচনায় সার্থক শিল্পরূপ দান করা। সংশ্লিষ্ট কবির পক্ষে আদর্শবাদী প্রণোদনা ভিন্ন এই দায়িত্ব পালন যে সম্ভব নয় তা আমরা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারব।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গোরা' ও 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে সমাজ-কল্যাণের আদর্শ বিশেষ ভাবে প্রচার করেছিলেন। 'গোরা' উপন্যাসে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বমৈত্রীর অন্তরঙ্গতা সবলে উত্তোলিত হয়েছে। অত্যুগ্র জাতীয়াভিমান যে জাতিপ্রেমের নামে মানুষের জীবনে সমূহ অমঙ্গল ঘনিয়ে আনে এবং এই অমঙ্গলের কবল থেকে মুক্তির একমাত্র রাস্তা যোগাতে ভুলে গিয়ে আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্রের অনুশীলন—এই তত্ত্বটিকে কবি এই বিশালায়তন উপন্যাসটিতে একটি মনোরম কাহিনীর মধ্য দিয়ে অতি সুকৌশলে প্রথিত করেছেন। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে প্রায় একই রূপ তত্ত্ব প্রচারিত হয়েছে। সেখানেও উৎকট জাতীয়তাবাদী মনোভাবের অসারতা প্রতিপাদিত হয়েছে, তবে লেখকের অভিপ্রায় অনুযায়ী কাহিনী সেখানে অন্য দিকে বাঁক নিয়েছে। একটি ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনীর আবরণে রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে এই গ্রন্থে স্থূল স্বার্থবুদ্ধি তথা লোভাতুর অধিকারচেতনার উপরে মহান ক্ষমাধর্মের জয় ঘোষণা করেছেন। তার উপর আছে হিংসার বীভৎসতার চিত্রাঙ্কন। 'গোরায়' এই শোষোক্ত ভাবটি নেই। তা বরং পরে 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে আরও পূর্ণতর রূপ পেয়েছে।

সে যাই হোক, এখানে আমাদের বলবার কথা হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথ আদর্শবাদী অভীপ্সার দ্বারা সতত-চালিত হয়েছেন। তিনি নিছক ঔপন্যাসিক ছিলেন না। উপন্যাসের জন্যই উপন্যাস রচনার নীতিতে তিনি বিশ্বাস করতেন না। একটি বাস্তবানুসারী কাহিনী অবলম্বন করে এবং কেবলমাত্র ওই কাহিনীকেই উপজীব্য করে উপন্যাস রচনার যে রেওয়াজ আজকের দিনে সবিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে, তেমন উপন্যাসশিল্পের আদর্শের প্রতি কবির শ্রদ্ধা ছিল না। তা যদি থাকত, তা হলে তিনি কাহিনীমাত্র-সার উপন্যাসই রচনা করতেন, উপন্যাসের মধ্যে জাতিকল্যাণের বাণী বিশ্বকল্যাণের বাণী অনুপ্রবিষ্ট করাবার চেষ্টা করতেন না। আসলে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণদৃষ্টির অধিকারী লেখক। উপন্যাসের শিল্পগত দাবি পুরোপুরি ভাবে স্বীকার করে নিয়েও তিনি শিল্পতেই আত্মচেতন ছিলেন না, শিল্পকর্মের ভিতর শিল্পের অতিরিক্ত কিছু সংযোজন করতেন। সেই 'অতিরিক্ত কিছু' হল আদর্শবাদ অনুপ্রাণিত সমাজ-কল্যাণ তথা জাতিগঠন তথা বিশ্বমানবতার বাণী। বলা প্রয়োজন, এই আদর্শবাদ কিছু শিল্পের বহিরঙ্গবস্তু নয়, তটি যে-কোন মহতী শিল্প-ভাবনার মধ্যেই অনুস্যূত।

বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের পর থেকেই বাংলা সাহিত্যের সুর ক্রমশঃ নেমে গিয়েছে বলে মনে হয়। সত্যি বটে শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প-উপন্যাসে নির্যাতিত-শোষিত শ্রেণীর মানুষের প্রতি, বিশেষতঃ এতাবৎ-অত্যাচারিত নারীজাতির প্রতি, যথেষ্ট সহানুভূতি ও দরদ প্রকাশ করেছেন; তবে সচেতন ভাবে একটা বলিষ্ঠ আদর্শবাদ, একটা সজ্ঞান জাতিগঠনের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি লেখনী সঞ্চালন করেছেন এমন কথা বলা যায় না। সমাজকল্যাণের দিক থেকে বিচার করলে, পরোক্ষ সুফল শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির থেকে আমরা অনেক পেয়েছি, কিন্তু বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের মত বোধ করি শরৎচন্দ্র সজ্ঞান জাতিগঠনের মনোভাব দ্বারা চালিত হয়ে সাহিত্য রচনায় অবতীর্ণ হন নি। 'পল্লীসমাজ' 'অরক্ষণীয়া' 'পথিতমশাই' প্রভৃতি উপন্যাসে আদর্শবাদী মনোভাবের কিছু অভিব্যক্তি আছে বটে, তবে তা খুব জোরালো নয়। পল্লীসমাজের রমেশ এবং পথিতমশাইয়ের বৃন্দাবন আদর্শবাদী মনোভাবের বশবর্তী হয়ে গ্রামগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে আমরা দেখতে পাই, কিন্তু তাদের এই ভূমিকাকে ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠেছে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের ভূমিকা রমার প্রতি রমেশের প্রেম এবং পরিত্যক্তা কুসুমের প্রতি বৃন্দাবনের প্রেমের আকর্ষণ তাদের জীবনের পরিবর্তনকে গঠনাত্মক খাতে চালিত না করে ভিন্ন খাতে চালিত করেছে।

রমেশ আর বৃন্দাবনই এই, অরক্ষণীয়ার অতুল তো সেই তুলনায় অনেক দুর্বল চরিত্রের মানুষ। 'প্রীকান্তে' ইন্দ্রনাথ এবং 'শেষ প্রশ্নে' রাজেন আদর্শবাদ আর সমাজকল্যাণের ভূমিভূমির উপর দাঁড়িয়ে আত্মপ্রকাশ করল, কিন্তু পরক্ষণেই তারা হারায় মিলিয়ে গেল। সংসার রঙ্গমঞ্চের কেন্দ্রমধ্যে বারেকের জন্য অবতীর্ণ হয়েই যেন তাঁরা পরমুহূর্তে অদৃশ্য হল। শরৎচন্দ্র আমাদের মনে গভীর দরদের উদ্রেক করেছেন, নির্যাতিতের প্রতি আমাদের চোখে মমতার অশ্রু ঝরিয়েছেন; কিন্তু যাকে বলা হয় সচেতন আদর্শবাদ বলিষ্ঠ জাতিগঠনাত্মক চেতনা, তেমন কোন অভীপ্সা তাঁর রচনাবলীর মধ্যে প্রকাশমান হয়ে উঠেছে কিনা সন্দেহ। শরৎচন্দ্র মূলতঃ শিল্পী এবং খুব উঁচুদরের শিল্পী; তবে খুব উঁচুদরের মনীষী বা চিন্তাশীল ব্যক্তি নন। তাঁর মনোগঠনের এই ঘাটতির জন্যই তিনি অপরাজেয় কথাশিল্পী হওয়া সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ শিল্পী হওয়ার মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

এখনকার কথাসাহিত্য, যতদূর আমার মনে হয়, শরৎচন্দ্রের রেখাচিহ্ন অনুসরণ করে চলেছে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের ধারায় চলছে না। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের ধারায় না চলবার কারণ, এখনকার লেখকদের মধ্যে আদর্শবাদের অপ্রতুলতা। এঁদের অধিকাংশই বাস্তববাদী লেখক, বাস্তবকে অনুসরণ করতে ভালোবাসেন; কিন্তু সেই বাস্তবানুকরণের ফল ভালো হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে তা নিয়ে ওঁদের মাথাব্যথা নেই। সমাজকল্যাণ বস্তুটিকে তাঁরা সাহিত্যের সঙ্গে অসম্পর্কিত বিবেচনা করে তথাকথিত একপেশে শিল্পসৃষ্টিতে আত্মনিমজ্জিত থেকে নৈষ্কর্ম্য সার্থকতা লাভের চেষ্টা করেন। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ। এরকম বড় লেখকদের দ্বারা নয়। তাঁরা সমাজ ও শিল্পকে বেষ্টন করে একটি অখণ্ড দৃষ্টির অনুশীলন করেন তাঁদের সাহিত্যমধ্যে—দুপ্ত বেণীর মত তাঁদের রচনায় এক বেণী শিল্প ও অন্য বেণী সমাজাদর্শের খাতে বিন্যস্ত। যে শিল্প কেবলমাত্র বাস্তবের প্রতিফলন চেষ্টাতেই নিঃস্বসৃষ্টি, সেই শিল্প যতই নিখুঁত আর যথাযথভাবে রূপায়িত হোক, তেমন সাহিত্যকর্মের ফল সমাজ মনের উপর খুব বেশী সুরপ্রসারী হতে পারে না বলেই তাঁদের বিশ্বাস। তাই তাঁরা নিজ নিজ শিল্পসৃষ্টিতে শুধুমাত্র বাস্তবানুকৃতির নীতি মাত্র করেই সন্তুষ্ট থাকেন না, কল্পনার উপাদানও তাতে যথেষ্ট মিশিয়ে দেন,—এমন কল্পনা যা পাঠককে উদ্দীপিত করে, তার মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে সহায়তা করে। নিছক বাস্তবানুকৃতি ফটোগ্রাফীর বাড়া শিল্প-কৃতিত্ব কোন সময়েই দাবি করতে পারে না। বলা বাহুল্য, ফটো-শিল্পী আর চিত্র-শিল্পী এক পর্যায়ের শিল্পী নন।

সমসাময়িক কালের লেখকদের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আর সুবোধ ঘোষের লেখায় কিছু আদর্শবাদী অভীপ্সার পরিচয় পাওয়া যায়; অন্য লেখকেরা এর প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন বলে বোধ হয় না। তারাশঙ্করের 'পঞ্চগ্রাম'-এর দেবু ঘোষ ও 'ধাত্রীদেবতা'র শিবনাথ আদর্শবাদের ছাঁচে ঢালাই দুটি চরিত্র। 'বিচারক' উপন্যাসের বিচারক আর 'সপ্তপদী' উপন্যাসের রেভারেণ্ড কৃষ্ণেন্দুর মধ্যেও আদর্শবাদী প্রেরণার যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে। কিন্তু কেন জানি না তারাশঙ্করের রচনার এই সকলীয় আদর্শবাদ সত্ত্বেও জনমনের উপর তাঁর সাহিত্যের প্রভাব খুব গভীরতাসারী হতে পারে নি। ওঁর রচনাধর্মের মধ্যে নিশ্চয় কোথাও একটা সূক্ষ্ম অপূর্ণতা আছে, যার ফাঁক দিয়ে ওঁর লেখার অনেক সদ্গুণের সুফলই ঝরে গিয়ে থাকবে।

সুবোধ ঘোষ একজন উচ্চ শক্তিসম্পন্ন লেখক, তাঁর রচনার ভিতর শিল্পনৈপুণ্যের যেমন নিঃসংশে প্রমাণ রয়েছে, তেমনি তাঁর আদর্শবাদী মনোভঙ্গিটিও লক্ষ্য করবার মত। এমন কিছু তিনি লেখেন না

ধার ভিতর অস্পষ্ট ভাবে হলেও সমাজকল্যাণাদর্শের কিছু-না-কিছু ছায়াপাত না ঘটে। সমাজকে বিপথে চালিত করবার দায়িত্ব নিতে অন্তত সুবোধ ঘোষ নারাজ, যেমন অধিকাংশ বাস্তববাদী লেখকই উৎসাহের সঙ্গে ওই দায়িত্ব মেনে নেন। সম্প্রতি সুবোধ ঘোষের কিছু নূতন গল্প পড়লুম। চমৎকার তাঁর লিখনভঙ্গি, চমৎকার তাঁর চরিত্র-চিত্রণের ক্ষমতা। প্রতি গল্পের মধ্যেই একটা বক্তব্য আছে, আর সেই বক্তব্য গঠনাত্মক, সমাজাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত, কল্যাণধর্মী। এইটেই তো চাই। লেখক শিল্পও সৃষ্টি করবেন, আবার সমাজকে প্রেরণাও যোগাবেন। কাহিনীর রস পরিবেশনে তাঁর মধ্যে ঔদাসীন্য থাকবে না; আবার অন্যদিকে সেই কাহিনীর বক্তব্যের মধ্যে বিশেষ হিতকর তাৎপর্য পরিস্ফুটনেও তিনি সাতিশয় যত্নবান হবেন। সুবোধ ঘোষের লেখায় এই দুই শর্তই যোগ্যতার সঙ্গে পরিপূরিত। তাই তাঁর সাহিত্যের একটা বিশেষ মূল্য আছে আজকের বাংলার সমাজে ও সাহিত্যে। শুধু ঘাটতির মধ্যে, তাঁর রচনায় রসের কিছু কম। মননের প্রাচুর্য তাঁর প্রাণাবেগ কিয়ৎপরিমাণে শুষে নিয়েছে বলে মনে হয়। সুবোধ ঘোষ যদি আর একটু রসজ্ঞ লেখক হতেন, তবে বর্তমান বাংলা কথা-সাহিত্যে তাঁর স্থান নিঃসন্দেহে সকলের পুরোভাগে হত।

শক্তিমান কথাসাহিত্যিক দীপক চৌধুরীর বিগতকালীন লেখায় আদর্শবাদী প্রেরণার লক্ষ্য করেছিলাম। তাঁর 'শঙ্খবিষ' উপন্যাসখানা এই ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্যের সপক্ষে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করছে। কিন্তু ইদানীং তাঁর ওই সুস্থ প্রবণতা কিঞ্চিৎ মন্থীভূত হয়ে এসেছে বলে মনে হয়। খুব সম্ভব লেখার পরিমাণকীর্তির দায় মিটাতে গিয়ে এই দিকটায় আর আগের মত মনোযোগ দেবার অবসর তিনি পান না।

সমকালীন কথাসাহিত্যিকদের সম্পর্কে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এঁদের প্রায় সকলেই নিজেদের সমাজ-সচেতন বলে দাবি করেন, অথচ প্রকৃত সমাজকল্যাণকামী মনোভাবের বাষ্পও খুঁজে পাওয়া যায় না এঁদের লেখায়। উন্নত চরিত্রের কিংবা উন্নত ভাবের কোন আদর্শ এঁরা সমাজের সামনে ধরে দেন না। এঁরা আজকের দিনের প্রবহমান ভাববারার মানদণ্ডে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চান। কিন্তু মজা এই যে, বঙ্কিমের রচনার মধ্যেই সমাজাদর্শ সচেতন ভাবে ক্রিয়াশীল ছিল, এখনকার লেখকেরা প্রচার তো সুবাদেই শুধু সমাজ-সচেতন, কার্যতঃ নয়। কুলি-মজুর-খেপানো লেখাই যদি সমাজচেতনার নিদর্শন হয় তো এঁরা সমাজ-সচেতন লেখক অস্বীকার করব না, তবে প্রকৃত সমাজচৈতন্যের আদর্শের প্রতিফলন থেকে যে এঁরা অনেক দূরে আছেন সে কথা অপ্রিয় হলেও স্বীকার করতে হবে বৈকি। যে সাহিত্যে উন্নত ভাব, উন্নত চরিত্রাদর্শ সন্ধানে সঞ্চারিত করবার চেষ্টা করা হয় না, তেমন সাহিত্যকে আদর্শবাদী সাহিত্য কোনমতেই বলা যায় না।

ভারত-ভ্রমণে

আল্ডুস হাক্সলী

ছেলেবেলায় হাক্সলীর বাসনা ছিল বড় হয়ে চিকিৎসক হবেন। বাড়ির সকলেও তাই চাইতেন। পড়াশুনোও সেইভাবেই এগোচ্ছিল, কিন্তু স্কুলের পড়া শেষ হবার আগেই ওঁর এমন একটা চোখের অসুখ দেখা দিল যে কয়েক মাসের মধ্যে উনি একেবারে অন্ধই হয়ে রইলেন। চোখ ভালো করবার জন্য নানা চিকিৎসা চলতে লাগলো। হাক্সলী কিন্তু এই সময়টাও পড়াশুনো চালিয়ে যেতে লাগলেন অন্ধদের জন্য ব্যবহৃত ব্রেইলী পদ্ধতিতে। আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত এইভাবেই চললো হাক্সলীর, তারপর ক্রমশঃ ওঁর চোখ ভালো হ'তে লাগলো—বর্তমানে উনি আবার প্রায় স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন।

হাক্সলীর সাহিত্যিক জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল যা প্রায় নাটকীয় বলা চলে। অত্যন্ত ট্র্যাজিক। ওঁর প্রথম রচিত উপন্যাসখানি কোনোদিনই উনি চোখে দেখতে পান নি। সে সময়ে হাক্সলী অন্ধ ছিলেন। টাইপ্ করে উপন্যাস রচনা করলেন একখানা। অনেকেই তারিফ করলো সে রচনার। কিছুদিন পর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে টাইপ করা সেই পাণ্ডুলিপি খুঁজতে আরম্ভ করলেন হাক্সলী। কিন্তু তা আর পাওয়া গেল না কোথাও। হারিয়ে গেছে।

আল্ডুস হাক্সলী [Aldous Leonard Huxley, born in 1894] সম্প্রতি ভারতবর্ষে এসেছিলেন। এর আগেও একবার ভারতবর্ষ ঘুরে গেছেন হাক্সলী, সে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবে বিদেশী লেখকেরা এদেশে অকস্মাৎ সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলেন, হাক্সলী ওঁদেরই একজন। Eromo yellow [1921], Antic Hay [1923], Those Barren Leaves [1925] প্রভৃতি প্রথম দিকের বইগুলি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল বিদেশী সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহশীল মহলে হাক্সলীর একটি নিজস্ব পাঠকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। এঁরা কারা? কি পেলেন এঁরা হাক্সলীর রচনায়? এ কথা মনে রাখা দরকার যে হাক্সলী এমন একটা সময় ইংরেজী সাহিত্যে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যখন মম, ওয়েল্স, বেনেট, জয়েস, উলফ্, ফরস্টার, লরেন্স প্রভৃতির অনুকরণ দিকে দিকে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে ফেলেছিল। আর তা ছাড়া এঁদের যাঁরা পূর্বসূরী অর্থাৎ কনরাড, মেরেডিথ, ওয়াইল্ড, শ, কিপলিং, বাটলার, গলসওয়ার্দি এবং হার্ডি প্রভৃতির রচনাও প্রচুর পরিমাণে সর্বত্র সমাদৃত হ'তো। কাজেই, স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে: হাক্সলী নতুন কি কথা বললেন যার ফলে অতোগুলি অসাধারণ প্রতিভাশালী লেখকের যুগে আবির্ভূত হয়েও নিজের বিশিষ্ট আসন করে নিতে পেরেছিলেন?—এক কথায় বলতে গেলে হাক্সলীর সাহিত্যসাধনার মূল লক্ষ্য হ'লো সাহিত্যের নৈতিক মান উন্নয়ন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে একটানা বিশ-পঁচিশ বছর যখন বিভিন্ন দেশের প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকদের রচনার প্রধান বিষয় ছিল হয় শ্রেণী সংগ্রাম আর না হয় ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ব্যবস্থার জটিলতা পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরা, হাক্সলী ঠিক সেই সময়েই বলতে আরম্ভ করলেন যে বাইরের সমাজ ছাড়াও ব্যক্তির প্রবলতর শত্রু আছে। সে হ'লো ব্যক্তি নিজে বা তার একই শ্রেণীভুক্ত অন্য কেউ। জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যক্তি মানুষের যে অবিশ্বাস ও অনিশ্চয়তাবোধ এবং তার ফলে যে সততার অভাব দেখা যায় খিয়োডোর গামব্রিল (Antio Hay) নামে একটি ক্ষুদ্র মাঝারের চরিত্রের ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে

হাক্সলী তা' দেখাবার চেষ্টা করেছেন। এবং উনিশ শ' তেইশ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হাক্সলীর এই উপন্যাসখানি একাধিক কারণে স্মরণীয়। প্রথমতঃ এ বইতে হাক্সলীর জীবনদর্শন সর্বপ্রথম ধানা বাঁধতে আরম্ভ করে এবং দ্বিতীয়তঃ এ বইখানা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে হাক্সলীর স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়।

Antic Hay-র পূর্বেও হাক্সলী আরও পাঁচখানা বই প্রকাশ করেছিলেন। যার একখানা কাব্য-[Leda, 1920] এবং এইখানাই হাক্সলীর সর্বপ্রথম প্রকাশিত বই। Antic Hay-র পরে আজ পর্যন্ত হাক্সলী আরো পনেরো ষোলোখানা বই প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে অন্ততঃ ছয়খানা বই বিশ্বসাহিত্যে স্থায়ী সংযোজন। এ ছয়খানা হ'লো Point Counter Point, Brave New World, Ends and Means Eyeless in Gaza, After Many a Summer Dies the Swan এবং The Perennial Philosophy. এ বইগুলির নাম কালানুক্রমিকভাবেই দেওয়া হ'লো। এর মধ্যে Brave New World একখানা নতুন ধরনের ব্যঙ্গাত্মক রচনা—এ বইএর রচয়িতা হিসেবে হাক্সলীকে অনেক সমালোচক গালিভার্স ট্রাভেলস-এর লেখক সুইফ্‌টের সঙ্গেও তুলনা করেছেন। ভবিষ্যৎ পৃথিবীর সম্ভাব্য রূপ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের আলোকে আলোচনা করেছেন হাক্সলী। যার ফলে দেখা যায় যে জীব হিসেবে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব শেষ পর্যন্ত নেহাত একটা কথার কথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং মানুষ সর্বতোভাবে বিজ্ঞানের দাসে পরিণত হ'চ্ছে।

Ends and Means এবং The Perennial Philosophy রীতিমত দার্শনিক আলোচনা গ্রন্থ। বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্য দিয়ে যে নীতিমত সমস্যাগুলি হাক্সলী পরোক্ষভাবে পাঠকসমাজের সামনে তুলে ধরেছেন, সেইগুলিই বিশদভাবে এবং একেবারে দার্শনিক পদ্ধতিতে-আলোচনা করেছেন এই বই দু'খানাতে।

বাইবেল এবং খ্রীষ্টধর্মের প্রতি হাক্সলীর অনুরাগের বিষয় ওঁর উপন্যাসের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। হিন্দু ধর্ম-দর্শন এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধেও যে হাক্সলী যে কোনো সাধারণ শিক্ষিত হিন্দুর চাইতে কতো বেশী জানেন তা' ওঁর প্রবন্ধগুলির পাঠকমাত্রেই দেখলে বিস্মিত হবেন।

একসময়ে হাক্সলী সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষিত মহলে একটা বিশেষ কৌতূহল দেখা গিয়েছিল ওঁর ব্যক্তিগত জীবন যাপনের বৈশিষ্ট নিয়ে। হাক্সলী জাতিতে ইংরেজ, স্থায়ীভাবে বসবাস করেন আমেরিকার চলচ্চিত্র কেন্দ্রে অথচ তিনি হলেন যাকে বলে ঘোরতর moralist—গীতা এবং বেদান্তের একনিষ্ঠ পাঠক। এ হেন ব্যক্তি অসাধারণ না হয়ে যায় না। হাক্সলী এ শতাব্দীর একজন অসাধারণ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে। কারণ উনি যে শুধু একজন প্রতিভাশালী ঔপন্যাসিক বা প্রাবন্ধিক তাই নয়। মানব জীবনের নানা জটিলতা ভেদ করে তার মূল রহস্যের অনুসন্ধান করা এবং গোটা মানবজাতিকে একটা সুস্থতর নীতিবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ওঁর সারা জীবনের অক্লান্ত সাধনাও কম কথা নয়। অনেকের কাছে তো এইটেই আলডুস হাক্সলীর সর্বাপেক্ষা বড় পরিচয়।

হাক্সলী পরিবার তিনপুরুষ ধরেই শিক্ষিত সমাজের আলোচনার বিষয় হয়ে রয়েছেন। গত শতাব্দীর প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের লেখক টি. এইচ. হাক্সলী ছিলেন আলডুস হাক্সলীর পিতামহ। আলডুস হাক্সলীর বাবা ছিলেন বিখ্যাত 'Cornhill Magazine'-র সুযোগ্য সম্পাদক। হাক্সলীর বড়ভাই জুলিয়ান হাক্সলীও এযুগের একজন স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক।

—সুনীল কুমার নাগ

গ্রন্থ-পরিচয়

মানব বিকাশের ধারা—প্রফুল্ল চক্রবর্তী। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। ৩১৬ পৃষ্ঠা। দাম : বারো টাকা।

কথাটা রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার বলেছিলেন। মনকে বাঁধতে ও গড়তে হলে যেমন আর্টের প্রয়োজন আছে, তেমনি বিজ্ঞানেরও। বাঁচতে যখন হবে, তখন চাই বাস্তব দৃষ্টি ও মনের শক্তি। জীবনের পথে পথে নানান সমস্যা ও সংশয়, নানা বাধা ও বিপত্তি; তাদের মুখোমুখি হয়ে লড়াই এবং সমস্যা-সংশয়-বাধা পেরিয়ে যাবার চেষ্টাতেই জীবনচর্যার যথার্থ সার্থকতা। জীবনের পালা তখন পরিণত হয় জীবনলীলায়, মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করে। মনুষ্যত্ব অর্জনের বিবিধ উপকরণ, বিজ্ঞান তাদের অন্যতম। সংস্কৃতির ভিত্তি গঠনে এর অবদান ও প্রয়োজন তাই অসামান্য।

আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রথম পর্বে বিজ্ঞান ছিল অন্যতম পাঠ্য বিষয়। মধ্যপর্বে বেশ কিছুদিন অবহেলার পর একে আবার প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নতুনতর শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলনের পর প্রসারতাও বেড়ে গেছে। তবু এই রীতির অসম্পূর্ণতা ঘোচে নি। যে বয়সে শিশু বিজ্ঞান পড়ে, সে স্তরে তার বোধ অর্ধজাগ্রত; যখন জাগরণ সচেতন হয়, ঠিক তখনই 'হিউম্যানিটিজ' ও 'সায়েন্স' দ্বিধাবিভক্ত। যারা প্রথমদলে জন্মায়েৎ হয়, বিজ্ঞান তাদের অ-পাঠ্য; অথচ এই সময়েই বিজ্ঞানের সঙ্গে কিছু যোগ থাকলে পরবর্তী জীবনে তা কার্যকরী হতে পারে। কিন্তু তা হয় না। অন্যদিকে, বিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থাও এমন গতানুগতিক; ছাত্রদের মনে কিছু তত্ত্ব যদিবা সঞ্চিত হয়, বিজ্ঞান বুদ্ধি উদ্দীপ্ত হয় না। স্কুল ও কলেজ-পাঠ্য বইগুলি ছাত্রদের মন গড়ার দিক থেকে আদৌ অক্ষম। ফলে, বিজ্ঞান মুখস্থ হয়, মনস্থ হয় না।

এই পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করেই রবীন্দ্রনাথ বিদ্যায়তনের পরিধির বাইরে 'জনপ্রিয়' বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ দিয়েছেন এবং স্বয়ং অগ্রণী হয়েছেন। এছাড়া বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এবং অন্য কয়েকটি সংস্থার প্রচেষ্টাও স্মরণীয়, ব্যক্তিগতভাবেও কয়েকজন প্রাগ্রসর। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রেও লেখক ও বই যেমন সংখ্যালঘু, তেমনি পাঠকসমাজও অল্পমনস্ক। এই কারণেই বিজ্ঞান-বিষয়ক যে কোন সৎ রচনা অকুণ্ঠ অভিনন্দনযোগ্য। এই ধরণেরই একটি বই প্রফুল্ল চক্রবর্তী রচিত 'মানব বিকাশের ধারা'।

'মানব-বিকাশের ধারা' জৈবিক অভিব্যক্তি এবং সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশের গোড়াকার কথা। বিশ্বের বৃহৎ মঞ্চে প্রাকৃতিক নির্বাচনের পথে জীবনের যে প্রথম আবির্ভাব ঘটল, তার উল্লেখ করে লেখক গ্রন্থারম্ভ করেছেন। অতঃপর মাটি আবহাওয়ার পালাবদলে প্রাণের রূপবদল হল। দেখা দিল এককোষী জীব, মানুষ গঠন, উদ্ভিদ ও তার রূপান্তর, সরীসৃপ, ডিনোসর, স্তন্যপায়ীদের অভিযাত্রা। অভিব্যক্তির চলনপথে আবির্ভূত হল মানুষ। তার দেহের গঠন, সমান্তরাল অন্যান্য প্রজাতিদের সঙ্গে সম্পর্ক, এবং স্বাতন্ত্র্য বিচার করে লেখক মানুষের মনের গঠন, তার প্রবৃত্তি-অনুভূতি ইত্যাদিরও জাতি নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন, সামাজিক বৃত্তির উৎস ও বিকাশের পর্যালোচনা করেছেন। পরবর্তী পর্বে আদি মানবের রূপরেখা আলোচিত হয়েছে, সেইসঙ্গে বংশগতি এবং জাতিবিভাগের রীতিও। এর পরের পর্বে প্রাগৈতিহাসিক জীবনপালা স্বভাবতঃই আলোচ্য বিষয়, যেখানে প্রস্তরযুগের সংস্কৃতির অধিকার এবং কৃষির আবিষ্কারে ও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার

শক্তি পেয়ে মানবসমাজে যখন বৈপ্লবিক রূপান্তর, ধীরে ধীরে নগর-সভ্যতার গোড়াপত্তন। সুমের-মিশর-ভারতের (সিন্ধুসভ্যতা) আদি সভ্যতার বর্ণনা দিয়ে গ্রন্থ শেষ হয়েছে।

সাধারণ ইতিহাসগুলি প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সুরু ; প্রচলিত বিজ্ঞান-গ্রন্থগুলিতে প্রাণের বিকাশ আলোচিত, কিন্তু অতি সংক্ষেপে। 'মানব-বিকাশের ধারা'-র লেখক সেই সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তকে বিস্তৃত পটভূমিকা দিয়েছেন, যে অস্পষ্ট সুদূর লোকে প্রাণের প্রথম স্পন্দন, যে স্পন্দনের পরিচয় সম্পর্কে বিজ্ঞান আজও স্বল্পজ্ঞানী। স্বভাবতঃই লেখকের প্রয়াস দুঃসাহসিক পথে পরিক্রমারত। ফলে, অনেক অজানা বিষয় যেমন পাঠকের গোচরে আসে, অনেক ভ্রান্ত ধারণারও নিরসন ঘটে। অপিচ, লেখক কেবলমাত্র জৈবিক অভিব্যক্তির সীমাতেই আবদ্ধ থাকেন নি, মানুষের সাংস্কৃতিক তৎপরতারও যথাযথ বিশ্লেষণ করেছেন। বইটি তাই কেবলমাত্র প্রাণের ক্রম-ইতিহাস নয়, মানবসভ্যতার আদি ও ক্রমিক ইতিবৃত্তও।

ভূমিকায় লেখক বলেছেন, 'মানুষের উদ্ভব ও উদ্‌বর্তনের কাহিনী মোটামুটিভাবে সংক্ষেপে বলবার চেষ্টা করেছি। বিশেষজ্ঞদের জন্য নয়। কাহিনীটি আমি সাধারণ পাঠকদের জন্য বলতে চেয়েছি।' ভূমিকা এবং ভূমির মধ্যে সাযুজ্য সহজেই চোখে পড়ে। ভাষা সহজ, বাগ্‌ভঙ্গি সরল, বিজ্ঞানসম্মত কঠিন শব্দরা অনুপস্থিত, সাধারণ পাঠকদের পক্ষে সহজবোধ্য। এই সঙ্গে সেকালের প্রাণ-জগতের কিছু ছবি, পরিভাষা এবং গ্রন্থপঞ্জীও সংযোজিত হয়েছে, সেগুলি স্বতঃ-মূল্যবান।

লেখক একথাও জানিয়েছেন যে, বিশেষজ্ঞদের আলোচনাগুলি তিনি সাজিয়েছেন মালার আকারে। মালাটি সর্বাঙ্গসুন্দর হলে সুখী হতাম। যে নিরপেক্ষতা বিজ্ঞান আলোচনার স্বগত বৈশিষ্ট, তা এখানে সর্বত্র বজায় থাকে নি, বিশেষ একটি মতবাদের ধারণা মাঝে মাঝে উগ্র হয়ে উঠেছে। অনেক বক্তব্য বিতর্কমূলকও। বিশ্লেষণ-পদ্ধতি প্রায়শই প্রত্ন-সম্বিত এবং আলোচনার গতিও অস্বচ্ছন্দ ও মন্থর। বক্তব্যকে আরও সহজ সরল সুতীব্র করার অবকাশ ছিল। যদিও বিভিন্ন মতবাদ ও ধ্যানধারণাকে লেখক পরিধির বাইরে রাখতে চেয়েছেন, তবু সর্বত্র তা পারেন নি। পারা সম্ভবও নয়। এবং সেইজন্যেই বক্তব্য যে, আদিম কৃমি ও তদ্বিধ মৃত্যু-পুনরুজ্জীবনের ধারণার উল্লেখ যখন তিনি করেছেন, তখন আদিম 'কৃত্যের' বিস্তৃত বিবরণ দেওয়াও উচিত ছিল। সুমের-মিশর-সিন্ধু সভ্যতার ধর্মবিষয়ে আলোচনাও প্রত্যাশিত। এতদ্‌ভাবে সংস্কৃতির ছবিটি অসম্পূর্ণ। জীবনের উৎস ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সাম্প্রতিকতম বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা ও বক্তব্যের ঘনিষ্ঠতাও কাঙ্ক্ষিত।

তবু লেখকের প্রচেষ্টা সাধুবাদের যোগ্য এবং এ বই সাধারণের অবশ্যপাঠ্য। যে দেশে বিজ্ঞানের চর্চা সত্ত্বেও বিজ্ঞানবুদ্ধি পশ্চাদ্‌গত, মন সস্তুপাক সাহিত্য-শিল্পে উল্লসিত এবং প্রাগাধুনিক অন্ধ কুসংস্কারে অবগাহনরত, সে দেশে এ জাতীয় রচনা সাদরে বরণীয়। এবং সবচেয়ে বড়ো দুঃখ এই, এমন একখানি উপকারী ও উপাদেয় বইয়ের ছাপা বাঁধাই ব্যাপারে প্রকাশক নিরুদ্যমভাবে ও যত্নসহকারে অবহেলিত।

শব্দযাত্রা—পবিত্র মুখোপাধ্যায়। কবিপত্র প্রকাশ ভবন; ১সি, রাণী শংকরী লেন, কলকাতা ২৬। চল্লিশ পৃষ্ঠা। দাম দু টাকা।

প্রচ্ছদে তমাবৃত অরণ্যভূমি, তার ওপারে ধ্রুবপদের অবস্থান, 'বলো, সুন্দর আছে কোন উপকূলে', কয়েক পাতা পরে রেখা-বর্ণাঙ্কিত একটি অসুন্দর মুখের ব্যঞ্জনা, তারপরে কাব্যারম্ভ। পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদশিল্পে এবং অলংকরণে ধার আভাস, উদ্ধৃত ধ্রুবপদে ধার বিভাব, কাব্যদেহের স্বাধীভাবই তার বীজ-মূল। পড়তে পড়তে কিছুদূর অগ্রসর হলে স্বতঃ মনে পড়ে তিনজন কবিকে : গ্যেটে, মিলটন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

পবিত্র মুখোপাধ্যায় তরুণ কবি। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দর্পণে অনেক মুখ' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়জনের দৃষ্টি তিনি স্বাধিকারে আকর্ষণ করেছিলেন। 'শবযাত্রা' তাঁর নতুনতম প্রকাশিত রচনা। মুক্তছন্দী কবিতার সংকলন নয়, স্বয়ং একটি দীর্ঘায়ত কাব্য, যার পাঁচটি সর্গ : পতন-আর্তনাদ-শবযাত্রা—সহমরণ—প্রার্থনা। সর্গগুলি বিচ্ছিন্ন নয়, সংশ্লিষ্ট; কাহিনী নয়, কবিমানসের সন্দিগ্ধ-প্রবাহ। স্বর্গভ্রষ্ট এক দেবশিশুর যন্ত্রণা ও অবসাদ, কান্না ও আলামুখী প্রার্থনা কাব্যটির বিষয়বস্তু। এই দেবশিশু স্বয়ং কবি। কিন্তু শুধু কবিই নয়, কবিকণ্ঠে বিশ শতকের ব্যথা ও বিলাপ রূপ নিতে চেয়েছে। একের অক্ষরে অনেকের বক্তব্য উচ্চারিত হয়েছে। সমষ্টির বেদনা সংহত হয়েছে ব্যষ্টির লেখনীতে।

কাব্যের মূল ভাবের উদ্দীপনে গ্যেটে ও মিলটনের কথা কবির সচেতন মনোজগতে ছিল কিনা জানিনা, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ দত্তের উপস্থিতি ঘন-প্রত্যাশিত। সুন্দরের সন্ধানে 'নিখিল নাস্তির' সেই বহুখ্যাত ভাবনা এখানেও, এবং সেইসঙ্গে পরিচিত শব্দ বাক্যাংশ এবং 'অর্কেস্ট্রা'-র রূপকর্মের প্রতিভাস। সমগ্র কাব্যটি বহুবৃত্তময়ী ছন্দে লেখা, ভাবের অনুগমনে যার পরিবর্তন এবং তাল-লয় বারে বারে বদলে গেছে।

তা ব'লে কবি অনুকারক মাত্রও নন। চিন্তার স্বাতন্ত্র্যে, ছন্দের বৈচিত্র্যে, চিত্রকল্পের কারুকার্যে স্বগত বিশিষ্টতাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের কবিধর্ম চরিত্রবান এবং কবিকর্ম শ্রুতিসুখদ। বিশেষতঃ, ছোট কবিতার ঘনতায় দীর্ঘ কাব্যের যে অনুশীলন ও নিরীক্ষা তিনি এখানে করেছেন, তা নতুন স্বাদ সহৃদয়ের দাবি রাখে।

আঙ্গিকগত রূপসজ্জায় কবিপত্র প্রকাশ ভবনের সদর আন্তরিকতা এবং রুচিবোধ সুন্দরের অভিসারী।

শুভদাস ভট্টাচার্য

সাময়িক পত্রের লেখকদের লক্ষ্য হওয়া উচিত পাঠক চিত্তের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসা। প্রবন্ধ এমনভাবে লিখতে হবে যার আবেদন সর্বজনীন। একই বিষয়কে বিভিন্নভাবে লেখা যেতে পারে এবং তার আবেদনও বিভিন্ন। কোন এক বিখ্যাত মাসিকপত্রের সম্পাদক মার্গ এ রোজ একটি বিষয়ের দু'টি বিভিন্ন নাম দিয়েছেন এইভাবে :—

১। মোটর গাড়ী শিল্পের অর্থনীতি।
২। আমেরিকার ধনী ব্যক্তিগণ—একটি অনুসন্ধান।
৩। আমেরিকার মিলিওনেয়ার।
৪। হেনরি ফোর্ড কিভাবে ধনী হলেন।
৫। আমি কিভাবে বিত্তশালী হলাম—ফোর্ড।
৬। আপনি কিভাবে ধনী হতে পারেন।

কোন্ শিরোনামার আবেদন অধিক তা কি ব্যাখ্যা করে বলতে হবে?

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ ৪ ॥

সাউথ রাজা স্ট্রীটের চৌমাথায় মোড়ে সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে পুলিশ অফিসটা পড়ে ঠিক বাঁ দিকে। এন্টনী দেখল সেই পাগলাটা সটান গিয়ে দাঁড়াল পুলিশ অফিসের সামনে ঝাঁকড়া পারীর ফুল গাছটার তলায়। সারাটা গাছ থোকা থোকা ফুলে ছেয়ে গেছে। শুধু তাই নয় সমস্ত ফুটপাথটাই বিছিয়ে আছে ঝরে পড়া পারীর ফুলে। দুপুরের রোদে আগুন বাতাস পারীরের হাল্কা মিষ্টি গন্ধে এই কর্মব্যস্ত এলাকাটুকুতে যেন খানিকটা আরামের আমেজ বুলিয়ে দিচ্ছে। এন্টনীর নাকেও সেই ঘ্রাণ এসে লাগল।

এদিকে লোকজন সব একে একে সরে যেতেই সেও আস্তে আস্তে এসে দাঁড়াল পারীর ফুল গাছটার তলায়। সাদা লম্বা লম্বা ফুলগুলো অবহেলায় পড়ে আছে। কত লোক তাদের মাড়িয়ে চলে গেছে। তবুও কতকগুলো বেশ তাজাই রয়েছে। এন্টনী তার ছেলেবেলার অভ্যাসমতো পারীর ফুল কুড়োতে লেগে গেল। এই পারীরের একটা দুর্নিবার আকর্ষণ আছে এন্টনীর মনে। এই পারীরের গন্ধের সঙ্গে তার অবচেতন মনে বহুদিনের সঞ্চিত সেই মুখখানা আবার চেতন মানসে ভেসে এল। সেই অদ্ভুত মেয়ে! সেই তামার সঙ্গে কাঁচা সোনার খাদ মেশানো রং। সেই হাল্কা লিপস্টিকে রাঙা চ্যাটালো পুরু দুটি ঠোঁট। সেই মুক্তোর পাঁতির মতো সাজান নিটোল শুভ্র দাঁতের সারি। সারা অঙ্গ ঘিরে তার অপরূপ রূপ-লাবণ্য খেলা করত ভরাট যৌবনের। তারই মাথায় সে প্রথম দেখেছিল এই পারীরের গোড়ে। তার বিনি-বাহার খোঁপা ঘিরে সাপের ফণার মতো উদ্যত হয়ে ছিল লম্বা লম্বা পারীরের দল।

অবাক হবারই কথা। পারীর এখানকার অতি সাধারণ ফুল হলেও কোন মেয়ে একে মাথায় পরে না। সেই প্রথম এন্টনী একজন মেয়ের মাথায় এই ফুল দেখল।

ছেলেবেলা থেকেই এন্টনীর পারীরের ওপর বড় ঝোঁক। পারীরের এমন একটা হাল্কা মিঠে মেজাজ আছে যে অন্য কোন ফুলের সঙ্গেই তাকে তুলনা করতে পারে না এন্টনী। পিচ্চি ফুলের গন্ধ খুবই মিষ্টি বটে, কিন্তু উগ্র রকমের মাতাল করা গন্ধ তার। মল্লিকাই-এর গন্ধ হয়তো তার থেকে কিছুটা নরম, কিন্তু পারীরের মতো এত স্নিগ্ধ নয়। মেয়েটিকে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, এ ফুল কেউ মাথায় দেয় নাকি?

মেয়েটি তার শাদা মুক্তোর মতো দাঁতের সারি ঈষৎ উন্মুক্ত করে একটু হেসেছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল—এ ফুলের নাম জান?

হ্যাঁ, জানি বৈকি। এতো পারীর।

মেয়েটা বলেছিল—পারীর হল এর সাধারণ নাম। এর আসল নাম হল মারমল্লি। কেউ কেউ একে নাগমল্লিও বলে। দেখ সাপের ফণার মতো কি রকম উদ্যত হয়ে আছে এর সারা দেহটা। আমার

খু-উ-ব ভাল লাগে। এর গন্ধ হাল্কা বটে কিন্তু বেশীক্ষণ শুঁকলে একটা নেশা লাগে দেখেছ? এক রকম সাপ আছে জান, তাদের চোখের দিকে চেয়ে থাকলে অল্প জন্তুর নেশা লেগে যায়। তখন সেই সাপটা তাকে আস্তে আস্তে গ্রাস করে। সেদিক থেকে নাগমল্লি নামটা এর অদ্ভুত সার্থক।

এন্টনী কথা বলে নি। কিন্তু মনে মনে বুঝেছিল সেই সাপটা তাকে আস্তে আস্তে গ্রাস করছে। সে তার সমস্ত মুখটা ডুবিয়ে দিয়েছিল মেয়েটির সাম্পু করা অজস্র চুলের রাশির মধ্যে। তারপর এন্টনী মনে মনে নিদারুণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল হঠাৎ। তাই সে ফুল কুড়ানো বন্ধ করে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে তার নজর পড়ল একটু দূরে এক জোড়া জলন্ত চোখ তার দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। পাগলাটা একটু দূর থেকে তাকে দেখছে। তার দু'চোখে জ্বলছে যেন আগুনের খাপরা! এন্টনীর চোখে তার চোখ পড়তেই সে তখুনি তার দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল। তারপর বলতে লাগল—এই নেঃ দু'লাখ। এই নেঃ পাঁচ লাখ। হল তো? যা যা হতভাগারা—এখন সব ভাগ—বলতে বলতে সে বন্দরের দিকে এগিয়ে চলল।

কিন্তু এন্টনী সেই জলন্ত চোখ দুটোকে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। যেন বহুদিনের অন্ধকারের আড়ালে লুকিয়ে থাকা একটা স্মৃতিকে মনে করিয়ে দিল চোখদুটো। ও চোখ কি এন্টনী আর কোথাও দেখেছে? বার বার সে আপন মনে নিজেকে এই প্রশ্ন করে চলল, যতক্ষণ না সে বন্দরের বড় গেটটার সামনে হাজির হল।

বন্দরের খোলা গেট দিয়ে সে নিতান্ত অন্যমনস্কেই বন্দরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ঢুকেই কিন্তু তাকে থমকে দাঁড়াতে হল। তার ভাবনায় ছেদ পড়ল একটা অদ্ভুত মেয়েলি গলায় চড়া আওয়াজে—হল্ট্।

সম্মুখে তাকিয়ে দেখল একটা বিরাট জমী জোয়ান লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার গোলপানা মুখে প্রকাণ্ড একজোড়া গালপাট্টা গোঁফ। দাড়ির নিচের দিকটা কামানো। কিন্তু গালপাট্টা গোঁফে আর ঝুলকিতে মিলে তাকে দেখাচ্ছে যাত্রার ভীমের মতো। সেই গোঁফের ওপর খেবড়া মতো একটা নাক। তার দু'পাশে জোড়া ভুরুর নিচে লাল টকটকে ডেলার মতো দুটো চোখ। কাস্টম্‌সের গেট কিপার।

ওই শরীর থেকে এই রকম মেয়েলী আওয়াজ! সত্যিই হাসির কথা বটে। এন্টনী দাঁড়িয়ে পড়ে লোকটার মুখের দিকে চাইল। সেও তার লাল লাল চোখদুটো ঠিক ভেড়ার চোখের মতো চুলু-চুলু অবস্থায় তুলে ধরল এন্টনীর মুখের দিকে। আশ্চর্য লোকটা আর কোন কথা বলে না। হল্ট বলে সেই যে সে চুপ করেছে তারপর তার মুখে আর কোন কথা নেই। মুখে চোখেও অন্য কোন ভাব নেই। এন্টনী অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

শেষে বললে—কি ব্যাপার?

মেয়েলি গলায় লোকটা উত্তর দিলে—এ গেট দিয়ে গাড়ি যাবার রাস্তা, পায়ে হেঁটে লোকেরা এখান দিয়ে যেতে পারে না। এন্টনী চেয়ে দেখল সত্যিই—তাই। তাকে পাশ কাটিয়ে গোরুর গাড়ির দল মচ মচ শব্দ করতে করতে চলেছে। শুঁটকিমাছ বোঝাই সব ক'টা। তাদের তীব্র বীভৎস গন্ধে এদিকটা যেন নরকে পরিণত হয়েছে। এন্টনী একটু সচেতন হতেই সেই গন্ধটা তার নাকে গিয়ে গা ঘুলিয়ে তুললো। বহুকালের অভ্যাস তার। তাছাড়া পাদ্রীয়ের গন্ধে মনে যে আমেজটুকু এসেছিল তার এতটুকুও এখন খুঁজে পেল না এন্টনী মনের মধ্যে। প্রায় দৌড়ে গেটের বাইরে চলে গেল সে। গেটের বাইরে পা দিতেই একটা লোক হাউ মাউ করে কেঁদে উঠে তার হাত জড়িয়ে ধরল। এন্টনী তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে মারিয়া হাসন।

আইয়ো, আইয়ো, আইয়ো [হায় হায় ধ্বনি]—আইয়া বাড়ি থেকে কখন কাউকে না বলে চলে এসেছেন। এই দুপুর রোদে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এমন করে ঘুরো খায় কেউ? এমনি করলে ক'টা দিনই বা শরীর ভাল থাকবে?

এন্টনী ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করতে লাগল রাস্তার ওপর। মারিয়া হাসনকে কোন রকমে ঠাণ্ডা করে সে বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

গেটের বড় গেট থেকে পার হতে গিয়ে আবার তার নজর পড়ল সেই পাগলাটির ওপর। সে এবার এসে দাঁড়িয়েছে রাস্তার বাঁ দিকে রেভেনিউ অফিসের সামনে ফুটপাথের ওপর। ফটমট করে চেয়ে আছে এন্টনীর দিকে। এন্টনীর অজানতেই তার পায়ের গতি একটু থানির জন্যে বন্ধ হয়ে এল। সে পাগলাটির মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে পাগলাটা আকাশের দিকে চেয়ে কিছু দিয়ে দেবার ভঙ্গিতে হাত ছুঁড়তে লাগল—নেঃ নেঃ এই দু'লাখ, এই চার লাখ। তুই কতো চাস? সতের লাখ! তা' এই নেঃ। যা হতভাগারা—ভাগ এখন! পালা বলছি!

বলতে বলতে শূন্যে হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে সে কতকগুলো কাল্পনিক লোকের দিকে তেড়ে গেল। এন্টনী এবার হাঁটতে শুরু করল বাড়ির দিকে। হাঁটতে হাঁটতে খালি মনে পড়তে লাগল পাগলাটার দাড়ি গোঁফ আর জটাবাঁধা চুলে ঢাকা মুখটা। সেই মুখের মধ্যে লুকোন দুটো চোখ যেন এন্টনীর কতো চেনা।

এন্টনী বাড়িতে ঢুকতেই গেটের দারোয়ান লম্বা সেলাম বাজিয়ে জানাল—হুসান কার্ভোজা অনেকক্ষণ তার জন্যে বৈঠকখানায় বসে অপেক্ষা করছে।

হুসান কার্ভোজার নাম শুনেই তার মনে পড়ল তার বাবা মারা যাবার ঠিক আগেকার সেই দিনটির কথা। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল মারিয়া হাসনের কথাগুলোও। ভাবল, কি মতলবে এসেছে হুসান তার কাছে? বৈঠকখানায় ঢুকতেই হুসান সোফা থেকে লাফ দিয়ে উঠে তার হাত জড়িয়ে ধরল—এই যে ইয়ং ম্যান! এসো এসো। আমি যে তোমার জন্যেই বসে আছি।

পরম হৃদ্যতার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানাল হুসান এন্টনীকে, যেন সেই-ই এই বাড়ির মালিক। তারপর বললে—তুমি যদিও আমাদের খুবই আপনার জন তবুও তোমাকে এখানে নবাগতই বলব আমি। তাই ভাবলাম যাই একবার একলা কেমন করে তোমার দিন কাটছে একটু খোঁজ নিয়ে আসি। যদিও আমার এই সময়টুকুর দাম অঙ্কের পাঁচয়ে ছাড়িয়ে যাবে, তবুও—

বলে চোখে মুখে বেশ খানিকটা জাঁকের হাসি হাসতে হাসতে হুসান বলতে লাগলেন—তবুও তুমি হলে আমার এক ধরের লোক, আমার বিশিষ্ট বন্ধু গড উইনের ছেলে। তোমার ওপর আমার একটা সামাজিক কর্তব্য আছে তো? ধরতে গেলে আমিই তোমার একরকম লোক্যাল গার্জেন।

বলতে বলতে ধূর্ত চোখ মেলে হুসান এন্টনীর মুখের ভাবটা খুঁটিয়ে দেখে নিল। সেখানে কোন রকম পরিবর্তন না দেখতে পেয়ে সে হি হি শব্দ করে একটা মোলায়েম হাসি হেসে আবার বললে—অবশ্য গার্জেন না বলে বন্ধু বললেই ভাল হয়। আজকালকার ছেলেরা আবার গার্জেনি বড় একটা মানতে চায় না তো? তা তুমি এতদিন ছিলে কোথায়?

এন্টনী নিস্পৃহ স্বরে জবাব দিল—লণ্ডনে।

হুসান গম্ভীর স্বরে সন্দেহ নিয়ে জিজ্ঞাসা করল—এই দারুণ যুদ্ধের সময় তুমি লণ্ডনেই ছিলে?

—না, মাঝে প্যারিস, বার্লিনেও ছিলাম।

—ওরে বাবা, সে যে আরও ভয়ংকর, আঁতকে উঠে বললে সুলান। বার্লিনে কি করতে গিয়েছিলে?

—জার্মানরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। সমানভাবে জবাব দিল এন্টনী। গলার স্বরে তার কোন পরিবর্তন নেই।

সুলানের চোখ দুটো ঠেলে যেন বার হয়ে আসছে নিদারুণ বিস্ময়ে। ভুরু দুটো ধনুকের মতো বেঁকে উঠে গেছে প্রায় কপালে। সে জিজ্ঞাসা করল—সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে কি করে?

এন্টনী সেই আগের মতোই নিস্পৃহ কণ্ঠে উত্তর দিল—সে অনেক কথা। অত কথা বলে আপনার দামী সময় আর নষ্ট করতে চাই না। তা একটু কফি খান দয়া করে।

ইতিমধ্যে বেয়ারা এক পেয়ালা গরম কফি আর কিছু কেকের টুকরো একটা ট্রের ওপর সাজিয়ে নিয়ে এল। সুলান সেদিকে তাকিয়েই হাঁ হাঁ করে উঠল—না না কিছু নয়। কফি টফি আমি খাইনে। যে কোন মিষ্টি আমার পক্ষে বিষ। তা ছাড়া পেটের দারুণ গণ্ডগোল, যা খাই হজম করতে পারি না। ডায়েবিটিস্, ডিস্-পেপ্‌সিয়া, ব্লাডপ্রেসার আর হার্ট-ট্রাবল্‌ই আমাকে জেরবার করে দিলে।

বলতে বলতে সুলানের ঘূর্তমীভরা চোখ দুটো কেমন যেন করুণ হয়ে উঠল। মুখখানা কিছুক্ষণের জন্যে ম্লান হয়ে গেল। গলার স্বরে নেমে এল রাজ্যের হতাশা। সুলান ভাঙা ভাঙা গলায় বললে—যদি তোমাদের মতো বাবা পেতাম তো একবার দেখিয়ে দিতে পারতাম।

কাকে যে সে কি দেখতো সে সব কথা উহ্য রইল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুলান কোঁৎ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর আগের আলোচনাটা সেই দীর্ঘশ্বাসের ঝড়ে উড়িয়ে দিয়ে বললে—তা তুমি উইলের প্রোবেট নেবার কি করছ?

এন্টনীর যদিও প্রশ্নটা ভাল লাগল না—তবুও জবাব দিল—সে ভার রামসন্স আয়ারকে দেওয়া আছে। তিনি যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন।

সুলান এবার ভাঙা গলার স্বরটা নিচে নামিয়ে এনে প্রায় গোপনীয় কথা বলবার ভঙ্গিতে এন্টনীকে বললে—দেখ, এই ডুন্ডুকুড়ি বড় ভয়ানক জায়গায়। হিটলারের জার্মানীও বোধহয় এত ভয়ংকর ছিল না। কাজেই খুব সাবধান হয়ে থাকবে। বিশেষত তুমি এখানে নবাগত আগন্তুক, তার ওপরে এই বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়েছ তুমি। তোমার বিপদ এখন পদে পদে। তবে তুমি যদি আমার বিশ্বাস করো তো আমার সবচেয়ে বড় কর্তব্য হবে তোমায় বাঁচান। এত বড় সম্পত্তির দেখাশুনো যদি নিজে না করতে পার—মানে তোমার তো আর এসব অভ্যাস নেই যে, তাই বলছিলাম তুমি আমার সাহায্য যে কোন সময়ে নিতে পার।

সুলানের কথার ফাঁকে এন্টনী তাকে দেখে নিচ্ছিল। সুলানের কথা শেষ হতেই সে জিজ্ঞাসা করল—কি রকম বিপদের কথা বলছেন আপনি?

গলা নামিয়ে প্রায় ফিস ফিস করে সুলান জবাব দিল—মেনেক্কারর‍া আমাদের ভয়ানক শত্রু। আমাদের মানে কাস্বারকারদের। এই কাস্বারকারদের মধ্যে সবচেয়ে পয়সাওলা লোক ছিলেন তোমার বাবা, অনেক মেনেক্কারকে তিনি টাকে গুঁজতে পারতেন। তাই তিনি ছিলেন মেনেক্কারদের এক নম্বরের শত্রু। আর আমি,—আমি চিরদিনই অবিচার অনাচার সহ্য করতে পারি না। আমি তাদের প্রতিবাদ সব সময়েই করে থাকি। আমি তাদের দু' নম্বরের শত্রু।

সুলান তার অতি মূল্যবান সময়ের কথা ভুলে গেল এসব কথা বলতে বলতে। সে সোফার ওপর বেশ ভালো করে জাঁকিয়ে বসল। এন্টনী তার ভাব দেখে আবার অনুরোধ করল—এক্‌ কিছু অন্ততঃ গলা ভেজাবার জন্যে—

সুলান বললেন—তা'হলে আমায় একটা সোডার বোতল এনে দাও।

একটা বেয়ারা তক্ষুনি একটা সোডার বোতল খুলিয়ে গ্লাসে ঢেলে দিয়ে গেল। তাতে চুমুক দিয়ে সুলান বললে—আমি জানি তোমার মনে আমার সম্বন্ধে একটু সন্দেহ আছে। কেন যে আছে তাও জানি। আমি তোমার বাবার ফকিনের শিল্পনে যাই নি তাঁর মৃত্যুর পর। এ নিয়ে তোমার মনে আমার ওপর অভিযোগ থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু একটা কথা তোমায় সত্যি করে বলছি এন্টনী, তোমার বাবা যে আমার কতোবড় বন্ধু ছিলেন তা আমি যদি বিশ্বর মতো আমার বুকটা চিরে দিতে পারতাম তো দেখতে পেতে। সেই অতি বড় বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আমি আর ক'দিন বিছানা থেকে উঠতে পারি নি।

সুলানের গলার স্বরটা এই কথাগুলোর বলতে বলতে আরও ভারী আরও ভারী হয়ে উঠল। গলাটা বেড়ে সাফ করে নিয়ে সে বললে—হারপর আজ আসব কাল আসব করে নানান কাজে আটকে গেলাম। কিন্তু তার মধ্যেই অনেক কথা আমার কানে আসতে লাগল। শুনলাম মেনেজারদের চীফ কার্মেল তাজ্‌ তোমাকে খতম করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। আর তোমার দুই মামা জোসেফ আর এলবার্ট তার সঙ্গে জুটেছে। এরা যদিও কাস্বারকার বংশের তবুও তোমার বাবা তাদের সম্পত্তির কোন অংশ না দেওয়াতে তারা ক্ষেপে গিয়ে তোমার ওপর দোষ তুলছে। খুব সাবধান তাদি [ভাই, অথবা স্নেহ সম্বোধন], খুব সাবধান।

এন্টনী চুপচাপ এতক্ষণ সব কথা শুনে যাচ্ছিল। এবার প্রশ্ন করল—আচ্ছা এই মেনেজার আর কাস্বারকার ব্যাপারটা কি? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

সুলান একগাল হাসল।—ও আমার কপাল, তুমি তাই-ই জাননা! তুমি কি রকম পারোয়ার ছেলে হে? তবে শোন। যখন এই করমাণ্ডেল উপকূল পর্তুগীজদের হাতে ছিল তারা পর্তুগালে বসে এ রাজ্য শাসন করত। তারাই এই কীর্ণ পারোয়ারের জিতর একজন সর্দার গোছের লোকের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। সেই সর্দারকে আমাদের জাতে নাম দিয়েছিল জাতি-তাসৈবরমোর। এ সব সম্বন্ধে আমি অবিশ্যি খুব বেশী কিছু জানি না। খুঁটিয়ে সব কিছু যদি জানতে চাও তো তুতুকুড়ির সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি যেসু মিরান্ডার কাছে যেতে হবে। তা সেও যে সব কথা ঠিক বলবে এমন কোন কথা নেই, কারণ সে নিজের মেনেজার কিনা। তা যাই হোক, এর মধ্যে মোদ্দা কথাটা হল এই যে, ওই জাতি তাসৈবরমোর চিরকাল আমাদের সমাজের সাধারণ লোকদের ওপর লাঠি ঘুরিয়ে এসেছে। রাজার খেতাব পেয়ে নিজেরাই রাজবংশ বনে গেছে। ওই তাদেরাই আবার নিজেদের সুবিধে অনুযায়ী পরে পারোয়া সমাজে দুটো ভাগ এনে ফেলে। রাজবংশের লোকেরা কয়েকটা ঘরকে বলে নিয়ে তাদের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের বিয়ে সাদী দেয়। এই সব ঘরিরই হল মেনেজার। মেজ্‌ মানে জানতো—টেবিল। এই সব ঘরির লোকেরা টেবিলে বসে খানা খায় —তাই এরা মেনেজার; চলতি কথায় টেবিলাইট্‌। এরা নিজেদের এ্যারিস্টোক্র্যাট বলে মনে করে। আর সমাজের যেটা বৃহত্তর অংশ যারা কারুর মাথায় ওপর লাঠি ঘোরায় না, সমুদ্রে নৌকো নিয়ে গিয়ে মাছ ধরে, গভীর সমুদ্রে ডোবে শাখ মুক্তো কুড়োবার জন্যে, তারা হল খেটে খাওয়া লোক। তারাই নাম পেল কাস্বারকার। তারা কাজ করে বলে তারা হল নীচুতলার লোক। তারা খানা খেত মাটিতে

বসে। মেনেজারদের সঙ্গে কাস্যারকার ঘরের বিয়ে দাদী অনেকদিন বন্ধ হয়ে গেছে। এক সঙ্গে তারা খেতেও বসে না। দীর্ঘদিন ধরে এই দু' দল খাঁড়ায়-কুমড়োয় হয়ে আছে। আমি এই মেনেজারদের অত্যাচার থেকে কাস্যারকারদের বাঁচাবার জন্যে কাস্যারকার মহা সমিতির প্রতিষ্ঠা করি। তোমার বাবা আমাকে বলেছিলেন—সুলান পয়সার জন্যে ভেবো না, যত টাকা লাগে আমি দেব। তাঁরপর তারও দেহান্ত হল আর আমিও সে তিক্ত থেকে যাব। কিন্তু মেনেজারেরা বেভাবে আবার উৎপাত সুরু করবার চেষ্টা করছে তাতে করে তোমাকে সব কথা না জানিয়েও পারলাম না। কথা শেষ করেই সুলান উঠে দাঁড়াল।—উঃ বড় দেরী হয়ে গেছে। আসি তা'হলে এখন।

বলে সুলান দু'হাত বাড়িয়ে এস্টনীর হাত দুটো মুঠোতে পুরে একটা ঝাঁকানি দিল। তারপর ঘর থেকে বার হয়ে গিয়ে বসল তার ছোট্ট গাড়িটার মধ্যে। গাড়িটা গলির মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

[ক্রমশঃ

আপনি কি ভাবে লেখেন? আমার মনে হয় আত্মপরীক্ষার ভেতর দিয়েই আপনি লেখেন। আপনার মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর সকল মানুষের সম্ভাবনা। আপনার মধ্যেই রয়েছে নিষ্ঠুরতা, মূর্খতা, বিকৃতি—রয়েছে মহত্ব, সহানুভূতা নিরমানুষতিতা। অন্য মানুষের সঙ্গে আপনার তফাৎ কেবল গুণ বা দোষের মাত্রার কম বেশীতে।

সুতরাং মানব প্রকৃতিকে জানা মানে নিজেকে জানা। উপন্যাস লেখার অর্থ আত্মোপলব্ধি—আপন আত্মার মধ্যে অভিযান—আত্ম-আবিষ্কার।

—এ. বি. গাথ্‌রি।

ইতিহাসের পাতা থেকে

শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর ॥

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

জার্মানির পতনের তিন সপ্তাহ পরে সোভিয়েট নিরাপত্তা পুলিশেরকর্তা বেরর নিটিকাইন রিপোর্ট দেন যে, হিটলার আত্মহত্যা করেন নি এবং তিনি জীবিত আছেন। ১৯৪১ সনেও রাশিয়ানরা সেই কথাই বলেছে। ১৯৪৫ সনে জেনারেল আইসেনহাওয়ার এ বিষয়ে ব্যাপক তদন্তের ব্যবস্থা করেন এবং হিটলারের শেষ জীবনে যে ২৮ জন ব্যক্তি তাঁর পাশে ছিল তাদের নানা ভাবে জেরা করে এবং অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করে এই কথা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেন যে হিটলার বেঁচে নেই। ১৯৪৫ সনের ৩০শে এপ্রিল আন্দাজ অপরাহ্ণ ২-৩০ টার সময় হিটলার তাঁর পাতালপুরীর ঘরে বসে মুখের মধ্যে পিস্তল ভরে গুলি ছোঁড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নব পরিণীতা পত্নী ইভা ব্রন সায়নাইড সেবন করেন। সেই রাত্রে ১০-৩০ টার সময় তাঁদের দু'জনের দেহ পেট্রোলে চুবিয়ে চ্যানসালারির বাগানে পুড়িয়ে ফেলা হয়। মস্কো থেকে কিন্তু সে রকম কোন রিপোর্ট প্রচার করা হয় নি। অপর পক্ষে পটসড্যাম সম্মেলনে স্বয়ং স্টালিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে বলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন হিটলার বেঁচে আছেন এবং স্পেন বা আর্জেন্টিনার কোন স্থানে অজ্ঞাতবাস করছেন। অনেকে মনে করেন রাশিয়ানরা এই যে ইচ্ছা করে হিটলারকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় এবং মাঝে মাঝে হিটলারের রহস্যময় অন্তর্ধান সম্বন্ধে মতামত প্রচার করে—তাদের এই প্রচার কার্যের পিছনে কোন বিশেষ গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। হিটলার বেঁচে আছে, এই অছিলায় ইওরোপে তাদের কার্যকলাপ অব্যাহত রাখা যেতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে তারা হয়ত এভাবে প্রচার কার্য করে থাকে বলে অনেকের ধারণা। যাই হোক মিত্র শক্তির প্রামাণিক কাগজ-পত্র থেকে হিটলারের শেষ সময়ের যে ইতিবৃত্ত জানতে পারা গেছে তারই সারাংশ এখানে লিপিবদ্ধ করা গেল।

১৯৪৫ সনের ২০শে এপ্রিল হিটলারের জন্মদিন। চ্যানসেলির বাগানে ৫০ ফুট মাটির নিচে অবস্থিত জার্মানদের সেনানায়ক ও দলের কর্তারা হিটলারকে অভিবাদন জানাবার জন্য সমবেত হয়েছে। চকচকে জুতো ধবধবে পোশাক ঝলমলে সমরভূষণ সকলের অঙ্গে—কিন্তু মুখ সকলের পাংশু, হাসি নেই কারো মুখে। সকল রণাঙ্গনেই জার্মানদের হার হচ্ছে। রুশ সৈন্য বার্লিনের উপকণ্ঠে সমবেত হয়েছে। মার্কিন সৈন্যও কাছে এসে পড়েছে। আর বোধহয় রক্ষা নেই। রক্ষা নেই? ননসেন্স—উত্তেজিত হিটলার বক্তৃতা দিতে লাগলেন, বজ্রকণ্ঠে বললেন, বার্লিনের দ্বারপথে রুশ সৈন্য ধ্বংস প্রাপ্ত হবে আর তারপর মিত্রপক্ষের সৈন্যদের গুঁড়ো গুঁড়ো করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হবে। হিটলার ঘন ঘন ম্যাপ দেখতে লাগলেন। নানা আদেশ জারী করলেন, হয় রণজয় না হয় মৃত্যু। অন্য পথ নেই। যে তার কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হবে তাঁকে তৎক্ষণাৎ গুলি করে মারা হবে। অমোঘ আদেশ! কারুর মুখে রা নেই।

২২শে এপ্রিল বিকালে হিটলার তাঁর সৈন্যাধ্যক্ষদের কাছে ঘোষণা করলেন যে, তাঁর নির্দেশে যে আক্রমণাত্মক সংগ্রাম আরম্ভ করা হয়েছে তার প্রথম ধাক্কায় জার্মানরা জয়লাভ করেছে। এস্ এস্ বাহিনীর নেতা হিমলার টেলিফোনে জানিয়েছেন যে, সেনানায়ক স্টীনারের আক্রমণে বার্লিনের উপকণ্ঠে রণবাহিনী

পর্যুদস্ত হয়ে পিছু হটেছে। হিটলারের ঘোষণা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বার্তার পর বার্তা আসতে লাগল। পরিচালনা বিভাগের অধিনায়ক কর্ণেল জোডল্ সেই খবরগুলি পর পর সাজিয়ে রাখতে লাগলেন।

হিটলার উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিলে 'খবর কি জোডল্, আমরা জিতেছি তো?'

গম্ভীর কণ্ঠে জোডল্ উত্তর দিলেন—'মাপ করবেন, ফুরের, স্টালিন্‌র আক্রমণ করে নি, সে পিছু হটে চলে গেছে।'

তারপর খবর এলো মার্শাল জুকভের বাহিনী বার্লিনের মধ্যে প্রবেশ করেছে। চীৎকার করতে লাগলেন হিটলার,—"তোমরা সকলে প্রতারক! সকলে বিশ্বাসঘাতক! কুত্তার দল!"

হিটলারের সেই রক্তচক্ষু আর উগ্রতার সামনে সকলে পাথর হয়ে গেল। তিন ঘণ্টা ধরে হিটলার চিৎকার করে অবশেষে শ্রান্ত হয়ে বললেন,—"সব শেষ। এখন আমার মরা ছাড়া অন্য পথ নেই। আমি শেষ পর্যন্ত এখানে থাকব। আর লড়াই করে লাভ নেই, গোয়েরিংকে খবর পাঠাও, সন্ধির জন্যে ব্যবস্থা করুক।"

খবর গেল গোয়েরিংএর কাছে। উত্তরে গোয়েরিং হেতারে জানালো—'মহামান্য ফুরের, যদি আপনি আমার সর্বময় কর্তৃত্ব দান করতে পারেন তা হলে আমি অগ্রসর হই। আজ রাত দশটার মধ্যে যদি কোন খবর না পাই তা'হলে বুঝবো আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মত আছেন, এবং তা হলে আমি তদনুরূপ ব্যবস্থা করব।'

গোয়েরিং তার পার্শ্বরক্ষীদের জানালো যে আগামীকাল জেনারেল আইসেনহাওয়ারের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এয়োপ্লেনে রওনা হবে। অন্তরে অন্তরে মহাখুশি গোয়েরিং। আইসেনহাওয়ারের কাছে একটি হেতার বার্তা পাঠাবার জন্যে খসড়া তৈরি করতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হেতারে প্রত্যুত্তর এলো—'গোয়েরিং, তোমার আচরণ মৃত্যু-দণ্ডাদেশ পাবার উপযুক্ত। তুমি এখনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবে। তা না করলে তোমার সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে। —অ্যাডল্ফ হিটলার।'

বড় বড় চোখে গোয়েরিং হেতার বার্তাটি পড়ছে এমন সময় এস্ এস্ বাহিনীর লোক এসে ঘরে ঢুকলো। গোয়েরিংকে গ্রেপ্তার করবার আদেশ এসেছে। সুতরাং তাঁকে হাজতে যেতে হবে। অবিশ্বাস্য ঘটনাচক্র।

তারপর হিটলারের আদেশে বার্লিনের পথে পথে যে লড়াই চলল, দেশের উন্মাদ নেতার আদেশে প্রাণ বলিদানের সে এক মর্মন্তুদ দৃশ্য। হাজার হাজার জার্মান পথের ধারে মরে পড়ে রইল। একস্থানে একদল বন্দুকধারী সৈন্য নিহত হয়ে শুয়ে আছে। তাদের কারুর বয়স ষোলর কুড়ির বেশী নয়, ওরানিয়ার্স পোলের কাছে ৬০০ জার্মান বালক হাত বোমার সাহায্যে রুশ ট্যাঙ্ক বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে মারা পড়ল। মৃত সৈন্যের স্তূপে পথঘাট আকীর্ণ হল।

এদিকে ফুরের-এর বাংকারে [পাতালপুরীতে] অভূতপূর্ব কাণ্ড ঘটতে লাগলো। সেখানে সর্বসমেত ২৬ জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং তাদের ৩০ জন মেয়ে-সেক্রেটারী আর কয়েকজন রক্ষী অবস্থান করছিল। তারা সবাই যেন পাগল হয়ে গেল। রুশ কামানের গোলা পড়ছে চারিদিকে। কাঁপছে ধরাতল। ভ্রূক্ষেপ নেই তাদের। পাতালপুরীতে তখন মদের স্রোত বইছে। জামা খুলে ফেলে জার্মান অধিনায়করা উন্মত্তের মত তাদের মেয়ে-সেক্রেটারীদের কোমর জড়িয়ে ঘরে নাচতে শুরু করেছে। মদের নেশায় আবোল তাবোল বকছে সবাই। হাসছে পাগলের মতো।

২৮শে এপ্রিল খবর এলো হিটলারের শেষ বিশ্বস্ত সেনানায়ক হিমলার শত্রুপক্ষের কাছে আত্ম-সমর্পণের প্রস্তাব জানিয়েছে। ক্ষেপে গেলেন হিটলার,—শেষ পর্যন্ত হিমলার তুমিও। অতএব শেষ হোক সব।"

২৯শে এপ্রিল সকালে হিটলারের সঙ্গে ইভাব্রণের বিবাহ হল। সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে কাজ সারা হোল। রুশ কামানের গোলা তখন প্রায় তাদের মাথার ওপর এসে পড়ছে। কাঁপছে পাতালপুরী থরথর করে। ৩০শে এপ্রিল সংবাদ এলো আগামীকালের মধ্যেই রাজধানীর পতন হবে। হিটলার বললেন—"তা হলে আর দেরী নয়, তারা জীবন্ত পাবে না আমায়। যে আদেশ দিয়েছি তা যেন মনে থাকে। আমাদের দেহ পুড়িয়ে ফেলবে। নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। বিদায় বন্ধুগণ।"—এই বলে বিদায় নিলেন সকলের কাছে। তাঁর দুই চোখ তখনো জ্বলছে। ক্ষীণ কণ্ঠস্বর যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসছে। নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন ধীরে ধীরে।

তখন আবার শুরু হল নাচ গান। উন্মত্ত চীৎকার চারিদিকে। মদের বোতল খোলার শব্দ। মাথার ওপর কামান গর্জন শোনা যাচ্ছে। ঘুম্ ঘুম্ ঘুম্।

ইভাকে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে খরজা বন্ধ করে দিলেন হিটলার। একজন রক্ষী খরজার সামনে পাহারায় দাঁড়াল। কয়েক মুহূর্ত কাটলো নীরবে, তার পর ঘরের মধ্যে পিস্তলের শব্দ শোনা গেল। শেষ হল সংগ্রাম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমরনায়ক ছিলেন সার আর্চিবল্ড ওয়াভেল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একবার কেম্ব্রিজে বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

সেনাধ্যক্ষ হওয়ার কলাকৌশল সম্বন্ধে আলোচনাকালে তিনি বলে উঠলেন,—'যখন তোমাদের যুদ্ধের ইতিহাস পাঠ করতে হবে তখন সমরবিদ্যার রূপরেখা বা যুদ্ধের মূলনীতি পড়তে যেও না; তখন পড়বে জীবনী-সাহিত্য, স্মৃতিকথা, ঐতিহাসিক উপন্যাস—যেমন The Road to Glory বা Schoenbrunn, সমর বিদ্যার কঙ্কালরূপ দর্শন না করে তার রক্ত মাংসের পরিচয় নিও।'

জীবনের ব্যাপকতা এ যুগের সাহিত্যে প্রতিফলিত। এ যুগের মানুষ তার মধ্যে অন্বেষণ করছে জীবনের জটিলতা।

সেকালের সভা সমিতি

কলিকাতা সারস্বত সম্মিলনী

উনবিংশ শতকের আর একটি সভা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যমে স্থাপিত হয়। সঞ্জীবনী সভার উদ্যোগে যখন দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন সম্ভব হইল না তখন বাঙলা ভাষার উন্নতির জন্য "কলিকাতা সারস্বত-সম্মিলনী" স্থাপিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সমসাময়িক সকল প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণই এ সভার সভ্য ছিলেন। বঙ্কিমবাবু এ সভার নাম ইংরাজীতে 'Academy of Bengali Literature' রাখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র সহযোগী সভাপতি ছিলেন।

সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তিনটি। প্রথম, বঙ্গ ভাষার অভাব মোচন; দ্বিতীয়, বঙ্গীয় গ্রন্থসমালোচনা করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতিসাধন ও উৎসাহবর্ধন; এবং তৃতীয়, বঙ্গ সাহিত্যানুরাগীদের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ স্থাপন। এই সভা স্থাপন কালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত অনুষ্ঠানপত্র ও নিয়মাবলীর কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

বিদ্বজ্জনগণের একত্র সম্মিলনের অনেকগুলি শুভফল আছে :—

(১) সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিদিগের মধ্যে পরস্পর দেখাশুনা হয়, ও সৌহার্দ জন্মে।

(২) পরস্পরের মধ্যে ভাবের ও মতের আদান প্রদান হওয়ায়, একদেশদর্শিতা ঘুচিয়া যায় ও উদারতার বৃদ্ধি হয়।

(৩) এই বিদ্বজ্জন-সম্মিলনের উপলক্ষে, আমাদের বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে বহুবিধ শুভ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে। যথা—

(ক) বঙ্গভাষায় পাশ্চাত্য সাহিত্য-দর্শনের অনুশীলন করিতে হইলে যে সকল নূতন কথাসৃষ্টির প্রয়োজন হয়, তাহা আলোচিত ও নির্ধারিত হইতে পারে এবং তৎসঙ্গে বঙ্গভাষার সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ একখানি অভিধানও সঙ্কলিত হইতে পারে।

(খ) বিদেশীয় ভাষার শব্দসমূহ বাঙলা অক্ষরে প্রকাশ করিতে হইলে, নূতন যে সকল অক্ষরের আবশ্যক হয়, তাহা সৃষ্টি করিয়া প্রচলিত করা যাইতে পারে।

(গ) বাঙলা গ্রন্থের নিরপেক্ষ ও যথাযোগ্য সমালোচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিসাধন হইতে পারে।

(ঘ) সুলেখক দিগকে সভা হইতে যথোপযুক্ত সম্মান দেওয়া যাইতে পারে।

(ঙ) প্রবন্ধ বা পুস্তক রচনা করিয়া অথবা সংবাদপত্র বা সন্দর্ভপত্রের সম্পাদকতা করিয়া যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, এবং যাঁহারা বাঙলা ভাষার অনুশীলনে বিশেষ অনুরাগী, তাঁহারাই এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন।

(চ) বাঙলায় গ্রন্থাদি না লিখিলেও যাঁহাকে সভ্যগণ সারস্বত সভার যোগ্য বিবেচনা করিবেন, অর্থাৎ যাঁহার দ্বারা সভার উদ্দেশ্যসাধনে সাহায্য হইতে পারিবে, তাঁহাকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারিবে

(৬) সভায় বাঙ্গলা গ্রন্থসমূহ বঙ্গভাষায় সমালোচিত হইবে, অথবা ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কোন বিষয়ক প্রবন্ধ বা গ্রন্থ, অন্য ভাষায় রচিত হইলে সভায় তাহারও সমালোচনা হইতে পারিবে।

(৭) যে সকল সমালোচ্য গ্রন্থ সভায় উপস্থিত হইবে, সম্পাদক তাহা সভা-সমক্ষে উপস্থিত করিলে সভাপতি তাহার সমালোচক স্থির করিয়া দিবেন।

(৮) যে অধিবেশনে পুস্তকের সমালোচনা পাঠ হইবে—তাহার পরের অধিবেশনে সমালোচনা-লিখিত তর্ক-বিতর্কের সারাংশ ও সমালোচ্য গ্রন্থখানি সম্বন্ধে সভাপতি তাঁহার নিজ মত সংক্ষেপে ব্যক্ত করিবেন।

(৯) সভার অন্যান্য কার্য্যবিবরণের সহিত লিখিত সমালোচনার সংক্ষিপ্তসার ও তর্ক-বিতর্কের সারাংশ এবং তৎসম্বন্ধে সভাপতির অভিপ্রায় সাধারণের অবগতির জন্য কোন প্রসিদ্ধ সম্বর্তপত্রে প্রকাশিত হইবে। সভায় যে কোনও মত ব্যক্ত হইবে, তাহা সভার মত বলিয়া গৃহীত না হইয়া ব্যক্তিগত মত স্বরূপে গৃহীত হইবে।

(১০) সমালোচনা প্রভৃতি কার্য্য না থাকিলে অথবা কার্য্য শেষ হইয়াও যথেষ্ট অবসর থাকিলে, সভ্যদিগের মধ্যে কেহ সভার নির্দ্দিষ্ট কোন বিষয় সম্বন্ধে পাঠ অথবা মৌখিক বক্তৃতা বা পুস্তকাদি পাঠ করিতে পারিবেন, ও তাহা লইয়া বাদানুবাদ চলিতে পারিবে। সমালোচনা, প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতাদির কার্য্য না থাকিলে সঙ্গীতাদি হইতে পারিবে।

কথায় আছে 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।' জ্যোতিবাবুর মাথায় এই কল্পনা উদয় হইতেই তিনি রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পরামর্শের জন্য গেলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—'তোমরা বড়মানুষের ছেলে, কোনও যশ-খোয়ালি না করিয়া এই সব লইয়া যদি সময় কাটাও, ত সে ভালই। কিন্তু, বাবা, একটা কথা আমি তোমাদের বলিয়া দিতেছি। বড় বড় হোমরা-চোমরা লোকদের ইহার মধ্যে লইও না—তাহা হইলেই সব মাটি হইয়া যাইবে।' ঈশ্বরচন্দ্র উৎসাহ দিলেন কিন্তু সভায় যোগ দিতে রাজী হইলেন না।

কিন্তু কার্য্যত হোমরা-চোমরা লোক লইয়াই কার্য্য আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় হইলেন সম্মিলনীর প্রথম সভাপতি। ভূগোলের ইংরাজী শব্দের পরিভাষা তিনি নিজেই লিখিতে সুরু করিয়া দিলেন ও 'ভৌগোলিক পরিভাষা' [? ১২৯০] প্রকাশিত হইল। দুই তিন অধিবেশন পর্য্যন্ত বেশ কাজ চলিয়াছিল—কিন্তু তাহার পরেই নানা কারণে সভা বন্ধ হইয়া গেল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা বর্ণে বর্ণে ফলিয়া গেল। সভা একটুখানি অঙ্কুরিত হইয়াই শুকাইয়া গেল।

পুরাতন পাতা

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা [গত সংখ্যার পর]

'পরব্রহ্মের উপাসনার প্রকার এবং তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ জ্ঞাপনার্থে এবং সর্বোপাসনা হইতে পরব্রহ্মের উপাসনা সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, ইহা জানাইবার নিমিত্ত আমাদিগের শাস্ত্রের সারমর্ম সংগৃহীত হইবেক।

'বিচিত্র শক্তির মহিমা জ্ঞাপনার্থে সৃষ্ট বস্তুর বর্ণনা এবং অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশিত হইবেক।

'কুকর্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা না থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় না, অতএব যাহাতে লোকের কুকর্ম হইতে নিবৃত্ত থাকিবার চেষ্টা হয় এবং মন পরিশুদ্ধ হয় এমত সকল উপদেশ প্রদত্ত হইবেক।

'বৈষয়িক সম্বাদপত্রে পরমার্থঘটিত রচনা প্রকাশের প্রথা না থাকাতে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি আপনাদিগের অভিলষিত রচনা প্রকাশ করিতে অশক্ত ছিলেন। অতএব এই পত্রিকা প্রকাশ হইয়া তাঁহাদিগের সেই বিষয়তা এইক্ষণে নিবৃত্ত হইল এবং সর্বসাধারণ সমীপে মনোগত জ্ঞানালোকের প্রকাশ হইবার বিলক্ষণ উপায় হইল।

'এই অমূল্য পত্রিকা তাবৎ চিরজীবন, এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত প্রতি মাসের প্রথম দিবসে উদিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের এবং তাহার বন্ধুদিগের মনোরঞ্জন করিবেন। যদি তাহাদিগের স্নেহের দ্বারা এই পত্রিকার পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, তবে তৎকালে ইহার সমাচার দেওয়া যাইবেক।'

পত্রিকাতে রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী এবং অন্যান্য ব্রহ্মজ্ঞান প্রসঙ্গী গ্রন্থ প্রকাশের কথা বড়ই সময়োপযোগী ও শিক্ষিতমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। রামমোহন রায়ের জীবিতকালে এ-দেশবাসী অনেকে তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর দেহান্তর প্রাপ্তির পর এ-দেশের শিক্ষিতমণ্ডলী তাঁর মহত্ব উপলব্ধি করে, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর গ্রন্থাবলীর প্রতি যে দেশের লোকের একটা টান হয়েছিল, তাহা উপরোক্ত ঘোষণাপত্র থেকে স্পষ্ট প্রকাশ পায়। তাই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী প্রকাশের কথা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে বড়ই উপাদেয় লেগেছিল। তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যগণের কাছে পত্রিকা বিনামূল্যে প্রেরিত হইত।

ঘোষণাপত্রের আরো দু'একটি বিষয় শিক্ষিত পাঠক সম্প্রদায়ের এবং সমগ্র হিন্দু সমাজের শ্রীতিদৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনার্থে আমাদের শাস্ত্রের সারমর্ম সংগ্রহ করা তাদের অন্যতম। এইখানেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের সাম্প্রদায়িক ভাব দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু এর ফলে ব্রাহ্মসভার পক্ষপাতী ও বিরোধী উভয় সম্প্রদায়ের বিবাদ-বিসম্বাদ ঘুচে গিয়ে মিলনের পথ প্রশস্ত হলো। শাস্ত্র-সাহায্যে ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করবার কারণে আমাদের জাতীয় সম্মান পরিরক্ষিত হোল এবং সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাও হিন্দুসমাজের আদরের সামগ্রী হয়ে উঠতে লাগল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আর একটি বিষয়ের সূত্রপাত করে বঙ্গের তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজকে চমকিত করে তুলেছিল। বঙ্গ ভাষায় বিজ্ঞানের বিষয় নিয়মিতরূপে আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হওয়া সে কালের লোকদের কাছে খুবই নূতন বোধ হয়েছিল। ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত সৃষ্ট বস্তুর বর্ণনা ও অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করবার অঙ্গীকারসূত্রে বিজ্ঞান বিষয়ক নানা প্রবন্ধ সচিত্র হয়ে পত্রিকার অঙ্গ ভূষিত করতে লাগল। আমরা জানি যে সেকালে বঙ্গের শিক্ষিত মণ্ডলীর অনেকে এই সকল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের জন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশ প্রতীক্ষা করে থাকতেন। তাঁরা প্রথম প্রথম বিশ্বাসই করতে পারেন নি যে বঙ্গভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সুচারুরূপে লেখা যেতে পারে।

এই উন্নত ঘোষণাপত্র সম্মুখে রেখে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে স্বীয় কর্তব্য সাধন করে চলতে লাগল। দেবেন্দ্রনাথ একটি বৎসর কারো সঙ্গে কোন প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদে নামেন নি। প্রথমে তাঁর আশাই ছিল না যে, পত্রিকা এক বৎসরেও জন সাধারণের হৃদয়রঞ্জক হয়ে চলতে পারবে। কিন্তু এক বৎসরের পরিবর্তে পত্রিকা নির্বিঘ্নে দুই বৎসর কাটিয়া গেল এবং পত্রিকার মতামতের উপর লোকে শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে লাগল। ডফ্ সাহেব হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্ম সমাজের উপর গালাগালি বর্ষণ করেছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ সেটা ভুলতে পারেন নি। যখন, বলতে গেলে, পত্রিকার পাঠক তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য এবং ব্রাহ্মসমাজের দীক্ষিত সভ্য নিয়ে একটি সম্প্রদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হোল, তখন দেবেন্দ্রনাথ ডফ্ সাহেবের সেই 'India and India's Missions' পুস্তিকার প্রতিবাদে 'Vedantic doctrines vindicated' এবং 'Rational analysis of the Gospel' নামক দুইটি প্রবন্ধ লিখে পত্রিকায় প্রকাশ করেন। শুনেছি যে, শেষোক্ত প্রবন্ধে খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব খণ্ডিত হয়েছে দেখে ডফ্ সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, তার নাম দিয়েছিলেন 'The Irrational paralysis of the Gospel'। পূর্বেই বলে এসেছি যে, ডফ্ সাহেবের প্রচারগুণে তদানীন্তন শিক্ষিত মণ্ডলীর অনেকে খৃষ্টধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। কেহই আশা করতে পারেন নি যে, কোন শিক্ষিত ভারতবাসী আবার হিন্দুধর্মের সমর্থনে লেখনীধারণে অগ্রসর হবেন। উপরোক্ত দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশের ফলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শক্তিমত্তা শিক্ষিত সমাজে স্বীকৃত হোল। আর ডফ্ সাহেবের সঙ্গে বাদানুবাদের ফলে, তত্ত্ববোধিনী সভার এবং সেই সভার ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছিল, সেই ব্রাহ্মসমাজেরও জাতীয় হিন্দুভাব পরিস্ফুট হয়ে পড়ল। এইরূপে নানা উপায়ে বলতে গেলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই এদেশে প্রথম জাতীয় ভাবের পত্তন করে যায়।

লেখকদের পক্ষে লেখা আরম্ভ করাটাই একটা মহাসমস্যা। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে লেখবার আগে কুড়িটা পেনসিল কাটতেন। উইলা ক্যাথার লেখা আরম্ভ করার পূর্বে প্রত্যহ বাইবেলের একটি অনুচ্ছেদ পড়তেন। টমাস উলফ্ সারা রাত ধরে ব্রুকলিনের পথে পথে হাঁটতেন।

উপেন্দ্র-স্মৃতিকথায় রবীন্দ্রনাথ

যথাসাময়িকতা বনাম সময়নিষ্ঠা

তখনকার দিনে আমরা ভারতবর্ষীয়েরা বিশেষত বাঙালীরা, মনে-প্রাণে আলস্য-বিলাসী। আলস্যের সঙ্গেও দীর্ঘ সুত্রতার সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তাই বেন্ডীমাধব গঙ্গুলীর 'Translation and Retranslation' গ্রন্থে Procrastination-এর প্রতিশব্দ 'দীর্ঘসূত্রতা' পাওয়া গিয়েছিল: 'Procrastination is the thief of time—দীর্ঘ সূত্রতা সময়াপহারক বাক্যটির মধ্যে বেন্ডীমাধব অবশ্য Punctuality-র সপক্ষে ওকালতির সূত্রপাত করেছিলেন, কিন্তু সময় রক্ষা ক'রে চলার গুণটিকে ইংরাজী Punctuality শব্দ হতে বাংলার প্রতিশব্দে মূর্তিমান করতে সক্ষম হন নি তিনি।

Punctuality শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ নির্ণীত করতে অসমর্থ হয়ে আমরা অবশেষে আমাদের সহপাঠী বন্ধুবর নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হলাম। নিম্নশ্রেণী হতে নলিনী সংস্কৃতে বড়। প্রত্যেক পরীক্ষাতেই সে সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে এসেছে। পরে সংস্কৃত ভাষায় এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করে। একদা 'প্রেসিডেন্সী গভর্ণমেণ্ট কলেজে'র সুযোগ্য অধ্যক্ষ নলিনী শাস্ত্রীকে না চিনত এবং না শ্রদ্ধা করত, আসাম প্রদেশে লেখাপড়া জানা এমন লোকই ছিল না।

নলিনী অবিলম্বে আমাদিগকে আমাদের কাঙ্ক্ষিত বস্তু দান করলে,—যথাসাময়িকতা। পেলাম বটে, কিন্তু মনের মধ্যে গভীর বেদনাও পেলাম। সাড়ে পাঁচটায় মীটিঙে হস্তদন্ত হ'য়ে কোনরকমে সাড়ে পাঁচটার সময়ে উপস্থিত হতে পারলে যথাসাময়িকতা রক্ষা করা হবে? একি ব্যাপার! বেলা দশটার সময়ে আসবে ব'লে নাপিত এগারোটার সময়ে এলে তাকে বলতে হবে, ওহে, তুমি আর একটু যথাসাময়িক হতে পার না? তবেই হয়েছে।

নলিনী আমাদের আশ্বাস দিলে যথাসাময়িকতা পদটি প্রত্যয়-প্রকরণের কয়েকটি পদ্ধতিপ্রণালী নির্বিঘ্নে পার হয়ে আমাদের তটে পৌঁছেছে,—সুতরাং তার ব্যাকরণ-বিশুদ্ধির বিষয়ে অপ্রত্যয়ের কোনো কারণ নেই। কি উপায়ে 'যথাসময়' 'যথাসাময়িকে', এবং 'যথাসাময়িক' 'যথাসাময়িকতাই' উপনীত হতে পারল, সে বিষয়ে নলিনী আমাদিগকে একটা বৈয়াকরণ ব্যাখ্যা দিয়ে বললে, পদটি শুধু ব্যাকরণ-সম্মতই হয় নি, পরন্তু সুললিতও হয়েছে।

আমরা যখন ব্যাকরণ-কৌমুদীর অনুজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছি, নলিনী তখন মুগ্ধবোধ-পাণিনি-মহাসাগরের তলদেশ মথিত ক'রে জ্ঞানের মণিমুক্তা আহরণের দ্বারা নিজেকে পণ্ডিত ব'লে প্রমাণ করেছে। সুতরাং একান্তে নিরুত্তর থেকে আমরা মনে মনে বললাম, রাজার নন্দিনী তুমি, যা বল তা শোভা পায়। মনের মধ্যে কিন্তু যথাসাময়িকতার বিরুদ্ধে একটা জোর অবাধ্য আগ্রহ হয়ে রইল।

সৌভাগ্যক্রমে অল্পদিনের মধ্যেই যথাসাময়িকতার অক্টোপাশ থেকে মুক্তিলাভ করবার একটা সুযোগ দেখা দিলে। আমাদের সাহিত্য-সমিতির বার্ষিক উৎসবের সময়ে প্রতিবার কোনো-না-কোনো বিশিষ্ট সাহিত্যিককে সভাপতির পদের জন্যে সংগ্রহ করতাম। সেবার রবীন্দ্রনাথকে সভাপতিরূপে লাভ করবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে জাগ্রত হ'ল। যতদূর মনে পড়ে, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ

সেন, অমরেন চট্টোপাধ্যায় ও আমি—বন্ধু চতুষ্টয়, একদিন জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের গৃহে গিয়ে হাজির হলাম। সে সময় রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ ছিলেন ব'লে সভাপতির পদ গ্রহণ করতে পারলেন না, কিন্তু আমাদের সাহিত্য-সমিতির প্রতি সহানুভূতিশীল এবং আগ্রহশীল হয়ে সে বিষয়ে অনেক আলাপ আলোচনা করলেন।

কথায় কথায় এক সময়ে আমি বললাম, 'একটা বিষয় নিয়ে আমরা একটু কাতর হয়ে আছি, আপনি যদি দয়া ক'রে একটা উপায় করেন।'

আমার অনুরোধ শুনে বৎসরোনাস্তি কৌতূহলী হয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "বল কিহে। তোমরা কাতর হয়ে আছ,—আর আমি তার উপায় করতে পারি?"

বললাম, "আপনার তো মনে হয় নিশ্চয় পারেন।"

"কি ব্যাপার বল দেখি?"

বললাম, "ইংরাজী পাংচুয়ালিটি শব্দের ছোটখাট বাংলা প্রতিশব্দ কি হবে, তা আমরা কিছুতেই ঠিক ক'রে উঠতে পারছিলাম না। আমাদের একজন সংস্কৃতবিশারদ বন্ধু 'পাংচুয়ালিটির' বাংলা করেছেন 'যথাসাময়িকতা।' তিনি বলেন, যথাসাময়িকতা ব্যাকরণশুদ্ধ। কিন্তু এত লম্বা কথা আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছিনে।"

আমার কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ একটু চিন্তা করলেন; তারপর বললেন, "পাংচুয়ালিটির" বাংলা 'সময়নিষ্ঠা' হতে পারে, কাজে কাজেই পাংচুয়ালের বাংলা 'সময়নিষ্ঠ।'

একটা অন্ধকার ঘরে সুইচ নাবিয়ে দিলে সহসা ঘরটা যেমন আলোকিত হয়ে ওঠে, আমাদের মনও ঠিক তেমনিভাবে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। কি চমৎকার! যেমন অর্থপূর্ণ, তেমনি প্রতিধ্বনিময়, আর তেমনি অর্থব্যঞ্জক। গভীর জ্ঞান এবং সৌন্দর্যবোধের ধরনই আলাদা।

এর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ 'সময়নিষ্ঠা' শব্দ নিজে কখনো ব্যবহার করেছিলেন কি না, অথবা অপরকে ব্যবহার করতে দেখেছিলেন কি-না, তা জানিনে। কিন্তু যেভাবে তিনি আমার কথা শুনে একটু চিন্তা ক'রে তারপর কথাটি বলেছিলেন, তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেইদিন সেই সময়েই তিনি কথাটি রচিত করেছিলেন। অর্থাৎ 'সময়নিষ্ঠা' এবং 'সময়নিষ্ঠ' শব্দ দুটি সেইদিনই প্রথম সৃষ্টি লাভ করেছিল।

'যথাসাময়িকতা'কে পশ্চাতে ফেলে হালকা মন নিয়ে আমরা সেদিন ভবানীপুরে ফিরেছিলাম।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

দেশ-বিদেশ

তাজিকিস্তানে ভারতীয় কলা কেন্দ্র

ভারতের ভারতীয় কলা কেন্দ্রের নৃত্য সম্প্রদায় তাজিক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী স্তালিনাবাদের সফর শেষ করিয়াছেন। সফরকালে তাঁহারা "কুমারসম্ভব" ব্যালে নৃত্য-নাট্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুষ্ঠানে সকলের মধ্যেই প্রভূত উৎসাহের সঞ্চার হয়।

তাজিকদের নিকট নৃত্য খুবই প্রিয়। সুতরাং ভারতীয় কলা কেন্দ্রের ব্যালে নৃত্য দেখিবার জন্য সকল টিকিট নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই বিক্রয় হইয়া যাওয়াতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। ভারতীয়দের মূল নৃত্য দেখিবার জন্য এত লোকের মধ্যে আগ্রহ দেখা যায় যে, এই অতিথি নৃত্য-সম্প্রদায়ের পরিকল্পিত দুইটি অনুষ্ঠানের পরিবর্তে তিনটি অনুষ্ঠানে রাজী হইতে হয়।

ভারতীয় নৃত্য-সম্প্রদায়ের নৃত্যাংশে অংশগ্রহণকারী সকলেরই অপূর্ব ভাবাবিত মনোরম প্রকাশভঙ্গি দেখিয়া স্থানীয় সংবাদপত্র কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছে।

নৃত্যপরিকল্পনা ও নৃত্যে অংশগ্রহণকারী ব্রিজমোহন মহারাজ বিশেষভাবে প্রশংসা অর্জন করেন। "কমিউনিস্ট তাজিকিস্তানা" উহার ব্যালে নৃত্যের পর্যালোচনায় উল্লেখ করেন যে, ব্রিজমোহন মহারাজ তাঁহার কামদেবের ভূমিকায় অপূর্ব গতিশীল এবং চরিত্রানুগ ছিলেন। তাঁহার নৃত্যের উৎকৃষ্ট প্রকাশ ক্ষমতার প্রতি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। তবে উক্ত সংবাদপত্রটি উল্লেখ করেন যে নৃত্যে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কাহাকেও বিশেষভাবে চিহ্নিত করা কঠিন, কারণ তাঁহারা সকলেই হৃদয়গ্রাহী অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন। তাঁহাদের অনুষ্ঠান নূতন ধরনের, বিরল রস এবং অমূল্য ভাবধারার সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহাদের অবসর সময়ে অতিথি নৃত্যসম্প্রদায় স্তালিনাবাদের দৃশ্য দেখিয়াছেন এবং তাজিক চলচ্চিত্র স্টুডিও পরিদর্শনের সময় তাঁহারা তাজিক ব্যালে চিত্র "লাইলি এবং মজনু" দেখেন। শিল্পীরা সারা শহর ঘুরিয়া বেড়ান, সহরবাসীদের সহিত আলাপ আলোচনা করেন এবং সর্বত্রই গভীর আদর আপ্যায়ন লাভ করেন। নৃত্যে অংশগ্রহণকারীরা শ্রীমতী কুমুদিনী লাখিয়া তাঁহার ধারণা বর্ণনা করিয়া বলেন,—"আমি দীর্ঘ সময় ধরিয়া স্তালিনাবাদের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি এবং পুনঃ পুনঃ আমার এই প্রতীতিই জন্মিয়াছে যে, শহরবাসীদের আমাদের প্রতি কি গভীর শ্রদ্ধা। স্তালিনাবাদ বাসীদের অকপট ও আন্তরিক ভালবাসায় আমি এবং আমার সাথীরা সময় সময় ভুলিয়া যাইতাম যে আমরা আমাদের দেশে নাই। ইহা আমার জীবনের এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি।"

নৃত্য সম্প্রদায়ের পরিচালক শ্রীযুক্তা আর. এন্. আর. সিং তাজিকিস্তান সম্পর্কে তাঁহার ধারণা বিবৃত করিতে গিয়া বলেন,—"সোভিয়েত ইউনিয়নে আমাদের প্রথম সফর আমরা কখনোই ভুলিব না। আমরা সেখানে আমাদের কলা কৌশলই শুধু প্রদর্শন করি নাই পরন্তু আমরা নিজেরা সেখানে অনেক কিছু দেখিয়াছি এবং শিখিয়াছি। আমাদের ব্যালে নৃত্যে দর্শকমণ্ডলীর ভীড় ও দর্শকমণ্ডলীর হর্ষধ্বনি বিবেচনা করিয়া আমরা বলিতে পারি, উহা যথোপযুক্ত প্রশংসা লাভ করিয়াছে। আমরা স্তালিনাবাদের কলানুশলীদের সহিত নিঃসংকোচে মিশিয়াছি এবং আলাপ পরিচয় করিয়াছি। তাঁহাদের সহিত একটি অপরিকল্পিত ঐক্যতানে অংশগ্রহণও করিয়াছি। আমরা যাহা দেখিয়াছি তাহাতে এই সিদ্ধান্তই করিতে হয় যে, উজবেক ও কাজাকদের আমরা কিছুদিন পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি তাঁহাদের

ঘনিষ্ঠতা লাভ করে এবং আমরা উভয় দেশের জনগণের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক শক্তিশালী করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

বের্লিনের মানবজাতি-তত্ত্ব যাদুঘর

জার্মানীর যাদুঘরগুলোর মধ্যে পশ্চিম বের্লিনের মানবজাতিতত্ত্বের যাদুঘর একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। অতীতে বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত রাজা মহারাজাগণ অনেক দুর্লভ বস্তু সংগ্রহ করেছিলেন তা'ছাড়া বহু ব্যবসায়ী ও গবেষক দুনিয়া'র বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক বিরল সামগ্রী সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছেন। এইসব অজানা অচেনা জাতির সাংস্কৃতিক নিদর্শনগুলো অনেক সময় ইওরোপীয় সাংস্কৃতিক বস্তুর চাইতে অনেক প্রাচীন।

রাজা ফ্রীড্রিস বিলহেলম ফন ব্রাণ্ডেনবুর্গ সংগৃহীত শিল্প আর দুর্লভ বস্তুর সাহায্যে একটা ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র যাদুঘর স্থাপন করেছিলেন। ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বের্লিনের শাসনকর্তা ছিলেন, এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার জন্যে জনসাধারণকে বিভিন্ন অজানা অচেনা দেশের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের ব্যাপারে উৎসাহ দান করা ছিল তাঁর একটা প্রধান কাজ। ১৮২৯ সনে তাঁর ব্যক্তিগত যাদুঘরের দুর্লভ বস্তুগুলো রাজপ্রাসাদের বাইরে নিয়ে আসা হয় এবং এগুলো "এথ্‌নো গ্রাফিক সংগ্রহ" নাম পরিগ্রহ করে। সাথে সাথে বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিকও এইসব বস্তু সম্পর্কে অনেক কিছু জানবার সুযোগ পান। ১৮৭০ সনে দেশের সাধারণ নারী পুরুষ এইসব বস্তু প্রথম চোখে দেখে। কারণ এই সময় থেকেই এই সব দুর্লভ বস্তুর সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত মানবজাতি-তত্ত্বের একটা সরকারী যাদুঘর দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির সাথে জার্মানীর মানুষের পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

পশ্চিম বের্লিনের ডাহলেম-এলাকায় অবস্থিত মানবজাতি তত্ত্বের যাদুঘরে বর্তমানে সারা দুনিয়ার প্রায় ৪০০০০০ দুর্লভ বস্তু দেখতে পাওয়া যায়। যাদুঘরের বিভিন্ন বিভাগে অতি যত্নের সহিত সাজিয়ে রাখা হয়েছে এইসব বস্তু। যাদুঘরের সমগ্র-আফ্রিকা, প্রাচীন আমেরিকা, সুদূরপ্রাচ্য, উত্তর ও পূর্ব এশিয়া, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, ইওরোপ প্রভৃতি বিভাগগুলো দেখতে দেখতে দর্শকের মনে এক অপরূপ অনুভূতির সঞ্চার হয়।

বের্লিনের এই যাদুঘরের ৪০০০০০ সংগ্রহ অবশ্য একসাথে দেখানো সম্ভব নয়। প্রদর্শনের জন্যে কর্তৃপক্ষ তাই ৪২০০ মূল্যবান ও চিত্তাকর্ষক বস্তু বেছে নিয়েছেন। দর্শকদের জন্যে প্রদর্শনী-কক্ষে এগুলো সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্যে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা যাদুঘরের ২৭০০০০ বস্তু প্রয়োজনমতো ব্যবহার করতে পারে। যাদুঘরের এক-তৃতীয়াংশ সংগ্রহ বেঁধে-ছেঁদে তুলে রাখা হয়েছে।

বের্লিনের মানবজাতি-তত্ত্ব যাদুঘরের অনেকগুলো সংগ্রহ সত্যিই অনুপম উদাহরণস্বরূপ। তুরফান এবং গান্ধারের প্রাচীন-চিত্র ও ভাস্কর্য, আফ্রিকার দুর্লভ সাংস্কৃতিক বস্তু, মধ্য ও দক্ষিণ। আমেরিকার মূল্যবান সংগ্রহ ও আমেরিকার অন্যান্য অসাধারণ সামগ্রী এবং ক্যাপ্টেন কুকের সমুদ্রযাত্রা সম্পর্কিত বিভিন্ন সংগ্রহের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রতিদিন বহুসংখ্যক নরনারী বের্লিনের এই যাদুঘর দেখতে আসে। অজানা অচেনা দেশ আর এইসব দেশের মানুষের সংস্কৃতি আর শিল্প সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চায় তারা। গত কয়েক বছরে এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার অনেক দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে, আর তার সাথে সাথে এইসব দেশ সম্পর্কে জার্মানীর জনসাধারণের অনুসন্ধিৎসা আরও বেড়ে গেছে।

জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্র এবং স্বাধীন পশ্চিম বের্লিনের মানুষ এইসব তরুণ রাষ্ট্রকে কতো বেশী আপন মনে করে এই অনুসন্ধিৎসাই হলো তার প্রকৃত নিদর্শন।

॥ শিল্পীর তুলিতে ॥

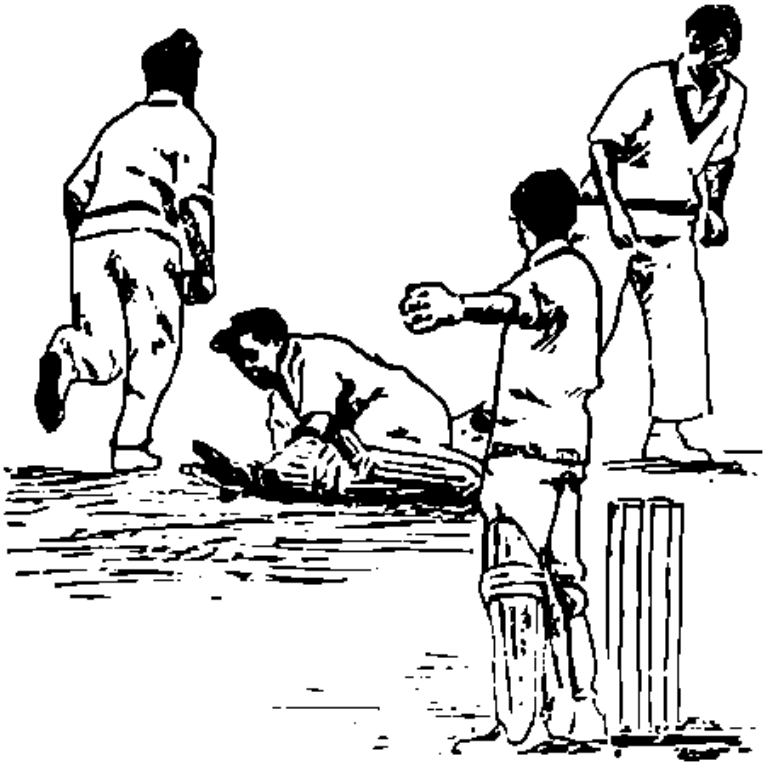

স্বামী বিবেকানন্দ স্মরণে

এ যুগের দিগন্তব্যাপী ঘোর অন্ধকারে যেখানে আমাদের মধ্যে, স্বামীজীর ভাষায়—"মনোবৃত্তির স্ফূর্তি নাই, হৃদয়ের বিকাশ নাই, প্রাণের স্পন্দন নাই, আশার তরঙ্গ নাই, ইচ্ছাশক্তির প্রবল উত্তেজনা নাই, তীব্র সুখানুভূতি নাই, বিকট দুঃখেরও স্পর্শ নাই, উদ্ভাবনী শক্তির উদ্দীপনা একেবারে নাই, নূতনত্বের ইচ্ছা নাই,—সেখানে তাঁর ইচ্ছাশক্তির অপরূপ প্রকাশ আমাদের চেতনায় কঠিন আঘাত দেবে করুক।

সাহস, শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস অর্জনের মন্ত্র আমরা স্বামীজীর কাছ থেকে গ্রহণ করব। চাকার যে কিছুই হয় না, 'নাথেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যারও কিছুই হয় না, ভালবাসার সব হয়'—চরিত্রই যে বাধাবিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে পারে এই অমর সত্য স্বামীজীর জীবন থেকে সংগ্রহ করব। 'আমাদের এখন এমন ধর্ম চাই, যাহাতে আমাদিগকে মানুষ করিতে পারে। আমাদের এখন সব মতবাদের আবশ্যক—যাহা আমাদিগকে মানুষ করে। যাহাতে মানুষ প্রস্তুত হয়, এমন সর্বাঙ্গসম্পন্ন শিক্ষার প্রয়োজন।' স্বামীজীর কাছে আমরা মানুষ হওয়ার মন্ত্রে দীক্ষা নেব। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—এই অভয়বাণী শোনাবার জন্যই তাঁর পবিত্র আবির্ভাব। তাঁরই আদর্শ অনুসরণ করে আমরা এ যুগের সমস্যার সমাধান অন্বেষণ করব।

এ দেশের মানুষ মানুষকেই ভুলে গিয়েছিল। স্বামীজী তাঁর জীবনাদর্শে মনুষ্যত্বকে ভাসিয়ে তুললেন। তিনি সকল দেশবাসীর কাছে উদাত্ত আহ্বান প্রেরণ করলেন, আবার তোমরা মানুষ হও। হে বীর জাগ্রত হও। উপেক্ষিত, নির্যাতিত নরনারীর সেবায় নিজেদের উৎসর্গ কর। দেশ ও জাতির সেবার মধ্যেই তোমার সকল শক্তি নিহিত রয়েছে, রয়েছে তোমাদের মুক্তি।

স্বামীজীর বজ্রগর্ভ বাণী আমাদের কানে ধ্বনিত হচ্ছে। ভারত আজ স্বাধীন কিন্তু কোথায় ভারতের আত্মমর্যাদা! কোথায় মানুষের মর্যাদা! মানুষের মত মাথা উঁচু করেই আমাদের বাঁচতে হবে। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার পথ স্বামীজী জাতিকে দেখিয়েছেন। আমরা সকলে বাংলার সেই বীর সন্ন্যাসীর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করব। স্বামীজী জাতিকে সেবা শক্তি ও মঙ্গলের পথে পরিচালিত করুন।

ভারতের শাশ্বত আত্মার যে অনির্বচনীয় প্রকাশ স্বামী বিবেকানন্দ আজ তাঁর মহাপুণ্যময় স্মৃতির পদতলে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করব, স্বাধীন ভারতের নরনারী তোমার সাধনা ও সিদ্ধির উত্তরাধিকারী হয়ে মানুষের মধ্যে দুর্জয় শক্তি ও প্রেমের লীলা প্রত্যক্ষ করুক। তোমার অভয় আশীর্বাদের সঞ্জীবনী মন্ত্রে কঙ্কালে প্রাণের সঞ্চার হোক, আজ নিশ্চয় করে উপলব্ধি করব—নিষ্ঠুর জড় পদার্থের মত পড়ে থাকার দিন গেছে, বীরের মত উন্নত মস্তকে অধিকার ও কর্তব্যকে নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে গ্রহণ করার শুভ মুহূর্ত সমাগত। আমাদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ও ক্ষুদ্র লোভের ওপর তোমার রোষবহ্নি পড়ুক,—তোমার অভয়বাণী আমাদের মনুষ্যত্বকে কঠিনবীর্য পৌরুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করুক, "বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। জয় প্রভু, জয় প্রভু! ক্ষুদ্র মরণ, ক্ষুদ্র ক্ষুধা, ক্ষুদ্র শীত। জয় প্রভু! অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা। পশ্চাতে চাহিও না, কে পড়িল দেখিতে যাইও না। এগিয়ে যাও, সম্মুখে, সম্মুখে।"

ভালবাসা কখন বিফল হয় না। আজই হউক, কালই হউক, শত শত যুগ পরেই হউক, প্রেমের জয় হইবেই। তোমরা কি মনুষ্যজাতিকে ভালবাস? ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নহে? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? নদীতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন? প্রেমের সর্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস সম্পন্ন হও।

স্বামী বিবেকানন্দ

কেবল কৃষির উন্নতিতেই অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে না। তার জন্যে চাই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধানে শিল্পোন্নয়নের সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনা। পরিকল্পনা গঠনকারীদের স্থিরচিত্তে বিচার করতে হবে, কোন কোন দেশীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবন করা সম্ভব, আর কোন কোন ক্ষেত্রে অধিক উৎপাদন নীতি গ্রহণ করা কর্তব্য। আধুনিক শিল্পবিপ্লবকে আমরা যতই অপছন্দ করি, ইচ্ছে থাকলেও আর শিল্পপূর্ব যুগে ফিরে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং ব্যাপক শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

—নেতাজী সুভাষচন্দ্র

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ

আজ আমি জানি, বাংলাদেশের জনসাধারণের প্রধান পদ সুভাষচন্দ্রের, সমস্ত ভারতবর্ষে তিনি যে আসন গ্রহণের সাধনা করে আসছেন সে পলিটিক্সের আসরে। আজকেকার এই গোলমালের মধ্যে আমার মন উঁকিঝুঁকি মারছে বাংলাকে, যে বাংলাকে আমরা বড় করব সেই বাংলাকে বড়ো করে লাভ করবে সমস্ত ভারতবর্ষ। তার অন্তরের ও বাহিরের সমস্ত দীনতা দূর করবার সাধনা গ্রহণ করবেন এই আশা করে আমি সুদৃঢ় সংকল্প সুভাষকে অভ্যর্থনা করি এবং এই অধ্যবসায়ে তিনি সহায়তা প্রত্যাশা করতে পারবেন আমার কাছ থেকে, আমার যে বিশেষ শক্তি তাই দিয়ে। বাংলাদেশের সার্থকতা বহন করে বাঙালী প্রবেশ করতে পারবে সসম্মানে ভারতবর্ষের মহাজাতীয় রাষ্ট্রসভায়। সেই সার্থকতা সম্পূর্ণ হোক সুভাষচন্দ্রের তপস্যায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি সুভাষচন্দ্র

গুরুদেব! আপনি বিশ্বমানবের শাশ্বত কণ্ঠে আমাদের সুপ্তোত্থিত জাতির আশা আকাঙ্খাকে রূপ দিয়েছেন। আপনি চিরকাল নূতনতর যৌবনশক্তির বাণী শুনিয়ে আসছেন। আপনি শুধু কাব্যের বা শিল্পকলার রচয়িতা নন। আপনার জীবনে কাব্য এবং শিল্পকলা রূপ পরিগ্রহ করেছে। আপনি শুধু ভারতের কবি নন—আপনি বিশ্বকবি। আমাদের স্বপ্ন মূর্ত হতে চলেছে দেখে যে সমস্ত কথা, যে সমস্ত চিন্তা, যে সমস্ত ভাব আজ আমাদের অন্তরে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছে তাহা আপনি যেমন উপলব্ধি করবেন, তেমন আর কে করবে? যে শুভ অনুষ্ঠানের জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি তার হোতা আপনি ব্যতীত আর কে হতে পারবে?

গুরুদেব! আজকার এই জাতীয় যজ্ঞে আমরা আপনাকে পৌরোহিত্যের পদে বরণ করে বসে রয়েছি। আপনার পবিত্র করকমলের দ্বারা "মহাজাতি সদনের" ভিত্তি স্থাপন করুন। যে সমস্ত কল্যাণ প্রচেষ্টার ফলে ব্যক্তি ও জাতি মুক্তজীবনের আস্বাদ পাবে এবং ব্যক্তির ও জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হবে—এ গৃহ তারই জীবন কেন্দ্র হয়ে মহাজাতি সদন নাম সার্থক করে তুলুক—এই আশীর্বাদ আপনি করুন। এবং আশীর্বাদ করুন যেন আমরা অবিরাম গতিতে আমাদের সংগ্রাম পথে অগ্রসর হয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করি এবং আমাদের মহাজাতির সাধনাকে সকল রকমে সাফল্যমণ্ডিত ও জয়যুক্ত করে তুলি।

মানুষ সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলা হয়ে থাকে কিন্তু প্রাণিজগৎ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ সংবাদ রাখি না। অথচ প্রাণিজগতের মধ্যে বিপুল বৈচিত্র্য বিদ্যমান। শুধু তাই নয়, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিরাট সমস্যাও দেখা দিয়েছে প্রাণিকুলে। মানুষের সঙ্গে জীবজগতের নূতন নূতন সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে মানুষের উগ্র লোভ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে প্রাণিজগতের কয়েকটি অমূল্য নিদর্শন চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে প্রাণিজগত সম্পর্কে আলোচনা কেবল কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য নয়, শিক্ষালাভের জন্য এবং প্রাণিজগৎকে রক্ষা করার মানবিক আবেদনে সাড়া দেওয়ার জন্যও বটে।

এই কথা স্মরণে রেখে প্রাণিজগৎ সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশ করা হোল।

এই প্রসঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চিড়িয়াখানা সম্পর্কে ও চিড়িয়াখানার রক্ষিত জীবজন্তুরা জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব।

প্রাণিজগৎ কোন পথে?

ক্রমবিবর্তনের পথে মানুষের আবির্ভাবের বহুপূর্বে এই পৃথিবীতে এসেছিল জন্তু-জানোয়ার। একদিন এ পৃথিবী ছিল তাদেরই। ক্রমে মানুষ হয়েছে পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিকারী, অথচ জীবজগতের অংশীদার হিসেবে মানুষের সঙ্গে তাদেরও দাবি রয়েছে এই পৃথিবীর ওপর। কিন্তু আজ পৃথিবীর বহু জীবের প্রাণধারণের ন্যূনতম দাবিও উপেক্ষিত। পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নততর প্রাণী যে মানুষ তার লোভ অবহেলা ও ঔদাসীন্যের ফলে গ্যালাপ্যাগোস দ্বীপপুঞ্জের বৃহৎ কচ্ছপ ও এশিয়ান ব্যাকট্রিয়ান ক্যামেল থেকে শুরু করে ব্রিটেনের গায়ক পক্ষী ও প্রজাপতি পর্যন্ত সমূহ বিনষ্টির পথে।

বিশু খ্রীষ্টের সময় বিশ্লেষ করলে দেখা যায় আজ পর্যন্ত প্রায় ১০০ রকমের প্রাণী পৃথিবী থেকে চিরকালের মত মুছে গেছে। এর মধ্যে ৬৮ প্রকার প্রাণী এত একশ বছরের মধ্যে নিঃশেষ হয়েছে। আরো চমকপ্রদ তথ্য হচ্ছে গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ৯টি জাতের প্রাণী একেবারে শেষ।

ঠিক এই সময়ের মধ্যেই প্রায় উপরোক্ত সংখ্যক বিভিন্ন শ্রেণীর পক্ষীকুলও চিরতরে অন্তর্হিত।

বহুকাল আগে মারা গেছে এক জাতের সমস্ত পাখী—তার নাম ডোডো, প্রাণের চিরবিলুপ্তির প্রতীকী বেদনা বহন করছে এই নাম।

আরো বহুবিচিত্র ও দুষ্প্রাপ্য প্রাণী—হাতী, হপিং, ক্রেন, চিতা, ঝাড়া শিংওয়ালা এন্টিলোপ (Oryx), গরিলা, কাশ্মীরীলাল হরিণ (Stag), স্টেলার্স অ্যালবাট্রস, সিনদি জলহস্তী প্রভৃতি আজ মানুষের মূঢ়তা এবং স্বার্থপরতার ফলে একেবারে লুপ্ত হতে চলেছে।

এই ভয়াবহ অবস্থার দিকে বর্তমানে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। জন্তু-জানোয়ারের বিপন্ন অস্তিত্বের প্রতি তার যে বিরাট নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে এ বিষয়ে তাকে সচেতন করতে হবে।

দুরদৃষ্ট সম্পন্ন এবং অসুন্দর দর্শন গণ্ডারকে মানুষ নির্মমভাবে হত্যা করেছে এবং তাকে তার প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। অত্যন্ত অল্পসংখ্যক গণ্ডারই আজ জীবিত। পৃথিবীতে বহু জাতের হাতী ছিল, সব একে একে শেষ হয়ে আজ দুটি জাতে এসে ঠেকেছে। ভারতীয় হাতী ধরা হয় নানা কাজে লাগাবার জন্যে, আর আফ্রিকার হাতীকে হত্যা করা হয় কেবল শিকারের জন্যেই তা ছাড়া আর হাতের মূল্যও বড় কম নয়।

বন্দী অবস্থায় হাতীর খুব কমই বাচ্চা হয়। ডোডো পাখির মতই একদিন তারা সব মরে যেতে পারে।

বিলুপ্তির পথে এসে দাঁড়িয়েছে আরবের অরিক্স।

গরিলাকে দেখে মনে হয় খুবই হিংস্র। কিন্তু তার শান্তিতে ব্যাঘাত না করলে সে কখনোই মানুষকে আক্রমণ করে না।

কিন্তু মানুষই হচ্ছে তার নিকৃষ্টতম শত্রু। বাচ্চা গরিলাগুলি বন্দী হচ্ছে তার হাতে, চিড়িয়াখানার শোভাবর্ধন করবে এরা, আর পূর্ণবয়স্কগুলি লুটিয়ে পড়ছে বুলেটের আগ্নেয় আঘাতে।

পশ্চিম আফ্রিকার জলহস্তী আজ সংখ্যালঘুদের দলে।

কাশ্মীরী লাল হরিণের শিংগুলি ভারী সুন্দর। শিকারীরা ওর পেছনে ছুটল, কিন্তু স্বার্থদুষ্ট সেই অন্বেষণ, সৌন্দর্যরক্ষার কোন বাসনা তাদের ছিল না, ফলে ওরাও আজ অবলুপ্তির মুখে।

হুপিংক্রেন নামে উত্তর আমেরিকার এক জাতীয় সারস পাখি পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্লভ প্রাণীরূপে পরিগণিত। ওয়াইল্ড ফাউল ট্রাস্টের ডাইরেক্টর পিটার স্কটের মতে আর মাত্র তিরিশটি পাখি জীবিত আছে। আমেরিকার প্রাচীনতম অধিবাসী এই সারস, আমেরিকার নবীনতম আগন্তুক সভ্য মানুষের হাতে তার সংহার না সংরক্ষণ—এই চিন্তায় আজকের প্রকৃতিপ্রেমী শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আকুল হয়ে উঠেছে।

গভীর নৈরাশ্যের মাঝে একটু আধটু আশার আলো দেখা যায়। গতকের লোভে এতকাল শিকারীরা হত্যালীলা চালিয়ে আসছিল স্টেলার্স অ্যালবাট্রসের ওপর। অতি সুন্দর এই পাখীগুলি নিধনে

হয়ে যাচ্ছিল। এরা যাতে নিশ্চিন্তে এদের নীড়ে বাস করতে পারে তার জন্যে বহুকাল ধরে রেলপথের পরিবর্তন সাধন করবে বিশেষ তোড়জোড় চলেছে। এ ঘোষণায় পক্ষীপ্রেমিক মাত্রেই উল্লসিত।

জায়াণ্ট পাণ্ডা খুবই দুষ্প্রাপ্য জন্তু। ঠিক সময়ে সচেতন না হলে এটিরও নিদর্শন মিলত কেবল মাত্র যাদুঘরে। বিশ শতকের দুর্ভাবনার মাঝে মানুষের শুভবুদ্ধি যে একেবারে আচ্ছন্ন হয় নি তারই প্রতীক হয়ে রয়েছে পাণ্ডা।

জন্তু-জানোয়ারের এই মৃত্যুর মিছিলের অন্যতম কারণ হচ্ছে মানুষের অবহেলা। প্রকৃতির মাঝে বিরাজ করছে এক ভারসাম্য। মানুষ যখন এই ভারসাম্য নষ্ট করে তখনই বিপর্যয় উপস্থিত হয়। বলা যাক জেব্রার কথা। দলে দলে এরা যে প্রান্তরে চরে বেড়ায় সেখানে প্রকৃতি তাদের জন্যে রেখেছে নরম ঘাস। মানুষ সেই বিশাল মাঠকে করলে সুপরিচালিত পশুচারণ ক্ষেত্র। গোরুতে সমস্ত ঘাস খেয়ে তৃণক্ষেত্র মরুভূমি করে ফেললে। ফলে অনাহারে মারা পড়ল জেব্রা।

মাঝে মাঝে হৃদয়বিদারক দৃশ্য অরণ্যে অকূলে দেখা যায়। একটা কঙ্কাল পড়ে আছে মাটিতে, অদূরে তার জলের উৎসটি শুকনো। হয়তো সে জল খুঁজতে শ্রান্ত হয়ে পথেই লুটিয়ে পড়েছে, পৌঁছতে পারে নি জলের ধারে, কিংবা গর্তের কাছে এসে জল না পেয়ে প্রাণ হারিয়েছে আকণ্ঠ তৃষ্ণায়।

পানীয় জল চাই অরণ্যে, আর চাই অবগাহনের সুযোগ। শুধু পানীয় জলে জলহস্তীর তৃষ্ণা মিটবে না। শুধু তাই নয়, নদী শুকিয়ে গেলে গাছপালা জন্মাবে না, মাছ অদৃশ্য হয়ে যাবে, তৃণভোজী-দের খাদ্য মিলবে না, মিলবে না এতটুকু ছায়া, যে সব প্রাণী মাছ খায় তাদেরও ঘটবে চরম খাদ্যাভাব। আফ্রিকার কেনিয়াস্থ Tsavo East National Park-এ দশ হাজার জন্তুজানোয়ারের মৃত্যু হয়েছে। এটা মাত্র এ বছরের প্রথম ছ'মাসের খবর। প্রতি বছর মাত্র ১২৫টি গণ্ডার পারক পৃথিবীর আলো দেখে, আর পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় বহুরে পাঁচশোটি। এদেরও বংশ শেষ হয়ে এল।

মানুষের আবিষ্কৃত বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য লক্ষ লক্ষ বর্গ মাইল জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে, লক্ষ লক্ষ পাখি মারা পড়ছে তাতে, অথচ ওই পাখিই অতিকর কীটপতঙ্গ বিনাশ করে মানুষের উপকার করে। চতুর্দিকে আজ বড় বড় ইঞ্জিনীয়ারিং প্রজেক্টের মহিমা। এতেও প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

আজকাল ট্যুরিস্ট আকর্ষণের জন্যে প্রতিটি দেশ তার নিজ নিদর্শন সাজিয়ে দোকান খুলেছে। উদ্দেশ্য, বিদেশীদের কাছে নিজের দেশের কুটিরশিল্পের নমুনা তুলে ধরা। আফ্রিকার শহরে শহরে এক ধরনের অদ্ভুত দোকান দেখা যায়—সে পণ্য যাঁটি দেশজাত সত্ত্বেও নেই কিন্তু তার উপাদান বহু প্রাণীর অঙ্গ, রক্ত, অস্থি, চর্ম··· হাতির পা, জেব্রার লেজ, গণ্ডারের খড়্গ, হাতীর দাঁত, সিংহের চামড়া ও থাবা—সবই পাওয়া যায় দোকানে, বিদেশী ট্যুরিস্ট চড়া দামে এসব কিনে নিয়ে যায়, দেশে ফিরে হয়তো সকলকে তা লাগিয়ে দেয়—এ সবই তার শিকারের ফসল।

একদিকে এই লোভ, আর একদিকে মানুষের অন্ধ বিশ্বাস—এ দুয়ে মিলে আরণ্য প্রাণীর মৃত্যু ত্বরান্বিত করেছে।

এশিয়ার ব্যবসায়ীদের অন্ধ বিশ্বাস, গণ্ডারের খড়্গে অসীম শক্তি। এ জিনিস খেলে তাদের যৌবনশক্তি ফিরে আসবে। খড়্গচূর্ণ তারা জলে মিশিয়ে পান করে।

আফ্রিকার অরণ্যে ঘুরে বেড়ায় মানুষ, হাতে তাদের অস্ত্রশস্ত্র, কি করে জন্তুকে ফাঁদে ফেলতে হয়, কি করে তাদের নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়ে তিলে তিলে হত্যা করতে হয়—এসব তথ্য তাদের আয়ত্তে।

ফলে মৃত্যুর ফাঁদে ধরা পড়ে ইন্যাও, তার গলায় ফেঁসে বসে শক্ত তার, অবাক যন্ত্রণায় তার মৃত্যু হয়। চামড়াটা অবশ্য কালোবাজারে বিক্রি হয় চড়া দামে।

এই হত্যাকাণ্ড বন্ধের একটিমাত্র পথ খোলা আছে। সেটি হচ্ছে সংরক্ষিত অরণ্যে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া, আর এজন্যে দরকার বিরাট সংগঠনের।

ইংলণ্ডে সম্প্রতি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্যে জোর আন্দোলন শুরু হয়েছে, প্রকৃতি-প্রেমিক মানুষ একে দ্বিতীয় ক্রুসেড অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধ আখ্যা দিয়েছে। এজন্যে প্রচুর অর্থ, বিরাট সংগঠনী শক্তি এবং প্রাণি-জগৎ সম্পর্কে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন। আর সর্বোপরি চাই প্রেম, নিখিল বিশ্বের বেদনার অনুভব।

নির্মলেন্দু ধারা

বিস্ময়ের বিষয় কোন জন্তু কি ভাবে চলে—এ বিষয়টি এখনও অবহেলিত রয়ে গেছে। প্রাণি জগতে শারীরিক গঠন বৈচিত্র্যের সঙ্গে সমতা রেখে চলারও বহু বিচিত্র ছন্দ বর্তমান। যারা বেঁটে মোটা আর ছোট পা-ওয়ালা তারা চলে হাঁসের মত দুলে-দুলে। হাতীর মত যারা ভারী আর মোটা তারা সব সময় দুটি কিংবা তিনটি পা রাখে মাটির ওপর। আর যারা চিতার মত তারা ছুটতে পারে লাফিয়ে লাফিয়ে।

হাতী ছুটতে পারে ঘণ্টায় তিরিশ মাইল সর্বোচ্চে। চিতা ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে ছোটে।

এখন পিতলের-ঢক্কা ক্যাপযুক্ত শিশিতে
পাওয়া যায়

- ঝরঝরে লেখা হয়
- তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়
- সাবলীল গতিতে কালি যায়

রেনবো কালি

রেনবো ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাঃ লিঃ
২১এ, আর্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত কর্তৃক ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত-সাহিত্যের তথ্য-সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক আলোচনা ও আধ্যাত্মিক রূপায়ণ। [১৫৲]

রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত

এই চিরায়ত কাব্য ও ধর্মগ্রন্থটিকে সুন্দর চিত্রাবলী ও মনোরম পরিসাজে মুসরুচিসম্মত একটি অনিন্দ্য প্রকাশন করা হইয়াছে। সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত। শিল্পী শ্রীপূর্ব রায়ের বহু রঙীন ও একবর্ণ চিত্রে শোভিত। প্রকাশন পারিপাট্যে ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত। [৯৲]

রমেশ-রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত; তাঁহার যাবতীয় উপন্যাস জীবদ্দশাকালীন শেষ সংস্করণ হইতে গৃহীত ও একত্রে গ্রন্থিত মোট ছয়খানি উপন্যাস : বঙ্গবিজেতা মাধবীকঙ্কণ, মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত, সংসার এবং সমাজ। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত ও সাহিত্যকীর্তি আলোচিত। [৯৲]

সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহাতে তিন হাজারের অধিক শব্দসংখ্যা যোগ হইয়া চৌতাল্লিশ হাজারের মত শব্দের ব্যাখ্যা ও ব্যুৎপত্তি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। লাইনো হরফে ছাপা; সুদৃঢ় বাঁধাই। [৮৷৹]

SAMSAD ANGLO-BENGALI DICTIONARY

বহু প্রশংসিত উচ্চ-মানবিশিষ্ট ইংরেজী-বাঙ্গালা আধুনিক শব্দকোষ।
১৬৭২ পৃঃ [১২৷৹]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদের সংকলন, টীকা, শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রমিক পদসূচী সম্বলিত পদাবলী সাহিত্যের আধুনিকতম আকরগ্রন্থ। অধুনা অপ্রাপ্য 'পদকল্পতরু' ও 'পদামৃত-মাধুরী' হইতেও অধিকতর পদ সংযোজিত এবং বহু অপ্রকাশিত পদ এই প্রথম প্রকাশিত। ডিমাই অক্টেভো আকারে লাইনো হরফে মুদ্রিত হওয়ায় সহজ ব্যবহার্য হইয়াছে প্রকাশনা সৌষ্ঠবে অনুপম। [২৫৲] গ্রন্থাগার, পদাবলী-রসিক ও কীর্তনীয়াগণের অপরিহার্য গ্রন্থ।

পুস্তক-তালিকার জন্য লিখুন :
সাহিত্য সংসদ
৩২-এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৯

আমাদের বই সর্বত্র পাওয়া যায়

গল্প-ভারতী

ফাল্গুন—১৩৬৮

সম্পাদক :

সহঃ সম্পাদক : শ্রীকল্যাণ রায়

মূল্য—এক টাকা

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড ২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে
শ্রীসুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত এবং কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড,
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

"..... কেশ নবীনে কেন দেবে?

লোমা

সাদা চুলকে চিরস্থায়ী কালো ক'রতে—অদ্বিতীয়—

সোল এজেন্ট :এম, এম, খাম্ভাটওয়ালা, আমেদাবাদ

এজেন্ট :—শা বভিসী এণ্ড কোং
১২৯ রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

সোল এজেন্টস্ :—
এম. এম. খাম্ভাটওয়ালা
আমেদাবাদ—১

এজেন্ট :—
শাহ বাভিশী এণ্ড কোং
১২৯, রাধাবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—

ফোন :- ২২-১০১৮

Lord's

যে কোন উপলক্ষেই

লর্ডের

লজেন্স
ও
টফি

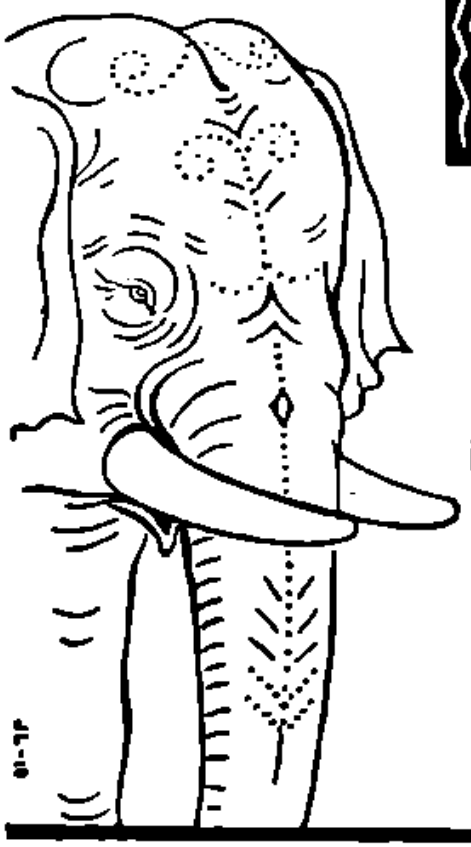

এই সংখ্যায়

একজন আর কয়েকজন (স্মৃতিকথা)—অনিল কুমার ভট্টাচার্য ৮৫৩
খোলা জানালা (গল্প)—সুপ্রিয়া সেন ৮৫৭
দেশবিদেশ (সচিত্র)— ৮৬০
খেলাধূলা— ৮৬৬
Election Eloquence— ৮৬৬
তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন—রঙ্গরস ৮৬৭
প্রাণিজগৎ—(সচিত্র সংযোজন) — ৮৭২
হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী ও প্রাণিসমাজ— ৮৭৪
মানবপ্রেমের আলোতে উজ্জ্বল জার্মাণীর প্রাণিপ্রীতি— ৮৭৫
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (বিশেষ সংযোজন) ৮৭৯
দুইটি চিঠি—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীযদুনাথ সরকার ৮৮০
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ৮৮১
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ৮৮৩
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—হারীতকৃষ্ণ দেব ৮৮৭
সাংবাদিকজগতের অনন্যসাধারণ পুরুষ—বিধুভূষণ সেনগুপ্ত ৮৮৯
আচার্য হেমেন্দ্রপ্রসাদ ও আমরা—দক্ষিণারঞ্জন বসু ৮৯২
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের স্মৃতি—ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ ৮৯৫
কয়েকটি চিঠি ও একটি স্মৃতি—পৃথীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ৮৯৮
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ও বাংলা সাংবাদিকতা—পবিত্র পাল ৯০১

অব্যাহত গতি

একদা মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত রচনা করিয়া ইহাকে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য একজন লেখকের খোঁজ করিতেছিলেন। কিন্তু কেহই এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হইলেন না। অবশেষে পার্বতী-তনয় গণেশ এই শর্তে রাজি হইলেন যে তাঁর লেখনী মুহূর্তের জন্যও থামিবে না।

আধুনিক যুগের লেখকরাও চান যে তাঁদের লেখার গতি কোনক্রমেই ব্যাহত না হয়। আর এই অব্যাহত গতির জন্যই সুলেখা আজ এত জনপ্রিয়

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ : কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

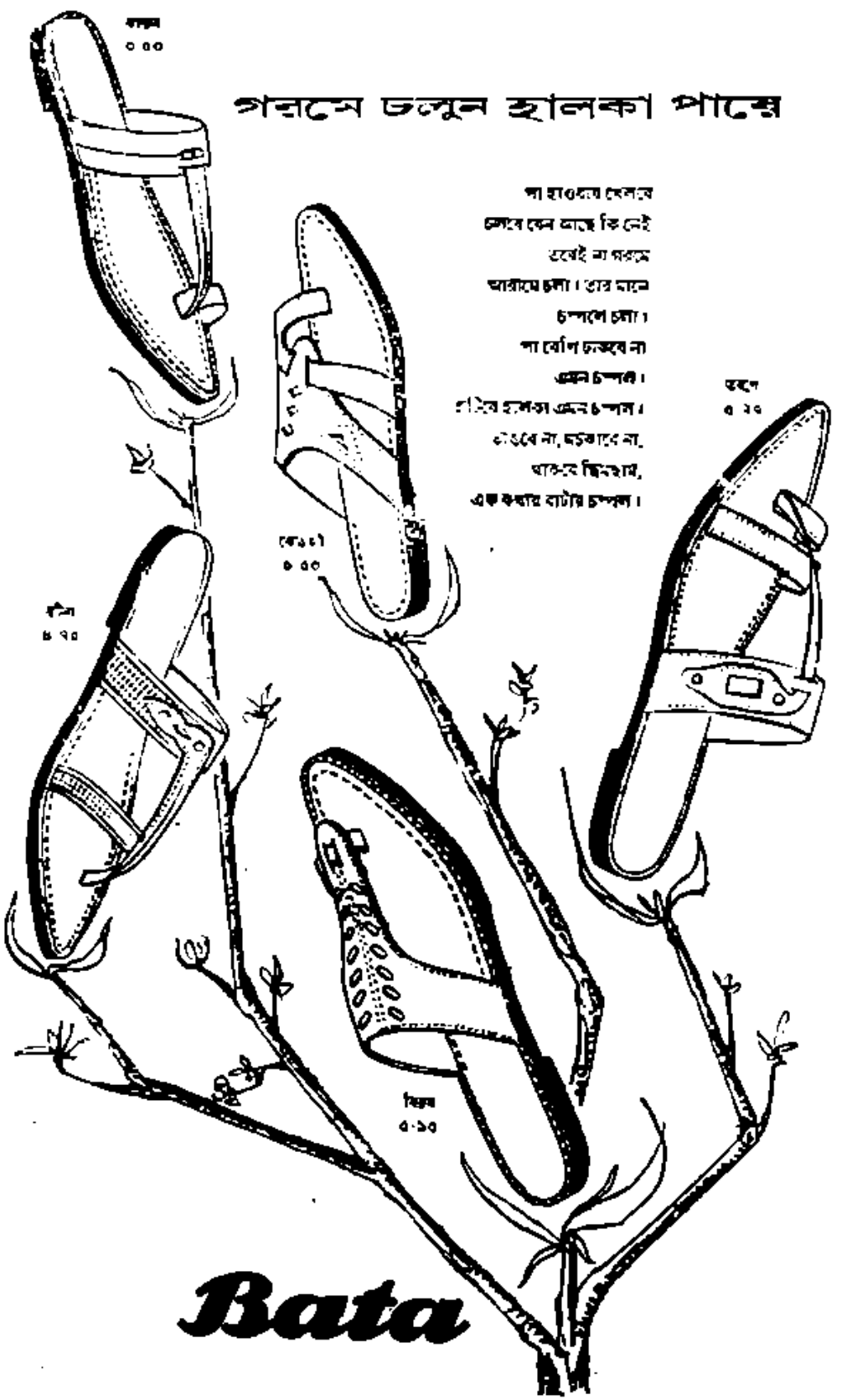
গরমে চলুন হালকা পায়ে
পা হাওয়ায় খেলবে
চলবে কেন আছে কি নেই
তবেই না গরমে
আরামে চলা। তার মানে
চপ্পলে চলা।
পা বেঁধে চলবে না
এমন চপ্পল।
হবে হালকা এমন চপ্পল।
ওঠবে না, ঘড়ঘাবে না,
থাকবে ছিমছাম,
এক কথায় বাটার চপ্পল।
Bata

CALCUTTA UNIVERSITY

সপ্তদশ বর্ষ ॥ অষ্টম সংখ্যা. ফাল্গুন ১৩৬৮

গল্প-ভারতী

সম্পাদকীয়

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও ভক্তিমার্গ

জ্ঞান ও কর্মমার্গ ভারতের প্রাচীনতম অধ্যাত্ম সাধনার দুই ধারা, তার মধ্যে কর্ম বা আচার হিন্দুদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত। "শ্রুতি" বা বৈদিক যুগের সাহিত্য থেকে "স্মৃতি" বা ধর্মশাস্ত্র পর্যন্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অর্থাৎ 'দ্বিজ' জাতি সঙ্ঘ আজও বর্তমান। কিন্তু সংখ্যা-গরিষ্ঠ শূদ্র চতুর্থ-বর্ণ ছাড়া, অন্ত্যজ [অনার্য] ও অস্পৃশ্যাদি অগণ্য নিম্নজাতি বহুকাল ন্যায়-বিচারের দাবি জানায়। কালের সেই দাবি না শোনার ফলে লক্ষ লক্ষ হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম খৃষ্টানাদি বিজাতীয় ধারা অনুসরণ করে এবং তাই বর্ণ-সঙ্কর তথা জাতীয় সংকট সৃষ্টি করেছে। তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা আজ রূপ গ্রহণ করেছে আসামে Nagaland এবং ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী 'দ্রাবিড়-স্থান' দাবিতে। এসবের শেষ কোথায় ?

এই জাতীয় সংকটে কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা করেছেন—Disintegration or Integration নিয়ে বিচ্ছেদ বা সমন্বয়ের প্রশ্ন জনমনে সজাগ করে তুলতে। অথচ তার মধ্যেই আলিগড় থেকে মীরাট দিল্লী অঞ্চলে আগুনের মত জ্বলে উঠল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। জনশিক্ষার মূলে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রয়োজন আজ প্রকট অথচ কোন স্কুল-কলেজে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা আজ নেই। সেকথা স্মরণ করাই এ বছর শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের তিথি-উৎসবে।

Vivekananda Bridge মুখে দক্ষিণেশ্বর থেকে শুরু করে ওপারে বেলুড় পর্যন্ত নানা জনকল্যাণ-কর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তাই আশা হয় তথাকথিত secularism বুলি ছেড়ে, সর্ব-ধর্ম সমন্বয়ের বাণী শোনান হয়ত শুরু হবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব [১৮৩৬-১৮৮৬], মাত্র ৫০ বছরে, তাঁর সেবক ভক্ত ও সহযোগীদের নিয়ে কত বড় কাজ করে গেছেন সেটি বিবেকানন্দ শতাব্দী উপলক্ষে মনে পড়ে।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অতি সংক্ষিপ্ত ৩৯ বছরের [১৮৬৩-১৯০২] জীবনের শেষ দশকে যে বিরাট কাজ করে গেছেন তার জন্য আমরা চিরঋণী। সে ঋণ কথঞ্চিৎ শোধ হবে যদি Vivekananda University তাঁর উপযুক্ত করে গড়ে তোলা যায়। তার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে সেও আশার কথা। জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও রাজযোগ প্রভৃতি গ্রন্থ লিখে ও বহু ভাষণ ইওরোপ আমেরিকা ও ভারতে দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ যেন তাঁর নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয়ের আধ্যাত্মিক পাঠ্য সূচী [Syllabus]

নিখেই রেখে গেছেন। কিভাবে তার ব্যবহার ও ভবিষ্যৎ গবেষণাদির সূত্রপাত করা হবে, সেই তো মূল প্রশ্ন। Vivekananda University-র সামনে সেকথা নবনির্বাচিত অধ্যক্ষ এবং মঠ ও মিশনের শ্রীমৎ-বিশুদ্ধানন্দজীকে জানিয়েছি; তাঁর নেতৃত্বে, নবযুগের শিক্ষা শুরু হোক এই প্রার্থনা।

শ্রীচৈতন্য পঞ্চ শতাব্দী

শ্রীরামকৃষ্ণ তিথি উৎসবে আর এক মহাপুরুষকে বারবার মনে পড়ল তিনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য [১৪৮৬ জন্ম]। আসামের শঙ্করদেব, উড়িষ্যার বাসুদেব সার্বভৌম ও আর ভক্তি শাস্ত্র-প্রণেতা রায় রামানন্দ, শ্রীচৈতন্যের বাণী, কামরূপ ও বঙ্গদেশ থেকে উড়িষ্যা ও দ্রাবিড় সীমান্ত পর্যন্ত ভক্তির প্লাবনে সবাইকে মাতিয়েছিলেন। সেই গৌরবের ঐতিহ্য আবার জীবন্ত করে তুলতে হবে; কারণ ২০২৪ বছরের মধ্যেই শ্রীচৈতন্য পঞ্চম শতাব্দী [১৪৮৪-১৯৮৪] উৎসব শুরু করতে হবে। বাংলার ভক্তি-গঙ্গা বিরাট ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা থেকে মহানদী, কৃষ্ণা ও কাবেরী-কূল পর্যন্ত প্লাবিত করেছিল, সেকথা এদেশের লোকই প্রায় ভুলেছে। কিন্তু সেই দিব্য প্রেমের বিরাট অভিযান আবার বাংলা বাংলা আমাদের অনুসরণ করতে হবে, গড়ে তুলতে হবে "শ্রীচৈতন্য বিশ্ববিদ্যালয়" যেখানে শ্রীবাস-প্রাঙ্গনের পাশেই থাকবে "যবন" হরিদাসের প্রাঙ্গন। তাদের আশীর্বাদে সেই ভক্তি-তীর্থই ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধন-ক্ষেত্র হয়ে উঠবে দোল পূর্ণিমার উৎসবে। মাতামাতি কমিয়ে দেশবাসীদের সে কাজের কথাই স্মরণ করাই। কীর্ত্তনিয়া ও সুরশিল্পীদের অনুরোধ করি শ্রীচৈতন্য কীর্তন প্রবাহ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ যুগ পর্যন্ত, যে সব অমূল্য ভজন বাউল কীর্ত্তন ও ভাব-সঙ্গীত প্রচলিত ছিল, সেগুলি শিখে ও পরিবেশন ক'রে লুপ্ত-রত্নোদ্ধার করুন। একথা কলাধিৎ স্বামী প্রজ্ঞানন্দজীকে স্মরণ করিয়ে এসেছি। তিনি সেই সব বিস্মৃত প্রায় "সাধন সঙ্গীত"গুলি সংগ্রহ করে তাদের স্বরলিপি প্রকাশ করুন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেকালে ভক্ত চিরঞ্জীব শর্মার ব্রহ্ম-সঙ্গীত ভালবাসতেন অথচ তার নামে যে ত্রৈলোক্য সান্যাল ও তাঁর গানগুলি কেউ প্রায় গাইতে জানেন না।

রাগকল্পদ্রুম ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

প্রাচীন রাগসঙ্গীত ও ব্রহ্মসঙ্গীত মহারাজা রামমোহন রায় [বিষ্ণুবাবুর পৃষ্ঠপোষক] ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যুগ পর্যন্ত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৯১৬ সালে প্রকাশ করেন। বিশ্বকোষ-সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু এই বিরাট গ্রন্থ প্রকাশের টীকা টিপ্পনী দেন ও সমগ্র সম্পাদন ও মুদ্রণের খরচ দেন লালগোলার রাজা শ্রীযোগীন্দ্র নারায়ণ রায়। তাঁর আনুকূল্যে, লক্ষাধিক টাকা খরচে, সংস্কৃত, হিন্দী, গুজরাটি, মারাঠী, কর্ণাটী, তামিল, তেলেগু, ওড়িয়া, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় রচিত উচ্চাঙ্গের গান, তিন খণ্ডে বর্ণাক্ষরে ছাপা হয়েছিল। অধুনা দুষ্প্রাপ্য সেই ৺কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব বিরচিত 'সঙ্গীত রাগ-কল্পদ্রুম' আমাকে উপহার দেন লালগোলার সৌহিত্র সুসাহিত্যিক রাও রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়। তিনি তাঁর মাতামহ পণ্ডিতপ্রবর ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ঘরে-বাইরের কথা মনোজ্ঞ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। রামেন্দ্র-সুন্দর আমাদের কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথের কল্যাণ মিত্র ছিলেন। তাঁর পরে বঙ্গের যুগের পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে সাহিত্য-পরিষদ গৌরবান্বিত হন। তাঁর তিরোধানের পর, পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও আচার্য যদুনাথ সরকারের আমলে, বঙ্কিমচন্দ্র-শতাব্দী-গ্রন্থমালা প্রকাশ করে আমাদের কৃতার্থ করেছেন।

সজনীকান্ত দাস

৺ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ও সজনীকান্ত দাস এই নূতন কাজে প্রধান উদ্যোক্তা। তাঁরা "সাহিত্য-সাধক চরিতমালা" ও অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ প্রকাশ করে আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করে গেছেন। বন্ধুবর সজনীকান্তের সাহিত্য সেবার কথা দুগারের পত্রিকায় "স্মারক" সংখ্যায় লিখেছি। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় আরো বহু তথ্য ক্রমশ প্রকাশিত হবে। সজনীবাবুর অপ্রকাশিত কাগজপত্র দেখে তাঁর সাহিত্যিক বন্ধু কেউ প্রকাশ শুরু করলে ভাল হয়। বহু দুষ্প্রাপ্য বাঙ্গালা গ্রন্থাদি সজনীবাবু সংগ্রহ করেন; তাঁর বন্ধু শ্রীযুক্ত পুলিন সেন [বিশ্বভারতী] ও অমল হোম প্রভৃতি মিত্র এদিকে দৃষ্টি দিলে আশ্বস্ত হব। ১৯২৩-২৪ থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সজনীকান্ত বহু সাময়িক পত্রিকায় তাঁর গদ্য ও পদ্য রচনা ছেপেছেন; অথচ 'গ্রন্থপঞ্জী' রচনা শুরু না হলে সবাই ভুলে যাবে। এই বন্ধুকৃত্য পালন করতে তাঁর সুহৃদ মণ্ডলীকে অনুরোধ করি। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ও 'বনফুল' তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু; তাঁদের এবিষয়ে অবহিত হতে অনুরোধ করি। কারণ অনেক প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র তাঁদের সাহায্যে শনিবারের চিঠিতে ছাপা হতে পারে। অধ্যাপক সুশীলকুমার দে ও ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ও এবিষয়ে সাহায্য করবেন, কারণ তাঁদের সঙ্গে সাহিত্য-পরিষদের যোগও নিবিড় বহুকালের।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—বিশেষ সংযোজন।

'গল্প-ভারতী'কে পিতৃতুল্য স্নেহে ৺ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ধন্য করে গেছেন। তাঁর শেষ রচনা ও মৃত্যুর পর তাঁর শেষ আশীর্বাদী প্রবন্ধ ছাপার সৌভাগ্য আমাদের হ'ল। তাঁর বিপুল গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহ [collection] সুরক্ষিত হলে আমরা তথা সাংবাদিক মাত্রেই সুখী হবেন। কেন তিনি, এ সংগ্রহ করে রেখে গেছেন সেটি ক্রমশ বোঝা যাবে। অন্য পত্রিকাদির "হেমেন্দ্র-সংখ্যা" প্রকাশ হল না দেখে আমরা গল্প-ভারতীতে তাঁর নামে বিশেষ সংযোজন দিলাম, হয়তো তার ফলে নূতন তথ্যাদি ও তাঁর বিস্মৃত প্রায় রচনা অন্যত্র ছাপা হবে। মনে রাখতে হবে যে সংবাদ-সাহিত্যেরও এক বিরাট ঐতিহ্য আছে, "গৌড়ীয় ব্যাকরণ" রচয়িতা রামমোহন রায় ও তৎকালিন কবি ঈশ্বর গুপ্ত ও সাংবাদিক ছিলেন, এবং সেই ধারা সগৌরবে অনুসরণ করে গেছেন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়; এ বিষয়ে গবেষণা করে ৺ হেমেন্দ্রপ্রসাদ-যুগের সংবাদ-সাহিত্য অবধি আলোচনা সুরু হোক।

শচীন্দ্রনাথ সান্যাল

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

"Of all men now living he has exercised the greatest amount of influence over the educated classes of our countrymen. His death would be a real loss··· for the progresss of independence of mind and thought."

অর্থাৎ—বর্তমানে জীবিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে দেশের শিক্ষিত লোকদিগের মনে, তিনিই সর্বাধিক প্রভাব স্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু মনের ও চিন্তার অগ্রগতির প্রকৃত ক্ষতির কারণ হইবে।

বাংলার একজন মনীষীর সম্বন্ধে আর একজন এক মনীষী তৃতীয় মনীষীকে এই কথা লিখিয়াছিলেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে দেশের ও দশের কল্যাণ সাধনায় সর্বস্ব ব্যয় করিয়া—অর্থ, উদ্যম ও প্রতিভা যুক্ত করিয়া—যাহাকে "বিশ্বজিৎ" যজ্ঞ বলে তাহাই করিয়া নিঃস্ব অবস্থায় সার্থকনামা হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যখন মৃত্যুশয্যায়—তখন মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে পত্রে ওই মত জানাইয়া আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

বহুদিন পরে অন্য প্রসঙ্গে বাংলার আর একজন মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন, রামমোহন রায়কে ছাড়িয়া দিলে—"রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালাদেশে দেশ-বাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে।"

আর কয় মাস পরেই হরিশচন্দ্রের মৃত্যু-শতবার্ষিকী। ১০ই জুন তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৪ই জুন বাংলার পক্ষে শোকের দিন। এই দিনে হরিশচন্দ্রের মত চিত্তরঞ্জন দাশ ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় মরদেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

আগামী ১০ই জুন যদি হরিশচন্দ্রের মৃত্যু-শতবার্ষিকী যথাযোগ্যভাবে উদ্‌যাপিত না হয়, তবে তাহা বাঙ্গালীর ও ভারতবাসীর পক্ষে লজ্জার কারণ হইবে। কারণ পূজ্যপূজা-ব্যতিক্রম অপরাধ। যে জাতি তাহার মনীষীদিগকে সম্মান নিবেদন করিতে না জানে সে জাতি মনীষীর আবির্ভাবের উপযুক্ত নহে।

ল্যাটিন ভাষার একটি কথা আছে—যার বাংলা অর্থ হল —"আমি প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করি।" হরিশচন্দ্রকে সমস্ত জীবন তাহাই করিতে হইয়াছিল এবং বীর যোদ্ধার মত তিনি কখনও রণে ভঙ্গ দেন নাই। শৈশবে ও বাল্যে তাঁহার যুদ্ধ দারিদ্র্যের সহিত; যৌবনে তাঁহার যুদ্ধ জ্ঞানার্জনে বিঘ্নের সহিত; প্রৌঢ়ে তাঁহার যুদ্ধ কুসংস্কার ও অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে। যুদ্ধে আবির্ভাব হইয়া তিনি মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে বার্ধক্যের পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারই মধ্যে তিনি যে কাজ করিয়া গিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

লেখক বলিয়াছেন, শত্রুর দুর্গ যখন অধিকৃত হয়, তখন দুর্গের সমুচ্চচূড়ায় পতাকা উড্ডীন করিবার লোকের অভাব হয় না—যাঁহারা অজেয় বলিয়া বিবেচিত দুর্গ জয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তাহা আক্রমণ করেন ও প্রাকারে প্রবেশ পথ করেন—কিন্তু দুর্গ প্রবেশ করিবার পূর্বেই প্রাণদান করেন—তাঁহাদিগেরই অভাবলক্ষিত হয়। কিন্তু আমরা যেন তাঁহাদিগকে বিস্মৃত না হই।

তেমনই আমরা যেন হরিশচন্দ্রকে বিস্মৃত না হই—পূজাপূজা-ব্যতিক্রম পাপে পাপী না হই।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে কলিকাতার উপকণ্ঠে ভবানীপুরে মাতুলালয়ে বহুবিবাহকারী কুলীন পিতার তৃতীয়া পত্নীর পুত্র হরিশচন্দ্রের জন্ম হয়। কুলীনপুত্র বলিয়া খৃষ্টান পাদরিদিগের সংবাদপত্র "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" তাঁহাকে ব্যঙ্গ করেন। দেশে একটি চলিত কথা ছিল—

"দুই জাত কুলীনের ছেলে—
তোরে নাদ দিব কি বলে?"

কিন্তু হরিশচন্দ্র উত্তরে আপনার উৎকর্ষের কথায় বলেন—"জাতির মধ্যে হিন্দু, হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের মধ্যে কুলীন, কুলীনের মধ্যে ফুলিয়া।" তিনি বার্ণার্ড শ'র কৌলিন্য প্রথা সমর্থনের বহু পূর্বে এইকথা বলিয়াছিলেন।

দরিদ্র পিতার সন্তান হরিশচন্দ্র মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তৎকালীন প্রথানুসারে 'হাতে খড়ি' [বিদ্যারম্ভ] হইবার পরে তাঁহাকে স্থানীয় পাঠশালায় প্রেরণ করা হয় এবং তথায় তিনি বাঙ্গালা শিক্ষা করেন। সাত বৎসর বয়সে স্থানীয় 'ইউনিয়ন স্কুলে' বিনা বেতনে গৃহীত ছাত্ররূপে প্রবেশ করিয়া তিনি তয় বৎসরে ইংরেজী শিখেন বটে কিন্তু যখন তাঁহার বয়স চতুর্দশ বৎসর তখনই তাঁহাকে সংসার প্রতিপালনের জন্য অর্থের সন্ধানে বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে হয়। তিনি পরে সিংহগর্জনে অত্যাচারী ইংরেজ রাজকর্মচারীর নীলকরদিগের অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়া দেশবাসীর কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন, তিনি দারিদ্র্যহেতু বাল্যকালেই বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া অর্থার্জনের চেষ্টা করেন। যে শিক্ষা তাঁহাকে সমসাময়িক সমাজে সমাদৃত করিয়াছিল, সে শিক্ষা তিনি স্বীয় চেষ্টার কর্মক্ষেত্রে অর্জন করিয়াছিলেন। চাকরীর চেষ্টায় তিনি নানা স্থানে ঘুরিতে লাগিলেন কিন্তু বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা হইয়াছিল, তাহাতে কেরাণীর চাকরীও জুটিল না। তখন দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি হয় নাই। কেহ কেহ ইংরেজীতে বিল, আবেদনপত্র প্রভৃতি লিখিয়া কিছু কিছু উপার্জন করিতেন। হরিশচন্দ্র তাহাই করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার দারিদ্র্য কিরূপ তাহা একটি ঘটনা হইতে বুঝা যায়।

একদিন—প্রভাত হইতে বর্ষণের বিরাম নাই—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—পথে জল। হরিশচন্দ্র বসিয়া ভাবিতেছিলেন। ঘরে অর্থও নাই · চাউলও নাই। কাজেই একখানি পিতলের বাসন বন্ধক দিয়া লব্ধ অর্থে চাউল কিনিয়া আনিতে হইবে—তবে রন্ধন হইবে। কিন্তু সেই বৃষ্টিতে বাহির হইবার উপায় নাই—কারণ, ছত্র নাই। এই অবস্থায় হরিশচন্দ্র যখন চিন্তায় কাতর, তখন একজন জমিদারের মোক্তার একখানি দলিল ইংরেজীতে অনুবাদ করাইবার জন্য হরিশচন্দ্রের কাছে আসিলেন। কাজ করাইয়া লইয়া আপাতত দুই টাকা পারিশ্রমিক দিলেন। এরূপ পারিশ্রমিক হরিশচন্দ্রের পক্ষে সুলভ ছিল না। ইহা তিনি ভগবানের দান বলিয়া বিবেচনা করিলেন।

চাকরীর জন্য ঘুরিতে ঘুরিতে চাকরী মিলিল—নিলামকারী টাল্লা কোম্পানীর নিলাম ঘরে বিল লিখিবার কাজ। মাসিক বেতন ১০ টাকা। কিছুদিন ওই কাজ করিবার পরে হরিশচন্দ্র যখন বেতন কিছু বাড়াইয়া দিতে বলিলেন, তখন তাঁহার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় অপমানে ও অভিমানে হরিশচন্দ্র চাকরী ত্যাগ করিলেন। আবার অভাব প্রবল হইল। ভাগ্যক্রমে এই সময় সামরিক হিসাব বিভাগে মাসিক ২৫ টাকা বেতনে একটি চাকরী খালি জানিয়া হরিশচন্দ্র তাহার জন্য আবেদন করিলেন এবং পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়া চাকরীতে বহাল হইলেন। যখন তিনি মাসিক ১০ টাকা বেতনে বিল

লিখিতেন তখনও সেই সামান্য আয় হইতে পুস্তক কিনিতেন ও পড়িতেন। তাঁহার বিদ্যানুরাগ এতই প্রবল ছিল। মাসিক ২৫ টাকা বেতনের চাকরী পাইয়া তিনি অভাব হইতে অব্যাহতি পাইলেন এবং অবসরকালে সাগ্রহে জ্ঞানোর্জ্জনের জন্য পাঠ করিতে থাকিলেন। এই চাকরীতে তিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁহার মাসিক বেতন ক্রম বর্দ্ধিতহারে ক্রমে ৪ শত টাকায় পরিণত হয়। সেই অর্থ সামর্থ্যে তিনি "হিন্দু পেট্রিয়ট" সাপ্তাহিক পত্র পরিচালিত করিয়া দেশবাসীর অসাধারণ কল্যাণসাধন করেন এবং অত্যাচার নিবারণ ও অনাচারের সহিত সংগ্রাম করিতে পারিয়াছিলেন।

তিনি যে দুইজন ইংরেজের অধীনে চাকরী করিতেন, তাঁহারা উদারহৃদয় ও গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের কেরাণীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ও অসাধারণ মানসিক শক্তির পরিচয় পাইয়া তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আবশ্যক উপদেশ ও উৎসাহ দিতেন এবং তাঁহার পদোন্নতিতে সাহায্য করেন। তাঁহারা সময় সময় তাঁহাকে নানা পুস্তক ও মাসিক পত্রাদি পাঠ করিতে দিতেন।

সুযোগ পাইয়া হরিশচন্দ্র কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীতে নিয়মিত যাইয়া অধ্যয়ন করিতে থাকেন। তিনি 'এডিনবরা রিভিউ' পত্রের ১৪ খণ্ড ও বা ৪ বার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছিলেন।

এইরূপে তিনি সাংবাদিকের কাজ করিবার যোগ্যতা অর্জন করেন। তিনি পাঠাগারে পাঠ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেন না—মধ্যে মধ্যে ডক্টর ডাফের বক্তৃতা শুনিবার জন্য ভবানীপুর হইতে পদব্রজে ৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া কলিকাতায় আসিতেন।

এই সময়ে তিনি "হিন্দু ইন্‌টেলিজেন্সার' পত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী ও সুশিক্ষিত কাশীপ্রসাদ ঘোষ এই পত্র প্রতিষ্ঠিত করেন ও ইহার সম্পাদক ছিলেন। কাশীপ্রসাদবাবু ইংরেজীতে কবিতাও লিখিতেন। ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন ভারতীয়দিগের জন্য যে ইংরেজী কবিতা সংগ্রহ বিরাট গ্রন্থ সংকলিত করেন, তাহাতে তিনি বাঙ্গালীর রচিত ইংরেজী কবিতার নমুনা হিসাবে কাশীপ্রসাদের একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।

'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' ব্যতীত ইংরেজ সম্পাদিত 'ইংলিশ ম্যান'পত্রেও তাঁহার কোন কোন রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

হরিশচন্দ্র ভবানীপুরে তাঁহার প্রতিবেশী বিখ্যাত ব্যবহারজীবী দ্বারকানাথ মিত্রের সহিত আলোচনাকালে আইনও শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাহা তাঁহার সম্পাদকীয় কাজে বিশেষ উপকার করিয়াছিল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি তৎকালীন একমাত্র রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে যোগ দেন তখন জমিদারী বিষয়ক বিষয়ে বিখ্যাত উকীল প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মর্টিণ্ড প্রভৃতির সহিত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিবার জন্য ভূমি সংক্রান্ত আইন ও নিয়ম সমূহ সযত্নে অধ্যয়ন করিয়াছেন। অসাধারণ প্রতিভার সহিত নিষ্ঠার সংযোগ ব্যতীত এমন কাজ সম্ভব হয় না।

হরিশচন্দ্রের মৃত্যুতে শোকসভায় রামগোপাল ঘোষ বলিয়াছিলেন, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতে বাণিজ্যের ও শাসনকার্যের অধিকারের 'ছাড়' যখন আবার প্রদত্ত হয়, তখন বাঙ্গালা হইতে জনসাধারণের পক্ষে যে আবেদন ইংলণ্ডে করা হইয়াছিল, তাহা হরিশচন্দ্রের রচনা। তখন হরিশচন্দ্র সাংবাদিক হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগেই 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। কলিকাতায় বড়বাজারে

মধুসূদন রায় নামক এক ব্যক্তির একটি ছাপাখানা ছিল। তিনি একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে আগ্রহশীল হইলে কলিকাতা সিমুলিয়ার ঘোষ পরিবারের গিরীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীনাথ ঘোষ ও ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ তিন ভ্রাতা সম্পাদকের কাজে তাঁহার সহায় হইতে সম্মত হন। ইঁহারা সরকারের চাকরী করিতেন এবং ইংরেজী লেখক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। হরিশচন্দ্র সময় সময় তাঁহাদিগের কাজে সাহায্য করিতেন। তখন তিনি কাশীপ্রসাদ ঘোষের "হিন্দু ইন্‌টেলিজেন্সার" পত্রে কোন কোন রচনা দিতেন এবং ইংরেজ পরিচালিত 'ইংলিশম্যান' পত্রেও কিছু কিছু লিখিতেন। কয় মাস মধ্যেই ঘোষ ভ্রাতৃত্রয় মধুসূদন কর্তৃক প্রকাশিত পত্রের সম্বন্ধে শিথিলযত্ন হইয়া পরে নিজেরা 'বেঙ্গলী' পত্র প্রচার করেন। কাজেই "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রের সম্পাদকের কার্যভার হরিশচন্দ্রের উপর ন্যস্ত হয়। তখন এদেশে ভারতীয় পরিচালিত ইংরেজী সংবাদপত্রের অবস্থা শোচনীয়। তখন দেশে ইংরেজী শিক্ষিতের সংখ্যা অতি অল্প এবং ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয়গণ ভারতীয় চালিত সংবাদপত্রের বিশেষ আদর করিতেন না। এদেশে ইংরেজরা এদেশের ব্যাপার সম্বন্ধে অবহিত থাকিতে চাহিতেন না। এই অবস্থায় ভারতীয় পরিচালিত ইংরেজী সংবাদপত্রের পক্ষে আত্মরক্ষা করাই দুষ্কর ছিল। 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' কোনরূপে আত্মরক্ষা করিতেছিল—এমন সময় [১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে] মধুসূদন পীড়িত হইয়া স্বাস্থ্যান্বেষণে পশ্চিমে গমন করেন। তাঁহার ছাপাখানা বিক্রীত হয়। তখন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ভবানীপুরে 'সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী সভার' মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইতে থাকে। হরিশচন্দ্র একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং উহার 'হিন্দু পেট্রিয়ট প্রেস' নামকরণ করিয়া তাহাতেই পত্রখানি মুদ্রিত করিতে থাকেন। তাঁহার ভ্রাতা হারাণচন্দ্র উহার অধিকারী ও কার্যাধ্যক্ষ বলিয়া পরিচিত হন। পত্রখানির বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা স্থির হয়। বলা বাহুল্য ছাপায় অনেক ত্রুটি ছিল। ভবানীপুর সদর দেওয়ানী আদালতের সান্নিধ্যহেতু বহু ব্যবহারজীবী প্রভৃতির বাসস্থান ছিল। তাঁহারা স্থানীয় সংবাদপত্র বলিয়া 'হিন্দু পেট্রিয়টের' আদর করিলেও পত্রখানির গ্রাহক সংখ্যা এক শত অতিক্রম করে নাই। সে সময় ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে ভারতীয় পরিচালিত ইংরেজী সংবাদপত্র কেবল মাদ্রাজে 'মাদ্রাজ মেইলিং সান' ও বোম্বাই প্রদেশে আরেকটি ইংরেজীপত্র। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দুই বৎসর হরিশচন্দ্র বিশেষ দক্ষতা সহকারে—বহু শ্রমে ও অর্থ ব্যয়ে "হিন্দু পেট্রিয়ট" পরিচালিত করেন। হিন্দু বিধবা বিবাহ লইয়া হিন্দু সমাজে যে বিক্ষোভ হয়, তাহাতে রক্ষণশীল দল বিরোধী হইবেন জানিয়াও স্বাধীনচেতা হরিশচন্দ্র ঐরূপ বিবাহ সমর্থন করেন। সেজন্য তিনি আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। তাঁহার এইরূপ মনোভাবের পরিচয় আরও পাওয়া যায়। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রের উন্নতি সাধনের জন্য যখন প্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী জমিদার প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ অর্থ সাহায্য করিবার প্রস্তাব করেন। তখন হরিশচন্দ্র সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। শেষে ছাপার দোষের জন্য পাঠকগণের নিকট হইতে অভিযোগ পুঞ্জীভূত হইলে তিনি অনিচ্ছায় সে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে, রবার্ট নাইট কলিকাতার 'ঈষ্টার্ন্যান' পত্র পরিচালনাকালে প্রয়োজনে ইঁহাদিগের নিকট অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হরিশচন্দ্র ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে হিন্দু সভ্যতা ও য়ুরোপীয় সভ্যতা—তুলনায় সমালোচনা করিয়া য়ুরোপীয় সভ্যতার বহু ত্রুটির উল্লেখ করিয়া যে প্রবন্ধ লিখেন তাহাতে তাঁহার হিন্দু ও প্রতীচ্য দর্শনে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। আর একটি প্রবন্ধে তিনি ইংলণ্ডের "ট্রাইকের" সহিত বাংলার

'ধর্মঘটের' তুলনা করেন। স্বাধীনচেতা সাংবাদিক হরিশচন্দ্র অনুগ্রহের প্রলোভন ও রাজপুরুষদিগের রোষের ভয় অগ্রাহ্য করিয়া বড়লাট লর্ড ডালহৌসীর অবলম্বিত নীতির নিন্দা করিতে—এমন কি সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদিগের ত্রুটি তীব্র সমালোচনা করিতে কখনও বিরত হইতেন না। তিনি সাংবাদিকের কর্ত্তব্য পালনে কখন বিরত থাকিতেন না।

ইহার পরে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের এক শত বৎসর পরে অর্থাৎ ভারতবর্ষে ইংরেজদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠারম্ভের শতবার্ষিকীতে ভারতবর্ষে সিপাহী বিদ্রোহ হয়।

সিপাহী বিদ্রোহকে কেহ কেহ—স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম প্রধান কর্মী সাভারকার মহাশয় ভারতে প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু সে সম্বন্ধে মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ আছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে দেশ খণ্ড খণ্ড—জাতি নানাভাবে বিভক্ত—প্রদেশে প্রদেশে ঐক্যের অভাব—দেশাত্মবোধ তখন দেশে ব্যাপ্ত নহে—সমাজে ও ধর্ম নিবদ্ধ। এমনকি হিন্দু সমাজে অন্য দেশের লোকের পক্ষে [মৎস্যাহারকারী] বাঙ্গালীর বাসস্থান বাংলায়—তীর্থযাত্রা ব্যতীত অন্য কারণে আগমন পাপ বলিয়া বিবেচিত। বঙ্কিমচন্দ্র দেশবাৎসল্যের কথায় লিখিয়াছেন—'বাৎসল্য পরমধর্ম; কিন্তু এ ধর্ম অনেক দিন হইতে বাঙ্গালা দেশে ছিল না। কখনও ছিল কিনা বলিতে পারি না। ... তখনকার লোক আপন আপন সমাজ, আপন আপন জাতি বা আপন আপন ধর্মকে ভালবাসিত। ইহা দেশবাৎসল্যের ন্যায় উদার নহে—অনেক নিকৃষ্ট। মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে।' বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, সমগ্র ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহাই বলা যাইতে পারে। এই কথা বলা যাইতে পারে—বাংলার গোমুখীমুখ হইতে জাতীয়তার ধারা নির্গত হইয়াছিল এবং ভগীরথ যেমন শঙ্খধ্বনি করিয়া গঙ্গাকে সাগরসঙ্গমে লইয়া গিয়াছিলেন, বাঙ্গালী সুরেন্দ্রনাথ তেমনই সেই ধারাকে সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। সে ভার ইংরেজাধিকৃত ও ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষ হইতে সামন্ত-পরিচালিত রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।

সে বিষয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত হইবার স্থান বর্তমান প্রবন্ধ নহে। কেবল বলা প্রয়োজন—বাঙ্গালী সিপাহী বিদ্রোহে যোগদান করে নাই; তাহার কারণ বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে' বলিয়াছেন—আর সেই বিদ্রোহের সময় হরিশচন্দ্র দেশবাৎসল্যের নেতারূপে দেখা দিয়াছিলেন—তাঁহার 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদের কার্য করিয়াছিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গালীরা সিপাহী বিদ্রোহে বিদ্রোহীদিগের পক্ষাবলম্বন করেন নাই। এমন কি মনুক্‌নপুরে একজন বাঙ্গালী মুন্সেফ [প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়] রক্ষিবাহিনী গঠিত করিয়া স্থানটি বিদ্রোহীদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া বিস্ময়কর সমরনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। বড়লাট তাঁহার বিবৃতিতে তাঁহাকে "যোদ্ধা মুন্সেফ" [The fighting Moonsiff] বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর এরূপ করার কারণ—

(১) তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, এই বিদ্রোহ দেশের অবস্থাহেতু সফল হইতে পারে না।

(২) ইহা জাতীয় ব্যাপার নহে।

(৩) জাতীয় ব্যাপার নহে বলিয়াই ইহা সাম্প্রদায়িকতায় পর্যবসিত হওয়া অনিবার্য।

এই তৃতীয় কারণ দিল্লীর শেষ বাদশাহ বাহাদুর শাহের বিচারে অন্য-এডভোকেটের বক্তৃতাতে-ও

দেখা যায়। তিনি উহা মুসলমান শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ধর্ম যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন—

(ক) "If we now take a retrospective view of the various circumstances which we have been able to elicit during our extended inquiries, we shall perceive how exclusively Mahomedan are all the prominent points that attach to it."

(খ) "Hinduism, I may say, will nowhere either reflected or represented; if it be brought forward at all, it is only in subsurvience to its aggressive neighbour."

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ হয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। যখন ইংরেজ শাসকদিগের প্ররোচনায় মুসলমানরা কংগ্রেসের বিরোধিতা করেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন,—

"সিপাহী বিদ্রোহ যদি সফল হইত, তবে আজ দিল্লীতে মুসলমান বাদশাহ এবং লক্ষ্ণৌয়ে মুসলমান বাদশা রাজত্ব করিত।"

বাঙ্গালী সিপাহী বিদ্রোহে বিদ্রোহীদলকে যোগ দেন নাই, কিন্তু ইংরেজের অত্যাচার হইতে ভারতবাসীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সে কার্যে হরিশচন্দ্র ভারতবাসীর নেতা—সেনাপতি। সিপাহী বিদ্রোহ দমিত ও দলিত হইল; ইংরেজের জয় হইল। কিন্তু মদোন্মত্ত সিপাহীদিগের অত্যাচারের অবসান হইলে জয়োদ্ধত ইংরেজের অত্যাচারের আরম্ভ হইল। ভারতে ইংরেজরা প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া অত্যাচারে ভারতবাসীকে ভীতিবিহ্বল করিবার ও আপনাদিগের ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া সেই ক্ষমতা প্রতিপন্ন করিতে আগ্রহশীল হইলেন। নানাভাবে অত্যাচার প্রকট করিবার উপায় অবলম্বিত হইল ও ক্ষমতা প্রকট করিবার আয়োজন চলিল।

তখন হরিশচন্দ্র কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি দেখাইলেন, বিদ্রোহকালে অল্প সিপাহীরা উত্তেজনাবশে যত অনাচারই করিয়া থাকুক না—সভ্যতাভিমানী ইংরেজরা তাহার তুলনায় অল্প অনাচারের অনুষ্ঠান করে নাই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে হরিশচন্দ্র যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার ভাবার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

'একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বিদ্রোহীদিগের পরাভবের পরেই [ইংরেজের] প্রতিশোধ গ্রহণকার্য উৎকটভাবে হইয়াছিল—সেরূপ কাজ কোন সভ্য সরকারের কর্মচারীদিগের নিকট সঙ্গত মনে করা যায় না। ৬ই জুন হইতে ১৬ই জুলাই পর্যন্ত কয় দিনে এলাহাবাদ শহরেই প্রায় ৮ শত লোককে ফাঁসী দেওয়া হয়। একজন সহকর্মীর হত্যার জন্য প্রতিহিংসা গ্রহণের শিখদিগকে শহরে যথেচ্ছ অনাচার করিতে দেওয়া হইয়াছিল। যে পথে ব্রিগেডিয়ার নীল বারাণসী হইতে এলাহাবাদে গমন করেন সেখানে যে সকল নিরস্ত্র গ্রামবাসীর শব পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই শত্রুরূপে তাঁহার দলের পক্ষে আইসে নাই। সৈনিকদিগের সম্বন্ধে সংযম রক্ষার চেষ্টা হয় নাই। নদীর উভয় কূলে মাইলের পর মাইল গ্রাম বিধ্বস্ত করা হইয়াছিল।"—ইত্যাদি

হরিশচন্দ্র যেমন বিদ্রোহীদিগের অত্যাচারের নিন্দা করিয়াছিলেন, তেমনই ইংরেজদিগের অত্যাচারের নিন্দা করিতে দ্বিধানুভব করেন নাই; পরন্তু তিনি দেখাইয়া দিয়াছিলেন, যাহারা

আপনাদিগকে সভ্য বলিয়া গর্ব্বানুভব করে, তাহাদিগের দ্বারা অত্যাচার অধিক নিন্দনীয়। কেবল তাহাই নহে যে সময়ে শাসক জাতি ইংরেজরা প্রতিহিংসাবশে অত্যাচারের সমর্থক সেই সময়ে বিজিত বাঙ্গালী হরিশ্চন্দ্র ন্যায়নিষ্ঠাবশে—প্রজাপালন যে রাজার কর্ত্তব্য—সমাজের পক্ষে যে সুশাসনের দায়িত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য তাহা বুঝাইয়া দেন—ইংরেজকে শাসক জাতির কর্ত্তব্য পালন করিয়া মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে বলেন। তিনি ভারতীয় সৈনিক ও ইংরেজ—শাসিত ও শাসক উভয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপনের কাজ করিয়া উভয় পক্ষের অসাধারণ মঙ্গলবিধানে সহায় হন। তখন লর্ড ক্যানিং ভারতে বড়লাট। তিনি ইংরেজদিগের অনুমোদিত উগ্র ও অন্যায় ব্যবহার বিরোধী ছিলেন এবং সেইজন্য দেশে তাঁহার স্বজাতিদিগের অপ্রীতি অর্জ্জন করেন। সাধারণ ইংরেজরা ব্যঙ্গ করিয়া তাঁহাকে 'Clemency Canning' বলিতে থাকে। হরিশ্চন্দ্রের প্রবন্ধ তাঁহার অবলম্বিত নীতি সমর্থন করে এবং তিনি সেই সকল প্রবন্ধের যুক্তি অকাট্য বলিয়া গ্রহণ করেন।

তখনও এদেশে ভারতীয় পরিচালিত সংবাদপত্র শক্তিশালী হয় নাই। কিন্তু হরিশ্চন্দ্র প্রতিপন্ন করেন ন্যায়নিষ্ঠ সংবাদপত্র ভারতীয়ের দ্বারা পরিচালিত হইলেও শক্তিশালী হয়। লর্ড ক্যানিং হরিশ্চন্দ্রের মত এতই মূল্যবান মনে করিতেন যে, যে দিন [সাপ্তাহিক] 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রকাশিত হইবে সেদিন লাটপ্রাসাদ হইতে অশ্বারোহীবাহক আসিয়া দরিদ্র বাঙ্গালী সাংবাদিক হরিশ্চন্দ্রের দ্বারে উপস্থিত থাকিত—পত্র প্রকাশ হইলেই বড়লাটের জন্য লইয়া যাইবে।

এই সমস্ত কারণে হরিশ্চন্দ্রকে ভারতীয় সাংবাদিকতার জনক বলা হয়।

সিপাহী বিদ্রোহ শেষ হইল—দেশে আবার শান্তি স্থাপিত হইল। অক্ষয়কুমার চৌধুরীর কথায় দেশের অবস্থা—

"শুষ্ক গঙ্গা বহি যায় রক্তবিন্দু নাহি তায়
সুনীল যমুনা নিরমল।
স্বর্ণ কান্তি শস্য ক্ষেত্র দেখিলে জুড়ায় নেত্র
আগে যেথা ছিল রণস্থল।"

কিন্তু মানুষ স্বার্থপর, পরবশে অন্যায় আচরণ করে—সবল স্বার্থসিদ্ধির জন্য দুর্ব্বলকে পীড়িত করে। সুজলা সুফলা বাংলায় নীলকর ইংরেজরা নীল উৎপন্ন করিবার জন্য প্রজার উপর অত্যাচার করিতে থাকে। তখনও রাসায়নিক উপায়ে কৃত্রিম নীল আবিষ্কার হয় নাই—যে উদ্ভিদ হইতে এই বর্ণ প্রস্তুত হইত তাহার চাষ এদেশে বিশেষতঃ বাঙ্গালায়—ভাল হইত। সেইজন্য ভারতে প্রস্তুত হইত বলিয়া 'ইণ্ডিয়া' আভরণ 'ইণ্ডিগো' নামে পরিচিত হয়। দেশের কৃষকরা স্বভাবতঃ শান্ত—এ অবস্থাহেতু দুর্ব্বল—ইংরাজ নীলকররা তাহাদিগের শান্তিপ্রিয়তায় ও দৌর্ব্বল্যের সুযোগ লইয়া তাহাদিগকে অনিচ্ছায় হইলেও এবং উপযুক্ত মূল্য না দিয়া নীলের চাষ করাইত। অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে—লাভের লোভ নীলকরদিগকে অত্যাচারী করিয়া তুলে। কথায় বলে—পদদলিত হইলে কৃমি-কীটও দংশন করে। বাংলায় তাহাই হইল—বাঙ্গালার লোক সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে আন্দোলন প্রবল হয়। বহুদিন পরে সেই আন্দোলনের অনুকরণে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী রাজনীতিক অধিকার লাভের জন্য এদেশে যে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করেন এবং যাহা হিংসাশ্রয়ী [physical force movement]

আন্দোলনের সহিত সম্মিলিত হইয়া ভারতবর্ষে স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তনের কারণ হয় বাংলার প্রজা সেই আন্দোলন প্রবর্তিত করে। তখন বাংলায় ইংরেজী শিক্ষা অন্যান্য প্রদেশের তুলনায়—অধিক বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং বাঙ্গালী জাতীয়তার স্বাদ পাইতেছে—বুঝিতেছে—

"ছিন্ন ভিন্ন হীনবল
ঐক্যেতে বাড়িবে বল।"

বাংলার তৎকালীন ছোটলাট সকলে যাইয়া এই আন্দোলনের প্রকৃতি, গতি ও শক্তি উপলব্ধি করিয়া অত্যাচার নিবারণের প্রয়োজন বুঝেন এবং সে বিষয় বড়লাটের গোচর করেন। সমগ্র প্রদেশে সেই আন্দোলন দেশের রাজধানী কলিকাতায় কেন্দ্রীভূত হয় এবং কেন্দ্রে তাহার পরিচালনভার গ্রহণ করেন—হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে প্রজার পক্ষ অবলম্বন করেন। তিনি নীলকরদিগের অত্যাচারের বিবরণ প্রকাশ করিতে থাকেন। সে সম্বন্ধে যাহারা মফঃস্বল হইতে তাঁহাকে উপকরণ-সংবাদ প্রেরণ করিতেন তাঁহাদিগের মধ্যে ছিলেন—'নীলদর্পণ' লেখক দীনবন্ধু মিত্র, নদীয়া জেলার স্কুল ইনস্পেক্টর রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগরের পুলিশ দারোগা গিরীশচন্দ্র বসু প্রভৃতি। আর উল্লেখযোগ্য [তখন বিদ্যালয়ের ছাত্র] মনোমোহন ঘোষ ও শিশিরকুমার ঘোষ। মনোমোহন পরে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেন এবং শিশিরকুমার 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রবর্তক ও সম্পাদক হইয়া সমগ্র দেশে খ্যাতি অর্জন করেন। বলা যায়, সাংবাদিকতায় Harish Chandra's mantle fellow Sisirkumar.

বলা হইয়াছে, নীল ভারতেই উৎপন্ন হইত। তখন বাংলা বলিতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা বুঝাইত। এই বাংলায় প্রতি বৎসর উৎপন্ন নীলের মূল্য প্রায় ৩ কোটি টাকা। খাস বাংলায় প্রধানতঃ রাজসাহী, ঢাকদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোর ও ফরিদপুর এই ৬টি জেলায় নীলের চাষ হইত। তখনও বাংলা হইতে পাটের রপ্তানী অধিক হয় নাই—যাহাকে Golden fibre বলা হইত, তাহার প্রাধান্য ছিল না। নীলের আয় [প্রায় ৩ কোটি টাকা] যদি যথাযথভাবে কৃষক, উৎপাদক, ব্যবসায়ী প্রভৃতির মধ্যে বণ্টন করা হইত, তবে নীল বাংলায় সম্পদই হইত। কিন্তু নীলকরদিগেরই লাভের লোভে তাহা সম্পদ না হইয়া বিষে পরিণত হয়। নীল সম্পর্কে নীলকুঠীর মালিকরা কিরূপ উপদ্রব করিত, তাহা 'নীলদর্পণে' দেখিতে পাওয়া যায়। আর দেখিতে পাওয়া যায়—নীল চাষ সম্বন্ধে তদন্তের জন্য যে কমিশন নিযুক্ত হয় সেই কমিশনের বিবরণে। প্রবল পক্ষের স্বার্থই সে পক্ষ পরামর্শ মনে করিতেন এবং সেই জন্য নীল চাষ বাঙ্গালার পক্ষে অনর্থের কারণ হয়। নীলের কুঠীর মালিক ইংরেজরা কিরূপ রাজোচিতভাবে বাস করিতেন, তাহা কোলসওয়ার্দী গ্রাণ্ট লিখিত পুস্তকে আমরা জানিতে পারি।

অত্যাচারপীড়িত প্রজার ত্রাণ কর্তারূপে হরিশচন্দ্র আবির্ভূত হইলেন।

অমৃত কথা ও কাহিনী

[শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী]

ব্যাকুলতা না এলে কিছুই হয় না। সাধুসঙ্গ করতে করতে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। যেমন বাড়িতে কারুর অসুখ হলে সর্বদাই মন ব্যাকুল হয়ে থাকে, কিসে রোগী ভাল হয়। আবার কারু যদি কর্ম যায়, সে ব্যক্তি যেমন অফিসে অফিসে ঘুরে বেড়ায়, ব্যাকুল হতে হয় সেইরূপ। যদি কোন অফিসে বলে কর্ম খালি নেই, আবার তার পরদিন এসে জিজ্ঞাসা করে, আজ কি কোন কর্ম খালি হয়েছে?

• • •

ঈশ্বর দর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য।

• • •

ছেলে, কলকাতায় যখন আমি আসতাম, লাট সাহেবের বাড়ি আমাকে দেখাত—মামা, ওই দেখ, লাট সাহেবের বাড়ি, বড় বড় থাম। মা দেখিয়ে দিলেন, কতকগুলি মাটির ইট উঁচু করে সাজান।

ভগবান ও তাঁর ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্য দু'দিনের জন্য; ভগবানই সত্য। বাজীকর আর তার বাজী। বাজী দেখে সব অবাক, কিন্তু সব মিথ্যা; বাজীকরই সত্য। বাবু আর তার বাগান। বাগান দেখে, বাগানের মালিক বাবুকে সন্ধান করতে হয়।

• • •

আমি একবার মিউজিয়মে গিয়েছিলুম; তা সেখানে ইট পাথর হয়ে গেছে, আনোয়ার পাথর হয়ে গিয়েছে। দেখলে, সঙ্গের গুণ কি! তেমনি সর্বদা সাধুসঙ্গ করলে তাই হয়ে যায়।

• • •

"সাপ হয়ে খাই, আবার ওঝা হয়ে ঝাড়ি!' তিনি বিদ্যা অবিদ্যা দুই-ই হয়ে রয়েছেন। অবিদ্যা মায়ায় অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন; বিদ্যা মায়ায় ও গুরু রূপে ওঝা হয়ে ঝাড়ছেন।

"অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান। জ্ঞানী দেখেন তিনিই আছেন, তিনিই কর্তা; সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার করেছেন। বিজ্ঞানী দেখেন, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন।

"মহাভাব, প্রেম হলে দেখে তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই।

"ভাবের কাছে মুক্তি কিকে; ভাব পাকালে মহাভাব, প্রেম।

• • •

আমি বেদান্ত আদি শাস্ত্র পড়ি নাই বলে একটু দুঃখ হয় না। আমি জানি, বেদান্তের সার, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। আবার গীতার সার কি? গীতা বলবার বললে যা হয়; ত্যাগী ত্যাগী।

পরের উপকার পরের মঙ্গল যে ঈশ্বর করেন—যিনি চন্দ্র, সূর্য, বাপ, মা, ফল ফুল, সব জীবের জন্য করেছেন! বাপ-মার ভিতর যা স্নেহ দেখ, সে তাঁরই স্নেহ, জীবের রক্ষার জন্যই দিয়েছেন। দয়ালুর ভিতর যা দয়া দেখ, সে তাঁরই নিঃসহায় জীবের রক্ষার জন্য দিয়েছেন। তুমি দয়া কর আর না কর, তিনি কোন না কোন সূত্রে তাঁর কাজ ক'রবেন। তাঁর কাজ আটকে থাকে না।

তাই জীবের কর্তব্য কি? আর কি, তাঁর শরণাগত হওয়া, আর তাঁকে যাতে লাভ হয়, দর্শন হয়, সেই জন্য ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সেদিন দুপুর বেলায় এটনী সব ভাবনা চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে লাইব্রেরী ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। বেছে বেছে সে একটা উপন্যাস পড়তে শুরু করেছিল যার মধ্যে মনটা চট করে বসে যায়। উপন্যাসের পাতা আশ্রয় করে এটনী তার মনকে মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করেছিল। সে পড়ছিল নাট হামসুনের 'হাঙ্গার'। অনেকবার সে এই উপন্যাসটা পড়েছে; কিন্তু কিছুতেই যেন পুরনো হয় না বইটি। হামসুন লেখক তো নয় যেন মনের যাদুকর। আর তাছাড়া জীবনকে দেখবার ভঙ্গিটি কি সোজা, কি নির্মম, অথচ কী জীবন্তভাবে আশাবাদী। ঘটনা সম্পাত কি অদ্ভুত রকমের আকর্ষণীয়। সেই ঘটনাবলীর মধ্যে এটনীর মন ডুবেছিল।

হঠাৎ বাইরের থেকে একটা কাতর আর্তনাদ তার কানে এল—মোহাই, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও। কেউ যেন নিদারুণ ভয়ে চীৎকার করে উঠল। চীৎকারটি একবার উঠেই সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল বটে, কিন্তু এটনীর মনটাকে এক মুহূর্তে তোলপাড় করে দিয়ে গেল। হাতের বইটা টেবিলে রেখে তখুনি সে বার হয়ে এল। এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখে কেউ কোথাও নেই। মার্চ মাস পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদের তাপ বেড়েছে অনেক। দুপুরে ঝুনি শুরু হয়েছে রীতিমতো। রোদের মধ্যে খাঁ-খাঁ করছে গডউইন কার্নাগুর অত বড় বাড়িখানা। চাকররা এ সময়ে খেয়ে দেয়ে ঘুম দিচ্ছে ঘরের মধ্যে। এটনীর মনে সন্দেহ হল আওয়াজটা সেকি সত্যি সত্যি শুনেছে? কিন্তু অত ভুল হবার কথা তো নয়, স্পষ্ট আওয়াজ—সে যে চমকে উঠেছিল, সে কথা তার মনে পড়ল। সে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঘণ্টা বাজাল। সঙ্গে সঙ্গে মারিয়া হাসন এসে হাজির। বেচারা কাঁচা ঘুম ভেঙে যে উঠে এসেছে তা ওর চোখ দেখলেই বোঝা যায়।

—আচ্ছা মারিয়া হাসন, এই ওর দুপুরে কোথা থেকে একটি বিশ্রি চীৎকার উঠল বলতে পার?—এটনী জিজ্ঞেস করল।—তুমি কি শুনেছ আওয়াজটা?

মারিয়া হাসন বললে—হিয়া আইয়া আপনি বসুন। আওয়াজটা এল ওই ওদিকটা থেকে।—বলে মারিয়া হাসন আঙুল দিয়ে উঠোনের ওপারে ঘরগুলোর দিকে দেখিয়ে দিলে। ওই ঘরগুলোতে বাস করে গডউইনের আশ্রিতরা।

—এমন চীৎকার কে করল, একবার খোঁজ নাও তো চট করে।

খোঁজ নেবার দরকার নেই হুজুর। আমি জানি কে এমন আওয়াজ করল। ও হল সোলোমন কার্নাগুর বড় মেয়ে সুজি। দিন দুই হল এখানে ফিরে এসেছে।

এটনী বিরক্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করল—কেন তার কি হয়েছে, অমন করে আওয়াজ করে কেন?

মারিয়া হাসন জবাব দিল—সোলোমন হুজুর, কর্তার সিলোনের অফিসে কাজ করত। তার বউ

আর মেয়ে থাকত এই বাড়িতে। সোলোমনের বউ যাই হোক মেয়েটা কিন্তু সত্যি সত্যি ভাল ছিল। মোলি-ক্রস কনভেন্টে প্রত্যেক বছর ফার্স্ট হয়ে ক্লাশে উঠত। আমাদের কর্ত্তা যদিও প্রথম প্রথম মেয়েদের লেখাপড়া করা একদম দেখতে পারতেন না, পরে তাঁর কিন্তু মত বদলে গিয়েছিল। তিনি মেয়েটার সব খরচ দিতেন। মেয়েটাও লেখাপড়ায় বেশ ভাল হয়ে স্কুলের উঁচু ক্লাশে পাশের এগ্‌জামিন দেবার মতো হ'ল। সে অবশ্য এক বিপর্যয় কাণ্ড। আমাদের পরোয়াজের ভেতর মেয়েরা কেউ তখন পর্যন্ত অতটা পাশ করে নি। আর সত্যি কথা বলতে কি, ক'টা পুরুষই বা ওই সব পাশ-টাশের ধার ধারত বলুন! কিন্তু এতে কল হল দিতে বিপরীত। সোলোমন মেয়ের এই খবর শুনে আনন্দ করা দূরে থাক মনে মনে খুব রেগে গিয়ে মেয়ে আর মেয়ের মাকে নিয়ে সিলোনে চলে গেল। কর্ত্তার সামনে সে মুখ তুলে কথা কইতে পারত না। কিন্তু আমাকে একদিন আড়ালে বলেছিলো সোলোমন—কর্ত্তা মেয়েটাকে ইস্কুলে দিয়ে একদম মাথা বিগড়ে দিয়েছেন। সে মেয়ে এখন কলেজে পড়বে বলে নাকি ক্ষেপে উঠেছে। সেই মেয়েকে সিলোনে নিয়ে গিয়ে তার ওপর কঠোর অত্যাচার করেছিল সোলোমন। এদিকে নিজে ছিল তো কর্ত্তার টাইপিস্ট, যা পেত তাতে সংসারের খরচ তারা মাস চালাতে পারত না। তার ওপর ছিল তার নিজের মদের নেশা। তার মধ্যে পড়ে বউ আর মেয়ের অবস্থা তো শোচনীয় করে তুলল সোলোমন। আর অবস্থা এতই শোচনীয় হতে লাগল তবুই সোলোমন লেখাপড়া জানা মেয়ের ওপর নানাভাবে অত্যাচার করে শোধ তুলতে লাগল। মারধোর তো করতোই, খেতে পর্যন্ত দিত না তাকে করে।

এর ওপর জুটল সোলোমনের স্ত্রীর সন্দেহ বাতিক, লেখাপড়া জানা মেয়ের ওপরে। তার ফলে তার ঘর থেকে বার হওয়া বন্ধ করে দিলে সোলোমন। কর্ত্তার কানে এত সব কথা ওঠে নি বহুদিন। তা ছাড়া তিনি ছিলেন ভয়ানক ব্যস্ত লোক, এসব ছোট কথা সব সময়ে তাঁর কানে উঠতও না।। যখন উঠল তখন খুব দেরী হয়ে গেছে। মেয়েটার মাথাটা বেশ খারাপ হতে শুরু করেছে। মেয়েটা থাকে থাকে হঠাৎ কি যেন একটা ভয় পেয়ে চীৎকার করে—আমায় ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও!—বলে আর সময় সময় হাউ হাউ করে কেঁদে অস্থির হয়। কর্ত্তা সিলোন থেকে ওদের এখানে আনিয়েছিলেন। মেয়েটির চিকিৎসার কথাও ভাবছিলেন, এমন সময়ে তাঁর নিজেরই ডাক এসে গেল। কর্ত্তার অসুখের সময় সোলোমন মেয়েটাকে সিলোনে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু কর্ত্তা সেকথা জানতে পেরেই নতুন কনকপিল্লে সেতুরামন আয়ারকে বলেছিলেন মেয়েটাকে এখানে নিয়ে এসে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। সেতুরামন বোধ হয় মেয়েটিকে কাল এখানে নিয়ে এসেছেন।

এটর্নী জিজ্ঞেস করল—নতুন কনকপিল্লে সিলোন থেকে ফিরেছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ছিয়া আইয়া। তিনি সকালে আপনার কাছে এসেছিলেন, তা আপনি লাইব্রেরী ঘরে পড়াশুনো করছেন দেখে আপনাকে আর বিরক্ত করেন নি। সন্ধ্যেবেলায় আবার আসবেন তিনি। এটর্নীর দু'চোখের দৃষ্টি মাখিয়া বাসনের কথা শুনতে শুনতে উঠোনটা পার হয়ে ওদিকের ঘরগুলোতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সেখানে নজরে পড়ল একটা ঘরের জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। বয়স হবে বড় জোর বছর কুড়ি, মুখটা একেবারে কচি চলচল করছে। তার ওপর দুটো বড় বড় চোখে একটা অদ্ভুত চাউনি। সে বাইরের দিকে চোখ মেলে দাঁড়িয়ে আছে বটে, তবু যেন সে কিছুই দেখছে না। দুটো চোখে ফুটে উঠেছে একটা গভীর আবেশের ভাব।

এটর্নী জানতে চাইল—ওই কি সলোমনের মেয়ে বুঝি?

মারিয়া হাসন সেদিকে তাকিয়ে বললে—হ্যাঁ হুজুর। আমি ফনকপিয়েকে বলব ওকে যেন তাড়াতাড়ি কোন একটা পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেয়। আমি এখন চলি হুজুর, আপনার চায়ের ব্যবস্থা করি গিয়ে।

বলে মারিয়া হাসন সে জায়গাটা থেকে সরে গেল। এটনী আবার এসে তার লাইব্রেরীতে বসল। মনটা কেমন যেন তার খারাপ হয়ে গেছে। মনে মনে সে অবাকও হয়েছে কম নয়। পড়াশুনোতে ভাল হলে যে কেউ কোথাও নিগ্রহের পাত্রী হয়, এখন সে এই নতুন শুনল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল তার ছেলেবেলার কথাগুলো। তার বাবাও কি অমুক গোঁড়া ছিলেন এই লেখাপড়া শেখার ওপরে। কিন্তু মারিয়া হাসন বলল ওঁরও পরে পরিবর্তন হয়েছিল। তিনি নাকি ওই মেয়েটির লেখাপড়ার খরচ জোগাচ্ছেন। যাই হোক, এ নিয়ে একবার সেতুরাঘনের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ফনকপিয়ে সেতুরাঘন লাইব্রেরী ঘরে ঢুকল। তখনও এটনী আপন মনে বড় ঘরটার একদিক থেকে আর একদিকে পায়চারি করছিল আর ভাবছিল দুপুরের ঘটনাটি।

গুড্ ইভনিং স্যর,—

গুড্ ইভনিং।—এটনী চোখ তুলে তাকিয়েই দেখতে পেল একটি উজ্জ্বল চেহারার যুবা তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। বয়সে হয়তো এটনীর থেকে সে কিছুটা ছোটই হবে। রোগা এক-হারা চেহারা, মুখখানা একটু লম্বাটে, অসাধারণ গম্ভীর ভাব তার ওপর। ছোট ছোট ঝকঝকে দুটো চোখের ওপর পুরু লেন্সের চশমা। পরনে সাদা ট্রাউজারের ওপরে কালো কোট, তার সঙ্গে লালরঙের একটা টাই। সেতুরাঘন ইংরেজীতেই এটনীর সঙ্গে আলাপ শুরু করল। তার তামিল ভঙ্গিতে ইংরাজী উচ্চারণ এটনীর কানে উৎকট শোনাতে লাগল। ওদিকে গলায় টাই বেঁধে ইঁস ফাঁস করছে সেতুরাঘন। বার বার তার আঙুলটা গলা আর কলারের মধ্যে ঢুকে গিয়ে বাতাস যাবার রাস্তা করে দিচ্ছিল। এটনী তাকে বসতে বললে। কিন্তু সে কিছুতেই বসল না। সমস্ত ক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলে যেতে লাগল।

সেতুরাঘন বললে—স্যর, মাস্টারের মৃত্যুর সময় আমি থাকতে পারিনি বলে আমি মর্মাহত। কিন্তু স্যর, বিশ্বাস করুন আমার আসারও কোন উপায় ছিল না। আমি যদি সে সময়ে চলে আসতাম তা হলে সিলোনের অফিসে সর্বনাশ হয়ে যেত। আর তাছাড়া যখন এখানকার অফিসের হেডক্লার্কের চিঠিতে জানলাম যে আপনি এসেছেন, তখন আমি নিশ্চিন্ত হয়ে সিলোনের সব কাজগুলো করবার সুযোগ নিলাম।

এটনি জিজ্ঞেস করল—সিলোনের অফিসে সর্বনাশ হত বললেন কেন? কি ধরনের সর্বনাশ হত?

সেতুরাঘন বললেন—মাস্টার যেদিন মারা যান তার ঠিক দু'দিন আগে সকালবেলা সিলোনে সুলান কার্ভোথার অফিসের হেডক্লার্ক আমাদের অফিসে এসে হাজির। সে টেলিগ্রাম পেয়েছে মাস্টারের নামে স্যাম্‌লিং-এর বিরাট চার্জ এসেছে সরকার থেকে। তার বক্তব্য তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। মাস্টার মনের দুঃখে শয্যা নিয়েছেন আর উঠবেন না, ইত্যাদি ইত্যাদি। কাজেই কার্ভোথার কাছে মাস্টার যে তিন লাখ টাকা ধার নিয়েছিলেন সেটা যেন এক্ষুনি আমাদের বন্দোবস্ত করা হয়। আমি স্যর এবার সিলোনে গিয়ে একটা কাজ করেছিলাম। কাউকে জানতে দিই নি যে, আমি সিলোনে গিয়েছি মাস্টারের কাছে। তা ছাড়া আমাকে সেখানকার লোকজনও খুব বেশী চিনত না, আমার তাতে সুবিধাই হয়েছিল। অবশ্য এ মতলব আমাকে মাস্টারই দিয়েছিলেন।

বলেই প্রসঙ্গ পাল্টে ঘরা গলায় সেতুরাঘন বললে—উঃ, কি ধুরন্ধর বুদ্ধি যে ছিল মাস্টারের।

লেখাপড়া কিছু শেখেন নি, কিন্তু মানুষের চরিত্র কি ভীষণ ভাবেই যে বুঝতেন। তা ছাড়া বিষয় রাখবার, ব্যবসা চালাবার এ রকম প্রাকটিক্যাল সেন্স সত্যি আমি জীবনে দেখি নি। একটা অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন মাস্টার। তিনিই আমাকে অনেকদিন থেকে তাগাদা দিচ্ছিলেন সিলোনে যাওয়ার জন্যে। তা আমি ওঁর শরীরের অবস্থা দেখে খানিক দিন পিছোচ্ছিলাম। শেষে উনি একরকম জোর করেই আমাকে ঠেলে পাঠালেন। কলম্বো গিয়ে উঠলাম ওঁর এক বন্ধুর বাসায়। বন্ধু হলেন ডাক্তার। কাজেই আমাকে কেউ সন্দেহ করতে পারে নি। কিন্তু হেড ক্লার্ককে আদেশ দেওয়া ছিল খরচের সমস্ত ব্যাপারে সে যেন আমাকে পরামর্শ করে। সুতরাং যখন কার্ভোজার অফিসের ক্লার্ক সেই চিঠিখানা আর টাকা আমাদের হাতে নিয়ে এল, তখন হেডক্লার্ক আমার কাছে এসে বললে—টাকাটা নাকি মাস্টার কোন এক সময়ে কার্ভোজার কলম্বো অফিস থেকে বিশেষ জরুরি কাজের জন্যে নিয়েছিলেন। ওরা এখন সেটা চাইছে। আমি তার মুখের কথায় তো কোন কাজ করি না, আমি হেড ক্লার্ককে বললাম ওদের ডক্যুমেন্ট যদি কিছু থাকে নিয়ে এসো। মাস্টারের ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে আমি ব্যাপারটার পরামর্শ করলাম। তিনি বললেন—গভর্নমেন্টের একটা বড় প্রিভিলেজ হচ্ছে কারুর কাছ থেকে টাকা ধার না করা। আমার এ ব্যাপারে সন্দেহ হচ্ছে। আমি আমাদের কলম্বোর এটর্নীর সঙ্গেও পরামর্শ করলাম। তিনি বললেন—তাঁর এ সম্বন্ধে কিছু জানা নেই। এদিকে যেমন কার্ভোজার তরফ থেকে ওরা কোন রকম ডক্যুমেন্ট দেখাতে পারল না, বলল—ওঁরা দু'জন যথেষ্ট বন্ধু ছিলেন, ওঁরা মুখের কথাতেই টাকা লেন দেন করতেন। আমি তার ওই কথা শুনে আমার হেড ক্লার্ককে বললাম—একটা পাই পয়সাও কাউকে আমি দেব না প্রমাণ ছাড়া। এ কথার জবাবে কার্ভোজার হেডক্লার্ক তিন জন সাক্ষী নিয়ে এল একদিন আমার কাছে। একজন হল বেন্টী মিরাণ্ডা সিলোনের বিখ্যাত মদ ব্যবসায়ী—আপনাদের সমাজেরই লোক। আগে পুরনো বোতল কেনা-বেচার কাজ করতেন। অতি হীন অবস্থা থেকে এখন বিরাট ব্যবসা ফেঁদেছেন, শুধু জাল জোচ্চুরিতে টাকা করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন একজন সিংহলীজ, সে বেন্টী মিরাণ্ডারই বন্ধু। ভদ্রজীবিকা বলতে তার কিছুই নেই, আর এটা কাল সেটা করে দিন চালায়। আর তৃতীয় জন হলেন আমাদের অফিসের হেড ক্লার্ক ডি সিল্ভা। ডি সিল্ভা বললে—সে নাকি নিজে গিয়ে কার্ভোজার অফিস থেকে টাকাটা নিয়ে এসেছে। সুতরাং কার্গের গুড্‌উইল রাখতে গেলে টাকাটা দিয়ে দেওয়াই ভাল। আমি এই তিন জনেরই মতলব বুঝে ফেললাম তখন। বললাম—একটা পংসা আমি দেব না ডক্যুমেন্ট ছাড়া। সে ডক্যুমেন্টও আবার কাগজে লেখা ডক্যুমেন্ট হওয়া চাই। কার্ভোজার লোক ফিরে গেল। কিন্তু তার পরের দিন আমাদের অফিসে প্রচণ্ড ভিড়। শহরে কে যেন রাষ্ট্র করে দিয়েছে গভর্নমেন্ট কার্নাটোর সমস্ত সম্পত্তি ভারত সরকার আটকেছে স্পলিং-এর চার্জে, আর তার জন্যেই সে লোকে সেখ পয়সা নিয়েছে। দলে দলে পাওনাদাররা এসে অফিস ঘিরে ফেললে। ব্যবসা চালাতে গেলে নানান ভাবে পংসার লেন-দেন হয়ে থাকে। তাই সেই দলের মধ্যে সত্যিকারের পাওনাদারদের সঙ্গে এলো অনেক বাজে লোক। তারা এসে টাকার জন্যে চীৎকার করতে লাগল—শাসাতে লাগল। আমি কার্গের অফিস বন্ধ করে দিলাম। হেড ক্লার্ককে বললাম, পাওনাদারদের বলতে, যেন তারা তাদের বিল পাঠায় কার্গে, পোস্টে তাদের বিল পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যারা সত্যিকারের পাওনাদার তারা চলে গেল। কিন্তু হাজার বাজার মিথ্যে পাওনাদাররা। তারা দিনের পর দিন অফিসের সামনে এসে হল্লা করতে লাগল। তখন আমি বাধ্য হয়ে পুলিশে খবর দিলাম। কলম্বো পুলিশের একজন অফিসার আমার বিশেষ বন্ধু ছিল। আমরা দু'জনে একসঙ্গে ট্রিনিটে কলেজে জোসেফ্‌স্

কলেজে পড়েছি। সে শুধুনি গোটাকতক লোককে ধরে হাজতে পুরে দিলে কবে উত্তম-মধ্যম। খুব ভয়ও খেলাল তাদের। তখন আসল কথাটা জানল তারা। তারা বললে, আমাদের হেড-ক্লার্ক ডি সিলভা আর কার্ভোজার হেড-ক্লার্ক মিলে তাদের বলেছে এই সব কাণ্ড করতে। তাদের সেজন্যে কিছু কিছু টাকাও দিয়েছে এর জন্যে। বুঝুন স্যর, কী ব্যাপার! আমি সেই কথা শুনেই ডি সিলভাকে পরের দিন আমাদের অফিস থেকে তাড়িয়ে দিলাম।

বলে সেতুরামন একবার তার গলার মধ্যে আঙুল চালিয়ে তাতে খানিকটা বাতাস ঢোকাবার পথ করে দিয়ে এটর্নীর মুখের দিকে বড় বড় চোখে চেয়ে নিল কিছুক্ষণ। যেন শুনতে চায় এটর্নী কি বলে। এটর্নী একমনে তার কথা শুনে যাচ্ছিল। আস্তে আস্তে বললে—মিঃ সেতুরামন আপনি বসুন না। বসে বসে গল্প করুন।

সেতুরামন বিনীত ও ব্যস্ত হয়ে বললে—থ্যাঙ্ক ইউ স্যর, থ্যাঙ্ক ইউ। আপনি এখন আমার মাস্টার।

বলে সে সমান ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগল। —ওদিকে এটর্নীও মনে মনে দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। শেষে সে আর কিছু করতে না পেরে ঘণ্টা বাজাল। ঘণ্টার শব্দ পেয়ে কিন্তু মারিয়া দাসন এসে দাঁড়াল না। কিছুক্ষণ পরে এটর্নী বিরক্ত হয়ে আবার ঘণ্টা বাজাল। এবার মারিয়া দাসন ঘরে ঢুকল ধীর মন্থর পায়ে। ঘরে এসে চোখ তুলে আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াল। তার মুখখানা থম থম করছে, চোখ দুটো টকটকে লাল। ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে এল্‌কোহলের গন্ধও এটর্নীর নাকে গেল। সেতুরামন মারিয়া দাসনের কাছ থেকে আরও খানিকটা দূরে গিয়ে সরে দাঁড়াল।

এটর্নী সেতুরামনকে দেখিয়ে বললে— এঁর জন্যে কফি নিয়ে এস। তার গলার স্বরে বিরক্তি ফেটে পড়তে লাগল। মারিয়া দাসন চলে যাবার উপক্রম করতেই সে আবার বললে—তোমার আসবার দরকার নেই, কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও।

মারিয়া দাসন চলে যেতেই সেতুরামন বললে—সন্ধ্যের পর মারিয়া দাসনকে ঠিক অবস্থায় পাওয়া ভাগ্যের কথা।

বলেই আবার আগের কথার খেই ধরে বললে—এদিকে ডি সিলভাকে বরখাস্ত করার পরেই সে রীতিমতো সাংঘাতিক হয়ে উঠলো। আমাকে প্রথমে শাসানি দিয়ে চিঠি লিখতে লাগল, কলম্বো ছেড়ে চলে যাবার জন্যে। শেষে একদিন আমার পিছনে গুণ্ডা লেলিয়ে দিলে। আমি কিছুদিনের জন্যে কলম্বো ছেড়ে বাইরে চলে গেলাম। মাস্টারের ডাক্তার বন্ধুর একটা বাড়ি ছিল ক্যাণ্ডিতে। আমি সেখানে বসে রইলাম কিছুদিন। তাতেই স্যর আমার কাজের একটু ক্ষতি হয়ে গেল। শেষে কলম্বোতে একদিন গা ঢাকা দিয়ে ফিরে এলাম। এসেই শুনলাম ডি সিলভাকে সুসান কার্ভোজা তার কার্মে ভবল মাইনে দিয়ে কাজে ভর্তি করেছেন। কার্ভোজার হেডক্লার্কও আমাদের একটা চিঠি লিখেছে। তাতে লিখেছে তার কর্তার নির্দেশ অনুযায়ী সে আমাদের স্বর্গত কর্তার তিন লাখ টাকা দেনার কথা জানিয়ে দিচ্ছে। টাকাটা যদি এক মাসের মধ্যে আমরা দেবার ব্যবস্থা না করি তো তারা আইনের সাহায্যে সেটা আদায় করবে।

এটর্নী ধীরে সুস্থে সেতুরামনকে জিজ্ঞাসা করল—সিলোনে আমাদের কি কি ব্যবসা, আর কি কি সম্পত্তি আছে?

সেতুরামন বললে—আমাদের সবচেয়ে বড় ব্যবসা হল ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা। তা ছাড়াও ব্যাঙ্কিং আছে, টি-এস্টেট কিছু আছে, আর আছে সাতখানা বড় বড় বাড়ি। আপনি স্যর অফিসে এসে বসুন, আমি আপনাকে সব দেখিয়ে জানিয়ে দেবো।

কিন্তু পরের দিন সকালে অফিসে বসে এটর্নী যে ঘটনার সঙ্গে মুখোমুখী দাঁড়াল তাতে তার সমস্ত ভাবনাকে আগাগোড়া আবার নতুন করে ঢেলে সাজাতে হল। [ক্রমশঃ]

অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে টলস্টয় অর্জন করেছেন লেখার শক্তি। 'চাইল্ডহুড—বি লেসন্‌স্ ইন ইয়ুথ' বইখানি তিনি চারবার সংশোধন করেছেন। 'ওয়ার অ্যাণ্ড পিস্'-এর মত বিপুলায়তন উপন্যাসখানি টলস্টয়ের পত্নী সাত বার নকল করেছেন। বিশ্বের এই শ্রেষ্ঠ উপন্যাসখানি লিখতে তাঁর সময় লেগেছে সুদীর্ঘ সাত বৎসর। 'আনা কারেনিনা' লিখতে লিখতে তিনি ফেলে রাখতেন, বলতেন, ভাল লাগছে না, আবার এক সময়ে কলম তুলে নিতেন, লিখে যেতেন পাতার পর পাতা।

বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা তিনি পছন্দ করতেন না। এই সভ্যতা মানুষকে এনে দিয়েছে অজস্র উপকরণ কিন্তু তাকে আত্মিক উপলব্ধি থেকে করেছে বঞ্চিত। যারা সভ্যজগতে টেলিফোন টেলিগ্রাফ নিয়ে বাস করছে—একবারও চিন্তা করছে না ঈশ্বরপ্রেমের কথা—ধর্ম এবং ন্যায় নীতির কথা—তারা ক্রমেই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এজন্য তিনি শহরও পছন্দ করতেন না।

তিনি ছিলেন যুদ্ধবিরোধী—শান্তিবাদী। বিশ্বের ভবিষ্যত নিয়ে সর্বদাই চিন্তিত। তাঁর বিশিষ্ট পরিচয়। তিনি আদর্শবাদী। তাঁর বিশ্বাস ছিল আত্মসংস্কার তথা আত্মোন্নতি হচ্ছে মানব জীবনের প্রকৃত পথ। যখন প্রতিটি মানুষ নিজেকে সংস্কার ক'রে পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে বা চরম উৎকর্ষ লাভ করবে তখন তা আনবে বিশ্বের সুখশান্তি।

মানুষকে টলস্টয় ভালবেসেছেন, তাদের জীবনযাত্রা দেখেছেন দু'চোখ ভরে, তাদের সঙ্গে একপ্রাণ একমন হয়ে গেছেন বলেই তিনি স্রষ্টার আসনে বসতে পেরেছেন, রচনা করেছেন বিশ্বের অমর কথাসাহিত্য।

টলস্টয় 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস্' উপন্যাসে Natasha Orstova-র চরিত্র এঁকেছেন তা কেবল মাত্র কল্পনাই ছিল না। টলস্টয়ের এক নিকট আত্মীয়া তানিয়া ছিলেন ওই চরিত্রটির মূলে। মহিলাটি একদিন টলস্টয়কে কথাচ্ছলে বলেছিলেন,—'বুঝলুম যে আপনি একটা সেনাপতির চরিত্র বর্ণনা করতে পারেন, পারেন একজন জমিদার, চাষী, এমন কি একটি মায়ের চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে। কিন্তু আপনি একজন তরুণী প্রেমিকার চিত্র আঁকেন কি করে? আমি তো কিছুতেই তা বুঝতে পারি না।'

বহু বিচিত্র পথে চালিত হয়েছিল তাঁর অসামান্য বোধশক্তি। যে ছোট্ট ছেলেটি তাঁর কাছে আসত তিনি তাকে বুঝতেন। যে মেয়েটির জীবনে রোমাঞ্চ লেগেছে সে যখন তাঁর কাছে এসে কথা বলত তখন তাকেও তিনি বুঝতে চাইতেন গভীরভাবে।

স্ত্রীর সঙ্গে মনের গভীর অমিল ছিল টলস্টয়ের। সেই মহিলার পক্ষে শক্ত ছিল তাঁকে বোঝা। স্বামী-স্ত্রীর মানসিক দ্বন্দ্ব টলস্টয়কে অত্যন্ত ক্লান্ত ও পীড়িত করে তুলত। তাঁর ইচ্ছে ছিল তিনি গোপনে অনাড়ম্বরভাবে কৃষকদের মাঝে যাবেন আর তাদের মাঝেই হবে তাঁর মৃত্যু। কিন্তু কাগজের রিপোর্টার থাকতে তা যে সম্ভব নয় কিংবা রাশিয়ার জনসাধারণের মধ্যে তাঁর যে প্রভাব অপরিমেয় তা তিনি যেন বুঝতে চাইতেন না।

বিখ্যাত রুশ সুরকার Tchaikovsky-র স্মৃতিতে Russian Conservatory তে কনসার্ট শুরু হবে, সবাই অপেক্ষা করছে কখন টলস্টয় আসবেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর দেখা পাওয়া গেল না। অনেক পরে তিনি এলেন, ভেতরে ঢুকতে যাবেন প্রহরী বাধা দিল এবং সে তাঁকে একজন সাধারণ চাষী ভেবে বের করে দিতে চাইল, বলল, কনসার্ট শুনে তার কি হবে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত অন্যে তাঁকে চিনতে পেরেছিল।

এই ঘটনায় তিনি অসন্তুষ্ট হওয়া তো দূরের কথা বরং অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন, অন্ততঃ একজন তাঁকে সত্যিকারের চাষী বলে ভাবতে পেরেছে।

সম্প্রতি Leo Rabenock টলস্টয়ের স্মৃতি প্রসঙ্গে এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। টলস্টয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের আর এক বিবৃতি প্রসঙ্গে Sir Shane Leslie আর একটি ঘটনার কথা বলেছেন।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষটির সঙ্গে দেখা করতে এলেন স্যার লেসলি। সে সময় টলস্টয়ের মনে বড় চলেছে। সে বছরের শীতে বেকার নিরন্ন কৃষকের দল বেড়া ভেঙে তাঁর জমিতে অনধিকার প্রবেশ করে এবং শাকসব্জী তুলে নিয়ে যায়। এর বিরুদ্ধে যেন কিছু না করা হয়, এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু তাঁর সংসারের অন্যান্য সকলের ইচ্ছা ছিল অন্য। স্থানীয় শাসক সচেতন হলেন এবং টলস্টয় দেখে মর্মাহত হলেন যেসনেটধারী সৈনিক এসে তাঁর শাকসব্জী পাহারা দিতে। এ ছিল তাঁর নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁর সঙ্গে শেষ দেখার প্রসঙ্গে বেরিয়েছিলেন স্যার লেসলি সেবার তিনি তাঁকে একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছিলেন: 'They will soon have to choose between me and the bayonets.'

আধুনিক সভ্যতা পরিহার করে তিনি চেয়েছিলেন প্রকৃতির কাছে ফিরে যেতে। ঈশ্বরের সৃষ্টির সঙ্গে প্রকৃতিকে তিনি এক করে ফেলেছিলেন, এই বিশ্বজগৎ প্রকৃতি, ঈশ্বর—সকলের মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন ঐক্য। জীবনের মৌল জিজ্ঞাসার উত্তরসন্ধানী সাধক ছিলেন তিনি। আর সেইজন্যই আধুনিক অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি কিছুই তিনি সমর্থন করতে পারেন নি।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ···এমন একটি ঘটনা ঘটল যা শুনলে মনে হবে এ যেন একেবারে আজকের কথা। খুব বড় বড় কথায় সে ঘটনাটি এই: বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নটিকে বিবেচনার জন্য হেগ নামক স্থানে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলির শীর্ষ সম্মেলনের জন্য মহারাজ জারের প্রস্তাব।

এ সম্বন্ধে একটি সংবাদপত্র তাঁর মতামত আহ্বান করলে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করেন তা আজকের দিনে অনুধাবনযোগ্য:

"My answer to your question is that peace can never be achieved by conferences or be decided by people who not only jobber, but who themselves go to war....All such conferences can be summed up in a single dictum: All people are sons of God and brothers, and therefore they ought to love and not kill each other. Forgive my sharpness, but all these conferences invoke in me a strong feeling of disgust over the hypocrisy that is so obvious in them."

তাঁর মতবাদের ওপর উদ্ধত আঘাত নেমে এসেছে বার বার তবু আশ্চর্য প্রাণবন্ত ছিলেন মানুষটি। জীবনের গভীরে অবগাহন করেছিলেন তিনি, অশান্ত প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে ফিরেছেন জীবনের শেষ পর্যন্ত। এক আশ্চর্য আশাবাদ তাঁকে এই প্রাত্যহিক বিবর্ণ জীবনযাত্রার ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়েছিল।

বিকালে বেড়াতে বেরোতেন তিনি। একদিন প্রান্তরের পারে অস্তগামী বিবাগী সূর্যের আলোর আভা আর আকাশ দেখে গৃহে ফিরলেন তিনি, ধীরে ধীরে দিনলিপির পাতায় লিখলেন কথা কটি:

"No, this world is not a joke, and not a vale of trials or a transition to a better, ever lasting world, but this world here is one of the eternal worlds that is beautiful, joyous, which we can and must make more beautiful and more joyous for those living with us and for those who will live in it after us."

চর দখল

তুলসী বসু

চা-এর পেয়ালায় সবে মাত্র চুমুক দিয়েছি, এমন সময় পাড়ার নবীন সংঘের সম্পাদক বীরু গাঙ্গুলি হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল।

'কি ব্যাপার হে বীরু?'

'এই যে আপনাদের দু'জনকেই একসঙ্গে পেয়ে গিয়েছি। বরাত ভাল বলতে হবে।'

'এই শুভাগমনের উপলক্ষটা কি হে?' কুমার জিজ্ঞাসা করল, 'বরাত ভাল বলছ যে, চাঁদা আদায়ের মতলব নেই তো?'

বীরু সেই রকম উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলল,—'আরে না, না। আপনাদের যে কি এক মারাত্মক চাঁদাতঙ্কে ধরেছে! এ দেখছি সকলেরই এক ব্যাধি, এর আশু চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন।' এক বুক নিঃশ্বাস নিয়ে, টান হয়ে দাঁড়িয়ে হাতের বিশেষ মুদ্রায় সে বলল,—'আমাদের সংঘের ব্যায়াম শাখার বাৎসরিক অধিবেশন, আসছে সপ্তাহে চৌঠা তারিখে। শুভাগমনের কারণটা হচ্ছে, ওই অধিবেশনে আপনাকে সভাপতির পদে—'

'বৃত করতে চাও।' কথাটা শেষ করল কুমার। গলার স্বরে একটু কাতরতা মিশিয়ে সে বলল 'কেন আর আমাকে দিয়ে ওসব বাজেনা ভোগ করাবে। খেলা ধুলো করি, এই পর্যন্ত। তা বলে আমাকে দিয়ে সভাপতির ভাষণ। এ যে উটের পিঠে শেষ কুটো হে।'

'আপনার শক্ত পিঠ ভাঙবে না, ঠিক বইতে পারবেন।' এক চিমটে কসরতী হাসি হাসল বীরু। কুমার বরিয়া হয়ে একটা শেষ প্যাঁচ দিল, তবু যদি ছাড়ান পায়। সে বলল,—'দেখ বীরু, বরং এক কাজ করো, এঁকে ধরো, সংবাদ পত্রের নিজস্ব সংবাদদাতার কাজ করেন। বক্তৃতা করা ও শোনার বাজেনা ওঁকে হাজেনাই পোহাতে হয়।'

বীরু উদ্যোগী পুরুষ, একেবারে নাছোড়বান্দা, না বাগিয়ে যাবে না। কুমার শেষটায় রাজী হ'ল। বলল,—'কই তোমাদের কার্যসূচী দেখি।' বীরুর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে পড়ে কুমার হঠাৎ হাসতে আরম্ভ করল। হাসছে তো হাসছেই, হাসি আর থামে না।'

'কি ব্যাপার কুমারদা, আপনি হঠাৎ হাসতে আরম্ভ করলেন কেন? আরে কি ব্যাপার।'

কুমার হাসির রাশ টানল।—'তোমরাও কি লাঠি খেলা দেখাবে না কি? এই সেরেছে।'

'আপনার কি আপত্তি আছে না কি? আপত্তি যদি থাকে—'

'আরে না, না। তা কেন থাকবে, এমনই জিজ্ঞাসা করছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, তোমরা এখন যেতে পারো, আমি রাজী আছি।'

যাবার সময় বীরু বলল,—'বিনয়বাবু, আপনাকেও সেদিন থাকতে হবে।'

ওরা চলে গেলে আমি কুমারকে জিজ্ঞাসা করলাম,—'তুমি হঠাৎ হাসছিলে কেন?'

'লাঠি খেলার কথায় আমার ছোট বেলার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। ঘটনাটা যেমনই মজার আর তেমনই হাস্যকর। কুমারকে আবার হাসি পেয়ে বসল। হাসির দম ফুরোলে কুমার বলল,—গল্পটা শোনো, গল্পটা বড় মজার। আমার ছোট বেলার ঘটনা। অনেকদিন গত হয়েছে কিন্তু আজও আমি

ঘটনাটা প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি।' চা টা শেষ করে একটা সিগারেট ধরাল কুমার। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে সে পুরনো দিনের টুকরো টুকরো স্মৃতি মনের অন্তর থেকে টেনে তুলছিল। তার মুখের উদ্ভত ধোঁয়া ছোট ছোট কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘরময় উর্ধে মিলিয়ে যাচ্ছিল, কয়েক মিনিটের সম্ভাব্য নীরবতার মধ্যে কণ্ঠক্ষেপ করল কুমার।

'ঘটনাটা তোমাকে বললেও সেই পরিবেশটা তুমি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারবে কি না আমার সন্দেহ আছে।'

'কেন?'

'কারণ তুমি চলে কলকাতার লোক, কলকাতার মানুষ। বিজলী আলো, ট্রাম বাস আর মানুষের ভীড়ে জীবন কাটাতে অভ্যস্ত। পরে ষোল বছর আগের অজ-পাড়াগাঁর জীবন তোমার পক্ষে সঠিক কল্পনা করা সম্ভব নয়। তখন আটটার পর সচরাচর লোক ঘরের বাহির হোত না। বর্ষাকালে অধিকাংশ সময় রাস্তাঘাট চলাচলের অযোগ্য থাকত আর রাস্তায় আলো বলে কোন জিনিসের বালাই ছিল না। অবশ্য এখন তো অনেক পরিবর্তন হয়েছে।'

একটু থামল কুমার। অলস চোখে তাকাল হাইদানির গর্ভ থেকে উত্থিত দীর্ঘ দীর্ঘায়ত ধূম-রেখার দিকে।

'নতুন ওঠা একটি নদীর চর নিয়ে কিছুদিন ধরে দু'পক্ষের মধ্যে একটা বাদ বিসম্বাদ ও মনোমালিন্য চলে আসছিল। সেটাই এখন গুরুতর আকার ধারণ করল। একপক্ষ আমরা আর অপর পক্ষ দু' তিনটে গ্রামের মালিক বিত্তশালী রামহরি ভুঁইয়া। রামহরি ভুঁইয়া নিজে একজন বড় লেঠেল। অবশ্য তখন তাঁর বয়স হয়েছে। ভুঁইয়া মশায় দক্ষিণ মেদিনীপুর থেকে কয়েক পরিবার বাগদী এনে জমি দিয়ে তাদের চাষ বাসে লাগিয়েছিলেন। এদের চেহারা দেখলে আঁৎকে উঠতে হয়। সবল দৃঢ় মাংসপেশী, গালে উল্কা চওড়া গালপাট্টা, মিশ মিশে কালো রং, তার ওপর আবার এক জোড়া মানোয়ারী গোঁফ। সন্ধ্যের মুখে আচমকা চোখে পড়লে দু'চোখ কপালে উঠে একেবারে চিরমি যাবার যাবিল। রাম ভুঁইয়ার আদেশে এদের নিয়মিত কসরৎ করতে হোত। তিন চারটে গ্রামে সকলেই জানত যে, জান নেওয়া আর জান দেওয়া এদের কাছে কিছুই নয়।

এমন যে রামহরি ভুঁইয়া তার কাছ থেকে হঠাৎ বাবার নামে একখানা চিঠি এল, যে, সামনের মঙ্গলবার তিনি সদলবলে নতুন ওঠা কাশ-চর দখল করবেন। রায়গঞ্জের ব্রজ রায়ের যদি সাধ্য থাকে তো সে যেন বাধা দেয়। চিঠি নিয়ে এল বাগদী সর্দার চিতু। তার একমাথা কালো কাঁকড়া চুল লাল পট্টি দিয়ে বাঁধা। মালকোছা মারা আট হাতি ধুতি কোমরে লাল গামছা দিয়ে আঁটা। তার মিশমিশে কালো চেহারা, তেল চকচকে পাকা লাঠির ওপর ভর দিয়ে আভূমি নত হয়ে সেলাম করে সেই ভীষণ মূর্তি ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

চিঠি পড়ে বাবার চোখে মুখে এক ঝলক রক্ত ছুটে এল। একটু পরেই তাঁর মুখ ফ্যাকাসে বিবর্ণ হয়ে গেল। মুখে একটি কথা নেই, যেন বোবা হয়ে শূন্য-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

মা এলেন, ঠাকুরমা এলেন, আমার পিসতুতো ভাই কানাইদা এল। অনেক জিজ্ঞাসা করার পর বাবা চিঠির মর্ম খুলে বললেন। সব শুনে ঠাকুরমা, মা সোজাতেই বললেন,—'ও সবের মধ্যে বাবার কোন দরকার নেই। চর জমির জন্য মানুষ খুন হবে না কি? মনে হ'ল বাবারও যেন অনেকটা সেই ধরনের

মত। কিন্তু কানাইদা উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করতে করতে বলল, 'সে হয় না। সে কিছুতেই হতে পারে না'। কিছুক্ষণ চিন্তা করে শেষে বাবা বললেন,—'একেবারে বিনা বাধায় অমন উর্বর চর বেদখল হবে সেটা কিছুতেই উচিত হবে না। ভবিষ্যতে মামলা করার পথ একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। বরং কিছু লোকজন নিয়ে আমরা চরে উপস্থিত থাকবো'। এ কথায় সব চেয়ে খুশি হল কানাইদা, বুক চাপড়ে সরু দুটো ঠ্যাঙে লাফাতে লাফাতে কানাইদা বলল, 'এই তো চাই, এই তো মরদের মত কথা। বিনা বাধায় অমন চর দখল করতে মোর? কানাই কি মরে গেছে? তুমি চিন্তা কোরো না মামা। আমার হাতে অনেক লেঠেল আছে। আমি কাল থেকে তাদের জোগাড় করছি। তুমি শুধু তাদের খাওয়ানোর ভার নাও। শেষের দিকে মোটা দুই পাঁটা মেরে তাদের কিস্টি দিলেই চলবে। দেখো না, এই সাতদিনে আমি কি কাণ্ডটা করি'। বাবা অবশ্য কানাইদার কথায় হুঁ, হাঁ করে সারলেন। বেশ বোঝা গেল, যে, কোন অবস্থায় তিনি রক্তপাত ও খুন জখমের বিরোধী।

সত্যিই কানাইদা সেইদিন থেকে লোক জোগাড় করার জন্য উঠে পড়ে লাগল। আমার তখন অষ্টম শ্রেণীর পরীক্ষা সামনে। এই দারুণ উত্তেজনার মুখে পড়াশুনা শিকেয় উঠল। আমার ছোট ভাই তোষলেরও অবস্থা তাই।

এই ঘটনার দু'তিন দিন পর থেকে দু'একজন করে লেঠেলরা আসতে শুরু করল। নির্দিষ্ট দিনের একদিন আগে অর্থাৎ সোমবার কানাইদার চেষ্টায় সবশুদ্ধ সাতজন লেঠেল জোগাড় হ'ল। বাগানে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা আর বৈঠকখানা ঘরে হ'ল তাদের শোবার ব্যবস্থা। স্বয়ং কানাইদার ওপর সব তদারকের ভার পড়ল। চরের ব্যাপার নিয়ে কানাইদা এখন বাড়িতে একজন বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়ে দাঁড়াল।

মঙ্গলবার মাঝরাত্রি থেকেই ঠাকুর ঘরে পূজা চলতে লাগল। ভোরে পূজা শেষ করে ঠাকুরমা লেঠেলদের মাথায় পূজোর ফুল বেলপাতা ছুঁইয়ে দিলেন। ঠাকুরমা আশীর্বাদ করলেন, 'পূজোর আশীর্বাদ ফুল তোদের মাথায় ছুঁইয়ে দিলাম, বাছারা জয় করে ফিরে আয়।' আমি আর আমার ছোট ভাই তোষল তখন উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছি। ঠাকুরঘরের সামনে মিশকালো দেহ লেঠেলরা পাকাল বাঁশের লাঠি হাতে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর ঠাকুরমা তাদের মাথায় পূজোর ফুল ছুঁইয়ে দিচ্ছেন। সেই কিশোর বয়সে ওই দৃশ্য তার সকল সম্ভাবনা নিয়ে আমার ও তোষলের মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও উত্তেজনার সৃষ্টি করল। আমরা দু'জনে গোপনে যুক্তি করে তৎক্ষণাৎ আমাদের ইতি কর্তব্য স্থির করে ফেললাম।

কানাইদার রণসজ্জা দেখবার মত হয়েছে। একে লিকলিকে লম্বা চেহারা, তার হাঁটুর ওপর তুলে একটা লুঙ্গি-হাতি কাপড় মালকোছা মেরে পরেছে। অস্বাভাবিক কাপড় গোঁজার ফলে পেছনটা অস্বাভাবিক রকম ফোলা দেখাচ্ছে। গায়ে দেহ-যষ্টির মাপে শাদা কতুয়া। কিন্তু সব চেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে তার ছোট মাথায় কের দিয়ে বাঁধা একটা বড় লাল গামছা। লেঠেলদের চলায় একটা শান্ত ধীরস্থির ভাব আছে। কিন্তু কানাইদার চালচলন যেন সম্পূর্ণ বিপরীত। একটা উত্তেজনা মিশ্রিত আনন্দ যেন তাকে পেয়ে বসেছে। পা দুটো মাটিতে পড়ছে কি পড়ছে না, যেন ঘুরে ফিরে নেচে চলেছে। মহরমের দিন তাজিয়া ঘিরে লাঠিয়ালরা যেমন কখনও লাফিয়ে নেচে লাঠি খেলে বেড়ায়, কানাইদার যেন সেই তাজিয়া খেলার নেশা লেগেছে। কিন্তু সব চেয়ে মজা হ'ল যে কানাইদা হ'ল 'অস্ত্রহীন যোদ্ধা'। সকাল থেকেই একটা সোরগোল শোনা যাচ্ছিল যে কানাইদার লাঠিটা পাওয়া যাচ্ছে না। তন্ন তন্ন করে খোঁজা হ'ল

কিন্তু কানাইদার সেই অনেক তেল খাওয়ানো চকচকে নতুন লাঠিটা কোথাও পাওয়া গেল না। সময় বুঝে লাঠিটা নিজেই কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে। শেষে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে কানাইদা খুদি পাকানো দুটো দীর্ঘ হাত আকাশে তুলে বলল,—'আমি শুধু হাতেই লড়ব।'

ভোম্বল একটু মুচকি হেসে বলল,—'কানাইদা, তোমায় যেন সেই নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মহাবীর ইন্দ্রজিতের মত লাগছে'।

লেঠেলদের চলে যাবার পর মা আবার ঠাকুর ঘরে ঢুকলেন। ভোম্বল আর আমি মা ঠাকুরমাকে লুকিয়ে দূর থেকে ওই বীর যোদ্ধাদের অনুসরণ করলাম। প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের লেঠেলদের দল কাশ-ডাঙার নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হল। বাবা ও কানাইদার নির্দেশ মত লেঠেলেরা একটা জায়গায় সারিবদ্ধ হয়ে হয়ে দাঁড়াল অপর দলের প্রতীক্ষায়।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। দূর থেকে দেখা গেল প্রতিপক্ষ দল আসছে, আর সংখ্যায় তারা বেশী। তাদের সর্দার চিতু ওস্তাদ লেঠেল বলে এ অঞ্চলে খ্যাতি আছে। সে শক্তিমান লেঠেল তো বটেই অধিকন্তু চিতাবাঘের মতই ক্ষিপ্র। ওদের লেঠেলরা সার দিয়ে রামহরি ভুঁইয়ার পেছন পেছন আসছে। ভুঁইয়ার হাতে পাকা লাঠি, গায়ে মেরজাই, পরনে মালকোছা-মারা ধুতি। ওদের প্রত্যেকটি লেঠেলের চেহারা আমাদের লেঠেলের চেহারার চেয়ে ভালো। চলার ফলে তাদের বুকের আর হাতের মাংসপেশীগুলো ঈষৎ আন্দোলিত হচ্ছে। রামহরি ভুঁইয়ার আদেশে তারা আমাদের দলের হাত বারো দূরে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। ওদের দলের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে চিতু সর্দার। সে মাথায় সকলের চেয়ে লম্বা। লেঠেলদের দলপতির মত মানানসই চেহারা বটে। আমি আর ভোম্বল দু'জনেই আশ্রয় নিয়েছি একটু দূরে কাশবনের পেছনে একটা উঁচু জায়গায় কয়েকটা বাবলা গাছের আড়ালে। প্রতিপক্ষ দলের মুখের ভাব ভঙ্গি আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলাম। ওদের লেঠেলদের চোখগুলো আমাদের প্রত্যেকটি লেঠেলের দেহের ওপর বুলিয়ে নিচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরেই তাদের চোখগুলো স্থির হয়ে এল। যতদূর বোঝা যাচ্ছিল, তাতে মনে হল যে আমাদের লেঠেলরাও নিশ্চল হয়ে তাদের নিরীক্ষণ করছে। এখন কেমন একটা থমথমে ভাব। দুর্যোগ ঘনিয়ে আসার পূর্ব মুহূর্তে চারিদিক যেমন একটা থমথমে ভাব ধারণ করে। বাবলা গাছের আড়ালে আমরা দু'ভাই কাঠ পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। নিকট ও নিশ্চিত আশংকায় বুকের ভিতর সবটা যেন মোচড় খেয়ে খালি হয়ে গেছে। কেবল বুকের দুর-দুর শব্দ থেকে থেকে চেতনা ফিরে আসছে। কিন্তু সে চেতনাও যেন আচ্ছন্ন। ভোম্বলকে একটা কিছু বলতে গেলাম। কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বেরুল না, নাই থেকে গলা পর্যন্ত সবটা যেন শুকিয়ে গেছে। আমার হাত ভোম্বলের হাঁটুতে লাগতে বুঝতে পারলাম যে, সে ভয়ে ও উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে। আমার মুখ দিয়ে একটা কথা সরল না, তাই ইসারায় জানালাম বাবলা গাছটা শক্ত করে জড়িয়ে ধরতে, যেন না সে পড়ে যায়।

আমাদের দলের পেছনে ঠিক মাঝখানটায় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বাবা। দলের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে কানাইদা। রামহরি ভুঁইয়া আর কানাইদা ঠিক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। বাবার গলা শোনা গেল। তিনি আমাদের দলের লেঠেলদের উদ্দেশ করে ডাকলেন, যেন তারা প্রথমেই না আক্রমণ করে বা লাঠি চালায়। তিনি আমাদের দলের মিতুন সর্দারকে হুঁশিয়ার করে দিলেন, যেন কোন রকম গরম কথা বা গালি গালাজ না করা হয়। মিতুন সর্দার ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো। এমন সময় রামহরি ভুঁইয়া এল এগিয়ে। খানিকটা এগিয়ে এসে বাবাকে উদ্দেশ করে কাছে থেকে শুরু গম্ভীর গলায় বলল,—

'জজবাবু, এ ছেলে-খেলা নয়, আপনি ঘরে ফিরে যান। কেন অনর্থক মানুষ খুন আর রক্তপাতের কারণ হবেন, এ চর আমার। এ চর আমার সংলগ্ন জমির সামনেই উঠেছে। আপনার কোন দাবী নেই যে এই জমি দখল করেন। শেষবার বলছি, আপনি এখনই ফিরে যান'।

বাবা ধীর শান্তস্বরে বললেন,—'ভুঁইয়া মশায়, আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি, আপনি মানী লোক। আপনি চিন্তা করে দেখুন, যে কারণে ওই কাশ-চর আপনি আপনার বলে দাবি করছেন, ঠিকসেই একই কারণে আমি দাবি করছি, এ চর আমার। এই দিকে তাকিয়ে দেখুন, এই চর আমার জমির সংলগ্ন হয়ে উঠেছে। আরও দেখুন এই চরের বেশীর ভাগ অংশ আমার জমির সংলগ্ন। আমি রক্তপাত কি খুন-জখমের কারণ হতে চাই না। কিন্তু এই অন্যায় জবর দখল আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতেও পারি না।' রামহরি ভুঁইয়া প্রত্যুত্তরে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল,—'তা'হলে আপনার এই কাঠের পুতুলদের নিয়ে আমার জমির দখল আটকান। ওই ক'টা মাথা উড়িয়ে দেওয়া আমার লেঠেলদের পক্ষে দু' চার মিনিটের কাজ'। এই কথা বলে ভুঁইয়া তার দলের লোকের কাছে ফিরে গেল।

এখন কয়েক মিনিটের জন্য সব নিস্তব্ধ, সব নিশ্চুপ। কয়েক মিনিট আগের থম থমে ভাবটা যেন আরও ঘনিয়ে এল। কয়েকটা কাক দূর থেকে সোজা এই দিকে উড়ে আসছিল, হঠাৎ ওদের দিয়ে মোড় নিয়ে ঘুরে 'কা কা' শব্দে উড়ে পালাল। এই কঠোর স্তব্ধতা প্রথম ভঙ্গ করে কানাইদার উত্তেজিত গলার শব্দে আর ঘুরপাক খাওয়ায়। ভুঁইয়া তার আগের জায়গায় পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে কানাইদার গলার চীৎকার যেন সপ্তমে চড়ল। তার গালি-গালাজ আর কথার ধাপট ভুরুকির তোড়ে বেরোতে লাগল।—'ওরে হতভাগারা, তোদের মধ্যে কেউ মানুষ নেই রে, যে লাঠির বাড়ি মেরে লোকটার কথার উত্তর দেয়, তোদের কাঠের পুতুল বলে গেল তোরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনলি? হাঁরে, তোরা কি মায়ের দুধ খেয়ে কেউ মানুষ হ'সনি? তোরা কি মরদের বাচ্চা নস্? তোদের হাতে কি লাঠি নেই? ওর মাথাটা ফাঁক করে দিলি নি কেন? কানাইদার যেন গলাফাটা বাজখাই চীৎকার আর তেমনই লাফানো। বাবা বারবার বলতে লাগলেন—'চুপ কর কানাই। মিতুন ওকে শক্ত করে ধরে থাক, ও যেন হঠাৎ কিছু না করে বসে।' মিতুন তখনই কানাইদার বাঁ হাতটা জোরে ধরে রাখল। কিন্তু কে কার কথা শোনে, কানাইদাকে তখন যেন একটা বেপায় ক্ষেপাকে পেয়ে বসেছে। সে যেন একটা সম্পূর্ণ অন্যরকম মূর্তি।

বাবলা গাছের আড়াল থেকে তোফল আর আমি পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি। কথা না বললেও দু'জনের মনের ভাব যেন মুখে ব্যক্ত হয়ে উঠেছে। 'ঠাকুমা থাকলে কানাইদাকে এ অবস্থায় হয়তো সামলাতে পারতো, কিন্তু বাবাকে ও একেবারেই গ্রাহ্য করে না।'

কানাইদার চীৎকার আর লাফানো যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। 'যে ছেড়ে দে আমায়, একবার ছেড়ে দে, আমি দেখে নিই এই ক'টাকে। লাঠির ঘায়ে হারামজাদাদের মুণ্ডুগুলো উড়িয়ে দি। ওরে আমায় একবার ছেড়ে দে, এক লাঠির ঘায়ে যদি মুণ্ডুগুলো না ফাঁক করে দি তবে আমার নাম কানাই সরকার নয়। তোদের এতবড় সাহস, জানিস না এখানে কে আছে?'

ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করেছে। রামহরি ভুঁইয়া নিশ্চল খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলছে ক্ষুধিত নেকড়ে বাঘের মত। এইবার একবার ভুঁইয়া চোখের ইসারা করল। ওদের দলের লেঠেলদের মধ্যে যেন একটা উত্তেজনার শিহরণ ঢেউ খেলে গেল। সমস্ত দলটা সাত আট হাত ধীর পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে এল। দলের আগুয়ানে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে চিনু সর্দার গোঁফে তা

দিচ্ছে আর বলছে,—'এগিয়ে আয়, আয় এগিয়ে।' কয়েকটা লেঠেল ছুটে পড়ে চরের মাটি নিয়ে বুকে আর হাতের পেশীতে ডলে ডলে মাখছে। মাথার চুলে মাটি মেখে চুলগুলো ফুলিয়ে ঝাঁকড়া করে তুলেছে। থেকে থেকে চিতুর গুরু গম্ভীর আওয়াজ উঠছে,—'এগিয়ে আয় নরকের বাচ্চা, এগিয়ে আয়।'

বাবলা গাছের তলায় তোষলের দিকে চোখ পড়ায় দেখি তোষল ঘর ঘর করে কাঁদছে। ও বুঝতে পেরেছে এই কাশচরের মাটিতে প্রথম খুন হবে কানাইয়া, আমাদের চোখের সামনে অদক্ষ্যাত খুন, চর দখলের প্রথম বলি, আমাদের সেই কানাইয়া। আমি যেন অনুভব করছি আমার বুকের মধ্যে চেঁকির পাড় দিচ্ছে। আমার পা আরে সর্দারের যেন আড়ষ্ট, সে যেন আমার দেহ নয়।

সামনের দিকে লক্ষ্য করে দেখলাম, বাবাও যেন কেমন হয়ে গেছেন, কেমন যেন হতভম্ব ভাব। আমাদের লেঠেলদের মধ্যে কেমন একটা চাঞ্চল্য, মানুষের জীবন রক্ষার স্বাভাবিক তাগিদের চাঞ্চল্য, চাঞ্চল্য আত্মরক্ষার। থেকে থেকে বাবার মুখ থেকে বেরুচ্ছে—'ওকে ধরে রাখ, ওকে ছাড়িস্‌নে মিতুন।' কিন্তু এতে ফল স্পষ্টতঃই আরও খারাপ হচ্ছে। এতে কানাইয়া আরও উত্তেজিত হয়ে দাঁতে দাঁত ঘসছে আর আস্ফালন করছে,—ছেড়ে দে আমায়, তোরা একবারটি আমায় ছেড়ে দে, ওই সমুদ্দিদের বুড়ো ক'টা উঁড়িয়ে দি। ওদের লাঠিখেলার সাধ একেবারে চিরকালের তরে ঘুচিয়ে দি।' এইসব কথায় ভুঁইয়ার লেঠেলরা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে দাঁতে দাঁত ঘসছে। ওদের দলের দু'তিন জন এগিয়ে আসার জন্য পা তুলছে আর আমাদের দলের লেঠেলরা ওদের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য পায়ের টাল ঠিক করে যে যার লাঠিগাছ বাগিয়ে ধরছে। কিন্তু কানাইয়ার চীৎকার আর আস্ফালন সমানে চলেছে, তার আর বিরতি নেই।—'ওই চিতু সর্দারের মুণ্ডুটা আমি হাত দিয়ে ছিঁড়ে নিয়ে আসবো, দে আমায় ছেড়ে দে।' একটু একটু করে এগিয়ে আসায় দলে এখন দু'দলের ব্যবধান হাত দশেকের বেশী রইল না।

হঠাৎ চোখের পলকে একটা ওলট পালট কাণ্ড হয়ে গেল। আমাদের দলের মিতুন সর্দার প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ঠিক হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে কানাইয়ার হেঁচড়া-হেঁচড়িতে টাল ঠিক রাখতে না পেরে তার হাত ফস্‌কে গেল, আর ধনুকের ছিলে-ছাড়া তীরের মত কানাইয়া চিতু সর্দারের পায়ের কাছে ছিটকে পড়ল। মুহূর্তে তিন চারটে পাকা লাঠি সাঁ করে ওপরে উঠল, পর মুহূর্তে কানাইয়ার মাথায় পড়বে বলে। বাবলা গাছের আড়ালে আমি আর তোষল, তোষল আর আমি, আমাদের এক হাত সামনে কে যেন অন্ধকারের একটা স্বচ্ছ পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছে। চাপড়া চাপড়া রক্ত, ঘন লাল রঙ আর ঝাঁক ঝাঁক সবুজে ফুল কেবল হলদে, হলদে আর হলদে। আমাদের চোখ দুটো আমাদের অজানতেই বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের সকল ইন্দ্রিয়শক্তি যেন অসাড় হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে বোধশক্তি বলে যেন আর কিছু নেই।

আমাদের এই আচ্ছন্ন ভাবটা জোর ধাক্কা খেল একটা সম্মিলিত বিকট হাসির আওয়াজে। চোখ চেয়ে দেখি, কানাইয়া চিতুর পা দুটো সবলে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে আর কাঁদছে,—'তোর পায়ে পড়ি বাবা, আমায় মেরে ফেলিস নে, ওরে তোরা আমার মা-বাপ রে। ওরে তোদের লাঠির এক ঘায়ে মরে যাবো রে। ওরে তোদের পায়ে পড়ি রে। ওরে তোরা আমায় ছেড়ে দে রে। ওরে নাক খোলা কান খোলা যাচ্ছি রে। ওরে আর কখনও এমন কাজ করবো না রে। তোদেরই বাবা তোদের, আমায় এবার তোরা ছেড়ে দে।' সেই ইনিয়ে বিনিয়ে কানাইয়ার কান্না আর ভুঁইয়ার দলের লেঠেলদের কি বিকট হাসি। চিতু সর্দারও তার লাঠি গাছটা ফেলে দিয়ে কানাইয়াকে শূন্যে তুলে একবার ওপরে ছুঁড়ে আর লুফে নেওয়ার মত করে হাসতে হাসতে বলে,—'কিরে মরদ,—আমার মুণ্ডুটা তুই ছিঁড়বি যে, নে এইবার ছেঁড়। আমার মুণ্ডুটা তোর হাতের কাছে।'

সংঘর্ষের জায়গাটায় যেন উচ্চ হাসির তুফান বয়ে যাচ্ছে। আমাদের দলের লেঠেলরাও সে হাসিতে যোগ দিয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার লাঠি ফেলে দিয়ে ঝুঁকে পড়ে পেটের দু'ধার হাত দিয়ে চেপে ধরে হাসছে, কেউ আবার হাসতে হাসতে বসে পড়েছে।

আমরা দু'জনে কখন যে বাবলা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছি তা যেন আমাদের খেয়াল নেই। যখন খেয়াল হ'ল তখন দেখি, সেখানে বাবা আর রামহরি ভুঁইয়া পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দু'জনে হাসছে আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে এই মজা উপভোগ করছি আর হাসছি। কানাইদাকে যখন চিতু সর্দার নিচে নামিয়ে দিল, তখন দেখি কানাইদার সেই মৃদু কান্না ধীরে ধীরে হাসিতে রূপান্তরিত হয়েছে। সেটা হাসি কি কান্না তা ঠিক বোঝা যায় না, সেটা হাসি ও কান্নার সংমিশ্রনে একটা করুণ অভিব্যক্তি। কিছুটা পরে কানাইদাও সকলের সামনে উচ্চহাসির ঐকতানে নিজের হাসির সুরটি মেলালো।

আমরা দু'ভাইও হাসছি। কানাইদার হাসিতে আবার নতুন করে একটা হাসির ঝড় বয়ে গেল। সেই ভারী গুমোট আর জমাট বন্ধ হওয়া থমথমে পরিবেশটা তখন সম্পূর্ণ হাল্কা হয়ে গেছে। হাসির তোড়ে ওদের সকলের মন থেকে হিংসা, দ্বন্দ্ব আর গোঁয়ারতুমি ভাবের অনেকখানি যেন ধুয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। এই ভাবটা কাটলে পর রামহরি ভুঁইয়া আমাদের দু'ভাইকে দেখিয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—'এরা কে?' বাবা আমাদের পরিচয় দিতে বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন,—'তোরা এখানে কখন এলি, আর কেন বৃথা এলি? মারামারি খুনোখুনির মধ্যে তোদের আসতে বারণ করেছিলুম না, তোদের এখানে সামলাবে কে?'

বাবার গলার স্বর বেশ রাগত। ঐ অবস্থায় আমার মুখ দিয়ে কোন কথা সরল না। বাবা রাগ করলে আমার খুব ভয় করত, তা ছাড়া এত অপরিচিত লোকের সামনে আমি চুপ করে রইলাম। কিন্তু তোষল ছাড়বার পাত্র নয়। বাড়ির ছোট ছেলে বলে সে সকলের আদুরে ছিল। কেউ তাকে কিছু বললে বা তিরস্কার করলে সে তার উত্তর দেবেই দেবে। এ তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। তোষল বাবার কথার উত্তর দিয়ে বলল,— 'আমাদের বাপ-দাদারা এখানে এসে খুনোখুনি হয়ে মরবে আর আমরা ঘরে বসে পড়াশুনা করব, এই তুমি চাও। তোমরা মরে গেলে আমাদের কি হবে? আমরা দু'ভাই প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছিলাম, যে তোমরা মরলে আমরাও মরব।' এই কথা বলে তোষল কাঁদতে লাগল। তার কথায় আমারও চোখে জল এল। আমি বললাম,—'তোষল ওই বাবলা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে কেঁদেছে।'

তোষলের কান্না আর থামে না। রামহরি ভুঁইয়া এতক্ষণ আমাদের দেখছিল। এখন সে তোষলের কাছে এসে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। তোষল ভুঁইয়ার হাত সরিয়ে দিতে লাগল। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল,—'আপনি এতগুলো লেঠেলকে নিয়ে এসেছেন আমার বাবাকে ঠেঙিয়ে মারবেন বলে। আমরা আপনার কি করেছি'?

ভুঁইয়া বলল,—'কে তোমায় বলেছে যে আমি তোমার বাবাকে ঠেঙিয়ে মেরে ফেলবো? চর নিয়ে যে ঝগড়া সে আমি আজই মিটিয়ে ফেলছি। তা হলে তো তুমি খুশি হও।—তোষল মাথা নেড়ে বলল,— 'হ্যাঁ, এখনি মিটিয়ে ফেলুন।' রামহরি ভুঁইয়া তখনই তোষলকে বলল,—'তোষল, তুমি ভাগ করে দাও'।

'বেশ তাই হোক। আমিই ভাগ করে দেব। আমি কাউকে বেশী দোব না, কাউকে কম দোব না। আধাআধিই ভাগ করব। এই কুড়ি বিঘে চরের আপনি দশ বিঘে নিন, আর বাবা দশ বিঘে নিন।'

'তোফল, আমি তোমার কথায় রাজী।' বলল রামহরি ভুঁইয়া।

আবেগের আতিশয্যে বাবা রামহরিবাবুকে জড়িয়ে ধরলেন।

'ভুঁইয়া মশায় আজ আপনি একটা অনর্থক রক্তপাত বাঁচালেন।'

'ব্যাপারটা যে এ রকম মোড় ঘুরে যাবে তা ভাবতে পারি নি,' বলল ভুঁইয়া।—'মোড় ঘোরালে আপনার ভাগনে আর আপনার ছেলে তোফল।'

রাগ ক্রোধ করে তখনই চরটা ভাগাভাগি করা হল। দু'বাড়ি থেকে তিনিস পত্তর এল। ছুটো পাঁঠা কাটা হল। তোফল পর্ব দিয়ে একটা ভিন্ন ব্যাপারের সূত্রপাত হ'ল। গল্পটা শেষ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে চিন্তাবিষ্ট হ'ল কুমার।

'সেই বিশ বছর আগের ঘটনা কিন্তু আজও তোমার বেশ মনে আছে দেখছি।'

'একটানা আর মনে আছে কই। সবই তো টুকরো টুকরো ভাঙা ভাঙা চীনেমাটির বাসনের মতো। সব মিশিয়ে কথার মোজেইক গেঁথে চলেছি। যেদিন গত হয়েছে সে আর ফিরে আসবে না। এখন তো চোখের সেন্সে হলদে ফিল্টার পড়েছে।'

'কি রকম?'

'তা আর নয়? যে বয়সের গল্প করছি তখনকার দিনে রোদ্দুরে অনেক বেশী কাঁচা সোনার রং ছিল। এখনকার আকাশের রঙে আগেকার আকাশের সে গাঢ় নিলীমা কোথায়? এ রং তো অনেক ফিকে, কেমন বিবর্ণ বিবর্ণ ভাব, এখনকার বাতাসে তখনকার বাতাসের স্নিগ্ধতা নেই, নেই সেই শরীর জুড়নো শীতলতা। নদীর ধারে বাতাসে রাশি রাশি কাশফুল দুলতে দেখে তখন মনটাও দোলা খেত। সে দোলা স্পষ্ট অনুভব করতাম অন্তরে, দেহে রক্তের প্রবাহে। কিন্তু এখন তা আর হয় না। আর যাকে হারানো উত্তেজনার কথা বলছ। তখনকার দিনের সেই অনুভূতি যা দেহে, যা রক্তের প্রবাহে অনুভব করেছি এখন আর ঠিক তেমনটি অনুভব করি না। তাই বলি চোখের সেন্সে হলদে ফিল্টার পড়েছে। এ চোখ সে দিনের চোখের মতো আর দেখতে পায় না।

সরকারী খাজনা আদায় করা মানুষটির কাজ। রাজস্ব আদায় করে একটি ব্যাঙ্কে তিনি তা রাখতেন। হঠাৎ ব্যাঙ্ক ফেল পড়ল। যদিও তিনি সব টাকা দিয়ে দিলেন তবু বিচারে তাঁর তিন মাসের জেল হয়ে গেল।

জীবনে অনেক জ্বালা অনেক যন্ত্রনা পেয়েছেন। এবার কলম ধরলেন তিনি। একটি অপরূপ চরিত্র আঁকলেন যে বিচিত্র পথে বিপথে বেরিয়ে পড়েছে।

সত দুঃখের মাঝখানে পড়েও দাড়ভাঙে কখনো হারাননি তাঁর অসাধারণ পরিহাস বোধ, ব্যঙ্গ-কৌতুকের তির্যক দৃষ্টিভঙ্গী।

তাঁর কুইন্টো বিশ্বসাহিত্যে চিরকাল বেঁচে থাকবে।

চলতিদুনিয়া

ইংল্যাণ্ডের তরুণ-তরুণীরা আজকাল ছুটির দিনগুলো কাটাবার চমৎকার পন্থা বের করেছেন। কয়েকজন মিলে একটা ভ্রাম্যমান নাটুকে দল তৈরি করে নেন, সপ্তাহখানেক রিহার্সাল চলে, তারপর সকলে বেরিয়ে পড়েন পথে প্রান্তরে। দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই শুরু হয় রোমাঞ্চকর জীবনযাত্রা। প্রতি রাতে এক এক জায়গায় অভিনয় করেন, নিত্য নতুন স্থানে তাঁরা লাভ করেন নতুন বন্ধু-বান্ধব, অজানা মানুষের সঙ্গে প্রতিনিয়ত হয় পরিচয়। আর এতে খরচও পড়ে অতি অল্প। —ওয়্যান্

• • •

জর্ডনের সম্রাট যে প্রাসাদে বাস করেন সেটি একটি সেকেলে দুর্গবিশেষ। আক্রমণকারীর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে এ যুগেও তার চারদিকে পরিখা রয়েছে। দুর্গে যাবার রাস্তায় রয়েছে সাতটি বাঁক, আর প্রতিটি বাঁকেই বন্দুকধারী সৈনিক।

সম্রাটের জীবন যে কোন মুহূর্তে বিপন্ন হতে পারে। তাঁর প্রাসাদের সর্বত্র সশস্ত্র রক্ষী। শয়ন কক্ষেও স্টেন-গান বসানো, বিছানার সব সময় দুটি রিভলভার। পিতামহকে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারাতে ইনি দেখেছেন। এঁরই আত্মীয় ইরাকের সম্রাট ফৈজল এবং গোটা হুসেনাইট পরিবার তিন বছর আগে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে।

সম্রাটের জীবন এ যুগে সুখের নয়। —ওয়্যান্

• • •

লণ্ডনের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে আজকাল মেলামেশার সুযোগ খুবই বেড়ে গেছে এবং ক্লাবের মাধ্যমে তাদের এই অবাধ মেলামেশার ফল মোটেই ভাল হচ্ছে না। এ নিয়ে পিতামাতার মনে খুবই দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে। কারণ কয়েক ঘণ্টা আলাপ পরিচয়, তারপর ভালো লাগা তারপর ব্যাপারটার রাশ টেনে না ধরলে অনেকদূর পর্যন্ত গড়ায় এবং শেষ জীবনে যে কী মর্মান্তিক দুঃখ কষ্টের সৃষ্টি হয় তা অনুভবশী তরুণ তরুণীদের চিন্তায় আসে না। অবশ্য এদের অস্থিরচিত্ততার জন্যে সিনেমা, টেলিভিশন, মোটর, এমন কি মোটর সাইকেলকে পর্যন্ত দোষ দেয়া যায় কিন্তু আসল গলদ রয়েছে বাপ মায়ের মধ্যে—একথা আজ একদল চিন্তাশীল ব্যক্তি বলতে শুরু করেছেন। মায়েদের উচিত কন্যাকে যথা সময়ে এই বলে সাবধান করে দেয়া যে পুরুষদের সঙ্গে অত্যধিক মেলামেশা আগুন নিয়ে খেলার সমান। যখনি সে কোন তরুণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসবে তখনি যেন মনে করে যে ভয়াবহ বিপদ রয়েছে পশ্চাতে। —ডেলি মিরর

শোনা যায় বাঘের মিশিতে পায় তারা শেষ পর্যন্ত খুবই বিপদে পড়ে। এতদিন পর্যন্ত নিদ্রিত অবস্থায় উঠে হেঁটে চলাফেরার খবর শোনা গেছে। এবার জানা গেল আরও বিচিত্র সংবাদ। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় মিসেস রেখ ব্লেকমোরকে মিশিতে পেয়েছিল। তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন, ঘুমন্ত অবস্থায় মোটর গ্যারেজে গেলেন এবং গাড়িতে উঠে বসলেন।

নিদ্রিত অবস্থাতেই গাড়ি চালালেন, গ্যারেজের দরজার কোন ক্ষতি হোল না, কিন্তু শেষপর্যন্ত একটা দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা মারল গাড়িটা।

তাতেই ভদ্রমহিলার ঘুম ছুটে গেল। —ডেলি মিরর

• • • •

কিছুদিন পূর্বে লিভারের ডিউকের একটি পা অস্ত্রোপচার করে বাদ দিতে হয়। ব্যাপারটি যে কোন পুরুষের পক্ষেই মর্মান্তিক।

কিন্তু তাঁর সুন্দরী স্ত্রী অর্থাৎ ডাচেস্ অফ লিভার এ ঘটনায় আদৌ ভেঙে পড়লেন না। উভয়ের মধ্যে বয়সের বিশেষ ব্যবধান ছিল। সেটাকেও তিনি আমল দিলেন না। সমগ্র সংসার যাত্রায় এমন একটি ছন্দিত সুষমা আনলেন যে, মনে হোল স্বামীকে একান্তে পেয়ে তিনি যেন অত্যন্ত খুশি।

স্বামীর ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্ত কৌশলী হলেন ভদ্রমহিলা। ডিউক ধূমপান করতে চাইলে তিনি ঘরের এক কোণ থেকে সিগারেট ছুঁড়তে থাকেন। কুড়ি বার ধরতে পারলে তবেই একটি সিগারেট। এতেই ডিউকের শরীর চালনা বা মৃদু ব্যায়াম হয়ে যায়।

ডাচেসের কাছে প্রতিটি পোশাকে শুধু কাঁটাই নেই, প্রতিটি কাঁটারও ওপরে রয়েছে গোলাপ।

—ওম্যান্স্ ওন্

• • • •

বিখ্যাত বিজ্ঞানী সভার ভূমিষ্ঠান হাক্সলে সম্প্রতি শিকাগোর 'মিউজিয়ম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রি' পরিদর্শনে গেছলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি এসে দাঁড়ালেন একটি প্রদর্শিত বস্তুর সম্মুখে।

বস্তুটির নিচে একটি পরিচয়-লিপি ছিল :

"The most numerous large mammal on earth : a dangerous animal whose misuse of world resources and uncontrolled population growth is a threat to all living things."

প্রদর্শিত বিষয় বস্তুটি কি ? একটি বড় আয়না। —নেন্ ওন্‌লি

• • • •

নিউ ইয়র্কে কিশোর অপরাধীদের সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে গেছে। গত বছরে নানা অপরাধের জন্ত ১২,৬৯৩ জন বালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সাতটি প্রথম শ্রেণীর খুনের ব্যাপারে জড়িত অপরাধীও এদের মধ্যে ছিল।

অপরাধী ধরনের নানা চেষ্টা চলছে তবে সাফল্য সুদূরপরাহত। —নেন্ ওন্‌লি

• • • •

সম্প্রতি নিউইয়র্ক সিটিতে নিয়ম করা হয়েছে যে যারা শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণের জন্ত আবেদন জানাবেন তাদের আঙুলের ছাপ নেয়া হবে।

নিয়মটি চালু হওয়ার পর বিস্ময়কর তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ৪৫৪৫ জন আবেদনকারীর মধ্যে ১০৪ জনের ক্ষেত্রে পুলিশ রেকর্ড পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে কয়েকজন নারীঘটিত ব্যাপারে অপরাধী এবং এক জন নরহত্যা ব্যাপারে লিপ্ত বলে সন্দেহ করা হয়েছে। —মেন্ অন্‌লি

• • •

ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান্ কুয়েন্টিন্ জেলের মধ্যেই সম্প্রতি পর পর চারটি হত্যাকাণ্ডে সকলেই বিচলিত হয়ে উঠেছেন। একটি ক্ষেত্রে এক আসামী অন্য আসামীকে প্রকাশ্যে হত্যা করেছে। এ সবের কারণ কি, অস্ত্র-শস্ত্র আসে কোত্থেকে? নিবারণের উপায় কি? —এমনি সব প্রশ্ন উঠেছে।

এখনও এর উত্তর মেলে নি তবে জেলের ভেতরেই জুয়া খেলার পরিণামস্বরূপ এই হত্যাকাণ্ড, এই রকম অনুমান করা হচ্ছে। জেলের চিফ্ ওয়ার্ডেন বলেছেন, আমরা জুয়ো অনুমোদন করি না, কিন্তু এ আমাদের কন্ট্রোলের বাইরে।

জেলের মধ্যে ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত আসামী সমাবেশ হত্যাকাণ্ডের মূলে রয়েছে বলে প্রচারিত হচ্ছে। এখানে ২,৮০০ জনের জায়গায় ৪৯১০ জন আসামী আছে এবং এদের গড়পড়তা বয়েস হচ্ছে ২৮ বছর এবং এখন ক্রমেই আরো অল্প বয়েসী ছেলেরা মারাত্মক সব অপরাধের জন্য জেল খাটতে আসছে। এবং জেলের মধ্যেই চূড়ান্ত অপরাধ করে গা ঢাকা দিচ্ছে। —নিউজ উইক্।

সম্প্রতি লেবাননের মন্ত্রীদের মধ্যে যে বিষয়টি নিয়ে গভীর মতভেদ দেখা দিয়েছে সেটি আর কিছুই নয়, আধুনিক টুইস্ট নাচ। স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীর মতে লেবাননের যুবকদের নীতিবোধ বজায় রাখার জন্যে এ নাচ একদম নিষিদ্ধ করা উচিত। আইন-মন্ত্রী জানিয়েছেন যে, তিনি সর্বপ্রকার ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বপক্ষে। [অর্থাৎ টুইস্ট নাচ চলুক।] শ্রম-মন্ত্রীর মতে কুমারী টুইস্ট [Miss Twist] নির্বাচনের জন্য একটা নাচের আসরের ব্যবস্থা করা উচিত। কৃষি-মন্ত্রী বলেছেন যে, তিনি নাচের পক্ষে কারণ তাঁর জুতাটি তাজা। স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী পুলিশ পাঠিয়েছেন নাইটক্লাবে, তারা কোন দোষ দেখতে পায় নি। —নিউজ উইক

ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্র সচিব বাটলার সম্প্রতি একটি আবেদনপত্র পেয়েছেন গেরিল্লাদের কাছ থেকে। তাতে বলা হয়েছে যে ব্রিটেনের যাবতীয় পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর খরচা যখন করদাতারাই জোগাচ্ছেন তখন তাদের রক্ষা করার ভারও সরকারকে নিতে হবে। অতএব দুশো পাউণ্ড দান হিসেবে মঞ্জুর করা হোক সরকার পক্ষ থেকেযার দ্বারা মিঃ গ্রীন হাইড্রোজেন বোমার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একটি আশ্রয় স্থল নির্মাণ করতে পারবেন। —ডেলি মিরর

বাংলা রঙ্গালয়ের নব-রূপায়ণ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

[৪]

প্রথম প্রযোজনাশিল্পী ঃ

অবনীন্দ্রনাথ বলতেন,—"আমি বাংলা থিয়েটারে অভিনয় দেখতে যাই না, ম্যাজিক দেখতে যাই।" অবশ্য এর মধ্যে খানিকটা কৌতুককর অত্যুক্তি আছে—কিন্তু এইটুকু ব'লেই তাঁর কথা উড়িয়ে দেওয়া চলে না। পরে তাঁর সম্পূর্ণ উক্তি উদ্ধার ক'রে আমরা দেখাব যে, তার মধ্যে ভাববার কথাও আছে যথেষ্ট।

পিতামাতা নাট্যানুরাগী ছিলেন ব'লে আমিও শৈশব থেকেই বাংলা রঙ্গালয়ের অভিনয় দেখতে অভ্যস্ত হয়েছিলুম। তারপর ক্রমেই অভিনয় দেখাটা ঘর-অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল—নির্বিচারে ভালো-মন্দ সব অভিনয়ই দর্শন করাটা হয়ে উঠল যেন নেশার মত—একচক্ষু হরিণের মত একদিকে ধাবিত হয়ে হারিয়ে ফেললুম জ্যোতিষ্পথের ঠিকানা।

সাধারণ রঙ্গালয়ের আবহ হয়ে উঠেছিল অধিকতর চমৎকার। একখানা কৌতুকনাট্যের [লেখকের নাম মনে নেই] অভিনয়ে দেখলুম, জনৈক রায়বাঘিনী জাতীয় স্ত্রীলোক তার অমুখর্ব স্বামী-বেচারাকে সম্বোধন করে এবং তার গালে ঠোনা মেরে গান ধরেছে—

'তোর বংশচণ্ডী ছিলে পিণ্ডি,
হা কর রে বাপ।'

ওই পালারই আর একটি গীতি-কবিকা : অভিসন্ধাত্রী কেরানীবাবুরা স্ত্রীদের সম্বোধন করে তারস্বরে এক সঙ্গে গান গাইছেন :

'তুই শালী তো করলি মেরি
আনতে গিয়ে তরকারি।'

সাহিত্যিক ও কবি ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ পর্যন্ত সে যুগের বাংলা রঙ্গালয়ের পরিস্থিতির ভিতরে গিয়ে মাঝে মাঝে নিজের মাথা হারিয়ে ফেলতেন। তাঁর 'সাবিত্রী' একখানি জনপ্রিয় ধর্মমূলক নাটক। ওরই একটি ভূমিকায় কালীনাথ চট্টোপাধ্যায় নিজের নৃত্যশীলা সহধর্মিনীকে গান গেয়ে বলতেন—

'তুমি লো আমার 'ম' যেতে আকার,
আমি লো বাছনি।'

অমৃতলাল বসুর প্রহসনগুলির কিছু কিছু অংশ যে কুবিখ্যাত হয়ে আছে তা নিতান্ত অকারণেই নয়।

ভালো অভিনয় দেখবার আশায় এ-সব অত্যাচারও সহ্য করলুম, কিন্তু গিরিশোত্তর যুগে উচ্চশ্রেণীর অভিনয়ও দুর্লভ হয়ে উঠল। তবু থিয়েটর দেখা ছাড়তে পারলুম না। কারণ? নেশা। নেশা।

অথচ সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে গিয়ে মাঝে মাঝে চমক লেগেছে। প্রখ্যাত অধ্যাপক স্বর্গীয় বিনয়েন্দ্রনাথ সেন ছিলেন আমার জ্যেষ্ঠ মাতুলানীর আত্মীয় এবং প্রায়ই আমার মাতুলালয়ে গমনাগমন করতেন। সেই সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার জানাশুনা। আমার অভিনয় দেখবার আগ্রহ দেখে একদিন তিনি তাঁর পরিবার সংশ্লিষ্ট এক নাট্যানুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ করলেন। অভিনেয় নাটক ছিল 'বিসর্জন'। তখন আমার বালক বয়স। মঞ্চের উপরে রবীন্দ্রনাথের নাটকের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। রীতিমত অবাক হয়ে গেলুম। এখানে কুশীলবদের মুখে যে অনুপম কবিত্বপূর্ণ ভাষা শুনলুম, সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ে কোনদিন তার তুলনা পাই নি। আজকের দিনের মঞ্চনাটকের সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলতে পারে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল মঞ্চনাটকে অল্পবিস্তর সাহিত্যিক কবিত্বকে আনবার চেষ্টা করেছেন বটে কিন্তু গিরিশচন্দ্র এদিকটা যেন সজ্ঞানেই যথাসম্ভব এড়িয়ে গিয়েছেন। খুব সম্ভব তাঁর মত ছিল সাহিত্যিক কবিত্ব মঞ্চনাটকের জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ করে—বার্নার্ড শ' এবং আরো অনেক নাট্যবিশেষজ্ঞেরও ওই মত। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকের জনপ্রিয়তার অভাব দেখে এ মত অমূলক নয় ব'লেই মনে হয়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো 'প্লে-রাইট' বা মঞ্চনাট্যকার ছিলেন না, মঞ্চের সুবিধা অসুবিধা বুঝে কোন দিনই তিনি নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নি। তিনি ছিলেন স্বাধীন নাট্যকার বা 'ড্রামাটিস্ট'। এবং সর্বোপরি তিনি যে কবি, কোন-কিছুর জন্যে লেখনী ধারণ করে এ কথাটা কোনদিন তিনি ভুলতে পারেন নি। এটা প্রমাণিত করবার জন্যে বেশী বাকাব্যয় করবার দরকার নেই—তাঁর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কীয় সমস্ত প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস—এমন কি অসংখ্য পত্রই সে প্রমাণ বহন করছে। অধিকন্তু যাঁরা তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই জানেন রবীন্দ্রনাথের অতি-সাধারণ কথাবার্তা পর্যন্ত উচ্চসাহিত্যের উপযোগী হয়ে উঠত। কবিত্ব ও রবীন্দ্রনাথকে অভিন্ন বললেও অত্যুক্তি করা হবে না।

যে সময়ে 'বিসর্জন' দেখেছিলুম তখন আমার নাটকত্ব নিয়ে মাথা ঘামাবার বয়স হয় নি। কিন্তু কবিত্ব রসমাধুর্যের দিক দিয়ে ওই নাট্যাভিনয় আমাকে একেবারে অভিভূত ক'রে দিলে। মানুষের তরুণ বয়সেই তার মনের ভিতরে ভালো করে ঝাঁকিয়ে বসে কবির কবিত্ব।

অভিনয়ের ভালো-মন্দ নিয়ে আলোচনা না করলেও চলবে, কিন্তু সেদিনকার সমগ্র অনুষ্ঠানটি ছিল এমন পরিচ্ছন্ন সুরুচির পরিচায়ক, যা তখনও পর্যন্ত কোন পেশাদার বাংলা থিয়েটারে গিয়ে কেউ আশা করতে পারত না। তার কারণও বোঝা কঠিন নয়। ওই অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রবাবধায়ক ছিলেন নাট্যানুরাগী অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন। কলিকাতার য়ুনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট যখন সৌখিন নাট্যজগতে গৌরবের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিল, তখন সেই গৌরবের কতকাংশ ছিল বিনয়েন্দ্রনাথের প্রাপ্য। তাই শিশিরকুমার ভাদুড়িকে প্রায়ই একান্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পথনির্দেশক বিনয়েন্দ্রনাথের নাম উচ্চারণ করতে শুনতুম।

তখন রবীন্দ্রনাথের আর একখানি মাত্র পূর্ণাঙ্গ নাটক ছিল 'রাজা ও রাণী'। তখনকার দিনে লোকে যা চাইত, এখানি ছিল মঞ্চনাট্যের উপযোগী সেইরকম মেলো-ড্রামা, তাই সাহিত্যিক কারণে থাকা সত্ত্বেও তা সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত ও জনসাধারণের দ্বারা সাদরে অভিনন্দিত হয়েছিল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে এমারেল্ড থিয়েটারে যখন তার অভিনয় আরম্ভ হয় আমি তখন মাতৃকোলের বাসিন্দা। কিন্তু তার গানগুলি ঘরে-বাইরে লোকের মুখেমুখে শুনে শৈশবেই আমার কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল।

তারপর আন্দাজ ষোলো বৎসর বয়সে ভবানীপুরের এক সৌখিন সম্প্রদায়ের দ্বারা কোরিন্থিয়ান রঙ্গমঞ্চে সর্বপ্রথমে 'রাজা ও রাণী'র অভিনয় দেখলুম এবং আবার সেই কবিত্বের ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ নাটকের

তাহার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেল আমার চিত্ত। সেদিনকার অভিনেতাদের মধ্যে দুইজন শিল্পী সত্যে যথেষ্ট নাম কিনেছিলেন। একজন হচ্ছেন তিনকড়ি চক্রবর্তী, নবযুগের সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ও যাঁর উল্লেখযোগ্য দান থেকে বঞ্চিত হয় নি। দ্বিতীয় শিল্পী হচ্ছেন বরদা রায়, তিনি পেশাদার থিয়েটারে যোগ দেন নি বটে, কিন্তু প্রাচীন বয়সে একাধিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিলেন। 'রাজা ও রাণী'র পঞ্চরের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় হয়েছিল অতুলনীয়। তাঁর সেই ভাবভোতক সুমধুর অথচ সুগম্ভীর কণ্ঠস্বর আজও আমার কানে বাজে মৃদঙ্গের বোলের মত।

পরে স্টার থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের নায়কতায় আবার "রাজা ও রাণী"র অভিনয় দেখেছিলুম। মোটেই ভালো লাগে নি। একমাত্র স্বর্গীয়া সুশীলাবালাই [রাণী সুমিত্রার ভূমিকায়] সেই পুনরাভিনয়ের মানরক্ষা করেছিলেন,—আর কেউ রবীন্দ্রনাথের কবিতা উচিত মত আবৃত্তি করতেই পারেন নি।

তারপর সাধারণ রঙ্গালয়ে রবীন্দ্রনাথের একাধিক গল্প ও উপন্যাসের নাট্যরূপ দেখেছি, কিন্তু সে সব হয়েছে যেন সুরের অভাবে বোলের ব্যবস্থা। ওরই মধ্যে কতকটা উৎরে গিয়েছিল 'বউঠাকুরাণীর হাটে'র নাট্যরূপ 'বসন্ত রায়।'

তারপর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রবল অন্তঃপুরে প্রবেশ করলুম এবং তাঁর একান্ত ভক্ত হয়ে পড়লুম। নির্বোধরা নাকি স্বর্গের দরজায় ধাক্কা মারতেও ভয় পায় না—আমিও ভয় পেলুম না। কারুর সাহায্য না নিয়ে, একলা গিয়েই তাঁর সঙ্গে পরিচিত হলুম এবং প্রথম পরিচয়ের দিনেই তাঁর সঙ্গে ঘণ্টাকালব্যাপী তর্কযুদ্ধ করলুম স্বর্গভোচিত যুক্তি নিয়ে। তারপর পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল এবং আমি যে তাঁর স্নেহাশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত নই, তার পরিচয়ও পেয়েছিলুম বার বার। কিন্তু রবীন্দ্র-ভক্ত কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের ভাষায়—

"তবু ভরিল না চিত্ত।"

কারণ অভিনেতা রবীন্দ্রনাথকে দেখবার জন্যে আমার মন তখন উন্মুখ হয়ে উঠেছে। তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, একথা প্রায়ই শুনতুম নাট্যকলার বিশেষজ্ঞ বহু গুণী ব্যক্তির মুখে। তাঁর একাধিক অভিনয় চিত্রও দর্শন করেছি। ওই পর্যন্ত। যখন আমি যুবক, তখন তিনি কেবল গল্প লেখেন, উপন্যাস লেখেন, প্রবন্ধ লেখেন, পদ্য লেখেন এবং বড় জোর কোন কোন সভায় কবিতা আবৃত্তি বা প্রবন্ধ পাঠ করেন—ভুলেও অভিনয়ের নাম মুখে আনেন না।

তবে হ্যাঁ, সে হচ্ছে আবৃত্তির মত আবৃত্তি! একদিন টাউন হলে তাঁর রচিত শিবাজীর উপরে এক সুদীর্ঘ কবিতার আবৃত্তি শ্রবণ করলুম—সে-রকম ভাবব্যঞ্জনার বিচিত্র আবৃত্তি তার আগে বা পরে আর কখনো শ্রবণ করবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। কী সেই আশ্চর্য কণ্ঠস্বর! তখনও 'মাইকে'র সাহায্যে স্বরক্ষেপণপদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নি, বক্তা বা গায়কদের আপন আপন কণ্ঠের উপরেই নির্ভর করতে হ'ত। কিন্তু টাউন হলের অমন যে বিরাট হল ঘর, রবীন্দ্রনাথের চাঁচা-ছোলা উদাত্ত কণ্ঠস্বর তার প্রত্যন্ত দেশ পর্যন্ত তরঙ্গের পর তরঙ্গের উচ্ছ্বাসের মত গিয়ে পৌঁছতে লাগল। পদ্য এবং ভাব অনুসারে তাঁর কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনও লক্ষ্য করলুম বিশেষ ভাবেই। এ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ নাট্যশিল্পীর বিশেষত্ব। কিছুকাল পরে তাঁর নিজের কণ্ঠের গানও শুনলুম। সেও হচ্ছে "ভাব হ'তে রূপে অবিরাম আনাগোনা"।

একবার কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধুর [কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়] সঙ্গে কবিকে দর্শন করতে গিয়েছি। স্পষ্ট ভাষায় অভিযোগ ক'রে বললুম,—"লোকের মুখে

আপনার অভিনয়ের কত সুখ্যাতিই শুনি। কিন্তু চিরদিনই কি আমাদের লোকের মুখের কথা শুনেই তৃপ্ত থাকতে হবে?"

রবীন্দ্রনাথ মৃদুহাস্যপ্রসাদাত্মক মুখে, কিন্তু গম্ভীর স্বরে কেবল বললেন,—"ধৈর্য অবলম্বন কর।"

তারপরেও বেশ কিছুকাল পর্যন্ত কলকাতার রঙ্গমঞ্চে কবির সাড়া পাওয়া যায় নি। অথচ মাঝে মাঝে খবর পেতে লাগলুম, শান্তিনিকেতনের রঙ্গমঞ্চে কোন কোন ভূমিকায় কবি আবার অভিনেতার কর্তব্যপালন করেছেন। মনে অভিমান জাগত। কলকাতায় আমরা কি এতই ক্যাল্‌না? কিন্তু উপায় কি? রবীন্দ্রনাথ তখন নাট্যজগতের পুরাতন ধারা ছেড়ে নূতন ভাবের নূতন পদ্ধতিতে নাটকের পর নাটক রচনা ক'রে যাচ্ছেন, অভিনয় দর্শনে বঞ্চিত হয়ে আমরা তাদের নিয়েই উপভোগের আনন্দে মেতে উঠলুম।

তারপর এল সেই স্মরণীয় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ—য়ুরোপের বুকে তখন প্রথম মহাযুদ্ধের ভয়াবহ রক্তাক্ত কাহিনী লেখা হচ্ছে এবং বাংলাদেশের বাঁকুড়া জেলা দুর্ভিক্ষ-চায়ুতার করলগ্ন হয়ে দিগ্বিদিক বিদীর্ণ করছে মর্মান্তিক হাহাকারে। কবির হৃদয় শান্তিনিকেতনেও অশান্ত হয়ে উঠল। দুর্ভিক্ষের পরিবর্তে যতটা সম্ভব সুভিক্ষের ব্যবস্থা করবার জন্যে তিনি তাড়াতাড়ি চ'লে এলেন কলকাতায় এবং টিকিট বিক্রয় ক'রে টাকা তোলবার জন্যে নিজের নবরচিত ঐতিহাসিক 'ফাল্গুনী' অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। এবং সেই সঙ্গে তাঁর ভূমিকার মত জুড়ে দিলেন 'বৈরাগ্যসাধন' নামে নাটকাকারে গ্রথিত আর একটি রচনা।

আমরা বিপুল আনন্দে শ্রবণ করলুম এই নাট্যাভিনয়ে নটের সাজসজ্জায় কবি স্বয়ং মঞ্চের উপরে করবেন আত্মপ্রকাশ। 'বৈরাগ্যসাধনে' তিনি হবেন কবি এবং 'ফাল্গুনী'তে অন্ধ বাউল।

শুনলুম হু-হু ক'রে টিকিট বিক্রয় হয়ে যাচ্ছে—যদিও সে যুগের হিসাবে টিকিটের দাম ছিল যথেষ্ট চড়া। পাছে শেষটা ফাঁকে প'ড়ে অনুতাপ করতে হয়, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি একখানি প্রবেশপত্র কিনে ফেললুম। নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে যথাস্থানে হাজির হয়ে দেখলুম, জোড়াসাঁকোর পুরাতন বাড়ির সুবৃহৎ অঙ্গনে অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। ঠাকুরদালানের সামনে প্রেক্ষাগার এবং মঞ্চ বাঁধা হয়েছে দক্ষিণ দিকে।

দর্শকদের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে রীতিমত অবাক হয়ে গেলুম। প্রত্যেকেরই মুখে-চোখে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ছাপ। এত উচ্চ শ্রেণীর দর্শকের জনতা তার আগে বাংলাদেশের আর কোন অভিনয়ের আসরে উপস্থিত থাকতে দেখি নি। দর্শকদের মধ্যে য়ুরোপীয় স্ত্রী-পুরুষেরও অভাব ছিল না। কিন্তু যবনিকার সামনে ব'সে তখনও বুঝতে পারি নি যে, আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে আত্মগোপন ক'রে আছে কি এক অভাবিত রূপকথার সজল স্বপ্ন!

যবনিকা উঠল। প্রথমেই দেখলুম রাজসভা। ভূমিকা গ্রহণ করেছেন গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও সমরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি। পরে এলেন 'কবি'—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ। তাঁর বয়স তখন পঞ্চাশ পেরিয়ে ষাটের কোঠায়—মাথার উপরে বার্ধক্যের শুভ্রতার ছাপ। কিন্তু যে কবিকে দেখলুম তিনি তো বৃদ্ধ নন—চোখের সুমুখে দেখলুম যেন যৌবনের সরসতায় অপূর্ব 'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসী'র সুকুমার স্রষ্টাকে। ছন্দস্বরের প্রতি পদক্ষেপে ফুটে উঠছে যেন তাঁর তারুণ্যের চঞ্চল গতির মৌন সঙ্গীত এবং ভাবনেও নেই নটের বয়োধর্মের এতটুকু প্রভাব।

তারপরেই বিস্ময়ের উপরে বিস্ময়—যা ছিল আমার স্বপ্নাতীত এবং ধারণাতীত। শুরু হ'ল 'ফাল্গুনী'র গানের পালা এবং বৃন্দসঙ্গীত। ইন্দিরা দেবীর ভাষায়:

"অবন ঘাষার মঞ্চ-সজ্জার কথাও উল্লেখযোগ্য। আগেকার কালের সেই বিলম্বিত বিদেশীপনকে ঘুচে দিয়ে তার ভায়গায় সিঙ্কনে একটি নীল পশ্চাৎপট দিয়েছিলেন, সেটি এখনও দেওয়া হয়। তার উপরে কেবলমাত্র একটি গাছের ডাল, তার উপরে একটি মাত্র নীল ফুলের উপরে একটি ক্ষীণ চন্দ্ররেখা।"

তারপর সেই ইজিতময় পশ্চাৎপটের সামনে আরম্ভ হল যে আশ্চর্য ও বিচিত্র নাট্যলীলা, আমার দরিদ্র ভাষায় তার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। তবে যতটা পারা যায় সে সব কথা সবিস্তারে বর্ণনা করবার চেষ্টা করেছি আমার লেখা "শৌখিন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে, যাঁদের আগ্রহ আছে পড়ে দেখতে পারেন। সেই গ্রন্থ থেকে কেবল একটু অংশ উদ্ধার করলুম :

"তারপর রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব অন্ধ বাউলের ভূমিকায়। একেবারে বিপরীত ভূমিকা। প্রাচীন বাউল, দেহে যৌবনের চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু বার্ধক্যও যে শ্রীময় হ'তে পারে, তার দিকে তাকালে সেটা বুঝতে বিলম্ব হয় না। বাউল অন্ধ বটে, কিন্তু আত্মার মহান দৃষ্টিতে তার মৌখিক ভাব দীপ্যমান। হাতে একতারা নিয়ে বাউল মনোহর নাচের ভঙ্গিতে গান ধরলে—"ধীরে বন্ধু ধীরে"। সে কি হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীত, রাগিনীর ঝংকারে তার কি সতীর ভাবের অভিব্যক্তি, যে কোন মুক্তিত চিত্তও তার ধ্বনির ঐক্যতানে মুহূর্তে সচেতন হয়ে উঠতে পারে। সেই অপূর্ব সুর-মূর্ছনীর সঙ্গে বাউলের সমস্ত অন্তরাত্মা যেন বিগলিত হয়ে শ্রোতাদের হৃদয়-মনের উপরে ঝরে পড়তে লাগল। কত সেরা সেরা গুণীর গান শুনেছি, কিন্তু মানসচোখে আর কারুর কণ্ঠধ্বনির মধ্যে তেমনভাবে অরূপকে রূপায়িত করতে দেখি নি। এ আমার অতিবাদ নয়, সেদিনকার প্রেক্ষাগারে যে ভাগ্যবানরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই আমার কথার সায় দিয়ে বলবেন, সঙ্গীতে তেমন রূপায়ণ যাদুমন্ত্রীত। এডওয়ার্ড টমসন সেই গীতাভিনয় দেখে লিখেছিলেন :

"Not often can men have seen a stage part so piercing in its combination of fervid action with personal significance. It was almost as if Milton had acted his own Samson Agonistes."

এই উপলক্ষে স্থানান্তরে আমি যা বলেছিলুম, সেইটিই হচ্ছে আমার প্রধান কথা। বাল্যকাল থেকেই সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ নাটকের অভিনয় দেখবার সুযোগ পেয়েছি, কিন্তু মহাশিল্পের মধ্যে যথার্থ প্রযোগ নৈপুণ্য 'ফাল্গুনী'র আগে আর কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

একসুরে বাঁধা বীণার মত এই নাট্যানুষ্ঠানটি যে অনাহত ও অপূর্ব রাগিনী ফুটিয়ে তুলেছিল, তার সর্বত্র পাওয়া গিয়েছিল প্রযোগকর্তার অতুলনীয় প্রতিভার অমূল্য প্রসাদ। সেইদিন স্বচক্ষে দেখে প্রথম বুঝতে পেরেছিলুম যথার্থ প্রযোগশিল্প কাকে বলে। তার আগে এ সত্য উপলব্ধি করবার কোন উপায়ও ছিল না, কারণ আমরা ছিলুম নানাদিকে অর্থহীন ও অসঙ্গতি দোষদুষ্ট পেশাদার বাংলা রঙ্গালয়ের অভিনয় দেখতে অভ্যস্ত। কাজেই এটা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই যে, বাংলাদেশে প্রযোগশিল্পের দিকে নাট্যরসিকদের চোখ খুলে দেন সর্বপ্রথমে রবীন্দ্রনাথই। কেবল চোখ খুলে দিলেন না, তিনিই হলেন প্রথম পথপ্রদর্শক।

এই হ'ল বাংলা রঙ্গালয়ের নব রূপায়ণের প্রথম প্রচেষ্টা।

সেকালকার যে সব শৌখিন রঙ্গালয় থেকে এসেছিল আমাদের পেশাদার থিয়েটারের আদর্শ, ঠাকুরবাড়ির রঙ্গালয় ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু যুগ পরিবর্তনের ফলে সে আদর্শ হয়ে পড়েছিল অচল। তবু গিরিশোত্তর যুগের অধঃপতিত অচলায়তনের মধ্যে কোন শিল্পীর নিদ্রাভঙ্গ হয় নি।

বিংশ শতাব্দীতে ঠাকুরবাড়ির নাট্য প্রতিষ্ঠানে আবার নূতন ভাবে যুগধর্ম আত্মপ্রকাশ করলে বটে, কিন্তু আমাদের পেশাদার রঙ্গালয় সেদিকে দৃষ্টিপাত করা দরকার মনে করলে না। এই অক্ষতা এবং অসাড়তা আর্টের পক্ষে মৃত্যুর মত।

তার অব্যবহিত পরের কথা আর একজন নাট্য বিশেষজ্ঞের মুখে শ্রবণ করুন। আমার যা বক্তব্য, ['পরিচয়ে'র রবীন্দ্রজন্ম-শতবার্ষিকী সংখ্যায়] আগেই বলেছি, এবারে শুনুন 'ডাকঘর' অভিনয় সম্বন্ধে আর একজন গুণী নাট্যানুরাগীর উক্তি। 'সূত্রধার' [স্বর্গীয় অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য] লিখেছেন :

"পঁয়ষট্টি বছর ধ'রে লেখক থিয়েটার দেখে আসছেন; আজও বিরাম নেই। তাঁকে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন, এতদিন ধ'রে তো থিয়েটার দেখছ কোন্ থিয়েটারের কোন্ অভিনয় তোমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে? উত্তরে, তাঁকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে অন্যত্র যেতে হবে। ১৯১৭ সালে জোড়াসাঁকোতে বিচিত্রা-ভবনে 'ডাকঘরে'র যে অভিনয় হয়, আজ অবধি কোনো অভিনয়ই তার কাছে পৌঁছতে পারে নি। ... এগারো রাত্রি এই অভিনয় হয়েছিল। একদিন দর্শকদের মধ্যে ছিলেন আনি বেসান্ট, বালগঙ্গাধর তিলক, লালপৎ রায়, মদনমোহন মালবীয়, মহাত্মা গান্ধী। অভিনয় শেষ হল, মহাত্মাজী আর ওঠেন না; স্তব্ধ হয়ে ব'সে, চোখ দিয়ে টস্‌টস্ ক'রে জল পড়ছে।"

আমার সৌভাগ্যক্রমে সে অভিনয়ের আসরেও আমি উপস্থিত ছিলুম। 'সূত্রধার' কিছুমাত্র অত্যুক্তি করেন নি। গান্ধীজী বাংলা জানতেন না। তবু তিনি না কেঁদে থাকতে পারেন নি। শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের এমনি গুণ। ইংলণ্ডে গিয়ে রুশিয়া, জার্মানি ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ থেকে নানা নাট্য-সম্প্রদায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করে, সাধারণ ইংরেজ দর্শকরা তাদের ভাষা বোঝে না, তবু অভিভূত হয়।

'কাস্তনী'তে দেখেছিলুম একরকম প্রযোগনৈপুণ্য, 'ডাকঘরে' দেখলুম প্রযোগ শিল্পীর আর একরকম প্রতিভার নিদর্শন। কিন্তু এখানেও পেশাদারের কাছকে আদর্শের স্থানে উপস্থিত থাকতে দেখলুম না। সেখানে চলতে লাগল সেই পুরাতন কানুনীর পরিবেষণ। এদিকে নাট্য জগতে নবযুগধর্মের বিজয়কেতন নিয়ে যেখা দিলেন যে একজন নূতন পথিকার, সে সত্য তাঁরা অনুভব করতেও পারলেন না।

জীবনের প্রথম অধ্যায়ে শিল্পী আকাঙ্ক্ষা করেন খ্যাতি-ঐশ্বর্য, শ্রেষ্ঠ-প্রতিপত্তি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি ওঠেন খ্যাতির চরম শিখরে।

তারপরেই আসে অপ্রত্যাশিত নানা বিপত্তি। অল্পশক্তিমানের শিল্পী-জীবন এই খানেই হয় শেষ। আর যাঁরা মহান তাঁদের জীবনের নতুন অধ্যায় খুলে যেয় ঐ দুঃখ বেদনা।

এখন তিনি আর কার নির্দেশে ছবি আঁকবেন না, এখন মাত্র একজনকেই খুশী রাখতে হবে—সে নিজেকে—মহৎ শিল্পের উদ্ভব ঐ অন্তর-প্রেরণা থেকে। শিল্পী রেমব্রাণ্টের জীবনী এই কথাই বলে।

রম্যাণি বীক্ষ্য

উৎকল পর্ব

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আঠারো

খতা এখানে হারিয়ে যাবে না। গড়িয়ে পড়বারও কোন ভয় নেই। তেনজিঙের মতো আমরা হিমালয় জয়ে উঠছিলাম। বাঁধানো ধাপে ধাপে কয়েকটা বাড়ির মাথায় উঠছি। একটু উঁচু ধাপ, তাড়াতাড়ি উঠতে সামান্য টান ধরে। ওই পর্যন্তই। আর কোন বিপদের কথা মনে আসেনা।

আমার সঙ্গে উদয়গিরির দিকে খতা যায় নি। যতদূর মনে পড়ে, তাকে এই পাহাড়েই উঠতে দেখেছিলুম। হয়তো কোথায় বিশ্রাম নিচ্ছে, কিংবা না-না, আত্মগোপন করে কেন থাকবে। রামানন্দ-বাবুর ভয়ে! ভয় পাবার মতো লাজুক মেয়ে সে নয়। তবে কি—নামা, আমার অপেক্ষায় লুকিয়ে আছে, এখন দুঃসাহসের কথা আমি ভাববো না। নিজের অজ্ঞাতসারে আমি তাড়াতাড়ি উপরে উঠছিলুম। হঠাৎ থেমে পড়লুম। বাঁ হাতে একটা গুহার সন্ধান পেয়েছি।

বাইরে একজন ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়েছিলেন। এগিয়ে এসে বললেন, চরণামৃত।

চরণামৃত তাঁর হাতে ছিল। আমাকে হাত পেতে নিতে হবে। বললুম, এখানেও চরণামৃত!

ততক্ষণে ব্রাহ্মণ আমার হাতে চরণামৃত দিয়েছেন। হাত পেতেই আমি নিয়েছিলুম। তারপর সেই জলটুকু পান করে কয়েকটি পয়সা দিলুম ব্রাহ্মণের হাতে। সেই সঙ্গেই নির্ঝরের কলধ্বনি শুনলুম। উচ্ছল আনন্দে খতা হেসে উঠেছে।

আশ্চর্য হয়ে বললুম। ব্যাপার কী?

খতা বলল: তারি ভক্তি যে।

গুহার ভিতর থেকে সে এগিয়ে এল।

বললুম: কোথায় লুকিয়ে ছিলেন এতক্ষণ?

কে বললে লুকিয়েছিলুম?

রামানন্দবাবু হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

তিনি আপনাকে খুঁজছেন।

না। আমার আর মুখদর্শন করবেন না বলে রায় দিয়েছেন।

আর কিছু বলেন নি?

আপনি কেন লুকিয়েছিলেন, তাই বলুন।

লুকোব কেন। এই গুহার ভিতর গবেষণা করছিলাম।

কিসের গবেষণা?

খুড়া বলল : তবে আসুন ভেতরে।

গুহার ভিতরে এসে বললুম : বলুন এবারে।

এরা এই গুহার নাম বলছে অনন্ত গুহা। অনন্ত শব্দটা আছিতে হিন্দু। অনন্ত শয়ন, অনন্ত— বুঝেছি।

এই গুহাগুলি নাকি রাজা খারবেলার তৈরি। তিনি জৈন ছিলেন। কাজেই—

এ কথাও বুঝেছি।

এইবারে দেওয়ালের গায়ে দেখুন। বুদ্ধের মূর্তি।

তার মানে গুহা জৈন নয়। বৌদ্ধ।

আর এই ব্রাহ্মণ তেল সিঁদুর ফুল চন্দন দিয়ে হিন্দু দেব-দেবীর পুজো করছেন।

সে নিজের পেটের জন্যে, দেবতার জন্যে নয়। চলুন নিচে।

নিচে কেন?

আপনার দাদা-বউদি ব্যস্ত হয়েছেন।

ওঁদের চেয়ে তো আপনি বেশি ব্যস্ত হয়েছেন দেখছি। ওপরটা দেখব না? ওপর থেকে ভুবনেশ্বরের দৃশ্য?

আমি জানি আমার আপত্তি টিকবে না। তাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললুম।

উপরে উঠতে উঠতে খুড়া বলল : বড় বিপদে পড়েছেন মনে হচ্ছে।

তা একটু পড়েছি বইকি।

বিপদ কিসের?

এখন দেখতে পাচ্ছি যে কথাটা মিথ্যে নয়। যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যে হয়।

আমি কি বাঘ?

বাঘ বললে ব্যাকরণের ভুল হবে।

খুড়ার দৃষ্টিতে আমি ভৎর্সনা নয়, কৌতুকও দেখলুম।

খণ্ডগিরি পাহাড়ে যাঁরা উঠেছিলেন, তাঁরা সবাই নেমে গেছেন। এবারে গিয়ে উদয়গিরিতে উঠলেন। আমরা যে ক'জন উদয়গিরিতে প্রথম উঠেছি, সেই ক'জনই এখন খণ্ডগিরিতে উঠছি। আমাদের সঙ্গে আর কেউ নেই। মনে হল, তাঁরা অনেক নিচে আছেন। ধীরে ধীরে উঠছেন। বললুম : অকারণে দেরি করে উদয়গিরি দেখবার আর সময় পাবেন না।

কে বললে আমি অকারণে দেরি করেছি?

দুঃখিত। আপনি যে গবেষণাটা করছিলেন, সে কথা আমার মনে ছিল না।

কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে খুড়া বলল : সাবধান, এমন ভুল যেন আর না হয়।

হবে না।

খুড়া আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল।

এই হাসিকে আমি বড় ভয় পাই। বুকের ভিতরটা আমার কেঁপে উঠল। আমার অতীত তো আমি ভুলে যাই নি। ভুলতে পারি নে। ভুলে যাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি বিস্তর বার। এই হাসি দেখে নিজেকে হারালে আমার চলবে না।

খুড়া বলল : হঠাৎ বড় গম্ভীর হয়ে গেলেন যে ?

রামানন্দবাবুর কাছে আমি অপরাধ করছি।

কেন ?

আপনার জন্যেই ও ভদ্রলোক এদিকে এসেছিলেন। আর আপনি তাঁকে ফাঁকি দিলেন।

তাতে আপনার অপরাধ কি ?

আপনি আমার জন্যই তো তাঁকে ফাঁকি দিলেন।

আপনার জন্যে !

খুড়া সহসা ফিরে দাঁড়াল। তার দু'চোখের দৃষ্টি যেন জ্বলছে।

বললুম : ক্ষমা করবেন, আপনাকে আমি অপমান করতে চাই নি।

খুড়ার উজ্জ্বল দৃষ্টি নিমেষে নিবে গেল। কোন কথা কইল না।

এক সময় আমরা পাহাড়ের মাথায় এসে পৌঁছে গেলুম। খানিকটা খোলা প্রশস্ত স্থান। মন্দির পার্শ্বনাথের চারিদিক ঘিরে নিচু রেওয়াল। দর্শকরা স্বচ্ছন্দে এর ওপর বসে নিচের দৃশ্য দেখতে পারে। খুড়া বলল : আসুন, এই রেওয়ালের ওপর কিছুক্ষণ বসি।

উত্তর না দিয়ে আমি তার আদেশ পালন করলুম। খুড়াও বসল।

যেখানে আমরা বসেছিলুম ঠিক তার সামনেই উদয়গিরি। স্বর্গপুরী গুহা যেন দেখতে পাচ্ছি। অন্য গুহাগুলি পাহাড়ের অপর অংশে। এখান থেকে তা দেখা যায় না। তারপর পাহাড় শেষ হয়ে প্রান্তর। প্রান্তরের শেষে ভুবনেশ্বর শহর—নূতন রাজধানী আর অগণিত মন্দির। নিকটে কোন স্থানীয় লোক থাকলে সবই আমাদের চিনিয়ে দিতে পারত।

খুড়া বলল : এইতো, উদয়গিরি আমার এখান থেকেই দেখা হল।

বললুম : আমি দেখেছিলুম কলকাতা থেকে।

কি করে।

খবরের কাগজে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলুম—দেখে এলাম উদয়গিরি। কয়েক খানা ছবিও ছাপা হয়েছিল। বাকিটুকু 'মনসা' দেখলুম।

মনসা মানে ?

সংস্কৃত ব্যাকরণ বুঝি পড় নি ?

মনে নেই।

মনসা দ্বিতীয়ান্তং গচ্ছতি, কিসের উদাহরণ আমার মনে নেই। তবে এটি আমার বড় প্রিয় কথা। সুবিধা পেলেই ব্যবহার করি।

খুড়া বলল : বুঝেছি। মনে মনে ঘুরে বেড়াতে আপনি ভালবাসেন।

তাতে সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এই যে, দেশ দেখার কাজে পয়সা প্রতিবন্ধক হয় না।

তা না হলে কি—

শুধু আমার নয়, ভারতের লক্ষ কোটি মানুষের দেশ দেখা হয় না পয়সার অভাবে।

খুড়া প্রতিবাদ করল, বলল : আমার তা মনে হয় না। ভ্রমণ একটা শখের ব্যাপার। যাদের নেশা আছে, তারা ঘর ছেড়ে বেরবেই।

পয়সার অভাব থাকলে তারাই মনমা দেখে।

পয়সার অভাব একটা অজুহাত। আসলে পয়সার জন্যে কিছুই আটকায় না।

এটা পয়সাওয়ালা লোকের কথা। যাদের পয়সা নেই তাদের সবই আটকায় পয়সার জন্যে। পথের ধারে গাছের তলায় জীবনটাও আটকে যায়।

ঋতা বলল: এসব বইএর কথা। আর—

রাজনৈতিক দলের কথা।

ঠিক বলেছেন।

ঠিক বলি নি। যারা চোখ মেলে চলে, তারা সবাই সত্যটা দেখে। স্বীকার করে না সবাই। রাজনীতি সত্যকে আংশিক ভাবে স্বীকার করে। পুরোপুরি স্বীকার করলে দেশে দেশে বিদ্বেষ ছড়াত না। সত্য যে সব দেশেই প্রায় একরকম।

ঋতা এ আলোচনায় যোগ দিল না। শুধু গভীর ভাবে আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি দেখলুম, এতক্ষণে আরও কয়েকজন একে একে উপরে উঠে এলেন। আমাদের পাশাপাশি দেখে তাঁরা কী ভাবলেন তাঁরাই জানেন। এগিয়ে গেলেন মন্দিরের দিকে। ঋতা বলল: আমার একটা কথার উত্তর দেবেন?

এ ঠিক আপনার মতো কথা হল না।

প্রশ্নটাও ঠিক আমার মতো নয়।

সরাসরি জিজ্ঞাসা করুন, ভূমিকায় আমি ভয় পাই।

আপনার ক্ষতটা আপনি কেন ঢেকে বেড়াচ্ছেন?

আমি চমকে উঠলাম: কে বলল আমার ক্ষত আছে?

বুকের কাছটা যে রক্তে ভিজে গেছে।

আমি জানি, এ ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হয় না। তবু আমার দৃষ্টি চকিতে বুকের উপর পড়ল। রক্ত কেন, কোন চিহ্নই নেই গায়ের জামায়। মুখ তুলতেই ঋতা হেসে উঠল খিলখিল করে। বলল: আমার কাছে আপনি কিছুই লুকোতে পারবেন না।

লুকোবার নেই যে কিছু।

এ নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করব না। নিজের ধারণার কথা আপনাকে জানিয়ে রাখলুম।

ধন্যবাদ।

যাঁরা মন্দির দেখছিলেন, তাঁরা পার্শ্বনাথের মূর্তি দেখে অন্যত্রে সরে গেলেন। এঁদের পিছনে লাগলেও আমাদের চলবে। অন্যদল এতক্ষণে উদয়গিরির গুহা দেখা শেষ করেন নি। তাড়াতাড়ি ফিরে এলেও বাসে তাদের অপেক্ষা করতে হবে। সবাইকে না নিয়ে বাস ছাড়বে না। দ্রষ্টব্য স্থান আর আমাদের বেশি নেই। ধৌলির পাহাড় হয়ে ভুবনেশ্বরে ফিরব। রাজারাণীর মন্দির দেখব পথে। তারপর লোজা রাস্তায় পুরী। সন্ধ্যার আগেই যে আমরা পৌঁছে যাব, তাতে সন্দেহ নেই।

বলার কথা আমি খুঁজে পাচ্ছিলুম না। ঋতাও চুপ করে আছে। সময় যেন আর কাটছে না। শেষ পর্যন্ত আমিই বললুম: এবারে তাহলে ওঠা যাক।

উত্তরে ঋতা হাসল, কিন্তু উঠবার কোন চেষ্টা করল না।

বললুম : হাসলেন যে ?

আপনার কাণ্ড দেখে।

সে আবার কী ?

হাসতে হাসতেই ঋতা বলল : পুরুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা এই যে, মেয়েদের সামনে, তারা পুরুষ সাজে।

মানে ?

মানে খুবই সোজা। এই মুহূর্তে আপনি যদি নিজেকে পুরুষ না ভেবে মানুষ ভাবেন আর আমাকে ভাবেন আর একজন মানুষ, তাহলে দু'জনের সঙ্কট এখনি পালটে যায়। আমরা অন্তরঙ্গ হতে পারি বন্ধুর মতো।

আমার মনে হল ঋতা খুব সত্য কথা বলছে। তাই কোন কথা না বলে তাকেই বলবার অবকাশ দিলুম।

ঋতা বলল : পুরুষ ও নারীর মধ্যে শুধু মা বোন কন্যা ও প্রিয়ার সম্পর্ক নয়, সবচেয়ে বড় সম্পর্ক হল বন্ধুর সম্পর্ক। অথচ এই সত্যটি আমরা সব সময় অস্বীকার করি। এ সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে অনেক কথা আছে, অনেক বড় বড় মূল্যবান কথা। কিন্তু সবচেয়ে সাধারণ কথাটি নেই। পুরুষে পুরুষে যদি বন্ধু হতে পারে, নারে মেয়েতে মেয়েতে, তবে পুরুষে মেয়েতে কেন পারবে না ? সমান অধিকারের জন্যে আমরা আন্দোলন করছি, বন্ধুভাবে মেলবার জন্যে তো কোন দাবি জানাচ্ছি না।

এই ধরনের কথা আমি উপন্যাসে পড়েছি। কিন্তু নিজে কোনদিন উপলব্ধি করি নি। বললুম : শুনতে মন্দ লাগছে না।

ঋতা বলল : এ কথা মেনে নিলে আরও ভাল লাগবে। অন্তত আরাম যে পাবেন, তাতে আমার সন্দেহ নেই।

মিত্রার কথা আমার মনে পড়ল। দিল্লিতে সে এই কথা বলত। অন্তত এই যুক্তি দেখিয়ে চাওলাকে সে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। বললুম : এই কথা আমি রাজস্থানীতে একবার শুনেছিলুম। ব্যানার্জি সাহেবের মৌখিন মেয়ে মিত্রা এই কথা বলত। যাকে বলত, সে এ যুক্তি মানতে রাজী ছিল না। তার উত্তরটা খুব সভ্য হত না।

অশ্লীল না হলে বলতে পারেন।

বলত, পুরুষের প্রেম ঠিক বাঘের লোভের মতো।

প্রেমের কথা কেন উঠছে, আমি তো ওইটেই বাদ দিতে বলছি।

সাধু। এ হল তপস্বীদের কথা। কিন্তু তাদেরও তপোভঙ্গ হয়েছে। বিশ্বামিত্রের মতো অবরুদ্ধ ঋষিও দু'বার এ কথা ভুলেছিলেন। ভুলিয়েছিল একবার মেনকা, আর একবার রম্ভা। মেনকার গল্প সকলের জানা, রম্ভার কথা গোপন আছে। কেন না শকুন্তলার মতো কোন কন্যার জন্ম হয় নি।

আপনি তামাশা করছেন।

তামাশা নয়। মিত্রা চাওলাকে বিয়ে করেছে কিনা এখনও খবর পাই নি। সে খবর পেলে তামাশা করব।

ঋতা বলল : আমার যুক্তিতে কোন অসঙ্গতি আছে ?

নেই।

তবে।

সম্প্রতি একটু বেশি আছে বলেই ভয়ের কথা।

একটু বুঝিয়ে বলবেন।

বোঝাবার চেষ্টা করব। কিন্তু অপরাধ নেবেন না।

না।

আপনি নহ মাতা, নহ কন্যা। কিন্তু সুন্দরী রমণী। আপনার ইচ্ছামতো অনুসারে আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুর সম্পর্ক হতে পারে, বোনের নয়। জেনে নিলুম। ধীরে ধীরে আমাদের বন্ধুর সম্পর্ক বড় অন্তরঙ্গ হল। মনে রাখবেন, আমরা দু'জনেই অবিবাহিত। আপনার বউদি আমাদের মেলামেশা ভাল চোখে দেখছেন না। তার প্রধান কারণ আমি বেয়ানী। যদি কলকাতায় কারবারি হতুম, তা হলে নয়তো বিয়ের প্রস্তাব করতেন। এক্ষেত্রে তিনি অন্তের সঙ্গে আপনার বিয়ের চক্র ধরে পড়ে লাগবেন, এবং আপনার জীবনই বিপন্ন করে তুলবেন।

বুঝেছি।

আমি জানতুম, আপনি বুঝবেন। রবীন্দ্রনাথও বুঝেছিলেন। তাই তাঁর শেষের কবিতায় শেষটা কান্নার মতো শুনিয়েছিল।

ঋতা হেসে উঠবার চেষ্টা করল, কিন্তু তার হাসিতে আর সে প্রসন্নতা নেই।

যাত্রীদের সেই ছোট দলটি নেমে যাচ্ছিল। একজন জিজ্ঞাসা করল: ওধারের হনুমানটা দেখেছেন তো?

আমি চমকে উঠলুম। ঋতাও। উঠেও দাঁড়ালুম দু'জনে। ঋতা নামতে যাচ্ছিল। বললুম ওধারটা ঘুরে চলুন।

ঋতা হাসল। কিন্তু আমি হাসতে পারলুম না। আমি হাসলুম সেই হনুমানের বিরাট কালো মূর্তিটি দেখবার পর। ওই মূর্তিটি না দেখলে নিজেকে বড় অপরাধী মনে হত।

[ক্রমশ

The decline of literature indicates
the decline of a nation ;
the two keep pace in their
downward tendency.

—*Goethe.*

In literature to-day, there are
plenty of good massions but few
good architects.

—*Joucent.*

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

পরিস্থান ও শার্ল পেরো ॥

সূর্য মিত্র

'নার্সারি আর ছোটোবেলা ছাড়া রূপকথাকে আর কোনো বিশেষ স্থানে-কালে আবদ্ধ করতে পারা যায় না,'—এই কথাটা রূপকথার প্রসঙ্গে এতবার উচ্চারিত হয় যে তাতেই শৈশবের সঙ্গে রূপকথার অচ্ছেদ্য এবং নিবিড় সম্পর্ক প্রকাশিত হয়ে যায়। গত দেড়শো বছর ধ'রে অনেকেই এ-সম্বন্ধে নানাবিধ গবেষণা করেছেন; কিন্তু তাঁরাও এমন কোনো সংগত কারণ আবিষ্কার করতে পারেন নি যা সরাসরি এই প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধতা করতে পারে; বরং, অন্ত পক্ষে, আশাকে সার্থক ক'রেই, তারাও নার্সারির সঙ্গে রূপকথার ঘনিষ্ঠতাকে আরো নিবিড় করেছেন।

১৮১২ সনে গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয় যখন তাঁদের সংগৃহীত রূপকথার প্রথম সংকলন প্রকাশ করেছিলেন—সে হ'লো শার্ল পেরোর শতবর্ষকাল পরের ঘটনা—তখন তাঁরা এই রূপকথাগুলিকে সমগ্র ও বিপুল জনবাসীর কথকতার ঐতিহ্যের অন্তর্গত ব'লে গণ্য করেছিলেন। এই উপাদান থেকেই জাতির আত্মিক ইতিহাসের একটি বিশ্বাসযোগ্য খসড়া তৈরি করেছিলেন তাঁরা; কেননা যেহেতু যুগের পর যুগ সমষ্টিগতভাবে লোকমুখে এইসব রূপকথা ঘোরাফেরা করেছে, তখন যথেষ্ট পরিমাণে চোখ কান খোলা রেখে এই ঐতিহ্যের দিকে মনোনিবেশ করলে জাতীয় মানসিকতার একটি বিশেষ ভঙ্গিমাকেই পুনরুদ্ধার করা যাবে ব'লে তাদের বিশ্বাস ছিল। রূপকথাগুলি আসলে হ'লো মস্ত এক মৌলিক উপকথার ছিন্নবিচ্ছিন্ন অংশ, মূল উপকথার চেহারা হয়তো হারিয়ে গিয়েছে, নয়তো বিস্মৃতি এসে গোপন করেছে তাদের নিগূঢ় অর্থমত্তা—এই কথা ভেবেই তাঁরা সুশৃঙ্খলভাবে ভিন্ন এক গবেষণার পৃষ্ঠপোষণ করেছিলেন।

একে যদি সূচনা ব'লে মেনে নিই তো লোককথা বিষয়ে গবেষণা যে উনিশ শতকে প্রচুর, সংখ্যক শিক্ষিত বিজ্ঞানীর সাহচর্য লাভ করেছিলো, সেই তথ্যটিও এখানে উল্লেখ করতে হয়। যন্ত্র যেশেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো 'ফোক-লোর সোসাইটি': এক নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পৃথিবীর লোককথা সংগৃহীত হ'লো তাদের দরুণ কথকের মুখ থেকে, হ'লো তালিকাবদ্ধ, সংশ্লিষ্ট এবং বিশ্লেষিত, আর বিভিন্ন কথা মালার মধ্যে আবিষ্কৃত হ'লো অন্তর্লীন এক নিকট-আত্মীয়তা, নানারকম কাটাকুটি নকশা তৈরি ক'রে বিচিত্র যোগসূত্রকেও আবিষ্কার করা গেল ভিতরে ভিতরে। এই জ্ঞানকর্ম, এবং তার ফলে সৃষ্ট লোককথার সংকলনগুলি, আমাদের কাছে কিন্তু তাদের স্বীয় মূল্যেই চিত্তাকর্ষক ও কৌতূহলোদ্দীপক ঠেকে। অন্তরালে প্রচ্ছন্ন অর্থবত্তার জন্যও তারা আরো উদ্দীপক। এ-কথা সমর্থন করার জন্য খাড়া করা যায় 'লুপ্ত মহাদেশ কি যাযাবর বৃত্তির' বিরোধিতাকে; স্থাপত্যকর্ম কি বৃৎপিত্তের মতো লোককথার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাও অতীত সম্পর্কে বাঙ্ময় ও উদ্ভূত। সিনডেরেলার উপাখ্যান যুগপৎ দক্ষিণ আমেরিকার লাল মানুষদের মধ্যে ও পলিনেশিয়ায় পাওয়া গেছে—এই তথ্য থেকে আমরা একটি প্রাকল্পিক সিদ্ধান্তের সাহায্যে বলতে পারি যে তাতেই প্রমাণিত হয় কনটিকি অভিযানের সত্যতা এবং তার সঙ্গে অনায়াসেই যোগ করা যায় লুপ্ত মহাদেশ আটলান্টিকের অস্তিত্ব। যদি দুটি আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য বাপ-মতো মিলে যায় তো তা হয়তো প্রমাণিতও হবে। বিভিন্ন সংস্করণকে বৈধরিক ও প্রশাসনের দিক থেকে এমন সমৃদ্ধ হ'তে হবে যে, বিভিন্ন উৎসের সম্ভাবনাকে যাতে একেবারেই বাদ দেয়া চলে, আর তখনি অনায়াসে নিশ্চিত হওয়া যায় যে ঐতিহাসিক

যুগে য়ুরোপীয়দের সঙ্গে 'প্রথম' সংস্পর্শে আসার আগেই দু'জায়গাতেই এর অস্তিত্ব ছিল। জাহাজডুবির পর একমাত্র জীবিত নাবিক, কিংবা প্রথম কোনো একলা মিশনারি অবশ্য একাই এতটা যথেষ্ট যে, এমন ভিত্তির উপর প্রস্তুত যাযাবর-বৃত্তির বিয়োরির অস্তিত্বকে তাসের কেল্লার মতো চুরমার ক'রে দিতে পারে।

একবার যদি ভাষার বিভিন্নতার অন্তর্বিরোধকে জয় ক'রে নেয়া যায়, তা হ'লে রূপকথাই হ'লো আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বহনযোগ্য ও ফলপ্রসূ এবং শিল্প চরিত্রের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রেও সহজতর। গত শতাব্দীর শেষভাগে, লোকগাথার ফরাসী ছাত্ররা, অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে সাগ্রহে লক্ষ্য করেছিলো যে মাদাগাস্কারের কতকগুলি লোকগাথার সঙ্গে দেশজ লোককথা হুবহু মিলে যাচ্ছে। এই আবিষ্কার—তখন মনে হয়েছিলো—উত্তরেরই কোনো ভারতীয় কি আরব্য উৎসের দিকে তর্জনী নির্দেশ করছে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই এ-বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ হওয়া গিয়েছিলো যে আসলে এরা ফরাসি গল্পই, সপ্তদশ শতকে দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপনের পর নিশ্চয়ই কোনো সময়ে তা নীত হয়েছিলো এবং বহিরঙ্গের দিক থেকে এমনভাবে বদলে গিয়েছিলো যে তাদের সেই অঞ্চলের অন্য এক রূপকথা ব'লে মনে হওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক ছিলো না। আবার, মাদাগাস্কার থেকে অনায়াসেই তারা মূল ভূখণ্ডে পৌঁছুতে পেরেছিলো, এবং এই পথ দিয়েই অন্য অনেক অঞ্চল পেরিয়ে তারা ছড়িয়ে পড়েছিলো আফ্রিকায়। কাজেই যে নৃতাত্ত্বিক 'পাস-ইন-বুটস'কে হটেনটটের অধিবাসী কি হাবাশিদের মধ্যে পেয়েছিলেন, তাঁকে শেষ পর্যন্ত অনেক মাসের শ্রমক্লান্ত গবেষণার পর স্বীকার করতে হয়েছিলো যে আসলে শার্ল পেরোই এদের উৎস হিসেবে বিরাজ করছেন।

রূপকথা—মায়াবী উপাখ্যানে তৈরি ব'লে যারা পরিচিত, এবং ভাষুমতীর ইন্দ্রজাল যাদের অন্যতম সম্পদ হ'লো কথা ও কাহিনীর মধ্যে বোধ হয় একমাত্র বিশ্বজনীন ; সেখানে দেবতার আবির্ভাব হয় না, কারণ তা হ'লে তা মিথ বা পুরাণ হয়ে দাঁড়াতো,—আবার ভূতেরও না, কারণ ভূতুড়ে উপাখ্যান একে সরাসরি একেবারে মৃত্যু-উপাসকদের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে দিতো। কিন্তু বিবরণের ও শিল্পিতার ভিতর কখন বিশ্ব-জনীনতা আসে? যখন পর্যটক কিংবা মিশনারিদের সঙ্গে যোগাযোগের সম্ভাবনাটুকুও আমরা দেখতে পাই না, তখন বিভিন্নজনের মৌলিক কল্পনাপ্রবণতার সাদৃশ্যে বিশ্বাসী না হয়ে আমাদের উপায় থাকে না। রূপকথার মধ্যে নাকি অবচেতন ও মনচেতনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে যায়—এই কথাই বলা হয় আজকাল ; এই থিয়োরি অবশ্য একেবারে ফ্যালনা নয়। কেননা ছোটদের ক্ষেত্রেও, বড়োদের মতোই, পরি জাদুকরা বা ডাইনিদের আপাতনিরর্থক কর্মকলাপ অবচেতনের আশাআকাঙ্ক্ষা ও চিন্তাভাবনার সাংকেতিক অনুবাদ হয়ে দাঁড়ায়—আর তার ফলেই ওই থিয়োরির সঙ্গে তার মিলটা চোখে প'ড়ে যায়। মানবস্বভাব সর্বত্রই এক—এই সিদ্ধান্ত অবশ্য এ-কথাই বলে যে তার বহন বিভিন্ন দেশের রূপকথার গায়ে দেশকালের চিহ্ন বিদ্যমান হ'লেও মূলত অর্থাৎ অন্তঃসারের দিক থেকে একই রকম হবে। এর জটিল শিকড় মানুষের ধ্যান ধারণার এত গভীর প্রদেশে অনুপ্রবিষ্ট যে, তার ফলে তা যে কেবলমাত্র বিশ্বজননীনই তা নয়—সেই সঙ্গে আবার মৃত্যুহীনও।

তাই রূপকথাকে একাধিক সাংকেতিক অর্থে ব্যাখ্যা করাটা মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু একটা জিনিস সব রূপকথাতেই প্রচ্ছন্ন থাকবে : পরির অস্তিত্বে বিশ্বাস। কখনো কখনো এই পরিচারিত্র ঐন্দ্রজালিক, কি ডাইনি কি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পশুপাখির চেহারাও নিতে পারে। স্বাভাবিক জীবের মতো দেখতে হ'লেও এরা স্বাভাবিকের চেয়ে আলাদা কেবল জাদুর জোরে। কখনো আবার এই মায়াবি শক্তি

মুখ থাকে অরূপদার্থেও, যেমন 'মু-বেয়ার্ড'-এর চাবিতে বা 'একুশ বাইল জুতো'র। 'আয়াময়' ব'লে বিকৃত হয় এরা—পেরোর কথায় lee। মানবজাতির আশপাশেই অথন পরিচারিত্র সংবলিত একদল জীবের বসবাস—এই কল্পনাবিলাসের চেয়ে পেরোর কথা অনেক বেশি সুবোধ্য।

বামনদের অস্তিত্বের পিছনে যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা হ'লো : একদা একদল বামনজাতীয় লোক সত্যিই গ্রামে নগরে বাস করতো; কালক্রমে তাদের চেয়ে ঢের লম্বাচওড়া, উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ারে সজ্জিত প্রমাণ মাপের মানুষদের দ্বারা তারা বিতাড়িত হয়ে গেল; এবং তাদেরই ধূসর, সুদূর ও অস্পষ্ট স্মৃতি রূপকথার বামনদের ভিত্তিমূল। গভীর জঙ্গল, পর্বতের গুহা এবং অন্যান্য গোপন ও জনহীন স্থানে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো তাদের—শেষে সেখানেই এই ছিন্নবিচ্ছিন্ন বামনজাতি ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এমন ঘটনা যদি সত্যি ঘটে থাকে তো সে কতকাল আগে, এবং তাদের স্মৃতিই বা কেন এমনভাবে মানুষের মনের মধ্যে গোপন ভাবে ক্রিয়া করে—এ-সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। তবু, অতি চালাকির অর্ধেকও হবে না যদি বলি যে, এ-হ'লো সারা গোষ্ঠীর গূঢ় অপরাধবোধ,—সংখ্যায় বেশি ব'লে গায়ের জোরে অধিকতর বুদ্ধিমান কোন গোষ্ঠীকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এক অবচেতন অনুতাপের প্রমাণ। তা ছাড়া সকল পরিই আকারে ছোটো নয়। মধ্যযুগীয় পরিদের অনেকেই—সম্ভবত তারা হোমর-বর্ণিত মায়াবিনী কির্কীর উত্তরপুরুষ—ছিপছিপে লম্বা ছিলো, রজনীগন্ধার ডাঁটির মতো, আর ছিলো সুন্দর। এ-কথা নিশ্চয়ই আরো যুক্তিসিদ্ধ হবে যদি বলা যায় য়ুরোপের পরিরা সবাই হ'লো প্রতিমাপূজকদের গোপন অস্তিত্বের নিদর্শন, খ্রীস্টধর্ম যাদের কালক্রমে দেশচ্যুত করেছিল। এ-সব কথা যে সাম্প্রদায়িকতাকে স্পর্শ করে, তা অবশ্য বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু যে-ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার তামসিকতার কুহকের বিরুদ্ধে খ্রীস্টানেরা প্রবল লড়াই চালিয়েছিলো, সে-ক্ষেত্রে রূপকথার ভিতর তাদের আনাগোনা দেখেও খ্রীস্টধর্ম কেন বলম তোলে নি—এটাই এক পরম আশ্চর্য। সে যেন কোনো তোয়াক্কা না-ক'রে নির্বিকারভাবে একে এড়িয়ে গেছে, আর রূপকথার সুপ্রাচীন অস্তিত্বের সপক্ষে তা-ই হ'লো সবচেয়ে জোরালো যুক্তি।

অনেক রূপকথা থেকেই প্রাচীন পর্ব-পার্বণ কি উৎসবের চেহারার একটা ধারণা করা যায়, বিশেষ ক'রে যে-সব গল্প ঋতু-উৎসব কি পূর্বপোসনার সূত্রধার। পরিরা তখন ছিলো উপদেবতা—অনেকটা nature-spirit-এর মতো—কোনো বিশেষ স্রোতস্বিনী, বিল বা জঙ্গলের অধিষ্ঠাত্রী যেন। প্রকৃতি যেখানে বিমুখ ও বিরূপ, সেখানে তারা হয়ার অবতার। জীবনধারণ যেখানে দুরূহ এবং জটিল সেখানে তারা শত্রুর মতো নির্দয়, যেমন স্ক্যান্ডিনেভিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে। উপরন্তু এই উপদেবতার মধ্যে যারা খনির মালিক, চেহারায় বামন, ইংরেজিতে যাদের gnome বলা হয়, তারা যন্ত্রমতো সন্দেহজনক মেজাজের লোক। ধাতুময় তাদের পাতালরাজ্য, বহুমূল্য; অন্তত সেই রাজ্যের হাতুড়ির একটানা আওয়াজ এবং সুড়ঙ্গপথে তাদের আচমকা অদৃশ্য হবার সেই 'অলোকসম্ভব' ব্যবহার—তা-ই থেকে তাদের খনিক ব'লে মনে হয়, কেন না অনেক সময়েই দেখা যায় যে তাদের আচার-ব্যবহার আঞ্চলিক জনসাধারণের চেয়ে কোনো অংশেই পৃথক নয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও gnome বোধহয় খনিকদের ভ্রান্তধারণার অতিরিক্ত কোনো-কোনো গুণপনা নিয়েই রূপকথায় দেখা যেত, পৃথিবীর তলায় কী আছে, পাতালরাজ্যই বা কী নিয়ে গঠিত—এই সব জিজ্ঞাসা বোধ করি সর্বদাই কুসংস্কারভরা কল্পনাশ্রমণকে উৎসাহিত করতো।

আসল পরিদের কিন্তু আরো একটা কাজ ছিলো। মানসিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে তারা যতটা অন্তরঙ্গভাবে জড়িত ছিলো, উপদেবতারা কিন্তু মোটেই ততটা ছিলো না। জন্মদিনে কি বিবাহের শুভলগ্নে

আসতো তারা। সঙ্গে যে উপহার নিয়ে আসতো, নবজাতকের জীবনে তা সুনিশ্চিত প্রভাব ফেলতো—এমনকি তার ভাগ্যকে পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করতো। এই ধরনের 'ধাত্রীজাতীয় পরি'কে অনায়াসেই অধিকতর খ্রীষ্টীয় পরি ধর্মমা-র সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা গেলেও তারা আসলে প্রাক-খ্রীষ্টীয় ক্রিয়াচেতনারই অন্তর্ভুক্ত, ফরাসিদেশের গ্রামাঞ্চলে ও অন্যত্র যা বহু শতাব্দীকাল জীবিত ছিলো। তারা যেন আসলে ছোটোখাটো একেকজন আক্ষরিক বিধাতানিয়তি, প্রক্রিয়া—বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে জনমানবের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে, কিংবা যেন এক বিরাট পরিবারের [একজন পরিকে পোষার সাধ্য ও ক্ষমতা যে পরিবারের আছে] যারা সর্বস্ব সংরক্ষিত এবং নিজস্ব ব্যবহারের জন্য এক সম্পত্তি। অতীতকে বিশ্লেষণ করলে শব্দতত্ত্বের সাহায্যে এই ধারণাকেই সমর্থন করা যায়। ফরাসি Fee শব্দটি লাতিন Fata থেকে আহরিত [যার মানে হ'লো 'things fated', কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গ একবচনরূপেই তা গ্রাহ্য]। ইতালীয় শব্দ হ'লো Fata, স্পানিয়ার তাকে বলে Hada, আর আলেমান Fee ফরাসি থেকেই নেয়া।

এমন বিশ্বাসের বহু চিহ্ন এমনকি পেরোতেও পাওয়া যায় : 'নিদ্রিতা' আর 'রিকির' জন্মের সময় পরিরা এসেছিলো। আরো অনেক পরিজনোচিত ঐতিহ্যের ইঙ্গিতও ইতস্তত ছড়িয়ে আছে, একথা যা হয়তো কোনো যুক্তিবদ্ধ বিচারের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। 'নিদ্রিতা'র শেষ পরি দুষ্ট পরির অভিশাপকে কথঞ্চিৎ অকেজো করতে পারে কিন্তু একেবারে নাকচ করার ক্ষমতা তার নেই। 'রিকির' জন্মদিনের পরি রাণীর বড়ো মেয়েকে বুদ্ধি দিতে পারে না, কিন্তু 'রূপের কথা উঠলে সব কিছু করতে পারে'। 'Hop o' my thumb'-এর মধ্যে নির্বোধ বাবার জুতোর ব্যাপার আরো অদ্ভুত ; আশ্চর্যরকম নির্বিকার গলায় পেরো বলেছেন, 'এ হ'লো একদম বাইল জুতো'। জুতো যারই পায়ে থাকে সে অনায়াসেই জল-নদী-পাহাড় সব কিছুর উপর দিয়ে যেতে পারে, কিন্তু এই অদ্ভুত ব্যাপারটিকে যুক্তিযুক্ত করার জন্য ক্ষুদ্রতম মন্তব্যও করা হয়নি। কিন্তু জুতো যখন ফুঁচকে গিয়ে 'Hop o' my thumb'-এর আকার নিলো, তখনি এই বিশেষ ঐন্দ্রজালিক শক্তির পিছনে একটি বিশেষ ব্যাখ্যা রচিত হয়ে গেল।

প্রাপ্ত রূপকথাগুলির ভিতর সত্যিকার লোককথার ক'কৌটো চিহ্ন আছে আর এর কতটাই বা প্রাচীন ধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রতিবিম্ব—এই সব প্রশ্ন গ্রিমভ্রাতাদের কাল থেকেই আরো জটিল চেহারা নিয়েছে। এখন তো এ কথা অতি স্পষ্ট যে, অন্তত মুদ্রণের প্রচলন যে-কালে হ'লো, তখন থেকেই বিশুদ্ধ মৌখিক ঐতিহ্য থেকে আত রূপকথার অস্তিত্ব সুদূরপরাহত অসম্ভব হয়ে গেছে। মুদ্রণের আবিষ্কারের পরেও বিদগ্ধজনই যদি বাইবেলকে তাঁর একচেটে এক্তিয়ারে রাখতে চেষ্টা করেন, তবু এমন ঘটনা অচিরেই ঘটে যাবে যে, কোনো-না-কোনো গ্রামবাসী কোনো একদিন শহরে গিয়ে বাইবেলওলা লোকের সংস্রবে আসবে। মুদ্রিত গ্রন্থের প্রভাব রূপকথার উপর সর্বদাই কাজ করে : নিদেন দ্বিতীয় কি তৃতীয় উচ্চারণেই রূপান্তরের চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এভাবে বলাতে বলাতে অচিরেই গল্প হয়তো এমন এক রূপান্তরিত চেহারা নিয়ে নিলে, যার ফলে তাকে সনাক্ত করাই অতীব মুশকিলের ব্যাপার হয়ে উঠলো ; অনেক ক্ষেত্রেই তার গায়ে এমন সব স্থানীয় রং ও চিহ্ন লেপটে যাবে যা হয়তো 'মুদ্রিত' উৎসের চাইতেও বহু অংশে উৎকৃষ্ট হয়ে উঠবে। বিশুদ্ধ লোকায়ত উৎপাদন হিসেবে তার অস্তিত্ব তখন একেবারে কল্পনাতীত। পেশাদার কথক মারফৎ কিংবা কেল্লা বা মঠের ভাণ্ডারে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির মাধ্যমে মধ্যযুগেই গ্রীস, রোম ও ভারতের গল্প জনসাধারণের মধ্যে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিলো। অটিল বীপখানা বা ওই ধরনের কিছু কিছু বিভিন্ন বিরল কেলা ভিন্ন লিখিত ও কথিত গল্পের মধ্যে দীর্ঘরেখা টানা মোটেই বাস্তবানুগ নয়। স্বাভাবিকভাবেই তারা একে অন্যের উপর প্রভাব ফেলে।

মনোযোগ সেই কারণেই নিবিষ্ট হয় গল্প লেখকদের উপর। সেখান থেকেই তাঁরা বৈষয়িক উপাদান সংগ্রহ করুন না কেন, আপন ব্যক্তিত্বের স্পর্শে তা তাঁরা চিহ্নিত ক'রে রাখেন। এ তো অবশ্যম্ভাবী, কেন না মূলত তাঁরা তো শিল্পী—ফলে তাঁরা যে রচনার প্রকরণে তাঁদের সমস্ত সাধ্য প্রয়োগ করবেন, তাতে আশ্চর্য কিছুই নেই। গল্পের মূল সৌরভ যে মায়ানির্ভর ও ঘটনাভিত্তিক প্রতীকী রীতি, তা হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ নষ্ট হয় না; কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হয় উপাখ্যানের পক্ষে জরুরী ক্রিয়াকৌশল, যা নিতান্তই প্রাতিষ্ঠিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক। এ-কথার সত্যতা পরখ ক'রে দেখার সহজতম উপায় হ'লো কোনো পরিচিত পাদপার্শ্বকে উপজীব্য ক'রে গল্প বানাতে বলা; যেমন একটি পৌরাণিক স্তোত্রকে নেয়া যাক। হয়তো শুরু করতে হবে এই ব'লে: 'ছিলো এক লোক, যে কিনা একবার লোকের খাবার মধ্যে পড়েছিলো ...' মূল গল্পের অন্তরাকে বজায় রাখার যতই চেষ্টা করা যাক, এমন সূচনা থেকে বহু বিভিন্ন রচনা জন্মাতে পারে। বহু রূপকথাতেই হয়তো পৌত্তলিকদের পাদপার্শ্বের সৌরভ পাওয়া যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা থাকে নিতান্তই উপাদেয়ের অবস্থায়। এখন আর গল্পের সার্বিক আবেদনের মূল কারণ তারা নয়—বরং এখন পুরো গল্পটাই আমাদের বোধের কাছে উপাদেয় ও উপভোগ্য সামগ্রী—তারা কেবল গল্পটার একটি অংশ মাত্র, এই তাদের মূল্য।

য়ুরোপের সর্বাধিক পরিচিত ও শ্রেষ্ঠ রূপকথাগুলি এসেছে তিনটে মুদ্রিত উৎস থেকে: শার্ল পেরো, গ্রিম-ভ্রাতৃদ্বয়, ও হান্স ক্রিশ্চিয়ান আণ্ডেরসেন। ১৬৯০ সনের কাছাকাছি কোনো এক সময়ে পেরো মার্জিত ও শিক্ষিত ফরাসিজনের উপভোগের জন্য রূপকথা লিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর কথামালার ভিতর ঐতিহ্যসিদ্ধ কথনভঙ্গিমার প্রতি আনুগত্য অতিশয় স্পষ্ট: তাঁর উদার মানসতা তাকে ত্রুটিহীন সম্মান দেখিয়েছিলো। উনিশ শতকের প্রথমভাগে গ্রিম-ভ্রাতাদের মানসতা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিলো। তাঁরা নিজেদের দেখেছিলেন এক কথক ঐতিহ্যের অবধারক এবং সংকলক হিসেবে। সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব'লে লোকমুখ থেকে প্রাপ্ত যে-পাঠটিকে মনে হ'তো, তাকেই তাঁরা গ্রহণ করতেন। কিন্তু তাঁদের সংগৃহীত অনেক গল্পই এমন লোকের কাছে থেকে শোনা, যে ইতিপূর্বেই গল্প-বলিয়ে হিসেবে নামডাকা হয়েছে, গল্প, বানাবার সব কলকব্জা আয়োপাত্ত জানা, এবং যে-হয় তো সেইজন্যই প্রসাধিত করেছে মূলকে. হয়তো গল্পের ভিতরে নতুন কোনো রহস্যের অর্থময়তা আনবার জন্য তাকে বৈষম্যকারে গল্পের সব টানাপোড়েনকে বদলাতে হয়েছে। যদিও গ্রিমদের বইতে কোনো কোনো গল্পের একাধিক চেহারা পাওয়া যায়, তবু মানতেই হয় তাঁদের সংকলনের আয়তন অতিশয় বিপুল। তাঁদের ওই মস্ত সংকলনের পাশে শার্ল পেরোর ক্ষুদ্রকায় পুস্তিকাটি হয়তো মোটেই দাঁড়াতে পারে না, কিন্তু তবু কেবলমাত্র শিল্পিতার জন্যই পেরোর বইটি গ্রিমদের পাশেই নিজের স্থান ক'রে নিতে পারে। যেহেতু মুদ্রিত গ্রন্থের প্রভাব সীমান্তকে অনেকটা প্রসারিত ও বিস্তারিত করতে পারে, সেই জন্যই এটা বলা ভালো যে, জার্মেনিক ভাষার অনেক রূপকথাই পেরোর চেয়ে আদিম মনে হ'লেও সর্বত্র এই ফরাসি পুস্তিকার চেয়ে প্রাচীন নয়। ফরাসিজনের চিরন্তন বন্ধুর রচনা রাইনের উত্তর তীরে কর্কশ ও কাঠখোট্টা হবার প্রচুর সময় পেয়েছিলো, আর পেয়েছিলো গল্পের ভিতরে এক রহস্যময় উচ্চারণ ও প্রতিধ্বনি তৈরি করার উপযোগী সময়।

আর হান্স আণ্ডেরসেন সম্বন্ধে প্রাথমিক কথা হচ্ছে এই যে, ছেলেবেলায় শোনা কতিপয় দিনেমার লোককথাকে তিনি সংকলিত করেছিলেন বটে, কিন্তু প্রধানত তিনিই বোধহয় য়ুরোপের একমাত্র মৌলিক রূপকথাকার। বলা বাহুল্য, অস্কার ওয়াইল্ড, সেলমা লাগেরলোফ, টলস্টয় কি আরো দু-একজন কিছু কিছু মৌলিক রূপকথা লিখেছিলেন। কিন্তু সংখ্যায় হান্স আণ্ডেরসেনের রূপকথা হ'লো সকলের বেশি, এবং

রূপকথা ছিলো তাঁর আত্মপ্রকাশের নির্ভীক ও অকুণ্ঠিত বাহন ও উপায়। আর অল্প যে কয়েকটি সিনেমার লোকপাথা তিনি লিখেছিলেন। তাও তিনি পেরোর চেয়ে অনেক বেশি সংস্কৃত ও মার্জিত করে নিয়েছিলেন: এমনভাবে তিনি ওই কাজ সম্পন্ন করেছিলেন যে তা আসলে শেষ পর্যন্ত মৌলিক রূপকথারই চেহারা নিয়ে ফেলেছিলো। [দ্রষ্টব্য: 'হ্যামলেট': বুদ্ধদেব বসু প্রণীত (অমৃত, শারদীয় ১৩৬৮) এবং 'কোন পরিমল পবনে' : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত (মাসিক বসুমতী ১৩৬৮)]। উপরন্তু অন্তদেশের রূপকথাকেও তিনি গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন। চার্লস ডিকেন্সের সমকালীন, হান্স আণ্ডেরসেন যখন তাঁর ব্যক্তিসত্তার স্পর্শে রূপকথাকে সমৃদ্ধ করছিলেন, তখন লোককথা বিষয়ে, পড়াশোনা, গবেষণা, ও বহু সংকলন প্রকাশের ধুমধাম উৎসব শুরু হয়ে গেছে। যাঁরা এ-সব কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের বিচারের মাপকাঠি ছিলো চুলচেরা; এবং তাঁদের মনোযোগ নিবিষ্ট ছিলো কাঁচা কর্কশ ও অসংস্কৃত উপাদানের উপর এবং আনন্দ বা উপভোগ্যতা ছিলো তাঁদের মতে গৌণ বিবেচনা।

সিণ্ডেরেলা, ব্লু-বেয়ার্ড-এই সব একমুঠো গল্প কি পেরোর আগে আর কেউ লেখেন নি যে তাঁর রচনাবলী অমর হ'তে পারলো? দু-একটি গল্প অবশ্য ইতিপূর্বে অন্যত্র পাওয়া যায়, যেমন 'Puss-in-boots'—ইতালীয়তে এটা জোভান্নি ফ্রানচেসকো স্ত্রাপারোলা রচিত 'পিয়াচেভোলি সেৎলি'র [১৫৫০] অন্তর্ভুক্ত—অত্যন্ত জনপ্রিয় বই এটি, পেরো কলম ধরার আগেই বহুবার ফরাসিতে তার তর্জমা হয়েছিলো। তা ছাড়া জ্যাম্বাত্তিস্তা বাসিলে-এর 'পেন্টামেরোনে' [১৬৩৪-৩৬] নামক গ্রন্থে অনেক রূপকথা প্রাপ্তব্য: এই বইটি উত্তর-রেনেশাঁস কালের য়ুরোপের সর্বপ্রাচীন রূপকথার সংকলন; পেরোর কোনো-কোনো রূপকথার কাহিনীর সঙ্গে এই বইয়ের রূপকথা হুবহু মিলে যায়। কিন্তু তফাতও আছে; আর এই তফাতটুকু পেরোকে অমর করেছে। পেরো যেকালে মসৃণ, নম্র, শুভ্র ও বাগবিপুণ, বাসিলে তাঁর অতিকথনের দোলতে সেকালে রাবেলের দলের। রোমান্টিক ও ক্লাসিক-এ যতটা তফাত দু'য়ের মধ্যে তফাত ঠিক ততটাই। আর মূলত রোম্যান্টিক ও মুগ্ধ ব'লেই পেরো একদা ফরাসিদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মনোহরণ ও মনোরঞ্জন করেছিলো।

লেখক হিসেবে Georges Simenon-এর খুব নাম ডাক ইউরোপে। তাঁর ন' দেড়েক বই বিশ্বের ২৯টি দেশে লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে এবং তিনি প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা উপার্জন করেছেন তা থেকে। এই অসাধারণ জনপ্রিয়তার উৎস কোথায়? তিনি যখন একটি চরিত্র সৃষ্টিতে মগ্ন হয়ে যান তখন তার মতই আচরণ করতে থাকেন। একবার এক চল্লিশ বছরের লোকের সঙ্গে পঁচিশ বছরের তরুণীর জটিল সম্বন্ধের ওপর আলোকপাত করছিলেন। [Act of Passion] স্ত্রীর সামান্য একটি কথায় তাকে মেরেবসলেন। তারপরেই তিনি বললেন, কি করলাম আমি।

আর একবার বুড়ো মাস্তানের চরিত্র আঁকলেন। তিন দিন অবিশ্রান্ত লেখার পর ওঁকেই টলতে দেখা গেল। একদিন রবিবারের কাহিনী লিখতে লিখতে যখন শুনলেন ছেলেরা সেদিন স্কুলে গেছে তিনি কিছুতেই তা প্রথমটায় বিশ্বাস করেন নি।

বিশ্ব সাহিত্য

কথার কথা ॥

প্রমথ চৌধুরী

আসল কথাটা কি এই নয় যে, লিখিত ভাষায় আর মুখের ভাষায় মূলে কোন প্রভেদ নেই? তারা দুয়েরই এক, শুধু প্রকাশের উপায় ভিন্ন। একদিকে স্বরের সাহায্যে, অপর দিকে অক্ষরের সাহায্যে। বাণীর বসতি রসনায়। শুধু মুখের কথাই জীবন্ত! যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই, সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়। আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত, কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা, ঐক্য নষ্ট করা নয়! ভাষা মানুষের মুখ হ'তে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ হ'তে মানুষের মুখে নয়। উল্টো চেষ্টা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে। কেউ কেউ বলেন যে, আমাদের ভাবের ঐশ্বর্য এতটা বেড়ে গেছে যে, বাপ-ঠাকুরদাদার ভাষায় ভিতর তা' আর ধরে রাখা যায় না। কথাটা ঠিক হ'তে পারে, কিন্তু কাজলা সাহিত্যে তার বড় একটা প্রমাণ পাওয়া যায় না। কণাদের মতে 'অভাব' একটা পদার্থ। আমি হিন্দু সন্তান, কাজেই আমাকে বৈশেষিক দর্শন মানতে হয়, সেই কারণেই আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, প্রচলিত বাঙলা সাহিত্যেও পদার্থ অনেকটা আছে। ইংরাজী সাহিত্যের ভাব, সংস্কৃত ভাষার শব্দ ও বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ,—এই তিন চিজ মিলিয়ে যে খিচুড়ি তয়ের করি, তাকেই আমরা বাঙলা সাহিত্য বলে থাকি। বলা বাহুল্য, ইংরেজী না জানলে তার ভাব বোঝা যায় না। আমার এক এক সময়ে সন্দেহ হয় যে, হয় তো বিদেশের ভাব ও পুরাকালের ভাষা, এই দুয়ের আওতায় ভিতর পড়ে বাঙলা সাহিত্য ফুটে উঠতে পারছে না। এ কথা আমি অবশ্য মানি যে, আমাদের ভাষায় কতক পরিমাণে নতুন কথা আনবার দরকার আছে। যার জীবন আছে, তারই প্রতিদিন খোরাক যোগাতে হবে। আর আমাদের ভাষার দেহপুষ্টি করতে হ'লে প্রধানতঃ অমরকোষ থেকেই নতুন কথা টেনে আনতে হবে। কিন্তু যিনি নতুন সংস্কৃত কথা ব্যবহার করবেন, তাঁর এইটি মনে রাখা উচিত যে, তাঁর আবার নূতন করে প্রতি কথাটির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে হবে; তা যদি না পারেন তা হ'লে বঙ্গ-সরস্বতীর কানে শুধু পরের সোনা পরান হবে। বিচার না করে একরাশ সংস্কৃত শব্দ জড় করলেই, ভাষারও শ্রীবৃদ্ধি হবে না, সাহিত্যেরও গৌরব বাড়বে না, মনোভাবও পরিষ্কার করে ব্যক্ত করা হবে না। ভাষার এখন শানিয়ে ধার বার করা আবশ্যক, তার বাড়ান নয়। যে কথাটা নিতান্ত নহিলে নয়, সেটি যেখান থেকে পার নিয়ে এসো, যদি নিজের ভাষার ভিতর তাকে খাপ খাওয়াতে পার। কিন্তু তার বেশী ভিক্ষে, ধার, কিম্বা চুরি করে এনো না। ভগবান্ পবননন্দন বিশল্যকরণী আনতে গিয়ে আস্ত গন্ধমাদন যে সমূলে উৎপাটন করে এনেছিলেন তাতে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন—কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় দেন নি।

সাহিত্য-সংবাদ

সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা ও মিস্ হ্যারিয়েট শ' উইভার ॥

আমাদের দেশে মহিলা প্রকাশিকা কল্পনা করা দুরূহ ব্যাপার। অন্ততঃ এখনো পর্যন্ত কোন মহিলা এ-বিভাগে আসেন নি। সে তো আছেই এবং এ সংগে আরো দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন যা, তা হ'ল ভাল বইয়ে প্রকাশকরা হাত দিতে নারাজ। হয়তো প্রকাশকদের দিকটাও ভাববার আছে। কিন্তু এমন কথা তেমন প্রকাশকদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য, যারা আগুর ব্যবসা করতে না গিয়ে ভুল করে প্রকাশন-ব্যবসাতে এসেছেন। কিছু সাহিত্যিক প্রকাশন-ব্যবসাতে নেমেছেন, তাঁদের মনের পরিধি পূর্বকথিত—প্রকাশন-ব্যবসায়ীদের তুলনায় এক তিলও বেশি বিস্তৃত নয়। আসল কথা, তাঁদের কাছে মুখ্যতঃ যা প্রধান তা হ'ল, [১] তাদের নিজেদের বই-এর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং [২] যেন তেন প্রকারে মুনাফা লুণ্ঠন। একজন তরুণ সাহিত্যিক প্রকাশন-ব্যবসাতে নেমে সংকল্প করেছেন, তাঁর নিজের বই দিয়েই সে-প্রকাশনীর পুস্তক তালিকা রচিত হবে।

চটুলতা বর্জন করে নতুন ধরনের 'সিরিয়স্' চিন্তার খাদ্যরসবহ বই কেউ লিখলে সে-বইয়ের প্রকাশক পাওয়া দুষ্কর। অন্ততঃ এ দেশে তা খুবই কঠিন। সে-সমস্ত তরুণতম এবং নবতম লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতা তবে কে করবেন? কেউ সাহস পান না সে কাজে হাত দিতে। সেক্স, সস্তা রোমান্স এবং ঘুষেরি মিশ্রণ করে আজগুবি—এ-ই এখন একমাত্র উপজীব্য লেখকদের এবং সর্বোপরি সেটা অনেকখানি প্রকাশকদের নিদিষ্ট চাহিদার দরুণ হয়েছে।

জেমস্ জয়েস ইওরোপে তেমন একজন লেখক যিনি প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী এবং ইচ্ছে করলে তাঁর পক্ষে প্রচুর অর্থের অধিকারী হওয়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তিনি অনির্দিষ্ট পথে বরাবর পরিক্রমণ করেছেন। বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধ সত্ত্বেও গতানুগতিক ধারায় নিজেকে প্রবাহিত করেন নি। প্রকাশকদের তাচ্ছিল্য মর্মবেদনার সঞ্চার করলেও তাঁকে নিরুৎসাহ করে আপন ধারা ত্যাগে বাধ্য করতে পারে নি।

জয়েসের 'Portrait of the Artist as a Young Man' বইটি যখন বহু লাঞ্ছনায় জর্জ-বিক্ষত হতে চলেছিল, তখন এক মহিলা সে বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নেন। তিনি হলেন মিস হ্যারিয়েট শ' উইভার। জয়েসের ভুবনবিখ্যাত বই 'ইউলিসিস' হ্যারিয়েটই প্রকাশ করতে সাহায্য করেছেন। আগের বইটির চেয়েও বহুগুণ বেশি তাচ্ছিল্য কুড়িয়েছে এই বইটি। জয়েসের প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি মিস উইভারের সাহায্যদান সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা। মিস উইভার প্রচুর ধনের অধিকারিণী ছিলেন। কিন্তু থাকতেন একজন সাধারণের মত। তাঁর প্রকাশনী-ব্যবসায় ঘাটতি ছিল। কিন্তু সে-ঘাটতির জন্যে সে ব্যবসা থেকে সরে তো আসেন নি উপরন্তু প্রতিভাবান লেখক বলে যাঁদের ভেবেছেন তাঁদের বই ছেপেছেন। এলিয়টের কবিতার বই 'Prufrock and Other Observations' তিনি ছেপেছিলেন।

মিস উইভার একটি পাক্ষিক পত্রও প্রকাশ করেন। সেটির নাম The New Free-woman এবং পরবর্তীকালে এটিই বিখ্যাত হয়েছিল The Egoist নামে। এলিয়ট এ-কাগজের মৃত্যুর শেষের দিকে এর সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছিলেন। মিস উইভার ছিলেন প্রধান সম্পাদিকা।

পঁচিশ বছর বয়সে সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এই মহীয়সী নারী গত অক্টোবরে মারা যান। সাহিত্যের প্রতি তাঁর স্থায় ঔদার্যপ্রদর্শন খুবই বিরল ঘটনা। প্রেরণার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রূপে মিস উইভারের কীর্তি অনেককে উৎসাহ করবে এবং তরুণ প্রতিভাধর যে সমস্ত লেখক অবহেলিত এবং অবজ্ঞাত তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতার কাজে অনেককে পথ দেখাবে।

তারুণ্যের ঈর্ষা ॥

বিখ্যাত জার্মান মনীষী ফ্রেডরিক ওয়েলহেলম্ ফোয়েরষ্টারের বয়স তিয়ানব্বই বছর। এ দীর্ঘ জীবনলাভ আজকের যুগে বিরল সৌভাগ্য। বয়সের ভারে—দেহের এবং মূলতঃ মনের ক্লান্তি এসে যায়। কিন্তু নব্বই বছরের বৃদ্ধ দার্শনিক রাসেলের মত ফোয়েরষ্টারও দেহের শক্তহা সত্ত্বেও মনের শক্ততাকে স্বচ্ছন্দে অক্ষুণ্ণ করেছেন। তিনি তিয়ানব্বই বছর বয়সে মনের বৈদগ্ধ বাঁচিয়ে শুধু রাখেন নি নব চিন্তার আলোকে মহিমান্বিত করে চলেছেন।

পঁয়ষট্টি বছর আগে তিনি জার্মানিতে বিখ্যাত জার্মান সাপ্তাহিক Ethische Kultur-এর সম্পাদনা করেছিলেন। সম্পাদক হিসেবে তাঁর নাম সে সময় জগদ্বিখ্যাত ছিল। জার্মান জঙ্গিবাদ ও হিটলারী অন্ধ জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা তিনি তাঁর কাগজে করেছিলেন। তাতে হিটলার তথা সমগ্র জার্মান জঙ্গিবাদীরা প্রমাদ গণলেন এবং অকপক্ষ মানবতাবাদের প্রেমিকরা ফোয়েরস্টারকে সম্বোধন করেছিলেন: "The Conscience of a generation"। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বাধ্য হয়ে তাঁকে ফ্রান্সে চলে আসতে হয় এবং তারপর আমেরিকায় এসে স্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করেন।

দীর্ঘ জীবনে পৃথিবীর হলাহল পান করে রাসেল এবং ফোয়েরস্টার নীলকণ্ঠ হয়েছেন। কিন্তু অমৃতের সন্ধানী এঁদের পথযাত্রা আজো থামে নি। ফোয়েরস্টারের তিয়ানব্বই বছরে যে বইটি চিন্তার ঢেউ তুলেছে সেটি হল "The Jews"। খৃষ্টান ও ইহুদিদের চিরাচরিত পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বন্দ্ব নিয়ে এই বইটির আলোচনা। তিনি দ্বন্দ্বটিকে তুলে উভয়ের সম্প্রীতি কী করে আনা যায় এবং উভয়েই মূলতঃ উভয়ের কাছে ঋণী—এই কথাটিই ইতিহাসের সাহায্যে দার্শনিক বিচারে তিনি ওই বইটিতে বলতে চেয়েছেন।

ফোয়েরস্টার দার্শনিক রাসেলের মতই সত্যি সত্যিই তরুণদলের ঈর্ষার বস্তু।

গ্রন্থ-পরিচয়

কবি জীবনের একটি আধুনিক ব্যাখ্যা ঃ

মধু-জীবনীর নতুন ব্যাখ্যা—শ্রীমতী বাণী রায়। প্রমথ, ২২।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

বাংলা ভাষায় জীবনী-সাহিত্য এমনিতেই বিরল। কিন্তু সবচেয়ে বিরল হ'ল বৈজ্ঞানিক মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিতে জীবনী লেখার প্রচেষ্টা। বিশেষ করে যে সব মনীষী কবিরূপে জন্মগ্রহণ করেন, যাঁরা স্রষ্টা ও স্বয়ম্ভু তাঁদের সামগ্রিক চেতনা স্তরের বিবর্তন ও শিল্প চেতনার ক্রম বিকাশের ধারাপথকে যুক্তি নিষ্ঠ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনুসন্ধান করতে পারেন এমন জীবনীকারের এখনও এদেশে অভাব রয়েছে সুপ্রচুর। কবির জীবন সাধারণ মানুষের জীবন নয়; সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের অনুভূতির তুলনায় কবির সুখ দুঃখানুভূতি অনেক গভীর। বহির্জগতের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও আশা আনন্দের প্রতিক্রিয়া মানব সাধারণের জীবনে যেভাবে আঘাত করে কবি চিত্তে তাদের অনুরণন তার চেয়ে অনেক বেশী সূক্ষ্ম ও অনেক বেশী অন্তর্নিহিত। তাই মানব সাধারণের কর্ম-জীবন, ধর্ম-জীবন, চরিত্র ও সামাজিক সাফল্যের বিচার যে ভাবে করা যায় কবি জীবনকে সেভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা চলে না। যে কোন কবির কাব্যকৃতির সঠিক বিচার করতে গেলে সেই কবির দুর্গম মানস লোকের রুদ্ধ কক্ষে জীবনীকার ও সমালোচককে অভিযান চালাতে হবে। দেখতে হবে কেমন করে গিরি শিখরের চূড়ায় কবির মানস সরোবরে তাঁর শিল্প চেতনা জ্যোতির্ময় পদ্মের মতো ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে; কেমন করে সেই স্বর্গীয় পুষ্পের মধ্যে জিনের পর দিন সঞ্চিত হয়েছে বিন্দু বিন্দু অমৃত। তারপর সেই অমৃত কোন রহস্যময় প্রক্রিয়ায় রূপায়িত হয়েছে কাব্যামৃতে; ঝর ঝর করে ঝরে পড়েছে অজস্র কাব্যধারায়, এই মলিনমর্ত্যের ওপর বয়ে গিয়েছে পতিত পাবনী সুরধুনীর মতো।

যুক্তি নিষ্ঠ মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিতে কবি মানসের যে অনুসন্ধান তার অভাব বাংলা সাহিত্যের জীবনীকার ও সমালোচকদের হিমালয় প্রমাণ। কিন্তু শ্রীমতী বাণী রায়ের 'মধু জীবনীর নূতন ব্যাখ্যা' পড়ে বিশেষ আনন্দিত হওয়া গেল এই দেখে যে বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিক জীবনী লেখার পদ্ধতি বর্জন করে তিনি নূতন বৈজ্ঞানিক মনস্তাত্ত্বিক পথেই তাঁর অভিযান চালিয়েছেন মধুসূদনের মতো একজন সমাজ ও স্বধর্মচ্যুত, শ্রেষ্ঠ চরিত্র, জীবন সম্বন্ধে মমত্ববোধ লেশহীন একজন বিদ্রোহী কবির অতি দুর্গম মানস লোকে পৌঁছাবার জন্যে। আশ্চর্যের বিষয় যে তিনি সে কাজে সফলও হয়েছেন।

মধুসূদনের কাব্য ও জীবনকে বিচার ও বিশ্লেষণ করা সহজসাধ্য নয়। তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক এতো জটিল ও এত পরস্পর বিরোধী যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাদের বিচার করতে গেলে মধুসূদনকে একজন বীভৎস চরিত্রের ব্যক্তি বলে ধরে নেওয়া কিছু বিচিত্র নয়। বিশেষতঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দুই ভিন্নমুখী সভ্যতার দ্বন্দ্বাবর্তের মধ্যে যাঁর জন্ম, যিনি পিতামাতার অবাধ্য সন্তান ও এই নেটিভ সভ্যতার সব কিছুর ওপর যাঁর প্রচণ্ড ঘৃণা অথচ যিনি আবার "রেখো মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে" বলে বঙ্গ জননীর কাছে সাশ্রু-নেত্রে বিদায় নেন, তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণ ও তাঁর কাব্য মহীরুহের কেন্দ্র মূল উৎপাটন করা বড় সহজ কর্ম নয়। অথচ এই অতি কঠিন কর্মটি শ্রীমতী রায় সম্পাদন করেছেন অত্যন্ত সাবলীল ও সরস ভাবে।

শ্রীমতী রায় নিজে কবি। তাই কবি মনে যে বিচিত্র অনুভূতি জন্মায় তা তাঁর অজানা নয় সুতরাং কোন পথে অগ্রসর হলে মধুসূদনের কাব্য মানসের মূল কাব্যে পৌঁছান যায় তা বোধ হয় তাঁর ধ্যান লোকে সহজেই ধরা দিয়েছে। যুক্তি যেখানে যুক্তির জন্য প্রয়োগ করা হয় সেখানে সে প্রাণ রস হীন ও শুষ্ক। শ্রীমতী রায়ের যুক্তি আলোচনাগুলি কাগজটিতে রীতিমতো সরস ও প্রাণময়।

যোগেন্দ্রনাথ বসু, রাজনারায়ণ বসু, শীলেন্দ্রনাথ সান্যাল, শশাঙ্কমোহন সেন প্রমুখ বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি মধুসূদনের জীবনী, কাব্য প্রতিভার আলোচনা পূর্বে করেছেন। শ্রীমতী রায় এঁদের তথ্যগুলিকে অবলম্বন করে যে তত্ত্বে অভিযান চালিয়েছেন তা বোধ হয় বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের জীবনীকারের পক্ষেই সম্ভব। যুগোত্তর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন মধুসূদন। তাই বিংশ শতাব্দীর বিদ্রোহী-আত্মা মধুসূদনের মধ্যে অনুভব করিয়াছে নৈতিক বিদ্রোহ।

এই বিদ্রোহী কবিকে তখনকার কোন জীবনীকার বা সমালোচক সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। কেউ দিয়েছেন করুণা মিশ্রিত ঘৃণা, কেউ দেখিয়েছেন অনুকম্পা, কেউ বা উচ্ছ্বাস দেখিয়েছেন। কিন্তু শ্রীমতী রাণী রায়ের বিদগ্ধ ও মননধর্মী কবিত্বময় মধুকে যথাযথভাবেই তাঁর অন্তরে বারণ করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর এই বিদ্রোহী বিপ্লবী আত্মার মধ্যে শ্রীমতী রায়ের আত্মাও এক পরম পরিপূরক খুঁজে পেয়েছে। তাই এই দুয়ের মিলনে 'মধু-জীবনীর নূতন ব্যাখ্যা' রূপ নিয়েছে এক পরম উপাদেয় সৃষ্টিতে।

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বিশেষ করে মধুসূদনের স্বাদেশিকতা, চরিত্র, দাম্পত্য জীবন ও প্রেম এবং ধর্মে শ্রীমতী রায়ের Objective দৃষ্টিভঙ্গি ও কুশল সিদ্ধান্তের প্রশংসা করা যায়। '.....এই চিঠির আবেগ বাংলাভাষার প্রতি আবেগ। বীটনের পত্র পাইবার পূর্বেই বাংলা ভাষার ও নিজের দেশের প্রতি মধুর প্রবল আবেগ আনিয়াছেন। এই আবেগের উৎস বিরহ। বিরহ ভিন্ন এমন প্রেম হয় না। এই বিরহ ইংরাজীতে যাহাকে nostalgia বলিব, ভাবুককে রচনা কার্যে যত অনুপ্রেরিত করে এমন আর কিছুই করে না।' —এই আতীব্র যুক্তিপূর্ণ অথচ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ শ্রীমতী রায়ের ব্যাখ্যার মধ্যে প্রচুর আছে। বাহুল্য ভয়ে উল্লেখ করা গেল না।

কিন্তু কবি মধুসূদনের কাব্যমানসের জন্য যে বঙ্গোপসাগরেরই সুনীল জলরাশি এই মতের বিশ্লেষণ ও খণ্ডন টুকুর জন্য শ্রীমতী রায়কে অভিনন্দন জানাই। .....সেখানে [মাদ্রাজ উপকূলে] উপস্থিত হইলে প্রথমেই চোখে পড়ে সাগর মেখলা ধরিত্রীর রূপ। প্রচণ্ড তরঙ্গভঙ্গে মহলে ক্ষুব্ধ নীলাভ শুভ্র-দ্যুতি বিকীর্ণ করিতেছে। বেলাভটে বালুর বুকে হয়তো কোন শুভলগ্নে মহাকবির দৃঢ় পদক্ষেপ পড়িয়াছিল। এত বছরের সমুদ্রবারি সেই সদ্য সিকতা প্লাবিত করিয়া মুছিয়া নিয়াছে পদচিহ্ন। কিন্তু সমুদ্রতীরে রামায়ণ কবির মনোভাবে অমর হইয়া আছে তাঁহার কাব্যে।.....মাদ্রাজ প্রবাসে কবি রামায়ণের স্মৃতি-চিহ্নিত পথে রামায়ণের কাহিনী আবার কুড়াইয়া পাইলেন।

মাদ্রাজের সাগর উপকূলে মধুসূদন যেমন রামায়ণের কাহিনী কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, তেমনি রামায়ণী শ্রীমতী রায়ও খুঁজে পেয়েছেন মধুসূদনের মহাকাব্যের মানস-প্রেরণার উৎসটিকে।

এই সুগভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সঙ্গে মধুর কাব্যগন্ধী ভাষা যেন মণিকাঞ্চন যোগ। শ্রীমতী রায়ের কবিসত্তা এই ভাষা প্রয়োগে তার পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ গ্রহণ করেছে।

সবশেষে উল্লেখ করি শ্রীমতী রায়ের গবেষণা দৃষ্টির ও অনুসন্ধিৎসুর। মধুসূদনের কাব্য-বিচারে ও সাহিত্যের তুলনামূলক গবেষণায় হোমর, দান্তে, তাসিল, টাসো প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য মহাকবিদের কাব্যকৃতির যথাযথ উল্লেখ ও সমালোচনা লেখিকার বৈদগ্ধ ও মহান কাব্যানুভূতির অনবদ্য প্রমাণ।

সেই সঙ্গে তাঁর চেতন মানসে ও বুদ্ধিদৃপ্ত মননে বিশ্লেষণের বিভাগগুলি যেমন—বিদ্রোহ, বিপ্লব, স্বাদেশিকতা, চরিত্র, দাম্পত্যজীবন ও প্রেম, ধর্ম—সবগুলি একটি সুবিন্যস্ত যুক্তি সূত্রে দৃঢ় নিবদ্ধ হয়ে মধু-জীবনকে একটি সুন্দর পুষ্পমালার রূপ দান করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

ইতিহাসের পাতা থেকে

রাজাধিরাজ কবি।

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ফরাসি দেশের পনেরশ শতাব্দীর ইতিহাসের পাতায় একজন কবির নাম পাওয়া যায়—ফ্রাঁসোয়া ভিলন। যেমন অসাধারণ কবি তেমনি অদ্ভুত মানুষ। তাঁর সম্বন্ধে লেখা হয়েছে :

> King of the beggars, brawler, thief and
> roistering drunkard : that was Francois
> Villon. And he was also one of the exquisite
> Poets who ever turned a verse.

রাজাধিরাজ, লুটেরা, চোর এবং মাতাল, আর সেই সঙ্গে অলৌকিক-সামান্য কবিত্ব শক্তির অধিকারী। এক দুর্জ্ঞেয় পরস্পর বিরোধী চরিত্র। এমন মানুষ সংসারে বিরল বইকি।

তখনকার দিনে কথায় কথায় ফাঁসী হ'ত। প্রথম যৌবনেই সমাজবিরোধী কার্যকলাপের জন্যে ভিলন অভিযুক্ত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হল। সেই সময় দেশের রাজা ছিলেন একাদশ লুই। তিনি বললেন—'ফ্রাঁসোয়া ভিলনকে ফাঁসিকাঠে লটকানো চলবে না। দেশে তার চেয়ে অনেক বড় বড় চোর-ডাকাত বদমায়েস আছে, কিন্তু তার মত কবি একজনও নেই।'

সত্যিই ছিল না। ফরাসী দেশে তিনিই সর্বপ্রথম জগতের একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলে আজ স্বীকৃত। ইতিহাসে তিনি নাম রেখে গেছেন। তাঁর লেখা পরবর্তীকালের অনেক লেখককে প্রভাবান্বিত করেছে।

একদিকে তিনি ছিলেন দরাজদিল, ধর্ম সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল, নম্রনীয় এবং দয়াবান। অপরদিকে, উচ্ছৃঙ্খল মাতাল, অসামাজিক জীবনযাত্রার পথিক, নানা দুষ্কর্মের পাণ্ডা এবং আইন-কানুন সম্বন্ধে বেপরোয়া। তাঁর চরিত্রের এই বৈপরীত্য মনস্তত্ত্ব-বিশেষজ্ঞদের বিস্মিত করেছে।

রাজ-রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে মস্তানদের যখন তিনি হল্লা করতেন তখন যেমন আশপাশের ভদ্রলোকরা আতঙ্কিত হ'ত তেমনি আতঙ্কিত হত তাঁর সমাজের উপর তলার অভিজাত অধিবাসীরা, যখন তিনি তাঁর ধরধার লেখনী দিয়ে আশ্চর্য জোরালো আর রেখাত্মক ভাষায় তাঁদের ব্যঙ্গচিত্র আঁকতেন, তাঁদের মুখোশ খুলে দিতেন।

অনেক বড় বড় লেখক, যেমন, রাবেলে, মলিয়ের এবং আনাতোল ফ্রাঁস, তাঁদের লেখার মধ্যে ভিলনের প্রভাবের ছাপ রেখে গিয়েছেন। ইংলণ্ডে সুইনবার্ন, রসেটি প্রমুখ বড় বড় কবিরা তাঁর কবিতার অনুবাদ করেছেন। স্টিভেনসন তাঁর সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেছেন। জাস্টিন ম্যাকার্থি তাঁর এক নাটকে নায়করূপে চিত্রিত করেছেন, তাঁর জীবনী নিয়ে আধুনিক কালে চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে—The Vagabond king.

১৪০১ সনে প্যারিসে ভিলনের জন্ম হয়। তাঁর নিজের লেখায় জানা যায়, তাঁর মা ছিলেন দরিদ্র ধর্মপ্রাণা মহিলা। 'কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখনো নয়'—ছেলের বয়ঃপ্রাপ্তির জন্যে জীবনভোর তাঁর ম

অপার দুঃখ এবং হতাশা ভোগ করেছেন তবুও ছেলের প্রতি তাঁর স্নেহভালবাসার টান কখনো কমেনি। এক করুণ মধুর কবিতায় অনির্বচনীয় আবেগের সঙ্গে ভিলন তাঁর সেই দুঃখিনী মাকে বন্দনা করেছেন। ফরাসি কাব্যসাহিত্যে সে কবিতা অমর হয়ে আছে।

ছেলেবেলায় মার চেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছিলেন ভিলন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরমার্থবিদ্যায় ডিগ্রিও পেয়েছিলেন। তারপর কেমন করে কুসংসর্গে পড়ে তিনি উন্মার্গগামী হ'লেন, অসৎ জীবনের পাঁকে ডুবে গেলেন, তার বিশদ বিবরণ পাওয়া না গেলেও দেখা যায়, মাঝে মাঝেই ভিলন নানা দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়েছেন। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে কয়েকজন কুখ্যাত ঠিক, আর বহুবারেশেরও নাম পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে এক রমণীও ছিল—পোর্ট রয়েলের অ্যাবেস। এই নারী একদা বড় ঘরের ঘরনী ছিল। কিন্তু সে প্রায়শই এমন সব অদ্ভুত মাইফেল আর কাণ্ড করত যাতে সমাজে তার নিন্দার অবধি ছিল না, ভদ্র সমাজের কেউ তার সঙ্গে মেলামেশা পর্যন্ত করত না। শেষ পর্যন্ত সমাজের দ্বারা পরিত্যক্তা হয়ে অ্যাবেস প্যারিসের নৈশ-আড্ডার নায়িকা রূপে জীবনযাপন করতে থাকে। শোনা যায়, রাতের বেলায় পুরুষের বেশ ধারণ করে সে ভিলন এবং অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে সমান তালে প্যারিসের পথে বৈ হল্লা করে বেড়াতো।

একদিন এক নারীঘটিত ব্যাপারে ফিলিপ নামে এক ধর্মযাজক আক্রোশবশে রাস্তায় ভিলনকে অতর্কিতে আক্রমণ করল। হাতে তার প্রকাণ্ড এক ছুরি। আঘাত পেলেন ভিলন। কিন্তু তাতে কি যমের মত লোক! কোমরে ছিল তোজালি। তারি এক ঘায়ে কাৎ করলেন ফিলিপকে। তার পর চোঁ-চা দৌড়। ফিলিপ মোক্ষম হাসপাতালে যাত্রা গেল। মরবার সময় বলে গেল, ভিলনের কোন দোষ নেই, সে আত্মরক্ষার জন্যেই তাকে মারতে বাধ্য হয়েছিল। ফলে, ভিলনের নামে মামলা হ'ল না বটে কিন্তু প্যারিসে তাঁর বাস উঠল। শহর কোতোয়াল তাঁকে এক বিপজ্জনক মানুষ বলে রাজধানী থেকে দূর করে দিলে।

কিছুদিন পরে তিনি অবশ্য রাজধানীতে ফিরে আসবার অনুমতি পেলেন মুচলেকা দিয়ে। কিন্তু মুচলেকার দাম তাঁর কাছে কতটুকু! আবার শুরু হল মাতামাতী লুঠতরাজ। কিন্তু বেশি দিন চলল না। একদিন হাতে-নাতে ধরা পড়লেন এবং বিচারে ফাঁসীর হুকুম হ'ল। কয়েদখানা থেকে কবি ভিলন পার্লামেন্টের কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়ে এক মর্মস্পর্শী আবেদন পাঠালেন। সে আবেদনপত্রের ভাষা ছিল সাহিত্যরস-সৃষ্টির এক চরমোৎকৃষ্ট নিদর্শন।

পার্লামেন্টের সভ্যরা কয়েকদিন ধরে নানাভাবে নানা মনে সেই আবেদনের বিচার করে ফাঁসি মকুব করে তাঁর প্রতি আজীবন নির্বাসনের আদেশ দিলেন। দেশ ছেড়ে চলে গেলেন ভিলন। ঘুরে বেড়ালেন নানা স্থানে। শোনা যায় বিদেশের এক রাজসভায় এক কবির লড়াই অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই অনুষ্ঠানে ভিলন জয়লাভ করেন।

কিছুদিন পরে রাজা একাদশ লুই-এর আদেশে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ The Great Testament রচনা করেন। তার পর আবার দুষ্কর্ম এবং আবার নির্বাসন। এবার তিনি সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ হন। তাঁর শেষ জীবন কোথায় কী ভাবে কেটেছে তার প্রামাণিক তথ্য এতাবৎ পাওয়া যায় নি।

তাঁর রচনার মধ্যে The Great Testament, The Small Testament, প্রচুর গাথা এবং বহু কবিতার সন্ধান পাওয়া গেছে। কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে শ্লেষাত্মক ও কৌতুকরসোজ্জ্বল ভাষায় তিনি তাঁর সমসাময়িক জীবনের এবং সেই সময়কার বহু খ্যাতনামা নাগরিকের যে সব ছবি এঁকেছেন সেগুলি রঙে-

ভারত-প্রসঙ্গে

পার্ল বাক ॥

চীনের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক আজ কয়েক বছর যাবত রাজনীতির জটিল আবর্তে কলুষিত হয়ে উঠেছে। প্রকাশ্যে যুদ্ধের কোনও লক্ষণ নেই সত্যি, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা যুদ্ধের চাইতে ভয়ঙ্কর হয়ে রয়েছে গত ক'বছর ধরে। এই দু'টি মহান জাতির জনগণের মধ্যে অবস্থাটা যে এমনধারা হয়ে উঠলো বা হয়ে রয়েছে তার জন্যে দোষ তার কম বা বেশি তা আলোচনার প্রবৃত্ত হয়ে লাভ নেই। কারণ, সেটা রাজনীতির আলোচনা হয়ে পড়বে। রাজনীতির আলোচনায় না গিয়েও যে কথাটা বলা যায় তা হলো এই যে, চীনের সঙ্গে আমেরিকার এই বিচ্ছেদ একটা মর্মান্তিক ব্যাপার। বিশেষ করে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত চীনের জন্যে আমেরিকার যে বৈষয়িক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে তা ভাবলে আজকের দিনে অবাক হয়ে যেতে হয়। আমেরিকার যে-সরকারী জনসাধারণও এ জন্যে কম ক্ষতিগ্রস্ত হন নি। এবং সংখ্যায়ও তাঁরা নেহাৎ কম নন। প্রসঙ্গত পার্ল বাকের কথা বলা যায়।

পার্ল বাকের [Pearl Sydenstricker Buck, born in 1892] মা এবং বাবা দু'জনেই ছিলেন মিশনারী। আমেরিকার শত শত মিশনারীর মতো ওঁরাও চীনেই জীবন কাটিয়ে গেছেন বলা যায়। পার্ল বাকের বর্তমান বয়স সত্তর। উনিও মা-বাবার মতো অল্প বয়সেই মিশনারী হয়ে যান। জন্ম ওঁর আমেরিকায়, কিন্তু চীনে চলে আসেন আট-দশ বছর বয়সের সময়। সেই থেকে এক নাগাড়ে প্রায় চল্লিশ বছর ওঁর চীনেই কেটেছে। মধ্যে বার কয়েক, কয়েক মাসের জন্যে স্বদেশ থেকে ঘুরে এসেছেন মাত্র। অর্থাৎ সত্তর বছর বয়সের বেশির ভাগ সময়টাই ওঁর চীনেই কেটেছে। পার্ল বাকের কয়েকটি ভাই-বোন চীনেই মারা যায় অল্প বয়সে।

মা এবং বাবা মিশনারী কাজের প্রয়োজনে উত্তর চীনের গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন, পার্ল বাককে এই সময় দেখাশুনো করতেন একজন চীনা মহিলা। এই মহিলা দীর্ঘ আঠারো বছর বাক পরিবারে আয়ার কাজ করেছেন। যৌবনে পা দেবার আগেই পার্ল বাক যে মনেপ্রাণে একজন চীনা হয়ে উঠেছিলেন, তা প্রধানতঃ এই আয়ার প্রভাবেই। আয়ার মুখ থেকে শোনা চীনের ঘরোয়া কাহিনী, রূপকথা এবং কিংবদন্তী ও পৌরাণিক গল্প—এক কথায় চীনের সাধারণ মানুষের যে সেন্টিমেন্ট, বিশ্বাস এবং ভাবধারা—পার্ল বাক একেবারে বাল্য বয়স থেকেই তা' জানবার এবং বুঝবার সুযোগ পেয়েছিলেন এই মহিলাটির সান্নিধ্যে।

পার্ল বাকের প্রথম স্বামী ডক্টর জন লসিং বাকও একজন মিশনারী ছিলেন। ওঁর প্রধান কাজ ছিল কৃষিকর্মে চীনাদের সাহায্য দেওয়া। পার্ল বাকের দুই মেয়ে। ১৯০৪ সনে ওঁর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। পরের বছর পার্ল বাকের দ্বিতীয় বিবাহ হয় নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত প্রকাশক-প্রতিষ্ঠান জন ডে কোম্পানীর কর্ণধার রিচার্ড জে. ওয়ালস-এর সঙ্গে। লেখার ব্যাপারে পার্ল বাক এখনো তাঁর প্রথম স্বামীর পদবীই ব্যবহার করছেন। পূর্বোক্ত জন ডে কোম্পানীই পার্ল বাকের অধিকাংশ বইয়ের প্রকাশক।

এবার পার্ল বাকের লেখার কথায় আসা যাক।

পার্ল বাক লিখতে আরম্ভ করেছিলেন একেবারে বাল্য বয়স থেকেই। সাংহাই-এর বিখ্যাত Sanghai Mercury-এর একটি সাপ্তাহিক কিশোর সংস্করণ বেরুতো। এই পত্রিকাতে পার্ল বাকের

লেখা প্রথম বেরুতে আরম্ভ করলো। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী, রূপকথা ইত্যাদি অনেক কিছুই লিখেছিলেন পার্ল বাক এই পত্রিকায়। ওঁর বহু রচনা বিভিন্ন সময়ে প্রাইজও পেয়েছে। কিন্তু, বলাই বাহুল্য এই সময়কার অধিকাংশ রচনা নেহাত গতানুগতিক লেখা। সাময়িক স্বীকৃতি বা প্রশংসা লাভ করলেও অল্পসময়ের মধ্যেই সবাই তা ভুলে গেছে।

সাহিত্যক্ষেত্রে পার্ল বাকের যে খ্যাতি তা' হলো ওঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ ১৯৩১ সনে প্রকাশিত উপন্যাস The Good Earth-এর জন্য। এর পর থেকে আজ অবধি গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, জীবনী এবং কিশোর-পাঠ্য নিয়ে প্রায় পঞ্চাশখানা বই প্রকাশ করেছেন,—কিন্তু তবু আজ পর্যন্ত সারা পৃথিবীর পাঠকসমাজের কাছে পার্ল বাকের প্রধান পরিচয় The Good Earth-এর রচয়িত্রী হিসেবে। পার্ল বাক মানেই শুদ্ধ আর শুদ্ধ মানেই কৃষি-প্রধান মহাচীনের সাধারণ মানুষের জীবনের এমন একটা দিক যার সঙ্গে চীনের বাইরের সভ্যসমাজের বিশেষ কোনই ধারণা ছিল না। বস্তুতঃপক্ষে খাস চীনের রাজনীতিবিদেরা তাঁদের দেশ, সমাজ এবং সাধারণ মানুষকে বাইরের পৃথিবীতে যতটা না পরিচিত করাতে সক্ষম হয়েছিলেন, পার্ল বাক একা তার চাইতে অনেক বেশি করেছেন তাঁর এই একখানা উপন্যাসের মাধ্যমে। Good Earth হচ্ছে The House of Earth নামে একখানা সুবিশাল উপন্যাসের প্রথম খণ্ড। দ্বিতীয় খণ্ড Sons [1932] এবং তৃতীয় খণ্ড A House Divided [1935].

চীনের একটি চাষী পরিবারের সুখদুঃখকে উপজীব্য করে The Good Earth উপন্যাস রচিত। নায়ক ওয়াঙ লাং নিয়ে একজন পরিশ্রমী কৃষক। উদয়াস্ত জমি আঁকড়েই থাকে, তাঁর ধ্যানধারণা যা কিছু জমিকে কেন্দ্র করে। নিজের কায়িক পরিশ্রমে আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে লাঙের মনে বাসনা জন্মালো কি করে কৃষক সমাজে আভিজাত্য অর্জন করা যায়। ইতোমধ্যে বিয়ে হলো ওর একটি মেয়ের সঙ্গে, যে এক বিরাট অভিজাত জমিদারের বাড়ি রাঁধুনীর কাজ করতো। মেয়েটির নাম ও-লান। ও-লান ছেলেবেলা থেকেই জমিদার বাড়িতে মানুষ, কাজেই জমিদারের মান-সম্ভ্রম, প্রভাব প্রতিপত্তির মূল্য সম্বন্ধে ওর নিজেরও সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে। এবার স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে নতুন সংসার গড়ে তুলবার সাধনায় ব্রতী হ'লো। ক্রমে তিনটি ছেলে এবং দুটি মেয়ে হলো ওদের। অন্য দিকে প্রতি বছরই নতুন নতুন জমি কিনতে লাগলো লাং এবং তার অধিকাংশেই হোয়াং পরিবার থেকে—অর্থাৎ যে পরিবারে ও-লান রাঁধুনির কাজ করতো এক সময়ে। আর্থিক স্বচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে লাঙের কিছুটা নৈতিক অধঃপতন ঘটলো। কারণ, হঠাৎ একদিন দেখা গেল ও লোটাস নামে পরিচিত একটি বার-বনিতাকে বিয়ে করেছে। ওদের প্রথম এবং দ্বিতীয় ছেলেটি জমাজমির তদারকিই করতে লাগলো, কিন্তু তৃতীয় ছেলেটি বিপ্লবীদের দলে যোগ দিলো। মোটামুটি এই হলো কাহিনী ভাগ। কিন্তু এমন কতকগুলি ঘটনার সমাবেশ আছে এ-উপন্যাসে যার ফলে এ একখানা Epic-এর মর্যাদা দাবি করতে পারে। সেগুলি হলো অনাবৃষ্টি, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, পঙ্গপালের উপদ্রব ইত্যাদি ব্যাপক বিপর্যয়—যা কোনো যুগের লেখক-লেখিকারাই খুব বেশি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হন নি এই উপন্যাসে পার্ল বাক তা পেরেছেন। এবং সত্যি কথা বলতে কি বিরাট পরিপ্রেক্ষিতে পার্ল বাকের সমকক্ষ প্রচেষ্টা এ যুগে বা কোনো যুগেই খুব বেশি দেখা যায় নি।

সুনীলকুমার নাগ

সমাজ ও সাহিত্য

লোকান্তরিত ত্রয়ী॥

নারায়ণ চৌধুরী ॥

বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী সমাজে দুর্দিন লেগেছে। একে একে সব মাথাওয়ালা লোকেরা চলে যাচ্ছে। গত এক বৎসর কালের ভিতর কমপক্ষে দশ-বারোজন কৃতী পুরুষ বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্র থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করলেন। এঁদের ভিতর কেউ সাহিত্যে কৃতী, কেউ শিক্ষায় কৃতী, কেউ সাংবাদিকতায় কৃতী; কেউ সমাজসেবা ও রাজনীতিতে সুপ্রসিদ্ধ, কেউ পাণ্ডিত্যে দুর্ধর্ষ। একই কালে এতগুলি বিখ্যাত ব্যক্তির তিরোধান যে জাতীয় জীবনের পক্ষে কত বড় দুর্দৈব তা আমরা স্থিরভাবে বসে একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারব। বাংলাদেশের উপর দিয়ে এখন ক্রমাগত বিপর্যয়ের হাওয়া বইছে। যে সময়ে এই সকল মানুষের সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন বেঁচে থাকার, সেই সময়েই এঁরা সব কোট বেঁধে চলে গেলেন। যেন বাংলা মায়ের কোল খালি করে পরলোকের পথে পাড়ি জমানোর জন্যে তাঁর মুখা সন্তানদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে।

এঁদের মধ্যে সকলেরই যে যথেষ্ট বয়স হয়েছিল তা নয়। কেউ কেউ জীবনের মধ্যপথে, নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে, আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন। এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জি, ডক্টর অতীন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক প্রবাসজীবন চৌধুরী, ডাক্তার সুবোধ মিত্র, অধ্যাপক নির্মল সিদ্ধান্ত, সুসাহিত্যিক অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বামপন্থী রাজনীতিক অজয় ঘোষ ও বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, বৈজ্ঞানিক বীরেশচন্দ্র গুহ—এঁদের সকলেরই জীবনের পথে চলা অর্ধপথে এসে থেমে গেল বলা যায়। কেন না দেশবাসীর আয়ুর গড় আজ পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়েছে। পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন, এমনকি ষাট বছরে বিগত হওয়া আজকাল অকালে বিগত হওয়ারই সামিল। পঞ্চাশ পেরলেই আগেকার দিনের মানুষ যেমন কখন যাবার ডাক আসবে সেই আশায় অথবা আশঙ্কায় হাত ধুয়ে দুয়ারের পৈঠায় এসে বসে থাকতেন, এখন আর বিধাতার মুলুক এত তাড়াতাড়ি আসে না। 'পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ' কথাটার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য কিছু থাকলেও ব্যাবহারিক তাৎপর্য ইদানীং বাসি হয়ে গেছে। পঞ্চান্ন বছরের মাথায় সরকারী কর্ম থেকে বিটায়ার করে পুনরায় নূতন উদ্যমে কর্মান্তরে নিয়োজিত হওয়ার দৃষ্টান্ত আজ আর বিরল দৃষ্টান্ত বলা চলে না। সদ্য লোকান্তরিতদের মধ্যে অন্যতম প্রধান লোকান্তরিত পুরুষ মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ পরিপূর্ণ বয়সে দেহরক্ষা করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই তথ্য অনেকেরই জানা না থাকতে পারে যে, সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের যথার্থ কর্মজীবনের সূত্রপাত হয় পঞ্চাশ বছর বয়সের পরে। তাঁর বয়স যখন তিপ্পান্ন বছর তখন তিনি গোটা মহাভারতের সটীক অনুবাদ কর্মে হাত দেন। অধ্যবসায়ের কী অনুকরণীয় পরাকাষ্ঠা! কাজেই মহৎ কর্মব্রত উদ্‌যাপন চেষ্টায় আজ আর পূর্বের মত নির্দিষ্ট বয়সের সীমারেখা অনুসরণ করা চলে না। বৈজ্ঞানিক সমুন্নতি ও যুগপ্রভাবের চাপে চতুরাশ্রমের পুরাতন ধারণার রদবদল ঘটাবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

এই মানদণ্ডে বিচার করলে পূর্বোল্লিখিতদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি যে অকালে প্রয়াণ করেছেন সে কথা স্বীকার করতেই হয়। মৃত্যু মানুষের জীবনে অবধারিত, তা বলে এমন আয়োজন করে, বিভিন্নের সমারোহে, একের পর এক মৃত্যুর কোলে চলে পড়া—এ নিতান্ত মর্মান্তিক এক দৃশ্য। "একে

একে নিবিছে মেউটি"। সবচেয়ে যে দীপগুলি দীপ্যমান ও প্রভাময় ছিল, সেইগুলিই সব-আগে নিভে নিভে যাচ্ছে। আমাদের কপাল ছাড়া আর একে কী বলব!

আজ আমি বর্তমান নিবন্ধে এইরূপ সদ্য লোকান্তরিত মনীষীদের মধ্য থেকে তিনজন ব্যক্তিকে বাছাই করে তাঁদের উপর আলোচনা কেন্দ্রীভূত করব। এই তিন পুরুষ হলেন—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস ও ক্ষেত্রপ্রসাদ ঘোষ। লোকান্তর-গমনকালের ক্রম অনুসারে নাম তিনটি সাজানো হ'ল—তাঁদের গুরুত্বের তারতম্যের নিরিখে নয়। এত এত বিদায়ীজন থাকতে বিশেষ করে এই তিন জনকে আলোচনার বিষয়ীভূতরূপে নির্বাচন করবার কারণ, এঁদের তিনজনাই ছিলেন মূলতঃ সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের মানুষ। এঁদের কর্মক্ষেত্রের ভিন্নতা থাকলেও প্রধানতঃ লেখ্যবৃত্তি অর্থাৎ সাহিত্য ও সাংবাদিকতার জীবিকাকে কেন্দ্র করেই এঁরা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। 'সমাজ ও সাহিত্য,' পর্যায়ে বিশেষভাবে সাংস্কৃতিক জগতের বিষয় ও সাংস্কৃতিক মানুষদের নিয়েই আলোচনা করা হচ্ছে। সেই ধারা রক্ষা করে, সুতরাং, এখানে উপরোক্ত তিন জনকে বাছাই করে নেওয়া হল। এতে অপর বিদায়ীদের প্রতি মনোযোগের অভাব বোঝায় না, শ্রদ্ধার তো নয়ই। আলোচনায় কোথাও কোথাও ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অবতারণা থাকবে। এই ধরনের আলোচনায় সেটি অপরিহার্য। পাঠক সে বস্তুটিকে কিঞ্চিৎ ক্ষমার চক্ষে দেখবেন বলেই আশা করি।

ধূর্জটিপ্রসাদ

ধূর্জটিপ্রসাদ ছিলেন পেশায় অর্থনীতি ও সমাজ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক। কিন্তু নেশা ছিল তাঁর সাহিত্যে। কর্মস্থল ছিল তাঁর লখ্‌নউ, পরে আলিগড়। কিন্তু গোটা কর্মজীবন প্রবাসে অতিবাহিত করেও তিনি বাংলাদেশের সঙ্গে নিবিড় যোগ রক্ষা করেছিলেন। সমসাময়িক কালের বাঙালীর চিন্তাচর্চায় তাঁর একটা ভূমিকা ছিল এবং সে ভূমিকা নিতান্ত নগণ্য নয়। সাহিত্যের প্রাচীন ধারার প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল না। সাহিত্যের যেটি আধুনিক ধারা, তার প্রতিই ছিল তাঁর মনের সমধিক পক্ষপাত। বাংলাদেশের অতি-আধুনিক সাহিত্য-আন্দোলনের সঞ্চার ও পরিপুষ্টি সাধনে এককালে ধূর্জটিপ্রসাদ যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। তিনি লখ্‌নউতে বসেই কলকাতার সাহিত্যের শেষতম হালচালের খবর রাখতেন। 'কল্লোল' ও 'কালিকলম' পর্বের অনেক লেখকই আজ সুপ্রতিষ্ঠিত ও বয়োপ্রবীণ। তাঁরা এক সময়ে যখন নবীন ছিলেন তখন তাঁদের একাধিক জনকে ইংরেজী-বাংলা সমালোচনা-প্রবন্ধের মাধ্যমে জনসমক্ষে পরিচিত করিয়েছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ। আমার এখনও মনে আছে, 'শেষের কবিতা'র লিপিভঙ্গি অনুসরণ করে বুদ্ধদেব বসুর 'যেদিন ফুটলো কমল' উপন্যাসটি যখন প্রথম বেরুল তখন ধূর্জটিপ্রসাদ তার তিন-কলম-ব্যাপী সমালোচনা প্রকাশ করেছিলেন অমৃতবাজার পত্রিকায়। এইরকম আরও অনেক তৎকালীন-নবীন লেখকের পক্ষেই ধূর্জটিপ্রসাদ সেদিন কলম ধরেছিলেন। নবীনদের রচনা সম্পর্কে তাঁর প্রভূত, এমনকি মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহ ছিল বলা যায়। 'মাত্রাতিরিক্ত' এইজন্য যে, সকল সময় ওই উৎসাহ যে উপযুক্ত পাত্রে অর্পিত হয়েছে এমন কথা বলতে পারি নে। ধূর্জটিপ্রসাদের রকমটাই ছিল ওই রকমের। তিনি নিজে বয়োপ্রবীণ আর পণ্ডিত ব্যক্তি হলেও তাঁর পক্ষপাতের পাল্লাটা সব সময় অবধারিত ভাবে তরুণদের অভিমুখেই ঝুঁকে থাকত। তরুণ লেখকদের তিনি যথার্থ হিতকামী সুহৃৎ ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁর ভরের

ও যোগ্যতার লোকের মধ্যে নবীন সাহিত্যের এতবড় পৃষ্ঠপোষক আর কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ। সম্ভবতঃ তাঁর মানস-প্রকৃতির মধ্যে একটা মজ্জাগত তারুণ্য কোথাও লুকিয়ে ছিল, তারই প্রয়োচনায় তিনি তরুণের গলায় জয়মালা পরাতে সদা-ব্যগ্র ছিলেন। এক্ষেত্রে পাত্রাপাত্র বিচার গৌণস্থান অধিকার করত।

ধূর্জটিপ্রসাদ সম্পর্কে একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তাঁর জিজ্ঞাসা ছিল বহু-ব্যাপ্ত। এমন বহুমুখী কৌতূহল আজকালকার লেখকদের মধ্যে দেখা যায় না। পণ্ডিতদের মধ্যে তো নয়ই, কেন না স্পেশালাইজেশনের কৃপায় জ্ঞানের খণ্ডীকরণ হতে হতে প্রতিটি জ্ঞানের কোঠা আজ নিতান্ত এক-টুকরা কয়েদখানার গোপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'বিশেষজ্ঞ' নামধেয় ব্যক্তিরা নিজের এলাকাধীন জ্ঞানের সীমার বাইরে পা বাড়াতে ভয় পান। গভীরতা প্রয়াসের নামে জ্ঞানের চৌহদ্দির এই সুস্পষ্ট খর্বীকরণ প্রক্রিয়ার এক প্রত্যক্ষ ব্যতিক্রম ছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ। জ্ঞানের নানা শাখায় তাঁর সমান মন বিচরণ করে ফিরত। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি কোনটাই তাঁর মনোযোগের বহির্ভূত বিষয় ছিল না। সঙ্গীতে তাঁর প্রভূত জ্ঞান ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে, লখনউ শহরের সুবিদিত সাঙ্গীতিক পরিমণ্ডলের মধ্যেই তাঁর রুচি ও রুচি গড়ে উঠেছিল বলা চলে। রাগ-সঙ্গীতের তিনি একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অন্যদিকে রবীন্দ্র-সঙ্গীতেরও মর্মজ্ঞ ছিলেন। সঙ্গীত বিষয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যে সকল পত্রালাপ হয় তার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ প্রকটিত হয়েছে। ধূর্জটিপ্রসাদের 'কথা ও সুর' এবং 'সুর ও সঙ্গতি' দুটি উৎকৃষ্ট সঙ্গীত-পুস্তক। এ ছাড়া ইংরেজী বাংলায় তিনি কত যে সঙ্গীত-বিষয়ক রচনা করেছেন তার ঠিক-ঠিকানা নেই। ইংরেজীতেই তাঁর কলম চলত বেশী। ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গীত বিষয়ক রচনার বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে শাস্ত্রের কচকচি নেই অথচ তার মধ্যে সাঙ্গীতিক জ্ঞানের যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তাঁর কলমে সাঙ্গীতিক পরিভাষার ব্যবহারও খুবই স্বচ্ছন্দ ছিল। লখনউয়ে থাকতেন বলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতচর্চার মহলে প্রচলিত মুসলমানী বুলি ও 'জবান'গুলি তাঁর নিতান্ত দুরস্ত ছিল। আসলে ধূর্জটিপ্রসাদ ছিলেন সঙ্গীতের উপভোক্তা লেখক, সঙ্গীতের ঐতিহাসিক বা তাত্ত্বিক তিনি ছিলেন না। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে রসোপভোগমূলক আলোচনার তিনি পথিকৃৎ ছিলেন বলতে পারি। এই জাতীয় রচনার অনুশীলনে বর্তমান প্রবন্ধের লেখক একসময় ধূর্জটিপ্রসাদের দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সেই ঋণ প্রকাশ্যে স্বীকার করে ধূর্জটিপ্রসাদের স্মৃতির প্রতি নতি স্বীকার করি।

কিন্তু জ্ঞানচর্চার বহুমুখীনতার যে অসুবিধা, ধূর্জটিপ্রসাদের পক্ষে সেই ত্রুটি অতিক্রম করা সম্ভব হয় নি। কারও পক্ষে তা সম্ভব হয় না। জ্ঞান আজকাল এতই জটিল আর বহুবিস্তৃত হয়ে পড়েছে যে তার এক-একটি বিভাগের বিদ্যা আয়ত্ত করতেই গোটা জীবন কেটে যায়, সেই স্থলে একাধিক বিভাগের বিদ্যা অর্জনে নিছিলাভ অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। অতি-বড় চৌকস প্রতিভা ছাড়া যেমন-তেমন মানুষের কর্ম নয় এক সঙ্গে অনেকগুলি বিদ্যাকে সামাল দিয়ে তাদের নিয়ে নির্বিবাদে ঘরকন্না করা। যুগপৎ বহুর ভজনা করতে গেলে কারও প্রতিই পুরাপুরি মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না।

ধূর্জটিপ্রসাদের বিরুদ্ধে গল্পগ্রাহিতার অভিযোগ উঠেছে। তাঁর জ্ঞান নানামুখী হলেও সে-সকল জ্ঞান উপর-ভাসা ছিল, কেউ কেউ এরকম বলেন। এই সমালোচনা একেবারে ভিত্তিহীন এমন কথা বলতে পারি নে। কিন্তু এই অভিযোগের ভিত্তি স্বীকার করে নিয়েও বলা যায়, তিনি যে সকল বিদ্যার

চর্চা করতেন তার কোনটিতেই তাঁর অধিকার নেহাৎ কম ছিল না। সমাজ-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা—এই ক'টি শাস্ত্রে তো তাঁর প্রভূত অধিকারই ছিল বলতে হবে।

আসলে তিনি যে ব্যক্তির মানস-শিষ্য ছিলেন সেই প্রমথ চৌধুরী আর তাঁর প্রবর্তিত 'সবুজ-পত্র' পত্রিকার সাহিত্য-আন্দোলনের একটা মুখ্য বৈশিষ্ট্যই ছিল এই যে, স্পেশালাইজেশনে তাঁদের আসক্তি ছিল না; জ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে সঞ্চরণেই তাঁদের ছিল আনন্দ। প্রমথ চৌধুরী একবার আধা-মর্মে আধা-বিনয়ে বলেছিলেন যে,—"গবেষণা করবার জন্য ভগবান তাঁকে পৃথিবীতে পাঠান নি।" ধূর্জটিপ্রসাদের মনোভাব ছিল কতকটা তা-ই। কোনরূপ গবেষণা-কর্মে তিনি উৎসাহ পেতেন না, জ্ঞানের নানা ফুলে মধু আহরণ করেই তাঁর মন তৃপ্ত ছিল। এককালীন নানা বিষয়ের চর্চায় স্বীয় মনোযোগ বিক্ষিপ্ত না করে তিনি যদি একটি কি দুটি বিষয়ের অনুশীলনেই মাত্র নিবদ্ধ-দৃষ্টি হতেন, তাহলে নিঃসন্দেহেই তিনি এক কি দুই বিষয়ে পণ্ডিত বলে খ্যাত হতে পারতেন। কিন্তু তাঁর মনের ধাত সে-রকম ছিল না বলেই তিনি ওইদিকে কখনও কোন চেষ্টা করেন নি। একটি বিষয়ে তথাকথিত পণ্ডিত হয়ে আর সকল বিষয়ে অচেতন হওয়ার চাইতে জ্ঞানের এই বহুমুখীনতাকে আমি পল্লবগ্রাহিতার অপবাদ সত্ত্বেও শ্রেয়তর আদর্শ বলব। এতে যে মানসিক ঔদার্যের সঞ্চার হয়, একচক্ষু স্পেশালাইজেশনের চর্চায় তা কোনমতেই অধিগম্য হওয়ার নয়। ধূর্জটিপ্রসাদের মানসিক ঔদার্য ছিল সুপ্রচুর।

ধূর্জটিপ্রসাদ সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যেও কিছু কিছু রচনা করেছিলেন। তাঁর 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত,' 'মোহনা'—এই উপন্যাসত্রয়ী [trilogy] এই ক্ষেত্রে তাঁর শক্তি ও উদ্যমের পরিচয় বহন করছে। প্রমথ চৌধুরীর ঢঙে তিনি কিছু ছোটগল্পও লিখেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাঁর ব্যক্তিক গঠনে আবেগের কিছু অপ্রতুলতা ছিল, এবং মননশীলতাই তাঁতে প্রখর ছিল, সেই কারণে সৃজনাত্মক রচনায় তাঁর তেমন প্রতিষ্ঠা হয় নি। কেবল জেমস জয়েস, মার্সেল প্রুস্ত, ভার্জিনিয়া উলফ প্রভৃতির ধরণে তিনি বাংলায় মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের পথিকৃৎ বলে আধুনিক মহলে কিছু গৌরব লাভ করেছিলেন। ধূর্জটিপ্রসাদ মূলতঃ ছিলেন মননধর্মী লেখক। বুদ্ধি ছিল তাঁর প্রধান অবলম্বন। তাঁর মন চলত যুক্তির সরণিতে, আবেগের খাতে নয়। বোধ হয় এই কারণেই ধূর্জটিপ্রসাদের আবেদন খুব বেশী দূর ছড়াতে পারে নি, মননশীল সাহিত্য পাঠে যাঁরা আনন্দ পান তাঁদের মধ্যেই কেবলমাত্র তাঁর সমাদর সীমাবদ্ধ ছিল। বুদ্ধিজীবী মহলের তিনি আলোচ্য ছিলেন।

ধূর্জটিপ্রসাদের প্রতি বর্তমান লেখকের কৃতজ্ঞতার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে তৎকালপ্রচলিত 'পূর্বাশা' মাসিক পত্রের সাপ্তাহিক সংস্করণে আমি 'নারদ' ছদ্মনামে বাংলা গান সম্পর্কে কতগুলি প্রবন্ধ লিখি। সপ্তাহে সপ্তাহে সেগুলি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হত। লখ্‌নউ প্রবাসী ধূর্জটিপ্রসাদের সেই লেখাগুলি নজরে পড়ে ও ভাল লাগে। তিনি 'পূর্বাশার' সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে পত্র লিখে জানতে চান, ওই লেখাগুলির ছদ্মবেশী লেখকটি কে এবং 'নারদ' আসলে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের দাদা গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য [বর্তমানে স্বর্গীয়] কি-না। এই প্রসঙ্গে অজয় ভট্টাচার্যের নাম ধূর্জটিপ্রসাদের মনে হওয়ার কারণ অজয় ভট্টাচার্য পূর্বাশা পত্রিকার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং সাঙ্গীতিক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। সঞ্জয় ভট্টাচার্য এই ভুল অনুমানের সংশোধন করে পত্রে ধূর্জটিপ্রসাদকে প্রকৃত লেখকের নাম জ্ঞাপন করেন। ধূর্জটিপ্রসাদ লেখাগুলির সম্বন্ধে এতই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন যে তিনি পণ্ডিচেরীতে দিলীপকুমার রায়কে পত্রে সে কথা লেখেন।

সেই থেকে দিলীপকুমারের সঙ্গে আমার পরিচয়ের সূত্রপাত। দিলীপকুমার কলকাতা এলে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি, এবং 'কথা ও সুর' নামক এক প্রবন্ধ-রচনা করে তাঁকে দেখাই। ওই প্রবন্ধে গানে কথা ও সুরের আপেক্ষিক বিচারে সুরের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হয়েছিল। দিলীপকুমার আমার মত স্বীকার করেন না, এবং কথার পক্ষ নিয়ে তিনি এক পাল্টা প্রবন্ধ দাঁড় করালেন। লাবুদডাউন রোডের মিত্রদের বাড়িতে [স্বর্গতা গায়িকা হাসি বসুর মামাদের বাড়ি) এক বৈঠকে এই দুটি প্রবন্ধ পড়া হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ। পরে এই দুই প্রবন্ধ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকায় ছাপা হয় এবং এই বিতর্কে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অমেন্দ্র-নাথ মিত্র প্রমুখ বিদগ্ধ সঙ্গীতরসিকেরা যোগ দেন। 'নাচঘর' পত্রিকায় কেদারকুমার রায় আমার বক্তব্যের প্রতিবাদ করে এক জোর প্রবন্ধ লেখেন। মামলা অনেক দূর গড়িয়েছিল। শেষ অবধি স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপে মামলার নিষ্পত্তি হয়। ১৩৪৪ সালের বিচিত্রা মাসিক পত্রের ফাইল খুললে পাঠক এই মামলার বিস্তৃত পরিচয় পাবেন।

এর পরেও ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে নানা উপলক্ষে দেখা হয়েছে। যখনই দেখা হয়েছে সঙ্গীত ও সাহিত্য নিয়েই কথা হয়েছে বেশী। খুব অমায়িক দিল-দরিয়া খোলা প্রকৃতির লোক ছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ। বৈঠকী আলাপে ছিলেন দুর্ধর্ষ, রসিকতায় ছিলেন সুনিপুণ। কথা একবার শুরুলে বাক্যস্রোত অনর্গল ধারায় প্রবাহিত হ'ত তাঁর মুখ থেকে। এমন বৈঠকী মেজাজের মানুষ আজকাল বড় একটা আর চোখে পড়ে না। আধুনিকতার সবিশেষ উৎসাহদাতা আর প্রগতির প্রবক্তা হলেও এই দিক দিয়ে তিনি ছিলেন পুরাতন ধারার মানুষ। তাঁর মধ্যে মননশীলতা ও বৈঠকী মেজাজের এক সুন্দর সমন্বয় হয়েছিল। এ রকম সমন্বয় ইদানীং বিরল হয়ে পড়েছে।

সজনীকান্ত দাস

মাত্র ৬২ বৎসর বয়সে কবি-সমালোচক গবেষক সম্পাদক সজনীকান্তের পরলোকগমন অকাল বিয়োগের বেদনা নিয়ে প্রতি সাহিত্যধরণীর মনে এক গভীর শূন্যতার অনুভূতির সৃষ্টি করেছে। এত বড় সাহিত্য-প্রাণ ব্যক্তি, সাহিত্য ও সাহিত্যিকের সুহৃৎ বাংলাদেশে আর কেউ ছিলেন না বা নাই। তিনি প্রখর সমালোচক ছিলেন, সাহিত্য ও জাতীয় জীবনে যা তাঁর নিকট অশালীন ও অন্যায় বলে মনে হ'ত তাকে তিনি নির্মম ভাবে আঘাত করতে দ্বিধা করতেন না। অনেক প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিরও কার্য ও রচনার ত্রুটি তাঁর নির্ভীক সমালোচনার শরাঘাতে লাঞ্ছিত হয়েছে। এই জন্য সাহিত্য ও সমাজে তাঁর বৈরীর সংখ্যা কম ছিল না। কিন্তু গুণ গ্রহণে আর গুণকীর্তনেও এই মানুষটি সমান অকুণ্ঠিত ছিলেন। তাঁকে এবং তাঁর সম্পাদিত শনিবারের চিঠি পত্রিকাকে আশ্রয় করে বাংলাদেশে এক শক্তিশালী সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের বিকাশ হয়েছিল। কল্লোল-কেন্দ্রিক সাহিত্যিকদের বিপরীত কোটিতে এঁদের অবস্থান ছিল—কি দৃষ্টিভঙ্গিতে কি রচনাভঙ্গিতে। এঁরাই সত্যিকারের লেখক ছিলেন, কেন না দেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে এঁদের যোগ ছিল, জাতীয় ভাবসাধনার ঐতিহ্য আর দেশীয় সনাতন মূল্যবোধগুলিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার ও অনুসরণ করে এঁরা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে-ছিলেন। ৺ বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, প্রমথনাথ বিশী এঁরা ছিলেন এই গোষ্ঠীর বিশিষ্ট সদস্য, আর সজনীকান্ত ছিলেন এঁদের মধ্যমণি। মোহিতলাল ছিলেন এঁদের অন্যতম।

অর্থাৎ সজনীকান্তের শক্তি বিনাশাত্মক আর গঠনাত্মক এই দুই খাতেই প্রবাহিত হয়েছে। খতিয়ে দেখতে গেলে, গঠনাত্মক খাতেই বেশী প্রবাহিত হয়েছে। ফলে তাঁর প্রতি ভক্ত ও ভূতের সংখ্যা প্রায় সমান-সমান ছিল বলা চলে। এই মানদণ্ডে সজনীকান্তের ব্যক্তিত্ব ছিল অনন্য। তাঁর আর দুড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না বাংলা সাহিত্যে। তিনি একাই একটি প্রতিষ্ঠান ছিলেন। অনেক মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চলতেন—তাঁদের ভিতর নানান ছাঁদের লোক ছিল। মোহিতলালের মত কবিপ্রাণ আর ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত নীরস গবেষণা-গবেষক—যাঁদের প্রকৃতির বৈপরীত্য প্রায় অসেতু-সম্ভব ছিল—এই দুইকে তিনি একসঙ্গে ডাইনে বাঁয়ে সামাল দিয়ে চলতেন। অভিজাত গোত্রের মানুষের সঙ্গে তাঁর ভাব ছিল, আবার অতি দুঃস্থ সাহিত্যিকটিকেও আত্মীয় জ্ঞানে আলিঙ্গন দান করতে পশ্চাৎপদ হতেন না। সকলের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল অতিশয় সহৃদয়। তিনি সামাজিক আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর দরজা বড়-ছোট সবাইয়ের জন্য সমান উন্মুক্ত ছিল। তাঁর দুয়ার থেকে কেউ রুক্ষ ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে ফিরে এসেছে এমন নজীর তাঁর শত্রুপক্ষীয় প্রচারকেরাও কখনও তুলে ধরে দেখাতে পারবে না। সজনীকান্তের সামাজিক সৌজন্যের দৃষ্টান্ত এত ভূরি-ভূরি যে এক-এক সময় প্রত্যয় করা কঠিন হয় যে এই মানুষটিই লেখনী প্রয়োগে এমন প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করতেন মিত্র-অমিত্র উভয় মহলে সকল সময়। দুর্বার তাঁর সাহস, বহুর রোষ উৎপাদন করেও অবিচলিত থাকার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর। উত্তেজনার কারণ সৃষ্টি করে নিজে অনুত্তেজিত থাকা বড় সহজ ব্যাপার নয়। পরকে হাসিয়ে নিজে গম্ভীর হয়ে থাকার চেয়েও তা কঠিন। সজনীকান্ত ওই বিরল গুণের অধিকারী ছিলেন। অকুতোভয়তা তাঁর চরিত্রে সহজাত কবচকুণ্ডলের মত ছিল বলেই ওই অরিষ্টের মধ্যে বসেও অনায়াসে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল বলে মনে করি।

সজনীকান্তের সাহিত্যপ্রাণতার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সাহিত্যসেবীদের তিনি যথার্থ সুহৃৎ ছিলেন। বিপন্ন লেখকদের সাহায্য করবার জন্যে তিনি যেন এগিয়েই থাকতেন সব সময়—তাঁদের মুখের কথাটি খসার মাত্র অপেক্ষা করতেন। নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে প্রাণ ঢেলে পরের জন্য লড়াই করতে তাঁর মত আর কাউকে দেখি নি সাহিত্যিক সমাজে। সজনীকান্তের দ্বারা কোন-না-কোন ভাবে উপকৃত হয়েছেন এমন লেখকের সংখ্যা নিতান্ত কম হবে না। এই প্রবন্ধের ক্ষুদ্র লেখক সেই উপকৃতদের একজন।

আমার জীবনের এক ঘোরতর দুঃসময়ে সজনীকান্ত আমাকে তাঁর স্নেহছায়ার আশ্রয় দিয়েছিলেন। দুসময়ের অনেক বন্ধুই তখন সংস্কৃতবচনের সারবত্তা প্রমাণ করে আমাকে ছেড়ে যেতে দ্বিধা করেন নি, যাঁদের উপর ভরসা ছিল তাঁরাও কেউ কেউ মুখ ফিরিয়েছিলেন, সেই সংকট সময়ে এই মানুষটি অপরিচয়ের আড়াল থেকে নিজাস্ত হয়ে [তখনও তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি] স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে আমাকে তাঁর আত্মীয়তা দান করে বাঁচিয়েছিলেন। তিনি যদি সেই সময় আমার পাশে এসে না দাঁড়াতেন তবে হয়তো আমার অস্তিত্বই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। সজনীকান্তের সেই দুর্দিনের উপকার জীবনে কখনও আমি ভুলতে পারব না। সব কথা এখানে খুলে বলবার নয়। পরে যদি কখনও সুযোগ হয় ও লেখার বিস্তৃততর জায়গা পাই তখন ওই প্রসঙ্গটি সবিস্তারে আলোচনা করা যাবে। আপাতত এই মাত্র বলে রাখি, সজনীকান্তের বরদী-চিত্তের স্পর্শ ও অবারিত স্নেহ পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি, তাঁর কাছে আমার ঋণের শেষ নেই।

এর পর প্রায় একটানা দু'বছর সজনীকান্তের অতি নিকট-সান্নিধ্যে আমার কেটেছে। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকার সূত্রে তাঁকে অতি কাছে থেকে দেখবার সুযোগ হয়েছে। দেখেছি কী সুবিবেচক অপরের সুখ-দুঃখের প্রতি সজাগদৃষ্টি হৃদয়বান মানুষ তিনি। অপরিচয় বা অর্ধ-পরিচয়ের

বৃত্তসীমার উপর দাঁড়িয়ে মানুষ মানুষের কী ভুল বিচারই না করে। পরিচয়ের সীমার মধ্যে এলেই মানুষের আর এক রূপ—আত্মীয়তার সুস্থির রূপ। সজনীকান্তের সঙ্গে যখন পরিচয় ছিল না তখন লোকশ্রুতি প্রভাবাৎ তাঁর সম্বন্ধে কী অমূলক ধারণাই না ছিল। সেই ধারণা তো কবেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আজ সজনীকান্তের বিয়োগে মনের ভিতর একটা গভীর আত্মীয়বিয়োগের বেদনা অনুভব করছি। যখনই তাঁর কথা স্মরণ হয় তখনই মনটা ব্যথায় উদাস হয়ে যায়। হায়, এমন বহুপকারক মিতা-প্রত্যাকাঙ্ক্ষী অভিভাবকস্থানীয় সাহিত্য-সুহৃদের দেখা আর কোথায় পাব? সজনীকান্তের শূন্যতা কোনমতেই ভরাট হওয়ার উপায় নেই।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

ভারতবিশ্রুত সাংবাদিক প্রখর মনীষার অধিকারী আশ্চর্য প্রতিভার অমিত তথ্যজ্ঞানের খনি স্বনামধন্য হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ আর ইহলোকে নেই। তাঁর তিরোধানে উনিশ শতকের সঙ্গে এই শতকের শেষ যোগসূত্রটি বুঝি ছিন্ন হয়ে গেল। যদিও তিনি নিতান্ত পরিণত বয়সেই দেহরক্ষা করেছেন এবং সেই দিক থেকে আমাদের আক্ষেপ করবার কিছু নেই, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে একটা আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তাঁর দেহে বা মনে জরার লক্ষণ মোটেই প্রকাশ পায় নি। অক্লান্তকর্মা লেখক ছিলেন তিনি, ক্লেদহীন অধ্যবসায়ের এক সুমহান দৃষ্টান্ত। এই সেদিনও কোন জাতীয় উৎসবের উপলক্ষ্যে ঘিরে তিনটি চারটি মীটিংয়ে বক্তৃতা করতে তাঁকে ক্লান্তিবোধ করতে দেখি নি। আমাদের তাক লেগে যেত। এত প্রাণশক্তি কোথা থেকে সংগ্রহ করেন? বছর চারেক আগে শাইকপাড়ায় এক রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের প্রাঙ্গণে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বললেন, একটা মীটিং সেরে এসেছেন, এইটে দ্বিতীয়, এর পর যাবেন উল্টাডাঙ্গায় আর একটা মীটিং সারতে। আমরা তাঁর তুলনায় নিতান্ত খুকা বয়সী বললেই হয়। মীটিং করারও অভ্যাস আছে। কই, আমাদের তো এত শক্তিতে বা উৎসাহে কুলায় না। তবে কি এই প্রাণশক্তি উনিশ শতকেরই বিশেষ মানস-আবহাওয়ার দান—যে মানস-আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট হয়েছিল হেমেন্দ্রপ্রসাদের ব্যক্তিত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি ও শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত বৈদগ্ধ্য? জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর লেখনীর বিরাম ছিল না। এই 'প্রবাসী' পত্রিকাতেই তাঁর কত লেখা বেরিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। পঞ্চাশী ছিয়াশী বছরের বুড়োও এমন ক্লান্তিহীন অনালস্যের দৃষ্টান্ত আমাদের শিক্ষাস্থল হওয়া উচিত।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ইংরেজী বাংলায় সমান দুর্ধর্ষ লেখক ছিলেন। বোধ হয় ইংরেজী ভাষাতেই সমধিক কৃতী ছিলেন। ওটাও উনিশ শতকের বৈশিষ্ট্য। উনিশ শতকীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা সকলেই ইংরেজী ভাষায় মহাপারঙ্গম ব্যক্তি ছিলেন। সে-রকম অবলীলায়িত ইংরেজীর জ্ঞান অধুনা দেখা যায় না। আজ থেকে ১৭।১৮ বছর আগে কলকাতায় All Indian Newspaper Editor's Conference-এর বাৎসরিক অধিবেশন হয়। বম্বে ক্রনিকল-সম্পাদক পরলোকগত আবদুল্লা ব্রেলভি হয়েছিলেন তার সভাপতি। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন 'Doyen of Indian Journalism' হেমেন্দ্রপ্রসাদ। আমরা ডেলিগেট হয়ে সেই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলুম। অধুনা-বিলুপ্ত সিনেট হাউসে এই সম্মেলন হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি

রূপে হেমেন্দ্রপ্রসাদ যে লিখিত ভাষণ পাঠ করেছিলেন তা তাঁহার চমৎকারিত্বে ও জ্ঞানের গভীরতায় বহু ওকীলদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পরদিন 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় হেমেন্দ্রপ্রসাদের অভিভাষণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ছাপা হয় এবং বিশেষ করে তাঁর ইংরেজী ভাষার অতুলনীয় অধিকারের উল্লেখ করা হয়। ইংরেজ-পরিচালিত পত্রিকায় কোন ভারতীয়ের ইংরেজী জ্ঞানের প্রশংসার তাৎপর্য আশা করি সকলেই হৃদয়ঙ্গম করবেন। এমনি ছিল হেমেন্দ্রপ্রসাদের ইংরেজী ভাষার উপর দখল।

আর একবার স্টুডেন্টস হলে কি মহাবোধি সোসাইটি হলে ঠিক মনে নেই, কংগ্রেস আন্দোলনের ইতিহাস লেখক ডাঃ পট্টভি সীতারামায়া সাংবাদিকতার উপর এক বক্তৃতা দেন। সেই সভায় সভাপতি ছিলেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ। কী চমৎকার এই ইংরেজী বক্তৃতা দিলেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ! সেই সভায় অন্যতম বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক ৺ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—আমাদের সত্যেনদা। সত্যেনদা হেমেন্দ্রপ্রসাদের উপর ইংরেজীতে বলবার ভার ছেড়ে দিয়ে নিজে বাংলায় বললেন। আজকাল ইংরেজীতে বলবার রেওয়াজ যেন থেকে উঠেই যাচ্ছে বলতে গেলে। যে-সব ইংরেজী বক্তৃতা মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায় সে কহতব্য নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের নানা বৈশিষ্ট্যই ইদানীং লুপ্ত হবার মুখে। ইংরেজীতে অনর্গল বলতে কইতে পারার ক্ষমতাটাও লুপ্ত হয়ে এল বলে।

অনেকের ধারণা, হেমেন্দ্রপ্রসাদ খুব রাশভারী প্রকৃতির লোক ছিলেন, লোকে নাকি তাঁর কাছ ঘেঁষতে চাইত না। তাঁর মুখমণ্ডলের ধারালো বহিরঙ্গ সাহেবি ভঙ্গির ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি [ওটাও উনিশ-শতকীয়] এবং কতকটা লালাভ চক্ষু বোধহয় তাঁর সম্পর্কে ওই ধারণা সৃষ্টি করে থাকবে। আমার অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্য রকম। যদিও স্বল্পকালস্থায়ী সেই অভিজ্ঞতা, তা হলেও তার থেকেই একটা মানুষের প্রকৃত পরিচয় পেতে বুঝি অসুবিধা হয় না।

তখন আমার বয়স তেইশ কি চব্বিশ। সংবাদপত্রের আপিসে চাকুরিপ্রার্থী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। চেষ্টার ত্রুটী নেই, কিন্তু চাকুরী মিলছে না। একদিন কী মনে হল, বৈনিক বসুমতীতে একবার ঢুঁ মেরে দেখব সংকল্প করলাম। বসুমতীর যোগীন্দ্রপ্রতাপ সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদের কাছে যেতে বুক দুরদুর করছিল, তবু একবার মা দুর্গা বলে সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে ওঁর ঘরে ঢুকে পড়লাম। লিখছিলেন, মুখ তুলে চাইলেন। আমার অনাহূত প্রবেশে বা কর্মে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় আদৌ বিরক্তি প্রকাশ করলেন না, বরং ধৈর্য ধরে আমার সকল কথা শুনলেন। বললেন, বেশ সহৃদয় ভাবেই বললেন, এখন তো সাব-এডিটারের পোস্টে কোন 'ভ্যাকান্সি' নেই, পরে পদ খালি হলে আমার জন্য চেষ্টা করে দেখতে পারেন। ব্যস, আমার তদানীন্তন অবস্থায় এইটুকু সান্ত্বনা বাক্যই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। চাকুরি আমার হয় নি ঠিক, কিন্তু মানুষটি সম্বন্ধে যে প্রসন্ন ধারণা নিয়ে সেদিন ফিরে এসেছিলাম তার স্মৃতি এত দিন পরেও আমার চিত্তে অম্লান আছে।

সঙ্গীত আসর

বসন্তের গান

বাগেশ্রী বাহার—চৌতাল

বসন্ত হইল রাজা ছয় রাগিণী রাণী
স্থলজ জলজ কুসুম কানন মাঝে রাজধানী ॥
শোভাকর শশধরে শিখীগণে ছত্রধরে
নৃত্য করে খঞ্জন গুঞ্জরে মধু মানি ॥
মন্দ মলয় মারুত হয়ে মন্দগতি দূত
নগরে নগরে প্রতি ঘরে ঘরে কহে এই বাণী ॥
কি কুমন্ত্রী পঞ্চশর কু কোকিল নিশাচর
ফিরিতেছে বিরহ ছল চাহিয়া হয় কি না জানি ।

কথা—রাধামোহন সেন

সুর ও স্বরলিপি

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১´		০		২		০		৩		৪		
সা	সা	মা	মা	মা	পা	ধ পা	মজ্ঞা	জ্ঞা	মা	জ্ঞা	-া	I
ব	স	০	ন্ত	হ	ই	ল ০	রা ০	জা	০	০	০	

১´	০		২		০		৩		৪	১´		০		২	
মা	পা ধা	ধা	ধা	না	না	র্সা	I-	I-	I- -া	I র্সা	র্সা	র্সা	র্সনা	র্রা	র্সা
ছ	০ র	রা	ণি	ণী	রা	ণী	০	০	০ ০	ব	ল	ক	ক ০	ল	ক

০		০		৪		১´		০		২	
পা	ধা	প ধ পা	পা	পা	পা I	মজ্ঞা	I-	মা	ধা	র্সা	পা ধা
কু	হু	ক ০ ০	কা	ন	ন	মা ০	০	বে	০	রা ০	ক

০		০		৪		
মজ্ঞা	মজ্ঞা	মজ্ঞা	রা	সা	-া	II
ধা ০	০০	০০	নী	০	০	

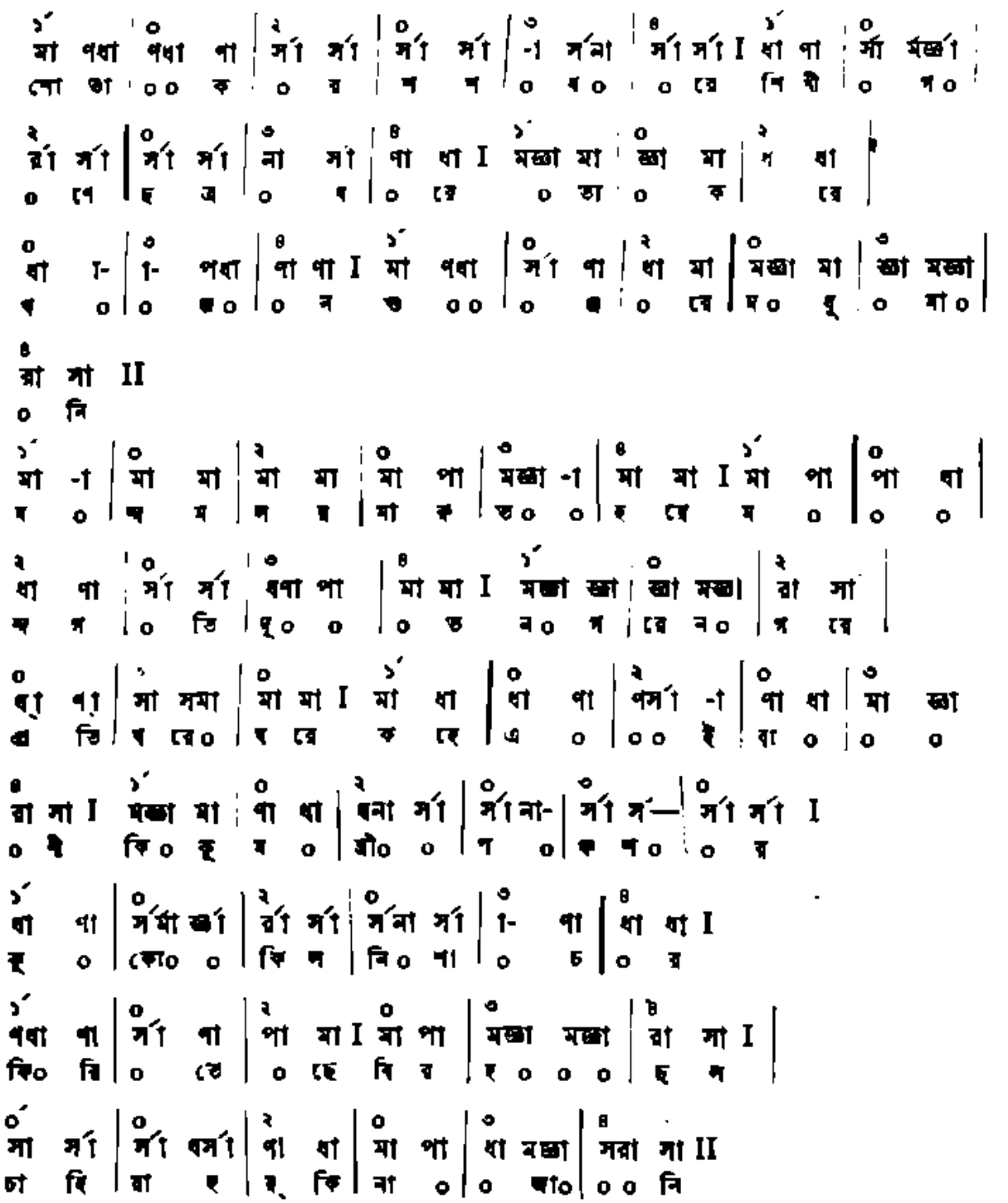
১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
মা পধা ধপা পা | র্সা র্সা | র্সা র্সা | -া র্সনা | র্সা র্সা I ধা পা | র্সা র্মর্জ্ঞা |
সো ভা oo ক o র | শ শ | o ধ o | o রে শি খী | o শ o |
২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
র্রা র্সা | র্সা র্সা | না সা | পা ধা I মজ্ঞা মা | জ্ঞা মা | শ ধা |
o দে | ছ ত্র | o ধ | o রে o তা | o ক | রে |
০ ০ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩
ধা ।- | ।- পধা | পা পা I মা পধা | র্সা পা | ধা মা | মজ্ঞা মা | জ্ঞা মজ্ঞা |
ধ o | o জ o | o ন ক oo | o জ | o রে | ম o ধু | o মা o |
৪
রা সা II
o নি
১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
মা -া | মা মা | মা মা | মা পা | মজ্ঞা -া | মা মা I মা পা | পা ধা |
ধ o | অ ম | ন র | মা ক | ক্ত o o | হ রে ম o | o o |
২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
ধা পা | র্সা র্সা | ধপা পা | মা মা I মজ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা মজ্ঞা | রা সা |
অ শ | o তি | ধু o o | o ত ন o শ | রে ন o | শ রে |
০ ১ ০ ১´ ০ ২ ০ ৩
ধ্রা পা | সা সমা | মা মা I মা ধা | ধা পা | পর্সা -া | পা ধা | মা জ্ঞা |
প্র তি | ধ রে o | ধ রে ক রে | এ o | oo ই | রা o | o o |
৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ০
রা সা I মজ্ঞা মা | পা ধা | ধনা র্সা | র্সা না- | র্সা র্স— | র্সা র্সা I |
o ধী | কি o হু | ম o | ত্রী o o | শ o | ক শ o | o র |
১´ ০ ২ ০ ৩ ০
ধা পা | র্সর্মা জ্ঞা | র্রা র্সা | র্সনা র্সা | ।- পা | ধা ধা I |
হু o | কো o o | কি শ | বি o শা | o চ | o র |
১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
পধা পা | র্সা পা | পা মা I মা পা | মজ্ঞা মজ্ঞা | রা সা I |
কি o বি | o ছে | o ছে বি ব | হ o o o | ছ শ |
০´ ০ ২ ০ ৩ ৪
সা র্সা | র্সা ধর্সা | পা ধা | মা পা | ধা মজ্ঞা | সরা সা II |
চা হি | রা হ | র্ কি | না o | o জা o | oo নি |

একজন আর কয়েকজন

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

[পূর্বানুবৃত্তি]

চিনি চিনি করছি, অথচ ঠিক চিনতে পারছি নে, বুঝছি অথচ ঠিক বুঝতে পারছি নে—সংশয়ান্বিত এই অবস্থার বিশেষ একটু মজা আছে। এই মজায় মজে থাকতেন মাঝে মাঝে উপেন্দ্রনাথ। আর তাই নিয়ে তারি মজার ঘটনা ঘটতো।

'শেষ বৈঠকের বিষ্ণুনাগ কে?' এ-প্রশ্ন শুধু উপেন্দ্রনাথের পাঠকশ্রেণীর নয়, তাঁর বহু আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধবেরও। উপেন্দ্রনাথ বলেন, 'কেন? বিষ্ণুনাগ একজন মানুষ। যেমন তুমি, আমি আর পাঁচজন। শুধু একটুখানি তফাৎ। মানুষের মতন না চলে তিনি চলেন ঘোড়ার মতন। সাধারণ জুতোর পরিবর্তে পাদুকা হিসাবে ব্যবহার করেন অ্যাম্বিউনিশন বুট।'

বিষ্ণুনাগের আকৃতির বর্ণনা দিয়ে উপেন্দ্রনাথ আরো বলেন,—'মাথায় এক মাথা কাঁচা-পাকা চুল, নাতিদীর্ঘ অবশিষ্ট দেহ, অঙ্গে গলাবন্ধ কোট, পরিধানে মিলের ধুতি। কোটের-প্রবিষ্ট দুই চক্ষু হতে নির্গত সার্চ লাইটের ন্যায় প্রখর অনুসন্ধানী দৃষ্টি। প্রকৃতির কথা ঠিক করে বলা কঠিন। কখনো বজ্রাদপি কঠোরাণি, কখনো বা পুষ্পের মতন কোমল।'

তবু তাঁকে সম্পূর্ণ চেনা যায় না। কেন না, পায়ে তাঁর যে পাদুকাকে অ্যাম্বিউনিশন বুট বলে মনে হয়ে ছিল, অনুমানে দেখা গেল তা নাগরা জাতীয় কোনো জুতো যাতে সম্প্রতি তিনি নাল লাগিয়ে থাকবেন, তাই ঘোড়ার চালে সিঁড়ি ভাঙেন। এই রহস্যময় ব্যক্তিকে ঘিরে উপেন্দ্র-অনুরাগী মহলে জল্পনা-কল্পনার আর অন্ত নেই।

বিষ্ণুনাগ নিজের পরিচয় সম্পর্কে বলেন,—'নাগ মহাশয়কে শুধু নাগ মশায় বললেই সবটা বুঝবে না, বিষ্ণুনাগ বললে তবে হয়তো খানিকটা বুঝতে পারবে।'

বিষ্ণুনাগ রহস্যময় পুরুষ—সম্পূর্ণ চেনা-জানার বাইরে নিজেকে রহস্যের আবরণে ঢেকে রাখেন তিনি। উপেন্দ্রনাথও তাই এক এক সময় তাঁকে ভুল করেন।

বৈঠক যখন জমজমাট—বিষ্ণুনাগ তখন আকৃতি এবং প্রকৃতিতে একজন, সাধারণ বৈঠক যখন নিঃসঙ্গ তখন বিষ্ণুনাগ অন্য এবং অনন্য। ঐকে ডাকের আসরে আমার সঙ্গে একসুরে হয়ে উপেন্দ্রনাথ বিষ্ণুনাগের সঙ্গে কোমর বেঁধে লড়েছেন, আবার নিঃসঙ্গের নিঃসীমতায় বিষ্ণুনাগের সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়েছেন।

সহাস্যে উপেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে বলেন,—'বুঝলে ভায়া, চোখটা সত্যিই গেছে। তা না হলে বিষ্ণুনাগকে চিনতে কষ্ট হয়?'

আমি বলি 'সে কী দাদা! আর সকলের সঙ্গে না হয় আপনার চোখের সম্পর্ক, কিন্তু বিষ্ণুনাগ তো আপনার মনের জন। তাঁকে চিনতে বাইরের চোখের দরকার কী?

উপেন্দ্রনাথ বলেন,—'লোকে তাই থেকে থেকে সন্দেহ করে যে বিষ্ণুনাগ বুঝি-বা কাল্পনিক।'

আমি বলি—'কেন? আপনি তো প্রমাণ রেখে গেছেন। আমার কথা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু সিভিলিয়ান এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক যেবেশ বাঁড়ুজ্যে মশাই বিষ্ণুনাগকে তো স্বচক্ষে দেখেছেন।'

'তবু ভুল হয়। স্বামীকে যেমন স্ত্রী বলে ভুল করি। যেমন একটি ফুটকির খোঁচায় স্বামীকে তার কল্পলোক থেকে সরিয়ে রাজসিংহাসনে বসিয়ে ফেলি।'

আমি বলি—'তাতে কিন্তু কোনোই কারণ থাকে না। সাহিত্যিক বাণী রায় ফুটবলের খেলোয়াড় বাণী হলে আমরা তাঁর লেখা সাদরে পড়তে পারি।'

উপেন্দ্রনাথ বলেন,—'বাণী রায়ী না হয় কাল্পনিক নেহাৎ কিন্তু তার চেয়েও যে মারাত্মক ভুল হচ্ছে অনেককাল। শ্রীমতী হাসি ভট্টাচার্য যে বেমালুম অন্য পদবীতে চলে যাচ্ছিলেন। ভাগ্যিস্ ননীমাধব চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন, তাই না রক্ষে। ননীমাধব চৌধুরী বললেন,—দাদা ইনি অনিল ভট্টাচার্যের স্ত্রী। আপনি ভুল করছেন।'

বললাম,—'শ্রীমতী ভট্টাচার্য পদবী ঘুরিয়ে কিন্তু নাতে উঠছিলেন।'

'আর তুমি? তোমাকে রোজ দেখি, অথচ সেদিন হঠাৎ তোমাকে সুবোধ বলে ভুল করলাম।'

আমি বললাম,—'তাতে ক্ষতি কি? অনিল ভট্টাচার্য যদি সুবোধ চক্রবর্তী হন তাতে তাঁর লোকসান নেই, বরঞ্চ লাভই ষোল আনা।'

উপেন্দ্রনাথ বলেন,—'লোকে বলবে মতিভ্রম। বুড়ো সত্যিই এবার চোখ হারিয়েছে।'

আমি বললাম,—'না দাদা। এ হচ্ছে আপনার অনুরাগ। মনের চোখ যখন শ্রীমতী বসুকে দেখতে চায়, বাইরের চোখ তখন শ্রীমতী ভট্টাচার্যের মধ্যে শ্রীমতী বসুকে দেখে। অনিল ভট্টাচার্যও তখন সুবোধ চক্রবর্তী হয়ে দেখা দেয়।'

উপেন্দ্রনাথ বলেন,—'বিষ্ণুদাস কিন্তু ঠিক তোমার এই বিশ্লেষণে সায় দেন। তাঁর নিজের পরিচয় ভ্রষ্টতার অন্তেও তখন তাঁর মনে বিকোভ থাকে না। আর এইটেই হচ্ছে সংশয়ান্বিত অবস্থার বিশেষ মজা।'

রবিবার সকাল বেলা বৈঠক বসেছে উপেন্দ্রনাথের দ্বিতলের প্রকোষ্ঠে—খাস বৈঠক। বৈঠক সবে শুরু হয়েছে। আমি কাছের অধিবাসী—একান্ত কাছের লোক। আমাদের বালিগঞ্জ প্রেসের গোটাকয়েক বাড়ির পিছন টপকালেই উপেন্দ্র-সদন। তাই প্রথম হাজিরা দেওয়ার পালা আমার।

নিচের তলায় লালি ঘেউ ঘেউ করে উঠলো। উপেন্দ্রনাথ সচকিত হয়ে উঠলেন।

'দাদা, আসতে পারি?'

'আরে এসো, এসো!'

'শরীর কেমন?'

'কুতঃ কুশলমস্মাকম্ আয়ুর্যাতি দিনে দিনে।' উপেন্দ্রনাথ বলেন,—'যখন দিন দিন আয়ু যাচ্ছে, তখন আমাদের কুশল আবার কোথায়?'

আগন্তুক সমর্থন সূচক ঘাড় নাড়লেন।

'কিন্তু তোমার সম্পর্কে আমার ভয়ানক অভিযোগ।'

উপেন্দ্রনাথের কথায় আগন্তুক বললেন,—'কী অপরাধ করেছি দাদা?'

'ভীষণ অপরাধ। লেখা ছেড়ে দিয়েছো।'

'আর সময় পাই কোথায়?'

'কেন, বাঁধুনি কী চুল বাঁধে না?'

আরো গুটি কয়েক কথাবার্তার পর এক কাপ চা আর দুটি সন্দেশ খেয়ে আগন্তুক বিদায় নিলেন, 'আজ উঠি দাদা। এদিকে এসেছিলাম, একবার পায়ের ধুলো নিয়ে গেলাম। আর তো আসা-যাওয়া ঘটে না।'

'এসো। আর এবার এসো লেখা নিয়ে।'

আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। আমার অপরিচিত কেউ এলেই উপেন্দ্রনাথ সর্বাগ্রে আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটিয়ে দিতেন। এ-ক্ষেত্রে আধ ঘণ্টার আলাপ-পরিচয়ের মাঝে আগন্তুকের সঙ্গে আমি অপরিচিত রয়ে গেলাম।

ভদ্রলোক বিদায় নেয়ে গেলে জিজ্ঞেস করলাম,—'উনি কে দাদা? আগে লিখতেন, অথচ আমার সঙ্গে পরিচয়ই হলো না।'

উপেন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে বললেন,—'সে কী, তোমার বিশেষ বন্ধু উনি। একই পাড়ায় দীর্ঘদিন তোমরা বসবাস করো!'

বিস্ময়ের মাত্রা আমার আরো বেড়ে গেলো। বললাম,—'আমার বিশেষ বন্ধু, একই পাড়ায় থাকি; অথচ আমি চিনতে পারলাম না! এ যে ভীষণ এবং কঠিন পরিহাস দাদা!'

উপেন্দ্রনাথ অবাক হয়ে গিয়ে বললেন,—'পরিহাস! বলো কী হে?'

'হ্যাঁ, দাদা সত্যিই পরিহাস।'

'কেন, উনি কী অ্যাডভোকেট জ্যোৎস্না চন্দ নন?'

কথাটা শুনে আঁতকে উঠলাম। উপেন্দ্রনাথ কি জানেন না—কঠিন রোগশয্যায় জ্যোৎস্না চন্দ শায়িত। তার কিছুদিন পরেই সাহিত্যিক এবং পুলিশ কোর্টের বিখ্যাত উকিল জ্যোৎস্নানাথ চন্দ পরলোকে গমন করলেন।

উপেন্দ্রনাথ সে সংবাদে ব্যথিত হয়ে বললেন,—'চোখের ভুলে সেদিন যাঁকে জ্যোৎস্না চন্দ বলে ভুল করলাম—তাঁর দেখা হয়তো আবার পাবো; কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ মনের চোখে সেদিন জ্যোৎস্নাকে দু'দণ্ড কাছে পেয়েছিলাম। জ্যোৎস্নাকে আমি বড় স্নেহ করতাম।'

সংশয়মিশ্র এই অবস্থাকে স্নেহ-বিজ্ঞানীরা কী বলবেন জানি নে; কিন্তু মনোবিজ্ঞানে নিশ্চয়ই বলে—এটা অনুরাগ-সিঞ্চিত স্নেহ এবং ভালোবাসা।

স্নেহ এবং ভালোবাসার পাত্র-পাত্রীকে মনের আশে-পাশে আমরা যাবে মাঝে পাই—যখন ঐকান্তিক ভাবে মন তাকে চায়। এই মনের চাওয়ায় উপেন্দ্রনাথ চাওয়া-পাওয়ার মাঝে মধ্যে থাকতেন মাঝে মাঝে।

কিছু বোঝা এবং কিছু না বোঝা, কিছু আলো আর কিছু অন্ধকার, কিছু আস্বাদ এবং কিছু আস্বাদন—এইতো হচ্ছে রসের কথা। সেখানেও সংশয়মিশ্র অবস্থা। এই সংশয়মিশ্র অবস্থার সঙ্গে ফোটোগ্রাফের 'out of focus softness'-কে তুলনা করেন রসিক এবং স্রষ্টা উপেন্দ্রনাথ।

সাহিত্য সম্পর্কে অতি বাস্তবতাকে তিনি বলেন ফটোগ্রাফির 'hard focusing' বা অতি স্পষ্টতার দোষ। 'soft effect'-এর যে মজা তাই হচ্ছে সৃষ্টির আস্বাদ এবং আস্বাদন। প্রত্যক্ষে যা তুমি দেখলে সেইটাই শেষ দেখা নয়—অপ্রত্যক্ষে আরো কিছু রয়ে গেল—যাকে বুদ্ধি দিয়ে দেখতে হয়।

কিন্তু শুধু বুদ্ধিবাদই কি মহৎ সাহিত্যের লক্ষণ?

উপেন্দ্রনাথ বলেন—'না, তাও নয়। কিছু বোঝা এবং কিছু না বোঝা, কিছু আলো আর কিছু অন্ধকার, কিছু আস্বাদ এবং কিছু আস্বাদন—এই হচ্ছে প্রকৃত সাহিত্যসৃষ্টি।'

আধুনিক কালের দুর্বোধ্যতা নিয়ে তাই উপেন্দ্রনাথ তর্ক তুলতেন মাঝে মাঝে। তিনি বুদ্ধিবাদী কিন্তু তাই বলে অহেতুক জটিলতার পক্ষপাতী নন।

সাম্প্রতিককালের কোন একটি পত্রিকায়—একটি গল্প পড়ে একদিন ডেকে পাঠালেন আমাকে। বললেন,—'এই গল্পটি পড়ো।' ...'চিলউড়ছে কাক ঠোকরাচ্ছে ক্রিং ক্রিং বাইরে তার শিয়নের ডাক... ইত্যাদি, ইত্যাদি।' অর্থাৎ কয়েকটি বিচ্ছিন্ন শব্দ, কয়েকটি সংকেত এবং ইঙ্গিতের ব্যঞ্জনা।

প্রশ্ন করলেন উপেন্দ্রনাথ,—'কিছু বুঝলে?'

অজ্ঞতার ভান না করে স্পষ্ট করে উত্তর দিলাম,—'না।'

'কেন?'

'বুঝিনাম পাঠক নই বলে।'

'যিনি লিখেছেন, তিনি কি বুদ্ধিতে খুব বড়?'

বললাম,—'না, তাও ঠিক নয়। তিনি নতুন টেক্‌নিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিশ্বাসী। কথাসাহিত্যের গতানুগতিকতাকে বর্জন করতে চেয়েছেন।'

'কিন্তু আমরা যে ফাঁকিতে পড়ে থাকছি!'

'সেটা আপনাদের অন্ধ সংস্কার।'

উপেন্দ্রনাথ হাসলেন। বললেন,—'তুমিও এড়িয়ে গেলে।'

আমি বললাম,—'পণ্ডিতের সমাজে আমাদের অবস্থা এখন যাবৎ কিঞ্চিৎ—'

উপেন্দ্রনাথ বললেন,—'আচ্ছা তাহা, দুর্বোধ্য জিনিসটা কী?'

বললাম,—'অস্পষ্টতা, অন্ধকার, রহস্য। যাকে দেখতে পাই নে। খুঁজতে গিয়ে আনন্দ পাই। আধুনিককালে স্পষ্টতায় আসক্তি নেই।'

উপেন্দ্রনাথ বললেন,—'অস্পষ্টতা, অন্ধকার, রহস্য, মিস্টিক। তাতে তো আমরাও আনন্দ পাই। প্রেমেন মিত্তিরের কবিতার উপমা কালিদাসের উপমা নয়, সে উপমা সৌন্দর্যের অলঙ্কার নয়, কিন্তু তাতে ক্ষতি কী? জীবনানন্দ দাশের ধান-সিঁড়ি আমাকেও কল্পনার আস্বাদ দেয়। ডিকেন্‌স, হাক্সলির গদ্য লেখার বুদ্ধিবাদ আমার কাছে অর্থহীন নয়। কিন্তু আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের কয়েকজনকে যা দেখছি—তাতো আগাগোড়া অর্থভ্রষ্ট, রস পরিবেষণ তো দূরের কথা—মাথা ধরার যন্ত্রণা দেয়।'

আমি বললাম,—'দাদা, এটা প্রাথমিক পর্যায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা সবেমাত্র শুরু হয়েছে। এখনি এ-সম্পর্কে কোনো মত দেওয়া সমীচীন হবে কী?'

উপেন্দ্রনাথ বললেন,—'একটা সুস্থ আলোচনা চালু করো না কেন? একদিন বৈঠকে নারায়ণবাবুকে ডাকো।'

'নারায়ণ গাঙ্গুলি?'

আমার কথায় উপেন্দ্রনাথ বললেন,—'নারায়ণ গাঙ্গুলি তো আমাদের দলের লোক। তাঁর মধ্যে তো কোন অস্পষ্টতা নেই। বলিষ্ঠতা আছে। জীবন বোধের বাস্তবতার সঙ্গে কাব্যের আবেগ—তিনি সৎ শিল্পী।'

আমি বললাম,—তা হলে সমালোচক নারায়ণ চৌধুরীর কথা বলছেন?

উপেন্দ্রনাথ বললেন,—'হ্যাঁ। বড় নির্ভীক এবং যুক্তিবাদী সমালোচক। আমার ইচ্ছে ওঁকে দিয়ে আমাদের কাগজে এই পর্যায়ের একটা বড়দরের আলোচনা চক্র চালাই। শ্রীযুক্ত ইন্দিরা চৌধুরীকে দিয়ে শুরু করিয়ে যেমন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের তান বিস্তার প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একটি নতুন দিককে মেলে ধরা গেল, তেমনি আধুনিক সাহিত্যের দুর্বোধ্যতাকে নিয়ে একটা সুস্থ এবং স্বাস্থ্য-সম্মত আলোচনার প্রয়োজন আজ সত্যিই দরকার হয়ে পড়েছে।'

আমি বললাম,—'কিছু বোঝা এবং কিছু না বোঝা, কিছু আলো আর কিছু অন্ধকার, কিছু আস্বাদ এবং কিছু আস্বাদন'—আপনার এই মন্তব্যই কী যথেষ্ট নয়?'

উপেন্দ্রনাথ বললেন,—'ধরো এই হচ্ছে সুর। এইবার সুর থেকে সারগ্রামে যাওয়া যাক। ডাকো বড় বড় ওস্তাদদের।'

খোলা জানালা।

সাকি

অনুবাদ—সুপ্রিয়া সেন

বেশ সপ্রতিভাবে মেয়েটি বললে,—'সিসিমা এই এলেন ব'লে। এ-সময়টুকু বরং আমার সঙ্গেই কাটাবার চেষ্টা করুন।' তখনো সন্ধে হয় নি। বিকেলবেলার নরম প'ড়ে আসা আলোয় আস্ত ঘরটা ঝিম ধ'রে চুপ ক'রে আছে। কোন কথা বললে পিতৃষসা আর ভ্রাতুষ্পুত্রী দু'জনকেই খুশি করা চলে, শটেল তা মনে মনে ভাবার চেষ্টা করলো; কিন্তু সেই কথাটাকে কিছুতেই খুঁজে পাওয়া গেল না। তার স্নায়ুগুলি এতই অস্থির যে ডাক্তারের পরামর্শে তাকে হাওয়া বদলাতে আসতে হয়েছে—যাতে তারা কথঞ্চিৎ বিরাম পায়; কিন্তু হাওয়া বদলাতে এসে এ-সব সামাজিক সাক্ষাতের আদৌ কোনো দরকার আছে কি না তা শটেল নিজেই ভেবে পায় না। এই গ্রামে আসার প্রস্তুতির মুখে তার বোন একবার বলেছিলো,—'সেখানে কি মরতে যাচ্ছো। কোনো মানুষের সঙ্গে কথা না ব'লে তো তোমার স্নায়ুপীড়া বাড়বে বই কমবে না। অবশ্য, যাদের চিনি, তাদের কাছে চিঠি দিয়ে দিচ্ছি: তারা দয়া করলে অন্তত কথা বলার চমৎকার লোক খুঁজে পাবে।' এবং তাই এবারে যাঁর কাছে সে এসেছে সেই শ্রীযুতা স্যাপলটন উক্ত চমৎকার লোকেদেরই একজন কি না, শটেল ব'সে ব'সে তাই ভাবছিলো। চুপচাপ থাকার একঘেয়েমি কাটিয়ে উঠে মেয়েটি বললে, —'আপনি বুঝি এখানকার অনেককেই চেনেন?'

'প্রায় কাউকেই নয়। বছর চারেক আগে আমার কোন একবার এখানে এসেছিল, তারই কয়েকটা চিঠি আমার সম্বল।'—শটেলের কথায় কোথায় যেন একটু আক্ষেপের সুর।

'ওঃ, তবে তো আপনি আমার সিসিমার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না।' তরুণীর স্পষ্ট উক্তি শুনে শটেল স্বীকার করলে,—'নাম আর ঠিকানা মাত্র—কেবল ওইটুকুই।' মনে মনে সে তখন ভাবছে শ্রীযুতা স্যাপলটন বিধবা কিনা। পুরুষের অস্তিত্বের একটা অদৃশ্য চিহ্ন এ-ঘরে আছে ব'লেই তার বোধ হ'লো।

শটেলের বিব্রত মুখ দেখে মেয়েটি চট ক'রে ব'লে উঠলো, সেই মহা দুঃখের ব্যাপারটা ঠিক তিন বছর আগেই ঘটেছে। আপনার বোন তারপরে তো আর আসেন নি।'

'দুঃখের ব্যাপার?' শটেলের জিজ্ঞাসাটা এমন যে মনে হয় যেন এই পাণ্ডববর্জিত ঠাণ্ডা দেশে দুঃখের ব্যাপার খুব অসম্ভব কিছু। বাইরের উঠোনের দিকের প্রায় দর-া সমান লম্বা-চওড়া খোলা জানলাটা দেখিয়ে মেয়েটি বললে,—'অক্টোবরের বিকেলে এই মস্ত জানলাটা খোলা দেখে আপনি নিশ্চয়ই খুবই অবাক হচ্ছেন?'

'তা গরম তো এখনো যায় নি এ-বছর।' শটেল বললে,—'কিন্তু এই জানালাটার সঙ্গে কি দুঃখের কোনো নিগূঢ় সম্পর্ক আছে?'

'আজ থেকে তিন বছর আগে এই খোলা জানালা দিয়েই আমার পিসেমশাই আর তাঁর দুই ভাই শিকার করতে বেরিয়ে যান। আর তাঁরা ফিরে আসেন নি। পাখি শিকার তাঁদের খুব প্রিয় ছিল। ওই পাখি মারতে গিয়েই জলা জায়গাটা পার হবার সময় চোরাবালি—হ্যাঁ, ওই জলার ধারে চোরাবালির ভীষণ প্রতাপ—তাদের তিন জনকেই নির্মমভাবে টেনে নিল। তিনে শুমোট গরমের সময় নিরাপদ জায়গাগুলো, একেক সময় ভয়ংকর হয়ে ওঠে। সবচেয়ে মর্মান্তিক হচ্ছে এই যে তাঁদের মৃতদেহও খুঁজে পাওয়া যায় নি।' মেয়েটির গলার স্বরে তখন আত্মবিস্মৃতির এক সুপ্তাগত আভাস: 'সিসিমা বেচারি।—সিসিমা কিন্তু সেই থেকে

ভাবছেন কোনো একদিন তাঁরা তিন ভাই নিশ্চয়ই সেই ছোট্ট খয়েরি রঙের স্প্যানিয়েলটি নিয়ে আবার ফিরে আসবেন, আর অভ্যেসমতো ওই জানলা দিয়েই ঘরে ঢুকবেন। সে জন্যেই অন্ধকার ঘন আর কালো না হওয়া পর্যন্ত ওই জানালা সারা সন্ধে খোলা প'ড়ে থাকে। তাছাড়া দুঃখে আছেন সিসিলিয়া; প্রায়ই আমাকে গল্প ক'রে শোনান কেমন ক'রে তাঁরা শিকারে বেরিয়েছিলেন; স্বামীর হাতে ছিলো শাদা বর্শাতি; রনি—সবচেয়ে ছোটো ভাই তখন একটা গান করছিলেন: সিসিলিয়াকে উত্তাক্ত করবার জন্য প্রায়ই তিনি ও গানটা গাইতেন।' মেয়েটির গলা উত্তেজনায় গভীর হয়ে এলো: 'জানেন, মাঝে মাঝে ঠিক এমনি শান্ত স্নিগ্ধ-ঘেরা দীর্ঘ গোধূলিতে আমারও কেমন আচ্ছন্নের মতো লাগে! মনে হয় উঠান পার হয়ে এই জানালা দিয়েই তাঁরা এক এক ক'রে···' হঠাৎ চমকে উঠে মেয়েটি চুপ ক'রে গেল। পোশাকের খশখশে শব্দ শোনা গেল কাছে, আর তার পরেই শ্রীমতী স্যাপলটন আস্তে এসে ঘরে ঢুকলেন। আর এত দেরি ক'রে আসার জন্য কলকণ্ঠে ক্ষমা চাইতে লাগলেন।—'আশা করি ভেরা আপনাকে বেশ আনন্দ দিয়েছে।'

সেই বিভীষিকা ভরা ছবির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে শটেল বললে, 'কে, ভেরা? না, না, বেশ ভালো লেগেছে তার কথা বলার ধরন।'

'আশা করি এই খোলা জানলাটা আপনার কোনো অসুবিধে করছে না। আমার স্বামী ও দেওরেরা এই এলেন ব'লে: বিশ্রী একটা অভ্যেস আছে ওদের, কেবল এই জানালাটা দিয়ে ঢোকে না। আজ ওঁরা গেছেন জলার দিকে। জলে আর কাদায় আমার কারপেটটার যে কী হতচ্ছাড়া চেহারা হবে আজ। আপনার পুরুষেরা বোধ করি এই সবই ভালোবাসেন।'

প্রফুল্ল কণ্ঠে ভদ্রমহিলা শিকারের গল্প জুড়ে দিলেন: এমনিতে এখানে পাখির অভাব, কী রকম, শীতের সময় বুনো হাঁসের প্রাদুর্ভাব, তখন পাখি শিকার কেমন হয়ে ওঠে—এইসব সাত-পাঁচ নানা ধরনের খবর জানাচ্ছেন আর শটেলের কাছে সেগুলো যেন অর্থহীন, তেমনি ভীতিকর ঠেকছে। প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য অনেক চেষ্টা করলো সে; কিন্তু ভদ্রমহিলার তাতে না-ছিলো আগ্রহ। এমন কি অতিথির প্রতিও তখন তিনি যন্ত্রবৎ উদাসীন। বাইরে এর মধ্যে ঘোলা, নরম, কাপসা অন্ধকার নেমে এসেছে: জানালার অবকাশে দূরের মাঠের দিকে কেমন উৎসুক চোখে তিনি তাকিয়ে আছেন—সব দেখে শুনে শটেলের ভারি বিব্রত লাগছিল। কী জানি কোন দুর্ভাগ্যের তাড়নায় শটেল একেবারে সঙ্গিন মুহূর্তেই এসে এখানে উপস্থিত হ'লো! এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির অবাঞ্ছনীয় আলোচনাকে চাপা দেবার জন্যে মরিয়া হয়ে শটেল ব'লে উঠলো,—'ডাক্তারেরা আমাকে উপদেশ দিয়েছেন পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিতে। বলেছেন যে, কিছুতেই যেন মনের ভিতরটা কোনো রাঁকুনি না খায়। কোনো উত্তেজনার কারণ ঘটলেই নাকি বিষম বিপাকে পড়তে হবে—স্নায়ুগুলি হয়তো ছিঁড়েইযাবে তেমন অবস্থায়। তা ছাড়া খাওয়া-দাওয়া নিয়ে ডাক্তারেরা যা বলেন, তা অবশ্য কোনো ভদ্রলোকের মতের সঙ্গেই মেলে না। ডাক্তারদের নিজেদের মধ্যেই কি মেলে? একেক জনের একেক মত।' ডাক্তার, চিকিৎসাবিদ্যা, কোন বৈদ্যটি ধন্বন্তরি-প্রতিম—এ সব বিষয়ে শটেল হয় তো আরো কিছুক্ষণ আলোচনা চালাতো, কিন্তু শ্রীমতী স্যাপলটন যে রকম নিরুৎসুক সুরে 'তাই বুঝি?' বললেন, তাতে তার সব উৎসাহে কে যেন পিপেসুদ্ধ ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলে। করুণ মুখ ক'রে সে যখন আর-কোন বিষয়ের অবতারণা করা যায়—এই কথা ভাবছে, তখন হঠাৎ শ্রীমতী স্যাপলটনের সব নিরুৎসাহতা কেটে গিয়ে সারা মুখ অস্বাভাবিক উত্তেজনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো: চাপা সতর্কস্বরে ব'লে উঠলেন,—'এই যে, ওঁরা আসছেন—একেবারে চা খাবার সময়েই। দেখছেন তো পা থেকে মাথা অবধি কী রকম কাদামাখা?'

শটেলের বুকের ভিতরটা যেন একবার প্রচণ্ডভাবে ডড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠেই থেমে পড়লো। একটু সমর্থন ও আশ্রয়ের জন্ত তেরার দিকে চেয়ে দেখলো, তার চোখ দুটি ভয়ে বড়ো বড়ো হয়ে উঠেছে। স্থির আচ্ছন্ন চোখে জানালার দিকে তাকিয়ে আছে সে অপলকে, সারা মুখে কেমন একটা আতঙ্কের ভাব। একটা অজানা ভয়ের শিহরণ অনুভব করলো শটেল। পরক্ষণে সেও অন্তদের মতো ওই খোলা জানালার দিকেই তাকালো—ঘন হয়ে আসা ম্লান সন্ধ্যার তলে অন্ধকারে প্রায় মিশে-যাওয়া তিনটি মূর্তি মাঠ পার হয়ে জানালার দিকে এগোচ্ছে; প্রত্যেকের হাতে বন্দুক; একজনের কাঁধে শাবা বর্শাটি। ক্লান্ত জিভ বের-করা একটা কুকুরও পায়ে পায়ে তাদের সঙ্গেই এগোচ্ছে। নিঃশব্দে সোজা তাঁরা বাড়ির কাছে এসে পড়লেন। কর্কশ একটি তরুণ গলার স্বর অন্ধকারের আবরণ ভেদ ক'রে শটেলের কানে এসে ধাক্কা দিয়ে তাকে সচেতন ক'রে তুললো।

মুহূর্তে শটেল তার টুপি আর লাঠি তুলে নিলো। তারপর বসবরের দরজা পেরিয়ে উঠোন পিছনে রেখে, সদর দরজা পার হয়ে কী রকম ক'রে যে রাস্তায় এসে পড়লো, তা সে নিজেই জানে না। মনে হ'লো মুহূর্তের একটা ঘোরের মধ্যে সব কিছু যেন মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল। নির্ঘাত একটা সাইকেল চাপা পড়তো—এত জোরে সে ছুটে এসেছিল—সাইকেলের আরোহীটি যদি অদ্ভুত কায়দায় তাকে বাঁচাবার জন্ত ব্রেকের বার ধেঁষে না বেরিয়ে যেতো তো নির্ঘাত আরেকটি কেলেঙ্কারি ঘটে যেতো।

'এই যে, ঠিক চায়ের সময়েই এসে পড়া গেছে', বলতে বলতে জানলা টপকে ভিতরে ঢুকে পড়লেন গৃহস্বামী। 'গা-হাত-পায় কাদামাখা বটে, কিন্তু সবই শুকনো কাদা। ও কে—ওই যে আমাদের দেখে পাগলের মতো পালিয়ে গেলো?'

শ্রীমতী ভাপলটন বললেন,—'অদ্ভুত লোক। নিজের অসুখের কথাই কেবল বললেন। কোনো বিদায় সম্ভাষণ না-ক'রেই হঠাৎ এমনভাবে চ'লে গেলেন যে মনে হ'লো যেন ভূত দেখেছেন।'

খুব শান্ত গলায় তেরা তার ধারণাটি ব্যক্ত করলে,—'আমার কিন্তু মনে হয় ভদ্রলোক স্যানিটোরিয়ম থেকেই পালালেন। আমাকে এতক্ষণ বলছিলেন যে ওঁর নাকি ভারি কুকুরের ভয় আছে। গঙ্গার তীরে কোন এক কবরখানায় একবার নাকি একপাল কুকুর কেন যেন খেপে উঠে হঠাৎ ওঁকে তাড়া করেছিল, সেই জন্তে সত্ত খোঁড়া একটা কবরে সারা রাত কাটাতে হয়েছিল ওঁকে। আর কবরের ঠিক বাইরেটায় ওই হিংস্র কুকুরগুলো নাকি বেয়াড়া রকম গর্জন করছিলো—ঠিক আদিমযুগের মতো। কারুর স্নায়ুকে দুর্বল ক'রে দেবার পক্ষে এই যথেষ্ট! হাজার হ'লেও ভদ্রলোকের স্নায়ু তো!'

লণ্ডনের রাস্তা দিয়ে একটা স্টেশন ওয়াগন ছুটে চলেছে। হঠাৎ গাড়িটা রাস্তা ছেড়ে পাশের ফুটপাথে উঠে পড়ল, দুটো লোককে চাপা দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে তারা মারা পড়ল।

গাড়ি চালাচ্ছিলেন জেমস স্টিলওয়েল, ব্রিটেনের প্রবীন মোটর চালক যিনি গত ২৫ বছরের মধ্যে কখনো কোনো দুর্ঘটনার মধ্যে পড়েন নি। আর এই দক্ষতারই পুরস্কার স্বরূপ সেদিন তিনি অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশন থেকে প্রথম মেডেল আনতে যাচ্ছিলেন।

ভাগ্যের পরিহাস।

সমাগম হয় এবং বাইমার নগরীর সাংস্কৃতিক জীবনের পুনরুদ্দীপন সম্পর্কে তাঁদের মনে এক নতুন আশা জাগে। মনে হয়, বাইমারের জীবনে আবার সেই গ্যেটে যুগ ফিরে আসবে, যে যুগে গ্যেটে বাইমারের সাংস্কৃতিক প্রগতি দেখে মুগ্ধ হয়ে বলে উঠেছিলেন,—"কী অপরূপ স্বর্গই না এই বাইমার!"

নগরীর অনেক সম্ভ্রান্ত ও খ্যাতনামা ব্যক্তিই সেইদিন বাইমার রঙ্গালয়ের সামনের সারিতে আসন গ্রহণ করেন। যতদূর মনে পড়ে ডক্টর গাউলও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তা ছাড়া স্থানীয় বেতার কেন্দ্রের অধিকর্তা হাইন্‌ৎস্ টাউব্ব বিশেষভাবে গ্রিফিথার এবং অন্যান্য গণ্যমান্য লোকজন এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। বাইমার রঙ্গালয়ে সেদিন 'ওথেলো' অভিনীত হয় এবং দর্শকগণ এই অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়েন। এই সময়ে লেখক ও সাহিত্যিকগণের অধিবেশনে গ্রিফিথার এক ওজস্বিনী বক্তৃতা দেন এবং উপস্থিত শ্রোতাগণ তাঁর মুখ থেকে বাইমার যুগের বিশ্বপ্রেমিক চিন্তাধারার পুনর্ভব সম্পর্কে অনেক আশার বাণী শুনতে পান। কিন্তু অল্প কয়েক বছর পরেই কমিউনিস্টদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি 'জার্মানীর সবুজ হৃৎপিণ্ড' থুরিঙ্গেন থেকে পালিয়ে যান। বহু অভিনেতা, অধ্যাপক ও শিল্পীও একই পথ অনুসরণ করেন এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সাংস্কৃতিক পীঠস্থান বাইমার সুধী ও গুণীশূন্য হয়ে পড়ে। ক্রিশ্চ্যান ডেমক্র্যাটিক ইউনিয়নের সংবাদপত্র 'থুরিঙ্গেন দৈনিক পত্রিকা'র প্রধান সম্পাদক হাইন্‌ৎস্ বাউমানকে ২৪ বছরের জন্যে "সাইবেরিয়ার নির্বাসনে পাঠানো হয় এবং সেখানে তিনি সাধারণ শ্রমিকের মতো হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে বাধ্য হন। এর পর জার্মানীর সোভিয়েত অধিকৃত এলাকার কমিউনিস্ট একটা পার্টি জার্মানীর সংস্কৃতি সম্পর্কে মাথা ঘামাতে শুরু করে।

সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রাচীন পীঠস্থান বাইমার নগরীর রেনেসাঁর স্বপ্ন আজ সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। যা অবশিষ্ট আছে, তা শুধু মানুষের মনকে বিষাদে ভরে তোলে। ৯৭৫ সনে প্রথম বিভিন্ন দলিলপত্রে এই নগরীর কথা উল্লেখ করা হয় এবং ১৪৭২ সন থেকে ১৯১৮ সন পর্যন্ত বাইমার রাজধানী হিসাবে যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করে। ডিউক-পত্নী আনামালীর আমন্ত্রণে জার্মানীর কৃতী সন্তান বীলাণ্ড বাইমারে আসেন এবং তার ফলে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই বাইমারে রঙ্গালয় স্থাপন সম্পর্কে প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু হয়। গ্যেটের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং হিতাকাঙ্ক্ষী কার্ল অগুস্ট ১৭৭৯ সনে এখানে ললিতকলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। গ্যেটে যুগের পরে কার্ল অগুস্টের পৌত্র কার্ল আলেকজাণ্ডার বাইমার নগরীর হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। তাঁর সময় ফ্রীডরিস, শিলৎসৎ, ফ্রান্‌ৎস্ লিজেল্‌স্টেড্‌ট্, হোফমান ফন্ ফালার্সলেবেনে প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ বাইমার রঙ্গালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তারও আগে ১৭০৮ সন থেকে সুরু করে ১৭১৭ সন পর্যন্ত জার্মানীর অমর সুরকার ইয়োহান সেবাস্টিয়ান বাখ বাইমারের প্রাচীন গির্জায় অর্গ্যান বাজাতেন এবং ১৭৭৬ সন থেকে ১৮০৩ সন পর্যন্ত হের্ডার সেখানে জনসাধারণকে ধর্মের বাণী শোনাতেন।

অনেক কথাই আজ মনে পড়ে। যুগ যুগ ধরে বাইমার নগরীর মাটিতে লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষের পায়ের চিহ্ন পড়েছে; অন্তত সামান্য কয়েক মুহূর্তের জন্যেও তাঁরা ভক্তিভরে রাজকীয় গোরস্থানের দিকে তাকিয়ে থেকেছে এই সব দর্শক। এই গোরস্থানেই গ্যেটের শবাধারের পাশে স্থান পেয়েছে শিলারের দেহাবশেষ। এখানে পা দিলেই সমস্ত অতীত যেন মানুষের চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ভেসে ওঠে।

———

খেলাধূলা

অর্জুন-পুরস্কার

খেলাধূলায় যারা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাদের পুরস্কৃত করার জন্যে ভারত সরকার এগিয়ে এসেছেন। ১৯৬১ সনের সুদক্ষ খেলোয়াড় হিসেবে কুড়িজন ক্রীড়াবিদকে 'অর্জুন-পুরস্কার' দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতি ভবনের দরবার হলে গত ১৪ই মার্চ ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ এস রাধাকৃষ্ণান্ এই পুরস্কার বিতরণ করেন। বিভিন্ন জাতীয় ক্রীড়াসংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী ক্রীড়াবিদদের নির্বাচন করা হয়। কুড়িজনের মধ্যে চারজন—ম্যাঞ্চুয়েল এ্যারন [বাস্কেটবল], সেলিম দুরানী [ক্রিকেট], রমানাথন কৃষ্ণান [টেনিস] ও মহারাজা প্রেম সিং [পোলো] ভারতে না থাকায় বাকি ষোলো জনকে পুরস্কার দেওয়া হয়। উপরাষ্ট্রপতি প্রত্যেক খেলোয়াড়ের সঙ্গে করমর্দন করেন এবং ত্রিবর্ণ রঞ্জিত কাগজে হিন্দী ও ইংরেজীতে লেখা মানপত্র প্রদান করেন।

গুরুচরণ সিং [এ্যাথলেট], নান্দু নাটেকার [ব্যাডমিন্টন], সর্বজিৎ সিং [বাস্কেট বল], এল ডি সুব্বা [মুষ্টিযুদ্ধ], প্রদীপ ব্যানার্জী [ফুটবল], পি সেঠী [গলফ্], শামলাল [জিমন্যাস্টিক], পৃথীপাল সিং [হকি], মহারাজা কারণী সিং [শুটিং], রাজরত্ন প্রসাদ [সাঁতার], কে. এল. রৈনা [স্কোয়াস], জয়ন্ত তোরা [টেবল টেনিস], এ. পালানিচামী [ভলিবল], এ. এন. ঘোষ [ভারোত্তোলন], উমরাও [কুস্তিগীর] ও এ্যানী লাম্পডেন [মহিলা হকি]—এঁরা অর্জুন-পুরস্কার গ্রহণ করেছেন।

সকলকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ২—০ ম্যাচে অগ্রগামী হয়েছে। দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচের পঞ্চম ও শেষ দিনে ব্রাবোর্ন পার্কে মধ্যাহ্ন ভোজের ১ ঘণ্টা পর ভারত মোট ২১৮ রানে তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ করে এক ইনিংস ও ১৮ রানে পরাজিত হয়।

দ্বিতীয় ইনিংসে দলের মারাত্মক বোলিংই ভারতের পরাজয়ের কারণ। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ফাস্ট বোলার হল এই ইনিংসে ৪৯ রানে ভারতের ৬টি উইকেট নেন। এই টেস্টে তিনি মোট ১২৮ রানে ৯টি উইকেট লাভ করেন।

যদিও দ্বিতীয় ইনিংসে নাদকার্নী, উমরিগর, ইঞ্জিনীয়ার ও দেশাই খেলায় কিছুটা দৃঢ়তা দেখিয়ে ছিলেন তবু এই টেস্টে সব সময়েই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রাধান্য বজায় ছিল।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পর পর ২টি টেস্টে বিজয়ী হল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের পরবর্তী টেস্ট বারবাডোসে।

স্কোর বোর্ড

ভারত—১ম ইনিংস—৩১৪ [বোরদে ৯১, নাইকানী নট আউট ৭৮, ইঞ্জিনীয়ার ৪৩, উমরিগর ৪০ ; হল ৭৯ রানে ৩ উইঃ, সোবার্স ৭৫ রানে ৪ উইঃ, শিবস ৬৯ রানে ২ উইঃ]।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—১ম ইনিংস—৮ উইঃ ৬০১ [কানহাই ১৩৮, ম্যাকমরিস ১৫৩, সোবার্স ১৩৩, ওরেল ৪৮, মেনডনকা ৭৮, স্টেয়ার্স নট আউট ৩৪]।

ভারত—২য় ইনিংস

জয়সীমা	ব	হল			১১
কণ্ট্রাক্টর	ব	হল			৯
স্মৃতি	এল-বি-ডব্লিউ		ব	হল	২৬
নাইকানী	ক	মেনডনকা	ব	শিবস	৩৫
উমরিগর	ক	সোবার্স	ব	শিবস	৩২
মঞ্জরেকার	এল-বি-ডব্লিউ		ব	সোবার্স	১৯
বোরদে	ক	ম্যাকমরিস	ব	হল	০
দুরানী	ব	শিবস			৪
ইঞ্জিনীয়ার	ক	হাণ্ট	ব	হল	৪০
দেশাই	ক	মেনডনকা	ব	হল	২০
প্রসন্ন	নট আউট				১
			অতিরিক্ত		১৫
			মোট		২১৮

উইকেট পতন :—১। ১৬, ২। ৪৬, ৩। ৫০, ৪। ১১৬, ৫। ১৩৭, ৬। ১৫৮, ৭। ১৪১, ৮। ১৫৭, ৯। ২০৫, ১০। ২১৮

বোলিং	ও	মে	রান	উইঃ
হল	২০	৫	৪৯	৬
স্টেয়ার্স	১০	০	২৫	০
ওরেল	১০	১	২৬	০
শিবস	২৬	৮	৪৪	৩
রডরিগস	১	০	৮	০
সোবার্স	১৭	৩	৪১	১

Election Eloquence

'My Policies' Brought Freedom, C. R. Claims

Bombay, Feb. 9.—Mr. C. Rajagopalachari, Swatantra Party leader, asserted here last night that India got Independence because the Congress leaders accepted 'my policies.'

He continued : "Let the past services of the people who fought for freedom be forgotten. It does not matter. We have to live for the future, and for that future this permit-licence-raj should go."

The Searchlight
February 11, 1962. Patna.

Menon is Not A Communist, Says Indira

"If you can call me a communist, then Mr. Menon is also a communist. But, do you call me a communist ?"—Mrs. Indira Gandhi.

The Searchlight
February 11, 1962. Patna.

Nehru Deplores 'Abuse' By Swatantra Leader

Madras, Feb. 6—Speaking "more in sorrow and distress than in anger," Mr. Nehru said it pained him particularly to hear Mr. Rajagopalachari's characterization of the Congress as a "band of bakasuras, tyrants—and a swarm of locusts."

• • Mr. Nehru recalled what Oliver Cromwell told merchants of the city of London who had advanced arguments that his policy was wrong : "I beseech you, in the bowels of Christ to consider whether you may not be in the wrong."

• • • Mr. Nehru said he could only explain Mr. Rajagopalachari's election speeches by the fact that he was an angry man, and added that as Gita said, anger destroyed one's capacity for reason.

The Hindustan Times
February 7, 1962. New Delhi.

Nehru Resents J. P's Statement

Gaya, Feb. 16—Mr. Nehru was addressing a public meeting attended by a lakh of people. He said the Swatantra Party was going about saying that "Jawaharlal is a Communist and so he is a bad man".

He added : "I was pained to know that Mr. Jaiprakash Narayan has also said something to the same effect. I regret very much that Mr. Narayan, who left politics occasionally, jumped back to it and said all kinds of things".

"In my opinion", Mr. Nehru said, "this statement of Mr. Narayan has neither head nor foot".

The Pioneer
February 17, 1962. Lucknow.

Socialism For Better Deal To Masses
No Quarter To Communalism

Rohtak, Jan. 22.—Prime Minister Nehru today declared that India had embarked on a mighty revolution to uplift forty-two crores of peoples on the basis of socialism.

National Hearld
January 23, 1962. Lucknow.

It was a mistake, says Morarji

Hyderabad, Jan. 1—Union Finance Minister Morarji Desai said today that the Congress had committed 'a mistake' in joining hands with the Muslim League in Kerala to oust the Communist Ministry and declared 'we will not do it again.'

Free Press Journal.
January 2, 1962 Bombay.

New Delhi, Jan. 13—When a correspondent asked whether it was not the duty of the Congress to encourage the growth of an Opposition party to strengthen democracy, Mr. Reddy said : "It is not for the Congress to sponsor opposition leaders in the election. Leaders like Mr. Asoka Mehta and others can select their constituencies in the strong pockets of their parties".

The Sunday Indian Nation
January 14, 1962. Patna.

তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন

রঙ্গরস

Courtesy : The Weekly Mail

For Better Or For Worse

There is a controversy on the possible effects of the rare conjunction of eight planets

Courtesy : Shankar's Weekly

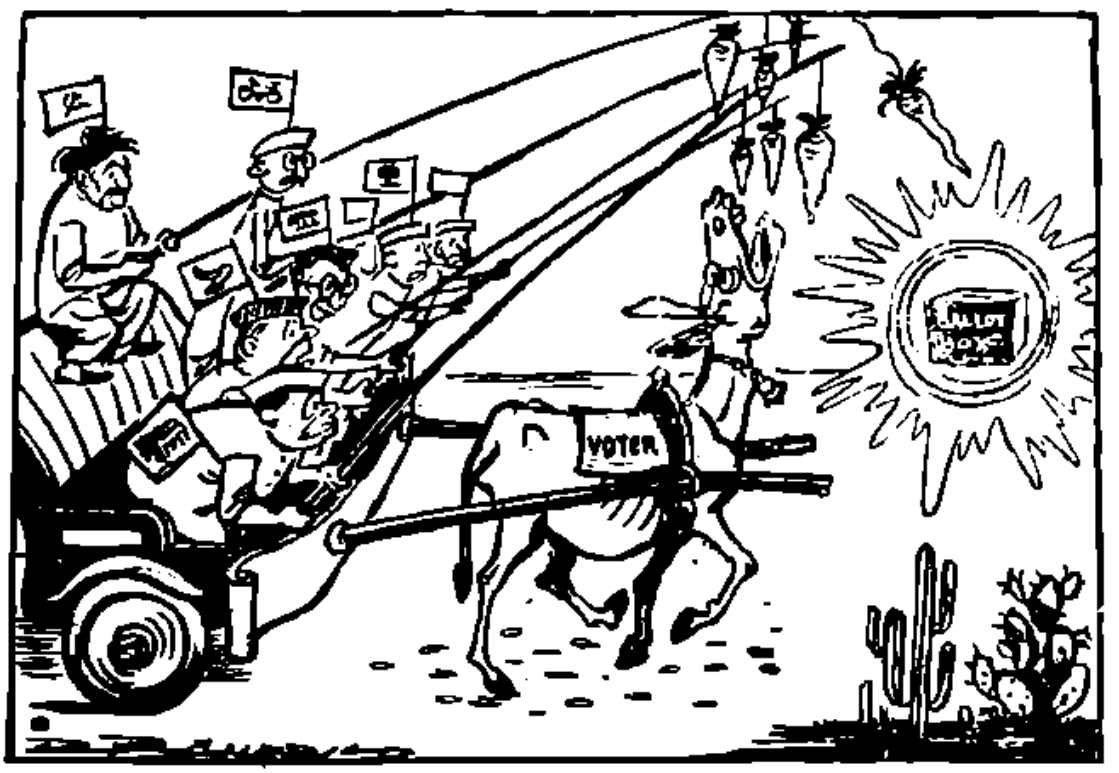

Courtesy : The Pioneer

GREAT EXPECTATIONS

"ELECTION FEVER"

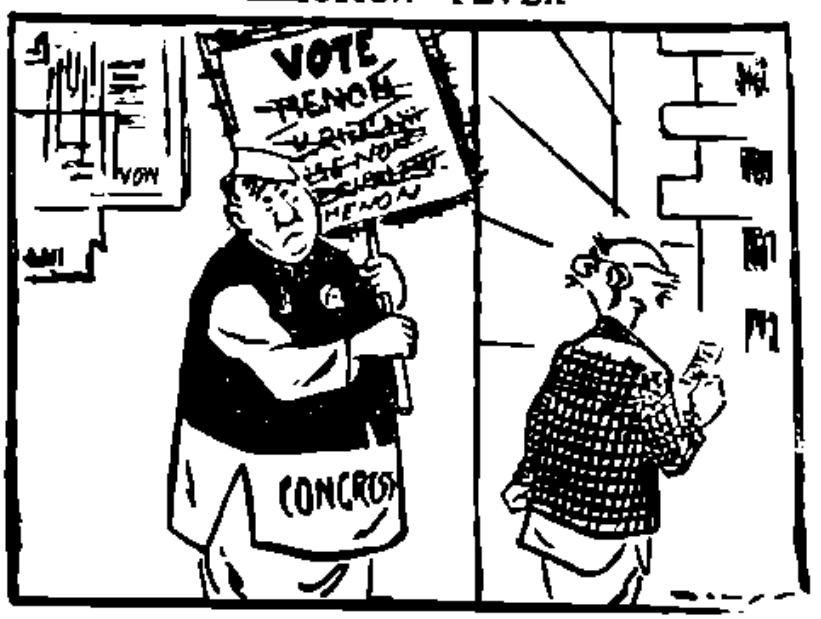

Courtesy : The Mail

AFTER THE THIRD WASH!

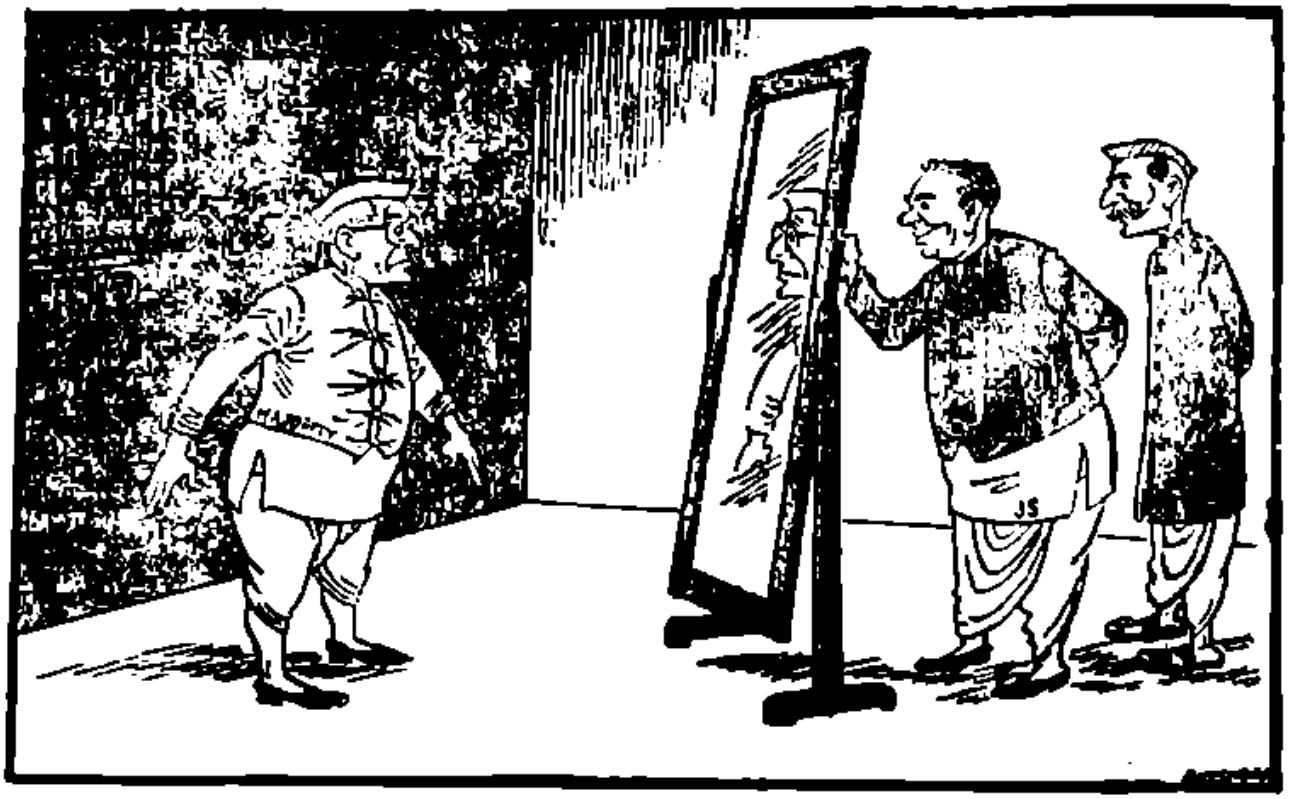

The election results for all the seats (except two) in the U.P. Assembly are out.

Courtesy : National Herald

RETREAT ACCORDING TO PLAN

Courtesy : National Herald

Admitting that the Swatantra Party has been put to rout in the general elections, Rajaji said that the battle for freedom, when it is against a party in power, is not easily fought out in one round.

ELECTION FEVER

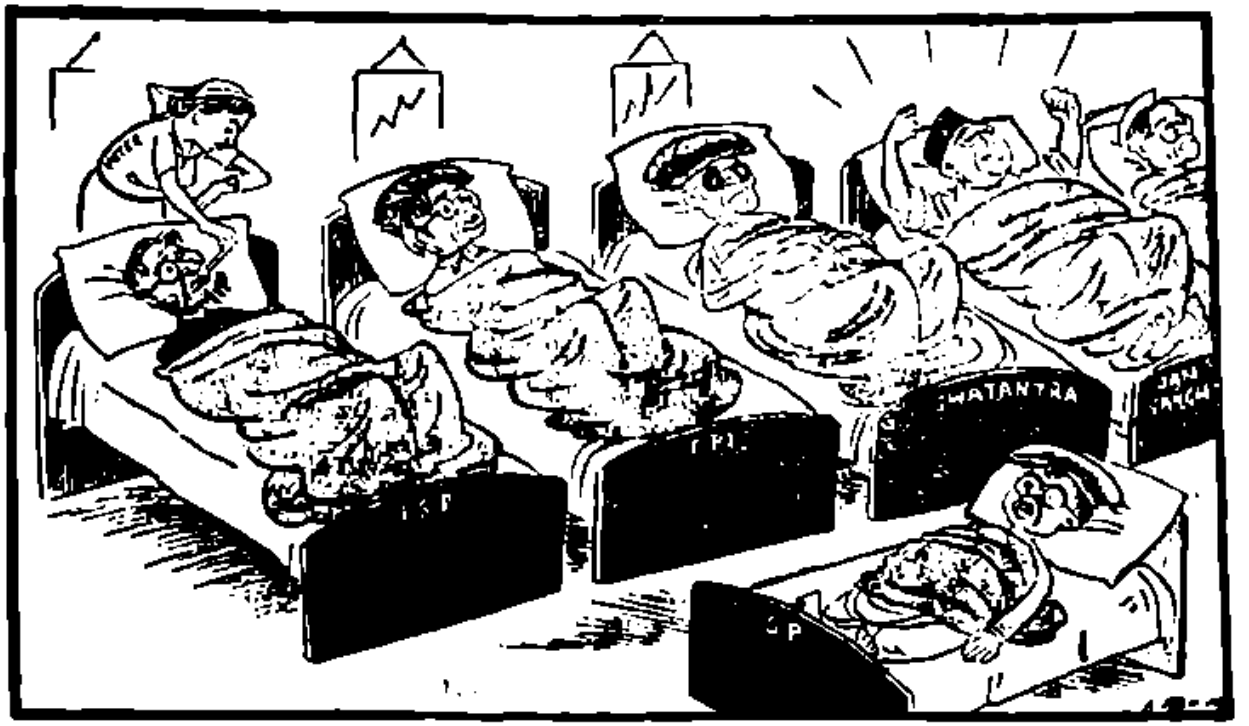

The election campaign is reported to be in full swing.

Courtesy : National Herald

THE PATH-FINDER AND HIS FLOCK

Courtesy : The Pioneer

HOME "DEFENCE"

Courtesy : The Times of India

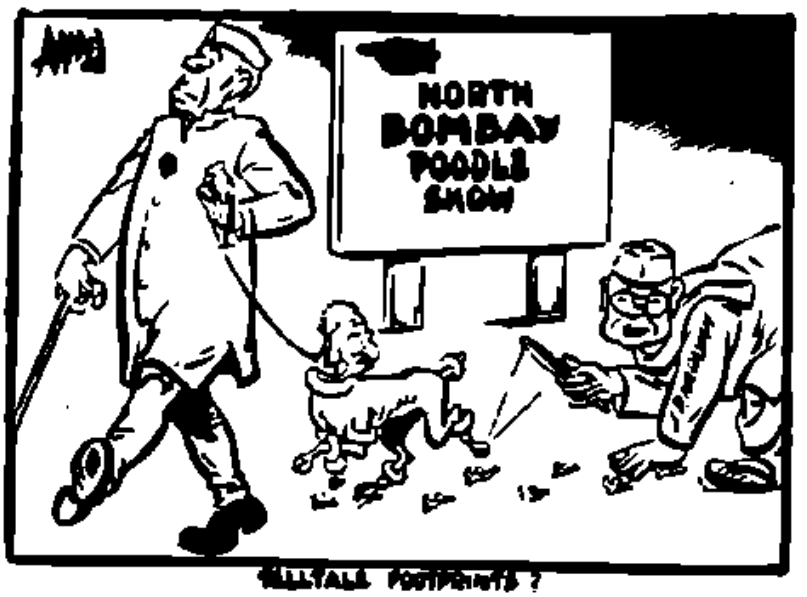

Courtesy : The Searchlight

Courtesy : Deccan Herald

AND WHERE IN HELL D'YOU THINK YOU'RE GOING ?

Courtesy : The Hindustan Times

Chain Reaction!

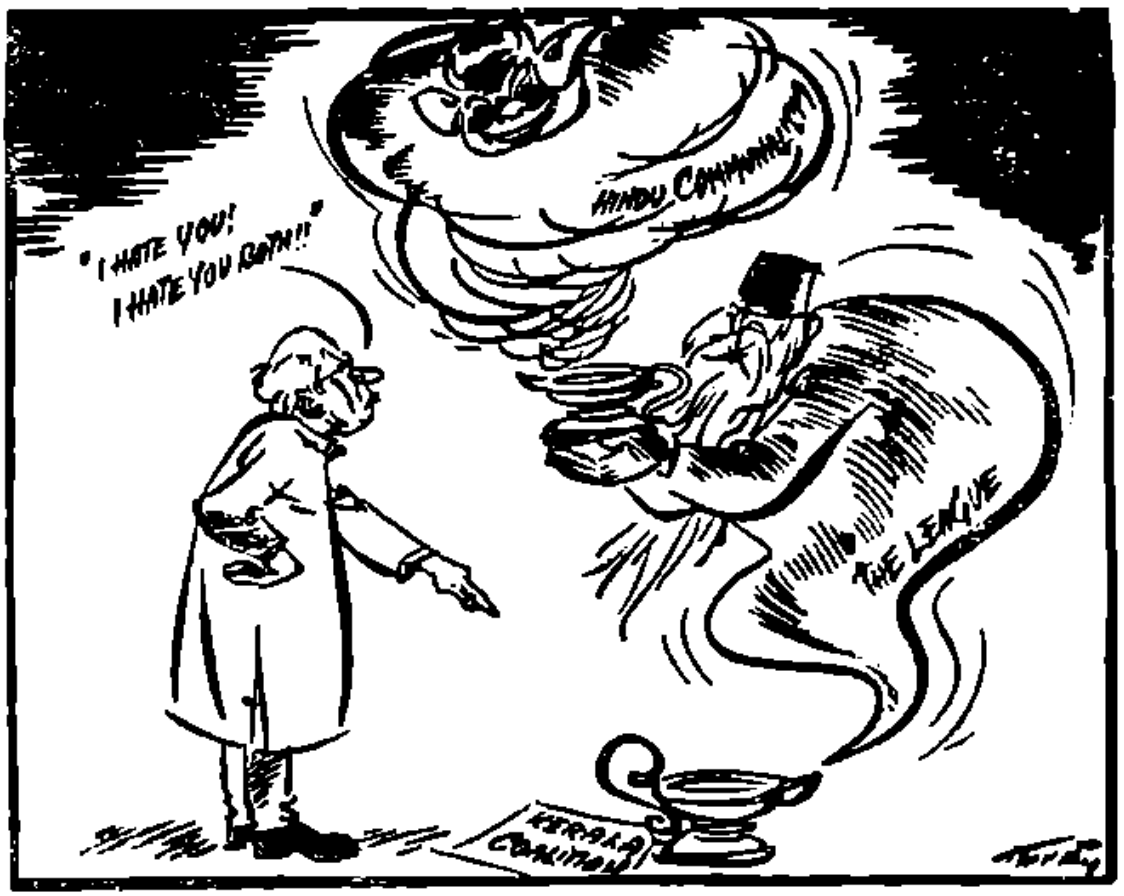

Courtesy : Deccan Herald

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী ও প্রাণিসমাজ ॥

মানুষের চিন্তায় শুভ ইচ্ছার ক্ষীণতম আভাস আজো মাঝে মাঝে দেখা যায়। যদিও, মূলতঃ মানুষের বর্তমান অস্তিত্বের সমগ্র অবয়বে হিংসা তার কুটিল ছাপ মেরে দিচ্ছে। মানুষেরি প্রীতির সম্পর্ক ক্রমশঃ অবসানের দিকে। নিজেদের ভিতর বিশ্বাস রাখা একটি দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পারস্পরিক নির্ভরতার বদলে, বিশ্বাসের বদলে, প্রীতির বদলে—আস্থাহীনতা, অবিশ্বাস, হিংসা মানুষের মনে ভীড় করেছে। অবিশ্বাসী, আস্থাহীন, নির্দয় হিংস্র এক মানুষের লোভের মুখে আরেক মানুষের জীবনসংশয় হয়ে উঠেছে। এ মানুষ আণবিক অস্ত্র নির্মাণে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিকে কাজে লাগাচ্ছে। আণবিক অস্ত্রের যুগে জীবন তো একটি বুদ্বুদের মত।

মানুষের কাছে মানুষের মূল্যের অবসান ঘটেছে যেখানে, সেখানে প্রাণিজগৎ সম্পর্কে তাদের ধ্যান-ধারণা প্রীতিমত্ত তরাল এবং তা মোটেই আশ্বাসের উদ্রেক তো করেই না, বরঞ্চ পৃথিবীর বক্ষ থেকে সমস্ত প্রাণিসমাজকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারলে নিজেদের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সফল কারুকার্যে পরমসন্তোষে আত্মস্ফূর্তির চেউয়ে নাচতে পারে এমনি একটা 'অমানবিক' ভাব পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

মানুষের হিংসা, লোভ, স্বার্থ, অন্ধ প্রভৃতি সম্মিলিত হয়ে এক প্রচণ্ড ধারাস রেখায় কীরকমভাবে অন্ত-আনোয়ারদের পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে, [পূর্ববর্তী সংখ্যায়] সে নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

আণবিক যুগের সর্বক্ষণের জন্ত জীবনযাপনের মাঝেও মানুষের মনুষ্যধর্ম কিছুটা আশার আলো বহন করে বেঁচে আছে। সত্যিকার দরদী মানুষ আশ্চর্য রকমভাবে আমাদের নৈরাশ্যবাদী বুদ্ধির সমস্ত জাল ছিন্ন করে আলোর সাগরে ভাসাতে চান। দেশে-বিদেশে এ মানুষেরা আপনাদের সমস্ত প্রেম উজাড় করে প্রাণিজগতের সংরক্ষণে এগিয়ে এসেছেন। পাশ্চাত্যদেশে চাঁদা তুলে, সোসাইটি গঠন করে পশুপক্ষীদের

সংরক্ষণ করার মানসে এ সমস্ত মহৎ লোকেরা এগিয়ে এসেছেন। নীরবে কোনও খ্যাতির মোহ না করে তাঁরা তাঁদের প্রেমধর্ম এ প্রাণিকুলের সেবায় বিলিয়ে দিয়েছেন। আজকের যুগে সত্যি সত্যিই বিরল অতুলনীয় মমত্ববোধ দিয়ে সে-প্রাণিদের এক মহৎপ্রাণ মানুষেরা বুকে আগলে রাখছেন। তেমন একজন মানুষ হলেন জর্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্টের চিড়িয়াখানার ডিরেক্টার Prof. Bernhard Grezimek। প্রাণিজগৎ সম্বন্ধে মানুষের অমানুষিক ব্যবহারে তিনি এত ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ হয়েছেন তিনি মানুষকে বিশেষিত করেছেন। "threatening, growing swarms of locusts." বাথিত হৃদয়ে প্রাণিকুলের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া লক্ষ্য করে তিনি বলছেন : "If conditions continue as they are, sparrows, rats and, at best, perhaps some rabbits will be the only animals our grand children will ever see."

উক্ত মহতী ভদ্রলোকের অতুলনীয় প্রাণি-প্রীতি অনেককে তাঁরি মত প্রাণিসেবায় উদ্বুদ্ধ করেছে। যেমন সিংহলের প্রাক্তন চিড়িয়াখানা ডিরেক্টর Major Aubrey Weinman তেমন একজন মহতী পুরুষ।

বিভিন্ন দেশে প্রাণিবরদের এমন অনুপম দৃষ্টান্তসমূহ সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করা হবে। বর্তমানে এখানে জার্মানীতে প্রাণিপ্রীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

ইরানের শাহ তাঁর স্ত্রী ফারা ডিবার জন্যে একটি চিতাবাঘের ছালের কোট কিনেছেন—এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পত্নী জ্যাক কেনেডিও ছোট ফার কলার ব্যবহার করেছেন—ব্যস্ আর দেখতে নেই, মিঃ ইয়র্কের ক্যাশান মহলে সাড়া পড়ে গেল—লেপার্ড বা চিতাবাঘের ছাল চাই—নকল নয়—আসল—শুধু কোট নয়—চাই বাঘছালের ব্যাগ, টুপি, স্যুটকেশ এবং হরজাই জিনিষ। '৬২ সালের সম্মুখে বাঘছালের বিরাট বাজার।

ফলে চামড়ার দাম চড়েছে—তিনশো ডলারের জায়গায় সাতশো ডলার। [১ ডলার প্রায় পাঁচ টাকার সমান]। আর যত দাম চড়ছে তত কেনবার উৎসাহ বেড়ে যাচ্ছে। একটা তৈরি কোটের দাম পড়ছে তিন হাজার থেকে আট হাজার ডলার। আহা! কী বাহার!

ওদিকে পূর্ব আফ্রিকার অরণ্যে লেপার্ডের সংখ্যা সীমিত হয়ে এল—শীঘ্রই তারা দুর্লভ হয়ে উঠবে, তারপর তাদের সম্মুখে চিরবিলুপ্তির অন্ধকার! মানুষ কি বাঘছাল পরে জন্তু হতে চাইছে?

মানবপ্রেমের আলোতে উজ্জ্বল জার্মানীর প্রাণিপ্রীতি।

প্রাণিকুল সম্পর্কে পৃথিবীর প্রায় দেশেই আজ এক গভীর প্রীতির সঞ্চার হয়েছে। বোধ হয় দু'দুটো মহাযুদ্ধের ভয়াবহতা, যান্ত্রিক জীবনের ক্রমপ্রসারিত অস্থিরতা আর নৈরাশ্য, ধ্বংসের আয়োজনে বৈজ্ঞানিক শক্তির অপব্যবহারজনিত এক নিদারুণ ভীতি, এগুলো মানুষের মনে অতীত জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অতীত জীবনের প্রকৃতিপ্রেম এবং জীবনপ্রেম দিয়ে ঘেরা দিনগুলোতে এখনকার মানুষ ফিরে যেতে চায়। সঙ্গে নিয়ে যেতে চায় ইতিহাসের কলঙ্ক অভিজ্ঞতাগুলোকে পরিশোধন করে শুদ্ধ চিন্তা নিয়ে, জীবনদর্শন নিয়ে। এমনি কারণে সমবুদ্ধির অধিকারী, বিবেকের দাবদহে আলো মহীয়ান হতে চান এমন ব্যক্তিরা এবং যারা বর্তমান বিশ্বের নির্মমতার ক্রমক্ষুব্ধ হয়ে চলেছেন তাঁরা আত্মিকশক্তির উদ্বোধনকে মানুষের মনুষ্যত্ব ধর্মের প্রয়োজনে সম্পন্ন করার কথা ভাবছেন। কেউ কেউ কাজেই নেমে পড়েছেন। হাইড্রোজেন, আণবিক এবং নানাবিধ ভয়াল অস্ত্র আবিষ্কারে অন্ধের মত ব্যস্ত পৃথিবীতে এই সাধকরা সত্যিই মানুষের উন্নত স্তরের জয়যাত্রার দিকে আমাদের চুম্বকবৎ আকর্ষণ করেন। এই সাধকরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপন আপন ব্রত নিয়ে পড়ে আছেন। প্রাণিকুলকে নৃশংস মানুষ-দৈত্যের হাত থেকে রক্ষার জন্যে এমন কিছু সাধক আশ্চর্য রকম মমত্ববোধের পরিচয় দিয়ে চলেছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়েছিল জার্মানী। সেই জার্মানীতে জঙ্গীবাদ এক সময় প্রবল চাড়া দিয়েছিল মানুষের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে। এবং সেই একই জার্মানী মানবপ্রেমের পরীক্ষায় ও শিল্পকলার চর্চায় পৃথিবীর মধ্যে অগ্রণী স্থান দখল করেছে। একক দেশ হিসেবে জার্মানী নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির দিক থেকে আজো শীর্ষে বসে আছে। যুদ্ধের ভয়াবহতা এ-জাতিকে হিটলারী জঙ্গীপদ থেকে রক্ষা করেছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি। তাই যুদ্ধের পরেই জার্মানরা কী রকম নৈপুণ্য সহকারে সুবিন্যস্ত করে গড়ে তুলছে বিধ্বস্ত জার্মানীকে। অল্পদিনে জার্মানরা পৃথিবীকে অবাক করলেন সত্যিই।

সুবিন্যস্ত করে গড়ে তোলার কার্যক্রমের মধ্যে পড়ে ফ্রাঙ্কফুর্টের আজকের নয়নাভিরাম এবং পশুপক্ষী প্রীতির অনন্য স্বাক্ষরস্বরূপ হওয়ামান চিড়িয়াখানাটি। এই চিড়িয়াখানাটির পেছনে যেন একজন সাধক নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর নাম Prof Bernhard Grzimek। তিনি আশ্চর্য প্রতিভার মানুষ। তাঁর ভেতর সর্বগুণের সমাবেশ দেখা যায়। তিনি ফটোগ্রাফার, লেখক, টেলিভিশন অভিনেতা, চলচ্চিত্র প্রযোজক, বিজ্ঞানী, ব্যবসায়ী, প্রচারবিদ। একটা লোকের ভেতর এতগুলো গুণের অদ্ভুত সমাবেশ পৃথিবীব্যাপী সুনাম অর্জন করেছে। সমস্ত গুণগুলোকে ছাড়িয়ে তাঁর পশুপ্রীতি কাহিনী তৈরি করেছে। ১৯৪৫ সনে যখন যুদ্ধশেষে এই প্রাণিবিদ ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে আসেন তখন সেখানকার চিড়িয়াখানার শোচনীয় অবস্থা তাঁকে কাতর করে তোলে। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে চিড়িয়াখানাটি অবহেলিত এবং মর্মন্তুদ দৃশ্যের অবতারণা করে দাঁড়িয়ে আছে। গায়টের জন্মনগরী এই শহরের এমন নৃশংসতা নিশ্চয়ই Prof Grzimek অস্থির করে তোলে। তখন তাঁর মনে একটি চিন্তাই প্রবল এবং একমাত্র হয়ে দাঁড়ায় কী করে এই প্রাণিকুলকে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে ফিরিয়ে আনা যায়। বিস্ফোরণের সাহায্যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে তিনি চিড়িয়াখানাটিকে সুন্দর করে গড়ে তুলেন। বছরের পর বছর প্রচণ্ড পরিশ্রম করে নূতন নূতন পরিকল্পনার সাহায্যে তিনি ফ্রাঙ্কফুর্টের আজকের রম্যদর্শন চিড়িয়াখানাটি গড়ে তোলেন। এই

চিড়িয়াখানার সংগ্রহ ভাণ্ডার তিনি বাড়িয়েছেন আশ্চর্য রকম। আর নিছক কৌশল অর্জন করা প্রাণি-সংরক্ষকের ভূমিকায় তিনি নিঃশেষিত নন। এই চিড়িয়াখানাটির প্রতিটি প্রাণী তাদের আত্মীয়বৎ এই পুরুষটিকে চিনতে ভুল করে না। যত হিংস্রই হোক না সে প্রাণী, তাঁদের আসল প্রেমিকাকে তাঁরা সম্মান জানাতে পেছপা হয় না। এই চিড়িয়াখানার ডিরেক্টরের এই ভদ্রলোকটি এদের ঘর ব্যাপারে এত কড়া যে, বাইরের কোন লোক কোন প্রাণীকে কিছু খেলেন এ তিনি সহ্য করতে পারেন না। কেন না তিনি মনে করেন, এ সমস্ত দর্শকরা জানেন না কোন্ প্রাণীর খাবার কোন্‌টি। তামাশা করে কিছু খাওয়ানোও কোন কোন দর্শকের স্বভাব। তিনি আকাশ থেকে কিছু তেবে এ রকম কড়াকড়ি করেন নি। একজন নির্বোধ দর্শক তাঁরি সংগ্রহকের একটি 'হিপোপোটেমাস'কে রাবারের বল তামাশা করে খেতে দেয়। আর তা খেয়ে সে প্রাণীটি মারা যায়। Prof Grzimek তাই কড়া নিয়ম করেছেন, যদি কেউ কোন কিছু খাওয়ান তবে ২৫ মার্ক জরিমানা দিতে হবে এবং অপমান করে চিড়িয়াখানার বাইরে বহিষ্কার করে দেওয়া হবে। এরকম মমত্ববোধের অধিকারী হ'লে এমন বিধি-নিষেধ একজন আরোপ করতে পারেন।

টেলিভিশনে তিনি প্রাণিদের সম্পর্কে আলোচনা করেন। আলোচনার ভেতর তাঁর প্রাণীপ্রেম এবং তাদের আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার আকুল আকুতি ফুটে ওঠে। সে আদরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভীড় খুব বেশি। জার্মানীর এই প্রাণীপ্রেমিক তাঁর আবেগ প্রধান ভাষণে ছেলেমেয়েদের অন্তর জয় করেছেন। এই 'A place for Animals' শীর্ষক অনুষ্ঠানটি অন্য যে কোন অনুষ্ঠানের চেয়ে কম জনপ্রিয় নয়। "Serengeti Shall Not Die" চলচ্চিত্রটি তিনি নিজে নির্মাণ করেছেন। এই ছবিটি হলিউডের বিখ্যাত 'অস্কার' পুরস্কার লাভ করেছে। প্রাণী সংরক্ষণের বিরাট সংগ্রামে তাঁর পৃথিবীব্যাপী প্রচার অনেকের কাছে ভালো লাগে নি, কিন্তু Prof Grzimek এদিকে ভ্রুক্ষেপ করেন নি। প্রাণীদের সম্পর্কে মানুষের মনে মমত্ববোধের জাগরণে এগুলোর প্রয়োজন। ফ্রাঙ্কফুর্ট এবং গিসেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অবৈতনিক লেকচারার। "International Association of Zoo Direction"-এর তিনি সভাপতি। জিরাফ, হাতী, সিংহ, গণ্ডার, চিতা প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিকুলের জন্যে তাঁর দরদ অপরিসীম। তাঁর একটি পুত্র পিতার পথেই এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিমান দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। ছেলেটি এই কাজেই যাচ্ছিলেন সেরেনগেটি ছেড়ে। যদি কোনদিন এ সমস্ত প্রেমিকদের কোন ইতিহাস রচিত হয়, তবে Prof Grzimek-এর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এ সঙ্গে আরেকটি চিড়িয়াখানার অবদান প্রণিধানযোগ্য। কলোন চিড়িয়াখানার শীর্ষব্যক্তি ডাঃ বিলহেলম হিনডেকার চিড়িয়াখানাকে শুধুমাত্র নয়ন ভুলানো প্রদর্শনীবস্তু করে রাখেন নি, তিনি পশু-পরিচর্যার একটি বড় কেন্দ্র করে তুলেছেন। জার্মান ফেডারেল তন্ত্রের চিড়িয়াখানাগুলো এঁদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রাণিকুল সংরক্ষণে আশ্চর্যরকম দৃষ্টান্ত খাড়া করেছেন। ডাঃ বিলডেকার পশুপরিচর্যার ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে চলেছেন। এ ব্যাপারে তিনি মহিলা পশুপরিচারিকা নিযুক্ত করতে পেছপা হন নি। অবশ্য সে মেয়েরা নিজেরাই এগিয়ে এসেছেন। ডাক্তার বিলডেকার এঁদের ঠাট্টা করে বলেন,—'আমাজন-দল [Amazon Corps]। যেখানে হিংস্র প্রাণীদের সামলাতে পুরুষ মানুষেরি হিমশিম খেতে হয় সেখানে অবাক ভাবতে লাগে মহিলা পশুপরিচারিকারা কি করে এ-ধরনের কাজে এগিয়ে আসেন। আসল কথা, প্রাণীসংরক্ষণে এঁদের চিন্তাও অনেকখানি নিয়োজিত হয়েছে। এঁরা হাতীর গা, শিম্পাঞ্জীর দাঁত পরিষ্কার করেন এবং চিড়িয়াখানার আর সব পশুদের স্বাস্থ্য প্রভৃতির পুরো দায়িত্ব এঁদের বহন করতে হয়।

এই মহিলা পশুচারিকাদের মধ্যে উরসুলা সোহেডলার যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কয়েক বৎসর ধরে তিনি এই চিড়িয়খানায় কাজ করছেন। ত্রিবার্ষিক পশু-পরিচর্যা সংক্রান্ত কোর্সে উরসুলা সাফল্য লাভ করে এই চিড়িয়াখানায় যোগদান করেন। পশুর বিভিন্ন ব্যাধি এবং তার আহার্য বিষয়ে নিখুঁত জ্ঞান এই মেয়েটির আছে। পশুর হাবভাব সম্পর্কে ও ওয়াকিবহাল না থাকলে যে কোন বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া মুস্কিল। উরসুলা প্রচণ্ড পরিশ্রমী। কোন পশু অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি দারারাত ধরে সেবা করেন। এর জন্য উরসুলার কোন ক্লান্তি বা দ্বিধা নেই। অকৃত্রিম প্রাণিপ্রীতি এঁকে সদা সতেজ এবং উৎসাহ ভরা করে রেখেছে।

মানুষই যেখানে নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না, সেখানে পশু তো দূরের কথা। সে জন্যে উরসুলাকে একবার এমনি এক বিপদে পড়তে হয়েছিল। তিনি একটি শিম্পাঞ্জীর দাঁত পরিষ্কার করে দিচ্ছেন এবং হঠাৎ সেটি তাঁর আঙুল কামড়ে ধরে। চীৎকার এবং নানাবিধ ধমক তার দেখাতে কিছুতেই কিছু হচ্ছে না, শিম্পাঞ্জী আঙুল ছাড়ে না। ফলে উরসুলা তার কান কামড়ে দেন। শিম্পাঞ্জীটিও মানুষকে এরকম আচরণ করতে দেখে অবাক হয়ে আঙুল ছেড়ে দেয়। এবং উরসুলাও রক্ষা পান।

জর্মান ফেডারেল রাষ্ট্রের চিড়িয়াখানা সমূহ মূলতঃ প্রাণিকুলের সংরক্ষণ নীতিতে উদ্বুদ্ধ। সমগ্র জর্মানীতে Prof Grzimek এবং ডাঃ বার্নহার্ডকোরের দৃষ্টান্ত ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। —সমস্ত রকম পশু সংগ্রহ এবং তাদের বন্ধ করা—এঁদের আদর্শ। আণবিক যুগে ধ্বংসের এবং নৃশংসতার ইঙ্গিতে সদা সন্ত্রস্ত পৃথিবীতে এরকম মানুষের দৃষ্টান্ত আমাদের হৃদয়ে গভীর আশার ঢেউ তুলে এবং মনুষ্যত্ব ধর্মের জয়পতাকা এরাই আসলে তুলে ধরছেন।

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের দায়িত্ব গভর্নমেণ্টের—এ কথা পুরোনো হয়ে গেছে। সরকার অনেক বাঁধ বেঁধেছেন নদীর ওপর, ইঞ্জিনিয়ারিং বিস্ময় বহর দেখিয়েছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে কি? বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ভূমিক্ষয় নিবারণের জন্যে তৈরি বাঁধ একটা অঞ্চলের জল, মাটি, গাছপালা এবং জীবজন্তুর সুস্থ ভারসাম্য বিনষ্ট করে ফেলতে পারে। ফলে জল সরবরাহেতেই ঘাটতি পড়তে পারে। সুতরাং সরকারের উচিত, উন্নয়নের নামে সরকারী কাজের বিরোধিতা করে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা।

আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেণ্ট অফ্ সায়েন্স বা সংক্ষেপে A. A. A. S.-এর বাৎসরিক সম্মেলনে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী Raymond L. Nace—Hydraulic Engineer for the U. S. Geological Survey.

UNIVERSITY COLLEGE OF SCIENCE & TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

[illegible] 57

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Yours Sincerely
P. Ray

10 Lake Terrace,
Calcutta 29,
15th Sept 1957

শ্রীযুক্ত রমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষের
দীর্ঘ জীবনে অটুট কর্মশক্তি
প্রার্থনা করিয়া দেশবাসীদের
স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে
এই প্রাচীন কীর্তিস্তম্ভটি ভারতের
গৌরব বাঙ্গলার আর একটি
অক্ষয়কীর্তি হইতে। দেশ-
মাতা কি আশীর্বাদ দিতেছেন —
"এসে এসে মিলিল দেউলী"।
যে দুটি মিনতি আমি জানাই সে আজি

শ্রী সুনীতি সরকার

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

যাঁহারা আমাদের চেয়ে বয়সে, অভিজ্ঞতায়, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে ও প্রতিষ্ঠায় বড়, যাঁহাদের আমরা অতি সহজে আমাদের অগ্রণীস্বরূপ বলিয়া মনে করিয়া থাকি, তাঁহাদের মৃত্যুতে মনে হয় যেন আমাদের গুরুস্থানীয় কাহারও তিরোধান ঘটিল মৃত্যু অহরহ ঘটিতেছে; কিন্তু কাহারও বাঞ্ছিত নয়। কিন্তু যাঁহারা আমাদের ঊর্ধ্বে অবস্থিত, বিদ্যায় প্রতিষ্ঠায় সম্মানে এবং ব্যক্তিত্বে, তাঁহাদের চলিয়া যাইতে দেখিলে মনে হয় আমাদের কানের পাশে যেন মহাকালের আহ্বান ধ্বনিত হইতেছে। গুরুস্থানীয় ব্যক্তিরা যেন আমাদের এবং অজ্ঞাত লোকের মধ্যে একটি আড়ালের মত রহিয়াছেন, এইজন্য তাঁহাদের অভাব যতই পরোক্ষভাবে হউক না কেন, মনে হয় কোন জায়গায় আমাদের একটি নির্ভর স্থান চলিয়া গেল। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ অন্য পথের পথিক ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালী বলিয়া আমার একটা যোগসূত্র ছিল। এই যোগসূত্র আমাকে এবং আমার মত অনেককে আমাদের ভাবজগতের সঙ্গে, আমাদের বাস্তব জীবনকে একটু দৃঢ় বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। মৃত্যু সেই বন্ধন ছিন্ন করিয়া দেওয়ায় আমরাও যেন তাহাকে একটু অবলম্বনহীন, শক্তিহীন বোধ না করিয়া থাকিতে পারি না। এই নির্ভর যদি একটা সত্তাকার বড় কিছু হয় তাহা হইলে আমরা বলিয়া থাকি যে, এতদিন আমরা পাহাড়ের আড়ালে ছিলাম এখন সেই আড়াল চলিয়া গেল।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ৮৬ বৎসর বয়সে দেহ রক্ষা করিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক ও সাংবাদিক, রাজনীতিজ্ঞ এবং সমাজতত্ত্ববিদ্—চিন্তানেতা ও কর্মনেতা। তাঁহার বিশেষ কর্মক্ষেত্র ছিল পত্র-পত্রিকা এবং ব্যাখ্যান ও বক্তৃতার মাধ্যমে সমাজের সেবা এবং রাষ্ট্রীয়তার পরিপোষণ।

বাঙালা সাংবাদিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ছিল তাঁহার সুদীর্ঘ এবং অতন্দ্র কর্মজীবন। এই সুদীর্ঘ সেবার অভিজ্ঞতাহেতু তাঁহাকে এই পথে এমন একটি উচ্চস্থানে লইয়া গিয়াছিল যাহা সকলের ভাগ্যে—এমন কি যাঁহারা এই পথের পথিকদের মধ্যে বয়োবৃদ্ধ তাঁহাদের ভাগ্যেও সুলভ হয় না। এই দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতাহেতু এইক্ষেত্রে নেতৃস্থান দেশবাসি জনগণ অবিসংবাদিতভাবে তাঁহাকেই অর্পণ করিয়াছিল। সর্বসম্মতিক্রমে জীবনের শেষ কয় বৎসর তিনি Doyen of Indian Journalists—ভারতীয় সাংবাদিকদের মধ্যে জ্ঞানবৃদ্ধ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন ভারতীয় সাংবাদিক-গণের ভীষ্ম পিতামহ।

এই সম্মান তিনি পাইয়াছিলেন কেবল তাঁহার বয়সের জন্য নয়, তাঁহার যোগ্যতার জন্য, তাঁহার নানাবিধ মানসিক শক্তি ও সুগুণের জন্য। তিনি প্রথম যৌবন হইতেই সত্য দৃষ্টি লইয়া এবং ভাবশুদ্ধি লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে ও সংবাদ জগতে অবতীর্ণ হন। নীতিনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মপদ্ধতির অধিকারী হওয়ায় তিনি সমস্ত জীবন ধরিয়া সৎভাব, সৎচেষ্টা ও সদাকাঙ্ক্ষার সেবা করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার নির্ভীক এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সাংবাদিক জগতে তাঁহাকে একটি বিশেষ মর্যাদা দিয়াছিল। এই হেতু তিনি যে কেবল সংবাদ পরিবেষণ ও সাহিত্যসৃজনাতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। দেশের

রাজনৈতিক চেতনার যাঁহারা উদ্বোধক ছিলেন এবং স্বাধীনতার সংগ্রামে যাঁহারা নেতা হইয়াছিলেন, তাঁহাদের আহ্বানে তিনি নিজের নির্বাচিত পথে দেশের এই অভ্যুত্থানের কার্যে আত্ম-নিয়োজিত হইয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের যুগ হইতে হেমেন্দ্রপ্রসাদ দেশের তাবৎ শ্রেষ্ঠ নেতার অনুগামী ও সহচর হইয়া দেশের সেবা করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ পুণ্যশ্লোক নেতাদের সহকর্মীরূপে বাঙলা দেশে প্রচারিত বাংলা ও ইংরাজী উভয় ভাষার পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে তিনি আমাদের স্বাধীনতা যজ্ঞের প্রসাদের জন্য অন্যতম পরিষৎ হইয়াছিলেন। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রসাদে বাঙালী তথা ভারতবাসীর মন আধুনিক-ভাবে শক্তিশালী হইয়া এই যুগের উপযোগী কর্তব্যের পথে অবতীর্ণ হইতে পারিয়াছিল।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ এই দুই ভাষার প্রয়োগে সব্যসাচী ছিলেন এবং প্রাঞ্জল প্রসাদগুণযুক্ত ও ওজস্বী বাংলা ও ইংরেজী রচনায় ও ভাষণে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। তাঁহার বক্তব্য স্পষ্ট করিয়া বলিবার শক্তি ছিল এবং বলিতে তিনি কখনও পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার স্পষ্টবাদিতা অনেক সময়েও তাঁহাকে অপ্রিয় সত্য বলিতে নির্দেশ দিয়াছিল এবং সেই নির্দেশ তিনি লঙ্ঘন করেন নাই। এই হেতু তাঁহার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রতি একটা সহজ শ্রদ্ধা দেশের লোকে পোষণ করিত।

ইহার উপর ছিল তাঁহার জ্ঞান ও তথ্যনিষ্ঠা। সব জিনিসেরই নাড়ী নক্ষত্র জানিয়া ও বুঝিয়া তবে নিজের মত প্রকাশ করিতেন। এইজন্য তাঁহার মতের মূল্য সকলেই দিতে বাধ্য হইতেন। জনসাধারণকে লইয়া ভাবের ও কর্মের জগতে যাহাদের বেসাতি তাহাদের নিকট এই জ্ঞান ও তথ্যনিষ্ঠা, ভাবশুদ্ধি ও দৃঢ়তা—এক কথায় একটা অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব সর্বদাই অপেক্ষিত। সেইরূপ ব্যক্তিত্ব কোথাও প্রকট হইলে জনসাধারণ সেখানে শ্রদ্ধা অর্পণ না করিয়া পারে না।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ নেতৃগণের বাঞ্ছিত, দেশিকোত্তমের উপযুক্ত এই সব সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন। এইজন্য তাঁহার তিরোধানে দেশের লোকের মনে একটা আক্ষেপ ও ক্ষোভ দেখা দিয়াছে—যেন দেশের জনজীবন একদিকে অভিভাবকবিহীন হইয়া পড়িল। এইজন্য আমরা তাঁহার মহাপ্রয়াণে এতটা বিচলিত হইয়াছি এবং তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের সশ্রদ্ধ শোকাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

ছোটবেলা যখন বহু দূরবর্তী গ্রাম্য স্কুলে [পূর্ববঙ্গে] পড়িতাম, তখন হইতেই হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধামিশ্রিত কৌতূহল ছিল। কারণ, খুব ছোটবেলা থেকেই আমি সংবাদপত্রের পাঠক ছিলাম। সাপ্তাহিক হিতবাদী ও দৈনিক বসুমতী সংগ্রহ করিয়া আমরা পড়িতাম এবং তখন এই পত্রিকা দুইটির গ্রাহকদেরও খুবই নাম ডাক ছিল। মনে পড়ে আমি এবং আরও দুইজন ছাত্র [সম্ভবতঃ তখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়িতাম] অনেক মাথা খাটাইয়া সেই দূরবর্তী গ্রাম্য স্কুল হইতে কলিকাতায় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের কাছে বসুমতীর ঠিকানায় একখানি পত্র দিয়াছিলাম। দুই তিন জনে মিলিয়া চিঠি দিয়াছিলাম এই জন্য যে, এতবড় হাঁকডাক ও নামওয়ালা সম্পাদকের কাছে একা একজনের চিঠি লিখিতে সাহস ছিল না। [এ কালে অবশ্য একটা বাচ্চা ছেলেও অনায়াসে সম্পাদকের ঘরে ঢুকিয়া লেখা না ছাপার জন্য কৈফিয়ৎ দাবি করে।] সেই চিঠির জবাব অবশ্য আমরা পাইয়াছিলাম, তবে, সহ-সম্পাদকের কাছ থেকে। সেই পত্রে আমরা দুই তিনটি বালক জানিতে চাহিয়াছিলাম যে, গরীব হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে বিলাতে যাওয়া যায় এবং বিলাতে গিয়া পড়াশুনা করা যায়। কারণ, তখন বৃটিশ রাজত্বের দাপটে আমাদের বালকচিত্তে এমন ধারণা গাঢ় হইয়াছিল যে, বিলাতে না গেলে মানুষ হওয়া যায় না। হেমেন্দ্রবাবুর পক্ষ হইতে সহ-সম্পাদক জানাইয়াছিলেন যে, বিলাতে না গিয়াও মানুষ হওয়া যায়, যেমন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

ছোটবেলার এই চিঠি লেখার ঘটনাটা আজও আমার মনে আছে। কারণ, তখনকার আবহাওয়ায় অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রাম্য জীবনে একজন স্কুল বালকের পক্ষে সংবাদপত্র ও সম্পাদকের সঙ্গে সামান্য যোগাযোগ সৃষ্টি করাও একটা প্রকাণ্ড ঘটনার মত ছিল। অবশ্য আজিকার দিনে শহরবাসী ছেলেদের পক্ষে এই সমস্ত ঘটনার কোন দাম নাই বরং হাস্যকর মনে হইবে। কারণ কোন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিই এখন আর ছেলেদের কাছে শ্রদ্ধেয় নহেন—প্রায় সমস্তই বোগাস্।

তারপর ১৯২৩ সনে ম্যাট্রিক পাশ করিবার পর যখন উত্তর কলিকাতার শ্যামবাজার স্ট্রীটে জনৈক ভদ্রলোকের বাড়িতে আশ্রয় পাই, তখন পরম বিস্ময়ের সঙ্গে দেখি শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ আমার প্রতিবেশী। কাঁঠালগাছ ওয়ালা বাড়িটাতে তিনি থাকিতেন এবং সকালবেলা গম্ভীর মুখে গলির মধ্যে পায়চারি করিতেন। আমি পাশের বাড়ির জানালা দিয়া সম্ভ্রমে এবং শ্রদ্ধায় তাঁর দিকে তাকাইয়া দেখিতাম—বলিষ্ঠ সুস্থ চেহারা, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি এবং পায়ে মোজা। [সাধারণতঃ ধুতি পাঞ্জাবির সঙ্গে বাঙালী ভদ্রলোকদের বড় একটা মোজা ব্যবহার করিতে দেখা যায় না। সম্ভবতঃ এজন্যই পায়ের মোজাটা নজরে পড়িয়াছিল এবং সেই সঙ্গে পায়ের গোছাও।] অনেক ভদ্রলোকের আনাগোনা এবং আলাপ পরামর্শ দেখিতাম হেমেন্দ্রবাবুর সঙ্গে। আমাদের ছেলেবেলা থেকেই প্রভূত খ্যাতির তিনি অধিকারী ছিলেন এবং সমাজে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাও ছিল।

দূর হইতে কিশোর বয়সের এই পরিচয়ের পর ক্রমে ক্রমে সংবাদপত্র জগতে আমার প্রবেশের সঙ্গে হেমেন্দ্রবাবুর সঙ্গেও নিকটতর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল এবং তাঁর জীবনের শেষভাগে বহু সভাসমিতিতে

আমরা একত্র অংশ গ্রহণ করিয়াছি। তথাপি একথা সত্য যে, বয়সের নিষ্করুণ পার্থক্যের জন্য হেমেন্দ্রবাবুর সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতার সম্পর্ক আমার হয় নাই। কিন্তু আমার দিক থেকে সম্ভ্রম এবং তাঁর দিক থেকে প্রীতির সম্পর্ক বরাবর ছিল।

ছোটবেলা হইতে যাঁকে দেখিয়া আসিয়াছি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরূপে, নিমতলা শ্মশানে তাঁর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইতে দেখিলাম। মনে হইল আধুনিক কালের সাংবাদিকদের পিতামহ যেন চিতাশয্যায় মর্ত্যলোক হইতে বিদায় নিতেছেন। বিচ্ছেদের একটি করুণ স্পর্শ যেন অনুভব করিলাম। অনুভব করিলাম মানুষ যত দীর্ঘজীবীই হউক, শেষ যবনিকা একদিন পড়িবেই।

কেবল বাঙলা দেশের নয়, সারা ভারতের সংবাদপত্র জগতের সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন তিনি। ৮৬ বৎসর বয়সে তাঁর এই পরলোকগমন সাফল্যমণ্ডিত একটি সুদীর্ঘ জীবনের অবসানের মত, যেন দূর প্রবাহিনী জলভরা নদী মহাসমুদ্রের অনন্ত বিস্তারে মিলাইয়া গেল। ৮০ বছর বয়স অতিক্রম করা সংসারের মানুষের ভাগ্যে মিলে না—বিশেষতঃ এই দেশে। কিন্তু হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এই দীর্ঘায়ুর কেবল অধিকারী ছিলেন না, তিনি সারা জীবন অত্যন্ত সুস্থ ছিলেন এবং তিনি গল্পচ্ছলে বলতেন যে, জীবনে তাঁর কোনদিন মাথা ধরে নাই। যথেষ্ট পরিমাণ আহার এবং প্রভূত স্বাস্থ্যের আশীর্বাদ তাঁর সম্পর্কে প্রায় চলতি কথায় দাঁড়াইয়াছিল। আরও আশ্চর্যের কথা, কেবল বাঁচিয়া থাকা বা ৮৫ বছর অতিক্রম করাই নয়, শেষ দিন পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত কর্মক্ষম ছিলেন। মৃত্যুর কিছুকাল আগেও তিনি সভা-সমিতিতে যোগদান ও বক্তৃতা করিয়াছেন এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অজস্র লিখিয়াছেন। তাঁর পরিশ্রম নৈপুণ্য অসাধারণ ছিল। তাঁর গ্রন্থাগার এবং উনবিংশ শতকের শেষ ভাগ হইতে বিভিন্ন বিষয়ে সংগৃহীত কাটিং ও রেফারেন্স যে কোন বিখ্যাত পণ্ডিতের পক্ষেও গর্বের ছিল। আর সেই সঙ্গে ছিল তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি—ঘটনা ও ইতিহাস যেন তাঁর নখদর্পণে ছিল। বলা যাইতে পারে যে, 'ইনফরমেশন' বা সংবাদ ও তথ্যের দিক হইতে তাঁর জ্ঞান ছিল বিশ্বকোষের মত। ভারতবর্ষের অন্য কোন সাংবাদিকের মধ্যে এতগুলি গুণের একত্র সমাবেশ কদাচিৎ দেখা গিয়াছে।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের মৃত্যুতে সংবাদপত্র জগতের উনবিংশ ও বিংশ শতকের প্রধানতম সংযোগসেতু বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, কিম্বা বিগত যুগের শেষ বিরাট স্তম্ভ ভাঙিয়া গেল। বহু দূরবর্তী ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে যশোহর জেলার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম এবং কৃষ্ণনগরে, কলিকাতায় হেয়ার স্কুলে ও প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁর শিক্ষালাভ। ছাত্র হিসেবেও তাঁর ঔজ্জ্বল্য ছিল, দীপ্তি ছিল এবং সাহিত্য ও সাংবাদিকতার দিকে স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। এমন এক যুগে তাঁর তরুণ জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল, যখন দেশে পুণ্যচরিত বিদ্যাসাগর ও সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের আবহাওয়া, প্রতিভার নব নব কিরণ সম্পাতে সেদিনের বাঙলার মানস দিগন্ত উদ্ভাসিত। উচ্চশিক্ষা লাভের সঙ্গে বাঙালা দেশের জাতীয় চেতনা ও মানস জাগরণ তরুণ হেমেন্দ্রপ্রসাদকে সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল। বাঙালা দেশের বিখ্যাত সাংবাদিকদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা কেবল পেশাকী কিংবা পেশাদার জার্নালিস্ট মাত্র নহেন, তাঁরা উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যিক, শিল্পী ও কবিও বটেন। [অবশ্য ভবিষ্যৎ বাঙালায় সাংবাদিকতার এই রূপ আর টিঁকিবে কিনা সন্দেহ। কারণ প্রুফ শিল্পায়নের অগ্রগতিতে এখন টেক্‌নিক্ ও "প্রোফেশন" বা চাকুরিগত বৃত্তির রূপটা বড় হইয়া উঠিতেছে এবং সংবাদপত্রগুলি কারখানার অফিসে রূপান্তরিত হইতেছে।] হেমেন্দ্রপ্রসাদ গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখিলেন এবং তাঁর প্রথম জীবনের দুর্লভতম সৌভাগ্য হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের

হাত দিয়া পুরস্কার পর্যন্ত লাভ করিলেন। গল্প, উপন্যাস, কবিতা ছাড়া তিনি ইতিহাসের বইও লিখিয়াছেন। উনবিংশ শতকের জাতীয় জাগরণের আলোক যখন বিংশ শতকের স্বদেশী যুগের অগ্নিমন্ত্রে দীপ্ত বহ্নি সঞ্চার করিল, হেমেন্দ্রপ্রসাদ সেই সময় বিখ্যাত বৈপ্লবিক পত্রিকাগুলির [সন্ধ্যা, যুগান্তর ইত্যাদি] সঙ্গে যুক্ত হইলেন এবং তারপর ১৯১০ সন হইতে ভারতব্যাপী নতুন জাতীয় আন্দোলনকে সাংবাদিকতার মধ্যে গ্রহণ করিলেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন আমৃত্যু সাংবাদিক এবং ১৯১৪ সনে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত দৈনিক বসুমতীর সঙ্গে তিনি গোড়া হইতেই একেবারে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জড়িত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে 'বসুমতী' সম্পাদকরূপেই তিনি বাঙ্গালা ও ভারতবর্ষে সমধিক খ্যাতিমান ছিলেন এবং দীর্ঘকাল এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালকও ছিলেন। বলা বাহুল্য যে, গভীর দেশপ্রেম ও জাতীয়তা—যে জাতীয়তা সংগ্রামধর্মী এবং যাহা অরবিন্দ-বিপিন পাল তিলক হইতে শুরু করিয়া সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত এক আশ্চর্য ইতিহাস রচনা করিয়াছে, হেমেন্দ্রপ্রসাদ তারই অনুরাগী ছিলেন। এ জন্য তিনি গান্ধীজীর অহিংসাকে কখনও মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বরং বহু সভা-সমিতিতে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি দিয়া বলিতেন যে, অহিংসা সন্ন্যাসীর ধর্ম, গৃহীর নয়। এমন কি খণ্ডিত ভারতের বর্তমান স্বাধীনতাকেও তিনি স্বায়ত্তশাসন ছাড়া অন্য কিছু মনে করিতেন না। অর্থাৎ তিনি কংগ্রেসী নেতৃত্বের কঠোর সমালোচক ছিলেন। অপর দিকে তিনি আধুনিক সমাজতন্ত্রেরও গুণগ্রাহী ছিলেন না এবং তাঁর মতবাদ প্রধানতঃ স্বদেশী যুগের ধ্যান ধারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে সাম্রাজ্যবাদ এবং বর্ণ-বৈষম্যের তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এক কথায় তিনি ছিলেন ষোল আনা জাতীয়তাবাদী এবং অখণ্ড ভারতের সার্বভৌম স্বাধীনতার সমর্থক।

সম্ভবতঃ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষই সর্বপ্রথম বাংলা সংবাদপত্রকে ইওরোপীয় সম্মান ও স্বীকৃতি এবং যুদ্ধক্ষেত্রের প্রত্যক্ষ পরিদর্শনের সঙ্গে যুক্ত করেন। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম কিম্বা পূর্ব ভারত হইতে একমাত্র বাংলা সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদই প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৭ সনে মেসোপটেমিয়া কিম্বা বাগদাদ পরিদর্শন করেন। বাগদাদ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তদানীন্তন বৃটিশ সরকার [প্রচার মন্ত্রিদপ্তর] হেমেন্দ্রবাবুকে ইওরোপীয় রণক্ষেত্র পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ করেন। সেদিনের আবহাওয়ায় একজন বাঙ্গালী সাংবাদিকের পক্ষে ইওরোপীয় যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন কেবল দুর্লভ সৌভাগ্য নয়, সাহসিকতারও পরিচায়ক ছিল। হেমেন্দ্রপ্রসাদ যখন ফ্রান্সে যান, তখনও ফ্লাণ্ডার্সের রণক্ষেত্রে কামান গর্জন শুনা যাইতেছিল। তারপর ১৯১৮ সনের ১১ই নভেম্বর যখন মহাযুদ্ধের অবসান ঘটে, তখন তিনি লণ্ডনে এবং সেদিনের উৎসবমত্ত লণ্ডনের রাস্তায় নর-নারীর অবাধ মিলনের [যুদ্ধ শেষ হওয়ার আনন্দে] যে রোমাঞ্চিত্র তিনি একটি প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ আজও তাহা অনেকের স্মরণে আছে। বাকিংহাম প্রাসাদে সম্রাট পঞ্চম জর্জের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ও করমর্দন এই যুগে তেমন কৌতূহল না জাগাইলেও ১৯১৮ সনের বৃটিশ সাম্রাজ্যের দাপটের দিনে তাহা কম উল্লেখযোগ্য ছিল না এবং আশা করি বসুমতীর পুরানো পাঠকদের মনে আজও সেই অভিনব লাইনটি স্মরণীয় হইয়া আছে, যেখানে দিনের পর দিন বিজ্ঞাপনে প্রচারিত হইত—"সম্রাটের সহিত করমর্দনকারী, চাণক্য-সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।" প্রকৃত পক্ষে 'বসুমতীর' এই অভিনব বিজ্ঞাপনটি তখনকার দিনে আমাদের তরুণচিত্তে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের রেখাপাত করিয়াছিল।

হেমেন্দ্রপ্রসাদের জীবন বৃহৎ বনস্পতির মত। দুই শতাব্দীর বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির যেমন তিনি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিয়াছেন, তেমনি সাহিত্য ও সংবাদপত্রের দূর-বিস্তৃত জগতে তিনি যেন শাখা-প্রশাখায়

বিদ্যায় লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর গভীর যোগ ছিল। অনলস, পরিশ্রমী এবং প্রকৃত বিদ্যা ও প্রতিভার অধিকারী পিতামহকুল্য এই সাংবাদিকের মৃত্যুতে এমন একটি স্থান শূন্য হইল, যাহা আর পূর্ণ হইবার নহে। কারণ, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ছিলেন "আপনাতে আপনি পূর্ণ" এবং আপন স্বাতন্ত্র্যে ও প্রতিভায় অন্য সকলের চেয়ে পৃথক। তাঁর এই মৃত্যুতে আমরা ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের সংযোগে হইতে বিচ্ছিন্ন হইলাম। বিংশ শতকের সাংবাদিকতা এখন নূতন যুগে প্রবেশ করিয়াছে। এখনে বাঙলা সাংবাদপত্র আর ইংরাজী পত্রিকার পিছনে পড়িয়া নাই। মন্ত্র এবং মন্ত্র উভয় দিক দিয়াই বাঙলা সংবাদপত্র আজ ইংরাজীর মত উচ্চ আসন দখল করিয়াছে। তার সংবাদ-দাতারা আজ কলিকাতা হইতে নিউইয়র্ক, এবং লণ্ডন হইতে টোকিও পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া আছে। ছোটবেলা স্কুলে পড়িবার সময় আমি হেমেন্দ্রবাবুকে ভয়ে ভয়ে চিঠি দিয়াছিলাম কিভাবে বিলাত যাওয়া যায়। আজ আর সেই প্রশ্ন ওঠে না। কারণ, আমার মত বাঙলা সংবাদপত্রের একজন লেখকের পক্ষেও ইওরোপ আমেরিকা এবং সারা পৃথিবী পরিক্রমা করার সুযোগ ঘটিয়াছে। স্বয়ং হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বিংশ শতকের সেযার্ধে ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর এই পরিবর্তন দেখিয়া গিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বাঙলা দেশের ঘরে একজন বরণীয় সম্পাদককে স্মরণে আনিব—তিনি হইতেছেন পরলোকগত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। সম্পাদকীয় বলিষ্ঠতায় ও প্রাণপ্রাচুর্যে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। আর খবরিসি আড্ডায় তাঁর জুড়ি কেউ ছিল না। আমার বিশ্বাস হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার স্ব স্ব প্রতিভার বৈশিষ্ট্যে বাঙলা সাংবাদিকতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে ইঁহাদের স্মৃতিরক্ষার কোন উদ্যম কোথাও নাই। কারণ, কোন সংগঠন তাঁহের পিছনে নাই। তথাপি বিংশ শতকের বাঙলা সংবাদপত্রের যদি সত্যকার ইতিহাস লেখা হয়, তবে, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এবং সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে।

বাংলা সংবাদপত্রকে যাঁহারা বহুল প্রচারিত করিয়াছিলেন তাঁহারা এক একজন সাহিত্যের এক এক দিকের দিকপাল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—ইঁহারা ভাষার যাদুকর এবং ইঁহারা কখনই ভোলেন নাই যে, সাংবাদিকের ধর্ম এই যে, যে উপকরণ পাওয়া যাইবে তাহার মধ্য হইতে যাহা লোকের চিত্তাকর্ষক তাহাই বাছিয়া লইয়া সরল, প্রাঞ্জল ও প্রবলভাবে তাহা লিখিতে হইবে। তাঁহাদিগের আদর্শই তাঁহাদিগের পরবর্তীদিগকে প্রেরণা দিয়াছে।

—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

৺হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ॥

শ্রীহারীকৃষ্ণ দেব

জানি, আমাকেও মরতে হবে, তবু যতক্ষণ মর্ত্যে আছি ততক্ষণ জানা-শোনাদের মৃত্যু-সংবাদ শুনতেই হবে এবং তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি মরণোত্তর-শ্রদ্ধা-নিবেদন অবশ্য কর্তব্য। এই শ্রদ্ধার একটা বিশিষ্ট রূপ আছে: মর-জগতে বর্তমান থাকার কালে যাঁর সম্বন্ধে যে-যে কথা বলবার ছিল কিন্তু বলা হয় নি, সেই সব কথা বলার শেষ সুযোগ আসে; আর শ্রোতার মধ্যে তিনি যে নেই, এই চিন্তা মনকে ছেয়ে ফেলে।

হেমেন্দ্রবাবু ছিলেন আমার চেয়ে আঠারো বছরের বড়ো, আর বাবার চেয়ে তেরো বছরের ছোটো। তিনি যেমন বাবার কাছে আসতেন, তেমনি আমিও তাঁর কাছে গিয়েছি। তথাপি তাঁর সম্বন্ধে আমার জ্ঞান যৎসামান্য। তাঁর অনেক গুণ ছিল সর্বজনবিদিত, সুতরাং আমারও জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, যথা—তাঁর দৈহিক ও মানসিক শক্তি, যার ফলে তিনি ছিলেন শ্রমে অক্লান্ত ও ক্লান্তি-হীন। দুটি গুণ আমায় বিশেষ আকৃষ্ট করেছিল: তাঁর স্মৃতি-শক্তি ও তাঁর নির্ভীকতা।

তিনি যে প্রধানতঃ সংবাদপত্রের সঙ্গে জড়িত, এ কথা জানতুম বটে, কিন্তু প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নিয়েও তাঁর আগ্রহ ছিল, এ সংবাদ পাই তাঁর এক আত্মীয়ের কাছে। আত্মীয়টি সংসার ছেড়ে সন্ন্যাস নেওয়ায় তাঁর পূর্বাশ্রমের পূর্ণ পরিচিতি দেওয়া উচিত নয়, তাই তাঁকে শুধু 'স্বামীজী' বলবো। উপলক্ষটা বলি। তখন খবরের কাগজে হামাগা পেটানো চলছিল যে, ইংরেজ সরকার ভারতের প্রতি প্রীতি দেখিয়েছেন অসাধারণ, কেন না তাঁরা বুদ্ধদেবের ভক্ত সারিপুত্ত এবং মোগ্‌গলান এই মহাপুরুষদ্বয়ের দেহাবশেষ যা একশো বছর আগে কানিংহাম সাহেব সাঁচী-স্তূপ খুঁড়ে পেয়েছিলেন এবং যা এতাবৎকাল লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত ছিল, তা সাঁচীতেই নব-নির্মিত স্তূপে রক্ষা করবার জন্যে ভারত সরকারকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। ওই দেহাবশেষ দুটি পাথরের কৌটোর মধ্যে ছিল; তার ছবি ও যথাযথ বর্ণনা মহামতি কানিংহাম-এর Bhilsa Topes-নামক পুস্তকে আমরা পাই; তাদের ঢাকনা দুটিতে ভিতর দিকে কালি দিয়ে লেখা ছিল 'মো' আর 'সা'—অর্থাৎ মোগ্‌গলান আর সারিপুত্ত এই দুই নামের আদ্য অক্ষর। অথচ, দেখুন এই আজব শহরের বৌদ্ধ বিহারে যখন ওই বিলেত ফেরত দেহাবশেষের প্রদর্শনী চলছে, তখন তৎসম্পৃক্ত মহাত্মা-দ্বয়ের তিরোধান হয়েছে এবং তৎপরিবর্তে রয়েছে অন্য দুটি পাথরের কৌটো যার ঢাকনায় কালির লেখা তো নেই-ই বরং যার গায়ে খোদাই করা অক্ষর দেখে বোঝা সহজ যে কৌটো দুটো সাঁচীতে পাওয়া যায় নি, পাওয়া গিয়েছিল সাত-ধারায়। এরকম উদ্ভোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোটার কথা আমি হেমেন্দ্র-বাবুকে জানালুম। উনি তৎক্ষণাৎ ওঁর নিজের লাইব্রেরী থেকে কানিংহামের বই-টই বের কোরে আমার কথা বাজিয়ে নিলেন। বললেন: "কথাটা শ্যামাপ্রসাদকে জানাবো।" জানিয়েছিলেন নিশ্চয়। কর্তারা যে-বক্তৃতা দিলেন তার অন্তরালে যেখানে যেন একটি ভাব-রাখি-কি-কূল-রাখি ভাব গোপন করার চেষ্টা ছিল, এবং শেষ পর্যন্ত হামাগা পেটানোর খোলও কিছু বদলে গেল, কিন্তু ভোল বদলানো না। আমার জ্ঞান সফল হোলো, হেমেন্দ্রবাবু কেবল আধুনিক ভারত নিয়ে মেতে থাকেন না, প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য সম্বন্ধেও তিনি শ্রদ্ধাশীল।

এ বিষয় তাঁর মন ও আমার মন ক্ষণিকের জন্যে একই ধারা ধরে চললো বটে। কিন্তু তিনি অতি প্রাচীন ইতিহাসের চাইতে আধুনিক ইতিহাসে আস্থা রাখতেন বেশি। তার কারণ বোধ হয় এই যে, সংবাদ পত্রের সঙ্গে বাল্যকাল থেকেই সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে এবং প্রখর স্মৃতিশক্তির আধার ছিলেন বলে আধুনিক ঘটনা সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রবল প্রেরণা দিত তাঁর কর্মপ্রবণ প্রাণকে। অলস প্রকৃতির ধর্ম হচ্ছে পেছন দিকে তাকানো, অতীতের লুপ্ত ঐশ্বর্যের ছবি আঁকা। আমাদের অতীত গৌরব নিয়ে বর্তমানে আমাদের গর্ব করার কিছু আছে কি না, বিশ্বের দরবারে আমরা কতটুকু সম্মানের আসন পেতে পারি, এই সব প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাবে, যদি অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে আমরা প্রাচীন ইতিহাসের গুপ্ত তথ্য পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হই।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ আমার অনুসন্ধিৎসার কথা জানতেন, কিন্তু অনুসন্ধানে কি ফললাভ করেছি সেটার পরিচয় উনি পান ছ' বছর আগে, যখন আমার ছাত্র-ছাত্রীদের মাথায় খেয়াল চাপলো আমায় জন্মদিন পালন করা চাই। তদুপলক্ষে তারা হেমেন্দ্রবাবুকে সভাপতির আসনে বসালে, বন্ধুবর সুনীতি চাটুয্যে ও সত্যেন বোসকে বক্তৃতা দিতে বাধ্য করলে। সেই বক্তৃতা-প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার আমার গবেষণা-কার্যের এত সুখ্যাতি করেন যে, আমি লজ্জিত হলেও হেমেন্দ্রবাবু তাতিক করে আমায় স্নেহাশীর্বাদ দিলেন। আজ তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি সমর্পণ করার সুযোগ-লাভ হয়েছে গল্প-ভারতীর কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে, সেই জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাই।

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় সর্বপ্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। উহা ইংরেজী ভাষায় পরিচালিত। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোন ভারতীয় ভাষায় সংবাদপত্র পরিচালিত হয় নাই। ওই বৎসর শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টধর্মযাজকরা সর্বপ্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। ওই পত্র বাংলায় প্রকাশিত—এবং উহার নাম "সমাচার দর্পণ"। তবে এবিষয়ে এখনও কিছু মতভেদ আছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলেন যে, গঙ্গাকিশোর [অথবা গঙ্গাধর] ভট্টাচার্য শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টধর্ম যাজকদিগের ছাপাখানায় কাজ করিতেন। তাঁহারা সংবাদপত্র প্রকাশ করিবেন জানিতে পারিয়া গঙ্গাকিশোর তাহার কিছু পূর্বেই কলিকাতা হইতে প্রথম পত্র প্রকাশ করেন। কিন্তু, শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টধর্মযাজকরা ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, পাদ্রী মার্শম্যান সমাচার দর্পণে'র প্রথম সংখ্যা প্রস্তুত করিয়া বন্ধুর ইংরেজী সার সংগ্রহ সহ তিনি উহা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতার কর্মচারীদিগের নিকট পাঠাইয়া দিবেন—যদি তাঁহারা ইহাতে আপত্তি না করেন, তবেই সপ্তাহে সপ্তাহে "সমাচার দর্পণ" প্রকাশিত হইবে। লর্ড হেষ্টিংস তখন পিণ্ডারী যুদ্ধে ব্যাপৃত। ফিরিয়া আসিয়া তিনি এই নূতন পরিকল্পনার আনন্দ প্রকাশ করেন। তখন হইতে "সমাচার দর্পণ" যথারীতি প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে যে প্রথম ভারতীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কাজেই সংবাদপত্রের শতবার্ষিকী ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে হইয়া গিয়াছে। ডিগবীর মতে বাঙালীর কৌতূহলই এদেশে দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের কারণ। ইহার বহুদিন পরে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বাংলা সংবাদপত্র "সাধারণী" প্রকাশিত হয়। অক্ষয়চন্দ্র সরকার উহার সম্পাদক এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অন্যতম লেখক।

সাংবাদিক জগতের অনন্যসাধারণ পুরুষ।

শ্রীবিভূতিভূষণ সেনগুপ্ত

একটি বারো বছরের ছেলে। চেহারায় বীরত্বের ছাপ। দেখলেই তার দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। সে যেন হাজারের মধ্যে একজন।

এই বালকবয়েসেই তার সৌভাগ্য হয়েছিল আচার্য রাজনারায়ণ বসু ও মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের সান্নিধ্য লাভ করার। দেওঘরে তাঁদের সাথে পরিচয়। ছেলেটিকে দেখে তার সাথে কথা বলে তাঁরা মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা, এই অপূর্ব শক্তিধর ছেলেটির মধ্যে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন, করেছিলেন অকুণ্ঠ আশীর্বাদ। শিশিরকুমার ও মতিলাল তাকে সাংবাদিক হবার জন্য উৎসাহ দিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন দেশ সেবা ও জন সেবার মূলমন্ত্র।

সেই বালক আর কেউ নয়—প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক-জগতের দিকপাল হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। তিনি প্রায় ৭০ বৎসর সাহিত্য ও সংবাদপত্রের সেবা করে পূর্ণ পরিণত জীবনের চরম প্রান্তে এসে মহাপ্রয়াণ করেছেন। যেন একটা আলো নিবে গেল—যে আলো উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সংবাদ-পত্রের মধ্যে একটা সেতু নির্মাণ করেছিল। সেই যুগের—যে যুগে সমাজচেতনা জেগে উঠেছিল—যে যুগে সংবাদপত্র দেশ জাগরণের বাণী প্রচার সাধনা ও মূলমন্ত্র করে নিয়েছিল—সে যুগের কথা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলবার আর বোধ হয় কেউ রইল না—একজন বন্ধু সেজন্যই বলেছেন, যেন ইতিহাসের একটি জীবন্ত পৃষ্ঠা বন্ধ হয়ে গেল।

তাঁর স্বপ্ন ও সাধনা অপূর্বভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। ভাগ্য তাঁকে পাঠিয়েছে জীবনের সর্বস্তরে জয়ের বরণমালা। অপূর্ব কর্মময় তাঁর জীবন। স্কুলে পড়ার সময়ই তাঁহার সাহিত্য সেবা আরম্ভ হয়। তাঁহার প্রথম পুস্তক 'কবিতা সংগ্রহের' ভূমিকা লিখেছিলেন কবি নবীনচন্দ্র সেন। ১৮৯০ সনে চৈতন্য লাইব্রেরীর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক প্রথম স্থান অধিকারী বলে বিবেচিত হন। এ কম সৌভাগ্যের কথা নয়। তারপর তিনি অনেক ছোট গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন—তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যাও গণনাতীত। সাংবাদিক হিসাবেও ক্রমে ক্রমে খ্যাতি লাভ করেন। শ্যামসুন্দরের "প্রীতিবাণী" কাগজে তিনি নিয়মিত ভাবে লিখতেন। বঙ্গবাসী, বসুমতী, প্রদীপ, সাহিত্য কাগজেও তাঁর লেখা বের হতে আরম্ভ করে।

তখন নবজাগরণের যুগ—স্বদেশী আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের সন্ধ্যা, বারীন ঘোষের যুগান্তর ও অরবিন্দের বন্দেমাতরম্—সব কাগজেই তিনি লিখতেন—প্রচার করতেন জনজাগরণের বাণী। কি উৎসাহ কি উদ্দীপনা কি প্রাণচাঞ্চল্য—শতাব্দীর সুপ্তি ভেঙে জেগে উঠেছিল—তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। সেই গণজাগরণের স্রোতে সারা দেশ ভেসে গিয়েছিল। তিনি সুরেন ব্যানার্জি, ভূপেন বোস, তিলক, লালপৎ রায়, বিপিন পাল, শ্যামসুন্দর, অরবিন্দ, কৃষ্ণকুমার, আশু চৌধুরী, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, দেশবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী, শরৎচন্দ্র সকলের সঙ্গে সহকারী হিসেবে জনজাগরণের কাজে অংশ গ্রহণ করেছেন। বঙ্গবিভাগ যে আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল—তার ফলও তিনিও ঘুমিয়েছিলেন। ফলে settled fact, unsettled হয়ে গেল—বঙ্গবিভাগ রদ

হলো। স্বদেশী যুগ থেকে আজ পর্যন্ত যত কাগজ বের হয়েছে—সব কাগজের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি অনেক কাগজে সম্পাদকতা করেছেন। তার মধ্যে বসুমতীর সঙ্গেই আজীবন সম্পর্ক ছিল।

তিনি অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি, কলা-সঙ্গীত, সাহিত্য ও জাতীয় দাবি সর্ব বিষয়েই ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

মনে-প্রাণে তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী। বাঙ্গালী জাতির মর্যাদা রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। লেখায়, বক্তৃতায়, আলাপ আলোচনায়, প্রবন্ধে গল্পে নানা ভাবে বাংলা ও বাঙ্গালীর জাতীয় গৌরব ও সম্মান রক্ষার্থে অশেষ চেষ্টা করেছেন।

তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলা, বিহার ও আসামের ভারতীয় ভাষায় পরিচালিত সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিরূপে মধ্য এশিয়ার বহু দেশ ভ্রমণ করেন। ১৯১৯ সনে বৃটিশ সরকারের সংবাদ-বিভাগের নিমন্ত্রণে ইওরোপের যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন করেন। ফিরে এলে চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল ঘোষ, যোগমকেশ চক্রবর্তী, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্যোগে তাঁহাকে সম্বর্ধনা করা হয়।

বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় তাঁর সমান ব্যুৎপত্তি ছিল। ১৯৪৫ সনে কলিকাতায় নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের অধিবেশনে হেমেন্দ্রপ্রসাদ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রূপে যে অভিভাষণ দেন তাহা সকলকে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর বক্তৃতা সম্বন্ধে Statesman লিখেছেন:

Bengal, whose Capital was chosen for the present session has of late been regarded for various reasons as having conspicuously fallen from her former pre-eminence in Indian affairs. But no decline in her ancient gifts of erudition and eloquence could have been discernible in the address of welcome to the visitors delivered by the Chairman of the Reception Committee Mr. H. P. Ghosh. In the encyclopadic breadth of its historical sweep and its felicity of phrasing it will rank memorably high among the many distinguished utterances by journalist in India about the traditions and aims of their calling.

Bombay Chronicle wrote: Mr. H. P. Ghosh—Chairman···delivered an address which was classic and showed the learning of a life-time. He not only gave us history of the pens in India, its vicissitudes and achievments but also the for anchoology of tyranny and the anthropology by tyrants. It was eminently fitted for the academic atmosphere of the great Senate Hall of Calcutta where we meet."

এ প্রশংসা গৌরবে উজ্জ্বল।

হেমেন্দ্রপ্রসাদই প্রথম কংগ্রেসের ইতিহাস রচনা করেন। পরে "কংগ্রেস ও বাংলা" লিখে জাতীয় আন্দোলনে বাঙ্গালীর অবদান বিবৃত করেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনকে জনপ্রিয় ও জয়যুক্ত করার জন্য অশেষ চেষ্টা করেছেন।

তাঁর লাইব্রেরী একটি অমূল্য সম্পদ। ইহাতে প্রায় ৭০ বৎসরের সংবাদপত্রের কাটিং-এ

রাজনীতি, অর্থনীতি সমাজ চেতনা—সাহিত্য ও সংস্কৃতি সব বিষয়ের সংবাদ এবং সমালোচনা ও পুস্তক রক্ষিত আছে। এই পাঠাগারে জাতীয় ইতিহাস লুক্কায়িত আছে। যদি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগে, কিংবা ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে এই পাঠাগারটি—"হেমেন্দ্রপ্রসাদ গবেষণাগার" নাম দিয়ে রক্ষিত হয়—তবে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হবে।

বাংলাদেশ ও বাঙালী তাঁর স্মৃতি গৌরবের সঙ্গে বহন করবে। তাঁর স্থান অপূরণীয়। যদি তাঁর পাঠাগারটি জাতীয় কল্যাণে রক্ষিত হয় তবে তাঁর স্মৃতি প্রকৃত ভাবে বেঁচে থাকবে।

হেমেন্দ্রবাবুর সঙ্গে প্রায় ৪০ বৎসরের পরিচয়। যখন সার্ভেন্ট ও ক্রী প্রেসে কাজ করতাম—এবং ইউনাইটেড প্রেস আরম্ভ করার সময় থেকে তাঁর কাছে যেতাম—তিনি প্রায়ই কেশব রায় ও উমা সেনের কথা বলতেন—পরামর্শ দিতেন, উদ্বুদ্ধ করতেন, বন্ধুর পথে চলবার,—নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে সাফল্য লাভ করবার। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সহকর্মী হিসাবে সাংবাদিকতা বিভাগে। তাঁর সঙ্গে পরিচয় ক্রমে বিশেষ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তিনি ছিলেন এ যুগের সাংবাদিকের পিতামহ স্বরূপ। আমাদের Friend, Philosopher and guide—তাঁকে জানাই শ্রদ্ধা—জানাই প্রণাম। কবিগুরুর ভাষায় বলি—

জীবন ভাণ্ডারে তব ছিল পূর্ণ অমৃত পাথেয়,
সংসার যাত্রায় ছিল বিশ্বাসের আনন্দ অমেয়।
নির্বিচল ছিলে সত্যে হে নির্ভীক তুমি নির্বিকার,
তোমারে পরাস্ত মৃত্যু অম্লান বিজয়মালা তাঁর।"

আচার্য হেমেন্দ্রপ্রসাদ ও আমরা ॥

দক্ষিণারঞ্জন বসু

প্রায় এক শতাব্দীর ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের হাতে তুলে দিয়ে ভারতের প্রবীণতম সাংবাদিক লোকান্তরিত হলেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর শেষ জ্যোতিষ্কের অস্তর্ধান ঘটল। শিক্ষা, সাহিত্য এবং দেশপ্রেমে সারা ভারতে যাঁরা নবজাগরণের সূত্রপাত করেছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছিল যে মহাজীবন, মৃত্যুর মহাসমুদ্রে অসংখ্য তরঙ্গের সঙ্গে আজ তার সব কিছুই বিলীন হয়ে গেল।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন পরিপূর্ণ জাতীয়তাবাদী ও অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তাঁর মতের প্রতিষ্ঠায় যেমন তিনি ছিলেন বিরামহীন সংগ্রামী, সংবাদপত্র সেবা ও সাহিত্য সাধনাতেও তেমনি ছিলেন নিরলস কর্মী। এ-কালে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় সমদক্ষ সাংবাদিক আমাদের মধ্যে বিরল। কিন্তু হেমেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন এর উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। দীর্ঘকাল তিনি বাংলা ও ইংরেজী দৈনিক 'বসুমতী' সম্পাদনা করেছেন। বছরের পর বছর একাই তিনি আট দশ কলম করে প্রত্যহ সম্পাদকীয় রচনা লিখেছেন, আজকের দিনে অনেকের কাছেই এ তথ্য অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে। সম্পাদনার দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণের পরও জীবনের শেষ অবধি তাঁর লেখনী ছিল অব্যাহত। বাংলা ও বহির্বাংলার নানা পত্র-পত্রিকায় অজস্র ইংরেজী ও বাংলা রচনা তিনি নিয়মিত পরিবেশন করে গেছেন। তাঁর রচনাবলীতে স্থান পেয়েছে বহুমুখী চিন্তা-ভাবনা। এত বিষয় নিয়ে তিনি এত অধিক লিখেছেন যে, তাঁকে আমরা অনায়াসে 'জীবন্ত বিশ্বকোষ' রূপে অভিহিত করতে পারি।

আমার পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে ২৭ বছর আগে হেমেন্দ্রপ্রসাদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার প্রথম সুযোগ ঘটেছিল। ১৯০৫ সনের কথা সেটা। তখন আমি দু'খানি বাংলা দৈনিকের সঙ্গে যুক্ত। সেই দু'খানি কাগজে মাঝে মাঝে তিনি সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখতেন। আমার সাংবাদিক জীবনের শুরুতে তাঁর কাছে গিয়ে সেই সময় শ্রুতি-লিখনের কাজ করতে হত। পায়চারী করতে করতে তিনি অনায়াস-স্বচ্ছন্দে বলে যেতেন, আমি লিখে নিতাম। লিখতে লিখতে আমি বিস্মিত হয়ে যেতাম তাঁর প্রখর স্মরণশক্তির পরিচয় পেয়ে। নির্ভুল সন-তারিখ, গ্রন্থ-পত্রের এমন অজস্র উদ্ধৃতি স্মৃতি থেকে আর কাউকে আমি উদ্ধার করতে দেখি নি। সম্ভবতঃ এ-ব্যাপারে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় ব্যক্তি-পুরুষ। গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী হেমেন্দ্রপ্রসাদকে শেষ দর্শনের জন্য উপস্থিত হয়ে বারংবার এমনি অনেক পুরনো স্মৃতি আমার মনে জীবন্ত হয়ে উঠছিল।

কিন্তু সে স্মৃতিচারণা আর এখন নয়। আমি এখানে শুধু হেমেন্দ্রপ্রসাদের সাংবাদিক জীবনের ও সাহিত্য জীবনের অসাধারণ অবদানের দু'চারটি কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করছি। বাংলা সংবাদপত্রের তিনিই ছিলেন প্রথম প্রতিনিধি যিনি সাংবাদিকরূপে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শনের সুযোগ পেয়েছিলেন। বাংলা সংবাদপত্র তথা বাঙালীর সাংবাদিকতার ইতিহাসে এ-এক অভাবনীয় ঘটনা। তদানীন্তন বৃটিশ সমরমন্ত্রী লর্ড কিচেনার ছিলেন সংবাদপত্র-বিরোধী। ফলে, যুদ্ধের প্রথম দিকে বহু সাংবাদিকের মধ্যে মাত্র

পাঁচজন বৃটিশ সাংবাদিককে তিনি সমরাঙ্গন পরিদর্শনের সুযোগ দেন। যুদ্ধের শেষাংকে হেমেন্দ্রপ্রসাদই একমাত্র ভারতীয় সাংবাদিক যিনি সর্বপ্রথম এই অভাবনীয় সুযোগ লাভ করে প্রথমে মেসোপটেমিয়া ও পরে ফ্রান্সের রণাঙ্গন পরিদর্শন করেন। শুনেছি, লণ্ডনে বাকিংহাম প্রাসাদে সম্রাট পঞ্চম জর্জের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ ও করমর্দন করেছিলেন। ঘটনা হিসাবে নিশ্চয়ই এটাও উল্লেখ্য, কিন্তু লর্ড কিচেনারের বিধি-নিষেধের জাল ছিন্ন করে যে বাঙালী সাংবাদিক সর্বপ্রথম রণাঙ্গনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংবাদপত্র-পাঠকদের কাছে পরিবেষণ করলেন, বাংলার সাংবাদিকগণ তা-ই সগৌরবে স্মরণ করবে চিরকাল।

হেমেন্দ্রপ্রসাদের দেশ-প্রেমের দীক্ষাগুরু ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। 'বন্দেমাতরম্' দৈনন্দিন সাময়িকপত্রের তিনি শুধু লেখক ছিলেন না, শ্রীঅরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে ওই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বও পালন করেছেন। এ-ছাড়া 'সন্ধ্যা,' 'যুগান্তর' প্রভৃতি সাময়িক পত্রগুলিতে তাঁর বিচারশীল, বুদ্ধিদীপ্ত, অগ্নিগর্ভ রচনাবলী সেই সময় অগণিত পাঠককে মুগ্ধ করেছিল,—তরুণ মনে জাগিয়েছিল দেশপ্রেমের প্রেরণা। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর সেই নির্ভীক, আপোষহীন মনোভাবকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ৩৭-তম অধিবেশনে [কলিকাতা] সংবাদ-সাহিত্য শাখার সভাপতি হিসাবে তিনি যে অভিভাষণ দিয়েছিলেন, তাঁর জীবনের সেই শেষ অভিভাষণেও হেমেন্দ্রপ্রসাদের সেই একই মনোভাবের পরিচয় পরিস্ফুট ছিল। সেদিন তিনি বলেছিলেন : "কোনোরূপ প্রভাবে যদি সংবাদপত্র স্বাধীন মত প্রচারে কুণ্ঠানুভব করেন, তবে সংবাদপত্রের যাহা অবশ্য কর্তব্য তাহাই বর্জিত হয়। সংবাদপত্র এ-দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে অল্প কাজ করে নাই। যে সরকার তাহার প্রচার ও প্রতাপ ক্ষুণ্ণ করিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী, সে সরকারের সহিত ঘনিষ্ঠতা অনিষ্টের কারণ হইতে পারে। সংবাদপত্রের আদর্শ যাহা প্রয়োজন স্বাধীন মত প্রকাশ। সে আদর্শ ভ্রষ্ট হইলে সংবাদপত্রের সার্থকতা নষ্ট হয়।"—আমরা যেন দেশের প্রবীনতম সাংবাদিকের এই বিদায়কালীন উপদেশ স্মরণে রাখি।

জীবনের শেষাংশে সাহিত্য রচনায় বিরতি ঘটলেও এককালে স্বজনধর্মী সাহিত্য রচনায় হেমেন্দ্র-প্রসাদ প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তাঁর সাহিত্য-আদর্শের প্রতীক। তিনি সাহিত্য-সম্রাটের শুধু স্নেহই লাভ করেন নি, সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভে বঙ্কিমচন্দ্রের হাত থেকে পুরস্কার লাভের সৌভাগ্যও অর্জন করেছিলেন। সুরেশ সমাজপতি সম্পাদিত তৎকালীন বিখ্যাত 'সাহিত্য' পত্রিকার লেখক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সেকালের যে কোনো সাহিত্যিকের পক্ষেই ছিল দুর্লভ গৌরবের বিষয়। হেমেন্দ্র-প্রসাদ সেই 'সাহিত্য' পত্রের ছিলেন নিয়মিত লেখক। এই পত্রিকায় সব্যসাচীর মতোই তিনি গল্প-উপন্যাস কবিতা প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখে পাঠকদের অজস্র প্রশংসা অর্জন করেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ স্বসম্পাদনায় 'আর্যাবর্ত' নামে নিজেও একখানা মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাখানি চার বৎসর চালু ছিল এবং তাতেও প্রতি সংখ্যাতেই হেমেন্দ্রপ্রসাদের একাধিক রচনা প্রকাশিত হতো। এন্ট্রান্স পাশ করার পরেই ১৮৯৩ সনে তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'উচ্ছ্বাস'-এর কথা তাঁর মুখেই কয়েকবার শুনেছি। তাতে কাব্যের উচ্ছ্বাস-বাহুল্য কিছু থাকলেও তাঁর রচিত 'বিপন্নীক', 'ষষ্ঠ ঋতু', 'অধঃপতন', 'নাগপাশ', 'ভূতানল' প্রভৃতি গল্প-উপন্যাসের মধ্যে যে সৃষ্টিশক্তি, সমাজ জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় রয়েছে তা যে কোনো সাহিত্যিকের পক্ষে ঈর্ষার বস্তু।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ শুধু কাব্য, কথা-সাহিত্য ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধ রচনা করেই ক্ষান্ত থাকতে পারেন নি। তিনি আমাদের অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দিয়ে গেছেন। তার মধ্যে 'The Press Act', 'The

Famine of 1770', 'কংগ্রেসের ইতিহাস', 'ভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থে মননশীল চেতনা ও যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্য পরিবেষণের অপূর্ব দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গিয়েছেন। বিগত কয়েক বছর ধরে বাংলার সংস্কৃতির দু'শ বছরের একখানা বাংলা ও একখানা ইংরেজি ইতিহাস তিনি রচনা করে চলছিলেন। যতদূর শুনেছি সে গ্রন্থ দু'খানি তিনি শেষ করেই গেছেন। প্রকাশিত হলে বিরাট 'আকর গ্রন্থ' রূপেই যে তা পরিগণিত হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

জীবনের শেষ দশ বৎসরে হেমেন্দ্রপ্রসাদকে আমরা দেখেছি নানাভাবে। সমাজ সেবার বিভিন্ন মহতী প্রচেষ্টার অগ্রণী নায়ক, অন্যায়ের প্রতিবাদে নির্ভীক বক্তা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপকরূপেই তিনি নিজেকে এ কয় বছর আবদ্ধ রেখেছিলেন। প্রথম দুটি বিষয়ে তাঁর কার্যকলাপের কথা দেশবাসী অবগত আছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগের সৃষ্টি থেকে নতুন সাংবাদিক সৃষ্টির কাজে শেষ বিদায় নেবার কিছুদিন আগে পর্যন্ত তিনি যে অনলস পরিশ্রম করেছেন তার তুলনা হয় না। তাঁর কনিষ্ঠতম সহযোগী হওয়া সত্ত্বেও সাংবাদিকতা বিভাগের অনেক অনুষ্ঠানে বা কাজে আমি অংশ গ্রহণ করে উঠতে পারি নি। কিন্তু কোনোদিন কোনো ত্রুটি দেখি নি অশীতিপর হেমেন্দ্রপ্রসাদের। সময় সময় এতে যে বেশ লজ্জা পেয়েছি তা' স্বীকার করতেই হবে। তাঁর পরলোকগমনে সাংবাদিকতা বিভাগের যে ক্ষতি হলো তা' যথার্থই অপূরণীয়। তবে সাংবাদিকতার যে আদর্শ তিনি ছাত্রদের সম্মুখে রেখে গেলেন তা' যদি তারা অনুসরণ করে চলতে পারে তবে বাংলা দেশের সাংবাদিকতা যে সমুন্নতর হবে তা' নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে।

এ সম্পর্কে আমি শুধু আর একটি বিষয় উল্লেখ করেই আমার এ নিবন্ধ শেষ করবো। হেমেন্দ্রপ্রসাদ সারাজীবন ধরে অসংখ্য গ্রন্থ ও সংবাদাদির যে কাটিং সংগ্রহ করে রেখে গেছেন তার তুলনা নেই। তাঁর এই সংগ্রহ ও তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও আচার্য যদুনাথ সরকারের দু'টি মন্তব্যের প্রতিলিপি এখানে প্রকাশ করা হলো। তা' থেকেই আমরা বুঝতে পারবো তাঁর মনীষার পরিচয় পেয়ে প্রফুল্লচন্দ্র ও যদুনাথের মত মনীষীরাও কত মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর জীবিতকালে দেশ-বিদেশের এমন কি সুদূর আমেরিকা থেকেও মাঝে মাঝে সাংবাদিকতা ও অন্যান্য নানা বিষয়ের গবেষক ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর কাছে এসে তাঁর সংগৃহীত নানা পুঁথিপত্র ও কাটিং ইত্যাদি থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছে। আমাদের দেশের সাংবাদিকগণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্রছাত্রিগণও ওই বিপুল সংগ্রহ দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হতে পারে। তাঁর উত্তরাধিকারিগণ যদি অমূল্য নিদর্শনে সমৃদ্ধ হেমেন্দ্রপ্রসাদের লাইব্রেরিটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগকে দান করেন কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি সাংবাদিকতা বিভাগের জন্য ওই লাইব্রেরিটি পাওয়ার ব্যবস্থা করেন তা' হলে এই সাংবাদিক-গুরুর স্মৃতি যথার্থভাবে রক্ষিত হতে পারে। এ দিকে আমি উভয় পক্ষেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অনেকেই হয়তো বহু বিষয়েই হেমেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি, কিন্তু এমন লোক খুব কমই দেখেছি যিনি তাঁর অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণ শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন না। সেই অমিত শক্তিধর আচার্যের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করে এই নিবন্ধ শেষ করছি।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের স্মৃতি ॥

ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ—এম. সি. বি. এস.
অধ্যক্ষ—সাধনা ঔষধালয়

সাংবাদিক-শ্রেষ্ঠ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের বিচিত্র কর্মময় জীবন-কাহিনী—অর্ধশতাব্দীর ঊর্ধ্বকাল ধরে বাঙ্গালী জাতির আশা-আকাঙ্খারই ইতিহাস। এই জীবন কাহিনী তাঁর অনলস কর্মশক্তির বিপুল ঘটনা স্রোতে পরিপূর্ণ। শ্রীঅরবিন্দের 'বন্দেমাতরম্' থেকে 'বসুমতী' পত্রিকার সম্পাদনা পর্যন্ত বিস্তৃত সাংবাদিক জীবনে তাঁকে বিদেশী আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী স্বাধীনচেতা সাংবাদিক হিসাবে দেখেছি—দেখেছি যুক্তি ও তথ্যের ক্ষুরধার লেখনী দিয়ে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে। যে কোন অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সর্বদা প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসতে পারেন এ-রকম অকুতোভয় মানুষ সমকালীন বাংলা সংবাদপত্র ও সমাজজীবনে হেমেন্দ্রপ্রসাদই ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ সেই সহজ অথচ দৃঢ়—সরল অথচ তেজস্বী একজন প্রকৃত বাঙ্গালীকে হারাল। দীর্ঘকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে হেমেন্দ্রপ্রসাদের ভূমিকা স্মরণীয়। সে ভূমিকা একাধারে দেশনায়ক ও সাংবাদিকশ্রেষ্ঠের।

শুধুমাত্র সাংবাদিকতায় হেমেন্দ্রপ্রসাদের প্রতিভা সীমাবদ্ধ ছিল না—জনসেবায় এবং জাতীয় সঙ্কটে তাঁর ভূমিকা বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে আজ স্মরণ করতে হবে। যুক্তি, তথ্য ও সত্যকে ভিত্তি করে তাঁর ক্ষুরধার বক্তৃতা—আজকের দিনের এই প্রথম শ্রেণীর প্রায় বক্তৃতাহীন বাংলাদেশে বারবার মনে পড়ে। তাঁর অসাধারণ স্মরণশক্তি এবং অতুলনীয় সংগ্রহের [সংবাদপত্র ও গ্রন্থাদির] জন্য তিনি জীবন্ত বিশ্বকোষ নামে সমধিক পরিচিতি অর্জন করেছেন।

দেশের সংস্কৃতি ও সমাজের উপর তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। দেশের উন্নতি ও সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত।

বহুদিন আগেকার একটা ঘটনা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল—সাধনা ঔষধালয়ের হ্যারিসন রোড শাখার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে এসেছেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ—উদ্বোধক বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়। সভাপতির ভাষণে হেমেন্দ্রপ্রসাদ আয়ুর্বেদ সাধনার পূর্বাচার্য বাঙ্গালী কবিরাজগণের কথা এবং বঙ্গভাষায় আয়ুর্বেদ সাহিত্যের কথা বললেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায়। আয়ুর্বেদ সাধনার কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন,—"আয়ুর্বেদ ভারতীয় ঐতিহ্যের স্বাক্ষরবাহী জীবনদর্শন, আর্য-সাধনার পরমসিদ্ধি—আয়ুর্বেদের সেবা ও সাধনা হচ্ছে প্রকৃত স্বদেশী কাজ—অর্থাৎ স্বধর্মপালন। বিদেশী মোহে আয়ুর্বিজ্ঞানের অনুশীলন যতই সীমাবদ্ধ হচ্ছে, দেশবাসী ততই নিজের আদর্শ থেকে সরে যাচ্ছে—স্বধর্মচ্যুত হচ্ছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ যা কিছু আমরা নিশ্চয়ই গ্রহণ করব—কিন্তু নিজের ঐতিহ্যকে আমরা যদি ভুলে যাই আমাদের সর্বনাশ কেউ রোধ করতে পারবে না।"—সেদিন বিস্ময়মুগ্ধ হয়ে আমরা তাঁর কাছে শুনেছিলাম চরক সংহিতার কথা—আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক মূল্যের কথা। শুনেছিলাম আয়ুর্বেদ সাধনার নূতন মূল্যায়নের কথা। একজন সাংবাদিকের আয়ুর্বেদ সম্পর্কে অপরিসীম জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে সেদিন সবাই বিস্মিত হয়েছিলেন। সেইদিন থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হল। তাঁকে প্রণাম করতেই বললেন—আয়ুর্বেদ সাধনাই হচ্ছে স্বাদেশিকতা—স্বধর্ম পালনে সিদ্ধিলাভ

করে মানুষের সেবায় আয়ুর্বেদকে বিনিয়োগ কর।"—তাঁর সেই আশীর্বাদ আমার জীবনে নূতন প্রেরণার সঞ্চার করল।

আমার পিতৃদেব আচার্য যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ব্যবস্থার বিস্তারে তিনি সর্বদাই পিতৃদেবকে সাহায্য করতেন। যখনই যে প্রয়োজনে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছি তিনি আয়ুর্বেদীয় সপ্তধাতু ও ত্রিদোষ বিষয়ে এবং চিকিৎসা পদ্ধতির মূল বিজ্ঞান বিষয়ে নানা কথা জিজ্ঞাসা করতেন। আমি বিশেষ করে লক্ষ্য করেছি যে, আয়ুর্বেদ সম্পর্কে তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধাও যেমন ছিল—সেইরকম অপরিসীম জ্ঞানও ছিল। আমার 'আয়ুর্বেদের ইতিহাস' শীর্ষক গ্রন্থ রচনায় তিনি আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এই গ্রন্থরচনায় তিনি আমাকে বহু অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান দেন। বঙ্গভাষায় এই ধরনের আয়ুর্বেদের ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা এই প্রথম বলে তিনি আমাকে বিশেষ উৎসাহ দেন।

আলিপুর জজ-আদালতে সুপ্রসিদ্ধ মুরারিপুকুর বোমার মামলায় শ্রীঅরবিন্দ এবং তাঁর সহযোগীদের বিচার-প্রকোষ্ঠে ও বহির্ভাগে স্মৃতিফলক সংবলিত ঔষধালয়ের উদ্যোগেই স্থাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে আলিপুর প্রাঙ্গনের সভায় সভাপতিত্ব করেন তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীসুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী,—প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ। সেদিনের ভাষণে তিনি তাঁর নেতা পরিকল্পিত শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে অনেক অজ্ঞাত তথ্য আমাদের শোনালেন। শ্রীঅরবিন্দ এবং তাঁর সহযোগীদের বিচার-প্রকোষ্ঠের স্মৃতি-ফলকের কথাগুলি তিনিই লিখে দিয়েছেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ আমার ভাষণ রচনায়ও বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। তিনি বললেন—"শ্রীঅরবিন্দের বিচার-স্মৃতিকে ঘিরে আছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবন ও দর্শন।"

বর্তমান মনীষী হেমেন্দ্রপ্রসাদ কত সহজ সরল ও হৃদয়বান ছিলেন দু'একটি ব্যক্তিগত স্মৃতিতে সর্বদাই আমার সে কথা মনে হয়। আমার সঙ্গে তিনি ব্যবহার করতেন পরম আত্মীয়ের মত। অনুযোগ করে তিনি আর একটি কথা প্রায়ই বলতেন, "কি হে, বৃদ্ধের কথা তো ভুলেই গেছ। তাহার লবণ তো ফুরিয়ে গেছে; কৈই আর তো পাঠালেন না।" বৎসরাধিক পূর্বে তাঁর জন্মতিথি উপলক্ষে আমি তাঁর এক সংক্ষিপ্ত জীবন-ইতিহাস রচনা করেছিলাম। দেহাবসানের কিছুকাল পূর্বে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন—"ওহে নরেশ তুমি আমার যে জীবনী লিখেছ—তার কয়েকটা খুঁজে রেখ—আমার দরকার আছে। —আর আমার কেন ভবিষ্যতে অনেকেরই দরকার হতে পারে। আমার কথা তুমি যে ভাবে লিখেছ সেভাবে তো কেউ লেখে নি।'

গল্প-ভারতীর কর্তৃপক্ষের কাছেও শুনেছি তিনি প্রায়ই আমার কথা বলতেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে আজ স্মৃতির মণিকোঠায় সেই কথা স্মরণ করে রাখব।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যখন 'আয়ুর্বেদ বিল' আইনে পরিণত করেন তখন আয়ুর্বেদের যাতে মর্যাদা রক্ষিত হয় সেদিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। শুধু 'বসুমতী' পত্রিকায় সম্পাদকীয় লিখেই তিনি নিবৃত্ত হন নি—তথ্য, যুক্তি ও বুদ্ধির সাহায্যে কবিরাজ মহাশয়দের সাহায্য করেছেন। আয়ুর্বেদসেবীগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম যেন তাঁর নিজেরই সংগ্রাম। এই ভাবেই দরদ দিয়ে—আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি প্রতিটি কাজে এগিয়ে আসতেন সকলের পুরোধারূপে।

সাহিত্য ও সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে হেমেন্দ্রপ্রসাদের মূল্য বিচারের ভার মহাকালের। সাংবাদিক

হেমেন্দ্রপ্রসাদ—আদর্শবাদী হেমেন্দ্রপ্রসাদ চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন তাঁর অতুলনীয় প্রতিভার মধ্যে—তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। একটি যুগের—একটি জাতির—আশা-আকাঙ্খা, আনন্দ-বেদনার সঙ্গে নিবিড়-ভাবে তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি নিজেই একটি কালের পঞ্জিকা বহন করেছেন।

সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনই একটা জাতির সব কিছু নয়। প্রগতিশীল ও প্রাণবন্ত জীবনের স্বাক্ষর পাওয়া যায় তার সংস্কৃতিতে। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ভারতের সেই সংস্কৃতির সাধক ছিলেন। ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে যেমন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য তাঁর ছিল—সেই রকম পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন ও রাজনীতি বিষয়ে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল।

খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেও তিনি ছিলেন প্রাচীন চতুষ্পাঠির পণ্ডিতের মত শিষ্যগণ-পরিবৃত। তাঁর বৈঠকী আসর ছিল প্রাণময়। শুধু ভারতবর্ষ বা প্রাচ্যদেশই নয়—সমগ্র পৃথিবীর তিনি ছিলেন তীর্থপথিক।

সর্বজন-মানসে তাঁর স্থান তাই শুধু সাময়িক নয় —চিরস্থায়ী—ভাস্বর—চিরন্তন।

ইংরেজ শাসনের যে অংশ শোষণ তাহার দ্বারা সে ভারতের সমৃদ্ধ শিল্প নষ্ট করিয়াছিল, বাণিজ্য ধ্বংস করিয়াছিল, যে দেশ কৃষিপ্রধান ছিল তাহাকে কৃষিপ্রণে পরিণত করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। সে কথা বাঙ্গালার দুই জন মনীষী বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন—ইংরেজীতে রমেশচন্দ্র দত্ত, বাঙ্গালায় সখারাম গণেশ দেউস্কর। রমেশচন্দ্রের পুস্তক সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাই দেশবাসীকে 'বয়কটে' প্ররোচিত করিয়াছিল—

Without the Economic History and its damning story of England's commercial and financial dealings with India we doubt whether the Public mind would have been ready for the Boycott. In this one instance it must be said of him that he not only wrote but created it."

কয়েকটি চিঠি ও একটি স্মৃতি ॥

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আর-দশটা ছেলের মতো আমারো শৈশবের নেশা ছিল ডাকটিকিট, পয়সা আর অক্ষর সংগ্রহের। পুরনো ডাকটিকিট আর পয়সায় আঁকা কত রাজা রাণীর চেহারা দেখতাম, সবই মনে গভীর দাগ কেটে দিত।

পণ্ডিচেরীতে আমাদের বাড়িতে প্রথম যেবার শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এলেন, তখনো আমার কৈশোর শুরু হয় নি বোধ হয়। বাবার সঙ্গে অমীতিপর সৌম্যমূর্তি এই প্রবীণকে দেখে বিস্ময়ে আমার পলক পড়ে নি।

"কি দাদু, নেহাৎ অচেনা লোক মনে হচ্ছে?"

"না তো", সম্বিত পেয়ে আমি ব'লে ফেললাম,—"খুব চেনা লোক তো আপনি।"

"মনে আছে আমার কথা? কে বলো তো?"

একটু ইতঃস্তত ক'রেই কস ক'রে মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল,—"পঞ্চম জর্জ।"

অদম্য কৌতুকে ভ'রে গেল ওঁর মুখ। আমায় বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

বাবা বললেন, —"দাদু হল!"

আলাপ হ'ল এইভাবেই। আলাপ জ'মে উঠতে দেরি হয় নি। আমাদের তিন ভাইয়ের সঙ্গে যখন কথা বলছেন, তখন যেন আমাদেরই একজন। আমার দাদার সঙ্গে খেলাধুলোর কথা, আমার সঙ্গে কবিতার কথা, আবার আমার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে জাপানী প্রথায় গাছ ছোট রাখবার সেই 'বন্‌সাই' পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা স্বচ্ছন্দে তিনি ক'রে চলেছেন—আজো আমার মনে পড়ে সেই দৃশ্য।

আবার বাবার সঙ্গে গুরুগম্ভীর অন্যান্য কথা আর মা'র সঙ্গে ঘর-সংসারের টুকরো টুকরো আলোচনাও চলেছে একই সঙ্গে। ওইটুকু সময়ের মধ্যে, আজো স্পষ্ট মনে আছে, দেখেছিলাম কত না বিচিত্র ওঁর জ্ঞান, কত বিস্তৃত ওঁর অভিজ্ঞতার পরিধি। সেদিন জানতাম না 'জীবন্ত বিশ্বকোষ' নামে সারা দেশে যাঁর খ্যাতি, তিনিই আমাদের কাছে অত ছোট ঘরোয়া মানুষটির মতো এসেছিলেন।

অল্পদিন পরেই, দ্বিতীয়বার পণ্ডিচেরী এলেন উনি। এবার আর একা নন। স্বনামধন্য আরো কয়েকজনের মধ্যে আমাদের আত্মীয় ৺শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ কালিদাস নাগ, শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য প্রভৃতিও ছিলেন। সেবারেই শ্রীমা উদ্বোধন করলেন শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্রের। তাই 'কনভোকেশন্' উপলক্ষে এই মহারথীদের আগমন।

প্রফেসর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ, যতদূর মনে পড়ে, পূর্বব্যবস্থা অনুযায়ী উঠেছিলেন দিলীপদার [শ্রীদিলীপ কুমার রায়ের] বাড়িতে। কিন্তু পণ্ডিচেরী আসবার আগেই তিনি বাবাকে চিঠি লিখেছিলেন, এবং এসেই সবান্ধবে আমাদের বাড়িতে এলেন—'বউদা আর ছেলেদের' দেখতে।

সেই স্মরণীয় দিনটির কথা ভুলব না। ঘরে ঢুকেই প্রফেসর ৺শ্যামাপ্রসাদ আমাদের সঙ্গে তাঁর সঙ্গীদের আলাপ করিয়ে দিতে গিয়ে আমাদের তিন ভাইকে প্রফেসর শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদের আলিঙ্গনে বাঁধা পড়তে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে বললেন,—"আগে থেকেই আমার দাদুদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে রেখেছেন!"

হো হো ক'রে আমরা হেসে উঠলাম ওঁর বলবার ধরন দেখে।

এমনি আনন্দেই সেদিন বিকেলটা কাটল। বাংলার এক স্বর্ণযুগের শেষ প্রতিনিধিদের এই বহুক্ষণ সান্নিধ্যে সেদিন উপলব্ধি করেছিলাম, এত বড় খ্যাতনামা পণ্ডিতেরাও কত-না সরল সহজ হ'তে পারেন।

দিলীপদার কোরাস দলের সঙ্গে আমরা 'কন্‌ভেন্‌শন্' সভায় গাইলাম কয়েকটি গান। তার মধ্যে মূল ফরাসীতে ফরাসী জাতীয় সঙ্গীতও গেয়েছিলাম,—"Allons enfants de la patrie !"

সভা শেষে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ দিলীপদাকে দেখিয়ে বললেন,—"তোমার গানের ওস্তাদ যে তোমার তারি সুখ্যাতি করছিলেন দাদু!"……

কাজ সেরে ওঁরা কলকাতা ফিরে গেলেন। যাবার আগে বারবার ব'লে গেলেন,—"দাদু, এই দেখাই কিন্তু শেষ দেখা নয়। চিঠি দিও।"

আমার স্বাক্ষরের খাতাটা দিলাম। হেসে বললেন,—"আমার চিঠি তো পাবেই।"

"কিন্তু এই খাতাটারও যে চাই আপনার সই।"

দু-মিনিট ভেবে লিখে দিলেন,—"মানুষের যাহা কর্তব্য, তাহাই তাহার ধর্ম।" তারপর, খাতার শেষ পাতায় তাঁর ঠিকানা লিখে দিয়ে বললেন,—"চিঠি দিও কিন্তু! আর, তোমার নতুন কবিতাও মাঝে মাঝে পাঠিও; আমার ভারি ভাল লাগল তোমার লেখা।"

সে সময় প্রায় রোজই নতুন নতুন কবিতা নিয়ে যেতাম দিলীপদার কাছে। অকৃত্রিম উৎসাহে তিনি সেগুলো কেবল দেখেই দিতেন না, দশজনকে ডেকে শোনাতেনও। নতুন কবিতা পাঠানো আর এমন কি? ওঁকে কথা দিলাম, নিশ্চয়ই পাঠাব। পাঠিয়েও ছিলাম।

কবিতা পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি লিখেছিলেন,—"স্নেহাস্পদ দাদু ভাই, তোমার পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। আমার কথা যে তোমাদের মনে পড়ে ইহা আমার পক্ষে সুখের বিষয়। তোমার প্রেরিত কবিতা পাইয়াছি। উহা মাসের শেষ সময়ে আসায় ছাপাইতে বিলম্ব হইল। আগামী সংখ্যায় [বোধহয় 'ভারতবর্ষে'] প্রকাশের ব্যবস্থা করিতেছি। যে সংখ্যায় উহা প্রকাশিত হইবে, তাহার একখানি তোমাকে পাঠাইয়া দিব। তোমার বাবাকে ও মা'কে আমার স্নেহ জানাইও এবং তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিও। যদি সুযোগ পাই, আবার তোমাদের কাছে যাইব। দুই নলিনীবাবুকে * ও শ্রীমান দিলীপকে আমার কথা বলিও। মা'কে আমার শ্রদ্ধা জানাইও। গত ১০ই জুলাই তারিখের 'Orient' পত্রে আমার একটি সচিত্র প্রবন্ধ—'A New International University' প্রকাশিত হইয়াছে। তোমার বাবা তাহা দেখিয়াছেন কি? মা'কে ও পুরাণী মহাশয়কে উহা দেখিতে বলিও। যদি ওই পত্র আশ্রমে না যায়, আমাকে লিখিলে আমি পাঠাইয়া দিব। আশা করি সকলে ভাল আছ। মন দিয়া পড়িও ও খেলা করিও।

ইতি শুভার্থী—

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।"

অল্প কয়েক দিন বাদেই আমার নামে এক কপি 'ভারতবর্ষ' এসে পৌঁছল। খুলে দেখি আমার কবিতা 'শ্রীঅরবিন্দ' প্রকাশিত হয়েছে।

* শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত এবং শ্রীনলিনীকান্ত সরকার।

সেই প্রথম 'ভারতবর্ষে' আমার লেখা প্রকাশিত হ'ল। আমার বয়স তখন? বলতে দ্বিধা হচ্ছে —মাত্র চোদ্দ কি পনেরো বছর।

আর এল ওঁর চিঠি:

"দাদাভাই, তোমাকে 'ভারতবর্ষ' পাঠাইয়াছি। আশা করি, তাহা পাইয়াছ। উহাতে তোমার কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় তোমার একটি কবিতা দেখিয়াছি। ছন্দ সম্বন্ধে আরো মনোযোগী হইবে। আজ তোমাকে একখানি 'গল্প ভারতী' পাঠাইলাম। উহাতে আমার একটি প্রবন্ধ আছে আশ্রম সম্বন্ধে। উহা তোমরা পাঠাগারে নলিনীবাবুকে [সরকার] দিও—উহা আশ্রম লাইব্রেরীতে রাখিতে পার। নলিনীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিও Convention-এর বিবরণ কি প্রকাশিত হইয়াছে? তোমার মা'কে ও বাবাকে আমার আশীর্বাদ দিও—তোমরা কয় ভাই আমার স্নেহ গ্রহণ করিও। আশা করি, সবাই ভাল আছ। ইতি—

শুভার্থী শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।"

আমার লেখা যখন যেখানে প্রকাশিত হয়েছে, ওঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। কখনো সামান্য অবশ্য-বদলের suggestion-ও পাঠিয়েছেন। ১৩৫৮ সালের বিজয়ার দিন আমায় যে চিঠিটা উনি লেখেন সেটি উদ্ধার করি:

"দাদাভাই, তোমরা আমার বিজয়ার আশীর্বাদ জানিও—জয়ী হও। তোমাকে পূর্বপত্রে ছন্দ সম্বন্ধে সাবধান হইতে বলিয়াছিলাম। 'প্রবীণে' তোমার কবিতা পড়িলাম।.....আশা করি, প্রেরিত কাগজগুলি তোমরা পাইয়াছ। তোমাদিগের সকলের কল্যাণ কামনা করিতেছি।—শুভার্থী শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।"

আমার পিতামহ মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এবং ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৯৫১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে হেদুয়ায় [আজাদ হিন্দ্ বাগ-এ] যতীন্দ্রনাথের আবক্ষ মর্মর মূর্তি যখন উন্মোচন করেন গুরুদিৎ সিং, উনি আমার বাবাকে লেখেন:

"কল্যাণীয়বরেষু—হেমেন, তোমার পত্র পাইয়াছি। বোধ হয়, জান—গত রবিবারে হেদুয়া দীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে—আমাদের যতীনের আবক্ষ মর্মর- মূর্তির আবরণ উন্মোচিত হইয়াছে। তাহার বিবরণ যে 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' ও 'যুগান্তরে' প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পৃথ্বীন্দ্র তারার নামে পাঠাইলাম। সে তো আমার "সমবয়সী" ও "বন্ধু"—দাদু। যতীনের একখানি Photo আমার প্রয়োজন। তুমি পত্র পাইয়া ২।১ দিনের মধ্যে আমাকে পাঠাইয়া দিও। যদি প্রয়োজন হয় তোমার ঘরের ছবি হইতে copy করাইয়া দিবে। দাদুর নামে একখানি Orient পাঠাইলাম। উহার সম্বন্ধে দাদুর অনেক কাজ রহিল।... সুধীরকে * ও নলিনীবাবুকে [সরকার] আমার কথা বলিবে। পুরাণীজীর জন্য তথ্য পাঠাইব। আশা করি তোমরা সকলে ভাল আছ। পৃথ্বীনকে পরে পত্র লিখিব। ইতি—শুভার্থী শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।"

কিছুদিন আগে, 'মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ' নামে আমার পিতামহের পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করছি, খবর পেয়ে তিনি আমায় জানান যে ওঁর সাধ্যমত তথ্যাদি পাঠাবেন আমার কাজে সাহায্যের জন্যে।

এত তাড়াতাড়ি তিনি চ'লে যাবেন, যেন কল্পনা করাও কঠিন। অথচ, সাধারণের তুলনায় অনেক বেশি দিনই তিনি ছিলেন আমাদের মধ্যে। চির তরুণ জ্ঞানবৃদ্ধ এই কর্মবীর আমাদের সামনে অক্ষিতীয় কর্মনিষ্ঠার যে দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন, তা' অবিস্মরণীয়।

আমার শৈশবের সংগৃহীত ডাকটিকিট, পয়সা আর স্বাক্ষরগুলো অবহেলিত প'ড়েছিল আলমারির এক কোণে। সেগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে আজ আবার চোখে পড়ল পঞ্চম জর্জের অস্পষ্ট ছবিটা। আর স্বাক্ষরের খাতায় ছোট ছোট অড়ানো অক্ষরে জ্বল্‌জ্বল্ ক'রে উঠল একটা বাণী: "মানুষের যাহা কর্তব্য, তাহাই তাহার ধর্ম।"

---

* মানিকতলা বোমার বাগানের শ্রীসুধীর সরকার।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ও বাংলা সাংবাদিকতা ॥

পবিত্র পাল

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মারা গেলেন, অথচ তাঁর সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা কোন সংবাদপত্রে বেরোয় নি। সাংবাদিকতা আজ এমন একটি 'চীপ' ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, মারদাঙ্গা ক'ল ছাড়া আর কিছুই অন্ততঃ বাংলা সাংবাদিকরা করতে রাজী নন। দু'চারটা কাগজ নকল করে সংকলন ধরনের আলোচনার পক্ষপাতীই বোধ হয় বেশী তাঁরা। কারণটা হ'ল, তাঁরা অন্য কোন পেশা না পেয়ে এ বিভাগে এসেছেন। কিছু রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকশ্রেণীর ব্যক্তিদের সহায়তায়। তাই দেখা যায়, কোন কৃতী ব্যক্তি মারা গেলে তাঁর সম্পর্কে সঠিক পরিচয় তুলনামূলক বিচারে ছাপা হয় না।

একথা বলা প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যখন হেমেন্দ্রপ্রসাদের কথা ওঠে। মৃত্যুর আগেকাল পর্যন্ত তিনি কঠোর নিষ্ঠা ও ছাত্রজীবনের শৃঙ্খলার সঙ্গে সাংবাদিক জীবনের দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন। এগুলো ছাত্র হিসেবে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে গিয়ে চাক্ষুষ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেদিন-ও তিনি নানা সংবাদপত্র পাঠ করেছেন, ঘটনাবলীর পূর্বাপর পারম্পর্য তথ্যসহকারে পরীক্ষা করেছেন, সম্পাদকীয় লিখেছেন। শুধু 'চীপ' এবং উত্তেজক 'রিক্রেকসন'-এ তিনি সহজ চতুর দায়িত্ব পালন করেন নি।

'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার নাম সুপরিচিত। অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর নাম এ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা তাঁদের জ্বালাময়ী লেখনীতে সম্পাদকীয় লিখতেন, সে সম্পাদকীয়গুলো বাংলার মানুষের মনকে নাড়া দিত। প্রেরণা দিত। দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচন করতে হবে, এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতেন দেশবাসী। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, আরো একজন বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সঙ্গে সম্পাদকীয় লিখতেন। তাঁর নাম এ প্রসঙ্গে অনেকেই জানেন না। তিনি হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। ১৯০৮ সনে 'বন্দেমাতরম্' বন্ধ হয়ে গেলে তিনি 'সাপ্তাহিক বসুমতী'তে যোগদান করেন। কিছুদিনের মধ্যে সে সাপ্তাহিকের সম্পাদক হন। তখন মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার 'নবশক্তি' এবং পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নায়ক' দৈনিক বাংলা পত্র হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে। মাঝখানে 'বঙ্গবাসী' কর্তৃপক্ষ 'দৈনিক' দৈনিক সংবাদপত্র বের করে ফেল করেন। 'সুপ্রভাত' দৈনিক পত্রটি বের করে অল্পদিনের মধ্যেই বন্ধ করেন 'ইংলিশম্যান' কর্তৃপক্ষ। সাপ্তাহিকের যুগ তখন, হেসে খেলাপড়ার দিকে বেশ ঝোঁক দেখা দিয়েছে দেশবাসীর। এ-সুযোগে প্রথম মহাযুদ্ধ যেদিন আরম্ভ হল, তার পরদিনই ১৯১৪ সালে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে সম্পাদক করে উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'দৈনিক বসুমতী' বের করেন। এই 'দৈনিক বসুমতী'ই বর্তমানে সর্বাপেক্ষা পুরাতন বাংলা পত্র। 'দৈনিক বসুমতী' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর সাড়া পড়ে যায়, ফলে রোটারী প্রেস বসাতে হল। এ-সম্পর্কে ১৯৫৪ সনে প্রকাশিত প্রেস কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে :

'The Basumati', a well-known Bengali daily, which is still publishing with its weekly and monthly of the same name, was started in 1914 under the editorship of Sri Hemendra Prasad Ghose. Sri Ghose set a cautious yet forward course for his paper and soon it made a place for itself in Bengali Journalism. Sri Ghosh's ability was acknowledged by his inclusion in a Press delegation which visited the theatres of war, soon after the formation of the Central Publicity

Bureau in 1918. He organised an efficient service of news for his paper which was the first among Bengali newspapers to adopt modern methods of newspapers production." ১৯১৯ সনে 'দৈনিক বসুমতী'র প্রচারসংখ্যা হল সাত হাজার। তখনকার দিনে এমন প্রচার অনেক কাগজের পক্ষেই লোভনীয় ছিল। বিশেষতঃ বাংলা কোন দৈনিক এর আগে এত প্রচার-গৌরব অর্জন করেনি। হেমেন্দ্রপ্রসাদের যোগ্য সম্পাদনায় সে গৌরব 'দৈনিক বসুমতী' অর্জন করে।

সম্পাদনা করতে গিয়ে হেমেন্দ্রপ্রসাদ জাতীয়তাবাদ এবং অনুন্নত দেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় জনমত সৃষ্টির দিকে নজর দিতেন। বসু-ও বসুমতীর স্বত্বাধিকারীরা মুখ্যতঃ হিন্দুপন্থী ছিলেন এবং সে কারণে আধুনিক শিক্ষায়-মানুষ হেমেন্দ্রপ্রসাদকে কখনো কখনো সে পন্থা অনুসরণ করতে হয়েছে। কিন্তু জাতীয়তাবাদ এবং বৃটিশের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিও করে গিয়েছেন। তিনি এ-শিক্ষা শিশিরকুমারের কাছে পেয়েছিলেন। বিদ্বেষের অগ্নি তাঁকে হাতছানি দিত। দেশের ঘোরতর অবিচার আর অন্যায়ের দিনে-ও তাঁকে শুনেছি বলতে বাংলাকে আবার অগ্নিযুগে ফিরে যেতে হবে। বছর দেড়েক আগে এমন কথা তিনি বলেছিলেন।

আজকের 'মাসিক বসুমতী'র প্রথম জীবন শুরু হয় হেমেন্দ্রপ্রসাদের সম্পাদনায়। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হেমেন্দ্রপ্রসাদকে সে ভারার্পণ করেন। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী' ছাপা হয়েছিল পাঁচ হাজার কপি। কিন্তু প্রথম সংখ্যাই এমন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, চারদিনের মধ্যে সব নিঃশেষিত হয়ে যায়। এবং সতীশচন্দ্র সংগে সংগে সেই সংখ্যাই আরো পাঁচ হাজার কপি ছাপেন। এটা সম্ভব হয়েছিল হেমেন্দ্রপ্রসাদের যোগ্য সম্পাদনা এবং জনপ্রিয়তার ফলে।

'বন্দেমাতরম্' 'সন্ধ্যা' এবং পুরোনো 'দৈনিক বসুমতী'র পাতা ঘেঁটে তাঁর লেখা উদ্ধার করে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। পঁয়ষট্টি বছরের বেশি কাল এক নাগাড়ে সাংবাদিকতা করে গিয়েছেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ। এ এক দুর্লভ ক্ষমতা। ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন তাঁকে বলতেন, 'পিতামহ ভীষ্ম'। পিতামহ ভীষ্ম সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদের কাছে তিন-পুরুষ ধরে বাংলা সাংবাদিকতা ঋণী।

তাঁর সম্পর্কে আরো একটি কথা বলা প্রয়োজন। তিনি তাঁর 'হোম লাইব্রেরী'কে মূল্যবান করে গড়ে তুলেছেন। এবং এ গ্রন্থাগারটিকে তিনি জীবনস্বরূপ জ্ঞান করতেন। কোন এক প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর এ লাইব্রেরীটিকে লোভনীয় অর্থের বিনিময়ে [যতদূর মনে হয়, অঙ্কের পরিমাণ ৫০,০০০ টাকা] কেনবার প্রস্তাব করা হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু তিনি জীবিতকালে এটি হাতছাড়া করতে চান নি। তাঁর কাছে এ লাইব্রেরী জীবনধারণের বড় প্রেরণা। ভাবতে অবাক লাগে, কী কঠোর তপশ্চর্যার মত তিনি এই সেদিনও লাইব্রেরীর কাজ করেছেন। কাগজের কাটিংগুলোকে সযত্নে খাতায় আঠা দিয়ে আঁটানো খাতায় লাগিয়েছেন। এগুলো কোথাও মিলবে না। সেজন্যেই রাজনীতিকরা তাঁর কাছে তথ্যের জন্যে ছুটে আসতেন। ভাষাপ্রসাদ, শরৎ বসু প্রমুখেরা সব সময় তাঁর সাহায্য নিয়ে চলতেন। আর কি আশ্চর্য স্মরণশক্তি ছিল তাঁর। যখনি কোন বইয়ের সাহায্য চেয়েছি বা কোন বিষয়ের বিস্তৃত তথ্য জানতে চেয়েছি, বিনা ক্লেশে তিনি চোখের পলকে সামনে এনে হাজির করতেন। বিন্দুমাত্র বিরক্ত হতেন না। নতুনরা তাঁর ওখানে কাজ করতে গেলে তিনি নিজেই তাকুণ্যে প্রতিষ্ঠিত হতেন। তাঁদের সর্বরকম কাজ করে দিতেন। কত সহজলভ্য ছিল তাঁর লাইব্রেরী যাঁরা সেখানে কাজ করেছেন তাঁরা জানেন।

গল্প-ভারতী

চৈত্র—১৩৬৮

সম্পাদক :

সহঃ সম্পাদক : শ্রীকল্যাণ রায়

মূল্য—এক টাকা

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড ২৭১বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে
শ্রীসুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত এবং কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড,
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

সারাদিন সুরভিমণ্ডিত ও সতেজ রাখবে

ওটিন

ট্যালকাম পাউডার

(সাধারণ ও জ্যাসমিন সুবাসিত)

এই রেশম-কোমল পাউডারের স্পর্শ আপনার ভালো লাগবে। স্নানের পরে মাখলে শরীরটি সরসরে মনে হবে—দীর্ঘস্থায়ী মিষ্টি গন্ধে মন আনন্দে মাতিয়ে রাখবে।

ওটিন ট্যালকম পাউডার মেখে এই ভাপসা গরমের হাত থেকে বাঁচুন— এতে সারাদিন আপনাকে সতেজ দেখাবে, আপনার দেহকে স্বচ্ছন্দ মনে হবে।

ওটিন প্রসাধন সামগ্রী— প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে সুপরিচিত

মার্টিন অ্যাণ্ড হ্যারিস (প্রাইভেট) লিমিটেড, ১৮২, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪

এই সংখ্যায়

সাহিত্য-সংবাদ—সুদর্শন পাল	৯৬৯
গেরহার্ট হাউপ্টম্যান—সুনীল কুমার নাগ	৯৭৩
গ্রন্থ-পরিচয়—	৯৭৪
সাহিত্যেরুচির অধঃপতন (আলোচনা)—নারায়ণ চৌধুরী	৯৭৯
সঙ্গীত-আসর——রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৯৮৫
একটি স্বাক্ষর (গল্প)—মৃত্যুঞ্জয় মাইতি	৯৮৬
পুরাতন পাতা—	৯৯৬
দেশ বিদেশ—	৯৯৮
খেলাধূলা—	১০০০
বিশ্ব-ব্যঙ্গ চিত্র—	১০০১

অব্যাহত গতি

একদা মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত রচনা করিয়া ইহাকে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য একজন লেখকের খোঁজ করিতেছিলেন। কিন্তু কেহই এই গ্রন্থ লিখিতে গ্রহণে সম্মত হইলেন না। অবশেষে পার্বতী-তনয় গণেশ এই শর্তে রাজি হইলেন যে তাঁর লেখনী মুহূর্তের জন্যও থামিবে না।

আধুনিক যুগের লেখকরাও চান যে তাঁদের লেখার গতি কোনরূপেই ব্যাহত না হয়। আর এই অব্যাহত গতির জন্যই সুলেখা আজ এত জনপ্রিয়

সুলেখা ওয়ার্কস্ লিঃ, কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

কে, সি, দাশের রসগোল্লা

প্রিয়জনের প্রীতিভোজে উপাদেয় উপাদান

বায়ুশূন্য টিনেও পাওয়া যায় এবং বহুদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে বলিয়া দূর দূরান্তরে উপহার স্বরূপ পাঠানো যায়।

●

সেই সঙ্গে পাবেন

রসোমালাই ঃ সন্দেশ ঃ দধি ইত্যাদি

●

রসোমালাই আবিষ্কারক ঃ

কে, সি, দাশ প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা—৩

সপ্তদশ বর্ষ ॥ দশম সংখ্যা. চৈত্র ১৩৬৮

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

গল্প-ভারতী

সম্পাদকীয়

বঙ্কিম শরণে ১৯৬২ : ভাষা সংকট ও জাতীয় সংহতি ॥

প্রায় ৭০ বছর আগে [১৮৯১] মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র হঠাৎ পেনসন নিয়ে অসমাপ্ত রচনা সমাপ্ত করার শেষ চেষ্টা শুরু করেন ; ফলে 'রাজসিংহ' পরিবর্দ্ধিত রূপে আমরা পাই ও রবীন্দ্রনাথ তার মনোজ্ঞ সমালোচনা ছাপেন। ১৮৯৪ সনে বঙ্কিম-তিরোধানের পরই তাঁর প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ যে অর্ঘ্য দান করেন বাংলা সাহিত্যে তার স্থান চিরদিনের। এই দুই সাহিত্যস্রষ্টাদের আজ [চৈত্র সংখ্যায়] স্মরণ করি, কারণ ভাষা-সমস্যা উৎকট হয়ে দেখা দিল সেদিন কনভোকেশন সভায়। মনীষী সত্যেন বসু চাইলেন কলেজে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর [Honours ও Post Graduate] বিভাগে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া হোক [আমি নিজেও দিয়ে এসেছি] কিন্তু উপাচার্য সাহিত্যী মশাই বলেন, প্রাদেশিক ভাষাকে মাধ্যম করলে ২০০ বছরের গড়া আইন, আদালত, গবেষণা ও বিজ্ঞানের প্রসার খর্ব্ব হবে ও কর্মগত একতায় বাধা পেলে জাতীয় ঐক্যও ব্যাহত হবে। দুই পক্ষেই অনেক কিছু বলবার আছে। সত্যেন বসু দেখেছেন ৭৫ পার হয়ে, কবি রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বপরিচয়' বইখানি লিখে বাংলার দাবি প্রমাণ করে গেছেন এবং বৈজ্ঞানিক শিরোমণি জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র, প্রধানত ইংরেজীতে গ্রন্থ লিখলেও, অপূর্ব নৈপুণ্যে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। তার ভবিষ্যত আছে জেনেই মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র কংগ্রেসের জন্মের আগে তাঁর নিজস্ব গন্ধে Huxley Tydal প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের লেখা অবলম্বনে "বিজ্ঞান রহস্য" লিখে যান। মাত্র ৫৬ বছরে দেহান্ত না হলে বঙ্কিম আরো কি করতেন ভাবতে পারি মাত্র ; কিন্তু শেষ জীবনে Senator হয়ে তিনি বাংলা ভাষাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে ভোটে হেরে যান, সেকথা আশুতোষ ও হরপ্রসাদের কাছে শুনেছি। অথচ এঁরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাজ করে গেছেন। সুতরাং, আশা করি ওঁদের বাঙালী বংশধরেরাও করবেন।

সাহিড়ী মহাশয়ের উদ্বেগ যে অমূলক নয় তাও স্বীকার করি ; কারণ ভারতের প্রধান মাতৃভাষা ১৪।১৫টি উপরে হিন্দীকেই রাষ্ট্রভাষা করায় হয়তো বিদায়ী প্রেসিডেন্টের সুবিধা হয়েছিল ; কিন্তু রাজেন্দ্রপ্রসাদের গদিতে রাধাকৃষ্ণানজী বসলে হিন্দী মাধ্যমে তাঁর কাজ চালান সুবিধা হবে না। তাঁর মাতৃভাষা তেলেগু ও ভগ্নী-স্থানিয়া কানাড়ী, মালয়ালম্ ও প্রাচীনতম তামিল মিলে কোনও দিন হয়তো হিন্দী-স্থান ছিঁড়ে দ্রাবিড়-স্থান [Nagaland সদৃশ] আদায় করার দাবি তুলবে। রবীন্দ্র-শতাব্দী উপলক্ষে ১৪টি ও সিল্ভী অর্থাৎ সংবিধানের ১৪টি ভারতীয় ভাষায়, রবীন্দ্র-রচনা অনুবাদ ও বিতরণ শুরু হয়েছে। এবার স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলীও ৯টি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়ে ৫,০০০০ লক্ষ গ্রামে প্রচারিত হবে এ আশ্বাস আমাদের দিয়েছেন কেন্দ্রীয় তথা প্রাদেশিক সরকার। এঁদের বৈরাগিক ঐক্যতত্ত্ব—অনুবাদের মাধ্যমে—এক নব ঐক্যচেতনা আনবে আশা করি।

বাঙলার পরেই তামিল ভাষায় [মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ কেন্দ্র পরিচালনায়] বিবেকানন্দ রচনাবলী অনূদিত হয়েছে। তাই বাংলা থেকে তামিলনাদ [Tamilnad] পর্যন্ত আত্মিক একতা দৃঢ় হয়েছে; সেই সঙ্গেই দেখেছি বাঙালীর সঙ্গে মাদ্রাজী মিলে, হিন্দী নয় ইংরেজীকেই আন্তর্জাতিক ভাষা বলে স্বীকার করেছে। তিরুপতি [Tirupati] বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত Inter University বোর্ডের অধিবেশন ১৬ : ১২ ভোটে অগ্রাহ্য হয়েছেন ইংরেজীনবীশ দল, সেটিও লক্ষ্য করার কথা। ইংরেজী-মাধ্যম স্বীকৃত না হলে, Dr. Radhakrishnan-এর মত দার্শনিক ও C. V. Raman-এর মত নোবেল লরিয়েট আমরা পেতাম না। বাংলা গীতাঞ্জলী ইংরেজীতে রূপান্তরিত হয়ে সমগ্র এশিয়ার প্রথম নোবেল পুরস্কার [১৯১৩] সগৌরবে এনেছিল। আগামী বছর [১৯৬৩] তার ৬০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে এসব কথা তুলবার ইচ্ছা রইল। ইতিমধ্যে ২০০ বছরে আরও ইংরেজী ভাষায় ভারতীয় লেখক-লেখিকাগণ তাঁদের সৃজনমূলক রচনাশৈলীর উন্নতি করুন। তাতে জাতীয় ভাষা এবং আন্তর্জাতিক সাহিত্য পরিপুষ্ট হবে। নূতন জগৎ আমেরিকার মানুষ ইউরোপীয় জাতির মিশ্রণে গড়ে উঠেছে; Queen's English আয়ত্ত না করলেও বহু মার্কিন লেখক-লেখিকা 'মার্কিন ইংরেজী' ভাষায় লিখে যশ ও অর্থ লাভ করেছেন, ভারতীয়রাই বা না করবে কেন? তবে মার্কিন দেশে প্রকাশক-সংঘ যতটা সহানুভূতি ও সৎ ব্যবসা-নীতি দেখিয়েছেন ভারতে তার সিকিও দেখা যায় নি। তাদের এক্ষেত্রে এগিয়ে এসে লেখকদের উৎসাহ দিতে হবে, শুধু রাষ্ট্রীয় খেতাব বা মেডেল দিয়ে নয়। গত বছর কোনও বাংলা বই পুরস্কৃত হয় নি কেন? সে প্রশ্ন Election-চাপা পড়ে গেছে; কিন্তু মাঝে মাঝে ভাষা-সমস্যা তুলে সকলকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে, সেটা সবাই আমরা অনুভব করছি। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধান-দিবস স্মরণ করে এই প্রার্থনা জানাই যেন বাংলার লেখক-লেখিকা-সংঘ সার্থক—ও সত্য শিল্পের জয়ধ্বজা উড়িয়ে তাঁরা এগিয়ে চলেন। সেকালে P. E. N. [Poets Playwrights, Essayist, Novelist] যে কাজ করে গেছেন ও এখনো করছেন, তার পরিপূরক রূপে সাহিত্য আকাদেমী দিল্লীতে বসে কাজ করেছেন; 'কলেন পরিচীয়তে' এই সাধু বাক্য আজ স্মরণ করালাম। শতবর্ষ পূর্বে মনীষী মধুসূদনের লেখা Epic থেকে সনেট—কত বিচিত্র রচনা বাংলায় দেখা দিয়েছিল। তারপর নাটক, নভেল, উপন্যাস ও গদ্যরচনায় বাঙালী সারা ভারতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে পূর্ব-সূরীদের আশীর্বাদে।

অস্ত্র-সম্বরণ ॥

১ এপ্রিল ১৯৬২, মস্কো রেডিও যে খবর দেন তার আসল উদ্দেশ্য ছিল All Fools Day—সবাইকে বোকা বানানো! জেনেভায় Disarmament বা নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক যখন বসছে [ফ্রান্স ও চীন বাদে] তখন ঠাট্টা শুরু করলেন সোভিয়েট। সেখান থেকে শুনেছি হাসি নির্বাসিত। যদিও স্বচক্ষে দেখে এসেছি মস্কো ও লেনিনগ্রাদের ছেলে-মেয়েরা বেশ হাসতে জানে। তাদের হাসি-কার্টুন কুমীর-মশাই, ছোট বড় হোমরা-চোমরা কাউকে ছেড়ে কথা কন না।

নাটকীয় ভাবে রুশ-রেডিও বলেন যে, অস্ত্র-বিসর্জন-চুক্তি জেনেভাতে সই হয়ে গেছে; Polaris রকেট, অপ্রয়োজনীয় বলে জেনেভা হ্রদে নিক্ষিপ্ত হয় ও মনের দুঃখে তাই এক মার্কিন Admiral হ্রদে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। হয়ত তিনি Polaris কোম্পানীর একজন মোটা অংশীদার ছিলেন, তাই শান্তির সম্ভাবনায় তাঁর চরম অশান্তি ও কায়োৎসর্গ! আমাদের জৈন বন্ধুরা অহিংসা নিয়ে এই হিংসাত্মক পরিহাস সহ্য করবেন কি না জানি না। তাই তাঁদের জৈন-পঞ্চায়ৎ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়েও হাজারিবাগে এবার গেলাম না; বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সে অধিবেশন জয়যুক্ত হোক।

কিন্তু আপাত-শান্তির মধ্যে Algeria-তে ১ এপ্রিল ২০ জনের বেশী মানুষ নিহত হয়, গোপনে চালিত অস্ত্রাঘাতের ফলে। সাত বছর যুদ্ধ ও নরহত্যায়ও যেন সাধ মেটে নি। খৃষ্টান ফরাসী O.A.S. সন্ত্রাস-বাদীরা হত্যা করে [ন্যায্য না অন্যায্য ?] সাম্রাজ্য অধিকার বজায় রাখতে চায়; তাই মুসলিম প্রজারাও মরিয়া হয়ে পড়ছে। তাদের বাঁচবার অধিকার শীঘ্রই Referendum করে দেওয়া হোক ফ্রান্সের কাছে এই আমরা চাই।

কিন্তু ইংরেজ পার্টিশন করে ভারতের ডাইনে-বাঁয়ে দু'খানি পাকিস্তান উপহার দিয়ে গেছেন। তাই পূর্ব-পাকিস্তানীদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে 'আর্ধ'ভাবে বামে-দক্ষিণে না লিখে উর্দ্ধমতে ডাইনে-বাঁয়ে তাঁরা যেন কলম চালান; তা'হলে দু'খণ্ড পাকিস্তান এক সুসংবদ্ধ রাষ্ট্র হয়ে উঠবে। এই সব আজগুবী পরিকল্পনার পরিণতি কোথায় কে জানে? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শহীদগণকে উর্দ্দু নয়—বাংলা ভাষার জন্য প্রাণোৎসর্গ করতে শুনেছি। আজ নূতন সংবিধানে নূতন সুর।

গান্ধিজীর ভারতবর্ষও কালের চেউয়ে কক্ষচ্যুত হয়ে যেন বড়াই করছে—জলে স্থলে আকাশে ভারত-বাহিনীর জয়ধ্বনি উঠছে। তাঁর আভাষ পেয়েছি মন্ত্রী কৃষ্ণমেননের 'সুদর্শন-চক্র' প্রয়োগে; তিনি হায়দ্রাবাদ ভাষণে সগর্বে বলেছেন যে, অষ্ট্রেলিয়া থেকে ইউরোপের মধ্যে গত ১৪ বছরে ভারতই শ্রেষ্ঠ 'আত্মরক্ষা-প্রতিষ্ঠান' [Defence] গড়েছে। উড়ো জাহাজ থেকে শুরু করে, সব রকম মারণাস্ত্র ও হাতিয়ার তৈরি হচ্ছে; ফলে গঠনমূলক শান্তির কাজেও মানুষের হাত থাকবে। কৃষ্ণমেনন এ যুক্তি গান্ধিজীকে দিতেন কিনা জানি না, কিন্তু গ্রন্থের বিনোবাজী আজও আছেন, তিনি জবাব দেবেন গান্ধি-ভক্ত মোরারজী দেশাইকে। তিনিই পাশ করেন Army খাতে ১৯ কোটি এবং Armed force যোগ করলে ২৯ কোটি টাকা।

১৪ বছরে এত শক্তি ও টেক্‌নোলজী আয়ত্ত করেও, স্বাধীন ভারত কেন ও কি ভাবে চীনাদের কবলে হিমালয়ের কয়েক হাজার বর্গ মাইল ছেড়ে দিল, তার কারণ এখনো আমরা জানি না। তার প্রতিরক্ষা দূরের কথা প্রত্যার্পণের দাবিও আত্মরক্ষামন্ত্রী মেনন জোরের সঙ্গে করেছেন কি? অথচ জোর-দখল হয়েছে। হিমালয়ের উত্তরেই ৬০০ মিলিয়ন চীনারা ভারতীয়দের কি ভাবছে? বিশাল তিব্বত তারা নিয়েছে। এখন নেপাল, সিকিম, ভুটান ও নেফা [NEFA] আসামেও চীনারা ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। কিন্তু ভারত-বন্ধু সোভিয়েট চীনাদের বাড়াবাড়ি ঠেকিয়ে রেখেছেন।

এহেন অনিশ্চয়তা ও অশান্তির মধ্য প্রগতিবাদী লেখক-শিল্পী ও চিন্তানায়কগণ দিল্লীতে [এপ্রিল] ও মস্কোতে [জুলাই] শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে আমাদের আমন্ত্রণ করেছেন, সেজন্য ধন্যবাদ ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। ৪০০ মিলিয়ন ভারতবাসী আমরা যদি সত্যই অহিংসাবাদী হই, তার প্রভাব জেনেভা থেকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। সেই আশায় মহাত্মা গান্ধি জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। সেই আদর্শ, প্রাচীন ঋষিকুল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সব নেতারাই ভারতবাসীদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। সেই উদার ঐতিহ্যের কথা যেন আমরা না ভুলে যাই। Atomic সমরে আমেরিকার চেয়ে সোভিয়েট শ্রেষ্ঠ, Pravda সেকথা স্পষ্ট করে বলেছেন। এই দুই শক্তির পাশে ভারত অস্ত্রশক্তি না দেখিয়ে 'আত্ম-শক্তি' প্রয়োগে সংঘবদ্ধ হোক।

শনিবারের চিঠি

রবীন্দ্র-যুগ [১৯১৬-২০] ॥

কালিদাস নাগ।

বলাকা ও কাল্পনী রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব কীর্তি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে জন্ম-মৃত্যুর চরম সমস্যা তাঁর কাছে কি ভাবে দেখা দেয় ও কাল্পনীর অন্ধ বাউল ও ডাকঘরের দাদাঠাকুরের ভূমিকায় অভিনেতারূপে তিনি চরম সংকেত কত রেখে গেছেন আমি দেখেছি ও আমাদের সঙ্গে দেখেছিলেন বন্ধুবর নটসম্রাট ৺শিশির ভাদুড়ি। তাঁর কাছে রবীন্দ্র-সাক্ষাতের গল্প শুনে সেকালের নাট্যপ্রসঙ্গ নিয়ে কেউ লিখলে সুখী হব। হঠাৎ ১৯১৬ সনে Passport মওকুফ নিয়ে গুরুদেব খুশি হয়ে জাপান যাত্রা করলেন। সঙ্গে ছিলেন তরুণ শিল্পী মুকুল দে ও তাঁর মাস্টার W. W. Pearson—যাঁকে home interned করা হয় [তাঁকে কবি বলাকা উৎসর্গ করেন]। মুকুল দে জাপান ও আমেরিকা ঘুরে নূতন প্রণালীর Etching শিখে এসে ১২ খানি মুখ এঁকে প্রসিদ্ধ হন; তার মধ্যে বিপিন পাল, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আছেন। রামানন্দ-প্রকাশিত প্রবাসী ও Modern Review প্রভৃতি মাসে দেশি চিত্রকরদের ছবি ছেপে কত প্রচার করেছেন তার উপযুক্ত সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর দাদা সমরেন্দ্র জাপানী রীতিতে 'জীবন-স্মৃতি'র ছবি আঁকেন, একথা আগেই লিখেছি। এবার তাঁদের Studio-তে যোগ দিলেন জাপানী শিল্পী Kampo Arai [এঁর ছবি Golden Book of Tagore-এ ছেপেছি]। এই জাপানী চিত্রকর মাদুরের উপর কুঁজে পড়ে 'বিচিত্রা ভবনে' ছাত্রছাত্রীদের শেখাতেন। আমি তাঁর কাছে শুনতাম, তাঁর গুরু Okakura, Y. Taikan [১৯০১-১১] ঠাকুরবাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করে ভগিনী নিবেদিতার সাহায্যে Ideals of the East [নিবেদিতার ভূমিকা দ্রষ্টব্য] লিখেছিলেন। Okakura শুধু জাপানী নয় বৈশ্বিক শিল্পেরও সমঝদার ছিলেন। তাঁর সংগ্রহ Boston Museum of Fine Arts ভবনে দেখেছি, মনীষী আনন্দ কুমারস্বামী আমায় দেখিয়েছিলেন।

কুমারস্বামী তাঁর 'Art and Swadeshi' ও মধ্যযুগের সিংহলী শিল্পাদি গ্রন্থ বাংলার স্বদেশী যুগের প্রেরণায় লেখেন। ১৯১১-১২ সনে চীনের রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটায় রামলাল সরকার ও ইন্দুমাধব মল্লিক প্রভৃতি যেমন নূতন চীন সম্বন্ধে লেখা শুরু করেন, তেমনি স্বামী বিবেকানন্দ [১৮৯৩] ও রবীন্দ্রনাথ চীন-জাপান সম্বন্ধে তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে তার আভাস দিয়েছি। রবীন্দ্র-শতাব্দী উৎসবের শেষে ও বিবেকানন্দ-শতাব্দী প্রারম্ভে 'ভারত ও সুদূর-প্রাচ্য' বিষয়ে গভীর আলোচনা দরকার. তার পূর্বাভাস দিয়েছি সাহিত্য আকাদেমী 'স্মারক' গ্রন্থে।

রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ সনে জাপানে Nationalism সম্পর্কে কিছু প্রবন্ধ পাঠ করতেই, সেকালে ঘোর সাম্রাজ্যবাদী ও মিত্রশক্তির প্রাচ্য-সহায়ক জাপান শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ অভদ্রতা ও রবীন্দ্রনাথের অপমান করেছিল। তার অনুশোচনা ও কঠিন ফল-ভোগ, জাপান ১৯৪৫ সনে Atom-বিদ্ধস্ত হয়ে করেছিল। তখন রবীন্দ্রনাথ চলে গেছেন কিন্তু আমি চতুর্থবার জাপানে গিয়ে সব দেখেছি। হিরোশিমার শান্তি-সম্মেলনের সভাপতিরূপে আমি প্রকাশ্যে শুনিয়েছিলাম [১৯৫৪] রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কবি Noguchi-র পত্র-বিতর্কের [১৯১৭-৩৮] কথা। তখন রবীন্দ্র-দর্শন স্বীকার না করলেও মার্কিন বোমা বিধ্বস্ত Hiroshima ও Nagasaki স্মরণস্তম্ভ আজও সাক্ষ্য দেয় যে, ভারতের সত্যদ্রষ্টা কবিই জাপানকে চরম সতর্কবাণী ১৯১৬ সালে শোনান। তার প্রতিদানে তিনি পেয়েছিলেন শুধু অবজ্ঞা ও অসম্মান।

কিন্তু তাঁর ভক্তরা যেমন শিল্পী Kampo Arai-কে পাঠান, তেমনি ভালো কিছু ছবিও রবীন্দ্রনাথকে উপহার পাঠান [হয়তো শান্তিনিকেতন কলা ভবনে আজও আছে]। কবিগুরু এই প্রথম জাপানী চিত্রকলা দেখে যেমন কলা ভবন প্রতিষ্ঠার শুরু করেন, তেমনি তাঁর মনের অগোচরে গানের সঙ্গে ছবিও উঁকি মারতে শুরু করে। সেটি দেখেছি তাঁর সঙ্গে ১৯১৪ সনে, যখন বিয়াট চীন ও জাপানী দেশ দেখে বেড়াই। আচার্য নন্দলাল আমাদের সাথী, তাঁর তুলির টানে বহু নরনারী আমাদের প্রশংসা করতে আসতো। কারণ Shimomura ও Taikan-এর মতন 'কৃষ্ণ-বলরাম' আমাদের গাইড ! সকল দুয়ার খোলা ছিল তাই আমাদের কাছে। তাই বিবেকানন্দ-ওকাকুরা যুগ থেকে শুরু করে টাইকান-মিয়াকোজী প্রমুখ শিল্পী-সাহিত্যিকদের কলম ছুঁয়ে এসেছি ও শুদ্ধ হয়ে দেখেছি তাঁরা এড়িয়ে আমাতীত লোকে রবীন্দ্রনাথ ঝাঁপ দিয়েছেন ১৯১৬, ১৯২৪ ও ১৯২৯ সনের সুদূর প্রাচ্য ভ্রমণের ফলে। তাঁর ২০০০ গানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জীবনের শেষ দশকে দেখা দিল ২০০০ ছবি, যা আজ বিশ্বে রবীন্দ্রনাথের অভিনব মূল্যায়ন করছে। আরো লাভ হয়েছিল প্রাচীন জাপানী ও চীনা নাটা ও নৃত্যাভিনয় দেখা। শিল্পীশ্রেষ্ঠ Mai Lang Fang যেমন চীনে আমাদের সাহায্য করেন, তেমনি কিওটো [Kyoto] টোকিওর সেরা শিল্পীদল আমাদের স্পেশাল Noh [বৌদ্ধ] অভিনয় ও Kabuki নাট্য-পারক্রমা। তাদের অজাত প্রভাব হয়তো দেখা দিল রবীন্দ্রনাথের শেষ নৃত্যনাট্য রচনায়। আজও শুধু মনে পড়ে গুরুদেবের কঠিন ধমক খেয়েছিলাম যখন ১৯২৪ সনে চীন-জাপান পরিক্রমা সেরে Hong Kong-এ Andrews সাহেব এসেছেন দেখেই তাঁর ঘাড়ে গুরুদেবের ভার দিয়ে আমি আরম্ভ করলাম 'বৃহত্তর ভারতে'র সন্ধানে [১৯২৪-২৫]। অধুনা প্রকাশিত আমার Discovery of Asia এবং Greater India গ্রন্থদ্বয়েও তার আখ্যান ২০০০ পাতায় দিয়েছি। কিন্তু গুরুদেব শোক দেখান, "তোমাকে China থেকে Peru" নিয়ে যাবো ভেবেছিলাম কিন্তু সে সুযোগ ছেড়ে তুমি ভাসলে চম্পা কম্বোজ [ফরাসী ইন্দোচীন] ও ওলন্দাজদের জাভা-বলীদ্বীপে !" সেখানে গুরুদেব ও বন্ধু সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ১৯২৭ সনে গিয়েছিলেন ; "দ্বীপময় ভারত" গ্রন্থে সে মূল্যবান কাহিনী ছাপা হয়েছে। তাঁদের যাত্রার পূর্বে Calcutta University Institute ভবনে বিয়াট সভায় আমাদের বৃহত্তর ভারত পরিষদের 'পুরোধা' রবীন্দ্রনাথকে তাঁর শুভযাত্রায় মঙ্গল-গাথা শোনাই 'বাল্মীকির জয়' রচয়িতা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদকে দিয়ে। তিনিই একমাত্র কবির বয়োজ্যেষ্ঠ ও ১৮৮১ সনে আজীবন "বাল্মীকি-প্রতিভা" দেখেন বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে। তার প্রমাণ 'বঙ্গদর্শনে' আছে। ১৯২৭ সনে দ্বীপময় ভারত দেখে 'বরোবুদুর' সাগরিকা ও সিয়াম-মন্দিরাদি যে কবিতাগুলি লেখেন, তা নূতন যুগ-সৃষ্টির সূচনা দেয়। রবীন্দ্র-নাট্য-নৃত্যকলা ও চিত্রকলার বিকাশে এই সুদূরপ্রাচ্য পরিদর্শনের গভীর তাৎপর্য আছে।

গুরুদেবের সঙ্গে ব্রহ্মদেশ, মালয়, হংকং, চীন, জাপান দেখে তাঁর প্রেরণায় Indonesia [1924-54] Australia [1938] ও Polynesia [Hawai] পরিদর্শন করি। India and the Pacific World গ্রন্থে তার বিবরণ আছে। গ্রন্থাকারে সেটি গুরুদেবের হাতে দেওয়া হয় নি, কারণ ১৯৪১-এর আগস্ট মাসে তিনি স্বর্গারোহণ করেন কিন্তু তাঁরই আশীর্বাদে গত ৪০ বছর [১৯২০—৬০] বৃহত্তর ভারত সন্ধানেই পাঁচটি মহাদেশ—সাত সমুদ্র তের নদীর বেশী পারাপার করেছি। তিনি স্বীতাঞ্জলীর যুগে "ভারতীয় ইতিহাসের ধারা" শুনিয়েছিলেন বলেই আমার মত বহু বন্ধু এই কাজে নেমেছেন। শুধু ইংরেজী নয় ফরাসী জার্মান ও ডাচ ভাষা থেকে "বৃহত্তর ভারত" কথার পুনরুদ্ধার করেছেন। তাঁদের সমবেত

সাধনায়, আশা করি, ভবিষ্যতে "বৃহৎকথা মঞ্জরী" ও "কথা-সরিৎসাগর" নবকলেবর লাভ করে অনাগত যুগের ছাত্রছাত্রীদের প্রেরণা দেবে। ১৮৯৩ সনে স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে Chicago Parliament of Religion-এ যোগ দেন; তা থেকে আমরা প্রেরণা পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথও এই জলপথে প্রাচীন এশিয়া থেকে নবীন আমেরিকায় যান। সেখানে সম্প্রতি তাঁর জন্ম-শতাব্দীর সঙ্গে বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকীও শুরু হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ-আমেরিকার প্রায় ১০।১২টি বেদান্ত-কেন্দ্র কাজ করছে। ভারতীয় দর্শন-সাধনের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের শেষ আমেরিকা যাত্রার [১৯৩০] দেখেছি তিনি স্বাস্থ্যের কারণে ভাষণাদি না দিলেও তাঁর গল্প ও পদ্য অনুবাদগুলি বহু নরনারী আমেরিকায় পড়েন। তাই Will Durant এর মত দার্শনিক সত্যেন্দ্র বলেছিলেন—'ভারত যে স্বাধীনতার যোগ্য তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ'! তাঁর A Case for India [যেমন Rev Sunderland লিখিত বই India's Right to Freedom, ১৯১৮] আমেরিকায় "প্রবেশ নিষেধ" করা হয়। কিন্তু তাড়া করা লেখিকা Catherene Mayo রচিত 'Mother India' গ্রন্থের লক্ষ লক্ষ কপির বিক্রয়লব্ধ মুনাফা শ্রীযুতী Mayo উপভোগ করে গেছেন।

১৯১৯ সনে পাঞ্জাব নিগ্রহের পর রবীন্দ্রনাথ যখন Sir উপাধি ত্যাগ করে চতুর্থ বার পাশ্চাত্য ভ্রমণে বেরোন তখন আমি তাঁর সঙ্গে ঘুরেছি ও ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করে মনীষী Romain Rolland-এর সাহায্যার্থে দীন জীবন উৎসর্গ করেছিলাম। ফরাসী ভাষায় [ও আরো বহু ভাষায় অনূদিত] Mahatma Gandhi, Ramakrishna ও Vivekananda গ্রন্থত্রয় রয়ে গেছে। সাময়িক দোষত্রুটি তাদের থাকলেও Rolland-এর ভারত-সেবা স্বাধীন ভারতের নরনারী সশ্রদ্ধ হৃদয়ে স্মরণ করবে। কারণ স্বামী বিবেকানন্দের শতাব্দী অবসানে আসছে তাঁর মন্ত্রশিষ্যা 'ভগিনী নিবেদিতা' তাঁর সহকর্মী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং পূর্ব-পশ্চিমের যোগসূত্র মনীষী রমাঁ্যা রলাঁ্যা শতবার্ষিকী [১৮৬৬—১৯৬৬]। রলাঁ্যা-সহধর্মিনী Madame Rolland বিবেকানন্দ-শতাব্দী উৎসবের সহ-সভাপতি পদ গ্রহণ করে আমাদের উৎসাহ বর্ধন করেছেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা ও অনুরোধ যে যদি কেউ রমাঁ্যা রলাঁ্যা প্রসঙ্গে তাঁর লেখা চিঠিপত্র নকল করে তাকে পাঠান [89 Boulevard Mont Parnasse, Paris] তা হলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত Romain Rolland Centre থেকে 'বিবেকানন্দ ও রমাঁ্যা রলাঁ্যা' গ্রন্থ প্রকাশ করবেন। তাঁর সেই আবেদন আমি বেলুড় মঠের এক সভায় প্রকাশ্যে জানিয়েছি। তাই আশা করি যে, প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ ও তাঁর সহায়ক স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মঠ-মিশনে সুরক্ষিত Rolland letters [মূল ফরাসীর প্রতিলিপি] প্রকাশ করতে সাহায্য করবেন। পূর্ব-প্রকাশিত Tagore and Rolland উপাদেয় হয়েছে—তার সঙ্গে Vivekanand and Rolland প্রকাশিত হয়ে বিশ্বে ভারতের স্থান জ্যোতির্ময় করুক!

———

চলতি দুনিয়া

ছেলেটির বাড়ি মিড্‌লসেক্সের ওয়েস্ট হওয়ারোতে। সেদিন সন্ধ্যে ছ'টার সময় বাড়ি ফিরে এল সুইমিং পুল থেকে। ঢুকলো রান্নাঘরে। তার মা প্রবেশ করলেন একটু পরেই।

আর তারপর পুলিশের কাছে ছেলেটির জবানবন্দীতে প্রকাশ: আমি তখন বেকন স্যাণ্ডউইচ তৈরি করছিলাম, মা ঢুকেই স্যাণ্ডউইচটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তিনি চীৎকার করে উঠলেন। আমি রেগে গেলাম, ছুরিটা নিক্ষেপ করলাম এবং আমার মনে হোল সেটা তার কাঁধে গিয়ে লেগেছে।

ডাক্তারী মতে কটি কাটার ছুরি ছোঁড়া হয় নি। ব্রিকিথ কোলের মতে, ক্ষত দেখে মনে হয় ছুরি মারা হয়েছে।

মাত্র বারো বছরের একটি ছেলে সামান্য একটা স্যাণ্ডউইচ নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদে মায়ের বুকে ছুরি চালাতে দ্বিধা করে নি। কিশোর মনে অপরাধ প্রবণতা খুবই বেড়ে গেছে। —ডেলি মিরর

• • •

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ভার্জিনিয়ার পল্লী অঞ্চলে দু'জন তরুণ চিকিৎসক গেছেন রোগী দেখতে, সঙ্গে নিয়েছেন প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র আর পায়রা। জরুরী রক্ত পরীক্ষার দরকার হোলে কোন ভাবনা নেই, পায়রার পায়ে বাঁধা রয়েছে ছোট কৌটো, তাতে রক্তের নমুনা রেখে পায়রা উড়িয়ে দেয়া হবে, ঘুরের ডাক্তার-খানায় চটপট রক্ত পরীক্ষা করতে হলে এ পদ্ধতি উত্তম ব্যবস্থা।

কিন্তু মনে করুন কেসটা এতই জটিল যে ছোট ডাক্তারখানায় নয়, বড় হাসপাতালে পাঠানো চাই রক্ত। তখন ডাক্তারখানায় যে পায়রা আছে সে আবার কৌটো নিয়ে উড়ে যাবে হাসপাতালে। ভাবলে চমৎকৃত হতে হয় যে আজকের দিনে আমেরিকার মত উন্নত দেশে উপরিউক্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেও পায়রা অপরিহার্য। —নিউজ উইক

• • •

বাহামা দ্বীপপুঞ্জ থেকে প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়েছিল একটি ছোট বোট 'ব্লু বেলি'। তাতে ছিলেন আমেরিকার ডুপারেন্ট পরিবারের পাঁচ জন—টেরি জো নামে একটি বালিকা, তার বাবা, মা, বোন এবং ভাই। চালক ছিলেন ক্যাপটেন হার্ভে। সঙ্গে তার তৃতীয়া স্ত্রী মেরী।

হঠাৎ বিকট আর্তনাদে মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে গেল টেরি জো-এর। সেটার কেবিনে গিয়ে সে দেখল মা আর ভাইএর দেহ যেন রক্তের চৌবাচ্চায় ভাসছে। বাবা আর বোনকে সে খুঁজলো সারা বোটে। কেউ কোথাও নেই। ক্যাপটেনের স্ত্রীও নেই। হঠাৎ শুধু ক্যাপটেনকে সে দেখতে পেল। সে তাকে নিচের কেবিনে নিয়ে গেল।

মেয়েটি শুনতে পেল মেঝের কি যেন ঠোকা হচ্ছে। ছিদ্রপথে জল উঠছে বোটে। ক্যাপটেন হুলিয়ান হার্ভে একটি ডিঙিতে চড়ে চলে গেলেন অন্ধকারে। টেরি জো তখন একটা ভেলা সমুদ্রে ছুঁড়ে দিল এবং তাতেই আশ্রয় নিল। বোট ডুবে গেল। পরে তাকে উদ্ধার করা হয়।

হুলিয়ান হার্ভে ফ্লোরিডার মিয়ামিতে ওঠে এবং জানতে পারে সবাই মরে নি; একটি ১১ বছরের মেয়ে আশ্চর্যভাবে বেঁচে গেছে। সে নিজের হাতের কবজি কেটে আত্মহত্যা করে।

সন্ধানে জানা গেছে, মেয়েটির বাবার নামে সাত হাজার পাউণ্ডের জীবনবীমা করা হয়েছিল সম্প্রতি। একটা মোটা পরিবারকে এবং তাঁর স্ত্রীকেও নিশ্চিহ্ন করে ক্যাপটেন হার্তে তার কার্যসিদ্ধি করতে চেয়েছিল। —ডেলি মিরর

• • •

ব্রিটেনে ১৯৫৭ সনের হোমিসাইড অ্যাক্ট কার্যকরী হওয়ার পর খুনের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেছে, যদিও খুনের শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ডদানের প্রথা প্রচলিত। এ বিষয়ে অনেক গবেষণার পর স্বরাষ্ট্র বিভাগ থেকে চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। তাতে জানা গেছে যে ভোতা অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে, জোরে ঘা দিয়ে কিংবা লাথি মেরে পূর্বে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে [১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে] হত্যা করা হত।

বছরে যতগুলি মানুষ নিহত হয়েছে তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শিশু ; মোট নিহত শিশুর প্রায় তিন চতুর্থাংশ পিতামাতা অথবা কোন আত্মীয়ের আক্রমণে প্রাণত্যাগ করেছে। পারিবারিক হত্যাকাণ্ডে গ্যাস একটি মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে।

মোট নিহত নারীর শতকরা চল্লিশ জন স্বামীর হাতে প্রাণ হারিয়েছে। নিহত পুরুষদের প্রায় অর্ধেকই অপরিচিত লোকের হাতে প্রাণ দিয়েছে।

• • •

সুন্দর স্বাস্থ্যবান যুবক টম গাল্লিয়ন। পোলিও রোগে আক্রান্ত হল সে। সারা শরীর পক্ষাঘাতে অবশ। তা হলে কি হয়, তার মনে ছিল আশা। একটি অভিনব আবিষ্কার Possom [Patient-Operated Selector Mechanism] পরীক্ষা করার জন্যে সেটেই হল।

রোগী মুখ দিয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করতে পারে এইটুকুই তার শক্তি। তার মুখে দেয়া হয় একটি সিগারেট হোল্ডার, তার সঙ্গে লাগানো থাকে প্লাস্টিক টিউব।

সে ফুঁ দিতে থাকে, একটা আলো ঘুরতে শুরু করে ইণ্ডিকেটারের চারধারে। সে থামলেই চলমান আলোটা স্থির হয়ে যায় আর তার মনোমত কাজটি সম্পন্ন হয়। আলো জ্বালানো, পড়া, টাইপ করা টেলিফোন করা, রেডিও ও টেলিভিশন চালানো ইত্যাদি সব রকমের কাজ যন্ত্রটির সাহায্যে করা যায়।

ডেরিক ক্লার্কসন এবং রেজিনাল্ড মেলিং যন্ত্রটির আবিষ্কারক। তিনটি ইলেক্ট্রিক্যাল ফার্ম যন্ত্রটি তৈরির জন্যে প্রস্তাব করেছে। The National Fund for Research into Poliomyelitis-এর পক্ষ থেকে তিনটি যন্ত্র কেনার কথা হয়েছে। এ যন্ত্র বহু রোগীর মনে নতুন আশার সঞ্চার করবে।

———

রম্যাণি বীক্ষ্য

উৎকল পর্ব

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

উনিশ

খণ্ডগিরি পাহাড়েই আবার রামানন্দবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে উপরে উঠছিলেন। গুণ্ডার সঙ্গে আমাকে নামতে দেখে একটুও খুশি হলেন না। একেবারে মারমুখো হয়ে উঠলেন। বললেন: আপনার কি কোন আক্কেল নেই মশাই?

আমি গুণ্ডার দিকে তাকিয়ে দেখলুম, কৌতুকে তার দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমাদের দু'জনের বাক্যালাপ সে উপভোগ করবার জন্য কৌতূহলী হয়েছে। বললুম: আপনি কাকে বলছেন?

আপনাকে, আপনাকে। কোন মহিলাকে মশাই বলে সম্বোধন করা হয় না।

আমাকে! আমি কী করেছি?

ভদ্রলোক আঙুল তুলে বললেন: প্রশ্ন নয়, আমি উত্তর চাইছি। আমি যা জিজ্ঞেস করেছি আপনি তার উত্তর দিন।

কিসের উত্তর দেব?

আপনার আক্কেল আছে, কি নেই?

না।

ভদ্রলোক যেন আকাশ থেকে পড়লেন: না!

বললুম: আমার সব ক'টা আক্কেল দাঁত এখনও ওঠে নি। মাঝে মাঝে যখন উঠব উঠব করে, তখন যন্ত্রণার শেষ থাকে না।

গুণ্ডা উদ্দাম ভাবে হেসে উঠল। এর পরে রামানন্দবাবু কী বলবেন ভেবে পেলেন না। সিঁড়ির একটা ধাপের উপর রামানন্দবাবু দাঁড়িয়েছিলেন। আমরা ওই পর্যন্ত নেমে আসতেই তিনিও নামতে শুরু করলেন। বললুম: এইবারে কী বলবেন বলুন।

রামানন্দবাবু এবারে গুণ্ডাকে বললেন: আপনি বুঝি সমস্ত পাহাড়টা ঘুরলেন?

সমস্ত পাহাড় ঘোরার মানে গুণ্ডা বুঝল কিনা জানি না, উত্তরে শুধু হাসল। উৎসাহ পেয়ে ভদ্রলোক বললেন: আমি ঠিক সন্দেহ করেছিলুম। আপনার ব্যাগ ওটিকে বললুম, কিচ্ছু চিন্তা করবেন না, আমি খুঁজে আনছি।

তারপরেই আমার দিকে চেয়ে ম্রিয়মান হলেন। বললেন: আপনি এদিকে কেন এসেছিলেন?

বুঝতে পারলুম যে আমি সঙ্গে থাকলে তাঁর কৃতিত্বের দাবিতে একজন অংশীদার হবে। তাই বললুম: আপত্তি থাকে, আমি এখানে বসে থাকি। আপনারা এগিয়ে যান।

না না, তা কী করে হয়।

কেন হবে না। বলব, আমিও হারিয়ে গিয়েছিলুম। আপনি আমাকেও এসে খুঁজে নিয়ে গেছেন।

ওঝা এতক্ষণে আমার রসিকতা বুঝতে পারল। তারই প্রমাণ পেলুম তার হাসিতে।

পাহাড়ের নিচে একটা গাছের ছায়ায় আমাদের বাস দেখতে পেলুম। দু'একজন যাত্রী তার ভিতরে বিশ্রাম নিচ্ছেন। মধ্যাহ্নের খর রৌদ্রে চারিদিক ঝক্ ঝক্ করছে। গাছের ছায়াতেই যেন একটু আরামের আভাস। সেইখানেই ওঝার দাদা বউদিকে দেখতে পেলুম। দ্বিতীয় বার এই পাহাড়ে উঠবার কথা তাঁরা ভাবতে পাচ্ছেন না। সুখী মানুষ, পরিশ্রমী নন। অনেকে শুনেছি একবারও উঠতে চান না। আমাদের দলেরই একজন মোটা মহিলাকে ঘোড়ার উপর বসে হব নিতে দেখেছি। শেষ পর্যন্ত উঠতে পেরেছেন কিনা জানি না। এই রকম সিঁড়ি ভেঙে ভারতের অনেক মন্দিরে উঠতে হয়। ত্রিচিনপল্লীর রক টেম্পল, শ্রবণবেলগোলার গোমতেশ্বর মন্দির, জুনাগড়ের জৈন-মন্দির বা পুনার পার্বতীর মন্দিরেও ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। কোথাও উঠেছি, কোথাও উঠি নি, দেখিনিও অনেক জায়গা। কিন্তু একটি জিনিস সর্বত্র দেখেছি,—সে যাত্রীর ভীড়। সকলের শক্তি সমান নয়। কেউ তর তর করে উঠে যাচ্ছে, কেউ উঠছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে, কেউ বা খানিক দূর উঠেই বসে পড়ছে। নিজেদের অক্ষমতার কথা যাদের জানা আছে, তারা নিজেরাও উঠছে না, অপরকেও নিরুৎসাহ করছে—দেবতার মাহাত্ম্য নেই বলে। রামানন্দবাবু না থাকলে ওঝার দাদাকে আবার উঠতেই হ'ত। এই অভদ্রলোকের উদ্বেগ ও উৎসাহ দেখে তাঁরা বেঁচে গেছেন। নিজের অক্ষমতার জন্য অভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর খোঁটা খাচ্ছেন কিনা জানি না।

রামানন্দবাবু কোন উত্তর দিলেন না। বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন যে, কিছু বলা এখন নিরর্থক। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আমি বললুম: ইনি যে পাহাড় পরিক্রমা করছেন, তা আপনি কি করে জানলেন।

হেঁ হেঁ।

রামানন্দবাবু যে খানিকটা গর্ববোধ করলেন তা তাঁর এই সংক্ষিপ্ত উত্তরেই বোঝা গেল। কিন্তু আমি বললুম: হিসেবে আপনার ভুল হয়েছে।

অ্যাঁ?

আমি বললাম: হ্যাঁ।

আমার ভুল হয়েছে?

আপনার ভুল হয়েছে কিনা আপনি এঁকেই জিজ্ঞেস করুন।

রামানন্দবাবু ওঝার দিকে তাকালেন।

ওঝা বলল: গুহার ভেতরে আমি গবেষণা করছিলাম।

গবেষণা?

আমি বললাম: হ্যাঁ হ্যাঁ, যে কাজ আপনি দেখে এসেছেন, সেই কাজ। গবেষণা।

সত্যি!

রামানন্দবাবু অত্যন্ত অসহায় চোখে ওঝার দিকে তাকালেন।

তখন আমরা পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে গেছি। ওঝার বউদি এগিয়ে এসে বলে উঠলেন। কী আক্কেল তোমার?

সেই আক্কেলের কথা। ঋতা হেসে বলল: আক্কেল দাঁত যে এখনও গজায় নি বউদি, তাই বাবে বে-আক্কেলে কাজ করে ফেলি।

গম্ভীর ভাবে ঋতার দাদা বললেন: কথা শোন।

রামানন্দবাবু কট মট করে আমার দিকে তাকালেন। বললেন: এসব কথা আপনার কাছে শিখছেন।

ঋতা খিলখিল করে হেসে উঠল।

আমি বললুম: দেখছেন ওই ভদ্রলোককে?

ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রামানন্দবাবু চমকে উঠলেন। রাস্তার ধারে কালো একখানা বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে সেই ভদ্রলোক কিছু টুকে নিচ্ছিলেন। পাহাড়ে উঠবার সময় আমি দেখেছিলুম, ওতে খণ্ডগিরির সম্বন্ধে কিছু ঐতিহাসিক কথা লেখা আছে। রামানন্দ নিজেও সেদিকে তাকিয়ে গেলেন। এবং পকেট থেকে তাঁর খাতা পেনসিল বার করে টুকতে আরম্ভ করলেন। ঋতা আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

যাঁরা উদয় গিরির দিকে গিয়েছিলেন, এবারে তাঁরাও একে একে ফিরে আসতে লাগলেন। এখান থেকে ফেরার সময় হয়েছে। পথে আমাদের আরও দুটি দ্রষ্টব্য স্থান আছে, ধউলি ও রাজারানীর মন্দির। তারপর সোজা পুরী। ভুবনেশ্বরে আমাদের চা খেতে হবে।

ঋতার দাদা ও বউদি ক্লান্ত বোধ করছিলেন। তাঁরা বাসে উঠে পড়লেন। সকলের সঙ্গে আমরাও উঠলুম।

রামানন্দবাবু সবটা টুকতে পারেন নি। যাত্রীদের কলরব শুনেই বাসে উঠে পড়েছিলেন। তারপর ধরলেন সেই ভদ্রলোককে: ও মশাই, শুনছেন?

বলুন।

আপনার নোট বইখানা একবার দেবেন?

ভদ্রলোক গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। কথা না বলে নোট বইখানা পকেট থেকে বার করে দিলেন।

সেই গলাবন্ধ কোট পরিহিত ভদ্রলোক বাঙালি ছিলেন। তাঁর নাম মনে পড়ছে না। নামটি আমরা জেনে ছিলাম কিনা তাও ভুলে গেছি। তিনি বললেন: সরকারের নোটিশ পড়ে আর কতটুকু জানতে পারবেন?

রামানন্দবাবু বললেন: তবে কী পড়ব?

কেন, মাদলা পঞ্জী পড়ুন।

সে আবার কী?

উৎকল রাজাদের কুলজী গ্রন্থের নাম মাদলা পঞ্জী। তাতে সমস্ত বিবরণ পাবেন।

পুরীর বাজারে পাওয়া যাবে?

পাগল হয়েছেন!

ভুবনেশ্বরে?

ভদ্রলোক বিরক্তভাবে বললেন: আরে মশাই, এ কি কোন উপন্যাস না ডিটেকটিভ বই যে হাটে বাজারে বিক্রি হবে! যদি পড়তে চান তো কোন লাইব্রেরীতে যান, আর যদি শুনতে চান তো আমাকে বলুন।

আমি শুনতে পেলুম। ঘড়া তার বউদির কানে কানে বলল : বেশ হয়েছে।

তার বউদি কোন উত্তর দিলেন না।

রামানন্দবাবু বললেন : বেশ তো, বলুন না আপনি।

ভদ্রলোক একটু গুছিয়ে বসে বললেন : উৎকল যে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যের মধ্যে ছিল, মাদলা পঞ্জীতে তার উল্লেখ আছে।

রামানন্দবাবু চমকে উঠে বললেন : মহাভারতের যুধিষ্ঠির ?

যুধিষ্ঠির আবার ক'জন আছে !

তার পর ?

ভদ্রলোক শান্ত হয়ে বললেন : তারপর পরীক্ষিৎ ও জন্মেজয়—এঁরাও উৎকলে রাজত্ব করেছেন। জন্মেজয়ের পর একে একে আঠারো জন রাজা রাজত্ব করেন। তারপর উৎকল যবনদের হাতে পড়ে।

যবন মানে তো মুসলমান ?

এ প্রশ্ন আমাকে করবেন না। আমার খেই হারিয়ে যায়। কোনখানে গ্রীকদের যবন বলা হয়েছে —ব্যাকট্রিয়ান গ্রীক। তারাও নাকি উড়িষ্যা আক্রমণ করেছিল। কোনখানে বৌদ্ধদের যবন বলা হয়েছে। উৎকলে এক সময় বৌদ্ধ প্রাধান্য ছিল। অনেকে মনে করেন, আইওনিয়ানরাই যবন নামে পরিচিত।

রামানন্দবাবু বললেন : আমরা তো যবন বলতে মুসলমান বুঝি।

সাধারণ ভাবে সবাই তাই বোঝেন। এখন যা বলছিলাম তাই বলি। ৩১৫ খ্রীষ্টাব্দে,—সনটা মনে রাখবেন—যযাতি কেশরী নামে এক রাজা—

দাঁড়ান দাঁড়ান, টুকে নিই সনটা।

বলে রামানন্দবাবু তাঁর পকেট থেকে খাতা পেনসিল বার করলেন। কিন্তু চলতি বাসে লিখতে কিছুই পারলেন না।

থাক, আর লিখতে হবে না।

হতাশভাবে রামানন্দবাবু তাঁর খাতা বন্ধ করে পকেটে রাখলেন।

ভদ্রলোক বললেন : যবনদের হাত থেকে রাজা যযাতি কেশরী উৎকল উদ্ধার করলেন। ভুবনেশ্বরে তাঁর রাজধানী স্থাপিত হল। ভুবনেশ্বরে যে শিবের মন্দির দেখলেন, তা এই যযাতি কেশরীর প্রতিষ্ঠিত। এঁর বংশধরেরা প্রায় সাতশো বছর উৎকলে রাজত্ব করেছেন। এঁরা সকলেই শৈব ছিলেন, এবং মন্দিরে মন্দিরে তাঁদের রাজধানী ভুবনেশ্বরকে ভারতের শ্রেষ্ঠ নগরে পরিণত করেছিলেন। কানপুরেও এঁদের একটি রাজধানী ছিল। আর কটক শহর পত্তন করেন রাজা নৃপকেশরী। এই বংশের চুয়াল্লিশ জন রাজা। শেষ রাজা সুবর্ণ কেশরীর মৃত্যু হয় ১১৩২ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, এবং তাঁর মৃত্যুর পরেই দেশে অরাজকতা উপস্থিত হয়। গঙ্গাবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম চোর গঙ্গা। চোর গঙ্গা বাঙালী ছিলেন বলে অনেকে মনে করেন।

বলেন কি ?

আমি বলি না। এ একটা মতের কথা। এখন আপনারা যে জায়গাকে তমলুক বলেন, তার প্রাচীন নাম তাম্রলিপ্তি। অনেকের অনুমান যে, চোর গঙ্গার আদিবাস তাম্রলিপ্তিতে। উৎকলের অরাজকতা দেখে তিনি এসে দেশ দখল করেন। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন, এবং তাঁরই সঙ্গে উড়িষ্যায় এল বিষ্ণুর উপাসনা।

আশ্চর্য।

আশ্চর্য আবার কী! এতদিন বৌদ্ধ ছিল, শৈব ছিল, এবারে এল বৈষ্ণব। চোর গঙ্গা তো কালাপাহাড় নয় যে বৌদ্ধ ও শৈবদের মেরে মঠ আর শিব মন্দির সব ভেঙে ফেলবেন,—ইনি শিবের বদলে বিষ্ণুর পূজা শুরু করলেন। এই বংশের পঞ্চম রাজা অনঙ্গ ভীমদেব। তাঁরই রাজত্বকালে পুরীতে নির্মিত হয় জগন্নাথদেবের মন্দির। এই বংশের তেইশ জন রাজা চারশো বছর ধরে রাজত্ব করেছিলেন। চোরগঙ্গার পুত্র গঙ্গেশ্বর গঙ্গা থেকে গোদাবরী পর্যন্ত নিজের শাসনে আনেন। পুরুষোত্তমদেব কাঞ্চী রাজ্য অধিকার করেন। আর কপিল রাজার আমলে সেতুবন্ধ পর্যন্ত উৎকল রাজ্য বিস্তৃত হয়।

এই ভদ্রলোক যে ইতিহাসের পণ্ডিত, তাতে আমার সন্দেহ নেই। শুধু এই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি যে, এইসব পণ্ডিতের সাক্ষাৎ আমরা কী করে পাই। এ একটা আকস্মিক ঘটনা ছাড়া অন্য কিছুই নয়, কিন্তু শুনলে অনেকেরই অসম্ভব বলে মনে হবে। জীবনে যত অসম্ভব ঘটনাই তো ঘটে, কিন্তু ঘটলেই তা অবাস্তব মনে হয়। এ নিয়ে তর্ক চলে না।

ভদ্রলোক বললেন: গোবিন্দ বিদ্যাধর নামে এক ব্যক্তি এই বংশের শেষ রাজা বলভদ্রদেবকে হত্যা করে ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। ইনি নিজে রাজত্ব করেন সাত বৎসর, এবং তার পরে আঠারো বছরে চার জন রাজা রাজত্ব করে যান। শেষ রাজার নাম মুকুন্দদেব। তিনি কুখ্যাত কালাপাহাড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিহত হন। কালাপাহাড় শুধু রাজাই অধিকার করেন নি, জগন্নাথের মন্দির লুঠ করে দেবমূর্তি ধ্বংস করেন। উৎকলের ইতিহাসে মুকুন্দদেব একাধিক। মাদলাপঞ্জী মতে এই মুকুন্দদেবই প্রথম। যাজপুরের যুদ্ধক্ষেত্রে এঁর মৃত্যু হয় ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। পঞ্চাশ বৎসর ধরে মুসলমানরা উৎকল আক্রমণ করছিল। কিন্তু এবেশ তারা অধিকার করতে পারে নি। কালাপাহাড় উৎকল অধিকার করলেন। গৌড়ীয় গোবিন্দ বছর দুই রাজত্ব করেছিলেন। তারপর প্রায় উনিশ বছর অরাজকতা। আবার তের জন হিন্দু রাজা রাজত্ব করেন। উৎকল এক সময় রাজপুতের অধিকারে ছিল, আকবরের আমলে ছিল পাঠানের দখলে। মোগলের হাতে এল শাহজাহানের সময়, শেষে মারাঠার কবলে। নবাব আলিবর্দী উৎকল রক্ষা করতে পারেন নি, কিন্তু ইংরেজ তাঁর নাতি সিরাজকে পরাজিত করে উৎকল অধিকার করেছিল ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে। সেদিন তারিখ ছিল ১৪ই অক্টোবর।

ভদ্রলোক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: মুসলমান অত্যাচারে ও উৎপীড়নের পর যেটুকু বাকি ছিল, তাও গুরে নিয়ে গেল মারাঠী বর্গীর দল।

রামানন্দবাবু খুব মনোযোগ দিয়ে এই গল্প শুনছিলেন। ভদ্রলোক থামতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: উৎকল নাম কী করে উড়িষ্যা হল, তাই বলুন।

এ একেবারে হকুম। কিন্তু ভদ্রলোক রাগ করলেন না, বিরক্তও হলেন না।

বললেন: উৎকল নাম কোথা থেকে এল জানেন?

না।

শাস্ত্রে বিশ্বাস আছে?

রামানন্দবাবু একটু দ্বিধাগ্রস্ত বোধ করলেন। হ্যাঁ বলবেন কি না বলবেন স্থির করতে না পেরে বললেন: যা বলতে চান বলুন না!

ভদ্রলোক বললেন: ব্রহ্মার মানস পুত্র মনু, তাঁর এক পুত্র ইক্ষাকু, অপর পুত্র সুদ্যুম্ন। উৎকল সুদ্যুম্নের পুত্র।

রামানন্দবাবু চমকে উঠলেন : বলেন কি।

ঠিকই বলছি।

তার পর ?

তারপর ওঙ্গ। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে চন্দ্রবংশে বলির পুত্র ওঙ্গ। তাঁরই নামে দেশের নাম হয়েছে ওঙ্গ দেশ। উৎকল বা ওঙ্গ কলিঙ্গের নামান্তর নয়, এ স্বতন্ত্র রাজ্য। কোন সময় হয় তো কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল।

রামানন্দবাবু বললেন : দাঁড়ান মশাই, খাতায় লিখে নিই।

বলে পকেট থেকে খাতা পেন্‌সিল বার করলেন।

ভদ্রলোক বললেন : বাসের ভিতর দাঁড়াব কি মশাই, বেশ তো বসে আছি।

কী বিপদ, আমি কি আপনাকে সত্যি সত্যিই দাঁড়াতে বলছি !

তাইতো বললেন।

তাই বললাম ?

তবে কি আমি মিথ্যে বলছি ?

আমি খাতার হাসি চাপার শব্দ শুনতে পেলুম। সেই সঙ্গে তার বউদির ভর্ৎসনা। কিন্তু আমি উদ্বিগ্ন হলুম এই দুই ভদ্রলোকের জন্য। বাসের মধ্যেই ওঁরা যাতে হাতাহাতি শুরু না করেন সেই উদ্দেশ্যে বললুম : হিউএন চাঙ এসেছে আসেন নি ?

রামানন্দবাবু তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করলেন : আমাকে বলছেন ?

ভদ্রলোকটি বললেন : আমাকে ?

আমি বললুম : আপনাকে।

কিন্তু কারও দিকেই তাকালুম না।

আমতা আমতা করে রামানন্দবাবু বললেন : তবেই বিপদে ফেললেন।

ভদ্রলোক বললেন : বিপদ কিসের ? হিউএন চাঙ যদি নাই এসে থাকেন তো উ-চর কথা শুনব কথা কী করে লিখলেন !

লিখেছেন বুঝি !

ভদ্রলোক বললেন : আলবৎ লিখেছেন। লিখেছেন, দেশের লোকেরা অসভ্য হলেও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। খাদ্যের অভাব ছিল না দেশে। ভারতের অন্যত্র তখন বৌদ্ধ ধর্মের ভাঁটা পড়েছিল, কিন্তু উড়িষ্যায় তখনও জোয়ার চলেছে। একশো সংঘারামে তিন্নু ছিলেন হাজার দশেক।

রামানন্দবাবুর হাতে তখন খাতা পেনসিল ছিল। বলল : দাঁড়ান দাঁড়ান, লিখে নিই।

ভদ্রলোক এবারে আর রাগ করলেন না, বললেন : দাঁড়ান বলবেন না, বলুন অপেক্ষা করুন।

খতা তখনও হাসি চাপবার চেষ্টা করছে।

[ক্রমশঃ

"প্রবাসী বাঙ্গালী"

[খাণ্ডোয়ার (মধ্য প্রদেশ) প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজ]

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

বহুকাল ধরে অর্থ উপার্জনের জন্য ভারতের এক প্রদেশের লোকেরা অন্য প্রদেশে গিয়ে বসবাস করছেন। সাধারণতঃ তাঁদের প্রধান পেশা হয় ব্যবসা-বাণিজ্য। এঁদের মধ্যে অনেকেই ব্যবসায় বহু ধন-সম্পত্তির অধিকারী হয়ে প্রবাসেই থেকে যান, এবং কেউ কেউ স্থানীয় লোকের সঙ্গে মিশে তাদের ভাষা, রীতিনীতি এবং আদবকায়দা গ্রহণ করে তাঁদের সঙ্গে এক হয়ে যান। অন্য প্রদেশীয়দের মত বাঙ্গালীরাও বাংলা ছেড়ে অন্যত্র গেছেন এবং তাঁরাও সাধারণতঃ স্থানীয় লোকের ভাষা শিখে অনেকাংশে তাদের রীতিনীতি ও আদবকায়দা গ্রহণ করে তাদের সঙ্গে মিলে মিশে চলেছেন কিন্তু এক হয়ে যান নি।

দেখা যায়, প্রবাসী বাঙ্গালীরা সর্বত্রই নিজেদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে এসেছেন—তাঁদের উচ্চশিক্ষা, নিজস্ব কৃষ্টি ও রুচি দিয়ে। তাঁরা নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে সচেতন। অনেক প্রবাসী বাঙ্গালীই উচ্চ-শিক্ষিত এবং তাঁরা প্রবাসে হয় উচ্চ রাজপদ নিয়ে নয় ত উকীল, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, প্রিন্সিপাল, প্রফেসার, প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষক হয়ে সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করেছেন: তাঁদের মধ্যে অনেকেই আবার নিজ পেশা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন নি, কেউ কেউ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করে নেতাও হয়েছেন। কেউ কেউ স্থানীয় লোকদের উন্নতির জন্য বহুবিধ কল্যাণকর কাজ করে শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।

প্রবাসী বাঙ্গালীদের নানাবিধ জনহিতকর কার্যের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কাজ, অনুন্নত স্থানে স্কুল ও কলেজ স্থাপন করে স্থানীয় লোকের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা। এ বিষয়ে উত্তর ও মধ্য ভারতে বাঙ্গালীর দান কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হয়েছে। তা ছাড়া স্কুল কলেজে সুশিক্ষক হিসাবে হাজার হাজার ছাত্রের উপর অনেকে প্রভাব বিস্তার করেছেন। তার ফলে বহুস্থানে বাঙ্গালীরা শিক্ষাব্রতী হিসাবে সম্মানিত। শিক্ষক ছাড়া অনেক বাঙ্গালী ডাক্তারও প্রবাসে শুধু তাঁদের চিকিৎসা নৈপুণ্য দিয়েই নয়, উদারতা ও জনতার প্রতি সমবেদনার দ্বারা বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন।

আমাদের জীবনের সুদীর্ঘকাল মহারাষ্ট্রে কেটেছে। সেখানকার কোলাপুর রাজ্যের রাজ কলেজে আমার স্বামী ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন। সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করে বাংলা ও মধ্যপ্রদেশে তিনি প্রিন্সিপালের কাজ করেন, তারপর কিছুকাল আমরা জব্বলপুরে বাস করে দিল্লী চলে আসি। এভাবে নিজেরা প্রবাসী বাঙ্গালী হয়ে মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশের কয়েকটি স্থানের এবং দিল্লীর প্রবাসী বাঙ্গালীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপনের সুযোগ পেয়েছি। ১৯৪৯ সনে আমরা খাণ্ডোয়া যাই। খাণ্ডোয়া মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে একটি ছোট শহর, নিমাড় জেলার কেন্দ্র। সেখানে কয়েক ঘর বাঙ্গালী পরিবার ছিল, তাদের মুখ্য ব্যক্তিরা কেউ উকীল, কেউ ডাক্তার, কেউ প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষক, কেউ ওভারসিয়ার, কেউ ব্যাঙ্ক বা রেলের কর্মচারী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দুই তিনটি পরিবার সেখানে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে রয়েছেন।

আমরা নবাগত। খাণ্ডোয়ার বাঙ্গালী সমাজ আমাদের সাদরে গ্রহণ করল দেখতে পেলাম। এই স্বল্প-সংখ্যক বাঙ্গালী পরিবারের মধ্যে বেশ হৃদ্যতা ও মেলামেশা আছে দেখে খুব ভালো লাগল। ধীরে ধীরে কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে আমাদের বেশ বন্ধুত্ব স্থাপিত হল।

খাণ্ডোয়াতে দু'জন উকীল ৺হরিদাস চ্যাটার্জী, এবং ৺প্যারীলাল গাঙ্গুলী বিস্তর জায়গা-জমি কিনে পাকা বাসভবন তৈরি করে গেছেন। হরিদাস চ্যাটার্জীর ভবনে বর্তমানে তাঁর তৃতীয় পুত্র ইঞ্জিনিয়ার শ্রীশরৎ চ্যাটার্জী ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাস করছেন। আর গাঙ্গুলী ভবনে আছেন প্যারীলাল গাঙ্গুলীর পুত্র শ্রীকুঞ্জলাল গাঙ্গুলী। তিনি সিনেমা জগতের বিখ্যাত অভিনেতা শ্রীঅশোককুমারের পিতা। শ্রীশরৎকুমার চ্যাটার্জী ও শ্রীকুঞ্জলাল গাঙ্গুলী উভয়েই অতি অমায়িক ও মিশুকে প্রকৃতির লোক।

হরিদাস চ্যাটার্জীর খাণ্ডোয়া শহরে বিশেষ খ্যাতি আছে। তিনি হুগলী জেলার মাহী পাড়াতে ১৮৫২ সনে সাধারণ এক মধ্যবিত্ত ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা থেকে এফ. এ. বি. এল. পাস করে নিজ দেশে দু'বৎসর ওকালতী করেন। ২৭ বৎসর বয়সে তিনি তাঁর বন্ধু প্যারীলালবাবু সহ ভাগ্য অন্বেষণে বাংলাদেশ ছেড়ে বের হয়ে পড়েন ও মধ্যপ্রদেশের খাণ্ডোয়া শহরে এসে ওকালতী ব্যবসা শুরু করেন। ক্রমে তিনি সাফল্যের পথে অগ্রসর হন।

হরিদাসবাবু প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে লাগলেন। একজন শ্রেষ্ঠ উকীল হিসাবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল। তখন তিনি খাণ্ডোয়ার নিকটবর্তী ইন্দোর শহরে গিয়ে ওকালতী করতে লাগলেন। কালক্রমে তিনি উভয় স্থানেই প্রচুর স্থাবর সম্পত্তি করেন, এবং নিজেদের বাসভবন তৈরি করান।

ওকালতী ব্যাপারে সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্থানীয় লোকের উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করলেন। ১৯৮০ সনে খাণ্ডোয়াতে তিনি একটি লাইব্রেরী ও ১৮৯৫ সনে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে সেই লাইব্রেরী বিস্তার লাভ করেছে এবং স্কুলটি গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুলে পরিণত হয়েছে। ১৯১৮ সালে তিনি স্থানীয় লোকদ্বারা নির্বাচিত হয়ে খাণ্ডোয়ার মিউনিসিপালিটির প্রেসিডেণ্ট হন। তিনি শহরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যের জন্য বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন এবং তাঁর চেষ্টায়ই শহরে জল ও বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহ হয়। সতের বছর পর্যন্ত তিনি নিমাড় জেলার ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সেলের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন।

ক্রমে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন এবং ১৯১৮ সনে রায়পুরে মধ্যপ্রদেশের যে প্রাদেশিক রাজনৈতিক কনফারেন্স হয় তিনি তার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। তখন ইন্দোর দেশীয়রাজ্য ছিল। সে রাজ্যের প্রজাদের অধিকার লাভের জন্য যে রাজনৈতিক আন্দোলন হয় তাতেও তিনি অগ্রণী ছিলেন, এবং ১৯২১ সনে ইন্দোর প্রজা পরিষদ তাঁকে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত করেন।

রাজনৈতিক কার্যের সম্পর্কে তিনি মহাত্মা গান্ধী, লোকমান্য তিলক, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বিপিন পাল প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত নেতার সংস্পর্শে আসেন তাছাড়া ধার্মিক নেতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বামী দয়ানন্দ এবং স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গেও পরিচয় স্থাপনের সুযোগ পান। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর প্রব্রজ্যা অবলম্বনের পর একবার খাণ্ডোয়ায় যান, তখন তিনি হরিদাসবাবুর বাড়িতেই অতিথি হন। সেখান থেকে তিনি আমেরিকা যাবার সংকল্প করেন ও পরে আমেরিকা থেকে ফিরে এসে আবার তাঁদের বাড়ীতে কয়েকদিন থেকে ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ হরিদাস বাবুর অতিথি হয়ে খাণ্ডোয়ায় কয়েকদিন ছিলেন, সেকথা তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূরা এখনও সগর্বে বলে থাকেন।

হরিদাসবাবুর কৃষি এবং কৃষিজাত দ্রব্যের উন্নতি করার দিকেও ঝোঁক ছিল। হরিদাসবাবু বিদ্যানুরাগী ছিলেন,। তিনি তাঁর তিনটি পুত্রকে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিলাতে পাঠান এবং তিনজনেই যথাক্রমে ব্যারিস্টার, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ও ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার হয়ে দেশে ফেরেন। তিনি Law of Legal Necessities and obligations নামে একটি আইন গ্রন্থ রচনা করেন।

৭১ বৎসর বয়সে ইন্দোরে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যু-সময়ে তাঁর চার পুত্র ও তিনকন্যা বর্তমান ছিলেন।

সেকালে বাংলার বাইরে সুদূরে এক বাঙ্গালী বর্জিত শহরে এসে হরিদাসবাবু নিজ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের গুণে শুধু যে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে গেছেন তা নয়। নিজের উচ্চশিক্ষা, সাহস ও বুদ্ধিবলে সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি হয়ে খ্যাতি অর্জ্জন করে গেছেন, বাঙ্গালীর পক্ষে এটি গৌরবের বিষয়। খাণ্ডোয়ায় আরো কয়েকটি বিশিষ্ট বাঙ্গালীর মধ্যে ব্যারিষ্টার ৺ হেম মিত্র একজন ছিলেন। তাঁর পিতা কলিকাতা হাইকোর্টের একজন বড় উকীল ছিলেন। কিন্তু হেমচন্দ্র কলিকাতা ছেড়ে খাণ্ডোয়াতে এলেন প্র্যাকটিস করতে। ১৮৯০ সন থেকে তাঁর মৃত্যুকাল ১৯২১ সন পর্য্যন্ত তিনি খাণ্ডোয়া বারে ব্যারিষ্টারী করে গেছেন। হরিদাস বাবুর সহিত তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি লণ্ডনে পাঠ্যাবস্থাকালে একজন ফরাসী মহিলাকে বিয়ে করে দেশে নিয়ে এলেন। শ্রীযুৎ চাটার্জী বলেছেন, ব্যারিষ্টার মিত্রের এই বিদেশিনী স্ত্রী বড়ই মিতুকে এবং সুন্দর স্বভাবের ছিলেন। তাঁর মায়ের সঙ্গে এই বিদেশিনীর বন্ধুত্ব হয়ে ছিল। তাঁর মায়ের কাছ থেকে তিনি দেশী ধরনে শাড়ি পরা, চুল বাঁধা এবং কিছু কিছু বাংলা কথা বলতে শিখেছিলেন। সুগৃহিনী হিসাবে ফরাসী মহিলার নাম ছিল। ব্যারিষ্টারীতে হেমমিত্র খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তিনি গবর্ণমেণ্ট দ্বারা মনোনীত হয়ে খাণ্ডোয়া মিউনিসিপালিটির প্রেসিডেণ্ট হন এবং বহুকাল পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের কাউন্সিলার ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁকে রায়বাহাদুর উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী দুই কন্যা সহ ফ্রান্সে চলে যান।

খাণ্ডোয়ায় আর একজন খ্যাতনামা বাঙ্গালী ছিলেন। ৺ সত্যপ্রসন্ন দত্ত বি-এ এল. এল. বি। তিনি খাণ্ডোয়া গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুলে হেডমাষ্টার হয়ে আসেন পরে হেডমাষ্টারী ছেড়ে দিয়ে ওকালতী ব্যবসা করেন। বহুকাল পর্যন্ত তিনি সেখানকার ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ৩০ বৎসর সুনাম ও যোগ্যতার সহিত তাঁর কর্মজীবন অতিবাহিত করে তিনি তাঁর বাসস্থান অমরাবতীতে চলে যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৮০-র উর্দ্ধে ছিল।

খাণ্ডোয়া শহরে বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিই তাঁদের কর্মজীবনে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করে গেছেন। ৺ নবীনচন্দ্র রায় খাণ্ডোয়ার একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম। খাণ্ডোয়া থেকে কিছু দূরে হরসুদ নামে একটি ছোট্ট শহরের নিকট 'ব্রাহ্ম গ্রাম' নামে তিনি একটি আদর্শ গ্রাম স্থাপন করেন। সেই গ্রামটি আজো তাঁর নামে অমর করে রেখেছে। খাণ্ডোয়ায় আসবার পূর্বে তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তার পর কিছুকাল এক দেশী ষ্টেটে দেওয়ান হয়ে তাঁর কর্মজীবনের কৃতিত্ব দেখিয়ে গেছেন।

খাণ্ডোয়াতে মিঃ বি. ঘে নামক একজন আই. সি. এস. অফিসার কমিশনারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি মহারাষ্ট্রের সাংগলী ষ্টেটে কিছুকাল দেওয়ান ছিলেন।

হরিদাস চাটার্জীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ৺প্যারীলাল গাঙ্গুলীও খাণ্ডোয়ায় এসে ওকালতী ব্যবসা শুরু করেন। একথা আগেই উল্লেখ করেছি। কালক্রমে প্যারীলালবাবুও ওকালতীতে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করে বিস্তর জায়গাজমি ক্রয় করেন ও নিজের বাসভবন তৈরি করান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শ্রীকুঞ্জলাল গাঙ্গুলী পিতার ওকালতী ব্যবসা শুরু করেন ও পিতৃভবনে স্থায়ী ভাবে বাস করতে লাগলেন।

শ্রীকুঞ্জ গাঙ্গুলী ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। বৃদ্ধ উকীল শ্রীকুঞ্জ গাঙ্গুলী আমাকে কনিষ্ঠা ভগিনীর মত স্নেহ করতেন। এবং প্রায়ই আমাদের বাড়িতে এসে নানা খোস গল্পে

সাজা আসর জমিয়ে তুলতেন। তাঁর গলা ছিল উল্লেখযোগ্য দীর্ঘশ্রুতি,—বহু বলিষ্ঠ গায়ক। যাত্রাদের জন্ত ও প্রচুর ভোজনের জন্ত খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এখনও তিনি গাড়িঘোড়ায় চড়ে বেড়ানো পছন্দ করেন না। দীর্ঘপথ দু'বেলা পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে আনন্দ পান। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি বেশ খেতে ভাল বাসেন এবং যথেষ্ট খেয়ে হজমও করতে পারেন।

অশোককুমার, অরুণকুমার ও কিশোরকুমার নামে তাঁদের তিন পুত্র এবং একমাত্র কন্যা সতীদেবী। কিশোরকুমারও সিনেমা জগতে প্রতিষ্ঠি লাভ করেছেন। সতী দেবীর স্বামী শ্রীশশধর মুখার্জি ফিল্ম প্রডিউসার হিসাবে বোম্বেতে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। তাঁরা তিন ভাই-বোনই গীতবিদ্যায় পারদর্শী এবং সেটা তাদের মায়ের গুণের প্রভাব। তিনি কীর্তন গাইতে পারেন অতি সুন্দর।

খাণ্ডোয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে খাণ্ডোয়ার নিকটবর্তী ইন্দোরের একজন বিশিষ্ট খ্যাতনামা লোকের নাম করতে হয়। তিনি হলেন ডাক্তার এস মুখার্জি। মধ্যপ্রদেশের জন-সাধারণ তাঁর দয়ালু ও নিঃস্বার্থপর স্বভাবের জন্ত তাঁকে দেবতুল্য মনে করে, এবং তাঁর আশ্চর্য সুচিকিৎসার জন্ত তাঁকে ধন্বন্তরী বলে থাকে। তিনি যে শুধু গরীব দুঃখী রোগীদের নিকট থেকে ভিজিট নেন না তা নয়, বিনামূল্যে তাদের ওষুধও দিয়ে বিশেষ যত্নসহকারে চিকিৎসা করেন। তিনি ধনী বা গরীব কোন বাঙালীর কাছ থেকেই কি নেন না জানলাম। বাংলার বাইরে সুদূর প্রবাসে বিদেশীদের মধ্যে বাঙালী ডাক্তারের প্রতি এমন গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস দেখে মনে গর্ব বোধ হল।

বাংলাদেশ থেকে বহুদূরে মধ্যপ্রদেশের একটি শহরে এই স্বল্প-সংখ্যক বাঙালী পরিবার নিজেদের মধ্যে একটি ছোটখাটো সমাজ তৈরি করে বসবাস করছে। স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে খুব বেশী মেলামেশা বা অন্তরঙ্গতা দেখতে পেলাম না। তাঁরা নিজেদের ভিতরই নানারূপ সভা-সমিতি উৎসব ও আমোদ প্রমোদের আয়োজন করে জীবন সরীব করে তোলেন। এই অল্প কয়টি পরিবারের পক্ষে দুর্গাপূজা সম্ভবপর নয়, তাই তাঁরা বিজয়া দশমী উপলক্ষে শ্রীতিভোজের ব্যবস্থা করতেন। চাঁদা তুলে প্রতিমা গড়িয়ে সরস্বতীপূজা করা হত, প্রসাদ বিতরণ ও খাওয়া দাওয়া হত খুব আনন্দে। এই দুই অনুষ্ঠানে বাঙালী ছেলে-মেয়েরা নৃত্যগীত, ট্যাবলো ও প্রহসন করে সবাইকে আনন্দ দান করত। কর্তৃপক্ষরাও তাদের পারিতোষিক বিতরণ করে উৎসাহ বর্ধন করতেন।

রবীন্দ্র জয়ন্তী ও মৃত্যুতিথিতে ছেলেমেয়েরা গুরুদেবের কবিতা আবৃত্তি করত। পুরুষলোকেরা এবং কোন কোন মহিলারাও গুরুদেবের সম্বন্ধে স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করে সভাকে সরীব করে তুলতেন। বর্তমান বাঙালী সমাজের মধ্যে শ্রীশশাঙ্ক শেখর যে ওকালতীতে নাম করেছেন। এখন তিনি খাণ্ডোয়ার সরকারী উকিল। তিনি সাহিত্যানুরাগী, এই সমস্ত সভাসমিতি করাতে তিনিই অগ্রণী। শ্রীযুক্ত যে নাগপুরের খ্যাতনামা জজ ৺গোষ্ঠবিহারী দে-র অতি নিকট আত্মীয়।

আমরা যখন খাণ্ডোয়ায় ছিলাম তখন বিলাসপুর থেকে একজন বাঙালী ডাক্তার শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত খাণ্ডোয়ায় এসে ডাক্তারী শুরু করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ডাক্তারীতে কৃতিত্ব দেখিয়ে সুচিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। আমরা পাঁচ বছর খাণ্ডোয়ায় ছিলাম। সেখানকার প্রবাসী বাঙালীদের সঙ্গে মেলামেশা করে দেখেছি, কর্তাগিন্নীরা খাঁটি বাঙালী। কিন্তু তাদের ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে সে কথা বলা যেতে পারে না। অধিকাংশ ছেলেমেয়েরাই হিন্দী ভাষায় অধিক অভিজ্ঞ। মাতৃভাষার

চেয়ে। এরা নিখুঁতভাবে বাংলা কথাবার্তা বলতে পারত না, অনেকে বাংলা বইও পড়তে পারত না। এর কারণ এখানে বাঙ্গালী অল্পসংখ্যক বলে বাংলাতে শিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থা নেই। স্থানীয় স্কুলে হিন্দীর মাধ্যমে তারা লেখাপড়া শিখে। এমন দেখা যায় বাঙ্গালী ছেলে-মেয়েরা তাদের পিতামাতার চেয়ে বিশুদ্ধ হিন্দী বলে ও উচ্চারণ করে। অনেক সময় দেখতাম ভাইবোনেরা খেলা-ধূলা বা গল্প করবার সময় হিন্দীতে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে।

যে সব ছেলেমেয়েদের দেখে এসেছিলাম, তারা হয়তো এতদিনে বাংলা ভাষা ভুলেও গেছে। অল্প, শিক্ষা দীক্ষা প্রবাসে হওয়াতে, তারা অনেকেই বাংলাদেশ দেখবার সুযোগ পায় নি। তাই তাদের বাংলা দেশের জন্য কোন আকর্ষণও নেই। হয়তো আর দু'পুরুষ পরে তারাও ওদেশী হয়ে যাবে। তবে বাঙ্গালী পরিবারের বাংলাভাষা ও দেশাচার পুজাপার্বণ ইত্যাদি এখনও লোপ পায় নি। শুধু একটা কারণে প্রবাসী বাঙ্গালী ছেলেরা অনেকেই বাংলাদেশে স্বজাতির মধ্যে বিয়ে করে, এবং বাংলাদেশ থেকে নব-বধূর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারে আবার নতুন করে খাঁটি বাংলাভাষা ও রীতিনীতির চলন প্রচলন হয়।

প্রকাশকের কাছ থেকে বই-বিক্রীর টাকাটা আদায় হতে দেরী হচ্ছিল বার কোনান ডয়েলের। যতবার তিনি তাগাদা করেন ততবারই ওই একই উত্তর পান—সব বই বিক্রী হয়ে গেলেই একসঙ্গে টাকাটা পাবেন।

বিরক্ত হয়ে কোনানডয়েল একটু ছদ্মবেশেই একদিন প্রকাশকের কাছে গেলেন।

প্রকাশক প্রশ্ন করলেন—কি চান আপনি?

—আমি গোয়েন্দা-কাহিনী লিখে থাকি, আমার একখানা বই কি আপনারা ছাপবেন?

—মিঃ কোনানডয়েলের মত যদি লিখতে পারেন তবে না হয় ছাপতে পারি।

—তার বই খুব চলে বুঝি?

—তা' আর বলতে। একখানি বইও আর পড়ে নেই আমাদের কাছে।

চটপটে ছদ্মবেশ খুলে কোনানডয়েল বললেন, এবার চিনেছেন নিশ্চয়ই,—দিন তাহলে পুরো টাকাটা।

একজন আর কয়েকজন

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

অনিবার্য কারণে সভাপতি সভায় উপস্থিত হতে পারলেন না—আজকালকার সভা-সমিতিতে হামেশাই এ ধরনের ঘোষণা শোনা যায়। সমুপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে তখন একজনের নাম প্রস্তাব করে সভাপতি-রূপে বরণ করা হয়। ইদানিং এটা রেওয়াজ হয়ে গেছে—এ নিয়ে অভিযোগের বড় একটা কারণ কিছু নেই। নির্দিষ্ট সভাপতিরো অনুপস্থিতি জনিত কোনো মনোবেদনার কারণ ঘটে না।

উপেন্দ্রনাথ-এর ব্যতিক্রম। দীর্ঘকাল ধরে বাংলা সাহিত্যের সেবা করে নাম করেছেন যথেষ্ট। তার ওপর সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ, অধ্যাপক এবং নিত্যকে উপেন্দ্রনাথ—সর্বোপরি প্রবীণ নিরহংকার উপেন্দ্রনাথ, সব সময়েই সভা সমিতি ভালোবাসেন। তবু বাংলা দেশে কেন, বাংলার বাইরে থেকেও নিত্যই ডাক তাঁর আসে সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবার জন্যে। উপেন্দ্রনাথ সানন্দে তা গ্রহণ করেন। আর সভাপতিত্ব গ্রহণ করে অনিবার্য কারণে উপস্থিত হলেন না—উপেন্দ্রনাথের কাছে তা হবার যো নেই। শেষ বয়সে স্বাস্থ্য তাঁর ভালো নয়—এটা ওটা অসুখ-বিসুখ তো লেগেই আছে, তার চেয়েও মারাত্মক তাঁর হার্টের অসুখ, ডাক্তারী ভাষায় যার নাম Angina pectoris। হৃদয়নিবাসিনী ওই সর্বনাশিনীকে উপেন্দ্রনাথ আদর করে নাম দিয়েছেন অঞ্জনা। Angina pectoris রোগে আক্রান্ত হয়ে নিদারুণ বক্ষ যন্ত্রণায় ছট ফট করার মাঝেও তিনি অনুরাগ ভরে লিখেছিলেন।

'হে অঞ্জনা, হে প্রেয়সি, বহ তুমি অরি,
শেষের সঙ্গিনী মোর, আছ বক্ষ ভরি।'

'অঞ্জনার' স্পর্শ উপেন্দ্রনাথের প্রায় নিত্যই লেগে থাকতো। কিন্তু তিনি বেপরোয়া। তাই বলে সভা-সমিতি করবেন না? যারা ভালোবাসেন, তারা যে কতো আদর করে ডাকে! তাদের আহ্বান সাহিত্যের আহ্বান, সাহিত্যার্থের আহ্বান—উপেন্দ্রনাথ নিজেকে তা থেকে বিমুক্ত করে রাখতে চান না। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এমন কি চিকিৎসকের নিষেধও তিনি মানবেন না। বলেন,—'দিনতো দুদোর তার আগেতে সময়টুকুর সদ্ব্যবহার'। তাই সভাপতি উপেন্দ্রনাথ অনিবার্য কারণবশতঃ সভায় উপস্থিত হতে পারলেন না, এমন ঘটনা বড় একটা কখনো ঘটে নি।

একবারের কথা বেশ মনে আছে। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে তাঁর যাওয়ার কথা। আগের দিন রাত্রে 'অঞ্জনা' একটু বেশি রকমের বাড়া দিয়েছিল। পরদিন সকালে উঠে বললেন। আমরা জোর করে তাঁকে শুইয়ে রাখলাম। রবিবারের বৈঠক তা বলে একেবারে বাদ দিলেন না।

সাহিত্যিক সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতি রবিবারে সকালে বৈঠকে হাজির হতেন। তাঁর গাড়ির হর্ন শোনার প্রতীক্ষায় উপেন্দ্রনাথ কান খাড়া রাখতেন।

আমি বললাম, 'দাদা' আজ কিন্তু আড্ডা দিতে দেবো না। আমি সদর দরজায় নোটিশ টাঙিয়ে দিয়েছি—'Not at home!'

উপেন্দ্রনাথ বললেন,—'তা বলে রসিকজনদের বাদ দিও না যেন!'

'না, আজ আর কেউ নয়। একটা দিন অন্ততঃ বিশ্রাম নিন!'

'সুধাংশুবাবুকে আসতে দেবে না?'

বললাম,—'তিনি স্বতন্ত্র। তাঁকে ছেড়ে দেবো।'

'সৌম্যেন ঠাকুর ?'

'তিনিও ব্যতিক্রম।'

'কৃষ্ণেন্দু কে ?'

হেসে ফেললাম। বললাম,—'তিনি কবিতা শোনার যদি আপত্তি নেই ; কিন্তু কথা বলা নিষেধ।'

'আচ্ছা, এখানে একটা স্লেট পেনসিল রাখো। কথা এখন বলবো না—বিকেলে আমার সংস্কৃতি সম্মেলন আছে।'

'যাবেন নাকি ?'

'যাবো না, বলো কী হে !' তবে ডঃ কালিদাস নাগকে মনে মনে মনে ডাকছি। তিনি হলে সাংস্কৃতি সম্মেলন অমুখে ভালো।'

তখনকার মতন চুপ করে গেলাম।

বাইরে মোটরের হর্ন শোনা গেল। সুধাংশুবাবু এসেছেন। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গিয়ে তাঁকে উপেন্দ্রনাথের অসুখের কথা বললাম। সুধাংশুবাবু ওপরে এসে কিছুক্ষণ বসে প্রায় বিনা বাক্য-ব্যয়েই উঠে গেলেন। যাওয়ার সময় আমাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানালেন সেদিন সভায় যাতে উপেন্দ্রনাথকে না যেতে দেওয়া হয়।'

বললাম,—'চেষ্টা করবো যথাসাধ্য।'

সুধাংশুবাবু আমাপেক্ষাও উপেন্দ্রভক্তি। তিনি বললেন,—'চেষ্টা নয় অনিলবাবু। ছুতো খুঁজুন। হার্টের রোগ বড় অবহেলার। ওঁকে সাবধানে রাখা দরকার।'

বললাম,—'উনি কি সেকথা শোনেন। বলেন শুয়ে থাকলেই আমার অসুখ বাড়ে। তোমরা কি আমাকে অক্ষয় করে বাঁচিয়ে রাখতে চাও ?'

সুধাংশুবাবু বললেন,—'হবুও। যে ক'দিন উনি থাকেন, তাতে ওঁর কী লাভ জানি নে, কিন্তু আমাদের লাভ ষোল আনা।'

বিকেলের দিকে উপেন্দ্রনাথ নিজেই বললেন,—'এখন বেশ ভালো বোধ করছি। একবার কৃষ্ণেন্দ্রকে ডাকো।'

বললাম,—'ডাক্তার কৃষ্ণেন্দ্র পাল ?'

উপেন্দ্রনাথ বললেন,—'হ্যাঁ !'

কারণটা অনুমান করে নিলাম। অপরাহ্নে সংস্কৃতি সম্মেলনে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে নেবেন। ডাক্তার পাল সজ্জন। উপেন্দ্রনাথকে তিনি অগ্রজের ন্যায় শ্রদ্ধা করেন এবং ভালবাসেন। বিলেত ফেরৎ বহু ডাক্তার কৃষ্ণেন্দ্র পাল উপেন্দ্রনাথের স্নেহের চেয়ে মনেরই চিকিৎসক। তাঁকে দিয়ে 'হ্যাঁ' বলানো খুব কঠিন কাজ নয়।

লোক পাঠালাম। কিন্তু ডাক্তার পালকে পাওয়া গেল না।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। উপেন্দ্রনাথ যাওয়ার জন্যে কিসের খুঁজছেন, কিন্তু সেদিন কেবল যেন আমারো মন চাইলো না।

খানিকটা অস্থিরতা নিয়ে উপেন্দ্রনাথ বললেন,—'কী হে ভায়া ! এখনো যে সংস্কৃতি সম্মেলন থেকে লোক এলো না !'

বিস্ময় আমার বিলীন। বললাম, পরের চালু হয়ে গেছে আপনি অসুস্থ। সকালে ওখান থেকে লোক এসেছিলেন—আমরা বলে দিয়েছি, ভালো থাকলে যাবেন।'

নিচে থেকে উপেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র কমল উঠে এলো। তাকে নির্দেশ দেওয়া ছিল তিনি যেন সংস্কৃতি সম্মেলনের পক্ষ থেকে যিনি আসবেন তাঁকে বুঝিয়ে বলেন।

কমল ইঙ্গিতে জানালেন—কাজ হাসিল।

উপেন্দ্রনাথ চাতুরী ধরে ফেললেন। বললেন,—'একটি সভায় তোমরা জোর করে আমাকে অ্যাবসেন্ট করালে! এই বোধ হয় প্রথম সভায় অনুপস্থিত হলাম।'

বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে টেম্পোরারি পার্কে বিরাট সাংস্কৃতিক সম্মেলন। কাউনসিলার অনিল মৈত্র তার প্রধান উদ্যোক্তা। সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশিষ্ট জনমণ্ডলীকে টেলিভিশনে দেখা যাবে।

সে সভায় উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমিও গেছি।

উপেন্দ্রনাথ বললেন,—'তারা, একটু সজাগ থেকো। আহ্বান সংস্কৃতি পরিষদ থেকে প্রভাত আসবেন আমাকে নিতে। এখান থেকে আমরা যাবো নিউ মার্কেটে।'

অনিল মৈত্র বললেন,—'তা হয় না দাদা। এখানে আজ আপনি আমাদের কাছে বন্দী। আপনি চলে গেলে সভার শোভা হারাবে।' আমিও এ কথায় সায় দিলাম।

উপেন্দ্রনাথ বললেন,—'লক্ষ্মী বিভিরের আহ্বান এড়াতে পারবো না যে। আর আমি যে সেখানকার স্থায়ী সভাপতি।'

বিশাল জনসমারোহ। উপেন্দ্রনাথ আছেন, ওয়ানীহুন মেয়র শ্রিওণা সেন আছেন—আরো কতজনা, কতো বিশিষ্ট ব্যক্তি। টেলিভিশনের দর্শক যৈ যৈ করছে।

ভিড়ের বেষ্টনী পার হয়ে একজন যুবক চারাসের দিকে এগিয়ে এলেন—'উপেন্দ্রনাথকে চাই। তাঁর সঙ্গে দেখা করবো।'

প্রশ্ন করলাম,—'আপনি?'

'আমি প্রভাত ঘোষ, আহ্বান সংস্কৃতি পরিষদ থেকে আসছি।'

বললাম,—'আপনাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। এইমাত্র সভাপতির ভাষণ শেষ হলো।'

প্রভাতবাবু অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন,—'আমাদের সভা যে সাতটায় আরম্ভ; এখনই তো প্রায় সাতটা।'

বললাম,—'সাতটার জায়গায় আটটা হলে এমন কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? কতো জায়গায় তো দেখি।'

প্রভাতবাবু সক্রোধে আমার দিকে তাকালেন। স্বভাবসিদ্ধ ভাবে তাঁর কামিজের হাতের আস্তানা গোটানো। বললেন,—'আজে আপনার বোধ হয় আহ্বান সংস্কৃতি পরিষদ সম্পর্কে ধারণা নেই। আপনি কী জানেন, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সেখানকার সভাপতি?'

সবিনয়ে জানালাম,—'আজে হ্যাঁ, তা জানি। তবে শুধু ওইটুকুই আমার জানা আছে।'

প্রভাতবাবু বললেন,—'আরো একটু জানুন, আমরা সময়নিষ্ঠ, নিয়মনিষ্ঠ, আমরা উপেন্দ্রনাথের শিষ্য।'

প্রভাতবাবুকে হয়তো সামলাতে পারতাম না—তাঁর আয়রণ ডিসিপ্লিনের কঠিন চাপে হয়তো শেষ পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়তাম। সে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন প্রভাত ঘোষের অগ্রজ প্রফুল্লকুমার মিত্র। প্রফুল্লবাবু উপেন্দ্রনাথকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তাঁর গাড়ি এনেছিলেন। তিনি আহ্বান সংস্কৃতি পরিষদের

সহ-সভানেত্রী শ্রীযুক্তা লক্ষ্মী মিত্রের স্বামী। প্রফুল্লবাবু কলকাতা করপোরেশনের প্রেস সুপারিন্‌টেনডেন্ট —উচ্চপদস্থ কর্মচারি এবং একজন কবি। নিউমার্কেটের ফ্রন্ট টাওয়ার সংলগ্ন সুদৃশ্য ফ্ল্যাটার্স তাঁর আবাসস্থল। আহ্বান সংস্কৃতি পরিষদের ঘরোয়া অধিবেশন সেখানেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

প্রফুল্লবাবু প্রভাত ঘোষকে নিয়ন্ত্রণ করলেন এবং উপেন্দ্রনাথকে নিয়ে সাতটার সভায় প্রায় আটটার সময় উপস্থিত হলেন।

আহ্বান সংস্কৃতি পরিষদের সেদিনকার সভা কেমন হয়েছিল তা বিশেষ স্মরণে নেই। কত লোকজন হয়েছিল তাও অনুল্লেখযোগ্য। কিন্তু শ্রীমতী লক্ষ্মী মিত্রিরের আদর-আপ্যায়ন আর প্রভাত ঘোষের সভার শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ সে'ভাই মনে রাখবার মতন।

সভাশেষে প্রভাত ঘোষকে বললাম,—'সাতটার ক্ষোভ আর মনে নেই তো? এখন কিন্তু রাত দশটা। দু'ঘণ্টার সভা থাকণ অন্যেছে।'

প্রভাত ঘোষ হেসে উত্তর দিলেন,—'কিন্তু তবুও ক্ষোভ মেটে নি; তার কারণ আমরা উপেন্দ্রনাথের কাছেই শিখেছি সাতটার সভা সাতটাতেই আরম্ভ করা উচিত।'

নিউমার্কেটের ফ্রন্ট টাওয়ার সংলগ্ন খোলা ছাদের সভা থেকে ট্যাক্সিতে করে যখন উপেন্দ্রনাথ এবং আমি বাড়ি ফিরছিলাম, উপেন্দ্রনাথ তখন খোশ মেজাজে। গুনগুন করে অতুল প্রসাদের গান ধরেছেন,—'দিবারে বাসরে ভালো, নইলে মনের কালো ঘুচবে না!'

বললাম,—'দাদা, এই ভালোবাসার জন্যেই কী এতো সভা-সমিতি করেন?'

উপেন্দ্রনাথ বললেন,—'তাতো নিশ্চয়ই। ভালোবাসাটুকুই তো জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। কতো দিলে আর কতো পেলে?'

'কিন্তু ভালোবাসা যেখানে নিগ্রহ হয়ে ওঠে?'

'তবুও তা গ্রহ। সে গ্রহকে ঠিক ভাবে গ্রহণ করলে তুমি সুফলই পাবে—কুফল নয়।'

বললাম,—'জ্যোতিষশাস্ত্রে তো বলে সব গ্রহ সকলের পক্ষে শুভ হয় না!'

উপেন্দ্রনাথ বললেন,—'সেক্ষেত্রে গ্রহশান্তি কবচ গ্রহণ করতে হয়। সে কবচটি কী তা জানো?'

বললাম, 'না।'

উপেন্দ্রনাথ বললেন,—'তার নাম ভালোবাসা। মন দিলে তবেই মনকে পাওয়া যায়। শুধু লেখার নয়, ব্যক্তিগত আচরণেও তার প্রয়োজন বড় বেশি। লেখার মধ্যে পাঠকের সঙ্গে যে মন দেওয়া-নেওয়া, তা হচ্ছে ভাবগত। তার প্রভাব বহুদিন বহুকালের। আর সভার প্রকাশ্যে যে মন দেওয়া-নেওয়া তা ব্যক্তিগত, দৈহিক। সে সান্নিধ্যের পরমায়ু আপাতদৃষ্টিতে অল্পকালের হলেও তার মধ্যেও কিছু থেকে যায়। সে থাকাও কালের আয়ুকে কিছু পরিমাণে বাড়ায়। সভার মধ্যে সবার মনকে আমি খুঁজে বেড়াই—তাই তো সভা আমার এতো প্রিয়।'

সভাপতি উপেন্দ্রনাথের জীবন দর্শনের একটি দিককে দেখে চমৎকৃত হলাম। আহ্বান সংস্কৃতি পরিষদের ছোট্ট সভাটিকে কৃতজ্ঞতা জানাই—উপেন্দ্রনাথের চরিত্রের একটি দিককে দেখবার অবকাশ তাঁদের দৌলতেই সেদিন পেয়েছিলাম।

———

অমৃত কথা ও কাহিনী

—বুদ্ধবাণী—

• • • রাজগৃহ নগরে অনাথপিণ্ডিক নামক একজন প্রভূত ধনশালী ব্যক্তি আসিয়াছিলেন। দানশীলতার জন্য তিনি 'পিতৃমাতৃহীনের প্রতিপালক এবং দরিদ্রের বন্ধু' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পৃথিবীতে বুদ্ধ অবতীর্ণ হইয়া নগরের উপকণ্ঠস্থ বেণুবনে অবস্থান করিতেছেন শুনিয়া, তিনি রাত্রিকালেই পুণ্যাত্মার দর্শন মানসে যাত্রা করিলেন।

দর্শন মাত্রেই পুণ্যাত্মা অনাথপিণ্ডিকের হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধারাশি অবলোকন করিয়া শান্তিপ্রদ পূতবাক্যে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারা একত্রে উপবেশন করিলেন। তৎপরে অনাথপিণ্ডিক পুণ্যাত্মার মুখনিঃসৃত মধুর সত্য শ্রবণ করিলেন। বুদ্ধ কহিলেন,

"আমি তোমাকে কহিতেছি, তুমি জীবনের বর্তমান অবস্থা রক্ষা করিয়া আন্তরিক সহকারে সৎকর্মে প্রবৃত্ত হও। জীবন, ধন কিংবা প্রভুত্ব মনুষ্যকে যাবতীয় দুঃখের কারণ। ওই বস্তু সমূহের অত্যধিক আসক্তিই তাহার দুঃখের কারণ।" • • • "যে ভিক্ষু স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করিবার উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ করেন, তিনি লাভবান হইবেন না। কারণ অলস জীবন অতি ঘৃণিত এবং উদ্যমের অভাব ঘৃণ্য।"

তথাগতের ঘোষিত ধর্ম কাহাকেও সন্ন্যাস আশ্রম করিতে কিম্বা বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে কাহাকেও সংসারত্যাগী হইতে কহে না; তথাগতের ধর্ম প্রত্যেক মনুষ্যকে অহংকারের মোহ হইতে মুক্ত হইতে, স্বীয় অন্তঃকরণের বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিতে, ভোগ সুখের তৃষ্ণা পরিহার করিতে এবং সাধু জীবন যাপন করিতে শিক্ষা দেয়।

"মানুষ যাহাই করুক, সংসারে থাকিয়া শিল্পী, বণিক এবং রাজকর্মচারীই হউক, কিম্বা সংসার ত্যাগী হইয়া ধর্মচিন্তা-নিরত হউক, সর্বান্তঃকরণে তাহাকে স্বীয় কর্মে নিযুক্ত হইতে হইবে; তাহাকে পরিশ্রমী ও উদ্যমশীল হইতে হইবে, এইরূপে পদ্ম যেমন জলে উৎপন্ন ও বর্ধিত হইয়াও জলস্পৃষ্ট নহে, মানুষও যদি সেইরূপ দ্বেষ ও হিংসার বশবর্তী না হইয়া জীবন সংগ্রামে রত হয়, যদি সে অহংকারের অনুসরণ না করিয়া সত্যের অনুগামী হয়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহরূপে সে শান্তি ও পরমানন্দ অনুভব করিবে।"

অনাথপিণ্ডিক পুণ্যাত্মার বাক্যে আনন্দিত হইয়া কহিলেন,—"আমি কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তি নগরে বাস করি। .....আমি ওই স্থানে একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করিব, ওই বিহার ভবদীয় সংঘের ধর্মানুশীলনের স্থান হইবে; আমার প্রার্থনা আপনি দয়া করিয়া উহা গ্রহণ করুন।"

• • • বুদ্ধ ওই দান গ্রহণে সম্মত হইয়া কহিলেন,—"দানশীল মনুষ্য সকলেরই প্রিয় • • •"

"অনুধাবন করা কঠিন: নিজের খাদ্য বিতরণ করিয়া আমরা অধিক শক্তিপ্রাপ্ত হই; নিজের বস্ত্র অপরকে দান করিয়া আমরা অধিকতর সৌন্দর্যশালী হই; বিশুদ্ধি ও সত্যের জন্য আবাসের প্রতিষ্ঠা করিয়া আমরা বৃহৎ ধন ভাণ্ডারের অধিকারী হই।" • • • "নিরবচ্ছিন্ন করুণা অমরত্বের পথপ্রদর্শী; করুণা ও দানে পূর্ণতা সাধিত হয়।"

হঠাৎ প্রিয়লালের চিঠি পাইলাম।

প্রিয়লাল কোনদিনই চিঠিপত্র বিশেষ লেখে না। ডাঃ বোসের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে; সূর্যবাবু তাহার কল্পনায় আর উদ্বিগ্ন হন নাই। তাহার সে বাড়িও চতুর্গুণ মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। বাড়ি বেচিয়া, অন্যত্র একটি স্থানে বাড়ি করিয়া প্রিয়লাল নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিয়াছে, ইহাই জানিতাম।

চিঠিটি পাইলাম, একটি ভদ্রলোকের হাতে। প্রিয়লাল লিখিয়াছে, বিশেষ প্রয়োজনে লিখিতেছি, জানি তুমি সাধ্যমত সাহায্য করিতে বিমুখ হইবে না। পত্রবাহক ভদ্রলোক, সুরজিতবাবু স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক, আমার বিশিষ্ট বন্ধু। অতি সজ্জন, আলাপ করিলেই বুঝিবে। সম্প্রতি ইনি কিছু বিপদে পড়িয়াছেন, ভ্রাতার চিকিৎসা লইয়া। রোগের তত্ত্ব আমি বিশেষ বুঝি না। কিন্তু কোন চিকিৎসাতেই নাকি ফল হয় নাই। ভদ্রলোক উদ্বিগ্ন; কোন বিশেষজ্ঞ দ্বারা চিকিৎসা করাইতে চান। অথচ এ-বাজারে কে-যে বিশেষজ্ঞ আর কে-যে নয়, তাহার তত্ত্ব-নির্ণয় করা সাধারণ মানুষের অসাধ্য। ভদ্রলোক আমাকে ধরিয়াছেন চিকিৎসকের সন্ধান করিয়া দিতে, কিন্তু আমি সে বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ। মুশকিলে পড়িয়া একজনের নাম মনে পড়িল, যিনি মুশকিল-আসানও বটেন, ডাক্তারও বটেন। তাই তোমার কাছে পাঠাইলাম, তুমি একটু দেখ, ডাঃ বোস যদি ইঁহার চিকিৎসার ভারটি হাতে নেন। তাঁহার বুদ্ধির অগোচর কিছু নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস; ইঁহার ভ্রাতাকেও রোগমুক্ত করিতে তিনি নিশ্চয় পারিবেন, ইহা আমার দৃঢ় ধারণা। আমি তোমার কাছে পাঠাইয়া দিলাম। এখন যা করার তুমি কর।

বিচিত্র! ডাঃ বোসকে আমি চিনি, অপরাধ-বিজ্ঞানী হিসাবে, ডাক্তারি তিনি সত্যই কতখানি করেন, বা আদৌ করেন কিনা, তাহাই ভাল জানি না। অথচ, প্রিয়লাল অনেকখানি ভরসা দিয়া পাঠাইয়াছে ভদ্রলোককে।

তিনি রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিতেছিলেন। চিঠি পড়া শেষ করিয়া আমি মুখ তুলিতেই কহিলেন, কি বলুন, পারবেন তাঁকে দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে? পারতেই হবে।

তাঁহার কণ্ঠের ব্যাকুলতা এমন প্রবল ও অকৃত্রিম, যে তাহার উত্তরে 'পারিব না' উচ্চারণ করা যায় না। দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে কহিলাম, সে ত তাঁর ব্যাপার; তাঁর সঙ্গে আলোচনা না করে কি বলব আপনাকে। আর, এই সময়টাতে তিনি আছেন কোথায়, তাও তো ঠিক জানিনে।

—কেন, কোথায় থাকেন তিনি? কলকাতায়ই তো? প্রিয়লালবাবু তাই বলেছেন।

—কলকাতায়, থাকেন অনেক সময়ে, কিন্তু অনেক সময়ে বাইরেও ঘুরে ঘুরে বেড়ান। মানে, একটু খেয়ালী লোক। তা, আমি খোঁজ নেব তাঁর, আজই চিঠি লিখব। কিন্তুসময় লাগবে। মানে তাঁর উত্তর পেয়ে, তবে ঠিক করতে হবে কখন কোথায় দেখা হওয়া সম্ভব। আপনার ভাই কোথায় থাকেন, আপনার সেখানেই তো?

—না। সে থাকে কলকাতাতেই। আমিই বাইরে থাকি, চাকরির ব্যাপারে।

—তাহলে একটা সুবিধে হল; ডাক্তার যদি কলকাতাতে থাকেন বা এসে যান, তবে রোগী দেখানোটা সহজ হবে। কিন্তু, তাঁর চিঠি পাব, আপনাকে খবর দেব, তারপর দু'জনে মিলে কলকাতায় যাব সব স্থির করতে—অন্তত দিন দশেক ধরে রাখুন।

—তা হোক। দশ দিন কেন, দশ সপ্তাহতেও আপত্তি নেই, যদি সত্যি করে একটা চিকিৎসার সুরাহা হয় তাতে।

—দশদিন হোক, দশ সপ্তাহ হোক? তার মানে? অসুখটা কি তাঁর?

—তাই তো জানিনে। কেউই নাকি ধরতে পারছে না। হাতের কাছে ডাক্তার কবরেজ যাদের পেয়েছি দেখাতে বাকি রাখি নি। তাঁরা ওষুধ দিচ্ছেন, ফলও হচ্ছে, দু'চারদিন একটু সুস্থ দেখাচ্ছে, আবার যে কে সেই। আর সে ছেলেও দারুণ খেয়ালী, না খাবে ওষুধপত্র, না চলবে নিয়ম মেনে।

—কতদিন?

—তা, বছর পাঁচেক তো বটেই, হয়তো আরও আগে থেকেই সূত্রপাত হয়েছে রোগের। মানে, তারা সবাই থাকে সেখানে, আমিই থাকি বাইরে, ঘুরে—ছুটি-ছাটায় যাই। শরীর যখন বেশ খারাপ হয়ে এসেছে তখনই আমার চোখে পড়েছে, সেও হল ধরুন তিন চার বছর হবে। তারপর থেকেই চেষ্টা করছি তার চিকিৎসার। কিন্তু না সে শুনছে কথা, না ডাক্তাররা পারছে তাকে সামলাতে।

সুরজিৎবাবুর গলা ধরিয়া আসিল। ভ্রাতার জন্য ইনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, সেটা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কহিলাম, কি রোগ, ডাক্তাররা কিছু বলছে না?

—ছাই বলছে। ইনি বলছেন টনিক দিচ্ছি, উনি বলছেন চেঞ্জে পাঠান। রোগী নিজে বলছে, আমার কিছুই হয়নি, বেশ সুস্থ আছি। অথচ, সুস্থ যে কত, সে তো দেখছি আমরা। ভাবনায়, আর চিন্তায় বাড়িসুদ্ধ মানুষকে তিলে তিলে মেরে ফেলছে হতভাগাটা। তার শরীর মন দুইই ক্রমাগত ভেঙে চলেছে দেখতে পাচ্ছি। অথচ ঠিক যে কি তার ব্যাধি, তার কেউই ঠিক পাচ্ছে না। মানে, তার সিম্‌টমটা হচ্ছে—

—সে আমাকে বলা বৃথা। আমি শুনে কিছুই বুঝব না। আপনার আপাতত প্রোগ্রাম কি?

—আপনি যা বলবেন। বলেন, তো কলকাতায় যাই তাঁকে খুঁজতে।

—সে এভাবে এক্ষুনি গিয়ে কি করবেন। হয়তো তিনিই নেই কলকাতায়।

—কি করব তাহলে, বলুন।

—তাই বা কি বলব। ওই ভুল করেছে; একেবারে আপনাকে ঠেলে না পাঠিয়ে শুধু যদি আমাকে চিঠি দিত একটা। আমি তাঁর খোঁজ নিয়ে তারপরে জানতাম কি করা যাবে।

—সে দোষ তাঁর নয়, আমিই নিজে থেকে চলে এসেছি।

—এসেছেন, কিন্তু কাজ কিছু হবে কিনা বলা মুশকিল। না যদি হয়, মিথ্যে আপনার হায়রানি; সময়ও নষ্ট, টাকাও নষ্ট।

—তা হোক, সেজন্যে আমি তৈরি হয়েই এসেছি।

—মানে? অনির্দিষ্ট কাল বসে থাকবেন? আপনার ক্লাসের ক্ষতি হবে না?

—না, সে ব্যবস্থা আমি করে এসেছি।

—বেশ। তাহলে, এসেই পড়েছেন যখন, বসে যান দিন-দু-চার আমার এখানটাতে। আমি দেখি চিঠি লিখে, তাঁর খবর পাই কিনা।

যতটুকু ধারণা হইয়াছিল রোগীর সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়া সেইদিনই ডা: বোসের নামে কলিকাতার ঠিকানায় পত্র দিলাম। তাগা এমন ছিল, তৃতীয় দিনেই উত্তর আসিল, রোগীর মামাকে লইয়া অবিলম্বে চলিয়া আইস। সেইদিনই ট্রেন ধরিয়া দুইজনে কলিকাতায় চলিয়া গেলাম। বিকালের দিকে পৌঁছিলাম, স্টেশন হইতে সোজা ডা: বোসের বাড়িতে।

ডাক্তার অপেক্ষা করিয়া ছিলেন। দু'জনকে বসাইয়া কহিলেন, বলুন, শুনি। রোগের ইতিহাস,

বিবরণ, যতটা জানেন সব বলে যাবেন। তারপর আমার যা প্রশ্ন করবার করব।

সুরজিৎবাবু কহিলেন, ইতিহাস যে কি, তাও বলতে পারব কিনা সন্দেহ।

ডাক্তার কহিলেন, যা কিছু আপনার মনে হয়, এই রোগের কারণ বা ইতিবৃত্ত বলে, একবার থেকে বলে যান। আমি তার থেকে বুঝে নেব। কোন কথা বাদ দেবেন না।

সুরজিৎবাবু কহিলেন, কিন্তু সে তো দীর্ঘ কাহিনী।

ডাক্তার কহিলেন, হোক। অন্তত পাঁচ বছরের রোগ বলছেন, তার কাহিনী বলতে নিজের পাঁচটা ঘণ্টা তো লাগবেই।

—না, তা লাগবে না।

—বলুন।

সুরজিৎবাবু বলিলেন, প্রায় খানিকটা বলিয়া একটামা বলিয়া গেলেন। ডাক্তার ও আমি নিঃশব্দে শুনিলাম। ডাক্তার শুধু মধ্যে মধ্যে হুঁ হাঁ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, তিনি সবই শুনিতেছেন।

সুরজিৎবাবুর ওই একমাত্র ভাই, বছর দশেকের ছোট। বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ। সুরজিৎবাবুর পঁয়তাল্লিশ। এম. এস. সি. ও বি-এল. পাস করিয়াছেন, কলিকাতায় ওকালতি করেন। বরাবর ভাল স্বাস্থ্য ছিল, খেলাধুলা দৌড় সাঁতার সবেতেই উৎসাহ ও দক্ষতা ছিল। সেটা বোধহয় বংশেরই ধারা, সুরজিৎবাবুর দেহের গঠন দেখিয়াই অনুমান করা যায়—পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স বলিলেন অথচ দেখিয়া কিছুতেই তেত্রিশ-চৌত্রিশের বেশী মনে হয় না।

ওকালতি আরম্ভ করিবার পর, আট-নয় বৎসর পূর্বে, বিবাহ করিয়াছেন। একটি কন্যাও হইয়াছে, তাহার বয়স বছর পাঁচেক।

প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে, একবার খুব অসুখ হয়। টাইফয়েড, বা ওই জাতীয়। বেশ কিছুদিন জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গ চলে। তারপর ক্রমে সুস্থ হন, কিন্তু পূর্বের স্বাস্থ্য আর ফেরে নাই। একটা অদ্ভুত রুগ্নতা ও দুর্বলতা যেন সর্বদাই লাগিয়া আছে। ঔষধে পথ্যে তাহার ব্যতিক্রম হয় না, বরং দুর্বলতা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। খাদ্য হজম হয় না, খাইবার ইচ্ছা ও সাধন দুইটাই ক্রমশ লুপ্ত হইয়াছে, সামান্য খান, এবং তাহার চেয়েও সামান্য উপলক্ষ্যে উপবাস করিয়া থাকেন। এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, অতি অকারণে অসুস্থ হন, জ্বর হয়, এবং সামান্য জ্বর হইলেই তাহার সঙ্গে প্রচণ্ড বমির বেগ ও দুর্বলতা দেখা দেয়। মাসে একবার অন্তত এরকম হয়ই, ফলে মাসের মধ্যে কিছু না হোক দিন দশেক বিছানায়ই কাটে। অন্য সময়েও ওঠানামা চলাফেরায় দারুণ অনিচ্ছা, হাসিখুশি স্ফূর্তি তো একেবারেই নাই, যেন এই বয়সেই জীবনের সকল আনন্দ ফুরাইয়া গিয়াছে এমনই ভাব। সুরজিৎবাবু চিকিৎসার চেষ্টা করিয়াছেন, ফল হয় নাই। চিকিৎসক ধরিতে পারেন না রোগটা কি, ঔষধে দু'দিন ফল হয় তারপরই পূর্বের অবস্থা ফিরিয়া আসে, রোগীরও ঔষধ খাইতে ডাক্তার দেখাইতে বিরক্তি ও আপত্তি। তাঁহার কথাই হইল, আমার কিছুই হয় নাই, তোমরা মিথ্যা অস্থির হইতেছ, আমাকেও অস্থির করিতেছ। জোর করিয়া ঔষধ খাওয়াইতে গেলে মিথ্যা বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়। মেজাজ খারাপ করিয়া হয়তো উপবাসই শুরু করেন, বা বমিটমি করিয়া অস্থির হইয়া পড়েন; রাগ বাড়িলে বিকট চিৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়াও গিয়াছেন দু'একবার। ফলে, বিশেষ জোরজার করিতেও ভরসা পান না ইঁহারা। দিন দিন এই অবস্থা বাড়িয়া চলিয়াছে, অথচ প্রতিকারের কোন পথ নাই। বলিতে বলিতে শেষের দিকে সুরজিৎবাবু প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, অনেক সাধ-আশা ছিল ভাইকে নিয়ে। চাকরির দুঃখ নিজে বুঝছি বলে স্বাধীন ব্যবসাতে বসিয়েছিলাম। সে ব্যবসা চুলোয় যাক, এখন সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকলেই আমরা বেঁচে যাই। বলিতে বলিতে ভদ্রলোক চক্ষু মুছিলেন; তারপর কহিলেন, সংসারে কারু মুখে হাসি নেই। অনেক খুঁজে পরের মেয়েকে এনেছিলাম ঘরের বউ

করে, তার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারি নে। মেয়েটা অবধি অকালে গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। অথচ কি যে করব তাও জানি নে।

ডাক্তার নীরবে শুনিতেছিলেন। কহিলেন, কিছু করতে হবে না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

—ঠিক হয়ে যাবে? সত্যি যাবে বলছেন আপনি? সুরজিৎবাবু প্রায় চেঁচাইয়া উঠিলেন, তারপর রোগীর মাথায় হাত বাড়াইয়া ডাক্তারের পদধূলি লইতে গেলেন।

ডাক্তার তাঁহার হাতটা ধরিয়া ফেলিলেন, কহিলেন, স্থির হন। এবার যা যা জিজ্ঞেস করছি উত্তর দিন।

—বলুন।

—খুব ভেবেচিন্তে বলবেন। এমন যদি হয় ঠিক উত্তর দিতে পারছেন না, তবে তাই-ই বলে দেবেন, আন্দাজে বলবেন না কিছু।

—বলুন।

—ফিট হয়ে যায় বলেছেন। কতবার হয়েছে এ রকম?

—তা বোধ হয় তিন চার বার।

—তিন চার বার, পাঁচ বছরের মধ্যে?

—এই দু'বছরের মধ্যে। তার আগে হত না।

—ফিট হতে আপনি নিজে দেখেছেন?

—একবার দেখেছি।

—কি রকম হয় অবস্থাটা, বলতে পারবেন?

—হাঁ, মানে, সেবার যা দেখলাম, হঠাৎ, এঁ এঁ এঁ করে চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

—খুব জোর চীৎকার করে?

—হ্যাঁ, একেবারে শুনে চমকে যাবার মত। পড়ে, দেহটা বেঁকে গেল, ঘাড় শক্ত হয়ে বেঁকে গেল, ঘরঘর করে সারাটা দেহ কাঁপছে, হাত আর পা বাঁকাচ্ছে। সে দারুণ ঝাঁকানি, ঠেসে টেনে স্থির রাখা যায় না। হাত মুঠো করা, দাঁত এঁটে গেছে, চোখ উল্টে গেছে, সারাটা মুখে যেন রক্ত নেই। মেয়েটা কেঁদে উঠতে গিয়ে বোবা হয়ে গেল। আমারই মনে হল এই গেল সব শেষ হয়ে।

—কতক্ষণ ছিল, এ রকম?

—তা, অন্তত মিনিট পনের তো হবেই, একেবারে ওই রকম ভীষণ অবস্থা। তার পর ক্রমে শান্ত হয়ে এল; তাও, পুরো চোখ মেলে তাকাল বোধ হয় ঘণ্টা দুই পরে। ফিট ভাংবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল, অত্যন্ত অবসন্ন অবস্থা।

—ফিট ভাংলো কি করে? নিজে থেকেই, না ওষুধপত্তর দিয়ে?

—প্রথমটা মাথায় জল ঢেলেছিলাম। তাতে মনে হল আরও বেড়ে যাচ্ছে। তারপর স্মেলিং সল্ট দিতে ফল হল।

—আরও ভাল ফল হ'ত, ব্যবহার করা জুতো শুঁকিয়ে দিলে।

—হ্যাঁ, একবার তাই দিয়েছিল শুনেছি। সেবার এক বিহারী চাকর ছিল বাড়িতে, ফিট হতেই সে তার পায়ের দিশী-নাগরা খুলে শুঁকিয়ে দিলে। তাইতে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ফিটের জোর কমে গেল।

—তাই যাবে। আবার যদি ফিট হয়, জুতো শুঁকিয়ে দেবেন। আচ্ছা, এবার বলুন, তার মধ্যে কয়েকটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন কিনা। হাতের শিরাগুলো মোটা মোটা হয়ে উঠেছে, যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে?

—হ্যাঁ, কর্ণা রং, রগগুলো খুব স্পষ্ট চোখে পড়ে।

—আমি বলে যাচ্ছি, মিলিয়ে নিন। খুব কন্‌স্টিপেটেড। চান করতে অনিচ্ছা, করলেও ঠাণ্ডা জলে করতে চায় না। পরিচ্ছন্ন হয়ে বা সেজে গুজে থাকবার প্রবৃত্তি কমে গেছে। হাসি হল্লোড় বা ক্রিয়াকর্মে বাড়ির হৈ-চৈ এড়িয়ে চলতে চায়। কোথাও যেতে চায় না পারতপক্ষে। মুখ-চোখের চেহারা অত্যন্ত শুকনো, যেন ভেতর থেকে শুষে নিচ্ছে কিছুতে। চোখের তারা অত্যন্ত ডাইলেটেড; তা আবার থেকে থেকে ছোট বড় হয়—বিশেষত অসুস্থ অবস্থায়।

—সব অবিকল মিলে যাচ্ছে। চোখের তারাটা লক্ষ্য করি নি।

—করবেন। খাওয়ার রুচি কোন্ দিকে? মাছ-মাংসে, না কি দুধ মিষ্টি?

—কোনদিকেই নেই বলা যায়। বলে, খেলেই অসুখ করবে।

—করে? না করবে বলে ভয় পায়?

—দুটোই। নেমন্তন্নে যেতে বললে তো মহামারী বাধায়।

—আচ্ছা। আমার শুনুন। মনটা অত্যন্ত হতাশায়, কোন কিছুতেই উৎসাহ নেই, ভরসাও নেই। চুপচাপ পড়ে থাকতে ভালবাসে। ঘুম হয় না, অন্তত বলে যে হয় না, এবং সারাক্ষণই শুয়ে শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতে চায়। শব্দ সাড়া করে ঘুম ভাঙিয়ে দিলে হঠাৎ চটে যায়।

—অস্বাভাবিক। এমন নির্জ্জলা অনুমান করেছেন কি করে!

—ঘুমোবার জন্যে ওষুধ খায় কিছু? নিয়মিত?

সুরজিৎ বাবু ঈষৎ ঘামিয়া গেলেন, তার পর কহিলেন, সে তো ঠিক বলতে পারছি নে।

—মনে করে দেখুন, হয়তো পারবেন বলতে। বা, জেনে নিতে চেষ্টা করুন। আপনার বউদিকে জিজ্ঞেস করবেন।

—করব।

—বেশ। এখন দিনকতক থাকতে পারবেন, এখানে?

—পারব। কতদিন?

—সেটা এখনই বলতে পারছি নে। আগে রোগীকে দেখতে হবে, তার ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে নিতে হবে। চিকিৎসা তার পরে। আচ্ছা, চেঞ্জে পাঠিয়ে দেখেছেন কখনও?

—চেষ্টা করেছি অনেকবার। ফল হয় নি। কলকাতা ছেড়ে বাইরে যেতে চায় না, গিয়ে গেলেও আবার ফিরে চলে আসবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

—বেশ। আচ্ছা, আপনি এবার তা হলে বাড়ি চলে যান। দেখুন গিয়ে, আজ কাল কেমন আছে কি অবস্থা। আমিও একটু ভেবে দেখি কেসটা। আপনার ঠিকানাটা রেখে যান। ফোন আছে?

—পাশের বাড়িতে আছে।

—নম্বর জানেন? ডেকে দেবে?

—তা দেবে। নম্বরও জানি।

—দিয়ে যান। আমার নম্বরটাও নিয়ে যান। পরশু সকাল আটটা নাগাদ আমাকে একবার ফোন করবেন, রোগীর বর্তমান অবস্থা জানাবেন। তার পর কি করতে হবে, তখন বলব।

আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, আর তুমি? তুমি কি করবে?

—কি করতে বলেন?

সুরজিৎবাবু কহিলেন, আপনি আমার সঙ্গেই চলুন না। আমার অতিথি হবেন এ দুটো দিন?

ডাক্তার কহিলেন, সেটা থাক। আপনার বাড়িতে যেতে হয় পরে যাবো। আপাতত—বাড়িতে খবর দিয়েছ যে আসছ তুমি?

কহিলাম, না।

—তবে আর কি, তুমি থেকে যাও আমার এখানে।

সুরজিৎবাবু কহিলেন, কিন্তু, আমার ওখানে গেলেই ভাল হত না?

—না, মন্দ হত। আপনার ভাই তো বললেন, ডাক্তার দেখলেই চটে যায়। ওকে দেখে সন্দেহ হবে না তার?

—তা হবেই-যে, এমন—

—কি দরকার রিস্ক নিয়ে। বরং এমনও তো হতে পারে, এখন ওকে না চিনলেই পরের কাজ সহজ হবে।

—কি কাজ?

—সে এখনই কি করে বলব। আগে বুঝে নিই কাণ্ডটা কি। আপনি চলে যান এখন, যা যা বললাম মনে রাখুন। আর, এই উদ্দেশ্যে এসেছেন, যা আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে এর, একথা ব্যক্ত করবেন না, কারু কাছেই নয়। মানে বাড়িতেও নয়, বাইরে অন্যের কাছেও নয়। বুঝেছেন কথাটা?

সুরজিৎবাবু বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিলেন, কি একটা প্রশ্ন করিতে গিয়া থামিয়া গেলেন, তারপর মাথা নাড়িয়া কহিলেন, বুঝেছি।

—মনে রাখবেন। আমার ঠিকানা আর ফোন-নম্বরটাও আপাতত নিজের মনে মনেই রেখে দেবেন। প্রয়োজন আমাকে ডাকবেন।

সুরজিৎবাবু চলিয়া গেলেন।

ডাক্তার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার ভ্রূ ধীরে ধীরে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, তারপর হঠাৎ নড়িয়া চড়িয়া সিধা হইয়া বসিলেন। অস্ফুটস্বরে কহিলেন, আসলে।

আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম, কি?

ডাক্তার কহিলেন, কিছু না, ওটা স্বগতোক্তি। তুমি যাও, চান-টান করে সুস্থ হয়ে এস।

—অসুস্থ হবার কি হ'ল আমার?

—আহা, সুস্থ, মানে রেডি হয়ে এস।

—রেডি হব, কিসের জন্যে?

—কিছুর জন্যে নয়। রেডি থাকার জন্যেই রেডি থাকে মানুষ, যাতে যে-কোন দরকারে চট্ করে কাজে লেগে যাওয়া যায়।

—আপাতত কোন কাজ তো নেই তেমন।

—নেই, আসতে কতক্ষণ। কাজ যিনি চাপান তিনি কি তোমার আমার অবসর বুঝে চলেন? তাঁর মরজি বুঝেই রেডি থাকতে হয়।

আমি আর তর্ক করিলাম না।

বাড়িতে পৌঁছিয়াছি চারটার কিছু পরে। সুরজিৎবাবু চলিয়া গিয়াছেন পাঁচটার কাছাকাছি। সাতটার সময় ডাক্তার বাহির হইয়া গেলেন। আমাকে বলিলেন, ঠিক আধঘণ্টা পরে ফিরব। আমি একটা বই খুলিয়া বসিলাম। বোধ হয় দশ-পনের মিনিট হইয়াছে কি হয় নাই, টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। তুলিয়া লইয়া কহিলাম, কে?

অল্পবয়সী মেয়ের গলা, অত্যন্ত মার্জিত উচ্চারণ। কহিলেন, ডাঃ বোস?

কহিলাম, তিনি একটু বাইরে গেছেন।

—কখন আসবেন?

—অল্পক্ষণ পরেই। কিছু বলবার থাকে যদি তাঁকে আমি বলে দিতে পারি।

—একটুক্ষণ নীরবতা, তারপর কহিলেন, তাই বলবেন। আমি বলছি—মানে, আমার শ্বশুর-মশাই ওঁর কাছে চলে গেলেন এইমাত্র—

—কে, বলুন?

—আমার, মানে,—বুঝিলাম একটু বিপাকে পড়িয়াছেন। শ্বশুরের নাম উচ্চারণ করাটা নিষিদ্ধ—তিনি আজই বিকেলে গিয়েছিলেন ওঁর কাছে।

—তার মানে? তাঁর নাম কি সুরজিৎবাবু?

—হ্যাঁ। আপনি কে?

—আমি তাঁরই সঙ্গে এসেছি।

—ও বুঝেছি।

—কি হল হঠাৎ। সুরজিৎবাবুর তো এখুনি আসবার কথা ছিল না।

—কারণ ঘটেছে। তিনি বেরিয়ে গেছেন, আমাকে বলে গেছেন ফোন করে খবর দিতে, যাতে গিয়ে ডাক্তারবাবুকে পান। পাবেন তো?

কণ্ঠে অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সুর। কহিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, নিশ্চয় পাবেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরবেন বলে গেছেন, সুরজিৎবাবু এসে পৌঁছতে পৌঁছতে উনি ঠিক এসে যাবেন। কিন্তু, কি ব্যাপার বলুন তো?

—ওঁর কাছেই শুনবেন সব। তাঁকে আনতে গেছেন। আসবেন তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, দরকার হলে নিশ্চয়ই যাবেন।

—তাই একটু বলবেন দয়া করে, যাতে আসেন। আর প্রশ্ন করিতে পারিলাম না। ফোন ছাড়িয়া দিয়াছেন। প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া হয়ত ঈষৎ ক্ষুণ্ণ বোধ করিলাম; তারপর মনে পড়িল, কোনটা পাশের বাড়িতে, নিশ্চয়ই রোগীর কথা সেখানে বসিয়া বলিতে চান নাই।

কিন্তু, হঠাৎ কি হইল? ডাক্তারের কথা মনে

পড়িল, রেডি থাকতে হয়। হাতের বই রাখিয়া উঠিয়া পড়িলাম, যদি ডাক পড়ে, বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া লইলাম। কোন আন্দাজ মিনিট দশেক পরে একটি ট্যাক্সি আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল; সুরজিৎবাবু অত্যন্ত ব্যস্ত ও দ্রুতপদে ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। কোন প্রশ্ন করিবার পূর্বেই আমি কহিলাম।

—একটুখানি বাইরে গেছেন, এখুনি ফিরে আসবেন। আপনার বাড়ি থেকে ফোন করছিলেন। কি হল, ব্যাপার কি?

সুরজিৎবাবু প্রায় টলিতেছিলেন, বসিয়া পড়িলেন। কহিলেন জানিনে। অত্যন্ত অসুস্থ। কি হবে জানি নে। ফিরতে খুব দেরি হবে?

—না, এই এখুনি এসে যাবেন।

বলিতে বলিতে ডাক্তারের গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। সুরজিৎবাবু এক সঙ্গে দরজার গিয়া দাঁড়াইলেন। ডাক্তার ক্ষিপ্রপদে প্রবেশ করিতেছিলেন, দুই জনে প্রায় ধাক্কা লাগিবার উপক্রম। ডাক্তার তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, কি ব্যাপার, অসুখ বেড়েছে? সুরজিৎবাবু কষ্টে উচ্চারণ করিলেন, হ্যাঁ।

সুরজিৎবাবু মাথা নাড়িয়া বুঝাইলেন, হ্যাঁ।

ঠিক আছে। একমিনিট।

ডাক্তার কলিং বেল টিপিলেন, আমার দিকে চাহিয়া ছিলেন, বসু। সুরজিৎবাবুকে কহিলেন, ট্যাকসি আপনি এনেছেন?

—হ্যাঁ।

—ছেড়ে দিন। গাড়িতে যাব।

ডাক্তার দ্রুতপদে বাথরুমে ঢুকিলেন, মিনিট খানেকের মধ্যে ভিজা তোয়ালে হাতে ঘাড় মুখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া আসিলেন। ভৃত্য আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার হাতে তোয়ালেটা দিয়া, তাহাকে দু'একটা কথা বলিলেন, একগ্লাস জল চাহিলেন, ছোট একটি ব্যাগ তুলিয়া লইয়া কহিলেন, চল। দুইজনে যখন রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখনও ট্যাক্সি গেট পার হয় নাই।

সুরজিৎবাবুকে কহিলেন, আমার পাশে বসুন, পথ চিনিয়ে দেবেন। আমি পিছনের সীটে বসিলাম। গলি হইতে বড় রাস্তায় পড়িয়া ডাক্তার কহিলেন, এবার বলুন, যেতে যেতে শুনে নিই। কি হয়েছে?

সুরজিৎ বাবু কহিলেন, কি হয়েছে মশাই জানেন।

—আঃ, কি দেখলেন তাই বলুন।

ঢোক খাইয়া সুরজিৎ বাবু একটু শান্ত হইলেন, তাঁহার আবেগটা অস্থিরতায় দাঁড়াইতেছিল, যাহার নাম হিস্টিরিয়া। কহিলেন, বলছি। আপনার এখান থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়িতে যাইনি আমি—একটা দোকানে একবার গিয়েছিলাম। বাড়ি পৌঁছলাম, তখন ছটা বাজে। গিয়ে দেখলাম, তাই বাড়িতে নেই, বিকেল থেকে কোথা বেরিয়েছে। অথচ শুনলাম, সামান্য জ্বর চলছিল, দিন চারেক প্রায় না নেয়েই আছে। অসুস্থ শরীরে বেরিয়েছে, 'সন্ধ্যা পেরিয়ে যায়, কোথায় খোঁজ করব জানিনে। বাড়ীর লোককে বলছি কেন বেরুতে দিলে।

বলতে বলতেই সে ফিরে এল, সোজা নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। বৌমা বোধহয় তাকে বলছেন আমি এসেছি। মিনিট দশেক পরে আমার ঘরে এসে বসল। কথা বলছি এটা সেটা, হঠাৎ দেখি কথা বলতে বলতেই সে কিরকম ঝিমিয়ে পড়ছে। কথা ভয়ানক জড়িয়ে যাচ্ছে, উচ্চারণ বোঝাই যাচ্ছে না মাঝে মাঝে; চোখের পাতা অসম্ভব ভারী, যেন টেনেও মেলতে পারছে না চোখ; হাত পায়ের স্থিরতা নেই। বসে বসে টেবিল থেকে ঘড়ি তুলে দেখতে গেল কটা বেজেছে, তা সে ঘড়িটাই যেন চোখে ঠাওর পাচ্ছে না, হাত বাড়িয়ে সেটাকে ধরতে যাচ্ছে ধরতে পারছে না। হাত এলোমেলো হয়ে একবার ঘড়ি এদিকে পড়ে একবার ওদিকে পড়ে। দেখে ভাবলাম খুব দুর্বলতায় আর ঘুম পেয়ে বোধ হয় এমন হচ্ছে। তখন বললাম, যা, শুয়ে পড়ুগে, কথা কাল হবে।

দু'বার বললাম, তিন বার বললাম, শুনতেই পায় না। তার পর শুনতে পেলে, উঠতে যাচ্ছে উঠতে পারছে না,

চেষ্টা করেও ধরে বসে পড়ছে। তারপর অতি কষ্টে উঠল, হাত ঠিক থাকে তো পা ঠিক থাকে না। এমনি করে দোতলা ঘরে ঘরে ঘুরপাক খেতে খেতে কোন রকমে ঘর অবধি গিয়ে পৌঁছল, চুপ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

—কত দূরে, তার ঘর?

—মাঝখানে একটা বারান্দা পার হয়ে। একতলা বাড়ি।

—তার পর?

—তখন হঠাৎ আমার খটকা লাগল। উঠে গেলাম। খাটের ওপরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, যে অবস্থায় পড়েছিল সেই অবস্থায়ই; নড়ে চড়ে দিব্যি হয়ে শোয়ার মতও হঁস নেই। বউমা পাশে দাঁড়িয়ে। তাঁকে বললাম, একি হল, এরকম করছে কেন? সে বললে, কপাল! বলে কেঁদে ফেললে।

—হুঁ। তার পর? কি করলেন? নেশা করেছে বলে সন্দেহ হল?

—হল এক বার। কিন্তু মুখ শুঁকে দেখলাম, কোন গন্ধ-টন্ধ পেলাম না।

—কিসের গন্ধ?

—ধরুন, মদের। বা গাঁজা-চরসের।

—সব নেশার গন্ধ চেনেন?

—না।

—বলে যান।

—আর কি বলব। তাকে ডেকে, ঠেলে, বার বার জিজ্ঞেস করলাম, কি হল তোর? কথার জবাব দেয় না। এক বার জড়িয়ে জড়িয়ে কি বললে, কিছু বুঝতে পারলাম না। বউমাকে বললাম, এরকম হল কেন?

সে শুধু কেঁদেই চলল।

তখন চট্ করে আপনার কথা মনে পড়ল। পাশের বাড়িতে কোন আছে, সে আবার তাদের বাড়ির ভেতরে। ইতিমধ্যে মা চলে এসেছেন, বোনরা এসেছে, চাকর ঠাকুর এসেছে। তাদের বললাম, সামলাও, মাথায় জল দাও। বউমাকে বললাম, আমার সঙ্গে চল। সে বাড়িতে গিয়ে দু'বার, তিন বার লাইন চাই, লাইন পাই নে। তখন বউমাকে বললাম, তুমি থাক, লাইন পেলে বলে দেবে আমি যাচ্ছি। বলে আমি সেই বাড়ি থেকেই বেরিয়ে, ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে এসেছি। এতক্ষণ কি ঘটেছে কে জানে।

ডাক্তার শান্ত কণ্ঠে কহিলেন, কিছুই হয় নি। আর কতটা?

—এই তো, এসে গেলাম।

ইতিমধ্যে কলিকাতা শহরের প্রায় সমস্তটাই পার হইয়া আসিয়াছি। শীত-রাত্রির নির্জন রাস্তা, ডাক্তার-বাবুর বেগে গাড়ি ছুটাইয়াছেন। উপকণ্ঠের নবনির্মিত পল্লী, রাস্তাগুলি তখনও বিজি হয় নাই। বারান্দা হইতে একটি সরু গলি বাহির হইয়াছে, গলির মধ্যে কিছুদূর গিয়া গাড়ি থামিল। ছোট একটি একতলা বাড়ি, নূতন, ছোট কিন্তু ভারি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। সুরজিৎবাবু প্রায় দৌড়িয়া গিয়া ঘরে ঢুকিলেন, আমরা দ্রুতপদে তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

প্রথমে একটি হল ঘর, তাহার পাশে একটি ঢাকা বারান্দা। বারান্দা পার হইয়া রোগীর ঘর। এক পাশে, প্রচুর আলো হাওয়া, জানালার বাহিরে ছোট ফুলের বাগান, হাস্নাহানার গন্ধে ঘর পরিপূর্ণ।

বিছানায় উপরে রোগী শুইয়া। মুখ কি ভঙ্গী বোঝা যায় না। চক্ষু বোজা, দেহ শক্ত ও কিছু অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে শয়ান, শ্বাস অ-সমান। প্রথম দৃষ্টিতেই ডাক্তারের একটি কথা আমার মনে পড়ল—সমস্ত দেহটা ও মুখখানাকে দেখিয়া মনে হয়, যেন কিসে ইহার সমস্ত জীবনীশক্তিকে ভিতর হইতে টানিয়া শুষিয়া লইতেছে।

মাথার কাছে, পাখা হাতে একটি বয়স্কা মহিলা, অত্যন্ত শান্ত ও ধীর বুদ্ধি, দেখিলেই মনে হয় নিঃশব্দে থাকা সহিবার প্রচণ্ড ক্ষমতা রাখেন। পাশে দুইটি মেয়ে। তরুণী বলা চলে। মা ও দুই বোন, সহজেই বুঝিলাম। পায়ের দিকে, দশাসই খুঁটি ধরিয়া একটি বিবাহিতা মেয়ে নিশ্চল দাঁড়াইয়া, স্ত্রী। ঘরের অন্য দিকে আরেকটি মহিলা। বিবাহিতা, বয়স কিছু বেশী, সুরজিৎবাবুর স্ত্রী বলিয়া অনুমান হইল।

ডাক্তার ঘরে ঢুকিয়াই ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে সকলের দিকে একবার তাকাইয়া লইলেন, তারপর অগ্রসর হইয়া রোগীর পাশে দাঁড়াইলেন। তাঁহার নিকটে থাকিয়া অনেক সময়েই সেটা অনুভব করিয়াছি তখনও সেই অনুভূতিটাই আমার স্পষ্ট হইল, যেন আশপাশের সকল মানুষের উপরে একটা আশ্বাসের প্রবাহ তিনি ছড়াইয়া দিতে জানেন। তিনি রোগীর পার্শ্বে দাঁড়াইলেন; তাঁহার দিকে চাহিয়া রোগীর মাতা, ভগিনী, স্ত্রী, ভ্রাতৃবধূ, প্রত্যেকেই যেন কিছু ভরসা ও নির্ভর খুঁজিয়া পাইয়াছেন—এমনই একটা ভাব তাঁহাদের মুখে চোখে ফুটিয়া উঠিল। ডাক্তার একটিও কথা উচ্চারণ করিলেন না, অত্যন্ত দ্রুত হস্তে একটির পর একটি পরীক্ষা করিয়া চলিলেন। রোগীর নাড়ির গতি দেখিলেন, স্পন্দন পরিলেন, শ্বাস পরিলেন, স্টেথোস্কোপ দিয়া হার্ট দেখিলেন, চোখের পাতা খুলিয়া দেখিলেন। চোখের তারার উপরে টর্চের আলো ফেলিয়া, আমাকে ইঙ্গিতে কহিলেন, দেখ। ঝুঁকিয়া চাহিয়া দেখিলাম, তারা অত্যন্ত বিস্ফারিত—প্রায় মণির সমান সমান। আলো লাগিয়া তারার মধ্যখান যেন থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তারপর ক্রমে ক্রমে তাহার মাথার চুল, মুখগহ্বর, হাত ও পায়ের পাতা এবং আঙুল টিপিয়া টানিয়া, খুলিয়া ও মুড়িয়া দেখিলেন।

প্রায় দশ মিনিট ধরিয়া ডাক্তার রোগীকে পরীক্ষা করিলেন, এই দশ মিনিটকাল ঘরের মধ্যে কাহারও শ্বাসের শব্দ পর্যন্ত শোনা গেল না, একমাত্র রোগীর ব্যতীত। তাহার শ্বাস অসমান, একটা দীর্ঘ একটা হ্রস্ব, কোনটা সহজে পড়ে কোনটা যেন আটকাইয়া যায়। পরীক্ষার শেষে ডাক্তার, পায়ের কাছে দাঁড়ানো রোগীর স্ত্রীর দিকে চাহিলেন, চকিতে চক্ষু ফিরাইয়া রোগীর মাতাকে প্রায় অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করিলেন, বউমা? তিনি ঈষৎ মাথা হেলাইয়া জানাইলেন, হাঁ।

ডাক্তার বধূটির দিকে দুই পা আগাইয়া গেলেন, অত্যন্ত মৃদু অথচ স্পষ্ট স্বরে প্রশ্ন করিলেন, কি খায়?

বধূ মেয়েটি চক্ষু তুলিয়া তাঁহার দিকে তাকাইলেন, কথা কহিল না।

ডাক্তার মাথা ঈষৎ ঝুঁকাইলেন, আরও মৃদুস্বরে প্রশ্নের সুরে কি একটা ইংরাজী শব্দ উচ্চারণ করিলেন—কথাটা আমি ধরিতে পারিলাম না।

মেয়েটির মুখশ্রী ঈষৎ চকল হইল, মাথা নাড়িয়া আভাসে জানাইল, হাঁ।

ডাক্তার রোগীর মুখের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। সুরজিৎবাবু ও আমি একটু পিছনে দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইয়া, মৃদুকণ্ঠে সুরজিৎবাবুকে কহিলেন, কি নাম?

সুরজিৎবাবু তেমনই মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, অরিজিৎ। ডাক নাম অনু।

ডাক্তার হাত বাড়াইয়া তাহার বাহু ধরিয়া নাড়া দিলেন, মৃদু অথচ তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকিলেন, এই! অনু!

দুই বার, তিন বার ডাকিবার পর রোগী সাড়া দিল উঁ।

কাইল কোথায়?

রোগী চুপ। ডাক্তার আবার ডাকিলেন, অনু! তারপর হঠাৎ অত্যন্ত কর্কশকণ্ঠে ধমক দিয়া কহিলেন, কোথায় শিশি? বলো। সে ধমক এমন অতর্কিত ও এত তীব্র, যে সকলেই আমরা চমকাইয়া উঠিলাম।

রোগীও চক্ষু মেলিল, অত্যন্ত বিহ্বল, নিষ্প্রভ দৃষ্টি মেলিয়া কহিল, উঁ!

—কোথায় রেখেছ শিশি? বলো।

রোগী জড়াইয়া জড়াইয়া কহিল, নেই।

—ডাক্তার একেবারে গর্জন করিয়া উঠিলেন, মনে হইল সে বাঘের গর্জন। কহিলেন, আছে। বলো বলছি। কোথায় রেখেছ?

রোগী কথা কহিল না, চক্ষু বুজিল, একটা হাত বাড়াইয়া মাথার দিকে তোষকের কোনটা খামচাইয়া তুলিবার ভঙ্গি করিল, তারপর আবার নির্জীবের মত মেলাইয়া পড়িল।

ডাক্তার সংক্ষেপে কহিলেন, সরুন।

রোগীর মাতা নিঃশব্দে সরিয়া বসিলেন। ডাক্তার এক হাতে রোগীকে ঠেলিয়া ঘুরাইয়া দিলেন, অন্য হাত তোষকের তলায় চালাইয়া কি খুঁজিতে লাগিলেন।

প্রথমে পাইলেন না, তারপর হাতের মধ্যে কি একটা খণ্ড মুঠা করিয়া ধরিয়া লইয়া হাত তুলিয়া আনিলেন। রোগীকে আবার টানিয়া কিরাইলেন, আবার সেইরূপ গর্জন করিয়া কহিলেন, আর কোথায় আছে?

রোগী আবার একবার চক্ষু চাহিল, কহিল আর নেই।

—ঠিক?

—ঠিক।

—ক'টা খেয়েছ?

রোগী জড়াইয়া জড়াইয়া কহিল, চারটে।

—আর নেই দিব্যি?

—না।

—মিথ্যে কথা।

রোগী হঠাৎ চক্ষু মেলিয়া চাহিল, মনে হইল চোখে একটু দৃষ্টি ফিরিয়াছে। অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট স্বরে কহিল, মিথ্যে বলি না।

ঠিক বলছ। আর নেই?

—নেই। ঠিক বলছি।

ডাক্তার হঠাৎ গলা নামাইলেন, শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, ঘুমোও।

ইহারা সকলেই নিস্তব্ধ। ডাক্তার কহিলেন, ভয় নেই, ঠিক হয়ে যাবে।

সুরজিৎবাবুর স্ত্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, দুধ আছে?

—আছে।

—আনুন। অল্প গরম, এক কাপ।

ডাক্তার ব্যাগ খুলিলেন, গ্লাসে ঔষধ প্রস্তুত করিলেন। দুধের সঙ্গে ঔষধটা মিশাইয়া, নিজের হাতে রোগীকে খাওয়াইয়া দিলেন।

রোগী একই ভাবে শুইয়া। মিনিট দশেক পরে মনে হইল তাহার শ্বাসের কষ্টটা কমিয়াছে, শ্বাস সহজ ও স্বচ্ছন্দ হইয়াছে। ডাক্তার আবার তাহার নাড়ী, হৃৎস্পন্দন প্রভৃতি পরীক্ষা করিলেন। আরও দশ মিনিট পরে আবার একবার। তারপর কহিলেন, আর ভাববার কিছু নেই। এখন সারারাত ঘুমুবে। একজন শুধু কাছে জেগে থাকবেন, তা হলেই হবে। জল চাইবে, জল বা শরবৎ দেবেন।

সুরজিৎবাবু কহিলেন, ওষুধ?

—এখন আর নয়। আমি এবার চলব। কাল সকালে একবার আসবেন আমার ওখানে।

সুরজিৎবাবুর মা এবার কথা কহিলেন, আপনি আজ রাতটা থেকে যাবেন?

ডাক্তার স্নিগ্ধ হাসি হাসিলেন। কহিলেন, কিছু দরকার নেই। কাল উনি গেলেই হবে। একটু থামিয়া কহিলেন, দরকারও নেই, তা ছাড়া আমার একটু ঘুমুতে হবে। আজ দুশো মাইল গাড়ি হাঁকিয়েছি; এটা হল তার ওপরে কাট।

আমি কহিলাম, সে কি!

—হ্যাঁ। তিনটেয় এসে বাড়ি পৌঁছেচি, আনতায় চারটেয় তোমরা আসবে। আচ্ছা ভাই, চলি। কাল যাবেন কিন্তু, ঠিক আটটায়। এদের নিয়ে যাবেন। বলিয়া, রোগীর স্ত্রীকে ও বোনদের মধ্যে একটিকে দেখাইয়া দিলেন। সুরজিৎবাবু কহিলেন, ওদের নিয়ে?

—হ্যাঁ। রোগী সামলাতে হবে ওদেরই।

আর নয়। চললাম।

গাড়িতে উঠিয়া বসিলাম। সুরজিৎবাবু গাড়ির পাশে দাঁড়াইয়া, ব্যাগ বাহির করিলেন: আপনার?

ডাক্তার কহিলেন, পরে। আগে রোগী সুস্থ হোক। আর, শুনুন, আজকের কথা কাল সকালে ওর কিছু মনে থাকবে না। মনে করিয়ে দেবেন না, সবাইকে বলে দেবেন। আচ্ছা, চলি।

গাড়ি বড় রাস্তায় পড়িল। আমি কহিলাম, ব্যাপারটা কি? ওটা কি বার করলেন বিছানার তলা থেকে?

ডাক্তার কহিলেন, বাড়ি গিয়ে।

সারাটা পথ আর একটিও কথা হইল না।

ডাক্তার একেবারে নিঃশব্দে গাড়ি চালাইতে

লাগিলেন, বুঝিলাম তিনি গভীর চিন্তামগ্ন। আমিও কথা বলিয়া তাঁহার চিন্তার ব্যাঘাত করিলাম না।

বাড়িতে আসিয়া, ডাক্তার পকেট হইতে একটি ছোট শিশি বাহির করিলেন। এ্যালুমিনিয়ামের শিশি, ইঞ্চি দেড়েক লম্বা, গোল, প্যাচ-কাটা ঢাকনি শিশির গায়ে রঙীন অক্ষরে কি-সব লেখা, কিন্তু তাহা পড়িতে পারিলাম না। শিশি খুলিয়া ডাক্তার কতকগুলি বড়ি টেবিলে ঢালিয়া ফেলিলেন, সংখ্যা আবার তুলিলেন, অস্ফুট স্বরে কহিলেন, দশটা! ভেরি গুড!

আমি কহিলাম, কি ওটা?

ডাক্তার একটি বড়ি আমার হাতে দিলেন। মাঝারি রকমের গোল চ্যাপ্টা বড়ি, কিছু হলদে-আভাযুক্ত ছাই-ছাই রং। নামটাম লেখা নাই, এক পিঠে শুধু II অক্ষরটি ছাপ মারা আছে।

কহিলাম, কি এটা? কি নাম?

ডাক্তার কহিলেন, নাম শুনে কি করবে?

—II মানে? নিশ্চয়ই নামের অক্ষর?

—না। ওটা সাংকেতিক মার্কা। ওর মানে হচ্ছে, ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপশন ছাড়া বিক্রি হবে না।

—কারণ?

—কারণ, জিনিসটা বিষাক্ত, অহেতুক বা অতি মাত্রায় ব্যবহার করলে বিপদ ঘটতে পারে। অবশ্য ও-সতর্কতায় বিপদ এড়ায় না, ডাক্তারেরই যা লাভ।

—ডাক্তারের কি লাভ?

—লাভ? প্রেস্‌ক্রিপশন লেখার মজুরি। যাও।

—হাত বাড়াইয়া বড়িটা তাঁহার হাতে দিলাম। কহিলাম, কিন্তু কিছুই তো বুঝতে পারলাম না।

ডাক্তার কহিলেন, এখন নয়। পরে বুঝিয়ে দেব।

পরদিন আটটার কিছু পূর্বেই সুরজিৎবাবু তাঁহার ভগিনী ও ভ্রাতৃবধূকে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার ও আমি অপেক্ষা করিয়া ছিলাম। সকলকে পাইয়া ডাক্তার কহিলেন, আপনাদের কয়েকটা প্রশ্ন করব আমি। সুরজিৎবাবু ঘুরে থাকেন, সব কথা আপনার জানা না থাকতে পারে, তাই এঁদের আনতে বলেছি। অবশ্য, কথাগুলো আপনাদের ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে। হয়তো মনে হবে আমার অনধিকার চর্চা। মনে যদি হয়, আমার বলবার কিছু নেই।

সুরজিৎবাবু কহিলেন, না না, মোটেই না। কথা যাই হোক, নিশ্চয়ই ওর রোগ এবং চিকিৎসার সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে?

—তা না থাকলে আমিই বা সে নিয়ে মাথা ঘামাব কেন। সম্পর্ক আছে বলে আমার ধারণা, অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক বলেই সন্দেহ। কিন্তু এখনই এই মুহূর্তে তার সবটা বুঝিয়ে বা খোলাখুলি ব্যাখ্যা করে বলতে পারব না।

সুরজিৎবাবু একবার ভগিনী ও ভ্রাতৃবধূর দিকে তাকাইলেন। তারপর কহিলেন, তা হোক। আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা আমি প্রিয়লালবাবুর মুখে শুনেছি, আপনার ওপরে তাঁর অগাধ বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের জোরে আমিও ছুটে এসেছি আপনার কাছে—আপনি ওকে বাঁচাবেন আমাদের বাঁচাবেন, এই আশা নিয়ে। আপনি যা ইচ্ছে প্রশ্ন করুন, আমরা যতদূর জানি উত্তর দেব।

—এঁরা?

বোন কহিলেন, আমরাও দেব। ছোড়দার যাবি আপনি আমরা না বলতেই ধরে ফেলেছেন, তাকে সারাতেও আপনিই পারবেন।

ডাক্তার ঈষৎ হাসিলেন। কহিলেন, ধরে ফেলেছি?

—হ্যাঁ। আমার মনে এ সন্দেহ বহুদিন আগেই হয়েছিল, ওরও। কিন্তু কিছুতেই তাকে বলে বলে বোঝাতে পারি নি, বলতে গেলে হয় কথা এড়িয়ে গেছে নয় ত চটে উঠেছে। কি থেকে আবার কি হবে, ভেবে আমরা চুপ করে থেকেছি।

ডাক্তার হঠাৎ আমাকে কহিলেন, হাতটা বাড়াও তো, কোনটা নামিয়ে রাখ স্ট্যাণ্ড থেকে।

আমি কোনটা নামাইলাম, কহিলাম, কেন ?

—কেউ শান্তিভঙ্গ না করে।

সুরজিৎবাবু কহিলেন, কিন্তু ব্যাপারটা তো আমিই ঠিক বুঝতে পারছি না।

ডাক্তার কহিলেন, পারবেন না, কারণ আপনি অনেক জিনিস জানেন না—দূরে থাকেন, কচিৎ আসেন। সেও সে সময়টা কিছু সামলে থাকে। এবার ধরা পড়ে গেছে।

সুরজিৎবাবু বিমূঢ়। তাঁহার বোন কহিল, তুমিও একেবারে জান না তা নয়, শুনেছ। বউদি বলেছে তোমাকে। বিশ্বাস কর নি।

ডাক্তার কহিলেন, তোমার নাম কি ?

—করুণা।

বধূটি কহিল, আমার নাম সুমিত্রা।

ডাক্তার কহিলেন, বেশ। কি বলেছে ? ওর সেই ওষুধ খাওয়া ?

করুণা কহিল,—হ্যাঁ। তাই নিয়েই সব। তোমরা পণ্ডিত লোক, অনেক জান, তাই যেটা জান না সেটাও জান বলে ভেবে নাও। আমরা কম জানি বলেই বোধ হয় অনেক কথা সহজে বুঝে ফেলি।

সুরজিৎবাবুর মুখে একটা অত্যন্ত অসহায় ভঙ্গি ফুটিয়া উঠিল। কহিলেন, কিন্তু সত্যি বলছি, আমি সে কথাটাকে মোটেই সীরিয়াস বলে ভাবতে পারি নি।

ডাক্তার কহিলেন, সেটা পুরোপুরি আপনার অপরাধ নয়। অনেকেই পারে না। কারণ আপনাদের ঠকাচ্ছে যারা তারা আপনাদের চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান। সে যাক্। এবার, আগে আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। তারপরে আমার যা বলবার আছে বুঝিয়ে বলব।

আমি কহিলাম, আমি তা হলে ও-ঘরে গিয়ে বসি।

করুণা কহিল, কিছু দরকার নেই।

সুরজিৎবাবুও কহিলেন, না, আপনি থাকুন।

—বেশ। ডাক্তার কহিলেন, আমার প্রথম প্রশ্ন আপনাদের পরিবার নিয়ে। আপনারা ভাই দু'জন, কাল বলেছেন। বোন ?

বড়রা বিবাহিত। এই দুটিই বাকি। করুণা এম্. এ. পড়ছে। ছোটটি আই. এ.।

—যাকে কাল দেখলাম। কাকা-টাকা ?

—আছেন, এখানে থাকেন না।

—এ বাড়িতে তা হলে শুধু আপনারাই ?

—হ্যাঁ। তাও, আমি তো অন্যত্রই থাকি প্রায় সারাবছর, ছুটি-ছাটায় আসি। আমার স্ত্রীও সেখানেই থাকেন সাধারণতঃ; এবার হঠাৎ কিছুদিন থেকে এসে আছেন—।

—কেন ?

—তাঁর মামার বাড়িতে এক বিয়ের ব্যাপারে ছিল। আমি টেস্ট-পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত তাই একাই চলে এসেছেন। তারপর দোষ মাস পড়ল বলে আর যাওয়া হয় নি।

—ভালোই হয়েছে, কিছু লোকবল বেড়েছে। বাড়িতে আর লোকজন নেই ?

—দূর-সম্পর্কের আত্মীয় স্বজন আছে দুএকজন। আর, ঝি চাকর। নিজেদের পরিবার এই পর্যন্তই।

—আপনাদের আদি দেশ কোথায় ? কলকাতায় ?

—না। নর্থ বেঙ্গলে, রাজশাহীতে। ঠাকুরদা প্রথম দেশ ছেড়ে চলে এসেছিলেন, সে আমাদের জন্মেরও ঢের আগে। এখন আর যোগাযোগ নেই বিশেষ। জ্ঞাতিরা আছেন সেখানে, আমরা তাঁদের নাম জানি তাঁরা আমাদের নাম জানেন, অশৌচ পড়লে খবর পাই, এই পর্যন্ত।

—এ বাড়ি কতদিনের ?

—অর্ধদিন। সাত আট বছর।

—বাড়ি আপনার ভাইয়ের নামে, কাল বলেছেন। একেবারেই ? আপনার অরেক্ট ইন্টারেস্ট কিছু নেই ?

—না।

—কার টাকায় হয়েছে বাড়ি ? তাঁর রোজগারে ?

—না, টাকা সবই আমি দিয়েছি। বাড়ি যখন হল তখন সে তো মোটে বেরুচ্ছে কোর্টে।

—তা হলে আপনার ইন্‌টারেস্ট কিছু রাখেন নি কেন ?

—ইচ্ছে করেই। জমি যখন বাড়না করা হয়, ও নিজেই দু'জনের নামে করিয়েছিল। আমিই বদলে একা ওর নামে করাই।

—কেন ? ভবিষ্যতে তো দুই ভাইয়ে বনি-বনা না হতে পারে ?

—সেই ভয়েই। ভয়েন্ট ইন্‌টারেস্ট রাখলে ভবিষ্যতে পার্টিশনের কথা উঠতে পারে, আমাদের মধ্যে বা আমাদের দু'জনের ছেলেদের মধ্যে। সে সম্ভাবনা আমি রাখতে চাই নি।

হুঁ। বাড়ির দলিল তা হলে ওরই একার নামে। প্ল্যান-টানও সব নিশ্চয়। সে কাগজপত্র কোথায়, বাড়িতেই আছে, না উকিলের কাছে ?

সুরজিৎবাবু ভ্রাতৃবধূর দিকে চাহিলেন। সে মৃদুস্বরে কহিল, ব্যাঙ্কে।

সুরজিৎবাবু কহিলেন, ব্যাঙ্কে লকার আছে, ওদের দু'জনের নাম। সেইখানেই থাকে, সব দরকারি কাগজপত্র। আমার কাগজপত্রও আছে।

—আছে তো ঠিক ?

—যাবে কোথায় ?

—তাই ত কথা। আচ্ছা লকার আছে যখন, ওর নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও আছে নিশ্চয়ই। তাতে কত টাকা আছে ?

—তা ঠিক জানিনে। তবে, বছর দুই আগে আমি একটা লটারি পেয়েছিলাম, তার থেকে পাঁচ হাজার টাকা থোক ধরে ওর হাতে দিয়েছিলাম। সেটা নিশ্চয়ই আছে, ফিক্‌স্ট ডিপোজিটে।

সুমিত্রা মৃদুস্বরে কহিল, নেই।

—নেই ? কি হল ?

—তা জানি নে। বলেন না। নেই জানি।

—আমাকে বল নি তো !

—দিদিকে বলেছি। দিদি বললেন, তুমি এ নিয়ে আলোচনা কোরো না। আপনাকে তিনি বলবেন বলেছিলেন।

ডাক্তার কহিলেন, তবে থেকে জান, নেই ?

—এবার জুন মাস পর্যন্ত ছিল ডিপোজিট। তখন তুলে নেওয়া হয়েছে। আর রাখেন নি।

—অন্য ব্যাঙ্কে যদি রেখে থাকেন ?

—বলেন নি তো সে-রকম।

—কি বলেছে ?

—কিছু বলেন নি। শুধু বলেছেন, তোমার জানবার দরকার নেই।

সুরজিৎবাবু কহিলেন, এসব কি কথা, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি নে।

ডাক্তার কহিলেন, আমি বোধ হয় পেরেছি বুঝতে।

রুকথা কহিল, বড় কিনা। বড়রা একটু লেটে বোঝে।

ডাক্তার কহিলেন, তার বন্ধুবান্ধব যারা, চেনেন বা জানেন ? বিশেষ যারা অন্তরঙ্গ ?

সুরজিৎবাবু কহিলেন, আমি কাউকেই চিনি নে। উকিল মানুষ, কোর্টের সূত্রে অনেকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবার কথা, তাছাড়া, তার ক্লাব আছে, খেলাধুলা আছে—

—আছে ?

—ছিল একসময়ে। এখন সব ছেড়েছুড়ে দিয়েছে। কিন্তু তখনকার চেনা-জানা বন্ধুরা হয়তো আছে এখনও।

ডাক্তার মেয়েদের দিকে চাহিলেন।—তোমরা জানো ? তাহারা উত্তরেই মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

—বেশ।

ডাক্তার নতমুখে কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। তারপর কহিলেন, শুনুন ! অসুখ কি হয়েছে, আমি বুঝেছি। তাকে সারিয়ে দেবার চেষ্টাও আমি করব। কিন্তু আপনাদের একেবারে বিনা বিচারে আমি যা বলব করে যেতে হবে। কোন কারণও জিজ্ঞাসা করতে পাবেন না।

সুরজিৎবাবু কহিলেন, কোন বিপদ নেই তো ?

—বিপদ ? ডাক্তার হাসিলেন ; বিপদ তো অনেক রকমই হয়ে থাকে মানুষের। বিপদের আশঙ্কা আছে

নিশ্চয়ই, কিন্তু সেটা কোন্ দিকে এবং কতখানি, তার সবটা এখনই বলতে পারছি নে। যা হোক, আমার যা সাধ্য আমি করব। কিন্তু ওই শর্ত—বিনা তর্কে আমার নির্দেশ মানতে হবে। রাজী?

তিনজনে প্রায় একই সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, হ্যাঁ রাজী।

—মা রাজী হবেন?

করুণা কহিল, তিনি রাজী হয়েই আছেন, কাল রাত্রেই বলেছেন আমাকে।

—কি বলেছেন?

—বলেছেন, এই লোক পারবে ওকে বাঁচাতে।

—বাঃ, শুনে খুশি হলাম। তাহলে এবার আপনাদের যা যা কর্তব্য, বলি।

সুরজিৎবাবু কহিলেন, কিন্তু, একটি কথা। যার চিকিৎসা, সে রাজী হবে তো?

ডাক্তার কহিলেন, তার রাজী না-রাজীতে যায় আসে না কিছু। আপনারা শুনে নিন। প্রথম কথা হচ্ছে, আমার সঙ্গে আপনাদের কোন সম্পর্ক আছে, এমনকি পরিচয়ও আছে, একথা আজ এই মুহূর্ত থেকে একদম ভুলে যাবেন। আপনাদের বাড়িতে আমার নাম নিয়ে কোন আলোচনা করবেন না, নিজেদের মধ্যেও না। আমার নাম ঠিকানা লেখা সে কাগজটা কোথায়?

করুণা কহিল, বউদিকে দিয়ে এসেছি। হঠাৎ যদি কোন দরকার হয়, কোন করবেন, তাই।

—গিয়েই উনুনে ফেলে দেবেন সেটাকে। দরকার হলে যোগাযোগের ব্যবস্থা আমিই করে নেব।

—আচ্ছা।

—আত্মীয়স্বজন বাইরের যারা আছে, দরকার হলে অন্যত্র পাঠিয়ে দেবেন। সেরকম দরকার হলে আমি জানিয়ে দেব।

—আচ্ছা।

—নতুন কি চাকর রাখবেন না, এখন মাস দুতিন অন্তত।

—বেশ। তিনজনের উত্তর প্রায় একই সঙ্গে হইতেছিল।

—ওকে আমার জিম্মায় এনে নেব। চিকিৎসা করব আমি আমার নিজের হাতে রেখে। অন্ততঃ তিন মাস। তার মধ্যে আপনারা তাকে দেখতে পাবেন না, জানতেও চাইবেন না কোথায় কেমন আছে। কেমন আছে খবর পাবেন, প্রিয়লালের মারফৎ, কিন্তু অন্য কেউ জানতে পাবে না। কোথায় আছে আপনারাও জানতে পারবেন না।

সুরজিৎবাবু ও করুণা বিধাভরে চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু সুমিত্রা বিনা দ্বিধায় স্পষ্ট স্বরে কহিল, রাজী।

করুণা তাহার দিকে চাহিল, কহিল, ক্যারেড্। আমরাও রাজী।

ডাক্তার ঘড়ির দিকে চাহিলেন। কহিলেন, ন'টা বেজে দশ। এবার আপনারা উঠুন। আমি রাত্রে আবার খবর দেব। চলেও যেতে পারি। কিন্তু সুমিত্রা, তুমি আজই একবার ব্যাঙ্কে যাবে। লকারে কি কি আছে, সব জানো?

—লিস্ট আছে।

—বেশ। যাবে, সব মিলিয়ে দেখবে, কি আছে আর কি নেই। বিশেষ করে বাড়ির দলিলপত্রগুলো সব আছে কি না। আজ রাত্রে আমি খবর জানতে চাই।

করুণা কহিল, আমরা দু'জনে যাব, ব্যাঙ্ক হয়েই বাড়িতে পৌঁছব। ব্যাঙ্ক থেকেই আপনাকে ফোন করব।

—না, আমি থাকব না বাড়িতে। রাত্রে বোলো, তা'হলেই হবে।

আমরা তাহলে যাই?

তাহারা দুইজনে বাহির হইয়া গেল।

ডাক্তার সুরজিৎবাবুকে কহিলেন, আপনি একটু বসুন। কয়েকটা কথা আরও বলতে বাকি আছে আপনাকে। আমাকে কহিলেন, কোনটা তোল, এই

নম্বরটা দাও। বলিয়া একটা নম্বর লিখিয়া আমার হাতে দিলেন।

আমি ফোন তুলিয়া নম্বরটা চাহিলাম, শুনিলাম, এনগেজ্‌ড্‌। ফোন নামাইয়া বলিলাম, দু'তিন মিনিট পরে আবার দেখব।

কিন্তু নামাইয়া রাখিবার পরক্ষণেই ফোন বাজিয়া উঠিল। আমি তুলিয়া লইয়া কহিলাম, হ্যালো, কে?

—অত্যন্ত চকল কিন্তু চাপা নারীকণ্ঠে উত্তর আসিল, ডাঃ বোস?

—হ্যাঁ।

—আমি মিনতি, মানে সুরজিৎবাবুর স্ত্রী। ওঁরা আছেন?

—আছেন। কেন, বলুন।

—ঠাকুরপোকে পাওয়া যাচ্ছে না।

—সে কি?

—ডাক্তার কহিলেন, কে?

নিরুদ্বিগ্ন। বলিয়া আমি হাত বাড়াইয়া ফোন তাঁহার হাতে দিলাম। ডাক্তার ফোন ধরিয়া কহিলেন, হ্যাঁ, আমি ডাক্তারবাবু। মিনিট খানেক নিঃশব্দে শুনিলেন, তারপর কহিলেন, ঠিক আছে। আপনি বাড়ি যান, আমরা চলে আসছি এক্ষুনি। ফোন রাখিয়া কহিলেন, চলুন।

সুরজিৎবাবু কহিলেন, কি হল?

তিনজনে আসিয়া গাড়িতে উঠিলাম। তাহার মধ্যেই ডাক্তার দ্রুত সংক্ষিপ্ত কথায় ব্যাপারটি জানাইয়া দিলেন। ইঁহারা বাহির হইয়া আসার পরে অরিজিৎবাবু বেড়াইতে যাইতে চান। একা যাইতে দেওয়া উচিত হইবে না বলিয়া সুরজিৎবাবুর স্ত্রী অরিজিৎবাবুর মেয়েটিকে লইয়া তাদের সঙ্গে বাহির হন। লেকের দিকে যাইবার ইচ্ছা। গলি ছাড়িয়া বড় রাস্তায় খানিকটা গিয়াছেন, অরিজিৎবাবু সামনে, ইঁহারা কিছু পিছনে। এমন সময়ে একটি ট্যাক্সি পিছন দিক হইতে হঠাৎ আসিয়া অরিজিৎবাবুর অদূরে দাঁড়ায়। ট্যাক্সির আরোহী হাত নাড়িয়া তাঁহাকে আহ্বান করে। অরিজিৎবাবু ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসেন। ট্যাক্সি দ্রুতবেগে মোড় ঘুরিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়।

সুরজিৎবাবুর স্ত্রী অনেকক্ষণ ধরিয়া ফোনে কানেকশন পাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। পান নাই, কারণ আমরাই ফোন নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিয়াছিলাম।

—এ আবার কি হল। বলিয়া সুরজিৎবাবু হতাশ ভাবে এলাইয়া পড়িলেন। ভদ্রলোকের জন্য আমার করুণা হইল। একটু নাদুস-নুদুস ধরণের লোক, আরেশী মানুষ, পড়াশোনা বা অনুরূপ নিরাপদ্রব কাজকর্ম লইয়া দিনপাত করেন। এরকম হৈ-হজ্জৎ তাঁহার ধাতেও নাই, সাধ্যেও কুলায় না।

পিছনের সীটে সুরজিৎবাবু অবসন্ন হইয়া পড়িয়া রহিলেন। সামনের সীটে আমরা দুইজনে—ডাক্তার দাঁতে দাঁত চাপিয়া বসিয়া যথাসাধ্য দ্রুতবেগে গাড়ি চালাইতে লাগিলেন, কিন্তু যাইক-টাইকের ভিড়। একটানা দ্রুত চলা অসাধ্য। পূর্বরাত্রি যে পথ আধ ঘণ্টায় পার হইয়াছি, এখন তাহাই অতিক্রম করিতে এক ঘণ্টারও বেশী সময় লাগিল।

পথে ডাক্তার কোন কথা বলিলেন না। আমি একবার বলিলাম, ভদ্রলোক বড় কাহিল হয়ে পড়েছেন।

ডাক্তার অস্ফুটস্বরে কহিলেন, Let him. He needs it. আমি বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে একবার তাকাইয়া চুপ করিয়া গেলাম।

বাড়িতে পৌঁছিলাম, তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে। সুরজিৎবাবুর স্ত্রী, মাতা ও ছোট বোন উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ডাক্তার একবারেই কহিলেন,—কি কি হল বলুন।

মিনতি কহিলেন, ফোনে যা বলেছি, সেইটুকুই। সাতটার কিছু পরে ওঁরা বেরিয়ে গেলেন। ঠাকুরপো তখনও ঘুমুচ্ছে। আমরা জাগাই নি। জাগল, প্রায় আটটায়। নিজে থেকেই উঠল। হাত মুখ ধুলে, খাবার খেলে। তারপর বললে, একটু বেরুই। মা বললেন, কোথায় যাবি এখন অসময়ে? বললে,

কোথাও নয়। কি রকম ক্লান্ত লাগছে, একটু ঘুরে আসি। আধঘণ্টা খানেকের মধ্যেই চলে আসব।

—দেখলাম, যাবেই। তখন আমি বললাম, বেশ, চল আমিও সঙ্গে যাই। বললে, কেন, হারিয়ে যাব? আমি বললাম, বিচিত্র কি! দিনকাল খারাপ। বললে, বেশ, চল, খাঁচলে বেঁধেই ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।

মেয়েটাকে জামা পরিয়ে নিয়ে বেরুলাম। তখন সাড়ে আটটা। গলি থেকে বেরিয়ে সামনের রাস্তা ছেড়ে দিলাম, কারণরের রাস্তাটায় সামান্য এগিয়েছি। পেছন থেকে একটা ট্যাক্সি এল। খুব অল্প স্পীড্। ঠাকুরপো তো তাড়াতাড়ি হাঁটে, সে আগে আগে চলেছে। আমি মেয়েটাকে নিয়ে পেছনে যাচ্ছি, প্রায় হাত কুড়ি পঁচিশ পেছনে হবে। গাড়িটা আমাদের ছেড়ে এগিয়ে গেল। ঠাকুরপোর ঠিক পাশে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়ির পেছনের সীটে একজন লোক ঠাকুরপোকে ডেকে কি বললে, হাত নেড়ে তাকে ডাকল। ঠাকুরপো থামল, তাকিয়ে দেখল, তারপর গাড়ির কাছে এগিয়ে গেল। তখনও কিছু সন্দেহ হয় নি। ভেবেছি, যেমন হয় তাই, যেতে যেতে কেউ দুটো কথা বলে যাচ্ছে। আমি বরং ঠাকুরপোকে এগিয়ে যেতে দেখে পেছনেই দাঁড়িয়ে পড়লাম মেয়েটাকে নিয়ে। বোধ হয় মিনিটখানেক হবে, তারপরই হঠাৎ টক্ করে গাড়ির দরজাটা খুলে গেল। ঠাকুরপো গাড়ির মধ্যে উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে মোশন নিলে। মেয়েটা চেঁচিয়ে বললে, ও বাবা, কোথায় যাচ্ছ। ঠাকুরপো মুখ ফিরিয়ে তাকালেও না, হয়তো শুনতেই পেলে না।

—আপনি কি করলেন?

—কি করব। কি হল ব্যাপারটা, বুঝবার আগেই গাড়ি স্পীড বাড়িয়ে দিলে, হাত পনেরো কুড়ি আগেই ডান হাতি গলি, তার বাঁক ঘুরে আড়াল হয়ে গেল। রাস্তায় তখন লোকজন প্রায় নেই। আমি মেয়েটার হাত ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে মোড় অবধি এগিয়ে গেলাম, সে গাড়ি আর চোখে পড়ল না। গলিটা ছোট, একটু-খানি এগিয়ে ট্রাম রাস্তায় পড়েছে—গাড়ির তখন পাত্তা পাওয়া অসম্ভব।

—গাড়ির নম্বর দেখেছ?

—না। দেখতে হবে, তাও তো মনে হয় নি। গাড়ি ছেড়ে গেল যখন, তখন আর খেয়াল করে তাকিয়েও নম্বর দেখতে পাই নি। ট্যাক্সি, নীল রঙের টুয়ার গাড়ি। সম্ভবত শেভ্রলে। এইটুকুই লক্ষ্য করেছি।

—তারপর, কি করলে?

—কি করব। তাকিয়ে দেখলাম চারদিকে। সাহায্য চাইব এমন কোন লোক চোখে পড়ল না। আর সাহায্য চাইবই বা কি। মিথ্যে চ্যাচামেচি করে লোক জড়ো করে লাভ নেই। মেয়েটা তখনও হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে নিয়ে বাড়ি চলে এলাম। মা শুনেই বললেন, ডাক্তারকে ফোন কর। তাকে সুদ্ধ আসতে বল। তিনি এসে যা হয় করবেন। আমি বললাম, কোন আমি করছি। কিন্তু তিনি এসে কি করবেন? মা বললেন, ওরে, পারলে তিনিই পারবেন। তোরা মানুষ চিনতে শিখিস নি, যা বললাম কর। তাকে ডাক্, শিগগির! তখন ছুটে ফোন করতে গেলাম। সে আবার আলা। এদিকে বারবার করে চেয়েও আপনার কানেকশান পাই নে। ওদিকে তারা সবাই চারধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কথা বলাও মুশকিল।

ডাক্তার কহিলেন, কিন্তু বললে তো সবটা। আর তারা শুনতে পেলেই বা কি।

—পায় নি। ঠিক যখন লাইনটা পেয়েছি, তখনি তাদের একটা ছোট মেয়ে বাইরে আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়েছে। কান্না শুনে সবাই দৌড়ে বেরিয়ে গেছে। আমার কথা কেউই শুনতে পায় নি।

—এ বাড়ির লোক? চাকর-বাকর? বা আত্মীয় যারা আছেন?

—কেউ না। শুধু আমরা তিনজন জানি, আর মেয়েটা। সে কিছু বোঝে নি।

—কি করে বুঝলে?

—তা'হলে কান্নাকাটি করছ।

—তার কোন মানে নেই। সেটা কোথায়?

—স্কুলে চলে গেছে। আপনারা আসবেন, তা'ছাড়া বাড়িতে থাকলেই কথা তুলবে বাবা কোথায় গেল, কেন গেল। তাই একটু তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি স্কুলে।

—বেশ। কিন্তু যদিই হয়, ট্যাক্সি করে বয়স্ক লোক কেউ যাচ্ছিল, পথে তাকে দেখে ডেকেছে, উঠে তার সঙ্গে চলে গিয়েছে। এমন তো যায় মানুষ। তুমি বা তোমরাই বল। এমন ব্যস্ত হয়ে উঠেছ কেন? বেশীক্ষণ তো হয় নি গেছে। হয়তো দেখবে এক্ষুনি ফিরে এল।

—না। সে যদি হত, আমাদের সঙ্গে একটা কথাও বলবে না, উঠে চলে গেল, কেন? নিশ্চয়ই আমাদের বলে যেত। তা'ছাড়া, যুক্তিটুক্তি অত বুঝিনে, আমার ভালো লাগছে না। ঠিক মনে হচ্ছে, এর ভেতরে গোলমাল আছে।

ডাক্তার কহিলেন,—Intuition?

—হতে পারে। কিন্তু আমি বলছি এর মধ্যে বিপদ আছে। যেই তাকে নিয়ে যাক, ভাল উদ্দেশ্যে নেয় নি। আমার বাতিক বলতে হয় বলুন। কিন্তু করবার কি আছে তাও ভাবুন আপনারা।

ডাক্তার কিছুক্ষণ নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন, মিনতি কহিলেন, তোমরা এলে, আর দু'জন কোথায়?

সুরজিৎবাবু কহিলেন, ব্যাঙ্কে গেছে।

—কেন?

ডাক্তার হঠাৎ সচেতন হইলেন। কহিলেন, হ্যাঁ, তুমি, যাও, আমার ফোন করব। ওরা ট্রামে গেছে, হয়তো এখনও ব্যাঙ্কেই আছে। বলে যাও, কাগজপত্র যা আছে সব কিছু নিয়ে চলে আসবে। সরনাগাটি টাকা নিয়ে আসবার দরকার নেই, কিন্তু সেগুলো সব মিলিয়ে দেখে আসবে।

মিনতি চলিয়া গেলেন। মিনিট দশেক পরে ফিরিয়া আসিলেন, কহিলেন, ব্যাঙ্ক থেকে তারা বেরিয়ে পড়েছে।

ডাক্তার কহিলেন, তা'হলে আর কি, বসেই অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

অপেক্ষা খুব বেশীক্ষণ করিতে হইল না। বোধ হয় কুড়ি পঁচিশ মিনিট, তারপরই ইহারা দুইজন আসিয়া পৌঁছিল। আমাদিগকে দেখিয়া সবিস্ময়ে কহিল, কি ব্যাপার, হঠাৎ এখানে চলে এলেন?

ডাক্তার কহিলেন, সে পরে বলছি। তোমরা কি দেখে এলে, তাই বল।

করুণা কহিল, সরনাগুলো ঠিকই আছে মনে হল। কাগজপত্র অনেক, তার কোন্‌টা দলিল কোন্‌টা কি ভালো বুঝতে পারলাম না। আমি যতদূর পেরেছি নিয়ে চলে এসেছি। আপনারা দেখে নিন।

ডাক্তার কহিলেন, বেশ করেছ, প্রায় ফেয়ারস্যাট হয়ে গেছ। দেখি, নাথাও তোমার পঞ্চমাঘন। দেখি কি নিয়ে এলে।

করুণার হাতের ব্যাগ কাগজপত্রে ভর্তি। সমস্ত সে টেবিলের উপরে ঢালিয়া নামাইয়া দিল। ডাক্তার ও সুরজিৎবাবু সেগুলিকে খুঁজিয়া ও বাছিয়া দেখিতে লাগিলেন। মিনিট দশেক, তারপর সুরজিৎবাবু কহিলেন, সে দলিল নেই।

—নেই? আমারও তাই সন্দেহ হয়েছিল। আর কি কি নেই দেখুন।

সুরজিৎবাবু কহিলেন, আর তো সবই ঠিক আছে মনে হচ্ছে।

—টাকা ছিল? শেয়ার সার্টিফিকেট? বা ক্যাশ সার্টিফিকেট?

—অন্তত ছিল বলে আমার জানা নেই।

—ইনসিওরেন্স পলিসি?

—সে ঠিক আছে। এই তো তার পলিসি, আমার পলিসি—হ্যাঁ, ঠিক আছে।

করুণা কহিল, কিন্তু ব্যাপারটা কি, আমি বুঝতে পারছি নে। বললেন, আপনার সঙ্গে পরিচয় আছে একথাও ভুলে যেতে হবে, অথচ তার পরেই আপনি নিজে এসে এখানে হাজির হয়েছেন। এর মানে? ছোড়দা কেমন আছে?

ডাক্তার কহিলেন, সেইটেই মানে। ছোড়দা নিরুদ্দেশ।

সুমিত্রা একটা আর্ত ধ্বনিকে প্রাণপণে রোধ করিয়া শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

করুণা কহিল, নিরুদ্দেশ! তার মানে? কোথায় গিয়েছে?

—কেউ জানে না। একটা ট্যাক্সিতে উঠে চলে গিয়েছে।

—ট্যাক্সি তাকে ডেকে দিলে কে?

—ডেকে দেয় নি। পথ চলতি ট্যাক্সি। তাকেই কেউ ডেকে তুলে নিয়ে গেছে। কে নিলে, বা কোথায় গেল, তাই এবারে খুঁজতে হবে।

করুণা দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিল। হঠাৎ একটা হাত তুলিয়া নিজের কপাল ও চোখের উপরে চাপা দিল। কহিল, দাঁড়ান, দাঁড়ান। বলিয়া, বাঁ হাতে একটা চেয়ারের হাতল চাপিয়া ধরিল।

মিনিট খানেক পরে হাত নামাইল, মুখ তুলিয়া কহিল, হাঁ, বলুন শুনি। কি হল?

ডাক্তার বিবরণটা বলিলেন। কহিলেন, এবার ভাবতে হবে, এভাবে তাকে ডেকে নিয়ে গেল কে। অবশ্য সৎ উদ্দেশ্যে নেয় নি, সেটা একা তোমার বউদির নয়, আমারও ধারণা।

সুরজিৎবাবু কহিলেন, থানায় খবর দেবেন?

ডাক্তার কহিলেন, তাতে লাভ হবে না। তার চেয়ে···বলিয়া অনেকক্ষণ ভাবিলেন। তারপর কহিলেন, আচ্ছা, সে আমিই ভেবে দেখব কি করা যায়। আপনারা ততক্ষণ—

করুণা কহিল, খুঁচি কোথায়?

মিনতি কহিলেন, স্কুলে।

ডাক্তার কহিলেন, সেও একটা কথা। তাকে বাড়িতে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা কর। দিন কতক এখন স্কুলে যাবে না। কাউকে পাঠিয়ে দাও, নিয়ে আসুক।

করুণা কহিল,—আমি যাচ্ছি।

করুণা বাহির হইয়া গেল। ডাক্তার কহিলেন, —কত দূরে স্কুল?

মিনতি কহিলেন, কাছেই।

ডাক্তার কহিলেন,—আচ্ছা, তুমি ততক্ষণ বল তো। যে লোকটা তাকে ডেকে নিলে, তাকে দেখেছ তুমি? চেহারাটা বলতে পারবে?

মিনতি কহিলেন,—না। গাড়ির ভেতরে ছিল, আমি ছিলাম গাড়ির পেছনে। শুধু হাতটা দেখেছি একবার।

—কি রকম হাত?

—কোট পরা, বোধ হয় সুট পরা ছিল। হাতটা রোগা, হাড্ডিসার। কালোর দিকে রং।

—আর কিছু?

—মনে পড়ছে না।

—দেখ মনে করে। ট্যাক্সিটা, বললে নীল রঙের, শেভ্রলে। কিন্তু নীল শেভ্রলে টুয়ার ট্যাক্সি কলকাতায় অসংখ্য আছে। আর কোন ডিটেইল মনে আছে তোমার? দেখ তো চেষ্টা করে। ঠিক সেই সময়টায় ছবিটাকে মনে কর।

মিনতি কহিলেন,—হাঁ। একটা মনে পড়েছে। টুয়ার ট্যাক্সি বললাম তো? তার ছড়টা ময়লা।

—রং?

—এমনি যা হয়। কালচে খাকি রং। মাঝখানে একটা কাটা ফ্ল্যাপ থাকে তো পেছন দিকে, সেই ফ্ল্যাপটা খানিক ছেঁড়া ছিল। মানে, কেটে গেছে এক পাশ থেকে। বোধ হয় সেটা ডান দিক।

ডাক্তার কহিলেন, চমৎকার! আর কিছু?

—মনে পড়ছে না।

বলিতে বলিতে তাহার কন্যাকে লইয়া করুণা ফিরিয়া আসিল। ছোট্ট মেয়ে, বয়স পাঁচ পূর্ণ হইয়াছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু চালচলনে একটা বিশেষ গাম্ভীর্যের আভাস; সে যে বই শ্লেট লইয়া স্কুলে যায়, এই মহিমার চেতনা তাহার অত্যন্ত স্পষ্ট।

একহাতে পিসির হাতের মধ্যে, একহাতে বই শ্লেট, ঘরে ঢুকিয়াই পরম গম্ভীর মুখে কহিল,—বাবা আসে নি?

ডাক্তার কহিলেন,—কোথা থেকে আসবে ?

তিনি অপরিচিত বলিয়া সে মেয়ে কিছুমাত্র ঘাবড়াইল না। কহিল,—সেই যে, চলে গেল ট্যাক্সি করে ?

—ও। সেই লাল ট্যাক্সিটা তো ?

—দূর ! লাল কেন হবে ? সে তো নীল ট্যাক্সি, বাবুয়াদের ট্যাক্সি।

মিনতি কহিলেন,—হয়েছে, তুমি থামো।

কিন্তু ডাক্তার সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন, তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন,—না, থামবে না। তুমি বল তো, কি রকম ট্যাক্সি সেটা।

—বললাম তো, নীল। বাবুয়াদের ট্যাক্সি।

—বাবুয়া কে ?

—বাবুয়া, বাবুয়া। পাঞ্জাবীদের ছেলে।

মিনতি আবার কি বলিতে যাইতেছিলেন, ডাক্তার চোখের ইঙ্গিতে তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন।

কহিলেন,—পাঞ্জাবীদের ছেলে ? ঠিক জানো ? হাফ শার্টের ছেলে নয় ; যা ফ্রকের ?

বুঁচি হাসিয়া ফেলিল। কহিল,—দূর, ফ্রকের ছেলে হয় নাকি ?

—হয় না বুঝি ? শুধু পাঞ্জাবীদের হয় ?

—আহা ! পাঞ্জাবী মানে কি আমরা পাঞ্জাবী ! মানুষ পাঞ্জাবী, ট্যাক্সি চালায়। তাদের ছেলে।

—তুমি চেন ?

—বা ! আমাদের স্কুলে পড়ে না সে ? তাদের ট্যাক্সি, তার বাবা চালায়।

—তুমি দেখেছ ?

—রোজ তো দেখি। ট্যাক্সি করে তাকে স্কুলে দিয়ে যায় তার বাবা। একদিন একদিন নিয়েও যায় ছুটির পরে।

—তা, সেই গাড়িতে করে চলে গেল তোমার বাবা ?

—হ্যাঁ। সে গাড়িটা তো চিনি আমি। নীল নীল, চালটা খোলা যায়। পেছনে ছিঁড়ে গেছে চালটা।

—বটে ! তা সেই গাড়িতে করে চলে গেল, তুমি কিছু বললে না ?

—তাই বলেই তো বললাম না। গাড়িটা এল, বাবা চড়ে বসল, আমাকে নিয়ে গেল না।

—তা, তুমি কেন মাকে বললে না, গাড়িটা বাবুয়াদের ?

—বললাম তো। মা শুনল। খালি খালি আমাকে বকে দিল। বলল, হয়েছে, পাকামো কোরো না, স্কুলে যাও। আমি তাই রাগ করে স্কুলে চলে গেলাম।

—বেশ করলে। সেই বাবুয়া আজ স্কুলে এসেছে ?

—না তো। তার মার সঙ্গে বেড়াতে গেছে।

—খুব ভালো কথা। চল তো, তুমি আর আমি একবার বেড়াতে যাই। দেখে আসি তোমার স্কুলটা কত বড়।

বুঁচি মায়ের দিকে চাহিল,—মা, যাব ?

মিনতি কহিলেন, যাও।

ডাক্তার তাহাকে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। আমি বসিয়া রহিলাম। সুমিত্রা এতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিল, কহিল, কি হবে ?

—কি হইবে, কি হইতেছে ব্যাপারটা, আমারও কোন ধারণা ছিল না। তথাপি যতটা সম্ভব দৃঢ়তা গলায় আনিয়া কহিলাম, কিছুই হবে না, সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি ভাববেন না।

সুরজিৎবাবু আচ্ছন্নের মত বসিয়া ছিলেন, একবার মাত্র চোখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিলেন। কথা কহিলেন না।

মিনিট পনেরো-কুড়ি পরে ডাক্তার ফিরিয়া আসিলেন। মিনতিকে কহিলেন, এই নাও, তোমার মেয়ে। ভারি ভালো মেয়ে। আমার অনেক পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিয়েছে। তাই না বুঁচি ?

বুঁচি কহিল, হ্যাঁ।

ডাক্তার কহিলেন। আমি এবারে চলব।

সুরজিৎবাবু কহিলেন,—চলবেন ?

—হ্যাঁ। আমার এর পরের কাজ এখানে নয়, অন্যত্র।

করুণা কহিল,—আমরা কি করব?

—কিছু করবে না। মনে থাকে যেন একেবারে কিচ্ছু করবে না। পুলিশে যাবে না, কাউকে কিছু বলবে না। কেউ জিজ্ঞেস করতে এলেও বাজে জবাব দিয়ে দেবে। আর সত্যসেবেশ্বর যা বলেছিলাম, বাড়তি লোকজনকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেবে।

করুণা কহিল,—আচ্ছা। আর?

—আর, আমার কথা যদি কেউ প্রশ্ন করে, বলবে তোমার মার কাল রাত্রে হার্ট-অ্যাটাক হয়েছিল, তার জন্যে আমাকে কল দিয়েছিলে। কাল আর আজ, দু'বার।

—আচ্ছা।

ডাক্তার আমাকে কহিলেন,—চল।

সুরজিৎবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ডাক্তার কহিলেন, না। আপনারা যেমন আছেন থাকুন। আজ আর কেউ বাইরে যাবেন না, হয়তো কালও যাবেন না। বুঁচি স্কুলে যাবে না। মনে রাখবেন, খেলতেও যাবে না বাড়ির বাইরে। কাল বা পরশু নাগাদ আমার কাছ থেকে কিছু খবর পেতে পারেন। যতক্ষণ না পাচ্ছেন, একদম চুপচাপ বসে থাকবেন, তা না হলে বিপদ হবে।

সুরজিৎবাবু বিবর্ণ মুখে কহিলেন,—বিপদ কিসের?

—কিসের সেটা ঠিক বলতে পাচ্ছি নে এখনও। জানতে পেলেই বলব। চল।

পথে বাহির হইয়া আমি কহিলাম, ব্যাপারটা বুঝতে পাচ্ছি না। কিন্তু বেচারী সুরজিৎবাবুর জন্যে আমার সত্যি দুঃখ হচ্ছে।

ডাক্তার সম্মুখে চাহিয়া গাড়ি চালাইতেছিলেন, মুখ ফিরাইলেন না, কহিলেন,—কারণ?

—অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক। ছাইকে নিশ্চয় একেবারে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন।

ডাক্তার কথাটা শেষ করিতে দিলেন না। মৃদুস্বরে কহিলেন, আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জান? আপাদমস্তক আচ্ছাদে ঢেকিয়ে দিতে।

—কাকে?

—তোমার সুরজিৎবাবুকে।

আমি হতবাক্ হইয়া গেলাম।

ডাক্তার কহিলেন,—ভাইকে ভালবাসেন? তা বাসেন। এমন বিকট ভালো বাসেন যে তাকে মৃত্যুর মোহে এনে হাজির করেছেন, তবুও সেটা চোখে ঠাওর পাচ্ছেন না, এমনই মোহান্ধ। আমার ভাগ্যি ভালো, তাই আমার এমন বড় ভাই নেই।

এ সকল কি বলিতেছেন, কেন বলিতেছেন, কিছুই বুঝি না। অথচ প্রতিবাদ করিবার মত কথাও জোগাইল না, চুপ করিয়া রহিলাম। ডাক্তার কয়েক মিনিট নিঃশব্দে গাড়ি চালাইলেন, তার পর আবার কহিলেন, প্রফেসার হালটাই কিছু নির্বুদ্ধি হয় বলে একটা কথা আছে। পুঁথির বিদ্যে আর অর্থহীন তত্ত্বজ্ঞান নিয়ে দিনরাত কারবার করতে করতে প্র্যাকটিকাল কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়ে যায়। কমনসেন্স উঠে গিয়ে তার জায়গা দখল করে আনকমন নন্‌সেন্স। কথাটা হয়তো সত্যি, কিন্তু এতবড় উজবুক সেই প্রফেসরদের মধ্যেও বেশী পাওয়া যাবে না সম্ভবত। নিজের মূর্খতা দিয়ে ভাইকে বিপদে ফেলেছেন, অন্ধ স্নেহের চোখে সে বিপদের লক্ষণ চোখে দেখেও চিনতে পারেন নি, এখন হাত পা ছড়িয়ে এলিয়ে পড়েছেন পচা গোবরের পুতুলের মত। অকাল কুষ্মাণ্ড! অদ্ভুত একটা বাড়ি—পুরুষ মানুষ দুটো দেখলাম, দুটোই পৌরুষ বর্জিত। কাণ্ডজ্ঞান আর পুরুষত্ব আছে যেটুকু, সে মেয়েগুলোর মধ্যে, ওই বাচ্চা মেয়েটার যেটুকু মাথা ঠাণ্ডা আছে, তোমার ওঁড়োহিৎবাবুর মধ্যে তার সিকির সিকি নেই।

আমি ভয় পাইয়া গেলাম। সুরজিৎবাবুর উপরে চটিয়াছেন, কেন চটিয়াছেন জানি না। কিন্তু তাহার জন্য যদি ব্যাপারটার সংস্রব ছাড়িয়া দিতে চান? ভয়ে ভয়ে কহিলাম, ওঁর ভায়ের কেস্ হাতে রাখবেন না?

ডাক্তার হিংস্র কণ্ঠে কহিলেন, না রেখে যাব কোথায়? এরা দুটোতে—একটা গাধা একটা ষাঁড়; কিন্তু মা, বউ, মেয়ে, এরা তো অপরাধ করে নি। বাঁচাতেও তো হবেই।

যাক, আমাকে তো বাঁচাইলেন!

বাড়ি পৌঁছিয়া, ডাক্তার কাহাকে যেন টেলিফোনে ডাকিলেন, অনেকক্ষণ কথা বলিলেন। দুপুরে এবং বিকালের দিকেও তাঁহার কয়েকবার টেলিফোনে ডাক আসিল, তিনিও ডাক পাঠাইলেন কয়েকবার। কাহার সঙ্গে আলোচনা, কিসের আলোচনা, আমার জানার সম্ভাবনা ছিল না। তবে প্রতিবারেই ইংরেজী বা হিন্দি ভাষার ব্যবহার দেখিয়া অনুমান হইল, একই ব্যাপার লইয়া বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত বা একই ব্যক্তির সহিত, বারংবার আলোচনা হইতেছে, এবং তাহারা অবাঙালী।

সন্ধ্যার পরে ডাক্তার আমাকে কহিলেন,—খেয়ে নেবে চল। খেয়ে উঠে রেডি হতে হবে।

—কিসের?

—বেড়াতে যাব।

খাইয়া উঠিয়া, পোশাক পরিয়া দুই জনে তৈরি হইয়া লইলাম। রাত তখন আটটাও বাজে নাই। ডাক্তার কালো রঙের সুট পরিয়াছেন পায়ে শব্দহীন জুতা। আমাকেও প্রায় তাহারই কাছাকাছি একটা পোশাক পরাইয়া লইলেন। ছোট্ট একটা রিভলভার প্যান্টের পকেটে পুরিয়া লইতেছেন, চোখে পড়িল। আমার অস্ত্র ব্যবহার করা অভ্যাস নাই, অস্ত্রও নাই। তবুও সপ্রশ্ন; কহিলাম আমিও কিছু নেব?

ডাক্তার হাসিলেন, কহিলেন,—তুমি? তুমি আমার লক্ষ নিচ্ছ তো, তা হলেই হবে।

তারপর একটি ছোট্ট মোটা হাত খানেক লম্বা লাঠি আমার হাতে দিলেন। তাহার মাথায় একটা অত্যন্ত ভারী বর্তুল। কহিলেন, এইটেকে আস্তিনের ভেতরে নিয়ে যাও।

রাত প্রায় সাড়ে আটটায় গেটের বাহিরে একটি গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল, হর্ন বাজাইল। ডাক্তার উৎকর্ণ হইয়া ছিলেন, জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তারপর আমাকে ডাকিয়া লইয়া গাড়িতে গিয়া উঠিয়া বসিলেন। ড্রাইভার কোন কথা না বলিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল, বুঝিলাম গন্তব্য স্থানের কথা তাহার জানা আছে।

গাড়িতে যাইতে যাইতে একবার শুধু বলিলেন, হয়তো দরকার হবে না, কিন্তু কিছু মারামারি করা দরকারও হতে পারে। রেডি থাকবে, for anything।

কহিলাম, রেডি আছি।

আরেকবার একটি প্রায় নির্জন দীর্ঘ রাস্তার উপর দিয়া গাড়ি ছুটিতেছে। কহিলেন, দেখ তো তাকিয়ে, কোন গাড়ি পেছনে আসছে কি না।

আমরা গাড়ির ভিতরের সীটে ছিলাম, গাড়ির ভেতরে আলো নিবানো। ডাক্তারের নির্দেশেই মাথা ঘুরাইয়া পিছনের জানালা দিয়া তাকাইলাম, অনেকক্ষণ তাকাইয়া রহিলাম। তার পর গাড়ি রাস্তার বাঁক ফিরিল, ঘুরিয়া বসিয়া কহিলাম, পেছনে গাড়ি নেই।

—ভালো।

কিন্তু, গাড়ি না দেখিতে পাই, আর একটি বস্তু আমার চোখে পড়িয়াছিল। এই গাড়িটি টুরার ধরনের, এবং ইহার পিছনের পর্দাটি কাটা। ফিসফিস করিয়া কহিলাম,—কিন্তু এটা কি সেই গাড়িটা?

ডাক্তার শুধু কহিলেন,—হ্যাঁ।

বহুক্ষণ গাড়ি চলিল; ক্রমে শহরতলীর প্রান্তদেশও প্রায় পার হইল, মাঠের কাছে একটি বাড়ির কিছু দূরে আসিয়া থামিল। ড্রাইভার কহিল, ওই বাড়ি।

ডাক্তার কহিলেন,—ঠিক আছে। তুমি একটু দূরে থাকবে। রেডি থাকবে।

—জী।

একটা বড় গাছের তলায়, অন্ধকারে গাড়ি রাখিয়া, দুইজনে হাঁটিয়া অগ্রসর হইলাম; ক্রমে সেই বাড়িটির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

কাঠের গেট, ভিতর দিক হইতে তালা বন্ধ। ডাক্তার গেটের ফাঁক দিয়া হাত চুকাইয়া দিলেন, মিনিট খানেক পরে কট্ করিয়া তালাটা খুলিয়া গেল। আমরা প্রবেশ করিলাম। ডাক্তার গেটটা আবার ভেজাইয়া বন্ধ করিয়া দিলেন, তালা লাগাইলেন না।

মস্ত বড় কম্পাউণ্ড। অন্ধকারে যতটা চোখে পড়িল, প্রায় সবটাই রিক্ত মাঠ, মধ্যে মধ্যে বড় বড় গাছ দু' একটা, সে আমগাছ বটগাছ যাহা খুশি হইতে পারে। মাঝখানে ছোট বাড়ি; সেই হইতে সুরকির রাস্তা সোজা চলিয়া গিয়াছে। রাস্তাটা খুব নূতন নয় বা বহুল-ব্যবহৃত নয়, তাহা পা ফেলিতেই টের পাইতেছিলাম। পায়ের তলায় খোয়া কাঁকর পড়িয়া মুটমুট শব্দ হইতে লাগিল। ডাক্তার কহিলেন, ঘাসে যাও। রাস্তা ছাড়িয়া পাশে মাঠের উপর, ঘাসের উপর দিয়া অগ্রসর হইলাম। ক্রমে বাড়ির নিকটে গিয়া পৌঁছিলাম। সম্মুখের দিকে অন্ধকার। বারান্দায় উঠিয়া পাশের দিকে যাইতে চোখে পড়িল, পিছন দিকে একটি ঘরে মানুষ আছে, দরজার ফাঁক দিয়া আলোর আভাস পাওয়া যায়। ডাক্তার এক মুহূর্তকাল নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। চোখ ও কান পাতিয়া লক্ষ্য করিলেন, কোথাও কোন মানুষের বা অন্য জীবের নড়াচড়ার শব্দ পাওয়া যায় কি না। আমিও লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, ওদিকে কোথাও কোন মানুষের অস্তিত্ব আছে মনে হইল না। ধূলি ও পুরানো আস্তরের ভ্যাপ্‌সা গন্ধ নাকে আসিল, বুঝিলাম বাড়িটি পুরানো এবং দীর্ঘকাল অব্যবহৃত।

ডাক্তার চলিতে চলিতে অন্ধকারেই হাত বাড়াইয়া আমার মুখটাকে টানিয়া হাঁ করাইয়া দিলেন। কানের একেবারে নিকটে মুখ আনিয়া শব্দহীন স্বরে কহিলেন, শ্বাসের শব্দ হবে। সত্যই দেখিলাম, মুখ অনেকখানি হাঁ করিয়া রাখিলে শ্বাস স্বচ্ছন্দে চলে অথচ শ্বাসের কোনরূপ শব্দ হয় না।

তার পর অন্ধকারে রাক্ষসের মত হাঁ করিয়া আমরা দুই কৃষ্ণবস্ত্র আচ্ছাদিত মূর্তি পা টিপিয়া টিপিয়া আগাইয়া চলিলাম। ক্রমে সেই ঘরটির সম্মুখে গিয়া পৌঁছিলাম।

দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। একটি জানালা, সেটিও ভিতর হইতে বন্ধ, তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। ঘরের মধ্যে কথা বলিতেছে। জানালা বন্ধ, কাঠের খড়খড়িও বন্ধ, কিন্তু সে খড়খড়ি পুরানো। নড়বড়ে হইয়া গিয়াছে, তাহার ফাঁকে চক্ষু রাখিলে ঘরের মধ্যে দৃষ্টি পড়ে। ডাক্তার সেইরূপ একটি ফাঁকে চক্ষু পাতিয়া দাঁড়াইলেন, হাতের ইঙ্গিতে আমাকে আর একটি ফাঁক দেখাইয়া দিলেন।

ঘরের মধ্যে একটি চারপাই, তাহার উপরে একটি মানুষ বসিয়া। চারপাইর উপরে একটি লণ্ঠন। তাহার আলোকে স্পষ্ট চিনিতে পাইলাম, অরিজিৎ-বাবু। ধুতি ও পাঞ্জাবি পরিধান, অত্যন্ত অবসন্ন মূর্তি। যেন গত রাত্রির চেয়েও ক্ষীণ এবং ক্লান্ত। চারপাইর অপর পার্শ্বে আমার দিকে প্রায় পিছন ফিরিয়া একটি লোক দাঁড়াইয়া। লণ্ঠনের আলো অপ্রচুর, তাহার মুখটি বিশেষ দেখিতে পাইলাম না। অনুমান যতটা করা গেল, বয়স চল্লিশের উপরে, কিন্তু কৃশকায় কিন্তু চটপটে মানুষ। ঘোর রঙের সুট পরা, মাথায় টুপি নাই, চুল পাতলা, কাঁচা বলিয়াই মনে হইল। তাহার হাতে এক তাড়া কাগজপত্র—কোর্টের কাগজের মত।

সেই ব্যক্তি কথা বলিতেছিল, অরিজিৎবাবু নিস্তব্ধ নতমুখে বসিয়া ছিলেন। তাঁহার ভঙ্গী অত্যন্ত অবসন্ন, যেন এখনই মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইবেন। এ ব্যক্তি কথাও বলিতেছে অত্যন্ত নিচু নিস্বরে, প্রথমে স্পষ্ট বুঝিতেই পারি না। তার পর ক্রমে অভ্যাস হইল, তখন কথা শুনিতে পাইলাম। বুঝিলাম, এই কথাবার্তা বেশ কিছুক্ষণ ধরিয়া চলিতেছে, এখন যেটা চলিতেছে সেটাকে একেবারে শেষের পরিচ্ছেদ বলা যায়। হাতে কাগজ, সেই কাগজে সে অরিজিৎবাবুকে স্বাক্ষর করিতে বলিতেছে, অরিজিৎবাবু স্বাক্ষর করিতেছেন না। লোকটির কথায় কোন সুর নাই, উত্তেজনা নাই, একটানা একঘেয়ে গলায় খালি একটা কথাই সে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিয়া চলিয়াছে—

নাও, মিথ্যে ওজর করে কি হবে, দাও সইটা করে। সই করে দিলেই আমি বলছি সব পেয়ে যাবে।

তাহার গলায় কোন সুর বা উত্তেজনা নাই বলিয়াছি। কিন্তু সেইটাই বোধ হয় তাহার বিশেষত্ব—সেই একঘেয়ে আবৃত্তি শুনিতে শুনিতে আমার গা মাথা ঝিমঝিম করিয়া আসিল। মনে হইল ইহার চেয়ে চেঁচামেচি গালাগালিও ভালো, এই একঘেয়ে সুরে যেন রক্ত হিম করিয়া আনে। যেন মনে হইতে লাগিল, এই কথার একঘেয়ে হাতুড়ির আঘাতেই অরিজিৎবাবু এমন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

ডাক্তারের দিকে চাহিলাম। তিনি একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন, দেহে এতটুকু স্পন্দন নাই।

লোকটি একভাবেই বলিয়া চলিয়াছে, অরিজিৎবাবু নতমস্তকে একইভাবে বসিয়া আছেন। লোকটি কাগজের তাড়াটি এক একবার তাঁহার সম্মুখে আগাইয়া ধরিতেছে, আবার একটু সরাইয়া লইতেছে। মুখে অনর্গল সেই একঘেয়ে বুকনি।

কতক্ষণ এইভাবে কাটিল জানি না। দশ মিনিট হইতে পারে, ত্রিশ মিনিটও হইতে পারে। বাহিরে নিশ্ছিদ্র নিস্তব্ধতা, একটা পোকা পর্যন্ত ডাকিতেছে না কোনখানে; ভিতরে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত সেই নিরুত্তাপ কণ্ঠের একটানা ঘ্যান্‌ঘ্যানানি শুনিতে শুনিতে মনে হইল এ অসহ্য; এটা যদি আমার মৃত্যুর পরোয়ানাও হইত তবু আমি বরং সই করিয়া দিতাম। এই ঘ্যানঘ্যান ক্রমাগত শোনার চেয়ে তাহাও সহজে সহ্য হইত।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। আর একটু হইলেই হয়তো ডাক্তারকে ঠেলা দিয়া বলিয়া ফেলিতাম, যা হয় করিয়া ফেলুন।

বোধ হয় হাত বাড়াইয়াছিলাম তাঁহাকে স্পর্শ করিবার জন্য, এমন সময়ে সেই একটানা বাক্যস্রোতে ছেদ পড়িল। কাগজের তাড়া তাহার ডান হাতে। বাম হাতে কোটের পকেট হইতে সে একটি শিশি টানিয়া তুলিল। হাতের পাতায় সেটি বার দুই নাচাইল, তারপর অরিজিৎবাবুর সম্মুখে, অথচ তাহার নাগালের বাহিরে, সেটিকে ধরিয়া রাখিয়া কহিল—কি বল, সেবে কি সেবে না?

ভালো শুনিতে পাইলাম না, তবু চিনিতে কষ্ট হইল না। ঠিক এই শিশিই কাল রাত্রে ডাক্তারবাবুর হাতে দেখিয়াছিলাম। শিশিটা নাড়াইল, মধ্যে ঠুকঠুক করিয়া ঘড়ি নড়ার শব্দ হইল। কহিল, কই, বল কথাটা। সেবে, না সেবে না?

অরিজিৎবাবু স্পষ্ট দেখিলাম, কষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিয়াছেন। তারপর ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। শিশিটার দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন,। মনে হইল তাঁহার সমস্ত মনপ্রাণ সেই দৃষ্টিতে আসিয়া একাগ্র হইয়াছে। মুখ ঈষৎ হাঁ করা, নিঃশ্বাস দ্রুত, সমস্ত মুখে চোখে একটা নির্লোভ লোলুপতা প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। লোকটি আবার শিশিটা তাহার একেবারে সম্মুখে বাড়াইয়া ধরিল।—কি, চাই?

অরিজিৎবাবু হাত বাড়াইলেন। ক্ষয়ীন কণ্ঠে কহিলেন, দাও।

সে হাত সরাইয়া লইল। অন্য হাতটি বাড়াইয়া দিয়া কহিল, এক্ষুনি দেব। সইটা কর।

অরিজিৎ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ নিচু করিল।

দূরে কোথাও একটা শৃগাল বিকট রবে ডাকিয়া উঠিল। অতর্কিত আঘাতে সেই নিশ্ছিদ্র নীরবতা যেন শব্দ করিয়া ভাঙিয়া চৌচির হইয়া গেল। এবং সম্ভবত সেই শব্দের ধাক্কাতেই ইহাদেরও কথাবার্তার সুর বদলাইয়া গেল।

লোকটি হঠাৎ অত্যন্ত রুক্ষস্বরে কহিল,—কি হ'ল! বলে, মরছি, দরদের ব্যাটার অভাবই নেই? সই করবে কি করবে না?

অরিজিৎও মুখ তুলিয়া চাহিল। হয়তো মৃদুকণ্ঠে কহিল, - না।

—করবে না! কেন শুনি?

—বাড়ি আমার নয়, দাদার। দাদা করেছে।

—দাদা করেছে! লোকটা ভ্যাংচাইয়া উঠিল

অরিজিৎকে—দাদা করেছে সে দাদা বুঝে নেবে। তোমার প্রাণটাকে বাঁচাতে হবে, কি হবে না?

অরিজিৎ উত্তর দিল না। লোকটা কহিল, সই কর, মাল পাবে। না কর, এইখানেই সব গলা শুকিয়ে।

অরিজিৎ আবার মুখ তুলিয়া চাহিল। এবার অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট স্বরে কহিল, করব না। নাদা বউদি তা'হলে পথে বসবে।

—বউদি? লোকটা বিকৃত ভঙ্গী করিয়া কহিল—তারি যে দরদ দেখি বউদির জন্যে!

অরিজিতের নিষ্প্রভ চক্ষু তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল। হঠাৎ উচ্চ চীৎকার করিয়া কহিল, খবরদার বলছি বউদির নাম করে বলবে না।

—বটে! এত কেন টান বৌদির ওপরে—খুব বুঝি জমজমাট? বলিয়া লোকটা একটা অত্যন্ত কুৎসিত ভঙ্গী করিল।

সঙ্গে সঙ্গে, পলকে প্রলয় ঘটিয়া গেল। অরিজিৎ অকস্মাৎ ছিটকাইয়া লাফাইয়া উঠিল। বাঘ যে ভাবে ঝাঁপ দিয়া শিকারের উপরে পড়ে ঠিক সেইভাবে ঝাঁপাইয়া দিয়া লোকটার উপরে পড়িল। তাহার সেই ঝাঁপের বেগ সহ্য করা সহজ নয়। অতর্কিত আক্রমণে লোকটা চিৎ হইয়া মেঝেয় পড়িয়া গেল। অরিজিৎ দুই হাতে তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়াছে। আমি অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিলাম, হয়ত জানালাটা টানিয়া খুলিয়া ফেলিতাম। ডাক্তার একটি হাত বাড়াইয়া দৃঢ় মুষ্টিতে আমাকে ধরিয়া রাখিলেন।

দুই মিনিট, তিন মিনিট, পাঁচ মিনিট,—কতক্ষণ জানি না; সেই কঠিন পীড়নে তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়া অরিজিৎ বসিয়া রহিল। তাহার সমস্ত দেহে মুখে একটা উদ্যত আক্রোশ স্পষ্ট। লোকটা প্রথমে দুই চারিবার হাত পা ছুঁড়িল, তার পর ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আসিল। তার পর একেবারেই অবশ হইয়া এলাইয়া পড়িল।

ডাক্তার খড়খড়ির ফাঁকে হাত গলাইয়া ছিটকিনি খুলিলেন, জানালাটা টানিয়া খুলিয়া ঘরের মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন। আমি তাঁহার অনুসরণ করিলাম। অরিজিৎ তখনও একই ভাবে কঠমুষ্টিতে বসিয়া। আমি তাহার হাত টানিয়া সরাইতে গেলাম, সে হাতে অসম্ভব শক্তি, উন্মত্ততার শক্তি। ডাক্তার তাহার মাথায় হাত রাখিলেন, অত্যন্ত কোমল স্বরে ডাকিলেন,—অনু!

অরিজিৎ সচেতন হইয়া উঠিল। মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিল, তারপর হঠাৎ এঁ এঁ এঁ করিয়া একটা বিকট চীৎকার করিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল। দেহটা ভীষণ ভাবে বাঁকিয়া গেল। হাত দুইটা বাঁকিয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

ডাক্তার ক্ষিপ্র হস্তে তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, জুতোটা।

অরিজিতেরই জুতো, নিউকাট। একখানা পায়ে পরানো, অন্যখানা খুলিয়া পড়িয়াছে। আমি জুতাটা আগাইয়া দিলাম, ডাক্তার সেটিকে কাৎ করিয়া তাহারি নাক ও মুখের উপরে এমন ভাবে চাপিয়া ধরিলেন যেন খালের সঙ্গে জুতার মধ্যের বাতাসটাই তাহার মুখে নাকে প্রবেশ করে।

ডাক্তার কহিলেন, ধর। ডাক্তার দুই হাতে তাহাকে চাপিয়া ধরিলেন। আমি জুতাটা সেইভাবে ধরিয়া রহিলাম। আশ্চর্য, মিনিট দুই কাটিতে না কাটিতে অরিজিতের কাঁপুনী ও খিঁচুনি কমিয়া আসিল। তার পর কয়েকটা দীর্ঘ শ্বাস টানিয়া সে অবশ হইয়া এলাইয়া পড়িল।

ডাক্তার কহিলেন,—কাগজগুলো তুলে নাও। জুতো দু'টো। শিশিটা।

কাগজগুলো ঘরের একদিকে ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল। আরও কতকগুলি কাগজ ছিল, একটা বুলুমিতে। শিশিটাও মেঝে হইতে কুড়াইয়া লইলাম। ডাক্তার ক্ষিপ্রবুদ্ধি বুলাইয়া আনিলেন: আর কিছু রইল না তো? চল।

অরিজিৎ নিশ্চল হইয়া পড়িয়া আছে। ডাক্তার দুই হাতে তাহাকে অক্লেশে তুলিয়া লইয়া কাঁধে ফেলিলেন, যেন তাহার গায়ে ওজন বলিয়া কোন বস্তুই নাই। অন্য হাতে ব্যাগের খিল ও ছিটকিনি খুলিলেন। আমাকে কহিলেন, বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে এস।

এবার আর সন্তর্পণে ঘাসের উপরে চলিবার প্রয়োজন নাই। দু'জনে দ্রুতপদে গেটে পৌঁছিলাম।

বাহিরে আসিয়া ডাক্তার গেটটাকে ভেজাইয়া দিলেন। গাড়িটি সেই গাছের তলায় দাঁড়াইয়া ছিল। আমরা উঠিয়া বসিতে বসিতে ড্রাইভার ইঞ্জিনে স্টার্ট দিল। অরিজিৎকে সীটের উপরে শোয়াইয়া দিয়া ডাক্তার আমাকে কহিলেন,—ছুতোটা ধরে রাখুন মুখের ওপরে।

গাড়ি ছুটিল। কিছুদূর আসিয়া আমি কহিলাম, —যাঃ!

ডাক্তার কহিলেন, কি হ'ল?

—দোরটা তো বন্ধ করে এলাম না।

—ক্ষতি কি! শৃগাল আজ উপকারী বন্ধু।

গভীর রাত্রি। পথ নির্জন, এবং পাঞ্জাবী ড্রাইভার গাড়ি ছুটাইতে জানে। ডাক্তারের বাড়ির গেটে যখন গাড়ি আসিয়া ঢুকিল, তখনও আমার হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিক হয় নাই।

গাড়ি হইতে নামিয়া ডাক্তার আবার অরিজিৎকে কাঁধে তুলিয়া লইলেন। আমি কাগজপত্র জুতা ইত্যাদি লইয়া নামিলাম। ডাক্তার পকেট হইতে একতাড়া নোট বাহির করিলেন, ড্রাইভারের হাতে দিয়া কহিলেন, —একদম ভুলে যাবে।

ড্রাইভার গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, আমার গাড়ি মেরামতের কারখানায় পড়ে আছে, আজ দুপুর থেকে।

তাহার মুখের দিকে তাকাইলাম। অন্ধকারে মুখটা দেখিতে পাইলাম না, শুধু বিরাট এক-জোড়া গাড়ি চোখে পড়িল। হঠাৎ মনে হইল, দাড়ি অতি উপকারী বস্তু।

সারা রাত্রি অরিজিৎ একইভাবে পড়িয়া রহিল। সে হয়তো ঘুম, হয়তো অবসাদের তন্দ্রা। খুব ভোরবেলা, তখনও সে তন্দ্রায় মগ্ন, ডাক্তার দেখিলেন। মিনতিকে ডাকাইয়া কহিলেন, পেয়েছি। তোমরা এখানে চলে এস, কাউকে কিছু বোলো না।

ঘণ্টাখানেক না কাটিতে সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; সুরজিৎবাবু, মা, দুই বোন, দুই বধূ। অরিজিৎ তখনও তন্দ্রামগ্ন। ডাক্তারের নির্দেশে সকলে নীরবে দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিয়া সারিলেন, তারপর এদিকের ঘরে আসিয়া বসিলেন। শুধু ছোট বোনটি ছোড়দার কাছে বসিয়া রহিল, ডাকাডাকি করিয়াও তাহাকে উঠাইয়া আনা গেল না।

সুরজিৎবাবু প্রথম প্রশ্ন করিলেন, কোথায় পেলেন? ডাক্তার কহিলেন, প্রশ্ন করবেন না, উত্তর দেব না। পেয়েছি, বেঁচে আছে, সুস্থ আছে, আপাতত এই যথেষ্ট। এখন ভাবতে হবে পরের কাজ। কিন্তু তার আগে কয়েকটি কাজ সেরে নিই—এই নিন দলিল। দেখুন, সব ঠিক আছে?

সুরজিৎবাবু দলিলটির পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিলেন। কহিলেন, হ্যাঁ, ঠিক আছে।

—কোথাও নষ্ট হয় নি?

—না, এটাও কি ওর সঙ্গেই ছিল?

—বলেছি তো, প্রশ্নের উত্তর দেব না। এখন শুধু, যা যা বলব শুনে যাবেন। তারপর, যদি প্রশ্ন করি, তার উত্তর দেবেন। আপনাদের কোন প্রশ্ন থাকলে, আমি সে পরে শুনব।

প্রথম কথা হচ্ছে, চিকিৎসা। চিকিৎসা আমি করব আজ থেকে। যা বলতে পারেন, ইতিমধ্যেই শুরু করেছি। কিন্তু সে চিকিৎসা হবে সম্পূর্ণ আমার হাতে এবং বাড়িতে ওকে রেখে। আপনারা কোন রকম হাঙ্গামা সৃষ্টি করবেন না, এমনকি কোথায় ও আছে, তা পর্যন্ত জানতে চাইবেন না—যতদিন না সম্পূর্ণ সুস্থ হয়। বলেছিলাম, মনে আছে?

করুণা কহিল, মনে আছে। আমরা তাতে রাজী, সেও কালই বলে দিয়েছি।

—তবু, ইতিমধ্যে তো মত পালটে যেতে পারে।

করুণা হাসিয়া কহিল, বরং জোরালোও হতে পারে। আমাদের হাতে রেখে আমরা রক্ষা করতে পারি নি, তার প্রমাণ কাল হয়ে গেছে।

ডাক্তার কহিলেন, হাঁ। এবং সেইজন্যেই ওকে একেবারে অজ্ঞাতবাস করাব আমি, যাতে চিকিৎসার ব্যাঘাত ঘটাতে কেউ না পারে, তোমরা নিজেরাও না পার।

করুণার মা কহিলেন, আমাদেরও তাই ইচ্ছে। মিনতি এবং সুমিত্রার দৃষ্টিতেও সেই কথাই ব্যক্ত হইল।

ডাক্তার কহিলেন, এইবার কতকগুলো কথা আপনাদের বলব, তা হলে আপনাদের একটা ধারণা জন্মাবে ব্যাপারটা কি এবং কতখানি ভয়ানক, অন্তত কতখানি ভয়ানক হতে পারত। করুণা, তোমাকে বলেছিলাম, ওর ঘর খুঁজে দেখতে, ওষুধের শিশি আরও পাও কি না। দেখেছিলে?

করুণা কহিল, দেখেছি। ওষুধ পাই নি। খালি শিশি পেয়েছি, অনেকগুলো।

কোথায় পেলে?

একটা দেরাজের ভেতরে, ছেঁড়া কাগজপত্রের একেবারে পেছনে লুকোনো ছিল।

—আচ্ছা, এবার বল, এই ওষুধ খাওয়া শুরু করেছে কত দিন?

মা কহিলেন, আমি তো বরাবরই বলেছি, ওই ওষুধেই ওর শরীর নষ্ট করছে। তোরা কান দিস্‌নে।

করুণা কহিল, যার দেবার কথা সে যদি না কানে তোলে কথা, আমরা দিয়ে কি করব! হাঁ, শুরু করেছে অনেকদিন, বোধ হয় সাত আট বছর। মানে, সেই যেবার বড় অসুখ হল, তার পর থেকেই সম্ভবত।

—'সম্ভবত' কেন?

—আন্দাজ করতে পারি, তার বেশী বলব কি করে। অসুখ গিয়েছে, ডাক্তার ওষুধ দিয়েছে, সে খেয়ে যাচ্ছে। কোন্ ওষুধে কি ঘটাচ্ছে, আমাদের বলছে কে। কিন্তু, সত্যিই কি ওষুধের থেকে এত কাণ্ড?

—হাঁ।

সুরজিৎবাবু কহিলেন, তা হলে বলুন বিষ!

—হাঁ, তাও বলা যায়।

—তবে এরকম ওষুধ বানায় কেন?

—বড়ি বানায় কেন? বড়ি অনেক কাজে লাগে। আবার গলায়ও দেয় কেউ কেউ। সে অপরাধ কি বড়িরই একার? গলায় যে দেয় তার, যারা তাকে যুক্তি দেয় বা উৎসাহ দেয় তাদেরও।

সুরজিৎ বাবু কথা কহিলেন না। তাঁহার মা কহিলেন, ঠিক কথা। আপনি বুঝিয়ে বলুন এর ব্যাপারটা কি হল।

ডাক্তার কহিলেন, বলছি। বিজ্ঞানের বলে অনেক বড় ব্যাপার হচ্ছে এ যুগে, আবার বিজ্ঞানেরই জোরে পাপেরও সৃষ্টি হচ্ছে কম নয়। একদল বৈজ্ঞানিক বসেই আছে এখন এই সব কাজের জন্যে। তাদের মাইনে মজুরি অনেক, এ ব্যবসাতে লাভও ঢাকুন। কাজেই একে ঠেকানো শক্ত।

ব্যাপারটা কি রকম হয় বলছি। ধরুন, মদ খাওয়া মাতলামি করা নোংরা নেশা। পৃথিবীর কোন কোন দেশে সেটা আইনেও বারণ। অথচ, মদ খাবার লোভ আছে মানুষের। বৈজ্ঞানিক বসে গেল আবিষ্কার করতে। মদের মধ্যে যে-সব বস্তু থাকার ফলে নেশা হয়, তার কতকগুলো আছে হয়তো একটা অতি সাধারণ জিনিসের মধ্যে—ধরুন কুইনিন, অ্যাস্‌পিরিন বা ওইরকম কোন জিনিসে, যা সর্বদা সর্বত্র পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক ভেবে চিন্তে একটা শরবতের ফরমুলা তৈরি করল। তার মধ্যে রইল নেশার উপকরণের বাকিগুলো। অতএব তখন অবস্থাটা দাঁড়াল—কুইনিন বা অ্যাস্‌পিরিন যার দরকার কিনছে খাচ্ছে, কোন বাধা নেই; আবার সে শরবৎও যার ইচ্ছে কিনছে খাচ্ছে, কারু কোন হানি নেই তাতে, আইনেরও বাধা কিছু নেই। কিন্তু রসিক ব্যক্তি যে সেই শরবৎ খাবার আট দশ মিনিট আগে দুটো কুইনিন বা অ্যাস্‌পিরিন বড়ি গিলে নেবে, বা হয়তো শরবতের গ্লাসের মধ্যেই দুটো বড়ি ফেলে

দেবে। ব্যস, দুয়ে মিশে চমৎকার মদ তৈরি হয়ে গেল, পুলিশের বাবাও কিছু বলতে পারবে না।

করুণা কহিল, এইটেই কি মদ?

ডাক্তার কহিলেন, তার চেয়ে ভয়ানক। মদ, অল্প খেলে স্বাস্থ্য কর্মশক্তি বাড়ে, বেশী খেলে শরীর নষ্ট হয়। ইনি সমস্ত শরীরকে ভেতর থেকে শুষে শুকিয়ে দেন, নার্ভ সিস্টেমকেও শীর্ণ করে আনেন। প্রকৃতিকে উৎসাহহীন এবং সংকীর্ণ করে তোলেন। এর নাম মরফিন, মানে আফিমের চোলাই-সার।

—আফিম?

—তার চেয়ে অনেক জোরালো। আইনত যেখানে আফিম খাওয়া মানা, সেখানে এই ওষুধের ছদ্মবেশে আফিম খাওয়ানো হচ্ছে লোককে। যারা নেশাখোর তারা এর সন্ধান রাখে। যারা জানে না তারা এর নেশায় পড়ে যায়।

—তবে চলে কেন?

—নেশার 'কেন' নেই। চলে বলেই চলে, লোকে খায় বলে চলে। কেউ-বা ওষুধ বলে খেতে শেখে, কিছুদিন খাবার পরে আর ছাড়তে পারে না, তারপর ক্রমেই মাত্রা বাড়িয়ে চলে। এই বড়ি, এর ক্যাটাল ডোজ হচ্ছে চারটে থেকে ছ'টা; একসঙ্গে চারটে-ছ'টা খেয়ে ঘুমুলে সে ঘুম আর ভাঙবে না। অথচ এছেলে বোধ হয় দিনে অন্তত আটটা করে খেয়েছে। ভালোই সাপে কাটলে মরবে না।

সুরজিৎবাবু কহিলেন, আশ্চর্য, আমরা কিছু বুঝতেই পারি নি!

ডাক্তারের চক্ষু হঠাৎ ঝলসিয়া উঠিল, কহিলেন, স্টাডিড্ ইগনোরেন্স বলে একটা কথা আছে। ওসব বিলাপ ছাড়ুন, কাজের কথা যা বলছি শুনে নিন।

যেভাবেই হোক, এই বিষ এর ধরেছে, ছাড়াতে হবে। বাড়িতে রেখে ছাড়াতে পারবেন না, কারণ একে কন্‌ট্রোল করবার সাধ্য আপনাদের নেই। এতএব, ছেলে এখানে আছে রেখে গেলেন, এবার আপনারা বাড়ি ফিরে যাবেন। কোনমতে ব্যস্ত হবেন না কোথায় আছে কি বৃত্তান্ত। হাঁ, লোককে যা খুশি বলে দেবেন, চেঞ্জে গেছে, হারিয়ে গেছে, যা মুখে আসে। খবরের জন্য ব্যস্ত হবেন না, ঘরেও লাভ হবে না কিছু। খবর যা পাওয়া দরকার, সে আমিই জানিয়ে দেব সময়মত। ঠিক আছে?

সুরজিৎবাবু কি বলিতে গিয়া, থামিয়া গেলেন। মেয়েরা একসঙ্গে কহিলেন, হাঁ।

অরিজিৎ তখনও তন্দ্রামগ্ন। দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া তাহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া দেখিলেন ইঁহারা, তারপর বাহিরে চলিয়া গেলেন।

সকলে চলিয়া গেলে আমি কহিলাম, আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। এতই যদি বিষাক্ত ওষুধ, এ তৈরিই বা হয় কেন, ডাক্তাররাই বা চালায় কেন?

ডাক্তার কহিলেন, তৈরির কারণ বলেছি। ঔষধার্থে বিষের ব্যবহার চিরদিনই আছে, চিকিৎসকের নির্দেশ মেনে নিয়মিত মাত্রায়। দ্বিতীয়ত, এসব ওষুধ আজকাল, নেশার মাল হিসাবেও তৈরি হচ্ছে বিক্রি হচ্ছে, সেটা এই যুগের অভিশাপ। এগুলো তৈরি হচ্ছে ইউরোপে, আমেরিকায়, তারা আমাদের এইসব দেশে পাঠায়, নিজেরা খায় না। সাহেবরা এদেশে আফিম তৈরি করে, চায়নায় পাঠায়, ইংল্যাণ্ডে তার প্রবেশ নিষেধ।

ডাক্তাররা চালায়, না জেনে, বা মতলব করেও একালে ডাক্তাররা লিখত মূল ওষুধ, রোগী জেনে প্রেস্‌ক্রিপশন্ লিখত, ওষুধ তৈরি করে দিত। এখন আসছে তৈরি পেটেন্ট। সে পেটেন্ট কি দিয়ে তৈরি ডাক্তার নিজেও জানে না। বিজ্ঞাপন আর বিবরণের পুঁথি পড়ে চেনে, রোগীকে দেয়। ডাক্তারের দায় দায়িত্ব কিছুই নেই—সারল তো ডাক্তারের হাত-যশ, মরল তো রোগীর কপাল।

—ডাক্তার জানে না, মানে? ওষুধের সিটারেচারে তার ফরমুলা লেখা থাকে না?

—না। পুরো ফরমুলা থাকে না, কারণ সেটা

সোপনীয়, পেটেণ্ট রাইটের ব্যাপার। থাকে, কিছু কিছু উপকরণের নাম। সবগুলোর নাম থাকে না, পরিমাণ বা অনুপাত থাকে না, কোনটা কিভাবে মেলানো হ'ল তাও থাকে না। থাকে খানিকটা গালভরা টেক্‌নিক্যাল নাম, তা পড়ে আসল বস্তু চিনতে পারা অত্যন্ত শক্ত।

—সাধারণ লোকে চিনবে না। ডাক্তার চিনবে না কেন?

—ভুল করছ। সাধারণ ডাক্তার, আই. এস-সি পাশ করে মেডিক্যাল কলেজে পড়তে গেছে। তার মনে, তার কেমিস্ট্রি জ্ঞান সেই আই. এস্-সি ক্লাসের বিদ্যে পর্যন্ত। তাদের চোখে ধাঁধা লাগাবার মত একটা ভাষার প্যাঁচ তৈরি করা আবিষ্কারক বৈজ্ঞানিকের পক্ষে মোটেই শক্ত হয় না। এ ব্যাপারে তাদের বিদ্যে-বুদ্ধি অনেক বেশী। অনেক ডাক্তার এগুলো দেয়, জিনিস না চিনে। ধর, এই বড়িটা—

—এটার নাম কি?

—দরকার নেই। এটা দেয় ডাক্তাররা, ঘুম পাড়াবার জন্যে, বা নার্ভ-সিডেটিভ বলে। অল্প পরিমাণ অল্প দিন দেওয়া নিয়ম। কিন্তু, একটানা কিছুদিন খেলেই হয়ে গেল—আর ছাড়া যাচ্ছে না, ইচ্ছেও করছি না ছাড়তে। ক্রমশ নিজেরই মনে ধারণা জন্মে যাচ্ছে। ছাড়লে তার চলবে না, ছাড়লে ভয়ানক অসুখ করবে। সে আশঙ্কা বিশেষ নয় খুব, হঠাৎ ছাড়লে নানান রকম উপসর্গ দেখা দেয়। এবং তার ভয়েই রোগী, মনে অনিচ্ছা থাকলেও একে না খেয়ে পারে না। তারপর আর কি, খাও এবং ক্রমাগত মাত্রা বাড়াও। ক্রমে নিজের সর্বনাশ, পরিবারের সর্বনাশ। তখন হিতাহিত জ্ঞান বলেও কিছু রইল না! না রইল নিজের মনে ভরসা বা মানসম্ভ্রমবোধ। না রইল পরিবার পরিজন স্ত্রী-পুত্রের প্রতি মমতাবোধ বা দায়িত্ববোধ। সে তখন নেশার দাস, একটা অর্ধচেতন পশু মাত্র।

তারপর, নেশার যা গুণ, বুদ্ধিমানরা কাজে লাগায়। এই একেই দেখ না—হয়তো শরীর অসুস্থ বলে ধরেছিল, হয়তো কোন কবিরাজ ডাক্তার বা বন্ধু ধরিয়েছিল। ডাক্তার যদি হয়, তার দাত, প্রতি দিন বা প্রতি সপ্তাহে প্রেস্‌ক্রিপশন লিখে দেবার ফী—সে ছাড়া ইনি কিনতে পারবেন না। দোকানে তাঁর কমিশনও মোটা। বন্ধু যদি হয়—

—বন্ধু!

—তা ছাড়া আর কি বলে তাকে। একেই যদি এর সেই বন্ধু এই নেশা ধরিয়ে থাকে, যার দেখা কালে রাত্র পেলাম? ধরিয়েছে, তারপর এই নেশায় ফেলে হাতের মুঠোয় পুরেছে। টাকাকড়ি কত বাগিয়েছে তার খানিক আন্দাজ তো পেলে? বাড়িটিও চলে যেত—দলিল বেরিয়েছে, একটি সেল্ ডীড্ লেখা হয়েছে, সইটা করাতে পারলেই মিটে যেত। তার পর, ওর মনেও থাকত না কোথায় কি করেছে, যে-কোন লোক ওর নাম নিয়ে সেজে কোর্টে গিয়ে সেটা রেজিস্ট্রী করে দিয়ে আসত। ভালোই হত, ওই সুরোর জিৎটার রাস্তায় দাঁড়ানোই উচিত ছিল।

—তাঁর ওপরে আপনি অবশ্য চটে গেছেন। কিন্তু তাঁর অপরাধ কোথায়?

—তারই তো। অধ্যাপক, পণ্ডিত, তার মানে পাঁড় গাধা। যেটা জানেন না সেটাও জানি বলে জাঁক করেন, নইলে পাণ্ডিত্যের মহিমা জানি। বাড়ি সুদ্ধ মেয়েদের হুঁস হয়েছে কি ব্যাপার, ওঁর হয় নি। ভ্রান্তমেহে এ নয়, এ আত্ম-স্তুতি। তাদের হয়তো বয়সেই থামিয়ে রেখেছে এতকাল। এবার আর পেরে ওঠে নি। কারণ শ্রীমান নিজেই একেবারে হাটে হাঁড়ি ভেঙে ফেলেছে বেসামাল হয়ে। অর হয়ে ক'দিন বেরুতে পারে নি, এদিকে মাল ফুরিয়েছে। তাই সেদিন প্রথম বেরিয়েছে, মাল হাতে পেয়েছে, পেট ভরে গিলেছে। তার থাকা সামলায়নি। বন্ধুও তৈরিই ছিল, বুঝেছে এভাবে বেশীদিন চলবে না। চটপট কাজ গুছিয়ে নিতে সেছে এটা একেবারে বে-এক্তিয়ার হয়ে যাবার আগে। দলিলটা ব্যাঙ

থেকে বার করা হয়েছে, খুব সম্ভব কাল বা পরশু। হয়েই যেত। একটিমাত্র রক্ষা কবচ ছিল, বউদি। সুরজিৎকে পিটিয়ে তাড়াতাম, পারি নি মেয়েগুলোর মুখ তাকিয়ে। ও-কে ঠিক সই করে দিত দলিল। দাদা-বউদির কথা ভেবে পারে নি। বউদিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। তার নাম কানে যেতেই তাই ঝিমানো মন জেগে উঠেছে। তাই বাঁচল। কালো মেঘের আড়ালে ওই একটি ছিল সোনালি রেখা। তাই বল না তোমরা?

আমি কহিলাম, সত্যি কথা। সে লোকটার কি হ'ল। জানলাম না তো!

—দরকার? আমার সে পিছে লেগে মরলে? হোক না যা হবার।

—যদি মরে গিয়েই থাকে?

—গিয়ে থাকে, গিয়েছে। কলকাতা শহর, অনেক লোক। একজনের দুঃখে ট্রাম বাস ভিড় করবার কোন কারণ নেই।

খুব সম্ভবত সেও এক ডাক্তার। নইলে আত্ত আত্ত পিশি যোগাত কি করে। মরে যদি থাকে, গোটাকতক মানুষ বেঁচে যাবে তার ফলে।

ডাক্তারকে এরূপ উত্তেজিত হইতে কখনও দেখি নাই। মনে হইল, ডাক্তারি-বিদ্যার সাহায্যেই এই ব্যবসায় চলে, ইহাই তাঁহার ক্ষোভের হেতু।

কহিলাম, আচ্ছা, এই ওষুধ, এত ভারি মাত্রায় ব্যবহার করেছে। যদি ক্রমাগত ব্যবহার কোরে যেত, কি হত?

—হ'ত? হতে পারত অনেক কিছু; নার্ভ একেবারে ভেঙ্গে গেলে যা যা হয়। ঘামে, প্যালসি, এপিলেপ্‌সি, ইন্‌স্যানিটি দেখা দিত, ক্রমে ক্রমে। বা, মেলাংকলিয়া বেড়ে আত্মহত্যা করাও অসম্ভব নয় এ কেসের পক্ষে।

কহিলাম, এত?

—হ্যাঁ। এবং বাড়িয়ে বলছি না, তার প্রমাণ সম্ভই পাবে। এর চিকিৎসা আমি আজ থেকেই শুরু করব। তুমি একটা কাজ কর—বাড়িতে চিঠি দিয়ে দাও দিন-কতক ফিরছ না। অসুবিধে হবে?

—চিঠি দেবারই দরকার হবে না। আমি বলেই এসেছি কিছুদিন দেরি হতে পারে।

—বেশ। চিকিৎসাটা কি হবে, তোমাকে তার আভাস দিচ্ছি, কারণ এর ওপরে সারাক্ষণ নজর রাখতে হবে, নার্সিং এবং পাহারা একসঙ্গে। সেই ভারটি থাকবে তোমার হাতে।

—ঠিক আছে।

—মনে রেখো, একেবারে কন্‌স্ট্যাণ্ট ওয়াচ, এক মুহূর্ত আড়ালে গেলে চলবে না। আমার চাকর-বাকররা বিশ্বাসী, কিন্তু নেশাখোর, যখন নেশার বস্তু পায় না তখন সে ভয়ানক হয়ে ওঠে—তখন যেমন জাগবে তার হিংস্রতা, তেমনই জাগবে তার ধূর্তবুদ্ধি। তার থাকা সামলাতে ওরা পারবে না, টাকার লোভেও পড়ে যেতে পারে। সেইজন্যেই আমি পরিবারকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি।

—কিন্তু, সত্যি যদি উগ্র হয়ে ওঠে, বাড়ির লোকই কাউকে কাছে রাখলে হত না, ওর ওপরে যার প্রভাব বেশী, যেমন ওর বউদি?

—তার সহ্য হবে না। অত্যন্ত কষ্ট পাবে দিনকতক, তুমিই কেঁদে ফেলবে কিনা জানি নে। নেশা পাবে না, তার জন্যে প্রচণ্ড রিঅ্যাকশন আসবে। ক্রমাগত বিষের ফলে যেসব রোগের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, সেগুলোও বাক্ত হয়ে ফুটে বেরিয়ে আসবে, হোমিওপ্যাথি মতে যাকে বলে অ্যাগ্রাভেশন। সবই দেখতে পাবে, কারণ আমি ওকে দেব হোমিওপ্যাথিক ওষুধ।

আমি বিস্মিত হইলাম। কহিলাম, হোমিওপ্যাথি আপনি বিশ্বাস করেন?

ডাক্তার হাসিলেন। কহিলেন, ডাক্তারি কি আমার ধর্মমত, যে একটাকে মানি বলে আরেকটাকে অস্পৃশ্য মনে করব। সব সিস্টেমেরই কতকগুলো সাকসেস আছে, কতকগুলো ফেলিওর আছে। আয়ুর্বেদে নাড়ি-জ্ঞান আছে, এলোপ্যাথিতে নেই। এলোপ্যাথিতে

সার্জারি আছে, আয়ুর্বেদে নেই। এর চিকিৎসা হোমিও-প্যাথিতেই হবে। একটামাত্র ওষুধ আমি ব্যবহার করব প্রধানত। তার সঙ্গে নেহাৎ সঙ্গ উপসর্গ ঠেকাবার জন্যে দু'একটা খুচরা ওষুধ। যাও, লিখে দিচ্ছি, কিনে নিয়ে এস।

একটি স্লিপে তিনি ওষুধের নাম ও দোকানের ঠিকানা লিখিয়া দিলেন, কহিলেন, এদেরই কাছে কিনবে।

কহিলাম, বিষের নামটা কিছুতেই শুনতে দিলেন না, ওষুধের নাম শোনাচ্ছেন কেন?

ডাক্তার আবার হাসিলেন, কহিলেন, অধি হয়েছে? বিষের নাম বলি নি, কারণ নাম করে বলা বিপদ। ওষুধ বলে চলছে, তার মধ্যে এই বিষ আছে সেটা প্রমাণ করবার প্রত্যক্ষ উপায় নেই। এরা কাঁচা মরাকিন মেয়ে নয় তো, মানে তার কতকগুলো কম্‌পোনেন্ট্। ফল যা ফলল ঠিক হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু নাম করে যদি কেউ বলেছে তো তার নামে ডিফারমেশনের মামলা। বিষজোড়া ফাঁদ পেতেছে যারা, তারা কি সেটুকু আটঘাট না বেঁধে চলে?

ওষুধের নাম বলেছি, কারণ তোমাকেই হাতে করে খাওয়াতে হবে। আর, না হয় জেনেই রাখলে নামটা—যা চিকিৎসাটা, মরকিন্ মেয়ের কথা পেলে সেবে যাইবে, কি বল!

স্লিপখানা পড়িয়া দেখিলাম। ওষুধের নামটা এখনও মনে আছে, Avena Sativa—Q।

কহিলাম,—Q মানে কি?

ডাক্তার কহিলেন, মাদার টিংচার। তার মানে, র' একদম্‌টাক্‌ট। ডাইলিউশান নেই—তার মানে এলো-প্যাথিক মতে চিকিৎসাই করছি বলতে পার ধর্মভ্রষ্ট হই নি।

তার পর অধিজিতের চিকিৎসা শুরু হইল। সে কী ভীষণ ব্যাপার, চোখে না দেখিলে বিশ্বাস হইত না। নিজের চোখে দেখিয়াছি, তারপর বহুদিন হইয়া গিয়াছে। এখনও মধ্যে মধ্যে স্বপ্নের আগে সত্যই দেখিলাম না কল্পনা মাত্র।

সেদিন, প্রায় সমস্ত দিনই, অধিজিৎ অর্ধ অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিল। ডাক্তার কহিলেন, পূর্ব রাত্রির উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া। মধ্যে মধ্যে জাগিল, শূন্য দৃষ্টিতে তাকাইল যেন কিছুই চিনিতেছে না, বুঝিতেছে না। অত্যন্তরকম একটা দুর্বলতা ও শ্রান্তির প্রকাশ দৃষ্টিতে, আবার চক্ষু বুজিল। আমি সেই জাগরণের ফাঁকে ফাঁকে একটুখানি করিয়া দুধ বা বার্লিওয়াটার খাওয়াইয়া দিলাম, তাহার কিছু গিলিল কিছু গিলিল না।

সারারাত্রি ঘুমাইল না, খালি ছটফট করিল আর মধ্যে মধ্যে চমকাইয়া উঠিতে লাগিল। ডাক্তার কহিলেন, নেশা গিলেছিল প্রচুর পরিমাণে, তার কিছু অবশিষ্ট এখনও আছে দেহে ছড়িয়ে। এইবার শুরু হবে নতুন করে নেশার জন্যে আকাঙ্ক্ষা, আর তার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণার চাপে বা ভয়েই মানুষ আবার নেশা খায়, ছাড়তে পারে না। ওকে তাই পারতে হবে। যন্ত্রণা থাকা সেই যন্ত্রণা সহ্য করে তবে যদি বেঁচে ওঠে। ওষুধ সমানে চালিয়ে যাবে। নেশার আকাঙ্ক্ষাটা এই ওষুধে মেটাবে: যে ক্ষতি হয়েছে নার্ভ সিস্টেমের তার প্রতিক্রিয়াকে সামলাবে।

তাঁহার নির্দেশ মত ঔষধ খাওয়ানো শুরু করিলাম। সেই Avena : Sativa, এক এক বারে পনের ফোঁটা ঔষধ এক আউন্স গরম জলে দিয়া, ৪ ঘণ্টা অন্তর ৪ বার, একেবারে খালি পেটে নয়, যাহোক কিছু খাবার মুখে দিয়া।

পরদিন হইতে যন্ত্রণা শুরু হইল। ভোর হইতে আরম্ভ হইল বমি—এত প্রবল তাহার বেগ, মনে হইল গলার আর কপালের শিরাই বুঝি কাটিয়া যায়। আর সে বমিও ঘনঘন—আধঘণ্টা চল্লিশ মিনিট অন্তর এক একবার জোর বাতা আসে। দুইদিন এই বমির বেগ সমানে চলিল, তারপর যেমন হঠাৎ শুরু হইয়াছিল তেমনই হঠাৎ চলিয়া গেল। প্রতিক্রিয়ার প্রথম দিন

বসি, দ্বিতীয় দিন আরম্ভ হইল কিট। থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ বিকট চিৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া যায়, মুখ সাদা হইয়া, চক্ষু কপালে উঠিয়া যায়, দেহ ও সাড়টা বাঁকিয়া যায়, হাত দুইটা অর্ধেক ভাঁজ হইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে—মনে হয় এই বুঝি শেষ হইয়া। তখন ঠাসিয়া ধরিয়া বুকের উপরে জুতা উল্টাইয়া ধরি। জুতার গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে ক্রমে শান্ত হইয়া আসে, হাতের মুঠি ও দাঁতের খিল শিথিল হয়। তারপর ক্লান্তিতে এলাইয়া পড়ে। এই কিটও চলিল ঠিক দুইদিন ধরিয়া। ডাক্তার কহিলেন, মৃগীর সূত্রপাত হয়েছিল, সেইটে ছুঁড়ে পেরিয়ে গেল, আর হবে না।

চতুর্থ দিন, সকাল হইতে নূতন এক অবস্থা। কিট-টিট্ নাই, স্বাভাবিক মুখশ্রী, হঠাৎ চক্ষু মেলিয়া চাহিল, সহজ গলায় কহিল,—আপনি কে?

কহিলাম, আপনি কি চিনবেন?

—না, কিন্তু আমি এখানে এলাম কি করে?

কহিলাম, মনে পড়ে কিছু?

কি যেন মনে করিবার চেষ্টা করিল, মনে করিতে পারিল না। তারপর হঠাৎ অদ্ভুত সব কথা বলা শুরু করিল। দেখা গেল, তাহার স্মৃতি বলিয়াই কিছু নাই। একবার বলিল, নামিয়ে দিন তো। চেয়ারটায় বসব। খাট হইতে নামাইয়া, চেয়ারে বসাইয়া দিলাম। বসিয়া, আমাকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিল। খুব ফিসফিস করিয়া অতি গোপনে প্রশ্ন করিল, একটা কথা বুঝিয়ে দিন তো। আমি এখানে কখন থেকে আছি?

আমি কহিলাম,—কোথায়?

—এই—এই চেয়ারটাতে বসে আছি, কতক্ষণ? তার আগে কোথায় ছিলাম?

তাহার স্মৃতি একেবারে লুপ্ত হইয়াছে; মনে কিছু ধরিয়া রাখিতেই পারিতেছে না। একটা প্রশ্ন করে, উত্তর দিই, সেটাকে একবার আওড়ায়। ঠিক আধ মিনিট পরেই প্রশ্নটা আবার উচ্চারণ করে। আবার বলি, আবার একই প্রশ্ন। ডাক্তারকে কহিলাম, এ কি হ'ল? ডাক্তার কহিলেন, ভালই হল। সব ভুলে যাক, তা হলেই আর সে বিষের কথাও মনে পড়বে না। কবে কাকে ঠেসে ধরেছিল তাও মনে পড়বে না।

কিন্তু, এ কয়দিন ছিল শান্ত ও অবসন্ন। সেই দিন, চতুর্থ দিন রাত্রি হইতে হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ছটফট করে, হঠাৎ উঠিয়া বসে, বিছানার বালিশ তোষকের তলায়, কি হাতড়ায়। ডাক্তার কহিলেন, নেশা মনে পড়েছে। ওই সব জায়গাতেই রাখত। খুঁজে পাচ্ছে না।

খোঁজে, প্রশ্ন করি,—কি খুঁজছেন?

উত্তর দেয় না, এড়াইয়া যায়। বলে, না, সে কিছু না; বা বলে দেশলাই আছে নাকি দেখলাম।

একটা জিনিস লক্ষ্য করিলাম, রোজই সন্ধ্যার দিকে অস্থিরতা বাড়ে। ডাক্তার বলিলেন, মৌতাতের সময়, তাই।

সেদিন দুপুর রাত্রি হইতে উত্তেজনা বাড়িল। মধ্যে মধ্যে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, চীৎকার করিতে লাগিল। আর অবিশ্রান্ত কথা—অসংলগ্ন, অর্থহীন কথা। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার—জ্বর নাই, উত্তেজনা নাই, মুখে চোখে কোন ভাববিকৃতি নাই, অথচ কথা একেবারে অর্থহীন প্রলাপ। ডাক্তার কহিলেন, কাল দেখবে পুরো চেহারা।

পরদিন সকালে দেখিলাম, ঘোর উন্মাদ অবস্থা। জ্ঞান বলিতে কিছুই নাই, এবং কথাবার্তা আচরণ সকলই অত্যন্ত উত্তেজিত পাগলের আচরণ। বহুবার ছুটিয়া বাহির হইতে গেল। গায়ে এত অসম্ভব শক্তি যে আমি ধরিয়া রাখিতে পারি না। একবার, অন্যের অলক্ষ্যে, ঘুমের ভান করিয়া শুইয়া শুইয়া হঠাৎ আমাকে মারাত্মক আঘাত করিবার চেষ্টা করিল। উন্মত্ততা যখন অত্যন্ত বাড়িল, ডাক্তার বড় বড় কাপড়ের থলি দিয়া তাহার হাত পা ও দেহকাণ্ড খাটের সঙ্গে টানিয়া বাঁধিয়া দিলেন। যেন উঠিতে বা সরিয়া পড়িতে না পারে, ভয়ানক কিছু করিতে না পারে।

দেখিয়া শুনিয়া আমার ভয় হইল। কহিলাম, সারাতে গিয়ে উল্‌টো উৎপত্তিই ঘটিয়ে দিলাম না তো? এর চেয়ে, অল্প সল্প করে কাটিয়ে আনলে হ'ত না?

ডাক্তার কহিলেন, না। অল্প সল্প করে করাবার জিনিস এ নয়। সারতে হলে এক ধাক্কাতেই এর জড় মারতে হবে। উন্মাদ রোগের সূত্রপাত হয়েছিল এর মধ্যে তারই এটা অ্যাগ্রাভেশন।

আমি কহিলাম, কাল রাত্রে আমাকে গলা টিপে ধরেছিল, জানেন? হয় তো মেরে ফেলতেই চাইছিল।

ডাক্তার কহিলেন—অসম্ভব নয়। কারণ ওর নেশা ছাড়াবার চেষ্টা যে করবে তার ওপরে আক্রোশ তো হবেই। ওটা নেশারই ক্রিয়া—ভূত আর সাপের রোখ রোজাকে মারবার দিকে।

—যদি মারত সাপকে?

—ভালোই হত, তোমাকে আক্রমণ করেছিল, এটা তো প্রকাণ্ড সুসংবাদ।

—কারণ? আমি মার খেলাম বলে?

—না। ওর মধ্যে মারবার প্রবৃত্তি জেগেছে বলে। নেশার ফলে ওর সমস্ত নার্ভ আর চেতনা ঝিমিয়ে থাকত। সেইটে সেরে গিয়ে উগ্র চেতনা ফিরছে, এটা তার প্রমাণ।

আমি কহিলাম,—এটা মন্দ কথা নয়। সকলে ঠ্যাঙাবে বা বধ করবে, সেটাকে সুলক্ষণ বলে ভাবতে হবে আবার।

—তা তো হবেই। একটা মানুষকে বাঁচাবে, তার দাম নেবে না একটুও? যাবড়াচ্ছ কেন, ভয় পাচ্ছ ওকে নিয়ে একা থাকতে?

—তা পাচ্ছি নে। কিন্তু, ওর হাতে গায়ে যা জোর এসে যায় সে সময়ে ধরে আটকানোই যে শক্ত হয়ে ওঠে।

—সেইটেই তো উন্মাদ রোগের লক্ষণ। তা হোক, যাবড়িও না। আমার খুব আশা হচ্ছে, এর সারতে সময় নেবে না।

কিন্তু, এখন বোঝ, বাড়ির লোককে রাখতে চেয়েছিলে। বউ-ই হোক আর বউদি কিম্বা যেই হোক্ এই দৃশ্য সইতে পারত? যা চাইছে না দিয়ে থাকতে পারত?

তিনটি দিন অবিজিৎ পুরা উন্মাদ হইয়া রহিল। তাহার পরে যেটা হইল সে আরও অদ্ভুত। শেষের দিন বিকাল হইতে অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, আচ্ছন্নের মত শুইয়া পড়িয়া ছিল। আমি পাশে বসিয়া একটা বই পড়িতেছিলাম, হঠাৎ সে জাগিয়া উঠিল। অত্যন্ত সহজ ও স্বচ্ছ গলায় কহিল, ওটাতো সেকেণ্ড পার্ট, ওর প্রথম বইটা পড়েছেন?

আমি চমকিয়া উঠিলাম। এক মুহূর্তে এমন শান্ত স্বাভাবিক হইল কি করিয়া?

ডাক্তার কহিলেন,—এখন নিশ্চিন্ত।

সেই রাত্রিটা সে অতি নিবিড় ঘুমে ঘুমাইল। পরদিন দেখিলাম, একেবারেই স্বাভাবিক। খালি একটা খটকা তার মনে—তার খুব একটা অসুখ হইয়াছিল তাহার মনে আছে। অসুখটা কি সে সম্বন্ধে কোন ধারণা নাই। সেইটা জানিতে চায়। ডাক্তার কহিলেন, পরে জানবে। এখন তোমার কাজ হইতেছে শুধু ওষুধ খাওয়া, খাবার খাওয়া আর ঘুমোনো।

সে পরম নির্ভরে কহিল—আচ্ছা।

আমাকে ডাক্তার কহিলেন, এইবারেই শুরু হইল আসল চিকিৎসা, এবং এই সময়টাতেই সত্যিকার সাবধান থাকতে হবে।

আমি কহিলাম,—কিসের জন্যে?

ডাক্তার কহিলেন, আবার না বাস পায়। মানে রোগী যখন বিছানায় পড়ে থাকে, তখন চিকিৎসা করা সোজা, কারণ তখন সে একেবারে হাতের মুঠোয় আসে। এখন সুস্থ হয়ে, চলেফিরে বেড়াতে পারবে, কাজেই যদি ইচ্ছে করে আবার গোপনে মাল যোগাড় করে নেওয়া অসম্ভব হবে না।

—সে তো চিরদিনই।

—না। ঠিক তিনটি মাস। এই শুধু তিনটি মাস

ওকে নিয়মিত খেয়ে যেতে হবে। তাতে, যে অনিষ্ট হয়েছে দেহের, সেটা মোটামুটি পূরণ হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, দেহ এবং সিস্টেমটাই ওই ড্রাগের বিরোধী হয়ে উঠবে, তখন আর সে ড্রাগ খেতে চাইবে না। খেলেও সহ্য করতে পারবে না। সেই হবে সত্যকার রোগমুক্তি। কিন্তু তার জন্যে বিশেষ সতর্কতা দরকার।

—কি করতে হবে বলুন।

—পারবে?

—পারতেই হবে। এত কাণ্ড করে যদি টেনে তোলাই গেল, আর ওকে সে অভ্যাস রিল্যাপ্‌স করতে দেব না।

—যদি মারামারি করতে হয়?

—করব।

—ঠিক আছে। অতএব আর দেরি নয়। আজই ওদের বাড়িতে চলে যাও। সুস্থ আছে, এই খবরটুকু দিয়ে এস। নিয়ে আসবে না কাউকে, ওর মনকে চঞ্চল করা হবে না। তারপর আজই রাতের গাড়িতে ওকে নিয়ে তোমার ওখানে চলে যাও। সেখানে রাখবে, ওষুধ আর খাবার খাওয়াবে, তিনটি মাস। সেখানে নতুন জায়গাতে ভালোই থাকবে। এখানকার পরিবেশ মনে পড়বে না, আর সেখানে ইচ্ছে থাকলেও মাল যোগাড় করে নিতে পারবে না। সেখানে রাখবে পুরো সুস্থ করে দেবে।

—পুরো সুস্থ হ'ল কি না বুঝব কি করে?

দেখবে, ওর পুরোনো স্মৃতি এখন নষ্ট হয়ে আছে। সেটা ধীরে ধীরে ফিরে আসবে। সেইটেই হচ্ছে আরোগ্যের প্রমাণ। অবশ্য তার পরেও ওষুধ বেশ কিছুদিন চলবে। বেশ সুস্থ হয়ে গেলে, তখন তাকে বুঝিয়ে দেবে, কি তার হয়েছিল এবং কোন্ বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে। বুদ্ধিমান ছেলে বুঝবে।

—ধলিলের ব্যাপারটা, সে লোকটার কথা, বলব?

—বাবা খারাপ, তাই বলে কখনও! সে আমরা ভুলে গেছি। একদম!

ইহার পরের বিবরণ সংক্ষিপ্ত। আমার বাড়িতে অরিজিৎ দ্রুত সুস্থ হইয়া উঠিল। তাহার দেহে খুব মাংস লাগিল, মনে স্ফূর্তি আসিল। এক মাস না যাইতে এমন আনন্দে হাসি-হুল্লোড় আরম্ভ করিল আমার পরিবার সুদ্ধকে লইয়া, আমার লজ্জা করিতে লাগিল, এই আনন্দ হইতে তাহার নিজের পরিবার-পরিজনকে বঞ্চিত করিতেছি বলিয়া।

তিন মাস পরে যেদিন তাহাকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিলাম, সেদিন তাহাকে আর চেনা যায় না। স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে ও লাবণ্যতায় ঝলমল করিতেছে। এতখানি সম্পূর্ণ রূপ তাহার মধ্যে ছিল, পরিচয়ের প্রথম রাত্রিতে তাহা শুনিলেও বিশ্বাস করিতাম না। ডাক্তারকে প্রণাম করিয়া সে নিঃশব্দে হাসিমুখে দাঁড়াইল।

ডাক্তারের সমস্ত মুখ একটি অতি প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কহিলেন, সব বুঝিয়ে বলে দিয়েছ?

অরিজিৎ কহিল,—দিয়েছেন।

—মনে থাকবে তো? খবরদার।

অরিজিৎ হাসিল। কহিল, থাকবে।

আমিই ট্যাক্সি করিয়া তাহাকে বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলাম। কিছুটা দুষ্টবুদ্ধি করিয়াই পূর্বে কোন সংবাদ দিই নাই; হঠাৎ যখন বাড়ি সুদ্ধ মানুষের মধ্যে তাহাকে লইয়া গিয়া হাজির করিলাম, সে মুহূর্তটির বর্ণনা দিবার বৃথা চেষ্টা আমি করিব না, আমার সাধ্যে কুলাইবে না।

পর দিন সকলে দল বাঁধিয়া ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করিতে, বা তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিলেন।

যাইবার পূর্বে মিনতি আমাকে এক পাশে ডাকিয়া লইলেন। খুব সন্তর্পণে কহিলেন, বলবেন, ডাক্তার-বাবুর কী কত?

আমি কহিলাম, তা তো জানি নে।

মিনতি একটি খাম খুলিয়া, একটি সই করা চেক বাহির করিলেন, তাহাতে টাকার অঙ্ক লেখা নাই।

অত্যন্ত সসংকোচে কহিলেন, ব্যাঙ্কে আমার নিজের দু'হাজার টাকা আছে। তাতে কি হবে?

আমি কহিলাম, হওয়াই তো উচিত।

মিনতি আরও সংকুচিত হইয়া কহিলেন,—উনি আমার বাপের কাজ করেছেন, ওঁকে জিজ্ঞেস করতে আমি পারব না। আপনি দয়া করে এটা রাখবেন? ওঁকে জিজ্ঞেস করে টাকার অঙ্কটা বসিয়ে দেবেন?

কহিলাম,—দেব। দিন।

মিনতি একটু থামিলেন, তারপর তেমনই সংকোচের সহিত কহিলেন,—আর দেখুন, কী যদি আরও বেশী হয়, তবে আপনি আমাকে বলবেন?

—বলব।

ডাক্তারকে যখন বলিলাম, ডাক্তার হাসিলেন। কহিলেন,। দেখি। দাও চেকখানা।

হাত বাড়াইয়া চেকটি লইলেন। কলম খুলিয়া টাকার অঙ্ক লিখিলেন, ছাব্বিশ টাকা এগারো আনা।

কহিলাম,- ওটা কি হ'ল?

ডাক্তার কহিলেন,—ওষুধের দাম। নিজের ফীটা নেওয়া গেল না। ওষুধ দিয়েছি হোমিওপ্যাথি মতে, ফী নিলে আর চলে যাবে।

—

গল্প-ভারতীর সামান্য বৈশাখ সংখ্যা থেকে সাবার
"জীবনের প্রভাতসাথে" ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে।
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

There is first the literature of *knowledge*; and, secondly, the literature of *power*. The function of the first is, to teach; of the second is, to move.

—*De Quincey.*

Literature always anticipates life. It does not copy it, but moulds it to its purpose.

—*Oscar Wilde.*

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

শ্রীমতী বিবিক্তবাসিনী ও ন্যাথানেল ওয়েস্ট ॥

সুবীর রায়চৌধুরী

এই সত্য জগতে যতো ছলনা, ততো ছদ্মবেশ। কিন্তু আমরা এমন নির্মম পরিবেশে বাস করি যে, বিবেকের বিদ্রোহ সত্ত্বেও আমরা এই মুখোশ পরিত্যাগ করতে পারি না। আমরা একই সঙ্গে প্রবঞ্চক ও প্রবঞ্চিত। সমাজে প্রতিনিয়তই আমরা ছলিত হচ্ছি, অন্যদিকে বেঁচে থাকার জন্য আমাদেরকেও নানাবিধ ছলনার আশ্রয় নিতে হয়।

কথাগুলি বহুশ্রুত, সুতরাং দীর্ঘ বাক্যের মতো ক্লান্তিকর। কিন্তু প্রত্যেকেই যখন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দায় দিয়ে এই নির্মম সত্যের সম্মুখীন হই, তখনই বুঝতে পারি পুরনো হলেও এ থেকে কারো পরিত্রাণ নেই। কোনো মানুষের ছদ্মবেশটাই যখন সকলের কাছে সত্য পরিচয় হয়ে ওঠে, তখন তার করুণ অবস্থার চিত্রণ পাই ন্যাথানেল ওয়েস্টের উপন্যাসে।

ন্যাথানেল ওয়েস্ট দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বের ঔপন্যাসিক। যুদ্ধ শুরু হবার পরের বছর আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। ১৭ই অক্টোবর, ১৯০২ [মতান্তরে ১৯০৩] খৃষ্টাব্দে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। ন্যাথানেল ওয়েস্ট তাঁর ছদ্মনাম—আসল নাম ন্যাথান ওয়েনস্টাইন। লেখাপড়া করেছেন ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সেখান থেকে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে দর্শনে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাটালগে [১৭৬৪-১৯৩৪] তার জীবিকা হিসেবে একটি মার্কিন পত্রিকার সম্পাদক রূপে উল্লিখিত হয়েছে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে নাগাদ তিনি কিছুদিন নিউ ইয়র্কের একটি আবাসিক হোটেলের ম্যানেজার রূপে কাজ করেন। তার আগে তিনি বছর দুয়েক প্যারিসে কাটান। এই সময়ে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'The Dream life of Balso Tnoll' [১৯৩১]'। সমালোচকদের মতে এই উপন্যাসটি সূচনা করে—'the arrival of a curious and individual talent'। জীবিকার দিক দিয়ে ওয়েস্ট তখন কার্লোস উইলিয়মসের 'Contact' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ওয়েস্টের সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস 'Miss Lonelyhearts' বা শ্রীমতী বিবিক্তবাসিনী প্রকাশিত হয়। এক বছর পরে 'A Cool Million'

এরপর ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ওয়েস্ট হলিউডে গমন করেন এবং জীবনের অবশিষ্টকাল সেখানেই কাটিয়েছিলেন। হলিউডে তাঁর প্রথম কাজ হলো 'Twentieth century united Artists' নামক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে শ্রীমতী বিবিক্তবাসিনীর একটি চিত্রনাট্য তৈরি করেন। চিত্রনাট্যটির ইংরেজী নাম 'Advice to the Lovelorn' ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি 'Republic Pictures'-এর জন্য আরো অনেকগুলি চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'Ticket to Paradise', 'Follow Your Heart' এবং 'The President's Mystery.' শেষোক্ত ছবিটির কাহিনী পরিকল্পনা প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি একটি মৌলিক কাহিনীর চিত্ররূপ দেন, নাম 'Born To Be Loved' এ ছাড়া 'Five Came Back', 'I stole a Million' ইত্যাদি চিত্রগুলিতেও সহযোগী চিত্রনাট্য কারকরূপে কাজ করেন। হলিউডে ওয়েস্টের অভিজ্ঞতার চিত্রণ রয়েছে তাঁর শেষ উপন্যাস 'The Day of the Locust' [১৯৩৯]-এ।

ওয়েস্ট এবং তাঁর স্ত্রী এলিন ম্যাকফেলি ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হন। এর তিনদিন পর থেকেই শ্রীমতী ম্যাকফেলিকে নিয়ে লেখা তাঁর বোন রুথ ম্যাকফেলির 'আমার বোন এলিন'-এর অভিনয় নিউ ইয়র্কে শুরু হয়। নাটকের অভিনয় বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। মৃত্যুকালে ওয়েস্টের স্বজনদের মধ্যে তাঁর বোন লরা পেয়েলথাম জীবিত ছিলেন। এই সঙ্গে ওয়েস্ট 'The Night Before Christmas' [১৯৪১] নাটকটি রচনা করেন।

আমাদের আপাতত আলোচ্য দুটি উপন্যাস 'শ্রীমতী বিবিক্তবাসিনী' [Miss Lonelyhearts] এবং 'ক্রোড়পতি' [A Cool Million]। দুটো উপন্যাসেরই কাহিনী খুব সাধারণ। 'শ্রীমতী বিবিক্তবাসিনী' এই মোহিনী নামটি একটি ছদ্মনাম এবং তিনি আসলে পুরুষ। এই নামের আড়ালে তিনি নিউ ইয়র্কের দৈনিক 'পোস্ট ডিসপ্যাচ' পত্রিকার একটি বিভাগ নিয়মিত পরিচালনা করে থাকেন। বলা বাহুল্য এই বিভাগটিই উক্ত পত্রিকার সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং প্রশংসিত বিভাগ। পত্রিকায় শিরোনামার ঘোষণা থাকে: 'আপনি কি মানসিক দুশ্চিন্তায় ভুগছেন? আপনার কি এমন কোনো গোপন ব্যথা বা ব্যাধি আছে যার প্রতিকার আপনার জানা নেই? তা হলে আপনি শ্রীমতী বিবিক্তবাসিনীকে লিখুন, তিনি আপনার সকল দুঃখ-গ্লানি হরণ করবেন।'—যে ডেস্কে ব'সে শ্রীমতী বিবিক্তবাসিনী কাজ করেন তার সামনে কার্ডবোর্ডে ঝোলানো এই শুভ-বাণীটি :

বিবিক্তবাসিনীর হৃদয় আমাকে উদ্ভাসিত করুক
বিবিক্তবাসিনীর দেহ আমাকে দণ্ডায়িত করুক
বিবিক্তবাসিনীর রক্ত আমাকে উদ্দীপিত করুক
বিবিক্তবাসিনীর অঙ্গ আমাকে পরিষাক্ত করুক

তারপর শুরু হয় পত্রপাঠ ও উত্তর দান। পত্রদাতারা সত্যিই বিপন্ন এবং আন্তরিকভাবে বিষাদ করেন শ্রীমতী বিবিক্তবাসিনী তাঁদের ত্রাণ করতে পারেন। কত বিচিত্র পত্রই আসে, প্রত্যেকটিই মূর্মুর্ আর্তনাদে পূর্ণ!

প্রিয় বিবিক্তবাসিনী,

মাঝে-মাঝে বুকে এমন যন্ত্রণা হয় যে, মনে হয় আত্মহত্যা করি। আমার স্বামীর ধারণা যে, গর্ভযন্ত্রণা তুচ্ছ ক'রে যে বারবার সন্তান ধারণে রাজী না হয় সে যথার্থ ক্যাথলিক নয়। গির্জেতে রীতিমতো শাস্ত্রীয়মতে আমাদের বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু আমি তখনও জানতাম যে বিবাহিত জীবনটা আসলে কি। কেননা স্বামী-স্ত্রী বিষয়ে আমাকে কেউ কোনোদিন কিছু বলে নি। আমার ঠাকুরমা, আসলে যিনি ছিলেন আমার খাঁটি মা, আমাকে কোনোদিন কিছু না জানিয়ে মস্ত ভুল করেছেন। কেননা সরল থেকে লাভ নেই, শুধু নৈরাশ্য বাড়ে। বারো বছরের মধ্যে আমি সাতটি সন্তানের জননী এবং শেষ দুই সন্তানের প্রসবকাল থেকে আমি শয্যাশায়ী অসুস্থ। দু'বার আমার অস্ত্রোপচার করা হয় এবং ডাক্তারের নির্দেশে আমার স্বামী আমাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে এবার আমাকে অব্যাহতি দেবেন, কেননা ডাক্তার বলেছিলেন তা না হ'লে আমার প্রাণহানির আশঙ্কা। আমি হাসপাতাল থেকে ফিরে এলেই স্বামী তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন এবং এখন আমি সন্তানসম্ভবা। বুকের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না। আমার যন্ত্রণা আরো বেড়ে যায় এই কারণে যে, আমি ভ্রূণহত্যা করতে পারি না, কেননা আমি ক্যাথলিক এবং আমার স্বামী নিষ্ঠাবান ধার্মিক। যন্ত্রণায় সব সময় আর্তনাদ করি—কি করবো জানি না।

ইতি—তিক্তবিরক্ত জনৈকা।

শ্রীমতী বিবিক্তবাসিনী খোলা দুয়ারে চিঠিটা ফেলে সিগারেট ধরান। তারপর আর একটি চিঠি তুলে নেন :

শ্রীমতী বিবিক্তবাসিনী মাননীয়াসু,

আমি এখন ষোড়শী এবং জানি না কি করবো। দয়া ক'রে যদি কোনো সন্ধান বলে দেন তবে বাধিত হবো। যখন ছোটো ছিলাম তখন বাচ্চাদের পেছু লাগায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমি বড়ো হয়েছি, এখন আমিও চাই অন্য মেয়েদের মতো ছেলে বন্ধু জোটাতে, শনিবার রাতে বেরোতে—কিন্তু কোনো ছেলেই আমাকে নিতে চায় না। কেননা জন্ম থেকেই আমার নাক নেই। যদিও আমি খুব ভালো নাচ জানি, আমার গড়ন ভালো, বাবা আমাকে সুন্দর-সুন্দর জামা কিনে দেন।

আমি সারাদিন ব'সে থাকি, নিজেকে দেখি আর কাঁদি। মুখের মাঝখানটায় মস্ত বড়ো গর্তের জন্য লোকে আমাকে দেখে ভয় পায়, এমন কি আমি নিজেও পাই। সেজন্য আমাকে নিয়ে না বেরুবার জন্য অন্য ছেলেদের খুব বেশি দোষ দিতে পারি না। মা আমাকে খুব ভালোবাসেন, কিন্তু আমার দিকে চাইলেই মা কান্নায় ভেঙে পড়েন। কোন্ পাপে আমার এই শাস্তি। যদি কোনো খারাপ কাজের ফলে এই নিগ্রহ হয়, তাহলেও এই দুষ্কৃতি আমি আমার এক বছর হবার আগেই করেছিলাম। কেননা আমি এই ভাবেই জন্মেছি। বাবাকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি বলেন যে তিনিও জানেন না। হয়তো অন্য জগতে কোনো পাপ করেছিলাম তাই এই শাস্তি, অথবা এ-ও হ'তে পারে পিতার পাপের জন্য আমার এই দুর্ভোগ। আমার কিন্তু তা বিশ্বাস হয় না—তিনি এতো ভালোমানুষ। আমি কি আত্মহত্যা করবো ?

বিনীতা—একজন মরিয়া

শ্রীমতী বিবিক্তবাসিনীর কাছে এই ধরনের চিঠি যতোই বিরক্তিকর হোক না কেন, সহকর্মীরা বেশ মাঝে-মাঝে উপভোগ করেন। গোস্তখিথ তাঁর ডাকব্যাগ থেকে একটা চিঠি তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করে দেন :

প্রিয় বিবিক্তবাসিনী,

চিঠি লেখা-টেখা আমার ভালো আসে না। যদি আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারতাম। আমার মোটে বত্রিশ বছর বয়েস এবং এর মধ্যেই আমার জীবনে অনেক ঝড়-ঝাপ্টা গেছে। আমার বিয়ে হয়েছে এক বিকলাঙ্গের সঙ্গে। আমার কিছু সৎপরামর্শের দরকার। কিন্তু আমার অবস্থা চিঠিতে খুলে বলা সম্ভব নয়। কেন না চিঠি লেখার হাত আমার নেই এবং তা হলে একজন লিপি-বিশেষজ্ঞের দরকার হবে। আমি জানি আপনি একজন পুরুষ এবং এর জন্য আমি খুব খুশি, কারণ মেয়েদের আমি বিশ্বাস করি না। ডেলিহাটিতে একজন আপনাকে দেখিয়ে বলে আপনিই নাকি কাগজের উত্তরগুলো দেন। আপনাকে দেখবার পরই মনে মনে বললাম, ইনিই একমাত্র লোক যিনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন। আপনার পরনে ছিল নীল সুট এবং ছাই-রঙা টুপি। আমি তখন আমার পঙ্গু স্বামীকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। আপনাকে আসতে বলতে একটুও খারাপ লাগছে না। মনে হচ্ছে আপনি যেন আমার চেনা। সুতরাং দয়া করে বার্গেস ৭-৭০১৯-এ ফোন করবেন—আমার দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে আপনার পরামর্শের বিশেষ দরকার।

ইতি—আপনার অনুরাগিনী কে. ডেল।

চিঠিটি পড়ে গোল্ডস্মিথ বিবিকভাষিনীকে ব্যঙ্গ করে। "তারপর ভক্টরেতরি, কি পরামর্শ দেবে ? আত্মহত্যা ? তার চেয়ে যাবা, সন্তান সংখ্যা বাড়িয়ে পত্রিকার ভবিষ্যৎ প্রচার বাড়াও না কেন ?" প্রথম প্রথম বিবিকভাষিনীর কাছেও সমস্ত ব্যাপারটাই কৌতুকপ্রদ ছিল। তিনি চিঠিগুলো পড়তেন আর মনে মনে ভাবা খুঁজতেন সাহসার্ত সান্ত্বনার। কখনো ক'উকে উপদেশ দেন যীশুই প্রেম ; কাউকে বলেন, অবিচলিতভাবে স্বামীকে ভালোবাসার জন্য। তাঁর কাছে এটা জীবিকা মাত্র।

কিন্তু জীবিকার খাতিরেও চিরকাল অন্যের জীবনকে নিয়ে উপন্যাস করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'লো না। মানুষের দুর্দশা নিয়ে তত্ত্বকথা অসহ্য। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে, যতোদিন এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি লঘু ও চপল ছিলো, ততোদিন তাঁর জীবনও নিশ্চিন্ত নিরাপদ ছিল। আন্তরাগের মহৎ ব্রত বিষয়ে সচেতন হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠানে পেলেন উন্মাদনা ও মৃত্যু। সেই শ্রীমতী কে, ডরেল, যার পত্র আগেই উদ্ধৃত হয়েছে,—হলেন তাঁর মৃত্যুর কারণ। উক্ত প্রেমবিলাসিনী পৃথুলা শ্রীমতী বিবিকভাষিনীকে ধারবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ওই পঙ্গু স্বামীকেই উত্তেজিত করলেন যে তার সতীত্ব বিপন্ন ! তারপর শেষ যুদ্ধে বিবিকভাষিনী আলিঙ্গনের পরিবর্তে উক্ত ভদ্রলোকের কাছ থেকে পেলেন ঘুষোটের আঘাত।

ওয়েস্টের 'ক্রোড়পতি' উপন্যাসটিতে বিদ্রূপের চেয়ে ব্যঙ্গ অনেক তীব্র। অব্যবসায় এবং সততার অতি মৈত্র থেকে কপাল ফেরানোর উপকথাকে নির্মমভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে উক্ত উপন্যাসে। সেমুয়েল পিটকিন বিধবা মায়ের দুঃখ ঘোচাবার জন্য ভাগ্যান্বেষণে একা নিউ ইয়র্ক যাত্রা করলো। কিন্তু ভাগ্যকে সে কি ক'রে জয় করবে, ভাগ্য তাকে প্রতিটি ঘটনায় বিপর্যস্ত করেছে। সেই গোড়া থেকেই শুরু করা যাক। পাগলা কুকুরের হাত থেকে কিশোরী বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে কুকুরের মালিকের সঙ্গে প্রথমে বচসা, পরে সংঘর্ষ। ফলে সে চৈতন্য হারালো। এবং তার কিশোরী বন্ধুটি শুধু কুকুরের মালিকের পাশবিক বৃত্তির কাছে হার মানলো তাই নয়, এর পর আমরা তাকে দেখতে পাবো জনৈক চীনা পরিচালিত একটি আন্তর্জাতিক বেশ্যালয়ের বন্দিনী হিসাবে। যাই হোক, বাড়ির একমাত্র সম্পত্তি কয়েকটি গোরু বন্ধক রেখে সংগৃহীত সামান্য অর্থ নিয়ে পিটকিন ভাগ্যান্বেষণে যাত্রা করলো।

রেলের কামরায় আলাপ হলো ক্রোড়পতি এক অভিজাত ভদ্রলোকের সঙ্গে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের নিকট আত্মীয়। কিন্তু তিনি নেমে যাবার কিছু পরেই পিটকিন বুঝতে পারলো উক্ত ক্রোড়পতি আসলে পকেটমার। কিন্তু তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। তার সমস্ত টাকা অপহৃত হলেও পকেটমার তার হাতের অতি মূল্যবান আংটি ফেলে গেছে। পিটকিন ভাগ্যান্বেষী। তার অপহৃত অর্থের পরিমাণ মাত্র আটাশ ডলার এবং ছয় সেন্ট। আংটির মূল্য অনেক বেশি, এতো টাকা সে নিতে পারে না। পাশেই বসে ছিলো একজন পাদ্রে-পড়া মহরি। সে দেখে শুনে বললো,—"আমি তোমাকে আপাতত তোমার হারা পাওনা ওই আটাশ ডলার ছয় সেন্ট দিচ্ছি আর লেখাপড়া থাকলো আসল মালিক ধরা পড়লে আমি বাকি টাকা দিয়ে দেবো।" পিটকিন সরল মনে সানন্দে সই করলো। ওই সই করা কাগজের ভিত্তিতেই পিটকিন কিছুক্ষণ পরে গ্রেপ্তার হলো কুখ্যাত পকেটমার হিসেবে। তারপর হাজতে চালান। কারাদণ্ডের আদেশের পর সাক্ষাৎ হলো জেলরের সঙ্গে। তিনি মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে দুষ্কৃতদের চিকিৎসা করে থাকেন। তাঁর মতে, যাবতীয় অপরাধের মূলে মানসিক অসুস্থতা। আর দাঁতই হচ্ছে যাবতীয় রোগ জীবাণুর মূলে। সুতরাং পিটকিনের সব দাঁতগুলো উৎপাটিত ক'রে বরফ জলে ধোয়া হলো। তেরো-চোদ্দ ঘায় বরফ ধোয়া আর ভাজসেঁতে ঘরে পিটকিনের ছুটো ফুসফুসই অথম হলো। ইতিমধ্যে খবর

এলো পিটকিন নির্দোষ, আসল আসামী ধরা পড়েছে। নির্লজ্জ জেলর তাকে এগিয়ে দিতে-দিতে বললো—"তুমি যদি এই সময়টা নিউ ইয়র্কে হপ্তায় পনেরো ডলারের কোনো চাকরি করতে, তাহলে কুড়ি হপ্তা জেলে কাটানোর ফলে তোমার মোট ক্ষতি হলো তিনশো ডলার। কিন্তু খাকা-খাওয়া বাবদ তোমার খরচ পড়তো সাত ডলার করে মোট একশো চল্লিশ ডলার। সেই খরচটা বেঁচে যাবার ফলে তোমার ক্ষতির পরিমাণ মোট দাঁড়াচ্ছে একশো ষাট ডলার। কিন্তু ডেন্টিস্টের কাছে পুরো দু'পাটি দাঁত তুলতে তোমার অন্তত দুশো ডলার পড়তো। সুতরাং তোমার চল্লিশ ডলার তো লাভ হলোই, তা ছাড়া আমি তোমাকে যে বাঁধানো দাঁত দিচ্ছি [এই বাঁধানো দাঁত নিয়েও পিটকিনকে যথেষ্ট নাকাল হতে হয়েছে] তার নতুন দাম অন্তত কুড়ি ডলার, বর্তমান দাম পনেরো ডলার তো হবেই। সুতরাং তোমার বয়সের ছেলের পক্ষে জেলে থেকে কম রোজগার হলো না।"

এরপর একে একে কিছুটা পরোপকার, কিছুটা সদুপায়ে অর্থাহরণে পিটকিন কি ক'রে বুড়ো আঙুল, একটি চোখ, একটি পা এবং শেষ পর্যন্ত প্রাণ বিসর্জন দিলো তার বিস্তৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার পরিসর আপাতত নেই। তারপর একেবারে শেষ অঙ্কে দেখতে পাচ্ছি, পিটকিন জাতীয় শহীদে পরিণত—একটি মার্কিন ফ্যাসিস্ট দল তাকে জাতীয় নেতা করে তুলেছে। তার জন্মদিন উপলক্ষে জাতীয় ঊর্ধ্ববিরতি দিবস মহাসমারোহে পালিত হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন পিটকিনের অভাগিনী মাতা যাঁর দুঃখ মোচনের জন্য সে নিউ ইয়র্কে গিয়েছিল, আর আছে পিটকিনের সেই কিশোরী বন্ধু যেটি প্রেইরি। এখন সে আর কিশোরী নয়, সম্ভ্রান্ত মহিলা—খোদ প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারি।

উদ্দেশ্য অপরাধে দুধের শাস্তি এবং প্রায়শ্চিত্তের কাহিনী টলস্টয়ও রচনা করেছেন। কিন্তু "God sees the Truth but He Waits" গল্পে ঈশ্বরের মহিমার প্রতি যে-অবিচল নিষ্ঠা ও বিশ্বাস রয়েছে, বলা বাহুল্য ভাথানেল ওয়েস্টের তা নেই। তিনি মানুষ এবং ঈশ্বর বিষয়ে সমান নির্মম, পুরোপুরি নাস্তিক। যুগধর্মের ফলে পিটকিনের এই ধারণ নৈঃসঙ্গ্য আমাদের অনেক কাছের মনে হয়।

ভাষা ও সাহিত্য।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্যামাচরণবাবু বলিয়াছেন এবং সকলেই জানেন যে, বাঙ্গালা শব্দ ত্রিবিধ। প্রথম সংস্কৃত মূলক শব্দ, যাহার বাঙ্গালায় রূপান্তর হইয়াছে, যথা—গৃহ হইতে ঘর, ভ্রাতা হইতে ভাই; দ্বিতীয়, সংস্কৃত মূলক শব্দ, যাহার রূপান্তর হয় নাই। যথা—জল, মেঘ, সূর্য। তৃতীয়, যে সকল শব্দের সংস্কৃতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই।

প্রথম শ্রেণীর শব্দ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, রূপান্তরিত প্রচলিত সংস্কৃতমূলক শব্দের পরিবর্তে কোন স্থানেই অরূপান্তরিত মূল সংস্কৃত ব্যবহার করা কর্তব্য নহে, যথা—মাথার পরিবর্তে মস্তক, রামণের পরিবর্তে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ব্যবহার করা কর্তব্য নহে। আমরা বলি যে, এক্ষণে রামণও যেরূপ প্রচলিত, ব্রাহ্মণ সেইরূপ প্রচলিত। ● ● ● যাহা প্রচলিত হইয়াছে, তাহার উচ্ছেদে কোন ফল নাই এবং উচ্ছেদ সম্ভবও নহে। ● ● ● নিষ্কারণ ভাষাকে 'ননবনদ্য' করা কোন ক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে। আর কতকগুলি এমত শব্দ আছে যে, তাহাদের রূপান্তর ঘটিয়াছে, আপাততঃ বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক রূপান্তর ঘটে নাই, কেবল সাধারণের উচ্চারণের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। সকলেই উচ্চারণ করে 'খেউরি,' কিন্তু 'ক্ষৌরী' লিখিলে সকলে বুঝে যে, এই সেই 'খেউরি' শব্দ। এ স্থলে ক্ষৌরীকে পরিত্যাগ করিয়া খেউরি প্রচলিত করায় কোন লাভ নাই। বরং এমত স্থলে আদিম সংস্কৃত রূপটি বজায় রাখিলে তাহার স্থায়িত্ব জন্মে। কিন্তু এমন কতকগুলি শব্দ আছে যে, তাহার আদিমরূপ সাধারণের প্রচলিত বা সাধারণের বোধগম্য নহে—তাহার অপভ্রংশই প্রচলিত এবং সকলের বোধগম্য। এমত স্থলেই আদিমরূপ কদাচ ব্যবহার্য্য নহে।

যদিও আমরা এমন বলি না যে, 'ঘর' প্রচলিত আছে বলিয়া গৃহ শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে, অথবা মাথা শব্দ প্রচলিত আছে বলিয়া মস্তক শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে; কিন্তু আমরা এমত বলি যে, অকারণে ঘর শব্দের পরিবর্তে মস্তক, অকারণে পাতার পরিবর্তে পত্র এবং তামার পরিবর্তে তাম্র ব্যবহার উচিত নহে। কেননা, ঘর, মাথা, পাতা তামা, বাঙ্গালা, আর গৃহ, মস্তক, পত্র, তাম্র সংস্কৃত। বাঙ্গালা লিখিতে গিয়া অকারণে বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত কেন লিখিব? আর দেখা যায় যে, সংস্কৃত ছাড়িয়া বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিলে রচনা অধিকতর মধুর, সুস্পষ্ট ও তেজস্বী হয়। 'হেভ্রাত' বলিয়া যে ডাকে, বোধ হয় যেন সে যাত্রা করিতেছে; 'ভাই রে' বলিয়া যে ডাকে, তাহার ডাকে মন উছলিয়া উঠে। অতএব আমরা ভ্রাতা শব্দ উঠাইয়া দিতে চাই না বটে, কিন্তু সচরাচর আমরা ভাই শব্দই ব্যবহার করিতে চাই। ভ্রাতা শব্দ রাখিতে চাই, তাহার কারণ এই যে, সময়ে সময়ে তদ্ব্যবহারে বড় উপকার হয়। 'ভ্রাতৃভাব' এবং 'ভাইভাব', 'ভ্রাতৃত্ব' এবং 'ভাইগিরি' এতদুভয়ের তুলনায় বুঝা যাইবে যে, কেন ভ্রাতৃ-শব্দ বাঙ্গালায় বজায় রাখা উচিত। এই স্থলে বলিতে হয় যে, আজিও অকারণে প্রচলিত বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত ব্যবহারে, তাই ছাড়িয়া অকারণে ভ্রাতৃ-শব্দের ব্যবহারে অনেক লেখকের বিশেষ আসক্তি আছে। অনেক বাঙ্গালা রচনা যে নীরস, নিস্তেজ এবং অস্পষ্ট, ইহাই তাহার কারণ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দ, অর্থাৎ যে সকল সংস্কৃত শব্দ রূপান্তর না হইয়াই বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তৃতীয় শ্রেণী, অর্থাৎ যে সকল শব্দ সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধশূন্য, তৎসম্বন্ধে শ্যামাচরণবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সারগর্ভ এবং আমরা তাহার সম্পূর্ণ

অনুমোদন করি। সংস্কৃত প্রিয় লেখকদিগের অভ্যাস যে, এই শ্রেণীর শব্দ সকল তাঁহারা রচনা হইতে একেবারে বাহির করিয়া দেন। অন্যের রচনায় সে সকল শব্দের ব্যবহার শেলের ন্যায় তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করে। ইহার পর দুর্ঘটা আমরা আর দেখি না। * * *

তাহার পরে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দকে বাঙ্গালা ভাষায় নূতন সন্নিবেশিত করার উচিতা বিচার্য্য। দেখা যায়, লেখকেরা ভূরি ভূরি অপ্রচলিত নূতন সংস্কৃত শব্দ প্রয়োজনে বা নিষ্প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা আজিও অসম্পূর্ণ ভাষা। তাহার অভাব পূরণ জন্য অন্য ভাষা হইতে সময়ে সময়ে শব্দ কর্জ্জ করিতে হইবে। কর্জ্জ করিতে হইলে, চিরকেলে মহাজন সংস্কৃতের কাছেই ধার করা কর্ত্তব্য। * * কিন্তু নিষ্প্রয়োজনে অর্থাৎ বাঙ্গালা শব্দ থাকিতে তদ্বাচক অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার যাঁহারা করেন, তাঁহাদের কিরূপ রুচি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

মূল কথা, সাহিত্য কি জন্য? গ্রন্থ কি জন্য? যে পড়িবে, তাহার বুঝিবার জন্য। না বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া, পাঠক আহি আহি করিয়া ডাকিবে, বোধ হয়, এ উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ লিখে না। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে যে ভাষা সকলের বোধগম্য—অথবা যদি সকলের বোধগম্য কোন ভাষা না থাকে, তবে যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য—তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত। যদি কোন লেখকের এমন উদ্দেশ্য থাকে যে, আমার গ্রন্থ দুই চারিজন শব্দপণ্ডিতে বুঝুক, আর কাহারও বুঝিবার প্রয়োজন নাই, তবে তিনি গিয়া দুরূহ তত্ত্বায় গ্রন্থপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন। যে তাঁহার যশ করে করুক, আমরা কখন যশ করিব না। তিনি দুই এক জনের উপকার করিলে করিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে পরোপকার-কাতর খলস্বভাব পাষণ্ড বলিব। তিনি জ্ঞানবিতরণে প্রবৃত্ত হইয়া চেষ্টা করিয়া অধিকাংশ পাঠককে জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে দূরে রাখেন। যিনি যথার্থ গ্রন্থকার, তিনি জানেন যে, পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই, জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই; অতএব যত অধিক ব্যক্তি গ্রন্থের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি উপকৃত—ততই গ্রন্থের সফলতা। জ্ঞানে মনুষ্য-মাত্রেরই তুল্যাধিকার। যদি সে সর্বজনের প্রাপ্য ধনকে, তুমি এমত দুরূহ ভাষায় নিবদ্ধ রাখ যে, কেবল যে কয়জন পরিশ্রম করিয়া সেই ভাষা শিখিয়াছে, তাহারা ভিন্ন আর কেহ তাহা পাইতে পারিবে না, তবে তুমি অধিকাংশ মনুষ্যকে তাহাদিগের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিলে। তুমি সেখানে বঞ্চক মাত্র।

* * *

অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য্য, সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য—সে স্থলে সৌন্দর্য্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়। প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্ ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্ত্তার ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কোন উচ্চ ভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদী বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেব বাবু প্রবর্ত্তিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং

সৌন্দর্য্য হয়, তবে সাধারণ ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য্যসিদ্ধি না হয়, আরও উপরে উঠিবে। প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই—নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথা-গুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে। যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি, আরবী, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অন্ধ'ল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না। তার পর সেই রচনাকে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট করিবে—কেন না, যাহা অসুন্দর, মনুষ্যচিত্তের উপরে তাহার শক্তি অল্প। এই উদ্দেশ্যগুলি যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, সেই চেষ্টা দেখিবে—লেখক যদি লিখিতে জানেন তবে সে চেষ্টা প্রায় সফল হইবে। আমরা দেখিয়াছি, সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী। কিন্তু যদি সে সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তবে কাজেকাজেই সংস্কৃতবহুল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে নিঃসঙ্কোচে সে আশ্রয় লইবে।

ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি। নব্য ও প্রাচীন উভয় সম্প্রদায়ের পরামর্শ ত্যাগ করিয়া, এই রীতি অবলম্বন করিলে, আমাদিগের বিবেচনায় ভাষা শক্তিশালিনী, শব্দৈশ্বর্য্যে পুষ্টা এবং সাহিত্যালঙ্কারে বিভূষিতা হইবে।

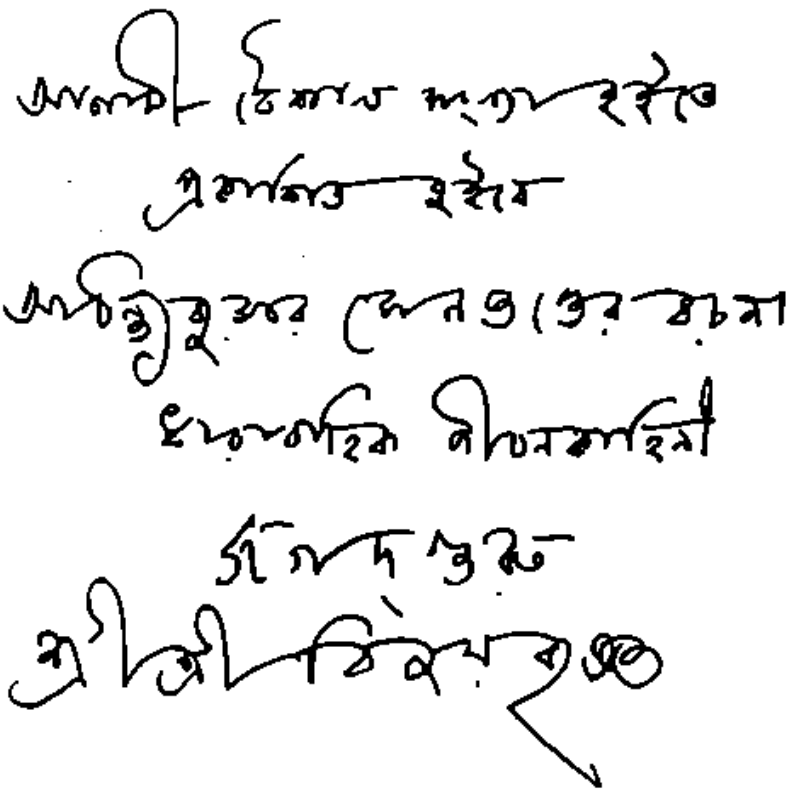

সাহিত্য সংবাদ

রবীন্দ্রনাথের নামে.....

কবি আমাদের যা দিয়ে গেছেন, তা অনুপম ও বিশ্বরসে আমাদের বুদ্ধির সীমানা বাড়ায়। উহার আলোতে মন সহসা ঝলকিত করে এবং পরিশেষে পরিশুদ্ধ স্বভাবের নৈকট্যবোধ সৃষ্টি করে তাঁর সাহিত্য।

মহর্ষিকে আমাদের বুদ্ধির জড়তাকে ভাঙবার অস্ত্র দিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। কিছুই বাদ যায়নি। সাহিত্য, রাষ্ট্রচিন্তা, সংগীত, শিক্ষা সব কিছুতে তিনি মৌলিকতা দান করে গিয়েছেন। শতবার্ষিকী উৎসব কোন না কোন ভাবে হয়ত অকৃতজ্ঞ উত্তরাধিকারী আমাদের কৃতজ্ঞতাবোধ জাগিয়েছে তাহলেও কবির সম্পর্কে সত্যিকারের কৃতজ্ঞতাবোধে চিন্তাচর্চা প্রয়োজনের তুলনায় বিন্দুমাত্র হয় নি। কৃতজ্ঞতাবোধ এখন ভক্তিসর্বস্ব। রবীন্দ্র-সাহিত্যবিচার এখন পূজাবিশেষ। এ ত তিনি চান নি। মনের স্বাধিকার এবং সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনের ওপর বরাবর তিনি জোর দিয়েছিলেন।

সাহিত্য আকাদেমী কিছুদিন পূর্বে একটি মূল্যবান সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা অভিনন্দন জানাই সে সিদ্ধান্তকে। তাঁরা ঠিক করেছেন, রবীন্দ্রনাথের নামে একটি পত্রিকা বের করবেন। ত্রৈমাসিক পত্রিকা। যেমন ইংল্যাণ্ডে শেক্সপীয়ারের নামে শেক্সপীয়ার সার্ভে এবং কীট্স্ শেলীর নামে কীট্স্ শেলী মেমোরিয়েল বুলেটিন প্রকাশিত হয়।

আকাদেমী রবীন্দ্র-পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব দিয়েছেন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের হাতে। এই পত্রিকা অন্ধ রবীন্দ্রভক্তির আবহাওয়া যেন সৃষ্টি না করে এবং রবীন্দ্রনাথের অপব্যাখ্যাও যেন না করেন এ আশাই করি। রবীন্দ্রনাথ জাতির সমগ্র মানসলোকে যে উদার, সংস্কারমুক্ত এবং বাধাবন্ধনহীন সুস্থ জীবনসৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছিলেন, এখন তার জরুরী প্রয়োজন বিবেচনায় রবীন্দ্র-সাহিত্যবিচার যাতে যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়, সেদিকে নজর দিলে রবীন্দ্রনাথের নামে পত্রিকা প্রকাশ সার্থকতা লাভ করবে।

তাঁরি আদেশের অন্তর্গত.....

বিখ্যাত মার্কিনদেশীয় 'লাইফ' পত্রে "The Old Man and the Sea" প্রকাশিত হল ১৯৫২ সনে, তখন জগৎময় প্রসিদ্ধি অর্জন করলেন হেমিংওয়ে। ১৯৫৪ সনে নোবেল পুরস্কার তাঁকে দেওয়া হল। হেমিংওয়ে বিশ্বজনের কাছে জনপ্রিয় হলেন; লিখলেন "A Farewell to Arms", "Men Without Women" প্রভৃতি।

শিকারীরূপে সুদক্ষ এই সাহিত্যিক অবশেষে দিনে দিনে তাঁর নিজের শরীরের শিকার হয়ে পড়লেন। আফ্রিকার বিমান দুর্ঘটনায় তিনি নিদারুণ আঘাত পেয়েছিলেন। একে একে লিভার বিদ্রোহ করল, রক্তচাপ বৃদ্ধি পেল এবং ক্রমে ক্রমে মানসিক অবস্থা চক্রান্ত সুরু করল। ১৯৬০ সনের নভেম্বর থেকে হাসপাতাল আর বাড়ি করলেন, কিন্তু রেহাই পেলেন না। শরীর পুরোপুরি বিশ্বাসঘাতকতা আরম্ভ করে দিয়েছে। শিকারী কিন্তু পুরোপুরি শরীরের শিকার হতে নারাজী হলেন। অবশেষে নিজের সেই বন্দুকটি যা দিয়ে বহুজনকে মৃত্যুর উপহার দিয়েছিলেন চেপে ধরলেন মুখে এবং সবশেষে সেই নির্মম সংবাদটি একদিন সবাই জানতে পারলেন।

মারলিন ডিয়েট্রিচ তাঁকে ডাকতেন, 'পাপা'। তিনিও চাইতেন এই নামে লোকে তাঁকে ডাকুক। স্বভাবতঃই সেই কারণে স্ত্রী বেরী হেমিংওয়ে তাঁকে ডাকতেন ওই নামে। 'পাপা'।

'পাপা' মারা গেলেন বটে, তাঁর স্ত্রী কিন্তু স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী। তিনি স্বামীর অপ্রকাশিত রচনা খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। তিনি গেলে হাভানায়, গেলেন কী ওয়েষ্টে। যা পেলেন সযত্নে সংগ্রহ করে আনলেন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রচনাবলী। তাঁরি আদেশে সবগুলো জড়ো করলেন মানহাট্টনের বাড়িতে। প্রকাশক খবর পেয়ে ছুটলেন সেখানে। রচনাগুলো নাকি চারখানা উপন্যাস তৈরি হবার উপকরণ। এখনো ঠিক হয়নি আলো অথবা কবে প্রকাশিত হবে। তাঁরা—প্রকাশক ও পাপার স্ত্রী মেরী আলোচনা করছেন। মেরীকে জিজ্ঞেস করা হল, প্রকাশিত হবে কি? তিনি উত্তর করলেন,—"I am under Papa's orders. I must do my utmost to know what he would want done about his work."

কোন আমেরিকান সাহিত্যসমালোচক হেমিংওয়েকে আখ্যা দিয়েছেন—"essentially a philosophical writer."। এ বিশেষণ অনেক সমালোচক স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, "The Old Man and the Sea"-ই তাঁর একমাত্র উল্লেখযোগ্য রচনা। স্ত্রীর সংগৃহীত অপ্রকাশিত রচনাবলীর দিকে সাগ্রহে অনেকে তাকিয়ে রয়েছেন হেমিংওয়ে এগুলোতে কতটা সফল হয়েছেন দেখবার জন্যে।

পার্লামেন্ট, গণতন্ত্র ও বার্ণার্ড শ.....

যখনি যা ভেবেছেন, যখনি তিনি ভেবেছেন সমাজের এই এই প্রতিষ্ঠানকে আঘাত করা উচিত, তখুনি বিনা দ্বিধায় আলোবাহীনভাবে বার্ণার্ড শ কাজে প্রকাশ করেছেন। ফলে তিনি অপ্রিয় যেমন হয়েছিলেন রক্ষণশীল মহল বিলেতে, তেমনি দেশে বিদেশে নন্দিতও হয়েছেন বিস্তর। মনস্তাত্ত্বিক মনোবৃত্তি, অবকাশযাপিনী নারী, অর্থনৈতিক অসাম্য থেকে শুরু করে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সব কিছুতেই তিনি তাঁর অস্ত্র ছুঁড়েছেন। কৌতুক করে বলায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এবং সে সমস্ত কৌতুকরচনা নিছক কৌতুকই নয় বরঞ্চ সিরিয়াস সমাজচিন্তা সেগুলোর অক্ষরে অক্ষরে মাখানো আছে।

কিছুদিন আগে "Platform And Pulpit" নামে তাঁর একটি বই বেরিয়েছে। ১৮৮৫ থেকে ১৯৪৬ সন পর্যন্ত অপ্রকাশিত রচনার সংগ্রহ। তাতে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সম্পর্কে তাঁর আলোচনাটি সমস্ত গণতন্ত্র-প্রেমিকদের কাছে খুবই আদর পাবে। ইদানীং যেমন যেমন পার্লামেন্ট সম্পর্কে একটা তীব্র বৈরাগ্য এবং বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে। গণতন্ত্রের নামে পার্লামেন্ট অগণতান্ত্রিক শক্তির মদত হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ'র এই আলোচনাটি, পার্লামেন্ট সম্পর্কে যে বৈরাগ্য দেখা দিয়েছে এবং যারা সে বৈরাগ্যে আক্রান্ত, তাঁদের কাছে এ আলোচনাটি খুব আদর পাবে। আর তা ছাড়া পার্লামেন্ট ও তার সঙ্গে যে গণতান্ত্রিক ভাবটি সংশ্লিষ্ট আসল গণতান্ত্রিক ভাবের সঙ্গে সেটির কী রকম সামঞ্জস্য লক্ষিত হচ্ছে, সে সন্ধানে যারা আগ্রহী, তাঁদের বার্ণার্ড শ'র এ আলোচনাটি পড়া উচিত। এ আলোচনার একটি চমৎকার অংশ নিচে তুলে দেওয়া হল :

"I think that the real function of Parliament in this country is to prevent anything being done by endlessly talking about it. Parliament reminds me of a locomotive engine, but a locomotive engine made in a peculiar way. You know a modern locomotive is attached to 70 trucks·· and it has to move the lot. In order to do that, there must be an enormous pressure of steam in the cylinders to make the wheels go round with all that weight···To prevent that pressure from blowing the boiler to bits there is a hole in the boiler whichis closed with a spring strong enough to resist the pressure needed to move the train ; but if the pressure goes beyond that the spring lifts and the steam evaporates. This new contrivance is called a safety valve. Now, the only difference between the parliamentary locomotive and the engineer's locomotive is that safety valve in the parliamentary locomotive is made so extremely weak that it blows off in hot air before there is the slightest possibility of the train moving at all"

—সুদর্শন পাল

গেরহার্ট হাউপ্টম্যান ॥

জার্মানীর সাহিত্যের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত যে ক'টি কালজয়ী স্রষ্টার আবির্ভাব হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হ'লেন গেরহার্ট হাউপ্টম্যান [Gerhart Hauptmann, 1862-1946]। গ্যেটে, শিলার, লেসিং, হাইনে, টমাস মান প্রভৃতি যেমন জার্মান সাহিত্যের অমর স্রষ্টা, তেমনি একজন হ'লেন হাউপ্টম্যান।

দুই শতাব্দীর মানুষ হাউপ্টম্যান নাটক এবং উপন্যাস—সাহিত্যের এ দুটো বিভাগেই একাধিক সৃষ্টি করে গেছেন, যার পাঠক পৃথিবীর সব দেশের শিক্ষিত সমাজেই কম বেশি দেখা যায়। হাউপ্টম্যানের শ্রেষ্ঠ নাটক 'দি উইভার্স' এবং শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'দি অ্যাটলান্টিস'। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হাউপ্টম্যান তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির স্বীকৃতি হিসেবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন রবীন্দ্রনাথের দু' বছর আগে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে।

জার্মানীর পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চল সাইলেসিয়াতে হাউপ্টম্যান জন্মগ্রহণ করেন এক তাঁতী পরিবারে। হাউপ্টম্যান নিজে বা তাঁর বাবা তাঁত না বুনলেও, তাঁর ঠাকুরদা বুনতেন। হাউপ্টম্যানের ঠাকুরদা একজন অত্যন্ত সাধারণ বৈশিষ্ট্যহীন শ্রমজীবী তাঁতী ছিলেন। অনশন বা অর্ধাশন সে সময়কার জার্মানীর সাইলেসিয়ার সাধারণ শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। বলাই বাহুল্য, হাউপ্টম্যানের ঠাকুরদাকেও প্রচুর উপোস করতে হয়েছে। এটা হলো জার্মানীতে শিল্প-বিপ্লবের পূর্বের কথা। উত্তর জীবনে হাউপ্টম্যানের ঠাকুরদা হোটেলের ব্যবসায় করেছিলেন। প্রথমে ছোট্ট একটা রেস্টুরেন্ট লীজ নিয়ে চালাতেন এবং তার থেকেই ক্রমশ উন্নতি হতে লাগলো, পরে উনি একটা বিখ্যাত হোটেল খুলেছিলেন।

হাউপ্টম্যানের যখন জন্ম হ'লো তখন অবশ্য ওঁদের পরিবারের মোটামুটি ভালো অবস্থা। কিন্তু হাউপ্টম্যান যখন নাটক লিখতে আরম্ভ করলেন তখন দেখা গেলো উনি শ্রমজীবী তাঁতীদের জীবনকে উপজীব্য করেই লিখে চলেছেন। জার্মানীতে শিল্পোন্নয়ন তখন পুরো মাত্রায় শুরু হয়ে গেছে। কাব্য, নাটক, উপন্যাস সর্বত্র যখন সাধারণ লেখকেরা শহরে জীবনের রূপায়ণে তৎপর এবং সাধারণ পাঠকেরাও তাদের নব-লব্ধ শিল্পভিত্তিক শহরে জীবনকে কেন্দ্র করে সাহিত্য পাঠে উদগ্রীব, ঠিক সেই সময়ে হাউপ্টম্যান শুরু করলেন সাইলেসিয়ার গ্রাম্য তাঁতীদের জীবনকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচনা করতে। ওঁর প্রথম নাটক "বিফোর ডন" যখন অভিনীত হলো তখন হাউপ্টম্যানের বয়স ঠিক সাতাশ।

সাহিত্য বা নাট্যজগতে সম্পূর্ণ অপরিচিত হাউপ্টম্যান রাতারাতি বিখ্যাত এবং সুপরিচিত হয়ে উঠলেন জার্মানীর বিদগ্ধ সমাজে। দু'ভাবেই বিখ্যাত হ'লেন উনি: নতুন বিষয়বস্তু নিয়ে নাটক রচনার কৃতিত্বের জন্যে যেমন, তেমনি আর একদিকে দর্শকমণ্ডলীর বিরক্তি ঘটাবার জন্যেও বটে। আগেই বলেছি, গ্রাম্য গরীব দুঃখীদের জীবনে যদি আদৌ কোনো রসের বস্তু থেকেও থাকে, সাধারণ দর্শক তার জন্যে সময় বা পয়সা কোনোটাই খরচ করতে ইচ্ছুক নন। কাজেই একখানা নতুন নাটক আরম্ভ হচ্ছে দেখে যারা শহরে জীবনের কিছু একটা চমকপ্রদ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করবার জন্যে থিয়েটারে এলো তারা রীতিমতো খেপে উঠলো। গোলমাল একটা লেগে যায় আর কি! তুমুলতম উত্তেজনার মধ্যে শেষ হলো নাটক। সব শেষে, শান্ত, সৌম্য, প্রিয়দর্শন যুবক হাউপ্টম্যান মঞ্চে উঠে দর্শকমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানালেন। মুখেচোখে

তাঁর এমন কিছু একটা ছিলো যে হাউপ্টম্যান মঞ্চে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে সব একেবারে চুপচাপ। কয়েকটা দিন কাটলো এইভাবেই, তারপর ক্রমশ প্রতিবাদের সুর নরম হয়ে আসতে লাগলো। এবং অল্প কিছু দিনের মধ্যেই দেখা গেলো নাট্যকার হাউপ্ট্‌ম্যান দুঃসাধ্য সাধন করেছেন। দর্শকমণ্ডলী ভালোবাসতে আরম্ভ করেছে তাঁর নাটকগুলি। শহরে নাগরিকেরা দেখতে লাগলো ফেলে আসা গ্রাম্য সভ্যতার দেবতাকে—দেখতে লাগলো তার নিজের বিস্মৃত এবং অবহেলিত ইতিহাসকে।

কাজেই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা বলতে যা বোঝায়, 'বিফোর ডন' অর্থাৎ প্রথম নাটকখানি প্রকাশিত পরেই হাউপ্টম্যান তা অর্জন করেন। এরপর থেকে আরো অনেকগুলি নাটক পর পর রচনা করলেন হাউপ্ট্‌ম্যান, যার মধ্যে অন্ততঃ দুখানি নাট্যসাহিত্যের স্থায়ী সংযোজন। 'দি বিভার কোট' একখানি কমেডী। যোগ্য সমালোচকেরা এই নাটকের জন্যে হাউপ্ট্‌ম্যানকে জার্মানীর জাতীয় কমেডী রচয়িতা লেসিং-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। "ফ্লোরিয়ান গেয়ার" হাউপ্টম্যানের একখানা প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক নাটক। 'দি র‍্যাট্', 'দি এ্যাসাম্পশন অব হ্যানেল' 'দি উইভার্স' 'দি সানকেন বেল'—এর প্রত্যেকখানিই নব্য জার্মানীর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আগেই বলেছি 'দি উইভার্স'ই সর্বসাধারণের মতে হাউপ্ট্‌ম্যানের শ্রেষ্ঠ নাট্যকীর্তি। এ নাটকের বৈশিষ্ট্য এই যে, অনেকগুলি চরিত্র, বলতে গেলে একটা অঞ্চলের গোটা সমাজ [অর্থাৎ সাইলেসিয়ার তাঁতী সমাজ] সমগ্রভাবে এ নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যে অংশ গ্রহণ করেছে। সাধারণতঃ নায়ক বলতে বলতে যা বোঝায় সে রকম কারো প্রাধান্য নেই, অথচ গোটা নাটকটি পড়া বা দেখা শেষ হবার পর পাঠক বা দর্শক এ কথা মানতে বাধ্য হবেন যে কোনো চরিত্রই বাদ দেওয়া চলে না।

হাউপ্ট্‌ম্যান ছিলেন একজন সত্যিকারের জাতীয়তাবাদী। জার্মানীর যা কিছু গৌরবময় অকপটে তাঁর রচনার মাধ্যমে প্রকাশ করতে প্রয়াসী হয়েছেন আমরণ। নিজের জীবনটাও তাঁর কম ট্র্যাজিক নয়। রবীন্দ্রনাথ যেমন ভালবাসতেন কলকাতাকে, হুগো বাসতেন প্যারিসকে, ঠিক তেমনি হাউপ্ট্‌ম্যান ভালোবাসতেন তাঁর গ্রামেশিক শহর ব্রেসলাউকে। ১৯৪৫ সনের ১৩ই ফেব্রুয়ারীর রাতের ঘটনা: হাউপ্টম্যান স্তব্ধ হয়ে দেখলেন চোখের সামনে তাঁর প্রিয় শহর মিত্রশক্তির প্লেন থেকে নিক্ষিপ্ত বোমার ঘায়ে ধ্বংস হয়ে গেলো। এর পর বৎসরাধিক কাল বেঁচেছিলেন হাউপ্টম্যান।

এ বছর নভেম্বর মাসে হাউপ্টম্যানের জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হবে। আমাদের দেশের সাহিত্যরসিক সমাজে হাউপ্টম্যানের শতবার্ষিকী যথাযোগ্যভাবে পালিত হবে এই আশাই করছি।

—সুনীলকুমার নাগ

গ্রন্থ-পরিচয়

ভারত কোষ ॥

ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করে [history repeats itself] এই প্রবাদ বাক্যটির সার্থকতা বাংলা কোষগ্রন্থের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও বেশ বিস্ময়কর ভাবে লক্ষ্য করলাম। বাংলা ১২৮৭ সালে রাজকৃষ্ণ রায় ও শরচ্চন্দ্র দেব মহাশয়দ্বয় 'ভারতকোষ'-এর সূচনা করেন এবং তিন খণ্ডে তা সমাপ্ত হয় বাংলা ১২৯৯ সালে। [দ্রষ্টব্য : সাহিত্যের খবর, ১৩৬৭ ফাল্গুন।] পূর্বোক্ত 'ভারতকোষ'-এর সূচনাকাল বাংলা ১২৮৭ সাল থেকে প্রায় ৮০ বছর পরে বাংলা ১৩৬৬ সালে আবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 'ভারত-কোষ' নামে একখানি বাংলা কোষগ্রন্থ সংকলনের পরিকল্পনা ও দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। লক্ষ্য করলাম এই দুই ভারতকোষ-এর মধ্যে নামগত তফাত মাত্র একটি হাইফেন-এর। অর্থাৎ :

রাজকৃষ্ণ-শরচ্চন্দ্র সম্পাদিত : 'ভারতকোষ'

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-পরিকল্পিত : 'ভারত-কোষ'

বাংলা ভাষায় একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর কোষগ্রন্থের অভাব বহুদিন যাবত অনুভূত হয়ে আসছে। তাই অতিব্যক্তি আমরা দেখেছি হেলিকস্ কেরির 'বিদ্যাহারাবলী' থেকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক 'ভারত-কোষ'-এর পরিকল্পনা গ্রহণ পর্যন্ত। তাই বাঙালী হয়ে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি, এবং আশা তো করছিই, পূর্বোক্ত ভারতকোষ-এর সঙ্গে বর্তমান 'ভারত-কোষ'-এর গুণগত তফাত যেন হাইফেন-এর ক্ষুদ্রতার মধ্যেই আবদ্ধ না থাকে। এ তফাতের মাত্রা যেন হয় বিশ্বব্যাপ্তি—যেন তা বাঙালীর মানস বিরহের তথা তার বিষণ্ণ দর্শনের তৃষ্ণা জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয় এবং সে তৃষ্ণা নিবারণ-প্রয়াসে জোগায় নিরন্তর প্রেরণা। তবেই না এর সার্থকতা!

দুই ॥

আলোচ্য 'ভারত-কোষ'এর সূচনা-পর্ব সম্বন্ধে জানা যায়, বহুদিন থেকেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্তৃপক্ষস্থানীয়দের মনে একখানি ভালো কোষগ্রন্থ সংকলনের পরিকল্পনা চলছিল। কিন্তু নানা কারণে তা দানা বাঁধতে পারে নি। ইতোমধ্যে পরিষদের কর্তৃপক্ষীয়দের অন্যতম ও সদস্য অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় এ বিষয়ে 'প্রকীর্ণকোষ' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। বাংলা ১৩৬২ সালে [মাসিক 'প্রবাসী' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায়] এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির প্রথম অংশে প্রবীণ অধ্যাপক মহাশয়ের বক্তব্য :

"..... সংস্কৃতের শব্দকল্পদ্রুম ও বাচস্পত্য এবং বাংলার বিশ্বকোষ নানা দিক্ দিয়া মূল্যবান ও উপযোগী হইলেও সব সময় ব্যবহারের উপযুক্ত নহে। অথচ সুলভ ও সুব্যবহার্য এই জাতীয় একখানি গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন আছে। ইংরেজীতে এরূপ গ্রন্থের অভাব নাই। অভিধানের মত এইরূপ প্রকীর্ণ কোষ বা সাইক্লোপিডিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রের পক্ষে অপরিহার্য। যিনি যে জাতীয় গ্রন্থই আলোচনা করুন না কেন মাঝে মাঝে তাঁহাকে এমন বিষয়ের সম্মুখীন হইতে হয় যাহার প্রকৃত তাৎপর্য সাধারণ অভিধানের সাহায্যে সুস্পষ্ট হইতে পারে না। ক্ষুদ্র সাইক্লোপিডিয়া কিন্তু সহজে সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের সহায়তা করিয়া থাকে। বাংলা গ্রন্থপাঠের সময়ও নানা সমস্যার উদ্ভব হয়, কিন্তু বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে সমাধানের উপায় সুলভ নহে—অনেক স্থলে একেবারে অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

বলা যায়, অধ্যাপক চক্রবর্তী মহাশয়ের এই প্রবন্ধ পাঠেই পরিষদের কর্তৃপক্ষস্থানীয়রা কোষগ্রন্থ সম্পর্কিত আশু কর্তব্য নির্ণয়ে সংকল্প গ্রহণ করলেন। এবং সরকারের কাছে 'ভারত-কোষ' এর খসড়া পরিকল্পনা পেশ করেন। খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়নে ৺রাজশেখর বসু মহাশয়ই পরিষদকে সর্বপ্রকারে সহযোগিতা দান করেন। বাংলা ১৩৭২ সালে উপরি উক্ত প্রবন্ধটি প্রকাশের পর দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বৎসর পরিষদের আন্তরিক চেষ্টার ফলে বাংলা ১৩৬৮ সালে এই মহত্তর কর্মপ্রচেষ্টায় অপরিহার্য আর্থিক সাহায্যের কার্যকারী প্রতিশ্রুতি ও সাহায্য পাওয়া গেল পশ্চিমবঙ্গ ও ভারত সরকারের কাছ থেকে। জানা যায়, ইংরেজী ১৯৫৯ সনের মে মাস থেকেই 'ভারত-কোষ' এর নিয়মমাফিক খসড়া বসে।

তিন ॥

'ভারত-কোষ'-এর সম্পাদক-সমিতি বাংলার যে কয়জন জ্ঞানী ও গুণী বিদ্বজ্জন নিয়ে গঠিত তাঁদের পরিচয় :

সভাপতি ॥ ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে।

সদস্যবৃন্দ ॥ শ্রীঅমল হোম। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য।

" শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী। শ্রীত্রিদিবনাথ রায়।

" শ্রীনির্মলকুমার বসু। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল।

" শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার। শ্রীসজনীকান্ত দাস। [*]

সম্পাদক-সমিতির পরামর্শক্রমে প্রস্তাবিত ভারত-কোষের লক্ষ্য বর্ণনা করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি যে বিজ্ঞাপন প্রচার করেন, তাতে জানা যায় :

> "প্রস্তাবিত গ্রন্থখানি এমন এক কোষ-গ্রন্থ হইবে, যাহা হইতে সর্বশ্রেণীর শিক্ষিত সাধারণ বাঙালী মাত্রেই দেশের সকল বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাইবেন। যে সমস্ত বিষয় ভারতবর্ষকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে নাই অথবা বাহিরের যে সকল বিষয়ের বিশ্বজনীন স্বীকৃতি নাই, সেগুলি সাধারণতঃ এই গ্রন্থের অন্তরভুক্ত হইবে না বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।"

এই বিজ্ঞাপন পত্রের প্রথমাংশে বলা হয়েছে :

> "ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বাংলা ভাষায় একখানি কোষগ্রন্থ প্রণয়নের আয়োজন করিয়াছেন। উহা 'ভারত-কোষ' নামে পরিচিত হইবে ও দুই খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। গ্রন্থের কার্য শেষ হইতে অন্যূন দুই বৎসর সময় লাগিবে।"

এই বিজ্ঞাপন-পত্র প্রচারের কাল ইংরেজি আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৫৯; আজ এপ্রিল ১৯৬২।

চার ॥

ভারত-কোষের ব্যবস্থাপক শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে কোষগ্রন্থ সংকলনের কাজ এগিয়ে চলেছে। তার পরিচয় পাওয়া গেল : ইংরেজি ১৯৬০ সনের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ভারত-কোষ সম্পাদক সমিতি ১৬ পৃষ্ঠার একটি নমুনা সংখ্যা প্রকাশ করেন। কাজ শুরু হওয়ার সময় প্রতিশ্রুতি ছিল দু'বছরেই ভারত-কোষ প্রকাশিত হবে—কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল, প্রায় দেড় বছরের মাথায় একটি নমুনা সংখ্যা।

---

* ১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৬২, রবিবার, কবি-সমালোচক সজনীকান্ত দাস মহাশয় পরলোক গমন করেছেন।

নমুনা সংখ্যাকে স্বাগত জানানো হবে কি অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখা হবে—সে কথা দেশবাসীই জানেন। কারণ নমুনা সংখ্যা মূল গ্রন্থ যথাসময়ে প্রকাশের বার্তা নিয়ে আসে নি। তত্ত্বদূতের মতো সে জানিয়ে দিল ভারত-কোষের বিলম্বে প্রকাশের সম্ভাবনায় বহু সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। তবে আপ্ত বাক্য বলে, শুভ কাজে নাকি অনেক বাধা, আর প্রবাদ বলে : ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়।

যাই হোক, ঘন্দে মত্ত না হওয়াই ভালো। তার চেয়ে আসুন আমরা 'ভারত-কোষ' নমুনা সংখ্যার ভূমিকায় কি বলা হয়েছে তাই শুনি। ভারত-কোষের লক্ষ্য বর্ণনা করে ১৯৫৯ সনে যে বিজ্ঞাপন পত্র প্রচারিত হয়েছিল, তাকেই তাষাকে একটু অদল বদল করে এই নমুনা সংখ্যার ভূমিকায় বলা হোল :

"ভারত-সংক্রান্ত প্রধান প্রধান বিষয় ও বহির্ভারতীয় যে সমস্ত বিষয় বা ঘটনা ভারতবর্ষকে প্রভাবিত করিয়াছে, শুধু সেই প্রসঙ্গগুলির সংক্ষিপ্ত ও নির্ভরযোগ্য আলোচনা এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইবে। এবং স্বভাবতঃই বঙ্গদেশ ও বঙ্গসংস্কৃতি সংক্রান্ত প্রসঙ্গসমূহ ইহাতে প্রাধান্য লাভ করিবে।" অর্থাৎ পূর্বপ্রচারিত বিজ্ঞাপন পত্রটির 'বিশ্বজনীন' কথাটির পরিবর্তে নমুনা সংখ্যার বিজ্ঞাপনে 'বঙ্গদেশ ও বঙ্গসংস্কৃতি-সংক্রান্ত প্রসঙ্গ সমূহ' প্রাধান্য লাভের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল।

নমুনা সংখ্যা ভারত কোষের ভূমিকার প্রথমাংশ থেকে মূল গ্রন্থ সম্পর্কে অন্যান্য যে সমস্ত তথ্য জানা যায় : সরকারি অনুমোদনক্রমে এই গ্রন্থের নাম স্থির হইয়াছে 'ভারত-কোষ'। আকার ডবল ক্রাউন ৪°, ৩২০০ পৃষ্ঠা ; প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলম ; টাইপ ১০। অতঃপরিক্রমে মুদ্রিত হইয়া চারি খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। আনুমানিক মূল্য চল্লিশ টাকা ধার্য হইয়াছে। গ্রন্থটি প্রকাশ করিতে অন্যূন দুই বৎসর কাল সময় লাগিবে।"

পূর্বপ্রচারিত বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল প্রস্তাবিত কোষ-গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হবে,—এখন জানা গেল : 'চারি খণ্ডে'। আরও জানা গেল : 'গ্রন্থটি প্রকাশ করিতে অন্যূন দুই বৎসর সময় লাগিবে'। *

পাঁচ ॥

নমুনা সংখ্যা 'ভারত-কোষ' প্রকাশের উদ্দেশ্য : জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের অভিমত সংগ্রহ করা। একথা নমুনা সংখ্যা ভারত-কোষের ভূমিকায় স্পষ্টই জানানো হয়েছে। নমুনা সংখ্যায় আলোচিত মোট বিষয় ও প্রসঙ্গ এবং তার লেখক-তালিকা :

চৈতন্যদেব— [অক্ষরবিহীন] ॥ দৌষ্মন্ত : বিস্তার—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ॥ ভারতীয় সঙ্গীত—শ্রীদিলীপকুমার মিত্র ॥ ভারতের ইতিহাস—শ্রীত্রিদিবনাথ রায় ॥ ভারতের মুদ্রা-ব্যবস্থা—শ্রীভবতোষ দত্ত ॥ মহাকাশ—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ মানববিদ্যা—[নৃতত্ত্ব বা নরতত্ত্ব]—শ্রীনির্মলকুমার বসু ॥ রকেট—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥

উল্লিখিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে আমার কাছে অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু লিখিত মানববিদ্যা [নৃতত্ত্ব বা নরতত্ত্ব, anthropology] প্রবন্ধটিই উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়েছে। অন্যান্য রচনাগুলির মধ্যে :

---

* সম্প্রতি জানা গেল, 'ভারত-কোষ' গ্রন্থের ১ম খণ্ড ইংরেজী ১৯৬২ সনের শেষভাগে প্রকাশের 'সম্ভাবনা' আছে ; এবং সম্পাদক-সমিতি 'আশা করেন' বাকি তিন খণ্ডের ছাপা শেষ হতে 'আরও তিন বছর' অর্থাৎ ১৯৬৫ পর্যন্ত সময় লাগবে।—[দ্রঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, বৃহস্পতিবার, ৫ এপ্রিল, ১৯৬২]।

ভারতের মুদ্রাব্যবস্থা, মহাকাশ ও রকেট প্রভৃতি তথ্যসমৃদ্ধ মনোজ্ঞ আলোচনা ; 'চৈতন্যদেব', 'বৌদ্ধধর্ম' [বিস্তার], 'ভারতীয় সঙ্গীত' এবং বিশেষতো 'ভারতের ইতিহাস' প্রবন্ধটি—অতি সাধারণ শ্রেণীর রচনার স্তর অতিক্রম করে কোষগ্রন্থের মানোপযোগী হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ আছে।

নমুনা সংখ্যা ভারত-কোষের প্রধান ত্রুটি এর প্রবন্ধগুলি এক সুরে কথা বলে নি,—যা কোষগ্রন্থের একটি বৃহৎ গুণ হিসাবে গণ্য করা হয় অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ মহলে। নমুনা সংখ্যা ভারত-কোষের প্রবন্ধগুলি মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধের মতো পৃথক সত্তায় পরস্পরবিরোধী শিবিরে আপন আপন স্নেহ ও অহমিকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার এ কথার সারবত্তা প্রমাণিত হবে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার [Encyclopaedia Britannica] প্রবন্ধগুলির একাত্মতা লক্ষ্য করলে। কোষগ্রন্থের প্রবন্ধ পড়লেই মনে হবে সমস্ত প্রবন্ধই একজনের লেখা। অর্থাৎ প্রবন্ধের বিষয়বৈচিত্র্য সত্ত্বেও কোষগ্রন্থের প্রতিটি প্রবন্ধের ভাব ভাষা ইত্যাদি এমন এক ঐকতানের সৃষ্টি করবে যার ফলে জাতীয়-সংগীতের বলিষ্ঠ অথচ সহজ ও সাবলীল ভাব অনুভূত হবে। কোষগ্রন্থে আলোচিত প্রতিটি প্রবন্ধের আবেদন হবে সোজাসুজি। [দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'মানববিদ্যা' ও 'ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থা' প্রবন্ধটির উল্লেখ করা চলে।] —তাতে কোন অথবা গৌরচন্দ্রিকা—যা নাকি মাসিক পত্রের প্রবন্ধের ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজন হয়,—তার কোন স্থান নেই। প্রতিটি প্রবন্ধের সারকথা এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কথা দিয়েই প্রবন্ধের শুরু হবে, এ রকম বলা যেতে পারে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার প্রবন্ধগুলিই এ সমস্ত বিষয়ে ধ্রুব আদর্শ। তাই যদি হয়, তবে ভারত-কোষের নমুনা সংখ্যায় যে দৃষ্টান্ত দেখা গেল তা মোটেই আশাপ্রদ নয়।

তবে আশা করা যায়, বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ সম্পাদকমণ্ডলী নমুনা সংখ্যার ভুল-ত্রুটি শুধরে নিয়ে মূলগ্রন্থ সংকলনে যথেষ্ট যত্নবান হবেন। কেন না, বাঙালী-সংস্কৃতির ঐতিহ্যের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখার যে বৃহৎ দায়িত্ব তাঁদের উপর বর্তেছে, সে সম্পর্কে তাঁদের উদাসীন থাকলে বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে চলবে না,—একথা নিশ্চয় আমরা আশা করতে পারি। এ আমাদের কেবলমাত্র আশা নয়, আন্তরিক ও জাতীয় দাবিও বটে।

—শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ

পারিবারিক জীবনের একটি স্মৃতি আলেখ্য।

সতীরাণী—শ্রীসুশীল প্রসাদ সর্বাধিকারী। প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১।বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২ বাংলা সাহিত্যের নিত্য নব গ্রন্থ প্রকাশনে আধুনিককালে অনেক বৈচিত্র্যের আস্বাদ পাওয়া যায় বটে; কিন্তু বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের উচ্চাদর্শের জীবন-কাহিনী আজ বিলুপ্ত-প্রায়।

বৈচিত্র্য সন্ধানী লেখক সম্প্রদায় জীবনের জটিলতাকে কেন্দ্র করেই বৈজ্ঞানিক এবং মনস্তাত্ত্বিক রূপায়নে ব্যস্ত; কিন্তু বিগত পঁচিশ তিরিশ বছরের আগে যে সরল স্বচ্ছ ধর্মজ্ঞান এবং নৈতিক বাঙালী জীবন আমাদের চোখের সামনে নিত্য স্বাক্ষররূপে প্রোজ্জ্বল ছিল, আধুনিক কালের ভাঙাচোরা জীবনবাদে আজ তা বিলীয়মান। বাস্তবে হয়তো এখনো তার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ঘটেনি। দু'একটি বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারে হয়তো এখনো দু'চারজন বয়িয়সী কিংবা বয়িয়ানদের মধ্যে সেই জীবনাদর্শ জীবিত; কিন্তু আধুনিক সাহিত্যের লিপিতে আর তাঁদের স্বাক্ষর চোখে পড়ে না। বিভূতি বাঁড়ুজ্যের পথের পাঁচালির পিসিমা ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যুর পর যেমন সমস্ত নিশ্চিন্দিপুরের ইতিহাস বিলুপ্ত প্রায়—তেমনি আজকের কথা সাহিত্যে খাঁটি বাঙালী মহিলার জীবনাদর্শও অবলুপ্ত।

এমনি এক অনুর্বর ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত সুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী স্মৃতিকথা এবং জীবনী সাহিত্যে সতীরাণীকে প্রতিষ্ঠা করে' বাংলার কথা সাহিত্যে শস্যসম্পদের সবুজ রঙকে আবার ফিরিয়ে এনেছেন। প্রবীন লেখক সুশীল প্রসাদকে এর জন্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সতীরাণী লেখকের প্রিয়তমা পত্নী—প্রখ্যাত ধাত্রীবিদ্যা চিকিৎসক স্বর্গীয় কেদার নাথ দাসের কন্যা এবং বাঙলা দেশের বিখ্যাত সর্বাধিকারী পরিবারের গৃহলক্ষ্মী। প্রবীন সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুশীল প্রসাদ সর্বাধিকারী তাঁর পরলোকগতা স্ত্রীর পুণ্য জীবন চরিতে সতীরাণী সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ চিত্র অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গীতে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি শিক্ষিতা, অতিথি পরায়ণ, ধর্মপ্রাণা, সাধ্বীস্ত্রী; সর্বোপরি তাঁর অপূর্ব শিল্পীসত্তার যে মহান পরিচিতি কয়েকটি শিল্পী কর্মের ছবি-আলেখ্যে প্রতীয়মান—তা আজকের দিনের শিল্পরুচিকেও চমৎকৃত করে। হৃদয় আবেগপ্লুত রচনায় সতীরাণীর স্মৃতি প্রোজ্জ্বল—তা অবশ্যই পাঠকচিত্তকে দ্রবিত করে। কিন্তু এই সতীরাণীর জীবন পারিপার্শ্বিকতায় লেখক যে তদানীন্তন বাঙালীর সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের গৌরবান্বিত রূপটিকে মেলে ধরেছেন এ-কালের পাঠকদের কাছে তা এক অমূল্য সম্পদ। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি মূল্যবান সংযোজনারূপেও 'সতীরাণী' বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। বইখানির তাই বহুল প্রচার অবশ্যই কাম্য।

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য

সমাজ ও সাহিত্য

সাহিত্যে রুচির অধঃপতন।

নারায়ণ চৌধুরী

বাংলা সাহিত্যের চলমান ধারাকে সচল ও নিত্যস্রোতযুক্ত রাখবার কাজে বাংলা মাসিকপত্রের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। বাংলার মাসিক সাহিত্য-পত্রিকাগুলি নতুন লেখকদের লেখা ছাপিয়ে উৎসাহ জুগিয়ে, প্রতিষ্ঠাবান লেখকদের রচনা প্রচারে সহায়তা করে, নানা বিষয়ের আলোচনা প্রত্যালোচনা বিতর্ক ইত্যাদি পত্রস্থ করে পাঠকমনে কৌতূহল ও চিন্তাক্ষমতা জাগ্রত করে, নানা তথ্যমূলক সন্দর্ভ ছাপিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তারে সহায়তা করে কত ভাবে যে দেশ ও সমাজের উপকার করছে তা বলে শেষ করা যায় না। সাহিত্য ও সমাজের সেবায় মাসিকপত্রের এই মূল্যবান ভূমিকা লক্ষ্য করে মাসিকপত্রকে চলমান সাহিত্যের দর্পণ আখ্যা দেওয়াই বোধ করি সঙ্গত।

কিন্তু ইদানীং বাংলা মাসিক পত্রিকাগুলির আকাল চলছে। একদিকে প্রভূত জনবল ও অর্থ-ক্ষমতাপুষ্ট দৈনিক সংবাদপত্রগুলির সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিতে সাহিত্যক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ এবং অন্যদিকে দেশের অপরুষ্ট অবস্থার সুযোগে নিম্নরুচির কারবারী সিনেমা পত্রিকাগুলির অবাধ প্রসার—এই দ্বিমুখী আক্রমণের আঘাত সামলিয়ে ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত স্বল্পসঙ্গতি বিশিষ্ট মাসিক পত্রিকাগুলির টিকে থাকাই দায় হয়ে উঠেছে। মাসিক পত্রিকাগুলির জনপ্রিয়তার মূল আধার ছিল তাঁদের আয়োজনের বিপুলতা নয়, তাঁদের চোখ-ধাঁধানো লেখক-সমাবেশও নয়; তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তির আসল ভিত্তি ছিল তাঁদের সাহিত্যনিষ্ঠা ও দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যের প্রতি তাঁদের স্বাভাবিক অনুরাগ। একদা দেশে 'বঙ্গদর্শন', 'সাধারণী', 'সাধনা', 'প্রচার', নব্যভারত', 'নারায়ণ', 'ভারতী', 'প্রদীপ', 'দাসী', 'প্রবাসী', 'বিচিত্রা' প্রভৃতি মাসিকপত্র জনসেবার ক্ষেত্রে যে দায়িত্ব পালন করে গেছেন, তাকে নিছক সাহিত্য পত্রিকার নিছক মাসিক আত্মপ্রকাশ মনে করলে ঠিক পরিচয় দেওয়া হবে না। বস্তুতঃ জনজীবনে তাঁদের ভূমিকা আরও অনেক বড়, আরও অনেক মহৎ। বাঙালীর রসপিপাসা ও মানসিক জিজ্ঞাসাকে সদা-সক্রিয় রাখতে এই পত্রিকা-গুলি বিশেষভাবে তাঁদের শক্তি নিয়োজিত করেছিল; বাঙালীর মননশীলতার ঐতিহ্যকে সঞ্জীবিত রাখতে এই পত্রিকাগুলি যে সংস্কৃতি-প্রীতি ও জাতিপ্রেমের দৃষ্টান্ত রেখে গেছে তার কোন তুলনা হয় না।

এখনকার কালের মাসিক পত্রিকাগুলি তাঁদের পূর্বসূরীদের গৌরবজনক পথ অনুসরণ করেই এতকাল চলবার চেষ্টা করছিল। তাঁদের সঙ্গতির স্বল্পতা ও আয়োজনের দীনতা, তাঁরা তাঁদের আদর্শবাদের দ্বারা ভরিয়ে তোলবার সাধ্যমত প্রয়াস করেছেন। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, দুই দিক থেকে তাঁরা বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। একদিকে সংবাদপত্রের দাবী, অন্যদিকে সিনেমা পত্রিকার দাবী। সিনেমা-পত্রিকার বাধাই অধিক মারাত্মক। এ যে শুধু সাহিত্যগতপ্রাণ মাসিক পত্রিকাগুলির অস্তিত্বের পক্ষেই বিপদের কারণ হয়ে উঠেছে তা-ই নয়, সাধারণভাবে জাতীয় সংস্কৃতির অগ্রগতির পক্ষেও মস্ত বড় ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা যে জাতি হিসাবে কী শোচনীয় অপকর্ষের অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছি, এই সিনেমা পত্রিকাগুলির বিপুল ব্যাপক লোকপ্রিয়তা তার প্রমাণ। তরুণ ও যুবমন থেকে সমস্ত প্রকারের শুভ সংস্কারকে হটিয়ে দিয়ে নট-নটীদের জীবন বৃত্তান্তমূলক নানা খুচরো খবরের কারবারী পত্রিকা নামধেয় এইসব সিনেমা-কাগজ সেখানে

অনুচিত ভাবে আসর জাঁকিয়ে বসেছে। আজকাল ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক চাকুরে মহলে এইসব পত্র-পত্রিকার সে কী অসাধারণ চাহিদা! আমাদের কোন আর মাহেশের মধ্যেও এই-জাতীয় পত্রিকার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ আছে বলে শুনতে পাই। কেরানীবাবুরা যে আপিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে স্টল থেকে চাউস মার্কা এক একটি সিনেমা পত্রিকা কিনে নিয়ে যান, সে তাঁদের নিজেদের জন্য নাকি ততটা নয় যতটা বাড়ির উপদ্রবের জন্যে। এর থেকে শোচনীয় আর কী হতে পারে? আমাদের তরুণ সমাজের রুচির অধোগতি লক্ষ্য করে লজ্জায় দুঃখে ক্ষোভে এক এক সময় শির আপনা থেকেই নুয়ে আসে।

দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না। সিনেমা পত্রিকামাত্রের বিরুদ্ধেই আমার অভিযোগ নয়। যে সকল সিনেমা পত্রিকায় সিনেমা শিল্পের উন্নতি বিষয়ে নানাবিধ গঠনাত্মক রচনা থাকে, শিল্পের আর্থিক দিকটি সামগ্রিক জাতীয় আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কেমন করে আরও মজবুত করে তোলা যায়, সে সম্বন্ধে নানা প্রস্তাবাদি থাকে, সিনেমা কর্মীদের অন্যায় অভিযোগ নিয়ে নিয়মিত আলোচনা প্রকাশ করা হয়, মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির ভাল-মন্দ নিয়ে সত্যিকারের রসজ্ঞ সমালোচনা পত্রস্থ করা হয়, এবং প্রসঙ্গতঃ সিনেমা শিল্পীদের পরিচিতি সম্বলিত কিছু কিছু লেখাও থাকে; সেই সব পত্রিকার বিরুদ্ধে আমার আপত্তি জানাবার কোনই হেতু থাকতে পারে না। বরং এই জাতীয় পত্রিকার প্রসার-প্রচার আমরা সর্বতোভাবে কামনা করি। কিন্তু দেখা গেছে, এরকম পত্রিকা চলে না। কয়েকবারই এ-জাতীয় পত্রিকা চালাবার চেষ্টা করা হয়েছে; পাঠক সাধারণের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে শেষ পর্যন্ত সে সকল চেষ্টা বানচাল হয়ে গেছে। লোকে এই-জাতীয় পত্রিকা পড়তে চায় না, পড়তে চায় নানা সুখরোচক তুচ্ছ খুচরো খবরের জোগানদার তথাকথিত সিনেমা পত্রিকা। সিনেমার গঠনমূলক আলোচনায় কারও আগ্রহ নেই, আগ্রহ আছে উত্তমকুমার কিংবা সুচিত্রা সেন কিংবা মীনাকুমারী বা নার্গিসের ব্যক্তিগত জীবনের নানা অকিঞ্চিৎকর খুঁটিনাটি বৃত্তান্তে। আমাদের যুব-সমাজের 'হীরো' কোন আদর্শবাদী নেতা নন, 'হীরো' হলেন রাজকাপুর কিংবা ওই জাতীয় রাজা বা কুমার নামধারী পর্দার কোনো অভিনেতা। এই বর্গের কোন 'হীরো' বা 'হীরোইন' শহরে এলে ভীড় সামলানোর জন্যে পুলিশের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। ছেলেদের পড়ার বইয়ে মন নেই; এদিকে বৈজয়ন্তীমালার কিংবা দিলীপ-কুমারের কিংবা সাবিত্রী চ্যাটার্জির মেল-গোত্র-প্রবর সব নখদর্পণে। কোন্ অভিনেত্রীর কোন্ শাড়ির রং পছন্দ, কোন অভিনেতা কী কী ভোজ্যবস্তু দিয়ে প্রাতরাশ সমাধা করতে ভালবাসে—এসব খবর ছেলেরা গড়গড় করে বলে যেতে পারে। হায়, এর এক-দশমাংশ মনোযোগও যদি ছেলেমেয়েদের অধ্যয়নের প্রতি থাকত!

বলা বোধ করি নিষ্প্রয়োজন যে, ছাত্র সমাজের এবম্প্রকার বিপথগামিতার জন্য উপরোক্ত সিনেমা-পত্রিকাগুলিই মুখ্যতঃ দায়ী। এসব পত্রিকা নামমাত্রের কাগজে সিনেমার গঠনমূলক আলোচনা তো কিছু থাকে না, থাকে পূর্বোক্ত ধরনের তুচ্ছ অপ্রয়োজনীয় মনোযোগ-বিভ্রান্তিকারী নানা টুকরো খবর এবং বিলোল ভঙ্গির একাধিক ছবি। পাঠকের সুসংহত মনঃসংযোগ ক্ষমতাকে বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত করতে এ সকল পত্রিকার জুড়ি নেই। কতকগুলি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র খুচরো ও টুকরো খবরের উপর দিয়ে তরুণ পাঠকের মন কেবলই যদি গড়িয়ে যেতে থাকে তবে তার কোমল-পেলব অনুভূতিপরায়ণ সত্তার উপর সে প্রক্রিয়ার প্রভাব কী মারাত্মক হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। মানুষের মনোযোগ কেন্দ্রবিচ্যুত করতে পারার মত ক্ষতি আর নেই।

উপরে যে সকল লক্ষণের বর্ণনা করা হয়েছে তার থেকে বোঝা যায়, আমরা জাতি হিসাবে কোন্ দিকে চলেছি। দেশের কিশোর তরুণ ও যুব-সমাজ রুচিবিকৃতির কী সর্বনাশা পথ অনুসরণ করে উত্তরোত্তর

ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে, সে কথা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। অথচ এ দিকে সমাজ-কর্তাদের মন নেই। এসব বিষয় নিয়ে যে কিছু ভাবনা-চিন্তার কারণ থাকতে পারে তা-ই বোধ করি তাঁরা মনে করেন না, এমনি বীরত্ব তাঁদের ঔদাসীন্য আর অচেতনতা। বাংলার চলমান সাহিত্য-সংস্কৃতির মুখপত্ররূপে যে সকল মাসিক পত্রিকা নানা বাধার বিরুদ্ধে আজও টিকে থাকবার চেষ্টা করছে, তারা টিকে থাকল কি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, সে বিষয়ে এঁরা মাথা ঘামানো আদৌ প্রয়োজন মনে করেন না। এটা কারও মাথাই নয়—না রাষ্ট্রচালকদের, না সমাজনেতাদের, না শিক্ষাবিদ্‌দের, না অভিভাবকদের। ফলে যা হবার তা-ই হচ্ছে। আমাদের ভবিষ্যতের আশা-ভরসার স্থল ছেলেমেয়েরা বিকৃতির পথে ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে। এরকম অবস্থা বেশীদিন চলতে পারে না। একদিন না একদিন সমাজ নেতাদের টনক নড়বে। কিন্তু হায়, সেদিন হয়তো তখনকার অবস্থা নিতান্ত আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। বিলম্বের জন্য শোক করে তখন আর কোন লাভ হবে না।

সবচেয়ে বলিহারি যাই সাহিত্যিক সম্প্রদায়কে। সাহিত্যিকদের সমাজের জাগ্রত মনের প্রহরী বলেই লোকে জানে। তাঁরা দেশের সবচেয়ে সজাগ অংশ এইরূপ মনে করা হয়। দেশবাসীকে নেতৃত্বদানের সহজ ক্ষমতা আছে সাহিত্যিকদের। এ যুগের অন্যতম ক্রান্তদর্শী ঋষিপ্রতিম ব্যক্তি বিনোবাজী তো বলেন, সমাজের উপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব যদি কোন সম্প্রদায়ের থেকে থাকে তো সে সম্প্রদায় হল সাহিত্যিক সম্প্রদায়। বিজ্ঞানের পাশে পাশেই আজ সাহিত্যের অব্যাহত জয়যাত্রা। এমন যে অসাধারণ প্রভাববিশিষ্ট সাহিত্যশক্তি, সেই শক্তির অধিকারী লেখকেরা কোথায় তাঁদের ক্ষমতা সমাজের হিতকল্পে প্রয়োগ করবেন, তা নয়, তাঁদের মধ্যে আজ অনেকেই নৈস্ব মনোবৃত্তি চালিত হয়ে সমাজের অহিতকারী শক্তিগুলির সহিত হাতে হাত মিলিয়েছেন। বাংলাদেশে আজ এমন অনেক লেখক আছেন—তাঁদের ভিতর কেউ কেউ রীতিমত বর্ষীয়ান ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বলে সমাজে পরিচিত—যাঁরা পূর্ববর্ণিত সিনেমা পত্রিকাগুলিকে লেখা দিয়ে আনুকূল্য করাটাকে বিশেষ দোষাবহ বলে মনে করেন না। কেউ কেউ তো চক্ষুলজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে সংবাদপত্রের মাধ্যমে তাল ঠুকেই প্রচার করেন অমুক সিনেমা পত্রিকার ছাড়া তিনি পূজায় আর কোথাও লেখা দেবেন না! আমাদের দেশের জাগ্রত মনের ধারক ও বাহক বলে সাধারণ্যে পরিচিত লেখককুলের রুচি কোথায় নেমে গেছে, এ থেকে তার একটা প্রমাণ পাওয়া যায়। এইসব সিনেমা-পত্রিকায় কী-জাতীয় লেখা ও ছবি সচরাচর ছাপা হয় তা যে এঁরা জানেন না তা নয়। কিন্তু জেনেও এঁরা চোখ বুজে থাকেন। কেউ সিনেমা-পত্রিকার সস্তা জনপ্রিয়তার প্রতি লুব্ধদৃষ্টি, কেউ অর্থের নিকট বিক্রীত, কারও মনোগত ভাবখানা এই যে, সিনেমা-পত্রিকায় লেখা ছাপা হলে আর কিছু হোক আর না হোক লেখার যশেই প্রচার হয় এবং পরে লেখা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার সময় ওই প্রচার বিশেষ কাজে লাগে। অর্থাৎ লেখকদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই কোন না কোন বৈষয়িক লাভের প্রত্যাশায় ওই তথাকথিত পত্রিকাগুলির যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত হবার জন্য মাথা এগিয়ে দিয়েছেন। সামান্য স্বার্থবুদ্ধির তাড়নায় তাড়িত হয়ে এঁরা দেশবাসীর কী যে সর্বনাশ সাধন করছেন, তা ভেবে দেখবার মত ধীরবুদ্ধি ও চিন্তাশীলতা এঁদের আছে বলে মনে করতে পারছি নে।

রুচি নিয়ে সাহিত্যের কাজ। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের যাঁরা রচনাকারী হবেন, তাঁদের মনোভঙ্গির মধ্যে শ্রেষ্ঠ রুচির প্রতিফলন ঘটবে, এইটেই লোকে আশা করে। রুচির একটা পরিচয় মেলে মানুষের সহ-নির্বাচনের মধ্যে। ইংরেজীতে একটা কথাই আছে—"Tell me what company you keep and I

shall tell you what you are" । যে যেমন সখী বাছাই ও মনের অনুশীলন করে তার রুচি তেমন হয়। কেউ কুলকে বিশ্বাস অথচ তার আচরণে কুলকের ছাপ পড়বে না, এমনটা হয় না। এমন অঘটন সম্পূর্ণ মানবীয় কারণেই অবিশ্বাস্য। অথচ আমাদের সাহিত্যিক সম্প্রদায় এই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটিই আমাদের দিয়ে বিশ্বাস করিয়ে নিতে চান। তাঁরা নিকৃষ্ট পত্রিকাদিতে লিখবেন অথচ তাঁদের রুচি হবে কুলের মত সুকুমার ও পবিত্র—এই ধারণা তাঁরা আমাদের মনে সৃষ্টি করতে প্রয়াসী। কিন্তু বলাই বাহুল্য, তাঁদের এই ধারণাসৃষ্টির প্রয়াস নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই প্রায় বিভ্রান্ত করতে পারে না. উপরন্তু, তাঁরা যে মনে করেন সিনেমা পত্রিকাদিতে লেখবার পরও জনমনে তাঁদের প্রদ্ধার আসন পূর্বের মতই অবিচলিত থাকবে, এইক্ষেত্রেও তাঁরা হিসাবের ভুল করেন। সিনেমা কাগজে লিখে অপরিণতমনা পাঠক-পাঠিকাদের বাহবা হয়তো তাঁরা কুড়োন, কিন্তু সমাজের রুচিশীল বিবেক মানুষদের শ্রদ্ধা-বিশ্বাস যে তাঁরা হারান, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আমি এমন একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন শক্তিমান লেখকের কথা জানি, যিনি এইসব নোংরা সিনেমা পত্রিকায় লেখা দেবার অনুকূলে এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, ওরা লেখার জন্য সবচেয়ে বেশী অর্থমূল্য দেয়, সুতরাং সেখানে লেখক হিসাবে তাঁদের লেখা না দিয়েই বা তিনি কী করেন। লেখা একটা বিক্রয়ের পণ্য অর্থাৎ কিনা saleable commodity। অর্থনীতির সাধারণ সূত্র অনুযায়ী বাজারে পণ্যের জন্যে যে মূল্যের বেশী দাম হাঁকবে, বিক্রেতা তারই নিকট মাল বেচতে বাধ্য। এখানে খরিদ্দারের ভালমন্দের বা তার উদ্দেশ্যের সদসতের কোন প্রশ্ন ওঠে না। মাত্র এইটুকু বলেই সমালোচ্য লেখক আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রক্রিয়ায় ইতি টানেন না, চোখের কোণায় কূটবুদ্ধির মৃদু একটি বিলিক দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে আরও একটু সম্প্রসারিত করেন এই বলে যে, যাঁর বাড়িতে প্রতি রোজ বত্রিশ জনার পাত পড়ে, তাঁর এত কাগজের তালমন্দ বিচার করলে চলে না।

চমৎকার যুক্তি। চমৎকার নিজের সাফাই গাওয়া। এই না হলে আর আমাদের সমাজে সমালোচ্য লেখকের এত প্রতিপত্তি হয়! ওই প্রতিপত্তির মূলে কূটবুদ্ধিও যে অনেকখানি জড়িয়ে মিশিয়ে আছে, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। অর্থাৎ আমার সংসারের খাই-খরচা বেশী, আমার জীবনযাত্রার মান উন্নত, কাজেই সুরুচি ও নীতির ধার ধেরে চলা আমার জন্য নয়; সে ধার ধেরে চলবে অর্থাভাবে শুকিয়ে আমসি হয়ে থাকা দরিদ্র লেখকের দল। তাঁদের সংসারে আরাম-বিরাম নেই, তাঁদের স্ত্রীপুত্র-কন্যাদি ভাল করে পেট পুরে খেতে পায় না, সুতরাং আদর্শবাদ যদি গেলাতে হয় তো সেই সব বিড়ম্বিতভাগ্য লেখক-দেরই গেলাবার চেষ্টা করতে হবে; আমার মত সকল লেখককে নিয়ে টানাটানি কেন। আদর্শবাদ উপোসী লেখকদের জন্য; আয়েসী লেখকদের জন্য নয়। তাঁরা যেহেতু আরামে আয়েসে অধিষ্ঠিত আছেন, সেই-হেতুই তাঁদের আরামের পান থেকে চুনটি পর্যন্ত খসানো চলবে না। সংসারে তেলো মাথাতেই তেল চাপানো নিয়ম। ওই যুক্তি অনুসরণ করে তিনি কেনই বা তাঁর তৈলাক্ত মস্তককে আরও বেশী তৈলাক্ত করবেন না? যার মাথায় তেল নেই সে তৈলহীন রুক্ষ মাথাতেই চলুক এবং আদর্শবাদের অনুশীলন করে সেটিকে আরও বেশী মাত্রায় চিমসে করে তুলুক; আমি ভাগ্যবান লেখক, রুচির বাছবিচার করা বা ওই বাবদে ত্যাগ স্বীকার করা আমাকে মানায় না।

স্বীয় উন্নত জীবনযাত্রার মানের অজুহাত দেখিয়ে, তার পর সেই উন্নত জীবনমান রক্ষার অনুকূলে যুক্তি যোগানো—এ কায়েমী আর্থবাদীদের বহুদিনের পুরনো অভ্যাস। সকল সমাজে এইভাবেই বিত্তহীনদের

বাবি বাবানো হয়ে এসেছে। আমার অনেক আছে বলেই আমার আরও বেশী চাই, এবং ওই বেশীটুকু হস্তগত করবার জন্তে ছলবল-কৌশল কোনটাই আমার পক্ষে ত্যাজ্য নয়, বরং আমি সকল মানুষ বলেই আমার পক্ষে ওইগুলি আরও বেশী মাত্রায় অবলম্বনীয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আদর্শবাদের কী হবে? কেন, আদর্শবাদ গোল্লায় যাক এবং যারা এই কুট পৃথিবীতে বাস করেও আদর্শবাদের চর্চা করতে চায়, সেইসব হাড়-বাবাতে বোকার দলের তার স্বয়ং ভগবান নিজহস্তে গ্রহণ করুন। আমার মৌরসী পাট্টার অধিকারে বেরসিক ভগবান হস্তক্ষেপ না করলেই হ'ল।

ঠিক এই যুক্তিই ইংরেজরা প্রয়োগ করত, যখন তারা এদেশে ছিল,—তাদের উন্নত জীবনযাত্রার অনুকূলে। প্রাতরাশের সময় পনীর যখন তখন ডিমের পোচ চাই, লাঞ্চে বিচিত্রপন্থী ভোজ্যবস্তুর সমাহার, রাত্রে ফুল-কোর্স ডিনার—এসব না হলে efficiency-ই যে মাটী। তার তাকত না হলে খুলবে কেন। তেমনি বাড়িতে রোজ প্রতি বেলা বক্তিমটা করে পাত পড়ে। সুতরাং আর কথা কী, সেই বক্তিম জনের রসদ জোগাবার জন্ত 'উলটপুরাণ', 'বাইফেল', 'রোমহর্ষণ' প্রভৃতি পত্রিকা-নামের জাকড়া কাগজে লিখতে হবে বৈকি। যারা সুনীতির বুলি মুখে নিয়ে, সুরুচির টুলি চোখে এঁটে এইসব পত্রিকার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা করেন তাঁরা নিতান্ত মূঢ়জন, গবেট; "তাঁহারা কী হারাইতেছেন তাহা তাঁহারা জানেন না"। আমি তো এই সুযোগে আমার এবং পোষ্যজনদের চর্বা-চোষ্যের সুব্যবস্থা করে নিই। কোন প্রতিষ্ঠানের লেখকের রুচি কত নিম্নগামী হলে তিনি এই-জাতীয় যুক্তির দোহাই পাড়তে পারেন, তা ভেবে দেখবার মত বিষয়।

সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের রুচির নিম্নগামিতার আর একটি দৃষ্টান্ত হল সরকারের প্রচার কার্যে শিল্পের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগানোর প্রস্তাবে রাজী হওয়া। সরকারী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অনুকূলে প্রচার কিংবা নির্বাচনপ্রার্থী কোন মন্ত্রী বা পদস্থ ব্যক্তির অনুকূলে ভোট ভিক্ষা করতে বেরনো—এ আজকাল আর জনপ্রিয় সাহিত্যিক বা শিল্পীর জীবনে কিছু বিরল ঘটনা নয়। গত নির্বাচনে এ রকম ব্যাপার কয়েক বারই ঘটতে দেখলুম। এর চেয়ে আত্মাবমাননাকর ঘটনা আর কী হতে পারে? এতে শিল্পীর স্বাতন্ত্র্য অতি নির্মমভাবে ক্ষুণ্ণ ও লাঞ্ছিত হয়। কোন শিল্পী যদি ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বিশ্বাসের দিক দিয়ে কংগ্রেসের আদর্শের অনুগত হন, তবে তিনি নিশ্চয়ই নির্বাচনপ্রার্থী কোন কংগ্রেসীর পক্ষে প্রচারকার্যে অবতীর্ণ হতে পারেন। সে স্বাধীনতা তাঁর অবশ্যই আছে। কিন্তু তিনি যদি কংগ্রেসের বা সরকার পক্ষের কেউ না হন, তিনি যদি দলীয় রাজনীতিতে অসংশ্লিষ্ট হন, তবে কেন তিনি ক্ষমতাপন্ন কোন মন্ত্রী বা কংগ্রেসের কোন মাথাওয়ালা লোকের পক্ষে নির্বাচনী প্রচার-কার্যে অবতীর্ণ হবেন? এতে কি তাঁর সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্য ব্যাহত হয় না? লোকে যদি এইরূপ ক্ষেত্রে তেমন শিল্পী বা সাহিত্যিকের প্রতি অভিসন্ধি আরোপ করে, তবে সে অভিসন্ধিকে খণ্ডন করবার মত কী যুক্তি এঁদের তূণীরে আছে? এঁরা যে পূর্বকৃত কোন উপকারের প্রতিদানে বা নূতন কোন অনুগ্রহের প্রত্যাশায় নির্বাচনী অভিযানে নামেন নি, তার কী নিশ্চয়তা? এর দ্বারা কী বোঝা যায়? এর দ্বারা এই কথাই কি বোঝায় না যে, এঁরা যখন কংগ্রেসী প্রার্থীর অনুকূলে নির্বাচনী প্রচারে অংশ গ্রহণে স্বীকৃত হয়েছিলেন, তখনই তাঁদের মনের অভ্যন্তরে প্রত্যক্ষ ভাবে না হলেও সূক্ষ্ম ভাবে এই প্রত্যাশা কাজ করছিল যে, এঁরা এঁদের এই উপকারের বিনিময়ে

কোন-না-কোন দিন সরকারী পুরস্কার বা সম্মানে ভূষিত হতে পারেন? তাঁদের চিনতে যে ভুল হয় নি, সে তো পরবর্তী ঘটনায় দেখাই গেল। আর ওই 'পদ্মশ্রী' উপাধির ভিতরের রহস্যটা যে কী, তাও এই উপলক্ষ্যে জনসাধারণ কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারল।

সরকারী খেতাব যখন প্রদত্ত হয় তখন তার সঙ্গে কোন শর্ত থাকে না, কিন্তু এই অলিখিত শর্ত বুঝি জুড়ে দেওয়া হয় যে, প্রয়োজনের সময় খেতাবধারী ব্যক্তি সরকারের কর্তাব্যক্তিদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে দ্বিধা করবেন না। এই রকম একটা সূক্ষ্ম আদান-প্রদানের মনোভাব বুঝি দু'পক্ষেই থাকে। কিংবা, আরও খোলাখুলি ভাবে বলতে গেলে, সরকারকে প্রদত্ত পূর্বের কোন সাহায্যের জন্যই বোধ হয় এই জাতীয় খেতাব দানের ব্যবস্থা। এর সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক যত-না তার চেয়ে অনেক বেশী সম্পর্ক রাজনীতির—এমন কথা যদি কেউ বলে তো সে কথাকে চট্ করে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে সাহিত্যের গুণাগুণ নিরূপণ নিতান্ত বাহ্য ব্যাপার; খেতাব বা সম্মান দানের মূল কারণ আরও অনেক বেশী গূঢ়, আরও অনেক বেশী নেপথ্যসঞ্চারী।

সরকারের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিরা শিল্পী বা সাহিত্যিকের কাছে এমন প্রস্তাব যে কী করে করেন তাই ভেবে আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই। এঁরা কি বুঝতে পারেন না যে, শিল্পীদের কাছে এই রকম সাহায্য চাওয়ায় শিল্পীদের খেতাব বা পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করবার সরকারী রেওয়াজটাই লোকচক্ষে নিতান্ত খেলো হয়ে যায়? এর দ্বারা জনসাধারণের মনে এই ধারণা সৃষ্টির সুযোগ দেওয়া হয় যে, সরকারী খেতাবটা আসলে গুণের স্বীকৃতিমূলক কোন চিহ্ন নয়, ওটা মূলতঃ উপকারের আদান-প্রদানের একটা ক্রিয়া মাত্র। এ ক্রিয়া রাজনীতির সঙ্গে যতটা সম্পর্কিত, শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে তার সিকির-সিকিও নয়।

জনসাধারণের মনে যে এই রকমের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠি-পত্রেই তার প্রমাণ। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় রাজ্যসভাতেও এই নিয়ে প্রশ্নোত্তর হয়ে গেছে। এ থেকেই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। শিল্পী সাহিত্যিকেরা যদি নিজেদের স্বাতন্ত্র্যকে লাঞ্ছিত হতে দেন, শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সরকারী অনুপ্রবেশকে বাধা প্রদান না করেন, তা হ'লে পৃথিবীতে কোন শক্তিই তাঁদের সরকারী ক্রীড়নকে পরিণত হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারে না, সে কথা নিশ্চিত। •

• মতামতের জন্য সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নন।

সঙ্গীত আসর

শুদ্ধ ও মিশ্ররাগ

কেবলমাত্র শুদ্ধ রাগরাগিনীর দ্বারা ভারতীয় সঙ্গীত পুষ্ট হয়েছে, তা' নয়—মিশ্ররাগিনীও তার বিশেষ আবশ্যকীয় অংশরূপে পরিগণিত। তানসেন প্রমুখ স্বনামধন্য সঙ্গীতস্রষ্টাগণ বহু মিশ্র রাগ প্রবর্তন করে গেছেন সেগুলি শ্রুতিমাধুর্য্যের জন্য সঙ্গীত সমাজে সমাদৃত। রাগ মিশ্রণের কৌশল চিন্তাশীল শিল্পীগণের পক্ষেই প্রধানত জানা সম্ভব। রাগগুলির পরস্পর ভাবের ঐক্য থাকা প্রয়োজন এবং তাদের সমন্বিত রূপ, রস পরিবেষণের পথে যেন বাধা সৃষ্টি না করে এবং শ্রুতিকটু না হয়। ভারতীয় সঙ্গীতে প্রচলিত চির-পুরাতন রাগগুলি আজও নবীন। রসিক শ্রোতাগণ ওই সকল রাগের নিত্য নূতন রূপ উপলব্ধি করেন কুশলী শিল্পীর পরিবেশনে। এই মিশ্ররাগ রচনার মূলে আছে নব সৃষ্টির প্রেরণা তাই পুরাতনকে গ্রহণ করে, তার মধ্যে বৈচিত্র এনেছেন প্রতিভাবান সঙ্গীতশিল্পীগণ। মিয়াকী মল্লার মিয়াকী সারঙ্গ, বসন্ত-বাহার, বাগেশ্রী-বাহার, বেহাগ-খাম্বাজ, ঝিঁঝিট-খাম্বাজ, সিন্ধু-খাম্বাজ, সিন্ধু-ভৈরবী, ভৈরবী-বাহার প্রভৃতি রাগগুলি বিশুদ্ধ রাগের সমমর্য্যাদা লাভ করেছে। একটি বাগেশ্রী বাহারের খ্যাল গানের স্বরলিপি এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল।

বাগেশ্রী বাহার—ত্রিতাল

মোহন হরী রঙ্গ রঙ্গারে হোরি খেল রচায়ে॥
ঘাল বাল সব সখা সঙ্গ লিয়ে
অবীর উলাল উড়ায়ে॥

কথা ও সুর—প্রচলিত

সুর ও স্বরলিপি

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

০	১	২	৩
না র্সা ণধা পা	মা পা মজ্ঞা মা I	মা ণা -া ধা	ধণা র্সা র্সণা ধা
মো ০ হ০ ন	হী ০ র০ ঙ	র ০ ০ ০	ঙা০ ০ ০রে ০
০	১	২	৩
মজ্ঞা মা মধা -া	ধণা র্সা ণা ধা I	মা মপা ধা -া	মা মজ্ঞা রা সা II
হো০ ০ রী ০	খে০ ০ লা ০	র চা০ ০ ০	০ ০০ ০রে
০	১	২	৩
মমা পা ণধা ধর্ণা	র্সা র্সা র্সা র্সা I	র্সা ধণা র্সর্মা র্মা	র্মজ্ঞা জ্ঞা র্রা র্স
ঘা০০ ল০ বা০	০ ল ল ব	ল ঘা০ ০০ ল	০০ ঙ দি রে
০	১	২	০
র্রা র্সণা ধা ধা	ধণা পা মা মা I	মজ্ঞা ঞ মধা পর্সা ণা	ণধা মজ্ঞা সরা সা II II
অ বী০ ০ র	উ০ লা ০ ল	উ০ ড়া০ ০০	০০ ০০ ০০রে

একটি স্বাক্ষর ॥

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

অন্ধকারে আমাকে শিশির একটি বস্তির দিকে নিয়ে চলল। আমার চলতে কষ্ট হচ্ছিল, পায়ে ব্যথা ঠেকছিল। কেমন যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল আমার এই ঘিঞ্জি, নোংরা, জঘন্য পরিবেশে এসে।

আর কদ্দূরে তুমি থাক? আমি একটু বিরক্ত হয়ে বললাম। এই, এসে গেছি স্যার।

এতক্ষণে শিশির আমাকে এক যায়গায় নিয়ে এল। একটা খাটিয়া দেখিয়ে বলল, এইটিই আমার আস্তানা।

আমি দেখলাম, এক পাশে কয়েকটি গোরু আপন মনে কাটা খড় চিবুচ্ছে। চারদিকে গোবর ছড়ানো, জাবনা খাওয়ানোর বড় বড় কাঠের পাত্রগুলো হাঁ করে তাকিয়ে আছে। বললাম, ওহে এটা যে একটা খাটাল, গবাদি পশুর বাসস্থান।

আমিও ওদের সঙ্গে থাকি, স্যার। আমার অবস্থা। গোরুর অবস্থার চেয়েও খারাপ। সকালে ডিউটিতে বেরিয়ে যাই, যখন যেমন ডিউটি পড়ে। ফিরে এসে হোটেলে যাই। দু'আনার ভাত, ডাল, আর একটু চচ্চড়ি। কখনো সখনো এক টুকরো মাছ, পয়সা থাকলে। আর এখানে শুয়ে পড়ি; ব্যস্।

এতক্ষণে ভাল করে চেয়ে দেখলাম—একটা টিনের সুটকেসের ওপরে ছেঁড়া রঙীন লুঙ্গির ঢাকনা, তার ওপর খান কয়েক বই। শিশির নাইটে আই. এ. ক্লাশে এডমিশান নিয়েছে। সেই থেকে আলাপ। দেশের ছেলে। পাশের গ্রামের।

কেমন যেন মায়া পড়ে গেল ছেলেটার ওপর। যাদবপুরের দিকে একটা কারখানায় পার্ট টাইম কাজ করে শিশির, আর রাত্রে পড়ে।

আপনাকে বলতে বলতে লজ্জা হচ্ছে, স্যার।

না না লজ্জা কি? আমি নিজেই খাটিয়ার ওপরে বসে পড়লাম। একটা মৃদু আর্তনাদ করে উঠল খড়ির বস্তাটা।

একটু চা নিয়ে আসি?

পাগল হলে নাকি? আমি এক্ষুনি চলে যাব।

শিশির কোন কথা শুনল না। মাটির খুরিতে করে চা, আর দুটো নোনতা বিস্কুট নিয়ে এল।

আমি বাধা দিতে পারলাম না। ওর আন্তরিকতাকে আঘাত দেওয়াটা কেমন যেন নিষ্ঠুরতা বলে এই মুহূর্তে মনে হোলো। বললাম, ছোট অবস্থা থেকে যে মানুষ বড় হয়, তার প্রতিভা মহত্তর। ডিকেন্সকে ছেলেবেলায় এক সময় একটা কাঠের বাকসের কারখানায় কাজ করতে হয়েছিল। সেই স্মৃতি ওঁকে মহৎ ঔপন্যাসিক হতে সহায়তা করেছে। শুধু লক্ষ্য সামনে রেখে এগিয়ে যাও, আর নিজের কাছে 'অনেস্ট' থেকো।

শিশির আমার কথাগুলো মাথা নিচু করে শুনছিল।

সেই থেকে শিশির সম্পর্কে আমি ক্লাশে সচেতন ছিলাম। লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করতাম, ও ক্লাশে কেমন পড়াশোনা করে।

সেদিন স্নান থেকে বেরিয়ে দেখি, শিশির দাঁড়িয়ে আছে। কি ব্যাপার? কিছু বলবে?

আমার থাকার ব্যবস্থাটা উঠে গেছে স্যার।

ও, সেই খাটালটা? কেন? কি হ'ল!

উঠে গেল। কর্পোরেশন শহরের ভেতর খাটাল রাখতে দেবে না, বস্তিটাও ভাঙা হবে। গোয়ালারা গোরু নিয়ে দূরে গড়িয়ার দিকে চলে গেছে।

ও। তা হলে, তুমি কোথায় যাবে?

কোন কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। আপনি যদি দয়া করে কারুর বাড়িতে একটু থাকার ব্যবস্থা করে দেন স্যার।

আমার জানা শোনা বিশেষ নেই। তা ছাড়া তোমার 'ইমিডিয়েটলি' দরকার। এই কম সময়ের মধ্যে কোথায় বাসা পাব?

শিশির চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

কি ভেবে বললাম, আচ্ছা এই আমার বাসার ঠিকানা। ঠিকানাটা ওকে লিখে দিলাম। তুমি আপাততঃ এইখানেই চলে এস। তারপর কি হয় দেখা যাবে।

শিশির সেই টিনের সুটকেশ আর বইপত্র নিয়ে আমার বাসায় উঠে এল। একটা ছোট ঘর খালি ছিল, ওকে সেই ঘরটা দিলাম।

অবশ্য, শিশির আসতে আমার লাভ হ'ল। চাকরের ওপর সংসারের সারা ভারটা ছিল। শিশির নিজে কিছুটা সেই ভার স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছে। এখনি দেখি খাওয়ার স্ট্যাণ্ডার্ড ভাল হয়েছে; চুরি কম হচ্ছে। সংসারটা যেন একটু সুশৃঙ্খলার সঙ্গে চলেছে।

শিশির এখন কেবল আর আমার ছাত্র নয়। আমাকে মৃণালদা বলেই ডাকে। বয়সের পার্থক্য খুব বেশি নয়। কারণ স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে শিশির অনেক বছর পড়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই সময় সে নানান জীবিকার স্বাদ নিয়ে দেখেছে। তাই অভিজ্ঞতা তার বিচিত্র। সে পরিচয় কয়েক দিনের মধ্যেই পেলাম।

পাবলিশারের কাছ থেকে টাকা আদায়ের ব্যাপারটাতে 'অধর' অপেক্ষা কাবুলিওয়ালাদের বেশি ভাল মানায়। শিশিরকে একদিন বললাম। শিশির চটি পায়ে দিয়ে জামাটি চড়িয়ে বলল, দিন একটা চিঠি লিখে দিন।

টেকনিকটা আমি জানতে পারি নি। তবে মোটা টাকা সেদিন পেলাম।

একদিন বললাম, বহুদিন একজনের কোন খবর পাচ্ছি না। তাই মনটাও ভাল লাগছে না।

শিশির বলল, জ্যোৎস্নাদির তো? খবর নিয়ে আসব? আপনি একবারটি বলুন না মৃণালদা, পৃথিবীটাকে জয় করে নিয়ে আসব আমি।

না, পৃথিবী জয় করার দরকার নেই, শুধু পরীক্ষাটাকেই জয় করে দেখি। শিশির বাংলায় ভাল নম্বর পায় নি।

আপনি ভেবে দেখুন মৃণালদা, কারখানার সেই খাটুনি, ওঃ মুখে রক্ত উঠে আসে। তার ওপর পড়াশোনা, স্নানে গেলেই ঘুম পেয়ে যায়। তবু তো আপনি বাড়িতে থাকতে দিয়েছেন। নতুবা সেই

খাটাল, আর সেই হোটেল, যেখানে মানুষ থাকে না। মৃণালদা সে যে কি কষ্ট হচ্ছিল। আর শেষ পর্যন্ত তাও উঠে গেল!

শিশিরের চোখ কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

হয়েছে আমার আর প্রশংসা করতে হবে না।

কই! আপনি তো বললেন না জ্যোৎস্নাদির খবর আনব কি না?

হেসে বললাম, কোথায় পাবি তাকে?

কেন! ছাপে! এখনো কলেজ ছুটি হয় নি।

সেটা মেয়েদের কলেজ, ঢুকতে দেবে না।

আমার ঢোকার দরকার নেই, খবরের দরকার শুধু।

শিশিরকে আটকানো গেল না।

কয়েকদিন পরে জ্যোৎস্নার সঙ্গে পথের ধারে দেখা হ'ল। বলল, আচ্ছা ভূতকে পাঠিয়েছিলেন তো।

কেন? কি করল?

কি আর করবে? আমাকে ডেকে নিয়ে বলল, আপনি আচ্ছা মানুষ তো জ্যোৎস্নাদি, মৃণালদা সেখানে ভেবে ভেবে মরছেন, আর আপনি দিব্যি আছেন। বলে তোমার চিঠিটা এগিয়ে দিল।

তুমি কি মনে করলে?

মনে করলাম, আমরা সেই রামায়ণের যুগে ফিরে গেছি। যে যুগে সেই লক্ষ্মণের মত ভাই পাওয়া যেত।

এবং সীতার মত স্ত্রী—আমি বললাম।

জ্যোৎস্না কটাক্ষ-পাত করে বলল, এবং রামের মত বীর স্বামী। ধনুর্বাণ ভেঙে যে সীতাকে লাভ করেছিল। এ যুগের বাংলার অধ্যাপকের মত নয়—একটা নালা পার হ'তে ভয় পায়, সমুদ্র বন্ধন তো বহু দূরের কথা।

আমার বিরুদ্ধে জ্যোৎস্নার এই চিরন্তন অভিযোগ। আমি যথেষ্ট দৃঢ় নই, আমার মধ্যে 'শিভ্যালারি' নেই, আমি সাহস করে কিছু চাইতে জানি না।

তবু যে জ্যোৎস্নার আমাকে কেন ভাল লাগে, যুক্তি বিদ্যার সেইটাই একটা বিস্ময়।

আমি চুপ করে গেলাম।

কি! অমনি রাগ হয়ে গেল! জ্যোৎস্না আমার চোখের ওপর চোখ রেখে বলল। কী কষ্ট হচ্ছিল আমার, তোমার কোন খবর পাচ্ছিলাম না, একটা চিঠি লিখে যে খবর পাব, সে সুযোগও নেই। বাড়িতে সি. আই, ডি, ভিড়। এ অবস্থায় শিশির বলেই আমাকে খুঁজেপেতে নিয়ে তোমার চিঠি দিল: আর কেউ হলে পারত? তুমিই বল?

আমি কিছুই বললাম না।

কী! কিছু বলবে তো? কতটুকু সময় তোমার কাছে থাকব? বাড়ি ফিরতে দেরি হলে ব[illegible] দেরায় পড়তে হবে। বাব্‌বাঃ সে কেন এক বাঘ উকিল। এইটুকু সময় তুমি মুখ ভার করে থাকবে?

আমি তখন পথের মাঠের ঘাসে সন্ধ্যার ছায়া-নামা দেখছি। একটা ট্যাক্সি ডাকলাম।

জ্যোৎস্না বলল, এরি মধ্যে ট্যাক্সি ডাকলে।

হাঁ, চলো।

কোথায় যাব?

চল, গঙ্গার ধারে ধারে একটু বেড়াই।

জ্যোৎস্না ছোট মেয়ের মত লাফিয়ে উঠল।

সেদিন কথায় কথায় শিশিরকে বললাম, আচ্ছা তুই যে এতো পরিশ্রম করছিস, আই. এ. পাশ করেই যা কি হবে বলতো? বি. এ. পাশ করলেও না হয় একটা কথা ছিল। চাকুরি পেতে সুবিধে হ'ত কিছু আই. এ. পাশটা তোর কোন্ কাজে লাগবে?

সে একটা ব্যাপার আছে মৃণালদা।

আমি যেন এক গোপন রহস্যের অন্ধকারে এসে দাঁড়ালাম। বললাম, কী ব্যাপার বল না?

শিশির মাথা নিচু করে রইল।

এই ওর এক অভ্যাস, কোনো সীরিয়াস কিছু ভাবলে মাথাটা নিচু করে আনে। অবশ্য তোর একেবারে পার্সোনাল ব্যাপার হলে বলার দরকার নেই।

শিশির তবু কিছু বলল না।

আমি ভাবলাম ওকে পীড়াপীড়ি করে লাভ নেই। এমনি সন্ধ্যা হয়ে আসছে, উঠোন থেকে ভেতরে গিয়ে একটু লিখতে বসব। উঠে যাব ভাবছিলাম, শিশির নিজেই এবার শুরু করল।

আমি উঠোনের অন্ধকারে ইজি চেয়ারে বসে শুনতে লাগলাম। শিশির ঘাসের ওপর বসে বলছে।

সে এক উপন্যাস মৃণালদা।

শিশির কথাগুলো বলছে দূরের দিকে তাকিয়ে—কিছুটা আপন মনে।

একটি মেয়ে আমাকে ভালবাসে। আমাকে তার যোগ্য হতে হবে মৃণালদা। তাই আমার এই তপস্যা। সময় বেশি নেই। আর এক বছর, এক বছর মাত্র। আমাকে অন্ততঃ আই. এ. পাশ করতে হবে। নইলে—

নইলে, সে তোকে ভালবাসবে না?

শিশির ফিরে তাকাল।

আমি বুঝতে পারলাম, কথাটায় শিশির আহত হয়েছে।

না, তা, বাসবে না কেন? আমি যে ফুল কাইভাস পাস, আমি যে একজন কারখানার প্রমিক, এই জেনেই সে আমাকে ভাল বেসেছে।

সে কদ্দূর পড়েছে?

সে আই. এ. পাশ করেছে। এখন মিসট্রেস।

মেয়েটির সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা হলো। বললাম, বাড়ি কোথায় রে?

আপনি কাঁটাখালি গ্রাম জানেন? হলদি নদীর ধারে?

জানি।

শিশির মেয়ের বাবার নাম বলল।

ও, উনি মেশের কাজ করেন না? খদ্দর টদ্দর পরেন?

হাঁ। শিশির এবার নিজের পরিবেশেই বলে চলল, তার নিবিড় প্রেমের কাহিনী। আমি বিস্ময়ের সঙ্গে শুনলাম সতী দুধ খায় না। কারণ শিশিরের দুধ কিনে খাবার পয়সা জোটে না।

সতী মাঝে মাঝে শিশিরকে টাকা পাঠায়।

শিশিরের জন্য খদ্দরের থান পাঠায়, নিজের হাতে সুতো কেটে!

আমি সেই অন্ধকারের নিঃশব্দ আলোকে শিশিরকে নতুন করে দেখলাম। তাকে এখন আর আমার বাড়ির আশ্রিত যুবক, আমার ছাত্র, অথবা একটা কারখানার শ্রমিক বলে মনে হচ্ছে না। সে যেন এক রাজার কুমার, প্রেমের বিরাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর সে।

আমি যেন কী এক গভীর আনন্দের, অমৃতের স্পর্শ পাচ্ছি। কি বলব, কিছু বুঝতে পারলাম না।

তবু বললাম, শিশির বিয়ে হতে তোদের বাধা কোথায়?

সতীর বয়স হয় নি, আইনের চোখে এখনও সে 'মাইনর'। আর এক বছর পরে সাবালিকা হবে। সেই সময়ের মধ্যে আমি আই. এ. পাশ করে যাব। তাই না মৃণালদা?

তোকে অবসর সময়ে আমি একটু একটু করে পড়াব। আসিস্ আমার কাছে।

আর কিছু দরকার নেই, মৃণালদা, শুধু ইংরেজীটা একটু দেখিয়ে দেবেন। ওই হতভাগা ইংরেজীটা আমার নির্ঘাৎ ফেল করাবে।

এই মুহূর্তে ইংরেজী ভাষাটাকে বড় নিষ্ঠুর বলে মনে হতে লাগল। বললাম, তা না হয় হ'ল। কিন্তু বিয়েতে আইনের চোখে সাবালিকা হতে হবে, মানে কি?

মানেটা খুব সোজা। আমাদের রেজেস্ট্রী করে বিয়ে করতে হবে।

কেন? মেয়ের বাবা মত দেবে না?

না। সতী, বাবাকে মত করাতে চেষ্টা করেছিল? তিনি রাজি হন নি কিছুতেই।

কেন? অসুবিধাটা কোথায়?

অসুবিধা, এই আমি একজন শ্রমিক, নিতান্তই স্কুল ফাইন্যাল পাশ, নামহীন, ঐতিহ্যহীন, একটি অসভ্য, বর্বর।

তা, সতী কী বলে?

সতী বলে, বাবার কথা শুনে তুমি একটুও দুঃখ করো না। ওঁরা কিছুতেই সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারে না। তা ছাড়া পুরনো বুনিয়াদি পরিবারের অহংকারগুলো ওর চিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ওতে তুমি কান দেও না, আমাকে বিশ্বাস কর,—আমি তোমাকে ভালবাসি এই তো তোমার বড়ো পরিচয়। মৃণালদা, সতীর কথা শুনে আমি যেন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করি, তখন আমি যে একটা শ্রমিক, আমি যে কত কষ্ট করে পড়াশুনা করার চেষ্টা করি, এসব আর মনে হয় না। জানেন? সতী বলেছে, আর একটু অপেক্ষা কর। আমিও কিছু টাকা জমাই। বিয়ে করলে তো কেবল হবে না? ঘর দোর চাই। ছেলে মেয়ে হলে, তখন?

এই মুহূর্তে সেই বউদিদিকে আমার দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল। বললাম, সতী কলকাতা আসে না রে? এলে, এইখানেই উঠতে বলবি। কোন সংকোচ করবি না। আমি সেই বোনটিকে একবার দেখতে চাই।

শিশির হঠাৎ আমার পায়ে হাত দিয়ে বলে উঠল, তুমি এসব সাপোর্ট কর মৃণালদা ?

কেন করব না ? যেখানেই ভালবাসা, সেইখানেই সত্য, সেইখানেই সুন্দর এসে ধরা দেয়। আমি লক্ষ্য করলাম, শিশিরের চোখ ছল্ ছল্ করছে।

কলকাতার আকাশ থেকে বর্ষার মেঘ তখন কোন্ অজানা দিগন্তের দিকে চলে গেছে। অথচ এই ঋতুটি আমার বড় প্রিয়। নির্জন অন্ধকার ঘরে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে আমি জ্যোৎস্নার কথা ভাবি, ভাবি এ ঘরে সে একদিন আসবে। এই শয্যা, এই পরিবেশকে সে সুন্দর করে তুলবে। তার অপূর্ব বিহ্বল দু'টি চোখের ছায়ার সংগীতে আমি জীবনের অতল জলের আহ্বান কান পেতে শুনব।

বর্ষার এই আশ্চর্য সুন্দর দিনগুলি কখন কেটে গেল। জ্যোৎস্না একদিনও আসে নি। শেষবার যখন দেখা হয়, সে বলেছিল, আমি বড় টায়ার্ড মৃণালদা, বড় টায়ার্ড। বাড়ির সঙ্গে আর পারছি না। ওরা তোমার কেবল নিন্দা করে, ভাবি একটা বাংলার প্রফেসার, তাতে আবার কবিতা লেখে। মাসে কত আয় ? বড় জোর চার শ' কি পাঁচ শ' টাকা ! এতে কোন ভদ্র পল্লীতে আজকাল 'ডিসেন্ট' ভাবে থাকা যায় না। এ বিয়ে অসম্ভব, এ্যাবসার্ড।

কিন্তু তুমি কি বল ? তোমার মতটাই বড় কথা ? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আমি তো তোমাকে বিয়ে করতে চাই, মৃণালদা।

আশ্চর্য ! জ্যোৎস্নার গলায় যেন আবেগের উত্তাপ নেই। আমি দুঃখ পেলাম, কিন্তু সে দুঃখ কাউকে বলা যায় না।

সেদিন কলেজের ক্লাস নেরিতে ছিল। একটু ঘুমিয়ে নিয়ে কাপড় পালটে, খাবার জন্য তৈরি হচ্ছি। বাইরে কে যেন কড়া নাড়ল।

চাকরটি ঘুমিয়ে আছে, তাকে আর তখন ডাকতে ইচ্ছে করল না। আমি নিজেই দরজাটা খুলে দিলাম।

হঠাৎ একটি মেয়ে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। আমি চিনতে পারলাম না, কোনো পরিচিতা ছাত্রীর মুখ বলেও মনে হ'ল না।

আমি সতী—মেয়েটি নিজেই বলল।

সেই শ্যামল স্নিগ্ধ পরিচ্ছন্ন মেয়েটিকে দেখে আমি মুগ্ধ হলাম।

শিশিরদা এই খানেই থাকে, আমাকে ঠিকানা দিয়েছিল। কলকাতা এসেছিলাম, তাই চলে এলাম একবার।

ভেতরে এস, তুমি এই খানেই থাকবে। তোমার জিনিস-পত্র কোথায় ?

জিনিস পত্র কি হবে ? আমি আজই চলে যাবো যে ?

না, আজ থেকে যাও। আমি অবশ্য কলেজ যাচ্ছি। ফিরতে দেরি হবে। ততক্ষণ শিশির এসে যাবে। আজ ও কলেজ যাবে না।

চাকরটিকে ডেকে দিলাম। বললাম, এই দিদিমণি থাকবে এখানে। খাবার এনে দিস্। সতীকে বললাম, তুমি এই ঘরে থাকবে, শিশির থাকে এইখানে। রাত্রে কথাবার্তা বলব, কেমন ?

আপনি শীগ্‌গির আসবেন কিন্তু !

মিষ্টি গলার এই নিঃসংকোচ ডাকটুকু ভালো লাগল, যা কেউ আমাকে আজো ডাকে নি।

সেইদিন কলেজের অধ্যাপকদের রুমে, এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে জ্যোৎস্নার এই মানসিকতার কথাটা বললাম। বন্ধুটি প্রেমের ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ। সব শুনে সে বলল, 'সিমটম্' বড় খারাপ মৃণাল। তারপর একটু থেমে সে বলল, আচ্ছা তুমি খুব 'শাই' না?

মানে?

জ্যোৎস্না তোমাকে কখনও কিছু বলত? অর্থাৎ এই তুমি 'বোল্ড' নও, কি খুব কিছু জোর কর না—এই সব আর কি।

একটু ভেবে বললাম, তা—অবশ্য বলত, আমি নাকি সাহস করে কিছু চাই না?

সোজা হয়ে গেল ব্যাপারটা। তারপর কানে কানে বলল, এর 'ক্যারেকটার' আলাদা। তাতে ক্ষতি কি? তোমার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে না হয় একটু কালো দাগ পড়ল। কোনো কোনো প্রেমিকা একটু স্পর্শ চায়, একটু নিবিড় স্পর্শ। বুঝলে না হে? মিথ্যেই কেবল বৈষ্ণব পদাবলী পড়লে আর পড়ালে! জীবনে কিছুই হ'ল না। 'আই কীল শীটি মৃণাল, আই রিয়েলি কীল'।

আমার চেতনা যেন আচ্ছন্ন হয়ে এল। আমি জ্যোৎস্নার সঙ্গে পরিচয়ের পরের ঘটনা-গুলোকে নতুন ভাবে দেখতে লাগলাম। তার নিবিড় সন্ধান, তার অরুণণ স্পর্শ, তার হাসি তার চাওয়া, তার অসংবৃত সজ্জা—সব যেন নতুন অর্থ নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। আমি বিভ্রান্ত হলাম, নিজের প্রতি অশ্রদ্ধা হ'ল—একটি মেয়েকে বুঝতে পারি নি বলে। জ্যোৎস্নার আচরণ যেন আমার যৌবনের প্রতি, আমার জীবনের প্রতি উদ্ধত অপমান বলে মনে হ'ল।

দু'পীরিয়ড আগে কলেজ থেকে বেরিয়ে, জ্যোৎস্নার কলেজের একটু দূরে একটা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। মোটামুটি এইটিই আমাদের দেখাশোনার জায়গা।

আমি ওর ছুটির প্রহর গুণতে লাগলাম। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলাম পথের দিকে তাকিয়ে। আজ যেন আমার নতুন অভিসার। বৈষ্ণব পদাবলীর সেই পদটি কেবল আমার মনে হতে লাগল,—রাধিকা বলছেন, বাঁশির সুর শুনেই আমি একলা এলাম—'অনুসরি আয়লু এহি ঠাম'। এখন কেউ কোথাও নেই। এই নির্জনে নিশ্চিত বিশ্বাসে আমার সাধ পূর্ণ কর—'একলি ধনি করহ নিজ সাথে'। আশ্চর্য, মধুর অভিসার। মনে মনে ভাবলাম—আজ জ্যোৎস্নাকে নতুন করে পাব।

ওদের কলেজ ছুটি হয়ে গেছে। মেয়েরা দল বেঁধে বাইরে আসছে।

এই তো জ্যোৎস্না বন্ধুদের সঙ্গে হাসতে হাসতে সিঁড়ি দিয়ে নামল!

জ্যোৎস্না একটু পিছিয়ে পড়ল।

এইবার বোধহয় আমার দিকে তাকাবে। না, জ্যোৎস্না আমার দিকে তাকাল না। হঠাৎ একটা বড় দামী গাড়ি এসে ব্রেক কষে দাঁড়াল। আমি দেখছি, সমস্ত মন নিয়েই রুদ্ধশ্বাসে দেখছি, সামনের দরজাটা খুলে গেল। জ্যোৎস্না হাসতে হাসতে সেই গাড়িতে উঠল, বসল ছেলেটির কাছে ঘেঁষে। গাড়িতে আর কেউ নেই। শুধু ওরা দু'জন।

জ্যোৎস্না সুন্দর করে ওর দিকে তাকাল।

আমি তাকালাম আকাশের দিকে। ভাদ্র মাসের শেষ অপরাহ্নের নিষ্ঠুর রৌদ্রে যে আকাশটা পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে!

আই. এ. পরীক্ষা এগিয়ে আসছে শিশিরের। টেস্টে কোনমতে পাশ করেছে। কিন্তু তবু যেন পড়াশোনায় মন নেই। কেমন যেন অগোছাল হয়ে গেছে শিশির। আমি মনে মনে অসন্তুষ্ট হই। তবু শিক্ষকের কর্তব্যটা, মাঝে মাঝে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

সেদিন আর স্থির থাকতে পারলাম না।

শিশির বাইরে থেকে এসে আমার কাছে একটা প্যাকেট হাতে নিয়ে দাঁড়াল। বললাম কি ওতে? আর এত রাত করে ফিরিস কেন? পড়াশোনা ছেড়ে দিলি নাকি?

কোনো উত্তর না দিয়ে শিশির প্যাকেট খুলে একটা খদ্দরের শাড়ি বের করল।

মৃণালদা, দেখুন না, কেমন হবে শাড়িটা?

আমার সারা শরীর রাগে জ্বলতে লাগল, কিন্তু মুখে বললাম বেশ ভাল হয়েছে, রংটা সুন্দর, কত নিল?

ত্রিশ টাকা। সতীকে মানাবে না?

আমি রুক্ষ গলায় বললাম, তুই না পরীক্ষার ফি দিতে পারছিলি না? শেষ পর্যন্ত আমাকে কয়েকটা টাকা দিতে হ'ল। আজ ত্রিশ টাকা দিয়ে শাড়ি কিনে নিয়ে এলি। হতভাগা কোথাকার! এই ক'মাসে তোর এত অধঃপতন হ'ল!

শিশির মুখ নিচু করে প্যাকেটটা তুলে নিয়ে নিজের সেই ছোট ঘরে চলে গেল।

আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম।

কতক্ষণে ধীরে ধীরে মনটা শান্ত হয়ে এল। আমি নিজের জগতে ফিরে এলাম। এখন মনে হ'ল, শিশিরের এই দুর্বল স্থানে আঘাত দেওয়া আমার ঠিক হয় নি। ও, এখন প্রেমের স্বপ্নে মগ্ন আছে। আমি কেন নিষ্ঠুরের মত সে স্বপ্ন ওর ভেঙে দেব!

আস্তে আস্তে ওর ঘরে গেলাম।

শিশির, সামনে শাড়িটা খুলে রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে।

আমি ডাকলাম।

ও যেন কোন সুদূর দেশ থেকে আমার দিকে নিঃশব্দে ফিরে তাকাল।

তোর খুব কষ্ট হয়েছে নারে?

একটু হেসে শিশির বলল না, আপনি যে আমার দাদা, দাদার মত কাজ করেছেন। আমি পরীক্ষা, বই-পত্তর সব যে ভুলে যাচ্ছি, মৃণালদা। সতী এত করে চিঠি লিখেছে—এ ক'দিন ধৈর্যধরে একটু পড়। কিন্তু সব, সব যে আমার ব্যর্থ হ'ল।

আমি শিশিরকে ঈর্ষা করলাম। একটি প্রেমের তপস্যায় ও—নিজেকে পূর্ণ করেছে বলে। বললাম, সত্যি আর ক'দিন আছে! একটু মন দিয়ে এ ক'দিন পড় না, পাশ করে যাবি। পাশ করলে সতী কত খুশি হবে বলতো!

সত্যি মৃণালদা, কিন্তু—

কিন্তু কি রে?

আমার যে অসুখ হয়েছে, বড় ভয় হয়, যদি কিছু হয়ে যায়!

আমি চমকে উঠলাম; কী এমন অসুখ হয়েছে তোর? ডাক্তার দেখিয়েছিস্? সামান্য পেট ব্যথা তো?

না। আজ ডাক্তার বলল, 'গলস্টোন' হয়েছে মনে হচ্ছে।

গলস্টোন? আমি বিস্মিত হলাম। কী কষ্ট হয়?

পেটে অসহ্য যন্ত্রণা।

এ্যাদ্দিন কেন বলিস নি আমাকে?

আপনি আমার জন্ত কত করেছেন, আপনার মন ভাল নয়, আবার আমি আপনাকে ব্যস্ত করব।

বুঝলাম। ডাক্তার কি বলল?

এখন ইনজেশান নিতে বলেছে, পরে 'এক্সরে' করতে হবে।

যা, ইনজেকশান নিয়ে আয়। মানিব্যাগ বার করে আমি দশটা টাকা দিলাম।

শিশির নোটটা হাতে নিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

কয়েকদিন পরে সন্ধ্যার দিকে আমার ক্লাশ ছিল। 'প্রেমের অভিষেক' পড়াচ্ছি।

'আপকা টেলিফোন আয়া'—স্যার।

কী এক অজানা আশংকায় আমি চঞ্চল হয়ে উঠলাম। পাশের বাড়ির একজন 'ফোনে' বলল, শিশিরকে এক্ষুনি মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অসহ্য যন্ত্রণায় মূর্চ্ছা গিয়েছিল শিশির।

প্রেমের গাম্ভীর্য্যে আর অগ্রসর হতে পারলাম না। ট্যাক্সি নিয়ে মেডিক্যাল কলেজে ছুটলাম।

পেশেন্টকে ইমারজেন্সি থেকে ভর্তি করে নিয়ে 'বেড'-এ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বহু কষ্টে সেখানে গেলাম।

ডাক্তার বললেন, আজই অপারেশন করতে হবে, এই রাত্রেই।

আমার চেতনা যেন লুপ্ত হয়ে আসছে। শুধু বললাম, এই রাত্রে! কেবল মনে হতে লাগল সতীকে জানাব কি করে?

আচ্ছা দেখুন, আমি একজন প্রফেসার!

ডাক্তারবাবুর সুর নামল, বললেন, বলুন কি করতে পারি?

আমি রাত্রে পেশেন্টের কাছে থাকতে পারি?

পারবেন।

আমি শিশিরের কাছে ফিরে এলাম। ওর জ্ঞান ফিরে এসেছে। আমাকে দেখে কেঁদে ফেলল, আমার হাতটা জড়িয়ে ধরল শিশির।

আমি ওর মাথায় হাত রাখলাম। বললাম, কোন ভয় নেই, সামান্ত একটা 'মাইনর' অপারেশান। ভাল হয়ে যাবে। আমি আজ তোর কাছেই থাকব।

মৃণালদা! শিশির ডাকল।

ওর চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে।

যদি না বাঁচি?

পাগল হয়েছিস, এতো সামান্ত ব্যাপার। কত মানুষ হাত পা কেটে গেলেও বেঁচে থাকে।

সতীকে যে দেখতে পাব না?

আমি ভোরে টেলিগ্রাম করে দেব, সন্ধ্যায় পৌঁছে যাবে।

শিশির যেন নিশ্চিন্ত হ'ল, বলল কালই তার চিঠি পেয়েছি, সতী টাকা পাঠিয়েছে।

এ সব ভাবিস না। ভগবানের ইচ্ছায় সব ঠিক হয়ে যাবে।

আপনি আশীর্বাদ করুন মৃণালদা।

রাত্রি গভীর হয়ে উঠছে হাসপাতালে। নিষ্ঠুর ঘন অন্ধকারগুলো বাগানে জড় হয়েছে। অপারেশান থিয়েটার থেকে শিশিরকে এইমাত্র 'বেড'-এ ফিরিয়ে দিয়ে গেল। কী বীভৎস দৃশ্য। ব্লাড দেওয়া হচ্ছে, অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে, হাত পা 'বেড'-এর সংগে বাঁধা। জ্ঞান হয়নি।

আমি এ দৃশ্য সহ্য করতে পারছিলাম না।

ধীরে ধীরে দুঃসহ কালো যন্ত্রণার রাত্রিটা ভোরের দিকে চলেছে।

কিন্তু শিশিরের অবস্থা খারাপ। সিস্টার আবার একটা ইনজেকশান দিয়ে গেল।

এখন কেমন দেখছেন, সিস্টার?

'এই একরকম।'

শিশিরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বসে আছি। হঠাৎ একবার জ্ঞান এল। বোবা চোখ নিয়ে তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজল—এক বার ওপরে চেয়ে রইল। ওখানে আকাশ নেই, শিশির জানে না।

তারপর কি এক কঠিন যন্ত্রণায় কাতর শব্দ করে উঠল। আমি ছোড়ে গেলাম, সিস্টার প্রীজ, পেশেন্ট কেমন করছে।

সিস্টার একটু হাসল—নিষ্ঠুর হাসি।

আমি ফিরে এলাম, দেখলাম একটি বিস্তৃত মৃতদেহ বিছানায় বীভৎসভাবে পড়ে আছে। সে যেন শিশির নয়। না, না, আমি কাঁদব না, শিশির আমার কেউ নয়। শুধু একজন ছাত্র। আমি বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। বেলা হয়ে গেছে, কলকাতা শহর তেমনি চলেছে। পৃথিবীর আকাশে, আলোকে কোথাও মৃত্যুর চিহ্ন নেই, তার বেদনা নেই, তার কান্না নেই।

একটু আগে শব সৎকার শেষ করে বাড়িতে ফিরে এসেছি। শ্মশানে বড় দেরী হ'ল। যাক তবু সৎকার করে এসেছি। এখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বড়ো ক্লান্ত। ঘরটা শূন্য মনে হচ্ছে। কে যেন ছিল, নেই, আর আসবে না, তাকে আই. এ. পরীক্ষা দিতে হবে না, ইংরেজীর জন্য ভয় পেতেও হবে না। সকল অনুভূতি থেকে সে মুক্তি পেয়েছে, সে মৃত্যুত্তীর্ণ!

কিন্তু একজন থাকবে, তাকে সমস্ত বেদনা নিয়ে থাকতে হবে, সে সতী। যে ভালবেসেছিল আই. এ. পাশ করে নি জেনেও একজন প্রমিক জেনেও এবং যে বলতে পেরেছিল, 'আমি ভালবাসি, সেইটিই তোমার পরিচয়'।

কি ভেবে শিশিরের সেই ছোট ঘরটায় এসে দাঁড়ালাম।

একবার শাড়িটা খুললাম। ও শাড়ি সতীকে কেমন মানাবে? সতী টাকা পাঠিয়েছে কিন্তু যাকে পাঠিয়েছে সে আর নেই।

আমি আপন মনে শাড়িটা আবার বেঁধে রাখতে যাব হঠাৎ কাগজ চোখে পড়ল। খুলে দেখলাম বিয়ের 'রেজিস্টার্ড সার্টিফিকেট'-এর ফর্ম। শুধু একটা সই করা আছে—'সিগনেচার অব ব্রাইডগ্রুম'-এর ঘরে—শিশির কুমার ঘাদ। সতী যেখানে সই করবে সেই ঘরটা খালি আছে।

সতীকে কখনও আর এ ঘরে সই করতে হবে না। ফর্মটাকে খামে ঢুকিয়ে আমার ড্রয়ারে বড়ো যত্ন করে তুলে রাখলাম। এ যেন একটা মূল্যবান দলিল! হাঁ দলিল, মানব সভ্যতার ইতিহাসের!

তার পর অন্ধকারে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। গন্ধরাজ গাছটায় শুধু একটা ফুল ফুটেছে, তারি করুণ গন্ধ ভেসে আসছে এখন।

———

পুরাতন পাতা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা যে সকল উপায়ে বঙ্গ-সাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিল, গ্রন্থ-সভা সেই সকল উপায়ের অন্যতর। পত্রিকা প্রথম প্রকাশ হবার কিছুকাল পরে 'এসিয়াটিক সোসাইটীর' প্রদর্শিত পথ অবলম্বনে তত্ত্ববোধিনী সভার অধীনে এক 'গ্রন্থ-সভা' [Paper committee] সংস্থাপিত হোল। সেই সভাতে কোন্ কোন্ প্রবন্ধ পত্রিকাতে প্রকাশের উপযোগী, তাহাই বিবেচিত হোত। পাঁচজনের বেশী এই সভার সভ্য 'গ্রন্থাধ্যক্ষ' থাকা নিয়ম ছিল না। একজন গ্রন্থাধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করলে, অপর একজন মনোনীত হয়ে তাঁর স্থান অধিকার করতেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজনারায়ণ বসু, শ্রীধর বিদ্যারত্ন, রাধাপ্রসাদ রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সমসাময়িক স্বনামধন্য মহোদয়গণ এই সভার সভ্য ছিলেন। সভার নিয়ম এই ছিল যে, পত্রিকার জন্য প্রেরিত প্রবন্ধ অধিকাংশের মনোনীত হলে প্রয়োজনমত পরিবর্তন সহকারে পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। অন্যের কথা দূরে থাকুক—বিদ্যাসাগর মহাশয় বা দেবেন্দ্রনাথের রচিত প্রবন্ধও অধিকাংশ সভ্যের সম্মতিক্রমে প্রকাশিত হোত।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার স্থায়িত্বলাভের প্রধান কারণ একটি মুদ্রাযন্ত্র লাভ। মাসিকপত্র স্বল্পব্যয়ে নিয়মিত প্রকাশ করতে ইচ্ছা করলে নিজের একটি মুদ্রাযন্ত্র নিতান্ত আবশ্যক। প্রয়োজন বুঝে, রমাপ্রসাদ রায় অক্ষরাদি উপকরণসহ একটি মুদ্রাযন্ত্র তত্ত্ববোধিনী সভাকে প্রদান করেছিলেন। এই মুদ্রাযন্ত্র ব্রাহ্মসমাজের যে কি পর্য্যন্ত উপকার সাধন করেছে, তার ইয়ত্তা হয় না। সময়ে সময়ে এই মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে লব্ধ অর্থের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের প্রাণরক্ষা হয়ে গেছে। আজও এই মুদ্রাযন্ত্রটি আদি ব্রাহ্মসমাজের আয়ের পথ উন্মুক্ত রেখেছে। কলিকাতার হেদুয়াতলার যে বাড়িতে রামমোহন রায় স্কুল বসিত সেই বাড়িতে তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয় প্রথম স্থাপিত হয়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করলেই অক্ষয়কুমার দত্তের কথা স্বতই মনে আসে। পত্রিকার প্রথমাবস্থার সঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনের কথা অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত। প্রথম অবধি বারো বৎসরকাল একাধিক্রমে অক্ষয়বাবু পত্রিকার সম্পাদনকার্য্যে ব্রতী ছিলেন। বলা বাহুল্য যে, সম্পাদকের ক্ষমতার উপরেই যে কোন সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রের উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে। অক্ষয়বাবুর মত সম্পাদক না পেলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা শিক্ষিতসমাজে নিজ শক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারত কি না সন্দেহ। অক্ষয়বাবুকে নির্বাচিত করে পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করবার জন্য, বস্তুতঃ দেবেন্দ্রনাথের নিকট ঋণী। পত্রিকা-সম্পাদক তখন গ্রন্থ-সম্পাদক নামে অভিহিত হতেন। দেবেন্দ্রনাথই গ্রন্থ-সম্পাদকের বেতন বহন করতেন। বোধহয় সেই কারণে, পত্রিকায় দেবেন্দ্রনাথেরই মতানুযায়ী প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হোত, অন্ততঃ তাঁর মত বিরোধী কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত না।

অক্ষয়বাবুকে গ্রন্থসম্পাদক পদে নিয়োগ সম্বন্ধীয় কথাটি এই :—"কোন্ ব্যক্তিকে ইহার [পত্রিকার] সম্পাদকতার ভার অর্পণ করা যায়, এই গুরুতর বিষয়টি সভার বিবেচ্য হইলে, অবশেষে স্থিরকৃত হইল যে প্রার্থীগণ 'বেদান্ত ধর্ম্মানুযায়ী সন্ন্যাসধর্ম্মের এবং সন্ন্যাসীদিগের প্রশংসা বাদ' এই বিষয়টি অবলম্বন করিয়া এক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করিবেন। যাহার প্রবন্ধ সর্বোৎকৃষ্ট হইবে তিনিই সম্পাদকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। ভবানীচরণ সেন, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের মধ্যে ইহার প্রতিযোগিতা হয়। অক্ষয়বাবুর প্রবন্ধটি সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইল, ইনিই তাই কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন।"

দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের রচনা 'অতিশয় শ্রবণগ্রাহী ও মধুর' বলিয়া উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"আমি মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে ইঁহার দ্বারা অবশ্যই পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারিব। ফলতঃ তাহাই ঘটিল। আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয়বাবুকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। তিনি যাহা লিখিতেন, তাহাতে আমার মত বিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না।... ফলতঃ আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম।'

উনিশ বৎসর বয়সে অক্ষয়কুমারের পিতৃবিয়োগ হয়। সেজন্য তাঁহার সাংসারিক অবস্থা আরও খারাপ হওয়ায়, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া লেখাপড়া পরিত্যাগ করিতে হয়। স্কুল ছাড়িবার পর অক্ষয়বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষকতায় নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে তিনি মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও বাসগ্রামের গোপীনাথ ভট্টাচার্য্যের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন। কিছুকাল পরে সংবাদ প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুরোধে বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে আরম্ভ করেন। একদিন অবসরমত ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহাকে দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধনী সভায় আনিয়া, তাঁহাকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেন। পরে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হইলে অক্ষয়কুমার আট টাকায় আরব্ধ করিয়া, দুই এক মাসের মধ্যেই চৌদ্দটাকা বেতনে তাহার শিক্ষক পদে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে তিনি একখানি ভূগোল রচনা করেন। ১৭৭৪ শকে [১৮৪২ খৃষ্টাব্দে] তিনি টাকীর প্রসন্নকুমার ঘোষের সহযোগিতায় 'বিদ্যাদর্শন' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ইহা ছয় মাসকাল মাত্র জীবিত ছিল। ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা বীরনেড়ে গ্রামে স্থানান্তরিত হইলে, অক্ষয়বাবু সেখানে যাইতে অস্বীকার করেন। অবশেষে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ হইলে, তিনি মাসিক ষাট টাকা বেতনে ইহার সম্পাদকতায় নিযুক্ত হইলেন। অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে এত স্নেহ চক্ষে দেখিতেন যে, পরে তিনি পত্রিকার কারণে দেড়শত টাকা বেতনের পদও গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। ১৭৭৭ শক পর্য্যন্ত দ্বাদশ বৎসর কাল তিনি পত্রিকার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৭৭৭ শকে কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত হইলে ঘটনাচক্রে পড়িয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে তাহার প্রধান শিক্ষকের পদ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই বৎসর অবধিই তিনি শিরোরোগে আক্রান্ত হইয়া, বাঁশবেড়িয়ায় গঙ্গাতীরে বাস করিতে থাকেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদন দ্বারা অক্ষয়বাবুর আর কিছুই অধিক হইত না, কিন্তু তিনি তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কার্য্যান্তর পরিহার পূর্বক নিয়তই উহার উন্নতি বর্ধনার্থ চেষ্টা করিতেন। ওই চেষ্টা সফল করণাশয়ে স্বয়ং নানাবিধ ইংরাজী গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন, এবং মেডিক্যাল কলেজে গমন করিয়া দুই বৎসর কাল রসায়ন উদ্ভিদ শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক সময়ে ৭০০ জন গ্রাহক ছিল। তাহা কেবল এক অক্ষয়বাবুর দ্বারা। অক্ষয়কুমার যদি সে সময়ে পত্রিকা সম্পাদন না করিতেন, তাহা হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এরূপ উন্নতি কখনই হইতে পারিত না।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই দেবেন্দ্রনাথের সর্বপ্রধান স্মৃতিস্তম্ভ।

———

দেশ-বিদেশ

আমেরিকায় চতুর্থ পর্যায়ের গান্ধী স্মারক বক্তৃতা : বক্তা—সাংবাদিক লুই ফিশার।

আগামী ১০ই এপ্রিল প্রখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক ও লেখক লুইফিশার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ পর্যায়ের মহাত্মা গান্ধী স্মারক বক্তৃতা দেবেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় "সংঘর্ষে লিপ্ত পৃথিবী : ঘটনাবলী ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা"।

নিউইয়র্কের তারকনাথ দাস ফাউণ্ডেশানের উদ্যোগে মহাত্মার স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এই বার্ষিক বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছে। ইহা একটি বেসরকারী সংস্থা, সমগ্র বিশ্বেই এশীয় বিষয়ে অনুশীলনে এই সংস্থা অর্থ সাহায্য করে থাকে। ১৯৩০ সালে এই সংস্থা গঠিত হয়। ১৯৪৮ সাল হইতে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বক্তৃতার প্রবর্তন হইয়াছে। ভারতে নিযুক্তপ্রাক্তন রাষ্ট্রদূত চেস্টারবোলস, নোবেল পুরস্কার বিজয়িনী সাহিত্যিকা পার্লবাক, এবং টেনেসিভেল আন্দোলনের নেতা জেমস এম লসনও বক্তৃতা দিয়েছেন।

মিঃ ফিশার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্ফ্রো উইলসন স্কুল অব পাবলিক এ্যাণ্ড ইণ্টারন্যাশন্যাল অ্যাফেয়ার্সএ ভিজিটিং প্রফেসার। এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্নস্থানে তিনি ২৫ বছরের বেশী আমেরিকার প্রখ্যাত সংবাদপত্রের প্রতিবেদক হিসাবে কাজ করিয়াছেন। ঐ সময়ে তিনি দশখানা পুস্তক রচনা করেন—ইহাদের মধ্যে একটি হইল মহাত্মাজীর জীবনী। তাহার রচিত অন্যান্য পুস্তক হইতেছে গান্ধী অ্যাণ্ড স্ট্যালিন, রাশিয়া রিভিজিটেড, দি সোভিয়েটস ইন ওয়ার্ল্ড অফেয়ার্স, প্রভৃতি। বর্তমানে তিনি মহাত্মাজী সম্পর্কে আর একটি পুস্তক রচনা করিতেছেন।

অভিনব শিক্ষায়তন

স্যানডিয়াগো, ক্যালিফোর্ণিয়া—১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ৫০০ বিদ্যার্থী ও ৩৫ জন শিক্ষক লইয়া একটি জাহাজ সাতটি মহাসাগর পরিক্রমায় বাহির হইতেছে। জাহাজটি ভারত, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া এবং আফ্রিকার বিভিন্ন বন্দরে নোঙর করিবে। ইহা সমুদ্রপথে ৩০০০ মাইল অতিক্রম করিবে। বিদ্যার্থীগণ ঐ সময়ে নিয়মিতভাবে পড়াশুনা করিবে, ইহাদের পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে থাকিবে, সঙ্গীত, শিল্পকলা, সাহিত্য, ধর্ম সমাজবিজ্ঞান, ভূগোল, নৃতত্ত্ব জীববিজ্ঞান ও সমুদ্রবিজ্ঞান। ইহাদের প্রথম পাঠ্য কাল শুরু হইবে যাত্রার সময় হইতে, এবং দ্বিতীয় পাঠ্যকাল ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে। ইহা যেসকল বন্দরে নোঙর করিবে সেই সকল স্থানের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ বিদ্যার্থী গণ পরিদর্শন করিয়া আসবে।

আলোকময় ডাক টিকিট

জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের ডাকবিভাগ সম্প্রতি এক নতুন ধরণের ডাকটিকিট বাজারে ছেড়েছে ; এগুলো হলো আলোকময় ডাকটিকিট। প্রথম দৃষ্টিতে অবশ্য টিকিটগুলোর কোনো আলোই চোখে পড়েনা। টিকিটগুলোর গায়ে এক ধরণের প্রতিপ্রভ রঞ্জক থাকে এবং শুধুমাত্র অতিবেগনি রশ্মির সংস্পর্শের টিকিটগুলো মানুষের চোখের সামনে আলোকময় হয়ে ওঠে। নিছক খেয়ালের বশেই যে ডাক-বিভাগ সাধারণ ডাকটিকিটের পরিবর্তে আলোকময় ডাকটিকিট আমদানি করেছে, তা নয়। নিতান্ত দায়ে পড়ে ডাকবিভাগ কর্তৃপক্ষ এই পথ অবলম্বন করেছেন। ডাক-সার্ভিসের উন্নতি সাধনের জন্যেই জার্মানীতে এই নতুন ডাকটিকিট চালু করা হয়েছে।

ডাকবিভাগ প্রতিবছর প্রায় ৮, ৭ বিলিয়ন চিঠিপত্র বাছাই ও বিলি করে। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২ কোটি ৩৩ লক্ষ চিঠিপত্র ডাকবিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হয়। ১৯৫২ সাল থেকে এইসব চিঠিপত্রের সংখ্যা শতকরা ৭০ ভাগ বেড়ে গেছে, এবং স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার প্রবর্তন ছাড়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লক্ষ লক্ষ চিঠিপত্রের বাছাই ও বিলি মোটেই সম্ভব নয়। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্য না নিলে দেশের সমস্ত ডাকঘরগুলো চিঠিপত্রের সমুদ্রে ডুবে যাবে। কারণ, জার্মান অর্থনীতির সকল বিভাগেই বর্তমানে কাজের লোকের বড়ো অভাব দেখা দিয়েছে। জার্মানীর ডাকবিভাগেও এই অবস্থার কোনো ব্যতিক্রম চোখে পড়েনা। সনাতন পদ্ধতি অনুসারে হাত দিয়ে চিঠিপত্র বাছাই ও বিলি করতে হলে বহু লোকের প্রয়োজন হয় এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তির হাতে পৌঁছতে যথেষ্ট সময় লাগে। তাছাড়া সমস্ত ব্যাপারটাই বেশ ব্যয়বহুল। কর্তৃপক্ষ তাই বাধ্য হয়ে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছেন। যন্ত্রগুলো জীবন্ত মানুষের মতোই সব কাজ দ্রুতভাবে সম্পন্ন করতে পারে। জার্মানীর ফেডারেল ডাকবিভাগের নতুন বাছাই যন্ত্র এই ধরণের একটা স্বয়ংক্রিয় "চিন্তাশীল" যন্ত্র। নয়া বাছাই যন্ত্রের ইলেকট্রনিক চোখ বিভিন্ন আলোক-চিহ্ন অনুসারে সকল চিঠিপত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখে। এই অতি আধুনিক ব্যবস্থার ফলে প্রতি সেকেণ্ডে সাতটা এবং প্রতি ঘণ্টায় ২০০০০ চিঠি বাছাই করা, সেগুলোর উপর ডাকঘরের ছাপ মারা এবং নির্দিষ্ট ঠিকানা অনুসারে সেগুলো বিভিন্ন চিঠির থলিতে পোরা সম্ভব হয়। বাছাই করবার সময় চিঠিপত্র-গুলো অবশ্য একটা মধ্যবর্তী স্টেশন অতিক্রম করার পর চিঠির থলিতে পৌঁছে এবং ডাকবিভাগের নতুন নিয়ম অনুসারে ডাকবিভাগের কর্মচারীরা এই মধ্যবর্তী স্টেশনে একটা কী বোর্ডের সাহায্যে চিঠিপত্রের উপর প্রয়োজনীয় 'কোড' মুদ্রিত করেন। এই ব্যাপারে তাঁরা এক ধরনের প্রতিপ্রভ রঞ্জক ব্যবহার করে থাকেন। বাছাই যন্ত্রের ইলেকট্রনিক চোখ চিঠিপত্রের কোডগুলো এবং জটিল বহনকারী বেল্টের সাহায্যে আপনা থেকেই চিঠির নির্দিষ্ট থলিতে পাঠিয়ে দেয়। জার্মানীর ডাকবিভাগ কর্তৃপক্ষ অবশ্য এই ব্যাপারে নিশ্চিন্তে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবেন। ভবিষ্যতে এই কোড-স্টেশনের আর কোনো প্রয়োজন হবেনা ; স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক যন্ত্র সরাসরি চিঠির টাইপ করা ঠিকানা ও ডাকঘরের নম্বর পড়তে পারবে এবং তার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে চিঠিপত্র নির্ভুলভাবে বাছাই ও বিলি করা সম্ভব হবে।

— ——

True humour springs not more from the head than from the heart. It is not contempt; its essence is love. It issues not in laughter, but in still smiles, which lie far deeper.

—THOMAS CARLYLE.

॥ বিশ্ব-ব্যঙ্গচিত্র ॥

— ভারত —

কলকাতার রাস্তায়—শিল্পী বিমল দত্ত

॥ বিশ্ব-ব্যঙ্গচিত্র ॥

— ইংলণ্ড —

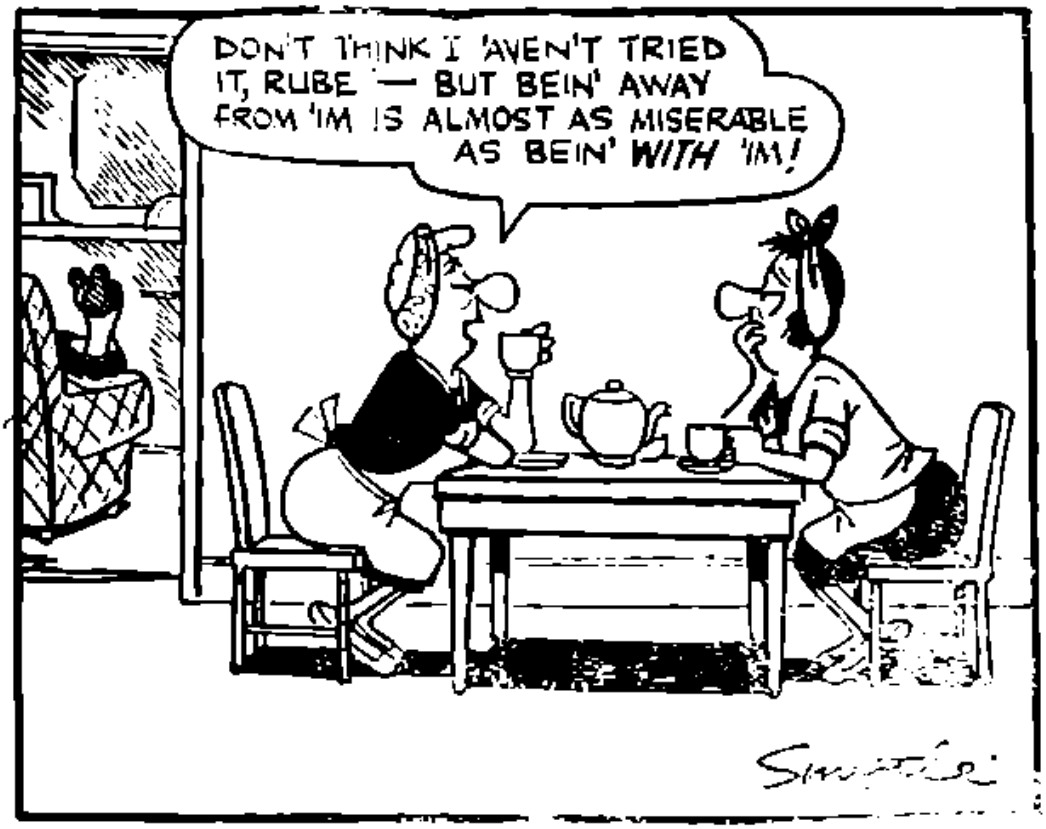

হোটেলের ম্যানেজার : অবাক করলেন ! সবাই বলে আর আপনি .....

আগন্তুক : তা হবে, তবে আপনার চার্জেরও তুলনা নাই ।

॥ বিশ্ব-ব্যঙ্গচিত্র ॥

— রাশিয়া —

'হ্যাঁ! হ্যাঁ! কোথায়—
কোথায় যাবেন?
ট্যুরিস্ট ক্যাম্প?
আরে এইযে! এক পা এগোলেই
পাবেন।'

'আরে [অতো] ভয় [পা]
করছ কেন? ঠিক
ধরে ফেলেছি।'

গল্প-ভারতী

বৈশাখ -১৩৫৯

সম্পাদক :

সহঃ সম্পাদক : শ্রীকল্যাণ রায়

মূল্য—এক টাকা

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড ২৭১বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে
শ্রীসুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত এবং কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড,
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

রবীন্দ্র-দর্শন

পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইল। শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রবীন্দ্র-জীবনবেদের সুখপাঠ্য প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। [২৷৷০]

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

১৯৬১ সনের রবীন্দ্র-পুরস্কার-প্রাপ্ত গ্রন্থ। লেখক ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত কর্তৃক ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত-সাহিত্যের তথ্য-সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক আলোচনা ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যান। [১৫৲]

রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত

এই চিরায়ত কাব্য ও ধর্মগ্রন্থটিকে সুন্দর চিত্রাবলী ও মনোরম পরিবেশে রুচিসম্মত একটি অনিন্দ্য প্রকাশন করা হইয়াছে। সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত। প্রকাশন পারিপাট্যে ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত। [২৲]

রমেশ-রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত; তাঁহার যাবতীয় উপন্যাস জীবদ্দশাকালীন শেষ সংস্করণ হইতে মুদ্রিত ও একত্রে গ্রন্থিত মোট ছয়খানি উপন্যাস : বঙ্গবিজেতা মাধবীকঙ্কণ, মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত, রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা সংসার এবং সমাজ। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত ও সাহিত্যকীর্তি আলোচিত। [২৲]

সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহাতে তিন হাজারের অধিক শব্দসংখ্যা যোগ হইয়া তেতাল্লিশ হাজারের মত শব্দের ব্যাখ্যা ও ব্যুৎপত্তি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। লাইনো হরফে ছাপা; সুদৃশ্য বাঁধাই। [৮৷৷০]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদের সংকলন, টীকা, শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রমিক পদসূচী সম্বলিত পদাবলী সাহিত্যের আধুনিকতম আকরগ্রন্থ। অধুনা অপ্রাপ্য 'পদকল্পতরু' ও 'পদামৃত-মাধুরী' হইতেও অধিকতর পদ সংযোজিত এবং বহু অপ্রকাশিত পদ এই প্রথম প্রকাশিত। ডিমাই অক্টেভো আকারে লাইনো হরফে মুদ্রিত হওয়ায় সহজ ব্যবহার্য হইয়াছে প্রকাশনা সৌষ্ঠবে অনুপম। গ্রন্থাগার, পদাবলী-রসিক ও কীর্তনীয়াগণের অপরিহার্য গ্রন্থ। [২৫৲]

পুস্তক-তালিকার জন্য লিখুন :

সাহিত্য সংসদ

৩২-এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,

কলিকাতা-৯

আমাদের বই সর্বত্র পাওয়া যায়

এখন পিলকার-প্রুফ ক্যাপযুক্ত শিশিতে পাওয়া যায়

- ঝরঝরে লেখা হয়
- তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়
- সাবলীল গতিতে কালি নামে

রেনবো কালি

রেনবো ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাঃ লিঃ

২১ এ, আর্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়-	১০০৫
অমৃত কথা ও কাহিনী—	১০০৭
জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ (জীবন কাহিনী)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	১০০৮
শুক্তি সৈকত (উপন্যাস)—বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়	১০১৪
পরীক্ষিৎ (গল্প)—সুশীল রায়	১০২৪
পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নটনায়ক (কাহিনী)—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১০২৯
জীবনের যজ্ঞশালায় (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	১০৩৪
চলতি দুনিয়া—	১০৪৩
রম্যাণি বীক্ষ্য—(ভ্রমণকাহিনী)—সুবোধ কুমার চক্রবর্তী	১০৪৫
পুরাতন পাতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৫০
একজন আর কয়েকজন (স্মৃতিকথা)—অনিলকুমার ভট্টাচার্য	১০৫২
পুরানো দিনের নাট্যজগতের রঙ্গকথা—বররুচি	১০৫৬
বিশ্বসাহিত্য—	
স্বপ্ন সন্ধানী হোল্ডারলিন—দীপক চক্রবর্তী	১০৬০
ভাষা ও সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৬৪

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত থেকে

সন্ন্যাস নিয়ে প্রেমাবেশে যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু তিন দিন রাঢ় দেশে ভ্রমণ করেছিলেন তখন শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত গৃহে তাঁর ভোজন-লীলার একটি চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বিরচিত বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ জীবনী-গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :

সদ্ঘৃত পায়স নব মৃৎকুল্লিকা ভরি।
তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ ভরি ধরি॥
দুগ্ধ-চিড়া-কলা আর দুগ্ধ লকলকি।
যতেক করিল তাহা বহিতে শকি॥

(মধ্যলীলা)

খুব ঘন ছালের দুধ, অথবা দুধের এই ছিল তৎকালীন বাঙালীর শ্রেষ্ঠ খাবার।
আর এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ খাবার হ'ল—

রসোমালাই

●

কে, সি, দাশ প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা

✱ রসোমালাই আবিষ্কারক ✱

এই সংখ্যায়

সাহিত্য-সংবাদ—পবিত্র পাল	১০৬৫
রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা—নারায়ণ চৌধুরী	১০৬৮
সন্দর্শন (বড় গল্প)—নরেন্দ্রনাথ মিত্র	১০৭৪
বিশ্ব-ব্যঙ্গচিত্র—কার্টুনিস্ট হাবরক	১০৮৯
রবীন্দ্রনাথ (সংযোজন)	১০৯৫
বিচিত্র "বিচিত্রা"— হেমেন্দ্রকুমার রায়	১০৯৭
রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা—অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	১১০৩
শিক্ষায় শিল্পের স্থান—নন্দলাল বসু	১১০৭
পশ্চিমে রবীন্দ্রনাথ—কালিদাস নাগ	১১১১
রবীন্দ্র-প্রতিভার একটি প্রকাশ—অরবিন্দ পোদ্দার	১১১৫
রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস—রথীন্দ্রনাথ রায়	১১১৯
ভারতপথে ও পশ্চিমে রবীন্দ্রনাথ—সুদর্শন পাল	
যুগমানব রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ—ত্রিপুরাশঙ্কর সেন	
ডায়েরীর পাতা—শান্তা দেবী	
রবীন্দ্রনাথের কথা—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	

॥ নূতন নূতন বই ॥

শৈলেন্দ্র মিত্রের নূতন উপন্যাস
পা বাড়ালেই রাস্তা ৫৲

বিমল মিত্রের অসাধারণ উপন্যাস
কড়ি দিয়ে কিনলাম (১ম খণ্ড) ১৬৲

শম্ভু মহারাজের অসাধারণ ভ্রমণকাহিনী
বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা (৩য় মুদ্রণ) ৬৲

প্রমথনাথ বিশীর
নবতম প্রবন্ধগ্রন্থ
রবীন্দ্রস্মরণী ১০৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
নূতন উপন্যাস
চন্দনবাঈ ৫৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
ঐতিহাসিক উপন্যাস
বহ্নিবন্যা (৪র্থ মু:) ৮৲

প্রবোধকুমার সান্যালের
বিবাগী ভ্রমর (২য় মু:) ৭৲

অমোঘ বসুর
বন কেটে বসত (২য় মু:) ৯৲

অদ্ভুতের
দুর্গম পন্থা (২য় মু:) ৪৲

ডঃ শুভ্রাংশু মুখোপাধ্যায়ের
রবীন্দ্রকাব্যের পুনর্বিচার ৬৲

ইলিনা রুদ্রচেস্টের
যা কিছু পেয়েছি ৪৲

সুবোধ নাথ ঘোষের
মন বিনিময় (২য় মু:) ৩৲

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আমাদের প্রকাশিত উপন্যাস

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস
চোখের বাহিরে ২·৫০

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের
যদি জানতেম ৪·০০
কন্যামৃগয়া ২য় সংস্করণ ৩·০০
সাতদিন ছোট গল্প ২·৫০

সুবোধ ঘোষের
মুক্তিপ্রিয়া ২·৫০

বারীন্দ্রনাথ দাশের
অনেক সন্ধ্যা, একটি সন্ধ্যাতারা ৪·০০

চিত্তরঞ্জন মাইতির
ডাক্তার জনসনের ডায়েরী ৩·০০

প্রভাত দেবসরকারের
শীঘ্র প্রকাশিতব্য উপন্যাস
মধুর এমন (যন্ত্রস্থ)

গ্রন্থশ্রী প্রাইভেট লিমিটেড
৪৬।৫বি, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সপ্তদশ বর্ষ ॥ একাদশ সংখ্যা. বৈশাখ ১৩৬৯

সম্পাদকীয়

প্রথম রবীন্দ্র-শতাব্দীর শেষ ॥

২৫শে বৈশাখ ১৩৬৯ কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারের উদ্যোগে শতবার্ষিকী উৎসবের যবনিকা টানা হচ্ছে—যদিও বাস্তবক্ষেত্রে এই রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল, প্রধানতঃ কয়েকটি সঙ্গীত নৃত্য ও নাট্যের মধ্যেই।

আজ বারবার মনে পড়ছে কবিগুরুর সেই বাণী : শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে? গভীর বেদনার সুরে কবি ওই গানে আমাদের শুনিয়েছিলেন; তাঁর এমনি কত গানই বাঙালী আজ ভুলতে বসেছে। দুই হাজার গানের মধ্যে অর্ধেক রবীন্দ্রসঙ্গীত আজকাল গাওয়াই হয় না। এই সঙ্গীতগুলির কয়টির যে নির্ভুল স্বরলিপি আছে তাও গবেষণার বিষয়। যদিও গীতবিতান, দক্ষিণী, রবিতীর্থ প্রভৃতি বহু রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিদ্যালয় চলছে। রেকর্ডে রবীন্দ্র-সঙ্গীত কিছু ভালো গলায় নির্ভুল স্বরলিপির সাহায্যে গাওয়া হয়েছে, আরও হওয়া দরকার। অনাদি দস্তিদার, শৈলজারঞ্জন মজুমদার প্রভৃতি প্রবীণ সঙ্গীত-শিক্ষকদের এ বিষয়ে অবহিত হতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের ৪।৫টির বহুল প্রচার হলেও আমাদের 'পাপমোচন' যেন এখনও হয় নি। তাঁর বহু নাটক ও নাট্যধর্মী রচনা সম্পর্কে বিশেষ মনোযোগ আলোচনা হয় নি—যেন চাপা পড়েছে—তাই রবীন্দ্র-নাট্যসংঘ ও রবীন্দ্র-পাঠচক্রের একান্ত প্রয়োজন—না হলে Tagore Theatre গড়া ব্যর্থ হবে। কলকাতার "রবিস্মরণী" আশা করি এক্ষেত্রে আলোচনা ও প্রয়োগের প্রসারের ব্যবস্থা করবেন। রবীন্দ্রনাথের গদ্য বা কবিতাসংগ্রহ ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও প্রকাশিত হলেও বিরাট গদ্য রচনার নির্দেশক কোন বই নেই—হয় তো Browning Cyclopaedia-র মতো রবীন্দ্র-কোষ প্রকাশিত হলে সে অভাব পূর্ণ হবে। কবিবর ডঃ অমিয় চক্রবর্তী English Prose Anthology [গদ্য-সংগ্রহ] প্রকাশ করেছেন, তাতে কিছুটা সাহায্য হবে। কিন্তু শতাব্দী উৎসবের সমাপ্তি কালেও এই সংগ্রহ প্রকাশের কাজ শুরু করা দরকার—যাতে ভবিষ্যতে রবীন্দ্র-কোষের প্রকাশ ও প্রসার সম্ভব হয়। তুলনামূলক সাহিত্য-

চর্চায় রবীন্দ্রনাথের অবদান আজ একান্ত স্মর্তব্য। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রকাশ ও রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রবর্তন করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদেরও এক্ষেত্রে বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও পর্ষদের অধিনায়করা এ বিষয়ে এগিয়ে আসবেন—কবির প্রতি জাতির ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমাদের সকলেরই। ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও ফ্রান্সে রবীন্দ্র-সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার ও অনুশীলন হচ্ছে।

বলাকা কাব্যগ্রন্থখানি ফরাসী ভাষায় আমি আক্ষরিক অনুবাদ করেছিলাম [১৯২৩-২৪]। সোভিয়েত রাশিয়াতে ও বাংলা-ভিত্তিক রুশ অনুবাদ শুরু হয়েছে—বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর সাম্প্রতিক অনুবাদিকা অধ্যাপিকা Novikov-কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি, এইরকম ভাবেই বিদেশী সাহিত্যে রবীন্দ্র-অনুশীলন আরও ব্যাপকতা লাভ করবে।

অমৃত কথা ও কাহিনী

[মহাত্মা যীশুর বাণী]

চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা, প্রবঞ্চনা করার চেয়ে বড় পাপ আর নাই।

• • •

তোমার প্রতিবেশীকে আপনার নিজের মতো ভালোবাসিতে শিক্ষা কর।

• • •

যাহাদের প্রাণে ধর্মলাভের জন্য ব্যাকুলতা আছে, তাহারা নিশ্চয়ই ধর্মলাভে পরিতৃপ্ত হইবে।

• • •

যে ব্যক্তি দানশীল, মহা তাহার গৃহেই বাস করে।

• • •

মিথ্যা দিব্য করিও না। এক গাছি চুল শাদা কি কালো করিয়া দিবার ক্ষমতা যাহার নাই, সে মিথ্যা দিব্য করিতে যায় কোন্ সাহসে?

• • •

প্রার্থী জনের প্রার্থনা পূর্ণ করিও। যে তোমার নিকট বিপদে পড়িয়া ধার চায়, তাহা হইতে তাহাকে বিমুখ করিও না।

• • •

তোমার শত্রু, মিত্র সকলকেই ভালোবাসিবে। মনে রাখিও, তোমরা স্বর্গস্থ পিতার সন্তান; তিনি ভালো-মন্দ লোকেদের উপরেও আপনার সূর্যকে কিরণ দিতে বাধা দেন না; ধার্মিক ও অধার্মিক সকলের উপরই তাঁহার মেঘ, বৃষ্টির শীতল ধারা ঢালিয়া দেন।

• • •

লোককে দেখাইবার জন্য ধর্ম-কর্ম করিও না। তুমি যখন দান কর, তখন তোমার সম্মুখে তুরী বাজাইও না। তুমি যখন দান কর, তখন তোমার দক্ষিণ হস্ত কি করিতেছে তাহা তোমার বাম হস্তকে জানিতে দিও না। যিনি গোপনে দেখেন, তিনি এইরূপ দানেরই ফল দেন।

• • •

চক্ষু শরীরের প্রদীপ। তোমার চক্ষু যদি সরল হয়, তবে তোমার সমস্ত শরীর দীপ্তিময় হইবে। চক্ষু কিন্তু তোমার যদি মন্দ হয়, তবে তোমার সমস্ত শরীর অন্ধকারময় হইবে।

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ

জীবন কাহিনী ॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১

বাড়িতে হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছে। ব্যাপার কী?

আদালতের পেয়াদা এসেছে ক্রোকী পরোয়ানা নিয়ে।

পেয়াদা-বরকন্দাজকে তখন বিষম ভয়। কী হয়া হাঙ্গামা শুরু করে না জানি। বাড়ির মেয়েরা যে যেখানে পারলো গা-ঢাকা দিল। স্বর্ণময়ী লুকোল বাড়ির পিছনে পিটুলি গাছের নিচে কচুবনের মধ্যে।

বাপের বাড়ি এসেছে স্বর্ণময়ী। বাপ গৌরীপ্রসাদ জোয়ারদার।

পরোপকারী হলে যা হয়। কোন এক বেনদার বন্ধুর জামিন হয়েছিলেন গৌরীপ্রসাদ। যথাকালে সে বন্ধু কেরার হয়েছে। সুতরাং ধরো গৌরীপ্রসাদকে। ক্রোক করো তার অস্থাবর।

ক্রোকের হাঙ্গামা মিটতে-মিটতে সন্ধে।

শ্রাবণের গুলন পূর্ণিমার সন্ধে। দিকে-দিকে কৃষ্ণনাম শুরার ঢেউ।

পেয়াদারা বিদায় হলে খোঁজ পড়লো মেয়েদের। সবাই ফিরলো কিন্তু স্বর্ণময়ী কোথায়? বাপ গৌরীপ্রসাদ অস্থির হয়ে উঠলেন। মেয়ে যে অন্তর্বত্নী। আসন্নপ্রসবা।

খুঁজতে খুঁজতে স্বর্ণময়ীকে পাওয়া গেল কচুবনে। কিন্তু একী অঘটন! সে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে আর তার কোলে সদ্যোজাত শিশু। পবিত্রের পবিত্র, মঙ্গলের মঙ্গল, ভুবন-সুন্দর-আনন্দকর।

এই শিশুই বিজয়কৃষ্ণ।

কৃষ্ণের জন্ম কারাগারে। বুদ্ধের জন্ম বৃক্ষতলে। যীশুর গোয়াল ঘরে। রামকৃষ্ণের চেঁকিশালে। নিমাইয়ের নিমতলায়। আর বিজয়কৃষ্ণের কচুবনে।

'যা বাড়ি যা, আমি তোর ঘরে তোর পুত্র হয়ে জন্মাবো।' বিজয়ের বাপ আনন্দকিশোর গোস্বামী পুরী গিয়েছেন, মধ্যরাত্রে জগন্নাথকে স্বপ্ন দেখলেন।

কী অমানুষিক ক্লেশ করে গিয়েছিলেন পুরী। নিত্যপূজার শালগ্রামচক্র গলায় বেঁধে দণ্ডী কাটতে কাটতে গিয়েছিলেন চারশো মাইল—শান্তিপুর থেকে শ্রীক্ষেত্র। যেতে লেগেছিল দেড় বছর। নদী পার হবার সময় নৌকোতেও দণ্ডী দেবার কামাই ছিল না। বুকে ও হাঁটুতে ঘা হয়ে গেল, ঘায়ে জড়িয়ে নিলো চট, তবু নিরস্ত হলেন না সাষ্টাঙ্গ থেকে। শ্রীধামে গিয়ে নবস্ত করলেন, আর ফিরবেন না। পেয়ে গেছি পুরুষোত্তমকে।

তখন স্বপ্ন দেখলেন। জগন্নাথ বললে,—'বা, পুরুষোত্তম তোর পুত্ররূপে তোর ঘরে আবির্ভূত হবে।'

'পুরুষোত্তম তো তুমি।'

'হ্যাঁ, আমিই তোর পুত্ররূপে জন্মাবো। গত জন্মে যে কাজটুকু বাকি ছিল তাই সম্পন্ন করবো এবার।'

দু-দু'বার বিয়ে করেছিল আনন্দকিশোর। দু' স্ত্রীই নিঃসন্তান।

বড় ভাই গোপীমাধব মৃত্যুকালে পাশে ডাকলেন আনন্দকে। বললেন,—'যাবার সময় একটা কথা বলে যাই তোকে। আমার এই অন্তিম অনুরোধ তোকে রাখতেই হবে।'

'বলুন।'

'দেখছিস আমার স্ত্রীর ছেলে পিলে নেই। তোর ছোট ছেলেটি তাকে দত্তক দিবি।'

'সে কী!' আকাশ থেকে পড়লেন আনন্দকিশোর: 'আমিও তো নিঃসন্তান। তা ছাড়া আমি আবার বিপত্নীক। আমার আবার দত্তক দেওয়া কিসের?'

গোপীমাধব চঞ্চল হলেন না। বললেন,—'আমি দিব্যচক্ষে দেখছি তুমি তৃতীয়বার বিয়ে করেছ আর তোমার দুটি ছেলে হয়েছে। আমি অপুত্রক—তোমার ছোট ছেলেটি আমার স্ত্রীকে দিয়ে দিও।'

মনে মনে হাসলো আনন্দকিশোর। বিয়ের নামে দেখা নেই, তায় পোষ্যপুত্র।

কিন্তু এ কী স্বপ্ন দেখালেন জগন্নাথ!

আর এমন আশ্চর্য, পঞ্চাশ বছর বয়স আনন্দকিশোরের, তৃতীয়বার বিয়ে করলো। বিয়ে করলো নদীয়া জেলার শিকারপুরের কাছে ঘরকুল গ্রামের সৌরী জোয়ারদারের মেয়ে স্বর্ণময়ীকে।

স্বর্ণময়ীও তেমনি মেয়ে। আসলে জীবন্মুক্ত অবস্থা, লোকে বলে পাগলিনী।

এক মুসলমান ফকিরের বরে তার জন্ম। বাপ-মা ফকিরকে বলেছিল, দ্বিতীয় সন্তান জন্মালে তোমাকে দিয়ে দেব। দ্বিতীয় সন্তান জন্মালে প্রতিশ্রুতি পালন করলো না। ফকির শাপ দিল: দেখিস তোদের প্রথম সন্তান থাকবে না ঘরে।

পাগল কোথায়! ও তো করুণার মন্দাকিনী।

শান্তিপুরে কোত্থেকে এক পাগলি এসে জুটেছে। ছুরন্তেরা তার পিছু নিয়েছে, ছুঁড়ছে ধুলোবালি। অসহায় পাগলির মুখে শুধু একটা করুণ কান্নার শব্দ।

কী হয়েছে যে তোর? স্বর্ণময়ী তাকে হাত ধরে নিয়ে এলেন ঘরে।

'আমি পুত্রশোকে উন্মাদ।'

'পুত্র কি তোমার যে তুমি শোক করছ? যাঁর জিনিস তিনি নিয়ে গিয়েছেন। তোমাকে দু'দিন দিয়েছিলেন নাড়তে চাড়তে, সেবা করতে, নেড়েছ-চেড়েছ, সেবা করেছ। ব্যস, ফুরিয়ে গিয়েছে। পরের জিনিসে শোক কিসের? কৃষ্ণজীকে ডাকো, তিনিই তোমাকে শান্ত করবেন, বুঝিয়ে দেবেন আগাগোড়া।'

হাত-ভরতি তেল নিয়ে পাগলির মাথায় মাখিয়ে দিলেন স্বর্ণময়ী। ঘড়ায়-ঘড়ায় জল ঢেলে স্নান করিয়ে দিলেন। পাগলির পাগলামি সেরে গেল বোধ হয়। বললে,—'মা, তুমি আমাকে জুড়িয়ে দিলে। এমনটি আর কোথাও দেখি নি। সবাই আমাকে পাগল বলে, ক্ষেপায়, দূর হ' বলে ঢিল ছোঁড়ে, আলার উপর আলা দেয়। কেবল তুমিই আমাকে স্নিগ্ধ করলে। তুমি কে মা?'

এক কুলত্যাগিনীকে নিজের ঘরে আশ্রয় দিলেন। পতিতা বলে ঘৃণা করলেন না। শুধু আশ্রয় নয়, সমস্ত গৃহকর্মের ভার চাপিয়ে দিলেন তার উপর। আরো বড় কথা, দীক্ষা দিলেন কৃষ্ণমন্ত্রে। প্রত্যহ ভোরে উঠে নদীস্নান করে সেই মেয়ে, স্নানান্তে ইষ্টমন্ত্র জপ করে, তারপর সংসারের কাজে লাগে। সংসারের কাজে তার অন্তহীন স্ফূর্তি। চিন্তাহীন উৎসাহ।

কোথায় পড়ে থাকত যে পঙ্কফুলে, তুলে নিয়ে এসে লাবণ্য-উচ্ছল বিকচ পদ্মে পরিণত করলেন। কৃপায় এমনি কত শত বৃষ্টি বিন্দু।

কালীঘাটে যাচ্ছেন। দেখলেন পথের ধারে খোলার ঘরের সামনে অল্প বয়সের একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুরন্ত শীত, তবু কাঁকা ছেড়ে ঘরে যাচ্ছে না। মেয়েটি কে বুঝতে দেরি হল না স্বর্ণময়ীর। ফিরিয়ে নিলেন চোখ। কিন্তু বস্তির থেকে ফেরবার সময় দেখলেন তখনো তেমনি দাঁড়িয়ে আছে সেই বারাঙ্গনা। শীতে কাঁপছে নিরাবরণ।

স্বর্ণময়ী এগোলেন তার কাছে। সঙ্গে যা টাকা-পয়সা ছিল সব সেই মেয়েটির হাতে ঠেলে দিলেন। বললেন,—'বাছা, আর শীতে দাঁড়িয়ে থেকো না, ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো।'

স্টেশনে এসে শান্তিপুরের টিকিট কিনতে গিয়ে দেখেন, সব পয়সা দিয়ে এসেছেন সেই বারাঙ্গনাকে।

সংসারের যা বরাদ্দ তার চেয়েও বেশি রান্না করেন স্বর্ণময়ী। গরীব দুঃখী স্ত্রীলোক যারা শান্তিপুরের বাজারে শাক-সবজি বেচতে আসে, তাদের বাড়িতে ধরে ধরে এনে খাওয়ান। বলেন, —'যে একলা নিজের জন্যে রান্না করে সে তো শেয়াল কুকুরের মতো। পাঁচজনের কম রান্না করা উচিত নয় কখনো।'

আর খাওয়ান কৃপণদের। বলেন,—'ওদের মতো দুঃখী বুঝি আর কেউ নেই। নিজেদের থেকেও ওরা উপোস করে থাকে।'

আর আনন্দকিশোর? তাঁকে সসম্ভ্রমে সকলে ঋষি-গোস্বামী বলে। ভোর রাত্রির কাঠও গঙ্গাজলে ধুয়ে নেন। নিষ্ঠার আধিক্যের জন্যে কেউ কেউবা বলে শকড়ি-ঘোরা বা খড়ি-ঘোরা গোঁসাই। গৃহদেবতা শ্যামসুন্দর, তাঁরই সেবা-পূজা ও বৈষ্ণবসেবাই তাঁর নিত্য কর্ম। আর, শুনে যাও দেখে যাও, তাঁর ভাগবত পাঠ।

যখন ভাগবত পড়েন তখন চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যায়, পুঁথির পাতা ভিজে ওঠে। শুধু তাই? রোমকূপ থেকে রক্ত ফেটে পড়ে, গায়ের জামা লাল হয়ে যায়। ভাবাবেশে হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন: রাধাশ্যাম, রাধাপ্যারী, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! সে হুঙ্কারে শ্রোতাদেরও রোমাঞ্চ জাগে। আত্মসম্বরণ অসাধ্য হয়। কান্নায় লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।

একবার দোলের দিন এক শিষ্যের দেওয়া আবির ভাগবতের উপর ছড়িয়ে দেন আনন্দ-কিশোর। শিষ্য ক্ষুণ্ণ হয়, কেন বিগ্রহকে না দিয়ে ভাগবতকে দেওয়া। আনন্দকিশোর শিষ্যকে বিগ্রহের কাছে নিয়ে গেল ডেকে। দেখ দেখ বিগ্রহের গায়েও আবির মাখানো। একী, কে আবির দিল বিগ্রহকে? কেউ দেয় নি। ওই ভাগবতের আবিরেই বিগ্রহ রঙিন হয়ে গিয়েছে!

আনন্দকিশোরের প্রথম পুত্র ব্রজগোপাল। যত দিব্য ঘটনার সূত্রপাত দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের প্রাক্কালে।

রাসপূর্ণিমার দিন শ্যামসুন্দরকে দর্শন করে ঘরে যাচ্ছেন স্বর্ণময়ী, বিগ্রহ থেকে এক জ্যোতির্ময় শিশু বেরিয়ে এসে তাঁর আঁচল চেপে ধরলো। চললো সঙ্গে সঙ্গে।

স্বর্ণময়ী চমকে উঠলো। কে? কে তুমি?

কই, কেউ নেই তো।

কিন্তু রাতে স্বপ্ন দেখলেন স্বর্ণময়ী। সেই জ্যোতির্ময়-শিশু তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। অমনি ধরেছে আঁচল চেপে। বলছে, মা, তোমার কাছে এলাম।

এখন থেকে কতো কী দেখছেন। সোনার রোদ গাছের পাতায় ঝিকমিক করছে, মনে হচ্ছে যেন রাধাকৃষ্ণ নাচছে। শুয়ে আছেন, দেখছেন গর্ভের সন্তান বাইরে বেরিয়ে এসে শুয়ে আছে মাথা গেঁথে। আলো হয়ে গেছে ঘরদোর। গৃহকাজে হাঁটছেন চলছেন, কে যেন নূপুর পরে ফিরছে পায়ে-পায়ে। সুগন্ধে আমোদ হয়ে গিয়েছে দশ দিক।

স্বামী ছাড়া আর কাকে বলবেন এসব অনুভূতির কথা। আনন্দকিশোর বলছেন,—'পুরীর স্বপ্ন কখনো মিথ্যে হবার নয়।'

কলুবন থেকে শিশুকে ঘরে নিয়ে আসা হল। ডাকা হল কবরেজ। দেখুন দেখি, শিশু এমন নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে কেন?

কবরেজ দু'রকম ওষুধ দিল। একটা খাবার, আরেকটা মালিশের। প্রথমটাতে মুসব্বর, দ্বিতীয়টাতে আফিং।

স্বর্ণময়ী ভুল করে আফিং খাইয়ে দিলেন শিশুকে।

সর্বনাশ করেছিস। নিজের হাতে বিষ দিয়েছিস মা হয়ে।

কিন্তু কী আশ্চর্য, বিষেই উলটো ফল হল। জ্ঞান হল শিশুর।

শান্তিপুরে খবর গেল। গোপীজনবল্লভের স্ত্রী কৃষ্ণমণির আনন্দ আর ধরে না। ধন্বন্তরি পাবেন এই শিশুকে।

ছ মাস পরে স্বর্ণময়ী ফিরলেন শান্তিপুরে। পতি গৃহে। কতো বড় মর্যাদাসম্পন্ন সে ঘর। অদ্বৈত আচার্যের বংশ। যার আহ্বানে-হুঙ্কারে মহাপ্রভুর আবির্ভাব। সেই মহাপ্রভুই আবার এলেন নদীয়ায়, ঝুলন পূর্ণিমার সন্ধ্যায়, বহিরঙ্গনে বৃক্ষতলে। আর যখন অষ্টম মাসে শিশুর অন্নপ্রাশন হল, শিশু আগের মতোই, সোনা রূপা মাটি না ধরে ধরলো ভাগবত।

কিন্তু নাম উঠলো কী রাশিচক্রে? দুই নাম উঠল। দুইই অসামান্য। এক নাম দিগ্বিজয়, আরেক নাম বিজয়কৃষ্ণ। শুধু দিক-দেশ বিজয় নয়, সর্বাংশে সর্বজনমন জয় করবে বলেই বিজয়কৃষ্ণ নির্ধারিত হল।

শিশুর গায়ে গয়না উঠেছে। আর খোকা, পাখি ধরে দেব, বলে চোর তাকে কোলে তুলে নিয়েছে। এগিয়ে চলেছে নিরালার সন্ধানে। কিন্তু একী, চোরের দিক্ ভ্রম হল নাকি? কোথায় নির্জনে যাবে, তা নয়, ঘুরতে ঘুরতে আনন্দকিশোরের দোর গোড়াতেই এসে হাজির হল।

'বাবা!' আনন্দকিশোরকে দেখে লাফিয়ে পড়লো ছেলে। বাপের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো হাত মেলে।

চোর কিছুতেই তাকে পারলো না ধরে রাখতে। বেগতিক দেখে নিজেই চম্পট দিল।

শ্যামসুন্দর, আমার বিজয়কে দেখো, আতান্তরে ফেলো না।

কিন্তু বিজয়ের যখন প্রায় চার বছর বয়েস, আনন্দকিশোর চোখ বুজলেন। জমিদার শিষ্য মুকুন্দ চৌধুরির বাড়িতে ভাগবত পড়তে পড়তে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

'কালো কুচকুচে, লাল টুকটুকে, শাদা ধবধবে, আবার হলুদে মেশানো—তুই কে রে?' এক পাগল বারে বারেই ছুটে আসে বিজয়ের কাছে, আর ওই বলে হাঁক পাড়ে। পাগলের নাম শ্যামা ক্ষেপা। সকলে বলে, সর্বজ্ঞ।

তার মানে তুমিই কি সেই ভাগবত বর্ণিত কৃষ্ণ? 'শুক্লো রক্ত তথা পীতঃ ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ?' তুমিই কি সেই তমালশ্যামল কৃষ্ণ, পরমসুখকন্দ গোবিন্দ? আর্তত্রাণ-পরায়ণ জগন্নাথ?

স্বামী গত হবার পর স্বর্ণময়ী ছেলেদের নিয়ে ঝাঁপরে পড়লেন। নিজেই যেতে লাগলেন স্বামীর শিষ্যদের বাড়িতে। ওখান থেকে যা আদায় হয় তা দিয়েই সংসারনির্বাহ। কায়ক্লেশে দিন কাটানো। আবার কখনো যান পিত্রালয়ে, শিকারপুরে।

একবার ছেলেদের নিয়ে শিকারপুর থেকে আসছেন শান্তিপুরে। দেখলেন নদীর খানিকটা শুকিয়ে গিয়েছে। শান্তিপুর আর দূরে নয়, দু' তিন ঘণ্টার পথ। কিন্তু হঠাৎ এ কী দুস্তর বাধা! ঘুরে যেতে হলে তিন দিনের ধাক্কা। এখন কী করেন, কে আছে—তাঁদের পার করে দেবে, কোথায় তুমি অচল-চালক!

কে এক বিরাট পুরুষ হঠাৎ আবির্ভূত হল সেখানে। শুকনো ডাঙার উপর দিয়েই নৌকো টেনে নিয়ে চললো সবলে। জলে এনে ছেড়ে দিল, ভাসিয়ে দিয়ে গেল। তারপর কোথায় মিলিয়ে গেল কেউ দেখলো না।

সর্বক্ষণ ভয়ে কাঁপছে বিজয়। কে এই অপ্রমেয় মহাবাহু। কে এই বহুমঙ্গল লোকবন্ধু!

শিকারপুরে দিঘির জলে পড়ে গিয়েছে বিজয়। অতলতল দিঘি, কেউ সন্ধান পাচ্ছে না শিশুর। সৌরীপ্রসাদ জাল ফেলেছেন। পারে দাঁড়িয়ে হাহাকার করছেন স্বর্ণময়ী। শুধু স্বর্ণময়ী নয়, গাঁয়ের কত শত লোকজন।

ও মা, ছেলে যেখি ওপারে চলে গিয়েছে। কে একজন শিশুর লম্বা চুল ধরে টেনে তুলে দিয়েছে ওপারে। সেই বুঝি জলের মধ্যে এতক্ষণ শিশুকে বুকে করে ছিল। কী আশ্চর্য, এক ফোঁটা জল খায় নি বিজয়।

মাথায় চুলে সুন্দর জটা হয়েছিল বিজয়ের। আদর করে সবাই তাকে জটে গোঁসাই।

'তেঁতুল গোলা দেখাও তো জটে গোঁসাই।'

বলতেই হল, শিশু আনন্দে অমনি মাথা ঝাঁকাতে শুরু করে। ঝটপট শব্দ হয় জটায়, তা দেখে সবাই হেসে কুটিকুটি।

মায়ের স্নেহে ভরপুর থাকলে কী হবে, বাবাকে প্রায়ই মনে পড়ে শিশুর। ছাদে কখন একা-একা চলে এসেছে বিজয়। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ, তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। চেয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছে অতর্কিতে।

এই দেখ, ছাদে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। কী ভীষণ ছেলে! ভয় ডর কিচ্ছু নেই।

ডাকাডাকি করতেই চমকে উঠলো বিজয়।

'কিরে, তখন অমন চমকে ছিলি কেন?' জিগগেস করল স্বর্ণময়ী।

'জানো মা, বাবাকে দেখলাম।'

'কাকে?' এবার স্বর্ণময়ী চমকালেন।

'বাবা এসে আমার হাত ধরলেন, বললেন ওঠ। বলে তাঁর কোলে বসিয়ে নিয়ে গেলেন চাঁদের দেশে। কতো সেখানে নদী, কতো পাহাড়, কতো ফুল বাগান—'

'কিছু বললেন?'

'বললেন, আমার ঘরে একজন খুব বড় সাধু হবে। তুই হবি সেই সাধু।' হাসতে লাগলো বিজয়।

'তুই কী বললি?'

'বললাম, হবো। আমিই তো হবো।' একটু বুঝি উদাস হল শিশু: 'বললাম, আর অমনি বাবা খুশি হয়ে ফিরে গেলেন। জেগে দেখি চাঁদে নয়, ছাদে শুয়ে আছি।'

ছেলে এখন যথেষ্ট বড় হয়েছে—এবার তবে পোক্ত ধাত। ধার্য করলেন কৃষ্ণমণি।

আর কেরানো যায় না, যায় না ঠেকানো।

বিধিমতো লেখাপড়া করলেন কৃষ্ণমণি। করলেন শাস্ত্রমতো যাগযজ্ঞ। গণ্যমান্যদের সাক্ষী রাখলেন দলিলে। বিজয়কৃষ্ণ দত্তক হয়ে গেল।

কিন্তু কৃষ্ণমণিকে কিছুতেই মা বলবে না বিজয়। আমার নিজের মা থাকতে কেন আরেক জনকে মা বলতে যাবো?

কৃষ্ণমণি তাকে নিজের ঘরে বন্দী করে রাখতে চান, নিজের স্নেহাঞ্চলে। বিজয় মানবে না সে বন্ধন, গোঁ ধরে থাকবে। আমি আমার মায়ের ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে যাবো কেন? আমার মায়ের ঘরে কি আদর নেই? তাঁর পাশটিতে কি জায়গা নেই আমার বিছানায়? কতো বড়ো মা আমার।

গয়ার পাহাড়ে পাথরে পা ঠুকে ব্যথা পেয়েছে বিজয়কৃষ্ণ। মা গো—বলে আর্তনাদ করে উঠেছে। দুঃখে-ধৈর্যে আঘাতে-ব্যাঘাতে মা নাম ছাড়া আর কী আছে সংসারে?

বাড়ি ফিরে এলে স্বর্ণময়ী বললেন,—'হ্যাঁ রে, পায়ে পাথরের ঠোক্কর খেয়ে ব্যথা পেয়েছিলি?'

'তুমি কেমন করে জানলে?'

'হঠাৎ সেদিন, ঘরে বসে আছি, আমার পায়ে একটা পাথরের চোট লাগলো। আমি ভাবলুম, সে কী, ঘরে বসে আছি, পাথর এলো কোত্থেকে?'

'কিন্তু সে যে আমাকে লাথা পাথর, তা তুমি বুঝলে কী করে?' প্রশ্নে ব্যাকুল হল বিজয়।

'তোর ডাক যে আমার কানে বাজলো, মনে হল, তুই নিশ্চয় কষ্ট পেয়েছিস।'

[ক্রমশ]

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

একমুঠো শহর তুতুকুড়ির পূর্বপ্রান্তে হল বীচ রোড। উত্তর থেকে দক্ষিণে লম্বালম্বি চলে গেছে খুব বেশি যদি হয়তো মাইল দুয়েক। বীচ বলতে এখানে কিছুই নেই। না আছে মাদ্রাজের মতো ঢেউয়ের বালির নরম কার্পেট বিছানো সমতল, সুন্দর উপকূল, না আছে কন্যাকুমারীর ধীরে ধীরে গড়িয়ে নেমে যাওয়া শিলার সোপান! তুতুকুড়ি শহরের পাশে উপকূল রেখা অত্যন্ত অসরল। কোথাও তা বেঁকে গেছে অর্ধচন্দ্রাকৃতি হয়ে, কোথাও বা হয়েছে ঈষৎ সরল, কোথাও বা সে রেখা ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে গেছে। তাই একটু সরল, সমতল, চওড়া বীচের জন্যে তুতুকুড়ির লোকেদের যেতে হয় শহর ছাড়িয়ে দক্ষিণে প্রায় মাইল দুই। সেখানেই হল তুতুকুড়ির বীচ। তা সেও মাদ্রাজের মতো বিস্তৃত জায়গা নয়। সে তুলনায় বলা যায় একটুখানো সমতল বালিভরা জায়গা।

শহরের এলাকার মধ্যে সমুদ্রের পাড়ে যেখানে এতটুকু জমি সমতল পাওয়া গিয়েছে সেখানেই কারুর না কারুর নৌকো তৈরি হচ্ছে। কাঠের একশ', দু'শ', তিনশ' টনের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নৌকো। এরা বলে সেঈ। এই সব সেঈর মালিকরা হলেন এই তুতুকুড়ির পরোয়া সমাজের লোকেরা। তুতুকুড়ির বন্দরে যে সব বড় বড় নৌকো মাল নিয়ে যাওয়া আসার কাজ করে তাদেরই জন্মস্থান হল এই সব জায়গা। পরোয়া সমাজের যাঁরা মাথায় আছেন তাঁদেরই কয়েকজনার ঘরে, সর্বসাকুল্যে বোধ হয় পঁচিশ-ত্রিশ ঘর হবে, এই সেঈর কৃপায় লক্ষ্মী বাঁধা আছেন। তাই তাঁরাও প্রায় টাকার জোরে কিনে রেখেছেন তুতুকুড়ি শহরের প্রান্তে সমুদ্রের ধারের এই জমিটুকু।

দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে হাঁটতে থাকলে বীচ রোডের ডানদিকে সমুদ্রের কোল ঘেঁসে ঘেঁসে যেসব যাবে এই নৌকো তৈরির জায়গাগুলো। শুধুমাত্র বন্দর এলাকাটুকু বাদ। সে জায়গাটুকু পাঁচিল দিয়ে ঘিরে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রেখেছে। উপরে বন্দর এলাকা যেখানে শেষ হয়েছে, তার পরেই কুলী-ধাওড়া। কুলী-ধাওড়ার পাশেই এসে পড়েছে হার্ভেস্টিনের ঘোরাট ঘরে আনা পচা নর্থনাটা। দিবারাত্রি দুর্গন্ধে এই জায়গাটার বাতাস বিষাক্ত হয়ে আছে। বীচ রোড কিন্তু নির্বিকার চিত্তে চলে গেছে আরও এগিয়ে। বাঁয়ে তার বিখ্যাত তুলোর কারখানা হার্ভে মিল। অনেক ইতিহাস জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে এই এলাকাটার এই পরোয়া সমাজেরও। বাইরের থেকে যদিও মনে হয় এর ঔদ্ধত্য ঠিক আগের মতোই আছে, ভিতরে ভিতরে কিন্তু সেটা অনেক নিষ্প্রভ। গত বছর ভারত স্বাধীন হবার পর থেকে মিলের ছট মালিকরা খুবই মুষড়ে আছেন।

এষ্টনী হার্ভে মিলের সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করতে লাগলো। ছেলেবেলাকার কথাগুলো তার জলছবির মতো মনে এঁটে আছে। তার বাবার সঙ্গে তাদের বাড়িতে আসত এই হার্ভে মিলের স্কট আর ইংরেজ সাহেবরা। খানা-পিনা হত এস্তার, তাদের বাড়ির বড় হলঘরের পালিশ করা কাঠ দিয়ে তৈরি বিস্তৃত মেঝে প্রায়ই মুখর হয়ে উঠত সাহেব-মেমদের নাচের সঙ্গে সঙ্গে। সারা হলটা গমগম করত হাসি-ঠাট্টা আর বাজনার আওয়াজে—কিন্তু না বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা চলবে না। এদিকে ডানদিকের ফাঁকা জায়গা থেকে এক ঝলক বাজনার আওয়াজ এসে কানে বাজলো।

সেখানে অনেকটা জায়গা ঘিরে প্যাণ্ডেল উঠেছে। অসংখ্য লোক গিজগিজ করছে। মোটরের পর মোটরকার আসছে আর মাননীয় ব্যক্তিদের নামিয়ে দিয়ে গাড়ির সারিতে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাজনাও বেজে চলছে পুরোদমে। সে বাজনার আওয়াজ এষ্টনীর কানে ঢুকে তার ধ্যান ভাঙিয়ে দিল মুহূর্তের মধ্যে। বিলাতী ব্যাণ্ডে খেলো বিলাতি সুর বাজছে।

এষ্টনী পায়ে পায়ে রাস্তা থেকে নেমে পড়ল বালির চড়ায়। তারপর এগিয়ে চলল বালি ভাঙতে ভাঙতে।

পেরেরাদের নৌকো ভাসান হচ্ছে। সেই উদ্দেশ্যেই সভা, সেই সভাতে ছোকরা-চোকরা থেকে আরম্ভ করে চুল্লুকুড়ির চুনোপুঁটিরা কেউই বাদ নেই। পেরেরাদের ছোট ছেলে জিল তাকে গত রাতে গিয়ে নিজে কার্ড দিয়ে নিমন্ত্রণ করে এসেছে।

এষ্টনী আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল সভাক্ষেত্রের দিকে। প্রথমে যে সব মুখ তার নজরে পড়তে লাগল তারা কেউই তার বিশেষ পরিচিত নয়। তার বাবার শেষ কাজের সময় অনেক লোকই তাদের বাড়িতে এসেছিল। কিন্তু কারুর মুখই আজ এষ্টনীর চট করে মনে পড়ছিল না। তার কারণ হল তার বাবার মৃত্যুর সময় যা সব ঘটছিল তা যেন তার কাছে অনেকটা স্বপ্ন বলে মনে হয়েছিল। সেই স্বপ্নের রাত শেষ হতে এখন এই বাস্তবের আলোয় সে কাউকে আর মনে করতে পারছিল না। কিন্তু সে সভার এলাকাতে পা দিতেই পেরেরাদের ছোট ছেলে জিল এগিয়ে এসে তার হাত জড়িয়ে ধরল—ওয়াঙ্গে ওয়াঙ্গে [আসুন, আসুন] ভিতরে চলুন।

বলতে বলতে জিল তাকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল সভামণ্ডপের মধ্যে। চারদিকের লোকেরা বেশ একটু অবাক হয়েই তাকিয়ে ছিল ধুতি পাঞ্জাবী পরা এষ্টনীর দিকে। জিল তাকে নিয়ে গিয়ে সভার প্রথম সারির একটা আসন দেখিয়ে বসতে ইঙ্গিত করল। সঙ্গে সঙ্গে একটি তরুণ এসে এষ্টনীর সামনে ধরল রূপার পাত্র, তার মধ্যে গোলা আছে চন্দন আর হলুদ, সুগন্ধি গোলাপ জলে। এষ্টনীর এ প্রথাটা মনে থাকবার কথাও নয়, ছিলও না। সে তরুণটির মুখের দিকে জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। জিল পরিচয় দিল—এই আমার বড় ছেলে স্যাম—স্যাম্‌সন। হার্ভে মিলে স্পিনিং এ্যাপ্রেন্‌টিস আছে, পরে বিলেত যাবে। স্যাম্‌সন একটু ইতস্ততঃ করতে লাগল এষ্টনীর সামনে। এমন সময় আর একজন মাননীয় অতিথি এসে চন্দনের বাটিতে দুটো হাত ডুবিয়ে হাতে চন্দনের জল মেখে নিয়ে নাকের কাছে এনে শুঁকলেন। তরুণটি এগিয়ে তাঁর বাটন হোলে একটা রক্ত গোলাপ গুঁজে দিলে। জিল তক্ষুনি আর একজন কাকে অভ্যর্থনা করতে হৈ হৈ করে এগিয়ে গেল। তরুণটি একটা ফুল এষ্টনীর হাতে তুলে দিল। এষ্টনীর বেশী ভেটি আর পাঞ্জাবীতে বাটন খুঁজে পাবার কথা নয়। তরুণটির অপ্রস্তুত ভাবটা ছিল তারই জন্যে। সে কাজ সেরে আবার এগিয়ে গেল তার বাপের পিছনে

পিছনে। এটনী দেখলো সভার মাঝখানে সভাপতির আসন একটা ভাল গদি আঁটা চেয়ার আর টেবিল। সভাপতির আসনের কাছে আরও চারখানা আসন। তাদের সামনে পাতা টিনের চেয়ারে নিমন্ত্রিত অতিথিদের বসবার জায়গা। কিন্তু প্রথম সারিতে কয়েকখানা সোফা-সেটও পাতা আছে টিনের চেয়ারের সঙ্গে। সে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়লো।

ভিতরে বসে এটনী কিছুক্ষণের মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠলো। ভিতরে প্রচণ্ড গরম। বেলা এখন সাড়ে চারটে। পশ্চিম থেকে কটকটে হলদে রোদ লম্বা হয়ে এসে পড়েছে বালির চড়ার ওপরে। তারপর প্যাণ্ডেলের ফাঁক দিয়ে এসে ঢুকেছে সভার মধ্যে। তারই মধ্যেই এটনী অবাক হয়ে দেখল, বেশির ভাগ সভাসদ্‌রা গরমের সুট পরে এসেছে। গলায় তাদের ঝুলছে বাহারে টাই। সেই পোশাকেই তাঁরা বেশ বুক চিতিয়ে ঘোরা ফেরা করছে প্যাণ্ডেলের মধ্যে।

এমন সময় বাইরে অনেক লোক এক সঙ্গে হৈ হৈ করে হৌড়ে গেল। জিল আর তার ছোট ভাই জ্যাক দু'জনেই ছুটে গেল। গাড়ি থেকে নামলেন সুসান কার্ভোজা। একদল লোক হৈ হৈ করতে করতে এগিয়ে গেল সুসান কার্ভোজার দিকে। সুসান আপ্যায়িতের হাসি হাসতে হাসতে গাড়ি থেকে নামলেন। তারপর তাঁর বিরাট ওপর নিচে চাপা মাথাটা নাড়তে নাড়তে জ্যাক আর জিল দু'ভায়ের পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে প্যাণ্ডেলের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। জ্যাক আর জিল দু'ভায়ে সুসানকে এনে মাঝখানকার সোফাটায় বসিয়ে দিল। জিলের ছেলে এসে সুসানের হাতের কাছে চন্দনগোলা রূপোর পাত্রটা ধরল। তারপর বেশ বড় দেখে একটা গোলাপ ফুল বেছে নিয়ে সুসানের কোটের বাটন হোলে লাগিয়ে দিল। সুসান হাসিমুখে তাকে একটা কি রসিকতা করলেন।

সোফায় বসেই কিন্তু সুসান স্থির হলেন না। তাঁর প্রকাণ্ড চ্যাপটা মাথাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারিদিকে দেখতে লাগলেন। এটনী অবাক হয়ে দেখল চারিদিকের লোকেরা তাঁর সেই দৃষ্টির সামনে মাথা নিচু করে অভিবাদন জানাতে লাগলো। আর সুসান রাজামহারাজার ভঙ্গিতে কৃপার সঙ্গে মাথা নাড়তে লাগলেন। এটনীর আদবে ভালো লাগল না সুসানের ভঙ্গিটা।

একটু পরেই সুসানের দৃষ্টি পড়ল এটনীর ওপর। চিনতে পারার ইঙ্গিত করে মাথা নাড়তে গিয়েও এটনীকে থেমে যেতে হল।

সুসানের চোখের দৃষ্টি ঠিক এটনীর চোখের ওপর নয়। সে যেন এটনীর মাথা টপকে ওপারে চলে গেছে আর কারুর ওপরে। এটনী একটু ইতস্তত: করে শেষ পর্যন্ত চোখ নামিয়ে বসল। কিন্তু তাকে স্বস্তিরও হতে দিলেন না সুসান। তিনি ঠিক তেমনি ভাবে এটনীর মাথা টপকে দৃষ্টি পাঠাতে লাগলেন বার বার।

বাইরে আবার হৈ হৈ উঠল। ব্যাণ্ডের বাজনা দ্বিগুণ জোরে বেজে উঠল। এটনী দেখল দু'খানা গাড়ি এসে লাগল সভার সামনে। একটা গাড়ি থেকে নামলেন একজন শ্বেতাঙ্গ আর একখানা থেকে একজন লম্বা একহারা চেহারার কালো মানুষ। পরনে লম্বা চিলে সাদা আলখাল্লা। গলায় তার লেসের কারুকার্য করা। কোমরে পাকানো রেশমের দড়ির সঙ্গে ঝুলছে জপের মালা। গলায় সোনার চেনে ঝুলছে একটা প্রকাণ্ড ক্রশ। ডানহাতের অনামিকাতে একটি অস্বাভাবিক বড় চুনী পাথরের আংটি। মাথায় ছোট্ট টুপি। কে যেন বললে—এই যে বিশপ এসে পড়েছেন।

বিশপ এসে বসলেন সভাপতির পাশের চেয়ারে। সভাপতির আসনে বসলেন সেই শ্বেতাঙ্গ

ভদ্রলোক। তাঁর মাথা-জোড়া প্রকাণ্ড টাক। পশ্চিম থেকে পড়ন্ত রোদ এসে তাঁর টাকে পড়ে টাকটা চক্ চক্ করে উঠলো। সেদিকে তাকিয়ে বিশপ হাসিমুখে রহস্য করলেন—মিঃ ম্যাকলাউড আমার মাথার তালু ঢাকা দেবার টুপিটা বরঞ্চ আপনিই পরুন। না হলে আপনার টাকের চক চকানিতে লোকের চোখ ধাঁধিয়ে যাবে।

মিঃ ম্যাকলাউড হাসিমুখে উত্তর দিলেন—ধন্যবাদ মিস্টার বিশপ। টুপিটা আমি মাথায় নিয়ে বিশেষ সম্মানিত হতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি যে এক ছেলের কামার। আপনার মতো হাজার সন্তানের কামার-গিরি করা আমার ক্ষমতায় কুলোবে না।

সভায় লোকেরা হো হো করে হেসে উঠলো। হাসির ধমকটা উঠতেই এটনী চকিত হয়ে তাকাল সভাপতির ডান দিকে। সেখানে মেয়েদের বসবার জায়গা হয়েছে। সেখানে যেন বাঁধভাঙা নদীর মতো কুলকুল করে হাসির বন্যা চলেছে। বিশেষ করে একটি মেয়ে সেই হাসিতে যেন নিজেকে নিয়ে ভেসে যাচ্ছে, মনে হল এটনীর। তার চোখ গিয়ে আটকে গেল সেই মেয়েটির ওপর। সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল। আশ্চর্য, এত দীর্ঘ দিন পরেও তার রূপের একটুও বদল হয় নি। দীর্ঘ দশ-বছরের মধ্যে তার চেহারায় এতটুকু চল নামে নি। সেই রকম অনবদ্য কমনীয় রয়েছে তার মুখশ্রী। সেই লিপস্টিকে রাঙানো চ্যাটালো পুরু ঠোঁট, সেই মাঝারি সাইজের নাক। সেই অপূর্ব মুখাবয়ব আর তাতে লাগানো সেই তেল তেল ক্রীম। এখনও ঠিক সেই দশ বছর আগেকার মতোই তার মুখের থেকে গলে গলে পড়ছে লাবণ্যের ধারা। দু'চোখ তার ঢাকা একটি কালো চশমায়। তাই তার চোখ এটনী দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু কালো চশমায় তাকে যেন আরও বেশী রহস্যময়ী করে তুলেছে। এটনী বুঝতেই পারল না সে তাকিয়ে আছে কার দিকে। ইতিমধ্যে সে হাসি সামলে উঠে সহজ হয়ে বসেছে। তার মাথার ওপর পাম্পিয়ের গোড়ে যেন সাপের ফণার মতো উদ্যত হয়ে দুলছে।

—হ্যালো মিঃ কারনাডো!

পাশে কার ধরা ধরা গলার ডাক শুনে এটনী চমকে তার দৃষ্টি সামলে নিয়ে ফিরে তাকাল। দেখল সুসান তার সোফা ছেড়ে এসে দাঁড়িয়েছে এটনীর পাশে। তার কানের কাছে মুখ এনে তাকে ডাকছে। অন্যমনস্ক এটনী চমকে অভিবাদন করে উঠে দাঁড়াতেই সুসানের সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল। দেখল সুসানের চোখে মুখে একটা চাপা হাসি যেন উপচে পড়ছে। মনে হল তিনি যেন এটনীর এই অন্যমনস্কতার কারণটা বুঝতে পেরেই হাসি চাপলেন। মুখে কিন্তু সে বিষয়ের ধারেও গেলেন না তিনি। সুসান, জিলের ভাই জ্যাককে হাতের কাছে পেয়ে কৃত্রিম স্বরে ক্ষুব্ধ ধমক দিলেন। —তোমাদের কী দেখবার চোখ নেই হে! এই এতবড় একজন জ্ঞানী মানী অতিথিকে তোমরা টিনের চেয়ারে বসিয়েছ?

বলতে বলতে সুসান এটনীর হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন তার সোফার দিকে। পাশের সোফাতে আঙুল দেখিয়ে এটনীকে বসতে অনুরোধ করলেন। এটনী কিছু আপত্তি করার আগেই তার দু'কাঁধে দু'হাত রেখে চেপে বসিয়ে দিলেন তাকে সুসান।

ওদিকে সভার কাজ শুরু হয়েছে। এদিকে এটনীর মনের মধ্যে একটা ঝড় শুরু হয়ে গেছে। সে দু'চোখ সামনে সভাপতির দিকে মেলে বসে আছে বটে। কিন্তু তার ভিতরটা একটা প্রচণ্ড আবেগে থরথর করে কেঁপে উঠছে বার বার। হাজার প্রশ্ন ভিড় করে আসছে মনে।

মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে একটি বছর দশেকের মেয়ে উদ্বোধন সঙ্গীত গাইছে। এ যেন নিয়ম রক্ষার খাতিরেই গান গাওয়ানো। মেয়েটির গলায় না আছে সুর—না আছে গানের কথাগুলো স্পষ্ট করে উচ্চারণ করার ক্ষমতা। কিন্তু তা না থাক, তার পোশাকটা অদ্ভুত রকমের জমকালো—যদিও মেয়েটির গায়ের রং ওর সঙ্গে তা একেবারেই মানায় নি। পোশাকের জরি ব্রোকেডের প্রাচুর্য আর সেই সঙ্গে হীরে চুনী পান্নার অলংকার—তার রূপহীনতা আরও বেশি করে প্রকাশ করে দিচ্ছে।

এস্টনীর কানে গেল কে একজন বলছে—জ্যাক, তোমার মেয়েটির গানের গলা তো ভারী মিষ্টি।

এস্টনী বুঝতে পারল না লোকটি জ্যাককে ঠাট্টা করল কি না। কিন্তু জ্যাকের জবাবে তার ভুল ভাঙল। জ্যাক হেঁ হেঁ করে জবাব দিল—হ্যাঁ, ওর গানের গলার প্রশংসা অনেকেই করেছে। ভাবছি আসছে মাস থেকে ওকে কর্ণাইটিক ক্লাসিক শেখাবার বন্দোবস্ত করব। আর তা ছাড়া ও এমনিতে নাচেও তো খুব ভাল। তা আপনি আসুন না আসছে কাল সন্ধ্যাবেলা ওর নাচ দেখে আমাদের বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করে যাবেন।

লোকটা বক্তৃতার মঞ্চে পড়ল। জরিগলিত স্বরে সে বললে—তা বেশ তো, তা বেশ তো—। বাকি কথাটা সে আর শেষ করতেই পারল না।

আবার এস্টনী দেখছে অপলকভাবে সেই রহস্যময়ীকে। তার ঠোঁটের কোণে কুঁচকে উঠেছে নিষ্ঠুর বিদ্রূপের হাসি। নিশ্চয়ই জ্যাকের মেয়ের গান শুনে। এস্টনী বেশ বুঝতে পারছে তার দুটো চোখও কালো চশমার আড়ালে বিদ্রূপের হাসি হাসছে। ওই চোখ দুটোর প্রতিটি অভিব্যক্তি এস্টনীর পরিচিত। রাগ-দ্বেষ, অভিমান-ঈর্ষা, বিশেষ করে এই বিদ্রূপ কি তীক্ষ্ণ হয়েই না ফোটে তার ওই দুটো চোখে। কিন্তু যে অভিব্যক্তিটা সবচেয়ে বেশি মুখর হয়ে ফুটে উঠত তার মৌন চোখের ভাষায় তা হল তার লীলা উজ্জ্বল আসক্তি-সম্ভোগের আনন্দ। ওর চোখে মুখে এই অভিব্যক্তির তুলনা এস্টনী সারা পৃথিবীতে কারুর মধ্যে দেখে নি। তাই তো ওকে এতদিনের অদর্শনেও ভুলতে পারল না। আচ্ছা ও এখন কার ঘরের ঘরণী?

বিশপের রুক্ষ-গম্ভীর গলার আওয়াজ শোনা গেল। আজ বড় আনন্দের দিন। পেরেরাদের আর একটি নৌকো আজ জলে ভাসবে। ঈশ্বরের পুত্র প্রথম ধর্ম-প্রচার করেন জেলেদের মধ্যে। জেলেরাই তাঁর সবচেয়ে কাছের সন্তান। জেলেরাই তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। সেই জেলেদের মধ্যে পেরেরারা তাদের ধর্ম-বিশ্বাসে অনেকের চেয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ঈশ্বরও তাই তাদের দু'হাত ভরে দিয়েছেন, এখনও দিচ্ছেন। জ্যাক আর জিল দুই ভাই-এর মতো ধর্মভীরু, ঈশ্বর বিশ্বাসী প্রাণী আমি খুব বেশি দেখি নি। ক্যাথলিক ধর্মের ওরা হল মস্ত খুঁটি। এদের টাকার ওপর ভর করে ঈশ্বরের রথ এগিয়ে যাবে। আশীর্বাদ করি, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি—এদের ঈশ্বরে বিশ্বাস এই আধুনিক ভাব বিপর্যয়ের দিনেও যেন অবিচলিত থাকে।

বিশপের কথাগুলো একমুহূর্তে এস্টনীর কানে গিয়ে বিষম তীরের মতো। জ্যাক আর জিল, ওদের মতো ঈশ্বর বিশ্বাসী ধর্মভীরু বিশপ খুব কমই দেখেছেন। একটা প্রচণ্ড কৌতুকপ্রদ হাসির ঝড় এস্টনীর বুকের মধ্যে গুমরিয়ে উঠতে লাগল। সামনে চেয়ে দেখল—সেই কালো

চশমা চাকা মুখখানিতে বিদ্রূপের হাসিটা আরও যেন বেশি তীব্র আরও অনেক বেশি অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে। আশ্চর্য ওই মুখটার নীরব ভাষাটি আর কি কারুর নজরে পড়ছে না। এটনী কিন্তু বেশিক্ষণ আর সেদিকে চেয়ে থাকতে পারল না। নিজের অন্তরের মধ্যে ডুবে যেতে লাগলো। সেখানে আবার দেখা হল জিনের সঙ্গে।

পঁয়তাল্লিশ সনে যুদ্ধ শেষ হবার কয়েক মাসের মধ্যে এটনী লণ্ডনে ফিরে এসেছে। সে তখন থাকে বেস্‌ওয়াটারে কুইন্‌সওয়ের একটা বাড়িতে। তখন লণ্ডনে দলে দলে রিফিউজিরা আসতে আরম্ভ করেছিল বলকান স্টেট থেকে, পোল্যাণ্ড থেকে। কুইন্‌সওয়ের বাড়িটায় যেখানে এটনী থাকত সেটা ছিল একজন পোলিশ রিফিউজির। সে যথাসর্বস্ব পোল্যাণ্ড থেকে নিয়ে লণ্ডনে পালিয়ে এসে বাড়ি কিনে ভাড়া দেওয়ার ব্যবসা করছিল। বাড়িটাতে বাস করত নানা জাতের লোক। শাদা, কালো, হলদে, বাদামী। বাড়িটা এমনিতে ছিল পুরনো কিন্তু প্রকাণ্ড। তাতে ঘর ছিল কম করে হবে খান কুড়ি। বাড়িওয়ালা ভ্যাল্‌ডার সঙ্গে এটনীর বন্ধুত্ব ছিল। দু'জনে দু'জনকেই জানত অনেক আগে থাকতে। ভ্যাল্‌ডার স্ত্রী জেনেচ্‌কার ছিল নানান ধরনের রান্নার শখ। এটনীকে প্রথম ভারতীয় ভাড়াটে হিসাবে পেয়ে সে তার কাছ থেকে ভারতীয় রান্নার তালিম নিত। আর তার বদলে প্রায়ই এটনীকে নিমন্ত্রণ করে তার ওপর সেই নতুন রন্ধন প্রক্রিয়ার পরীক্ষা চালাত।

দেখতে দেখতে পৃথিবীর অবস্থা স্বাভাবিক হতে আরম্ভ করল। সমুদ্রে ডেস্ট্রয়ার আর সাব-মেরিনের বদলে বড় বড় লাইনারগুলো যাত্রী নিয়ে এপার ওপার করতে শুরু করে দিলো। দলে দলে বিদেশী লোক এসে লণ্ডন শহর ছেয়ে ফেলল। ভ্যাল্‌ডার বাড়ির কুড়ি খানা ঘর ভর্তি হয়ে প্রায় একটা জাতি-সংঘের ছোট খাট সংস্করণ হয়ে উঠলো। বাড়িটার কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ দিনে রাতে একটুখানির জন্যেও বন্ধ হয় না। তাছাড়া ভাড়াটেদের বেশির ভাগ আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, বার্মা, মালয়, সিংহলের অধিবাসি হওয়ায় এ বাড়িতে লণ্ডনের অন্যান্য বাড়ির থেকে হট্টগোল হত অনেক বেশি। মিঃ ভ্যাল্‌ডা সে জন্যে এটনীর কাছে মাঝে মাঝে দুঃখ করত। কিন্তু জোর করে কাউকে কিছু বলতে পারত না এই জন্যে যে খদ্দের ছিল তার কাছে লক্ষ্মী। ক্রমশঃ এই হট্টগোল বাড়তে বাড়তে অসহ্য অবস্থায় উদ্ভব হল। দিনের বেলা যদিও বাড়িটা সামান্য নিস্তব্ধ থাকে তো রাত্রে যেন ভূতের নৃত্য শুরু হয়ে যায় ঘরে ঘরে।

বেস ওয়াটারের সামনেই হাইড পার্ক। হাইড পার্কের আশে পাশের পাড়াগুলোয় মোড়ে মোড়ে দেহ পসারিণী মেয়েদের নৈশ শিকারের আড্ডা। সেই সব আড্ডা থেকে অতি নিম্নশ্রেণীর মেয়েরা এসে ভ্যাল্‌ডার ঘর ভর্তি হতে লাগল। বাধ্য হয়ে ভ্যালডা ভাড়াটেদের জানিয়ে দিলে যে রাত দশটার পর কোন ভাড়াটে বাড়িতে মেয়ে বন্ধু রাখতে পারবে না।

লণ্ডগোলটা বাধল তারই পরের দিন। সেদিন রবিবার। জেনেচ্‌কার কাছে দুপুরে এটনী নেমন্তন্ন খেয়ে সবে তাদের ড্রইং রুমে এসে বসেছে। ভ্যাল্‌ডা আর জেনেচ্‌কা দু'জনেই এটনীকে জানাচ্ছে তাদের নতুন আইনের কথা। এমন সময় কলিং বেলটা বেশ চড়া সুরে বেজে উঠল। জেনেচ্‌কা গিয়ে দরজা খুলে দিতেই একজন ভাড়াটে ভেতরে ঢুকল। লোকটির রং কুচকুচে কালো কিন্তু সারা অঙ্গ ঢেকে আছে একটা চড়া লাল রঙের ড্রেসিং গাউন। তার মাথার চুল উস্‌কোখুস্‌কো, দুটো

চোখ লাল। দেখে মনে হয় যেন এক্ষুনি ঘুম ভেঙে উঠে এসেছে। তার গা দিয়ে মদের গন্ধ বার হচ্ছে তীব্রভাবে। হাতে তার জ্বলন্ত সিগারেট।

লোকটি ঘরে ঢুকেই রুঢ় গলায় প্রশ্ন করল—মিস্টার ভ্যালডা, তুমি নাকি বাড়িতে রাত দশটার পরে মেয়ে বন্ধু রাখা নিষেধ করে দিয়েছ?

মিঃ ভ্যালডা বললে—হ্যাঁ, কেন আপনি কি আপনার ঘরে আমার লেখা নোটিশ পান নি? লোকটি তীব্র:ঝাঁঝালো গলায় উত্তর দিল—ওসব নোটিশ কোটিশ ছাই পাশ কোথায় আছে তা খুঁজে দেখবার সময় আমার নেই। আমি আজ ঘুম থেকে উঠতেই এই কথাটা আমার পাশের ঘরের ভদ্রলোক জানিয়ে গেলেন। আমি তাই জানতে এলাম, তুমি কোন্ অধিকারে এই রকম আইন চালাতে পার?

লোকটার গলার আওয়াজে আর অসভ্য রকমের কথাবার্তায় মেয়েটি একেবারে থ' হয়ে গেছে। এটর্নী মনে মনে খুবই বিরক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু ব্যাপারটা ভাড়াটে আর বাড়িওয়ালাকে নিয়ে। কাজেই তার এর মধ্যে কথা না কওয়াই উচিত। তাই সে চুপ করে বসে শুনছে।

মিঃ ভ্যালডা গম্ভীর মুখে জবাব দিল—আমার অধিকার বাড়ির স্বত্বাধিকারীর অধিকার। বলার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটি আচমকা চেঁচিয়ে উঠল—না, না, না, তুমি এ করতে পার না। তোমার কোন অধিকার নেই, কোন লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হাত দেবার। একবার বিনা শর্তে ভাড়া দিয়ে পরে তার ওপর কোন রকম শর্ত আরোপ তুমি করতে পার না। আজই আমি আমার গার্লফ্রেণ্ডকে এই বাড়িতে এনে রাত কাটাব। কেউ কিছু বলতে এলে তার নাক কাটিয়ে ছাড়ব।

কথা কটা বলেই সেই লোকটি যেই পিছন ফিরেছে অমনি এটর্নী চট্ করে উঠে এসে তার সামনের দরজা আগলে দাঁড়াল। লোকটার অসভ্য রকমের চীৎকারে তার মাথায় ইতিমধ্যে রক্ত উঠে গেছে। সে ঘর চালিতের মতো তাই লাফিয়ে এসে লোকটার পথ আগলাল।

মাপ করুন, আপনার নামটা জানতে পারি কি?

আমি মিস্টার পেরেরা। সরুন, আমার পথ ছাড়ুন, আমাকে বিরক্ত করবেন না।

পেরেরা নাম শুনেই এটর্নী একটু চমকে উঠেছিল। টিউটিকোরিন আর সিলোন ছাড়া পেরেরা নাম তো আর কোথাও নেই। কিন্তু পথ সে ছাড়ে নি।

বলেছিল—দেখুন, আপনি ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন, ভারতের সুনাম বিদেশে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করুন।

তার কথায় বাধা দিয়ে লোকটি নেহাত তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে উঠেছিল—আই ড্যাম কেয়ার ফর গুড্‌নেস অব্ ইণ্ডিয়া। আমি এখানে স্ফূর্তি করতে এসেছি, তা আমি চুটিয়েই করব।

এটর্নী সঙ্গে সঙ্গে রুঢ় গলায় বলেছিল—তা হলে এ বাড়িতে থেকে আপনি তা করতে পাবেন না। মিস্টার ভ্যালডা আমার বিশেষ বন্ধু, তাকে রক্ষা করা আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি। রাতে যদি এ বাড়িতে মেয়ে এনে ফ্যাসেলা করেন তবে আমি নিজেই ঘাব আপনাকে বার করে দিতে। আমার মনে হয় আপনার হাতের ঘুষি আমার নাক পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই আমার ঘাবা আপনার কাঁধে অনায়াসেই পড়তে পারবে।

লোকটা এবার একটু অবাক হবার ভান করে আপাদমস্তক এটর্নীকে ভালো করে দেখে নিল। এটর্নীর লম্বা চওড়া চেহারাটা দেখে সে আর চেঁচামেচি করল না বটে, কিন্তু দাঁতে দাঁত পিষে বললে—আমি জিম পেরেরা, আমার বাপ আলফ্রেড পেরেরা হল মহারাজা অব্ টিউটিকোরিন। আমি ইচ্ছে করলে সমস্ত বাড়িটাই কিনে নিতে পারি, মনে থাকে যেন।

এটর্নী বললে—আগে কিনুন, তার পর ওকথা শোনা যাবে।

সেই হল জিমের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। সেই জিমই এখানে এসে ধর্মভীরু আর ঈশ্বরবিশ্বাসী হয়ে গেছে। আশ্চর্য! এদিকে সভাপতির আসনে মিঃ ম্যাকলাউড বক্তৃতা করতে উঠেছেন। বার বার তাঁর মুখ দিয়ে আলফ্রেড পেরেরার নাম উচ্চারিত হতে শোনা যাচ্ছে।

—আলফ্রেড পেরেরার নাম আমি আজ বিশেষ করেই স্মরণ করছি। —বলছেন মিঃ ম্যাক্লাউড। —আলফ্রেডের মতো বিশ্বস্ত লোক আজকাল বড় একটা দেখা যায় না। আমি তখন সবে এদেশে এসেছি সে প্রায় ত্রিশ বছর আগেকার কথা হবে। তখন আমার বয়স ছিল পঁচিশ। সেই সময়েই দেখতাম আলফ্রেড আমাকে কি রকম ভক্তি শ্রদ্ধা করত। তাকে যখনই যা হুকুম করেছি সে কখনও না করে নি। একবারকার কথা আমার মনে আছে। জাহাজ এসে নোঙর করেছে তুতুকুড়ি থেকে নয় মাইল দূরে। খুব কতকগুলি জরুরি মাল এসেছে, তক্ষুনি খালাস করার দরকার। কিন্তু হঠাৎ মেঘ উঠল আকাশে, সমুদ্র খেপে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। শুরু হয়ে গেল ঝড় আর জল। সেই জাহাজের মাল খালাস করার কন্ট্রাক্ট ছিল অন্য লোকের। সে বললে—আজ কোন মাঝি সমুদ্রে যাবে না। আমি রেট বাড়িয়ে দিতে চাইলাম। তা সে বললে—লক্ষ টাকা বললেও কেউ সমুদ্রে যাবে না সাহেব। তখন আমি আলফ্রেডকে ডেকে পাঠালাম। আলফ্রেডকে কথাটা বলতেই সে তক্ষুনি তিনবার সেলাম জানিয়ে বললে—হুজুরের আদেশ হয়েছে এর ওপর কি আর কথা আছে। এ কাজ হয়ে যাবেই। তারপর সে নিজে একটা নৌকোতে সেই দারুণ তুফানে প্রাণ তুচ্ছ করে খোলা সমুদ্রের ওপর দাঁড়িয়ে থেকে চব্বিশ ঘণ্টায় মাল খালাস করে নিয়ে এসেছিল। তা এই হল হার্ভে মিলের সঙ্গে পেরেরাদের সম্পর্ক। জ্যাক আর জিম হল সেই আলফ্রেডেরই ছেলে। সুতরাং তাদের নৌকোর দলে আর একটি বাড়লো মানে হার্ভে মিলেরই শক্তি বাড়লো। আমি সর্বান্তঃকরণে এদের সব রকম উন্নতি কামনা করি। আশা করি যে বিশ্বাস আলফ্রেড বাঁচিয়ে রেখেছিল তার সারা জীবন দিয়ে সেই বিশ্বাসটা যেন এরা দু'ভাই বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

ম্যাক্লাউডের বক্তৃতা শেষ হতেই চট্ পট্ হাততালির আওয়াজে এটর্নীর আবার এক প্রস্থ ধ্যান ভাঙল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল আর একটা ঘটনার কথা। নটিং হিল গেট পাড়ায় মিস্টার আর মিসেস উডের আস্তানা। সেখানে থাকত এটর্নীর বন্ধু জাকরিয়া—ঢাকার মুসলমান। এক সময়ে জাকরিয়া আর এটর্নী একসঙ্গে ইণ্ডিয়ান স্টুডেন্টস ব্যুরোর কাজ চালিয়েছিল। পরে জাকরিয়া সে কাজ থেকে সরে পড়লেও এটর্নীর সঙ্গে বন্ধুত্বটুকু নষ্ট হয় নি কোনদিন। কাজেই সময়ে অসময়ে এটর্নী যেত তার আস্তানাতে সময় কাটাতে। জাকরিয়ার কতকগুলো মহৎ গুণ ছিল। সে ছিল ওস্তাদ বেহালা বাজিয়ে আর হাফিজ, রুমির গজল গাইতে পারত সে ভারি চমৎকার। তার ওপর ছিল তার কথার অপূর্ব যাদু। মনের মেঘ কাটাতে জাকরিয়ার সঙ্গ ছিল একেবারে অদ্বিতীয়। কিন্তু অন্যদিকে সে ছিল একেবারে বেহিসেবী বেপরোয়া। মিস্টার আর মিসেস উডের একমাত্র

সুন্দরী মেয়ে এডিথের প্রেমে সে ছিল পাগল। তাই সে এ আস্তানা ছেড়ে অন্য কোথাও নড়তো না। কিন্তু সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য ছিল জাকরুল্লার যে, এডিথ তাকে কিছুতেই পাত্তা দিত না,—যদিও এডিথ তার সঙ্গে রীতিমতো ভালোবাসার খেলা খেলেছিল জাকরুল্লা যখন প্রথম এ বাড়িতে আসে। কিন্তু জাকরুল্লা যেই এডিথকে বিয়ে করতে চাইল অমনি তার ভালোবাসার চিড় খেল। কারণ এডিথের খেলা ছিল ভালোবাসার খেলায়, যাতে সে পোক্ত হয়ে উঠেছিল তার বারো বছর থেকে। নানারকম বোর্ডার তাদের বাড়িতে থেকেছে বহুদিন থেকে। তাদের হাতে হাতে ফিরেছে এডিথ লোভনীয় খেলার সামগ্রী হয়ে। যদিও সে মনে করত যে তার রূপের জন্যেই এত লোক তার জন্যে পাগল হয়। একথা ভেবে সে রীতিমতো গর্বও অনুভব করত। জাকরুল্লা এডিথের এ ব্যাপারটা জানত বলেই সে চেয়েছিল এডিথকে তার জীবনের সর্বনাশ থেকে বাঁচাতে। তাকে সে বিয়ে করতে চেয়েছিল। তাতে এডিথ শুধু তাকে প্রত্যাখ্যানই করেনি তাকে করেছিল কঠোর বিদ্রূপ। জাকরুল্লাকে সে জানিয়েছিল, সে যদি নবাব কি কোন মহারাজার ছেলে হত তবেই তাকে এডিথ বিয়ে করতে পারত। ভাঙা মন নিয়ে বেচারা জাকরুল্লা তাই বসে বসে বেহালা বাজাতো আর বোতল বোতল মদ গিলত।

জাকরুল্লার আরও একটি মহৎ গুণ ছিল, এমনিতে কারুর দুঃখ সে সহ্য করতে পারত না। তার ওপর সে ব্যক্তি যদি ভারতীয় কি পূর্ব অঞ্চলের লোক হত তো তার ওপর তার সমস্ত দরদ গিয়ে পড়ত। কতদিন সে নিজে না খেয়ে গরীব ভারতীয় ছাত্রের খাওয়া জুগিয়েছে। নিজের দামী সুট বিক্রি করে পরীক্ষার্থীর ফি দিয়েছে। জাকরুল্লা লণ্ডনের একটা কার্মে একাউণ্টেণ্টের কাজ করত, নিজে সে ছিল চার্টার্ড একাউণ্টেণ্ট। কাজেই তার রোজগার ছিল বেশ ভালো। কিন্তু দুটো শিলিংও তার পকেটে পড়ে থাকবার যো ছিল না, তার এই সাহায্য করার বাতিকের জন্যে।

এই জাকরুল্লা একদিন, লণ্ডনের রাস্তায় মাতলামো করার অপরাধে ধরা পড়া এক ভারতীয়কে পুলিশের হাত থেকে জামিন দিয়ে খালাস করে নিয়ে এসে মিস্টার আর মিসেস উডের এটিকের ঘরে আস্তানা দিল। লোকটার হাল-চাল ছিল একেবারে হা'ঘরের মতো। তার নিজের বলতে যা কিছু ছিল সবই সে বেচে কিনে মদ খেয়ে উড়িয়ে দিয়েছিল। তার পরনের সুটটাও ছিল ছেঁড়া নোংরা আর শতছিন্ন। লোকটাকে সব রকমে সাহায্য করতে লাগল জাকরুল্লা কাউকে কিছু না জানিয়ে। এমনকি তার বন্ধু এন্টনীকেও সে এ কথা ঘুণাক্ষরে জানাল না। লোকটা জাকরুল্লার টাকায় খেতে এবং নবাবী করতে লাগল বিনা দ্বিধায়। কেবল বলতে লাগল কোন কারণে দেশ থেকে টাকা আসা বন্ধ হয়ে গেছে, সেটা এলেই সে জাকরুল্লার টাকা শোধ করে দেবে। পুরো ছ'মাস সে জাকরুল্লার ঘাড়ে কাঁঠাল ভেঙে নবাবী করে করে গেল। তারপর সে একদিন উধাও হল মিস্টার আর মিসেস উডের এটিকের ঘর ছেড়ে। জাকরুল্লার টাকা সে শোধ করল অন্যভাবে।

লোকটা বাড়ি ছেড়ে পালাতেই এডিথ এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল জাকরুল্লার কাছে। সেই লোকটাকে তুমি চিনতে সে কোথায় গেছে বল। তাকে না পেলে লজ্জায় ঘেন্নায় এডিথকে আত্মহত্যা করতে হবে। এডিথ তিন মাস অন্তঃসত্ত্বা। সেই লোকটা হল এডিথের গর্ভের সন্তানের বাপ। সে যদি না ফিরে আসে তো এডিথ নিজে যাবে তার বাবা মহারাজা অব্ টিউটিকোরিনের কাছে। গিয়ে সব কথা খুলে বলবে। তাকে বিয়ে করতে বাধ্য করাবে।

কিন্তু জাকলিনের কাছ থেকে যখন এডিথ শুনল যে টিউটিকোরিনের কোন মহারাজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে কোন দিনই ওয়াকিবহাল নয়, এবং লোকটাকে সে একদিন পুলিশের হাত থেকে উদ্ধার করে এনেছিল দয়াপরবশ হয়ে, তখন এডিথ একেবারে ভেঙে পড়ল। মিস্টার আর মিসেস উডের কাছেও এদিকে কথাটা গোপন রইল না। তাঁরাও ভীষণভাবে যা খেল কথাটা শুনে। তাদের মনে একটা আতঙ্ক জাগল এই ভেবে যে, বিয়ে না-হওয়া মেয়ের ছেলে হওয়ার ফলে সমাজে তো রটেই, পুলিশে এই নিয়ে শেষ পর্যন্ত হাঙ্গামা না হয়। এডিথ ঠিক করেছিল আত্মহত্যা করে এই সমস্যার সমাধান করবে। কিন্তু জাকলিনা তাকে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করে সেই ছেলেকে তার ছেলে বলে প্রচার করে দেয়। জিলের সেই ছেলে আজও লণ্ডনের ওডহ্যাম রোডের বাড়িতে রয়েছে। জাকলিনাকে সে বাবা বলে ডাকে।

গতকাল এন্টনীকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে জিল তাকে দেখে চমকে উঠেছিল। চিঁ-চিঁ করে বলেছিল—আপনাকে যেন আগে কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। তাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচাতেই এন্টনী হেসে বলেছিল কই আমার তো মনে পড়ছে না।

এই হল ধর্মভীরু, ঈশ্বর-বিশ্বাসী আর বিশ্বস্ত হবার নমুনা। এঁর প্রশংসায় মিল-মালিক থেকে আরম্ভ করে ধর্মগুরু বিশপ পর্যন্ত পঞ্চমুখ। এন্টনীর সারা মন বিদ্রোহ করে উঠল।

এদিকে সবারের হাতে খাবারের একটা করে প্যাকেট দেওয়া হয়েছে। তাতে রয়েছে এক টুকরো প্যাস্ট্রি, একখানা প্যাটিস্, এক টুকরো হালুয়া আর কয়েকখণ্ড কাজু বাদাম। অন্যমনস্ক ভাবে এন্টনী তার থেকে খাবারগুলো তুলে নিয়ে আঙুলের মধ্যে পিষে গুঁড়ো করতে লাগল।

মিঃ কারস্তাওো কফি?—সুলান কার্ভোজা ধরা ধরা গলায় তাকে শুধালেন। এন্টনী নিজের মধ্যে আবার ফিরে এল। এবার সামনে তাকাতেই চোখে পড়ল সেই কালো চশমায় ঢাকা চোখ দুটো যেন স্থির হয়ে আছে তারই দিকে। আগেকার সমস্ত চিন্তা সে ভুলে গেল। আবার তার বুকের মধ্যে রক্তের ঢেউ উঠতে লাগল ছলাৎ ছলাৎ করে। সেদিকে তাকিয়ে সে কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগল।

খাওয়া শেষ হল। আর সঙ্গে সঙ্গে প্যাণ্ডেলের ভিতরকার অতিথিরা দল বেঁধে উঠে দাঁড়ালেন। বিশপ সেই দলের সবার আগে। সবাই গিয়ে হাজির হলেন সমুদ্রের তীরে নতুন তৈরি হওয়া নৌকোটার নিচে। প্রকাণ্ড নৌকো। তিন শ' টন মাল এটা অনায়াসে বইতে পারবে। এই ভুতুড়ুড়ির মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে বড় নৌকো। নৌকোর গায়ে একটা প্রকাণ্ড মই লাগানো। সেই মই দিয়ে বিশপ নৌকোর ওপর উঠলেন। সঙ্গে জিল আর জ্যাক দুই ভাই, সুলান কার্ভোজা, মিঃ ম্যাকলাউড। প্রায় চল্লিশ ফিট উঁচু নৌকো। লম্বায় হবে প্রায় সওয়া শ' ফিট। তার ওপরে দু' দুটো মাস্তুল। সেই মাস্তুলের গায়ে বাঁধা হয়েছে মোছা করে কলা গাছের ঝাড়। সারাটা নৌকোর বাঁধের বেড় ঘিরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে পিচ্চি ফুলের গোড়ে মালা। তাদের গন্ধে জায়গাটা ম' ম' করছে। সেই ফুলের গোড়ের নিচে নিচে বাহারে লাল নীল কাগজের শিকলি দুলছে। বিশপ ওপরে নৌকোর উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে নৌকোর টিণ্ডেল [প্রধান মাল্লা] তাঁর গলায় গোড়ে মালা দুলিয়ে দিল। কুড়ি জন মাল্লাও সরু সরু ফুলের মালা বিশপের গলায় পরালেন। বিশপ হাতে একটা রক্তঃপূত জলের ঝারি নিয়ে জল ছিটোতে ছিটোতে নৌকোটার

আগা গোড়া ঘুরে এলেন। তারপর গলুইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন। প্রার্থনা শেষ হলে তিনি নিচে নেমে এলেন। নৌকোর মুখটা ঘুরিয়ে সমুদ্রের দিকে রাখা হয়েছে। যেখানে সেটা রয়েছে সেখান থেকে জলরেখা হল বিশ ফুট দূরে। বিশপ নেমে নৌকোর মুখের দিকে এগুলেন। সঙ্গে সঙ্গে কর্তা-ব্যক্তিরাও গেলেন। নৌকোর ওপর থেকে দড়ি বেঁধে একটা মস্ত বড় গোলাপ জলের বোতল টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেটা এতক্ষণ দুলছিল। বিশপ সেটাকে হাতের মুঠোয় ধরে নৌকোর গায়ে একটা ঘা মারলেন। বোতলটা ফট করে ফেটে গেল। সবাই হাততালি দিয়ে উঠল।

বিশপের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন একজন পাদ্রোয়া। তিনি রসিকতা করে বললেন—বাঃ, বিশপের তো দেখছি বোতল ভাঙা বেশ অভ্যাস আছে। বিশপ শুধু হাসি হাসি মুখে একবার তাকালেন তার দিকে। চার পাশের লোকেরা আবার হৈ হৈ করে হেসে উঠল। মেয়েদের দলও পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাদের মধ্যে ফুলফুল করে হাসির আওয়াজ উঠতেই এস্টনী মুখ ফিরিয়ে দেখল, সে এসে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েছে তার অতি কাছে। হাসির ঘায়ে সে যেন ভেঙে পড়ছে এমনি ভাব। আশ্চর্য, সে কি এস্টনীকে দেখতে পাচ্ছে না? এস্টনীর মনে হল এক্ষুনি গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করে।

কিন্তু বাধা পড়ল। জ্যাক আর জিল দু'ভাই এসে হাত জোড় করে সবাইকে অনুরোধ করতে লাগল নৌকোতে শুভেচ্ছা দিতে। একপাশে একটা লোক চন্দন হলুদ বাটা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেখান থেকে সবাই এক এক খাবলা নিয়ে নৌকোর গলুইয়ে মাখাতে লাগল। আর সঙ্গে সঙ্গে ক্রশ এঁকে নৌকোতে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রার্থনা করতে লাগল।

এস্টনীও গেল। একটু চন্দন হলুদ বাটা নিয়ে নৌকোর গায়ে লাগাতে যেতেই পাশের ভিড় থেকে একটা নরম কোমল হাত বেরিয়ে এসে তার হাতের ওপর কিছুটা চন্দন হলুদ লেপে দিয়েই হড়কে গিয়ে পড়ল নৌকোর গলুইয়ের গায়ে। এস্টনী পাশে তাকিয়েই ভাবল হাতটা একটু চেপে ধরে। কিন্তু তখনই সংযত হয়ে হাতটা সরিয়ে নিয়ে একদিকে সরে দাঁড়াল।

ফটো তোলা হল নৌকার। তার সঙ্গে সমাজের কর্তাদের। মাঝে রইলেন বিশপ আর মিঃ ম্যাকলাউড।

সূর্য পশ্চিমে চলে পড়েছে। গোধূলির পাণ্ডুটে আলোয় প্রায় পঞ্চাশ জন লোক নৌকোতে ঠেলা দিল। নৌকোর নিচে বসানো হয়েছে বড় বড় গাছের গুঁড়ি। তার ওপর দিয়ে নৌকো এগুতে লাগল সমুদ্রের দিকে। এক ফিট, দু' ফিট করে, ধীরে ধীরে।

দলে দলে লোক সমুদ্রের ধার থেকে বার হয়ে যাচ্ছে। চাউস চাউস গাড়িগুলো সব বোঝাই হয়ে একে একে সবাই চলে যেতে লাগলেন। এস্টনী আপন মনে পায়ে হেঁটে পথ ধরছিল একধার দিয়ে। পাশে একটা গাড়ি খুব আস্তে আস্তে এসে চলতে লাগল। একটা স্ত্রীলোকের মুখ একটু বার করে এস্টনীকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। তারপর গাড়ির দরজাটা খুলে দেল। এস্টনী দেখল তার মামাতো বোন মারি তাকে ডাকছে। সে তক্ষুনি গাড়ির মধ্যে উঠে গেল। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে তার চোখ ঝাঁতিপাতি করে খুঁজেও সেই কালো চশমা পরা চোখ দুটোকে আর দেখতে পেল না।

[ক্রমশঃ]

পরীক্ষিৎ ॥

সুশীল রায়

বজ্রপাত ঘটেছে আজ জনমেজয় পাকড়াশির বাড়িতে। তাঁর ছোট ছেলে সব্যসাচী বাইশ বছর বয়সের জোয়ান আজ যারা গিয়েছে হঠাৎ।

প্রকাণ্ড বাড়ি জনমেজয়ের। চারদিকে চারটি রাস্তা। চারদিকে গেট। প্রত্যেক গেটে ভিড় জমে গিয়েছে। সকলে হায় হায় করছে।

বড় নচ্ছার মানুষ ওই জন। কাউকে খাতির করতে জানে না। এত সোনাদানা হীরে পান্না দালানকোঠা, এত খ্যাতি, এত মান খয়রাত—এই জনমেজয় পাকড়াশির; তবুও তার বুকে হানল এই শেল।

নানা কথা বলাবলি করছে ওই জনতা। চাপা গলায় কথা বলছে সকলে, যেন কোনো কোলাহল গিয়ে তাঁর কানে পৌঁছে তাঁর শোকার্ত হৃদয়ে নতুন কোনো উপদ্রব সৃষ্টি না করে। —এমন হৃদয়বান মানুষ, তার বুকেও যে এমন ঘা দিতে পারে, তাকে কী বলে অভিশাপ দেওয়া যায়?

জনমেজয়ের এই ছোট ছেলেটি তাঁর সব ক'টি ছেলের মধ্যে সব চেয়ে ব্রিলিয়ান্ট। এর উপরে অনেক আশা ছিল জনমেজয়ের, অনেক ভরসা রেখেছিলেন তিনি এর উপরে। তাঁর বিজনেস দেখাশোনার সম্পূর্ণ ভার তিনি এই ছেলেটিকে দিয়ে যাবেন—এই ছিল তাঁর ইচ্ছে।

বড় ছেলেটা যেন কেমন-কেমন। মেজটা তো একেবারে বর্তব্যের মধ্যেই না। বড়টা আছে কেবল খেলাধুলা নিয়ে—কোথায় ক্রিকেট, কোথায় ইংলিশ চ্যানেল ক্রস করা, এই সবই হচ্ছে তার একমাত্র কাজ। এর জন্যে সে টাকা ঢালে বিস্তর। এশিয়ার কোনো সাঁতারু যদি চ্যানেল পার হবার জন্যে জলে নামল, অমনি জয়ন্ত পাকড়াশি প্লেন নিয়ে ছুটল তার তদারক করতে। বিজনেসের দিকে এতটুকু মন নেই তার। আর মেজটা, সেটা তো একেবারে গোল্লায় গিয়েছে। তার সঙ্গী-সাথি হচ্ছে সব অভিনারি স্ট্যাটাসের মানুষদের ছেলেরা। যাকে মিড্‌ল ক্লাশ বলে, সেই সব অল্পাহারী লোকেরা। এতে যে অ্যামবিশন নষ্ট হয়ে যায়; এতে মনের পরিধি যে একেবারে ছোট হয়ে যায়—এ হুঁশ তার নেই।

টাকা আছে বলেই অহংকারী হতে হবে, এমন ভুলুয় করতে চান না জনমেজয়। কিন্তু এই গ্রেড নিউ ওয়ার্লডে একটু বোল্ড হয়ে চলতে তো হবে। সামান্য মানুষদের সংসর্গে এলে মন কেবল ছোটই হয়ে যায় না, মনের সাহসও নষ্ট হয়ে যায়। পদে পদেই যারা ভয়ে আর আশংকায় চলাফেরা করে, তাদের সঙ্গে থেকে ভয়ের ছোঁয়াচ নিয়ে এসে লাভ কি!

জনমেজয়ের তাই দুঃখ। জয়ন্তটা একভাবে নষ্ট হয়েছে, আর পরীক্ষিৎটা অন্যভাবে। জয়ন্তর ভবিষ্যৎ তবু অন্ধকার না, কিন্তু পরীক্ষিৎটার আর কোনো আশা নেই। ওই সব মানুষদের জন্যে যদি মনের মধ্যে মমতা জেগেই থাকে তা হলে সে কথা তাঁকে বলুক না পরীক্ষিৎ; তাদের জন্যে একটি কলেজ তৈরি করে দিতে রাজি আছেন তিনি।

পরীক্ষিতের জেনে রাখা উচিত যে, যাকে ও টেণ্ডারনেস বলে, সে জিনিসটা জনমেজয়ের বুকের মধ্যেও পরিমাণে কম নেই। তার প্রমাণ বুঝি পায় নি সে? এই যে মধুপুরে একটা, কাশীতে দুটো, প্রয়াগে আর হরিদ্বারে একটা করে ধর্মশালা খুলেছেন তিনি; এই যে মানকুণ্ডু বিধবাশ্রম নাম দিয়ে তিনি আর্ত নারীদের জন্যে একটা আশ্রয় বানিয়ে দিয়েছেন, এসব বুঝি তাঁর হৃদয়ের পরিচয় নয়?

দক্ষিণ দিকের গেটেই ভিড় হয়েছে সব চেয়ে বেশি। ফটকে মোটা চেন জড়িয়ে তালা লাগিয়ে ভিতরের দিকে পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরোয়ান। পূব আর উত্তরের গেটেও অনেক লোক। সে দুটোতেও তালা লাগানো।

একমাত্র খোলা আছে পশ্চিমের গেটটা। ফটকের বিরাট দুটি পাল্লা অবারিতভাবে খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুটি ওস্তাদ দরোয়ান। অনবরত গাড়ি ঢুকছে এই ফটক দিয়ে। দুই দারোয়ান কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে সেলাম জানাচ্ছে।

আর তিন গেটে অনবরত আফসোস জানাচ্ছে সমবেত জনতা। তারা খুব সতর্ক আর সাবধান। তাদের গলার স্বর গিয়ে জনমেজয়ের কানে পৌঁছে তাঁকে বিরক্ত যাতে না করে, তার জন্যে তারা বেশ হুঁশিয়ার। কিন্তু চাপা গলা একত্র হয়ে একটা গুঞ্জন সৃষ্টি করে তুলেছে। চার রাস্তা দিয়ে ঘেরা জনমেজয়ের বাড়িটা হয়ে উঠেছে যেন আস্ত একটা মৌচাক।

জনমেজয়কে ঘিরে বসে আছে শহরের সব বিজনেস-ম্যানেজেটরা। ঘরে ঘরে পাখা ঘুরছে নিঃশব্দে। একটা পিন পড়লে শব্দ শোনা যায়, প্রাসাদতুল্য এ বাড়িটি এমনি শব্দহীন।

দোতলার দক্ষিণ দিকের বারান্দায় গা এলিয়ে দিয়ে বসে চুরুট ফুঁকছে অনন্ত। তার কাছে বসে আছে তার দুই বন্ধু। কোনো কথা বলছে না তারা। কিন্তু এই যে সেদিন ইংলিশ-চ্যানেলটা অবশেষে ক্রস করল তাদের বন্ধু ইয়ে—সেই ব্যাপার নিয়ে একটু আলোচনার জন্য তারা একটু উসখুস করতে লাগল।

একতলার হলঘরে জনমেজয় চাপা গলায় আলোচনা করছেন। কি কথা বলছেন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না।

গেটের ওধার থেকে গুঞ্জন কানে আসছে তাঁর। একটু বুঝি বিরক্তির সঙ্গেই তিনি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন দরজার দিকে। অমনি বুঝে ফেলল আরদালিরা। তারা ছুটল গেটের দিকে। সমবেত জনতাকে হটিয়ে দিতে লাগল তারা। বলতে লাগল, ঘর যাও। এখানে কোনো তামাশা হচ্ছে না। হল্লা মৎ করো।

বুঝি মর্মাহত হ'ল জনতা। মজা দেখতেও না, তামাশা দেখতেও না—তারা এসেছে জনমেজয়ের এই সর্বনাশের শব্দ পেয়ে।

সিভিলিয়ান অরবিন্দ মাইতি বললেন, মিস্টার পাকড়াশি, নতুন কি এনটারপ্রাইজ করেছেন বলুন। মনটা ওতে একটু ডাইভারটেড থাকবে।

জনমেজয় বললেন, এনটারপ্রাইজ বলব না। তবে, ইচ্ছে আছে আমাদের মিহিনপুরের কোস্ট তমলুকে শিপ-ইয়ার্ড করা যায় কি না।

ইতিহাসটিহাসিস্ট বিপিনবিহারী বললেন, কিংবদন্তী তো বলে, ওখানে এক কালে পোর্ট ছিল।

কোনারকের সূর্যমন্দির থেকে ঘণ্টা বাজত ; সেই সংকেতে চলাফেরা করত জাহাজ। মিস্টার পাকড়াশি যখন একবার একটা কথা ভাবতে আরম্ভ করেছেন তখন ও-কাজটা হয়ে গেছেই ধরা যেতে পারে।

সকলে একসঙ্গে তারিফ করে উঠল জনমেজয়ের।

হয় তো প্রীতই হলেন জনমেজয় ; সামান্য একটু হাসলেন। এমন দুঃখের দিনে এর চেয়ে বেশি হাসা যায় না। ঘরে ঘরে মোনিং চলেছে।

সব্যসাচীর বডি শুয়ে আছে প্রকাণ্ড পালঙ্কে রাজকীয় সজ্জায় ভূষিত হয়ে। খাটের চার পায়ের কাছে চারটি দাসী দাঁড়িয়ে চামর দোলাচ্ছে অকারণে।

পরীক্ষিৎকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। সে বুঝি অন্যদিনের মত কোন এক বারান্দায় বসে গল্প করছে তার বন্ধুদের সঙ্গে। কিন্তু তা তো নয়। পরীক্ষিৎকে দেখা গেল খোলা গেট দিয়ে হন্ হন্ করে ঢুকতে। তার পায়ের চাপে কুচো পাথর খর খর শব্দে বেজে উঠল। তার পিছন পিছন জন কয়েক ছেলে ঢুকল। ওস্তাদ দরোয়ান দুটি নিজেদের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করে কপালে হাত ঠেকাল। বড়বাবুর বরাতে এমন ছেলে জোটাতেই বুঝি তাদের আক্ষেপ।

সব্যসাচী মারা গিয়াছে ভোর পাঁচটায়। এখন বেলা বারোটা বেজে গিয়েছে। একে যে সৎকার করতে হবে, সে খেয়াল বুঝি কারোই নেই। পরীক্ষিৎ তার বন্ধুদের ডেকে নিয়ে এল তাই অবশেষে। তার বাবাকে খবর পাঠাল যে এবার তারা রওনা হচ্ছে।

খবর শুনে জনমেজয় একটু স্তব্ধ হলেন। চুপ করে বসে রইলেন। একটু পরে বললেন, আচ্ছা! বন্ধুদের দিকে চেয়ে বললেন, আমার এই ছেলেটিই আমার হেড্-এক্। ওর উপরে মিডল্-ফ্লাশ-ইনস্ট্রুমেন্ট পড়েছে।

স্টিভেডোর অরবিন্দ মাইতি বললেন,—ওটা তা হলে ডেন্জারাস থিং। ও জিনিস চেক্ করতে হবে।

সব্যসাচী দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে আছে টান হয়ে। চোখ দুটো তার বোজা। সেই দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে পরীক্ষিৎ ; তার চোখ-দুটো ছল ছল করে উঠেছে। কাঁধের তোয়ালে দিয়ে চোখ মুছে সে ইশারা করল তার বন্ধুদের। ওই প্রকাণ্ড ভারী খাটটি তারা সকলে মিলে টেনে তুলল।

আরদালির দিকে চেয়ে পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করল, বাবা আসবেন না একবার? কোনো উত্তর পেল না। তার পর খোলা গেটের কুচো পাথরে পায়ের আওয়াজ বাজিয়ে যাত্রা করল মৃতদেহ। জীবন ভারি পালঙ্ক। বিশ-বাইশ জন কাঁধ দিয়েছে একসঙ্গে। রাস্তায় নেমে ওরা হরিধ্বনি দিয়ে উঠল। অন্যান্য গেট থেকে ছুটে এসেছে জনতা। ভিড়ে ভরে গেল পথ।

জনমেজয় পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে বললেন, শিপইয়ার্ড। কি করে বানাব বলুন, মিস্টার মাইতি! ওই তো চলে গেল আমার একটা পাঁজর।

—কেন, আরো তো ছেলে আছে।

—আছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে স্পোর্টস-পাগল। আর একটা তো হিসেবের বাইরে। এই ছেলেটার ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার বড় ভাবনা, মিস্টার মাইতি। ওর বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, ব্রেন আছে, কিন্তু নেই একটা জিনিস—নেই সেন্স অব রিস্পন্সিবিলিটি।

হল-ঘরে বসে আলোচনা চলেছে নানারকম। এতক্ষণে হঠাৎ বুঝি তাঁর মনে পড়ে গেছে একটা কথা। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তার ছেলো বিজনেসম্যানেরা তাকালেন তাঁর মুখের দিকে।

জনমেজয় বললেন, শেষ-দেখাটা দেখা হ'ল না। ওরা বুঝি চলে গেছে অনেক দূরে।

—ঠিক আছে। স্থির হয়ে বসুন আপনি। ওরা ফিরিয়ে নিয়ে আসুক। বললেন ইনডাস্ট্রিয়ালিস্ট বিপিনবিহারী।

বলা মাত্র কাজ। সঙ্গে সঙ্গে লোক ছুটল গাড়ি নিয়ে।

কিন্তু, পরীক্ষিৎ বললো, বাবা একবার আসুন-না। এই বডি আবার ক্যারি করে নিয়ে যাওয়া—

গাড়ি ফিরে এল। সমাচার জানাল এসে। শুনে হায় হায় করে উঠল সকলে। আশ্চর্য। জনমেজয়ের ডিগ্‌নিটি নেই? এমন অসম্ভব প্রস্তাব বড় একটা শোনা যায় না।

আবার ছুটল গাড়ি। ওরা তখন এগিয়ে গিয়েছে অনেক দূর। দ্বিতীয়বার ওই প্রস্তাব আর পাঠানো গেল না। শবযাত্রীরা ফিরল। লম্বা প্রসেশন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল।

অনেকক্ষণ পরে গেটের সম্মুখে ফিরে এসে দাঁড়াল সেই পালঙ্ক।

অদূরের উঁচু বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন জনমেজয়। চোখ থেকে চশমা নামিয়ে তিনি একবার তাকালেন পালঙ্কের দিকে। পালঙ্কটা ওরা কাৎ করে ধরল।

সকলে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে গেল জনমেজয়কে।

রাজা বাহাদুরের মতো ছুঁচকেননিভ শয্যায় শুয়ে সন্ন্যাসীটা আবার যাত্রা করল।

কাঁধ বদল করতে করতে পরীক্ষিৎ মুছে নিল চোখটা।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নটনায়ক ॥

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

লণ্ডনের শহরতলী। সময়টা আঠারো শতকের মাঝামাঝি। সেই অখ্যাতনামা শহরতলীর এক রঙ্গমঞ্চে নাটকাভিনয় হচ্ছে। নাটকের নাম হার্লেকুইন্ স্টুডেন্ট।

দর্শকদের মধ্যে আছে গলীর কসাই, পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা, সার্কাসের রিং-মাস্টার, ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান এবং ওই শ্রেণীর নাগরিকবৃন্দ। বস্তুত তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় এই থিয়েটারটি চলে। এখানে অভিনয় দেখতে তারা আনন্দ পায়। দলে দলে আসে প্রতি রাত্রে। কিন্তু, এই শ্রেণীর দর্শকদের নিয়ে একটু অসুবিধেও আছে। অভিনয় তাদের মনোমত হওয়া চাই। কোন অভিনেতা যদি ভালো গাওনা না করতে পারে, তা হলে তারা মস্তরমতো প্রতিবাদ জানাবে এবং সেই প্রতিবাদের ভাষা ও ধরন রীতিমতো আতঙ্কজনক। তাদের সেই 'হাত থাকতে মুখে কেন' নীতির হাত থেকে অভিনেতাদের বাঁচাবার জন্যে মঞ্চের সামনে অর্থাৎ পাদপ্রদীপের ধারে লোহার ঘারালো কলা লাগানো বেড়া বসানো হয়েছে, যাতে কসাই-মুষ্টিযোদ্ধা-রিংমাস্টার-গাড়োয়ানবৃন্দ নিজের নিজের হাতিয়ার সমেত স্টেজের ওপর উঠে পড়তে না পারে।

এ হেন এক থিয়েটারে যখন পূর্বোক্ত নাটকটির অভিনয় হচ্ছিল তখন ডেভিড গ্যারিক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শুধু সেই রাতেই নয়, প্রতি রাত্রেই সেই থিয়েটারের অভিনয় আসরে তাঁকে হাজির থাকতে দেখা যেত। মঞ্চের অভ্যন্তরে তাঁর অবাধ গতিবিধি। অভিনেতাদের সঙ্গে বিলক্ষণ জানাশোনা। স্বয়ং ম্যানেজার তাঁকে বিশেষ পছন্দ করেন।

গ্যারিকের তখন উঠ্‌তি বয়স। এক মদের দোকানের মালিকরূপে সেই অঞ্চলে তিনি তাঁর ব্যবসা পরিচালনা করেন। থিয়েটারের কাছেই দোকান। মদের অর্ডার নিয়ে নেবার জন্যে প্রতি অভিনয়-রাত্রে থিয়েটারে আসেন আর অভিনেতাদের সঙ্গে আড্ডা দেন।

নিজের ব্যবসাকর্মে না ছিল তাঁর মাথা, না ছিল মন। মদের অর্ডার লেখার চেয়ে অভিনয়ের কায়দা আর অভিনেতাদের ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করবার দিকেই তাঁর নজর আর মন পড়ে থাকতো বেশি। তন্ময় হয়ে থাকতেন সারাক্ষণ, অভিনয়ের মধ্যে যেন ডুবে যেতেন। ছোটবেলা থেকেই অভিনয়শিল্পের প্রতি তাঁর মনে দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল। সুযোগ খুঁজছিলেন, কী করে পেশাদার স্টেজে নামা যায়।

হঠাৎ সেদিন অভাবিতরূপে ঠিক সেই সুযোগই এলো। হার্লেকুইন্ স্টুডেন্ট নাটকে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করতেন সে-অঞ্চলের নামকরা অভিনেতা ইয়েট্‌স। সে-রাত্রে অভিনয়ের শেষের দিকে অকস্মাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে একেবারে শয্যা নিলেন।

সাজঘরের মধ্যে মহা উত্তেজনার সৃষ্টি হল। অভিনয় শেষ করতে না পারলে দর্শকরা নির্ঘাৎ ক্ষেপে উঠবে। পয়সা ফেরৎ দেব বললেও নিস্তার নেই। পয়সা ফেরৎ কে চায়? অভিনয় দেখাও। নচেৎ—

ম্যানেজার থেকে সীন-শিফ্‌টার—সকলেই বিমূঢ়।

এমন সময় গ্যারিক ম্যানেজারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। জানালেন, পার্টটা তাঁর আগা-গোড়া কণ্ঠস্থ, ইয়েট্‌স কীভাবে অভিনয় করেন, কোথায় কোন্ প্যাচ দেন তাও তাঁর নখদর্পণে, সুযোগ দিলে বাকিটুকু তিনি চালিয়ে দিতে পারবেন। মেক-আপ যদি নিখুঁত হয় তা হলে কোন গোল হবে না।

গ্যারিকের কথা শুনে ম্যানেজার ধমকে উঠে তাঁকে হাঁকিয়ে দিলেন। এও কখনো সম্ভব নাকি! ইয়েট্‌স-এর জায়গায় এই আনকোরা নতুন ছোকরা। পাগল! দর্শকরা তা হলে সত্যিই কাউকে আস্ত রাখবে না।

কিন্তু তখন অন্য উপায়ই বা কি! মেক-আপম্যান এগিয়ে এলো। দেখাই যাক না। যা হয় কিছু একটা চেষ্টা তো করা হোক। এদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত গ্যারিককে সাজিয়ে দেওয়া হল। সাজসজ্জায় ইয়েট্‌স-এর সঙ্গে তাঁর তফাৎ সহজে ধরা যায় না। যা থাকে কপালে, বলে ম্যানেজার অভিনয় আরম্ভ করবার নির্দেশ দিলেন। যবনিকা উঠলো।

যথাসময়ে অভিনয় নির্বিঘ্নে শেষ হল। দর্শকরা বুঝতেই পারলো না যে আসল অভিনেতার বদলে একজন নকল অভিনেতা অভিনয় করলে। উইংস-এর পাশে দাঁড়িয়ে ম্যানেজার তো বিস্ময়ে হতবাক!

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যশিল্পীরূপে যাঁর নামডাক, সেই স্বনামধন্য ডেভিড গ্যারিকের অভিনেতারূপে প্রথম মঞ্চাবতরণের ঘটনাটি যে কৌতুকের ব্যাপার, তাতে আর সন্দেহ কি!

নটের জীবনে প্রবেশ করবার আগে তিনি যে অভিনয় শিক্ষা করেছিলেন বা ছোট ছোট অংশে অভিনয় করে নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন এমন কোন নজির নেই।

মঞ্চে আবির্ভাব তাঁর নিতান্তই আকস্মিক। প্রথম অভিনয়ে অবশ্য কোন মৌলিকতা ছিল না:—তার সবটাই ছিল নকলিয়ানা। কিন্তু তখনই বোঝা গিয়েছিল, অভিনয় কী করে করতে হয় তা তিনি জানেন। একেই কি বলে ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা?

কয়েকমাস পরের কথা। শহরতলীর সেই নড়বড়ে থিয়েটারের চেহারা বদলে গেছে। রঙ্গ-ভবনের সামনের রাস্তায় বড় বড় ঘুড়ি গাড়ির লাইন লেগেছে। শহর থেকে অভিজাত দর্শক দলে দলে এসে সেই থিয়েটারে ভিড় করেছে। সেখানে তৃতীয় রিচার্ডের ভূমিকায় গ্যারিক অভিনয় করছেন। অবিশ্বাস্য রকমের উঁচুদরের সে অভিনয়। রাতের পর রাত হাউস ফুল। কসাই-বক্সার-রিংমাস্টার-গাড়োয়ানদের পাশে বসে জমিদার-আইনজীবী-লক্ষপতি-ব্যবসাদার-পার্লামেন্ট-সদস্যবৃন্দ বিস্মিত মুগ্ধ বিস্ময়ে সেই অভিনয়ের তারিফ করছেন। অদৃষ্টপূর্ব নতুন ধরনের অভিনয়। ইতিহাসের চরিত্র যেন জীবন্ত হয়ে মঞ্চের উপর এসেছে।

এক বন্ধুর নির্বন্ধাতিশয্যে বৃদ্ধ কবি আলেকজান্ডার পোপ সেই অভিনয় দেখলেন। দেখে মন্তব্য করলেন—এই যুবকের তুল্য অভিনেতা কেউ নেই এবং হয়তো কোনদিনই কেউ এর সমকক্ষ হবে না।

• • •

জন্ম ১৭১৭ সনের ফেব্রুয়ারী মাস। পারিবারিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। কিশোর বয়সে লিসবনে এক খুড়োর কাছে তাঁকে পাঠানো হয়। খুড়োর ছিল মাছের ব্যবসা। সেই ব্যবসার কেরাণীরূপে ডেভিড গ্যারিকের জীবনের সূচনা। কিন্তু কলমপেশার কাজে তাঁর মন কোথায়? খুড়ো দেখতেন, ভাইপো তাঁর চমৎকার শেক্সপীয়র আওড়ায়, বুড়োদের মজলিশে বসে পাকা পাকা কথা কয়, ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে 'অ্যাক্টো' করে, কিন্তু দোকানের কাজে বেজায় গাফিলতি।

কিছুদিন পরে বাপের অবস্থার কিছু উন্নতি হল। তিনি ছোট ছেলে ডেভিডের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হলেন। অবশেষে দুই ভাইএ পরামর্শ করে ডেভিডকে আইন পড়বার জন্যে লণ্ডনে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

গ্যারিক লণ্ডনে পৌঁছোবার মাসখানেকের মধ্যেই যেন বজ্রপাত হল। প্রথমে তাঁর বাবা মারা গেলেন, তারপর গেলেন বুড়ো। দুঃখে শোকে ভরে ভাবনায় গ্যারিক-পরিবার মুহ্যমান হয়ে পড়ল।

ডেভিডের খুল্লতাত উইল করে স্নেহের ভাইপোটিকে এক হাজার পাউণ্ড দিয়ে গিয়েছিলেন। পারিবারিক পরামর্শ সভায় স্থির হল, অতঃপর ওই টাকা দিয়ে বড় ভাই পিটার আর ছোট ভাই ডেভিড দু'জনে মিলে মদের ব্যবসা খুলবেন দু'জায়গায়। পরামর্শ মতো কাজ হল। ডেভিড নিলেন লণ্ডনের দোকানের দায়িত্ব। পিটার ভার নিলেন নিজেদের গ্রামের দোকান পরিচালনার।

অচিরকালের মধ্যেই গ্যারিকের দোকানটি ডুবুডুবু হল। খবর পেয়ে পিটার লণ্ডনের দোকান পরিদর্শনে এসে দেখলেন, খাতাপত্র কিছুই ঠিক নেই, আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। এমন কি মদ্যুত মালের হিসাব মেলাও দুষ্কর। পিটার বিষম ক্রুদ্ধ হলেন। ডেভিড লজ্জায় অধোবদন। কী করে কোন্ মুখে স্বীকার করবেন যে ব্যবসা দেখার চেয়ে তিনি থিয়েটার দেখেছেন বেশি করে, হিসাব লেখার চেয়ে অভিনেতাদের সঙ্গ তাঁর সময় হরণ করেছে বেশি। আর,—প্রকাশ্যভাবে রঙ্গালয়ে যোগ দেবার বাসনাকে কিছুতেই তিনি আর চেপে রাখতে পারছেন না।

কিন্তু তখনকার দিনে বিলাতেও পেশাদার নটের বৃত্তি সমাজের কাছে নিন্দার বস্তু ছিল। বিলেতে তখনো পর্যন্ত পেশাদার অভিনেতার কোন মর্যাদা ছিল না, পংক্তিতে বসবার ছিল না অধিকার। তাই মনের অদম্য ইচ্ছা সত্ত্বেও মায়ের জীবদ্দশায় গ্যারিক পেশাদার মঞ্চে নাম লেখাতে সাহস করেন নি। মায়ের প্রতি তাঁর অবিচলিত ভক্তি ছিল। মায়ের মনে আঘাত দিতে তার মন সরে নি।

মায়ের মৃত্যুর পর যখন তিনি প্রকাশ্যভাবে রঙ্গালয়ে যোগ দিলেন তখনো তাঁর মনে কত কুণ্ঠা। ভাইএর কাছে একটি চিঠিতে তাঁর মনের ভাবটি সুন্দর ফুটে উঠেছে। তিনি লিখছেন—"আমার মনের গতি আর ইচ্ছাকে আর দাবিয়ে না রেখে আমি এই পথই বেছে নিলাম। আমি জানি, আমার এই কাজের জন্যে তুমি আমার ওপর খুবই অসন্তুষ্ট হবে। কিন্তু তুমি যখন দেখবে যে অভিনয় প্রতিভায় তোমার ভাই কারুর চেয়ে খাটো নয় এবং আরও যখন দেখবে যে এই পেশার আনুষঙ্গিক দোষগুলি আমায় কলঙ্কিত করতে পারে নি—তখন আশা করি তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হবে এবং আমাকে ভাই বলে স্বীকার করতে লজ্জা বোধ করবে না।"

গ্যারিক সারা জীবন ধরে তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণ করেছিলেন। ছোট ভাই-এর গৌরবে বড় ভাই নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন পরবর্তী জীবনে।

* * *

বিলেতের রঙ্গাকাশে গ্যারিকের অভ্যুদয় যেন এক মহিমায় এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। যেন "নূতন সূর্যকর উদিল, টুটিল তিমির রাত্রি"। পুরনো পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে নবতর অভিনয়-ধারার প্রবর্তন,—সেই নতুন ধারার মধ্যে রীতিমতো যেন ঐশীশক্তির প্রকাশ!

যুগপ্রবর্তকরূপে গ্যারিক অভিনন্দিত হলেন। মুগ্ধবিহ্বলতায় দর্শকসমাজ তাঁকে বরণ করে নিলে।

পুরনো দিনের বিখ্যাত নটেরা এক সঙ্গে সবাই হটে গেল, মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। তখনকার দিনের সবচেয়ে নাম করা অভিনেতা কুাইন সখেদে বললেন—"এই ছোকরার অভিনয়-পদ্ধতি যদি যথার্থ বলে গৃহীত হয়, তা হলে বুঝতে হবে আমরা এতদিন যা করেছি, সব ভুয়ো।"

আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই গ্যারিক অভিনয় জগৎকে জয় করে নিলেন। 'তিনি ভিডি ভিসি'—এলাম দেখলাম জয় করলাম।

• • •

ধাপে ধাপে যশ ও সৌভাগ্যের সোপান অতিক্রম ক'রে গ্যারিক জনপ্রিয়তার শিখরে উপনীত হলেন। 'গ্যারিক-প্রীতির' বন্যায় রঙ্গজগৎ প্লাবিত হল। শেক্সপীয়রের সতেরোটি চরিত্রকে নতুন ভাবে নতুন ধারণায় পুনরুজ্জীবিত করলেন তিনি। অগণিত দর্শকের সোচ্ছ্বাস প্রশংসায় সমগ্র রঙ্গ জগৎ মুখর হল। নিজের জীবদ্দশাতেই জনগণের এমন বিপুল স্বীকৃতি আর সাফল্য প্রতি খুব কম শিল্পীই পেয়েছেন। কিন্তু এই সর্বব্যাপী জনপ্রিয়তা তাঁকে কোনদিন অহমিকায় আচ্ছন্ন করতে পারে নি। সাফল্যের মাদকতা তাঁকে কোন দিন পথভ্রষ্ট করে নি, তাঁর সাধনা থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও তাঁকে বিচ্যুত করতে সক্ষম হয় নি। গ্যারিকের জীবনের এইটেই বোধ হয় সবচেয়ে বড় কথা।

সারা জীবন তিনি জ্ঞানী গুণী ও বিদগ্ধজনের সঙ্গ করেছেন। সাজঘরের চেয়ে বৈঠক-খানাঘরের আবহাওয়া ছিল তাঁর কাছে অধিকতর প্রিয়। বাল্যবন্ধু স্যামুয়েল জনসন প্রমুখ বহু রুচিবান ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর প্রীতির বন্ধন আজীবন অটুট ছিল।

১৭৪১ সনে গ্যারিক ইভা মারি ভিগেল নামে এক নৃত্যশিল্পীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহে প্রথমে নানা বাধা এসেছিল সমাজের কাছ থেকে এবং এই বিবাহের প্রণয়-পশ্চাৎপটকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে "ডেভিড গ্যারিক" নামে একটি নাটক রচিত হয়েছিল। স্যর চার্লস ওয়াইনড্হাম নামে তখনকার দিনের জনপ্রিয় অভিনেতা বহুবার উক্ত নাটকে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। এই নাটকের আখ্যানভাগে আছে, এক ধনী ব্যবসায়ীর মেয়ে গ্যারিকের প্রেমে পড়েছেন, কিন্তু সমাজ এই বিবাহের ঘোরতর বিরোধী। তাই নিজের প্রেমাস্পদার কল্যাণার্থে গ্যারিক আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে,—যাতে করে মেয়েটির মন তাঁর প্রতি বিমুখ হয় এবং বিবাহ ভেঙে যায়—সেই উদ্দেশ্যে, মেয়েটির সামনে নিজেকে লম্পট এবং মাতাল সাজিয়ে অভিনয় করছেন। অবশেষে অবশ্য তাঁর ছদ্ম-অভিনয় ধরা পড়ে এবং তাঁদের মিলন হয়।

বাস্তব জীবনে গ্যারিক যে সত্যিই এই রকম নকল অভিনয় করেছিলেন তার কোন নিশ্চিত প্রমাণ না থাকলেও এ-কথা জানা যায় যে, এই প্রণয় ব্যাপারে বিষম প্রতিকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই সময় গ্যারিক মেয়েটির মঙ্গলার্থে সত্যিই চরম আত্মত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলেন।

১৭৭৬ সনে পূর্ণ গৌরবে এবং জনগণের দেওয়া রাজমুকুট মাথায় নিয়ে গ্যারিক একান্ন বছর বয়সে অভিনয়-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিন বছর পরে ১৭৭৯ সনের ২০শে জানুয়ারী তাঁর জীবন-নাট্যের যবনিকা-পাত হয়। ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবেতে শেক্সপীয়রের মর্মরমূর্তির পাদদেশে তিনি সমাধিস্থ হন।

অবসর গ্রহণের উপলক্ষে গ্যারিক পর পর কয়েকরাত্রি কয়েকখানি বিখ্যাত নাটকের

পুনরভিনয়ের আয়োজন করেন। বয়সের আধিক্য সত্ত্বেও তাঁর অতুলনীয় অভিনয়-প্রতিভার অপূর্ব দীপ্তি তখনো পর্যন্ত এতটুকুও ম্লান হয় নি। দর্শকবৃন্দ অভিভূতচিত্তে সেই অভিনয়গুলি উপভোগ করেছিল। সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে মহাসাধক যেন অভিনয়ের মধ্যে ডুবে গেছেন, লুপ্ত হয়ে গেছে তাঁর সমস্ত বহির্সত্তা। অবাক-বিস্ময়ে দর্শকমণ্ডলী সেদিন ভেবেছিল—কতবারই তো এর আগে দেখেছি, কিন্তু এমনটি যেন আর কখনো দেখি নি। এমনিই অনির্বচনীয় হয়েছিল সেই অভিনয়গুলি।

শেষ অভিনয়-রজনীতে যখন যবনিকা নামলো তখন গ্যারিক আবেগে অভিভূত হয়ে পড়েছেন, অভিনয়ের অন্তে ভাষণ দেওয়ার যে রীতি তা দেবার শক্তি তাঁর লোপ পেয়েছে। বারবার করতালি পড়তে লাগল। বারবার যবনিকা উঠল। অবশেষে অশ্রুত কণ্ঠে কয়েকটি কম্পিত বাক্যে গ্যারিক দর্শকসমাজের কাছে তাঁর অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করলেন। তারপর ধীরে ধীরে পিছু হেঁটে মঞ্চ থেকে চলে যেতে লাগলেন। তাঁর আয়ত দুই চোখের প্রাণস্পর্শী উজ্জ্বল দৃষ্টি দর্শকদের প্রতি নিবদ্ধ রেখে তিনি করজোড়ে তাদের কাছ থেকে শেষ বিদায় গ্রহণ করলেন। সারা প্রেক্ষাগার তখন তাদের সেই প্রিয়তম অভিনেতার জন্যে গভীর আবেগে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল।

কিশোরী মেয়ে, রোগাটে গড়ন, কিন্তু চোখে মুখে বেশ সপ্রতিভ ভাব। ছোট্ট হ্রদের ধারে রাজহাঁসগুলোকে তাড়া করেছে। ওরাই ছোটে, মেয়েটিও ছোটে; ওরাও লাফায়, মেয়েটিও লাফায়; ওরাও ঘুরপাক খায়, মেয়েটিও তাই করে।

মস্কোর আর্ট থিয়েটারের নৃত্যশিক্ষক এসেছিলেন হ্রদের ধারে বেড়াতে। মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি কিশোরী মেয়েটির গতিভঙ্গিমা দেখে। বুঝলেন, অনেক বড় সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে তার ভবিষ্যতে।

অনেক চেষ্টা করে তিনি নিয়ে গেলেন মেয়েটিকে তাঁর সঙ্গে। তার পর একদিন অ্যানা পাভ্‌লোভার সোয়ান নৃত্য সারা বিশ্বের বিস্ময় সৃষ্টি করলো।

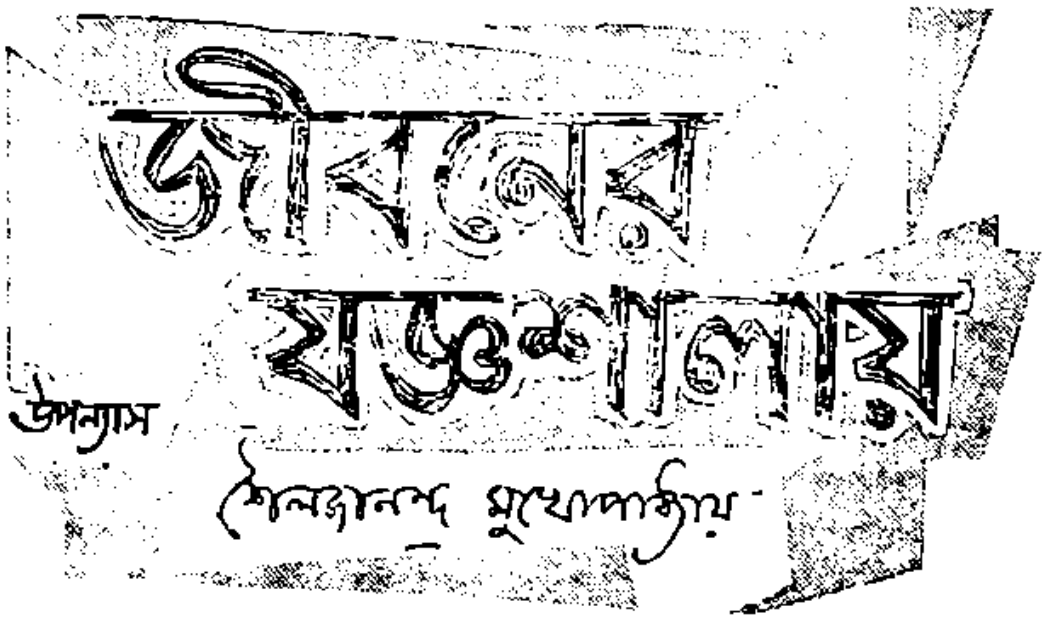

সে আজ বেশিদিনের কথা নয়। দেশে তখন জমিদারী ছিল। জমিদার ছিল।

জয়নারায়ণ চাটুজ্যেই বোধ করি চাটুজ্যে বংশের শেষ জমিদার। জয়নারায়ণ চাটুজ্যের জমিদারী ছিল। কোলিয়ারী ছিল। ছিল না শুধু খাবার লোক।

সংসারে আপনজন বলতে তাঁর একমাত্র মেয়ে সরমা। মেয়েটি পরমাসুন্দরী। এত সুন্দরী যে দেখলে দু'দণ্ড তার মুখের পানে তাকিয়ে থাকতে হয়।

মেয়েটির বিয়ে হয়েছে ন'বছর বয়সে। এত কম বয়েসে মেয়ের বিয়ে দেবার ইচ্ছে জয়নারায়ণবাবুর ছিল না। বিয়ে একরকম জোর করেই দিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী। দেওয়ার অবশ্য একটি কারণ ছিল। বহুদিন থেকে তাঁর স্ত্রী রোগে ভুগছিলেন। তাঁর ধারণা হলো তিনি আর বেশি দিন বাঁচবেন না। ইচ্ছা হলো—মরবার আগে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে যাবেন।

যাই হোক্, পাত্রের জন্য খুব বেশি খোঁজাখুজি করতে হলো না। পাত্র একটি তাঁদের গ্রামেই ছিল। ছেলেটির মা-বাবা আত্মীয়-স্বজন সবাই মারা গেছে। থাকবার মধ্যে ছিল তার এক দূর সম্পর্কের পিসি। সেই পিসির কাছেই তখন সে বাস করছিল। ছেলেটি দেখতে রাজপুত্রের মত। সরমার সঙ্গে মানালো চমৎকার।

ন'বছর বয়সে সেই তারই সঙ্গে সরমার বিয়ে দিয়ে মা বোধকরি তাঁর গৌরীদানের পুণ্য সঞ্চয় করে বেশিদিন আর বেঁচে থাকতে পারলেন না। একদিন এক দুর্যোগের রাত্রে মেয়ে-জামাইকে তাঁর স্বামীর হাতে সমর্পণ করে দিয়ে অশ্রুভারাক্রান্ত চোখদুটি তাঁর চিরদিনের তরে বন্ধ করে দিলেন।

বিপত্নীক জয়নারায়ণবাবু কি করবেন প্রথমে কিছু বুঝতে পারলেন না। তারপর তাঁর দিশেহারা ভাবটা কেটে যেতেই জামাইকে একটি নতুন বাইক্ কিনে দিলেন। বললেন,—'রোজ তুমি কোলিয়ারীতে যাবে। কাজকর্ম শিখে নাও।'

কাছেই তাঁর মস্ত কোলিয়ারী। 'ফার্স্ট' ক্লাস রাণীগঞ্জ-কোল'-এর বিরাট কুঠি। তখনকার দিনে একহাজার টাকা মাইনের ফার্স্ট ক্লাস ম্যানেজার বিনয় সেনের সঙ্গে জামাই-এর পরিচয় করিয়ে

দিয়ে বললেন,—একে হাতে-কলমে কাজকর্ম কিছু শিখিয়ে দিন। দেখাশোনা করতে হলে কাজকর্ম জানা দরকার।

কথাটা সত্যি। জয়নারায়ণবাবু অপুত্রক। উনিশ-কুড়ি বছরের এই জামাইটিই তাঁর উত্তরাধিকারী।

ম্যানেজার বিনয় সেন ছেলেটিকে কাছে টেনে নিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন,—'কি নাম তোমার?'

—ভবেশ মুখোপাধ্যায়।

—কতদূর পড়াশোনা করেছ?

—ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছি।

—আর-একটু পড়াশোনা করলে ভাল হতো। কথাটার জবাব দিতে পারলে না ভবেশ মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলো।

তা হোক্। বেশ ছেলেটি। স্বাস্থ্যবান, সুন্দর,—জমিদারের জামাই হিসাবে বেমানান্ মোটেই নয়।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে হলো বিনয় সেনের। —তবে কি জয়নারায়ণ বাবুরও দিন ফুরিয়ে এসেছে? সেকথা তিনি কি বুঝতে পেরেছেন?

বুঝতে পারার কোনও চিহ্নই কিন্তু দেখা গেল না জয়নারায়ণবাবুর আচারে আচরণে। নির্বোধ একটা গোঁয়ার্তুমি ছিল তাঁর চরিত্রে। যা তিনি করবো মনে করতেন, তা তিনি করতেনই। কেউ তাঁকে সেকাজে বাধা দিতে পারতো না। তাতে তাঁর ভালোই হোক্ আর মন্দই হোক্।

জমিদারী দেখবার জন্যে নায়েব ছিল, গোমস্তা ছিল, কর্মচারী ছিল। সেদিকটা তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজে তিনি পড়েছিলেন কয়লাকুঠি নিয়ে। কয়লাকুঠিতে নগদ টাকার কারবার। জমিদারীর আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। কাজেই রোজই তিনি কোলিয়ারীর আপিসে গিয়ে বসে থাকেন। এমন সব কথা বলেন, এমন সব কাজ করেন—যেগুলো ম্যানেজার বিনয় সেনের পছন্দ হয় না। অথচ কোলিয়ারীর মালিক তিনি। মুখের ওপর কিছু বলতেও পারেন না। তাঁর শিক্ষা দীক্ষা এবং ভদ্রতার বাধে।

অথচ সে-সব বালাই জয়নারায়ণবাবুর একরকম নেই বললেই হয়। ইংরেজি তিনি একদম জানেন না। অথচ সেকথা কারও বলবার জো নেই। বললে চটে যান। আর চটলে তাঁর আর কোনও কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। মুখের ওপর গালাগালি দিয়ে বসেন।

সেদিন একজন সায়েব ইঞ্জিনিয়ার এসেছিলেন কোলিয়ারী দেখতে। মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার। বিদেশ থেকে এসেছেন। বাংলা দেশের কোলিয়ারীতে কিরকম কাজ হয় দেখে যাবেন।

বিনয় সেন তাঁকে নিজে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে কোলিয়ারীর নিচে নামিয়ে সব-কিছু দেখিয়ে এনেছেন। খুব সমাদর করে আপিসঘরে বসিয়ে চা খাওয়াচ্ছিলেন। এমন সময় জয়নারায়ণবাবুর মোটর এসে দাঁড়ালো আপিসের গেটের সামনে।

বিনয় সেন প্রমাদ গণলেন। পাছে কোনও বেফাঁস কথা বলে ফেলেন, তাই তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে সেইখান থেকেই তাঁকে বিদায় করে দিতে চাইলেন। কিন্তু সে কথায় কানই দিলেন না জয়নারায়ণবাবু। পরনে কোঁচানো শান্তিপুরের ধুতি, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবীর ওপর কালো রঙের গলাবন্ধ কোট, বুকে ঝুলছে হীরে-খোলানো সোনার চেনঘড়ি, হাতে সোনা-বাঁধানো লাঠি, মুখে একমুখ পান। বললেন, চল তোমার সায়েবের সঙ্গে দেখাটাই করে যাই। না গেলে ভাববে—মালিক এলো, একটা কথাও বললে না।

বিনয় সেন তবু একবার নিরস্ত করবার চেষ্টা করলেন। বললেন,—'সায়েব বাংলা একদম জানেন না।'

—নাই-বা জানলো! আপনি রয়েছেন কি জন্তে?

জয়নারায়ণবাবু এসে বললেন। বিনয়বাবু পরিচয় করে দিলেন। চা খেতে খেতে সায়েব হাত বাড়ালেন। জয়নারায়ণবাবু ডান হাতের লাঠিটা বাঁ হাতে নিয়ে হ্যাণ্ডশেক করে বললেন,—'গুড্ মর্নিং!'

বিনয় সেন আগেই সামলে নিলেন। সায়েবকে বলে দিলেন,—'উনি ইংরেজি জানেন না।'

সাহেব বললেন,—'ওঁকে বুঝিয়ে দিন—আমি খুব খুশি হয়েছি।'

বিনয়বাবু বাংলায় বুঝিয়ে দিতেই জয়নারায়ণবাবু বলে উঠলেন,—'ওর বাপ্ খুশি হবে!'

বাংলায় বললেন তাই রক্ষে। বিনয়বাবু লজ্জায় মরে গেলেন।

কোলিয়ারীর নিচে গিয়ে কয়লা কাটার কিছু দোষ সায়েব লক্ষ্য করেছেন। সায়েব ভাবলেন, কোলিয়ারীর মালিককে সেকথাটা তাঁর বলে যাওয়া উচিত। তাই তিনি বিনয়বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে ইংরাজিতে বললেন,—আর একটু ভালো করে কয়লা যদি কাটেন তা হ'লে এ-প্রপার্টি অনেকদিন চলবে।'

এই নিয়ে মনিবের সঙ্গে বিনয় সেনের অনেক বার অনেক কথাই হয়ে গেছে। সাহেবের কথাটা তাই তিনি আর-একবার বাংলা করে জয়নারায়ণবাবুকে বুঝিয়ে বললেন। বললেন—'শুনুন স্যার, সায়েব কি বলছেন।'

জয়নারায়ণবাবু বললেন,—'কি বলছেন?'

—বলছেন, একটু ভালো করে কয়লা কাটলে এ আপনার সোনার সম্পত্তি। অনেকদিন চলবে।

জয়নারায়ণবাবু হাতের লাঠিটা মাটিতে ঠুকে বললেন,—'হুঁ, ও আমাকে কয়লা কাটতে শেখাবে। ছেলেবেলা থেকে খাদে নামতে নামতে বুড়ো হয়ে গেলাম!' এই বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন,—'ম্যানেজার একটা রাখতে হয় তাই রেখেছি। নইলে দশটা ম্যানেজারের কান কাটতে পারি আমি।' বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন,—'মনে হচ্ছে উনি যেন রাগ করলেন আমার কথাটা শুনে।'

বিনয়বাবু চেপে গেলেন কথাটা। বললেন,—'না রাগ করেন নি। অন্য কথা বলছেন।'

ভাবলেন, কথাটা তাঁকে না বললেই বোধহয় ভালো হতো। যাবার সময় সাহেবের সঙ্গে একটা কথা অন্তত তাঁর বলে যাওয়া উচিত ছিল।

সাহেব এবার উঠলেন। বাইরে তাঁর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বিনয় সেন সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিলেন তাঁকে গাড়িতে তুলে দেবার জন্তে। দেখলেন, জয়নারায়ণবাবু আপিসের বাইরে দাঁড়িয়ে চাকরটাকে ডাকছেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে—'লখু! লখু!'

লখু বেরিয়ে আসতেই বললেন,—'এক ঘটি জল আন্ তো বাবা!'

এ সময় তাঁর এক ঘটি জলের কি প্রয়োজন হলো বিনয়বাবু প্রথমে বুঝতে পারেন নি। সাহেবকে গাড়িতে তুলে দিয়ে ফেরবার পথে দেখলেন, ঘটি থেকে লখু জল ঢালছে, আর সেই জল দিয়ে জয়নারায়ণবাবু তাঁর হাত দুটো ধুচ্ছেন, লাঠিটা ধুচ্ছেন, আর বলছেন,—'ব্যাটা খিরিস্তান, এঁটো-হাতে গুড্ মর্নিং করে' দিলে আমার সর্বাঙ্গ এঁটো করে।'

ম্যানেজার বিনয় সেন একটু হেসেছিলেন সেদিন। মানুষটা এমনিই।

সরমার বয়স যখন তেরো, তখন তার একটি সন্তান জন্মালো। পুত্র সন্তান।

জয়নারায়ণবাবু আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। তাঁর একমাত্র কন্যার প্রথম সন্তান। তাঁর ঐশ্বর্যের প্রথম উত্তরাধিকারী।

জামাইটি তখন কোলিয়ারীর কাজকর্ম ভালোই শিখেছে। রোজ সকালে উঠে তার সেই বাইকটি নিয়ে সবেশ কোলিয়ারীতে যায়। দুপুরে একবার খেতে আসে, তারপর আবার যায়, আবার আসে।

শ্বশুরের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারে না। কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা করে। চোখে-চোখে দেখা হলেই একটু সরে দাঁড়ায়।

জয়নারায়ণবাবু বলেন,—'জামাই বড় লাজুক। তা হোক্। ছেলেটা ভালো।'

নাতি ছ' মাসের পড়তেই জয়নারায়ণবাবু খুব ঘটা করে তার অন্নপ্রাশন করলেন। অন্নপ্রাশনের এমন আয়োজন মানুষ কখনও দেখেছে বলে মনে হয় না। আশ-পাশের পাঁচ সাতখানা গ্রামের আপামর সাধারণকে নিমন্ত্রণ করে এমন খাওয়া খাওয়ালেন—যেরকম খাওয়া কেউ কোনদিন খায় নি। কোলিয়ারীতে চললো তিন দিন ধরে হৈ-চৈ কাণ্ড। গ্রামে হলো যাত্রাগান। কোলিয়ারীতে হলো খেঁটো-কুমুর আর কবির তর্জা। চারিদিকে যেন মেলা বসে গেল।

আর ঠিক সেই সময়ে সৌভাগ্যক্রমে কয়লার দাম কিছু বাড়লো। জয়নারায়ণবাবু বলে বেড়াতে লাগলেন,—'নাতি আমার কিরকম পয়মন্ত ভাখো। কয়লার দাম বাড়তে আরম্ভ করেছে।'

কোলিয়ারীর ম্যানেজার বিনয় সেন বলেছিলেন,—'এত আনন্দ করবেন না স্যার, এ দাম আবার দু'দিন পরে পড়ে যাবে দেখবেন।'

চটে গিয়েছিলেন জয়নারায়ণবাবু। বলেছিলেন, আপনি বুঝি তা'হলে খুব খুশি হন?'

বিনয়বাবু বুঝেছিলেন বলাটা তাঁর উচিত হয় নি। জীবনের আকস্মিক ঘটনাগুলোকে মানুষ অনেক সময় তার অদৃশ্য ভাগ্যসূত্রে গেঁথে ফেলে সান্ত্বনা লাভ করে। সেখানে কোন মন্তব্য করা মানেই অনধিকার চর্চা।

বিনয়বাবু আর কোনও কথা বলেন নি।

কিন্তু জয়নারায়ণবাবুর অদৃষ্ট দেবতা বুঝি রসিকতা করলেন। কয়লার দাম ক্রমশঃ বেড়েই চললো। পড়বার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না।

জয়নারায়ণবাবু বললেন,—'কেমন? হলো তো? আপনার কথা রইলো না বিনয়বাবু। দাম বাড়ছে।'

বিনয়বাবু বললেন,—'হ্যাঁ, সত্যিই দেখছি—আপনার নাতি পয়মন্ত।'

পয়মন্ত যে, তাতে আর কারও কোনও সন্দেহ রইল না। দু'বছর পরে দেখা গেল—কয়লার দাম বাড়তে বাড়তে একেবারে একটা অবিশ্বাস্য সীমায় গিয়ে পৌঁছোলো।

জয়নারায়ণবাবু তাঁর পুরনো গাড়িটা বেচে দিয়ে একখানা নতুন গাড়ি কিনে বসলেন।

রাণীগঞ্জ শহরটা রাতারাতি যেন কোন্ অদৃশ্য যাদুকরের যাদুমন্ত্রবলে আলো ঝলমল একটা প্রকাণ্ড শহরে পরিণত হয়ে গেল। বাড়িতে বাড়িতে নতুন নতুন কোম্পানীর সাইন-বোর্ড টাঙানো হলো। মাড়োয়ারীদের গদিতে গদিতে দালাল ঘুরতে লাগলো।

ওদিকে জয়নারায়ণবাবুর সঙ্গে ম্যানেজার বিনয় সেনের তখন রীতিমত ঝগড়া বেধে গেছে। বিনয়বাবু বলছেন,—'এরকম যদি করেন আপনি, চাকরি ছেড়ে দিতে আমি বাধ্য হব।'

জয়নারায়ণবাবু বলেছেন,—'এই সুযোগটা আমি ছেড়ে দেবো বলতে চান?'

—কি করবেন বলুন। আপনার কোলিয়ারীর রেজিং-এর একটা ক্যাপাসিটি আছে তো!'

কিন্তু জয়নারায়ণবাবু সেকথা বিশ্বাস করেন না। বলেন,—'আমার এত বড় কোলিয়ারী, এত এত কয়লা, আর আমি দু'দশ গাড়ি কয়লা বেশি তুলতে পারব না?'

বিনয়বাবু বলেন,—'নিয়ম-মাফিক তুলতে হবে তো! এলোপাথাড়ি যেখানে-সেখানে যদি কয়লা কাটতে যান, কোলিয়ারীটা নষ্ট হয়ে যাবে যে! আমি তা হতে দেবো কেন?'

উলটো বুঝে বসলেন জয়নারায়ণবাবু। বললেন,—'আপনি হতে দেবেন না? তার মানে? আপনি রিপোর্ট করবেন আমার নামে?'

—'ছি ছি, এ কী কথা বলছেন? কোলিয়ারীটা যাতে নষ্ট না হয় সেইটে দেখবার জন্যেই তো আপনি আমাকে এত টাকা মাইনে দিয়ে রেখেছেন।'

'আচ্ছা বেশ।' বলে জয়নারায়ণবাবু সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন।

বিনয়বাবু বুঝলেন তিনি খুব রাগ করেছেন।

দু'তিন দিন বন্ধ রইলো তাঁর এলোপাথাড়ি হুকুম। কোলিয়ারীতে আসেন, চুপচাপ একবার ক্যাশিয়ারের কাছে গিয়ে বসেন, একবার যান রেজিংবাবুর কাছে, সাইডিংএ ক'খানা গাড়ি লেগেছে একবার জিজ্ঞাসা করেন, বিনয় সেনের সঙ্গে দেখা হলে কথা বলেন না, মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পালিয়ে যান সেখান থেকে।

বিনয়বাবু মুখ টিপে টিপে হাসেন। একদিন সেই হাসিটা জয়নারায়ণবাবু দেখতে পেলেন। ব্যস্, সেইদিন থেকে তাঁর ধারণা হয়ে গেল—বিনয়বাবু ব্রেক্ রসিকতা করেছেন তাঁর সঙ্গে। ইচ্ছে করলে তিনি আরও অর্ডার নিতে পারেন, আরও কয়লা বিক্রি করতে পারেন।

রাণীগঞ্জের বড় বড় লক্ষপতি মহাজনেরা প্রায় সকলেই এক একটা কয়লার এজেন্সী খুলে বসেছে তখন। প্রতিদিন সকালে তাদের দালাল গিয়ে ধর্ণা দিয়ে বসে থাকে কোলিয়ারীর আপিসে। টাকার থলি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কোনোরকমে কিছু 'এ্যাড্‌ভান্স্' ধরিয়ে দিতে পারলেই হলো।

কিছুদিন থেকে টাকার লোভ প্রাণপণে সম্বরণ করছেন জয়নারায়ণবাবু।

প্রথম প্রথম বলছিলেন,—'আপনাদের জন্যে আমার কোলিয়ারীটা তো নষ্ট করতে পারি না। টাকা আমি নিতে পারব না। যান—বিনয়বাবুর কাছে যান।'

কিন্তু নাছোড়বান্দা দালাল। বলে,—'ছি ছি, সেকথা কি বলছি আমরা? কবে নাগাদ আসবো সেই কথাটা শুধু বলে দিন।'

জয়নারায়ণবাবু বলতেন,—'জানি না। বিনয়বাবু জানেন।'

বিনয়বাবু খুব শক্ত লোক। তাঁর কাছে তারা যেতে চায় না। বলে,—'বিনয়বাবু তো আপনার চাকর আছে বাবুজি। আমরা চাকরকে ধরবো কেন, মালিককে ধরেছি।'

শেষে কোলিয়ারীতে যাওয়া তিনি বন্ধ করে দিলেন। কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেল চারিদিকে। দু'একজন মহাজন তাঁর বাড়ি পর্যন্ত যাওয়া করলে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। জয়নারায়ণবাবুর

মনের অবস্থা ভালো নয়। হাতের কাছে টাকা। নিজের কোলিয়ারী। অথচ টাকা তিনি নিতে পারছেন না।

নাতির নাম রেখেছেন অজয়। সে তখন হাঁটতে শিখেছে। অজয়কে নতুন মোটর গাড়িতে চড়িয়ে সেদিন বিকেলে তিনি বেড়াতে বেরুলেন। সোজা চলে গেলেন রাণীগঞ্জ শহরে। অজয়ের জন্যে খুব ভালো ভালো পোশাক কিনবেন। রাজা-মহারাজার ছেলেদের যেরকম পোশাক হয়—তেমনি।

শহরের সব-চেয়ে বড় দোকানে বসে বসে তিনি পোশাক কিনছেন, এমন সময় কমবয়েসী একজন বাঙালী ছোকরা এসে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলে। এমন প্রণাম তাঁকে অনেকেই করে থাকে, কাজেই সেদিকে ততটা নজর দেবার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

একশো পঁচিশ টাকার পোশাক কিনে দোকানের বিলের টাকাটা মিটিয়ে দিয়ে তিনি দোকান থেকে বেরোতে যাচ্ছেন, আগন্তুক সেই ছোকরাটি তাঁর সুমুখে এসে দাঁড়ালো হাত জোড় করে।

—'আমি এসেছি হরসুন্দরদাস বেনারসীলালের কার্য থেকে। বেনারসীলাল আপনাকে একবার ডেকেছেন বাবু। গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন'।

জয়নারায়ণবাবু দেখলেন, বেনারসীলালের প্রকাণ্ড মোটর গাড়ি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে।

বললেন,—'আমি তো এখন যেতে পারব না বাবা। আমার নাতিটা রয়েছে সঙ্গে। অনেকক্ষণ বেরিয়েছি বাড়ি থেকে।'

ছোকরাটি বললে,—'আপনার নাতিকে দেখবেন বলেই গাড়িটি পাঠিয়ে দিলেন'।

বেনারসীলাল মস্ত বড় ধনী। নায়করা লোক। না যাওয়াটা অন্যায় হবে। জয়নারায়ণবাবু বললেন,—'চল একবার দেখা করেই যাই। কিন্তু গাড়ি কেন? গাড়ি তো আমার নিজেরই রয়েছে।

ছোকরাটি বললে,—'তা তিনি জানেন। আমি বললাম, গাড়ি নিয়েই তো উনি এসেছেন। গাড়ি কি জন্যে নিয়ে যাব? বেনারসীলাল বললেন, গাড়ি তো জয়নারায়ণবাবুর জন্যে পাঠাচ্ছি না, পাঠাচ্ছি তাঁর নাতির জন্যে।'

কথাটি শুনে জয়নারায়ণবাবুর মনে হলো যেন খুশি হয়েছেন। বললেন,—'চল তা হ'লে বেনারসীলালের গাড়িতে গিয়েই উঠি। তুমি এসো আমার গাড়িতে।' এই বলে অজয়কে নিয়ে তিনি বেনারসীলালের গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

গাড়ি তখন ও-তল্লাটে খুব কম। বেনারসীলালের গাড়িতে উঠেই জয়নারায়ণবাবুর মনে হলো—তিনি যেন ছোট হয়ে গেলেন একটুখানি। বেনারসীলালের গাড়িটা তাঁর গাড়ির চেয়ে অনেক বড়, অনেক ভালো। তবে কি গাড়িটা তাঁকে দেখাবার জন্যেই বেনারসী তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছে? এর চেয়েও ভালো একখানা গাড়ি তাঁকে কিনতে হবে। তা নইলে আর মান থাকে না।

কিন্তু বেনারসীলালের কথাবার্তা শুনে সেরকম কিছু মনে হলো না। জয়নারায়ণবাবুকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে তার সেই প্রকাণ্ড বাড়ির ফটকের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছিল বেনারসীলাল আগরওয়ালা। প্রিয়দর্শন যুবক। বয়স তিরিশের কিছু বেশিই হবে। জয়নারায়ণ চাটুজ্যের চেয়ে অনেক ছোট।

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে বেনারসীলাল। জয়নারায়ণবাবু যেন কৃতার্থ হয়ে গেলেন।

—কি নাম রেখেছেন নাতির?

—অজয়কুমার।

বেনারসীলাল দু'হাত বাড়িয়ে অজয়কে নিজের কোলে তুলে নিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেল। বললে,—'আমার স্ত্রীকে দেখিয়ে আনি। তারই দেখবার ইচ্ছে।'

বাড়ির ভেতর থেকে অজয়কুমার ফিরে যখন এলো, তখন আর তাকে চেনবার উপায় নেই। গোলাপী রঙের দামী মখমলের পোশাক, মাথায় খাঁটি মুক্তো-বসানো পাগড়ি, পায়ে জরিদার নাগ্‌রা জুতো।

জয়নারায়ণবাবু বললেন,—'এ তুমি কি করলে বেনারসী? ঠিক ওর গায়ের মাপে—এ পোশাক কি তুমি আগে থেকে তৈরি করিয়ে রেখেছিলে নাকি?'

বেনারসীলাল বললে,—'আজ্ঞে না, আমার তো ছেলেপুলে নেই। আমার এক ভাই এর একটি ছেলে হয়েছে। ঠিক এই বয়েস। তার জন্যে পোশাক তৈরি করিয়ে আমার স্ত্রী রেখেছিল তাকে পাঠিয়ে দেবে বলে।'

জয়নারায়ণবাবু বললেন,—'তোমার ভাইপোর পোশাক ওকে দিলে কেন?'

বেনারসীলাল বললে,—'মেয়েদের কখন যে কি ইচ্ছে হয় তা মেয়েরাই জানে বাবুজী। আমার স্ত্রী বললে, ভাইপোকে আবার তৈরি করিয়ে দেবে।'

বেনারসীলালের স্ত্রী বোধহয় এসে দাঁড়িয়েছিল দরজার আড়ালে। ঠক্ ঠক্ করে আওয়াজ হতেই বেনারসী সেইদিকে এগিয়ে গেল। ফিরে এসে বললে,—'ও একদিন যাবে বলছে আপনার বাড়িতে। আপনার মেয়ের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে আসবে।'

জয়নারায়ণবাবু খুশি হয়ে বললেন,—'কবে যাবে বল। আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেবো।'

—না না গাড়ি পাঠাতে হবে কেন? ও একদিন হুট্ করে গিয়ে হাজির হবে।

হাজির একদিন সে সত্যিই হলো। একা নয়। বেনারসীলাল সঙ্গে।

পাতলা ছিপ্‌ছিপে সুন্দরী মেয়েটি। সরযূর চেয়ে বয়েসে কিছু বড়ই হবে। কিন্তু অত বড়লোকের স্ত্রী—এতটুকু দেমাক্ নেই; একটুকু অহংকার নেই। একেবারে যেন মাটির মানুষ। সরযূকে আপনার করে নিতে তার বিন্দুমাত্র দেরি হলো না।

ওদিকে জয়নারায়ণবাবুকেও যেন আপনার করে নিয়েছে বেনারসীলাল।

বেনারসীলাল বললে,—বাংলাদেশে আমার জন্ম। আমরা বাঙালীই হয়ে গেছি একরকম।

জয়নারায়ণবাবু হাসতে হাসতে বললেন,—বাঙালী হয়ে গেছ, কিন্তু মাছ তো খাও না?

—আজ্ঞে না বাবুজি, ওইটে আমাদের বাড়িতে ঢুকতে পায় না। তবে কলকাতার মাড়োয়ারীর ছেলেরা শুনছি নাকি আজকাল লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক কিছু খাচ্ছে।

বেনারসীলাল বললে,—এখানে অনেকের সঙ্গে মিশলাম, অনেকের সঙ্গে কাজ-কারবার করলাম, কিন্তু আপনাকে আমার এত ভালো লাগলো কেন বুঝতে পারি না। অথচ আপনি আমার বাবার বয়সী।

জয়নারায়ণবাবু বললেন,—তোমাকেও আমার খুব ভালো লাগে। তোমার মাথা খুব সাফ্। কম বয়সে তোমার বাবা মরে গেল। আমরা ভেবেছিলাম—অত অত কারবার তুমি একা বোধ হয় সামলাতে পারবে না।

বেনারসীলাল বললে,—বাবার ছিল তিন রকমের কারবার। আমি সে জায়গায় বাইশটি কোম্পানী করেছি বাবুজী। আপনার আশীর্বাদে সবই ভালো চলছে।

খানিক থেমে বেনারসীলাল বললে,—টাকার একটা নেশা আছে বাবুজী। সেই নেশায় আমরা টাকার ওপর শুধু টাকাই বাড়িয়ে যাই। এক এক সময় ভাবি—কি হবে এত টাকায়? আমার স্ত্রী তাই দুঃখ করে। বলে, পরমেশ্বর টাকা দিয়ে তুলিয়ে রাখলে আমাদের। একটা ছেলে কি একটি মেয়ে কিচ্ছু দিলে না।

জয়নারায়ণবাবু বললেন,—আমারও তাই।

—না না আপনার তা কেন হবে বাবুজি! আপনার মেয়ে আছে, রাজপুত্রের মতো নাতি হয়েছে, আবার হবে। ওরাই দেখবেন—আপনার মনে শান্তি আনবে। আর আমার শান্তি দেখবেন?

এই বলে বেনারসীলাল উঠে দাঁড়ালো। তার গাড়িখানা দাঁড়িয়েছিল বাড়ির সামনে। সেই গাড়ির সিটের নিচে, লুকোনো একটি চেম্বারের চাবি খুলে চামড়ার একটি ব্যাগ হাতে করে নিয়ে এলো জয়নারায়ণবাবুর কাছে। বললে, কি আছে বলুন দেখি এর ভেতর?

—কেমন করে জানব বল!

বেনারসীলাল বললে,—পঞ্চাশ হাজার টাকার নোট। ব্যাঙ্কে পাঠাবো বলে রেখেছিলুম। ভুলে গেছি। একা মানুষ, কত আর মনে থাকবে বলুন।

তারা এসেছিল বিকালে। কথায় কথায় সন্ধ্যে হলো। বেনারসীলাল বার-বার বলে পাঠাতে লাগলো তার স্ত্রীকে—রাত্রি হয়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি এসো। কিন্তু কিছুতেই সে আসে না।

দু'জনে মিলে খাবার তৈরি করেন। সবাইকে খাওয়ালে। নিজেরা খেলে। খেয়েদেয়ে অজয়কে নিয়ে খেলা করতে লাগলো।

শেষে জয়নারায়ণবাবুকে সঙ্গে নিয়ে বেনারসীলাল নিজেই উঠে এলো ওপরের ঘরে। স্ত্রীকে বললে,—'রাত্তির হয়ে যাচ্ছে। চল। আবার আর একদিন আসবে।'

বেনারসীর স্ত্রী বললে,—যাব না, যাও!

বেনারসী তার হাতের ব্যাগটা দেখিয়ে বললে,—বুঝতে পারছো না—আমি কেন তোমাকে তাড়া দিচ্ছি! রাস্তার বাঁধের পাশ দিয়ে যেতে হবে। এই সেদিনে একটা রাহাজানি হয়ে গেছে। ভয়ে আমার বুক চিপ্ চিপ্ করছে।

সরমা বললে,—গাড়ি রয়েছে না?

বেনারসী বললে,—গাড়ি থামিয়ে দিতে কতক্ষণ? তুমি বুঝতে পারছো না সুখ।

বেনারসীর স্ত্রীর নাম সুখময়ী। বেনারসী তাকে সুখ বলে ডাকে।

সুখ হাসতে হাসতে বললে,—খুব বুঝতে পারছি। তুমি আমায় ভেবেও ভীতু।

বেনারসী বললে,—সরমা, ওকে বুঝিয়ে বল তো ভাই।

সরমা কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন,—সুখ তাকে বলতে দিলে না। বললে, তুমি থামো। তোমার বরকে না দেখে আমি কিছুতেই উঠবো না।

নিচে বাইকের শব্দ হতেই সরমা বললে,—ওই এসেছে!

বেনারসী বললে,—বেশ, তবে আমরা নিচে বসি! তোমরা ঝটপট কাজ সেরে নাও।

ভবেশ এলো। তাদের হাসি-রহস্যে আরও ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। অজয় তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমন্ত অজয়কে আদর করে, সরমাকে একদিন তাদের বাড়িতে যাবার নিমন্ত্রণ জানিয়ে সুখ যখন উঠলো, রাত্রি তখন ন'টা।

অযোধ্যার কাছাকাছি কি-একটা তিথি। ঘুটঘুটে আঁধারে ঢাকা নিস্তব্ধ পল্লীগ্রাম।

গাড়িতে ওঠবার সময় জয়নারায়ণবাবুকে প্রণাম করলে তারা দুই স্বামী-স্ত্রী। তারপর পঞ্চাশ হাজার টাকার নোট-ভর্তি চামড়ার ব্যাগটি জয়নারায়ণবাবুর হাতে বসিয়ে দিয়ে বেনারসীলাল বললে,—এ আমি আর সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি না। এটা রইলো আপনার কাছে।

—সে কি কথা?

জয়নারায়ণবাবু বললেন,—কাল সকালেই লোক পাঠিয়ে দিও।

হাসতে হাসতে বললে বেনারসীলাল,—'যদি না পাঠাই'?

জয়নারায়ণবাবুও হাসলেন। বললেন,—'সাক্ষী পর্যন্ত কেউ রইলো না। আমিও তো মেরে দিতে পারি'!

—দেবেন। ওরকম আমার অনেক আছে।

এই বলে বেনারসীলাল ড্রাইভারকে বললে,—চালাও!

[চলবে—]

চলতি দুনিয়া

ভাগ্যদেবী যে কখন কোন্ ছলে মানুষের জীবনের পথ কণ্টকোজ্জ্বল করে তোলেন, সে কথা দেবাঃ ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ।" বেচারা knebworth হোটেল থেকে চুরির অপরাধে দশটি বছর জেলে কাটাল। মুক্তির দিন জেল থেকে যখন বেরিয়ে এল, তখন বেশ এক পশলা বৃষ্টি হচ্ছে, সেই বৃষ্টিতে একটা ছাতা পর্যন্ত নেই, বেচারা কি আর করে, জামার কলারটা উল্টে দিল বৃষ্টির হাত থেকে কিছুটা বাঁচবার জন্যে—"he turned up his collar against the pouring rain."

তারপরেই এক অভাবনীয় ব্যাপার। খবর এসেছে, লোকটি নাকি হঠাৎ উত্তরাধিকার সূত্রে একেবারে এক লক্ষ আশী পাউণ্ডের মালিক হয়ে পড়েছে। এটর্নী অফিস তাকে সে কথা জানাতে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছে। অবশ্য ভাগ্য যে তার ফিরেছে এতে আনন্দ হবারই কথা, তবে দশটি বছর জেল খাটবার আগে যদি সেটা হোত। —ডেলি মিরর্।

• • •

রাজনীতির ঘনায়মান দুর্যোগের মধ্যে—এমন কি আসন্ন মৃত্যুর অবধারিত মুহূর্তের ঠিক পূর্বে জগতের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়কেরা কি করে যে প্রেমে পড়তে পারেন, এ রহস্য চিন্তাশীল মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করেছে। 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কখন কে ধরা পড়ে কে জানে।'—এ শুধু কবির কথা নয়, মানব জীবনের অতি কঠোর সত্য। সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে ইটালীর একদা রাষ্ট্র নায়ক মুসোলিনী পরিণত বয়সে এক তরুণীর প্রেমে পড়ে এমনই আত্মহারা হয়েছিলেন যে নিজের উচ্চ পদ মর্য্যাদা, সার্বজনীন ক্ষমতা ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের গুরুদায়িত্ব,—সমস্ত ভুলে সেই তরুণীর মায়ের কাছে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন—'Madam, will you allow me to love your daughter Clara ?' অবশ্য তরুণীটির বয়স তখন বাইশ, মুসোলিনীর পঞ্চাশের উপর। Clara-র সঙ্গে মিলনে মুসোলিনীর ব্যবহার ছিল একেবারে ছেলেমানুষের মত,—"He was so boyish that one could not but laugh." বহু বৎসর বিবাহিত জীবন যাপন করে বহু সন্তানের জনক হয়েও মুসোলিনী সর্বশেষে তরুণী clara-র কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে ছিলেন। মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে যে প্রেম বিশ্ব-সংসারকে উপেক্ষা করতে পারে, তার গভীরতা যে কোন্ স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে, কে তার বিচার করিবে ? —দি ইলাসট্রেটেড্ উইকলি।

• • •

তরুণ বিজ্ঞান-সাধক মোস্‌বয়ার তাঁর বিজ্ঞানচর্চার ফলাফল মাত্র পঞ্চাশ লাইনে লিখে জার্মানীর এক সংবাদপত্রে ছাপিয়ে দিলেন। ব্যাপারটা যে সামান্য এবং শুধু গবেষণামূলক এটাই তখন লোকে বুঝেছিল। হঠাৎ এর গুরুত্ব প্রকাশ পেল যখন তাঁকে তাঁর বক্তব্য বিষয়টি বিশদভাবে লিখে পুস্তকাকারে ছাপাবার জন্যে তাগিদ এল বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক মায়ার লিবনিজ এর কাছ থেকে। এর পরে মোসবয়ারের ভাগ্য ফিরে গেল। তাঁর আশ্চর্য গবেষণার ফলাফল দেখে ১৯৬১ সনে তাঁকে দেওয়া হোল নোবেল প্রাইজ। সেই অখ্যাতনামা তরুণ বৈজ্ঞানিক এবার বিশ্ববিখ্যাত হয়ে পড়লেন। শুধু তাই নয়, সুইডেনের রাজকুমারী, বলতে গেলে, একরকম তাঁর প্রেমেই পড়লেন।

বিয়ে হোল না বটে, কিন্তু নোবেল পুরস্কার ছাড়াও সুইডেনের বহু রাজকীয় পুরস্কার তিনি লাভ করলেন। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রৌঢ় বৈজ্ঞানিকের উপর তরুণী রাজকুমারীর প্রেম এক উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, সন্দেহ নাই। —স্বাধীনতা॥

• • •

রাশিয়া ও আমেরিকার মত ব্রিটেনও যে গোপনে গোপনে হাইড্রোজেন বোমা প্রস্তুত করছে, সে কথা এখন দেশে বিদেশে অনেক লোকের কাছেই ফাঁস হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, ব্রিটেনের সামরিক কর্তৃপক্ষ এখন জোর গলায় বলছেন, ব্রিটেনের হাইড্রোজেন বোমা এখন আনবিক যুদ্ধে যে-কোন আক্রমণকারী দেশের উপর প্রয়োগ করা যেতে পারে। —"H-bombs ready in Britain to be hurled at any aggressor in the awful event of nuclear war."

—সান্‌ডে পিকটোরিয়াল॥

• • •

পতিতা নারীর ভূমিকা নিখুঁতভাবে অভিনয় করার জন্য লণ্ডনের কমেডি থিয়েটারে কুমারী এরিক রমার্সকে যেভাবে অপূর্ব প্রশংসা লাভ করেছেন, তাতে নীতিবাগীশ অভিভাবকের দল যে শঙ্কিত ও বিরক্ত হয়ে উঠবেন, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে। অপরিণতবুদ্ধি নিয়ে যে সব কিশোরী ও তরুণী এ অভিনয় দেখতে যায়, তাদের নৈতিক চরিত্র যে কলুষিত হয়ে পড়বে এ আশংকা অনেকেই করছেন। এমন কি গোপনে এরিকা রমার্সকে আহত করারও চেষ্টা চলছে। চিঠি ও ফোনে তাঁকে জানানো হচ্ছে, পতিতা নারীর এরকম অভিনয় ত্যাগ করুন, নইলে আপনি ভীষণ দুর্ঘটনায় পড়বেন,—"You will meet with a serious accident unless you stop playing this part." কিন্তু কুমারী রমার্স স্থির করেছেন এ অভিনয় করবেনই, তাই থিয়েটার থেকে তাঁর দেহরক্ষী নিযুক্ত করা হয়েছে। —ডেলি মিরর॥

• • •

ক্যান্সার রোগ যে চিকিৎসার অতীত, আধুনিক ভেষজ-বিজ্ঞান তা' স্বীকার করে না। —"Some people still think that all Cancers are incurable. That's not so. Today some forms are being successfully treated—thanks to discoveries made by Research." ক্যান্সার রোগ যে মারাত্মক ও অসাধ্য ব্যাধি, একথা কিছুদিন আগেও চিকিৎসক-মহলে স্বীকৃত হয়েছিল, কিন্তু আজকাল এই মহাব্যাধির ঔষধও আবিষ্কৃত হয়েছে। এখন আর ক্যান্সারে ভয় পাবার কিছু নেই। অন্ততঃ, প্রাণটা যাবে না। ক্যান্সার সম্বন্ধে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এই কথাই দৃঢ়ভাবে বলছে, "This is the truth about Cancer." —ডেলি মিরর॥

• • •

বর্তমানকালে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বহু সমীক্ষা নিরীক্ষায় নারী-হৃদয়ের যে সকল তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে তাহাতে এ বিষয়ের পূর্বসূরীরা নেহাৎ পিছাইয়া পড়িয়াছেন। প্রত্যেক নারীই না-কি আজন্ম পুরুষবিদ্বেষিনী। স্নেহ মমতা প্রীতি প্রেম যাহা কিছু তাঁদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় সেটুকু নিতান্তই স্বার্থের খাতিরে তাঁরা দেখিয়ে থাকেন। চট্ করে সহজ ভাবে কিছু করা নারীদের পক্ষে সাধারণ ব্যাপার। "Women chose the easiest course." কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে নারীরা পুরুষের প্রতি একটা শত্রুতা, একটা অবজ্ঞার ভাব পোষণ করে,—"Women seem so basically hostile towards men that it's hard to understand how they manage to get married." প্রয়োজনের তাগিদেই নারীর পক্ষে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বা প্রেমের ফাঁদে পুরুষকে জড়িয়ে রাখা চলে, নইলে চিরদিনই নারীর শত্রু পুরুষ। —উওম্যান্স মিরর॥

রম্যাণি বীক্ষ্য

উৎকল পর্ব

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

কুড়ি

দূর থেকে আমাদের বউলি দেখতে হল। বাস নাকি তার কাছে যাবে না। যেতে পারে না নয়, তার এখন সোজা ফেরবার কথা।

সকলের আগে চটলেন রামানন্দবাবু। বললেন: কার কথা? কার কথায় এই বাস চলবে? ড্রাইভারের কথায়, না যাত্রীদের কথায়?

ড্রাইভার এই হুমকিতে একেবারেই বিচলিত হল না, বোধ হয় ভ্রূক্ষেপও করলো না। কিন্তু যাত্রীদের একজন বললেন: আপনি কাকে বলছেন? ওদের যা ইচ্ছে তাই ওরা করবে।

করলেই হল! আমরা পয়সা দিই নি?

পয়সা তো সবাই দিয়েছি। বাস তবু ওদের ইচ্ছাতেই চলবে।

না, চলবে না। ড্রাইভার!

ড্রাইভার নিরুত্তর।

এই ড্রাইভার!

আমি ওস্তার দিকে চেয়ে দেখলুম, সে তার অভ্যেস মতো হাসছে।

একটা লোক দিলাম তার সঙ্গে, সেই বা গেল কোথায়!

বিরক্তভাবে একজন যাত্রী বললেন: চুলোয় যাক।

আঁা, আপনিও সায় দিচ্ছেন!

তার কাজে সায় দিচ্ছি না, আপনাকে থামতে বলছি।

আমাকে?

হ্যাঁ মশাই, আপনাকে।

কিন্তু রামানন্দবাবু থামবার পাত্র নন, বললেন: বেশ লোক তো আপনি। বাস কি আপনার, যে আপনার গায়ে লাগছে?

গায়ে লাগছে না, ধৈর্যে লাগছে। আপনি চুপ করলে একটু আরাম পাই।

রামানন্দবাবু এ কথারও উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে তর্কে নিবৃত্ত করবার জন্যে বললুম: বউলি কী জিনিস মশাই?

রামানন্দবাবু আমার দিকে ফিরে বললেন: বউলি জানেন না?

না।

নাম শোনেন নি কোন দিন?

আশ্চর্য!

বললুম: সব কথা কি সব মানুষ জানে! বলুন না আপনি!

রামানন্দবাবু বললেন: আপনার কথা শুনে আমার ভারি আশ্চর্য লাগছে। এমন একটা প্রইব্য জিনিসের কথা আপনি আগে কখনও শোনেন নি!

এই বারে আমার মনে হল যে রামানন্দবাবু হয়তো নিজেই কিছু জানেন না, আর জানেন না বলেই এমন ভণিতা করছেন। বললুম: যদি না জানেন, বলবেন না।

রামানন্দবাবু প্রায় মারতে উঠলেন। বললেন: আমি জানি না, আপনাকে কে বললো?

বললুম: বলবে আবার কে! আপনার কথাতেই সন্দেহ হচ্ছে।

তা তো হবেই; আপনাদের মতো বকবক করতে আমি ভালবাসি না কিনা!

তার পরেই সেই গলা-বন্ধ কোট পরা ভদ্রলোককে বললেন: কী মশাই, এতক্ষণ তো অনেক বড় বড় কথা বলছিলেন, ধউলির কথায় কেন চুপ মেরে গেলেন?

খত্তা এতক্ষণ চেপে চেপে হাসছিল, এইবারে উদ্ভাসভাবে হেসে উঠলো।

আমি রামানন্দবাবুর মুখের দিকে তাকালুম। তিনি বড় অপ্রতিভ বোধ করলেন। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বললেন: শুরু করছেন না কেন, আপনার কাণ্ড দেখে যে সবাই হাসছে!

সেই ভদ্রলোক বললেন: কার কাণ্ড দেখে, তা জিজ্ঞেস করে দেখুন।

রামানন্দবাবু আবার কিছু বলবেন ভেবে আমি তাড়াতাড়ি বললুম: আপনি আর দেরি করবেন না।

ভদ্রলোক বোধ হয় আমার ভয়ের কারণ বুঝলেন, তাই তখনি বললেন: ধউলিতে অশোকের একটা শিলালিপি আছে।

রামানন্দবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন, বললেন: ধউলিটা কী, তা তো বলবেন।

ধউলি একটা নিচু পাহাড়ের নাম। ভুবনেশ্বর থেকে চার পাঁচ মাইল দূরে। অশোকের সময় এই পাহাড়ের গা বেয়ে বোধ হয় কোন ভালো রাস্তা ছিল। প্রতিদিন অনেক মানুষ নিশ্চয়ই যাতায়াত করত। তাই অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধে জয়লাভের পর এই পাহাড়ের একটা বড়ো পাথরের গায়ে শিলালিপি উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। পাহাড়ের গা ঘেঁষে একখানা পাথর সামনে বেরিয়ে এসেছে। তার উপরে একটা বিরাট হাতির মূর্তি, আর গায়ে শিলালিপি। এই রকম শিলালিপি অশোক ভারতের নানা উৎকীর্ণ করিয়েছেন। গির্নার প্রভৃতি স্থানে যে অনুশাসন আছে, তার সঙ্গে এখানে একটু প্রভেদ দেখা যায়। বারো ও তেরো নম্বরের অনুশাসন দুটি অন্যরকম। নূতন বিজিত রাজ্য কলিঙ্গের প্রজাদের উদ্দেশ্যে এ দুটি রচিত। একটিতে মহামাত্যদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: উপযুক্ত অনুসন্ধানে বা বিচার না করে কোন প্রজাকে যেন শাস্তি দেওয়া না হয়। কোন মহামাত্য এই আদেশ অমান্য করলে তিনি সম্রাটের অনুগ্রহ হারাবেন। অপর অনুশাসনে বলা হয়েছে: বনবাসীরা যেন সম্রাটকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করে।

ভদ্রলোক বললেন: এই শেষ অনুশাসন দুটি পরিবর্তনের প্রয়োজন অবশ্যই হয়েছিল। কলিঙ্গ যুদ্ধের মতো ভয়াবহ দৃশ্য আর কোন যুদ্ধে সংঘটিত হয় নি। এক লক্ষ লোক মরেছে, দু'লক্ষ বন্দী হয়েছে। রোগে অনাহারে ও ধ্বংসলীলায় যে কতো লোক মরেছে, তার গণনা নেই। এ যুদ্ধের

আণবিক অস্ত্র তখনও আবিষ্কৃত হয় নি। গোলা-গুলি দিয়েও তখন যুদ্ধ হত না। এ তো আজকের কথা নয়, এ যুদ্ধ হয়েছিল যীশু খৃষ্টের জন্মের দু'শো একষট্টি বছর আগে। লোকে তখন চাল তরোয়াল নিয়ে পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করতো, রথে চড়ে তীর ছুঁড়তো, আর বর্শা চালাতো, ঘোড়া ও হাতির পিঠ থেকে। হাতাহাতি চুলোচুলিও হত। তবু মরেছিল কয়েক লক্ষ লোক। এই যুদ্ধ না হলে পৃথিবীতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার এমন হত না।

—কী রকম?

সম্রাট অশোক এই ধ্বংসের পরিমাণ দেখলেন দু'চোখ মেলে। কলিঙ্গ বিজয় হল, তার সাম্রাজ্য হল বিস্তৃত, ইতিহাসে আর একটি কীর্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু—

ভদ্রলোক থামলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর কিছু আর্দ্র দেখলুম। খানিকটা আবেগ এসেছে।

রামানন্দবাবু বললেন: তার পর?

সম্রাট অশোক দেখলেন, কলিঙ্গ নয়, একটা শ্মশান তিনি অধিকার করেছেন। শিশুরা ক্ষুধায় চিৎকার করছে, আর নিঃসম্বল নারীরা কাঁদছে নিজেদের অসহায় অবস্থা দেখে। কী জন্য এই রাজ্যজয়? নিজের অহংকার চরিতার্থের জন্য, না কোন কল্যাণের জন্য? অশোক ভাবলেন, কাঁদলেন, তারপর অস্ত্র ত্যাগ করলেন।

রামানন্দবাবু প্রশ্ন করলেন: তাতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার হল কী করে?

ভদ্রলোক বললেন: ছেলে বেলায় ইতিহাস বুঝি পড়েন নি?

আলবাৎ পড়েছি।

তবে?

মনে নেই। সারাজীবন মনে রাখবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে পড়ি নি।

বেশ করেছেন। এবারে একটু বুদ্ধি খরচ করুন। দেখবেন, যুদ্ধের ফলাফল দেখে যিনি কাঁদেন, তিনি শুধু অস্ত্র ত্যাগই করেন না। বলেন, অহিংসা পরমো ধর্মঃ। বলেন, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। তারপর সেই বুদ্ধের বাণী বিতরণের ব্যবস্থা করেন দেশে দেশে। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি। ভারতের সর্বত্র অশোকের অনুশাসন উৎকীর্ণ হল শিলালিপিতে, মঠে, বিহারে, চৈত্যে সংঘের প্রতিষ্ঠা হল, শ্রমণ-সন্ন্যাসীর সাহায্যে দেশে দেশান্তরে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হল। বৌদ্ধ অশোক অহিংসায় বিশ্বাসী হয়ে ভারতের রাষ্ট্রশক্তিকে খর্ব করলেন।

বললুম: অনেক ঐতিহাসিক তো এই ঘটনাকেই ভারতের দুর্ভাগ্য বলে মনে করেন।

রামানন্দবাবু বললেন: কেন?

উত্তর আমাকে দিতে হল না, দিলেন সেই ভদ্রলোক, বললেন: হিংসা ভুলে হিন্দুরা দুর্বল হল। হিন্দুর সাম্রাজ্য বেশি দিন টিঁকলো না, ভেঙে টুকরো টুকরো হল। তারপরে পদানত হল বিদেশী শক্তির। এসব কথা আপনার ছেলের ইতিহাসের বইএ পড়বেন।

কী বললেন?

রাগে রামানন্দবাবু প্রায় উঠে দাঁড়াচ্ছিলেন। আমি তার হাত ধরে বসিয়ে দিলুম। বললুম: এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন?

হবো না? যা মুখে আসে, উনি তাই আমাকে বলবেন?

ভদ্রলোকও প্রতিবাদ করে উঠলেন : কী বলেছি মশাই, আপনাকে ?

কিছু বলেন নি ?

ভদ্রলোক দৃঢ় স্বরে বললেন : না।

মিথ্যে কথা। আমি বিয়ে করি নি, আমার ছেলের কথা বললে সেটা গাল দেওয়া হয় না ?

বাসের অনেকেই এবারে একসঙ্গে হেসে উঠলেন। যাঁরা চোখ বুজে ছিলেন, বা অন্যমনস্ক ছিলেন, তাঁরাও হলেন কৌতূহলী। রামানন্দবাবু কিন্তু আরও চটে উঠলেন, বললেন : অসভ্যতা।

রামানন্দবাবুর উষ্মার কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলুম, কিন্তু হাসি সংবরণ করেছি। সকলের সঙ্গে হেসে উঠতেও সাহস পাই নি। কেন না পুরী পৌঁছে আমাদের এক ঘরে একত্র থাকতে হবে। তিনি আমাকে পরিত্যাগ করবেন না, পরিত্রাণও পাবো না তাঁর হাত থেকে। কাজেই অল্পে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ চলে না। তাঁকে ভোলাবার জন্যে আমি ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলুম : ধউলিতে আর কিছু দেখবার আছে ?

আছে। নিকটেই একটি অতি প্রাচীন পুষ্করিণীর সন্ধান পাওয়া গেছে। অশোকের পরে কোন রাজা এটি খনন করেছিলেন। এক বর্গ মাইল পরিধির এই পুষ্করিণীটি সংস্কার করে এতে এখন আধুনিক পদ্ধতিতে মাছের চাষের গবেষণা হচ্ছে।

তার পর ?

তারপর শিশুপাল গড়। ভুবনেশ্বরের নিকটেই শিশুপাল গড়ের প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। অনেকের ধারণা যে, এই দুর্গটি অশোকের কলিঙ্গ আক্রমণের পূর্বে নির্মিত। আবার অনেকে বলেন যে, অশোকের পরে জৈন রাজা খরবেলা এই দুর্গে অবস্থান করেন।

জৈন রাজা খরবেলা যে একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যাচ্ছে না। বললুম : খরবেলার সম্বন্ধে কতটুকু জানা যায় ?

মোটামুটি সবই জানা যায়। অশোকের অনুশাসন কলিঙ্গে একশো বছরের মধ্যেই সন্ধান হারায়। ১৫০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে আমরা খরবেলাকেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দেখি। বর্তমান উদয় গিরির নাম দেখেছি কুমারী পর্বত। তার হাতি গোম্ফা আপনারা দেখে এলেন। হাতি গোম্ফার শিলালিপিও বোধ হয় দেখেছেন।

ভদ্রলোক আমাদের উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললেন : এই শিলালিপিতে আমরা খরবেলার রাজত্বকালের প্রথম চোদ্দ বছরের ইতিবৃত্ত পাই। জীবনের প্রথম পনের বছর তিনি রাজোচিত খেলা খেলেছেন। তার পরের ন' বছর যুবরাজরূপে তিনি লেখাপড়া ও রাজ্য পরিচালনা প্রভৃতি শিখেছেন। পঁচিশ বছর বয়স থেকে তিনি যুদ্ধবিগ্রহে যোগদান শুরু করেন। রাজা হয়ে তিনি অনেক সৎকাজ করেছিলেন। প্রথম বৎসরে তিনি রাজধানী সংস্কার করেন। দ্বিতীয় বৎসরে সাতকর্নির রাজা আক্রমণ করেন। তৃতীয় বৎসরে তিনি নিজের রাজধানীতে নৃত্যগীত ও নানা উৎসবের আয়োজন করেন।

ভদ্রলোকের স্মৃতিশক্তির প্রশংসা করতে ইচ্ছা হচ্ছিল। এই রকম করে তিনি হয় তো চোদ্দ বছরের ইতিহাস বলবেন। মানুষ কত বিচিত্র হয়। প্রতিদিন তার পরিচয় পাচ্ছি। ঘরে বসে এসব জানা যায় না, জানা যায় না ইতিহাস বা উপন্যাস পড়ে। বইএর মানুষের সঙ্গে বাস্তবের মানুষের অনেক তফাত। মানুষের প্রকৃতির যদি ছাঁচ তৈরি করতে হয় তো প্রত্যেক মানুষের আলাদা ছাঁচ হবে।

একজনের ছাঁচে আর একজনকে কিছুতেই ফেলা যাবে না। এই গলা-বন্ধ কোট পরিহিত ভদ্রলোকটিকেও আমি এই মুহূর্তে একেবারে নূতন ধরনের মানুষ বলে মনে করলুম।

ভদ্রলোক বললেন: একে একে চোদ্দ বৎসরের কাহিনী শুনতে আপনার ভালো লাগবে না। সব কথা সঠিক মনেও নেই। তবে মথুরা আক্রমণের কথা, অঙ্গ ও মগধ জয়ের কথা আছে। আর ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ বৎসরে এই কুমারী পর্বতে একশো সত্তরটি গুহা নির্মাণের কথাতেই এই শিলালিপি শেষ হয়েছে। খারবেলার রাজত্বকাল কিন্তু চোদ্দ বৎসরে শেষ হয়নি। তাঁর আদর্শ ছিল দিগ্বিজয়। তিনি একটির পর একটি রাজ্য জয় করেছেন। প্রথমে মূষিক ও অশ্বরাজ্য সাতকর্নির রাজ্য জয় করেন। তারপর মহারাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক ও ভোজকদের পরাজিত করেন। দুবছের জন্যে এই দুই রাজ্যকে তিনি আপন রাজ্যভুক্ত করেন নি। মগধে তখন শক্তিমান রাজা পুষ্যমিত্র। খারবেলা তাঁকেও পরাজিত করে অঙ্গ ও মগধ অধিকার করেন। উত্তর ভারত থেকে বিদেশীদের তাড়িয়ে পুষ্যমিত্র তখন শক্তিমান বলে ভারত বিখ্যাত হয়েছিলেন। প্রতিবেশী সকল রাজাকে পরাজিত করে খারবেলা অশ্বমেধ যজ্ঞও করেন।

ভদ্রলোক বোধ হয় আরও কিছু বলতে পারতেন। কিন্তু আমাদের তা শুনতে হল না। সদর রাস্তা ছেড়ে আমরা অন্য পথ ধরেছিলুম। একটা অনাদৃত পথ। খানিকটা এগিয়েই বাস একটা খোলা জায়গায় দাঁড়ালো। শুনলুম, নামতে হবে।

নেমে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলুম। সম্মুখে রাজা-রাণীর মন্দির। এই মন্দিরের কথা আগেই বলেছি। এর চেয়ে সুন্দর মন্দির আমরা ভুবনেশ্বরে দেখি নি।

এই মন্দির দেখে যখন আমরা বাসে চাপলুম, তখন আমাদের চায়ের তৃষ্ণা জেগেছে। শুধু আমার নয়, অনেকেরই। বাসের ড্রাইভারকে তাঁর একটা হোটেলে থামবার নির্দেশ দিলেন।

আমি রামানন্দবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখলুম, তিনি গম্ভীর হয়ে বসে আছেন। আর বোধ হয় কারও সঙ্গে কথা কইবেন না। আমাদের সঙ্গে চাও খেলেন না। বললেন, পুরীতে ফিরে যাবেন। সেখানে তো পয়সা দিতেই হবে:

খুব হাসলো তাঁর চা না খাবার যুক্তি শুনে।

[ক্রমশঃ]

অগষ্ট স্ট্রীন্‌বার্গের "মিস্ জুলিয়া" নাটিকা অভিনয়কালে মেরিয়া গরডিন্ জুলিয়ার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যেখানে অভিনয়ে ক্রোধের ভাব আনা দরকার, সেখানে যেন মেরিয়া ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিলেন।

বিখ্যাত অভিনেতা উলরিচ্ হন্ট ব্যাপারটা বুঝে নিলেন। তিনি সেই নাটকে চাকরের অভিনয় করছিলেন। হঠাৎ একটা দৃশ্যে উলরিচ্ মেরিয়াকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে বসলেন।

এইবার মেরিয়া প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চের কথা ভুলে গিয়ে চিৎকার করে ক্রোধভরে যে-সব কথা বললেন, সেগুলো নাটকে ছিল না।

দর্শকেরা সে-সব জানতেন না, তাঁর সার্থক অভিনয় দেখে তাঁরা করতালি দিয়ে উঠলেন।

পুরাতন পাতা

বানরের শ্রেষ্ঠত্ব ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

বানর বলিতেছেন আমরা বানর, অতি শ্রেষ্ঠ পুরাতন বনুবংশ জাত, অতএব আমরাই সকল জীবের প্রধান। নল, নীল, অঙ্গদ এবং সুবিখ্যাত মর্কটেরা এই বনুবংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের নমস্কার!

আমরা যে শ্রেষ্ঠ, তার প্রমাণ এই যে, আমাদের ভাষায় বানর অর্থই শ্রেষ্ঠ—আর আর সকল জীবই অশ্রেষ্ঠ। মনুষ্যদের আমরা ম্লেচ্ছ বলিয়া থাকি। যেহেতু তাহারা অশুচি কখনো দন্ত করিয়া থায়, এরূপ আচরণ আমরা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি না। তাহা ছাড়া তাহারা সাতজন্মে গায়ের উকুন বাছিয়া খায় না এমনি অশুচি! আত্মীয় বান্ধবের সহিত দেখা হইলে তাহারা পরস্পরের গায়ের উকুন বাছিয়া দেয় না, তাহাদের সমাজে এমনি সহৃদয়তার অভাব। শ্রেষ্ঠজাতি বানর জাতি এই সকল কারণে মনুষ্য জাতিকে ম্লেচ্ছ বলিয়া থাকে।

আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় কত দিব! আমরা পুরুষানুক্রমে কখনও চাষ করিয়া খাই না। সনাতন বানর শাস্ত্রে চাষ করার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। প্রাচীন বনুর সময়ে যে নিয়ম ছিল আমরা আজও সেই নিয়ম পালন করিয়া আসিতেছি—এমনি আমরা শ্রেষ্ঠ! আমাদিগকে ভ্রষ্টাচারী কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু ম্লেচ্ছ মনুষ্য জাতি চাষ করিয়া খায়, তাহারা চাষা!

চাষ না করাই যে সাধু আচার তাহার প্রমাণ এই, এতকাল ধরিয়া শ্রেষ্ঠ বানরসমাজে চাষ না করাই প্রচলিত। চাষ করাই যদি সদাচার হইত, তবে বনু-আচার্য কি চাষ করিতে বলিতেন না? আমাদের বানর বংশে যে মহাত্মা আদুবানের মত এতবড় দূরদর্শী পণ্ডিত জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন, কই তিনি ত চাষের কোন উল্লেখ করেন নাই। তবে যদি আধুনিক অর্বাচীন নব্য বানরের মধ্যে কোন মহাপুরুষ শ্যাজ খসাইয়া মানুষীয়ানা করিতে চান, তবে তিনি সনাতন পবিত্র বানর প্রথা ত্যাগ করিয়া চাষ করিতে থাকুন।

কিন্তু অত্যন্ত আমোদের বিষয় এই যে, বানরদের শ্রেষ্ঠতায় মুগ্ধ হইয়া মানুষেরা সম্প্রতি প্রমাণ করিতে আসিয়াছে যে, মানুষরা বানর বংশজাত। এইরূপ মিথ্যা যুক্তির সাহায্যে সোসেয়াল কোন প্রকারে মানুষ বানরের দলে মিশিতে চায়! হে বানর ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমরা সাবধান, মানুষ যে বানর এরূপ গুরুতর ভ্রম মনে স্থান দিও না।

মোটাকতক বিষয়ে বানরে ও মানবে সাদৃশ্য দেখা যায় বটে। কিন্তু তাহা হইতে কি প্রমাণ হইতেছে! এই প্রমাণ হইতেছে যে, মানবেরা বানর হইবার দুরাকাঙ্খায় ক্রমাগত আমাদের অনুকরণ করিতেছে—ক্রমাগত আমাদিগকে ape করিতেছে। ম্লেচ্ছ মানব কাঁচকলা খাইত বটে,

কিন্তু পক্ক কদলীর গৌরব আমাদের কাছ হইতে শিখিয়াছে। উকুন যাহা সম্বন্ধেও মানবীরা আমাদের অতি অসম্পূর্ণ অনুকরণ আরম্ভ করিয়াছে, শ্রেষ্ঠ বানরেরা তাহা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না! আনন্দ উপলক্ষে অনেক সময়ে মানবেরা দন্তপংক্তি বিকাশ করে বটে, এবং মনে করে বুঝি অবিকল বানরের মত হইলাম—কিন্তু সে মুখভংগি আমাদের পবিত্র বানরজাতি-প্রচলিত সনাতন দন্ত বিকাশের কাছ দিয়াও যায় না।

মানবের ভাষায় দুই একটা এমন শব্দ প্রয়োগ দেখা যায় বটে, যাহাতে সহসা কোন নির্বোধের ভ্রম হইতেও পারে যে বানরের সহিত মানবের যোগ আছে। "লেজে তেল দেওয়া", "লেজ মোটা হওয়া" শব্দ মানবেরা এমনভাবে ব্যবহার করে যেন তাহাদের সত্য সত্যই লেজ আছে। কিন্তু উহা ভাণ মাত্র—উহাতে কেবল তাহাদের হৃদয়ের বাসনা প্রকাশ পায় মাত্র—হায়রে দুরভিলাষ! আমি শুনিয়াছি দুরাশাগ্রস্ত লোককে মানুষ বলিয়া থাকে "অমুক-কাজ করিয়া এমনি কি চতুর্ভুজ হইয়াছ।" ইহাতে চতুর্ভুজ হইবার জন্য মানুষের প্রাণপণ চেষ্টা প্রকাশ পায়! শ্রেষ্ঠ বহুবংশজাত বানরেরা সহজেই চতুর্ভুজ হইয়াছে, কিন্তু ম্লেচ্ছ মানবেরা শত জন্ম তপস্যা করিলেও তাহা হইতে পারিবে না।

যাহা হউক, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, মানবেরা বানর বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। এমন কি, বস্ত্রদ্বারা তাহারা সযত্নে গাত্র আচ্ছাদন করিয়া রাখে, পাছে তাহাদের রোমাবলীর বিরলতা ও লাংগুলের অভাব ধরা পড়ে—পবিত্র বানর-তনুর সহিত ম্লেচ্ছ মানব-তনুর প্রভেদ দৃষ্টমান হয়। লজ্জার বিষয় বটে। কিন্তু বহুবংশীয়দের কি আনন্দ! আমরা কি গৌরবের সহিত আমাদের লাংগুল আস্ফালন করিতে পারি!

আমাদের কিচিকিচি-পুরাণ মানুষের পিতৃপুরুষের সাধ্য নাই যে বুঝে—কারণ শ্রেষ্ঠ জাতির শাস্ত্র নিকৃষ্ট জাতি কখনই বুঝিতে পারে না। আমি জিজ্ঞাসা করি মানুষের ভাষায় কি কোন প্রকৃত তত্ত্ব কথা আছে—যদি থাকিত তবে কি আমাদের পবিত্র কিচিকিচির সহিত তাহার কোন সাদৃশ্য পাইতাম না!

অতএব আমাদের বহুমেব ও বহুমদাচার্য চিরজীবী হইয়া থাকুন, আমরা যেন চিরদিন বানর থাকি, এবং কিচিকিচি শাস্ত্রে সম্যক্ পারদর্শী হইয়া উত্তরোত্তর অধিকতর বানরত্ব লাভ করি। আমাদের সনাতন ল্যাজ যেন সযত্নে রক্ষা করিতে পারি, এবং আস্ফালনের প্রভাবে তাহা দিনে দিনে যেন দীর্ঘতর হইতে থাকে! আর যে যা গায় গাক্, আমরা যেন কেবল কলা খাইতেই থাকি, এবং শ্রেষ্ঠ বানর ব্যতীত অন্য জীবকে দেখিবামাত্র দাঁত খিঁচাইয়া আনন্দ লাভ করি!

[বালক, চৈত্র—১২৯২ সাল]

একজন আর কয়েকজন

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

বালক কবি এসেছিলেন উপেন্দ্রনাথের বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে। সঙ্গে আরো দু' একজন কর্মী। দক্ষিণবঙ্গের বারুইপুরে এক সাহিত্য সম্মেলন করবেন তাঁরা।

সামান্য আয়োজন। তদোধিক সামান্য তাঁদের সঙ্গতি। তবু তাঁদের একান্ত কামনা বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সেবক উপেন্দ্রনাথকে তাঁরা সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

বালক কবি সবিনয়ে বললেন,—'দীনের এ পূজা—হীন আয়োজন!'

উপেন্দ্রনাথ হেসে উত্তর দিলেন,—'রাজদূয় যজ্ঞের জন্যে সাহিত্যের রাজা মহারাজেরা আছেন, ভালোবাসা পেলেই আমি কৃতার্থ।

বালক কবি বললেন,—'বালিগঞ্জ থেকে বারুইপুর ট্যাক্সি কিংবা মোটরে অনেক খরচ পড়ে যাবে—বুঝতেই তো পারছেন।'

উপেন্দ্রনাথ সমস্যা মিটিয়ে দিলেন,—'ট্রেনেই যাবো।'

বালক কবি আশ্বস্ত হলেন,—'সেকেণ্ড ক্লাসে খুব একটা ভিড় থাকবে না।'

উপেন্দ্রনাথ বললেন,—'কিন্তু!'

বালক কবি জিগ্যেস করলেন,—'কিন্তু কি বলুন!'

উপেন্দ্রনাথ আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন,—'ইনি আমার সহোদর এবং.....'

বালক কবি হাসলেন। বললেন,—'ওঁর পরিচয় আমার জানা আছে, উনিও সেদিন যাচ্ছেন।'

উপেন্দ্রনাথ পরম পুলকিত হলেন। 'তাহলে সেকেণ্ড ক্লাশ কম্পার্টমেণ্ট নয়—আমরা থার্ড ক্লাশেই যাবো। দু'জনের যাতায়াত একজনের খরচেই উশুল হয়ে যাবে।'

বালক কবি এবং তাঁর সঙ্গীরা সবিস্ময়ে উপেন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই বোধ হয় প্রথম তাঁরা দেখছেন একজন মানুষ, যিনি বিবেচনার ক্ষেত্রে কতোখানি উদার পন্থী।

'পথের পাঁচালী'র বালক কবিকে আমি চিনতাম। ইতিপূর্বে আরো একবার তাঁকে দেখেছিলাম।

গোবরডাঙ্গা সাহিত্য সম্মেলনে পথের পাঁচালীর লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় একবার সভাপতিত্ব করতে গিয়েছিলেন। সে সভার উদ্যোক্তাদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম।

সভাপতির অভিভাষণে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে দু'জনের কথা বলেছিলেন। একজন বিচিত্রা সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আর অপর জন এই বালক কবি।

মাথায় একমাথা বাবরি চুল, শ্যামবর্ণ একহারা চেহারা। তরুণ যুবক, চোখে মুখে গ্রাম্য সারল্যের অভিব্যক্তি—সেদিন সে সভায় দর্শকসমক্ষে উপস্থিত হয়ে বিশেষ ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছিলেন। তিনিই বিভূতিভূষণ বর্ণিত বালক কবি।

সভাপতি বলেছিলেন—এঁরা দু'জন না থাকলে পথের পাঁচালীর অপু বাংলা সাহিত্যে আসতেন কিনা সন্দেহ।

বালক কবিকে দেখলাম, কিন্তু গোবরডাঙ্গার উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে সেদিন আমার দেখা হয়নি।

বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা 'বিচিত্রা' প্রকাশিত হবে। তার ভাবী সম্পাদক সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ভাগলপুরে তারই ধ্যানে মগ্ন। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় তখন সেখানে।

কথায় কথায় প্রকাশ পেলো বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি উপন্যাস লিখেছেন। উপেন্দ্রনাথ আগ্রহ দেখালেন,—'দেবেন বিচিত্রায়!'

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় বিস্মিত এ যে স্বপ্নেরও অগোচর। বললেন,—'নামহীন গোত্রহীন লেখকের উপন্যাস ছাপবেন সেই কাগজে—যেখানে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র লিখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন!'

—'হ্যাঁ। ছাপবো। খুশি হয়ে ছাপবো।'

'উপন্যাসখানি একটি বিখ্যাত পত্রিকা থেকে অমনোনয়নের লজ্জা নিয়ে ফিরে এসেছে কিন্তু।'

'তা আসুক' দেবেন একটু পড়তে?'

'শেষের দিকটা আবার নতুন করে লিখছি।'

'বেশ তো গোড়ার দিকটা আগে পড়ে দেখি।

সেই গোড়ার দিক পড়ে দেখেই তিনি 'পথের পাঁচালী'কে বিচিত্রার জন্যে মনোনীত করলেন। শুধু মনোনীত করা নয় লেখক সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করেছিলেন ভাগলপুরে, বর্তমানে তা সঠিক হয়েছে।

বিভূতিবাবু এ গল্প গোবরডাঙা সাহিত্য সম্মেলনে করেছিলেন। বালক কবিকে দেখে সেই কথা আমার মনে পড়লো। উপেন্দ্রনাথকে বললাম বিভূতিবাবুর এ কাহিনী। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ খুশি হলেন। আরো বললেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা তোমরা জানো: অতসী মামী তাঁর প্রথম গল্প। সে গল্প পড়ে এক আশ্চর্য শক্তিমান লেখকের সন্ধান পেয়েছিলাম।

আমি বললাম,—হ্যাঁ। আপনি নিজে নবীন লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে লেখার জন্যে পারিশ্রমিক দিয়ে তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন।'

'আরো কয়েকজনের কথা হয় তো তোমরা জানো না।'

উপেন্দ্রনাথের কথায় বললাম,—জানি। অন্নদাশঙ্কর রায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

উপেন্দ্রনাথ বলেছেন,—'আজকের অন্নদাশঙ্কর তখনকার দিনের চারুচন্দ্র চক্রবর্তী। বিচিত্রায় তাঁর গল্প পড়েও তাঁর খোঁজ করেছিলাম। আশীষ গুপ্তের পাশে বিমল মিত্তিরকেও সম্মানের সঙ্গে জায়গা দিয়েছিলাম।

আমি বললাম,—'কলেজ বয়?'

উপেন্দ্রনাথ হাসলেন,—'অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের কথা বলছো তো।'

বললাম,—'হ্যাঁ।'

'জগদীশ ভালো সমালোচক। কি অপূর্ব তাঁর বিশ্লেষণ শক্তি। শুধু পাণ্ডিত্য নয়—রসগ্রাহীতাই তার সমালোচনার বৈশিষ্ট্য। পণ্ডিত এবং রসিক এ দুয়ের সমন্বয় বড় কঠিন। জগদীশ একাধারে তাই।'

বললাম—'তার কারণ তিনি কবিও।'

উপেন্দ্রনাথ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন,—'ঠিক বলেছো তুমি। আমার এক এক সময় কিন্তু কবি জগদীশ ভট্টাচার্যের জন্যে দুঃখ হয়। আমরা পণ্ডিত এবং সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্যকে পেয়েছি বটে আর তার জন্যে বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য পুষ্ট। কবি জগদীশ ভট্টাচার্যকে হারিয়েও কিন্তু আমরা অপরদিকে ক্ষতিগ্রস্ত।'

বালক কবির দল উঠতে চাইলেন : 'তাহলে চলি দাদা।'

'এসো ভাই।'

'যাচ্ছেন তো বারুইপুরে?'

'নিশ্চয়ই। তোমরা ডাকছো—যাবো না।'

শুধু যাওয়া নয়। উপেন্দ্রনাথ আরো যে অনুরাগ প্রকাশ করলেন আজকের দিনে তা বিরল।

বারুইপুর থেকে যিনি উপেন্দ্রনাথকে নিতে এসেছিলেন, তিনি ট্যাক্সি ডাকতে যাচ্ছিলেন। উপেন্দ্রনাথ তাঁকে নিরস্ত করে সে ভার দিলেন তাঁর পাচককে। আগন্তুককে বললেন, 'আপনার হোলতে চা-জলখাবার খাবো, আর আপনি চলে যাবেন!'

বালিগঞ্জ প্রেস থেকে বালিগঞ্জ রেল স্টেশন মাত্র দশ বারো আনা ট্যাক্সি ভাড়া। উপেন্দ্রনাথ নিজেই তা দিলেন। তারপর বালিগঞ্জ থেকে বারুইপুর তিনখানি থার্ড ক্লাশ কম্পার্টমেন্টের টিকিট—তাও কাটতে দেবেন না সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোক্তাকে। বললেন, 'দূরের পথ হলে অবশ্যই ভাড়া দিতাম না। এটুকু খরচ করে সাহিত্যের প্রতি একটু না হয় অনুরাগ আপনাদের সঙ্গে একযোগে দেখালাম।'

যিনি সম্মেলনের পক্ষ থেকে নিতে এসেছিলেন, তিনি তো বিস্মিত!

'না, তা হতে পারে না!'

উপেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন,—'কি হ'তে পারে না?'

'ট্যাক্সি ভাড়া দেবেন, ট্রেনের ভাড়া দেবেন। এ কি করে হয়?'

'কেন?'

'আপনি দয়া করে যাচ্ছেন এই আমাদের সৌভাগ্য।'

তাঁর কথায় উপেন্দ্রনাথ বাধা দিলেন, আর আপনারা গ্রামে সাহিত্য-সম্মেলন করছেন, আমাদের সেখানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন—তাও কি কম সৌভাগ্য আমাদের। এক সঙ্গে কতো পাঠক পাচ্ছি বলুন তো? লেখকরা যে পাঠক খোঁজে তার খবর রাখেন কি?'

টিকিট কাটা হয়ে গিয়েছিল। শিয়ালদহ থেকে দক্ষিণগামী ট্রেন এসে পড়লো। আমরা তিনজন একখানি থার্ডক্লাশ কম্পার্টমেন্টে গিয়ে উঠে বসলাম।

যিনি আমাদের নিতে এসেছিলেন তিনি অভিভূত হয়ে পড়েছেন উপেন্দ্রনাথের ব্যবহারে। তিনি গদগদ কণ্ঠে বললেন,—'শুধু একজন মহৎ লেখককে দেখলাম না—একটি মহৎ হৃদয়কেও দেখবার সৌভাগ্য আজ আমার হলো।'

ট্রেন তখন ছেড়ে দিয়েছে। উপেন্দ্রনাথ আমাকে চুপি চুপি বললেন,—দেখলে ভায়া। ওকালতি বুদ্ধিটা কেমন ছাড়লাম!'

আমি বললাম,—'দাদা', ভাগলপুরের কোর্টেও কি মক্কেলদের কাছে এমন মহৎ বুদ্ধির পরিচয় দিতেন।'

উপেন্দ্রনাথ বললেন,—'সে কাহিনী শুনো আইনের আঙিনায়।'

'ভুরুড়ে নাড়িকে নিয়ে প্রায়ই রসিকতা করতেন রসিক উপেন্দ্রনাথ। বয়েস অপেক্ষা হৃদয়-বাসিনী অঙ্গনার সৌষ্ঠবের উপেন্দ্রনাথের পালস ঠিক স্বাভাবিক মাত্রায় চলতো না। থেকে থেকে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়তো তাঁর নাড়ির গতি। কিন্তু উপেন্দ্রনাথ নির্বিকার। সেই অবস্থাতেই তিনি চলাফেরা করতেন, সভা-সমিতি করতেন। দৈনন্দিন কাজ-কর্ম তাঁর জন্যে অবহেলিত হতো না।

আমরা যারা তাঁর সঙ্গী-সাথী, একটু যে বিব্রত হতাম না তার জন্যে, এমন নয়। এক এক সময় ভয়ও পেয়ে যেতাম। আর যারা হঠাৎ তাঁর নাড়ি দেখতো—তাঁরা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়তেন এবং সভাপতিকে কোনো রকমে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়তেন।

উপেন্দ্রনাথ হাসতেন, আর থেকে থেকে ভুরুড়ে নাড়ির চিকিৎসা নিজেই করতেন।

দক্ষিণ বঙ্গের বারুইপুর অঞ্চলের মদনাহাট গ্রামের একটি সাহিত্য-সভায় সভাপতিত্ব করছেন উপেন্দ্রনাথ। ভারি জমকালো সভা। তিনটি তোরণদ্বার পেরিয়ে সভাপতি প্রধান অতিথি এবং আরো দু'একজন সাহিত্যিক সমভিব্যাহারে সকাল থেকেই আসর জমিয়ে আছেন। বৈঠক এবং মজলিসি গল্পে সারা গ্রামখানিকে তিনি একাই মাতিয়ে রেখেছেন। আহারাদির পর একটু বিশ্রাম নিতে না নিতেই সভাক্ষেত্রে চললেন উপেন্দ্রনাথ সদল বলে। দীর্ঘক্ষণব্যাপী অনুষ্ঠানপর্ব।

হঠাৎ ভুরুড়ে নাড়ি মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। উপেন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রঙ্গ-রসিকতায় সভাপতির ভাষণে সে-কথা উল্লেখ করলেন। আমি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লাম। বললাম, দাদা, সভা ভঙ্গ হোক!'

উপেন্দ্রনাথ বললেন,—সে কি কথা!'

বললাম,—'না দাদা, এই সেদিন অসুখ থেকে উঠেছেন, আর দীর্ঘক্ষণ ধরে আজ অনেক অনিয়ম করেছেন। আর চালানো ঠিক হবে না।'

সে-কথা সভাপতি শুনবেন না।

সভায় একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন। তাঁর শরণাপন্ন হলাম। তিনি সভাপতির পালস পরীক্ষা করে নির্দেশ দিলেন: 'সভাপতিকে সভাক্ষেত্রের এই ভিড় আর গরমে আর কিছুতেই রাখা চলে না। তিনি প্রকৃতই অসুস্থ। অতএব সভা ভঙ্গ হোক্!'

আমি অনুনয় জানালাম,—'দাদা, চিকিৎসকের পরামর্শ অবহেলা করার অধিকার আপনার কিন্তু নেই।'

উপেন্দ্রনাথ বললেন,—'না, তা নেই। তবে তার আগে একটু ঘুঙীযোগ প্রয়োগ করি।'

সভাপতি ডায়াসে রাখা হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে গান শুরু করলেন। রবীন্দ্রনাথের গান—'মধুর তোমার শেষ যে না পাই, প্রহর হলো শেষ।'

অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধের কণ্ঠের সুরেলা গান তাল-সুর-ব্যঞ্জনা এবং গীতিমূর্ছনায় অপূর্বমধুর হয়ে উঠলো।

গান শেষ হলে তিনি হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন,—'ডাক্তার এইবার একবার দেখুন তো!'

আশ্চর্য ব্যাপার! ভুরুড়ে নাড়ি ওস্তাদ মন্ত্রে বশীভূত।

চিকিৎসক তো অবাক!

সভাপতি তখন সভার অনুরোধে নতুন করে সঙ্গীত-সভার উদ্বোধন করলেন।

পুরানো দিনের নাট্যজগতের রঙ্গকথা ॥

বরুচি ॥

[সেকালের রঙ্গালয়ের যে নেপথ্যরঙ্গকাহিনীগুলি এই সংখ্যায় পুনরুদ্ধার করে দেওয়া হল, সেগুলির কতক পেয়েছি গিরিশচন্দ্রের অনুচর অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের অধুনালুপ্ত রচনা থেকে, কয়েকটি শুনেছি বিগত যুগের বাগবাজার নিবাসী কয়েকজন বিশিষ্ট নাট্যামোদীর মুখে।]

রামতারণ সান্যালের মতো নিষ্ঠাবান সঙ্গীতসাধক বাংলাদেশে বেশী জন্মগ্রহণ করেন নি। গিরিশচন্দ্র তাঁকে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতাচার্য বলে সম্মান করতেন। গানের সুর ও তাল সম্বন্ধে রামতারণবাবুর রীতিমতো 'এলার্জি' ছিল, অর্থাৎ গায়ক বা বাদকের সুর তালের কিছুমাত্র অজহানি ঘটলেই তিনি স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গিয়ে যা-নয়-তাই কাণ্ড করে বসতেন।

গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'সাবিত্রী সত্যবান' গীতিনাট্যের অভিনয় হচ্ছে। রামতারণবাবু সত্যবান। যথারীতি সর্পাঘাতে সত্যবান প্রাণ হারিয়েছেন—রামতারণবাবু মৃত অবস্থায় মঞ্চের উপর শুয়ে আছেন, আর তাঁর পাশে বসে সাবিত্রী স্বামীবিয়োগে শোক-সঙ্গীত গাইছেন।

নেপথ্যে যিনি হারমোনিয়ম বাজাচ্ছিলেন, সেদিন হঠাৎ কেন যেন তাঁর আঙুল বেসুরায় পড়ে গিয়ে গানটির সুর কেটে গেল। অন্য কেউ হয়তো ততটা বুঝলে না, কিন্তু রামতারণবাবুর কানে কে যেন গরম সীসে ঢেলে দিলে। আর যায় কোথায়! তিনি রাগে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গিয়ে লাফ দিয়ে উঠে সবেগে হারমোনিয়ম-বাদকের দিকে ধাবিত হলেন। আরে, একি হল, মরা সত্যবান বেঁচে উঠল, চারিদিকে হাসির রোল পড়ে গেল। নেপথ্যে বিশিষ্ট অভিনেতারা রামতারণকে বললেন—"ছি ছি, একি করলেন সান্যাল মশাই। কেলেংকারি হয়ে গেল যে, একি ছেলেমানুষী!"

রামতারণবাবু সে-সব কথায় কানই দিলেন না। তিনি তখন হারমোনিয়ম-বাজিয়েকে চেপে ধরেছেন—"বল, কেন, বাজনা বেসুরো হল?" তারপর অভিনেতাদের দিকে ফিরে বললেন—"আমি কি করব। ও ভুল বাজালো কেন!"

ইদানিংকালে বাংলা রঙ্গমঞ্চে নানা রকমের বাস্তবধর্মী "আঙ্গিকের" প্রচলন হয়েছে, এবং বলা হচ্ছে, বাংলা রঙ্গমঞ্চে এ-ধরনের প্রচেষ্টা নাকি এর আগে আর কখনো হয়নি। কথাটা ঠিক নয়। চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগেও এখানকার মঞ্চের উপর ঘোড়া, মোটরগাড়ি এমন কি চলন্ত ট্রেন পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। তাছাড়া শরীরের সূক্ষ্মমার্গে যাতায়াত, চোখের সামনে মুণ্ডু কেটে ফেলা, শ্মশানের সোনার মানুষ উড়ে যাওয়া, প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারও ছিল। সেই রকম দুটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হল।

গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অমৃতলাল বসুর "হীরকচূর্ণ" নামে নাটকখানির অভিনয় হয়। রোমার মহারাজার এক ঘটনা নিয়ে নাটকখানি লেখা। এই নাটকে মঞ্চের উপর প্রথম চলন্ত রেলগাড়ি দেখানো হয়। অভিনেতা যোগেন মিত্তির ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার। কলকাতা পাবলিক

ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টে কাজ করতেন। তিনিই এই ট্রেন তৈরী করেছিলেন এবং পাছে অন্য কোন অভিনেতা ট্রেন চালাতে গিয়ে গোলমাল করে ফেলে সেজন্যে তিনি স্বয়ং ড্রাইভার সেজে গাড়ি চালাতেন।

এক রাত্রে সেই নাটকের অভিনয়ে যথাসময়ে ট্রেন ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এবং বাঁশী বাজাতে বাজাতে মঞ্চে ঢুকলো। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। রীতিমতো ইঞ্জিন লাগানো ট্রেন, পিছনে কামরা। যোগেনবাবু ড্রাইভার সেজে গাড়ি চালাচ্ছেন, সবুজ আর লাল নিশান হাতে গাড়ির পিছনে স্বয়ং নাট্যকার, অর্দ্ধেন্দুবাবু বরোদার মহারাজার সাজে কামরার জানালার ধারে বসে আছেন। স্পেশাল ট্রেন চলেছে। একধার থেকে বেরিয়ে বাঁশী বাজাতে বাজাতে অন্য ধার দিয়ে চলে যাবে, এই ছিল ব্যবস্থা। এই ছোট্ট দৃশ্যটি দেখার জন্যেই প্রত্যেক রাত্রে বহু দর্শক আসতো আর আনন্দে কলরব করে হাততালি দিত। সেদিন হল কি, কি করে কল খারাপ হয়ে মঞ্চে ঢুকেই ট্রেন দাঁড়িয়ে গেল। যোগেনবাবু নানা চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু ট্রেন আর চলে না। মহা কেলেঙ্কারি। এখনি দর্শকরা উপহাস শুরু করে দেবে। চোখের পলকে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে অমৃতলাল লাফ দিয়ে নেমে এসে ট্রেনের সামনে দাঁড়িয়ে লাল নিশান ঘোরাতে লাগলেন—অর্থাৎ সামনে বিপদ, ট্রেন থামাও। ট্রেনের শব্দ থেমে গেল। ড্রাইভার ও মহারাজা নেমে এলেন। অমৃতলাল বললেন, এখানকার লাইন খারাপ হয়ে গেছে, তাই ট্রেন আজ রাত্রে আর যাবে না। কাল সকালে লাইন ঠিক হলে আবার যাবে। উপস্থিত রাতটা আপনারা ডাক বাংলায় কাটান। ওই যে দূরে ডাকবাংলো। চলুন যাওয়া যাক।" এই বলে ওঁদের দু'জনকে নিয়ে প্রস্থান করলেন। দৃশ্য পড়ে গেল। যারা ইতিপূর্বে দেখেছিল তারা অমৃতলালের উপস্থিত বুদ্ধির প্রমাণ পেয়ে তারিফ করলে। যারা দেখে নি, তারা কিছুই বুঝতে পারলে না।

আর একটি ঘটনা, ঐ গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারেই যে সময় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বৃত্রসংহার" কাব্যের নাট্যরূপটি অভিনীত হত সে সময় যোগেন মিত্তির আর একবার তাঁর ইন্‌জিনিয়ারিং কৌশল খাটিয়ে একটি দৃশ্য দেখিয়ে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিতেন।

"বৃত্রসংহারে" আছে—স্বর্গবিতাড়িতা শচী যে সময় নৈমিষারণ্যে দিন যাপন করছেন, সেই সময় দানবরাজ বৃত্রের আদেশে তাঁর ছেলে রুদ্রপীড় শচীকে হরণ করে নিয়ে যাবার জন্যে প্রেরিত হয়। রুদ্রপীড় শচীর ছেলে জয়ন্তকে যুদ্ধে হারিয়ে, 'নিকষজ' নামে তার এক পাষণ্ড অনুচরকে শচীকে ধরে আনবার জন্যে আদেশ দেয়। নিকষজ শূন্য পথে এসে শচীকে চুলের মুঠি ধরে তাঁকে ঝোলাতে ঝোলাতে নিয়ে আকাশে উঠে অদৃশ্য হয়ে যায়। হঠাৎ অন্ধকারে নিকষজের আকাশ থেকে নেমে আসা, তার পর শচীর চুল ধরে তাঁকে ওপর দিকে নিয়ে অদৃশ্য হওয়া—চোখের সামনে একান্ত বাস্তবভাবে এই দৃশ্য দেখে দর্শকরা প্রচণ্ড উল্লাস করত।

দৃশ্যটি যাতে ঠিকমতো অভিনীত হয় সে জন্যে যোগেনবাবু নানা কলকব্জা বসিয়ে অনুচরদের ঠিক ঠিক হুকুম দিয়ে নিজে নিকষজ দৈত্যের ভূমিকায় অভিনয় করতেন।

অভিনেত্রী কাদম্বিনী শচীর ভূমিকায় অভিনয় করত। যোগেনবাবু তার ঘাড়ে ও কোমরে বেল্ট বেঁধে তাতে দুটি কড়া লাগিয়ে দিতেন আর নিজের পায়ে ও কোমরে হুক এঁটে রাখতেন। কাদম্বিনীকে বলা ছিল, যখন যোগেনবাবু ওপর থেকে নেমে আসবেন, তখন অভিনয় করতে করতে কৌশলে কাদম্বিনী কড়ার মধ্যে হুক লাগিয়ে দেবে।

সেরাত্রে যথারীতি সেই দৃশ্যের অভিনয় আরম্ভ হয়েছে। কম্রপীড়ের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধের পর অসুর লুটিয়ে পড়েছে, শচী সকরুণ বিলাপ করছে—দর্শকরা চোখের জল মুছতে মুছতে সেই মর্মস্পর্শী অভিনয় দেখছে। এমন সময় নিকষকৃষ্ণ দৈত্যরূপী যোগেনবাবু হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে মুঞ্চ থেকে নেমে এসে শচীর আলুলায়িত চুল ধরে টানতে শুরু করলেন।

হঠাৎ অন্ধকারের ভিতর থেকে মুক্ত পথে দৈত্যের আবির্ভাব দেখে দর্শকরা বিস্ময়ে গুঞ্জন করে উঠল। তারপর সে যখন শচীর কেশাকর্ষণ করতে লাগল তখন তারা সমস্বরে দৈত্যের প্রতি কটূক্তি সুরু করে দিল—চারদিকে যেন হৈ চৈ পড়ে গেল।

হঠাৎ সেরাত্রে দর্শকদের এই প্রবল উত্তেজনায় কাদম্বিনী হকচকিয়ে গিয়ে হুকে কড়া লাগাতে ভুলে গেল। এদিকে যথানিয়মে যোগেনবাবুর নির্দেশমতো কল চলছে। শচীর চুল ধরে দৈত্য ওপরে উঠছে। কিন্তু আরে একি! চুলে যে বিষম টান পড়ছে—প্রাণ যে যায়—নিমেষে কাদম্বিনীর চৈতন্য হল—সে তো হুকে কড়া লাগিয়ে দেয় নি। কিন্তু এখন আর লাগাবারও কোন উপায় নেই। তার কোমরের কড়ার সঙ্গে যোগেনবাবুর পায়ের হুকের তখন অনেকখানি তফাৎ হয়ে গেছে। কাদম্বিনী শুধু চুলের জোরেই ঝুলছে। ব্যাপারটা সঙ্গে সঙ্গে যোগেনবাবুও বুঝতে পারেছেন। কাদম্বিনীর দেহের সমস্ত ভার তখন তাঁর দু'হাতে—ভয়ে ভাবনায় ত্রস্ত হয়ে যোগেনবাবু প্রাণপণে কাদম্বিনীর চুল শক্ত করে ধরে রইলেন। তা করা ছাড়া তখন আর অন্য উপায় ছিল না।

এদিকে চুলের টানের যন্ত্রণায় মুক্তপথে ঝুলতে ঝুলতে কাদম্বিনী পরিত্রাহি চীৎকারের সঙ্গে তার পার্ট বলতে লাগল আর দর্শকরা প্রবল উৎসাহে তাকে বাহবা দিতে লাগল।

"বৃত্রসংহারে" সেই জায়গার বর্ণনায় আছে—

'দানব-করেতে তবে
নিবদ্ধ কুন্তল-লতা
দুলিতে লাগিল শূন্যে শচী কলেবর।'

দর্শকরা এই দৃশ্যের অভিনবত্ব রূপায়ণ দেখে চমৎকৃত হল। শচীর প্রাণপণ আর্তনাদকে নিখুঁত অভিনয় মনে করে তাদের সে কী প্রচণ্ড হাততালি।

সৌভাগ্যক্রমে সেই দৃশ্যই অঙ্কের শেষ। ড্রপ পড়তেই সকলে ছুটে গিয়ে যোড়শ্যমানা কাদম্বিনীকে ধরে নামিয়ে ফেললে।

Nothing lives in literature but that which has in it the vitality of creative art. —E.P. Whipple.

Literature is the immortality of speech. —Schlegel.

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

স্বপ্নসন্ধানী হেল্‌ডারলিন ॥

দীপক চক্রবর্তী

জার্মান কবি হেল্‌ডারলিনের স্বপ্নের জগতে গ্রীক দেব-দেবীর নিত্য আনাগোনা। কবির মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁরা সতত সঞ্চরমান, জীবিত এবং সপ্রাণ। রোমান্টিক কবিকুলের প্রচলিত ধারা থেকে সরে এসে তিনি গ্রীক গুহুতাকে আশ্রয় করলেন। রুসো-কথিত স্বাভাবিক অনুপ্রেরণার অনুসরণে তিনি শিওরের স্বর্ণযুগে ফিরে যেতে চাইলেন। ক্লাসিকাল মেঘমণ্ডলের বিরাট পটভূমিতে দাঁড়িয়ে তাই মানুষ দেবতাদের সঙ্গে অনায়াসে কথা বলে। খ্রীষ্ট এবং সেণ্ট জন মাউণ্ট অলিম্পাসে সুস্থির হয়ে বসবাস করেন। কোথাও বুঝি কোনো দ্বন্দ্ব নেই, দ্বিধা নেই। হেল্‌ডারলিনের কবিতার ভাষা যদিও সরল, অনাড়ম্বর সুর আগাগোড়া উচ্চগ্রামে বাঁধা। তাঁর কল্পনার জগতে এই পৃথিবী আর সুদূর আকাশ চিরদিনের জন্য এক হয়ে মিলে যেতে চায়। 'দেবতারা অনেকদিন তাঁদের অমরতা ভোগ করেছেন, এখন তাঁরা বস্তু চান'—এই হলো কবির মনের কথা।

য়োহান ক্রিস্টান ফ্রেডেরিক হেল্‌ডারলিন ১৭৭০ সনের ২০শে মার্চ নেকার-এর তীরে সরিয়ার ছোট্ট শহর লফ্‌কেন-এ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা, যিনি লুথারীয় চার্চের তদারকি দেখাশোনা করতেন, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ১৭৭২ সনে মারা যান। দু' বছর পরে কবির মা পুনরায় বিবাহ করেন এবং পরিবারটি নেরটিনজেনে তাঁর দ্বিতীয় স্বামীর কর্মস্থলে চলে যায়। হেল্‌ডারলিন ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থানীয় গ্রামার স্কুলে পড়াশোনা করেন। কবিকে অস্বাভাবিক রকম মায়ের সঙ্গলাভ করে তাঁর দ্বিপিতা ১৭৭৯-তে মারা যান। কবিও গভীরভাবে তাঁর মা, ঠাকুমা, ছোটো বোন এবং অর্ধ-ভ্রাতা কার্ল গকের স্নেহবন্ধনে জড়িয়ে পড়লেন। ১৭৮৪-তে হেল্‌ডারলিন ডেনকেনডরফের নিম্ন মনাস্টারি স্কুলে ভর্তি হন, দু'বছর পরে মলব্রনে উচ্চ মনাস্টারি স্কুলে। ১৭৮৮ থেকে ১৭৯৩ পর্যন্ত টেবিনজেনের থিয়োলজিকাল সেমিনারীতে ধর্মপদ গ্রহণের জন্য পড়াশোনা করেন। এই সময়ে দুই বন্ধু নেক্‌কার এবং মগেনো, যাঁরা তাঁর সঙ্গে ফরাসি বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করত, তাঁদের নিয়ে তিনি একটি কাব্য সমিতির পত্তন করেন। এ ছাড়া তাঁরা আরো দু'জন সহাধ্যায়ীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন, যাঁরা পরে জগৎবরেণ্য দার্শনিক হিসাবে সম্মান পেয়েছেন, হেগেল ও শেলিং। ১৭৮৭-তেই হেল্‌ডারলিন তাঁর স্কুলের বন্ধুর ভগ্নীস্থানীয়া লুইস নাশ্‌টকে বিবাহের কথা দেন, কিন্তু পরে ১৭৯০-তে তা ভেঙে দেন। টেবিনজেনে তিনি এলিস লেভেটের প্রেমে পড়েন আর এই সময়েই তিনি বুঝতে পারেন এতদিন তিনি যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখেছেন তা হবার নয় এবং হয়তো কখনই নিজে স্ত্রীর চরণ পোষণের যোগ্য হয়ে উঠবেন না। ১৭৮৯-এর শরতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করে তাঁর মার অনুমতি চান। কিন্তু পরে মত পরিবর্তন করে সেখানে রয়ে গেলেন এবং গ্রীসের ললিতকলার ইতিহাস, সলোমনের প্রবাদ এবং হেসিওডের 'ওয়ার্কস এ্যাণ্ড ডেস'-এর সমান্তরাল করে বহু কবিতাভিত্তিক থীসিসের জন্য তিনি 'ম্যাজিস্টার' ডিগ্রী লাভ করলেন এবং পরমার্থবিদ্যার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

বেশ বড়ো হয়ে পর্যন্ত হেল্‌ডারলিন খেয়ালি, দারুণ অনুভূতিপ্রবণ ছিলেন; কোনো কোনো সময় খুব মন-মরা আবার কখনও খুশিতে ভরে থাকতেন। বন্ধুদের ভালোবাসতেন অথচ সহজভাবে

সকলের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারতেন না। ছোটোবেলা থেকেই তিনি আর সকলের থেকে পৃথক। সাহিত্যসাধনার বিশেষ সুযোগ-সুবিধার জন্য তাঁর বন্ধুদের এবং শিলেরের সহায়তায় তিনি সারলোটি ফন্ কাল্‌বের পুত্রের শিক্ষক নিযুক্ত হন। গৃহকর্ত্রীর উৎসাহ এবং সহানুভূতির অকৃপণতায় মুগ্ধ কবি 'হাইপেরিয়ন' উপন্যাসের প্রাথমিক কাজকর্ম শুরু করেন। শরতে তিনি তাঁর ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে জেনায় ফিশ্‌টের দার্শনিক বক্তৃতা শুনতে যান, শিলেরের সঙ্গে অনেকবার দেখা করেন ও নানা কথাবার্তা বলেন এবং গ্যেটে ছাড়াও বহু প্রতিভাবান লেখকের সংস্পর্শে আসেন। এর পর ১৭৯৪-এর গ্রীষ্ম পর্যন্ত হেল্‌ডারলিন একা জেনা এবং ছুরটিনজেনে কাটান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'হাইপেরিয়ন'-এর কাজ চালিয়ে যান, সেই সময়ের দার্শনিক 'স্তোত্র'গুলি রচনা করে 'মানবতার আদর্শে'র উদ্দেশে উৎসর্গ করেন এবং গুতিড থেকে কিছু অনুবাদ করেন।

ডিসেম্বরে তিনি ফ্রাঙ্কফুর্টে এক ধনীর গৃহে তাঁর পুত্রসন্তানদের শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হন। গৃহকর্তার সুন্দরী স্ত্রী সুসেটং অনতিবিলম্বে কবির কাব্যে মানসী 'দিওতিমা'র মর্যাদা লাভ করেন। সুসেটের প্রতি কবির অনুরাগে স্বর্গের সুষমা এসে মিলেছিল। কবির কাছে এ এক অন্য জগতের উপলব্ধি। তাঁর দিওতিমা কবিতাগুচ্ছই এর প্রধান প্রমাণ। এমন কি এই নূতন ভাবোন্মেষে তাঁর রচনা শৈলিও উল্লেখযোগ্যভাবে গতি পরিবর্তন করে নিবিড় সম্ভাবনায় ভরে উঠল।—

'তোমারে চেনে না এরা ; নিঃশব্দ দুঃখের ভারে নত,
অমৃতরূপিণী, তুমি স্থিরদাঁড় বিনা প্রতিবাদে ;
তবু আজো সূর্যের আলোয়
বর্বরের চক্রব্যূহে বৃথা খোঁজো আপন দোসর।
কোনখানে নেই আর মহাপ্রাণ প্রেমিক পুরুষ।
কিন্তু কাল নিরবধি। এ-মর সংগীত মোর তবু রেখে যাবে
সেইদিন, যে-দিন তোমার নাম, দিওতিমা দেবতার পরে
বীরের সম্মান পাবে, যোগ্য হবে তব।'

[শ্রীবুদ্ধদেব বসু-কৃত অনুবাদ]

দিওতিমার উদ্দেশে রচিত স্তোত্রগুলি স্বভাবতই বোদলেয়ারের 'স্তোত্র' কবিতার কথা মনে এনে দেয় যার অনুপ্রেরণাও একজন কল্যাণী নারীর স্মৃতিতে ভাস্বর। হেল্‌ডারলিনের কাছে দিওতিমা গ্রীক হওয়া সত্ত্বেও পরদেশে নিক্ষিপ্ত। সুসেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ কবিকে নতুনভাবে নিজেকে গড়ে নেবার সুযোগ দিল। তাঁর কল্পলোকের দিওতিমা এই সুসেট আদর্শগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর দৈহিক কামনার মধ্যে একটা সমন্বয় ঘটিয়ে কবিকে এ-যাত্রা বাঁচিয়ে দিল। এর আগেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে—'আমাদের হৃদয় কোন মানুষকে ভালো না বেসে মানবতাকে ভালোবাসতে পারে না'। হেল্‌ডারলিনের কাছে প্রেম একটি যোগ্য এবং অমর্ত অনুভূতি। মানবিক সর্ব ব্যাপারের মতো এর মধ্যেও পার্থিব অসঙ্গতি এবং স্বর্গীয় সুষমা মিশ্রিত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, প্রেম সম্বন্ধে হেল্‌ডারলিনের ধারণাকে সাধারণভাবে সৌন্দর্য এবং পূর্ণের ধারণার সঙ্গে এক করে দেখা যেতে পারে। তাঁর কাছে—কবিদের হৃদয় সেই পবিত্র আধার, যার মধ্যে সঞ্চিত আছে জীবনরস আর বীরের আত্মার গৌরব'।

১৭৯৮-এর শরতে একটি বিশ্রী ঘটনার পর হেল্‌ডারলিন সুসেট পরিবারের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন

করেন। এর পরেও হুসেটের সঙ্গে তাঁর পত্র বিনিময় হয়েছে এবং তাঁরা গোপনে দেখা সাক্ষাৎ করেছেন। হোমবুর্গে বসবাস করার সময়ে আইজাক ফন্ সিন্‌ক্লেয়ারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। উত্তরকালে ইনি হেল্‌ডারলিনের সবচেয়ে বড় বন্ধু ও সহায়ক হয়ে ওঠেন। ১৭৯৯ সন কবির কাছে এক সংকটপূর্ণ বৎসর বলে মনে হয়। এই সময়ে যদিও তাঁর রচনার স্রোত বয়ে চলেছে তবু এই প্রথম তিনি নিজেকে একজন স্বাধীন লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। জার্মানির শিল্প ও সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে নিজের সাধনাকে মিলিয়ে দিতে তাঁকে কম পরিশ্রম করতে হয় নি। 'ইডুনা' নামে একটি মাসিক আবেদনমূলক পত্রিকা প্রকাশের দ্বারা তিনি বিজ্ঞানকে জীবনের সঙ্গে, সত্যকে আদর্শের সঙ্গে, এক কথায় সভ্যতাকে প্রকৃতির সঙ্গে মালাবদলে বেঁধে এক করে দিতে চাইলেন। হেল্‌ডারলিনের মতে সমাজের প্রতি এই হলো কবির ধার্মিক এবং সাংস্কৃতিক দায়িত্ব। এ-হেন স্বপ্নের বিফলতা এবং শিলেরের কাছে শিক্ষা-জগতের কোন পদের জন্য আবেদন করায় প্রমাণিত হয় যে, সমাজ তাঁর স্বপ্নের সফলতায় বাদ সেধেছে। এই হতাশার ছায়া পড়েছে তাঁর তখনকার রচনায়, চিঠিপত্রাদিতে এবং এম্‌পেডোক্লিসের তিনটি ভগ্নাংশে। 'হাইপেরিয়ন'-এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল ১৭৯৯-তে কিন্তু এই সময় হেল্‌ডারলিন হৃদয়ে প্রবল নিঃসঙ্গতা অনুভব করলেন এবং নিজের সমাজ ও সময় থেকে একটু একটু করে দূরে সরে যেতে লাগলেন।

এর পরে কবির প্রেমাস্পদকালের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা উল্লেখ করি। জিমার কবির মাকে একটি চিঠিতে লিখছেন যে, মাথায় গোলমাল সত্ত্বেও কবিসত্তা এখনো তাঁর মধ্যে সক্রিয়। কেননা আমার বাড়িতে মন্দিরের একটি রেখাচিত্র দেখে তিনি কাঠ দিয়ে ওরকম একটা মন্দির গড়তে বলেন। আমি বলেছি যে, আমার ভাগ্য কবির মতো প্রসন্ন নয় যে অমন মানসিক প্রশান্তিতে নিমগ্ন থাকব, আমাকে বেঁচে থাকার জন্যে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। কবি তখুনি উত্তর দিলেন, হায়, আমি একজন হতভাগ্য।—এই বলে একটি কাঠের ফলকে পেনসিল দিয়ে লিখলেন,—

> The lines of life are various; they diverge and cease like footpaths and the mountains' utmost ends; What here we are, elsewhere a god amends with harmonies, eternal recompense and peace.

হাইপেরিয়ন নিজে একজন গ্রীক যুবক যে তুর্কীদের হাত থেকে নিজের দেশকে মুক্ত করতে চায়। উপন্যাসটি চিঠির আকারে সাজানো। বেশির ভাগ চিঠি জার্মান বন্ধু বেলারমিন ও প্রেমিকা দিওতিমাকে লেখা। নায়কের সবকিছু প্রচেষ্টা এবং আশা-আকাঙ্খা বিফল হয়েছে। দিওতিমা প্রাণ হারাল, হাইপেরিয়নের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা নিষ্ফল হলো, পারিষদরা তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। গ্রীস পরিত্যাগ করে জার্মানি রওনা হলো। মনুষ্যত্বহীনতা এবং অশিক্ষার জন্য নিজের দেশকে দায়ী করে প্রকৃতির মধ্যে সে সান্ত্বনা খুঁজলো। হাইপেরিয়ন জার্মানদের বলছে, 'দারিদ্র্য, ভয় এবং শক্তি তোমাদের বশ করেছে, এর দ্বারা তোমরা বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে হানাহানি করছো। ক্ষুধার নাম দিয়েছো প্রেম, আর যেখানে কিছুই নেই সেখানে তোমাদের দেবতারা বাস করেন। তাঁরাই কি দেবতা আর প্রেম?' হেল্‌ডারলিনের মতে একটি আদর্শ সমাজ সর্বত্রানেই দেবতাদের দেখতে পায়, তাদের সমস্ত কাজেকর্মে, সব প্রতিষ্ঠানে। সেই সমাজে কবির মধ্যবর্তিতায় দেবতা এবং মানুষ কাছাকাছি আসে। পুরোহিতের মত কবি দেবতাদের

সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধি মানুষকে শোনান। বলা বাহুল্য, 'হাইপেরিয়ন'-এর মধ্যে কবির মানসসত্তার বিবর্তনটি পূর্ণভাবে ধরা পড়েছে।

'মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে তখন সে রাজা আর ভাবতে বসলেই পথের ভিখারী'—এই হলো হাইপেরিয়নের মনের জোয়ার-ভাঁটার ইতিহাস, সম্ভবতঃ হেল্ডারলিনেরও মনের কথা। স্বপ্নলোকের আদর্শের সঙ্গে এই জগতের অসঙ্গতিকে মিলিয়ে দেবার চেষ্টায় কবির চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত, দিশাহারা। স্বপ্নকে এই পৃথিবীতে সম্ভব করে তোলা যায় কি না, এই হলো তাঁর একমাত্র জিজ্ঞাসা। ফ্রাঙ্কফুর্টে সুসেটকে প্রথম দেখে যে আশ্বাস তিনি পেয়েছিলেন, সেই বিশ্বাসই নিঃসন্দেহে হেল্ডারলিনের মূল কাব্যপ্রেরণা। 'প্রেমিক-প্রেমিকার স্বপ্ন আর এই জগতের অসঙ্গতির মধ্যে কোন তফাত নেই। বিরোধের মধ্যেই সামঞ্জস্য লুকিয়ে আছে, এবং যাদের বিচ্ছেদ হয়েছে তারা যুক্ত হবে।' হেল্ডারলিনের কাছে তাঁর যুগ গভীর তমসাচ্ছন্ন এবং আলোকোজ্জ্বল দিবসের প্রার্থনার মতো মানুষ নতুন করে দেবতাদের মধ্যে পথ চেয়ে বসে থাকবে। স্বর্গীয় আনন্দ হৃদয়ের গভীরে অনুভব করার জন্য মানুষ নিজেদের তৈরি করুক। কেন না এই নিবিড় পুলক সহ্য করা সহজ নয়। অনির্দেশের পথে বেরিয়ে পড়ুক তারা দেবতাদের সঙ্গলাভের জন্য। স্বর্গীয় উপলব্ধি একমাত্র তারাই বহন করতে পারে হৃদয়ে যাদের বল আছে, নিজেদের সেইমতো সাজিয়ে তুলেছে। এর জন্য চাই কঠোর নিয়মপালন অধিচ্ছেদ ভক্তি এবং গ্রহণ ক্ষমতা। কবিরাই পৃথিবীতে এ-কাজের যোগ্য, খ্রীষ্ট পৃথিবীর বুকে অবতীর্ণ শেষ দেবতা। আসলে হেল্ডারলিনের কল্পনায় গ্রীক দেব-দেবীর অস্তিত্ব এমনই ভাস্বর যে যখনই তিনি কোন গ্রীক দেবতা, কোন নগর বা নদীর কথা লেখেন তার কাছে এরা মূর্তি গ্রহণ করে সামনে এসে দাঁড়ায়। যেন এ-সবকিছুই তাঁর চেনা, নিজের চোখে দেখা, এদের মধ্যেই তিনি এতকাল বাস করেছেন। তাঁর ধারণা, আধুনিক সভ্যতা অসংগতিতে ভরা, কারণ সে এথেন্সের সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে এসেছে। একমাত্র শিল্পী এই প্রভেদ দূর করতে পারে। সে-ই মানুষ এবং প্রকৃতি। দেবতা ও মানুষ, আধ্যাত্মিক আর বস্তুজগতের বিবাদের অবসান ঘটাতে পারে। 'সব-কিছুর সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়াই দেবতাদের প্রাণ ধারণের লীলা, মানুষেরও স্বর্গসুখ তাতে'। দেবতাদের উদ্দেশে পূজা নিবেদন করে হেল্ডারলিন বুদ্ধির আর অনুভূতির পথ ধরে সেই আদি-অন্তহীন মহিমায় পৌঁছতে চেয়েছেন, যাঁর নাম ঈশ্বর।

ভাষা ও সাহিত্য ॥

রবীন্দ্রনাথ

বাংলা দেশের ইতিহাস খণ্ডতার ইতিহাস। পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ, রাঢ় বারেন্দ্রের ভাগ কেবল ভূগোলের ভাগ নয়; অন্তরের ভাগও ছিল তার সঙ্গে জড়িয়ে, সমাজেরও মিল ছিল না। তবু এর মধ্যে যে ঐক্যের ধারা চলে এসেছে সে ভাষার ঐক্য নিয়ে। এতকাল আমাদের যে বাঙালি বলা হয়েছে তার সংজ্ঞা হচ্ছে, আমরা বাংলা বলে থাকি। শাসনকর্তারা বাংলা প্রদেশের অংশ-প্রত্যংশ অন্য প্রদেশে জুড়ে দিয়েছেন, কিন্তু সরকারি দফতরের কাঁচিতে তার ভাষাটাকে ছেঁটে ফেলতে পারেন নি।

ইতিমধ্যে স্বাদেশিক ঐক্যের মাহাত্ম্য আমরা ইংরেজের কাছে শিখেছি। জেনেছি এর শক্তি, এর গৌরব। দেখেছি এই সম্পর্কে এদের প্রেম, আত্মত্যাগ, জনহিতব্রত। ইংরেজের এই দৃষ্টান্ত আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছে, অধিকার করেছে আমাদের সাহিত্যকে। আজ আমরা দেশের নামে গৌরব স্থাপন করতে চাই মানুষের ইতিহাসে।

এই-যে আমাদের দেশ আজ আমাদের মনকে টানছে, এর সঙ্গে সঙ্গেই জেগেছে আমাদের ভাষার প্রতি টান। এমন দিন ছিল যখন বাঙালি বিদেশে গিয়ে আপন ভাষাকে অনায়াসেই পুরোনো কাপড়ের মতো ছেড়ে ফেলতে পারত; বিলেতে গিয়ে ভাষাকে সে দিয়ে আসত সমুদ্রে জলাঞ্জলি, ইংরেজভাষিনী অনুচরীদের সঙ্গে রেখে ছেলেমেয়েদের মুখে বাংলা চাপা দিয়ে তার উপরে ইংরেজির জয় পতাকা দিত সগর্বে উড়িয়ে। আজ আমাদের ভাষা এই অপমান থেকে উদ্ধার পেয়েছে, তার গৌরব আজ সমস্ত বাংলা ভাষীকে মাহাত্ম্য দিয়েছে। বৎসরে বৎসরে জেলায় জেলায় সাহিত্য সম্মেলন বাঙালির একটা পার্বণ হয়ে দাঁড়িয়েছে; এ নিয়ে তাকে চেষ্টিয়ে তুলতে হয় নি হয়েছে স্বভাবতই।

বাংলা ভাষা ভারতবর্ষের প্রায় পাঁচ কোটি লোকের ভাষা। হিন্দি বা হিন্দুস্থানি যাদের যথার্থ ঘরের ভাষা, শিক্ষা-করা ভাষা নয়, সুনীতিকুমার দেখিয়েছেন, তাদের সংখ্যা চার কোটি বারো লক্ষের কাছাকাছি। এর উপরে আছে আট কোটি আটাশি লক্ষ লোক যারা তাদের খাঁটি মাতৃভাষা বর্জন ক'রে সাহিত্যে সভাসমিতিতে ইস্কুলে আদালতে হিন্দুস্থানির শরণাপন্ন হয়। তাই হিন্দুস্থানিকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যবহারের জন্যে এক ভাষা বলে গণ্য করা যেতে পারে। তার মানে, বিশেষ কাজের প্রয়োজনে কোনো বিশেষ ভাষাকে কৃত্রিম উপায়ে স্বীকার করা চলে, যেমন আমরা ইংরেজি ভাষাকে স্বীকার করেছি। কিন্তু ভাষার একটা অকৃত্রিম প্রয়োজন আছে; সে প্রয়োজন কোনো কাজ চালাবার জন্যে নয়, আত্মপ্রকাশের জন্যে।

রাষ্ট্রিক কাজের সুবিধা করা চাই বৈকি, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কাজ দেশের চিত্তকে সরস সফল ও সমুজ্জ্বল করা। সে কাজ আপন ভাষা নইলে হয় না। মেউরিতে একটা প্রদীপ জ্বালানো চলে, কিন্তু একমাত্র তারই তেল জোগাবার খাতিরে ঘরে ঘরে প্রদীপ নেবানো চলে না।

এই প্রসঙ্গে য়ুরোপের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। সেখানে দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, অথচ এক সংস্কৃতির ঐক্য সমস্ত মহাদেশে। সেখানে বৈষয়িক অনৈক্যে যারা হানাহানি করে এক সংস্কৃতির ঐক্যে তারা মনের সম্পদ নিয়তই অদল-বদল করছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ধারায় বয়ে নিয়ে আসা পণ্যে সমৃদ্ধিশালী য়ুরোপীয় চিত্ত, জয়ী হয়েছে সমস্ত পৃথিবীতে।

তেমনি ভারতবর্ষেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষার উৎকর্ষ-সাধনে বিধা করলে চলবে না। মধ্যযুগে য়ুরোপ সংস্কৃতির একভাষা ছিল লাটিন। সেই ঐক্যের বেড়া ভেঙে ফেলে য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা যেদিন আপন আপন শক্তি নিয়ে প্রকাশ পেলে সেইদিন য়ুরোপের বড়ো দিন। আমাদের দেশেও সেই বড়ো দিনের অপেক্ষা করব—সব ভাষা একাকার করার দ্বারা নয়, সব ভাষার আপন আপন বিশেষ পরিণতির দ্বারা।

['বাংলাভাষা পরিচয়' হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত।]

সাহিত্য-সংবাদ

বিশ্বজাগতিকতার চর্চায়……

বিশ্বকবি বলেছেন, "যে সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিন্তভাবে লাভ করতে পারে সে সত্যটি কী। সে সত্য প্রধানত বণিগ্‌বৃত্তি নয়, স্বরাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়, সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা। সেই সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে; বুদ্ধদেব সেই সত্যকে পৃথিবীতে সর্বমানবের নিত্যব্যবহারে সফল করে তোলবার জন্যে তপস্যা করেছেন এবং কালক্রমে নানাবিধ দুর্গতি ও বিকৃতির মধ্যেও কবীর নানক প্রভৃতি ভারতবর্ষের পরবর্তী মহাপুরুষগণ সেই সত্যকেই প্রকাশ করে গেছেন। ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা।"

রবীন্দ্রনাথ-কথিত "বিশ্বজাগতিকতা" আজ একটা দুর্লভ গুণ। ভাবের যে বিশ্বজাগতিকতা, তাকে সমৃদ্ধ করেছিল জ্ঞান এবং কর্ম। ভারতবর্ষের এ নিজস্ব সম্পদ। তাই দেখা যায় গীতা ও উপনিষদের আবেদন ভারতবর্ষের সীমা পেরিয়ে বিশ্বজনের মর্মে পৌঁছেছে। এখনকার মত সাংস্কৃতিক ভাববিনিময় তখনো শুরু হয়নি, তখন জার্মানীভারতবর্ষের মনকে পরম আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিল।

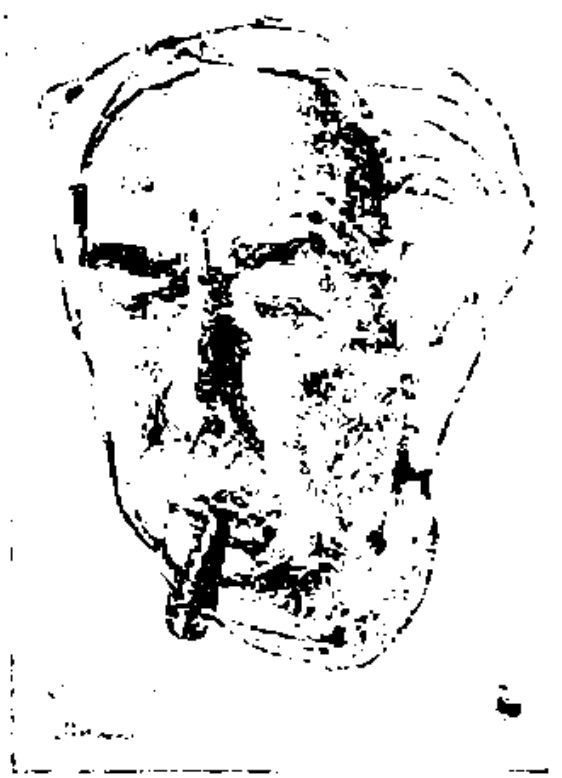

থিওডোর হেস

কিছুদিন আগে একটি বই এবং একটি প্রকাশিত রচনা আমার হাতে আসে। একটি হল, জার্মান ফেডারেল রিপাব্লিকের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট থিওডর হেসের বক্তৃতা-সংগ্রহ। ম্যাক্সমূলার ভবন কর্তৃক প্রকাশিত। আরেকটি হল, ডঃ ক্লাউস ক্রুহ্‌ন কর্তৃক লিখিত 'বর্তমান জার্মানীতে ভারত-তত্ত্বের চর্চা' প্রবন্ধটি। এটি 'ইউনাইটেড এশিয়া' কাগজের ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

থিওডোর হেস একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। নিজ জীবনে তিনি বহু সাহিত্য এবং রাজনীতি বিষয়ক পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। 'বার্লিন একাডেমী পলিটিক্যাল সায়েন্স'-এ তিনি অধ্যাপনা করেছেন। বহু কীর্তিমন্ত থিওডোর হেস ১৯৪৪ সালে প্রেসিডেন্ট পদে ভূষিত হন এবং ১৯৪৯ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৬০ সালের নভেম্বর মাসে তিনি ভারতবর্ষে আসেন। তখন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতবর্ষ ও জার্মানীর মধ্যে চিন্তাবিনিময় বিষয়ে বক্তৃতা দেন। কলকাতা ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণসহ ঐ দিল্লীর ভাষণটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন ম্যাক্সমূলার ভবন।

থিওডোর হেসের ভাষণটি এবং ডঃ ক্লাস্-এর লেখাটি ভারত-জার্মান সাংস্কৃতিক ভাববিনিময় বিষয়ে উৎসুক ব্যক্তিদের উৎসাহ বৃদ্ধি করবে সন্দেহ নেই।

Prof. Helmuth von Glasenapp এ বিষয়টি সম্পর্কে 'ব্রনার' সুলভ দক্ষতা ও ব্যাপক গবেষণাসমৃদ্ধ মন নিয়ে একটি বই প্রকাশ করেছেন। এ বইটি থেকেও জানা যায়,...in spite of initial linguistic inadequacies, Indian thought and literature with their own particular dignity, their religious and didactic content and their artistic forms, have been able in the past 200 years to fascinate and enthrall German mind, to disquiet but to soothe."।

জার্মানীতে রোমান্টিক আন্দোলন যখন খুব জোরদার হ'ল, তখন শুধু নিজের দেশ নয় বাইরে কোথায় ভাষা ও সাহিত্য কীরকমভাবে চলছে সে জানবার আগ্রহ প্রবল স্রোতে বইতে লাগল। বিশেষতঃ, ভারতবর্ষের দিকে চোখ পড়ল সর্বাগ্রে এবং নিদারুণ কুধার্ত হয়ে জার্মান বিশেষজ্ঞরা হেসে পড়লেন ভারততত্ত্বে। ১৮১৮ সনে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারততত্ত্বের অধ্যাপকের পদ খোলা হল। ভারততত্ত্ববিদ August Welhelm Schlegel এ পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯২৭ সনে এ ধরনেরি প্রথমে ছাত্র এবং পরে অধ্যাপক Willibald Kirfel 'পুরাণ' বিষয়ে প্রচুর গবেষণা করে 'পুরাণ পঞ্চলক্ষণ' গ্রন্থটি রচনা করেন। এঁর অনেক আগেই বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ ম্যাক্সমূলার 'ঋক্‌বেদ' সম্পাদনা করেন। তাঁর নাম ভারতবর্ষে এক নামেই সবাই চেনেন। রোমান্টিক আন্দোলনের সময়েই শোপেনহাওয়ার ভক্তি-প্রণতচিত্তে উপনিষদ পাঠে নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন। শোপেনহাওয়ার ভারতবর্ষের দর্শনগুলোর মধ্যে নিজের অন্তরস্থের প্রচণ্ড জ্বালা যন্ত্রণাকে ভুলে থাকবার উপায়ের সন্ধান পান। শোপনহাওয়ারেরই শিষ্য যাঁর নামও ম্যাক্সমূলারের নামের সঙ্গে স্মরণ করা যায় সেই Paul Deussen উপনিষদ ও বেদান্তের সূত্র অনুবাদ করেছেন।

বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিক নীৎসে যদিও পারসিয়ান দর্শনে অনুরক্ত হয়েছিলেন, তবুও তাঁর রচনায় ভারতীয় দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে বহু উক্তি তাঁর রচনাগুলোতে ছড়িয়ে আছে।

থিওডোর হেস বলছেন : 'I myself have been spontaneously and deeply impressed by two of the ancient, classical, Indian writing which, I think, reflect something of India's very essence, Kalidasa's play "Sakuntoala," and the great poem, The Bhagavad Gita"

বহু পূর্বেই জার্মান মনীষী গ্যাটে "শকুন্তলা" পড়ে অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি শকুন্তলার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন :

"Seek I for blossoms of spring and for fruits of the autumn one symbol,
One name for all that enchants or that nourishes, comforts, delights,
One designation embracing both this our earth and the heavens —
Truly, "Sakuntala', thou art the name that embodies all these."

হেস বলছেন, "We have nothing quite like it in German literature." গ্যাটে, তাঁর মতে, 'ফাউষ্ট' রচনা করতে গিয়ে 'শকুন্তলা' দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। গ্যাটের মনে 'বিশ্ব-

সাহিত্যে'র চিন্তা উদয় হয়েছে 'শকুন্তলা' ও 'ভাগবৎ গীতা' পড়ে। হেস মন্তব্য করছেন: If I am not mistaken, it was no less a person than Goethe who used the term, "world literature," not as a plea for a kind of intellectual Esperanto, but as a term signifying the power to express great thoughts appealing to reason and imagination alike!'

আজ জার্মানীতে ভাগবৎ গীতা ও উপনিষদের সুলভ সংস্করণ হু হু করে বিক্রী হচ্ছে।

বিখ্যাত জার্মান সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স ওয়েবার ১৮৯০ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত চিন্তায় জার্মানীকে নেতৃত্ব দান করেছিলেন। তিনি ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক বিষয়ে যে মূল্যবান আলোচনা করেছিলেন, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মকে সে বইটি উৎসর্গ করে গেছেন।

একশ' কুড়ি বাইশ বছর আগে কবি ফ্রেডরিক রুকার্ট "Wisdom of Brahmin" কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। সেটি রচনা করতে গিয়ে ভারতীয় রচনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া আরেকজন বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিক হেরমান হেস প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত, এ ত আজ সুবিদিত তথ্য।

ভারতীয় শিল্পকলা সম্পর্কেও জার্মানীতে প্রবল জিজ্ঞাসার ভাব বর্তমান। থিওডোর হেসের ঘরে যামিনী রায়ের ছবি শোভা পাচ্ছে। এটা ঘর সাজাবার জন্যই রাখা হয় নি। শ্রীরায়ের শিল্পপদ্ধতি সম্পর্কে সেখানে বিশেষ আগ্রহ দেখা দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ আজ জার্মান পাব্লিশারদের কাছে পরমাদৃত। তাঁরা তাঁর বই অনুবাদ করে চলেছেন।

পশ্চিম জার্মানীতে ছয়টি এবং পূর্ব জার্মানীতে দুটি ভারততত্ত্বের অধ্যাপকের পদ রাখা হয়েছে। এ আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দেওয়া হল: বার্লিন, বন, গেটিন্‌জেন, হামবুর্গ, লিপজিগ, মারবুর্গ, মিউনিক, টুয়েবিনজেন।

প্রাচীন ও বর্তমান ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, সাহিত্য, সমাজগঠন প্রভৃতি সব পড়ানো হয় এই আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ইউরোপের মধ্যে জার্মানী ছাড়া এত বেশী ভারততত্ত্ববিষয়ক উৎসাহী ব্যক্তির সংখ্যা অন্য কোথাও নেই। এমন কি ভারতবর্ষেই ভারততত্ত্ব যেভাবে পড়ানো হয়, তার চেয়ে উন্নততর পদ্ধতিতে জার্মানীতে পড়ানো হয়।

অথচ জার্মানী সম্পর্কে সমপরিমাণ আগ্রহ তো নয়ই বরঞ্চ অনাগ্রহের লক্ষণই এখানে সর্বত্র স্পষ্ট। এ ত নিদারুণ লজ্জার কথা। যে বিশ্বজাগতিকতা ভারতের সম্পদ, সে সম্পদ অতীতেরই। এবং সে সম্পদকে বিদেশীরা প্রণতচিত্তে গ্রহণ করেছেন আর আমরা এখন বিশ্বজাগতিকতার থেকে অনেক দূরেই আছি। এ বিষয়ে সচেতন হলে আমাদেরি লাভ বেশী।

—পবিত্র পাল

সমাজ ও সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা ॥

নারায়ণ চৌধুরী ॥

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সমাজ-চিন্তা বিষয়ে আমাদের সাহিত্যে আরও বেশী মাত্রায় আলোচনা হওয়া দরকার। তাঁর সৃষ্টি-কৃতির এই দিকটায় এখনও আমাদের দৃষ্টি তেমন করে পড়ে নি। আমরা কবির সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার পর্যালোচনা করতে বসে যে-পরিমাণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি, তাঁর সমাজচিন্তামূলক রচনাগুলি সম্বন্ধে আমাদের ঠিক ততটাই অনুৎসাহ। অথচ এরকম হওয়ার কোন কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সামগ্রিক বিচার করতে হলে তাঁর সমাজচিন্তামূলক রচনাগুলির প্রতি কোনক্রমেই অমনযোগী হওয়া চলে না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যধর্মের বিবর্তনের তত্ত্বটি ভালোরূপে বুঝতে হলেও আমাদের পক্ষে তাঁর সমাজোন্নয়নমূলক নিবন্ধগুলির সঙ্গে সম্যকরূপে পরিচিত হওয়া আবশ্যক। কেননা মহাকবি যাঁরা তাঁরা তো শুধু কল্পনাতেই বাঁচেন না, সমসাময়িক কালের সামাজিক পরিবেশের তীব্র আলোড়ন-বিলোড়নের মধ্যে বাঁচেন এবং সমসাময়িক জীবন থেকে বিচিত্র উপকরণ আহরণ করে তাঁদের কল্পনাকে পুষ্ট করেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মহাকবি, সুতরাং তাঁর ক্ষেত্রে কবিস্বভাবের প্রতি প্রযোজ্য এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ার কোন কারণ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ খুব উঁচুদরের কবি বলেই খুব উঁচুদরের সমাজ-সচেতন লেখকও ছিলেন।

কবির সমাজচিন্তামূলক রচনায় কতকগুলি স্তর লক্ষ্য করা যায়। প্রথম দিকের রচনায় কবি ঐকান্তিক জাতীয়তাবাদী ছিলেন এবং ভারতবর্ষের ধর্ম ধ্যান ও পুরাতন গৌরবের চিত্রটি তাঁর কল্পনাকে বিশেষভাবে উচ্ছ্বসিত করেছে। প্রাচীন ভারতের শান্তি ঔদার্য ও বৈরাগ্যের আদর্শটি প্রথম দিককার রচনায় তিনি বিশেষভাবে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন তাঁর দেশবাসীর সামনে। ওই আদর্শের প্রচারেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, ওই আদর্শকে স্বয়ং কার্যতঃ রূপায়ণে তিনি সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ই তার প্রমাণ। প্রাচীন ভারতের তপোবন-আশ্রিত গুরু-শিষ্যের সহজ আদান-প্রদানের সম্পর্কটিকে মনে রেখে তিনি ওই সুন্দর আদর্শের ছাঁচে তাঁর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়টিকে রূপায়িত করবার চেষ্টা করেছেন। এই কালে বৃহত্তর ভারতবর্ষ তার অতীত স্বপ্ন কল্পনাসহ কবির চিত্তকে বিশেষ ভাবে অধিকার করেছিল, তখনও বাংলাদেশ তেমন করে তাঁর চিন্তায় পরিমূর্ত হয়ে ওঠে নি। সেটি ঘটেছে আরও কিছু পরে, যখন রবীন্দ্রনাথ ১৯০৫ সনে প্রত্যক্ষতঃ স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হলেন। তখন থেকে বাংলাদেশ শুধু তাঁর গানে নয় কাব্যে নয়, বিচিত্র গদ্য প্রবন্ধাবলীর মধ্যেও বার বার রেখা দিতে লাগল। বাংলাদেশের অযুত সমস্যা প্রশ্ন বেদনা ব্যথা অপমান গ্লানি অভাব অভিযোগ কবির চিত্তদেশকে একান্ত ভাবে অধিকার করে তাঁর লেখনীকে বারংবার নিয়োজিত করল এ সকল সমস্যার কী ভাবে মীমাংসা হতে পারে তার যথাযথ উপায় সন্ধানে। পরাধীনতার জ্বালা যে কী দুর্বিসহ তার মর্মঘাতী বেদনার রূপটি এই কালেই কবির রচনায় বিশেষ করে বাঙ্ময়তি লাভ করল। এরও প্রায় দশ বারো বৎসর আগে কবির বয়স যখন ঊনত্রিশ, সেই সময় তাঁর 'ছিন্নপত্রের' পত্রগুচ্ছের মধ্যে

আমরা একবার দীনদরিদ্র ভক্ত-লাঞ্ছিত বাংলাদেশের ছবি এক-পলক দেখতে পেয়েছিলাম। তারপর অনেককাল অন্য বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের কালেই আমরা দেখলাম স্বদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশ তার মানুষ মাটি জল বায়ু ফল প্রভৃতি সকল প্রকার বিশিষ্টতা নিয়ে কবিকল্পনার কেন্দ্রস্থলটি জুড়ে বসেছে এবং কি গদ্যে কি পদ্যে কবি স্বদেশ-সাধনার আদর্শটিকে দেশবাসীর সমক্ষে বিশেষভাবে প্রবর্তিত করে চলেছেন। এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের স্বরূপজ্ঞানই কবির মুখ্য ধ্যেয় বস্তু; ভারতবর্ষের রূপকল্পনা তখন কতকটা পিছনে পড়ে গেছে। দেশের মাটি বলতে তখন বাংলাদেশের মাটিকেই বুঝিয়েছেন এবং তার 'পরেই মাথা ঠেকাতে চেয়েছেন। বাংলাদেশের শ্যামল আস্তরণের মধ্যেই সেই সময় তিনি বিশ্বময়ীর ও বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা রয়েছে দেখতে পেয়েছেন। কবির এই স্বদেশ-সাধনা তাঁর সামগ্রিক সাধনার একটা বড় দিক; একে অবহেলা করলে তাঁর সাধনার মর্মবস্তুটি হৃদ্‌গত করবার ব্যাপারেও অবহেলা হবে। কবি অবশ্য এই বিশিষ্ট সাধনার অধ্যায়টিতে সুদীর্ঘকাল আবদ্ধ হয়ে থাকেন নি; তিনি তাঁর স্বভাব-অনুযায়ী এই পর্বের বিশিষ্ট ভাব-ভাবনাকে অতিক্রম করে আরও বৃহত্তর ও মহত্তর ভাবলোকে গিয়ে পৌঁছেছেন তাঁর পরবর্তী কাব্যজীবনে।

কবির এই রূপান্তরিত ভাব-বৈশিষ্ট্য যথাসময়ে আমাদের লক্ষ্য করবার অবকাশ হবে। তার আগে এ কথাটা বলে নেওয়া প্রয়োজন যে, কবির মধ্যে স্বদেশ-সাধনার আবেশ—হ্যাঁ, তাকে শ্রেষ্ঠার্থে 'আবেশই' বলব, এ এক প্রকার সতীর ভাব-তন্ময়তা—যতদিন ছিল, ততদিন তিনি কী সোনার ফসলই না ফলিয়েছেন তাঁর কাব্যে গানে ও গদ্যরচনাবলীতে। রবীন্দ্রনাথ একজন শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক। তাঁর এই স্বদেশ-সাধনার ভাব-তন্ময়তার কালটিতেই তাঁর বেশীরভাগ শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্ম হয়েছে। আজকে আমরা তাঁর এই প্রবন্ধগুলি নিয়েই দু'চার কথা বলবার চেষ্টা করব।

স্বদেশী আদর্শের ব্যাখ্যান ও বিশ্লেষণ করে কবি যত প্রবন্ধ লিখেছেন, দেখা যায় তা একটি বিশেষ সময়ের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ। মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে এই পরিধির বিস্তার পনেরো-ষোলো বৎসর। ১৮৯১-৯২ থেকে ১৯০৮ সন পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যেই কবির শ্রেষ্ঠ স্বদেশ-ভাবাত্মক তথা সমাজ-চিন্তামূলক প্রবন্ধগুলি রচিত হয়েছে। 'শিক্ষার হেরফের' (১৮৯২), 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' (১৮৯৩), 'রাজাপ্রজা' (১৩০০), 'অপমানের প্রতিকার' (১৩০১), 'প্রসঙ্গ কথা' (১৩০৫), 'বা দৈঃ' (১৩০৯), 'স্বদেশী সমাজ' (১৩১১), 'রাজভক্তি' (১৩১২), 'বিলাসের ফাঁস' (১৩১২), 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' (১৩১২), শিক্ষা ও সমস্যা' (১৩১৩), 'সাধনা-প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির ভাষণ' (১৩১৪), 'পথ ও পাথেয়' (১৩১৫), 'সদুপায়' (১৩১৫), 'সমস্যা' (১৩১৫), 'পূর্ব ও পশ্চিম' (১৩১৫), প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রবন্ধগুলির রচনাকাল দেখা যাচ্ছে এই সময়ের মধ্যেই বিশেষভাবে বিধৃত। অর্থাৎ যে সময়ে বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ্য করে বাংলাদেশ জাতীয় ভাবের বন্যাপ্রবাহে আলোড়িত-মথিত হয়েছিল, সেই সময়ের কিছু আগে ও পরে এবং মধ্যবর্তী অবস্থাতেই এই প্রবন্ধগুলি রচিত। এর পরেও যে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশীভাবাত্মক প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেন নি তা নয়, কিন্তু দেখা যায়, আস্তে আস্তে এই ভাবটি কবি-কল্পনায় মন্থীভূত হয়ে এসেছে এবং অন্য ভাবের দিকে তাঁর মন ক্রমশঃ আকৃষ্ট হয়েছে। কবির ভাবজীবনের বিবর্তনের পথে একটা সীমারেখা যদি নির্দেশ করতে হয় তো প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের কালকেই সেই সীমারেখা বলে গণ্য করতে হয়। তার আগে ১৯১১ সনে

'গোরা' উপন্যাস রচনার কাল থেকেই কবির মনোজীবনে একটা বিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছে আমরা লক্ষ্য করি। বিশেষ ঘটনা দিয়ে কালচিহ্ন নির্দেশ করতে হলে প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের সূচনাকালের (১৯১৪) উল্লেখ করাই সমধিক প্রশস্ত। এর পরে কবির ভাবনায় সুস্পষ্ট পার্শ্ব-পরিবর্তন ঘটেছে। তখন আর স্বদেশ-সাধনা, বাঙালীর সমাজহিত, ভারতীয়তা প্রভৃতি একান্তভাবে জাতীয় চিন্তা রবীন্দ্রনাথের মনোভূমিকে অধিকার করে নেই; সেখানে অন্য ভাবের বীজ এসে পড়েছে এবং তা ক্রমশঃই অঙ্কুরিত হয়ে চলেছে। কবি জাতীয়তার সংকীর্ণ সীমা থেকে আন্তর্জাতিকতার বিস্তৃততর ও উদারতর প্রাঙ্গণে সমুত্তীর্ণ হবার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। ব্যক্তিমুক্তির আদর্শটি বিশেষ ভাবে এই বিবর্তনের পর্বে তাঁর মনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং একাধিক উপন্যাসে, কবিতায়, নাটকে এবং কখনও কখনও প্রবন্ধে তিনি এই ভাবটির সার্থক শিল্পরূপ দান করেছেন। স্বদেশ-ভাবনার অধ্যায়ে জাতীয়তার আদর্শটিকে জনমনে দৃঢ়প্রোথিত করবার চেষ্টায় কবির কল্পনায় ব্যক্তিকে ছাপিয়ে সমাজ বড় হয়ে উঠেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মত রবীন্দ্রনাথও এই পর্বে সমাজের প্রয়োজনটাকেই বড় করে দেখেছেন; ব্যক্তির প্রয়োজন আশা-আকাঙ্খা দাবি তখনও তাঁর দৃষ্টিসীমার সামনে এসে প্রবলভাবে নিজেকে জানান দেয় নি। ওই যুগে বোধ করি তা সম্ভবও ছিল না। দেশ যখন বিদেশী শাসকের সঙ্গে জীবনমরণ সংগ্রামে নিয়োজিত এবং সমাজের নানাবিধ ত্রুটী-বিচ্যুতি ও গলদের জন্য সেই সংগ্রামে সাফল্যলাভ পদে পদে ব্যাহত হচ্ছিল, সেই সময় সমাজের প্রয়োজনের উর্ধ্বে ব্যক্তির প্রয়োজনকে স্থান দেওয়ার কথা কারও মনে হয় নি। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই কবির মানসিকতায় গুরুতর পরিবর্তন সংসাধিত হয়ে চলল। কবি অনুভব করলেন সমাজের দাবিকে অগ্রাধিকার দিয়ে ব্যক্তিকে খাটো করে রাখলে পরিণামে সমাজেরই অকল্যাণ, কেননা সমাজ ব্যক্তিরই সমবায় মাত্র।

রবীন্দ্র-কল্পনায় এই ব্যক্তিমুক্তির ভাবটি বলা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল থেকেই ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। এই সময়ে প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' পত্রিকার সাহিত্য-আন্দোলনের সঙ্গে কবির সক্রিয় যোগাযোগ ঘটেছিল। তাতে কবির মধ্যে ওই ভাবের আরও স্ফূর্তি ঘটে। কারণ সবুজপত্রেরও মূল বাণী ছিল ব্যক্তিমুক্তি আর চিত্তমুক্তি এবং খুব সম্ভব পত্রিকাটির প্রচারিত এই নবাদর্শ রবীন্দ্রমানসকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে থাকবে। সে যাই হোক, কবির মনোজীবনের ওই প্রকার পরিবর্তনের কারণ যা-ই হোক না কেন, ১৯১৪ সনের কালসন্ধির পর থেকে আমরা লক্ষ্য করলাম কবির ভাব-ভাবনার মধ্যে বড় পরিবর্তন সংশোধিত হয়ে চলেছে। একদিকে চলেছে উত্তরোত্তর আন্তর্জাতিক আদর্শের অনুশীলন, অন্যদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বাণীর শিল্পাশ্রিত প্রচার। নব পর্যায়ের ছোটগল্পে ('স্ত্রীর পত্র', 'রোষ্টমী' প্রভৃতি গল্প স্মর্তব্য,) উপন্যাসে ('চতুরঙ্গ', 'ঘরে-বাইরে' ইত্যাদি) এবং রূপকাশ্রিত নাটকগুলির মধ্য দিয়ে কবি বিশেষভাবে ব্যক্তিমুক্তির আদর্শটিকেই বড় করে তুলে ধরলেন পাঠকসমাজের সামনে। তাই বলে কবির এই ব্যক্তিমুক্তির আদর্শ সমাজহিতবিরহিত নয়, বা বৃহত্তর সমাজহিতের পরিপন্থীও নয়। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেরই শুধু পোষকতা করেছেন; ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারের নয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিঃস্বার্থ হয়ে যদি উন্মার্গগামিতায় পরিসমাপ্তি লাভ করে তো তবে তেমন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অপেক্ষা সমাজবন্ধন অনেক ভাল। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির গুণবিকাশের স্বাধীনতা চেয়েছেন, তার প্রবৃত্তির স্বাধীনতা নয়। চতুরঙ্গের

যামিনী ও শচীশ এবং ঘরে-বাইরের বিমলার পরিণাম লক্ষ্য করলেই আমরা কবির প্রকৃত অভিপ্রায়ের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারব।

যাই হোক, কথা হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-জীবনের একান্তভাবে স্বদেশ-ভাবাবলম্বী অধ্যায়টিকে কেন্দ্র করে। দেশের মঙ্গলের জন্য রবীন্দ্রনাথ কত গভীরভাবে চিন্তা করেছেন তাঁর ওই সময়কার প্রবন্ধগুলিতে তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বিদ্যমান রয়েছে। তার বিখ্যাত 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ এই দিক দিয়ে একটি দিক্-চিহ্নস্বরূপ—রচনাটি কবির সমাজকল্যাণের আন্তরিকতার নিবিড় পরিচয় বহন করছে। পল্লীমঙ্গলের প্রসঙ্গটির উপর প্রাধান্য দান করে প্রবন্ধের এক জায়গায় কবি বলছেন—"আমি এ কথা বলিতেছি না যে সকলেই আপন আপন পল্লীর মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকো, বিদ্যা ও ধনমান অর্জনের জন্য বাহিরে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। যে আকর্ষণে বাঙালি আজটাকে বাহিরে টানিতেছে তাহার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেই হইবে—তাহাতে বাঙালির সমস্ত শক্তিকে উদ্‌বোধিত করিয়া তুলিতেছে এবং বাঙালির কর্মক্ষেত্রকে ব্যাপক করিয়া তাহার চিত্তকে বিস্তীর্ণ করিতেছে।"

কিন্তু এই সময়েই বাঙালিকে নিয়ত স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার যে, ঘর ও বাহিরের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ, তাহা যেন একেবারে উল্‌টাপাল্‌টা হইয়া না যায়। বাহিরে অর্জন করিতে হইবে ঘরে সঞ্চয় করিবার জন্যই। বাহিরে শক্তি খাটাইতে হইলেও হৃদয়কে আপনার ঘরে রাখিতে হইবে। শিক্ষা করিব বাহিরে, প্রয়োগ করিব ঘরে। কিন্তু আমরা আজকাল "ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর, পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।"

'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' প্রবন্ধে নিজের দেশকে ভালো করে জানার প্রয়োজনের উপর জোর দিয়ে এবং ওইরূপ জানাই যে সুশিক্ষার যথার্থ ভিত্তি সে কথাটি বিশেষ প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করে ছাত্রদের উদ্দেশে কবি বলছেন—

"প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত সংস্রব বর্জিত জ্ঞানই বলো, ভাবই বলো, চরিত্রই বলো নির্জীব ও নিষ্ফল হইতে থাকে, অতএব আমাদের ছাত্রদের শিক্ষাকে সেই নিষ্ফলতা হইতে যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশ আমাদের নিকটতম—ইহারই ভাষা সাহিত্য ইতিহাস সমাজতত্ত্ব প্রভৃতিকে আলোচ্য বিষয় করিয়া লইলে প্রত্যক্ষ বস্তুর সম্পর্কে ছাত্রদের বীক্ষণ শক্তি ও মননশক্তি সবল হইয়া উঠিবে এবং নিজের চারি দিককে, নিজের দেশকে ভালো করিয়া জানিবার অভ্যাস হইলে অন্য সমস্ত জানিবার যথার্থ ভিত্তি-পত্তন হইতে পারিবে। ছাত্রেরা কেবল পরের কাছ হইতে শিক্ষা করিবে কিন্তু শিক্ষার বিষয়কে নিজে গড়িয়া তুলিতে পারিবে না এইরূপ ভীরুতা যেন তাদের মনে না থাকে।'

দেখা যায় 'স্বদেশী সমাজের' উৎকলিত অংশের সঙ্গে 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণের' উদ্ধৃত অংশের উপলক্ষ্যের মিল না থাকলেও ভাবের মিল আছে। এই ভাবৈক্য স্বদেশের ঐকান্তিক মঙ্গলকামনা থেকে প্রসূত।

'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে কবি লিখছেন—

"শুনিয়াছি এমন কথাও কেহ কেহ বলেন যে, ইংরেজের প্রতি দেশের সর্বসাধারণের প্রতি বিদ্বেষই আমাদিগকে ঐক্যদান করিবে। এ কথা যদি সত্যই হয় তবে বিদ্বেষের কারণটি যখন চলিয়া যাইবে, ইংরেজ যখনই এ দেশ ত্যাগ করিবে, তখনই কৃত্রিম ঐক্যসূত্রটি তো এক মুহূর্তে ছিন্ন হইয়া যাইবে। তখন দ্বিতীয় বিদ্বেষের বিষয় আমরা কোথায় খুঁজিয়া পাইব। তখন আর দূরে খুঁজিতে হইবে না, বাহিরে যাইতে হইবে না, রক্তপিপাসু বিদ্বেষবুদ্ধির দ্বারা আমরা পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে থাকিব।"

উদ্ধৃত মন্তব্যটি যদিও আজ থেকে ৫৪ বছর আগে রচিত এক প্রবন্ধের অংশবিশেষ, তা হলেও এর অন্তর্নিহিত ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা কী মর্মান্তিকভাবেই না আজ সত্য হয়ে উঠেছে। আজকের ভারতবর্ষের পরিস্থিতি লক্ষ্য করলে দেখতে পাই, রাজ্যে রাজ্যে মনোমালিন্যের অন্ত নেই, কোথাও কোথাও এই মনোমালিন্য আত্মঘাতী কলহের রূপ নিয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যবাসীর মধ্যে অসুস্থ স্বার্থ-সংঘর্ষের প্রতিযোগিতায় পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক আবিল হয়ে উঠেছে। ইংরেজ চলে যাওয়ার পর কোথায় আমরা আরও ঐক্যবদ্ধ হব তা নয়, আমাদের মধ্যে অনৈক্যচেতনাটাই যেন আরও দানা বেঁধে উঠেছে। আমাদের স্বভাবের বিদ্বেষবুদ্ধির মধ্যেই যে এর মূল নিহিত ছিল সে কথা অপ্রিয় হলেও সত্য। ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষবুদ্ধিতে আমরা একতাবদ্ধ হয়েছিলাম, সত্যিকারের স্বাধীনতার স্পৃহা-বশতঃ নয়। গান্ধীজীর অহিংসার আদর্শকেও আমরা গ্রহণ করতে পারি নি। ফলে আজ আবার হিংসা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবার উপক্রম করেছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যে কত বড় সত্যদৃষ্টিসম্পন্ন, শুধু সত্যদৃষ্টিসম্পন্ন নয় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন, আমরা তা আজ উপলব্ধি করতে পারছি।

'অপমানের প্রতিকার' প্রবন্ধে তিনি ১৩০১ সালে লিখেছিলেন—

"বাঙালীর প্রতি বাঙালী কিরূপ ব্যবহার করে সেইটে গোড়ায় দেখা উচিত। কারণ তাহারই উপর আমাদের সমস্ত শিক্ষা নির্ভর করে।...আমাদের সমাজ স্তরে স্তরে উচ্চে নীচে বিভক্ত, যে ব্যক্তি কিছুমাত্র উচ্চে আছে সে নিম্নতর ব্যক্তির নিকট হইতে অপরিমিত অধীনতা প্রত্যাশা করে। স্তরে স্তরে প্রভুত্বের ভার পড়িয়া দাসত্ব এবং ভয় আমাদের মজ্জার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে থাকে। সেই সকল কারণে আমরা যথার্থই মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িয়াছি।"

এই ভাবটিকেই আবার অন্যরূপে তিনি ব্যক্ত করেছেন পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির ভাষণে—

"আমাদের চেতনা জাতীয় কলেবরের সর্বত্র গিয়া পৌঁছিতেছে না। সেইজন্য স্বভাবতই আমাদের সমস্ত চেষ্টা এক জায়গায় পুষ্ট ও অন্য জায়গায় ক্ষীণ হইতেছে। জনসমাজের সহিত শিক্ষিত সমাজের নানা প্রকারেই বিচ্ছেদ ঘটাতে জাতির ঐক্যবোধ সত্য হইয়া উঠিতেছে না। এই ঐক্যবোধ কোনমতেই কেবল উপদেশ বা আলোচনার দ্বারা সত্য হইতেই পারে না। শিক্ষিত সমাজ গণসমাজের মধ্যে তাহাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে প্রসারিত করিলে তবেই আমাদের প্রাণের যোগ সর্বত্র অবাধে সঞ্চারিত হইতে পারিবে।"

কিছুটা পরবর্তী কালের [১৩২১] রচনা 'লোকহিত' নিবন্ধে উচ্চশ্রেণী আর নিম্নশ্রেণীর মধ্যে আমাদের সমাজে যে দুস্তর ব্যবধান রয়েছে তা দূর করবার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে কবি লিখছেন—

"য়ুরোপের প্রজাশক্তিরা যেমনি বলিষ্ঠ হইয়াছে অমনি সেখানকার ধনিকরা অবাবদিহির দায়ে পড়িয়াছে। ইহাতেই দুই পক্ষের সম্বন্ধ সত্য হইয়া উঠিবে।...আমাদের সমাজ যেলোকসাধারণকে শক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছে এইখানেই সে নিজের শক্তিকে অপহরণ করিতেছে।...নিম্নতনদের সহিত ভাল ব্যবহার করা, মানহীনদের সহিত শিষ্টাচার করা নিতান্তই আমাদের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে, অপর পক্ষের শক্তির 'পরে নহে, এই নিরন্তর সংকট হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্যই আমাদের দরকার হইয়াছে নিম্নশ্রেণীদের শক্তিশালী করা।"

এই সমস্ত নানা উদ্ধৃতি ও উক্তি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় কবির দেশের মঙ্গলামঙ্গলের প্রশ্ন নিয়ে কত গভীরভাবে ও কত তলিয়ে চিন্তা করেছিলেন। পল্লীসংগঠন, পল্লীবাসীর স্বাবলম্বন, জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন, শিক্ষায় মাতৃভাষার ব্যবহার, জাতীয় আচার-আচরণ, পাল-পার্বণ প্রথা ইত্যাদির পুনরুজ্জীবন, ব্রহ্মচর্য ও সংযম সাধনা, শিক্ষিত, অশিক্ষিতের ভেদ সংকোচন, শ্রমিক-মালিক বিরোধ, নিম্নশ্রেণীয়দের জাগরণ, কুটির-শিল্পের উদ্ধার, জাতীয় শিল্প-সংস্কৃতির সাধনা, স্বদেশী ব্রত গ্রহণ, রাখী বন্ধন, ভূম্যধিকারীদের ত্রাসবাদ—কত বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ে তিনি যে চিন্তা করেছেন এবং সেই চিন্তার সুফল প্রকাশের প্রয়োজন অনুভব করেছেন তা বলে শেষ করা যায় না। আর শুধু কি বুদ্ধিগত ভাবে চিন্তাই করেছেন, সেই চিন্তা-অনুযায়ী কাজ করবারও চেষ্টা করে গেছেন। শান্তিনিকেতনের পাশে সুরুল গ্রামে শ্রীনিকেতনের গ্রামোন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করে স্বয়ং, হাতে-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন কেমন করে আশপাশের হৃতস্বাস্থ্য শিক্ষাহীন নির্জীব গ্রামগুলিকে উজ্জীবিত করা যায়। গ্রামের স্বাস্থ্য শিক্ষা অর্থনীতি কৃষি সমাজবদ্ধতা ইত্যাদি গ্রামজীবনের সকল দিকই তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। তিনি তাঁর গ্রামসেবার কাজকে আভ্যন্তরিক [intensive] ও বহির্ভূত [extension service] এই দুই প্রকারের কাজে ভাগ করে কাজের মধ্যে একটা সুশৃঙ্খল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিলেন। আজকের গ্রামসংঠনের কাজে সরকারী-বেসরকারী উভয় স্তরে রবীন্দ্রনাথ-প্রদর্শিত এই পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে। সরকারী ব্লকসমূহের কাজ এই নীতির ভিত্তির উপর বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গ্রামসংগঠনের কাজকে শান্তিনিকেতন-সন্নিহিত বীরভূম জিলার একটি বিশেষ সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন এই আদর্শ সমগ্র দেশের অভ্যন্তরে সঞ্চারিত হোক। তাঁর কথা ছিল এই যে, একটিমাত্র গ্রামকে আদর্শগ্রামে রূপান্তরিত করতে পারলে সারা ভারতে তার সুফল পরিব্যাপ্ত হবে। তিনি সেই আশাতেই গ্রামের কাজ করে গেছেন।

শান্তিনিকেতন আর শ্রীনিকেতন—রবীন্দ্র-সাধনার দুই দিক। শান্তিনিকেতনে মনন; শ্রীনিকেতনে কর্মোদ্যোগ। এবং ধ্যান ও কর্ম একত্র মিলনেই যেমন জীবনের পূর্ণতা, তেমনি রবীন্দ্র সাধনারও পূর্ণতা সাধিত হয়েছিল শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের যুগ্ম সমবায়ে। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র-সাধনার চিত্তদেশ, শ্রীনিকেতন বাহু। বাহুর শক্তিকে উপেক্ষিত রেখে অর্থাৎ কর্মসাধনার প্রতি মনোযোগ না দিয়ে চিত্তের সৌকর্যবৃদ্ধির চেষ্টা যে ফলবতী হতে পারে না কবি তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই শান্তিনিকেতনেরই অদূরে গ্রামোদ্যোগের এমন সুন্দর আয়োজন করেছিলেন। রবীন্দ্র-রসিকেরা বিশ্বভারতীর প্রসঙ্গে কেবল শান্তিনিকেতনের কথাই বলেন, কিন্তু শ্রীনিকেতনকে বাদ দিয়ে যে বিশ্বভারতীর চিত্র সম্পূর্ণ হতে পারে না সে কথা আমাদের ভালো করে বোঝা দরকার। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় বিশ্ব ভারতীর এমন খণ্ডিত মূর্তি ছিল না; আমরাই শুধু শিল্প সংস্কৃতি সাহিত্য রমাকলার প্রতি আমাদের অতিরিক্ত পক্ষপাতবশতঃ এবং সর্বপ্রকার কর্মোদ্যোগের প্রতি বাঙালী-সুলভ আমাদের মজ্জাগত বিমুখতাবশতঃ বিশ্বভারতী বলতেই শান্তিনিকেতনকে আমাদের মনশ্চক্ষুর সামনে প্রকট করে তুলি। রবীন্দ্রনাথের জাতিগঠনাত্মক চিন্তাকে আমরা গ্রহণ করি নি, গ্রহণ করেছি তাঁর ললিতাকে মাধুর্যকে ললিতকলার কমনীয়তাকে। ফলে আমাদের রবীন্দ্রোদ্যোগ এক-দেশদর্শী হয়ে উঠছে, কোনমতেই তা সম্পূর্ণতা পাচ্ছে না। রবীন্দ্র-প্রতিভার এই দুইটি দিককে একত্র মেলাতে না পারলে রবীন্দ্র-সাধনা আমাদের জীবনে খণ্ডিত হয়েই থাকবে।

সন্দর্শন ॥

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

ডায়াসের সামনে দু'ধারে দুটি আলপনা আঁকা মঙ্গল কলস। কলস দুটি শুদ্ধ শুদ্ধ চন্দনী গন্ধের ভরতি। শাদা ফুল আর লম্বা লম্বা সবুজ সতেজ ডাঁটা। দুইই দেখতে সুন্দর। ডায়াসের ওপর একটি কাশ্মীরি গালিচা পাতা। সামনে একটি ডেস্ক। তার ওপর এমব্রয়ডারির কাজ করা শাদা ঢাকনি। সভাপতি নবীন প্রধান অতিথি প্রবীণ বয়সী। সুদর্শন না হলেও সবাই বেশ সজ্জিত।

হল ঘরটির মধ্যে ঢুকে নিরঞ্জনের বেশ ভালো লাগল। পরিবেশটি বেশ সুন্দর আর রুচিসম্মত। আবৃত্তি সংঘের যে এত রুচি আছে তার পরিচয় এর আগে পায় নি নিরঞ্জন। পাড়ার কয়েকটি বকাটে ধরনের ছেলে-ছোকরা এই ক্লাবের হর্তা-কর্তা। সারা বছর তাদের অধিবেশন হয় মোড়ের চায়ের দোকানটিতে, কিংবা ঘোষেদের বাড়ির রোয়াকে। বসে বসে রাজা উজির মারে। সরস্বতী পূজার সময় চাঁদার খাতা হাতে বেরোয়। রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সময়েও ওদের খুব তোড়-জোড় দেখা যায়। সভাপতি চাই, বক্তা চাই, আর চাই আর্টিস্ট। চিত্রশিল্পী নয়—সঙ্গীতশিল্পী। নিরঞ্জন হালদার গান বাজনার চর্চা করে বলে সেই সময় পাড়ার ছেলেদের কাছে তার আদর বেড়ে যায়। শুধু নিরঞ্জনের গাইলেই হবে না, বিখ্যাত গায়ক-গায়িকাদের বিনা দক্ষিণায় কি অর্ধ-দক্ষিণায় জোগাড় করে দিতে হবে। নিরঞ্জন কখনো ওদের খুশি করতে পারে, কখনো পারে না। এবারো কয়েকজনের কাছে চিঠিপত্র দিয়েছিল। বোধ হয় সুবিধে হয় নি। কিন্তু যাই হোক এবার ওদের উদ্যোগ-আয়োজনে একটু বৈচিত্র্য আছে। সিনেমা হাউসের দোতলার এত বড় হলটিকে ওরা জোগাড় করেছে। সভাপতি আর প্রধান অতিথিও বেশ খ্যাতনামা। সবচেয়ে ভালো লাগল, ডায়াসটিকে এরা সাজিয়েছে বড় সুন্দর করে।

'এবার উদ্বোধন সঙ্গীত গাইবেন বেতার-শিল্পী শ্রীনিরঞ্জন হালদার। ইনি আমাদের আবৃত্তি ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক। ইনি প্রথমে একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইছেন : 'তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে'।

ডায়াসের নিচে সারি সারি চেয়ার পাতা। নিরঞ্জন কোণের দিকে একটি চেয়ারে বসেছিল। সেখান থেকে উঠে ডায়াসে মাইকের সামনে এসে বসল। তবলচী বাঁয়া তবলা নিয়ে উপস্থিত। নিরঞ্জন একবার তাকিয়ে দেখল, বড় হল ঘরটির মাত্র অর্ধেক ভরেছে, অর্ধেক এখনো খালি। কিন্তু গাইতে গাইতে পরিবেশের কথা সব ভুলে গেল। শুধু ধ্বনি ছাড়া তার কাছে আর কোন কিছুর অস্তিত্ব রইল না।

একটা অনুচ্চ হাততালির শব্দ শোনা গেল। নিরঞ্জন নেমে এল ডায়াস থেকে।

অনুষ্ঠানের 'অ্যানাউন্সার' মাইকের সামনে মুখ বাড়িয়ে বললেন : আমাদের ক্লাবের এবার পাঁচ বৎসর পূর্ণ হল। সেই উপলক্ষে পঙ্ক প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবেন কুমারী শ্বেতা রায়চৌধুরী।

ডায়াসের একপাশে পিতলের একটি লম্বা পিলসুজ। তাতে বড় একটি প্রদীপ। শাদা শাদা পাঁচটি সলতেও আছে।

অনুষ্ঠানের ধরন দেখে নিরঞ্জন নিজের মনেই একটু হাসল। গৌত্তলিকতার ছড়াছড়ি। এদিকে ঘরে বৈদ্যুতিক পাখা চলছে, পাঁচ-সাতটা বাল্‌ব জ্বলছে ষাট-সত্তর পাওয়ারের। আবার দীপ জ্বালানোও চাই।

'কই কুমারী শেতা রায় চৌধুরী—'। মাইকে আর একবার ঘোষণাকারীর তাগিদ শোনা গেল।

হলের ডানদিকে মেয়েরা বসেছিলেন। সেখান থেকে একটি মেয়ে এবার উঠে এল। এসে আস্তে আস্তে মঞ্চের উপর উঠল। জাগৃতি গ্রামের একজন সৌভাগ্যবান সদস্য একটি ছোট্ট জ্বলন্ত মোমবাতি কুমারী শেতার হাতে তুলে দিল। সেই মোমবাতি পদ্ম-প্রদীপে ছুঁইয়ে দিল শেতা। সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক সলতেগুলি অগ্নিশিখা হয়ে উঠল। পিতলের মূর্তি হল সুবর্ণপ্রদীপ। তার আলোয় উদ্ভাসিত একটি সোনার প্রতিমা মুহূর্তের জন্যে দর্শকদের সামনে দাঁড়াল। চোখ ভরে দেখল নিরঞ্জন। এমন রূপ সে আর জীবনে দেখে নি। গৌরাঙ্গী তন্বী দীর্ঘাঙ্গী একটি মেয়ে। নাক চোখ ঠোঁট চিবুক, বুক যেন একখণ্ড শ্বেতপাথর থেকে কুঁদে কুঁদে বার করা হয়েছে। তাই মানিয়েছে ওকে নামটি।

তারপর সেই শ্বেত পাথরের মূর্তি দুটি হাত যুক্ত করে দর্শকদের উদ্দেশে নমস্কার জানাল। নমস্কার তো নয়, এক জোড়া কোমল করকমলের পরম মনোরম মুদ্রা। একটি শতদলের কোরক। আঙুলের লম্বাটে ডগাগুলিও কী সুন্দর। চাঁপার কলি কথাটা পুরনো বহু-ব্যবহৃত। কিন্তু এর চেয়ে ভালো আধুনিক কোন উপমা নিরঞ্জনের মনে পড়ল না। যা মনে এল তা মনঃপূত হল না। হোক পুরনো। রূপ নিজেও কি পুরনো নয়? জাতির বহু প্রাচীন ঐতিহ্য দিয়ে গড়া নয়?

মেয়েটি ডায়াস থেকে এসে ফের সেই মহিলাদের দলে গিয়ে বসল। নিরঞ্জন ইচ্ছা করলেই ফের ওর দিকে তাকাতে পারে। কিন্তু তাতে ঘাড় বাঁকাতে হয়। সেই বক্রতা নিশ্চয়ই অনেকে বাঁকা চোখে দেখবে। চোখ ফেরালেই অনেকের চোখে পড়ে যাবে সে। তার চেয়ে প্রৌঢ় প্রধান অতিথির গোলগাল মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা নিরাপদ। সংস্কৃতির উৎস সম্বন্ধে তিনি যে গুরু গম্ভীর বক্তৃতা করছেন তা শোনা ভালো। কিন্তু শুনতে চাইলেই কি শোনা যায়? শুধু শব্দগুলিই শুনতে লাগল নিরঞ্জন। কিন্তু মাতৃভাষার বহু পরিচিত বহু-শ্রুত এইসব শব্দ তার মনে কোন অর্থ বহন করে আনল না।

শ্রোতারা কিন্তু তাঁকেও হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল। প্রধান অতিথির পর উঠলেন সভাপতি। তিনি ভালো বলতে পারেন না। অল্প কথায় সেরে নিলেন। জাগৃতি কথাটার অর্থ নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলেন। সংঘ জন-জাগরণের সহায়ক হয়ে তার নামকে সার্থক করে তুলবে, এই আশা আর আশীর্বাদ জানিয়ে তিনি ফের আসন নিলেন। তিনিও বাঁচলেন শ্রোতারাও হাঁফ ছাড়ল।

বক্তৃতা শেষ করে দু'জনেই উঠে পড়লেন। জরুরী কাজ আছে। তাঁদের জলযোগ আর পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবার জন্যে সেক্রেটারী সুধাংশু ডায়াস থেকে সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ল। সামনের সারি থেকে আর একজন ভদ্রলোককে তুলে নিয়ে সভাপতির আসনে বসানো হল। অল্প একটু বিশৃঙ্খলা, হৈ চৈ। এই নৈরাজ্যের সুযোগ নিয়ে নিরঞ্জন ডানদিকে একটু মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

মেয়েটি এবার হাতের তালুতে চিবুক রেখে সামনের দিকে তাকিয়েছে। সাধারণত গালে হাত দিয়ে বসা কি চিবুকে হাত দিয়ে বসাটা পছন্দ করে না নিরঞ্জন। তার ছাত্র-ছাত্রীরা অমন করে বসলে ধমক দেয়। কিন্তু থুতনিতে হাত রেখে বসেও মেয়েটি এক অপরূপ ছন্দের সৃষ্টি করেছে। সব মুদ্রাই যেন ওকে মানায়; কোন মুদ্রাই ওর পক্ষে মুদ্রাদোষ নয়। নামের সঙ্গে মেলাবার জন্যেই কি শাদা সিল্কের শাড়ি পরে এসেছে ও? তাতেও বেশ মানিয়েছে। নীল পীত লোহিত যে কোন রং ওকে মানাত। কিংবা আর গাঢ় রঙের যে কোন স্তর এই শ্বেতপ্রস্তর মূর্তির শোভা বাড়াত। গয়না বিশেষ পরে নি। হাতে দুটি বালা আছে। কানে সবুজ পাথর বসানো দুল।

হঠাৎ কাঁধে হাত পড়ায় চমকে উঠল নিরঞ্জন। এই মুহূর্তেই যেন হাতকড়ি পড়বে হাতে।

সেক্রেটারী সুধাংশু একটু হেসে বলল,—'নিরঞ্জনদা, আপনাকে আরো একখানা গান গাইতে হবে। শ্রীপতি মুখার্জী এখনো এলেন না। আসবেন কথা দিয়েছেন, আশাও দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আসবেন। আপনি ততক্ষণ একটু চালিয়ে যান। লক্ষ্মী দাদা আমার।'

নিরঞ্জন বলল—'কিন্তু আমার দ্বারা তো আধুনিক-টাধুনিক হবে না।'

সুধাংশু বলল,—'আধুনিক না হোক অনাধুনিকই চলুক। দ্বিজেন্দ্রলাল অতুলপ্রসাদ, আপনার তো সবই কিছু কিছু চর্চা আছে।'

কিন্তু গাইতে উঠে আরো একখানা রবীন্দ্র-সঙ্গীতই গাইল নিরঞ্জন: 'তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে'। গাইতে গাইতে আশা করল, সুরের পথ বেয়ে এর এই বিশেষ অর্থময় বাণীটুকু আর একজনের প্রাণের তটে গিয়ে পৌঁছবে।

মুক্ত অংশ পূরণের কাজ বেশিটা করতে হল না নিরঞ্জনকে। একটু বাদেই নির্দিষ্ট শিল্পীরা এসে পৌঁছলেন। গানের পর গান চলল। সব শেষে একটি নাটকের ব্যবস্থা আছে। তার জোড় জোড় শুরু হবার আগেই নিরঞ্জন উঠে পড়ল। সবিনয়ে বিদায় নিল আগন্তুক হলের কাছ থেকে। তার আর দেরি করবার উপায় নেই। বাড়িতে ছাত্র এসে বসে থাকবে।

সুধাংশুর সহকারী বিজন বলল,—'এক কাজ করুন নিরঞ্জনদা, কিতীশবাবুদের গাড়ি আছে। ওরা তো, মাত্র দু'জন। আরো একজনকে ওরা বেশ নিয়ে যেতে পারবেন। আপনি তো কলেজ স্কোয়ারের কাছে যাবেন। আপনাকে নামিয়ে দিয়ে ওঁরা চলে যাবেন। ওঁরা যাবেন ভবানীপুর।'

নিরঞ্জন আপত্তি করল না। কিন্তু এই ভবানীপুর যাত্রী কিতীশবাবু যে কে, সে সম্বন্ধে অন্ধকারেই রইল।

হাউসের বাইরে রাস্তার ওপর সারি সারি কয়েকটি গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। একখানা গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল বিজন। পিছনের সীটে দু'জন বসে রয়েছেন। আলো অন্ধকারে তাঁদের মুখ ভালো করে দেখা যায় না।

বিজন বলল,—'মেসোমশাই, নিরঞ্জনদাকে আপনাদের গাড়িতে দিয়ে দিচ্ছি। ওকে কলেজ স্কোয়ারে নামিয়ে দিয়ে যাবেন আশা করি কোন অসুবিধে হবে না। গাড়িতে আপনি আর মেসো ছাড়া তো আর কেউ নেই। উনি সামনের সীটে বসে যাবেন।'

শ্বেতা! সেই দীপান্বিতা! সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অন্ধকার যেন দূর হয়ে গেল নিরঞ্জনের মনে জ্বলেছিল শত প্রদীপ। মনের দেউলে লক্ষ শিখা জ্বলে উঠল।

ক্ষিতীশবাবু বললেন, 'আসুন আসুন। কিসের অসুবিধে! উনি আমাদের গাড়িতে যাবেন সে তো পরম সৌভাগ্য।'

ড্রাইভার সামনের দিকের দরজা খুলে দিল। ক্ষিতীশবাবু বললেন আহা উনিতো ভিতরেই বসতে পারতেন।'

কিন্তু নিরঞ্জন ততক্ষণ সামনের সীটে গিয়ে বসেছে। ক্ষিতীশবাবুর এই আদরটুকু নিছক নাগরিক সৌজন্য হওয়াই স্বাভাবিক বাইরে থাকাই ভালো।

একটু বাদে ভদ্রলোকের গলা শোনা গেল—"তুই-ই বল্‌না। আমি কেন বলব! তুই-ই বল্‌না। নিরঞ্জনবাবু, পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। আমার মেয়ে শ্বেতা। আশুতোষে থার্ড ইয়ারে পড়ে। পড়লে কি হবে। মোটেই আজকালকার ছেলেমেয়েদের মতো নয়। তারি লাজুক। আপনার গান ওর খুব ভালো লেগেছে।"

স্বরবর্ণের একটি শব্দ উচ্চারণ করল নিরঞ্জন—'ও!' আর কী বলবে। বক্তব্যটা নিতান্তই ইংরেজী শিষ্টাচারের অনুবাদ। বলতে ইচ্ছে হয় ধন্য হয়েছি, কিন্তু তাতো আর বলা যায় না।

ক্ষিতীশবাবু বললেন,—"ওরও একটু শখ আছে। গান নয় বাজনা, সেতার একটা কেনা হয়েছে। সপ্তাহে একদিন করে মাস্টারমশাই আসেন। কিন্তু আমার খুব ইচ্ছে নয়। সব একসঙ্গে হয় না মশাই। অনার্সের পড়া সহজ তো নয়। আর ফিজিক্সে ফার্স্ট ক্লাস একটা না পেলে পাওয়ার কোন দামেই হয় না। কী বলুন।"

নিরঞ্জন সায় দিয়ে বলল—'তা তো বটেই।'

গান বাজনা নিয়ে যদি বা একটু আলোচনা জোগা যেত দর্শনের চাপে তা তলিয়ে গেল। ছুটে চলল গাড়ি।

রাস্তার দু'দিকে আলো জ্বলছে। দূরের আলোগুলিকে দেখাচ্ছে একটি মালার মত। এই চিরপরিচিত শহরটি হঠাৎ আজ এত আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কী করে?

ভদ্রলোক সেই যে দর্শনের কথা বলে চুপ করে রইলেন আর কোন কথাই বললেন না। একেবারে নীরব থাকার চেয়ে আধ্যাত্মিক আলোচনাও যে ভালো ছিল। কিন্তু ক্ষিতীশবাবু বোধ হয় ওর মেয়ের মতোই লাজুক। সদ্য পরিচিত কারো সঙ্গে আলাপ জমাতে পটু নন। যেচে কথা বলতে নিরঞ্জনেরও বাধল।

তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে গেল কলেজ স্কোয়ার। বিজাপুরের মোড়। নিরঞ্জন বলল—'এইযে আমি এখানে নামব।'

ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দরজা খুলে দিল। নিরঞ্জন নেমে পড়ে ক্ষিতীশবাবুকে নমস্কার জানিয়ে বলল,—'আপনাদের অনেক কষ্ট হল।'

ক্ষিতীশবাবু বললেন,—'আরে না না, কষ্ট কিসের—এতো আমাদের সৌভাগ্য। আপনার মতো জ্ঞানী ব্যক্তি—। শ্বেতা উনি চলে যাচ্ছেন। বাবার ইশারা পেয়ে কিনা বলা যায় না, মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে

সেই অপরূপ ভঙ্গিতে নমস্কার জানাল—এবার আর জনসভাকে নয়, শুধু একজনকে। তারপর স্মিত মুখে বলল—'একদিন আসবেন। বিজনদার সঙ্গে একদিন আসবেন।'

ড্রাইভার ফের স্টার্ট দিল। গাড়ি ছুটে চলল। নিরঞ্জন অকারণে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মোড়ের মাথায়।

শুধু দেখতে নয় শুনতেও মেয়েটি অনবদ্য। কী মিষ্টি গলা! ও যদি গান গাইত সে গান অনেক গভীর কণ্ঠকে ছাড়িয়ে যেত।

একি শুধু সৌজন্য আর শিষ্টাচার? আমন্ত্রণ জানাল, ঠিকানা দিল না তো! রাস্তার নাম আর বাড়ির নম্বর না দিলেও সঙ্গী একজনকে দেখিয়ে দিয়ে গেছে। তাকে খুঁজে নেওয়া নিরঞ্জনের পক্ষে কঠিন হবে না। যদিও সামান্য পরিচয়, তবু বিজনকেই এই মুহূর্তে পরম স্বজন বলে মনে হতে লাগল নিরঞ্জনের।

মির্জাপুরের মোড় থেকে কানাই ঘর নেবে পুরনো জীর্ণ বাড়িটার দরজা পর্যন্ত নিত্য তিরিশ দিনের অভ্যাসেই নিরঞ্জনকে এনে পৌঁছে ছিল। চারদিকে লক্ষ্য রাখবার জন্যে সময় নষ্ট করতে হল না। দুটি পা ও শরীরকে একটি অপরিচ্ছন্ন সংকীর্ণ গলির মধ্যে ঘরে নিয়ে এল, কিন্তু মনের নাগাল পেল না। মন তখনো রূপতীর্থের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কড়া নাড়তে কল্যাণী এসে দোর খুলে দিল। নিরঞ্জন না আসা পর্যন্ত সামনের ঘর খানায় ও-ই থাকে। কেউ এলে তার সঙ্গে গল্প করে, না হলে গল্পের বই পড়ে।

'ছোড়দা এত তাড়াতাড়ি এলে যে আজ? ফাংশন শেষ হয়ে গেল?'

নিরঞ্জন বলল,—'শেষ হবে কেন? চলছে। নাটক-কাটক হবে। আমি চলে এলাম। আমার ছাত্রটি কোথায়?'

'শিবুর কথা বলছ তো? এতক্ষণ বসেছিল। আমি বিদায় করে দিলাম। বললাম তোমার আসতে অনেক রাত হবে। তারি তো ছাত্র মাইনে দেয় না, কিছু দেয় না। মিছিমিছি তোমার সময় নষ্ট করে যায়। মা বড়দা সবাই গজ-গজ করে। বলে এই সময় একটা টুইশন করলে কাজ হয়।'

নিরঞ্জন চেয়ারটায় বসে পড়ল। একটু হেসে বলল,—'ছেলেটার ভারি আগ্রহ আছে। আর গলাটাও বেশ মিষ্টি।' সঙ্গে সঙ্গে আর একটি গলার কথা মনে পড়ে গেল নিরঞ্জনের।

ঘরের আসবাবও জুড়ে তক্তাপোষ। একদিকে চেয়ার টেবিল। দাদার ছেলে মেয়েরা সেখানে এসে পড়ে। একটা কাঠের শেল্ফ। ওপরের তাকগুলিতে স্কুলের বই। নিচের তাকে একরাশ সাপ্তাহিক পত্রিকা। বাইরের ঘর, তবু তেমন করে গুছিয়ে রাখা যায় না। দাদার ছেলে মেয়েগুলি বড় দুরন্ত। সব তছ-নছ করে দেয়। বউদি রান্নাঘর আর শোবার ঘর ছেড়ে এদিকে বড় একটা আসেনা। কলিও দিন দিন কেমন কুঁড়ে হয়ে যাচ্ছে। এই বারোয়ারী ঘরখানা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবার ওর আর আজকাল তেমন উৎসাহ নেই। আচ্ছা এই ঘরে সেই রূপবতী যদি হঠাৎ এসে পড়ত কী হত? কী ভাবত, কী বলত? তার এই দারিদ্র্যকে কি অবজ্ঞার চোখে দেখত? না কি প্রসন্ন হাসিতে দৃষ্টিতে এই ঘরের রুক্ষ আসবাবগুলির ওপর রূপের তুলি বুলিয়ে দিত? ভাবত কি শুধুই ঘর এমনিই হয়? ওই তানপুরাটি, তাকের ওপর তুলে রাখা যাঁরা তবলা জোড়া কি তার দুটি কালো চোখের প্রসন্ন স্পর্শ পেত? কৌতূহলী হয়ে তাকাত? দু' একটা কথা জিগ্যেস করত যেমন তার কোন কোন ছাত্রী এসে করে।

'হাসছ যে ছোড়দা ?'

তক্তাপোষের ধার ঘেঁষে বসে কল্যাণী তার দিকে তাকিয়ে কী দেখছে। ধরা পড়ে গিয়ে একটু যেন চমকে উঠল নিরঞ্জন। বলল—'যারে, হাসলাম আবার কোথায়।'

কল্যাণী বলল,—'হাসছিলে। স্বীকার না করলে কী হবে। তোমাকে আজ ভারি খুশি খুশি দেখাচ্ছে। গান বুঝি ভালো হয়েছে খুব ? সুখ্যাতি হয়েছে ? আচ্ছা দাদা, আজ মালা-টালা কিছু পাও নি ?'

'না রে, মালা কে দেবে। মালা সভাপতি প্রধান অতিথিদের।'

'যা রে! বিনা পয়সায় গাইয়ে নিলে। একটা মালাও দিতে পারলে না ওরা ? গান গেয়ে আর দরকার নেই তোমার, বক্তৃতা দিতে অভ্যেস কর। কেউ শুনুক আর না শুনুক মালাটা পাবে।'

ফুলের ওপর ভারি লোভ কল্যাণীর। নিরঞ্জন হেসে বলল,—'আচ্ছা ফুল আমি তোর জন্যে কাল কিনে নিয়ে আসব। জানিস কাল, আজকের ওদের প্রোগ্রামে একটু নতুনত্ব ছিল। কে মাথা খাটিয়ে এটা বার করেছে কে জানে। একটি সুন্দরী মেয়েকে ওরা পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাবার ভার দিয়েছিল। দীপ না জ্বালালেও হত। সে নিজেই একটি দীপ। শুধু এই একটি আইটেমের জন্যেই ওদের অনুষ্ঠানটি সার্থক হয়েছে।'

'খুব সুন্দরী বুঝি ?'

নিরঞ্জন বলল—'পরমা সুন্দরী।'

হাসতে গিয়ে দেখল কল্যাণীর মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। কালো অসুন্দর মুখখানাকে আরো কালো দেখাচ্ছে। ঈর্ষায়! সঙ্গে সঙ্গে নিরঞ্জনের মনে পড়ল কারো রূপের প্রশংসা শুনলে কলি ওই রকমই করে। দেখতে ভালো নয় বলে ওর যে বিয়ে হচ্ছে, না হতে দেরি হচ্ছে সে দুঃখ যেন কলি কখনোই ভুলতে পারে না। একটু অপ্রস্তুত হল নিরঞ্জন।

কল্যাণী ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল—'তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে নাও ছোড়দা। খেয়ে নাও। রোজ রাত করে ফের। বউদির বড় কষ্ট হয়। এই নিয়ে সংসারে নিত্য অশান্তি।'

পর্দা সরিয়ে কল্যাণী ভিতরের ঘরে চলে গেল। নিরঞ্জন ভাবল রূপ এত অমূল্য এত অপরূপ এত আনন্দের বস্তু তা কেন সবাইর হল না! প্রকৃতি এত কৃপণ কেন বুঝি ? রূপকে কেন এত দুর্লভ করলে ? কেন এত ক্ষণস্থায়ী করলে ? তাই তো তাকে ঘিরে এত লোভ এত ঈর্ষা এত কাড়াকাড়ি হানাহানি।

ছোট্ট রান্না ঘর। সামনে একটু চাকা জায়গা আছে। সেখানে বউদি আর কল্যাণীর সঙ্গে খেতে বসল নিরঞ্জন। দিনেও সবচেয়ে পরে সে খায়। রাত্রেও খেতে হয় মেয়েদের সঙ্গে। বেশি বেলা হয়ে গেলে অবশ্য বউদি আর কলি খেয়ে নিয়ে তার ভাত বেড়ে ঢেকে রাখে। এগারোটা বেজে গেলে রাত্রেও সেই ব্যবস্থা। আজ অত রাত হয় নি। সবে দশটা। দাদা অফিস থেকে এসে খেয়ে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেছে। শুয়ে শুয়ে পড়বার নাম করে ঘুমুচ্ছে। মা নাতি নাতনিদের নিয়ে আছেন পাশের ঘরে। বুকের ওপর হরিনামের মালাটি রেখে তিনিও বোধ হয় ঘুমে বিভোর।

খেতে বসে বউদি বলল,—'কী, আজ আর কিছু তোমার খাওয়ার দরকার আছে নাকি ঠাকুরপো ?'

বউদি অবশ্যি নাম ধরেই ডাকে। ঠাট্টা করবার সময় বলে 'ঠাকুরপো'।

নিরঞ্জন বলল,—'না, খাবার দরকার নেই মানে ?'

বউদি হাসি চেপে বলল,—'আমি তো ভেবেছিলাম রূপসুধায় পেট ভরে এসেছ। আমাদের গরিবের ভাত ডাল চচ্চড়ির আর জায়গা নেই।'

নিশ্চয়ই কল্যাণী এসে সব বলেছে। বোন যদি যে খোঁচাটুকু নিজে দিতে পারে না তা বউদিকে দিয়ে দেওয়ায়।

খেতে খেতে বউদি বলল,—'কী রকম সুন্দরী, বর্ণনা কর তো শুনি।'

'বর্ণনা করে কী হবে?'

'মানে, আমরা বিশ্বাস করব না এই তো? না কি হিংসেয় ফেটে মরব? তা মরব না। পুরুষ মানুষের ওই দিকেই তো নজর। তোমার দাদাও একখানা কম নাকি? অমনিতে রস-কস নেই। আমার সঙ্গে কেবল পাই পয়সার হিসেব। কিন্তু পরের বউ-ঝির কথা উঠলে চোখ ভাবে ঢুলুঢুলু। ঘরে যারা আছে তারা বাঁদরী, কিন্তু পরের ঝি মাত্রেই পরী।

নিরঞ্জন মৃদু হেসে খেয়ে যেতে লাগল। বউদি অবশ্য কল্যাণীর মতো অত খারাপ দেখতে ছিল না। কিন্তু দুটি ছেলে মেয়ে হবার পরে শরীর একেবারে ভেঙে গেছে। তা ছাড়া সংসারও তেমন স্বচ্ছল নয়। নিরঞ্জনের চাকরি বাকরি নেই। জোটাবার চেষ্টাও করে না। একবার একটা অফিসে ঢুকে দেখেছিল। পোষায় নি। বেরিয়ে এসে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। গানের টুইশন করে। রেডিওতে মাঝেমাঝে প্রোগ্রাম পায়। একটা স্কুলের সঙ্গেও নামটা আছে জড়ানো। কিন্তু সুর-বীথির অবস্থা ভালো নয়। বেতনও অনিশ্চিত। বয়স পঁয়ত্রিশ পেরিয়ে গেছে। মা এখনো একা পেলে দু'একবার বিয়ের তাগিদ দেন। কিন্তু সে তাগিদও যেন ভদ্রতা। তিনি তো জানেন, ভিতরের বাইরের সবাই জানে নিরঞ্জন আর বিয়ে করতে পারবে না। বিয়ের জন্যে যে পরিমাণ ব্যয়ের দরকার হয় তা তার নেই। তা ছাড়া দুটিকে পার করলেও এখনো একটি অনূঢ়া বোন তাদের ঘাড়ে। নিরঞ্জনের আয় যত কমই হোক, দায়িত্ব বোধ। দাদা বরং আশা করেন নিরু নিজের যখন আলাদা কোন খরচ নেই বোনের বিয়ের ব্যয় বহনের জন্যে সেই কাঁধ এগিয়ে দেবে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে একটা সেভিংস একাউন্টও খুলেছে নিরঞ্জন। কিন্তু খুললে হবে কি, উদ্বৃত্ত কিছুই থাকে না। পাঁচ টাকা দশ টাকা আজ যদি জমা রাখে কালই তা তুলে আনতে হয়।

দিনের বেলায় যা বসবার ঘর, রাত্রে তাই শোবার। কল্যাণী এসে বিছানা পাতল, জল রেখে গেল এক গ্লাস, টেবিলের ওপর। যাওয়ার সময় ফিরে তাকিয়ে বলল,—'তোমার আর কিছু লাগবে নাকি ছোড়দা?'

নিরঞ্জন বলল,—'না।'

বউদি আড়াল থেকে ফোড়ন কাটল 'আজ আর কিছু লাগবে না।'

শুয়ে শুয়ে নিরঞ্জন নিজের দারিদ্র্যের কথা ভাবল, অক্ষতিত্বের কথা ভাবতে লাগল। বোনের গায়ে যেমন রূপ নেই, তার নিজেরও তেমনি সম্পদ নেই। পুরুষ যাচে খ্যাতি বিত্ত আর প্রতিপত্তির মধ্যে। এদিক থেকে নিজেকে ঠিক পুরোপুরি জীবিত বলে মনে করতে পারে না নিরঞ্জন। কলেজে যাদের সঙ্গে পড়েছিল তাদের কতজন কতদিকে ছিটকে পড়েছে। একদা সঙ্গীতের চর্চা যাদের সঙ্গে আরম্ভ করেছিল তারাও অর্থে-যশে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। শুধু

নিরঞ্জনই থেমে রয়েছে একটি ক্ষুদ্র বৃত্তের চারিদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে। দাদা তাকে মাঝে মাঝে খোঁচা দেয়: 'তোর কিছু হবে না! তোর উদ্যম নেই উৎসাহ নেই! আসলে পুরুষের যা বড় বল জেদ, সেই জেদ নেই তোর মনে।'

হয়তো তাই। জেদ নেই, প্রতিযোগিতার স্পৃহা নেই। ভূরিলক্ষ্মীর প্রসাদ সে পেয়েও পায় নি। যেটুকু পেয়েছে তাকে বাড়াতে পারে নি, না বাড়িয়েই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করে চলেছে। 'যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে'—এ কথা সব সময় খাটে না। দানও করতে হয়, গ্রহণও করতে হয়, অর্পণও করতে হয়।

বিষণ্ণ মন নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেও পরদিন নিরঞ্জনের ঘুম ভাঙল এক অপূর্ব প্রসন্নতার মধ্যে। ভোরের আলোয় ঘর ভরে গেছে। বাইরে যেন এক বিরাট জাগৃতি স্রোতের কল-কোলাহল। একটু একটু মনে পড়ছে ঘুমের মধ্যে কোথায় যেন চলে গিয়েছিল নিরঞ্জন। চলে গিয়েছিল না কি এই ঘরের মধ্যেই কেউ চলে এসেছিল। তার পায়ের ছোঁয়ায় এই ভাঙা ঘর মণিমুক্তার আলোয় ভরে উঠেছিল। কোথাও চলে যায় নি, এই বাড়িতেই দীপালি উৎসব বসেছিল। ছেলেবেলায় গাঁয়ের বাড়িতে ঠাকুরমা যেমন কয়েক শ' মাটির সুচি ঘরে দোরে কোনে কানাচে সব জায়গায় ছড়িয়ে দিতেন, সন্ধ্যার পর একটু তেল আর একটি সলতের সহস্রদীপ জ্বলত। তেমনি দীপাবলির রাত্রে চলে গিয়েছিল নিরঞ্জন। দীপের পর দীপ যে জ্বালিয়ে চলেছিল সে কিন্তু বুড়ি ঠাকুরমা নয়। অবশ্য ঠাকুরমাও বেশ সুন্দরী ছিলেন। আর তিনিও ছিলেন সর্বত্রগা। তাঁর সেই পাকা চুলের পাকা রঙের কথা এখনো মনে পড়ে নিরঞ্জনের। কিন্তু সেই সেকালের মৃৎ-প্রদীপকে অগ্নিস্পর্শে রত্নদীপ করে তুলেছিল একালের একটি মেয়ে। তার মুখ নিরঞ্জন দেখতে পাচ্ছিল না। কিন্তু সে যে চেনামুখ তাতে তার কোন সংশয়ও ছিল না। সে মুখ বারেকের দেখা হলেও জীবনভোর মনের পটে ধরে রাখবার মুখ। তার পায়ে পায়ে হাঁটছিল নিরঞ্জন, মাঝে মাঝে গায়ে গায়ে ছোঁয়া লাগছিল কিন্তু সেই রূপলক্ষ্মী শুধু দীপের পর দীপ জেলে চলছিল। মুখও ফেরাচ্ছিল না, ধরাও দিচ্ছিল না।

নিরঞ্জন উঠে বসল। আশ্চর্য স্বপ্ন। এই স্থূল বাস্তব জগতে স্বপ্ন এখনো রূপকথার বিস্ময় নিয়ে আসে। কিন্তু সেই বিস্ময়কে খোলা চোখে প্রত্যক্ষ করতে চাওয়ার মতো পাগলামি আর নেই। এই ছত্রিশ বছর বয়সেও সেই অদ্ভুত পাগলামি পেয়ে বসল নিরঞ্জনকে।

অবশ্য কাউকে জানতে দিল না, বুঝতে দিলনা যে সে পাগল হয়েছে। কিন্তু নিজের মনে টের পেল। পাগল কি নিজের পাগলামিকে বুঝতে পারে? বোধ হয় পারে না। কিন্তু নিরঞ্জন তো পুরো পাগল নয়। অন্তত পুরো চব্বিশ ঘণ্টার পাগল নয়। বরং বেশিরভাগ সময়েই সুস্থ প্রকৃতির মানুষ। সে নিজের বয়স সম্বন্ধে সচেতন। বন্ধু-বান্ধব, ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে যে সামান্য সম্মানটুকু তার আছে সেটুকু সে রক্ষা করে চলতে চায়। পুরো পাগল সে নয় ও সাজতেও পারে না। তবু একটা উন্মাদ তার বুকের মধ্যে যেন স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধেছে। সেই উন্মাদ বলে: 'তাকে আর একবার দেখতে চাই'।

কিন্তু সহজে তাকে আমল দেয় না নিরঞ্জন। তার হাত পায়ে সামাজিক রীতিনীতির

পিকল যেরার তাকে যুক্তি বুদ্ধির শাসন আর অনুশাসনে বাঁধে। তবু সেই উন্মাদ কখন যে পিকল ছিঁড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে, তার ঠিক থাকে না। যেমন একদিন তার কাণ্ড দেখে নিরঞ্জন নিজেই অবাক হয়ে গেল।

মোড়ের সেই শস্তা চায়ের দোকানটায় সুধাংশু তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে আড্ডা দিচ্ছিল। নিরঞ্জন গিয়ে তার সামনে দাঁড়াল।

সুধাংশু বলল,—'আরে, আসুন আসুন নিরঞ্জনদা! চা খান এক কাপ।'

'না ভাই এখন চা খাবো না। তুমি বাইরে এসে একটা কথা শুনে যাবে সুধাংশু?'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।'

এক চুমুকে বাকি চা-টুকু শেষ করে সুধাংশু বাইরে এসে দাঁড়াল। লোক চলাচলের রাস্তা থেকে একটু সরে এসে বলল,—'কী ব্যাপার বলুন তো?'

আসল ব্যাপারটা কি সহজে বলা যায়! নিরঞ্জন আরো পাঁচটা কথা এনে তাকে ঢাকতে লাগল। তবে একেবারে যাতে অপ্রাসঙ্গিক না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখল। নিরঞ্জন বলল,—'তোমাদের ফাংশন সেদিন খুব ভালো হয়েছিল।'

সুধাংশু কপালে হাত ছুঁইয়ে বলল,—'যদি কিছু হয়ে থাকে আপনাদের অনুগ্রহে। আপনার ছুটি গানও দাদা খুব চমৎকার হয়েছিল সেদিন। সবাই প্রশংসা করেছিল।'

আরো কয়েক মিনিট লাগল নিরঞ্জনের বিজনের কথায় আসতে। জাগৃতি ক্লাবের টীম-ওয়ার্কের প্রশংসা করল নিরঞ্জন, তার কর্মিদের দক্ষতার সুখ্যাতি করল। এই সব স্তব-স্তুতির পথ ধরে ধরে তবে ছুঁতে পারল বিজনের প্রসঙ্গ।

'আচ্ছা ওই ছেলেটির খবর কি? ওই যে লম্বা মতো, কর্সা চেহারা, খুব ছুটোছুটি করছিল, আরে ওই যে আমাকে যে গাড়িতে তুলে দিল—বিজন না কি নাম'—

সুধাংশু জ্বলে উঠল,—'ও বিজন! বিজন চক্রবর্তী! তার কথা আর বলবেন না নিরঞ্জনদা। এক নম্বরের লোফার। আর ভয়ানক স্বার্থপর। ও এক খানা চীজ। ওর সঙ্গে জাগৃতি ক্লাবের আর কোন সম্পর্ক নেই।'

নিরঞ্জন ঘুরে গিয়ে বলল,—'কেন ব্যাপারটা কি?'

সুধাংশু বলল,—'সে অনেক ব্যাপার। জানেন, কার্ডের এগেনস্টে আমরা তো কিছু কালেকশন করেছিলাম, নইলে খরচপত্র মেটাব কী করে? বিজনের কাছে খান পঞ্চাশেক কার্ড ছিল। তাদের মধ্যে পঁচিশ খানা কার্ডের হিসেব নেই। অন্তত শ'খানেক টাকা দিয়েছে মেরে। আমি হিসেবের কথা বলতে তেড়ে মারতে আসে আর কি। আমিও ছেড়ে দিই নি। বের করে দিয়েছি ক্লাব থেকে।'

রাগটা একটু কমলে সুধাংশু জিজ্ঞাসা করল,—'কেন, ওই হতভাগাটাকে দিয়ে আপনার কী দরকার, নিরঞ্জনদা?'

নিরঞ্জন বলল,—'না না কিছু দরকার নেই, এমনিই জিজ্ঞেস করছিলাম।'

সুধাংশু তবু পিছনে পিছনে এসে খানিকদূর এগিয়ে দিল। বলল,—আপনি আমাদের ক্লাবের আর যে কোন ছেলেকে চান আপনার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি নিরঞ্জনদা। ভূতো আছে, সতীশ আছে, কানাই আছে—প্রত্যেকেই অনেস্ট সিন্‌সিয়ার ওয়ার্কার। তারা আপনার জন্যে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে।'

নিরঞ্জন এতক্ষণে আশ্বস্ত হল। হেসে বলল,—'তার দরকার নেই। এখনকার মতো প্রাণগুলি রাখের জন্যেই তোমার কাছে গচ্ছিত রেখে দাও সুধাংশু। কারো সাহায্যের যদি কোন দরকার হয়, তোমাকে নিশ্চয়ই জানাব। তোমরা পাড়ার ছেলে, তোমাদের কাছে সাহায্য চাইতে কোন লজ্জা নেই।'

সুধাংশু বলল,—'ঠিক বলেছেন। পাড়ার ছেলেরাই ভালো। না জেনে না শুনে আর কোন যে-পাড়ার ছেলেকে আমি আর ক্লাবে ঢুকতে দিচ্ছি নে। চাল নেই, চুলো নেই, আর ওইরকম স্বভাব। ওকি আর কোন ক্লাবে ঠাঁই পাবে?'

নিরঞ্জন মনে মনে ভাবল ভালোই হল। শাপে বর হয়ে গেল তার। বিজনের সঙ্গে দেখা হলেই বা কী হত? নিরঞ্জন কি মুখ ফুটে বলতে পারত,—'আমি যাব তোমার মেশোমশাইর বাড়িতে।'

পথের সেই সাধারণ শিষ্টাচারের ওপর নির্ভর করে নিরঞ্জনের পক্ষে নিমন্ত্রণ রাখতে যাওয়া কি সঙ্গত হত? ভালোই হল বিজনের সঙ্গে দেখা হল না। ভালোই হল নিরঞ্জনের একটি গোপন বাসনা নির্জনে নিরুদ্ধ হয়ে রইল। কেউ কিছু জানতে পারল না।

সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে নিরঞ্জন নিজের কাজকর্মে মন দিল। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে বেশি করে খাটতে লাগল। স্কুলে মাইনে নিয়মিত না পেলেও যদ্দুর স্কুল তো,—তার উন্নতি হলে নিরঞ্জনেরও হয় তো ভবিষ্যতে একটা সুরাহা হয়ে যাবে। ক্লাসিক্যাল গানের চর্চা মাঝখানে ছেড়ে দিয়েছিল। পুরানো ওস্তাদকে সাধাসাধি করে ফের তাঁর কাছে সপ্তাহে একদিন করে যেতে শুরু করল। বয়স হয়েছে, তা হোক। অজরামরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।'

অর্থ, কোন দিন হবে না নিরঞ্জনের, কিন্তু বিদ্যার আকাঙ্খা যেন অনির্বাণ থাকে। রেয়াজের মাত্রা বাড়িয়ে দিল নিরঞ্জন। দুপুর গড়িয়ে যায় তবু তার গলা-সাধা থামে না। বউদি তবু ঠাট্টা করতে ছাড়ে না। সেদিন জলখাবার দিতে এসে বলল,—'কি ব্যাপার নিরঞ্জনবাবু? নতুন জোয়ার এলো বলে মনে হচ্ছে।'

নিরঞ্জন বলল,—'জোয়ার তো লেগেই আছে। তার আবার নতুন পুরনো কি? ভাঁটার টান কবে দেখলে, বউদি?'

সুরমা বলল,—'তা তো বটে। যারা চিরকুমার তারা চিরযুবক। বিয়ে না করলে মানুষ বাসও হয় না, ঠাকুরদাও হয় না,—তার বুড়ো হবারও ভয় নেই। কুমার কার্তিক সেজে চিরকাল থাকতে পারে।'

তারপর জোরে একটু মুখ টিপে হেসে বলল,—'আজকাল কার্তিকবাবুর সাজসজ্জা সত্যিই বেশ একটু বেড়েছে।'

নিরঞ্জন প্রতিবাদ করে বলল,—'মোটেই না। আমি যা ছিলাম তাই আছি।'

সুরমা বলল,—'ঠিক তা নেই। বেশ পারিপাট্য বেড়েছে।'

নিরঞ্জন বলল,—'কি রকম পারিপাট্য শুনি!'

সুরমা বলল,—'আগে আর ময়লা জামাকাপড়ে রাস্তা ঘুরে আসতে পারতে। আজকাল এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়িতে যেতে হলেও তোমার ধোপ দুরস্ত ইস্ত্রি করা পা-জামাটি চাই।'

নিরঞ্জন হেসে বলল,—'আর কিছু আছে ?'

সুরমা বলল,—'আছে বই কি। আগে মেয়েদের মুখের দিকে তাকাতে না। আজকাল কোন কোন ছাত্রীর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকো।'

নিরঞ্জন প্রতিবাদ করে বলল,—'যাঃ, যত বাজে কথা তোমার।'

বলল বটে, কিন্তু নিজের মনে অভিযোগটা একেবারে অস্বীকার করতে পারল না। দুটি ছাত্রী বাড়িতে গান শিখতে আসে। বকুল আর আরতি। প্রথমটি বেশ সপ্রতিভ। কিন্তু দ্বিতীয়টি বেশ লাজুক। মুখের দিকে তাকায় না। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে গান গায়। আজকাল মাঝে মাঝে তার দিকে তাকায় নিরঞ্জন। মনে হয় কোথায় যেন একটু ক্ষীণ সাদৃশ্য আছে সেই দীপান্বিতার সঙ্গে। তা ছাড়া আরতি নামটি এক নতুন অর্থ বয়ে নিয়ে আসে নিরঞ্জনের কাছে। দীপারতি ধূপারতির মতো রূপের আরতি। মেয়েটি কয়েক মুহূর্তের জন্যে সেই আরতি করতেই নেমেছিল। সে আরতির আজও শেষ হয় নি। 'তব অন্তর্ধান-পটে হেরি তব রূপ চিরন্তন।'

কিন্তু শুধু অন্তর্ধান-পটে সেই রূপবতীকে দেখেই তো মন সব সময় শান্ত থাকে না সে আবির্ভাব-পটেও মুহূর্তে মুহূর্তে তাকে দেখতে চায়। নিরঞ্জনের সন্ধানী চোখ তাকে সর্বত্র খুঁজে বেড়ায়। গানের আসরে, সাহিত্য সভায়, ট্রামে বাসে। না, কোথাও সে নেই। নিরঞ্জনকে একবার মাত্র দেখা দিয়েই সে মিলিয়ে গেছে। ফিরে ফিরে মেয়েদের মুখের দিকে তাকাবার এই যে অভ্যাস, এতে সে নিজেই লজ্জিত হয়। ছি ছি ছি, কেউ যদি লক্ষ্য করে—কী ভাববে। কেউ কি কল্পনা করতে পারবে, এ সেই রূপোন্মাদটার কীর্তি ? এ আচরণ সভ্য শান্ত সামাজিক গায়ক নিরঞ্জনের নয় ?

কেউ জানতে পারল না। কিন্তু সেই উন্মাদ নিরঞ্জনকে নিয়ে মাঝে মাঝে নানারকম ছোট ছোট কাণ্ড ঘটাতে লাগল। ছোট, কিন্তু এই সব ঘটনার মধ্যে প্রলয়ংকর অঘটনের বীজ আছে।

একদিন নিরঞ্জন আশুতোষ কলেজের সামনে তার প্রফেসর-বন্ধু বিশ্বজিৎ দাশগুপ্তের হাতে ধরা পড়ে গেল। বিশ্বজিৎ কলেজ থেকে বেরোচ্ছিল। নিরঞ্জনকে দেখে অবাক হয়ে বলল,—'আরে তুমি যে এখানে ? এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করছিলে ?'

নিরঞ্জন বলল,—'কী আবার করব ? একটি ছাত্রকে গান শিখিয়ে ফিরছিলাম—।'

বিশ্বজিৎ বলল,—'তারপর কোন সুর ভাঁজতে ভাঁজতে অন্যমনস্কভাবে এখানে দাঁড়িয়ে পড়েছ। তোমাকে এভাবে চলা ফেরা করতে অনেকদিন দেখেছি। তাই অন্যমনস্ক। একদিন দূর থেকে ডাকলাম শুনতেই পেলে না। চল, কোন্ দিকে যাবে ? না কি ভিতরে যাচ্ছিলে ? কেউ জানা শোনা আছে।'

নিরঞ্জন বলল,—'আরে না না। তুমি ছাড়া আর কে জানাশোনা থাকবে।'

বিশ্বজিৎ বলল,—'তা হলে চল, একটু চা খাওয়া যাক।'

নিরঞ্জন বলল,—'না না, এত বেলায় আর চা না।'

তবু বিশ্বজিৎ তাকে সহজে ছাড়ল না। হাঁটতে হাঁটতে সামনের দিকে এগোতে লাগল। মোড়ের দোকান থেকে পান কিনল, সিগারেট কিনল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বন্ধুর সঙ্গে গল্প করল। আগের মাসে নিরঞ্জন রেডিওতে যে প্রোগ্রাম করেছে তার সুখ্যাতি করল খানিকক্ষণ। তারপর, 'একদিন এসো' বলে বিদায় নিল।

এই সামাজিক বন্ধুবৎসল মানুষটির হাতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দিয়ে নিরঞ্জন সেদিন নিরাপদে এসে পৌঁছল।

তবু বিপদ মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগল। একদিন বিকাল বেলায় রূপচাঁদ মল্লিক লেন দিয়ে হেঁটে আসছিল নিরঞ্জন। বউদির কাকা থাকেন এই গলিতে। তাঁর এক মেয়ের সম্বন্ধ দাদা কোত্থেকে এনে হাজির করেছেন। মহা জরুরী ব্যাপার। বউদির এক হাত-চিঠি নিয়ে নিরঞ্জনকে আসতে হয়েছিল। চিঠিটা পোস্ট করলেই হয়। কিন্তু একদিনও নাকি সময় করবার উপায় নেই। বেকার যখন আছে নিরঞ্জন। সেই লিখনের কাজটা করে আসুক। বউদি অনেক কাকুতি-মিনতি করে বলেছিল—'আহা, তুমি তো ওদিকে গান-টান শেখাতে যাওই। একটু এগিয়ে গিয়ে চিঠিটা দিয়ে আসবে। আর মুখেও বলে আসবে কাকাকে। তিনি যেন তোমার দাদার সঙ্গে আজই দেখা করেন।'

তারপর একটু হেসে বলেছিল,—'এসব পুণ্য কাজ-টাজ একটু করো, ফল পাবে। বলা যায় না, কোত্থেকে রঙীন প্রজাপতিটি উড়ে এসে তোমার কাঁধে বসে পড়বে, আর সঙ্গে সঙ্গে—।'

বাড়ির নম্বরটা বউদি ভুলে দিয়েছিল। তাই একটু খুঁজে খুঁজে বার করতে হল। বউদির কাকার হাতে চিঠিটা দিয়ে চলে আসছিল, তিনি কিছুতেই ছাড়লেন না। চা আর মিষ্টি খাইয়ে দিলেন।

নিরঞ্জন নমস্কার জানিয়ে বলল,—'তা হলে চলি।'

বউদির কাকা বললেন,—'চলবেন তো। আকাশে যা মেঘ! বৃষ্টি বোধ হয় এসে পড়বে। সেরে যেতে পারবেন, না কি একটা ছাতা দেব?'

নিরঞ্জন বলল—'না না ছাতা টাতা লাগবে না, এই তো কাছেই ট্রাম লাইন।'

কিন্তু মেঘের মর্জি বউদির কাকাই ভালো জানেন। কয়েক পা এগোতে না এগোতেই বৃষ্টি নেমে পড়ল। রোয়াক ওয়ালা শাদা একটা বাড়িতে নিরঞ্জন তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। একটু পুরানো ধরনের বাড়ি। কিন্তু বড় সুন্দর দেখতে। বাইরে একটি নেম-প্লেট লাগানো আছে। কে. পি. রায় চৌধুরী। হঠাৎ নিরঞ্জনের মনে হল, এইটাই ক্ষিতীশবাবুর বাড়ি নয় তো! তাঁরা তো ভবানীপুর অঞ্চলেই থাকেন, বিমল বলেছিল। বলা যায় না, ভাগ্য হয় তো এতদিন পরে তাঁকে ঠিক সুযোগটি এনে দিয়েছে। বাইরে রুপালি বৃষ্টি। রাস্তার নাম রূপচাঁদ মল্লিক লেন। শাদা রঙের বাড়ি। বারান্দায় টবে শাদা গোলাপ। নিশ্চয়ই এই সেই সুখেতারা শুভ্র নিকেতন। নিরঞ্জনের মনে অপূর্ব যুক্তি পরম্পরার সৃষ্টি হল।

কড়ায় হাত রাখতে গিয়ে হাত কাঁপতে লাগল নিরঞ্জনের। কিন্তু নাড়তে হল না। তার আগেই বৃষ্টি দেখবার জন্যে ছোট ছোট দুটি ছেলে বেরিয়ে এল। তারাও দেখতে বেশ সুন্দর। ফুট ফুটে চেহারা।

তারা বলল,—'আপনি ভিজছেন কেন। ভিতরে এসে বসুন না।'

নিরঞ্জন আরো ভরসা পেল, আরো নিঃসংশয় হল। একটু হেসে বলল,—'আচ্ছা তোমাদের একটা কথা জিজ্ঞেস করি, এটা কি ক্ষিতীশ রায় চৌধুরীর বাড়ি?'

দুটি ছেলের মধ্যে যেটি বয়সে বড়, সে বলল,—'না না, এ বাড়ি আমার দাদুর। তাঁর নাম কালিকাপ্রসাদ রায় চৌধুরী।'

নিরঞ্জন নিভে গিয়ে বলল—'ও'। আচ্ছা ক্ষিতীশবাবু বলে কি কেউ থাকেন এখানে?

'না তো।'

নিরঞ্জন তবু ভরসা ছাড়ল না। সে পা টিপে টিপে সন্ধান করতে লাগল—'আচ্ছা, এদিকে অন্য কোন বাড়িতে থাকেন তিনি? যাঁর খুব ফর্সা আর সুন্দরী একটি মেয়ে। কলেজে পড়ে।'

তখন দুই ভাইয়ের মধ্যে ঘোরতর তর্ক হল। একজন বলল,—'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে তেতলা বাড়িটা। ওই যে মোটা মতো ভদ্রলোক, খপ খপ করে চলেন। তাঁর নামই তো ক্ষিতীশবাবু।' আর একজন বলল,—'তুই ঘোড়ার ডিম জানিস। তাঁর নাম মোটেই ক্ষিতীশবাবু নয়। তাঁর নাম করালীবাবু।'

তার দাদা বলল,—'রাখ বাজি। আচ্ছা বৃষ্টি থামুক। আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন। আমরা তাঁর নাম জেনে দেব। অনেক মেয়ে আছে এ পাড়ায় কলেজে পড়ে।'

শেষ কথাটায় গালে চড় পড়ল নিরঞ্জনের। ছি ছি ছি। ছি ছি ছি। এই যদি কোন বয়স্ক লোক হতেন কী ভাবতেন! নিতান্তই আট-দশ বছরের ছেলে বলে নিরঞ্জন রক্ষা পেল। নইলে এখানেই হয় তো বিদ্রূপ পরিহাস লাঞ্ছনা অপমানের চূড়ান্ত হয়ে যেত।

বৃষ্টি থামবার আগেই নিরঞ্জন রাস্তায় নেমে পড়ল। ভিজতে ভিজতে উঠল গিয়ে বাসে। এই তার উপযুক্ত শাস্তি। আচ্ছা কঠিন শাস্তি দেওয়া উচিত উন্মাদটার। তাকে আর এই শহরের রাস্তায় ছেড়ে দিতে পারে না নিরঞ্জন। সেই উন্মত্তকে ঘরের মধ্যে সত্যিই লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে।

রাখলও তাই বেঁধে। কিন্তু সেই বাঁধা অবস্থাতেই সে এক কাল্পনিক জগতে অবাধে চলাফেরা করতে লাগল। একবার ব্যর্থ হয়েছে বলে কি সে বার বারই ব্যর্থ হবে? প্রত্যেকটি বাড়ির কড়া নেড়ে নেড়ে জিজ্ঞেস করলেও কি তার খোঁজ পাবে না? ক'বছর লাগবে? পাঁচ বছর? দশ বছর?

দশ বছর অবশ্য লাগল না। দু'বছরের মাথায় বিজন নিজে এসে নিরঞ্জনের বাড়িতে এসে হাজির হল।

'চিনতে পারছেন, নিরঞ্জনদা? আমি বিজন চক্রবর্তী।'

নিরঞ্জন বলল,—'চিনেছি। কী খবর তোমার?'

খবর ভালো। বিজন এখন কসবায় থাকে। সেখানে সে আলাদা ক্লাব করেছে। নাম সংস্কৃতি চক্র। তার সেক্রেটারী বিজন নিজে। জাগৃতি ক্লাবের চেয়ে অনেক বড় এই ক্লাব। সদস্য সংখ্যা অনেক বেশি। ক্লাবের ইনকাম, প্রভাব প্রতিপত্তি যে কী রকম নিরঞ্জনদা নিজেই গিয়ে দেখতে পাবেন। একজন রিটায়ার্ড জজের বড় একটা হল ঘর পেয়েছে তারা। সামনের শনিবার সেখানেই অনুষ্ঠান হবে। নিরঞ্জনকে না গেলেই চলবে না। যেতেও হবে, গাইতেও হবে। গাড়িতে করে নিয়ে যাবে বিজন, গাড়িতে করেই পৌঁছে দিয়ে যাবে। নিরঞ্জনের কোন অসুবিধেই হবে না।

খানিকটা ওজর আপত্তির পর নিরঞ্জন খানিকটা রাজী হয়ে গেল।

অনুষ্ঠানের দিন গাড়ি নিয়ে বিজন অবশ্য নিজে এল না। একটি ছেলেকে চিঠি দিয়ে পাঠাল। পথে গাড়িতে আরো কয়েকজন উঠলেন। হয় তো সভাপতি, প্রধান অতিথি এবং উদ্বোধকও এঁদের মধ্যে আছেন। ওঁদের সঙ্গে নিরঞ্জনকে কেউ আলাপ করিয়ে দিল না। তার নিজের মনেই আলাপ চলতে লাগল। এতটা যখন যোগাযোগ হয়েছে আর একটা শুভসংযোগ কি ঘটবে না? সেই দীপান্বিতার হাতে আবার কি রূপের প্রদীপ জ্বলে উঠবে না? বিশেষ করে বিজন যখন এখানে আছে, তার সেই আত্মীয়াটিকে কি সে না এনে ছাড়বে?

কিন্তু নিরঞ্জন দেখে হতাশ হল, এবার সেই দীপ আলবার ব্যবস্থাটি নেই। শুধু তাই নয়, সভায় যে সব পুরাজনা বয়াজনা রয়েছে, তাদের মধ্যে সেই মেয়েটিকে কোথাও চোখে পড়ল না। সংস্কৃতি সঙ্ঘের বিবরণ পাঠ করা হল, উদ্বোধক বক্তৃতা দিলেন। তারপর প্রধান অতিথি, সভাপতি একে একে বলে চললেন। এঁদের এখানে গানের চেয়ে বক্তৃতার অংশেই বেশি লোক উসখুস করতে লাগল। গান মাত্র দু'জনের। একটি মহিলা গাইলেন। শোনা গেল তিনি জজ সাহেবের পুত্রবধূ। তারপর নিরঞ্জনকে পর পর খান তিনেক গান গাইতে হল।

সভা ভাঙল নটায়। বিজন খুব কৃতজ্ঞ। নিরঞ্জনের সামনে এসে বলল, দাদা, আপনিই আমাদের মান রাখলেন। আর কেউ মান রাখে নি। দেখুন তো কাণ্ড।'

গাড়ি করে বিজনই নিরঞ্জনকে পৌঁছে দিতে চলল। আরো দু'জন ছিলেন সঙ্গে। তাঁরা গড়িয়াহাটার মোড়ে নেমে গেলেন। এবার বিজন একা।

সংস্কৃতি চক্রের সুখ্যাতি করতে করতে হঠাৎ নিরঞ্জন জিজ্ঞেস করে বসল,—'আচ্ছা, তোমার সেই মেসোমশাইকে এবার দেখলাম না তো?'

'কোন্ মেশোমশাই?'

নিরঞ্জন বলল,—'ওই যে সেই কিতীশবাবু না কি নাম?'

বিজন হেসে বলল,—'ও, আপনার মনে আছে দেখছি।' জানেন, ওঁরেও মনে আছে। আপনার গান-টান মাঝে মাঝে শোনে তো রেডিওতে। সেদিন বলছিল আপনার কথা।'

কী বলছিল তা শুনবার দরকার নেই। বলছিল, এই সুখ-সংবাদটুকুই নিরঞ্জনের কানে অমৃত বৃষ্টি করল। নিরঞ্জন বলল,—'ওঁদের এই সভায় আসতে বা কেন?'

বিজন বলল,—'আসব কি! মেসোমশাইর বড্ড অসুখ। হাই ব্লাড প্রেসার। বাথরুমে একদিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। সেই থেকে প্যারালিসিস। একেবারে শয্যাশায়ী। বিদেশী মার্চেন্ট অফিসে কাজ করতেন। বেশ ভালো চাকরি। এখন ছুটিতে আছেন। মাইনে-টাইনে পাচ্ছেন কিনা, কে জানে? বড্ড ভালো মানুষ। আর আমাকে খুব ভালবাসেন। আপন মেসোমশাই নন। কিন্তু দেখলে মনে হবে না যে পর।'

নিরঞ্জন বলল,—'তুমি বুঝি খুব যাও টাও?'

বিজন বলল,—'কই আর যেতে পারি? নিজের চাকুরি আছে, সংসার আছে, তারপর এই সংস্কৃতি চক্র ঘাড়ে পড়েছে। ক'দিক সামলাই বলুন।'

নিরঞ্জন বলল,—'তা বটে।'

হঠাৎ বিজন বলল, চলুন না আজ যাই। পথেই পড়বে। এই বেণীমাধব স্ট্রীটে থাকেন ওরা। চলুন না! মিনিট পাঁচেকের বেশি দেরি হবে না। যাব আর আসব।'

নিরঞ্জন অস্ফুট স্বরে বলল,—'চলো।'

গাড়ি কোন্ পথ দিয়ে এগোতে লাগল, নিরঞ্জন লক্ষ্য করল না। বিজন মাঝে মাঝে আরো যেন কী বলে চলল, নিরঞ্জনের অর্থ বোধ হল না। নিরঞ্জনের মন বলতে লাগল—'অবশেষে, ভাগ্য আর একবার তাকে দেখতে দিল।'

গাড়ি থামল গলির মধ্যে একটা দোতলা বাড়ির সামনে। বিজনের সঙ্গে সরু সিঁড়ি বেয়ে

উঠতে উঠতে হুদপিণ্ডের শব্দ শুনতে লাগল নিরঞ্জন। তারও কি প্রেসার বেড়েছে না কি, সেও ওষুধযোগ্য।

কড়া নাড়তেই বারো-তের বছরের সুদর্শন একটি ছেলে দরজা খুলে দিল। বলল, বিজন দা! সঙ্গে উনি কে?'

বিজন বলল—'বলছি। শ্বেতাকে আর তোমার মাকে খবর দাও। আমরা বসছি ও-ঘরে। ভালো কথা মেসোমশাই কেমন আছেন বাবলু?'

ছেলেটির মুখ একটু ম্লান দেখাল। বলল 'বাবা সেই একই রকম আছেন, এখন ঘুমোচ্ছেন। ডাক্তার বেশি ডিস্টার্ব করতে নিষেধ করে দিয়েছেন।'

বিজন বলল,—'না না, আমরা তাঁকে ডিস্টার্ব করব না। আমরা এখুনি চলে যাব।'

ছোট্ট বসবার ঘর। খান ছয়েক সোফা, মাঝখানে নিচু সেন্টার টিপয়। একধারে কাঁচের আলমারিতে খানকয়েক রবীন্দ্র-রচনাবলী, দু'খণ্ড গীতবিতান।

'এই যে ওরা এসেছেন।'

বিজনের কথায় চমকে উঠে সামনের দিকে তাকাল। পিছনে একজন ম'হলা। সামনে সেই মেয়েটি। কিন্তু এ কি সত্যিই সেই? যাকে ভিতরে বাইরে এই দু'বছর ধরে নিরঞ্জন খুঁজে বেড়িয়েছে, তার সঙ্গে তো এর মোটেই মিল নেই। আটপৌরে আধময়লা একখানা শাড়ি পরনে। রোগাটে চেহারা। গাল দু'টি কেমন ভাঙা ভাঙা। বলে না দিলে চিনবার উপায় ছিল না এ সেই শ্বেতা।

নমস্কার বিনিময় করে শ্বেতা বলল,—'কেমন আছেন?'

বিজন তার মাসিমার সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিল। একটু বাদে বলল,—মাসিমা শ্বেতার চেহারাটা তো বড্ড খারাপ হয়ে গেছে দেখছি।

তিনি বললেন,—'চেহারার আর দোষ কি বাবা। আজ দু'মাস ধরে সমানে রাত জাগছে। সেবা-শুশ্রূষা ওই তো সব করে। শ্বেতা ছাড়া ওকে ওষুধটুকু পর্যন্ত কেউ খাওয়াতে পারে না। এমনি মেজাজ। তার পর বাইরের ঝামেলাও তো সব ওকেই সামলাতে হয়। ডিসপেনসারি, এখানে ওখানে ছুটোছুটি সব ওই এক হাতে। আর তিনটিই তো ছোট ছোট। ভরসা করে রাস্তায় ছাড়তে পারি না।

বিজনের মাসিমা চায়ের জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু নিরঞ্জনের হয়ে সেই বলল,—'না মাসিমা। আজ আর সময় নেই। আর একদিন বরং—।'

নিরঞ্জন উঠে দাঁড়াল। আর একবার নমস্কার বিনিময়। আর একটু কৃত্ অনুরোধ!—আ'র একদিন আসবেন।'

বিজনের পিছনে পিছনে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে নিরঞ্জন ভাবল,—'এবারের দেখা সেবারের মত নয়। তবু ওকে আজ এভাবে না দেখলে পুরোপুরি দেখাটা বাকিই থেকে যেত।'

বিজন নামতে নামতে মুখ ফিরিয়ে বলল,—'দেখে নামবেন নিরঞ্জনদা। একটা ফল্‌স্ স্টেপ আছে।'

বিশ্ব
ব্যঙ্গ
চিত্র

হেরাল্ড ট্রিবিউন'-এর প্যারিস সংস্করণ এবং রোমের 'রোম ডেইলী আমেরিকানে'ও তাঁর আঁকা কার্টুন নিয়মিত বেরোয়। পশ্চিমী দুনিয়ায় হারব্লক সর্বশ্রেষ্ঠ না হলেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ কার্টুনিস্ট তো বটেই।

হারব্লকের আঁকা কার্টুন একাধিকবার আমেরিকায় পুরস্কৃত হয়েছে। ১৯৪৩, ৫৩ এবং ৫৪ সনে বিভিন্ন পুরস্কার লাভ করেন। এর মধ্যে ৫৩ সনে উনি পুলিটজার পুরস্কার পান। এ পুরস্কারের আর্থিক মূল্য প্রায় আড়াই হাজার টাকা।

কার্টুনিস্টের আসল শক্তি শুধু ছবি আঁকার মধ্যে সীমিত নয়। যে ধারণা বা 'আইডিয়া'র ওপর ছবিটা আঁকা হচ্ছে সেইটেই হচ্ছে আসল কথা। এই আইডিয়ার দৈন্যের জন্যে অনেক কার্টুনিস্ট ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু 'হারব্লক' ঠিক এই আইডিয়ার জন্যেই প্রত্যহ শত শত চিঠি এবং টেলিফোন পেয়ে থাকেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পাঠকের কাছ থেকে। সকলেরই এক প্রশ্ন: মশাই, চমৎকার এঁকেছেন, এত আইডিয়া আপনি পান কোত্থেকে?

হারব্লক সরলভাবে সত্যি কথাটা জানিয়ে দেন সবাইকে: আইডিয়া পাই কোত্থেকে বলছেন? কেন, আইডিয়ার অভাব কি, খবরের কাগজ, রেডিও— যখনই যে কোনো সূত্র থেকে খবর পেতে থাকি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আইডিয়া সৃষ্টি হয়ে যায় মনে মনে।

আমেরিকার শিকাগো নগরীর একজন কেমিষ্টের ছেলে হারব্লক বছর দুই কলেজে পড়বার পর হঠাৎ একদিন দেখা গেলো পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে খবরের কাগজে চাকুরী নিয়েছেন, কার্টুনিস্টের চাকুরী। কিছুদিন পরেই এ চাকুরীটা ছেড়ে ১৯৩৩ সালে আমেরিকার নিউজপেপার এন্টারপ্রাইজ এ্যাসোসিয়েশনের চাকুরী নিলেন। দশ বছর চাকুরী কালে হারব্লক যে সমস্ত কার্টুন এঁকেছেন এক সময় দেখা গেছে তা প্রায় সারা দেশের ৭০০ খানা সংবাদপত্রে ছাপা হচ্ছে। এরপর দু'বছর 'হারব্লক' আমেরিকার সামরিক বিভাগের পত্রিকা 'ইয়াঙ্কে' কার্টুন এঁকেছেন।

আজ পর্যন্ত কয়েক সহস্র কার্টুন এঁকেছেন হারব্লক। এর বহু কার্টুন ছাপা হবার দীর্ঘদিন পর্যন্ত রসিকজনের আলোচনার বিষয় হয়ে থাকে। হারব্লকের আঁকা দু'খানা কার্টুন ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। একখানা হলো ব্রিটিশ প্লেন। অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মান অধিকৃত ফ্রান্সের আকাশে ব্রিটিশ প্লেন। কার্টুনটিতে দেখা যাচ্ছে: একজন জার্মান সৈনিক মাথার ওপর ব্রিটিশ প্লেন দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে আর একজন ফরাসী নাগরিক মৃদু হাসছে তার অবস্থা দেখে। দ্বিতীয় কার্টুনটি হলো স্টালিনের মৃত্যুর ওপর। একটা কালো আবরণের ভেতর থেকে মৃত্যু বলছে: জোসেফ, তুমি তো অনেকদিন থেকেই আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

॥ বিশ্ব-ব্যঙ্গচিত্র ॥

ভারত

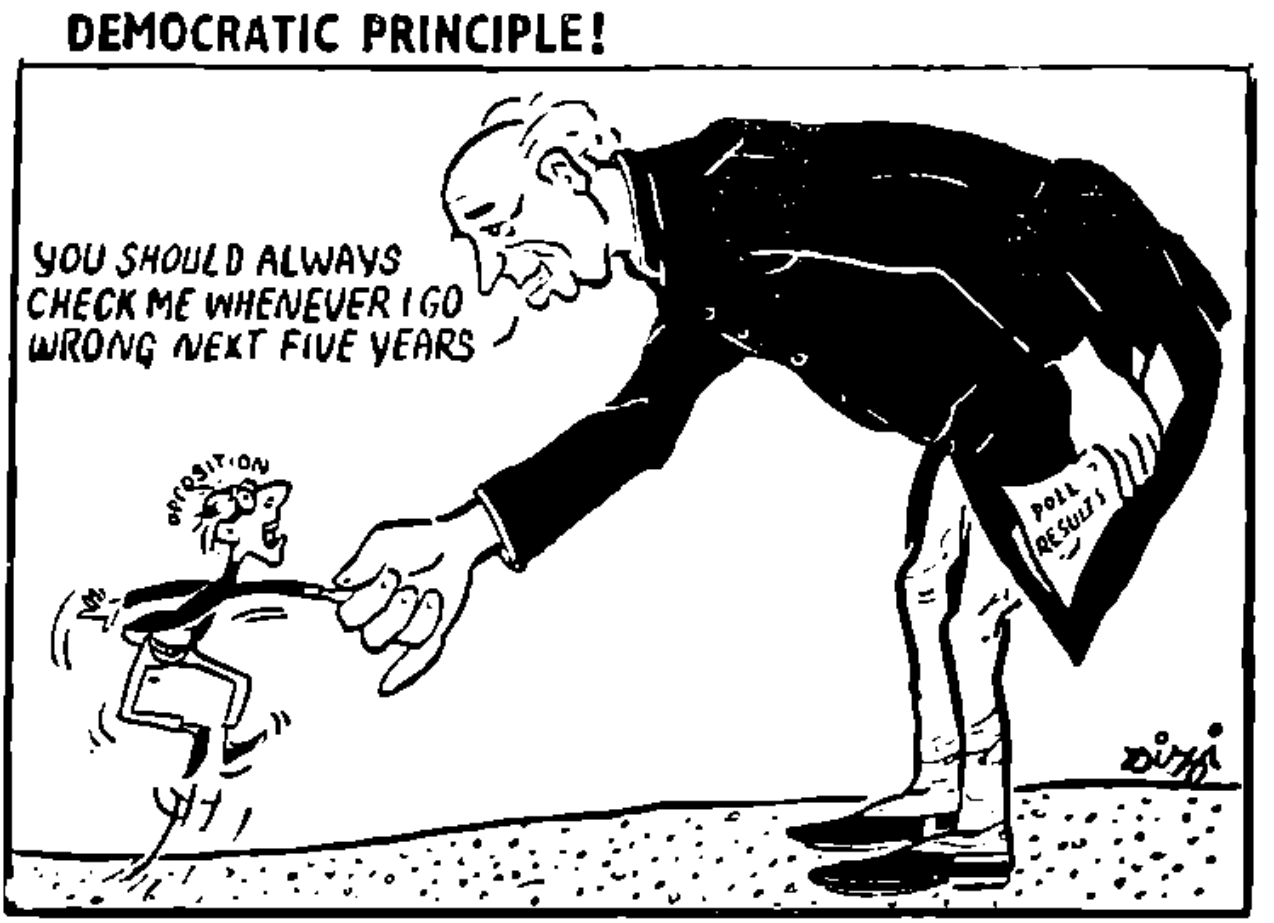

ফ্রি প্রেস জার্নালের সৌজন্যে

॥ লিপ্ত-ব্যঙ্গচিত্র ॥

ডেনমার্ক

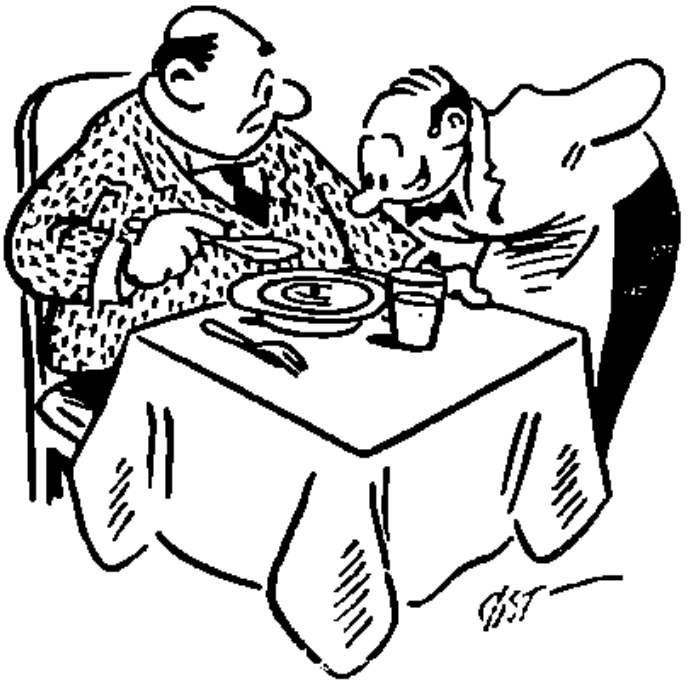

আরে মাছিটা এলো কোথেকে ?
কৈ দেখি। না, না এটা মাছি নয়—
সাঁতারু। কেমন সাঁতার কাটছে
দেখছেন ! ওকে চলে যেতে দিন।

ফ্রান্স

অত হৈ চৈ করছেন কেন ?
দেখছেন না আপনাদের শব্দে
পাখিরা ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে !

॥ বিশ্ব-ব্যঙ্গচিত্র ॥

ব্রাজ কম্পোজিটার সেলুনে চুল কাটাতে কাটাতে বাচাল নাপিতকে বলছে—
ওহে তুমি মাইনে পাও কি হিসেবে—সপ্তাহে সপ্তাহে না হাজার কথার হারে ?

নিম-এর তুলনা নেই

'নিম টুথ পেষ্ট'ই হ'ল একমাত্র টুথ পেষ্ট যার মধ্যে নিমের সব কিছু বিষাপহারক বীজাণুনাশক ও কষায়গুণ ছাড়াও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত এবং দাঁতের পক্ষে উপকারী সব কিছু উপাদান আছে। মাড়ীর পক্ষে অস্বস্তিকর 'টার্টার' নিরোধক এবং দন্তক্ষয়কারী বীজাণু ধ্বংসে অধিকতর সক্রিয় শক্তিসম্পন্ন এই টুথ পেষ্ট দাঁতের 'এনামেল' সুদৃঢ় করে এবং মুখের দুর্গন্ধও দূর করে।

নিম টুথ পেষ্টের গুণাগুণ সম্বন্ধে বিদেশী ব্যবহারকারীদের বহু অযাচিত প্রশংসাপত্রগুলির মধ্যে কয়েকটি :

"শ্রীমতী জিও লোয়েরিংগার নিম টুথ পেষ্ট ব্যবহার করে যে সুফল পেয়েছেন তা তাঁকে বিশেষ আগ্রহান্বিত করেছে। সেই থেকে তাঁর কোন দন্তরোগের সংক্রমণ ঘটেনি এবং দাঁত পরিচ্ছন্ন ক'রে নেবার প্রয়োজনও হয়নি। আগে প্রতি মাসে আমাকেও দাঁত পরিচ্ছন্ন করাতে হ'ত।"
.....সিয়াটেল, ওয়াশিংটন

"নিম টুথ পেষ্টে দাঁত মাজার পর মনে হয় আমার দাঁত আগের চেয়ে ঢের বেশী সাফ্ হয়েছে···।"
.....পন্ট-স্ত-লুপ, ফ্রান্স

"আমি কয়েকবার নিম টুথ পেষ্ট কিনে ব্যবহার করেছিলুম। আমার ভাল লেগেছিল। আমি বরাবর এই পেষ্ট ব্যবহার করবো।"
.....লেবানন, এন, এ, ইউ, এস, এ

"আমি নিম টুথ পেষ্ট ব্যবহার করি এর বিশেষ গুণের জন্য।"
.....মস্কো, মিনিষ্ট্রি অব্ কালচার

"নিম টুথ পেষ্ট অতি উৎকৃষ্ট। আমি ব্যবহার ক'রে বেশ সন্তোষজনক ফল পেয়েছি।"
নিউ দিল্লীর ইউনেস্কো কনফারেন্স প্রতিনিধি

"অতি উৎকৃষ্ট এবং ভারী চমৎকার। আমার দাঁতে ব্যবহার ক'রে আশ্চর্য্য সুফল পেয়েছি।"
.....৩৯, রেঁই গ্যাব্রিয়েল, প্যারিস

"আমি এই টুথ পেষ্ট অত্যন্ত পছন্দ করি, বিশেষ করে এর দাঁত পরিষ্কার রাখার গুণের জন্য।"
.....সিয়াটেল ৩, ওয়াশিংটন, ইউ, এস, এ,

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

NTP-2018

মিত্র ব্রাদার্স

ঘুমেলার্স

ওমেগা ও টিসো ঘড়ির
অথরিয়াল এজেন্ট

৫৭/২, গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা-১৯

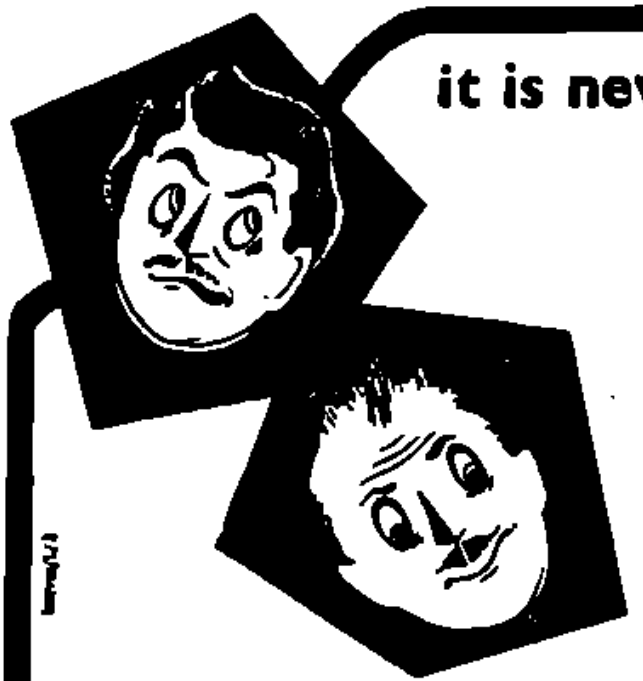

it is never too late

Yes, it is never too late. If all your hair had turned Grey or have started Greying. If your hair has started thining or Baldness Prevailing. It is never too late.

Loma the hairs natural food will supply the necessary vitality to the structure of cells that forms hair and keep the hair roots vigorously healthy. Turns Grey hair into Natural Black, stops falling or thining.

It re-starts the ceased work of the roots promoting new HAIR in cases of Baldness.

Sole Agents :

M. M. KHAMBATWALA, Ahmedabad

Loma

Agents : SHAH SAVISHI & CO. 129, Radhabazar Street, Calcutta-1.

দেবতা যে চায় সাধিতে সাধনে
মানুষের সাঁকা ধারা,
মানুষ কোলেতে তাই রেখে যায়
আপনার দুখলের ভাষা ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়

॥ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ॥

সব সে
সকল
সবার দিবাকর নৈবিদ্যের লোভ
নাই সে উঠিয়াছিল,
সঙ্কল্পিতে
চলটুকু সাই ঠাকুর সমসমার
॥ ৯ম ছিলাম সেখানেই ॥
তীরের প্রান্তরে
শুধু কুণ্ডিতকিরীটি সীমার
পূর্ণ স্রোতের প্রসাদ সে দিল যদি,
দৈবাগ্নে কুলে নদী
॥ সব যাত্রী এসেছিল
পারের আশ্বাস
নিশ্চয় আর রোদ্রে সোনার ঢাকনা এই
কূল যি সংসার।
এই দরিয়ার হালের সরকার
সব

বিচিত্র 'বিচিত্রা' ॥

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

সাহিত্যিক তথা নানা শ্রেণীর শিল্পীরা যে ব্যক্তিগত ঈর্ষার কবল থেকে প্রায়ই মুক্ত হ'তে পারেন না, এটা প্রমাণিত করবার জন্যে প্রমাণের পর প্রমাণ দাখিল করা বাহুল্য মাত্র।

আধুনিক যুগে এর সব চেয়ে বিখ্যাত দৃষ্টান্ত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "কাব্যে দুর্নীতি"র অভিযোগ এনে জেহাদ ঘোষণার দুষ্চেষ্টা।

সেই সময়ে রবীন্দ্র-ভবন এবং দ্বিজেন্দ্র-ভবন, দুই জায়গাতেই আমার যাতায়াত ছিল। রবীন্দ্র-ভবনে দ্বিজেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছুই উচ্চবাচ্য শুনতুম না এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তো এ সম্বন্ধে থাকতেন মূর্তির মতো একেবারেই নির্বাক। দুঃখের বিষয় দ্বিজেন্দ্র-ভবনে নিয়মিতভাবে যে সব বিখ্যাত সাহিত্যিক আনাগোনা করতেন, তাঁদের অনেকের সম্বন্ধেও একই মত প্রকাশ করতে পারলুম না।

সেখানে গিয়ে শুনতুম, রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতাই যোগে টিঁকবে না। তিনি সংস্কৃত ভাষা শেখেন নি, ভালো ইংরেজী জানেন না, অন্য কারুর সাহায্যে নিজের কবিতাগুলি তর্জমা করিয়ে নিচ্ছেন প্রভৃতি। [রবীন্দ্রনাথের দুর্ভাগ্যের জোর আজও চলছে। ইংরেজির কবিতা পাঠ না করলে রবীন্দ্রনাথ যে 'ক্ষণিকা'র শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি লিখতে পারতেন না, এ-সম্বন্ধে জনৈক প্রখ্যাত, অতি-আধুনিক ও বর্ণচোরা সাহিত্যিক একেবারে নিঃসন্দেহ। এরও চেয়ে উদ্ভট সব অভিযোগ শুনেছি। কিন্তু আর দৃষ্টান্তের সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ নেই।]

কিন্তু এই ঈর্ষার উদ্ধতভার পাশেই আবার দেখতে পাই প্রেম-প্রীতির শ্যামলতা। কবি ও শিল্পীরা পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা না ক'রেও থাকতে পারেন না। প্রাচীনকাল থেকেই তাঁরা চেয়েছেন এক-একটি বিশেষ আসরে সমবেত হয়ে হাস্যকৌতুক ও গল্পগুজব এবং আপন আপন রচনা পাঠ করতে; এবং সেইসঙ্গে কিছু কিছু জলযোগের ব্যবস্থাও যে থাকত না, একথা জোর ক'রে বলতে পারি না।

সেকালে এই সব অনুষ্ঠানের আয়োজক হ'তেন প্রধানত রাজা, মহারাজা ও বিত্তশালী ব্যক্তিগণ। এদেশে এজন্যে বিখ্যাত হয়ে আছেন সম্রাট বিক্রমাদিত্য, মহারাজা লক্ষ্মণ সেন ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি।

ইংরেজ আগমনের পরও দেখি ডিরোজিওর সাহিত্যিক ছাত্ররা মিলে রসিককৃষ্ণ মল্লিকের বাগানবাড়িতে একটি সাহিত্য বৈঠক বসিয়ে "জ্ঞানান্বেষণ" পত্রিকা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছেন [১৮৩১ খৃঃ]। তখন থেকেই অনেক পত্রিকার কার্যালয়েই সাহিত্যের আসর বসতে দেখি। তারপর বাংলা সাহিত্য যখন ভালো ক'রে গদ্যে ও পদ্যে দুই ধারে বাহিত হতে আরম্ভ করল, তখন দেখা যায় কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর বাড়িতে "বিদ্যোৎসাহিনী সভা" নামে এক সাহিত্য সভা গঠন করেছেন [১৮৫০]। তখনকার সাহিত্যের সেবক ও ভক্তগণ সেই আসরে ব'সে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা ও পরস্পরের সঙ্গে মিতালীর সম্পর্ক স্থাপন করতেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এই সভার সঙ্গে একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চও প্রতিষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথও একটি সাহিত্য সভা প্রতিষ্ঠিত ক'রে

ছিলেন এবং তার সঙ্গে যোগ ছিল বঙ্কিমচন্দ্রেরও। দুঃখের বিষয়, উল্লেখযোগ্য কিছু করবার আগেই সে আসর ভেঙে যায়।

তারপর আর কোন নাম করবার মতো সাহিত্য আসরের কথা বলা যায় না। তবে ছোট-বড়-মাঝারি সাহিত্য-বৈঠক বসতো বটে বিভিন্ন পত্রিকার কার্যালয়ে। ওরই মধ্যে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'যমুনা', 'মর্মবাণী' এবং 'ভারতী'র বৈঠক। ওদের বিবরণ প্রকাশ করলে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হবে ব'লেই মনে করি। কারণ বহু শক্তিশালী ও প্রতিভাবান সাহিত্যিক ও কলাবিদ ঐ সব আসরের বৈঠকবাজী ছিলেন—যেমন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয়লাল গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম এবং আরো অনেকেই।

সবচেয়ে জমজমাট ছিল 'ভারতী'র বৈঠক। কারণ ওখানে পাওয়া যেত 'বিচিত্রা'র কিছু-কিছু পূর্বলক্ষণ। 'যমুনা' ও 'মর্মবাণী'র বৈঠক ছিল কেবলই সাহিত্য ও আর্ট নিয়ে আলোচনার আসর, কিন্তু 'ভারতী'র আসরে শোনা যেত উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত, আবৃত্তি এবং কবিতা গল্প ও নাটক পাঠও। এইসব ব্যাপারে যাঁদের দেখা পেতুম তাঁরা হচ্ছেন অতুলপ্রসাদ সেন, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অজিতকুমার চক্রবর্তী, নজরুল ইসলাম, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী ও চিত্তরঞ্জন গোস্বামী প্রভৃতির মত ধুরন্ধর ব্যক্তিগণ। বলা বাহুল্য গানগল্পের দুই রাজা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও দীনেশচন্দ্র সেনগুপ্তের গল্পের পর গল্প এবং বীরবল বা প্রমথ চৌধুরীর মুখে আমরা শুনতুম সাহিত্য শিল্পের নানা কাহিনী। গল্প ও কবিতা পাঠ করেছেন শরৎচন্দ্র থেকে শুরু ক'রে ওখানকার অধিকাংশ প্রখ্যাত লেখক।

রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই বলতেন, একটু-আধটু ভাল হাতের ব্যাপার না থাকলে মজলিসী আলাপ কেমন যেন জমে না। 'ভারতী'র আসরে তারও অভাব ছিল না।

কিন্তু এ-সব কথা এখন শিকায় তোলা থাক্—আমি বলতে বসেছি অতুলনীয় 'বিচিত্রা সভা'র কথা।

হ্যাঁ, 'বিচিত্রা'কে অনায়াসেই অতুলনীয় বলতে পারি। এমন সভা বাংলা তথা ভারতে আর কখনো হয় নি এবং আর কখনো হবে ব'লেও বিশ্বাস করি না। কেননা দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব না হ'লে 'বিচিত্রা'র মতন আর একটি সভা কেউ গ'ড়ে তুলতে পারবে না। দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ! আজকের চুনোপুঁটীদের মাথাখানে ব'সে দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন দেখাও পাগলামির নামান্তর।

রবীন্দ্রনাথের মত বহুমুখী প্রতিভা পৃথিবীতে একাধিক দেখা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "আমি বিচিত্রের দূত। বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ ক'রে তাকে বাইরে লীলায়িত করা—এই আমার কাজ।"

এ তো কবি ও শিল্পীর নিজের মনের কথা—কিন্তু 'বিচিত্রা'র মত সভা প্রতিষ্ঠার কারণ কি, কবি কারুর কাছে তা প্রকাশ করেছিলেন কিনা জানি না। অন্ততঃ আমি তা শুনি নি কিংবা শুনলেও ভুলে গিয়েছি। তবে আমার একটা কথা মনে হয়। এদেশে যাঁরা শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব প্রকাশ করেন তাঁদেরও অধিকাংশের মনের চৌহদ্দী যে যথেষ্ট বিস্তৃত নয়, এ সত্য বহুদর্শী কবির কাছে অজানা থাকবার কথা নয়। হয় তো তাঁদেরই জন্যে এই বিচিত্র আয়োজন। নিজের অর্থক্ষতি নিয়ে কিছুমাত্র

মাথা না ঘামিয়ে তিনি এই বৃহৎ সাহিত্য সভার জন্যে যে রাজকীয় আয়োজন করেছিলেন তা ভেবে আজও আমার মনে বিস্ময় জাগে।

ফটক দিয়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে ঢুকে সামনেই দেখা যায় ঠাকুরবাড়ির প্রাচীন অট্টালিকা। ডানদিকে ছিল গগনেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুজদের বাড়ি—আজ যার চিহ্নমাত্র নেই। এবং বামদিকের লালরঙের বাড়িখানিই আজ বিচিত্রাভবন নামগ্রহণ ক'রে বিলুপ্ত 'বিচিত্রা সভা'র স্মৃতি বহন করছে। বাড়ির দোতলায় ও একতলায় অধিকাংশ জুড়ে আছে দু'খানি প্রশস্ত ও অতিদীর্ঘ হলঘর।

উপরের হলঘরে বসতো 'বিচিত্রা'র আসর। সেখানে স্বর্গীয় যাঁরা এসে নিয়মিত রূপে সমবেত হ'তেন তাঁদের কয়েকজনের নাম: প্রমথ চৌধুরী, গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ তিন ভাই, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও 'ভারতী' গোষ্ঠীর অন্যান্য সাহিত্যিকগণ, সুকুমার রায় ও সিরিজাকুমার বসু এবং প্রিয়ংবদা দেবী প্রভৃতি। প্রায়ই দেখা দিতেন "সবুজপত্রে"র দলের ইনি-উনি-তিনি। সেই সঙ্গে প্রত্যেক অধিবেশনে চোখে পড়ত অসংখ্য পরিচিত ও অপরিচিত সাহিত্য রসিকের মুখ—তাঁরা বরাবর কিনা বলতে পারি না। তবে অপেক্ষাকৃত উল্লেখযোগ্য দিবসের জন্যে আমন্ত্রণ-পত্রের ব্যবস্থা ছিল, নইলে ভিড় সামলানো অসম্ভব হয়ে উঠত।

মস্ত বড় হলঘরের একদিকে বসতেন প্রায় পঞ্চাশ ষাটজন মহিলা এবং আর একদিকে ছিল পুরুষদের বসবার জায়গা—অনেকদিনই সেখানে পা রাখবার ঠাঁই থাকত না। চেয়ার-টেবিলের বালাই ছিল না, জাজিম পাতা থাকত মেঝের উপরে।

মহিলা ও পুরুষদের মাঝখানে অল্প একটু খোলা জায়গা। তারই এক প্রান্তে বারান্দার দিক পিঠ রেখে বস্ত্রাবৃত বেদীর উপরে আসীন থাকতেন বাংলাদেশের পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ—প্রায় নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখাকে মনে পড়ত তাঁর মূর্তির দিকে তাকালে।

ঠিক তাঁর সামনেই একটি উচ্চ পাত্রের উপরে ছড়ানো থাকত বেল বা অন্য কোন ফুলের শুভ্র মালা।

সে জনতার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথকে মনে হ'ত যেন একাকী। স্মরণে আসত কবিগুরু বিহারীলালের লাইন—

'কে যোগেন্দ্র যোগাসনে,
চুপু চুপু দু নয়নে
কাহাকে ধেয়াও?'

এমনি ছিল রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের প্রভাব, অমন যে ছটফটে মানুষ ও বাকা-বিশারদ শরৎচন্দ্র তাঁরও অস্থিরতা ও মুখরতা আর থাকত না।

এই তো গেল দোতালার হলঘরের সাধারণ বর্ণনা।

একতলার অতবড় হলঘরের দেওয়াল ঢেকে বই ভরা বড় বড় আলমারি। খালি চকচকে বই আর বই—সে যে কত বই তা আর গুনে ওঠা যায় না। সাধারণ লাইব্রেরির পাঁচমিশালী বা তা বই নয়, উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য ও আর্ট নিয়ে পৃথিবীবিখ্যাত গ্রন্থীদের দ্বারা দুর্লভ সব কেতাব, কোন তথাকথিত পাবলিক লাইব্রেরিতে তাদের উদ্দেশ পাওয়া সম্ভবপর নয়। দুই দেওয়ালের মাঝখানে লম্বা টেবিলের

উপর সাজানো থাকত থাকে-থাকে নূতন নূতন বিলাতী সাময়িক পত্রিকা। এই সব বই ছিল 'বিচিত্রা'র সভ্যদের জন্যে। যে কোন বই তাঁরা বাড়িতে নিয়ে যেতে পারতেন।

জোড়সাঁকোর হলঘরে সভার কার্যপদ্ধতি ছিল কি-রকম? বিস্তৃতভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আবশ্যক নেই, তবে অল্পস্বল্প কিছু বলব।

প্রথমেই সাহিত্যের কথা। এদিকে প্রধান কথক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। তাঁর কত কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ কবির নিজের মুখে সে আমরা শ্রবণ করেছি তার আর সংখ্যা হয় না। কোন কোন নাটক হয়ে উঠত প্রায় অর্দ্ধ-অভিনয়ের মত। 'চিরকুমার সভা'র গানগুলি পর্যন্ত তিনি মৃদুকণ্ঠে গেয়ে শুনিয়ে দিয়েছিলেন।

তারপর তাঁর কথন। বলা বাহুল্য তাও ছিল পরম উপভোগ্য ব্যাপার। সভায় যখন যে প্রসঙ্গ উঠত তা নিয়ে আলোচনা তো করতেনই—তার উপরে তিনি হচ্ছেন বিচিত্রের দূত—সমগ্র বিশ্বের পথে পথে পরিভ্রমণ ক'রে এসেছেন—পৃথিবীর আর কোন সাহিত্যিকের সে সৌভাগ্য হয়েছে ব'লে আমার জানা নেই। তাঁর অভিজ্ঞতার পরিধি বিস্ময়কর—কত-কিছু দেখেছেন, শুনেছেন, জেনেছেন। মাঝে মাঝে প্রসঙ্গক্রমে সেই অভিজ্ঞতার বিরাট ভাণ্ডার থেকে কিছু কিছু প্রকাশ ক'রে তিনি আমাদেরও মনের পরিধি বাড়িয়ে দিতেন।

স্বরচিত রচনা পাঠ করতেন আরো অনেকেই—যেমন অবনীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি।

সত্যেন্দ্রনাথের রচনাটির নাম ছিল "ছন্দ-সরস্বতী"—ছন্দ নিয়ে চমৎকার আলোচনা। রবীন্দ্রনাথ সেই একঘর লোকের সামনে স্পষ্ট ভাষায় বললেন,—"সত্যেন্দ্রের ছন্দজ্ঞান আমার চেয়ে বেশী।" সত্য সত্যই যে বড় সেই-ই যে ছোট হ'তে পারে, রবীন্দ্রনাথ তারই একটি মহৎ দৃষ্টান্ত দিলেন।

নিছক সাহিত্যরসে যাঁদের মন ভালো ক'রে ভেজে না, 'বিচিত্রা' তাঁদেরও জন্যে খোরাক সরবরাহ করত।

একদিন জাপান থেকে এলেন ওখানকার শ্রেষ্ঠ নর্ত্তকী তোকোয়া। জাপানী নাচ যে এত সুন্দর হ'তে ও এমন সুন্দরস সৃষ্টি করতে পারে, আমাদের ধারণায় তা ছিল না। প্রধানত বাহু ও হাতের আঙুল দিয়ে ফুটিয়ে তোলেন তিনি ভাবের ভাষা। রূপসী, তরুণী, নর্ত্তকী, ঠিক যেন রঙচঙে সুন্দর পুতুল। নাচের নামেও নূতনত্ব, একটি নাচের নাম—"একটি মকুয়া ফুল"। কিন্তু হাসির পরেই অশ্রু। অল্পদিন পরে খবর পাওয়া গেল, তোকোয়া নাকি সিংহলে গিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। কারণ? ব্যর্থ প্রেম। একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর এমনি শোচনীয় পরিণামের কথা মনে করলে আজও আমার মনে দুঃখের সঞ্চার হয়।

একদিন স্বদেশী যাত্রার দল নিয়ে এলেন স্বর্গীয় মুকুন্দদাস। তাঁর বিখ্যাত যাত্রার পালা "মাতৃ-পূজা"র অভিনয় দেখলুম।

একবার বিদেশ থেকে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ বললেন,—"এবারে একটা নতুন জিনিস দেখে এলুম। কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে বাজনার সঙ্গত।" সেদিন তারই দৃষ্টান্ত দেখা দেল। চমৎকার!

একদিন কর্ণাট এলেন এক উষ্ণীষধারী গায়ক। তিনি শুনিয়ে গেলেন ধ্রুপদী সঙ্গীত। কিছু কিছু উল্টো ব্যাপারেরও পরিচয় পেলুম। উত্তরের ভৈরবী রাগিণী সেখানে সকালে নয়, অন্য নামে অন্য সময়ে গাওয়া হয়। এমনি আরো আছে।

একদিন স্বর্গীয় শিল্পী যতীন্দ্রনাথ বসু গাইলেন এবং নাচলেন। এখন তো এটা গা-সওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু সম্ভ্রান্ত সমাজে উচ্চশিক্ষিত পুরুষ যে নাচের কায়দা দেখাতেন, তখন এটা ছিল স্বপ্নেরও অগোচর। উদয়শঙ্কর তার একাধিক যুগ পরে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এবং ভদ্রঘরের মেয়েরা পর্যন্ত নাচের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন নি।

সুকুমার রায় ও সুবিনয় রায় স্বর্গীয় দুই ভ্রাতা। একদিন তাঁরা এসে শুনিয়ে গেলেন "রামায়ণী গান,"—বলা বাহুল্য হাসির পালা। হাস্যরসের অভিনয়ে তাঁদের এতটা বাহাদুরির কথা আগে জানা ছিল না—অথচ আমি ছিলুম তাঁদের বন্ধু।

কয়েক দিন চলল "ডাকঘরে"র অভিনয়। অভিনেতারা হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ, অসিতকুমার হালদার, আশামুকুল দাস ও সুরূপা দেবী [অবনীন্দ্রনাথের ছোট মেয়ে]। অপূর্ব সে অভিনয়! গান্ধীজী বাংলা ভাষা জানেন না, কিন্তু কেবল ভাবাভিনয় দেখেই না কেঁদে থাকতে পারেন নি।

হলঘর যত বড়ই হোক ষ্টেজ বাঁধবার পক্ষে উপযোগী হতে পারে না। কিন্তু ছোট্ট একটুখানি রঙ্গমঞ্চই ঠাকুরবাড়ির শিল্পিদের হাতে পড়ে অসম্ভবকেও সম্ভবপর করে তুলেছিল। অপূর্ব সেই দৃশ্যসৌন্দর্য্য বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের হামবড়া কর্তারা স্বচক্ষে দেখলেও তা বিশ্বাস করতে পারতেন না।

আর একবার হল "বৈকুণ্ঠের খাতা"র অভিনয়। সেবারে নটসজ্ঘের দেখা দিয়েছিলেন গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি। হাসির পালা। এবং ঠাকুরবাড়ির শিল্পিরা কৌতুকাভিনয়েও যে কতখানি বিশারদ "বৈকুণ্ঠ পালার" সে প্রমাণও পাওয়া গেল।

রঙ্গশিল্পেও নতুন রকম কৃতিত্ব। একসঙ্গে দুই ঘরের দৃশ্য এবং একসঙ্গেই দুই ঘরে বিভিন্ন নটের অভিনয় চলছে। আজ বর্তমান মঞ্চের প্রসাদে সাধারণ রঙ্গালয়েও এই রকম নাট্যক্রিয়া সম্ভবপর হয়েছে, কিন্তু সেদিন এমন ব্যাপার ছিল সম্পূর্ণরূপে অভিনব।

যে সব মহিলা সঙ্গীতশিল্পীকে মাঝে মাঝে তাঁদের গান গাইবার জন্য আহ্বান করা হত, গুরুদেবের আদেশে, কেউ 'না' বলতে পারতেন না। একদিন সুকুমার রায়ের সদ্য-স্বর্গত সহধর্মিনী [চিত্র-পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায়ের জননী] গাইলেন এই গানটি—

"দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল,
বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল।"

গানের প্রত্যেকটি কথা যেন "বহুযুগের ওপার হতে" আজও আমার কানে ভেসে আসে। ঐ গানটি অত ভালো করে আর কাউকে গাইতে শুনি নি।

শুভ-উৎসবের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই "বিচিত্রা" ভবনের পাশের জমিতে বর্ষামঙ্গলের এক চমৎকার অনুষ্ঠান হয়। ঠিক স্মরণে আসছে না, কোন সৎকার্যে দানের জন্য কিংবা অন্য কোন কারণে এই জলসার টিকিট বিক্রি করা হয়েছিল এবং একখানি আসনও খালি ছিল না। কথা নয়, নাচ নয়, খালি গান। বাজনদারদের দলে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীতজ্ঞ দৌহিত্র গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়কেও দেখেছিলুম। অল্পায়ু গুরুদাস পরে শিশিরকুমার ভাদুড়ির সম্প্রদায়ে যোগ দিয়ে "বসন্তলীলা" ও "সীতা"র গানে সুর সংযোগ করে দেশব্যাপী যশ অর্জন করেন। তিনিই প্রথমে দেখিয়ে যেন রঙ্গালয়ের নাটকীয় ক্রিয়ার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের গানের সুরের উপযোগিতা কতখানি।

বাছা বাছা সাহিত্যরসিককে "বিচিত্রা"র সভ্য রূপে নির্বাচন করা হত এবং সভ্যগণকে এক পয়সাও চাঁদা দিতে হত না।

বেশ কিছুকাল ধরে নিঃস্বার্থ ভাবে রসিকসমাজে আনন্দ বিতরণ করে তারপর একদিন কি কারণে জানি না "বিচিত্রা"র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হল। কিন্তু আসল কারণটা আজও আমার কাছে রহস্যময় হয়ে আছে। হতে পারে বিনা চাঁদায় এমন একটা বৃহৎ প্রতিষ্ঠান চিরদিন চলতে পারে না। কিন্তু সত্যই কি তাই? কারুর কারুর মুখে অন্য কথাও শুনি। যাক্ এ নিয়ে বেশি কৌতূহল প্রকাশ করার দরকার নেই।

কিন্তু "বিচিত্রা"র আকস্মিক অস্তিত্ব লোপ আমার বুকে বেজেছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধুবিয়োগের শোকের মত।

বৎসরের পর বৎসর যায়। এল ১৩৪৩ সালের পঁচিশে বৈশাখ। পি. ই. এন. ক্লাবের আহ্বানে কবির পঞ্চসপ্ততিতম জন্মোৎসবে যোগ দেবার জন্যে গেলুম বরাহনগরের বাগানবাড়িতে। সভাস্থলে হাজির হয়ে মনের ভিতরে আমার নতুন করে জেগে উঠল বিলুপ্ত "বিচিত্রার" স্মৃতি। সেই প্রকাণ্ড হলঘর, সেই সাহিত্যিক ও শিল্পীদের জনতা, সেই একদিকে মহিলাদের এবং আর একদিকে পুরুষদের নিয়ে মাঝখানে বেদী আলো করে বসে আছেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সামনের পাত্রে শোভা পাচ্ছে ফুলদল। "বিচিত্রা সভা"র যে সব পরিচিত মুখ দেখতে পেতুম এখানেও পেলুম তাঁদের অনেকেরই দেখা। যাঁরা হাজিরা দেন নি তাঁদের অধিকাংশকেই আর দেখতে পাব না ইহধামের কোন আসরেই।

সকলের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ তিনটি নূতন কবিতা পাঠ করলেন—তখনও তাঁর ভাববিচিত্র কণ্ঠস্বর অনাহত। তাঁর কণ্ঠে সেই আমার শেষ কবিতা শোনা।

বল বল, বন্ধু, বল, কিবি তোমার লাগে বাঁকা
বাঁশি তাই এবার দিয়ে গেছেন মড়লালের খোঁপায়।
শুধু দিবের আপত্তি মানে
জীবন তোমার বার্থ মানে
বল, তোমার পরান কিনি বিজু ধানে তোমার প্রাণে,
বল, কিবি সাথে সাথে মোরব তোমার দুখের টানে॥

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা

অধ্যাপক—অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের একজন ভক্ত, কবির বহুমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে একটি চমৎকার কথা বলেছেন:—"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত মহামানবের অন্তরে নানামুখী সপ্তাঙ্ক থাকে, তাহার পথে নানা সৌরভ নিয়ে, নানা রূপের বাতাস বহিতে থাকে,—যাহা বিচিত্র মানুষের বিভিন্ন রুচির মনকে আনন্দিত করে, আকৃষ্ট করে।" রবীন্দ্রনাথের কবিতা নানা নূতন রাগে রঞ্জিত হয়ে, নানা নূতন ভাবের আবেদন নিয়ে, কবির কবিতার নিজের অনুবাদে, বিশ্বজগতের নানা দেশের মানুষের চিত্ত জয় করেছে।

তাঁর গীতি রচনার সহায় মনের নানা ভাব ও ভঙ্গির প্রকাশ চেষ্টায়, জীবনের নানা অবস্থার নানা সুখদুঃখের দৌত্য নিয়ে,—যেসব বাংলা ভাষার মাধ্যমে এত বেশি আবেদন বহন করতে পারে নি, যা তাঁর কবিতার অনুবাদে সম্ভব হয়েছে। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে কবি আর একটি তৃতীয় ভাষার আশ্রয় নিয়েছিলেন,—সেটি হল রেখা ও রঙের ভাষা, যে ভাষা [যা অনেক সময়ে বাংলার শিক্ষিত মানুষের পক্ষে এখনও দুর্বোধ্য] বিশ্বজগতের সমস্ত রসিকদের কাছে পৌঁছেছে। কারণ, রূপের ভাষা কথার ভাষার মতো সীমাবদ্ধ নয়, পরন্তু, সকলের পরিচিত বিশ্বজনীন ভাষা—যা কবিতার ভাষার মতো প্রাচীর দ্বারা ব্যাহত বা সীমিত নয়। কবির রচিত চিত্রাবলী কখনও কখনও এক অদ্ভুত রূপরচনার মধ্য দিয়ে—যে রচনায় প্রকৃতির রূপ কিছুটা রূপান্তরিত হয়েছে—য়ুরোপ ও আমেরিকার মানুষদের পরিচিতি লাভ করেছে—যে পরিচিতি এ দেশে সম্ভব হয় নি। কারণ, আমাদের সাহিত্যিক মহাশয়রা রূপরেখার ভাষা অনেক দিন বিস্মৃত হয়েছেন—সুতরাং নিরক্ষরের ভাষায় লেখা কবির চিত্রাবলী তাঁদের সকলে বুঝতে পারেন না। সম্প্রতি তাঁর শতবার্ষিকীর নানা অনুষ্ঠানে ও সভা সমিতিতে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিভিন্ন প্রকাশের স্তব-মালা যেমন নানা মুখে আলোচিত হচ্ছে, সেইভাবে তাঁর দুর্বোধ্য-চিত্ররচনার রহস্যের চাবিকাঠিরও কিছু কিছু অনুসন্ধানের চেষ্টাও চলছে। শেষ বয়সে হাজার হাজার ছবি লিখতে ব্যাপৃত হয়ে—রূপ-সৌন্দর্যের আদর্শের মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যা করবার বড় সুযোগ তিনি পান নি। তাঁর একটি ছোট অল্প-পরিচিত প্রবন্ধে—'রূপ-সৃষ্টির আদর্শ' নাম দিয়ে রূপ তত্ত্বের রহস্যের কিছু ব্যাখ্যা তিনি করেছেন। তিনি বলেছেন, অনেকে বলতে পারেন যে চিত্রকলায় এবং অন্যান্য কলার সৃষ্টিতে কতক রকম নকশা-রচনার পরিচয় পাওয়া যায় যেগুলি বিশেষ রূপে আলংকারিক,—যার মধ্যে জীবন্ত কিছু বা আভ্যন্তরিক কোন বস্তুর প্রকাশের চেষ্টা নেই। কিন্তু, এ কথাটা বোধ হয় ঠিক নয়। এই সব অলংকরণ রূপকারের মনের সুখ-দুঃখের রসবোধের স্বতঃপ্রকাশরূপে বলতে থাকে—"আমি আমার সৃষ্টির মধ্যে আনন্দ পাই—সুতরাং এগুলি সার্থক রচনা।" আনন্দের সকল প্রকাশই সৌন্দর্যের রূপ নিয়ে থাকে কিন্তু একটা কথা বলা আবশ্যক—আনন্দ মাত্রই সুখরূপী ও সৌন্দর্যরূপী নয়—এবং সৌন্দর্য মাত্রই হাল্কা পান্-পাতা রূপ নয়। আনন্দ নিরুদ্যমতার বন্ধন মোচনের ফল,—আত্মার স্বাধীনতার ফল। সৌন্দর্য্য হচ্ছে তত্ত্ববস্তুর গভীর ও বিরাট প্রকাশ যা আমাদের হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে—অন্য কোনও আকর্ষণের তাগিদে নয়,—উহার নিজস্ব চূড়ান্ত সত্য প্রকাশের ব্যথায় ও তাড়নায়। যখন কোনও বিশুদ্ধ আনন্দের মুহূর্তে, এই কথাটা হৃদয়ঙ্গম করি আমাদের চারিদিকে বিশ্ব-

প্রকৃতির রূপের মধ্যে—তখন আমরা বিশ্বকে প্রত্যক্ষ করি কেবলমাত্র বাহ্যিক অস্তিত্বের মধ্যে নয়,—পরন্তু, তাকে প্রকাশিত দেখি সুর, বর্ণ ও রেখার নানা অলংকারে এবং আমরা হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি—এক অখণ্ড সত্তাকে-যিনি নিখিল বস্তুর মধ্যে বলছেন,—"আমি সৃষ্টি করেই আনন্দ পাই।"

এইটি হল কবির রূপ-রসের তত্ত্ব কথা—অল্প কথায় নিবদ্ধ। কিন্তু, আর এক স্থানে তিনি গভীরতর তত্ত্বে প্রবেশ করেছেন, তিনি বলেছেন—"আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, আমাদের ব্যক্তিসত্তা একটি সামগ্রিক স্বার্থবুদ্ধির সঙ্কীর্ণ চক্রের মধ্যে আবর্তিত হয়। এবং এই জন্য, আমাদের ভাবনা ও স্বল্প পরিসরের ঘটনাবলী—আমাদের চোখে বড় আকারে দেখা দেয়। এই নিদারুণ স্ব-চেতনার দৌরাত্ম্যে আমরা সকল বস্তুর সহিত ঐক্যবোধ অস্বীকার করে বসি। এই অনৈক্যবোধ অনেক বাধার পাহাড় সৃষ্টি করে তাদের নিজের পটভূমিকাকে আপসা করে তোলে। কিন্তু এটি আমাদের নিজস্ব সত্তাকে অনন্ত বস্তুর স্বার্থহীন স্বাধীনতায় ঐশ্বর্যশালী করে তোলে—যার মধ্যে নিজের পরিপ্রেক্ষিতের সাক্ষাৎ লাভ করে ধন্য হয়। আমাদের নিজ বাসগৃহ অগ্নিশিখায় বেষ্টিত হলে আমরা অনন্তের হৃদয়ে বাস করে যে অগ্নিশিখা,—তার সাক্ষাৎ পাই না। অনন্তের মধ্যে যে দুঃখের সত্তা বাসা বেঁধে আছে, তা আমাদের বেদের কবিরা গান করে বলেছেন: 'আনন্দাৎ এব খল্বিমানি সর্ব-ভূতানি।' তাঁরা বলেছেন—'স তপস্ তপ্ত্বা সর্বম্ অসৃজত যদিদমস্কিঞ্চ।'

কবি আর একটি পুস্তকে কলাবিদ্যার সার্থকতা সম্বন্ধে কয়েকটি সার্থক উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন,—'শিল্প কলার সাধনার পথে আমাদের ব্যক্তিসত্তা জগতের শ্রেষ্ঠ সত্তাকে লক্ষ্য করে', তার উত্তর প্রেরণ করে—যিনি নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেন অসীম সৌন্দর্যও জগতের মধ্যে - আলোকহীন রূঢ় বাস্তবিক বিশ্বের প্রাচীর ভেদ করে।'

"মানুষের সঠিক রূপ-রচনা করা কলাশিল্পের কর্তব্য নহে। মানুষ সেইখানেই সত্য যেখানে সে তাহার অনন্তের আস্বাদন পায়, যেখানে সে দিব্যসত্তায় উদ্ভাসিত—এই দিব্য-সত্তাই মানুষের মধ্যে সৃষ্টির শক্তি।" এখন দেখা যাক, এই সব তত্ত্বকথা কবির অদ্ভুত চিত্ররচনার রঙ-রেখার মধ্যে কোনও অর্থবোধে আমাদের সাহায্য করে কি না। কেহ কেহ তর্ক তুলেছেন—ছেলেবেলায় কবি অঙ্কনবিদ্যায় কোনও শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিলেন কি না। ১৮৮৫-১৯০ সনের সময় লক্ষ্য করে কবি জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন:—"এক এক দিন অপরাহ্নে চাদরে মোড়া সতরঞ্চের উপর শুয়ে পড়ে একখানি স্কেচ্ বইএর খাতার পাতায় ছবি লিখতে চেষ্টা করেছি।" কিন্তু এইসব শৈশবের চিত্র-চেষ্টার উপর নির্ভর করে তাঁর পরিণত জীবনের ৭০ বৎসরের চিত্ররচনার উপর কোনও প্রভাব কল্পনা করা অসম্ভব,—১৯২৮ সনে তিনি প্রথম চিত্র রচনা করতে সুরু করেন। প্যারী নগরে তাঁর প্রথম চিত্রপ্রদর্শনী হয় ১৯৩০ সনে। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৯ সনের মধ্যে কবি দুই হাজারের অধিক ছবি লিখে গিয়েছেন—যার সংখ্যা তাঁর গানের সংখ্যার প্রায় সমান।

কিন্তু কবির রঙ-রেখার রাজ্যে প্রথম বিচরণের ইতিহাস বড়ই বিচিত্র। চিত্ররাজ্যে তাঁর প্রবেশ ইচ্ছাকৃত নয়, সম্পূর্ণ আকস্মিক।

তাঁর চিত্রলেখা আরম্ভ হয়েছিল তাঁর কবিতার পাণ্ডুলিপির সংশোধন ও কাটাকুটির মারফৎ—সহজ স্থানান্তরের পথে—এই সব সংশোধন আকস্মিক ভাবে নানা উদ্ভট রূপের সৃষ্টি করেছিল। এই সব সংশোধন—সহজ নিগত-রেখার পথে—নানা কাটাকুটির জাল রচনা করেছে—

যার কালো লাইনের সীমানার মধ্যে কিছু কিছু শাদা রেখার সুতো দেখা যায়। এই সমস্ত সূক্ষ্ম রূপের কালো-ক্ষেত্রে শাদা রেখার ডোরা টেনে সীমাবদ্ধ করে একরকম অলংকার রচনার চেষ্টা হয়েছে। কখনও কখনও এই অলংকার রচনা দুই লাইন ব্যাপ্ত করেছে। তখন মনে হয়েছে এই অলংকারের একটা মাথার মত রূপ নিয়েছে। কখনও কখনও এই অলংকরণ গলদেশের বা ঠোঁটের মতন রূপ নিয়েছে—এবং মনে হয়েছে—একটি পাখী বুঝি পশ্চিম দিকে উড়ে চলেছে। এই সব পাণ্ডুলিপি পরিশোধনের চেষ্টা কেমন করে মৌলিক চিত্ররচনার রূপ নেল কবি তার কাব্যময় বর্ণনা দিয়েছেন: "যখন এই সব হস্তলিপির কাটাকুটি পাখীর মত মুক্তির জন্য রোদন করত, এবং তাহাদের বিশ্রী রূপ নিয়ে আমার চোখকে পীড়া দিত—আমি অনেক সময়ে এই পরিশোধন কার্য সমাপ্ত না করে' তাদের করুণা দেখিয়ে, ছন্দের পরিসমাপ্তিতে সার্থক করে তুলেছি। এই সব করুণার উদ্ধার কার্যে আমি একটা সত্য আবিষ্কার করলাম যে রূপের জগতে রেখা পরিণতির একটা নিয়তির স্বাভাবিক চলন চেষ্টা চলে—এবং কেবল শক্তিশালী রেখারাই বেঁচে উঠে, যাদের মধ্যে ছন্দগুণের গতি-প্রাণ আছে এবং আমি অনুভব করলাম, এই সব উদ্‌বাস্তু—পরস্পর বিরোধী রেখা-পুঞ্জের মধ্যে —যেকার সমস্যা সমাধান করতে হলে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের ছন্দ রচনা করে পরিতৃপ্তি ও পূর্ণতা দান করতে হয়—এই পূর্ণতা হল সৃষ্টির রহস্য।"

উপরে উদ্ধৃত বিবরণে কথাটা স্পষ্ট হয়েছে—যে কবির চিত্ররচনা পূর্বে ভেবে চিন্তে সৃষ্ট হয়নি। সহজভাবে স্বতঃস্ফূর্তরূপে এগুলির জন্ম—কোনও সুচিন্তিত নির্দিষ্ট বক্তব্যের পথে নয়। এই কথাটাও স্পষ্ট হচ্ছে যে এই সব চিত্র তাঁর চিত্রকলার দার্শনিক তত্ত্বের প্রমাণ হিসাবে চিত্রিত হয় নি। কেবলমাত্র একটা তত্ত্বাধারে—"আনন্দের সর্বপ্রকার ভাষাই সৌন্দর্যের রূপ গ্রহণ করে।" এই কথাটাও বোঝা যাচ্ছে যে—এই সব চিত্রাবলীর সহজ স্বতঃস্ফূর্ত রেখাবলী রচনার চেষ্টায় কবি প্রকৃত আনন্দ অনুভব করেছেন—যাদের পরিকল্পনায় কোনও পূর্বচিন্তিত ভাবনা বা উদ্দেশ্যের পরিচয় পরিচয় নেই।

তাঁর চিত্রাবলীর সবগুলিই একশ্রেণীর নয়—এক রীতির, বা এক শৈলীরও নয়। তাদের তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) উদ্ভট রূপের নানা প্রাক্-ঐতিহাসিক পশুর কল্পনা, যাদের অস্তিত্ব এখন বর্তমান জীবজগতের পাতা হতে লুপ্ত হয়েছে। কবির পশুপাখির চিত্রগুলি কোনও জীবিত জীবজন্তুর অনুকরণ নয়, সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক সৃষ্টি। তাদের রচনায় অনেক বিস্তৃত-রেখার বিস্তৃতি, অনেক চক্ষুকোণ ও লাম্বাতিরিক্ত রূপের ছন্দগতি এবং অভিনব রূপসৃষ্টির মৌলিক শক্তির পরিচয় আমরা পাই।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্ররচনার মধ্যে আমরা দেখতে পাই—নানা রীতির মানুষ, বালক, বালিকা, মহিলা ও বৃদ্ধার প্রতিকৃতি যার যার মধ্যে অনেক অনুকৃতি ও সাদৃশ্যের পরিচয় আছে। এই সব মূর্তি রচনার ছবি গভীর রসে ও ভাবে ভরপুর, এবং কখনও কখনও গূঢ় রহস্যের ছন্দে পরিপূর্ণ ও বাঙ্ময়।

(৩) তাঁর তৃতীয় শ্রেণীর চিত্র হল—প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর নানা সুচতুর রচনা, আলোছায়া ও বর্ণসমারোহে উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয়। এই সমস্ত রহস্যময় প্রাকৃতিক দৃশ্যে কখনও কখনও করাসী দৃশ্যচিত্রকর, কামিল কোরো এবং ইংরাজী চিত্রকর টারনারের চিত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু

এই সব য়ুরোপীয় ওস্তাদ চিত্রকরদের রীতি বা শৈলীর কোনও ইচ্ছাকৃত অনুকরণ চেষ্টা একেবারেই নেই। তাদের সঙ্গে কবির দৃশ্যাবলীর চিত্রমালার সাদৃশ্য একান্তরূপে আকস্মিক।

বৃদ্ধবয়সে-ছবি আঁকবার প্রবৃত্তি ও প্রয়াস কোথা থেকে এল, কবি তার একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন, —একটি কবিতায়। এই কবিতাটি বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর নন্দলাল বসুর উদ্দেশে রচিত। এই কবিতা থেকে আমরা জানতে পারি যে নন্দলালের চিত্রমালা তাঁকে চিত্ররচনার পথে—প্রথম উৎসাহিত করে। নন্দলালকে সম্বোধন করে তিনি বলেছেন—

তোমারি খেলা খেলিতে আজি উঠেছে কবি মেতে,
নব-বালক-জন্ম নেছে নূতন আলোকেতে।
ভাবনা তার ভাষার ডোবা—
মুক্ত চোখে বিশ্ব-শোভা
দেখাও তারে, ছুটেছে মন তোমার পথে যেতে।

কবির কথা উদ্ধৃত করেই, কবির চিত্রাবলীর রচনার রহস্যের ব্যাখ্যা,—গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা। আমরা এইখানেই সমাপ্ত করলাম।

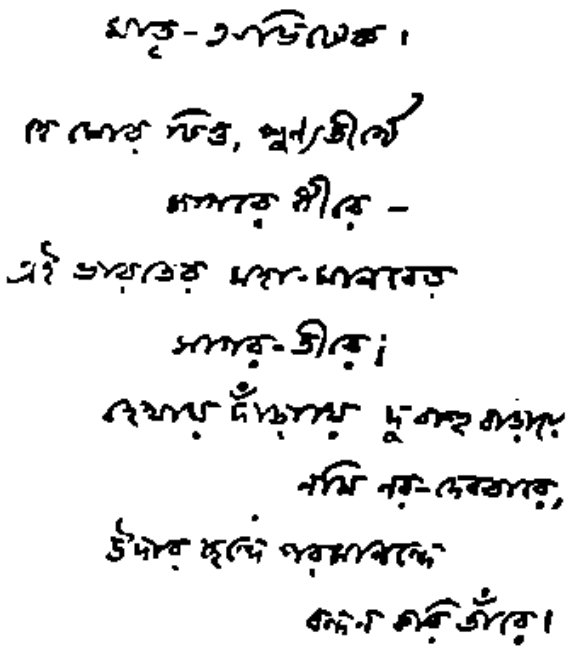

শিক্ষায় শিল্পের স্থান ॥

শ্রীনন্দলাল বসু

মানুষ আনন্দ পাবার জন্য এবং জ্ঞান অনুশীলনের জন্য যতরকম উপায় উদ্ভাবন করেছে, তার মধ্যে ভাষা একটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চা চলছে ভাষাকেই বাহন করে। সাহিত্য মানুষকে আনন্দ দেয়, কিন্তু তার প্রকাশের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। তার সেই অভাব পূরণ করছে রূপশিল্প সংগীত নৃত্য ও অন্যান্য কলা। সাহিত্যের যেমন একটা নিজস্ব প্রকাশভঙ্গী আছে, তেমনি রূপশিল্প সংগীত নৃত্যেরও আছে। মানুষ ইন্দ্রিয় দিয়ে, মন দিয়ে, বহির্জগতের সকল বস্তুর তত্ত্ববোধ ও রসবোধ করে এবং শিল্পে তা অপরের কাছে প্রকাশ করে; শিক্ষার ক্ষেত্রে শিল্পের চর্চার দ্বারা মানুষের তত্ত্ববোধ ও রসবোধের উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং শিল্পের প্রকাশভঙ্গী আয়ত্ত হয়। চোখের কাজ যেমন কানের দ্বারা হয় না তেমনি ছবি গান ও নাচের শিক্ষা কেবল লেখাপড়ার দ্বারা সম্ভব নয়।

আমাদের শিক্ষাদানের আদর্শ যদি সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাদান হয় কলাচর্চার স্থান এবং মান বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সঙ্গে সমান থাকা উচিত। এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এদিক দিয়ে এ পর্যন্ত যা ব্যবস্থা হয়েছে তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। এর কারণ আমার মনে হয়, আমাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস, শিল্পচর্চা একদল পেশাদার শিল্পীরই একচেটিয়া কারবার, সাধারণের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। শিল্প না বোঝার জন্য অনেক শিক্ষিত লোকও অগৌরব বোধ করেন না—আর জনসাধারণের তো কথাই নেই, তারা ফোটো ও ছবির তফাত বোঝে না; জাপানি খোকা-পুতুলকে শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মনে করে অবাক হয়ে থাকে; বিদ্রী-রঙ-করা লাল-নীল বেগুনি জার্মান র‍্যাপার দেখতে চোখের পীড়া তো বোধ করেই না বরঞ্চ উপভোগ করেই থাকে; সহজপ্রাপ্য সস্তা মাটির কলসির বদলে প্রয়োজনের দোহাই দিয়ে টিনের ক্যানেস্তা ব্যবহার করে। এর জন্য দায়ি দেশের শিক্ষিতসমাজ এবং প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয়। আপাতদৃষ্টিতে বিদ্যার ক্ষেত্রে দেশবাসীর সংস্কৃতি যেমন বাড়ছে বলে মনে হয়, রসবোধের দৈন্যও তেমনি ক্রমশঃ পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। এর প্রতিকারের উপায় তথাকথিত শিক্ষিতসমাজে কলাশিক্ষার প্রচলন ব্যাপকভাবে করা; কারণ, এই শিক্ষিতসমাজই জনসাধারণের আদর্শস্বরূপ।

সৌন্দর্যবোধের অভাবে মানুষ যে কেবল রসের ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হয় তা নয়, তার মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সৌন্দর্যজ্ঞানের অভাবে যাঁরা বাড়ির উঠানে ও ঘরের মধ্যে জঞ্জাল জড়ো করে রাখেন, নিজের দেহের এবং পরিচ্ছদের ময়লা সাফ করেন না, ঘরের বেয়ালে পথে ঘাটে রেলগাড়িতে পানের পিক ও থুথু ফেলেন, তাঁরা যে কেবল নিজেদেরই ক্ষতি করেন তা নয়—জাতির স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি করেন। তাঁদের দ্বারা যেমন সমাজদেহে নানা রোগ সংক্রামিত হয় তেমনি তাঁদের কুৎসিত আচরণের কু-আদর্শ ও জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

আমাদের মধ্যে একদল আছেন যাঁরা কলাচর্চার বিলাসী ও ধনী ব্যক্তিরই একমাত্র অধিকার বলে তাকে প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে অবজ্ঞাভরে নির্বাসিত করে রাখতে চান। তাঁরা ভুলে যান, যে সুষমাই

শিল্পের প্রাণ, অর্থমূল্যে শিল্পবস্তুর বিচার চলে না। গরিব সাঁওতাল তার মাটির ঘরটি নিকিয়ে মুছে মাটির বাসন ও ছেঁড়া কাঁথা গুছিয়ে রাখে। আবার, কলেজে-পড়া অনেক শিক্ষিত ছেলে প্রাসাদোপম হোস্টেলের বা মেসের ঘরে দামি কাপড়-জামা তৈজসপত্র এলোমেলো ছড়িয়ে অবড়ঙ্গ করে রাখে। এখানে দরিদ্র সাঁওতালের সৌন্দর্যবোধ তার জীবনযাত্রার অঙ্গীভূত ও প্রাণবন্ত, ধনীসন্তানের সৌন্দর্যবোধ পোশাকি এবং প্রাণহীন। শিল্প-উপাসনার নামে ক্যালেণ্ডারের মেমসাহেবের ছবি ফ্রেমে বাঁধানো হয়ে শিক্ষিত লোকের ঘরে সত্যকার ভালো ছবির পাশে স্থান পেয়েছে, দেখতে পাই। ছাত্রমহলে দেখি, ছবির ফ্রেম থেকে জামা ঝুলছে—পড়ার টেবিলে চায়ের কাপ, আশি, চিরুনি ও কোকোর টিনে কাগজের ফুল সাজানো। প্রসাধনে কাপড়ের উপর বুকখোলা কোট, শাড়ির সঙ্গে মেমসাহেবি ফুরওয়ালা জুতো—এরূপ সর্বত্রই সুষমার অভাব, আমাদের বিত্ত থাক আর না-থাক, সৌন্দর্যবোধের দৈন্য সূচিত করে।

আবার আর-একদল লোক আছেন, যাঁরা বলেন—'আর্ট করে কি পেট ভরবে।' এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। ভাষা চর্চার যেমন দুটো দিক আছে—একটা আনন্দ ও জ্ঞানের দিক—আর-একটা অর্থলাভের দিক, তেমনি শিল্পচর্চারও দুটো দিক আছে—একটা আনন্দ দেয়, আর একটা অর্থ দেয়। এই দুটি ভাগের নাম চারুশিল্প ও কারুশিল্প। চারুশিল্পের চর্চা আমাদের দৈনন্দিন দুঃখ দৈন্য কষ্টে সংকুচিত মনকে আনন্দলোকে মুক্তি দেয়, আর কারুশিল্প আমাদের নিত্য-প্রয়োজনের জিনিসগুলিতে সৌন্দর্যের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে কেবল যে আমাদের জীবনযাত্রার পথকে সুন্দর করে তোলে তাই নয়, অর্থাগমেরও পথ করে দেয়। কারুশিল্পের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর্থিক দুর্গতির আরম্ভ হয়েছে। সুতরাং, প্রয়োজনের ক্ষেত্র থেকে শিল্পকে বাদ দেওয়া জাতির অর্থাগমের দিক দিয়েও অত্যন্ত ক্ষতিকর।

শিল্পশিক্ষার অভাবে যে আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রা অসুন্দর করে তুলেছে তাই নয়, আমাদের অতীত যুগের রসস্রষ্টাদের সৃষ্ট সম্পদ থেকেও আমাদের বঞ্চিত করেছে। আমাদের চোখ তৈরি হয় নি, তাই দেশের অতীত গৌরবস্বরূপ যে চিত্র ভাস্কর্য ও স্থাপত্য এতদিন আমাদের কাছে অবোধ্য ও অবজ্ঞাত ছিল, বিদেশ থেকে সমঝদার আসবার প্রয়োজন হল সেগুলি আবার আমাদের বুঝিয়ে দিতে। আধুনিক যুগের শিল্পসৃষ্টিও বিদেশের বাজারে যাচাই না হলে আমাদের দেশে আদৃত হয় না, এ আমাদের লজ্জার কথা।

এর প্রতিকারের সম্বন্ধে এইবার মোটামুটি ভাবে আলোচনা করা যাক। শিল্পশিক্ষার গোড়ার কথা হচ্ছে—প্রকৃতিকে এবং ভালো ভালো শিল্পবস্তুকে শ্রদ্ধার সহিত দেখা, সে-সবের সঙ্গ করা এবং সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত হয়েছে এমন লোকের সঙ্গে আলোচনা করে শিল্পকে বুঝতে চেষ্টা করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য—প্রত্যেক স্কুলে ও কলেজে অন্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পশিক্ষার স্থান রাখা, শিল্পকে পরীক্ষাগ্রহণ কালে অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে গণ্য করা এবং প্রকৃতির সঙ্গে ছেলেদের যাতে পরিচয় ঘটতে পারে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা ও অবকাশ রাখা। অনুকরণপদ্ধতি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা বাড়বে; ফলে তারা সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির ক্ষেত্রেও সত্যদৃষ্টি লাভ করবে। বিদ্যালয়ে কাব্যচর্চার ব্যবস্থা আছে কিন্তু কাব্যে বিদ্যালয়ের আয়োজন থাকলেই যে সকল ছেলে শিল্পী হবে এবং ভালো শিল্প সৃষ্টি করতে পারবে, এমন আশা করা অবশ্য ভুল হবে।

প্রথমত ছেলেদের বিদ্যালয়ে, গ্রন্থাগারে, পড়ার ঘরে এবং বাসগৃহে কিছু কিছু ভালো ছবি

মূর্তি এবং অন্যান্য চারু ও কারুশিল্পের নিদর্শন [অভাবে ওই সকলের ভালো ফোটো বা প্রতিচ্ছবি] সাজিয়ে রাখতে হবে।

দ্বিতীয়ত, ভালো ভালো শিল্পনিদর্শনের ছবি ও ইতিহাস-দেওয়া সহজবোধ্য ছেলেদের বই উপযুক্ত লোক দিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে দেখাতে হবে।

তৃতীয়ত, ছায়াচিত্রের সাহায্যে মাঝে মাঝে স্বদেশের ও বিদেশের বাছাইকরা ভালো ভালো শিল্পবস্তুর সঙ্গে ছেলেদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।

চতুর্থত, মাঝে মাঝে উপযুক্ত শিক্ষকের সঙ্গে দিয়ে ছেলেরা নিকটস্থ যাদুঘর বা চিত্রশালায় অতীত শিল্পকীর্তির নিদর্শন দেখে আসবে। বিদ্যালয় থেকে ফুটবল ম্যাচ খেলতে যাওয়ার ব্যবস্থা যখন হতে পারে তখন চিত্রশালা বা যাদুঘর দেখে আসাও অসম্ভব হবে না। এ কথা মনে রাখতে হবে—একটা ভালো শিল্পবস্তু নিজের চোখে দেখলে এবং বুঝলে শিল্পদৃষ্টি যতটা জাগ্রত হয়, একশোটা বক্তৃতা শুনলে তা হয় না। ভালো ছবি, ভালো মূর্তি, ছোটবেলা থেকে দেখতে দেখতে, কিছু বুঝে না-বুঝে ছেলেদের চোখ তৈরি হবে, পরে আপনা থেকেই তাদের শিল্পের ভালোমন্দ বিচার করবার শক্তি জন্মাবে এবং ক্রমশই সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত হবে।

পঞ্চমত, প্রকৃতির সঙ্গে ছেলেদের সঙ্গে যোগসাধন করবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ঋতুতে উৎসবের আয়োজন করতে হবে। সেই আয়োজনের মধ্যে থাকবে সেই ঋতুর ফুলফলের সংগ্রহ এবং শিল্পে ও কাব্যে সেই সেই ঋতু সম্বন্ধে যে-সমস্ত সুন্দর সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে ছেলেদের যতদূর সম্ভব পরিচয় ঘটাবার ব্যবস্থা।

ষষ্ঠত, প্রকৃতিতে যে ঋতু-উৎসব চলেছে তার সঙ্গে ছেলেদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। শরতের ধানখেত ও শস্যবন, বসন্তে পলাশ-শিমুলের মেলা, তারা যাতে নিজের চোখে দেখে আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে শহরবাসী ছেলেদের জন্য এ ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক; গ্রামের ছেলেদের এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলেই চলবে। এই সব ঋতু-উৎসবের জন্য বিশেষভাবে ছুটি দিয়ে বনভোজনের এবং ঋতু-উপযোগী বেশভূষা ও খেলাধূলার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রকৃতির সঙ্গে যোগসাধন একবার হলে, প্রকৃতিকে সত্যকার ভালবাসতে শিখলে, ছেলেদের অন্তরে রসের উৎস আর কখনও শুকোবে না; কারণ, প্রকৃতিই যুগে যুগে শিল্পীকে শিল্পসৃষ্টির উপাদান জুগিয়ে এসেছে।

শেষ কথা এই যে, বৎসরের কোনো এক সময়ে বিদ্যালয়ে একটি শিল্পসৃষ্টির উৎসব করতে হবে। তাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী কিছু না কিছু শিল্পবস্তু নিজের হাতে তৈরি করে এনে শ্রদ্ধার সঙ্গে যোগ দেবে—তা সে শিল্পবস্তু যতই সামান্য হোক। ছেলেদের সৃষ্ট শিল্পবস্তুগুলি উৎসবের অর্ঘ্যরূপে সংগৃহীত হয়ে সাজানো থাকবে। নৃত্য-গীত শোভাযাত্রা প্রভৃতির দ্বারা উৎসবটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলবার চেষ্টা করা দরকার। উৎসবের নির্দিষ্ট একটা কালনির্ধারণ করা শক্ত, দেশভেদে সেটা বদলাবে। বাংলাদেশে শরৎকালই প্রশস্ত মনে হয়।

আমরা যতদূর জানি, তাতে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ কলাচর্চাকে উপযুক্ত স্থান দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির ব্যবস্থায় তিনিও পদে পদে বাধা পেয়েছেন। কলাচর্চার স্থান বিশ্ববিদ্যালয়ে না থাকায় অভিভাবকগণ কলাচর্চাকে অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় বোধ করেন; ফলে যে-সমস্ত ছেলেদের ছোটোবেলায় নানা কলাবিদ্যার চর্চায় বিশেষ অনুরাগ দেখা গেছে

তারাও প্রবেশিকা পরীক্ষার দু-এক বৎসর আগে থেকে কলাচর্চার অপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠে এবং তাদের শিল্পানুরাগ এই সময় থেকে কমতে কমতে অবশেষে একেবারেই তিরোহিত হয়। এ বিষয়ে আমাদের সকল প্রকার জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অবহিত হবার সময় এসেছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলতে চাই। যে-সমস্ত সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক অপরিণত হাতের কাঁচা কাজ কোনো বিশেষ ধরনের শিল্পের নাম করে বাজারে যার করেন তাঁদের রুচিহীনতার অন্ত নিন্দা না করে কেবল এই বললেই যথেষ্ট হবে যে, ভালো নূতন ছবি না পেলে তাঁরা বরং ভালো পুরাতন ছবি ছাপাবেন কিন্তু বন্ধুত্বের বা আত্মীয়তার খাতিরে লোককে ভ্রান্তপথে চালিয়ে অপরাধী হবেন না। চিত্রনির্বাচনে সমস্যার সৌন্দর্যবোধসম্পন্ন লোকের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন হলে নিতে হবে; কারণ, লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে সাময়িক পত্রসমূহের ভালো বা মন্দ প্রভাব বিস্তার করবার শক্তি সামান্য নয়।

মোটকথা, শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ঔদাসীন্য কমলেই শিল্পচর্চার প্রসার হবে এবং ফলে দেশবাসীর সৌন্দর্যবোধ এবং পর্যবেক্ষণ শক্তি বাড়বে—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

———

আমার শীতবিদায় বসন্তের বেলায় এবার
তাক দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে।
তাইত আমার এই জীবনের মনছায়ায়
ফাল্গুন আসে ফিরে ফিরে দক্ষিণবায়ে,
নতুন সুরে গান উঠে যায় আকাশপানে,
নতুন রঙে ফুল ফুটে তাই এবার এবার॥

ওগো আমার বিজয়নূতন, দাঁড়াও হেসে,
ধনুক তোমার বিনম্রনমে নবীনরোষে।
দিনের শেষে বিরল সবুজ পাখের আলোয়,
সাগরতীরে পথের আমার যেই ফুরালো,
তোমার হাসি নয়ন সাঁঝের এনেছে কাছে,
শূন্যে আমার উঠল এবার সারে সারে॥

২৪ বৈশাখ
১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমে রবীন্দ্রনাথ ॥

কালিদাস নাগ

সাহিত্য আকাদামী তাঁদের স্মারকগ্রন্থে আমায় দিয়ে লিখিয়েছিলেন প্রাচ্য-খণ্ডে রবীন্দ্রনাথ। কবি কৃষ্ণ কৃপালনি সে প্রবন্ধ ছেপেছেন। পশ্চিমের সঙ্গে তাঁর সংযোগও এই বৈশাখে স্মরণীয়।

১৮৭৮ সনে প্রথম বিলেতে শিক্ষার্থী হয়ে রবীন্দ্রনাথ বেরিয়ে বিলাত প্রবাসীর পত্র ভারতী পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তাঁর দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সে লেখার সমালোচনা ছাপেন। সব মিলিয়ে আজও পড়া উচিৎ। দেবেন্দ্রনাথের কথা স্বয়ং Max Muller লিখে গেছেন যিনি দয়ানন্দ সরস্বতী ও শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়েও লিখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ যখন এক বছরের শিশু—সেই ১৮৬২ সনে তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাইকেল মধুসূদন এক জাহাজে ভেসে ছিলেন—ঠিক একশ বছর আগে। মাইকেল ব্যর্থ ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরে ৫০ বছরের মধ্যে (১৮২৪-১৮৭৩) মারা যান কিন্তু সনেট "চতুর্দশপদী" বাংলা সাহিত্যে দিয়ে যান বিলাতে বসে লিখে। সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম I. C. S. হয়ে সগৌরবে ফিরে উপনিষদ ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে যেমন লেখেন তেমনি "গাও ভারতের জয়।" বিখ্যাত স্বদেশী গান লেখেন, যার প্রশংসায় বঙ্কিমচন্দ্র 'পঞ্চমুখ' হয়েছিলেন। তাই দাদাদের যুগ থেকে দেখি রবীন্দ্রনাথ "পূর্ব্ব ও পশ্চিম" সমস্যা ভেবেছেন ও যারা সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তালিমে কবি শুধু Anglo Saxon এবং Anglo Norman সাহিত্যের আলোচনা করেন ভারতী পত্রিকায় তার মধ্যে বহু বাংলা অনুবাদ আছে কেউ পড়েন না। তদুপরি মেজদার কাছে ফরাসী শিখে বহু ইংরেজ কবিদের তুলনায় ফরাসী কবি ভিক্তর হুগো (Hugo) ও লামার্তিন অনুবাদ ও রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন। বিশ্বকবি রোড়াস্যাঁকো তাই পূর্ব্ব ও পশ্চিমের যোগসেতু এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্র সাহিত্য নূতন করে পড়তে হবে।

১৮৭৮-৮০ পুরো দু'বছর তিনি ইংলণ্ডে পড়াশোনা করেন। কিন্তু কোন পরীক্ষা না দিয়ে ও পাশ না করে ফেরেন বলে তাঁকে আবার ব্যারিষ্টারী পাশ করতে পাঠাবার চেষ্টা হয় আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে যিনি কৌতুকী ও জজ রূপে খুব যশস্বী হন। রবীন্দ্রনাথ জাহাজ থেকে মাদ্রাজে নেমে বাড়ী ফিরে এলেন ভাগ্নিদ্। তাই হাইকোর্টে ভর্ত্তি না হয়ে তিনি পিতার আদেশে জমিদারী দেখ্‌তে নিযুক্ত হলেন। ১৮৮১-১৯০১ প্রায় পুরো কুড়ি বছর রবীন্দ্রনাথ পদ্মার এপার ওপার করেছেন; জমিদারী চালনার ভালমন্দ দেখে অশিক্ষিত বিপন্ন প্রজাদের স্বপক্ষে রায় দিয়েছেন।

ব্যারিষ্টার না হলেও তারক পালিত (লোকেন পালিতের পিতা) ও অজবন্ধু আশু চৌধুরীর মিলনের ফলে বহু স্থানে বিশেষ "বিচারক" ছোট গল্পে ও গোরা থেকে যোগাযোগ উপন্যাসে তাঁর বিচারের আদর্শ দেখিয়েছেন। তার মধ্যে English Legal Code-এর প্রভাব আছে কিনা এই সন্ধানে লাগা উচিত। প্রসন্নকুমার ঠাকুর Tagore Law লেকচার করার ফলে বহু দেশের আইনজীবী বহু লক্ষ টাকা পেয়েছেন। যা হোক ১৮৯০-৯১ অর্থাৎ মানবীয় প্রতিভাবর কবি 'সাধনা'র মাধ্যমে 'পূর্ব্ব-পশ্চিম' 'রাজা ও প্রজা' প্রভৃতি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'দিগ্‌দর্শন' করেছেন যার চরম প্রকাশ 'নৈবেদ্য' কাব্যে। সেটির সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার মিল আছে।

'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র' ও 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরী' তথা 'পথিকৃত' গ্রন্থ রথা রচনাগুলি পড়লে বোঝা যায় যে গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ (১৯১১-১২) করার বহু পূর্বে তাঁর অধ্যাপক Henry Morley-কে অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত বাংলা ভাষায় রচনা করতে গেলেও Herbert Spencer ও Hamilton-এর দর্শন ও বহু ইংরেজী সাহিত্যিকের রচনা তিনি নিয়মিত পাঠ করতেন। Shakespeare ও Browning ও তাঁর চির-প্রিয় কবি যেমন Shelley ও Yeats ছিলেন তাঁর যৌবন-রচনায়। সেকালের গদ্য লেখক Bradley (On Shakerpeare) ও Stoppord Brooke (On Milton) প্রভৃতির অনুরাগী পাঠক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। Irish চাষীরা ভারতের কৃষকদের মত নিপীড়িত তাই তিনি আইরিশ নেতা জর্জ রাসেল (A. E.) লিখিত National Being ও Bernard Shaw, W. B. Yeats প্রভৃতির রচনা পড়তেন যদিও তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছিল ১৯১২-১৩ Nobel Prize পাবার আগেই। তেমনি মার্কিন সাহিত্যিক Emerson, Mark Twain, Whitman, Ezrapound, Robert Frost দের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়। তাই ৪র্থ বার আমেরিকা ভ্রমণের ফলে ও বক্তৃতার প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ মার্কিনী সাহিত্যেও প্রভাব বিস্তার করেন, কবি অমিয় চক্রবর্তী আশা করি গবেষণা করে এ বিষয়ে লিখবেন। ১৯৩০ সনে Europe থেকে তাঁর সঙ্গে America ভ্রমণের সময় দেখি "Poetry" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাত্রী Harneat Monroe (যিনি ১৯১২ সনেই ইংরেজী গীতাঞ্জলি কিছু ছাপেন), Sinclair Louris (প্রথম মার্কিন Nobel Lauriate) প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এমনি করে Atlantic সাগরের এপার ও ওপারে রবীন্দ্র-রচনার প্রভাব বিস্তারিত হয়; দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রা-পথে অসুস্থ হওয়ায় তাঁকে Peru যেতে না দিয়ে আর্জেনটিনায় (Buenos Aires) রাখা হয় শুশ্রূষা করেন মহিলা কবি Victoria Ocampo যাঁকে 'বিজয়া' নামে কবি তাঁর 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থ (১৯২৪) উৎসর্গ করেন ও আমি তাঁর হাতে সেই বাংলা বইখানি P. E. N. Congress-এ ১৯৩৬ সালে উপহার দিয়ে আসি।

১৯১২—১৯৩২ এই কুড়ি বছর রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমের বহু দেশে বহু ভাষণ দিয়েছেন কিন্তু ইউরোপ আমেরিকা পত্রিকা ঘেঁটে কেউ লেখেননি। শুধু ইহুদী অধ্যাপক Aroonson শান্তিনিকেতন গ্রন্থাগার ও 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগ্রহ' থেকে কিছু লিখে গেছেন। বেশী তাঁর প্রচার হয়নি কিন্তু অপ-প্রচার হয়েছিল অধ্যাপক Edward Thompson রচিত Rabindranath Tagore, Tagore Poet and Playwright (1927) প্রভৃতি গ্রন্থে। India Society সহজ থেকে 'Gitanjali' প্রথম ছাপেন ও Nobel পুরস্কার পেতেই Macmillan কোম্পানী বড় তাড়াতাড়ি Tagore Works এলোমেলো ভাবে ছেপে যান। তাই কবির যশস্থায়ী না হয়ে অস্থায়ী হয়—এ অভিযোগ Thompson সাহেব করেন। তাঁর মৃত্যুর পর MCA বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদক হিসেবে আমি সে কথা ছেপেছি (১৯৬১)।

মূল বাংলা না পড়ে ভাবানুবাদ করার বিপদ আছে সেটি বুঝে কবির সঙ্গে France-এ গিয়ে আমি তাই তাঁর বলাকার আক্ষরিক অনুবাদ করি বন্ধু P. J. Jouve এর সঙ্গে মিলে (১৯২২-২০) এবং Rolland ভগ্নী Madeliene কে বাংলা শিখিয়ে চতুরঙ্গ ফরাসীতে অনুবাদ করিয়ে প্রকাশ করাই। পরে 'গোরা' করার কথা ছিল এতদিন পরে Unesco ফরাসী 'গোরা' ও আমার ফরাসী 'বলাকা' Cygne ছেপেছেন (১৯৬১)।

ফরাসী লেখক Andre Zide বাংলা না জানলেও Macmillan অনুবাদ সাধারণ Gitanjali

ও Amal বা ডাকঘর নাটিকা অনুবাদ করেন। তার প্রভূত প্রভাব হয়। দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণের সময় দেখি Zide রচিত রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ ধরে পর্তুগীজ (Brazil) ও Spanish আমেরিকা (Menxio to Chile) সর্বত্র Tagore Cult অর্থাৎ রবীন্দ্র-গোষ্ঠী কাজ করে চলেছে।

India Society-র Gitanjali ছাপার উদ্যোগ হয় শিল্পী W. Rothenstein এর চেষ্টায়। তিনি ১৯১০-১১ সনে জোড়াসাঁকোতে শিল্পী সমবেন্দ্র এবং অবনীন্দ্র ঠাকুর মহাশয়দের সাক্ষাৎ পেয়ে তাঁদের কাকা রবীন্দ্রনাথ যে শুধু কবি নন কিন্তু শ্রেষ্ঠ গল্প-লেখক তা আবিষ্কার করেন ও কবি-ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্র যে শিল্পী—তাঁদের বাড়ির ও বাইরের অনেকের মুখ আঁকেন (Portrait) সেটি-ও বুঝে এক Album ছাপেন ও নিজ অঙ্কিত Profile চিত্র ইংরেজী Gitanjaliতে প্রকাশ করেন। আমি যখন Norway ও Sweden ভ্রমণে যাই (১৯২৩) তখন Nobel Accademy-র ভবনে তাদের সভাপতি Per Halmistromএর সঙ্গে সব দেখে আসি; তিনি Sweden-এর ভাষায় Shakespeare অনুবাদ করেন। Gitanjali-কে Nobel Prize দেওয়া হয় তাঁরই Confidental রিপোর্টের ফলে। এবছর Norway সভার থেকে Nobel Peace Prize দেওয়া হল গোষ্ঠীপতি Lithule কে; তিনি শান্তিবাদী ও বিশ্বশান্তির সমর্থক। তাই আফ্রিকায় তিনি প্রথম যেমন এশিয়ায় রবীন্দ্রনাথ প্রথম Nobel পুরস্কার পেয়েছেন; দক্ষিণ Africa ভ্রমণের সময় শান্তির শান্তি সংগ্রাম জড়িত স্থানগুলি দেখে এসেছি পরে প্রকাশ করব। Indian Opinion প্রায় দুষ্প্রাপ্য। ফাইল পেলে কাজের সুবিধা হয়। কিন্তু Poona Gokhale Institute ছাড়া কোথায় পেলাম না। তবু মুখে ১৯৩৬ সালে যে রিপোর্ট গুরুদেবকে দিয়েছিলাম তার ফলে 'আফ্রিকা' নামক বিপ্লবী কবিতা রবীন্দ্রনাথ লিখে নির্যাতিত মহাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে গেছেন; ২৫০ মিলিয়নের অর্দ্ধেক আমাদের কালো ভাইবোন আজ মুক্ত!

মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান দুই ভাষা আরবী ও ফার্সীতে রবীন্দ্রনাথেরও অনুবাদ হয়েছে। Cairo থেকে Teheran অবধি ঘুরে দেখে এসেছি—তুর্কী ভাষাতেও অনুবাদ আছে। তাই মধ্য এশিয়ায় Soviet প্রজাবা ও রবীন্দ্র-চর্চা—বিশেষ নাটকের প্রয়োগ করে যাচ্ছেন। U. S. S. R রাষ্ট্রসঙ্ঘের সর্বত্র নিজ নিজ ভাষায় যেমন তেমনি রুশ ভাষায় সার্থক অনুবাদ মূল বাংলাকে ভিত্তি করে চলেছে। প্যারীচাঁদ মিত্র থেকে দীনবন্ধু মিত্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত গ্রন্থাবলী রুশ অনুবাদ বেরিয়েছে এবার রবীন্দ্রশতাব্দী সংস্করণ শুরু করে পূর্ব-পশ্চিমের যেন যোগসেতু হয়েছে সোভিয়েট! তাদের অন্তর্গত ছোটখাট Baltic States-এও দেখছি নিজ নিজ ভাষায় রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ চলছে। আর Polish, Rumania, Bulgaria, Servia এবং Czecoslovakia, Hungary প্রভৃতি Slav ও non-Slavic ভাষায়-ও অনুবাদ হচ্ছে। তার মধ্যে চেক্ পণ্ডিত V. Lesly শান্তিনিকেতনে এসে বাংলা শেখেন। কবিকে বাংলায় চিঠি লিখেন ও Prague থেকে বহু ভাষাভিত্তিক অনুবাদ প্রকাশের সূত্রপাত করেন।

জার্মান বড় ভাষা। কিন্তু মূল থেকে অনুবাদ হয়নি যদিও বই বিক্রি ভাষাই সবচেয়ে বেশী করেছিল Kurt Wulf (Munich) প্রকাশনী সেটি নিজে দেখে এসেছি। আমার বন্ধু প্রমথনাথ রায় Italyতে 'লিপিকা' ইতালীয় ভাষায় প্রকাশিত করে প্রশংসা পেয়েছেন। ইংরেজীর পীঠস্থানে বাংলা জানা ইংরেজ লেখক কেউ নেই বলে ইংরেজ অনুবাদক রবীন্দ্রনাথ পাননি তবে সাহায্য নিয়ে Thompson 'বিদায় অভিশাপ' ও Sturge moore 'কর্ণ-কুন্তী' অনুবাদ করেন, হয়ত Soviet এর তাড়ায় ইংরেজ লেখকরাও ক্রমশঃ এগোবেন। Oxford এ যেমন Thompson তেমনি Cambridgeএর J. D. Anderson বাংলায়

রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখতেন। (সবুজপত্র দ্রষ্টব্য) তাই 'বাংলা ছন্দ' বিষয়ে রচনাটি আমরা পেয়েছি। রাজকবি Robert Bridges ও মেসফীল্ড (Masefield) একসময়ে রবিভক্ত হলেও রাজসম্মান (Knighthood) তাঁদের পত্র রবীন্দ্রনাথ যেন 'ত্যক্তপুত্র' হয়েছিলেন এমনকি Rothenstein ও Yeats প্রভৃতির পরবর্তী রচনায় তার ছায়া পড়েছে, রবি যেন 'রাহুগ্রস্ত' হয়েছিলেন। তবু ১৯২১ সনে Canada তাঁকে নিমন্ত্রণ করে Philosophy of Leisure বক্তৃতা শোনে এবং ১৯৩০ সনে তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে দেখি Oxford Manchester কলেজে বই লিখে Religion of Man আগ্রহে শোনেন। Quaker শান্তি বাদীদল Horace Alexander ও Mureel Lester, Agatha Harrison প্রভৃতি আমার কাছে রবীন্দ্রনাথের উচ্চ প্রশংসা করেছেন আর W. Pearson সাহেব বাংলা শিখে বহু রচনা অনুবাদ করে Modern Reviewতে ছেপে গেছেন। Andrews গান্ধিজী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আজীবন সংযোগ রক্ষা করে গেছেন। এঁদেরও ইংরেজ-ভক্ত হিসেবে স্মরণ করি।

আমরা সবাই এক সঙ্গে বসে দেখেছি বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথকে Latin ভাষায় অভিনন্দন দিচ্ছেন Oxford বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ও ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ বোলপুরের মাঠে। কারণ কবির পক্ষে Oxford যাত্রা অসম্ভব। ১৯৩০ সনের সেই ঘটনা হয়ত ভবিষ্যতের সূচনা করে যখন Gitanjali, Religion of Man প্রভৃতির রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে নানাদেশের সুধী মণ্ডলী তাঁর জন্মভূমি বাংলায় আসবেন তার জন্য আমাদেরও প্রস্তুত হতে হবে। এইটি স্মরণ করিয়ে গুরুদেবকে ২৫শে বৈশাখে তাঁর প্রথম শতাব্দী-পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রণাম জানাই।

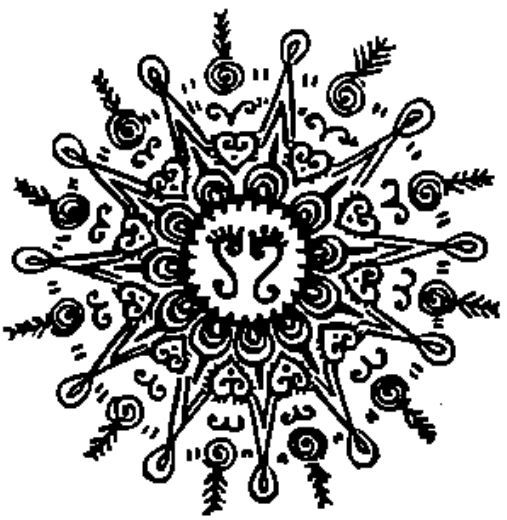

রবীন্দ্রপ্রতিভার একটি প্রকাশ ॥

অরবিন্দ পোদ্দার ॥

"কিন্তু এই নৈরাশ্যের মধ্যেই এই কথাও মনে আসে যে, দুর্গতি যতই উদ্ধতভাবে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠুক, তবু তাকে মাথা তুলে বিচার করতে পারি। ঘোষণা করতে পারি তুমি অশ্রদ্ধেয়, অভিসম্পাত দিয়ে বলতে পারি "বিনিপাত"……আজ পেয়াদারূপীরূপে হাড় গুঁড়িয়ে দেতে পারে, তবু তো আগেকার মতো হাতজোড় করে বলতে পারিনে, দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা, বলতে পারিনে, তেজীয়ান যে তার কিছুই দোষের নয়। বরঞ্চ মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি, তারই দায়িত্ব বড়ো, তারই আদর্শে তারই অপরাধ সকলের চেয়ে নিন্দনীয়।" এই বিস্ময়কর কথাগুলোর রচয়িতা যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের জনসাধারণের সংগ্রামের এক বিশেষ অভিব্যক্তি ধ্বনিত। এই রবীন্দ্রনাথ তাই আজকের সমস্যা-জর্জর অরাজক ভারতবর্ষের নিকট অপরিহার্য।

উদ্ধৃত পংক্তিগুলো রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর' গ্রন্থের কালান্তর শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া। 'কালান্তর' শুধু বিস্ময়কর গ্রন্থ নয়, ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের—তার নবজাগৃতির দীক্ষা, আদর্শ, প্রাচীন ঐতিহ্য, সংঘাত, ব্যর্থতা, চরিতার্থতা ইত্যাদি সম্পর্কে, এক কথায় ভারতের ঘটমান বর্তমান সম্পর্কে এক উজ্জ্বল ভাষ্য! এমন ভাষ্য কোনো ইতিহাস-বেত্তার রচনায়ও দুর্লভ। তাঁর বিশ্লেষণ যেমন কঠোর, তাঁর ভাষণের আন্তরিকতার তেমনি প্রগাঢ় ও সজল। এই গ্রন্থপাঠে মানসপট যে সত্যের আলোয় প্রদীপ্ত হয় তা হলো এই—এখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জাতীয়তা-বোধ অনুভব ও সর্বপ্রকার অত্যাচারবিরোধী প্রতিজ্ঞা দ্বারা আমাদের এক দুর্লভ দৃঃসাহসে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, অন্ধকারকে ধিক্কার দিয়ে মানুষকে তার অপ্রমেয় শক্তিতে স্বাধীনতার স্থিত হতে বলেছেন।

অথচ, আশ্চর্য এই, যে বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করে কালান্তরের রবীন্দ্রভাষণ আন্দোলিত বিক্ষুব্ধ, তা মূলত রাজনৈতিক। প্রত্যক্ষ রাজনীতির সহিত রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিন্ন হলেও তিনি যে আজীবন কী দুরতীব্র নিষ্ঠায় ও দেশের প্রতি মমত্ববোধে রাজনৈতিক ভাবনায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন, সত্য ও সংগ্রামশীলতার ঐশ্বর্যশীল ঐতিহ্য রক্ষণে যত্নবান ছিলেন, তা আমাদের মুগ্ধ বিস্মিত করে। এই সব ভাবনায় বিচলিত না হলেও তো তিনি পারতেন! বিত্তের আভিজাত্য তাঁদের ছিল। সাম্প্রতিক আভিজাত্যের উত্তরাধিকারও তাঁর ছিল; আরও ছিল দেশের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ ও রাজনৈতিক চিন্তানায়কদের সঙ্গে আদর্শগত বিরোধ। সুতরাং আভিজাত্য ও বিরোধের কথা স্মরণে রেখে তিনি ঐসব ভাবনা থেকে সহজেই মুক্তি গ্রহণ করতে পারতেন, অথবা রাষ্ট্রসমস্যা কবির সমস্যা নয় বলে তিনি আপন মানসভুবনে অনায়াসেই আশ্রিত থাকতে পারতেন। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈশিষ্ট্যই এই যে, তিনি যেমন ইউরোপীয় ব্যক্তিস্বাধীনতা ও কর্মশীলতার নির্যাসটুকু আত্মস্থ করেও গ্রাম বহির্বিশ্বের কর্মযজ্ঞের নিকট আত্মবিক্রয় করেন নি, তেমনি দেশের বহমান জীবনস্রোত ও জনমনের জীবন-ভাবনার সঙ্গে আত্মিক মিল সন্ধানেও তিনি ছিলেন ব্যাকুল। এই ব্যাকুলতা তাঁর জীবনের প্রতিটি স্তরে প্রতিটি কর্ম ও ভাবনায় প্রকট। সেজন্যই, দেশের রাষ্ট্রভাবনা এবং রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মের রূপরীতি রূঢ় হওয়া সত্ত্বেও এবং নিজের চেয়ে সর্বদাই অমিলের আধিক্য

থাকা সত্ত্বেও একে তিনি বর্জন করতে পারেন নি—কখনও না। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সত্য সত্যই জীবনের প্রাঙ্গণ থেকে নয় প্রাঙ্গণের মধ্যে সংসাধিত হয়েছে তাঁর পলায়ন। জীবনের মধ্যেই তাঁর পলায়ন; এখানেই তাঁর বিহার, তাঁর নীড়, তাঁর সমুদয় ভাবনার আশ্রয়। এই আশ্রয়ের অভাব ঘটলে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র হ'তেন শুধু, রবীন্দ্রনাথ হতে পারতেন না।

সমগ্রভাবে গ্রহণ করে যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা লাভ করেছি তাঁর সাধনা, ভারতবর্ষের নিপীড়িত মানুষকে উন্নততর সাংস্কৃতিক পরিবেশের অধিকার দান করা এবং মুক্তির সপ্রতিভ আনন্দে মহিমময় করা। এই আজীবন সাধনায় মোহমুগ্ধ অন্ধ বৈরতার বিরুদ্ধে নিস্রাহীন সংগ্রাম যেমন সত্য সাম্রাজ্যবাদী ও সামাজিক অত্যাচার উৎপীড়ন নৃশংসতার বিরুদ্ধে আমরণগত সংগ্রামও তেমনি ক্লান্তিহীন। মানবিক বিকাশের উচ্চতর পর্যায়ে মানুষের উত্তরণকে যদি সম্ভাবনাযুক্ত করতে হয়, তবে পথের অবাঞ্ছিত দুর্লঙ্ঘ্যগুলোকে অতিক্রম করতেই হবে। তাঁর মানবিক বিশ্ববোধ ঐ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ছিল বলেই তিনি য়ুরোপীয়, এশীয় বা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উন্মত্ত মানবিকতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে গর্জে উঠেছেন। 'কালান্তর' গ্রন্থ থেকে আরও একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যাক: "ক্রমে ক্রমে দেখা গেল য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয় মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে। তাই একদিন কামানের গোলা আর আফিমের পিণ্ড এক সঙ্গে বর্ষিত হলো চীনের মর্মস্থানের উপর। ……ওদিকে আফ্রিকার কঙ্গো প্রদেশে য়ুরোপীয় শাসন যে কী রকম অকথ্য বিভীষিকায় পরিণত হয়েছিল সে সকলেরই জানা। আজও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোজাতি সামাজিক অসম্মানে লাঞ্ছিত, এবং সেই জাতীয় কোনো হতভাগ্যকে যখন জীবিত অবস্থায় দাহ করা হয়, তখন শ্বেতচর্মী নরনারীরা সেই পাশব দৃশ্য উপভোগ করবার জন্যে ভিড় করে আসে।

অন্তরের অপ্রমেয় শক্তি, তেজ এবং শুভবুদ্ধিতে বলশালী হয়ে তিনি সাম্রাজ্যবাদকে "বিনিপাত" বলে অভিসম্পাত দিয়ে গেছেন, এবং ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের সংগ্রামশীল ঐতিহ্যে ও মানবধর্মী প্রত্যয়কে আদর্শের এক সুউচ্চ শিখরে স্থাপন করে গেছেন। সেই আদর্শের উত্তরাধিকার আমাদের, রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষের। দেশের "অকাল-জরা-জর্জরিত, আত্মবিশ্বাসী ভীরু, অসত্য-ভাষাবনত মূঢ়"—দের সম্বোধন করে কবি যে লিখেছেন, আজ ক্ষুদ্র ঈর্ষায় ক্ষুদ্র বিদ্বেষে আত্মক্ষয়ী কলহে প্রবৃত্ত হওয়ার সময় নেই, তুচ্ছ আশা তুচ্ছ পরমানের জন্য ভিক্ষুকের মত কাড়াকাড়ি করার দিনও আজ নয়, মিথ্যা অহঙ্কারে গৃহকোণের অন্ধকারে আত্মবিস্মৃত অস্তিত্ব বহন করার সময়ও আর নেই, আমাদের অসীম ব্যর্থতার লজ্জা থেকে চিরকালের মত বাঁচার জন্যে মৃত্যুঞ্জয়ী মহৎ মনুষ্যত্বের পথে এগিয়ে যেতে হবে—রবীন্দ্রনাথের উদাত্ত কণ্ঠের সেই আহ্বান আমরা শুনতে পেয়েছি। এই সংগ্রামী রবীন্দ্রনাথ আমার প্রিয়তম।

আমাদের জাতীয় জীবন নানাবিধ গ্লানি ও অন্যায়ের স্বীকৃতিতে কলুষিত; সেই কলুষ-কালিমা থেকে আমরা রবীন্দ্র-প্রদর্শিত পথেই আত্মরক্ষা করে পুনরুজ্জীবিত হতে পারি। তাঁর মানব-মৈত্রীর মহামূল্য সত্যটি আমাদের অন্তরে প্রস্ফুটিত হলেই শোষণ অত্যাচারের অরণ্যে মুক্তি ও সৌন্দর্যের রসবৃষ্টি হবে, মানুষেরই ঘরে মানুষ প্রতিষ্ঠিত হবে। এই রবীন্দ্রনাথকে আমাদের মানসপটে সর্বদা উজ্জীবিত রাখা আমাদের জাতীয় স্বার্থের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের জন্ম

শতবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা বিগত বৎসর যেসব উৎসব অনুষ্ঠান ইত্যাদি করেছি তাতে রবীন্দ্র মানসের অন্য অনেক দিকের পরিচয় পাওয়া গেলেও এই রবীন্দ্রনাথ প্রায় সর্বত্রই উপেক্ষিত থেকেছেন। এ যে কতো বড় লজ্জার তা বর্ণনাতীত।

রবীন্দ্রপ্রতিভার আরেকটি মহত্বের দিক লোক-সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অনুরাগ। এবং তার সঙ্গে আত্মিক যোগসূত্র স্থাপন। পূর্বেই কথিত হয়েছে যে, মানবসম্বন্ধের বৃহত্তর পটভূমিকায় স্থাপন করে তিনি তাঁর দেশ, কাল, জাতি এবং মানুষকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন; এবং সে পথেই তিনি আমাদের আত্মসচেতন করার জন্য সারা জীবন ধরে সচেষ্ট ছিলেন। সেই আত্মসচেতনতার তাগিদেই লোকজীবনের মূলের দিকে, উৎসের দিকে তাঁর যাত্রা। রবীন্দ্রনাথই তো বরাবর আমাদের বলে এসেছেন যে, বাইরের রাষ্ট্রীয় জীবনের যে কলরব; যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি আর রাজা ও রাজ্যের ভাঙ্গাগড়া উত্থানপতন ইত্যাদি ইতিহাস নয়; ইতিহাস হলো সমগ্রজীবনের নিভৃত নিঃসঙ্গ গতি, তার ধীর প্রবাহ এবং সংস্কৃতির নিঃশব্দ রূপান্তর।

সমগ্রজীবনের প্রতি সেই শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং নির্ভরশীলতার জন্যই লোক সংস্কৃতির প্রতি তাঁর এমন নিবিড় আকর্ষণ। আমাদের দেশের আবহমান কাল হইতে আসা সমগ্রজীবনের অপ্রমেয় প্রাণ শক্তির উপর তাঁর অবধা ছিল অকৃত্রিম। একথা তিনি বলেছিলেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশে যে শোষণ চালিয়েছে তাতে আমাদের দেশের মানুষের বেঁচে থাকার কথা নয়; কিন্তু, তারা মরেনি। বেঁচে আছে; আর শুধু তাই নয়, তাদের দুঃখবেদনার কথা সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশও করে। কত বড়ো প্রাণশক্তির অধিকারী হলে যে এটা সম্ভব তাই ভেবে রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য হয়েছিলেন। নিজের জীবনেও কবি তাই বারবার সমগ্রজীবনের প্রাঙ্গণে ছুটে গিয়েছেন, দেখতে চেয়েছেন কোথা থেকে আউল-বাউল-বৈষ্ণবের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, কোন গোপন নিভৃতে মরমীয়া সাধক ভারতের মর্মবাণীটুকু সযত্নে ধারণ করে আছেন তা অনুসন্ধান করেছেন। এইরূপ অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে তিনি যেমন আপন অভিজ্ঞতা, জীবনবোধ এবং উপলব্ধিকে অধিকতর সরস, অর্থবহ ও বৈচিত্র্যময় করেছেন, তেমনি সমগ্রজীবনের মর্মবাণীও তাঁর কণ্ঠকে আশ্রয় করে নবীনতর ব্যঞ্জনায় সত্য করে তুলেছেন। বাংলা দেশের নিভৃত পল্লীর মাঠে-বাটে আকাশে যে সুর প্রতিনিয়ত বাজে এবং যে সুরের মধ্যে বোবা মাটি বোবা মানুষের ক্রন্দন শুনতে পাওয়া যায়, এবং প্রকৃতপক্ষে যে সুরের মধ্যে সমগ্র দেশেরই হৃদয়-কলরোল খুঁজে পাওয়া যায়, তার নিকট রবীন্দ্রনাথের ঋণ অপরিসীম। জন্মগত ও সংস্কারগত ব্যবধান থাকলেও রবীন্দ্রনাথ অবলীলাক্রমে সেই ব্যবধান উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন, এবং অত্যন্ত সহজেই সেখানে তিনি বিচরণ করতে পেরেছেন।

অনেক বিস্মৃতপ্রায় গ্রামীণ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলো তিনি পুনরুদ্ধার করেছেন, অথবা পুনরুদ্ধারের প্রেরণা দিয়েছেন। লোকসঙ্গীত, ছড়া, লৌকিক উপকথা, গাথা, এমন কি বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরাকাহিনীর মধ্যেও তিনি নতুন অর্থের ইঙ্গিত পেয়েছেন; এবং মুক্ত রাজ আনন্দ যথার্থ বলেছেন যে, গ্রামীণ জীবনের সেই পুরাতন প্রতীকগুলোকে তিনি আপন মানস-সংগ্রামের বাহন বা অস্ত্র হিসাবে নিপুণভাবে ব্যবহারও করেছেন।

সেজন্য, লোকসংস্কৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগের মধ্যে শহুরে কৃত্রিমতার কোন স্বাক্ষর নেই। অন্তরের স্বাভাবিক গরজই তাঁকে সেই পথে টেনে নিয়ে গেছে; নিজের দেশের জীর্ণ কুটীরে

এবং সাহিত্য মানুষের মধ্যে শতাব্দীকালের দেশকে আবিষ্কার করার প্রেরণা তো আমরা তাঁর কাছ থেকেই লাভ করেছি। দেশের জাতীয় কবি এবং দেশের মানুষ যে এক দিক থেকে অভিন্ন, রবীন্দ্রনাথ তার প্রমাণ। কারণ, তিনি শুধু গ্রহণ করেননি, দিয়েছেনও ; এবং দিয়েছেন অপর্যাপ্ত অপার দাক্ষিণ্যে। জনচিত্তের আর্তি আহরণ করে, তার কণ্ঠের সুর আহরণ করে। সেই আর্তি এবং সেই সুরই তিনি পুনরায় জনগণকে ফিরিয়ে দিয়েছেন তাঁর কাব্যের মাধ্যমে সঙ্গীতের চিত্তবিহ্বল সরলতায়। এটাকে তাঁর কৃতিত্ব অথবা মহত্ত্ব যাই বলি না কেন, রবীন্দ্রনাথ যা-ই স্পর্শ করেছেন তাতেই তাঁর প্রতিভার অনন্য স্বাক্ষর রেখে গেছেন। লোকসঙ্গীত ও শিল্পের ক্ষেত্রেও তাই। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রসিক মাত্রই জানেন, বাংলার গেয়না গাজীর সুর ও বর্ষবাউলের নিকট তাঁর কত কতোটা। কিন্তু, সেই ঋণের মধ্যেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, বাংলার বাউল ও কীর্তন গানকে তিনি আপন বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধতর করেছেন ; এবং করে জনজীবন থেকে সংগৃহীত সম্পদ পুনরায় জনসাধারণকেই প্রত্যর্পণ করেছেন। এভাবে উভয়েই অর্থাৎ কবিমানস ও লোক-সংস্কৃতি পারস্পরিক মিলনে উপকৃত হয়েছে।

লোক সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রমানসের এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থেকে এই সত্যের আভাস মেলে যে, কালের অন্তর প্রেরণা ও জনচিত্ত প্রতিভায় আবির্ভাবের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে ; এবং সেজন্য মহৎ সাহিত্যের ভিত্তি বৃহত্তর জনজীবনের মূল স্পর্শে বিস্তৃত, সেই জীবনের দর্পণ রূপেই তার আবির্ভাব। শিল্পীর ব্যক্তিক চেতনা এর উপস্থিত উৎস হলেও এবং তাঁর একক অনুভব উপলব্ধি প্রত্যক্ষভাবে সাহিত্যের স্রষ্টা হলেও জনজীবনের সঙ্গে গভীরতরভাবে সম্পর্কিত হয়েই সাহিত্য তার কালজয়ী গুরুত্ব ও অর্থে মণ্ডিত হয়। বৃহত্তর এই উৎসের আশ্রয় না পেলে সাহিত্য বাঁচে না। জীবনের রূপকার মহৎ শিল্পীও সেজন্য একান্ত স্বাভাবিকভাবেই জনজীবনের সহিত, তার সংগ্রাম, স্বপ্ন ও প্রেরণার ধ্যানের সঙ্গে আপন আত্মার সংযোগ অনুভব করেন ; তাদের কাছ থেকে তাঁর দূরে থাকার কোনো উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথেরও ছিল না। তাঁর প্রতিভার অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ও জাতি, শিল্পীর ব্যক্তিক চেতনা ও দেশের চেতনা, কবি-মানস ও লোক-মানস এক দুর্লভ প্রেমে মিলিত বলেই তিনি মহৎ, এবং ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় কবি।

———

রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস

রথীন্দ্রনাথ রায়

'বউঠাকুরাণীর হাট'-কেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস বলা হয়। কিন্তু এই উপন্যাস প্রকাশের (১৮৮৩) প্রায় পাঁচ বছর আগে তিনি উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছিলেন। 'ভারতী' পত্রিকার প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা থেকে (আশ্বিন ১২৮৩) প্রায় একবছর (ভাদ্র ১২৮৪) তিনি 'করুণা' উপন্যাসের সাতাশটি পরিচ্ছেদ লিখেছিলেন। উপন্যাসটি অসমাপ্তই থেকে যায়। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনুমান করেছেন: "আশ্বিন মাসে বিলাত যাত্রা করায় বইটি সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। উপন্যাস-রচনা বিষয়ে কবির পরবর্তী জীবনের অভ্যাস দেখিয়া মনে হয় তিনি 'করুণা' মাসে মাসে লিখিয়া পত্রিকায় দিতেছিলেন; সমগ্র বইখানি একসঙ্গে লেখেন নাই। বিলাত চলিয়া যাওয়াতে উহা আর শেষ হইল না।" পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারেও উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়নি। সম্প্রতি শনিবারের চিঠি'-তে (বৈশাখ ১৩৬৮) অসমাপ্ত উপন্যাসখানি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে এর কোনো উল্লেখ করেন নি।

'করুণা' উপন্যাস রচনার আগে কবি 'ভারতীর' প্রথম দুইসংখ্যায় (শ্রাবণ, ভাদ্র ১২৮৪) 'ভিখারিণী' গল্প প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম গল্প যে তাঁকে বিস্তৃত পটভূমিকায় উপন্যাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল, এ বিষয় অনুমান করা কঠিন নয়। এই যুগে কবি যে সমস্ত আখ্যায়িকা কাব্য রচনা করেন, তাদের সঙ্গে অসমাপ্ত উপন্যাসটির একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে। তুচ্ছ গল্পাংশকে উচ্ছ্বসিত অতিভাষণ ও সুদীর্ঘ বর্ণনার সাহায্যে ভারাক্রান্ত করা হয়েছে। এ যুগের কাব্য ও উপন্যাসে প্রায় একই জাতীয় অপরিণতির চিহ্ন বিদ্যমান।

'করুণা' উপন্যাসে বঙ্কিম-পর্বের বাংলা উপন্যাসের লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট। ঘটনাবাহুল্য, অতিনাটকীয় আকস্মিকতা, কাহিনীগ্রথনের শৈথিল্য প্রভৃতি কয়েকটি দুর্লক্ষণ এ যুগের অপেক্ষাকৃত খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকদের রচনাতেও পরিস্ফুট হয়েছে। বলা বাহুল্য ষোল বছরের কবিবিশোরের পক্ষেও এই দুর্লক্ষণগুলি থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। তবু বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস পর্যালোচনায় কবির এই অপরিণত প্রথম উপন্যাসটিকে উপেক্ষা করা যায় না।

সাতাশ পরিচ্ছেদের অসম্পূর্ণ উপন্যাসের প্রথমে একটি নাতিদীর্ঘ 'ভূমিকায়' পূর্বকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সে-যুগের অনেক লেখক ইতিহাসাশ্রিত রোমান্টিক কাহিনী রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম উপন্যাসেই ইতিহাসকে বর্জন করে সামাজিক পটভূমি গ্রহণ করেছেন। পরবর্তীকালে 'বউঠাকুরানীর হাট' ও 'রাজর্ষি' উপন্যাসে কবি ঐতিহাসিক পটভূমির অস্ফুট আভাস দিয়েছেন বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক যুগজীবনের চেয়ে একটি নির্বিশেষ ভাবরসই সেখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। তবে এ দুটি উপন্যাসও বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রতিধ্বনি নয়। আসল কথা, ঐতিহাসিক উপন্যাস কবির স্বক্ষেত্র নয়। 'করুণা' উপন্যাস এই সত্যটিকে স্পষ্টতর করেছে।

'করুণা' উপন্যাসে দুটি কাহিনীর ধারা সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়েছে। একুশটি পরিচ্ছেদ ঐভাবে চলার পর একসঙ্গে মিলেছে। একটি কাহিনী নরেন্দ্র-করুণার আর একটি কাহিনী মহেন্দ্র ও বন্ধুবীর। উনিশ

শতকের প্লটসর্বস্ব উপন্যাসে ঘোরালো ও জটিল প্লট রচনার দিকে লেখকদের আগ্রহের অন্ত ছিল না। কতকগুলি রোমাঞ্চকর ঘটনার সৃষ্টি করে খাদ্যরোধকারী আবহাওয়ার সঞ্চার করা হ'ত। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রন্থনের শৈথিল্য লক্ষ্য করা যেত। 'করুণা'ও এর কোনো ব্যতিক্রম নয়। উপন্যাসের মূল কাহিনী দুটি অনেক আগেই মিলিয়ে দেওয়া যেত—কিন্তু দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমান্তরালভাবে চললেও তারা মিলতে পারে নি। কোনো কোনো সময় ব্যবধান এত কমে এসেছে যে, মনে হয় যেন তারা পায়ে-পায়ে এসে পড়েছে। মহেন্দ্র যখন নরেন্দ্রদের বলে মিলতে আরম্ভ করেছিল, তখনই দুটি কাহিনী সমন্বয় করার একটি বড়ো সুযোগ ছিল। রঘুনাথ সার্বভৌমকে কাহিনীতে একটি বিশিষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু মূল দুটি গল্প প্রবাহের কোনোটির সঙ্গেই তিনি অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত নন।

চরিত্রগুলি আড়ষ্ট—সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্বদ্যোতক নয়। পণ্ডিতমশাই ও নিবির চরিত্র ছাড়া কোন চরিত্রই তেমন ফুটে ওঠেনি। পণ্ডিত মশায়ের সরলতা ও উৎকেন্দ্রিকতা উপন্যাসের মধ্যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। সাংসারিকজ্ঞানশূন্য এই সরল মানুষটির চরিত্রকে কিশোর কবি সামান্য কয়েকটি রেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন: "সাধারণ পণ্ডিতদের সহিত তাঁহার আর কোন বিষয়ে মিল ছিল না তিনি খুব টস্‌টোসে রসিক পুরুষ ছিলেন না, বা ঘট্‌ঘটে ঘটপট-বাগীশ ছিলেন না, দলাদলির চক্রান্ত করিতেন না, শাস্ত্রের বিচার লইয়া বিবাদে লিপ্ত থাকিতেন না, বিদায় আদায়ের কোন আশাই রাখিতেন না, কেবল মিল ছিল প্রশস্ত উদরটিতে, নস্যের ডিবাটিতে, ক্ষুদ্র টিকিটিতে ও অক্লান্তবিহীন মুখে।" চতুর্থ পরিচ্ছেদে পণ্ডিত মশায়ের দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহবর্ণনা আছে। এই অংশটি স্বতঃস্ফূর্ত ও অনাবিল কৌতুকরসের নির্ঝর। নিরীহ পণ্ডিত-মশায়কে বিড়ম্বিত ও বিপর্যস্ত করার মধ্যে একটু বাড়াবাড়ি আছে। কিন্তু এই আতিশয্যই কৌতুকরসকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। সমাজসংস্কারক গদাধর বাবুর সঙ্গে পণ্ডিতমশায়ের দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী কাত্যায়নী ঠাকুরাণীর গৃহ-ত্যাগ ও পত্নীবিরহে পণ্ডিতমশায়ের নির্যাতন কাহিনী বর্ণনা (সপ্তদশ পরিচ্ছেদের) ব্যর্থ হয় নি। পরবর্তীকালে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'মডেল ভগিনী'-র (১৮৮৬-১৮৮৮) উপর প্রভাব বিস্তার করেছে বলে মনে হয়। মডেল ভগিনীর নায়িকা কমলিনীর বর্ষীয়সী ব্রাহ্মণপণ্ডিত স্বামী রাধাকান্ত ভাগবতভূষণের নির্যাতন ব্যাপারটির সঙ্গে ভাবগত ঐক্য আছে। তবে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনার মধ্যে নির্দোষ কৌতুকরস সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই, কিন্তু যোগেন্দ্রচন্দ্র নীতি প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়েই উপন্যাস রচনা করেছেন।

নরেন্দ্র ও স্বরূপ দুজনাই নরপশু, কোনো মানবীয় দুর্বলতা দিয়ে তাদের চরিত্রকে স্বাভাবিক করে তোলা হয়নি। তার ফলে তারা ঘরে পরিণত হয়েছে। সার্থক উপন্যাসের ঘটনাংশ অন্তর্নিহিত রসের তাগিদেই রচিত হয়। বাইরে থেকে যদি ঘটনার আমদানি করা হয়, তা কাহিনী বা চরিত্রের সঙ্গে কোনো সংযোগ রক্ষা করতে পারে না, বাইরের জিনিস বাইরেই থাকে। মহেন্দ্রের কাশী স্টেশনে আকস্মিক আবির্ভাব, স্বরূপের এলাহাবাদ যাত্রা প্রভৃতি ঘটনা যেন গল্পটিকে কোনো মতে চালিয়ে নেওয়ার জন্যই এসেছে। করুণার নামানুসারে উপন্যাসটির নামকরণ করা হয়েছে। কিন্তু করুণার প্রভাব কোথাও খুব স্পষ্ট নয়। করুণা অস্পষ্ট ছায়া, রক্ত মাংসের মানবী নয়। রজনী ও মোহিনীর চরিত্র তার চেয়ে অনেক বেশী পরিস্ফুট। স্বরূপের সঙ্গে করুণার কাশীযাত্রা করুণা চরিত্রের বিরোধী।

করুণা চরিত্রের যত অপূর্ণতাই থাকে না কেন, এ চরিত্র প্রধানত রবীন্দ্রনাথেরই রচনা। রজনী ও মোহিনী বঙ্কিমচন্দ্রের তুলিতে অঙ্কিত। এই পর্বের আখ্যায়িকাকারের কোনো কোনো নায়িকার সঙ্গে করুণা চরিত্রের আত্মিক সম্পর্ক ও নিকট জ্ঞাতিত্ব অনুমান করা যায়। কমলা (বনফুল); মৃণালা (ভগ্নহৃদয়) ও অমিয়া (কৃষ্ণচরিত্র) চরিত্রের অনেক ভাবসাদৃশ্য করুণা চরিত্রে বিদ্যমান। এরা সকলেই এক অস্পষ্ট ভাবলোকের অধিবাসিনী। তাই করুণা, কমলা বা মৃণালা কারো পরিণতিই ট্র্যাজিক বেদনার উদ্রেক করে না। ছায়ালোকের জীব তারা—অন্ধকারেই তাদের পদধ্বনি মিলিয়ে যায়! তবে কাব্যের ক্ষেত্রে যার ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব, উপন্যাসের ক্ষেত্রে তার তেমন জবাবদিহি সম্ভব নয়।

'করুণা' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে বিষবৃক্ষের। সে যুগে 'বিষবৃক্ষ' বাংলা সামাজিক উপন্যাসের স্ট্যাণ্ডার্ড হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথও একাধিকবার বিষবৃক্ষের উল্লেখ করেছেন। 'চোখের বালি'র ভূমিকায় প্রথমেই বিষবৃক্ষের কথা আছে। এমন কি 'রাজসিংহ' আলোচনা করতে গিয়েও বিষবৃক্ষ সম্পর্কে সপ্রশংস মন্তব্য করেছেন: 'রাজসিংহ দ্বিতীয় বিষবৃক্ষ হয় নাই, বলিয়া আক্ষেপ করা সাজে না। বিষবৃক্ষের সুতীব্র সুখ দুঃখের পাকগুলা প্রথম হইতেই পাঠকের মনে কাটিয়া কাটিয়া বসিতেছিল; অবশেষে শেষ কয়টা পাকে হতভাগ্য পাঠকের একেবারে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসে।" মোহিনী চরিত্রটি কুন্দনন্দিনীর ছায়ায় রচিত। তৃতীয় পরিচ্ছেদে মোহিনী ও মহেন্দ্রের মনের কথা বিষবৃক্ষ উপন্যাসে নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীর অনুরূপ হৃদয়াবেগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সমাজ সংস্কারকদের যে ব্যঙ্গচিত্র আছে, তার সঙ্গে তারাচরণ ও তার সংস্কারপন্থী বন্ধুদের অত্যন্ত নিকট সাদৃশ্য আছে। সংস্কারকদের দৃষ্টি শেষে বিধবা মোহিনীর উপর নিবদ্ধ হল। বিষবৃক্ষ সংস্কারকদের লক্ষ্য হয়েছে কুন্দনন্দিনী। দীর্ঘকাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ বিষবৃক্ষকে আদর্শ উপন্যাস মনে করেছেন। সুতরাং অপরিণত বয়সে উপন্যাস রচনার প্রাথমিক প্রচেষ্টায় যে বিষবৃক্ষের সংস্কার প্রবল হয়ে উঠত তাতে বিচিত্র কি!

'করুণা' উপন্যাস লেখার প্রায় সাত বছর পর রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথ বসুর কাছে 'ভারতী' পাঠিয়ে দিয়ে উপন্যাসটি সম্পর্কে তাঁর মতামত চেয়েছিলেন। উপন্যাসখানি পড়ে মনীষী চন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে যে সুদীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন, তা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চিঠিখানিতে উপন্যাসটির নিপুণ বিশ্লেষণ আছে, তার সঙ্গে দোষ গুণকেও খুঁটিনাটিভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি মহেন্দ্র চরিত্রের আর একটু বিশ্লেষণ করেছেন: "মহেন্দ্র বাড়ী আসিবার সময় অনুরাগ ও লজ্জা এই উভয় ভাবের বশবর্তী হইয়া আসিতেছিল। অতএব লজ্জাবশত আসিতে আসিতে, তাহার এক একবার যেন ইতস্তত করা স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। এবং সেই কারণে সোজা পথ ছাড়িয়া একটু বাঁকিয়া বাঁকিয়া কাশীতে যাওয়া বেশ সঙ্গত। আমার মনে হয় যে এই রকম করিয়া মহেন্দ্রের কাশী যাওয়ার কথাটা বলিলে মহেন্দ্রের গল্পের···দোষ থাকে না।"

পণ্ডিত মশায়ের গল্প সম্পর্কে চন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন: "···সেই জন্যই আমার দুঃখ হয় যে, কি মহেন্দ্রের কি নরেন্দ্রের গল্প কোনটিরই সহিত তাহা বিশিষ্ট রূপে জড়িত নয়। একটু ভাল করিয়া জড়াইয়া দেওয়া যায় না কি? গল্পের তিনটি সূতাই বেশ ভাল পাকের সূতা, কিন্তু তাতির বুনন কিছু আলগা হইয়াছে।" করুণা ও রজনী চরিত্র সম্পর্কেও তাঁর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য: "করুণাকে আমি ঠিক বুঝিয়াছি কিনা বলিতে পারি না।

তবে এ কথা বলিতে পারি যে, করুণা কেবল একটি কল্পনা মাত্র—মানবচরিত্র নয়; রজনী প্রকৃত মানবচরিত্র। করুণা কর্মক্ষেত্রে আসিবার জিনিস নয়; রজনী কর্মক্ষেত্রের জিনিস।" চিঠিখানির শেষদিকে চন্দ্রনাথ লিখেছেন: "পত্রটি পুস্তকাকারে ছাপান আবশ্যক। কিন্তু পত্রের বাঁধনি একটু শক্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে।"

চন্দ্রনাথ বসুর এই পত্রটি যথার্থ রসজ্ঞের বিচারে পরিবেশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নিতান্ত অপরিণত রচনাও যে তখনকার প্রধান গুণগ্রাহীদের অকুণ্ঠ অনুমোদন লাভ করেছিল, চিঠিখানি তার প্রমাণ। চিঠিখানি ১৭ আশ্বিন, ১২৯১-এ ৪নং রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রীট থেকে লেখা হয়। দীর্ঘকাল ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সংগ্রহে ছিল। পরে বিশ্বভারতী পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয় (১৩৫১, চতুর্থ সংখ্যা।)

রবীন্দ্র উপন্যাসের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনায় 'করুণা'র আর একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি' উপন্যাসে ইতিহাসের স্পর্শ থাকলেও, রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত নয়। ঐ দুখানি উপন্যাসে বঙ্কিমপর্ব থেকে কবির নিজস্ব ক্ষেত্রে পদক্ষেপের অস্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান। উপন্যাসের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে বঙ্কিম প্রভাবকে অতিক্রম করতে না পারলেও তার একটি প্রতিস্রোতিগুণ প্রচেষ্টা আছে। কিন্তু 'করুণা উপন্যাসে কবি বঙ্কিমপর্বেরই পদানুসারী। 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' থেকে রবীন্দ্র উপন্যাসের যাত্রা শুরু হলে খানিকটা যেন ফাঁক থেকে যেত। তাই কবির এই অসম্পূর্ণ অপরিণত উপন্যাসখানি উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিম রবীন্দ্র সম্পর্ককে অধিকতর যুক্তি সঙ্গত ও স্পষ্টতর করে তুলেছে।

মনের একটি অন্ধকার পর্ব চলেছে রবীন্দ্রনাথের ঊনপঞ্চাশোত্তর জীবনে।

"শান্তিনিকেতনের ছাদের উপর মাদুর পেতে পড়ে থাকতুম, প্রবল একটা আবেগ এসেছিল ভিতরে। চল, বাইরে চল, যাবার আগে তোমাকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে হবে, সেখানকার মানুষের সুখদুঃখের উচ্ছ্বাসের পরিচয় পেতে হবে। সে সময়ে বিদ্যালয়ের কাজে বেশ ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কি হল। রাত দুটো তিনটের সময় অন্ধকার ছাদে এসে মনটা পাখা বিস্তার করল। যাই যাই এমন একটা বেদনা মনে জেগে উঠল। × × × আমার মনে হচ্ছিল, একটা কিছু ঘটবে, হয়তো মৃত্যু।"

একটি অপরূপ নাটক সৃষ্টি হল কবিমনের এই অবস্থা থেকে—ডাকঘর।

এই এক সৃষ্টির রহস্য—বার বার মন কেঁপে কেঁপে উঠেছে কী এক অজ্ঞাত চঞ্চলতায় আবেগের আন্দোলনে আহত হচ্ছে মন, মনের মধ্যে চলেছে ভাবের আনা-গোনা—শান্তি এল সমস্ত কিছুকে বাণীরূপ দানের মধ্যে।

॥ ভারতপন্থ ও পশ্চিমে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী ॥

সুদর্শন পাল

সন্ত কবীর বলতেন, শততন্ত্রী বীণার প্রতি তারে যেমন ভিন্ন সুর, কিন্তু সে ভিন্ন সুরের জন্য একটি তারকেও বাদ দেওয়া চলেনা। তাদের সবার একটি সমন্বয়-ধর্মী সুরসাধনা চাই। ভারতের সর্ব সাধনার সমন্বয়ে যে সাধনা তাই তার নিজস্ব সাধনা। কোন সাধনাকেই হোক না তা যতই অকিঞ্চিৎকর বাদ দেওয়া চলেনা। হেলায় ধূলায় মলিন করা চলে না। তাইতো কবীর দেখেছেন, "শংখ বীণা সত ধুন উঠৈ।" সর্বপন্থের সমন্বয়-বীণার সত্য সুর উঠছে বেজে। যা সমন্বয়-সাধনা তা-ই ভারতীয় সাধনা। এ সাধনার নাম দিয়েছেন কবীর, "ভারতপন্থ।"

এ "ভারতপন্থ" কোনদিনই বাইরের আভরণে মণ্ডিত হয় নি, যেহেতু অন্তরলাভ অন্তরের কক্ষ কোণ থেকেই সম্ভব। ভারতবাসীর পরিচয় তার পোষাকটাই নয়, ভারতবর্ষের উপরের ঝড়ের ইতিহাসটা ভারতবর্ষের ইতিহাস নয়। রবীন্দ্রনাথ এ কথাটাই বলেছেন তাঁর অপূর্ব অনুপম ভঙ্গীতে,

"ঝড়ের দিনে যে ঝড়ই সর্বপ্রধান ঘটনা, তাহা তাহার গর্জনসত্ত্বেও স্বীকার করা যায় না; সে দিন-ও সেই ধূলিসমাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যে পল্লীর গৃহে গৃহে যে জন্মমৃত্যু সুখদুঃখের প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহা ঢাকা পড়িলেও মানুষের পক্ষে তাহাই প্রধান। কিন্তু বিদেশী পথিকের কাছে এই ঝড়টাই প্রধান, এই ধূলিজালই তাহার পক্ষে আর-সমস্তই গ্রাস করে; কারণ সে ঘরের ভিতরে নাই, সে ঘরের বাহিরে সেইজন্য বিদেশীর ইতিহাসে এই ধূলির রূপ, ঝড়ের কথাই পাই; ঘরের কথা কিছুমাত্র পাইনা। সেই ইতিহাস পড়িলে মনে হয়, ভারতবর্ষ তখন ছিলনা, কেবল মোগল-পাঠানের গনমুষল বার্ত্তাবহ শুষ্ক পত্রের ঝড়া তুলিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং পশ্চিম হইতে পূর্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। ..... বর্তমানে পাঠ্যগ্রন্থের বহির্ভূত সেই ভারতবর্ষের সংগেই আমাদের যোগ। সেই যোগের বহুবর্ষকালব্যাপী ঐতিহাসিক সূত্র বিলুপ্ত হইয়া গেলে আমাদের হৃদয় আশ্রয় পায়না। আমরা ভারতবর্ষের আগাড়া-পরশাছা নহি, বহু শত শতাব্দীর মধ্য দিয়া আমাদের শতসহস্র শিকড় ভারতবর্ষের মর্মস্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে এমন ইতিহাস আমাদিগকে পড়িতে হয় যে, ঠিক সেই কথাটাই আমাদের ছেলেরা ভুলিয়া যায়। মনে হয়, ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা যেন কেহই না, আগন্তুক-বর্গই যেন সব।" (ভারতবর্ষের ইতিহাস)

বাইরের যে ঝড়টা তা হল পলিটিক্যাল ঝড়; সে ঝড়টাই আসল ভারতবর্ষের নয়। তা-ই যদি হত, তবে কবীর, নানক, চৈতন্যের জন্ম কখনো সম্ভব হত? বা বহু বহিরাগত জাতিকে এমনভাবে আত্মীয়বৎ গ্রহণ করে একান্তভাবে ভারতবর্ষীয় পরিবারভুক্ত করা কি সম্ভব ছিল?

য়ুরোপে "নেশন" বলে, "রিলিজন" বলে দুটো শব্দ আছে। দুটোই ভারতবর্ষের কাছে অপরিচিত, ভারতবর্ষের চিন্তার সমন্বয়-সাধনায় চিন্তায় তা কোনদিন স্থান পায় নি।

কবি বলছেন, "সম্প্রতি ইউরোপীয় শিক্ষাগুণে ন্যাশনাল মহত্ত্বকে আমরা অত্যধিক আদর দিতে শিখিয়াছি। অথচ তাহার আদর্শ আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে নাই। আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ কিছুই নেশন-গঠনের প্রাধান্য স্বীকার করে না। (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা)

য়ুরোপের 'রিলিজন' কখনো মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি; ভারতবর্ষের ধর্ম মানসিক বিচ্ছেদ গঠনে বাধা দেয়—আমাদের বুদ্ধি বিশ্বাস আচরণ, আমাদের ইহকাল পরকাল, সমস্ত জড়াইয়াই ধর্ম। ভারতবর্ষ তাহাকে খণ্ডিত করিয়া কোনোটাকে লোকালয়ে এবং কোনোটাকে আটপৌরে করিয়া রাখে নাই।" (ভারতবর্ষের ইতিহাস)

য়ুরোপীয় ও আমাদের প্রাচ্যাদর্শ নিয়ে কবির আলোচনা চিন্তাসমৃদ্ধ। উদ্ধৃতিতে শেষ করা যায় না। কারণ, এ আলোচনাগুলোতে তাঁর দূরদৃষ্টি, দার্শনিক মন এবং বিশ্বভাব এমনভাবে স্পষ্ট হয়েছে, প্রতিটি প্রবন্ধেরই যেন ওজন আছে। কোনোটাই লঘুগুরু নয়। অনুপম তাঁর প্রকাশভঙ্গী, কত সরল তাঁর সত্যদৃষ্টি। য়ুরোপীয় সভ্যতা ও ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' আলোচনায় বলছেন।

"আমাদের হিন্দু সভ্যতার মূলে সমাজ, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি। সামাজিক মহত্ত্বেও মানুষ মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রনৈতিক মাহাত্ম্যেও। কিন্তু আমরা যদি মনে করি, য়ুরোপীয় ছাঁচে নেশন গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য তবে আমরা ভুল বুঝিব।"

'নববর্ষ' প্রবন্ধে য়ুরোপের চরিত্রের বস্তু-সর্বস্বতা, সেখানকার মানুষে-মানুষে অবিশ্বাস, স্ত্রীলোকদের প্রতিসম্পর্কে তাচ্ছিল্যের ভাব ইত্যাদি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, শ্রেষ্ঠত্বের আসল সংজ্ঞা কী, কোন্‌টা আসলে শ্রেষ্ঠ—ভারতীয় না য়ুরোপীয় সভ্যতা।

ভারতের বাইরে পাশ্চাত্য দেশগুলোতে আজ রবীন্দ্র-চর্চা বেড়েছে প্রবল হারে। শতবার্ষিকী উৎসব পালনোপলক্ষে বিশেষ রীতিমত উৎসাহ দেখা দিয়েছিল। এবং রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা এখন দুর্দম। সেকারণে রাশিয়া এবং বৃটেন বাদ দিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোতে রবীন্দ্র-চর্চার এ ধারা এক নূতন দিগদর্শন তৈরী করতে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতেই বৃটেনে এবং রাশিয়ায় উভয় দেশেই প্রচুর সম্মান কুড়িয়ে এনেছিলেন।

তখন থেকেই তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা জন্ম নিতে শুরু করেছিল রাশিয়ায়। এখন রাশিয়ায় লক্ষ লক্ষ রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে। মূল বাংলা থেকে রবীন্দ্রনাথকে জানবার এবং বুঝবার এ চেষ্টা রাশিয়ায় এক যুগান্তকারী ঘটনা। এর দ্বারা যদি কেউ রাজনৈতিক কারণ সন্ধানে ব্যাপৃত হয়েন, তবে তিনি ভুল করবেন। কারণ, রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রচার পুস্তিকার সামিল নয়। বরঞ্চ, তাতে আত্মজিজ্ঞাসার উৎস-দ্বার খুলে যায়। স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং স্বাধিকার চেতনায় ব্যক্তির বিকাশকে সমৃদ্ধ করে। এ আত্মজিজ্ঞাসা মানুষের জীবনবোধকে পরিপক্ক করে তুলতে সহায়তা করে। রাশিয়ায় আজ রবীন্দ্র-চর্চা এমন দ্রুতহারে হচ্ছে। শুধু রাশিয়ায় নয়, সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে। চেকোশ্লোভাকিয়া, পোলাণ্ড, জার্মানী, আমেরিকা, যুগোশ্লোভিয়া ইত্যাদি দেশে-ও।

প্রাচ্যজগতকে টানছি নে এ প্রসঙ্গে। কারণ, প্রাচ্যজগতে রবীন্দ্রনাথের কদর বরাবরের। প্রথম কারণ, প্রাচ্যদেশসমূহ পারস্পারিক ভাবের বিচারে, দর্শনের এবং ধর্মের বিচারে মোটামুটিভাবে ঐক্যসূত্রে বদ্ধ। বিশ্বসাহিত্য এবং তাঁদের আত্মার আত্মীয় বিশ্বধরেণ্য কবিকে অন্তরে ১৯১৩ সালের পর থেকেই গ্রহণ করেছেন। মিশর, ইরাণ, ইন্দোনেশিয়া, বার্মা, চীন, ইন্দোচীন, শ্যাম প্রভৃতিকে নিয়ে কবির মনে এক স্বপ্ন বরাবরের ছিল। প্রাচ্যজগতের রসসন্ধানে কবি বহুবার বেরিয়েছেন, যেমন আমরা মাঝে মাঝে দূরপ্রবাসী আত্মীয়ের খবর নিতে যাই। সেজন্য প্রাচ্যদেশসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে এ বিচার আজ নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু য়ুরোপের জঙ্গীবাদ, বস্তুসর্বস্বতা, জাতীয়তাবাদ এবং বিচ্ছিন্নরাজ্যগঠন-প্রবণতাকে বার বার আঘাত করেছেন কবি। প্রকাশ্য দিবালোকে। এবং য়ুরোপের বুকে বসে। চুপি চুপি কোন লোভের কাছে তিনি মাথা নীচু করেন নি। তা-ই নিয়ে বহু বিক্ষোভ, সমালোচনা, আস্ফালনের ঝড় উঠেছিল য়ুরোপের। সেদিন কবি যা বলেছিলেন, আজ তারা দেখতে পাচ্ছেন অক্ষরে অক্ষরে চোখের সামনে মানবজাতির কী দুঃসহ গ্লানি আর অপমানিত অস্তিত্বের প্রতিদিনকার কাহিনী হয়ে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রাজ্ঞ এক ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সে কথাগুলো ফলে যাচ্ছে।

কবি তখন বেরিয়েছেন ইউরোপের নগরে নগরে। ১৯২৬ সাল। মিলানে এলেন। তাঁকে আদর জানানো হলো। তিনি সরাসরি তাঁর সেখানকার শ্রোতাদের জিজ্ঞেস করলেন :

"Do you realize how rigid ugliness is everywhere apparent—in your cities, in your commerce, the same monotonous mask—so that nowhere is there room for living expression of the spirit ?.....Your very science is becoming your destroyer.".....

তাঁর উক্তি নিয়ে সেদিন যে বিরক্তির সঞ্চার হয়েছিল ইটালীর শহরে তার ঢেউ গিয়ে পৌঁছল আমেরিকায়। আমেরিকা উত্তাল হ'ল বিক্ষোভে। কিন্তু কবি কি ভুল বলেছিলেন ? 'মানুষের ধর্ম' বলে যে বইটি বিশ্বময় তোলপাড় করেছে, মানুষকে উন্মুখ, আত্মদর্পণে মুখ দেখতে বাধ্য করেছে, তাতে মানুষের একটি চেহারা আছে : "মানুষের সেই প্রকাশই শ্রেষ্ঠ যা একান্ত ব্যক্তিগত মনের নয়, যাকে সকল কালের সকল মানুষের মন স্বীকার করতে পারে। বুদ্ধির বর্বরতা তাকেই বলে যা এমন মতকে এমন কর্মকে সৃষ্টি করে যাতে বৃহৎকালের চরজনীন মন আপনার সায় পায়না।" কবির 'মহামানব' এই মানুষ। দু দুটো যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছেন বেদনাহত চিত্তে। ইউরোপের জার্মানী, ইটালীর রাজ্যলিপ্সা এবং রাজ্যপরিচালনার চরম অবিশ্বাস মানুষের মনকে ফ্যাসিজমের পথে নিয়ে যায়—সব তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন। ছোট ছোট রাজ্যগুলোর অসহায়তা আর তারি প্রতিপক্ষ বড় বড় রাজ্যগুলোর প্রচণ্ড দম্ভ যা উগ্র জাতীয়তাবাদের জন্মদান করে—কবির মনকে পীড়া দিয়েছে নিরন্তর। মিউনিক চুক্তি কী ভাবে লঙ্ঘন করলেন হিটলার এবং চেকোস্লোভাকিয়ার সেদিনকার হিটলারের হাতে এই অসহায়ত্বে লর্ড চেম্বারলেনের নির্লিপ্তভাব—কবিকে দুর্দান্ত আঘাত দিল। সেদিন মিউনিক-গ্রহসনে তিনি ডঃ লেসলীকে লিখেছিলেন : "এটি একটি মর্মান্তিক উপলব্ধি যে, মানবতার সমস্ত নীতির ভাগ্য, যার জন্য তিন শতাব্দী ধরে পশ্চিমের লোকেরা শহীদ হয়েছে তা ন্যস্ত রয়েছে ভীরু অভিজাতকের হাতে, যারা নিজেদের চামড়া বাঁচাবার জন্য তা বিক্রী করছে। দেখে ঘেন্না লাগে যে গণতান্ত্রিক লোকেরাও নিজেদের সমগোত্রীয়দের বিশ্বাসঘাতকতা করে, যেখানে এমন কী গুণ্ডারা একে অন্যের পাশে দাঁড়ায়। এ সব কথা ভেবে আমি এত অপমানিত আর অসহায় বোধ করেছি, আধুনিক সভ্যতার যা কিছু মূল্য সব একে একে প্রত্যাহৃত আর আমরা এত অসহায় এবং অশক্ত যে তা রোধ করতে পারছি না। আমাদের দেশ-ও তাই শিকার হয়েছে। আমার তাদের এমন কোনো ক্ষমতা নেই যা এই উন্মাদদের আক্রমণ বন্ধ করতে পারে অথবা যারা মানবতার রক্ষক বলে জাহির করে তাদের পরিত্যাগ কেউ ঠেকাতে পারে না। আমি শুধু তাদেরই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যারা এখনো পুরো উন্মাদ হয়নি, যখন মানুষ পশু হয়ে যায়, তখন অচিরেই একজন আর একজনকে ছিঁড়ে খায়।"

তাছাড়া চীনের ওপর জাপান জাতীয়তাবাদের আক্রমণ দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন। বিখ্যাত জাপানী কবি নোগুচীকে সতর্কবাণী শোনালেন জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে। কবি লিখলেন, "জাপানী সভ্যতার দৌধ এক মহলা—সে হচ্ছে তার সমস্ত শক্তি এবং দক্ষতার নিকেতন। সেখানকার ভাণ্ডারে সব চেয়ে বড়ো জিনিস যা সঞ্চিত হয়, সে হচ্ছে কৃতকর্মতা, সেখানকার মন্দিরে সব চেয়ে বড়ো দেবতা বাস্তবিক স্বার্থ। জাপান তাই সমস্ত য়ুরোপের মধ্যে সহজেই আধুনিক অর্থনিধি শক্তি উপাদক নবীন হার্শনিবদের কাছ থেকে মন্ত্র গ্রহণ করতে পেরেছে।" (জাপানযাত্রী)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু আগে কবি গেলেন মার্কিন মুলুকে। আকাশ কালো করে যে ঝড় আসছিল, তাতে খেতশ্মশ্রু কবি মানবেতিহাসের এক বীভৎস রূপ দেখতে পেলেন। শান্তির বাণী প্রচার করতে লাগলেন। 'Nationalism' বইটা বেরিয়েছে। এ বই পড়ে কিছু যুবক যুদ্ধ বর্জন করেন। যুদ্ধবিরোধী ইস্তাহারে সই করেন রোমা রোলাঁর অনুরোধে। সে খবর পেয়ে মার্কিন শিল্পকেন্দ্র হেট্রয়েটের এক অর্থবাদী কাগজ লিখল,"রবিঠাকুরের চিনি মেশানো তিক্ত বিষ যদি কোনও কাজে লাগে তা শুধু তরুণদের বিভ্রান্ত করা।"

ঝড়ের বেগে তিনি চিরটা কাল অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাড়া দিয়েছেন। বঙ্গভঙ্গ, জালিয়ানওয়ালাবাগ, সিঙ্গলীবন্দীদের উপর গুলীচালনার প্রতিবাদে, য়ুরোপীয় জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি সবকিছুর বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রেরণা জুগিয়েছে।

আর সবচেয়ে বড় যে জিনিসটির উপর তিনি চিরটা কাল গুরুত্ব দিয়েছেন, তা হ'ল মানুষের উপর বিশ্বাস রাখা। এ বিশ্বাস অম্লান রাখতে চেয়েছেন। তিনি "সভ্যতার সঙ্কট" এ কথা লিখেছেন, "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।"

য়ুরোপের বাইরের রূপটা তাঁকে যতবার মর্মপীড়া দিলেও তিনি জাপানযাত্রী'তে লিখছেন :

"আমাদের সঙ্গে য়ুরোপের আর কোথাও মিল-যদি না থাকে, এই বড়ো জায়গায় মিল আছে। আমরা অন্তরতর মানুষকে মানি—তাকে বাইরের মানুষের চেয়ে বেশি মানি। .....এই অন্তর মহলে মানুষের যে মিলন সেই মিলনই সত্য মিলন"।

ভারতপন্থ-ই কবির দর্শন। তাই নিরাসক্ত দৃষ্টিতে বিশ্ব-দর্শন লাভ করেছিলেন। জার্মান কবি গোটে একমাত্র পুরুষ বিশ্বসাহিত্যে যিনি রবীন্দ্রনাথের পূর্বে "বিশ্বদর্শন"এর কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, পূব-পশ্চিমকে মিলিয়ে দাও। গোটে ও ভারতীয়-দর্শনমুগ্ধ কবি ছিলেন।

এ 'ভারতপন্থ' রবীন্দ্রনাথকে সত্য দৃষ্টিলাভে সাহায্য করেছে, এ ভারতপন্থ তাঁকে বিশ্বদৃষ্টিলাভে প্রেরণা দিয়েছে। আর ভারতপন্থ ও আসলে 'বিশ্বপন্থ'। সবাকার সমন্বয় সাধন—ভারতপন্থের মূল কথা। এখানে বিচ্ছেদের কথা অনুপস্থিত, বর্জনের কথা অনুচ্চারিত। এখানে এক কথা। অনুপম এবং মনুষ্যত্বের ধর্মরক্ষার আজন্ম পিপাসায় যা আকাঙ্খিত সে কথা হল মিলন।

এ ভারতপন্থকে তোপী য়ুরোপ ভুল বুঝেছে। ভুল বুঝেছে বহুযুগ। ভুল বুঝেছে বলেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, হিরোশিমা নাগাসাকি, কোরিয়া, সাম্প্রদায়িকতা, ভিয়েটনাম, সাওল, সর্বোপরি আণবিকিরিয়া আজ প্রতি মুহূর্তের কর্মপদ্ধতি। মন থেকে 'শান্তি' উধাও।

কবির ভারতপথ বুঝেছিলেন রোমা রোলাঁ। বুঝেছিলেন, আইনষ্টাইন : "Thou sawest the fierce strife of creatures, a strife that wells forth from need and dark desire. Thou sawest the escape in calm meditation and in creations of beauty, cherishing these, thou hast served mankind all through a long and fruitful life, spreading everywhere a gentle and free thought in a manner such as the seers of thy people have proclaimed as Ideal."

জার্মানীর মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক পল নাটোপ বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সংগে আলাপ করার পর :

"Rabindranath Tagore, however, is a miracle to man to us because he has succeeded in remaining a man in the midst of the 20th century and he is still a man in his sixtieth year. He knows how to meet men in a human way however they may behave."

আমার বক্তব্য হল, ভারতপথ এমন একটি বিরল মন্ত্র যেখানে বিশ্বব্যাপী হানাহানি পথ হারিয়ে ফেলে, যেখানে মানব কল্যাণের প্রশ্ন উজ্জ্বল বর্তিকার মত জ্বল্‌জ্বল্ করে। আজ পৃথিবীব্যাপী অবিশ্বাস, হানাহানি, ক্ষমতামদমত্ততায় সাধারণ মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। পশ্চিম পূবের দিকে ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ তাদেরকে চিনতে সাহায্য করেছেন এই পূবের মুখ। যদিও দুঃখের সংগে বলতে হয়, পূব মুখস্থ করতে চাচ্ছে পশ্চিমী রাষ্ট্রনীতির কেতাব। পশ্চিম নিজের কেতাব ভুলে পূবের সমাজ কল্যাণ সংঘের কাছে শিক্ষা নিতে চাচ্ছে। তাই কবির জন্মশতবার্ষিকী পৃথিবীর সমস্ত দেশেই উৎসাহ ও শ্রদ্ধার সংগে হতে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখ হল সেই পূবের মুখ। পশ্চিমী দুনিয়া আজ তাই রবীন্দ্রনাথের পাঠ গোগ্রাসে গিলতে চাচ্ছে।

সে বছর কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে একটি সাহিত্য সম্মেলন ও অনুষ্ঠিত হল। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি।

অপূর্ব ভাষণ দিলেন রবীন্দ্রনাথ, বললেন—বাঙালিকে আমরা যে 'বাঙালী' বলিয়া অনুভব করিতেছি তাহা মানচিত্রে কোনো কৃত্রিম রেখার জন্য নহে।

কবির মতে এর মূলসূত্র বাংলা ভাষা। বাংলার সাহিত্য সকল দেশবাসীর মধ্যে যথার্থ মিলন সেতু রচনা করেছে।

নূতন একটি মন্ত্র দিলেন দেশবাসীকে—'দেশকে জানো'।

কঠোর পরিশ্রমে, জীবনব্যাপী সাধনায়, কর্মে মর্মে আত্মদানে এই মন্ত্র সফল করে তুলতে হবে আজকের উত্তরসাধককে।

ডায়েরীর পাতা

—শান্তা দেবী

নিজেকে চিত্রশিল্পী বলতে পারি না, কারণ নাতি-নাতনীদের ঝাঁঝায় ফুল পাখি ঘোড়া আঁকা ছাড়া অন্য কোন শিল্পচর্চা আজকাল করি না। কিন্তু অল্প বয়সে ছবি আঁকার শখ ছিল। যখন কলেজ থেকে পাশ করে বেরোই তখন আমার বাবা একদিন অকস্মাৎ বললেন, : "তুমি ছবি আঁকতে শেখ, আমি নন্দলাল বাবুকে ঠিক করে দিই।" আমার ছোট ভাই প্রসাদ ষোল বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মাটি দিয়ে মানুষের মাথা গড়ার তার অভ্যাস ছিল অতি অল্প বয়সেই। তাকে কেউ কিছু শেখায় নি। এই বালকের অকালমৃত্যুতে বাবার বোধ হয় মনে হয়েছিল অন্য ছেলেমেয়েদের কারুর শিল্পপ্রতিভা জাগে কিনা তিনি চেষ্টা করে দেখছেন। নন্দলালবাবু আমার শিক্ষক নিযুক্ত হলেন।

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে আমরা তখন থাকতাম। প্রবাসী আপিসের পিছনের বাড়ির দোতলায় একটি ঘরে শতরঞ্চি পেতে বসে শিক্ষা নিতাম। একেবারে শিল্পের অ আ ক খ থেকেই শুরু করেছিলাম। প্রথম প্রথম ফুল পাতার নকল আঁকতে দিলেন। নিজে এঁকে আমাকে কপি করতে বলতেন না। আমি কি আঁকি আগে তা দেখতে চাইতেন। তারপর সেইটুকু অবলম্বন করে নিজের বক্তব্য বলতেন। প্রকৃতিতে আমরা যত রকম আকৃতি দেখি তাকে কত ভাগে ভাগ করা যায় তার সহজ পন্থা তিনি বলে দেন। আগে এসব ভেবে দেখি নি কখনও।

রং দিয়ে কাজ করার চেষ্টা প্রথম থেকেই করান। কাঠের কৌটা, পিতলের মূর্তি, পাথরের থেলনা ইত্যাদি আঁকার ভিতর দিয়ে কাঠের কাঠত্ব, ধাতুর ধাতুত্ব, প্রস্তরের প্রস্তরত্ব কি করে রেখায় ও রঙে ফুটে ওঠে তাঁর কাছেই বুঝি। আগুন, জল, মেঘ প্রভৃতির Character কি করে দেখানো যায়, অল্প কথায় ও অল্প তুলির টানে মাস্টারমশাই বুঝিয়ে দেন। প্রকৃতিতে যে রং যেমন ভাবে অন্য রঙের সঙ্গে সাজানো থাকে আমাদের তা দেখে শিখতে বলতেন।

অজন্তা গুহা চিত্রাবলীর রেখাঙ্কনের প্রতিলিপি তিনি আমার জন্য এনে দিতেন। সেগুলির সাহায্যে জীবজন্তু ও ক্রমে মানুষের মুখ-হাত-পা'র নানা রূপ আঁকা অভ্যাস করি। তিনি বলতেন 'মানুষ আঁকা সব চেয়ে শক্ত।' তবু মানুষ আঁকার শখ হত। তিনি নিরুৎসাহ করতেন না।

খুব অল্পদিনেই মাস্টারমশায় ছবি compose করতে উৎসাহ দিতে লাগলেন। দুই চারটা ছবি দাঁড় করানো গেল। সেই সূত্রেই রঙের কাজ শিখতে লাগলাম। যখন আঁকায় একটু ভরসা এসে গেল তখন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে নন্দলালবাবু কলকাতা ছেড়ে শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে চলে গেলেন। কাজেই কিছুদিনের মতো তাঁর সাহায্য পাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

গগনবাবু উৎসাহ দিলেন অবনবাবুর কাছে গিয়ে শিখতে। তাই যাওয়া শুরু করলাম। অবনবাবুর কাছে যে সব ছবি নিয়ে যেতাম তার কয়েকটা প্রবাসীতে ছাপা হয়েছিল। অবনবাবুর কাছে শিক্ষার বিষয় বহুদিন আগে একবার লিখেছিলাম। যদি সে লেখাটা খুঁজে পাই তো সে সব কথা আবার বলব।

এরপর কিছুদিনের জন্য আমিও শান্তিনিকেতনে গেলাম। এখানে আবার নন্দলালবাবুরই ছাত্রী হলাম। তখন কলাভবনের বর্তমান বাড়ি হয় নি। পিয়ার্সন সাহেবের বাড়ির দোতলায় আমাদের ক্লাস হত। সে সময় মাসোজি, হরেন্দ্র চক্রবর্তী, মণি গুপ্ত, ধীরেন্দ্র দেব বর্মন প্রভৃতি উচ্চ ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। মেয়েদের মধ্যে প্রধানত ছিলাম আমি ও শ্রীমতী হাতিসিং [প্রমদা ঠাকুর]।

মাস্টারমশাই আমাদের প্রকৃতিকে ভালো করে দেখতে বলতেন। শিরিষ ফুল, জবা ফুল, আম গাছ, পেপে গাছ, তাল, নারিকেল প্রত্যেকের বিশেষত্ব দেখাতেন। অতি অল্প সময়েই রেশমের উপর আঁকা, কাঠের উপর আঁকা, এবং কাগজে আঁকার টেকনিক শিখেছিলাম। প্রাচীন কাংড়া চিত্রের নকলও করেছিলাম।

মাস্টারমশাই খুব কম কথা বলতেন, কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের তাড়াতাড়ি গড়ে তুলতেন। ভ্রমণে তাঁর খুব উৎসাহ ছিল। তাঁর সঙ্গে গোরুর গাড়ি চড়ে দূরগ্রামে মেলা দেখতেও আমরা গিয়েছি। তিনি বলতেন, "মেলায় যে বিশেষ কিছু দ্রষ্টব্য আছে তা নয়। এই যাওয়াটাই একটা আনন্দ।" এই যাত্রার মধ্যেই তিনি কত ছবি খুঁজে পেতেন। মেলায় সাঁওতাল নাচ হত। সেও তাঁর একটা ছবির জিনিস।

আশ্রমের নানা অনুষ্ঠানের ছবিই তো তাঁর তুলিতে অমর হয়ে আছে। বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষণ লক্ষ্মীপুজো, আরও কতো বিভিন্ন ছবি। ছোট ছোট জিনিসও তাঁর কাছে তুচ্ছ নয়। ছাগলছানা, মুরগী, বিশ্বনাথের গলির ষাঁড়, আদুমুখে বক—এই সব সামান্য ছবিও তুলির টানে তিনি জীবন্ত করে রেখেছেন।

তিনি ছবিতে অলংকরণের পক্ষপাতী খুবই ছিলেন। তাতে ছবিগুলির রূপ মণিমাণিক্যের মতোই ঠিকরে পড়ত। কিন্তু শুধু রেখার সাহায্যে আঁকা তাঁর সাঁওতাল দম্পতির ছবি, কি চৈতন্যের বিষাদের ছবি নিরাভরণতায়ই অপরূপ রূপ ধরে আছে। কাঠখোদাইয়ে 'সহজ পাঠে'র ছবি একটা নূতন দিক।

অনেক রকম পদ্ধতিতেই তিনি কাজ করেছেন। সবগুলিতেই তাঁর নিজস্ব প্রতিভা নিজের বিশেষত্ব নিয়ে দেখা দিয়েছে। [এত ছোট আয়গায় অল্প সময়ে আমার মত লোক তা আলোচনা করতে পারবে না।] কয়েক বৎসর পূর্বে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের কলিকাতা শাখা নন্দলালবাবুর ছবির একটি প্রদর্শনী করেন এবং **Album of Nandalal Bose with a Biographical note** নাম দিয়ে একটি সুন্দর বই প্রকাশ করেন। তাঁর অসংখ্য ছবির অতি অল্প সংখ্যকই এতে আছে। সুবিখ্যাত চিত্র "সতী" এবং গুরু অবনীন্দ্রনাথের চিত্র, গান্ধীজির ডাণ্ডীযাত্রার ছবি—এগুলি উল্লেখযোগ্য।

নন্দলাল বসু ১৯১০-এ অজন্তা চিত্রাবলী এঁকে আনার জন্য অসিত হালদার, সমরেন্দ্র গুপ্ত ও ভেঙ্কটাপ্পার সঙ্গে অজন্তা গিয়েছিলেন। তার আগের ও পরের কথা সংক্ষেপে এই বইটিতে আছে।

যুগমানব রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ ॥

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী সেই জাতি, যে জাতির ভিতর বহু মহাপুরুষ বা লোকোত্তর পুরুষের আবির্ভাব ঘটে। আবার, দুর্ভাগ্যের অন্ত নাই সেই জাতির, যে জাতি শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রাতঃস্মরণীয় মহামানবদের স্মরণ করে না, অথবা তাঁহারা যে শ্রেয়ের আদর্শ স্থাপন করেন, সে আদর্শের অনুসরণ করে না। এ কালের বাঙালীর সৌভাগ্যও যেমন অপরিসীম, দুর্ভাগ্যও তেমনই অপরিমেয়।

যাঁহারা লোকোত্তর পুরুষ, তাঁহারা একই সঙ্গে যুগাগ্রগ ও যুগাতিগ, যুগ-প্রতিনিধি ও যুগস্রষ্টা। আতস কাঁচে যেমন সূর্যের রশ্মি সংহত হয়, তেমনি তাঁহাদের মধ্যে একটা সমগ্র যুগের বিচ্ছিন্ন ভাবধারা কেন্দ্রীভূত হয়। তাই কার্লাইলের ভাষায় তাঁহারা 'হিরো', আর এমার্সনের ভাষায় Representative Men বা যুগমানব। যে সকল বরেণ্য মানব একই দেশে ও একই কালে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের চিন্তাধারায় অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকে সত্য কিন্তু 'না সৌ মুনির্যস্ত মতং ন ভিন্নম্'—তাই তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্যও বড় অল্প নয়। এই পার্থক্যের মূল অনুসন্ধান করিতে হইবে তাঁহাদের বংশগতির (heredity) মধ্যে, তাঁহাদের পরিবেশের মধ্যে, এবং দৈহিক ও মানসিক গঠনের ভিন্নতার মধ্যে। বিগত শতকে বাংলা দেশে প্রায়ই এক কালে যে তিনজন মহামনস্বী পুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল এবং বিশ্বের দরবারে যাহারা বাঙালী তথা ভারতবাসীকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চিন্তাধারায় কোথায় সাম্য আর কোথায়ই বা বৈষম্য, তাহা চিন্তা করিলে আমরা পরম লাভবান হইব। আমরা বলিতেছি বিশ্বের বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ, বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র ও দিগ্‌বিজয়ী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের কথা। কিন্তু আমরা বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিব প্রধানত রবীন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথের অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের কথা, শুধু দুই এক স্থলে প্রফুল্লচন্দ্রের কথারও উল্লেখ করিব।

আমরা এখানে রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী অথবা বিচিত্র-পথ গামিনী কবি-প্রতিভার সম্পর্কে কোন আলোচনা করিব না। আমাদের আলোচ্য মনস্বী ও চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ। বর্তমান যুগে পৃথিবীর এমন সমস্যা অতি অল্পই আছে যে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আলোকপাত করেন নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রধানত উপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষিত, তবে ঔপনিষদিক সাধনার সঙ্গে বাউল-বৈষ্ণবের সাধনার ধারাও তাঁহার মধ্যে মিলিত হইয়াছে। এই ত্রিধারায় অবগাহন করিয়াই রবীন্দ্রনাথ ধন্য হইয়াছেন, আর প্রধানত এই ঐতিহ্যের আলোকেই তিনি যুগ-সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দও বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী ও চিন্তানায়ক, বিশ্বের নানা সমস্যার সমাধানের প্রয়াস তিনিও করিয়াছেন। কিন্তু প্রধানত আচার্য শঙ্করের প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদের আলোকে তিনি বিশ্বমানবের নিকট কল্যাণের পথ নির্দেশ করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম ভারতীয় সন্ন্যাসী যিনি বেদান্তের অদ্বৈতবাদকে ব্যবহারিক জগতে প্রয়োগ করিয়াছেন। সেই সঙ্গে তিনি উপনিষদের 'অভী' মন্ত্র গ্রহণ করিয়া দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে বলিষ্ঠ, ব্রহ্মিষ্ঠ, ও মেধাবী করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন, আর সেইজন্যই যথার্থ শক্তি সাধনার প্রয়োজন সম্পর্কে জাতিকে সচেতন করিয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ উভয়েই ভারতীয় সাধনা ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান, উভয়েই প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী কিন্তু

তাঁহাদের পরিবেশ ও শিক্ষাদীক্ষার পার্থক্য এবং মানস প্রকৃতির ভিন্নতার জন্যই নানা বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ঘটিয়াছে।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ উভয়েই প্রাচী ও প্রতীচির মিলনের স্বপ্ন দেখিয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য আছে, তাহা স্বীকার করিয়া লইলেও তাঁহারা কেহই কবি কিপ্‌লিং-এর মত বলেন নাই—

'The East is East and the West is West And the twain shall never meet'.

এই প্রসঙ্গে যে মহাপুরুষ সর্বপ্রথম এই মিলনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, সেই রাজা রামমোহনকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার পার্থক্য রবীন্দ্রনাথ নানা ভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি কোথাও বলিয়াছেন,—'আমাদের হিন্দু সভ্যতার মূলে সমাজ, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি। ...আমরা যদি মনে করি, য়ুরোপীয় ছাঁদে দেশকে গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য, তবে আমরা ভুল বুঝিব'। কখনও বলিয়াছেন—'য়ুরোপ ভোগে একাকী, কর্মে দলবদ্ধ। ভারতবর্ষ তাহার বিপরীত। ভারতবর্ষ ভাগ করিয়া ভোগ করে, কর্ম করে একাকী। য়ুরোপের ধনসম্পদ আরামসুখ নিজের। কিন্তু তাহার দানধ্যান, স্কুল-কলেজ, ধর্মচর্চা সমস্ত দল বাঁধিয়া। আমাদের সুখ-সম্পত্তি একলার নহে; আমাদের দান ধ্যান অধ্যাপন আমাদের কর্তব্য একলার'। কখনও বলিয়াছেন,—পাশ্চাত্যের আদর্শ 'করা', আর ভারতবর্ষের আদর্শ 'হওয়া'। স্বামী বিবেকানন্দও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার পার্থক্য নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আর এক্ষেত্রে তাঁহার ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার মধ্যে আশ্চর্য মিলও দেখা যায়। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—'আমাদের পূর্বপুরুষেরা ধর্মচিন্তায় স্বাধীনতা দিয়াছিলেন; তাহাতেই আমাদের এই অপূর্ব ধর্ম দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা সমাজের পায়ে অতি শুরু শৃঙ্খল পরাইলেন। ...পাশ্চাত্য দেশে সমাজ চিরকাল স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়াছে—তাহাদের সমাজের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখ। আবার অপর দিকে তাহাদের ধর্ম কিরূপ, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিও'। রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন—'অন্যান্য দেশ ধর্মবিশ্বাসে শাস্ত্রের অধীন, আহার বিহার আচারে স্বাধীন; ভারতবর্ষ বিশ্বাসে বন্ধনহীন, আহার বিহার আচারে সর্বতোভাবে শাস্ত্রের অনুগত'। দেখা যাইতেছে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ উভয়েই সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তথাপি, এই উভয় মনীষীই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, প্রাচী ও প্রতীচী একদিন প্রেমে মিলিত হইবে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—'ভারতবর্ষ বশিষ্ঠের মন্ত্রে দীক্ষিত, য়ুরোপ বিশ্বামিত্রের মন্ত্রে চঞ্চল'। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন যে, এই দুই ঋষি যদি প্রেমে মিলিত না হন, তাহা হইলে মানুষের কল্যাণ-যজ্ঞ বারংবার ব্যাহত হইবে। স্বামী বিবেকানন্দও বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ য়ুরোপকে দিবে তাহার অধ্যাত্মসম্পদ আর য়ুরোপ ভারতকে দিবে তাহার বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক শিল্প, তবেই উভয় দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হইবে। রবীন্দ্রনাথও এই 'শিক্ষার মিলনে'র স্বপ্নই দেখিয়াছিলেন। (এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন' ও শরৎচন্দ্রের 'শিক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধ দুইটি স্মরণীয়।)

পৃথিবীর সকল মহামানবের ন্যায় রবীন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দও মানুষের আত্মাকে মহত্তম মর্যাদা দান করিয়াছেন। ভারতের অধঃপতনের অন্যতম কারণ যে অস্পৃশ্যতা বা মানুষে-মানুষে কৃত্রিম ব্যবধান রচনা, সে কথা উভয়েই বজ্রকণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন। আমাদের দেশের স্মৃতি শাস্ত্রকারেরা মানুষের জীবনকে কৃত্রিম বিধি নিষেধের জালে আবদ্ধ করিয়া তাহার ব্যক্তিত্বকে পঙ্গু করিয়াছেন, এই সহজ সত্য কথাটিও উভয়েই বারংবার

প্রচার করিয়াছেন। কারণ, তাঁহারা উভয়েই ছিলেন মানুষের স্বাধীন ব্যক্তি-সত্তায় বিশ্বাসী। অবশ্য তাঁহারা কোঁত্ (Comte) বা মিলের (John Stuart Mill) প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

'হে ভগবান্! আমরা কি মানুষ? ঐ যে পঞ্চবৎ হাড়ী, ডোম, তোমার বাড়ির চারিদিকে, তাহাদের উন্নতির জন্য তোমরা কি করিয়াছ, তাহাদের মুখে এক গ্রাস অন্ন দিবার জন্য কি করিয়াছ, বলিতে পার? তোমরা তাহাদের ছোঁও না দূর-দূর কর। আমরা কি মানুষ? ঐ যে তোমাদের হাজার হাজার সাধু ব্রাহ্মণ ফিরিতেছেন, তাঁহারা এই অধঃপতিত দরিদ্র পদদলিত পরিবারের জন্য কি করিতেছেন? খালি বলিতেছেন, ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না। এমন সনাতন ধর্মকে কি করিয়া ফেলিতেছে! এমন ধর্ম কোথায়? খালি ছুঁৎমার্গ—আমাকে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না'।

যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ পুরোহিততন্ত্রকে বা আদর্শভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ সমাজকে আঘাত করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার ভাষা অত্যন্ত তীব্র হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথও ভারতের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন, এবং এদেশের তথাকথিত উচ্চ বর্ণেরা যে সে আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, সে কথাও নানা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন। 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

'যদি প্রাচ্য ভাবেই আমাদের সমাজ রক্ষা করিতে হয়, যদি য়ুরোপীয় প্রণালীতে এই বহু দিনের বৃহৎ সমাজকে আমূল পরিবর্তন করা সম্ভবপর বা বাঞ্ছনীয় না হয়, তবে যথার্থ ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের একান্ত প্রয়োজন আছে। তাঁহারা দরিদ্র হইবেন, পণ্ডিত হইবেন, ধর্মনিষ্ঠ হইবেন, সর্বপ্রকার আশ্রমধর্মের আদর্শ ও আশ্রয়স্বরূপ হইবেন ও গুরু হইবেন'।

অবশ্য, যথার্থ ব্রাহ্মণ-সমাজ গড়িয়া তুলিতে বিবেকানন্দও চাহিয়াছিলেন। কিন্তু অধঃপতিত উচ্চ বর্ণের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের ভাষা হইয়াছে অধিকতর জ্বালাময়ী। (যেমন 'অতীতের কঙ্কালচয়', 'হাজার বছরের ঘুমি,' 'Kick out priestcraft,' প্রভৃতি)।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বলেন, এদেশের উচ্চবর্ণের লোকেরা স্মৃতির বিধান রচনা করিয়া ও ন্যায়ের কূটতর্কের অবতারণা করিয়া শুধু মস্তিষ্কের অপব্যবহার করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ উভয়ের মধ্যেই ঐতিহাসিক চেতনা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ছিল। 'বর্তমান ভারত' নামক পুস্তিকায় স্বামিজী বিশ্বের ইতিহাসের উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। নানা দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়া তিনি এই কথা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি যথাক্রমে পৃথিবী ভোগ করে। সারা পৃথিবীতে একদিন শূদ্র-বিপ্লব উপস্থিত হইবেই, এই ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,'—সোশ্যালিজ্‌ম্, এনার্কিজম্, নিহিলিজম্ প্রভৃতি এই বিপ্লবের অগ্রগামী দূতী'। সঙ্গে সঙ্গে এই ভবিষ্যদ্বাণীও তিনি করিয়াছেন যে, ভারত যদি তাহার সনাতন আদর্শকে বিসর্জন দেয়, তাহা হইলে সে বাঁচিবে না।

স্বামিজীর এই চিন্তাধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার কতখানি সাদৃশ্য আছে, 'রথের রশি' নাটিকাটির আলোচনা করিলেই তাহা বোঝা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ও স্বামিজীর শিক্ষাচিন্তা, রাষ্ট্রচিন্তা ও সমাজচিন্তার মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল আছে। কিন্তু তাঁহাদের ধর্মচিন্তার মধ্যে যেমন গুরুতর সাদৃশ্য আছে, তেমনি গুরুতর পার্থক্যও আছে। তাহার কারণ, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রধানতঃ রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভাবধারার উত্তরাধিকারী;

'ধর্ম,' 'মানুষের ধর্ম', 'শান্তিনিকেতন', 'পথের সঞ্চয়', প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি ধর্মসাধনার উপর যে আলোকপাত করিয়াছেন, তাহার মূলে আছে ব্যক্তিগত অনুভূতি ও কবিদৃষ্টি। কিন্তু সংশয়বাদী নরেন্দ্রনাথের মধ্যে একদিন যে প্রবল ধর্মজিজ্ঞাসা জাগিয়াছিল, উহারই প্রেরণায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হন ও তাঁহার সকল সংশয় নিরস্ত হয়, তাই ধর্মপ্রচারক বিবেকানন্দ যে প্রধানত শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসাধনারই উত্তরাধিকারী, তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য, পাশ্চাত্য দেশে তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার অধ্যাত্মচেতনার মূলে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের মধ্যে যে মানসপ্রকৃতির পার্থক্য ছিল, তাহাও এই প্রসঙ্গে আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে।

কিন্তু এই দুই যুগমানবের মধ্যে ধর্মসাধনায় যতই পার্থক্য থাকুক, একটি প্রধান বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে ঐকমত্য দেখা যায়। সে কথাটি এই, ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মধ্যে যাহা শাশ্বত, যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব তাহা আমাদিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে, নতুবা আমরা জাতীয় আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মহতী বিনষ্টি প্রাপ্ত হইব। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—'হে ভারত! ভুলিও না, তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর, ভুলিও না, তোমার বিবাহ, তোমার জীবন, তোমার ধন ইন্দ্রিয়সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না, তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত। ভুলিও না, তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ের ছায়া-মাত্র।' আর রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

'জয় হইবে, ভারতবর্ষেরই জয় হইবে। যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, যাহা উদার, যাহা নির্বাক তাহারই জয় হইবে। আমরা, যাহারা ইংরেজি বলিতেছি, অবিশ্বাস করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি, আস্ফালন করিতেছি, আমরা বর্গে বর্গে—

'মিলি মিলি যাওব সাগরলহরী সমানা'। তাহাতে নিশ্চয় সনাতন ভারতের ক্ষতি হইবে না। ভবাচ্ছন্ন যৌনী ভারত চতুষ্পথে মুখচর্ম পাতিয়া বসিয়া আছে; আমরা যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া পুরকন্যাগণকে ছোট ফ্রক পরাইয়া দিয়া বিদায় হইব, তখনো সে শান্তচিত্তে আমাদের পৌত্রদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না, তাহারা এই সন্ন্যাসীর সম্মুখে করযোড়ে আসিয়া কহিবে,—'পিতামহ' আমাদিগকে মন্ত্র দাও।'

তিনি কহিবেন,—'ওঁ ইতি ব্রহ্ম।'

তিনি কহিবেন,—'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।'

তিনি কহিবেন,—'আনন্দব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।' (নববর্ষ, স্বদেশ।)

রবীন্দ্রনাথের কথা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ···

এ নামে ওই বাঙলা দেশ নয়, ভারতবর্ষ নয়—সারা পৃথিবী আজ সসম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় মাথা নত করে! তার কারণ, বাংলা ভাষায় লিখলেও, তাঁর রচনায়, তাঁর ভাবসম্পদে সমস্ত পৃথিবী ধন্য হয়েছে!

তাছাড়া, বাল্মীকি, কালিদাস শেকসপীয়র, গোটে—এঁরা ছিলেন শুধু ভাবরাজ্যের অধীশ্বর; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন ছিলেন ভাবরাজ্যের অধীশ্বর—তেমনি জগৎজীবনে বিরাট কর্মীপুরুষ। কাব্যে, গানে, কথায়, গল্পে—নাট্যে অভিনয়ে,—অর্থাৎ সাহিত্যে, ললিতকলাশিল্পে, সমাজ ধর্মতত্ত্বে, পলিটিকসে—সকল বিষয়ে ছিল তাঁর নিগূঢ় অন্তর্দৃষ্টি—সে দৃষ্টি অন্তর্যামীর মতো! পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ববিষয়ে এমন বিরাট শক্তিমান পুরুষের পরিচয় আর কোথাও মেলে না। সাহিত্যে, অভিনয়ে, পলিটিকসে, স্বদেশপ্রেমিকতায়—এক এক দিকে বহু দেশে বহু দিকপালের আবির্ভাব হয়েছে—কিন্তু তিনি ছিলেন দশদিকপাল। তাঁর শক্তির বিরাটত্ব শুধু উপলব্ধির যোগ্য—তাঁর ব্যাখ্যা স্বল্প পরিসরে করবার চেষ্টা আমি ধৃষ্টতা মনে করি—জ্ঞানীগুণির তা নিয়ে গুণাগুণ ধরে গবেষণা করুন। আমি আজ এ পুণ্যতিথিতে তাঁর ঘরোয়া জীবনের কবি কাহিনী বলবো—এ কাহিনী গুলির সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছিল।

আমি বলছি প্রায় পঁয়ষট্টি বছর আগেকার কথা। তখন স্কুলে নিচের ক্লাসে পড়ি, বয়সে বালক। উষর রবির কিরণ তখন সবেমাত্র পূর্বগগন উদ্ভাসিত করছে। সে সময় অকস্মাৎ রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়লুম—

দিনের আলো নিবে এলো সুযি্য ডোবে ডোবে
আকাশ ঘিরে মেঘ করেছে চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে, রঙের উপর রঙ
মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা বাজলো ঠং ঠং!
ওপারেতে বিষ্টি এলো ঝাপসা গাছপালা,
এপারেতে মেঘের মাথায় একলো মানিক জ্বালা।

পড়ে মশগুল হলুম! তখন পাঠ্যগ্রন্থে যে সব কবিতা পড়তুম তাতে শুধু তত্ত্বকথা আর উপদেশ। আর ওই রামায়ণ মহাভারতে দেব-দানবের অলৌকিক কথা, আমরা যেমন মানুষ তেমন মানুষের সহজ কথা, তেমন মানুষের মনের কোনো ছবি তখনকার দিনের কবিতায় পেতুম না। রবীন্দ্রনাথের এ কবিতা পড়ে মনে হলো, আমরা যা চোখে দেখছি—আকাশে নক্ষত্র দেখে ভাবছি লক্ষ মানিক জ্বালা—এমন কথা তো কোন কবিতায় পাই না।

তার পর পড়লুম—

বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এলো বান—
• • • •
কবে বিষ্টি এসেছিলো বান এসেছিলো কোথা
শিবঠাকুরের বিয়ে হলো, কবেকার সে কথা—
সেদিনো কি এমনিতর মেঘের ঘটাখানা?
থেকে থেকে বিজুলী কি দিয়েছিল হানা?

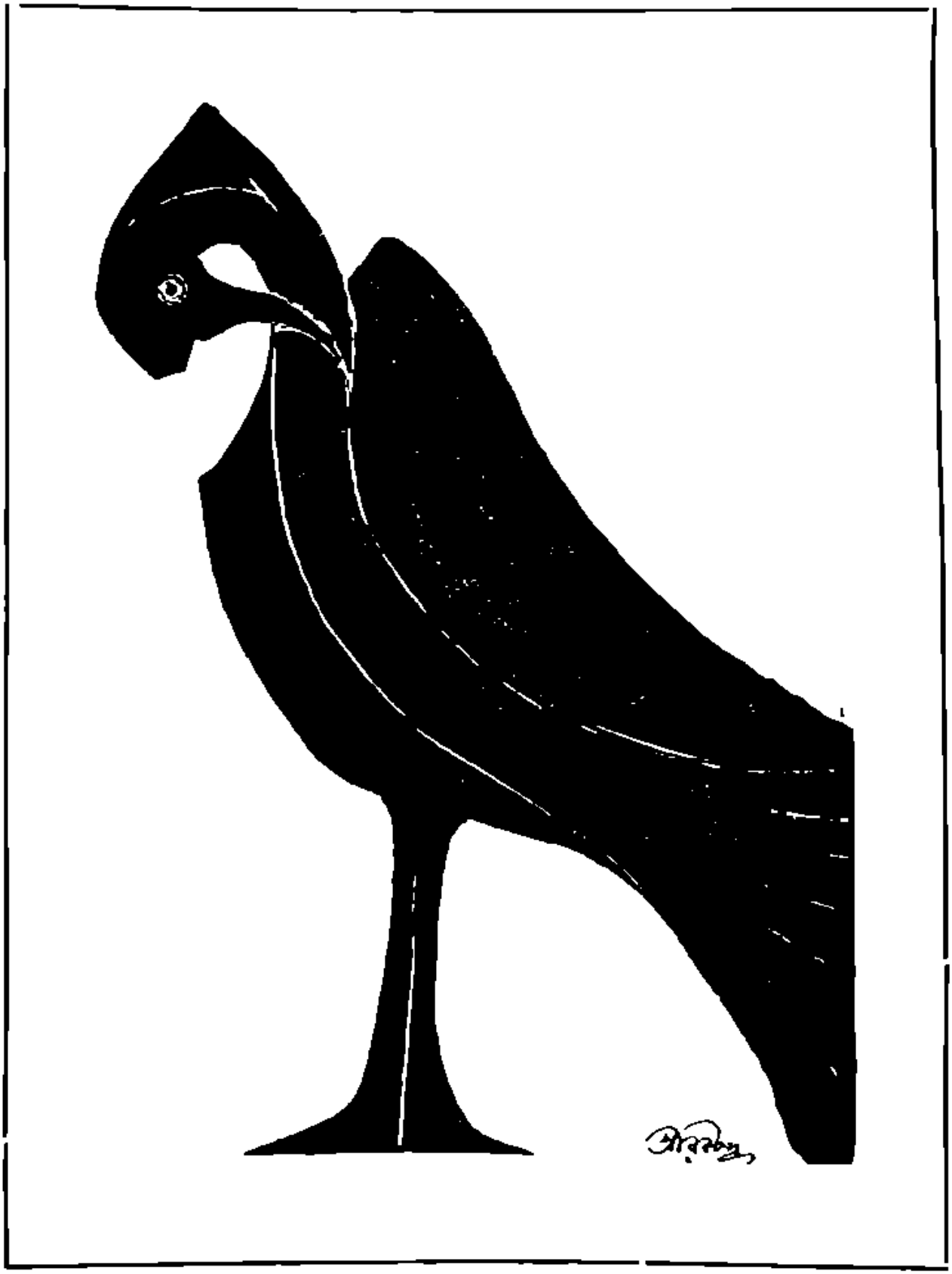

এ ছত্র দুটি পড়ে শুধু সন্ধ্যার রবি আসার ছবিই চোখের সামনে যেন মনের কপাট খুলে মনে কল্পনার কুহক জেগেছিল! মনে জেগেছিল সেই সঙ্গে প্রেরণা—কবিতা লিখবো। জীবনের পরিচয় পেতে লাগলুম রবীন্দ্রনাথের কবিতায়। তখন তিনি উদয়-রবি, সেই উদয়-রবির কিরণে জীবনে আলোয় আলো হয়ে উঠেছিল—এবং বারো বছর বয়সে আমি কবিতা লিখতে শুরু করেছিলুম।

এর পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য লাভ হলো। ১৮৯৬ সনের কথা। স্বর্ণময়ী দেবীর সঙ্গে আমাদের পারিবারিক সংযোগ ছিল—এই সময়ে একদিন আমার মাতৃদেবী এবং ছোটদিদি (অনুরূপা দেবী) এঁদের নিয়ে আমি গেলুম স্বর্ণকুমারী দেবীর গৃহে। সেখানে ছোটদিদির মুখে স্বর্ণকুমারী দেবী শুনলেন আমি কবিতা লিখি। একথা শুনে স্বর্ণকুমারী দেবী খুশী হয়ে বললেন—বটে! তাহলে রবির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো। রবি এখানে প্রায় আসেন। এবং এ কথা তিনি রক্ষা করেছিলেন। ক'দিন পরে স্বর্ণকুমারী দেবী আমার বাড়িতে আমার মাতৃদেবীর নামে চিঠিলিখে গাড়ি পাঠালেন। চিঠিতে লিখেছিলেন রবি এসেছে—সৌরীনকে তার কবিতার খাতা সমেত গাড়ি করে পাঠাবেন।

মনে কি পুলক আবেগ! অমন কবিতা লেখেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—তাঁকে দেখবো। তাঁর সঙ্গে হবে পরিচয়! কবিতার খাতা নিয়ে গেলুম স্বর্ণকুমারী দেবীর গৃহে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি দিলেন পরিচয় করিয়ে বললেন—স্কুলের থার্ড ক্লাসে পড়ে, কবিতা লিখছে।

রবীন্দ্রনাথ দেখলেন আমার কবিতার খাতা—পড়লেন আমার লেখা কবিতা, পড়ে অশেষ উৎসাহ দিলেন, পরামর্শ দিলেন।

অতবড় কবি—তিনি এমন সহজভাবে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন, কথাবার্তা কইলেন। আমার মন তাঁর পায়ে যেন লুটিয়ে পড়লো। তিনি বলেছিলেন, স্কুলের বইয়ে যেসব ইংরেজী কবিতা আর সংস্কৃত শ্লোক পড়ো, কবিতার ছন্দে সেগুলির অনুবাদ করো—তাহলে ছন্দে জ্ঞান হবে—বিষয়বৈচিত্র্যে অনেক কিছু ভাবতে কল্পনা করতে শিখবে। চোখে যা দেখবে, লিখবে—হাতের লেখা পাকা করতে হলে যেমন লেখা অভ্যেস করতে হয়, এমনিভাবে ছন্দানুবাদে লেখার কাজ হবে সহজ।

তাঁর এ অমূল্য উপদেশ শিরোধার্য করেছিলুম।

এরপরে এক ঘটনা...১৯০২ সন। আমি তখন বি-এ পড়ছি থার্ড ইয়ারে। আমার এক বন্ধু মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (পরে অবনীন্দ্রনাথের জামাতা এবং পরে ভারতীর সম্পাদক) এবং আমি তখন প্রায় যাই বাগবাজারে বোসপাড়া লেনে সিস্টার নিবেদিতার কাছে। তিনি আমায় খুব স্নেহ করতেন। ১৯০২ সনে জুলাই মাসে স্বামীজী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেন। আমাদের ছিল আলোচনা সমিতি Excelsior Union, সেই সমিতি থেকে শোক সভার ব্যবস্থা করলুম আমরা। সিস্টার নিবেদিতাকে বরলুম, তিনি রাজী হলেন স্বামিজীর সম্বন্ধে ভাষণ দিতে। কাকে এ অধিবেশনে সভাপতি করা যায়। আমরা দু'জনে গেলুম জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের কাছে। তাঁকে এ ব্যাপার বলে প্রস্তাব করলুম তাঁকে সভাপতিত্ব করা হবে। তিনি রাজী হলেন। ভবানীপুর সাবার্বান স্কুলের হলে জুলাই মাসের শেষে (১৯০২) সভার অধিবেশন হলো। অধিবেশনে ভাষণ দিলেন সিস্টার নিবেদিতা এবং সভাপতিত্ব করলে রবীন্দ্রনাথ। এ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ কোন প্রবন্ধ লিখে এনে পড়েন নি; বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এ অধিবেশনের প্রায় অধিকাংশ রিপোর্ট ছেপে বেরিয়েছিল Bengali (দৈনিক) পত্রিকায়। বেঙ্গলীর ম্যানেজার তারা

স্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে ঢুকলুম তখন পড়লুম তাঁর 'বাল্মীকি-প্রতিভা'—রত্নাকরের পুরাতন কাহিনীটিকে এ নাটিকায় জীবন্ত প্রত্যক্ষ করলুম। রামায়ণে বাল্মীকির যে পরিচয় পেয়েছিলুম সে পরিচয়ে রত্নাকর-বাল্মীকি ছিলেন যেন পটে-আঁকা ছবি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটিকায় রত্নাকরকে পেলুম জীবন্ত দস্যু সর্দাররূপে। এ নাটিকায় রত্নাকরের দলের ডাকাতরা এক অসহায় বালিকাকে ধরেছে—(বাল্মীকির রামায়ণে এ ঘটনা নেই)—কি স্বাভাবিক ভাব!

মেয়েটিকে ধরে ডাকাতরা এলো সর্দার রত্নাকরের কাছে। এসে বললে—।

দেখ হো ঠাকুর, বলি এনেছি মোরা—
বড় সরেস পেয়েছি বলি, সরেস—
এমন সরেস মহলি রাজা, জালে পড়েনি ধরা—
দেরি কেন ঠাকুর, সেরে ফেল ত্বরা!

এ কথায় রত্নাকর বললে—

নিয়ে আয় কৃপাণ, রয়েছে তৃষিতা শ্যামা মা,
শোণিত পিয়াও ত্বরায়!
লোল জিহ্বা লকলকে, তড়িৎ খেলে চোখে
করিয়ে বণ্ড দিকদিগন্ত ঘোর রক্ত তায়!

রত্নাকরের এ কথায় রক্তত্বাতুরা শ্যামার যে ছবি ফুটলো, মানসনেত্রে দেখে শিউরে উঠতে হয়! দুটিছত্রে Climax কতখানি! বালিকাটি তখন ভয়ে আকুল। সে বললে—

কি দোষে বাঁধিলে আমায়, আনিলে কোথায়—
বন্ধনে কাতর বড় মরি যে ব্যথায়!

সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যান্তরাল থেকে বনদেবী বললেন—

দয়া করো অনাথারে দয়া করো গো—
বন্ধনে কাতর তনু জর্জর ব্যথায়।

বালিকার দু'চোখে অশ্রু—দস্যু রত্নাকরের মন টললো। যাকে বলে human instinct, রত্নাকরের instinct হলো অচেতন। একেই বলে নাটকীয়তা! রত্নাকরের মন টললো। রত্নাকর বললে—

এ কেমন হলো মন আমার—
কেন আজি আঁখিজল দেখা দিল নয়নে!
সব ভেসে গেল গো—
মরুভূমি ডুবে গেল করুণার প্লাবনে!

তত্ত্ব-উপদেশ নয়—অসহায় বালিকার চোখে ওই অশ্রু—পাপ পুণ্যের বিচার-বিবেচনা না মমতার বলে দস্যুর কঠিন প্রাণ হলো বিগলিত। দস্যুতা সে ত্যাগ করে সে তখন অসহায়। দুর্বলকে পীড়ন থেকে রক্ষা করে বেড়ায়। মানুষ, পশু পাখি সকলের উপর তার সমান মমতা এবং একদিন ব্যাধের বাণে ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে নিহত দেখে তার কণ্ঠে ফুটলো কবিতার ছন্দে সেই অমরবাণী—মা নিষাদ ইত্যাদি।

দস্যু রত্নাকরকে মানুষ করে আঁকা—কিশোর বয়সের রচনা হলেও এ নাটিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার যে পরিচয় পাই, তা প্রায় অনন্যসুলভ।

তারপর তাঁর রাজর্ষি, বৌঠাকুরাণীর হাট উপন্যাস—রাজা ও রাণী এবং বিসর্জন নাটক—এসব রচনায় রাজা, রাণী, প্রভৃতি সর্বপ্রথম তাদের কেতাদুরস্ত কেতাবীরূপ ছেড়ে সাহিত্যের ক্ষেত্রে রক্তে মাংসে গড়া আমাদের মতো মানুষের। তা হয়েছে শুধু মায়াবী রবীন্দ্রনাথের মায়াতুলির স্পর্শে। তাঁর ছোট গল্পের কাবুলিওয়ালা, ফটিকচাঁদ, বনমালী প্রভৃতি—কাকেও কেতাবী জীব বলে মনে হয় না, তারা সকলেই জীবন্ত। যে কাবুলিওয়ালাকে আমরা হেয়জ্ঞান করি—সেই কাবুলিওয়ালা যখন তার আমার ভিতর থেকে তার মেয়ের হাতের কালির ছাপমারা কাগজ বার করে দেখায়, তখন তাকে ভাই বলে বুকে চেপে ধরবার জন্য মন আকুল হয়।

কিন্তু তাঁর কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধাবলীর বিশ্লেষণ করার মতো জ্ঞান নেই। কাজেই সে-কাজ না করে, তাঁর ঘরোয়া জীবনের দু'চারটি কথা বলে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছি। ভাবুক কবি, ধর্মগুরু, স্বদেশপ্রেমিক হিসাবে তিনি ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য। তিনি ছিলেন মন্ত্রদ্রষ্টা কবি—এটুকু বুঝতে তাঁর রচনা সলিলে অবগাহন করে তা উপলব্ধি করতে হবে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি গল্প বলি।

প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের "সোনার তরী" কবিতার আলোচনা করে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। সে প্রবন্ধে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ও-কবিতাটি সম্পূর্ণ অর্থহীন—জোড় কতকগুলো লাগসৈ কথা জুড়ে তিনি ছন্দে গেঁথেছেন। এ প্রবন্ধের প্রতিবাদে তাঁর বন্ধুরা সরকার (তখন তিনি 'স্যার' হন নি) প্রমুখ ক'জন কৃতবিদ্য সুধী সোনার তরীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করে প্রবন্ধ লিখে ছাপান। তাঁদের আধ্যাত্মিক অর্থগুলি ছিল বিভিন্ন রকম। তখন আমরা রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলুম, এর কোন অর্থ ঠিক? হেসে তিনি বলেছিলেন এসব আধ্যাত্মিক অর্থের কোনোটাই আমার মাথায় ছিল না বা আসে নি এখন এদের ব্যাখ্যা পড়ে ভাবছি—আমার ও কবিতার মধ্যে এমন আধ্যাত্মিক অর্থ ছিল!

অনেকে অনুযোগ করেন, রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্য লেখেন নি। মহাকাব্য মানে Epic. তাঁরা Epic অর্থে কি বোঝেন জানি না। Epic-এর অর্থ Real or mythical history of great achievements. কোনো রূপসীকে নিয়ে রাজায় রাজায় মহাযুদ্ধ নয় এবং সে Epic দু'সাত সর্গে লিখিত হবে, এমন কোনো বাঁধা আইন-কানুন নেই। রবীন্দ্রনাথের গান্ধারীর আবেদন, কর্ণকুন্তী সংবাদ প্রভৃতিতে যে-মানবতার আরোপ করেছেন, তার অপূর্ব বৈশিষ্ট্যে বিস্মিত এবং মুগ্ধ হতে হয়। গান্ধারীর সেই কথা—

…ধর্মিতের সাথে
দণ্ড দাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার যার ভয়ে প্রাণ
কোন বাধা নাহি পায়, তারে ভগবান
প্রবলের অত্যাচার।

কর্ণকুন্তী সংবাদে কর্ণর সেই কথা—

… যে ফিরালো বাহুপাশ
তাহারে দিতেছ মাতা, রাজ্যের আশ্বাস!
একদিন যে সাক্ষাতে বরেছো বঞ্চিত
সে আজ ফিরায়ে দেওয়া তব সাধ্যাতীত!

১৯০৪-০৫ সাল থেকে আমি ছোট গল্প লেখা শুরু করি, স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদিত 'ভারতী'তে আমার লেখা ছোট গল্প, বন্ধুবর মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা ছোট গল্প প্রায়ই প্রকাশিত হতো। রবীন্দ্রনাথ সে সব গল্প পড়ে তাঁর মতামত জানাতেন—চোখটি দেখিয়া দিতেন! তিনি তখন মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন। তিনি এলেই তাঁর কাছে যেতুম আমরা চার বন্ধু—চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্র দত্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং আমি। তিনি নিজের নূতন লেখা শোনাতেন আমাদের লেখাও শুনতেন। সে সময় আমি এটর্নির অফিসে আর্টিকেল ক্লার্ক ছিলুম-এবং আমরা লেকচারের অ্যাটেণ্ডেন্স কমপ্লীট করেও পরীক্ষা দিই নি। ইচ্ছা ছিল সাহিত্য সেবা করবো জীবনে এবং আইনের লাইনে যাবো না। এ কথা জানতে পেরে রবীন্দ্রনাথ বেশ জোরগলায় বলেছিলেন—না না-পরীক্ষা তোমাকে দিতেই হবে—সাহিত্যকে পেশা করোনা-নেশা করো।'

তাঁর তাগিদে সে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে আমি ওকালতি আরম্ভ করি—কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের ফৌজদারী কোর্টে!

এই সময়ের আর একটি ঘটনার কথা। ১৯১০ সনের কথা···তখন দেশের সি-এচ ডি-ফিল প্রভৃতি সুধীজন এবং ডিস্ট্রীক্ট জজ, বড় বড় উকিল মুহুরিরা রবীন্দ্রনাথকে শুধু বড়লোকের ভাববিলাসী ছেলে যখনি না করে কবিতা লেখেন—এমনি মত সগর্বে প্রকাশ করতেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা গল্প কবিতা তাঁরা স্পর্শও করতেন না। আমরা চার বন্ধু (চারুচন্দ্র, সত্যেন্দ্র, মণিলাল এবং আমি) তাঁর ছোট গল্পের প্রচারকল্পে কয়েকটি গল্পের নাট্যরূপ দিয়ে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করবার উদ্যোগ করি। যাদের রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে ছিল আমার ঘনিষ্ঠতা যোগ। রবীন্দ্রনাথকে একথা বলে তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করলুম। তাঁর মুক্তির উপায় গল্পটিতে নাট্যরূপদানের অনুমতি। তিনি দিলেন অনুমতি এবং তাঁর অনুমতিক্রমে গল্পটিকে আমি নাটিকায় রূপান্তরিত করলুম। তিনি আমার রচনাটি দেখেছিলেন। তখন 'দশচক্র' নামে সে-নাটিকার অভিনয় হলো অমৃতলাল বসুর স্টার থিয়েটারে। অভিনয় বেশ সাফল্যলাভ করেছিল—রবীন্দ্রনাথ আমাকে সে নাটিকাটি গ্রন্থাকারে ছেপে বার করবার অনুমতি দিলেন এবং 'দশচক্র' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো ১৯১১ সনে।

১৯১৭ সনের একটি বর্ষণমুখর তখন তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে নিত্য নিয়মিত বিচিত্রার আসর বসে। আমরা অনেকেই বিচিত্রার সদস্য। আমরা আসরে বিকালে যথাসময়ে হাজির হই। আসরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখা পড়েন, আমরা পড়ি আমাদের লেখা। গান হয়, সাহিত্য এবং নানা বিষয়ের মনখোলা আলোচনা হয়। সকলেই সে আলোচনায় যোগ দেন। আমি আসরে আসি কোর্ট থেকে কোর্টের পোশাকে। সেজন্য আসরের মাঝখানে না বসে একপ্রান্তে বসি জড়োসড়ো হয়ে। রবীন্দ্রনাথ তিনদিন তা লক্ষ্য করলেন। তার পর একদিন বললেন—তুমি অমন দূরে বসো কেন? আমি বললুম কৌজদারী কোর্টে প্রাকটিস করি, যত চোর জুয়াচোরের তরফে মামলা করি। এ পোশাকটী যতক্ষণ না ছাড়ি—ততক্ষণ নিজেকে কেমন অশুচি মনে হয়, তাই দূরে বসি।

হেসে তিনি বললেন, না, কিসের অশুচি। তুমি রাজদ্বারে কাজ করছো। কত দুর্জনকে সাজা দেবার কাজে সহায় হচ্ছ। কত সাধু সজ্জনকে পুলিশ আর হাকিমের সাজার হাত থেকে পরিত্রাণ করছো—পরিত্রাণায়

সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্—এতে এক মহান্ত সাধন করছো! ও পোশাকে নিজেকে অশুচি মনে করো না। তার এ সহজ রসিকতায় কতখানি উপলব্ধি করেছিলুম। এবং তারপর কোর্ট থেকে আমি সোজা আসতুম অবনীন্দ্রনাথের গৃহে সেখানে কোর্টের পোষাক ছেড়ে মসিলালের ধুতি পরে বিচিত্রার আসরে এসে বসতুম।

একদিন বিচিত্রার আসরে বিকালে এসে দেখি রবীন্দ্রনাথ কেমন বিষন্ন মলিন মুখে বসে আছেন। জিজ্ঞাসা করলুম, শরীর অসুস্থ? তিনি বললেন, না। আমার স্বর্ণাকলমটি (fountain pen) হারিয়ে গিয়েছে পাচ্ছিনা। তোমাদের রবিঠাকুরের লেখা আর তেমন পাবেনা। তার কারণ, যার লেখা রবিঠাকুর গোড়ার দিকটা খানিক লেখে আর বাকি দিয়ে শেষ করতো আমার সেই স্বর্ণাকলম!

কথাটা তিনি এমনভাবে বললেন যে আমরা সকলে হো-হো করে হেসে উঠলুম!

তার প্রায় দেড় মাস পরে—একদিন বেলা তখন বারোটা—আমি কোর্টে। হঠাৎ তাঁর কর্মচারী গোপালবাবু এসে হাজির! ব্যাপার কি? পুলিশ কোর্টে কেন? গোপাল বাবুর হাতে ম্যাজিষ্ট্রেটের সহি আর কোর্টের সীলমোহর করা একখানি সাকিনার কাগজ। সাক্ষীর সাকিনা। সাকিনামায় Rabindranath Tagore এর নামে—তাঁকে অমুক তারিখে থার্ড প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে হাজির হতে হবে বেলা এগারোটায় একটা চুরির কেস-এ সরকারের তরফে সাক্ষ্য দিতে! গোপালবাবু বললেন—দিন কতক আগে জোড়াসাঁকো থানার ইনস্পেক্টর আর জমাদার এসেছিল একটি লোককে নিয়ে—তার কোমরে দড়ি বাঁধা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হয় ইন্সপেক্টরের দেখা। ইন্সপেক্টর বললেন, দড়ি বাঁধা লোকটি হাবীচোর—ধরা পড়েছে—তার বাড়ী সার্চ করতে অনেক চোরাই জিনিষ পাওয়া গিয়েছে। কোন্ জিনিষ কোন্ বাড়ী থেকে চুরি করেছে—ওকে দিয়ে তার কবুল করান হচ্ছে। একটা পেন পাওয়া গেছে। ও বলছে, সেটা এ বাড়ী থেকে চুরি করা। রবীন্দ্রনাথ পেনটি দেখে চিনলেন। তিনি পেনটি ফেরৎ চাইলেন। ইন্সপেক্টর বললেন, এর মামলা হবে কোর্টে—মামলার পর আপনি পেন পাবেন।

গোপালবাবু বললেন, তার পর আজ বেলা দশটা নাগাদ থানার এক জমাদার এসে এই সাকিনা দিয়ে গেছে—রবীন্দ্রনাথ তখন স্নানের উদ্যোগ করছিলেন এই সাকিনা দেখে তিনি অবসন্নের মতো বসে পড়েছেন। আমার হাতে সাকিনা দিয়ে তিনি বললেন—এখনি সৌরীণের সঙ্গে গিয়ে দেখা কর কোর্টে। তাকে বলবে এটি যদি নাকচ করতে পারে ভালো না হলে বলো আমি হার্টফেল করে মারা যাবো। তখনকার থার্ড প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন সাহিত্যরসিক। আমাকে খাতির করতেন। লাঞ্চটাইমে তাঁর খাসকামরায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে সাকিনা দেখিয়ে তাঁকে সব কথা বললুম। তিনি তখনি সে সাকিনা Cancel করে বললেন, গোপাল বাবুর নামে সাকিনা দিচ্ছি। তিনি মামলার দিন কোর্টে এসে ও কলম সনাক্ত করবেন।

তার পর আমাকে তিনি অনুরোধ করলেন, আমি যেন কোর্টের পর তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বলি তিনি নাম না দেখে সাকিনায় নাম সহি করেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ যেন ম্যাজিষ্ট্রেটের এ অপরাধ ক্ষমা করেন।

কোর্টের পর আমি গেলুম রবীন্দ্রনাথের কাছে—তাঁকে এ কথা বললুম। হেসে রবীন্দ্রনাথ বললেন, ফৌজদারী কোর্টে প্র্যাকটিস করো বলে কোর্টের পোষাকটিকেও তুমি অশুচি বোধ করো—এখন বোঝ কোর্টের গুণ। ভাগ্যে তুমি রাজদ্বারে ছিলে তাই তোমাদের রবি ঠাকুর অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলো।

রবীন্দ্রনাথের

নীরপুরুষ

রবীন্দ্রজন্মদিবসের শতবার্ষিক উদ্‌যাপনে 'শিশু' কাব্যের এই পরমাদৃত কবিতার স্বতন্ত্র প্রথম প্রকাশ।
আটটি স্তবক, আটখানি পূর্ণপৃষ্ঠা ছবি, দুইখানি রঙিন।
শ্রীনন্দলাল বসু-অঙ্কিত ত্রিবর্ণ প্রচ্ছদপট। শোভন আকার-প্রকার। পরিপাটী মুদ্রণ। মূল্য ১·৩০

নৈবেদ্য

রবীন্দ্রশতবর্ষ-উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বিশেষ সুলভ সংস্করণ। মূল্য ০·৭৫
কবি-প্রতিকৃতি ও পাণ্ডুলিপিচিত্রে অলংকৃত।
ভাবভক্তি কবিবের যে পরম সুষমা গীতাঞ্জলি কাব্যে ব্যক্ত, নৈবেদ্যে তাহারই ভূমিকা।
ইতিপূর্বে পরিপাটি মুদ্রণে ও সুলভ মূল্যে যেভাবে গীতাঞ্জলি প্রচারিত হইয়াছে, নৈবেদ্য কাব্যও সেইভাবেই প্রকাশ করা হইল।
ভগবদ্‌ভক্ত, কাব্যরসিক এবং ভারত ভারতীর শাশ্বতবার্তার সন্ধানী সকলেরই বিশেষ আদরণীয় হইবে সন্দেহ নাই।

পল্লীপ্রকৃতি

এ দেশের পল্লীসমস্যা ও পল্লীসংগঠন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী—শ্রীনিকেতনের আশা ও উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা—অধিকাংশ রচনাই ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই। রবীন্দ্রশতপূর্তিবর্ষে শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা-দিবসে নূতন প্রকাশিত। সচিত্র ॥ মূল্য ৪·৫০

বিচিত্রা

রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ নাটক পত্রাবলী কবিতা গানের এই সংকলন পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। সর্বসাধারণের সহজে রবীন্দ্রনাথের বিবিধ রচনার সঙ্গে নূতন করিয়া পরিচয়সাধনের উদ্দেশ্যে ডিমাই সহস্রাধিক পৃষ্ঠার এই বই স্বল্পমূল্যে দেওয়া হইয়াছে।

এখন তিন রকমের বাঁধানো বই পাওয়া যায়
পূর্ববৎ লিনেন বাঁধাই ৬·০০, হাফক্লথ বোর্ড বাঁধাই ৭·০০
এবং উপহার-উপযোগী পূরা মূল্য বোর্ড বাঁধাই ৮·৫০

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

কিলোর মাপে কিনুন

এখন সবত্র দেশে মেট্রিক ওজনের ব্যবহার বাধ্যতামূলক। পুরনো ওজন ব্যবহার করা বেআইনী।

মূল্যের পরিবর্তন তালিকা (সের থেকে কিলোগ্রামে)

এক সের থেকে এক কিলোগ্রাম প্রতি কিলোগ্রাম

সের	কিলো	সের	কিলো	সের	কিলো	সের	কিলো	সের	কিলো
১	১	২১	১৯	৪১	৩৭	৬১	৫৬	৮১	৭৪
২	২	২২	২০	৪২	৩৮	৬২	৫৭	৮২	৭৫
৩	৩	২৩	২১	৪৩	৩৯	৬৩	৫৮	৮৩	৭৬
৪	৪	২৪	২২	৪৪	৪০	৬৪	৫৯	৮৪	৭৭
৫	৫	২৫	২৩	৪৫	৪১	৬৫	৬০	৮৫	৭৮
৬	৬	২৬	২৪	৪৬	৪২	৬৬	৬১	৮৬	৭৯
৭	৭	২৭	২৫	৪৭	৪৩	৬৭	৬২	৮৭	৮০
৮	৭	২৮	২৬	৪৮	৪৪	৬৮	৬৩	৮৮	৮১
৯	৮	২৯	২৭	৪৯	৪৫	৬৯	৬৪	৮৯	৮২
১০	৯	৩০	২৭	৫০	৪৬	৭০	৬৫	৯০	৮৩
১১	১০	৩১	২৮	৫১	৪৭	৭১	৬৬	৯১	৮৪
১২	১১	৩২	২৯	৫২	৪৮	৭২	৬৭	৯২	৮৫
১৩	১২	৩৩	৩০	৫৩	৪৯	৭৩	৬৭	৯৩	৮৬
১৪	১৩	৩৪	৩১	৫৪	৫০	৭৪	৬৮	৯৪	৮৭
১৫	১৪	৩৫	৩২	৫৫	৫১	৭৫	৬৯	৯৫	৮৮
১৬	১৪	৩৬	৩৩	৫৬	৫১	৭৬	৭০	৯৬	৮৯
১৭	১৫	৩৭	৩৪	৫৭	৫২	৭৭	৭১	৯৭	৮৯
১৮	১৬	৩৮	৩৫	৫৮	৫৩	৭৮	৭২	৯৮	৯০
১৯	১৭	৩৯	৩৬	৫৯	৫৪	৭৯	৭৩	৯৯	৯১
২০	১৮	৪০	৩৭	৬০	৫৫	৮০	৭৪	১০০	৯২

টাকা প্রতি সের থেকে টাকা প্রতি কিলোগ্রাম

টাকা/সের	টাকা/কিলো	টাকা/সের	টাকা/কিলো	টাকা/সের	টাকা/কিলো	টাকা/সের	টাকা/কিলো	টাকা/সের	টাকা/কিলো
১	১.০৯	১১	১০.০৪	২১	১৯.২৫	৩১	২৮.৪৩	৪১	৩৭.৬১
২	১.৮৩	১২	১১.০০	২২	২০.১৮	৩২	২৯.৩৬	৪২	৩৮.৫০
৩	২.৭৪	১৩	১১.৯৩	২৩	২১.১১	৩৩	৩০.২৯	৪৩	৩৯.৪৩
৪	৩.৬৬	১৪	১২.৮৪	২৪	২২.০৪	৩৪	৩১.২২	৪৪	৪০.৩৬
৫	৪.৫৭	১৫	১৩.৭৫	২৫	২২.৯৭	৩৫	৩২.১৫	৪৫	৪১.২৯
৬	৫.৪৯	১৬	১৪.৬৬	২৬	২৩.৯০	৩৬	৩৩.০৮	৪৬	৪২.২২
৭	৬.৪০	১৭	১৫.৫৭	২৭	২৪.৭৩	৩৭	৩৪.০১	৪৭	৪৩.১৫
৮	৭.৩২	১৮	১৬.৪৮	২৮	২৫.৬৬	৩৮	৩৪.৯৪	৪৮	৪৪.০৮
৯	৮.২৩	১৯	১৭.৪০	২৯	২৬.৫৯	৩৯	৩৫.৮৭	৪৯	৪৪.৯১
১০	৯.১৫	২০	১৮.৩১	৩০	২৭.৪২	৪০	৩৬.৭০	৫০	৪৫.৮৪

১ কিলোগ্রাম (১০০০ গ্রাম) = ৮৬ তোলা

ভারত সরকার-কর্তৃক প্রকাশিত

গল্প-ভারতী

জ্যৈষ্ঠ—১৩৬১

সম্পাদক :

সহঃ সম্পাদক : শ্রীকল্যাণ রায়

মূল্য—এক টাকা

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড ২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-৯ হইতে
শ্রীসুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত এবং কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড,
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

‘এমন ছেলেকে সামলাতে হলে আপনার কাজের আর অন্ত নেই ···! বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের যদি ফিট্‌ফাট রাখতে চান, তা'হলে কাপড় কাচাটাতো লেগেই আছে।’

‘সানলাইটে কাচি, তাই রক্ষে! তবু দেখে উঠছি সানলাইটের বেলায় ফেনায় কাচাটা খুবই সহজ বলে। কেবল এমন ঘাঁটি সাবানেই এত ভাল কাপড় কাচা যায় আর তাও কোন কষ্ট না করে।’

৫৫ নং ষ্ট্রাট, কলকাতা মার্কেট, নয়া দিল্লীর শ্রীমতী ওয়াসওয়ানি বলেন, ‘কাপড় কাচায় সানলাইটের মতো এত ভাল সাবান আর হয় না।’

সানলাইট

কাপড়জামার সাঠিক যত্ন নেয়!

H. 11-X51 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

॥—এই সংখ্যায়—॥

সম্পাদকীয়—	১১৪১
জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ (জীবন কাহিনী)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	১১৪২
শেষের গল্প—সমৃদ্ধ	১১৪৯
সুরের আগুন (গল্প)—জগদীশ মোদক	১১৫৭
রম্যাণি বীক্ষ্য—(ভ্রমণকাহিনী)—সুবোধ কুমার চক্রবর্তী	১১৮৩
পুরানো দিনের নাট্যজগতের রঙ্গকথা—বরুচি	১১৮৭
জীবনের যজ্ঞশালায়·(উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	১১৯০
পুরাতন পাতা—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১১৯৭

সাধনার সৌন্দর্যের গোপন কথা...

'লাক্স আমায় সুন্দর রাখে'

সুন্দরী চিত্রতারকাদের রূপ লাবণ্যের গোপন কথা হোলো নিয়মিত সাবানকে বেছে নেওয়া। লাক্স-এর ফুলে ফুলে গড়ে ওঠা ফেনা কত কোমল, কত মধুর! ··· আপনিও লাক্স ব্যবহার করেছেন? তার মানে··· লাক্সের কুসুম কোমল ফেনায় গড়ে তোলার নতুন লাবণ্য আসবে! তার মানে··· সুবাসিত লাক্সের মধুর গন্ধ আপনার চমৎকার লাগবে! তার মানে··· লাক্সের মাদুর মতো ফেনা বিভিন্ন বেলা থেকে ময়লা মতো মল বেছে নিতে পারবেন। আপনার ত্বকে লাবণ্য ফিরে আসবে। লাবণ্যময়ীর জন্য লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করুন!

চিত্রতারকাদের
বিশুদ্ধ, কোমল
সৌন্দর্য্য-সাবান

'সুন্দরী সাধনা বলেন 'লাক্স সাবানটি আমি অনেকদিন ধরে এর রঙ গুলোও আমার ভারী ভাল লাগে'।

LTS. 111-X52 BO

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

এই সংখ্যায়

বিশ্বসাহিত্য—
সাহিত্য ও সাহিত্যিক—মার্সেল প্রুস্ত: একজন স্বপ্ন ভারাতুর—সমীর সেনগুপ্ত ১২০০
ভাষার প্রাঞ্জলতা—গিরিশচন্দ্র ১২০৫
ভবিষ্যতের বাংলা উপন্যাস—অরবিন্দ পোদ্দার ১২০৬
সাহিত্য-সংবাদ (মফঃস্বলের মুখপাত্র)—পবিত্র পাল ১২১২
ভারত ভ্রমণে— ১২১৬
চলতি দুনিয়া— ১২১৮
যাত্রা গান—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১৯
একজন আর কয়েকজন (স্মৃতিকথা)—অনিলকুমার ভট্টাচার্য ১২২০
অপরিমেয় জীবনীশক্তির অধিকারী চার্লি চ্যাপলিন—অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১২২৫
দেশ-বিদেশ— ১২২৮
বিশ্ব-ব্যঙ্গচিত্র— ১২৩২

একাগ্র গতি

একদা মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত রচনা করিয়া ইহাকে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য একজন লেখকের খোঁজ করিতেছিলেন। কিন্তু কেহই এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হইলেন না। অবশেষে পার্বতী-তনয় গণেশ এই শর্তে রাজি হইলেন যে তাঁর লেখনী মুহূর্তের জন্যও থামিবে না।

আধুনিক যুগের লেখকরাও চান যে তাঁদের লেখার গতি কোনক্রমেই ব্যাহত না হয়। আর এই অব্যাহত গতির জন্যই সুলেখা আজ এত জনপ্রিয়

সুলেখা ওয়ার্কস্ লিঃ ; কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

বোরোলীন
প্রসাধনে অতুলনীয়!

মুখমণ্ডলের কান্তি এবং লাবণ্য রক্ষা করা যখন কঠিন হয়, বায়ুগত পরিবর্তনে যখন ত্বক ও ওষ্ঠাধর শুষ্কতর হয়ে ওঠে, তখনই মনে পড়ে বোরোলীন-এর কথা। ল্যানোলীন-যুক্ত অ্যান্টিসেপটিক বোরোলীন যে শুধু রুক্ষ ত্বককে লাবণ্যময় এবং মসৃণ করে তোলে, তাই নয়····এর মৃদু সুগন্ধ মনকে করে বিমুগ্ধ! নিত্য প্রসাধনে বোরোলীন ব্যবহার করুন।

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস্ প্রাইভেট লিমিটেড

১১/১, নিবেদিতা লেন, কলিকাতা-৩

সপ্তদশ বর্ষ ॥ দ্বাদশ সংখ্যা. জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯

সম্পাদকীয়

কালিদাসের দেশে রবীন্দ্রনাথ ॥

মধ্যপ্রদেশে মহাসমারোহে 'রবীন্দ্র-জন্মোৎসব' পালন করা হল—২৪শে বৈশাখে আমন্ত্রিত হয়ে তাঁদের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আনন্দলাভ করেছি। প্রবাসী বাঙালীরা রবীন্দ্রনাথের "শোধবোধ" বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেছিলেন। প্রবীণ ডাক্তার বসু শ্রীযুক্ত মহাশয়ের নেতৃত্বে প্রবাসী বাঙালীদের এই ধরনের নাট্যাভিনয় বিশেষ উপভোগ্য। কানপুরের বাঙালীদের কাছে আবেদন জানিয়েছি তাঁরা যেন হিন্দী শিখে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রচারে ও প্রসারে অগ্রণী হতে। ভূপালেও বন্ধুবর শাস্ত্রীজি তাঁর নিজস্ব হিন্দী অনুবাদসহ "আজি হতে শতবর্ষ পরে" প্রচার-পুস্তিকাটি বিতরণ করলেন—বিরাট রবীন্দ্র-রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্র-ভারতীর ছাত্র-ছাত্রীরা "চণ্ডালিকা" প্রভৃতি মঞ্চস্থ করে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা এবং রবীন্দ্র-সাহিত্য অনুশীলনের জন্য এখানে স্থায়ী ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রবীন্দ্র-রঙ্গমঞ্চের প্রস্তুতির জন্য প্রত্যেক প্রদেশে বহু অর্থব্যয় করা হচ্ছে—এই অর্থব্যয় সার্থক হলে বিশ্বকবির যথার্থ মর্যাদা দানের অন্তত একটা কার্যকারী প্রচেষ্টা হবে।

মধ্যভারতের রবীন্দ্র-সমারোহে যোগদান করে মনে পড়ল কবিগুরু কী ভাবে মহাকবি কালিদাসের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে গিয়েছেন। কালিদাসের শকুন্তলা, মেঘদূত, ঋতুসংহার প্রভৃতির প্রেরণায় কবি রবীন্দ্রনাথ যেন নব মেঘদূতের সূচনা করে গিয়েছেন।

গল্প-ভারতীর মাধ্যমে 'গুরুদক্ষিণা' দিয়ে যেন আমরা শিল্প সাহিত্যের আদিগঙ্গা এই বাংলার সাধনায় নিজেদের নিয়োজিত করতে পারি, কবিগুরুর জন্মবার্ষিকীতে একান্তভাবে এই কামনা করি।

ভবানীপ্রসাদ নাগ

জগদ্গুরু শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণ

জীবন কাহিনী ॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

[২]

কুলদেবতা শ্যামসুন্দর।

ভোর বেলা, ঘুম থেকে উঠে স্বর্ণময়ী দেখলেন, বিজয় ঘরে নেই। কোথায় গেল দুরন্ত ছেলে! ওমা, শ্যামসুন্দরের মন্দিরের বন্ধ দরজায় ধাক্কা মারছে।

দ্রুত পায়ে ছুটে গেলেন স্বর্ণময়ী। 'ওকী, মন্দিরের দোর ঠেলছিস কেন।'

'আমার বল খুঁজে পাচ্ছি না।'

'বল খুঁজে পাচ্ছিস না তো ওখানে কী!'

'এই শ্যামসুন্দরই আমার বল নিয়ে পালিয়ে এসেছে।'

'সে কী অসম্ভব কথা!' স্বর্ণময়ী অবাক মানলেন।

'বা, শ্যামসুন্দর যে খেলছিল আমার সঙ্গে।' বিজয় সরল মুখে বললে, 'খেলতে খেলতে পালিয়ে এসেছে।'

'তা পূজুরী আসুক। পূজুরী এসে দরজা খুলুক। তখন দেখা যাবে।'

কখন পূজুরী আসবে কে জানে। গায়ের জোরে দরজা যখন খুলতে পারছে না, তখন বিজয় কাকুতি-মিনতি করছে। 'দাও না আমার বল। কেন বসে আছ দোর এঁটে? বাইরে বেরিয়ে এসো না। খেলার মাঝখানে পালিয়ে গিয়ে কেউ লুকোয় ঘরের মধ্যে?'

কে শোনে কার কথা।

তখন বিজয় এক লাঠি কুড়িয়ে আনলো। দাঁড়াও, কতক্ষণ বন্ধ হয়ে থাকবে? পূজুরী এসে দরজা খুললেই দেখে নেব তোমাকে। কে তখন তোমাকে বাঁচায় দেখা যাবে।

দরজা খোলা হল যথাসময়ে। কিন্তু হায়, বিজয়কে ঢুকতে দেওয়া হল না। তার যে এখনো পৈতে হয় নি!

সারা দিন উপোস করে রইল বিজয়। স্বর্ণময়ী এসে কতো সাধ্যসাধনা করলেন, নরম হল না এতটুকু। শ্যামসুন্দরের উপর প্রতিশোধ না নিয়ে অন্নজল গ্রহণ করবে না কিছুতেই।

ঘরে ভাত রেখে শুয়ে পড়লেন স্বর্ণময়ী। বিজয় কাছেও যে ঘায় মানে না, সে কেমনতরো ছেলে।

মাঝ রাতে স্বর্ণময়ীর ঘুম ভেঙে গেল। বিজয় যেন কথা কইছে কার সঙ্গে!

'যাক, ঘাট মানলে তাই ছেড়ে দিলাম। নইলে দেখাতাম একবার মজা!'

তারপর আবার অন্যরকম সুর ধরলো।

'আমি না হয় তোমার উপর রাগ করে খাই নি। কিন্তু তুমি খেলে না কেন? তোমার কী হয়েছিল? বেশ বেশ, এসো দু'জনে একসঙ্গে খাই।' ঢাকা খুলে খেতে লাগলো বিজয়। যেন তার সঙ্গে আরো একজন কে খাচ্ছে।

সকালে উঠে পূজুরীর কাছে খোঁজ নিল স্বর্ণময়ী। পূজুরী বললে, আমি কাল রাতে স্বপ্ন দেখেছি শ্যামসুন্দর বলছেন তাঁর সায়াহ্নিক ভোগ হয় নি।

সে কী কথা! বিজয়কে ডেকে জিগগেস করলেন, 'কাল রাতে ঘরে কার সঙ্গে বসে কথা কইছিলি।'

বিজয় আকাশ থেকে পড়লো: 'কই কিছু জানি না তো!'

বিজয়কৃষ্ণ তখন ব্রাহ্মসমাজে। একদিন শ্যামসুন্দর তাকে বললে, 'আমি সোনার চুড়ো পরবো। আমাকে একটা গড়িয়ে দে না।'

বিজয় বললে,—'আমি তোমাকে মানি না। যারা মানে তাদের বলোগে। আমার টাকা-পয়সা নেই।'

'তোর নেই, তোর খুড়ির আছে'—বললে শ্যামসুন্দর। 'আখগে তোর খুড়ির ঝাঁপির মধ্যে অনেক টাকা। খুড়িকে বলে চেয়ে নে গে।'

খুড়িমাকে বললে গিয়ে বিজয়।

'কী আশ্চর্য!' খুড়িমা অভিভূতের মত বললেন, 'কাল যে আমাকেও স্বপন দিয়েছেন শ্যামসুন্দর। বললেন, ওগো আমি সোনার চুড়ো পরবো। আমি বললুম, টাকা কোথায় পাবো! শ্যামসুন্দর বললেন, আখ না ঝাঁপি খুলে, চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা কোন না পাবি! লুকিয়ে-চুরিয়ে সাতষট্টি টাকা জমিয়ে ছিলাম ঝাঁপিতে, কেউ জানে না, কিন্তু শ্যামসুন্দর ঠিক দেখে রেখেছেন। সাধ্য নেই তাঁর চোখে ধুলো দি।'

বিজয়ের হাতে টাকা দিল খুড়িমা। সেই টাকায় ঢাকা থেকে গড়ানো হল সোনার চুড়ো। সেই চুড়ো পরানো হল শ্যামসুন্দরকে।

সন্ধ্যের আগে ছাদে গিয়েছে বিজয়, শ্যামসুন্দর ঘর থেকে উঁকি মারলো উপরে। বললে, 'ওরে একবার দেখে যা না, চুড়ো পরে আমাকে কেমন দেখতে হয়েছে।'

'আমি আর কী দেখবো।' মেঘলাটাকে ফিরিয়ে দিল বিজয়। 'আমি তো আর তোমাকে মানি না। যারা তোমাকে মানে তাদের ডেকে আনোগে।'

শ্যামসুন্দর হাসলো মৃদু মৃদু। বললে, 'নাই বা মানলি, তাতে একবার দেখতে দোষ কী।'

সত্যিই তো দেখতে বাধা কিসের! একটা পাথরের মূর্তির মাথায় মুকুট পরানো হয়েছে, এইটুকুই তো দেখা। দেখি না কেমন গড়িয়ে এনেছে সোনার চূড়ো।

শ্যামসুন্দরের কাছে এসে দাঁড়ালো বিজয়কৃষ্ণ। একি, চোখ যে আর ফিরিয়ে নিতে পারছে না। পদ্মপত্রবিশালাক্ষ কী অপার স্নেহে তাকিয়ে আছেন! সমস্ত ঘর নয়, সমস্ত ভুবন যেন দাঁড়িয়েছেন আলো করে।

'কিরে, যাবিস না, তবে অমন করে তাকিয়ে আছিস কেন?' হাসলো শ্যামসুন্দর। 'চোখের দেখা তো কখন হয়ে গিয়েছে। এবার যা না কিরে!'

কোথায় ফিরে যাবে? পা ওঠে না বিজয়ের, নিষ্পলক দেখছে শ্যামসুন্দরকে।

শান্তিপুরের এক প্রান্তে শ্যামচাঁদের মন্দির। সেখানে নানা সাধু-সন্ন্যাসীর ভিড়। সেখানে কখন একা-একা চলে আসে জটে-গোঁসাই, সকলের আদরের জিনিসটি হয়ে বসে থাকে। এ যেন আগন্তুক কোনো শিশু নয়, সকলের মনে হয়, যেন কোন অন্তরঙ্গ আত্মীয়। কোথায় বাড়ি-ঘর কে জানে, মন তবু চায় না ছেড়ে দিতে।

সেদিন সন্ধ্যেও যায় যায়, বিজয়ের দেখা নেই। স্বর্ণময়ী ঘর-বার করতে লাগলেন। সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত হল, রাত মাঝরাত। কোথায় বিজয়! ঘরে-বাইরে হাহাকার পড়ে গেল। বিজয়কে পাওয়া যাচ্ছে না।

পরদিন সকালে খবর পাওয়া গেল, ঠিক জায়গাতেই আছে—শ্যামচাঁদের বাড়িতে, নিরাপদ পরিবেশে—সাধুসঙ্গে। সাধুরা তাকে আদর করে খাইয়েছে, হরিনাম শুনিয়েছে, বিছানা করে ঘুম পাড়িয়েছে। এমন যাদুমন্ত্র থেকে পারে কি বিচ্ছিন্ন থাকতে।

ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলেকে ছিনিয়ে নিলেন স্বর্ণময়ী।

মা কেমন সুন্দর রাঁধেন শ্যামসুন্দরের জন্যে। কেমন সুন্দর ভোগ সাজান, পরিবেশন করেন। কিন্তু শ্যামসুন্দরের পাশে যে আছেন ওই শ্রীমতী, তিনি কী করেন? তিনি একটু পরিশ্রম করে পরিবেশন করতে পারেন না?

'মা, তুমি রাধাকে একটু বলো না, আমাকে পরিবেশন করে খাওয়াতে। বলো না!' স্বর্ণময়ীকে পিড়াপিড়ি করতে লাগলো বিজয়।

'তা কি কখনো হয়?' স্বর্ণময়ী বিদূষের মতো হয়ে গেলেন।

'খুব হয়। কেন হবে না? তুমি বলো না রাধাকে।' গম্ভীর-গম্ভীর মুখ করলো বিজয়: 'আমাকে খাওয়াবে না তো ও কাকে খাওয়াবে!'

দুই ভাই, ব্রজ আর বিজয়, বলরাম আর কৃষ্ণ সেজেছে। আমরা কৃষ্ণলীলা অভিনয় করছি। আর এই যে দেখছ আমাদের সহচর-অনুচর, এরা সব রাখাল বালক। শ্রীদাম সুদাম।

অভিনয়ের শেষে দুই ভাই হাত ধরাধরি করে নাচে আর গায়: কানাই বলাই দুই ভাই, পথ ছেড়ে দে বাড়ি যাই।

কোথায় বাড়ি! পরনে পায়ে ধেড়াতে ধেড়াতে পথ হারিয়ে ফেলেছে বিজয়। রাত হয়ে এল, পথঘাট ঘুছে গেল অন্ধকারে। কোথাও লোকজন নেই, এ ধারটা একেবারে নির্জন। একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলো, ডাকতে লাগলো শ্যামসুন্দরকে। শ্যামসুন্দর, আমাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দাও। অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, বুঝতে পাচ্ছি না, আমাকে পথ দেখাও।

একটি দশবছরী ছেলে কোত্থেকে পাশে এসে দাঁড়ালো। বললে, এসো আমার সঙ্গে।

পথ আলো করে চলতে লাগলো শ্যামসুন্দর। বাড়ি পৌঁছিয়ে দিল নির্ভুল।

'ও সন্নিসি ঠাকুর, তুমি ও কার পুজো করছ?' বাড়িতে এক সন্ন্যাসী অতিথি হয়েছেন, তাঁকে জিগগেস করল বিজয়। বললে, 'ও তো দেখছি একটা পাথরের টুকরো।'

'হোক। ওই আমার ঠাকুর।'

'ওটি আমাকে দাও না।' সন্ন্যাসীর শালগ্রাম-শিলার দিকে হাত বাড়ালো বিজয়। 'আমি ওর পুজো করব।'

কী সর্বনাশ! শিলা বুঝি ছুঁয়ে দিল ছেলে, সবাই আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো। সন্ন্যাসী শিলাকে নিবিড় করে আঁকড়ে ধরলো বুকের মধ্যে। বিজয় কাঁদতে লাগলো।

সন্ন্যাসী ভাবলে, পালাই। যা দস্যি ছেলে, কখন না আমি শিলা অশুচি করে দেয়। যাবার সময় ছল করে একটা পাথরের টুকরো দিয়ে গেল বিজয়কে। বললে, 'এই নাও ঠাকুর।'

ঠাকুর পেয়ে বিজয়ের আনন্দ দেখে কে! ছল-অছল কী জানে, এক মনে সেই পাথরের টুকরোকেই পুজো করতে লাগলো।

ফিরতি পথে এসেছে সেই সন্ন্যাসী। ছদ্ম-হাসির আড়ালে দাঁড়িয়ে বিজয়ের পুজো দেখছে।

চমকে উঠলো সন্ন্যাসী। এ কে পুজো করছে? কার পুজো? স্বর্ণময়ীকে বললে,—মা, তোমার এ ছেলে সামান্য নয়।'

'নয়? কেন?' ভয় পেলেন স্বর্ণময়ী।

'ওই প্রস্তরখণ্ড জাগ্রত হয়ে উঠেছে।'

'বলেন কী সর্বনেশে কথা!' স্বর্ণময়ী বিজয়ের ঠাকুর, সেই পাথরের টুকরো, সন্ন্যাসীকে ফিরিয়ে দিলেন।

বিজয় মনে মনে হাসলো। যেন ঠাকুরকে ফিরিয়ে দেওয়া যায়! যেন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় তাকে সরিয়ে দেওয়া চলে!

উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় শান্তিপুর থেকে একা চাকায়, দেওয়ারিয়া আশ্রমে, চলে এসেছেন স্বর্ণময়ী। বিজয়কৃষ্ণ তো অবাক। এ কী, তুমি কোত্থেকে? এত দূর পথ কী করে এলে একা-একা?

'আমাকে ওরা সবাই পাগলা-গারদে দিতে চেয়েছিল।' বললেন স্বর্ণময়ী, 'আমি ভয় পেয়ে শ্যামসুন্দরকে বললাম, শ্যামসুন্দর, আমাকে তুমি আমার ছেলের কাছে রেখে এসো। শ্যামসুন্দর বললেন, তোর ছেলে কোথায়? আমি তখন ধমকে উঠলাম, বললাম, ভাখ, চালাকি করতে হবে না। শিগগির রেখে আয় বলছি। তখন আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসে রেখে গেল তোর কাছে।'

'শ্যামসুন্দর?'

'হাঁ, এই ভাখ, তোকে দেবার জন্যে তাঁর এই মাত্রবস্ত্র আমাকে দিলেন। বললেন, আমার বিজয়কে দিবি।' বলে স্বর্ণময়ী শ্যামসুন্দরের এক খণ্ড উত্তরীয় বিজয়কৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করলেন।

অভিভূত হয়ে সেই উত্তরীয় মাথায় ধরলো বিজয়কৃষ্ণ। আমি তাঁকে জানি বা না জানি, মানি বা না মানি, তিনি আমাকে কখনো ছাড়েন না, পারেন না ছেড়ে থাকতে।

প্রচারক অবশ্যই একবার বাড়ি ফিরেছে বিজয়। বাড়ি ফিরেছে মাকে দেখে যেতে। দুপুর বেলায় বসে আছে চুপচাপ, শ্যামসুন্দর এসে বললে, 'ভাখ, আজ আমাকে খাবার দিয়েছে, কিন্তু জল দেয় নি। জল ছাড়া খেয়ে কখনো তৃপ্তি হয়?'

তখুনি উঠে পড়লো বিজয়। খুড়িমাকে গিয়ে বলল, 'তোমার শ্যামসুন্দর বলছেন, আজ তোমরা তাঁকে জল দাও নি।'

খুড়িমা কাঁদটা মেরে উঠলেন: 'শ্যামসুন্দর তো আর লোক পেলেন না, তুই ব্রহ্মজ্ঞানী, তোকে এসেছেন নালিশ করতে!'

'তার আমি কী জানি। তুমি একবার দেখ না খোঁজ নিয়ে।'

খুড়িমা খোঁজ নিয়ে জানলেন, সত্যিই আজ জল দেওয়া হয় নি শ্যামসুন্দরকে। তখন ত্রুটিমোচন করতে পথ পান না খুড়িমা।

খুড়ির কোনো যদি অনাচার ঘটে তা হলে, বলতে গেলে, শ্যামসুন্দর সেই বিজয়কেই বলবে। আমি আর কাউকে জানি না, তোমাকে জানি—তুমি এর প্রতিবিধান করো।

বলছেন বিজয়কৃষ্ণ, 'আমি না মানলেও তিনি আমাকে ছাড়েন নি।'

শ্যামসুন্দরকে উদ্দেশ করে বলছেন, 'ঠাকুর, আমার উপর তোমার এতই যদি দয়া, তবে আর এতকাল এত ঘোরালে কেন? সমস্ত ভাঙিয়ে-চুরিয়ে বিষম কাণ্ডকারখানা করেছিলে কেন?'

শ্যামসুন্দর বললেন, 'তাতে তোর কী? ভেঙেও ছিলাম আমি, এখন আবার গড়ে নিচ্ছিও আমি। তাতে তোর কী হয়েছে? ভেঙে গড়লে ঢের-ঢের সুন্দর হয় না কী!'

কিন্তু সকলের আগে মা। মা-ই সমস্ত।

সরল বিশ্বাসে যথার্থ কাতর হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলে ভগবান নিশ্চয়ই পূর্ণ করেন প্রার্থনা। সরল বিশ্বাস মানেই বালকের বিশ্বাস। বালকের যেমন মাকে বিশ্বাস। আর যথার্থ কাতর তো একমাত্র শিশুই হতে পারে তার মায়ের কাছে।

ইউরোপে কোথাও অনেকদিন ধরে দারুণ অনাবৃষ্টি যাচ্ছে। বৃষ্টির জন্যে নগরবাসীদের সমবেত প্রার্থনা হবে গির্জেয়, চারদিকে রাষ্ট্র হয়েছে বিজ্ঞাপন। নির্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যার দিকে গির্জেয় দলে দলে লোক এসে জমায়েত হল—প্রার্থনায় যদি ফল হয়। জনতার মধ্যে একটি বালক ছাতা হাতে করে এসেছে। সবাই পরিহাস করছে, এমন সময়ে গরমে ছাতা কেন? সরল চোখ তুলে বালক বললে: 'আজ বৃষ্টি হবে না?' বৃষ্টি হবে—কে বললে? সবাই হেসে উঠলো। 'বা, বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা হবে না, সমবেত প্রার্থনা?' তা হবে তো হবে, তাতে এখুনি-এখুনি বৃষ্টি কী। 'বা, সমবেত কাতর প্রার্থনা শুনলেই ভগবান বৃষ্টি দেবেন। আর তখন বৃষ্টি হলে আমি যাই কোথায়? যাই বলো, ভিজে-ভিজে বাড়ি ফিরতে আমি প্রস্তুত নই।' —যেই সমবেত প্রার্থনা শেষ হল, আর তখুনি ঝমঝম করে বৃষ্টি নামলো। ছাতা খুলে বাড়ি চললো বালক, সকলকে বললে, 'ভগবানের উপর যদি তোমাদের সত্যি-

সত্যি বিশ্বাস থাকতো তা হলে ছাতা ফেলে আসতে না, আমার মতো নিয়ে আসতে সঙ্গে করে। এখন দেখ, তোমরা পড়ে রইলে, আর আমি চলে যাচ্ছি বৃষ্টির মধ্যে।'

'তোমাদের পায়ে পড়ে বলছি,' বললেন বিজয়কৃষ্ণ, : 'একবার মাকে ডাকো। শিশু যেমন ডাকে তেমনি কাতর হয়ে ডাকো। মায়ের দয়ার ইতি-অন্ত নেই। বিশ্বাস করে ডাকলে, সরলভাবে ডাকলে মা দেখা দেবেন, ধরা দেবেন। তেমনি করে মাকে একবার ডেকে দেখ না কী হয়, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।'

মায়ের সঙ্গে কুটুম বাড়ি গিয়েছে বিজয়। রাত্রে ঘরে একা-একা ঘুমুচ্ছে।

অমাবস্যা, কোথাকার এক বনে ভাঙা মন্দিরে কালী পুজো হবে। নরবলির বলি সংগ্রহ করতে বেরিয়েছে লোক, কিন্তু বলির দেখা নেই এখনো। কে একজন ঘুমন্ত শিশু বিজয়কে এনে হাজির করলো। সকলের আনন্দের আর সীমা-পরিসীমা রইলো না। এমন নির্মল নিরবদ্য বলি আর কোথায় মিলবে? স্নান করিয়ে শিশুকে নিয়ে এলো মন্দিরে। তান্ত্রিক কাপালিক খড়্গ তুলেছে বলি দিতে, এমন সময় কোত্থেকে কে জানে, এক পাগল এসে উপস্থিত। মুহূর্তে কাপালিকের হাত থেকে খড়্গ কেড়ে নিয়ে উলটে আক্রমণ করলো। কাপালিক আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা যে-দৌড়।

বিজয়কে কোলে করে কুটুম-বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল পাগল। কেমনতরো মা ঘুমন্ত শিশুকে একা ফেলে রাখে! কেমনতরো কুটুম! অতিথি শিশুর দিকে নজর রাখে না! বকতে বকতে, অসতর্কতাকে শাসন করতে করতে চলে গেল রক্ষাকর্তা।

কে এই পাগল? কে এই সতিমর্তা প্রভুঃ সাক্ষী? কে এই সাক্ষাৎসুহৃৎ?

'কে ও? দুলাল দাদা না?' ডেকে উঠলো বিজয়।

'আরে কে ও? গোঁসাই-দাদা?' দুলাল-সর্দারের হাতের বর্শা শিথিল হয়ে পড়লো।

গোস্বামীদের প্রজা, জাতিতে জেলে, রংপুর অঞ্চলে খামারে এলে বিজয়কে নিয়ে খেলা করতো। কাঁধে চড়াতো। রং-বেরঙের পাখি দেখতো। ডাকতো গোঁসাই-দাদা বলে।

তুমি আমার দুলাল-দাদা। পাল্টা সম্ভাষণ করতো বিজয়।

রংপুরে শিবরাড়ি চলেছেন স্বর্ণময়ী। পথে রাত হতে চড়ার কাছে ঝাউবনের আড়ালে নৌকো বাঁধলো মাঝিরা। নদীতে ডাকাতের ভয়। দুলাল সর্দারের ভয়ে সমস্ত নদীই এখানে তটস্থ।

যা ভয় করেছিল, হারে-রে-রে রব তুলে ডাকাতের ছিপনৌকো এসে চারদিক থেকে ঘিরে ধরলো। মারো, লোটো, কাটো। কেটে নদীর জলে ফেলে দে টুকরোগুলো।

'কে ও? দুলাল দাদা না?' ডাকাতের সর্দারকে পলকে চিনতে পেরেছে বিজয়।

'আরে কে ও? তুমি? আমার গোঁসাই-দাদা?' দুলালের হাতের বর্শা, যা কোনোদিন হয় নি, থরথর করতে লাগলো।

কতো ছেলেকেই তো কোলে-পিঠে করেছে দুলাল, কতো লোকের কণ্ঠেই তো শুনেছে দুলাল-দাদা, কিন্তু এ কে অপরূপ, যার কণ্ঠস্বরটি তখনো কানে লেগে আছে মধু হয়ে! যার ডাকটি শত কোলাহলেও ডুবে যায় না, মুছে যায় না মন থেকে। এক ডাকে চেনা যায়।

'কোথায় চলেছ?'

'শিবরাড়ি।'

'এত রাত্রে, এখানে ? কোপের মধ্যে ?'

'তোমার ভয়ে।' হেসে উঠলো বিজয়।

'সঙ্গে আর কে আছে ?'

'যা আর দাদা।'

নৌকোয় নিজের লোক দিয়ে দিল দুলাল। বলে দিল নিরাপদে এদের শিঙ্গ বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবি। খেয়াল রাখবি পথে কেউ যেন না বিরক্ত করে, একটি আঙুলও যেন না তোলে। বলবি দুলাল-সর্দারের লোক।

দুলাল-সর্দারের মধ্যেও ভাবসুন্দর।

জয়গোপালদের নাটমন্দিরে কীর্তন শুনতে যাচ্ছে বিজয়। পথে দেখতে পেল অশ্বত্থ গাছের ডালে ডাক করে একটা লোক বাঁটুল ছুঁড়ছে। সঙ্গে সঙ্গেই একটা ঘুঘুপাখি রক্তাক্ত দেহে ছিটকে পড়লো জলের উপর, মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলো।

'গোপাল-দা, দেখ দেখ, কে এই লোকটা, নিরীহ পাখিটাকে মারলে!' আহত পাখিটাকে বুকে নিয়ে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো বিজয়।

পাখিটার মুখে-গায়ে জল দেওয়া হল। কণ্ঠনালীটা একবার নড়লো পাখির, তারপর নিস্পন্দ হয়ে গেল।

শীতাম্বর চক্রবর্তীর বাড়ির সামনে ঘটনা। তিনি কান্না শুনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন মৃত পাখি হাতে নিয়ে ছোট একটি ছেলে আকুল হয়ে কাঁদছে।

কে রে এই জগন্মোহন ছেলে, সামান্য পাখির শোকে কেঁদে ভাসায় !

বিজয়কে কোলে টেনে নিলেন শীতাম্বর। শান্ত করতে বললেন। তাঁর নিজের চোখও সিক্ত হল।

আর যে মেরেছিল পাখিটাকে—গায়ন স্বামী তার নাম—চিরজীবনের মতো ছেড়ে দিল পাখি-শিকার।

আমহলায়, নিজ আসনে ধ্যানমগ্ন আছেন বিজয়কৃষ্ণ। হঠাৎ চমকে উঠে বললেন,—'দেখ তো, দেখ তো, ওদের তাড়িয়ে দাও, তাড়িয়ে দাও, পাখিরা ডাকছে।'

কোথায় পাখি ডাকছে ! কোথায় কাকে তাড়িয়ে দেবে ?

গোস্বামী-প্রভু বললেন, 'গিয়ে দেখ কুঞ্জ ঘোষের বাড়ির বড়ো আম গাছে।'

শিষ্য ভক্ত কুলদানন্দ তখুনি ছুটলো। গিয়ে দেখলো, কুঞ্জ ঘোষের বাড়ির বড়ো আম গাছটাকে লক্ষ্য করে দুটো ছেলে ঢিল ছুঁড়ছে। ওখানে কী ? শালিকের বাসা। তিন চারটে শালিক গাছের উপরে এ-ডাল থেকে ও-ডালে ওড়া-ওড়ি করছে আর ডাকছে। ধমক দিতেই ক্ষান্ত হল ছেলেগুলো। পাখিরাও স্থির হল। ফিরে এলো কুলদা।

'কী দেখলে ?' জিজ্ঞেস করলেন বিজয়কৃষ্ণ।

কুলদা যা দেখেছে বললে। বললে, 'আমি তো এখানেই বসেছিলাম, পাখিদের শব্দ তো কিছুই শুনতে পাই নি। আপনি মহাবন্ধায় থেকে অত দূরে পাখিদের ডাক কী করে শুনলেন ?'

গোস্বামী-প্রভু বললেন, 'নিকটে যা ঘুরে, তার কী করবে ? যেখানে যে অবস্থায়ই থাকা যাক, কোনো আপদে পড়ে কেউ ডাকলে তখুনি তা এসে প্রাণে বাজে।' —[ক্রমশঃ]

শেষের গল্প ॥

সম্বুদ্ধ ॥

এই গল্প যে কালের তার নাম হলে-হতে-পারত। এর ক্রিয়াপদগুলোতে লঙ্, লিট্ না দিয়ে লৃঙ্ বিভক্তি দেওয়া হল।

ভবিষ্যদ্বক্তারা বলেছিলেন, তেসরা থেকে পাঁচুই ফেব্রুয়ারি তিন দিন ধরে অষ্টগ্রহ সম্মেলন হবে। দুই গ্রহের সংঘাতে শ্রীকৃষ্ণপুরীতে যা যা হল তার থেকেই অনুমান করা যাচ্ছিল, আটগ্রহের মিলনে ঘটনাটা কিধিধ দাঁড়াবে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই তাই সর্ববিধ পরিণতির জন্যে প্রস্তুত হয়ে ছিলেন, ব্যাঙ্কের টাকা তুলে নিয়ে, স্ত্রীকে পিত্রালয়ে পাঠিয়ে, ইনসিওরেন্স পলিসি সারেণ্ডার করে এবং বাড়িভাড়া, কর্পোরেশন ট্যাক্স যতটা সম্ভব বাকি ফেলে।

আমি শ্রীসম্বুদ্ধ, ট্যারা চোখ মেলে বসে নউই জানুয়ারী তারিখে এই অবস্থা দেখেছি, এবং এর পরের ঘটনাবলী মানসনেত্রে দেখে নেবার চেষ্টা করেছি। ভেবেছি ঐহিক পৃথিবীতে হয়ত এইটাই শেষ গল্প যা আমি লিখলাম এবং আপনি পড়লেন।

হ'ল না। পচা-ঘি খেয়ে দেবতারা গাড়ু-ঘটির আশ্রয় নিলেন, প্রলয় ঘটানোটা বুলডুমি হয়ে গেল। কিন্তু, হতে পারত। হলে কি কি হত, তার ছবি প্রত্যক্ষ করুন।

তেসরা ফেব্রুয়ারী অবধি নির্বিঘ্নে কেটে যেত। সাগাজার গোরা আবার আক্রমণ করতেন না, জওহরলাল এবারেও ইলেকশন জেতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতেন, আকাশে মেঘ বা ঝড়ের আভাস থাকত না।

তেসরা ভোর থেকে অল্প অল্প মেঘ জমত আকাশে। হাওয়া কিছু এলোমেলো হত। চৌঠা সকাল থেকে মেঘ বাড়ত। হাওয়া কমত। চৌঠা রাত্রে হাওয়া একদম বইত না, অসম্ভব গরম পড়ত, যেন সর্বাঙ্গ পুড়ে যেত তার তাপে, বুকের মধ্যে আগুনের হল্কা ঢুকত প্রতিবার শ্বাসের সঙ্গে।

শেষ রাত্রি থেকে হাওয়ার জোর বাড়ত। পাঁচুই সকাল বেলায় রীতিমত ঝড়। ঝড়ের বেগ ক্রমশ বেড়ে চলত। আকাশে মেঘের রাশি সদ্য-ধুনুরীর তুলোর রাশির মত নিয়ত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন এবং ইতস্তত নিক্ষিপ্ত হতে থাকত। দুপুর থেকে শুরু হত প্রচণ্ড বর্ষণ। হিমালয়ের শিখরদেশে মুহুর্মুহু বজ্রপাত হত। সন্ধ্যের পরে ভারত মহাসাগর এবং তার দুই শাবক আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর অকস্মাৎ উদ্বেল হত। সত্তর-আশিফুট উঁচু উঁচু ঢেউ এসে পড়ত ডাঙার ওপরে। সমগ্র ভারতভূমি সেই জলপ্লাবনে একযোগে নিশ্চাবিক হয়ে যেত। কিছু কিছু মুনি ঋষি যতঃ হিমালয়ের ঊর্ধ্বদেশের বাসিন্দা; কিছু কিছু ভবিষ্যদ্দৃষ্টি এবং যেত সম্পন্ন ব্যক্তি আত্মরক্ষার্থে হিমালয়ের পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করেছিলেন; বজ্রপাতে হিমালয়ের শিরঃস্থিত বরফ বিগলিত হয়ে চল নামত এবং গিরিপৃষ্ঠ বিদীর্ণ হয়ে

ধরে নামত—তার হাজার এঁরাও সকলেই অচিরাৎ পাদদেশস্থ সমতল ভূমিতে উপনীত হতেন এবং অদৃশ্য হতেন। তারতমাতা নির্বংশ হয়ে যেতেন।

রাত দুটো-আড়াইটে নাগাদ এই মহৎ কর্ম সমাধা হত। তার পর কর্ম সমাপনান্তে সম্মেলনের ইতি হত। অট্টহাস আবার যে যার কক্ষ-পথে ধাবিত হতেন। একা রাহু কর্কটাশ্রিত হয়ে দাঁড়িয়ে মুচকে হাসতেন আর ভাবতেন, একা আমি সঙ্গে ছুটিনি, তাই এত কাণ্ড, অথচ আমি স্বয়ং কিছুমাত্র উপদ্রব ঘটাইনি। এবার বোঝ নিরুপদ্রব অসহযোগের ঠেলাখানা। ভাবতেন এবং মুচকে হাসতেন, দেহ নেই বলে করতালি দিতে বা নৃত্য করতে পারতেন না। তাঁর সেই সলীল আনন্দে পাছে কেউ বাধা দিতে চায়, বলে কর্কটরাশি তাঁকে ক্রোড়ে ধারণ করে দুই বিকট দাড়া উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এই ভাবে রজনী প্রভাত হত।

দুইই ফেব্রুয়ারী। আকাশের বড়বাপ্টা শান্ত। নীচের বিস্রাণ পৃথিবী আরও শান্ত। বেলা দশটা নাগাদ দেবলোকে সংবাদ পৌঁছত। দেবতারা বিচলিত হতেন, সবাই যদি মরে গেল ত আমাদের পুজোটুজো দেবে কে। তাঁরা বলতেন, এর তদন্ত হোক। ইন্দ্র বলতেন, বয়ে গেছে, এমনিতেও আমাকে আর কেউ তেমন পোঁছে না আজকাল। তদন্ত হবে না তা নয়। তবে ধীরে সুস্থে। ব্যস্ত হবার কি আছে।

বৃহস্পতি বলতেন, তা আছে বৈকি। দেরি করলে পচা গন্ধ ছাড়বে। অনেক বেশী দেরি করলে বহু প্রমাণই লুপ্ত হয়ে যাবে।

ইন্দ্র বলতেন, তাহলে অশ্বিনীকুমাররা চলে যান, সবাই মরল কি না দেখে আসুন। তাঁরা এসে মরেছে বললে তখন আমি শুনে দেখতে লোক পাঠাব।

অশ্বিনীকুমারদ্বয় বেরিয়ে পড়তেন। ফিরে এসে চালাও রিপোর্ট দিতেন, সব সাবাড়। শুনে ইন্দ্র বলতেন, তবে আর কি, এখন আর আমার দায় নেই, সব যমরাজের এলাকা। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে দুচোঁক সুরা খাওয়া যাক।

দুটই তারিখ থেকে নটই তারিখ ধরে এই ব্যাপার। দশই তারিখ সকালবেলা যমরাজ ইন্দ্র-প্রেরিত অশ্বিনীকুমার-রিপোর্ট পেতেন। বলতেন, চিত্রগুপ্ত তাহলে ব্যবস্থা করতে হয়।

চিত্রগুপ্ত বলতেন, আজ্ঞে। কিন্তু চাট্টিখানি কথা নয়। একসঙ্গে এতগুলো, কোথায় বা বসাই, কি-বা খেতে দিই।

যমরাজ বলতেন, তা বললে ত হবে না। আসছে যখন, আয়গা দিতে হবেই। মেহেরচাঁদ এসেছে?

চিত্রগুপ্ত বলতেন, আসবে নিশ্চয়ই। তবে এখনও এসে পৌঁছায় নি কেউ। মানে জলে ডুবে মরা, ফুলে ঢোল হয়ে গেছে, সময় নেবে।

যমরাজ বলতেন, তা হোক। এলে পরে মেহেরচাঁদকে ডেকে দেবে। এদের বাসস্থা করানোর ভারটা তাকেই দেওয়া যাবে।

এগারোই তারিখ। শেষ রাত থেকেই একটা দুরাগত হলহলারব কানে আসত।

ভোর বেলা সেটা ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠত।

বেলা নটা নাগাদ তুমুল কোলাহল যমপুরীর ফটকের বাইরে। ফটকের ওপরেও দুমদাম কিল গুঁতো।

যমরাজ বলতেন, এ যে কান পাতা যায় না। কি হল, ও চিত্রগুপ্ত।

চিত্রগুপ্ত বলতেন, এসে পড়েছে, তাই আওয়াজ।

যমরাজ বলতেন, তা, অত চ্যাচাচ্ছে কেন! আর ধরজাই বা সেটায় কেন।

চিত্রগুপ্ত বলতেন, ঢুকতে চাইছে।

যমরাজ বিস্মিত হয়ে বলতেন, যমপুরীতে ঢুকবার জন্যে এত তাগাদা?

চিত্রগুপ্ত বলতেন, মর্ত্যলোকের সবই বিচিত্তির।

যমরাজ বলতেন, তা বেশ, দাওনা ফটক খুলে।

চিত্রগুপ্ত বলতেন, বলাব কোথায়? আমি ভেবেছিলাম মেহেরচাঁদ আগে পৌছে গেলে, তখন ধীরে সুস্থে এদের ঢোকাব, ইন্ ইনস্টলমেণ্ট্স্।

যমরাজ বলতেন, সে আর পৌছেছে। এই ভিড় ঠেলে আসতে পারলে ত। তুমি দাও খুলে ফটক। যা হবার তা হয়ে যাক্।

চিত্রগুপ্ত বলতেন, তবে আপনিই একটু দাঁড়ান।

যম ভীষণ কালান্তক মূর্তি ধারণ করে ফটকের মুখে দাঁড়াতেন। চিত্রগুপ্তের ইঙ্গিতে দ্বারী ফটক কিঞ্চিৎ ফাঁক করে দিতেন।

বিপুল জনতার খানিকটা অংশ জলস্রোতের মত দুর্বার বেগে ঢুকে পড়ত। চিত্রগুপ্ত বলতেন, আরে, আস্তে আস্তে। সে কথা কেউ শুনতেই পেত না।

তখন যমরাজ বজ্রগম্ভীর স্বরে বলতেন, চুপ কর। স্থির হয়ে দাঁড়াও। আসবে, থাকবে। এত হৈ চৈ কিসের?

ভিড়ের মধ্যে লোক কলরব করে উঠত, আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

—দেরি? কিসের?

—ইলেকশনের।

—তার মানে?

—মানে নির্বাচন। আমাদের নির্বাচন ফসকে যাবে দেরি হলে।

—ভাল বুঝতে পারছি না। স্থির হও, একজন একজন করে কথা বল। কে বলবে?

ভিড়ের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি ঠেলেঠুলে সামনে এসে দাঁড়াত। খুব বেঁটে, খুব মোটা, মাথায় খুব টাক। মাথাটা এত প্রকাণ্ড যে নড়বড় করে দুলছে, মনে হচ্ছে এই বুঝি পড়ে যায় বোঁটা ভেঙে। মার্জিত করে কথা বলতে চেষ্টা করে। কিন্তু যেমন অমার্জিত তার ভাষা, তেমনই অমার্জিত আর কর্কশ তার বাচনভঙ্গী। গলা খুব যাত্রা-যাত্রা করে, যেন স্কুলে কবিতা আবৃত্তি করছে, বলত, আমি বলব।

—তুমি কে?

—আমি এদের প্রতিনিধি। জনসেবক।

—এতগুলো জন, তারে তুমি একমাত্র সেবক?

—আমি একা কেন, আমার পার্টি আছে। তবে আপাতত আমিই নেতা, কারণ অন্যেরা সকলে নেতিয়ে পড়েছে।

যমরাজ বলতেন, সবই তাজ্জব। যে নেতিয়ে পড়ে না তারই নাম নেতা।

জননেতা বলত, ফাজলামো করবেন না।

চিত্রগুপ্ত যমকে দিতেন। বলতেন, সাবধানে কথা বল। কে ইনি, জান? স্বয়ং যমরাজ।

পেছনের ভিড় থেকে ধ্বনি উঠিত,

রাজাগজা মানি না।

বাপ বাবার নাম জানি না॥

জননেতা হুঙ্কার দিয়ে বলত, নিশ্চয়। তারপর গলা নীচু করে চিত্রগুপ্তকে বলত, আমার সম্বন্ধে একটু স্পেশাল করে বলে দেবেন, স্যর।

চিত্রগুপ্ত যমকে চোখ টেপে দিতেন।

যমরাজ বলতেন, বেশ, জননেতা, তোমার মুখেই শুনি ব্যাপারটা। এত গোলমাল কেন?

জননেতা হঠাৎ ডানহাত মুঠো করে আকাশের দিকে ঘুষি ছুঁড়ত, একা-একাই চীৎকার করে বলত,

আমাদের দাবি মানতে হবে।

নির্বাচন করতে হবে।

যমরাজ বিস্মিত হয়ে যেতেন। বলতেন, ও চিত্রগুপ্ত, এসব কি বলছে?

চিত্রগুপ্ত বলতেন, আজ্ঞে মর্ত্যলোকে আজকালই ওদের নির্বাচন হবার কথা ছিল। সেইটে চাইছে, কিন্তু এখানে ত নির্বাচন হয় না। ওটা—মর্ত্যলোকেরই ব্যাপার।

যমরাজ বলতেন, কেন হবে না। নির্বাচন মানে ত বাচন বন্ধ করা। হোক না। তবু কান দুটো বাঁচবে।

জননেতা বলত, আলবৎ হবে, হতেই হবে।

যমরাজ গম্ভীর স্বরে বলতেন, বাচালতা কোরো না। 'হতেই হবে' কথা আমাকে বলা যায় না।

জননেতা বলত, জানেন, এটা ডিমোক্রাসির যুগ?

—সেটা কি বস্তু?

—তাই জানেন না? ছোঃ।

—তুমিই দাও না বুঝিয়ে। তুমি তো জননেতা।

—জননেতা হবার জন্যে বোঝবার বা বোঝানোর দরকার হয় না। দরকার হচ্ছে পাবলিক ওপিনিয়ন।

যমরাজ বলতেন, এক-একটা করে বল। ডিমোক্রাসি কি?

—ডিমোক্রাসি মানে হচ্ছে ডিমসেরক্রাসি। ক্রাসি মানে শাসন। যেমন বুরোক্রাসি অটোক্রাসি। তেমনি ডিমোক্রাসি।

চিত্রগুপ্ত বলতেন, বুঝেছি। বুড়োক্রাসি মানে বুড়োদের শাসন। যা আগে ছিল। বুড়ো মানে প্রবীণ জন, মুনি-ঋষিরা। আটোক্রাসি মানে আটজনের শাসন, যা হয়ে গেল, যার চেলায় এরা মর্ত্যলোক ছেড়ে চলে এসেছে।—ডিমোক্রাসি মানে তাহলে হল, ডিমের শাসন। কিন্তু কিসের ডিম?

জননেতা বলত, ছাই বুঝেছেন। ডিমোক্রাসি মানে হচ্ছে, আমাদের শাসন। মানে—

যমরাজ বলতেন, মানে ডিম্বাকৃতি—মাথা ওয়ালাদের শাসন। এই ত?

জননেতা বলত, আজ্ঞে না। এ সে-ডিম নয় যে-ডিম হাঁসে পাড়ে। যে ডিম থেকে বাচ্চা বেরোয়। এ হচ্ছে—

চিত্রগুপ্ত বলতেন, নির্গুণ নিরাকার নৈর্ব্যক্তিক ডিম।

জননেতা গদগদ হয়ে বলত, যা বলেছেন। আমি সেই নির্গুণ নিরাকার নৈর্ব্যক্তিক ডিমসের, সেই মহাজনগণ মানসের প্রতিনিধি। এদের দ্বারা নির্বাচিত।

যম বুঝতেন না কিছুই। তবু এইটুকু বুঝতেন যে এ বোঝা তাঁর কর্ম নয়। খুব মাথাটাথা নেড়ে বলতেন, হুঁ। হুঁ। হুঁ। তা, এখন তোমার বক্তব্যটা কি?

—বক্তব্য হচ্ছে, এবার আমাদের নির্বাচন হবার কথা ছিল। মরেই যাই আর যাই হই, নির্বাচন ফস্‌কাতে পারে না। কারণ ওটা একেবারে বেসিক পলিটিক্যাল রাইট—অ্যাট্-ওয়ান্স্ এ রাইট অ্যাণ্ড এ ডিউটি। অতএব আমাদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হোক, অবিলম্বে।

—কিন্তু নির্বাচন দিয়ে কি হবে? মর্ত্যলোকের সুখদুঃখ, তার জীবন মৃত্যু, সব কিছুকেই পেছনে ফেলে এসেছে তোমরা। তার সেই একটা বস্তু, কি সে বস্তু জানিনে, তাকে এখানে টেনে নিয়ে আসবার জন্যে এত অধীর হচ্ছ কেন?

জননেতা বলত, অধীর হব না? বলেন কি। ডিমোক্রাসি ইজ আওয়ার বার্থ-রাইট। মানে, কত কেঁদে কঁকিয়ে কত কেচ্ছা করে তবে এই রাইটখানা পেয়েছি আমরা। স্বাধীন হয়েছি। তার পরে দুটো মাত্র নির্বাচন হয়েছে আমাদের। এরই মধ্যে সব ফুরিয়ে যাবে? স্বাধীনতার জন্যে এত মহাসমর, সব মিথ্যে হয়ে যাবে? তা হতেই পারে না। আমরা তাহলে সত্যাগ্রহ করব।

যমরাজ বলতেন, দাঁড়াও, একটু বুঝে দেখি ব্যাপারটা। ধর, নির্বাচন হল। তারপর, কি হবে তখন?

—নির্বাচন করে স্থির হবে কে আমাদের শাসন করবে।

চিত্রগুপ্ত বলতেন, আর যমরাজ কোথা যাবেন? আবদার!

জননেতা বলত, তা না হয় ওঁকেই ভোট দেব আমরা। কিন্তু নির্বাচন চাইই চাই।

পেছনের ভিড় এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার হেঁকে বলত, চাই চাই।

একজন বেশী উৎসাহে 'চায়-প্রম্' বলে ফেলবে।

সেই ফাঁকে জননেতা ফিসফিস করে বলত, একটু চেপে যান না স্যর। দেখবেন আমি সব ম্যানেজ করে নেব।

চিত্রগুপ্ত বলতেন, বেশ, ধর তাই হল। এঁকেই ভোটে দিলে, ইনিই শাসক হলেন। অর্থাৎ যা ছিল তাই রয়ে গেল। তোমাদের লাভটা হল কি?

জননেতা বলত, সমূহ লাভ। সবারই।

—কি করে?

—এই ধরুন, ইনি জানবেন, সর্বসম্মতিক্রমেই ইনি নির্বাচিত। অতএব এঁর অখণ্ড প্রতাপ।

—সে ত হয়েইছে।

—আহা বুঝছেন না। এখন আছে বাহুবলে। তখন থাকবে জনমতের বলে। সে প্রতাপে আপত্তি করবার কেউ থাকবে না।

—বেশ, চল। কিন্তু তাহলে ত ওদেরই স্বেচ্ছায় শিরঃ-বিক্রয়। ওদের লাভ কি, সে নির্বাচনে?

—ওরা ভাববে, ওরাই এঁকে গড়েছে, অতএব তাতে ওদেরই অধিকার।

—তাহলে ওরা পাঁচ মুণ্ড্য বল?

—আজ্ঞে তাই যদি না হবে, আপনি আমি করে খাব কি করে।

—হুঁ। কিন্তু এঁর লাভ হল শক্তি প্রতিষ্ঠা, ওদের লাভ হল আত্মস্তুতি, যা আত্ম-প্রবঞ্চনা, তাই বল। তোমার লাভটা কি?

জননেতা গলা খাটো করে বলত, আমার লাভও তার একশ এন-পি। আমি ওদের বুঝিয়ে দেব আমার নেতৃত্ব বলেই ওরা নির্বাচনে জিতেছে। অতএব আমি অবিসংবাদিত জননেতা থেকে যাব।

যমরাজ বলতেন, আঃ, মধুর। কী চমৎকার মাথাটা তোমার, চেটে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু এমন মাথাখানা, ঘরে রাখা উচিত। এত পালিশ কেন?

চিত্রগুপ্ত বলতেন, আমার মনে হচ্ছে, বুদ্ধির তাপে।

জননেতা বলত, হেঁ হেঁ হেঁ।

যম। হবে। এত ফোলা কেন?

চিত্র। বুদ্ধির ভাঁপে।

জন। হেঁ হেঁ হেঁ।

যম। এমন দুলছে কেন?

চিত্র। নিশ্চয়ই বুদ্ধির চাপে।

জননেতা বলত, এবার হল না তার। দায়িত্বের চাপে।

যমরাজ বলতেন, দায়িত্বটা কিসের?

—অকল্যাণের দায়িত্বটা নিজের মাথায় করে বহন করছিনা সারাক্ষণ?

—সত্যি করছ?

—আহা, ওরা তাই ভাবছে। মানে আমিই ভাবাচ্ছি।

যমরাজ বলতেন, নাঃ, এ দামী মাল। চিত্রগুপ্ত, একে হাতছাড়া করা যাচ্ছে না। যা বলছে কর। নির্বাচনের ব্যবস্থা করে দাও।

জন। আজ্ঞে হ্যাঁ, আজই।

—আজই হয় কি করে।

—হতেই হবে। দেরি হলে সমূহ বিপদ, বাগানো ভোট সব ভেস্তে যাবে। মানে, আমরা কিছু আগে আগে দৌড়ে চলে এসেছি। ওদের ভোটাররা পেছনে আসছে। এসে পড়বার আগে কাজ সেরে ফেলতে চাই।

যমরাজ বলতেন, তোমার ভাষাগুলো আমার ঠিক জানা নয়- - কিন্তু বোধহয় মোটামুটি বুঝতে পারছি। তবু, যেহ, এতবড় একটা ব্যাপার, আমরাও অনভ্যস্ত, কিছু সময় যাবেই ব্যবস্থা করতে।

জননেতা বলত, অসম্ভব। জানেন না ত এ সব ব্যাপার। একটা দিন কেন, একটা ঘণ্টা-মিনিটের আগুপিছুতে পাকা ঘুঁটি কেঁচে যায়। টেষ্টম্যাচের চেয়েও সূক্ষ্ম মাপের খেলা। বর্তমানের অসুবিধাটাই শুধু ভাববেন না স্যর। ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করবেন।

যমরাজ বলতেন, ভুল করলে, বর্তমান, ভবিষ্যৎ ওসব মর্তলোকের কথা। এখানে এসে সব সমান। বর্তমান বা ভবিষ্যৎ বলে কিছুই নেই এখানে। সব ভূত।

জনতা চেঁচিয়ে বলত, আমরাও ?

—তা বই কি।

জনতা গর্জন করে বলত, ভাই সব,আমাদের ভূত বলেছে।

জননেতা দুই হাত তুলে মাথা আরও দুলিয়ে দুলিয়ে ওদের কি সব বলত। তারপর হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে একদম নন্দিনীর মত করে বলত, রাজা এবার তোমার সঙ্গে আমার লড়াই।

যমরাজ হেসে বলতেন, এ যে দেখি নতুন রং।

জননেতা যাত্রাগানের হিরোর মত করে বলত, নিশ্চয়। আমি এদেরই প্রতিনিধি, জনগণ মালিকের বাহক। বলুন, কৈফিয়ৎ দিন। কেন, কোন অধিকারে আপনি এদের ভূত বলেছেন ?

যমরাজের মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল হত। বলতেন, মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ।

জননেতা আরও চেঁচিয়ে বলত, আপনি বলেছেন এখানে বর্তমান বা ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। সবই ভূত। তাই এরাও ভূত। তা হলে, আমি বলছি, আপনিও ভূত। ভূতরাজ, মহাভূত।—আপনার এই পুরীতে যে যেখানে আছে সবাই ভূত।

যমরাজ পেছনে, যমপুরীতে যারা থাকে তারা অনেকে ইতিমধ্যে এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। এবার তারা চেঁচিয়ে বলত, খবরদার। আমরা ভূত নই। আমরা প্রেত।

জননেতা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মর্ত্যলোক থেকে আসত ভূতরা চেঁচিয়ে বলত, আলবৎ বলব। ভূত। ভূত। ভূত।

প্রেতরা আরও চেঁচিয়ে বলত, খবরদার। মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেলব। আমরা প্রেত। প্রেত। প্রেত। তোরা ভূত। তোরা ভূত। তোরা ভূত।

জননেতা গর্জন করে বলত, ভাই সব, ভোট দাও। হাত তোল। আজ প্রত্যক্ষ নির্বাচন। বল, ভূত। ভূত। ভূত।

প্রেতরা উচ্চ লম্ফ দিয়ে বলত, না, প্রেত। প্রেত। প্রেত।

তারপর দুই দল একসঙ্গে হুঙ্কার দিয়ে বলত, বন্দেমাতরম্। জয় হিন্দ্। ইনক্লাব জিন্দাবাদ। আমরা-কী জয়। আমরা জিন্দাবাদ। তোরা মুর্দাবাদ।

যমরাজ বলবেন, নির্বাচন কাকে বলে বোঝা গেল। তাইহোক, নির্বাচনই হোক। চিত্রগুপ্ত, কটক খুলে দাও। সমস্ত নরকের দোর খুলে দাও। দেখি কারা হারে কারা জেতে।

তারপর যে কাণ্ড হত, সে কল্পনা করতে স্বয়ং ভ্রুশুণ্ডির মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠবে। কেনেডির মাথা টেকো হয়ে যাবে। ঘণ্টা দুই পরে দেখা যেত, ভূত প্রেত ইহলোক পরলোক, সব নিশ্চিহ্ন নির্ঝঞ্ঝাট। শুধু একা পরম ব্রহ্ম সেই নির্মক্ষিক শূন্য ভূমিতে বিচরণ করছেন।

অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। তারপর সহসা খেয়োক্তি করতেন, আমি এখন কোথায় যাই।

অকস্মাৎ শুনতে পেতেন, এস আমার মধ্যে বিলীন হয়ে যাও।

ব্রহ্ম বিস্মিত। এদিক-ওদিক তাকাতেন, কাউকে দেখতে পেতেন না। বলতেন, কে তুমি? কোথা থেকে কথা বলছে?

উত্তর হত, আমি সর্বত্র থেকে কথা বলছি। আমি মহাশূন্য।

—কি বলছে?

—বললাম, তুমি আর একা একা বসে কি করবে। বিশ্বাসে ব্রহ্মের অস্তিত্ব, বিশ্বাসে বিলয়। তোমাতে বিশ্বাস করবার কেউ রইল না, অতএব তোমারও অস্তিত্ব শেষ। তুমি এস, আমার মধ্যে বিলীন হয়ে যাও।

ব্রহ্ম বলতেন, তা বটে। আমার অস্তিত্ব শেষ। কিন্তু, তোমার মধ্যে আমি বিলীন হব কি করে?

—কেন, বাধাটা কিসের?

আমি ব্রহ্ম, সর্বব্যাপী। আমি সবের মধ্যে নই। আমারই মধ্যে সব। তুমিও আমার মধ্যে। তোমার চেয়ে আমি বড়। ছোটর মধ্যে বড় বিলীন হতে পারে না।

মহাশূন্য বলত, কে বললে তুমি বড়। তুমি যখন থাকবে না তখনও আমি থাকব। আমিই বড়।

ব্রহ্ম গর্জন করে বলতেন, খবরদার। আমি বড়।

মহাশূন্য বলত, তাস্। আমি বড়।

—বারণ করছি।

—সাবধান বলছি।

হঠাৎ দুজনেরই মনে হত তাদের দুই টিকি কে দুই হাতের দুই অদৃশ্য আঙুলে পেঁচিয়ে ধরেছে। দুজনে একবাক্যে বলতেন, কে?

শুনতেন, আমি আদ্যাশক্তি, মহাশক্তি। এত দেখলে, তবু অহমিকা গেল না, মারামারির বুদ্ধি গেল না? বেশ, দিচ্ছি।

বলে দুই মাথাকে ঠকাস করে ঠুকে দিতেন।

অনেক-কুড়ি হাজার-মেগাটন বম একসঙ্গে ফেটে যেত। ঘোর রবে সমস্ত অদৃশ্য হয়ে যেত। তারপর ধোঁয়া কাটলে দেখা যেত, এরা ত গেছেই, এদের সেই সম্মিলিত মহাবিস্ফোরণের ধাক্কায় খরং আদ্যাশক্তিও শত-সহস্রধা বিদীর্ণ হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন।

———

সুরের আগুন ॥

জগদীশ মোদক

আজকের ফাল্গুনদিনটা বড়ো ভালো লাগছিল। সারাটা দিন আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। কখনো ঝিরঝির কখনো ঝুপঝাপ ক'রে বৃষ্টি নামছিল। বিকেলের দিকে আকাশটা খোলসা না হলেও মেঘ অনেকটা হালকা হয়ে গিয়েছিল। হালকা মেঘে অস্তগামী সূর্যের রক্তিম ছটা। সেই রক্তিম মেঘের আলোয় প্লাবিত হয়ে সমস্ত প্রকৃতিটা যেন বড়ো অপরূপ হয়ে উঠেছিল।

ঘর থেকে বেরিয়ে আমি খোলা ছাদটায় এসে দাঁড়িয়েছিলুম। ঘরে রেডিওটা বেজেই চলেছিল। কিন্তু সেদিকে আমার এতটুকু মন ছিল না। এতোক্ষণ ঘরে কী যে মাথামুণ্ডু হচ্ছিল জানি না। প্রকৃতিতে এতো তন্ময় হয়ে পড়েছিলুম যে পারিপার্শ্বিক কোনো কিছুর সঙ্গেই মনের সঙ্গতি খুঁজে পাচ্ছিলুম না। তারপর কখন যেন রেডিওতে কে গাইতে সুরু করেছিল :

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন ভোরের আকাশ ভরে দিলে
এমন গানে গানে।

গানটা হঠাৎ কানে আসতেই আমার সমস্ত চেতনা যেন একেবারে নিস্পন্দ হয়ে গেল। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সজাগ ক'রে আমি যেন গানের সেই পরিচিত সুর আর কথাগুলি শুনতে লাগলুম।

পশ্চিমের আকাশটা আরও রক্তিম হয়ে উঠেছে। বাতাসে মল্লিকবাড়ির নারকেল গাছের পাতাগুলি বাদলের মতো দুলছে। বৃষ্টিধোয়া পাতাগুলি রক্তিম আলোয় চিক্‌চিক্ করছে। জামরুল গাছে এক ঝাঁক শালিক কিচির-মিচির করছে। সবকিছু মিলে যেন সেই মোহনপুরের মতোই আবহাওয়াটা।

মোহনপুর, নন্দিতা, বাগচিবাড়ি—সব যেন ছায়াছবির মতো আমার স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো। এই গান এই সুর আমাকে যেন জীবনের একটি তীব্র অধ্যায়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিল।

তখন আমার কতোই বা বয়েস। তেইশ কি চব্বিশ। চোখে রঙীন স্বপ্ন, মনে মহৎ আদর্শ। ছাত্রজীবনের পর রাজনীতি, সমাজসেবা ইত্যাদিতে কয়েকটা বছর কাটিয়ে মনে কেমন একটা বিরক্তি এসে গিয়েছিল। অথচ সেই আদর্শ মনটা তখনো মরে যায় নি। এর পর কি করা যায় ভেবে কূলকিনারা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ঠিক করলুম, কোনো গ্রামের শান্ত পরিবেশে গিয়ে শিক্ষক জীবনের মহৎ ব্রত গ্রহণ করবো। এই উদ্দেশ্য নিয়েই মোহনপুরে যাওয়া।

প্রথম থেকেই গ্রামটি আমার কাছে বড়ো ভালো লেগে গিয়েছিল। এককালে গ্রামটি যে খুব সমৃদ্ধ ছিল তার সাক্ষীস্বরূপ ছড়িয়ে আছে বড়ো বড়ো বাড়ির ধ্বংসাবশেষ, পুরনো মেউল আর ভাঙা শিব-মন্দিরগুলি। দশ বছর আগে আমি যখন গিয়েছিলুম তখন আর গ্রামে আগেকার সমৃদ্ধি ছিল না। ছিল না, তবু যেন পুরোনো দিনের সেই ঘনেছিয়ানা আর ঐতিহ্যের কিছু অবশেষ দেখতে পেয়েছিলুম।

সেখানকার মানুষগুলির চেহারায়, তাদের কথাবার্তায়, চালচলনে। গ্রামের এই বনেদিয়ানার আবহাওয়াটাই সেদিন আমায় যেন কেমন আকৃষ্ট করেছিল। তাছাড়া গ্রামীণ পরিবেশেও কিছুটা মুগ্ধ হয়েছিলুম। তার আগে কখনো গ্রামে থাকি নি। তাই সেখানকার মাঠঘাট, আম-কাঁঠালের বাগানে ছায়া-ঘুনিবিড় পথ, নিস্তব্ধ দুপুরে করুণসুরে ঘুঘুর ডাক—এসব আমার মনে মুগ্ধতার আবেশ ছড়িয়েছিল। অবিশ্যি সবচেয়ে বেশী তখন খুশী হয়েছিলুম নন্দিতাদের পরিবারের সাহচর্যে। গ্রামীণ পরিবেশে ওদের সেই চালচলন, আচার ব্যবহার সাহচর্য আমার কাছে খুবই অপ্রত্যাশিত মনে হয়েছিল।

মনে আছে, প্রথম দিনই আমি খুব অভিভূত হয়েছিলুম। সেই যেদিন বিকেলে স্কুলের দপ্তরী দীননাথ বাড়িটা দেখিয়ে দিলে। বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে দীননাথ নিজের কাজে চলে গেল। বিরাট প্রাচীন বাড়িটার সামনে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আমি ইতস্তত: করলুম খানিকক্ষণ। তারপর একসময় এসে দরজায় কড়া নাড়লুম। প্রথমে আস্তে, পরে একটু জোরে। বেশ কিছুক্ষণ কড়া নাড়ার পর মনে হলো, ভেতর থেকে কে যেন দরজাটার দিকে এগুতে এগুতে কেমন এক বিলম্বিত সুরে বলে উঠলো: কে?

গলাটি বড়ো সুরেলা, বিলম্বিত সুরে জিজ্ঞেস করার ভঙ্গিটিও বড়ো অদ্ভুত লাগলো। মনে কেমন একটা রোমাঞ্চ অনুভব করলুম। বুকের সেই দুরদুরানি আরও বেড়ে গেল যখন দেখলুম, দরজার একটি পাল্লা খুলে গিয়ে তার সামনে একটি সুন্দরী তরুণী এসে দাঁড়িয়েছে। অপূর্ব তার দাঁড়াবার ভঙ্গী, অদ্ভুত তার চাহনি। চুলগুলি অর্ধেক বুকে, বাকিটা পিঠে ছড়ানো। ঘাড়ের কাছে চুলে একটা লম্বা চিরুনি আঁটকানো। যেন মেয়েদের চুলে পালক গুঁজে রাখার মতো ভঙ্গিটা। বোধ হয় চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতেই দরজা খুলতে চলে এসেছে।

মেয়েটি তার মদির চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল। সেই ছবি হয়ে থাকা মেয়ের সামনে আমি কেমন যেন অভিভূতের মতো দাঁড়িয়েছিলুম।

—কি চাই আপনার?

ওর কথায় আমি চমকে উঠলুম। তারপর আস্তে আস্তে যেন একটু সংকোচের সঙ্গেই বললুম: এখানে একটি ঘর খালি আছে শুনে এসেছি।

—আপনি দাঁড়ান, আমি মাকে ডেকে দিচ্ছি।—কথাটা বলে সে আমার আপাদমস্তকে আরেকবার দৃষ্টি বুলিয়ে ভেতর দিকে চলে গেল।

খোলা দরজা দিয়ে আমি বাড়ীর ভেতরটায় চোখ বুলোলুম। দেখলুম, সামনের ঘরগুলির পেছনে এক বিরাট উঠোন। উঠোনের পর আর একটি মহল। মেয়েটি সেই ভেতর মহলের একটি দরজা দিয়ে আরও ভেতরে চলে গেল।

কয়েকটি সোনা-পায়রা ছাদের কার্নিশে বকবকম সুরে ডেকে চলেছিল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে সেই ডাক শুনতে শুনতে আমার মনে হলো, আমি যেন সামন্তযুগের কোনো ধ্বংসাবশেষের সমুখে দাঁড়িয়ে আছি।

খানিক পরে ধান কাপড় পরা এক ভদ্রমহিলা বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর পরণের কাপড়টি যদিও আটপরনা, চুলগুলি রুক্ষ, কিন্তু দেখলুম, তাঁর চেহারায় বেশ একটা আভিজাত্য, মুখেচোখে মমতা, পান-খাওয়া ঠোঁট দুটিতে মধুর হাসি। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—তুমি বাড়ি ভাড়া নিতে এসেছ বাবা?

তাঁর মধুর সম্ভাষণটুকু বড়ো ভালো লাগলো।

এরপর আমার কেমন আর ক'খানা ঘরের প্রয়োজন, আমার সঙ্গে কোনো আত্মীয়-স্বজন থাকবে কি না—ইত্যাদি জেনে নিয়ে ভদ্রমহিলা আমাকে একটি ঘর দেখালেন। বাড়ির বাইরের মহলের একটি ঘর। এককালে হয়তো সেরেস্তা বা আমলাদের থাকবার জায়গা ছিল।

যাই হোক, ঘরটি আমার পছন্দ হলো, এবং সেইদিনই কথাবার্তা পাকা ক'রে পরের দিন সেখানে চলে এলুম।

পরের দিন সকালে যখন বাক্স বিছানা নিয়ে এসে হাজির হলুম, তখন একটি ছেলে এসে ঘরের দরজাটি খুলে দিলে। ঘরের ভেতর ঢুকে দেখলুম, আগের দিন ধুলোবালি কুটোকাটায় ঘরের যে চেহারা ছিল, সেদিন আর সে চেহারা নেই। ঘরটা ধুয়ে-মুছে ঝকঝকে তকতকে করে রাখা হয়েছে। দেওয়ালের গায়ে কোথাও আর এতটুকু ঝুলের চিহ্ন নেই। এমন-কি দেওয়ালের গায়ে শেল্‌ফটি পর্যন্ত ঝেড়ে মুছে ব্যবহারযোগ্য করে রাখা। আমি খুশিভরা দৃষ্টিতে ঘরটির পরিচ্ছন্ন চেহারা দেখছিলুম। তাই দেখে ছেলেটি বললে,—আজ ভোরে দিদিকে দিয়ে মা ঘরটা ঘোয়ামোছা করিয়েছে।

তাই নাকি!—কথাটা শুনে যেমন ভালো লাগলো, তেমনি আবার একটা সংকোচও বোধ করলুম।

ঘরের মেঝেয় বাক্স বিছানা রেখে বিছানার গাঁটরিটার ওপর বসে আয়েস ক'রে একটা সিগারেট ধরালুম। ছেলেটিকে জিগ্যেস করলুম: তোমার নাম কি ভাই?

—অপ্রতিম সান্যাল।—মৃদু গলায় ছেলেটি জবাব দিলে।

—বাঃ, বেশ তো অভিনব ধরনের নামটি। কোন্ ক্লাসে পড়ো?

—নাইন-এ পড়তুম, এখন আর পড়ি নে।—ছেলেটি কেমন যেন সংকোচের সঙ্গে কথাগুলি বললে।

সে কি—পড়ো না কেন!—আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলুম।

মাথা নীচু ক'রে নখ খুঁটতে খুঁটতে ও জবাব দিলে, স্কুলে আমাদের দু'ভাইয়ের অনেক মাসের মাইনে বাকী পড়ে গিয়েছিল। মা আর দিতে পারেন নি। তাই নাম কেটে গেছে।

কথাটা বলতে বলতে ছেলেটির শ্যামমুখে যেন একটা বিষণ্ণতার ছায়া ঘনালো। দেখে ভারী খারাপ লাগলো। সহানুভূতির সুরে আমি ওকে বললুম, বসো—তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন!—বলে ওকে আমার বাক্সটা দেখিয়ে দিলুম।

ছেলেটি সংকুচিতভাবে আমার বাক্সের ওপর বসলো।

কথায় কথায় সেদিন ওর কাছে আরও অনেক কথা জানতে পারলুম। জানলুম, এটা ওদের মামার বাড়ি। বাবা শিলং-এ ভালো চাকরী করতেন। সেখানেই এক সম্ভ্রান্ত পরিবেশে ওরা আজন্ম কাটিয়েছে। বাবার অকালমৃত্যুতে ওদের পরিবারের এই বিপর্যয়। এতো বড়ো সংসারের বকি সামলাতে পিতৃপুরুষের বংশে কেউ এগিয়ে এলেন না। অগত্যা মাকে ছেলেমেয়েদের হাত ধরে নৈতিক ভিটেয় এসে উঠতে হলো। নৈতিক ভিটের অধিস্থি কেউ থাকতেন না। শূন্যই পড়ে থাকতো। মামারা প্রত্যেকেই ভালো চাকুরে। চাকরির খাতিরে দূর দূর দেশে পড়ে থাকেন। দেশের বাড়ীর সঙ্গে ঠিকমতো যোগাযোগ রাখতে পারেন না। তাই মা এখানে চলে আসায় ওঁদের কিছুটা স্বার্থরক্ষা

গেল। তাঁরা বোধহয় ভাবলেন, যাক্, আর কিছু না হোক, পৈতৃক বাড়ি, বাগান, পুকুর ইত্যাদি দেখাশোনার জন্যে এতদিনে একজন বিশ্বস্ত লোক পাওয়া গেল। আর ভাবলেন, অন্য কারুর জিম্মায় এইসব ফেলে গেলে তাকে দশ-কুড়ি টাকা মাসোহারা দিতে হতো, সেই টাকাটা না-হয় নিজের বোনকেই দেওয়া যাবে। কিন্তু টাকাটা এতোই সামান্য যে তাতে হয় তো বিরাট সংসারটার ক্ষুদ্র কোনো একটা চাহিদাই মেটে। অগত্যা তাদের তাই অনেক কষ্টেসৃষ্টে, অনেকরকম কল্পি-ফিকির ক'রে সংসার চালাতে হয়। ভাড়াটে পেলে বাইরের দরদের ঘরগুলো ভাড়া দেয়, ক'ড়ে ডেকে বাগানের ফলফুলুরি বেচে। কিন্তু তাতে আর কী এমন হয়। গ্রামদেশে সবসময় ভাড়াটে জোটে না, আর বাগানেও এমন কিছু ফলে না; কিছু আম-কাঁঠাল, কিছু সুপুরি-নারকেল।

অপ্রতিমের মুখে ওদের সংসারের আরও নানান কথা হয়তো শুনতে পেতুম, কিন্তু ওর মা হঠাৎ এসে পড়ায় তা বন্ধ হয়ে গেল। ভদ্রমহিলাকে দেখে হাতের সিগারেটটি ফেলে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালুম। আগের দিন তাঁকে একরূপে দেখেছিলুম, সেদিন আরেক রূপ দেখলুম। দেখলুম, তাঁর পরণে একখানি তসরের থান। সকালে চান করেছেন। ভিজে চুলগুলি ঘাড়ের ওপর দিয়ে টেনে এনে বুকের ওপর ছড়িয়ে রেখেছেন। কপালে একটি চন্দনের টিপ। সারা মুখখানিতে যেন স্নিগ্ধতা আর পবিত্রতার মাধুর্য।

কতোক্ষণ তুমি এসেছ বাবা?—ঘরে ঢুকে আমার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন।

—এই তো কিছুক্ষণ আগে।

—আমি একটু পূজোয় বসেছিলুম, টের পাই নি। তা অপুই বুঝি দরজা খুলে দিলে?

হ্যাঁ।—আমি কৃতজ্ঞভাবে হেসে জবাব দিলুম।

ভদ্রমহিলা আমার বাক্স আর আর বিছানার গাঁটরীটার দিকে তাকিয়ে বললেন,—তা হ্যাঁ বাবা, এই বুঝি তোমার জিনিসপত্র—না আর কিছু আছে?

—না, আর কিছু নেই।

—তা একটা চৌকি-টৌকি না থাকলে তুমি শোবে কিসে? পুরনো বাড়ি তো, মেঝেটা তাই স্যাঁতসেঁতে, এই মেঝের ওপর বিছানা পেতে তো শুতে পারবে না বাবা।—ভদ্রমহিলা যেন একটু উদ্বিগ্নচিত্তে কথাগুলি বললেন।

আমি বললুম,—তাতে আমার কিছু হবে না মাসিমা। আপনি অতো ব্যস্ত হবেন না।

এতোক্ষণে ভদ্রমহিলাকে একটা জুতসই সম্বোধনে ডাকতে পেরে আমি যেন বড়ো স্বস্তি অনুভব করলুম। মনে একটা আনন্দের মাধুর্য ছড়িয়ে পড়লো।

মধুর হাসিতে ভরা চোখদুটি আমার দিকে নিবদ্ধ রেখে ভদ্রমহিলা বললেন,—তা কি হয় বাবা, আমার চোখের সামনে যখন রয়েছ তখন আমার তো একটু মাথা-ব্যথা হবেই, এবং আমাকেই তোমার সুবিধে-অসুবিধেগুলো দেখতে হবে।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ভদ্রমহিলা অপ্রতিমকে বললেন,—অপু, তুই আর পার্থ মিলে ওঁদের ঘরের দালানে যে ছোট চৌকিটা আছে, সেটা এই ঘরে এনে পেতে দিবি।

—আচ্ছা।—ব'লে অপু উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, মায়ের ডাকে ফিরে তাকালো।

ভদ্রমহিলা বললেন,—নন্দা বলছিল বাজার থেকে কি যেন আনতে হবে। যা আনতে হবে ওকে জিগ্যেস করে তুই একবার বাজারে যা। আর শোন্, নন্দাকে বলবি আমার চা-টা এবং আরো এক কাপ চা যেন এইখানে পাঠিয়ে দেয়।

—আচ্ছা।—ব'লে অপু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি কুণ্ঠিত গলায় বললুম, আমার চায়ের কোনো দরকার ছিল না। আপনি অযথা আমার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছেন।

না বাবা, সে কি!—ভদ্রমহিলা হাসতে হাসতে বললেন, ব্যস্ত আর হচ্ছি কোথায়। ছেলেদের জন্যে মায়েদের মন অমন একটু ব্যাকুল হয়ই। মা বাপ ছেড়ে বিদেশে বিভূঁয়ে পড়ে আছ, তাই এটুকু যদি আমরা না করি তো কে করবে।

আমি কৃতজ্ঞতার হাসি হাসলুম।

হঠাৎ বাপ-মায়ের কথা ওঠায় ভদ্রমহিলা আমার খবর জানার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আমি আমাদের পরিবারের সকলের কথা একে একে তাঁকে বললুম। আর সে কথা বলতে গিয়ে পরম্পরায় আরও অনেক কথা এসে গেল। এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ-পরিচয়ে সেদিন তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যেন অনেক সহজ হয়ে এলো।

আমাদের কথাবার্তার মাঝে একসময় হঠাৎ বাইরে থেকে সেই সুরেলাকণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠলো: —মা চা-টা নিয়ে যাও।

আগের দিন শোনা সেই কণ্ঠের মাধুর্য তখনো যেন আমার কানে লেগে ছিল। তাই অন্তরাল-বর্তিনীর কণ্ঠস্বরে আমার বুকের ভেতরটা হুলাৎ করে উঠলো।

ভদ্রমহিলা তার উদ্দেশে বললেন,—লজ্জা কি মা, ভেতরে নিয়ে এসো।

বোধ হয় বাইরে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ ইতস্তত: করলো মেয়েটি। তারপর চায়ের ট্রে হাতে ক'রে মাথা নীচু করে ঘরে ঢুকলো। আমি চোখ তুলে ওর দিকে একবার তাকালুম। দেখলুম, ওরও চেহারাটা শান্ত, স্নিগ্ধ। ভিজে চুলগুলি পিঠের ওপর ছড়ানো। ট্রে হাতে করেই সে আমার দিকে একবার তাকালো সলজ্জভঙ্গিতে। তারপর সংকুচিত পায়ে এগিয়ে এলো। আমি সশব্যস্তে সোজা হয়ে বসে ট্রে থেকে চায়ের কাপটা তুলে নিলুম। সে এবার মায়ের দিকে এগিয়ে গেল।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ভদ্রমহিলা আমাকে উদ্দেশ করে বললেন,—এই আমার মেয়ে নন্দিতা।

মেয়েটি দু'হাত তুলে সলজ্জভঙ্গীতে আমায় নমস্কার করলে। পাল্টা নমস্কার করে নেহাৎ যেন সৌজন্যের খাতিরেই আমি তাকে জিগ্যেস করলুম, কী করেন আপনি?

প্রশ্নটি করে কিন্তু নিজেই বড়ো অপ্রস্তুতে পড়লুম। ভাবলুম, ওদের পারিবারিক অবস্থার কথা জানতে তো আমার কিছুই বাকী নেই, তবু এমন একটা অসঙ্গীতীন প্রশ্ন করে অযথা ওকে কেন বিব্রত করা।

নন্দিতা মৃদু হেসে সলজ্জভঙ্গীতে জবাব দিলে: কিছুই না।

কি আর করবে বাবা।—ভদ্রমহিলা বিমর্ষ গলায় বললেন, এ সংসারে কি কিছু করতে পারার উপায় আছে। নইলে ঠিক মতো ওর পড়া-লেখাটা চালিয়ে যেতে পারলে ওকে এ'দিনে গ্র্যাজুয়েট করতে

পারতুম। পড়া-লেখায় তো কিছু খারাপ ছিল না। তা থাকো না কেন, টেনেবুনে স্কুল-ফাইন্যালটাও পাশ করাতে পারলুম না। তার আগেই ওকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে দিতে হলো। ভেবেছিলুম, প্রাইভেট পরীক্ষাটা দেওয়াবো, কিন্তু দেখলুম তারও অনেক অসুবিধে আছে। বাড়িতে কোচিং-এর জন্যে একজন টিউটর রাখা দরকার, সে সামর্থ আমার নেই।

কথাগুলি শুনে মেয়েটির প্রতি একটা সহানুভূতিতে মনটা ভরে উঠলো। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে তাকে উদ্দেশ করে আমি একসময় বললুম, কিছু যদি মনে না করেন, এবং পড়ার ব্যাপারে আপনার যদি এখনো ইন্টারেস্ট থেকে থাকে, তবে আপনাকে কোচিং-এর ব্যাপারে আমি একটু আধটু সাহায্য করতে পারি।

নন্দিতা কিছু বলার আগে তার মা-ই হঠাৎ ব্যস্ত গলায় বলে উঠলেন,—না না, মনে করার কি আছে, তুমি যদি এটুকু উপকার করো তা হলে তো ওর খুব ভালোই হয়।

কিন্তু নন্দিতা কোনো কথা বললে না। মাতৃমুখে দাঁড়িয়ে দরজার কপাটে নখের আঁচড় কাটতে লাগলো। আমার বড়ো ভালো লাগলো তার গ্রীবা হেলিয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গীটি। তার দিকে আপাঙ্গে চেয়ে বললুম,—কিন্তু যিনি পড়বেন তাঁর ইন্টারেস্ট থাকাটাই সবাগ্রে প্রয়োজন।

তবু কোনো কথা বললে না সে। তেমনি ভঙ্গীতে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলুম না।

ওর মা বললেন,—তোমাকে সে-সব কিছুই ভাবতে হবে না বাবা, ওর যথেষ্ট উৎসাহ আছে।

সেদিন আমার ঘরে বসে আরও খানিকক্ষণ গল্পগুজব করে ভদ্রমহিলা এক সময় উঠলেন। তিনি বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি একটি সিগারেট ধরিয়ে দক্ষিণের খোলা জানালার সামনে এসে দাঁড়ালুম। জানালার পরেই খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তার পর সারিবদ্ধ কয়েকটি দীর্ঘ দেবদারু গাছ। তার পরেই আম-কাঁঠালের ছায়া-সুনিবিড় বাগান। সারিবদ্ধ দেবদারু গাছগুলি যেন বাগানের সীমানা টেনে রেখেছে। দোদুরে বাগানের ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশটা যেন কেমন এক মায়া বিস্তার করে রেখেছে। একটি আতাগাছের নিচু ডালে এক জোড়া বুলবুলি নাচানাচি করছে।

কেমন এক খুশী খুশী মন নিয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে আমি এইসব দৃশ্য দেখতে লাগলুম।

সকালের এই খুশীর বিভোরতা যেন সারাটি দিন আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখলো। গ্রামে এসে অমন একটি ভদ্র মার্জিত পরিবারের সঙ্গে আলাপ হতে পারায় খুশীতেই শুধু সে বিভোরতা নয়, নন্দিতাকে পড়াবার সুযোগ পাওয়ার জন্যেও কিছুটা।

দুপুরে স্কুলে কাজের ফাঁকে ফাঁকে সকালের কথাগুলি কেবলই মনে পড়তে লাগলো। বিকেলেও তেমনি বিহ্বল মন নিয়ে বাসায় ফিরলুম। বাসায় ফিরে মনটা আরও খুশিতে ভরে উঠলো। দেখলুম, ঘরে ওরা একটা চৌকি পেতে রেখেছে।

সকালে আমার কোনো কাজই হয় নি। তাই গায়ের জামাটি ছেড়ে ঘর গুছোনোর কাজে লেগে পড়লুম। প্রথমে চৌকির ওপর পরিপাটি করে বিছানা পাতলুম। তারপর বাক্সটা খুলে গামছা তেলের শিশি, সাবানদানি, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, আয়না ইত্যাদি জিনিসগুলি বের করে একে একে দেওয়ালের গায়ে পেরেকটিতে ঝুলে রাখলুম। দেওয়ালের গায়ে ইতস্তত: দুই পেরেক পোঁতা ছিল,

বিছানা বাঁধা ঘড়িটা দুই দেয়ালে বেঁধে জামা-কাপড় রাখার জন্যে একটা অস্থায়ী আলনাও করে নিলুম। কাজকর্মের শেষে একটি বই নিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলুম। কিন্তু কিছুতেই বইয়ে মন দিতে পারলুম না। সর্বক্ষণ যেন এক মধুর প্রত্যাশায় অস্থির হয়ে রইলুম।

তারপর বইয়ে চোখ বুলোতে বুলোতে কখন যেন একটু ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলুম। মৃদু সলজ্জ কণ্ঠের ডাকে সে ঘোর কেটে গেল। আধো-ঘুম আধো-জাগা চেতনায় প্রথমে মনে হয়েছিল, যেন স্বপ্নে আমায় কেউ ডাকছে। সমস্ত পরিবেশ আমার সমস্ত চেতনায় সুরের অনুরণন তুলেছিল। বুঝতে পারার পরও খানিকক্ষণ যেন সেই স্বপ্নঘোরের আবেশে পড়ে থাকলুম। তারপর এক সময় আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকালুম। দেখলুম, সামনে সত্যিই যেন এক স্বপ্নের নায়িকা। একাগ্র দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। পরনে তার একটি বিচিত্রবর্ণের ছাপা শাড়ি। চুলগুলি বেণীবদ্ধ। বেণীতে দুটি আধফোটা যুঁই। সেবেলার রক্তিম আলোর আভায় প্রলম্বিত মুখখানিতে অপরূপ লাবণ্য।

বিকেলে নির্জন ঘরে তাকে এইভাবে দেখে আমার মনে হলো সত্যিই যেন সে স্বপ্নের পাখার ভর দিয়ে নির্জনে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি চোখ মেলে তাকাতেই তার চোখে মুখে লজ্জার রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়লো। মাথা নিচু করে সে আস্তে আস্তে বললে, আপনার যদি চান করা বা গা ধোয়ার দরকার হয় তা হলে আমার সঙ্গে এসে কুয়োতলাটা দেখে যান। মা আমাকে সেই জন্যেই পাঠিয়ে দিলেন।

মনে হলো, তার শেষের কথাটি যেন লজ্জা ঢাকার কৈফিয়তেই বলা।

যেন কোন কথা খুঁজে না পেয়ে আমি জিগ্যেস করলুম,—কুয়োটা কোথায়?

ভেতর বাড়ির উঠোনে।—নন্দিতা আস্তে আস্তে বললে।

চান করার আর কোনো জায়গা নেই?

আছে, পুকুর আছে।

কোথায় পুকুরটা?

এই তো বাগানটার মধ্যে।

দক্ষিণের খোলা জানলাটা দিয়ে বাগানটা দেখিয়ে দিলো সে। তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জিগ্যেস করলো: যাবেন আপনি পুকুরে?

না, এখন নয়, কাল সকালে বরঞ্চ দেখিয়ে দেবেন।

খানিকক্ষণ নীরবতায় কাটলো। তারপর ওর দিকে তাকিয়ে আমি ব্যস্ত গলায় বলে উঠলুম, এভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন—বসুন!

ঘরে বসার কোনো জায়গা ছিল না। নন্দিতা তাই খানিক ইতস্তত: করে আমার চৌকিটারই এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসলো।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলুম,—তারপর, কবে থেকে পড়া সুরু করছেন?

আপনার যেদিন থেকে সুবিধে হবে।—আমার মুখের দিকে সলজ্জ ভঙ্গিতে তাকিয়ে জবাব দিলো সে। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে আবার বললো,—কিন্তু কেন অযথা আমার জন্যে এভাবে আপনার এনার্জি নষ্ট করছেন!

লাভ-ক্ষতির হিসেবটা কি এতো আগে থাকতেই করা যায়?—ওর দিকে তাকিয়ে আমি একটু হাসলুম।

ও বোধহয় আমার কথার ইঙ্গিতটুকু বুঝে থাকবে। তাই ঠোঁট টিপে সলজ্জ ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে বাম হাতের চেটোটা ডলতে লাগলো। ওর সলজ্জ মধুর ভঙ্গিমার দিকে মুগ্ধ চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে এক সময় জিজ্ঞেস করলুম,—আপনার তো অন্যান্য সাবজেক্টগুলো কিছু পড়া আছে? অসুবিধে শুধু ইংরেজি আর বাংলার টেক্সট বইগুলো নিয়ে।

—নতুন সিলেবাসের বইগুলো জোগাড় করাও তো একটা সমস্যা। —নন্দিতা এবার চোখ তুলে কেমন যেন নিরুৎসাহিত গলায় কথাটি বললে।

এ সমস্যার কথা আমি ভেবে দেখি নি। তাই ওর কথায় একটু ভাবনায় পড়লুম। কিন্তু মনের ভাবনাগ্রস্ত ভাবটা এতটুকু প্রকাশ না করে ওকে বললুম,—সেজন্যে আপনাকে কোনো চিন্তা করতে হবে না। আপনি অন্য সাবজেক্টগুলো পড়তে সুরু করে দিন। তারপর আমি দেখছি কদ্দুর কি ব্যবস্থা করা যায়।

কোনো কথা বললে না সে। চুপ করে বসেই থাকলো। আমি বললুম,—তা হলে আর দেরি না করে আসছে কাল থেকেই পড়া শুরু করে দিন।

কখন আসবো?—চোখ তুলে প্রশ্ন করলো সে।

—সকালের দিকে আসুন। সকালেই বোধ হয় আপনার সুবিধা হবে।

—আচ্ছা তাই আসবো।—বলে ও উঠে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কথাটা বলার সময় যতো সহজ মনে হয়েছিল, কার্যক্ষেত্রে নেমে দেখা গেল, কাজটা ঠিক ততোখানি সহজ নয়। নতুন কোর্সের বই জোগাড় করা একটা রীতিমতো মুশকিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। নন্দিতা একদিন পড়তে বসে হাসতে হাসতে বললে,—আপনি তো তখন কৌকের মাথায় কথাটা বলে বসলেন, এখন দেখুন তো কতো ঝামেলা। এই সমস্ত সমস্যার কথা ভেবেই আমি সেদিন তাই চট করে মত দিতে চাইনি।

অসম্মতিও তো জানাও নি।—ট্রানস্লেশান টাস্কের খাতা থেকে চোখ তুলে আমি ওর মুখের দিকে তাকালুম।

নন্দিতা বললে,—জানাই নি সে শুধু আপনার উৎসাহের বহর দেখে। আমার সম্পর্কে আপনার ধারণাটা নেহাত খেলো হয়ে যাবে বলেই সেদিন আপনাকে নিরুৎসাহিত করি নি। অবিশ্যি এখনই যে একটা খুব উঁচু ধারণা পোষণ করছেন—এমনও আমি আশা করি নে।

শেষ কথাটিতে ওর চোখে যেন কৌতুকের ছটা দেখা গেল।

তোমার সম্পর্কে আমার কি ধারণা—তা জানার জন্যে দেখছি খুব বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছ। —কথাটা বলে আমি ওর কমনীয় মুখখানির দিকে তাকিয়ে রইলুম খানিকক্ষণ। তারপর আবার খাতায় দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলুম। খাতা দেখা শেষ হলে ওকে জিজ্ঞেস করলুম,—আর কি আছে?

যা আছে থাক্।—নন্দিতা হাসতে হাসতে বললে, আজ এমন বৃষ্টির দিনে কিছুতে মন বসছে না। তবে এক কাজ করো,—'মানসী'টা পেড়ে দিচ্ছি, তার থেকে কয়েকটা কবিতা পড়ে শোনাও।

শিলংয়ে থাকতে নন্দিতা যে ভালো আবৃত্তি করতে পারতো এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা রাখতো, একথা তার মায়ের কাছ থেকেই একদিন কথাচ্ছলে শুনেছিলুম। শিলং শহরে এসেছে তার যথেষ্ট

খ্যাতি ছিল। স্কুল এবং বাইরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বহুবার বহু প্রাইজ পেয়েছে। প্রাইজের সেই জিনিসগুলি এখনও সে সযত্নে রেখে দিয়েছে। জিনিসগুলি সে নিয়মিত ঝাড়াঝোছা করে। নিয়ে নাড়াচাড়া করে অবসর সময়ে। একদিন এমনি ঝাড়াঝোছা করতে করতে সে আক্ষেপ করে আমায় বলেছিল,—জানেন অনুপমদা, জিনিসগুলি নিয়ে যখন নাড়াচাড়া করি তখন বিগতদিনের কতো কথা মনে পড়ে। মনে হয় সে যেন অন্য কেউ। আমার আজকের অবস্থার সঙ্গে সেদিনের শিলং শহরের সেই উচ্ছল মেয়েটির কোথাও এতোটুকু মিল খুঁজে পাই নে।

কথাগুলি বলতে বলতে নন্দিতার গলার স্বর যেন জড়িয়ে এসেছিল। আমি মামুলি কথার সান্ত্বনায় সেদিন তাকে ভোলাতে চেয়েছিলুম। কিন্তু তবু সে শান্ত হয় নি। উন্মনা হয়ে বিগতদিনের সেই উচ্ছল জীবনের কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় ওর চোখ দুটি ছলছল করে উঠেছিল। ওর সে চোখের দিকে তাকিয়ে আমি সেদিন বিচলিত হয়ে পড়েছিলুম যেমন, তেমনি বেদনাও অনুভব করেছিলুম। আর সেদিন থেকে মনে একটা বাসনাও ছিল, ওর গলায় একদিন আবৃত্তি শুনতে হবে, একদিন গান।

গানের কথাটা এতো তাড়াতাড়িতে বলতে সংকোচ হলো, তাই আবৃত্তির জন্যে 'মানসী' টা শেল্‌ফ থেকে পেড়ে দিলুম। নন্দিতা বইটির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে প্রথমে 'সংশয়ের আবেগ' কবিতাটি পড়া সুরু করলে। পড়তে গিয়ে প্রথম দু'চার লাইনে তার গলাটা একটু জড়িয়ে গেল। তার পর ধীরে ধীরে সে জড়তা কেটে গেল। বেশ আবেগদীপ্ত হয়ে উঠলো। এতো সুন্দর ভঙ্গীতে যে ও পড়তে পারে তা ধারণা করতে পারি নি। ওর আবেগদীপ্ত কণ্ঠস্বরটি শুধু আমার কানে নয়, মনের পর্দাতেও যেন বিচিত্র সুরে বেজে উঠলো।

প্রথমটি শেষ হওয়ার পর সে 'নারীর উক্তি,' 'শুভ্রপ্রেম,' 'নিষ্ফল কামনা' ইত্যাদি কবিতাগুলি একে একে পড়ে গেল। আমি মুগ্ধচিত্তে শুনলুম।

এরপর একদিন গান-শোনারও সুযোগ এসে গেল। ইতিপূর্বে ভেতরবাড়িতে ওদের গৃহস্থালীর সঙ্গে আমার পরিচয়টা একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। নন্দিতার মা আমাকে প্রায়ই চা খাওয়াবার জন্যেই বা এমনি গল্প করার জন্যে ডেকে পাঠাতেন। প্রথম থেকেই কেন জানি না ভদ্রমহিলার প্রকৃতিটা আমায় আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর চেহারা, কথাবার্তা, মনোভাব—সব কিছুতেই এমন একটা স্নিগ্ধ মাধুর্য—যা যে-কোনো মানুষকেই অভিভূত করে। তাই তিনি ভেতর থেকে ডেকে পাঠালে আমি সাড়া না দিয়ে থাকতে পারতুম না।

সেদিন সন্ধ্যেয় এমনি চায়ের বেয়ারাকে দিয়ে সবার সঙ্গে গল্প করতে করতে কী এক কথায় নন্দিতাকে একসময় বললুম,—মাসীমার কাছে তোমার গলার প্রশংসাটাই শুনেছি, গান আর শোনা হলো না।

নন্দিতা লজ্জায় মাথা হেঁট করলে। মাসীমা ওকে বললেন, লজ্জা কি মা, অনুপম যখন শুনতে চাইছে তখন শুনিয়ে দাও-না কয়েকখানা গান।

অণু পাশে বসেছিল, সেও নন্দিতার হাত ধরে বললে,—গা না দিদিভাই, কতোদিন তুই গান গাসনি! এনে দেব হার্মোনিয়ামটা?

বলে অণু তার সম্মতির অপেক্ষা করলে না। হার্মোনিয়ামটা আনতে ছুটে গেল।

নন্দিতা মায়ের দিকে তাকিয়ে সসংকোচে বললে,—কতোদিন চর্চা নেই, গাইতে কী আর পারবো?

মাসীমা বললেন,—যেমন গাইতি তেমনি গা।

ততক্ষণে অপু হার্মোনিয়ামটা এনে নন্দিতার সামনে রেখে দিয়েছে। অগত্যা সে সংকুচিত ভাবে হার্মোনিয়ামটা খুলে একটা গানের সুর ভাঁজতে লাগলো খানিকক্ষণ। তারপর গাইতে সুরু করলে:

তুমি যে সুরের আগুন লাগায়ে দিলে
মোর প্রাণে।
এ আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে।

গানটি রেকর্ডে বহুবার শোনা। শুনতে শুনতে তাই মনে হলো, গানটির জায়গায় জায়গায় সুরের তাল একটু কেটে যাচ্ছে। সেটা বোধ হয় দীর্ঘদিনের রেওয়াজ না থাকার দরুনই হয়েছে। নইলে গলাটি ওর সত্যিই অপূর্ব!

একটি গান গেয়েই ও থেমে পড়তে চাইছিল। আমি সাগ্রহে বললুম,—থামলে চলবে না, আরও কয়েকখানা শোনাও। আমার অনুরোধে মৃদু হেসে হার্মোনিয়ামটা আবার কোলের কাছে টেনে নিলো সে। এবার ধরলো:

কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না
শুকনো ধুলো যতো?
কে জানিত আসবে তুমি গো
অনাহূতের মতো।

সবশেষে সে গাইলে:

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন ভোরের আকাশ ভ'রে দিলে
এমন গানে গানে।

নন্দিতা যতগুলি গাইলে তার মধ্যে শেষ গানটিই যেন আমার কাছে ষড়ো ভালো লাগলো। নিঃশব্দ রাত্রির পরিবেশে বিলম্বিত সুরে গাওয়া গানের ওই আবেদনময় ভাষা আমার হৃদয়কে যেন মুক্ততার বেদনায় শতখান ক'রে দিল।

গান শেষ করে হার্মোনিয়ামটা বন্ধ করে নন্দিতা প্রত্যাশাভরে আমার দিকে তাকালে। আমি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলুম,—সত্যি অপূর্ব তোমার গলা। এমন গলা অথচ চর্চা রাখো না কেন! আমার তো বিশ্বাস ঠিক মতো চর্চা করে গেলে তুমি গানের জগতে নিশ্চয় নাইন করতে পারবে। আমি তোমায় অনুরোধ করছি নন্দিতা, এ চর্চা তুমি ছেড়ো না।

নন্দিতা কোনো কথা বললে না। শ্রীবা হেলিয়ে লজ্জাজড়ীতে হাসতে হাসতে ডান হাতের তর্জনীতে শাড়ীর আঁচলটা অকারণে জড়াতে লাগলো।

মাসীমা আক্ষেপের সুরে বলতে লাগলেন,—আর বাবা গানের চর্চা। দু'বেলা পেটের ভাত জুটাতেই যে সংসারে হিমসিম খেতে হয়—সেখানে গানের চর্চা রাখার মতো মন মেজাজ কী ক'রে আর থাকে বলো।

মাসীমা আরও যেন কি বলতে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই পাশের ঘর থেকে তাঁর ছোট ছেলে পার্থ হঠাৎ চেঁচিয়ে ডেকে উঠলো। উনি তাড়াতাড়ি আমাদের কাছ থেকে উঠে গেলেন।

আমি এবার পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে নন্দিতার দিকে তাকালুম। নন্দিতা তখনো তেমনি গ্রীবা হেলিয়ে বসেছিল। ওর সেই অপূর্ব ভঙ্গীমার দিকে মুগ্ধচোখে তাকিয়ে থেকে কেমন যেন আবেগ জড়ানো গলায় আমি বলতে লাগলুম,—সত্যি নন্দিতা, তোমায় খুব সিরিয়াস্‌লিই বলছি, তুমি গানের চর্চাটা ক'রে যাও।

নন্দিতা কোনো জবাব দিলে না। আমি আরও যেন কি বলতে যাচ্ছিলুম, ঠিক তখনই পাশের ঘরে পার্থ আবার কান্না-জড়ানো গলায় খুব চ্যাচামেচি করে উঠলো।

খানিকক্ষণ কান পেতে সেই চীৎকার শুনে আমি নন্দিতাকে জিগ্যেস করলুম,—কী ব্যাপার! পার্থর জ্বরটা কি আবার বেড়েছে?

নন্দিতা আস্তে আস্তে বললে,—না, ও খাওয়ার জন্যে চ্যাচামেচি করছে।

ওর চীৎকার থামে না দেখে আমি একসময় উঠে পাশের ঘরে এলুম। এসে দেখলুম, মাসীমা তার সামনে একটা বাটিতে সাবু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, আর পার্থ বিছানার ওপর বসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে প্রবল আপত্তির সুরে বলছে,—না আমি সাবু খাবো না, আমার সামনে থেকে তুমি ও-সব নিয়ে যাও। নইলে টান মেরে আমি ফেলে দেব।

মাসীমা আমার দিকে অসহায়ের মতো তাকালেন। আমি সহানুভূতির সুরে বললুম,—কি আর করবেন, অসুখ যা হোক কিছু ওকে দিন। সত্যিই তো—এক নাগাড়ে তিন চার দিন কাঁহাতক আর শুধু সাবুবার্লি খেয়ে থাকা যায়।

মাসীমা বললেন,—অসুখ আর কি দেব বাবা। কি করেই বা দেব। পরশু তোমার কাছ থেকে যে দশটা টাকা ধার নিয়েছিলুম, তা সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস আনতেই ফুরিয়ে গেছে। কী হালে যে আমার সংসার চলছে তা তোমায় কি করে বোঝাই।

কাঁদতে কাঁদতে পার্থ হঠাৎ অনুযোগের সুরে বলে উঠলো,—হ্যাঁ, তোমাদের নিজেদের খাওয়ার ব্যবস্থাটা ঠিক ক'রে রেখেছো, কেবল আমার বেলাতেই যতো অভাব।

খাওয়ার জন্যে ছোট ছেলেটিকে ওইভাবে কাঁদতে দেখে আমার বড়ো মায়া হলো। আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে এসে ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আমি সস্নেহে বললুম,—ছিঃ পার্থ, মাকে অমন ক'রে বলতে নেই। মা এখন যা এনেছেন খেয়ে নাও, পরে আমি তোমার জন্যে কিছু এনে দেব।

পার্থ আধভরাচোখে আমার মুখের দিকে তাকালে। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আমি সস্নেহে বললুম,—নাও খেয়ে নাও লক্ষ্মীটি।

এবার শান্ত ছেলেটির মতো হাত বাড়িয়ে মায়ের হাত থেকে বাটিটা নিলো সে। তারপর নাক মুখ কুঁচকে কোনোরকমে সাবুটুকু খেয়ে ফেললো। খাওয়ার পর বাটিটা ফেরৎ দিতে দিতে সে বললো,—যাও, এবারকার মতো খেয়ে নিলুম, এরপর মাথা কুটলেও খাবো না।

মাসীমা বাটিটা নিয়ে মুখ টিপে হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমি পার্থর শিয়রে এসে বসলুম। আমার হাতটি ধরে পার্থ তার রোগপাণ্ডুর দুইচোখে অনুনয় এনে আস্তে আস্তে বললো,—অনুপমদা, আমার অসুখ সেরে গেলে আমাকে পাঁচ আনা পয়সা দেবেন?

কেন রে?—ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আমি সস্নেহে জিজ্ঞেস করলুম।

পার্থ অনুযোগের সুরে বললে,—দেখুন না, শহরে সার্কাস এসেছে, দেখার জন্যে আমি কবে থেকে মায়ের কাছে পয়সা চাইছি, মা দিচ্ছে না।

তার চুলে বিলি দিতে দিতে আমি বললুম,—ঠিক আছে তুমি সেরে ওঠো, তারপর তোমাদের দু'ভাইকে সঙ্গে ক'রে আমিই নিয়ে যাবো।

ঠিক তো?—আমার চোখে চোখ রেখে পার্থ আশ্বস্ত হতে চাইলো।

ঠিক।—মৃদু হেসে আমি তাকে আশ্বাস দিলুম।

তারপর অনেকক্ষণ নীরবতায় কাটলো। পার্থ আমার হাত ধ'রে চুপ করে বিছানায় শুয়ে থাকলো। আমিও চুপচাপ বসে দেওয়ালের গায়ে টাঙানো একটি গ্রুপ্ ফটো দেখতে লাগলুম। পরিবারের সকলে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে ছবিটি তোলা। ছবিটি দেখলে বোঝা যায়, চাল-চলন, বেশবাস, ভাবভঙ্গী—সব কিছুতেই সুখী পরিবারটি কতো কেতাদুরস্ত ছিল। আজ পরিবারটির সেই আভিজাত্য—জীবনযাত্রার সেই মান কী পর্যায়ে এসে নেমেছে! শিলং শহরের সম্ভ্রান্তপল্লীর সেই মহিলাটিকে দু'মুঠো ভাতের জন্য আজ এর কাছে ওর কাছে হাত পাততে হয়। সামান্য একটা শখ মেটাবার জন্যে অনাত্মীয়ের কাছে ভিখিরির মতো পয়সা চাইতে ছেলেগুলির সম্ভবে এতোটুকু বাধে না। যে মেয়েটির ভেতর একদিন কতো সম্ভাবনা ছিল, সারাটি জীবন সে হয়তো খ্যাতি আর ঐশ্বর্যের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে থাকতো, সে আজ কতো অসহায়তা কতো ভীরুতা নিয়ে এক অন্ধকারে দিন কাটাচ্ছে।

ছবিটির দিকে তাকিয়ে কথাগুলি ভাবতে ভাবতে আমি একটা বেদনা অনুভব করলুম। আর ভাবলুম, এমন একটি ভদ্র মার্জিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের এই বিপন্ন অবস্থাকে আমি যদি আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্য দিয়ে কিছুটা ঠেকিয়ে রাখতে পারি, তবে তার চেয়ে মানসিক পরিতৃপ্তি আর কি আছে।

সেইদিন রাত্রেই আমি পার্থর জন্যে একটিন ভালো বিস্কুট কিনে আনলুম। আর মাসীমার হাতে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে বললুম,—মাসীমা এই টাকাটা আপনি রেখে দিন। মাসীমা একটু অবাক হওয়ার ভঙ্গীতে বললেন,—কেন বাবা, হঠাৎ টাকা দেওয়ার কি প্রয়োজন হলো!

আমি আস্তে আস্তে বললুম,—রেখে দিন, আপনার অসুখ-বিসুখের সংসারে এখন টাকার অনেক দরকার।

মাসীমা সসংকোচে বললেন,—কিন্তু বাবা এই সেদিন তোমার কাছ থেকে দশটা টাকা নিলুম, আজ আবার টাকা দিচ্ছ,—এতো টাকা আমি শোধ করবো কি করে বলো তো?

সে আপনি সুবিধেমতো দেবেন। তাই ব'লে আপনার এই অবস্থায় আমার হাত গুটিয়ে ব'সে থাকাটা কি মানুষের মতো কাজ হবে।

মাসীমা কোন কথা বললেন না। শুধু কৃতজ্ঞচোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

পার্থর অসুখ সেরে গেলে ওদের তিন ভাইবোনকে নিয়ে একদিন শহরে সার্কাস দেখতে যাওয়া ঠিক হলো। মাসীমাকে আগে থেকেই কথাটা বলে রেখেছিলুম। তিনি মত দিয়েছিলেন। কিন্তু যাওয়ার দিন নন্দিতাই যতো আপত্তি করতে লাগলো। আড়ালে পেয়ে তাকে জিগ্যেস করলুম,—কেন, তোমার যেতে এতো আপত্তি কেন?

সে আপত্তির সুরে বললে,—না, আমি আবার কি যাবো। ওরা ছেলেমানুষ যেতে চাইছে—যাক, কিন্তু তাই বলে কি আমার যাওয়াটা সাজে!

—ও, সার্কাসটা বুঝি শুধু ছেলেমানুষদেরই দেখবার জিনিস?

—না, তা কেন!

—তবে?

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে নন্দিতা একসময় সংকুচিত গলায় বললে,—ওদের দেখাচ্ছেন দেখান, তাই বলে আমাকেও দেখিয়ে মিছি-মিছি গুচ্ছের পয়সা নষ্ট করার কি কোন মানে হয়!

ও, বুঝেছি।—আমি ক্ষুব্ধ গলায় আস্তে আস্তে বললুম, আমি ঠিক বুঝতে পারি নি যে তোমার আপত্তিটা ওই কারণে আসবে। আমায় তুমি ক্ষমা করো নন্দিতা।

নন্দিতা ব্যস্ত গলায় বলে উঠলো,—না না, এ সব কি বলছেন! আপনি যেভাবে কথাটা নিচ্ছেন আমি কিন্তু সেভাবে মোটেই বলি নি। আপনার প্রতি অকৃতজ্ঞ হবো—এমন দুষ্টতা যেন আমার ভেতর কোনোদিন না আসে।

আমি ওর নরম হাতটি নিজের মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বললুম,—তবে আর আপত্তি করো না লক্ষ্মীটি। তুমি সঙ্গে গেলে আমি যে কতো খুশি হবো তা কি বুঝতে পারো না!

বিশ্বাস তো হয় না।—বুঝি ভালোভাবে যাচাই করার জন্যেই নন্দিতা কৌতুকের ছলে কথাটি বললে।

ওর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে আমি আরও কাছে টেনে নিলুম ওকে। তারপর যেন কানে কানে কথা বলার মতো স্বরে বললুম,—সত্যিই কি বিশ্বাস হয় না?

নন্দিতা আমার দিকে কৌতুক কটাক্ষ হানলো,—কেন আমার বিশ্বাস হওয়া বা না-হওয়ায় আপনার কি কিছু আসে যায়?

তা একটু আসে যায় বইকি।—এবার ওর হাতে একটু জোরে চাপ দিলুম।

আমার দিকে একবার সলজ্জ মধুর চাহনিতে তাকালো সে। তারপর হাতটা ছাড়িয়ে চলে গেল।

তা হলে তৈরী হয়ে নাও, আর দেরী করো না কিন্তু।—পেছন থেকে কথাটা বলে আমি এবার নিজের ঘরে চলে এলুম।

মনটা কেমন এক খুশীর আবেশে ভ'রে ছিল। একটা সিগারেট ধরিয়ে যেন সেই খুশীর চাকনাই ঘরটার ভেতর পায়চারী করতে লাগলুম।

খানিক পরেই ওরা তিন ভাইবোন এসে ঘরে ঢুকলো। আমি নন্দিতার দিকে তাকিয়ে যেন চোখ ফেরাতে পারলুম না। সামান্য একটু সাজগোজেই ওর সেই সুন্দর আটপৌরে চেহারাটা যেন আরো কতো অপরূপ হয়ে উঠেছে। আমার দৃষ্টির মুগ্ধতা ওর চোখমুখে লজ্জার আবির ছড়িয়ে দিয়ে ওকে যেন আরো মধুর করে তুললো। একটা আবেশে আমার মন ভ'রে উঠলো।

সেই আবেশভরা মন নিয়ে আমি সেদিন সর্বক্ষণ তার সান্নিধ্যের সুৎকর অনুভূতিটুকু বুকে ধরে বেড়ালুম। শহরে যাবার বাসে উঠে আমরা পাশাপাশি বসলাম। সার্কাসের খেলা দেখার সময়ও তাই।

খেলা দেখে যখন বাইরে বেরুলাম তখন রাত তেমন হয় নি যদিও, তবু শীতের জন্যে শহরের পথঘাট বেশ ঝাঁকা-ঝাঁকা লাগছিল। দেখলুম, শীতের প্রকোপে অনেক দোকানও বন্ধ হয়ে গেছে। বড়ো খিদে পেয়েছিল। নন্দিতাকে বললুম,—চলো একটা দোকানে গিয়ে কিছু খাওয়া যাক।

নন্দিতা সংকোচের সঙ্গে বললে,—আমার কেন এসব ঝামেলা করছেন।

ঝামেলা আবার কিসের। খিদে পেয়েছে, খাওয়া দরকার।—এই বলে কোনো ওজর আপত্তি না শুনে আমি ওদের নিয়ে ঢুকলুম, শহরের একটি নাম করা রেস্টুরেন্টে। দোকানের ভেতর একটা ছোট্ট কেবিনে আমরা চারজন ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলুম। নন্দিতা বসলে আমার পাশে। ওরা দু'ভাই আমাদের মুখোমুখি দুটি চেয়ারে বসলো।

আমার খিদেটা আসলে পেট, মুখ উদ্দেশ্য ওদের ভালো-মন্দ কিছু খাইয়ে খানিকটা আত্ম-প্রসাদ লাভ করা। তাই দোকানের ছোকরাটিকে ডেকে নানারকম মুখরোচক জিনিসের অর্ডার দিলুম। খাদ্যসম্ভার দেখে নন্দিতার তো প্রবল আপত্তি। অনুযোগের সুরে বলতে লাগলো,—এমন জানলে আমি আপনার সঙ্গে কখনোই আসতুম না।

ওর রাগ-থমথমে মুখখানির দিকে তাকিয়ে আমি পরিহাস ছলে বললুম,—দুর্ভাগ্যক্রমে যখন এসেই পড়েছ তখন এগুলির সদ্গতি করা ছাড়া আর কি উপায় আছে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে উঠতে আরো আধঘণ্টা দেরী হয়ে গেল। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে রাস্তাটা আরো ঝাঁকা লাগলো। লোকজন নেই বললেও হয়। দোকান পশারও যে দু'একখানা খোলা ছিল, তা বন্ধ হয়ে গেছে, বা হতে চলেছে। শীতটা আগের চেয়ে আরও কনকনে হয়ে গায়ে বিঁধছে।

আমরা বাস টামিনাসের দিকে হাঁটতে সুরু করলুম। খানিকটা দূরে বাস টামিনাস। হাঁটতে হাঁটতে নন্দিতা একসময় তার স্কার্ফটা গায়ে মাথায় আরো ভালোভাবে জড়িয়ে নিয়ে আমার আরো কাছে সরে এলো।

কালো স্কার্ফটা অল্প ক'রে মাথায় টেনে দেওয়ায় ওকে বড়ো সুন্দর দেখাচ্ছিল। শীতরাত্রির রহস্যময়তায় একজন অবগুণ্ঠনবতীর এভাবে আমার গায়ে গা-লাগিয়ে হাঁটা, পরম বিশ্বাস আর অন্তরঙ্গতার ভঙ্গীতে আমার হাত জড়িয়ে ধরা—আমার চিন্তাভাবনাকে কেমন যেন আচ্ছন্ন করে তুললো।

এর পর একটা মেশায় যেন আমাকে পেয়ে বসলো। একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর যে এমন মাদকতা আছে তা আমার জানা ছিল না। কিন্তু গ্রামদেশে ইচ্ছেমতো যেখানে সেখানে বেড়ানো সম্ভব নয়। একদিন যেমন মাসিমার অনুমতি পেয়ে নন্দিতাকে নিয়ে শহরে সিনেমা দেখার উদ্দেশে বেরুলাম। কিন্তু যে-ছবিটা দেখার হঠাৎ পাল্টে একটা হিন্দি ফিল্ম দেখানো হচ্ছে। মনটা মুষড়ে গেল। ছবি দেখার বাসনা ত্যাগ করতে হলো।

নন্দিতা মাথা নেড়ে আব্দারের সুরে বললে,—কিন্তু তাই বলে আমি এখন বাড়ি ফিরবো না।

তবে?—আমি জিজ্ঞাসুচোখে ওর মুখের দিকে তাকালুম।

ও বললে,—সিনেমায় যাওয়া যখন হলো না তখন চলুন কোথাও একটু বেড়িয়ে আসি।

—কোথায়?

যেখানে খুশী।—নন্দিতা নির্বিকার এবং নির্বিধায় কথাটা বললে।

প্রস্তাবটা আমার কাছে মন্দ লাগলো না। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়—চলন্ত বাসে ব'সে আমি ভাবতে লাগলুম। তারপর বাসটা রাস্তার মাঝে একটা মনোরম পরিবেশে থামতে আমি হঠাৎ নন্দিতাকে বলে বসলুম,—চলো এইখানেই নামা যাক।

এইখানেই?—ও যেন একটু অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে জিগ্যেস করলো।

কেন মন্দ কী, জায়গাটা তো বেশ ভালোই।—আমি কৈফিয়তের সুরে বললুম।

বেশ নামুন তা হলে।—ও আর দ্বিরুক্তি না ক'রে নেমে পড়লো বাস থেকে। তার পর চারিদিকে এক ঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে খুশী খুশী গলায় বললে,—বাঃ বেশ তো জায়গাটি!

ভেবেছিলুম, পথের মাঝে এইভাবে হঠাৎ নেমে পড়ায় ও হয়তো আমার ওপর বিরক্ত হয়েছে। কিন্তু ওকে খুশী হতে দেখে সে আশংকা দূর হলো। এরপর নিশ্চিন্ত মনে একটা সিগারেট ধরিয়ে যেন নিজের প্রাপ্য কৃতিত্বের জন্যে বললুম,—কেমন একটা জায়গায় নিয়ে এলুম, বলো তো?

সত্যি বড়ো ভালো লাগছে।—নন্দিতার গলায় ছেলেমানুষি মুগ্ধতা।

লাগবেই আমি জানতুম। ওর খুশীতে আমিও যেন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে বললুম,—পরিবেশটা তোমার ভালো লাগবে বলেই তো এখানে নেমে পড়লুম।

সলজ্জভঙ্গিতে হেসে ও বললে,—শুধু কি আমার জন্যেই নামা? আপনার ইচ্ছা-অনিচ্ছা ভালোমন্দের কোনো প্রশ্ন নেই?

যদি বলি—না? কৌতুক কটাক্ষে ওর দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলুম।

আমার দিকে সলজ্জচোখে তাকিয়ে কি যেন ভাবলো সে। তার পর তেমনি লাজুক ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে বললো,—কথাটা ঠিক বিশ্বাস করতে না পারলেও মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে বড়ো ভালো লাগছে।

আমি কোনো কথা বললুম না। শুধু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

দুরন্ত হাওয়ায় অবাধ্য দিলুকের হাল্কা শাড়িটি দু'হাতে সামলাতে সামলাতে একসময় ও বললে,—চলুন না, কোথাও গিয়ে একটু বসা যাক।

কিছু দূরে মাঠের মাঝে এক জায়গায় কতকগুলি ঝাউ তালগাছের সারিবদ্ধ জটলা। সেই এ্যাশফল্টের রাস্তায় দাঁড়িয়ে জায়গাটাকে একটা উঁচু ঢিপির মতো মনে হচ্ছিল যদিও, কিন্তু ওটা যে একটা বড়ো পুকুরের চারপাশের উঁচু পাড় তা আমি বুঝতে পেরেছিলুম। আঙুল দিয়ে নন্দিতাকে জায়গাটা দেখিয়ে বললুম,—ওখানে মনে হচ্ছে একটা ঝিরাট পুকুর-টুকুর কিছু আছে, যাবে ওখানে?

চলুন না, যাওয়া যাক।—অবাধ্য শাড়ির আঁচলটাকে আঁটোসাঁটো করে কোমরে জড়িয়ে নিতে নিতে নন্দিতা উৎসাহিত গলায় বললে।

এ্যাশফল্টের রাস্তার সঙ্গে মাঠের ওপারে ছায়াচ্ছন্ন গ্রামটির সংযোগ একটি সংকীর্ণ মেঠো পথের। আমরা সেই পথটি ধ'রে এগুতে লাগলুম। যেতে যেতে রাস্তার ধারে একটি কিশোর গাছ দেখিয়ে নন্দিতা জিগ্যেস করলে,—এই এটা কি ফুলের গাছ বলুন তো?

—শিরিষ।

তাই না কি! নন্দিতা দাঁড়িয়ে পড়ে অবাক হওয়ার ভঙ্গীতে জিগ্যেস করলে,—সেই যে রবীন্দ্রনাথের 'প্রাঙ্গণে মোর শিরিষ শাখায়'—এই কি সেই শিরিষ?

—হ্যাঁ।

বাঃ, বেশ তো ফুলগুলো। দিন না কয়েকটা পেড়ে।—নন্দিতা ছেলেমানুষের মতো আব্দারের গলায় বললে।

আমি হাত বাড়িয়ে কয়েকটা ফুল পাড়ার চেষ্টা করলুম। নাগাল না পেয়ে লাফ দিয়ে ডালকে নিজের আয়ত্তে এনে কোনোরকমে দুটি ফুল সংগ্রহ করলুম। আমার হাত থেকে ফুল দুটি নিয়ে খানিক্ষণ ধরে তার ঘ্রাণ নিলে সে। নাকে মুখে গালে চোখের পাতায় নরম কেশরগুলো বুলিয়ে সুড়সুড়ি অনুভব করলো। তারপর খোঁপায় গুজলো ফুল দুটিকে।

পথ চলতে চলতে আমি কেবলই আড়ে আড়ে তাকে দেখছিলুম। লক্ষ্য করছিলুম ওর ভাবভঙ্গী। ওকে বেশ দেখাচ্ছিল। চলার ভঙ্গীতে যেন একটা ছন্দোময়তা, কথাবার্তায় চটুল মাধুর্য, চলার তালে তালে সমস্ত শরীরটাই যেন ছন্দোময় হয়ে উঠছে।

ওকে দেখে আমার মনে হ'তে লাগলো, দারিদ্র্য আর সংসারের তিক্ত অভিজ্ঞতায় সংকুচিত ওর বাইশ বছরের মনটা যেন এই উদার মুক্ত প্রাঙ্গণে হঠাৎ ছাড়া পেয়ে বড়ো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সংসারের অভিজ্ঞতায় এবং বিষয়বুদ্ধিতে পাকা সেই মেয়েটিকে যেন তখন আর চেনাই যাচ্ছে না। একেবারে পাল্টে গেছে। সাজসজ্জা, চলন-বলন—সব কিছু মিলে ও যেন সেদিন কিশোরী মেয়েটির মতো লাবণ্যময়ী হয়ে উঠেছে।

যেতে যেতে আমি একসময় তাকে বললুম, এই অতো পাশ দিয়ে হাঁটছো কেন! সরে এসে রাস্তার মাঝ দিয়ে হাঁটো না! খানা খন্দে পড়ে যাবে যে!

পড়তে কি আর কিছু বাকী আছে।—সে হঠাৎ চটুল সুরে বলে উঠলো।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থাকলুম আমি। তারপর ওর কথার ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে আমিও চটুল সুরে বললুম,—গাড্ডায় পড়াটা তা হলে অনুভব করতে পেরেছ!

সে আর বলতে।—নন্দিতা হাসতে হাসতে জবাব দিল।

হাঁটতে হাঁটতে উঁচু পাড় বাঁধানো সেই দীঘিটার কাছে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলুম। পাড়ের উপর উঠে ও বললে,—বাঃ, বড়ো সুন্দর তো দীঘিটা!

উঁচু পাড়ের উপর আমরা ঘুরে বেড়ালুম খানিকক্ষণ। তারপর নরম ঘাস বিছানো একটা ভালো জায়গা দেখে দু'জনে মুখোমুখি বসলুম। আমি একটা সিগারেট ধরালুম। তাই দেখে নন্দিতা হঠাৎ ভর্ৎসনা ভরা গলায় বলে উঠলো,—এই না একটা সিগারেট শেষ করলেন, আবার এরই মধ্যে আরেকটা ধরাচ্ছেন! আচ্ছা, আপনি এতো ঘন ঘন সিগারেট খান কেন!

—কেন, খাই সেকথা যে যায় না তাকে ঠিক বোঝানো যায় না। আমার কথা শুনে নন্দিতা ঠোঁট টিপে হাসতে লাগলো।

সিগারেট টানতে টানতে আমি ওর দিকে ঘন ঘন ফিরে তাকাই। ও পশ্চিম আকাশের

রক্তমেঘের দিকে তাকিয়ে বলেছিল। শেষবেলার আকাশ থেকে ঠিক্‌রে পড়া আলো ওর প্রসাধিত মুখের ওপর রেণু রেণু হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তাইতে ওর মুখখানি বড়ো সুন্দর দেখাচ্ছে। আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলুম।

সে তার চোখদুটিকে আরো আয়ত আরো অপরূপ ক'রে তোলার জন্যে চোখের কোলে খুব সূক্ষ্ম টানে সুর্মার রেখা টেনেছে। কপালে দিয়েছে ছোট্ট একটি কুমকুমের টিপ। সুরুচিসম্মত প্রসাধন তার মুখের মসৃণ ত্বকে যেন আরো কোমলআভা ফুটিয়েছে।

সেদিন সবকিছুই যেন কী এক অপরূপ সাধনা নিয়ে আমার মনে মুগ্ধতার আবেশ ছড়িয়ে দিতে লাগলো। বুকের ভেতর তরঙ্গ তুললো এক অনির্বচনীয় সুখের। আমার মনে হতে লাগলো, অস্তাচলের মেঘে এই রক্তিমা, সমস্ত প্রকৃতিতে এই আলোর প্রসাধন, দীঘির জলে তীরু কিশোরীর কালো চোখের মতো ছায়া, অশথ পাতায় মুখর ধ্বনি—সব কিছুই যেন বড়ো তাৎপর্যময়।

নন্দিতা একসময় জিজ্ঞেস করলে,—কি, হঠাৎ এমন তন্ময় হয়ে পড়লেন কেন?

কেমন যেন স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো আমি বলে উঠলুম,—সত্যি, আজকে সবকিছুই যেন বড়ো ভালো লাগছে।

সব কিছু বলতে···?—নন্দিতা আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো।

ভালো লাগছে এই আলো, এই বাতাস, বিকেলের এই মনোরম প্রকৃতি, আর মনে হচ্ছে যেন এই সবকিছুর সৌন্দর্য এবং মাধুর্য তোমাতে এসে ঠাঁই নিয়েছে।

তাই নাকি।—কৌতুককটাক্ষ হেনে নন্দিতা কথাটা বললে।

আমি কিন্তু কৌতুকের ধারকাছ দিয়েও গেলুম না। নন্দিতার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে তেমনি আবেগবিহ্বল গলায় বললুম,—সত্যি, তোমাকে আজ এতো ভালো লাগছে তা আর কি বলবো!

আমার সেই মুগ্ধদৃষ্টির সামনে নন্দিতার চোখের পাতা দু'টি কেমন যেন ভারী হয়ে আসতে লাগলো। যেন লজ্জার ছায়া আস্তে আস্তে ঘন হয়ে ছড়িয়ে পড়লো। সেই বিনম্র চোখ দুটি তুলে মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাতে লাগলো। অনেকক্ষণ আমরা কেউ কোনো কথা বললুম না।

এমনি নীরবতায় খানিকক্ষণ কেটে যাওয়ার পর নন্দিতা একসময় বললে,—উঠুন, এবার বাড়ি ফেরা যাক।

হ্যাঁ,—বলে আড়ামোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ালুম। তার পর পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে আবার একটা সিগারেট ধরালুম। নন্দিতা শুধু একবার কটাক্ষ হানলে। কোনো কথা বললে না বটে, তবে হাসি আর শুৎসনার মেশামেশিতে তার চোখে মুখে এক অপরূপ ভঙ্গিমা ফুটে উঠলো।

সেদিন রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে আমার চোখে আর সহজে ঘুম এলো না। বিকেলের আনন্দটা যেন তখনো মনে এক আবেশ ছড়িয়ে রেখেছে। নন্দিতার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যে এমন প্রগাঢ় মাধুর্যে ভরে উঠবে তা আমি কোনোদিন কল্পনাও করতে পারি নি।

সত্যিই সবকিছুই যেন সেদিন আমার কাছে বড়ো আশ্চর্য বলে মনে হতে লাগলো। আমি কি আশা করতে পেরেছিলুম যে গ্রামে এসে এমন একটি সম্ভ্রান্ত আর মার্জিত পরিবারের মধুর সাহচর্য পাবো। অথচ ঘরটা ভাড়া নেওয়ার আগে এবাড়ির মেয়েদের সম্পর্কে কতো আজগুবি কথাই না শুনেছিলুম।

কয়েকমাসের অভিজ্ঞতায় আমার মনে হলো, গ্রামের মানুষের সবও ধারণাই ভ্রান্ত। আসলে চালচলনে মেলামেশায় গ্রামের অন্যান্য বাড়ির মেয়েছেলের' এতোখানি সপ্রতিভ নয় এবং গ্রামের মানুষে এমনটা দেখতে অভ্যস্ত নয় বলেই হয় তো তারা এদের সম্পর্কে এই রকম একটা ধারণা পোষণ করে।

কিন্তু যে যাই ভাবুক, আমার মনে সে দিন পরিবারটির জন্যে যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। ভাবতুম, মানুষ সবকিছু ভুলতে পারে, কিন্তু অভ্যাস এবং কালচারকে সহজে পরিহার করতে পারে না। এবং তা করার মতো ধৈর্যবাঁধও কিছু নেই। পরিবেশের সঙ্গে মনের রুচি প্রকৃতিকে খাপ খাওয়াতে না পারার ট্রাজেডিই মানুষের জীবনে সব চেয়ে বড়ো ট্রাজেডি। শিলংয়ের সম্ভ্রান্ত পরিবেশে যে আদবকায়দা শিক্ষাসহবতে ওরা গড়ে উঠেছে সেটাকে সহজে ভুলতে পারছে না। গ্রামীণ সমাজে এসে রুচিপ্রকৃতিকে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারছে না। হয় তো সেই কারণেই ওদের নামে এমন কলঙ্ক রটেছে।

পরিবারটির এই অসহায়তা উপলব্ধি করে পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষের প্রতি একটা গভীর মমতা আর সহানুভূতি গড়ে উঠেছে। আমি যেন ধীরে ধীরে সে পরিবারের একান্ত আপনজনের মতো হয়ে উঠেছি। যেন বাঁধা পড়েছি আত্মীয়তার যোগসূত্রে। কিন্তু সেই সম্পর্কটার ভেতর যে এমন আকস্মিক ভাবে একটা সংশয় এসে দেখা দেবে, এতখা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। সংশয়ের সূত্রপাত তখন থেকেই, যখন বাইরের মহলের আর একটি ঘর এসে ভাড়া নিলেন ধীরেন সরকার নামে এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক।

মোহনপুর থেকে কাউডাঙা পর্যন্ত যে নতুন বাস সার্ভিসটা খোলা হয়েছিল, ধীরেন সরকার সেই রুটের একটি বাসের মালিক। কেষ্টনগরের কাছে কোথায় যেন তাঁর দেশ। দেশের বাড়িতে স্ত্রী পুত্র পরিজনরা ছিল। কাঁচা পয়সার কারবারে হাতে হিসেবটা ঠিক মতো থাকে তার জন্যেই তাঁকে মোহনপুরে থাকার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। বাসা একটা করেছিলেন বটে তবে বাসাতে তিনি থাকতেন খুব কম সময়ই। সকাল আটটায় সময় বেরিয়ে যেতেন, ফিরতেন মাঝ দুপুরে। দুপুরে খানিক বিশ্রাম নিয়ে আবার বের হতেন, ফিরতে কোনোদিন হতো রাত নটা, কোনদিন বা দশটা। খাওয়া দাওয়া সবকিছু বাইরেই সারতেন। বাসার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল শুধু স্নান আর নিদ্রার।

ক্রমে দেখা গেল, আমার মতো ধীরেন সরকারের সঙ্গেও ভেতর বাড়ির সকলের বেশ একটা চেনাজানার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। মাসিমা মাঝে মাঝে তাঁর ঘরে এসে তাঁর সুবিধা অসুবিধার কথা জেনে যান। নন্দিতাকে দিয়ে সকালে তাঁর ঘরে চা পাঠান। অপু পার্থকেও যখন-তখন তাঁর ঘরে দেখা যায়। তাঁর সঙ্গে ওরা বেশ একটা সম্পর্কও পাতিয়েছে। তাঁকে মামাবাবু বলে ডাকে। বোধ হয় মাসিমাই তাদের শিখিয়েছেন।

অবিশ্যি তখনো যে আমার সঙ্গে সম্পর্কে কোনোরকম শৈথিল্য দেখা দিয়েছে—তা নয়। আগের মতোই রয়েছে। তবু মনে কেমন একটা সংশয় দেখা দিল। মাঝে মাঝে মনে হতে লাগলো, আমার সঙ্গে এ পরিবারের এই মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠাটা যেন কোনো সবিশেষ ঘটনা নয়। ব্যাপারটি নেহাত এ পরিবারের মানুষগুলির স্বভাবসিদ্ধ কারণেই ঘটেছে। আমি না এসে যদি অন্য কেউ এ ঘর ভাড়া নিতো তবে তার সঙ্গেও ঠিক এইরকম একটা সম্পর্ক গড়ে উঠতো।

কিন্তু এ বাড়ির আর যার সম্পর্কেই এরকম কথা ভাবি না কেন, নন্দিতা সম্পর্কে এই রকম একটা চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতে মন সায় দেয় না। শেষ পর্যন্ত মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো একদিন একটা প্রমাণও পেলুম।

সেদিন চান করার জন্যে ভেতর বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে শুনলুম, মা আর মেয়েতে রীতিমতো কথা কাটাকাটি হচ্ছে। এরকমটা কোনোদিন শুনি নি। তাই আমাকে দরজার মুখে থেমে পড়তে হলো। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম; ধীরেন সরকারের ঘরে চা দিতে যাওয়া নিয়েই মা-মেয়েতে বচসা। মা জোর দিয়ে বলছেন,—না, তোকে যেতেই হবে। দেখি যাস কি না যাস।

মেয়েও এতোক্ষণ প্রবল আপত্তির সুরে কথা বলছিল। এবার কাতর অনুনয়ে ভেঙে পড়ে বললো,—না আমি যাবো না, তুমি আমাকে ওর ঘরে কখনো পাঠিও না মা। লোকটা মোটেই ভদ্র নয়। আমার বড়ো বিশ্রী লাগে।

মা ধমক দিয়ে বললেন,—মে বাজে কথা বলে আর ন্যাকামি করতে হবে না।

নন্দিতা বললে,—হাঁ, তুমি তো সবই বাজে কথা বলে উড়িয়ে দাও।

—বাজে কথাই তো। মানুষের মেহ ভালোবাসা বুঝতে পারিস না, ঘিনঘিনে শুধু তাদের নামে দোষ দিস।

মা!—শুধু এই সম্বোধনটুকু বেরুলো নন্দিতার গলা থেকে। কান্নায় তার গলার স্বর জড়িয়ে গেল।

আমি সেখানে দাঁড়িয়ে বড়ো বিব্রত বোধ করতে লাগলুম। বাড়ির ভেতরে ঢুকতে পারি না, চলেও আসতে পারি না। শেষ পর্যন্ত ফিরেই আসতে হলো চান করার সংকল্প ত্যাগ করে।

সামান্য একটু ইংগিতেই বাড়িটা সম্পর্কে আমার চিন্তা ভাবনা সংকল্প ধারণা—সবকিছু যেন ওলোট পালোট হয়ে গেল। নিজের ঘরে এসে স্থাণুর মতো বসে রইলুম আমি। বসে ভাবতে লাগলুম, তা হলে এতোদিন এ বাড়ির সকলের মধুর ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছিল, তার ভেতর কি আন্তরিকতা বলে কিছু নেই! সে কি শুধুই অভিনয়। মনে মায়া বিস্তারের চেষ্টা! ধীরেন সরকারের ঘরে চা দিতে যাওয়া নিয়ে নন্দিতার মনে যে আপত্তি—সে আপত্তি কি আমার ঘরে আসার সময়ও ছিল! এবং শেষ পর্যন্ত মায়ের কড়া নির্দেশেই কি সে আপত্তিকে জলাঞ্জলি দিয়ে আমার ঘরে আসতে হয়েছে! আপ্যায়িত করতে হয়েছে মধুর হাসিতে! মায়া ছড়াতে হয়েছে ভাবভঙ্গি আর কথাবার্তার ছলাকলায়! ভাবলুম, এই জন্যেই হয়তো এ বাড়ির মেয়েদের সম্পর্কে গ্রামের সকলের মনে একটা বিশ্রী ধারণা।

মনে পড়লো, ঘর ভাড়া নেওয়ার আগে অনেকে আমাকে অনেক কথা বলেছিল, কিন্তু সে সব কথায় তখন কান দিই নি। আসলে অতো শোনা আর অতো মানাতেই আমার মনে কেমন একটা দুর্বার ইচ্ছে জেগেছিল—বাড়িটার গোপন রহস্য জানতে। মনে কেমন একটা জেদ চেপে গিয়েছিল। দেখাই যাক না কি সে রহস্য, আমাকেই বা তা কেমন কাবু করতে পারে। যেন একটা জেদের বশে আর আত্মবিশ্বাসের জোরে ঘরটা ভাড়া নিয়েছিলুম। কিন্তু বাড়িটায় এসে মনের সে সবলতা থাকেনি। ওদের চেহারা চালচলন কথাবার্তা ব্যবহার—সবকিছু এতো ভালো লেগেছে যে কোনোদিন কোনো বিশ্রী ধারণা মনে ঠাঁই পাওয়ার অবকাশই পায় নি। সেদিন মনে হলো, ওইগুলোই ওদের কৌশল। কথাগুলো ভাবতে আমার কেমন যেন শ্বাসরোধ হয়ে আসছিল।

ভেবে কোনো কূলকিনারা পেলুম না। অথচ কথাটা তখনো যেন পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারলুম না। আর সকলের সম্পর্কে যদি বা বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু নন্দিতার সম্পর্কে এমন একটা ধারণা মনে পোষণ করি কি করে! আমার সঙ্গে মেলামেশার প্রথম থেকেই ওর মনে যে উদ্বেগ ব্যাকুলতা আর স্বতস্ফূর্ততা দেখেছি—তাতে আমার পক্ষে তখনো বিশ্বাস করা যায় না যে, ও আমার সঙ্গে কোনোদিন ছলনা করেছে। তা ছাড়া ওর ওপর আমার মনে যে দুর্বলতা, তাকে আমি অস্বীকার করতে পারি নি। পারি নি বলেই বুঝি সেদিন বিকেলে ও যখন আমার ঘরে এসে ঢুকলো তখন আমি ঠিক আগের মতোই মনেপ্রাণে পুলকিত হয়ে উঠলুম।

নন্দিতা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে উদ্বিগ্ন গলায় জিগ্যেস করলো,—একি, এমন অসময়ে শুয়ে আছেন কেন!

শরীরে কেমন একটা ক্লান্তি বোধ করছি।—আমি বিছানার উপর উঠে বসলুম।

নন্দিতা চৌকির এককোণে বসে আমার দিকে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো,—ও, তাইতে মশায়ের তখন থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাই নি।

কেন যে ঘরের ভেতর চুপচাপ বসেছিলুম—সে কথা কবুল করতে সংকোচ বোধ করলুম। তাই ওর মদির চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে আমিও সকৌতুকে বললুম,—যাক্, শুনে সুখী হলুম যে আমারও সাড়াশব্দ পাওয়ার জন্যে একজন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে।

আমার সঙ্গে তার আচার আচরণে এতোটুকু ব্যতিক্রম দেখতে পেলুম না। সে ঠিক আগের মতোই ঠোঁট উল্টিয়ে কৃত্রিম তাচ্ছিল্যের সুরে আমাকে বললে,—আমার ভারি বয়ে গেছে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতে। নেহাত একটা চিঠি এসেছে বলেই সেটা দেওয়ার জন্যে খোঁজ নিচ্ছিলুম।

কথাটা বলে নন্দিতা আমার হাতে একটি পোস্টকার্ড দিলো।

হস্তাক্ষর দেখে বুঝতে পারলুম, বাড়ি থেকে মা চিঠি লিখেছেন। দু'চার ছত্র পড়েই বুঝতে পারলুম, তার আগে দু'একটা চিঠিতে মা যে কথা জানিয়েছিলেন, সে চিঠিটাতেও সেই একই কথার উল্লেখ; অর্থাৎ গত সাত আট মাসে বাড়িতে টাকাপয়সা না পাঠানোর জন্যে মায়ের অনুযোগ। কিন্তু অন্যান্য বারের চেয়ে সেবারের অনুযোগটা আরেকটু প্রবল। চিঠিটায় যেন একটু কৈফিয়তের সুর। টাকা না পাঠাতে পারার স্পষ্ট কারণ জানতে চেয়েছেন।

আগে একটা চিঠিতে অজুহাত দিয়েছিলুম এই বলে যে,—'এতোদিন আমার উপার্জনের অপেক্ষায় না থেকেও যখন সংসারের কোনো কিছুতে এতটুকু অসচ্ছলতা আসে নি, তখন আজও আমার টাকাটা না পেলে সংসার আগের গতিতেই চলে যাবে। তা ছাড়া দিলেই যখন সংসারের বেহিসেবী খুচরা টাকাটাকে গ্রাস করে ফেলবে তখন তা আমার কাছে থাকাই যুক্তিসঙ্গত মনে করি।'

মায়ের চিঠিটা হাতে ক'রে আমি চুপচাপ বসেছিলুম। নন্দিতা একসময় উদ্বিগ্ন গলায় জিগ্যেস করলে,—কী, হঠাৎ এমন চুপ ক'রে গেলেন কেন! চিঠিতে কি কোনো দুঃসংবাদ আছে?

আমি শুকনো গলায় জবাব দিলুম,— না, তেমন দুঃসংবাদ কিছু নয়।

তবে?—নন্দিতা উৎসুক হয়ে আমার হাত থেকে চিঠিটা নিলে। তারপর চিঠিটা প'ড়ে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ধীরে ধীরে একসময় বললে,—সত্যি আপনার কিন্তু ভারি অন্যায় হয়েছে।

না অন্যায় কিছু হয় নি নন্দিতা।—স্থিরমাণ গলায় আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারলুম।

নন্দিতা বললে,—অন্যায় নয়! বাড়ির প্রতি আপনার কি একটা কর্তব্য থাকা উচিত নয়।

কর্তব্যবোধ আমার যথেষ্ট আছে, শুধু টাকা পয়সা পাঠালেই কর্তব্য পালন হয় না।—খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আমি আবার বললুম,—মায়ের টাকা চাওয়াটা সংসারের প্রয়োজনে নয়, মনোবৃত্তি-সুলভ চাহিদায়। মানুষের চাওয়ার যে শেষ নেই। যতোই থাক না কেন, তবু সে চাইবেই। মায়ের চাওয়াটাও সেইরকম। তাই সেই চাহিদার সাড়া দেওয়ার চেয়ে একটি বিপন্ন পরিবারের সংকট মোচনের চেষ্টাটা আমার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব'লে মনে হয়েছে।

কিন্তু কেন আপনি আমাদের সংসারের জন্যে এমন ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন! কি আপনার স্বার্থ?—আমার দিকে চোখ তুলে নন্দিতা হঠাৎ অদ্ভুত গলায় প্রশ্ন ক'রে বসলো।

আমি খানিকক্ষণ ওর মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে জিগ্যেস করলুম,—কেন নন্দিতা, আজ হঠাৎ এমন প্রশ্ন করছো কেন!

কোনো জবাব দিলো না সে। নতমুখে কেমন যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্তের মতো বসে থাকলো। তারপর অনেকক্ষণ পরে যখন মুখ তুললো তখন দেখলুম, ওর দুটি চোখ জলে ভ'রে উঠেছে।

সেই ছলছলে চোখে সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কান্না জড়ানো গলায় বলে উঠলো,—কিন্তু কেন—কেন আপনি এমন নিঃস্বার্থভাবে আমাদের সংসারকে সাহায্য করে যাচ্ছেন! প্রতিদানে আমরা কি দিতে পারবো! আপনার এই মহানুভবতার কোনো মূল্যই তো আমাদের কাছ থেকে পাবেন না।

ওকে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে দেখে আমি হঠাৎ ওর হাত দুটি চেপে ধরে কাছে টানলুম। বললুম,—আমি তো অন্য কিছু চাই নে, নন্দিতা। যে পরমার্থ পেয়েছি, তাই নিয়ে আর তাকে নিয়েই খুশি থাকতে চাই।

নন্দিতা তেমনি কান্না জড়ানো গলায় বললে,—কিন্তু যা দিয়েছি তার চেয়ে বেশি কিছু দেওয়ার যে আমার উপায় নেই। উপায় নেই আমার এই সংসারের চক্র থেকে মুক্তি পাওয়ার।

নন্দিতার কথায় আমার চিন্তা ভাবনা আবেগ উচ্ছলতা—সবকিছু যেন মুহূর্তে অসাড় হয়ে গেল। ওর কথায় সে বাড়ির চক্রান্তটা আমার ধারণায় যেন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। চুপচাপ ব'সে থাকলুম খানিকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে একসময় বললুম,—কিন্তু আমি তো তোমায় মুক্ত করতে পারি।

নন্দিতা ব্যাকুলভাবে আমার হাতটা জড়িয়ে ধ'রে বললে,—পারো, সত্যিই পারো তুমি। তবে আমায় এখান থেকে দূরে কোথাও নিয়ে চলো না কেন!

যাবো—তাই যাবো নন্দিতা।—আমি আস্তে আস্তে জবাব দিলুম।

নন্দিতা আরো যেন কি বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই বাইরে কার পায়ের শব্দ শুনে সচকিত হয়ে উঠলো। শশব্যস্তে দরজার কাছে এসে বাইরে উঁকি দিলো। তারপর বুঝি চোখাচোখি হওয়াতেই একটু অপ্রস্তুত প'ড়ে বাইরে বেরুলো। কে, দেখবার জন্যে আমিও দরজার কাছে এসে উঁকি দিয়ে মাসিমাকে দেখতে পেলুম। দেখলুম, মাসিমা গম্ভীর মুখে বাইরের রোয়াক থেকে নেমে ভেতর বাড়ির দিকে এগুচ্ছেন। তাঁর পেছনে কুণ্ঠিত পায়ে নন্দিতা। মনে হলো, নন্দিতাকে তিনি যেন ডেকেই নিয়ে যাচ্ছেন। কেমন একটা সন্দেহ ঘনালো মনে। তবে কি বাইরের

রোয়াকে দাঁড়িয়ে মাসীমা এতক্ষণ আমাদের সব কথা শুনেছেন! আমাদের ষড়যন্ত্র আর সংকল্পের কথা! নিশ্চয় শুনেছেন! নইলে ওঁর মুখটা অমন থম্‌থমে কেন! আর নন্দিতার মুখটাই বা অতো শুকনো কেন!

এরপর সন্দেহটা আরো ঘনীভূত হলো—যখন দেখলুম, সে বাড়ির সকলেই যেন আমাকে কেমন এড়িয়ে চলতে চাইছে। অপু পার্থ আর নন্দিতার তো আমার ঘরে আসা বন্ধ হ'য়ে গেলই, মাসীমাও আমাকে এড়িয়ে যেতে লাগলেন।

অথচ চোখের সামনে দেখা যেতে লাগলো, আমার সঙ্গে সে বাড়ীর সম্পর্ক যতো আলগা হচ্ছে পাশের ঘরের ধীরেন সরকারের সঙ্গে ঠিক ততোই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে। নন্দিতা আমার ঘরে আসে না, অথচ ধীরেন সরকারের ঘরে নিয়মিত চা দিতে যায়। মাসিমাকে ধীরেনবাবুর সুবিধে অসুবিধে আনার জন্যে সদাই ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। দেখা যায় অপু পার্থকেও যখন তখন তাঁর ঘরে যেতে। রাত্তিরে ঘরে বসে ধীরেনবাবু যখন বাস কণ্ডাক্টরের সঙ্গে মুঠো মুঠো খুচরো পয়সার হিসেব করেন তখন তো তারা দু'ভাই নিয়মিত আসবেই। এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকবে স্তূপীকৃত পয়সার দিকে লোলুপদৃষ্টিতে চেয়ে।

ক্রমে দেখা গেল, ধীরেনবাবুকে আর আগের মতো সবসময় বাইরে কাজের জন্যে ব্যস্ত থাকতে হয় না। কাজগুলো সব এমনিতেই হয়ে যায়। তাই তিনি সবসময় ঘরে বসে কাটান। আগের মতো হোটেলের অরুচিকর আহার্যেও তাঁর আর তৃপ্তি নেই। অগত্যা দু'বেলা খাওয়ার ব্যবস্থাটা মাসিমার কাছেই পাকাপাকি করতে হয়েছে। বড়ো ভোজনরসিক মানুষ তিনি, তাই নিজের হাতেই প্রতিদিন বাজারটি করেন।

এইসব দেখে বাড়িটা সম্পর্কে আমার মনে একটা বিশ্রী ধারণা বদ্ধমূল হলো। নন্দিতার সম্পর্কেও ধারণাটা খুব উঁচু রইলো না। ভাবলুম, ওই বা কেন এই নোংরামিতে নেমেছে। সেদিন মায়ের কাছে সে যে আপত্তি করেছিল, কোথায় গেল তার সেই আপত্তি! সেই চারিত্রিক দৃঢ়তা! তারও মনটা কি বাড়ির আবহাওয়ার অনুকূলে গ'ড়ে উঠেছে। নইলে এতোখানি নির্লজ্জ সে হয় কি করে!

আমার দিকে তাকাতে ভয় পায়, না লজ্জা পায়, তাও ঠিক বুঝতাম না বলেই ওর ওপর পুরোপুরি বিশ্বাসও হারাতে পারতুম না। এমনি সংশয় ব্যাকুল চিত্তে ওকে তাই একদিন আমার ঘরে ডাকলুম।

বিকেলে ধীরেন সরকারের ঘরে চা দিয়ে সে যখন ফিরে যাচ্ছে তখন আমার ঘরের দরজার মুখে দাঁড়িয়ে তাকে ডাকলুম। আমার ডাকে সে যেন একটু চমকে উঠে ফিরে তাকালো। তারপর ভেতর বাড়ির দিকে চকিত দৃষ্টি হেনে হরিণীর মতো ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে এলো।

সে ঘরের ভেতর এলে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আমি এবার পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালুম। সে ঘরে ঢুকে মাথা নিচু করে এককোণে দাঁড়িয়ে আঙুলের নখ খুঁটছিল। ভঙ্গীটা অপরাধ-বোধের না ভয়ব্যাকুল প্রতীক্ষার তা ঠিক বোঝা গেল না। আমি কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলুম। তারপর একসময় আস্তে আস্তে কাছে এসে বললুম,—নন্দিতা, তুমি যে সংকল্পের কথা সেদিন আমায় বলেছিলে তা কি ভুলে গেছ?

কোনো জবাব দিলো না সে। তেমনি নতচোখেই দাঁড়িয়ে রইলো। খানিকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে তার হাতে মৃদু ঝাঁকি দিয়ে আমি আবার ব্যগ্রকণ্ঠে বললুম—বলো নন্দিতা—আমার কথার জবাব দাও।

না।—নন্দিতা এবার চোখ তুলে তাকালো। দেখলুম, ওর চোখদুটি জলে ভ'রে উঠেছে।

তবে কেন—কেন তুমি এমন চুপ করে আছ!—আমি ব্যগ্রকণ্ঠে ব'লে উঠলুম।

কি করবো আমি?—কান্না-বিকৃত গলায় নন্দিতা কেমন যেন অসহায়ের মতো কথাটা বললে।

কি আবার করবে, আমার সঙ্গে এই পাপচক্র ছেড়ে তোমায় যেতে হবে, এবং তা শীগ গির, সম্ভব হলে আজই।

আজই!—নন্দিতা কেমন ভয়ে ভয়ে কথাটা উচ্চারণ করলো।

হ্যাঁ আজই। বেশী দেরী করলে হয়তো নানা দিক থেকে আমাদের বাধা আসতে পারে। তার চেয়ে আজই চলো না কেন।

নন্দিতা আস্তে আস্তে জবাব দিলো,—বেশ, তাই যাবো।

অনেকখানি সময় কেটে গেল। তার ভেতরেই আমাদের অনেক কথাবার্তা হলো। ঠিক হলো, সেদিনই শেষরাতে স্টেশনে গিয়ে ভোর চারটের ট্রেন ধ'রে আমরা কোলকাতায় যাবো। আমি ঘরের দরজা খুলে ফেলে থাকবো। তারপর যথাসময়ে নন্দিতা এলে আমরা বেরিয়ে পড়বো।

কথা কইতে কইতে নন্দিতা বাইরে যাওয়ার জন্যে মাঝে মাঝে বড়ো ব্যস্ত হয়ে পড়ছিল। আমি তাকে বেশীক্ষণ ধরে রাখলুম না। তাকে ছেড়ে দিয়ে নিজেই এসে ভেজানো দরজাটা খুলে দিলুম। সে বেরিয়ে গেল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তার গমন পথের দিকে তাকাতে গিয়ে আমি চমকে উঠলুম। দেখলুম, ভেতর বাড়ির একটি জানলা থেকে মাসীমার মুখটা হঠাৎ আড়ালে সরে গেল। মনে হোলো, দৃষ্টিটা যেন এতক্ষণ আমার ঘরের দিকেই নিবদ্ধ ছিল।

দরজাটা আস্তে আস্তে ভেজিয়ে দিয়ে আমি আবার চৌকিটায় এসে বসলুম। মাসীমাকে ওই ভাবে দেখতে পাওয়ায় বড়ো সংকুচিত হয়ে পড়লুম। কিছুটা ভয়ে, কিছুটা বা লজ্জায়। ভাবলুম, দরজা ভেজিয়ে ঘরের ভেতর আমাদের অতোক্ষণ সময় কাটানোটা মাসীমা না জানি কি ভাবে নিয়েছেন। ভালোভাবে যে নেন নি তা ওঁর মুখচোখের সন্দিগ্ধ ভাব দেখেই বুঝতে পেরেছি।

পরক্ষণেই আবার ভাবলুম, উনি যাই মনে করুন না কেন—তাতে আমার কি যায় আসে। এ বাড়ির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে যখন এখান থেকে চলেই যাচ্ছি তখন আবার এত চক্ষুলজ্জার বালাই কেন!

ভেবেছিলুম, সেদিন আর বাড়ি থেকে বেরুবো না। কিন্তু সিগারেট আনার জন্যে শেষ পর্যন্ত বেরুতেই হলো। আর সিগারেট আনতে গিয়ে আরও দু'চারটে টুকিটাকি কাজ সারতে হলো। বইটা লাইব্রেরীতে জমা দিয়ে চাঁদা পরিশোধ করলুম। একটা চায়ের দোকানে কিছু পয়সা বাকি ছিল, তারও পাওনা মিটিয়ে দিলুম। এই সমস্ত সেরে বাড়ি ফিরতে কতোটুকুই বা সময় লেগেছে। খুব বেশী হলে একঘণ্টা, কিন্তু বাড়ি এসে দেখলুম, তারই ভেতরে একটা দারুণ বিপর্যয় ঘটে গেছে।

সদর দরজা দিয়ে ঢুকতে গিয়েই শুনলুম, ভেতর বাড়িতে যেন কিসের একটা মওগোল হচ্ছে একটা সরু গলায় কান্না আর সেই সঙ্গে একটা তীব্র কণ্ঠের ভর্ৎসনা শোনা যেতে লাগলো। কিন্তু কি যে ব্যাপার তা কিছুই বুঝতে পারলুম না। ভেতর বাড়ির সমস্ত দরজা জানলাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে না বাড়ির ভেতরের মওগোলটা বাইরে থেকে শোনা যায়।

কৌতূহল নয়, যেন একটা ভয় আর বিস্ময় পাথর হয়ে আমার বুকের ওপর চেপে বসলো।

ধীরেন সরকারের ঘরটার দিকে একবার তাকালুম। দেখলুম, সে ঘরে আলো জ্বলছে। নিদারুণ বিস্ময়ে কেমন যেন ঘমকে গিয়ে সদর দরজাটার কাছেই খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর পায়ে পায়ে ভেতর বাড়ির বন্ধ দরজাটার কাছেই খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। ভেতর থেকে তখনো ভর্ৎসনা আর কান্নার আওয়াজ আসছে। কিন্তু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবু আমি সেই বন্ধ দরজাটার ওপর কান পেতে ভেতরকার ব্যাপারটা আঁচ করার চেষ্টা করলুম। কিন্তু কান পেতে প্রথমেই আমাকে আঁতকে উঠতে হলো, বেত চালানোর সাঁই সাঁই শব্দ শুনে। বেত আস্ফালনের সঙ্গে সমান তালে মাসিমার তীব্র অথচ চাপা গলার ভর্ৎসনাও শোনা যেতে লাগলো :

—হারামজাদী মেয়ে, তোর পেটে পেটে এতো শয়তানী মতলব ছিল! তুই আমাদের মুখে কালি দিতে চাস! তোকে আমি আজ খুনই ক'রে ফেলবো।

কথার শেষে বেতের শব্দটা যেন আরও তীব্র হয়ে উঠলো, আর সেই সঙ্গে বেড়ে উঠলো নন্দিতার চীৎকারটাও। কাঁদতে কাঁদতে সে কাতর অনুনয়ে বলতে লাগলো,—মা গো তোমার পায়ে পড়ি, ছেড়ে দাও—আর মেরো না।

ছাড়বো! এতো সহজে ছাড়বো! তোকে আজ আমি শেষ ক'রে তবে ছাড়বো। তারপর দেখবো, ও ছোঁড়াও কতো বাড় বেড়েছে। —কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বেতও সমান তালে পড়তে লাগলো।

নন্দিতার জন্যে একটা নিদারুণ মমতা অনুভব করে আমি বড়ো বিচলিত হয়ে পড়লুম। অথচ কিছু করারও উপায় নেই। নিরুপায়ের মতো আমি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম, যদিও দাঁড়িয়ে থাকতে বড়ো বিশ্রী লাগছিল। ভয়, বিস্ময়, উৎকণ্ঠা, ব্যাকুলতা—সবকিছু মিলে আমার শ্বাস-প্রশ্বাসকে কেমন ভারি ক'রে তুললো। চেতনাকে ক'রে তুললো অসাড়।

খানিকক্ষণ ওই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে আমি এক সময় নিঃশব্দ পায়ে চলে এলুম সেখান থেকে। নিজের ঘরে এসে চৌকির ওপর বসলুম। ভয়, ভাবনা, চিন্তা, উৎকণ্ঠা যেন পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে আমার বোধশক্তিকে অসাড় ক'রে তুলতে লাগলো। কিছুতেই বুঝতে পারলুম না, নন্দিতার ওপর এমন নৃশংস অত্যাচারের কি কারণ থাকতে পারে।

তবে কি আমাদের সংকল্পের কথা উনি কোনরকমে টের পেয়েছেন? ভাবলুম, হয়তো তাই হবে। নইলে বিকেলে নন্দিতা যখন আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, তখন তিনি জানলা দিয়ে অমন সন্দিগ্ধচোখে তাকিয়ে ছিলেন কেন? তবে কি আড়ি পেতে শোনার জন্যে অন্য কাউকে তিনি আমার জানালার কাছে মোতায়েন রেখেছিলেন? হতেও পারে। তাঁর পক্ষে কোন কিছুই করা অসম্ভব নয়।

কিন্তু সেদিনই আমার সমস্ত ধারণা পালটে গেল। মনের বিস্ময়কে ক্ষুব্ধ করে দিল আর এক সাংঘাতিক বিস্ময়।

সেদিন অমন দুশ্চিন্তার ভেতরেই প্রহর কাটাতে কাটাতে কখন আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঘুমের ঘোরে দরজায় করাঘাত এবং মাসিমার উদ্বিগ্ন ব্যাকুল কণ্ঠের ডাক শুনে ধড়মড় ক'রে বিছানার উপর উঠে বসলুম। বুঝতে পারলুম না, এত রাত্রে এমন ভাবে ডাকছেন কেন। তবে কি কোনো অঘটন ঘটেছে। ভয়ে আমার বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। মাসিমা ব্যাকুল গলায় আরও বার দুই ডাকার পর আমি চৌকি থেকে নেমে আস্তে আস্তে এসে দরজাটা খুলে দিলুম।

দৃশ্যটা আশাতে মনে ছিল না। সেই অন্ধকার ঘরেই তিনি হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়লেন। তারপর কোনো ভূমিকা না করেই কেমন কান্নাব্যাকুল গলায় বলে উঠলেন,—অনুপম তুমি এ কি করলে। কেন আমার মন্নার এমন সর্বনাশটি করলে! ও হতভাগীকে নিয়ে আমি এখন কি করবো। কোথায় যাবো! কি করেই বা লোকের কাছে মুখ দেখাবো!

আমি সবিস্ময়ে জিগ্যেস করলুম,—মাসিমা এসব কি বলছেন! আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

মাসীমা তেমনি কান্নাব্যাকুল গলায় বললেন,—মেয়েছেলের আর কি সর্বনাশ হ'তে পারে বাবা!

কথাটা শুনে আমি চমকে উঠলুম। এ কি ক'রে সম্ভব! বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুলো না। চিন্তা ভাবনাও যেন লোপ পেতে বসলো।

মাসীমা তখনো ইনিয়ে বিনিয়ে বলে চলেছেন,—বলো আমি এখন কি করি! ওই মুখপুড়িকে নিয়ে সমাজের কাছে আমি মুখ দেখাই কি ক'রে!

অনেকক্ষণ পর আমি আস্তে আস্তে যেন বড়ো ক্লান্ত গলায় বললুম, বিশ্বাস করুন মাসীমা, আপনি আমাকে মিছিমিছি সন্দেহ করছেন।

—সন্দেহ ক'রে বলবো কেন বাবা, মন্না তো নিজেই সবকথা স্বীকার করেছে। এরপরও কি আমাকে তোমার কথা বিশ্বাস করতে বলো।

নন্দিতা—নন্দিতা এসব কথা বলেছে! —বিস্ময়ে আমার গলা থেকে যেন স্বর বেরুতে চায় না।

হ্যাঁ—তাই তো, নইলে আমি কি তোমার ওপর সন্দেহ ক'রে বলছি।

আমি কোনো কথা বলতে পারলুম না। বিস্ময়ে যেন হতবাক হয়ে রইলুম।

মাসীমা কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, এখন তো অন্য কোনো উপায় নেই। তোমাকেই এর যা হোক একটা বিহিত করতে হবে।

আমি কি বিহিত করবো, আর কেনই বা তা করবো? —এবার আমি মুখ ফুটে জবাব দিলুম।

তোমাকেই করতে হবে, যেহেতু তুমিই এর জন্যে দায়ী। —মাসিমা এবার দৃঢ় গলায় কথাটি বললেন।

আমি মোটেই দায়ী নই, সব মিথ্যে। —আমিও তখন রীতিমতো প্রতিবাদের সুরে বলে উঠলুম।

সত্যি কি মিথ্যে তা হ'লে কোর্টে উঠেই তা প্রমাণ হবে। তুমি বললেই তো আর মিথ্যে হয়ে যাবে না। মন্না নিজেই এজাহার দেবে। —তীব্রগলায় কথাগুলি বলে তিনি আর সেখানে দাঁড়ালেন না।

আমি কেমন যেন পাথর মতো দাঁড়িয়ে রইলুম। কি যে করবো, কি যে বলবো—ভেবে কূল কিনারা পেলুম না। মনে শুধু একটা কথাই বার বার ধাক্কা খেতে লাগলো, নন্দিতার এ সর্বনাশ কে করলে! তবে কি বীরেন সরকার? কিন্তু সে ছাড়া আর কে করবে? গত ন'দশ মাসে আমি তো আর কারুর সঙ্গে ওকে মেলামেশা করতে দেখি নি।

ভাবলুম, হয়তো এই জন্যেই সন্ধ্যের সময় মাসিমা ওর ওপর অমন নৃশংস অত্যাচার করেছেন।

নইলে তো অন্য কোনো সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। তা ছাড়া তখন বাইরে থেকে মাসিমার মুখে যে দু'চারটে কথা শুনেছিলুম, সেই কথাগুলোর যেন সম্পর্ক রয়েছে এইরকম একটা ব্যাপারের সঙ্গে।

কিন্তু সে যেমনই হোক আর যাই করুক না কেন, আমার নামে মিছিমিছি কেন এমন বদনাম দিয়েছে! কেন এমন চক্রান্ত ক'রে আমাকে একটা কলঙ্কের ভেতর জড়াতে চাইছে! আমাকে কি কোনো প্যাঁচে ফেলার উদ্দেশ্য রয়েছে তার! তা হলে কি সে উদ্দেশ্য?

একবার ভাবলুম, ওকে ডেকে জিগ্যেস করি। আবার ভাবলুম, ডেকে কি হবে? যাদের কাছে একবার যেকথা বলেছে, তা কি আর আমার সামনে এসে দাঁড়াবে, না দাঁড়াবার সাহস পাবে। তা ছাড়া ওই মেয়েটাকে সামনে ডেকে এসব কথা জিগ্যেস করতেও আমার এতটুকু স্পৃহা জন্মে না। কিন্তু কি যে করবো—তাও মাথা স্থির করে ভাবতে পারলুম না। শুধু মনে হতে লাগলো আমার পেছনে যেন একটা বিশ্রী চক্রান্ত রয়েছে। এই চক্রান্ত থেকে আমাকে যেমন করেই হোক মুক্ত হ'তে হবে।

সেদিন সারারাত অন্ধকার ঘরে চৌকির ওপর ব'সে আমি এইসব কথা ভাবতে লাগলুম। ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত মুক্তির একটা পথও খুঁজে পেলুম। এবং পাওয়ামাত্র আর কোনো দ্বিধা না ক'রে তাড়াতাড়িতে শুধু আমার সুটকেসটি একটু গুছিয়ে নিলুম। তারপর বাইরের দিকের দরজাটি নিঃশব্দে খুলে সেই অন্ধকারেই বেরিয়ে পড়লুম।

*

মনে আমার একটি বিস্ময় আর দ্বিধাদ্বিধা নিয়ে সেই গ্রাম ছেড়ে চলে আসবার পর দশটি বছর পার হয়ে গেছে। আসার পর প্রথম প্রথম যখনই আমি সেইসব কথাগুলো ভাবতুম তখনই সেই বিস্ময় আর দ্বিধাদ্বিধা সমস্ত মন জুড়ে ছেয়ে থাকতো। নন্দিতার ওপর মনে যে দুর্বলতা ছিল, তা উবে গিয়ে তার বদলে জেগেছিল ঘৃণা, বিদ্বেষ। তারপর সেই ঘৃণা আর বিদ্বেষও না জানি মন থেকে কবে মুছে গিয়েছিল। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম তাকে।

আজ রেডিওতে হঠাৎ গানটি শুনে দশ বছর আগের সেই দিনগুলির কথা মনে পড়ে গেছে। গান শেষ হয়ে যাওয়ার পরও তার রেশ মন থেকে মুছছে না। গানের সুর মনে যেন কি এক যাদুকরী আবেশ ছড়িয়ে দিয়েছে। আবিষ্ট হয়ে আমি সেই সব দিনগুলির কথা ভাবছি। মনে আজ আর কোনো ঘৃণা বা বিদ্বেষ নেই। নন্দিতার ওপর কেমন এক মায়া আর সহানুভূতিতে মনটি ভ'রে উঠেছে। এখন মনে হচ্ছে যেন ওর সেই ভালোবাসায় কোথাও এতোটুকু খাদ ছিল না। ছিল না এতটুকু ফাঁকি।

রম্যাণি বীক্ষ্য

উৎকল পর্ব

(পুনরাবৃত্তি)

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

[একুশ]

মেঘের ডাকের সঙ্গে সমুদ্রের ডাকের অনেক প্রভেদ আছে। বর্ষার আকাশে মেঘ ঘনায়, বিদ্যুৎ চমকায়, মেঘ ডাকে। কখনও জোরে, কখনও আস্তে। যত জোরে বিদ্যুৎ চমকায়, মেঘও তত জোরে ডাকে। তার কত বিচিত্র শব্দ। কত অস্থির, কত দুরন্ত। সমুদ্রের অন্য রূপ। সমুদ্র সারাদিন ডাকে, সারাক্ষণ ডাকে, সমুদ্রের ডাকের কোন শেষ নেই। তার সুর এক, শব্দ এক, তার ডাক স্থির ও গম্ভীর। সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা এই ডাক শুনি, সমুদ্রের কাছ থেকে দূরে গিয়েও শুনি মনের কান দিয়ে। মেঘের ডাক বলতে কোন একটা বিশেষ সুর, আমাদের কানে বাজে না, কিন্তু সমুদ্রের ডাকের নামে হৃদয়ে দোলা লাগে, মন ভরে। সন্ধ্যাবেলায় সমুদ্রের ধারে বসে আমার এইসব কথা মনে আসছিল।

আজ আমাদের সারাদিন কেটেছে ভরপুরের মতো। পুরী থেকে সাক্ষীগোপাল। সেখান থেকে ভুবনেশ্বর। তারপর উদয়গিরি খণ্ডগিরি হয়ে বাড়ি ফেরা। পথে রামানন্দবাবুর সঙ্গে সেই গলাবন্ধ কোট পরিহিত ভদ্রলোকের বিবাদ হয়েছে। ইতিহাসের অনেক গল্প শুনেছি। আর রত্নাকে দেখেছি আরও কাছে থেকে। আরও নিবিড় ভাবে তাকে চিনবার সুযোগ সে দিয়েছে। সে আমার অন্তরঙ্গ হতে চায়, বন্ধুর মতো অন্তরঙ্গ, প্রিয়ার মতো নয়। প্রিয় বন্ধু, প্রিয় বান্ধবী নয়। হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হবে দুই মানুষে, পুরুষ ও নারীতে নয়। তার কথাগুলিও আমার মনে পড়ল। সে বলেছিল, পুরুষের সব চেয়ে দুর্বলতা এই যে মেয়েদের সামনে তারা পুরুষ সাজে। পুরুষ ও নারীর মধ্যে শুধু মা বোন কন্যা ও প্রিয়ার সম্পর্ক নয় সব চেয়ে বড় সম্পর্ক হল বন্ধুর সম্পর্ক। অথচ এই সত্যটা আমরা সব সময় অস্বীকার করি। পুরুষে পুরুষে যদি বন্ধু হতে পারে, পারে মেয়েতে মেয়েতে, পুরুষে মেয়েতে কেন পারবে না!

দিল্লীর মিত্রার কথা আমার মনে পড়েছিল। চাওলাকে সে নাকি এই কথাই বলত। ওখানে আমাকে বলেছিল, চাওলাকে আমি ভালবাসি। কিন্তু বিয়ে করব না। সে কথা আমি ওকে জানিয়ে দিয়েছি।

ভারি স্পষ্ট কথা, ভারি আশ্চর্যের কথা। অন্য মেয়ে হলে নিজের মনকে এমন অকপটে মেলে ধরত না। লজ্জা পেত, হয়তো ভয়ও পেত। লোকে নির্লজ্জ ভাববে সেই ভয়। কিন্তু মিত্রা ভয়কে জয় করেছে। সংসারকে করছে উপেক্ষা। আমি তাকে শ্রদ্ধা করতে শিখালুম, বললুম, ভালোই যখন বাসেন, তখন বিয়ে করতে আপত্তি কী?

মিত্রা বলেছিল, তার সঙ্গে আমার মতের মিল নেই। সে ভাবে, ঘুঁটে কুড়নীর দুঃখই দুঃখ,

রাজকন্যার দুঃখ দুঃখ নয়। তার মন সমাজ-সচেতন। কিন্তু একটা মতবাদকে ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে আর একটা মতবাদের ভারে সে বেঁকে গেছে। লোকটা এখন আর সুস্থ নয়।

চাওলার পরিচয় আমি আগেই পেয়েছিলুম। মিত্রা হয়তো সত্যি কথাই বলছে। কিন্তু এই প্রত্যাখ্যান আমাকে বিস্মিত করেছে। মনের মিলটাই বড় কথা, মতের মিল নয়। মতের মিল হয়েও মনের মিল হয় না, কিন্তু মনের মিল হলে মতেরও একদিন মিল হতে পারে। মতের মিল নেই অথচ সারাজীবন সুখে সংসার করলেন, এমন দম্পতি সমস্ত দেশে আছেন। তবু আমি প্রতিবাদ করি নি। শুভাকে যা বলেছি, সেও প্রতিবাদ নয়।

অন্ধকারে সমুদ্র আর আকাশ মিশে গেছে। স্থির গম্ভীর সমুদ্র, তার ডাকও উদাত্ত গম্ভীর। চোখ বন্ধ করে আমি এই ডাক শুনি। এই ডাকে আমি আমার জীবনের ধ্বনি শুনতে পাই। সে ধ্বনি মেয়ের মতো অস্থির নয়, বিচিত্র নয়। বেলাভূমির উপর শুধু একটু উচ্ছলতা আছে, একটু হাসি। তার পরেই শান্ত সমুদ্র অকূল অনন্ত। তার অবিশ্রান্ত ধ্বনিতে আমি জীবনের গান শুনি।

স্বাতির কথা মনে পড়ে। মিত্রার মনোভাব স্বাতি সমর্থন করে না, শুভারও করবে না। সে বলে, হৃদয় কি তিলে তিলে দেবার জিনিস, না একবার দিয়ে আবার ফিরিয়ে নেওয়া যায়! বন্ধুতা বাহিরের সম্পর্ক, হৃদয়ের সম্পর্ক যায় না অস্বীকার করা। কয়েকটি আনন্দের দিনকে আমি পথের সঞ্চয় রূপে গ্রহণ করতে চেয়েছিলুম। বলেছিলুম, এই দিনগুলি আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে রইল।

বিস্মৃত প্রদোষে
হয়তো দিবে সে জ্যোতি,
হয়তো ধরিবে কভু নাম-হারা স্বপ্নের মূরতি।

স্বাতি আমাকে কঠোর ভাষায় ধিক্কার দিয়েছে,—ভুল। এ দুর্বলের মনোভাব। অন্তর খেতে না পেয়ে তাকে টক ভেবে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা। আনন্দের মুহূর্তকে ধরে রাখবার চেষ্টাতেই তো পৌরুষ।

তার পর?

তারপর তার প্রিয় কবি ব্রাউনিঙের মতো আমি তার গলায় চুল জড়িয়ে তাকে হত্যা করতে পারি নি। কিন্তু সে বলেছিল who knows but the world may end to night? আজ রাতেই যে পৃথিবীর শেষ হবে না কে জানে!

কিন্তু তার ইচ্ছায় পৃথিবীর শেষ হল না, অথচ আমার অনিচ্ছায় আমাদের সম্পর্কের শেষ হয়ে গেল। সে বিয়ে করে বম্বে যাবে জো রায়ের ঘর আলো করতে, আর আমার উত্তরপাড়ার ঘর চির-জীবনের মতো অন্ধকার পড়ে থাকবে। এ কথা কি স্বাতির একবারও মনে হয় নি?

কেন হয় নি? জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা আজ মিথ্যা হয়ে গেছে। জীবনটারই যেন কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না।

স্বাতির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল দুর্ঘটনায়। বিপদে পড়ে তারা আমার সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। আমি এগিয়ে গিয়েছিলুম। তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে, আমি জানিয়েছি ধন্যবাদ। কিন্তু মনে মনে আমি যে বাঁধা পড়েছিলুম, তা বুঝতে পারি নি। বরং উল্টো বুঝেছি। ভেবেছি, স্বাতি নিজেই বাঁধা পড়েছে। ভাল লেগেছে ভাবতে, নিজের গৌরবে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি। কিন্তু পায়ের

নিচে যে ফোরা বালি ছিল বুঝতে পারি নি। ধীরে ধীরে সেই বালি সরে গেছে। জীবনটা আজ ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। নিরর্থক হয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের ডাক যে মিথ্যা, আমার তা জানা ছিল না। জীবন মিথ্যায় পৃথিবীটাই বুঝি মিথ্যা হয়ে গেল।

ছি ছি, এ সব কথা আবার কেন আমার মনে আসছে! এই ভাবনা কলকাতায় আমাকে পীড়া দিয়েছে। এই ভাবনার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই তো আমি এখানে পালিয়ে এসেছি। কোথাও কি আমি মুক্তি পাবো না!

না, আর ভাববো না স্বাতির কথা।

কিন্তু ও কে আসছে! ঋতা নাকি। বিচিত্র নয়। এই মেয়েটার সঙ্গে কোথায় যেন আমি স্বাতির মিল দেখতে পাচ্ছি। স্বাতির মতো ছেলেমানুষ, কৌতূহলিত, হাস্যোজ্জ্বলা। জীবনে কোন বেদনা আছে কিনা জানি নে, কিন্তু অন্তরের দিকটা সম্পূর্ণ আড়াল করে রেখেছে। নিজের কথা কারও কাছে বলে না, শোনেও না নিজের কথা। অপরকে নিয়েই সারাক্ষণ মেতে আছে।

ভেবেছিলুম, আমি পিছন ফিরে থাকব, তাকাবো না কোন দিকে। ঋতা যদি আমার কাছে এসে থাকে, একেবারে এগিয়ে আসুক। স্বীকার করুক যে সে আমার জন্যেই এখানে এসেছে। তবে আমি তার দিকে মুখ ফেরাবো। তা না হলে সমুদ্রের সৌন্দর্য দেখব দু'চোখ ভরে।

অনেকক্ষণ কেটে গেল, কিন্তু কাছে কেউ এল না। মুখ ফিরিয়ে দেখলুম, যে আসছিল সে আমার পিছন দিয়ে চলে গেছে। সে ঋতা নয়, সে অন্য কোন মেয়ে।

সন্ধ্যায় সমুদ্রবেলা নির্জন নয়। অনেকেই এমন করে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আমি কেন মেয়েটিকে ঋতা ভাবলুম, কেন মনে করলুম যে সে আমার কাছে আসছে। এও কি আমার কোন দুর্বলতা নয়।

স্বাতির সম্বন্ধেও আমি এইরকম ভাবি। সেই বিদেশ ফেরৎ ভদ্রলোককে আমি দেখি নি। মামীর কাছেই শুনেছিলাম যে স্বাতির বিবাহ স্থির হয়েছে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে। অগ্রাহ্যেই বিয়ে। মামার কোন উৎসাহ দেখি নি। আর কালীঘাটের কালীকেষ্ট হালদার যে মন্তব্য করেছেন, তা নিতান্তই অশ্লীল। স্বাতি নিশ্চয়ই তা শোনে নি। তবু তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রত্যাখ্যান যে করবে, আমি জানতুম। আমার কাছে সে ভদ্রলোকের সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছে, তা শ্রদ্ধার নয়। কোন অশ্রদ্ধার পাত্রকে বিয়ে করে সুখে সংসার করা সম্ভব নয়। এই বিয়ে ভেঙে গেছে শুনেও আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলুম। আমার মনে হয়েছিল, এ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত নেবার আগে স্বাতি হয় তো আমার কথাও ভেবেছিল। দিল্লীতে মামি যখন মামার সঙ্গে স্বাতির বিয়ের চেষ্টা করেছিলেন, তখনও আমার এই কথা মনে হয়েছিল। আমি ভাবতুম, এ বিবাহে স্বাতির সম্মতি নেই। স্বাতির আগ্রহের অভাবকে আমি নারীসুলভ লজ্জা বলে মনে করি নি, ভেবেছি এ তার মৌন আপত্তি। আমি উপস্থিত থাকতে আর কাউকে সে যেন পছন্দ করতে পারে না।

তারপর জো রায়। আমি তাঁকে পছন্দ করেছিলেন, কিন্তু স্বাতি করল না। এই কথা সে দৃঢ়ভাবে প্রচার করে দিয়েছিল। সৌরাষ্ট্রের মিঠাপুর থেকে জো রায়ের বাবার কথা ছিল কচ্ছে। কিন্তু এই পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হবার পর যেতে পারলেন না। মিঠাপুরে না নেমে সেদের ওখা বেটদ্বারকা, সেখান থেকে সোমনাথেই হয় তো যেতেন। কিন্তু স্বাতি তাঁকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিল।

খানিকটা অপৌরুষ নিশ্চয়ই প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু তাতে সে দ্বিধা করে নি। মায়ীর বন্ধুদিকেও ভয় পায় নি। তার ভর্ৎসনা মেনে নিয়েছে মাথা পেতে। এবারেও আমি ভেবেছিলুম যে আমার জন্যেই স্বাতি এ কাজ করেছে।

জো রায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ এইখানে শেষ হয়ে যায় নি। বম্বের মাদ্রাজের ফিরে আবার তার দেখা পাওয়া গিয়েছিল। একটা মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে এসেছিলেন। আমি দেখেছিলুম, কিন্তু স্বাতির দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করি নি। সে নীচতা আমার নেই বলে গর্ববোধ করি। স্বাতি দেখতে পেয়েছে কিনা জানতে পারি নি। দেখে থাকলেও সে আমার কাছে না দেখার ভান করেছে।

জো রায়ের মনে যে অপরাধ-বোধ ছিল তার প্রমাণ আমি পেয়েছিলুম। সেই মেয়েটিকে লুকিয়ে রেখে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। ঠিকানা জেনে নিয়ে পরদিন হোটেলে দেখা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

সকালবেলায় স্বাতি সবাইকে পুনায় টেনে নিয়ে গেল। জো রায়ের জন্য অপেক্ষা করতে কিছুতেই রাজী হল না। তার পরদিনও ভোর বেলায় আমায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল। বুঝতে আমার বাকি থাকে নি যে জো রায়কে সে এড়িয়ে যাচ্ছে। আমার পাশে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে সে দাঁড়াতে দেবে না।

এমন কথা বার বার কেন মনে হয়েছিল জানি না। এ বোধ হয় সকল পুরুষেরই দুর্বলতা। নিজেকে নায়ক ভাবতে পুরুষেরা বুঝি ভালোবাসে।

এখন মনে হচ্ছে, জো রায়ও এই কথা ভেবেছিল। স্বাতি যখন সহসা আমাকে কলকাতার গাড়িতে তুলে দিয়ে জো রায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াল, নিশ্চয়ই দাঁড়িয়েছিল, তখন জো রায় শুধু বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয় নি, ভেবেছিল এই তার প্রাপ্য ছিল। স্বাতি একটু দেরিতে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে।

কিন্তু আমি আমার ভুল বুঝতে পারলুম আরও অনেক দেরিতে। আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে আমি সমুদ্রের ডাক শুনেছি। এতদিন যে ডাক শুনছি জীবনের গভীরে, আজ তাকে মিথ্যা মনে হচ্ছে। জীবনটাই কি মিথ্যা হয়ে যাবে!

সহসা আমার গম্ভীরার কথা মনে হল। সেদিন এই স্থানটি বড় ভালো লেগেছিল। চৈতন্য মহাপ্রভুর স্মৃতিজড়িত এইখানে বড় শান্তির সন্ধান পেয়েছিলুম। কিন্তু তা উপভোগের সময় পাই নি। ইচ্ছা হল, সেই স্থানে খানিকটা সময় কাটিয়ে আসি। জীবনের কোন সত্য কি সেখানে নেই!

আমি উঠে পড়লুম।

(ক্রমশঃ

পুরানো দিনের নাট্যজগতের রঙ্গকথা ॥

বররুচি

মিনার্ভা থিয়েটারে অমৃতবাবুর 'শিরি ফরহাদ' ঐতিহাসিক নৃত্যশিক্ষক সাতকড়ি গাঙ্গুলি (কড়িবাবু) মহবুবের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। কোন একটি দৃশ্যে মহবুবকে 'হো হো' করে হেসে মঞ্চে ঢুকতে হত। রিহার্সালের সময় কড়িবাবুর সেই হাসি প্রাণের সঙ্গে বেরুতো না—যেন কাঠহাসির মত বোধ হত। কড়িবাবুও তা বুঝতে পারতেন। তিনি অর্ধেন্দুশেখরকে ধরে বসলেন, বললেন—"সাহেব, হাসিটা কিছুতেই ঠিক মত আসছে না। যাতে প্রাণ খুলে হাসতে পারি, হাসিটা স্বাভাবিক হয়, সেইটা আমায় শিখিয়ে দাও।"

অর্ধেন্দুবাবু, 'আজ শেখাবো', 'কাল শেখাবো' বলে দেরী করতে লাগলেন। কড়িবাবু অনেক-বার অনুরোধ করে শেষে হতাশ হয়ে তাঁকে আর কিছু বলতেন না। অর্ধেন্দুবাবু কড়িবাবুর অভিমানের কারণ বুঝেও যেন বুঝলেন না।

বাংলা থিয়েটারে প্রত্যেক নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নাট্যাচার্যকে এবং অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম বা নমস্কার জানিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করেন—প্রায় সব থিয়েটারেই এই রীতি এখনো চালু আছে। কিন্তু সেদিন কড়িবাবু অভিমানবশে অর্ধেন্দুবাবুকে নমস্কার করলেন না। অর্ধেন্দুবাবু বুঝলেন এবং মুচকে হেসে চুপ করে রইলেন।

যে দৃশ্যে কড়িবাবু মঞ্চে ঢোকবার আগে সেই 'হো হো' হাসিটা হাসবার চেষ্টা করছেন, সেই দৃশ্যে সেই সময় তিনি তাঁর বিপরীতদিকের উইংসে কি একটা শব্দ শুনে যেমন সেদিকে চেয়েছেন, অমনি দেখলেন, অর্ধেন্দুবাবু দিগম্বর বেশে অদ্ভুত ভঙ্গীতে সেই উইংস-এর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। কড়িবাবু সেই দৃশ্য দেখে হো হো করে হেসে উঠলেন আর তারপর সেইরকম হাসতে হাসতেই অভিনয় করে গেলেন। অভিনয় সত্যিই অপূর্ব স্বাভাবিক হল।

সেই দৃশ্যের অভিনয় শেষে ভিতরে ঢুকে কড়িবাবু ছুটে গিয়ে অর্ধেন্দুবাবুর পায়ের ধুলো নিলেন। অর্ধেন্দুবাবু তাঁর পিঠ চাপড়ে বললেন—"কেমন, প্রাণের হাসি শিখলি তো। বড় যে অভিমান করেছিলি।" (এই ঘটনাটি আমরা কড়িবাবুর মুখে শুনেছি।)

* * *

মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্রের 'মুকুল মুঞ্জরা' নাটকের অভিনয় হচ্ছে। অফিম্-খোর 'বরুণচাঁদ' বেশি অর্ধেন্দুশেখর 'ভজনরামের' সঙ্গে একটি দৃশ্যে অভিনয় করছেন এমন সময় কোথা থেকে একটা বিড়াল মঞ্চে ঢুকে পড়ল তারপর ছুটে অন্যদিকে বেরিয়ে গেল। হঠাৎ এই দৃশ্য দেখে কয়েকজন দর্শক উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল। তখনি অর্ধেন্দুশেখর সহ-অভিনেতাকে উদ্দেশ করে বললেন—"এই রে, বেরাল! ওরে ভজন, বুঝি সর্বনাশ হল—একে আমি আফিম-খোর মানুষ—আমার দুধটুকু বুঝি বেড়াল হতভাগা খেয়ে গেল। তাড়িয়ে দিয়ে আয় বাবা তাড়িয়ে দিয়ে আয়।"

এমনভাবে তিনি কথাগুলি বললেন যাতে অনেক দর্শক মনে করলে যে বুঝি বা তিনি নাটকের কথাই বলছেন, সত্যিই বোধ হয় বিড়ালে দুধ খাবার ব্যাপার নাটকে আছে।

* * *

কথার পিঠে সঙ্গে সঙ্গে কথার জবাব দেবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল অর্ধেন্দুশেখরের। একদিন তিনি মিনার্ভা থিয়েটারে সকালবেলা তেল মেখে স্নান করবার জন্যে চৌবাচ্চার দিকে যাচ্ছেন এমন

সময় এক ভদ্রলোক ব্যস্তসমস্তভাবে তাঁর সামনে এসে বললেন,—"এই যে স্যার, কেমন আছেন?" সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধেন্দুশেখর সর্বাঙ্গ কুঁকড়ে মুখ বেঁকিয়ে ক্ষীণ স্বরে বললেন,—"উঃ! বড্ড জ্বর।" ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, "সে কি মশাই! জ্বর হলে কেউ কি এভাবে খালি গায়ে তেল মেখে চান করতে যায়! জ্বর, কি বলছেন?" অর্দ্ধেন্দুশেখর তখন আবার সহজভাবে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি তো কিছু বলি নি মশায়, আমি তোকা তেল মেখে চান করতে চলেছি, আপনিই হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন,—"কেমন আছেন।" যেন আমি ছ'মাস রোগে পড়েছিলুম, এইমাত্র বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছি।"

ভদ্রলোক অপ্রস্তুতের একশেষে।

* * *

মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের মুকুল-মুঞ্জরা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। বরণচাঁদ বেশী অর্দ্ধেন্দুশেখর দাঁড়বাঁধা সুবেশকে রাজার সামনে এনে বলছেন,—"প্রাণনাথকে প্রেমডুরিতে বেঁধে টানাটানি করছি।" রাজা বললেন —"আরে, এ বলে কি!—ভাঁড় না কি?" অর্দ্ধেন্দুশেখর তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে বললেন,—"মহারাজ, ভাঁড়? না, অত বড় নই, আমি ছোট একটি খুরি।"

* * *

বাংলা রঙ্গালয় যাঁরা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর ভাই কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেকালে একজন নামকরা অভিনেতা ছিলেন। বেঙ্গল থিয়েটারে 'মেঘনাদবধ' নাটকে তিনি মেঘনাদের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। একরাত্রে যুদ্ধযাত্রার সময় মন্দোদরীর কাছে বিদায়-দৃশ্যে মা-কে প্রবোধ দেবার জন্যে মেঘনাদ-বেশী কিরণবাবু—"কেন মা ভয়াও তুমি রাঘবে লক্ষ্মণে রক্ষোবৈরী" বলে এমনই সবেগে খাপ থেকে তলোয়ার বার করলেন যে মন্দোদরীর হাতের তাবিজের সুতো কেটে গিয়ে সেটা স্টেজে পড়ে গেল।

অভিনয়ের শেষে ভিতরে গিয়ে মন্দোদরী খুব রাগ করে বলতে লাগল—"আর আমি থিয়েটার করতে চাই না। খুব হয়েছে। আজ আর একটু হলেই হাতখানা উড়ে যেতো।"

এমন সময় কিরণবাবু হাসতে হাসতে এসে বললেন—"দেখলে তো হাতের তাবিজ, গয়না কাটলো, কিন্তু গায়ে আঁচড়টি লাগল না।"

* * *

কিরণবাবুর মেজদা নগেন বাঁড়ুয্যেও নামকরা অভিনেতা ছিলেন। একবার দুই ভাই একসঙ্গে নেমেছেন। "নন্দ-বংশোচ্ছেদ" নাটকে আছে রাজকুমার নন্দ আর মন্ত্রী শকটার ছেলে বিজয়বল্লভ। দু'জনে অসিযুদ্ধ করে এবং শেষ পর্যন্ত নন্দ আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। নগেনবাবু বিজয়বল্লভ আর কিরণবাবু নন্দ সেজেছেন। অসিযুদ্ধের দৃশ্যে দু'জনে তলোয়ার ঘোরাচ্ছেন। হঠাৎ কিরণবাবুর এমন ক্ষত্রিয়ভাব দেখা দিল যে তিনি বীরবিক্রমে লড়াই চালাতে লাগলেন—তাঁকে যে পড়তে হবে তা তাঁর খেয়ালই রইল না। দর্শকরা খুব উৎফুল্ল। লড়াই থামছে না। তখন থিয়েটারের কর্তৃপক্ষরা উইংসের পাশ থেকে চাপা গলায় বলতে লাগলেন—"কিরণ পড় পড়, বড্ড দেরী হচ্ছে।" কিন্তু কে শোনে সে কথা? তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে কিরণবাবু বললেন—"তলোয়ার খেলায় মেজদা আমার সঙ্গে পারে না কি।" অবস্থা সঙ্গীন দেখে নগেনবাবু চুপি চুপি বললেন—"আমিই হার মানছি ভাই। তুই এবার পড়।"

তখন কিরণবাবু বিজয় গৌরবে উৎফুল্ল হয়ে ধরাশায়ী হলেন।

অক্ষয় চক্রবর্তী সেকালের একজন ভাল কৌতুক-অভিনেতা ছিলেন। অমর দত্তের ক্লাসিক থিয়েটরে অভিনয়কালে অক্ষয়বাবু যাত্রার দলে প্রবেশ নিখে দিতেন, শুধু তাই নয়, তাদের শিখিয়ে পড়িয়েও দিয়ে আসতেন। এজন্যে মাঝে মাঝে তাঁর কামাই হোত। এদিকে অমর দত্ত এই ধরণের কামাই-করা বরদাস্ত করতেন না। কয়েকদিন কামাই-এর পর অক্ষয়বাবু এসে সাজঘরে সাজতে যাচ্ছেন, এমন সময় একজন অভিনেতা এসে বললে—"বাবু, আপনাকে ডিস্‌মিস করেছেন। আপনি সাজবেন না।" অক্ষয়বাবু তার কথায় কান না দিয়ে পোষাক পরতে লাগলেন। তখন অভিনেতাটি অমরবাবুর কাছে গিয়ে খবর দিলে। অমরবাবু বিরক্ত হয়ে নেপেন বোসকে দিয়ে কের বলে পাঠালেন। কিছুক্ষণ পরে নেপেন বোস ফিরে এসে বললেন—"আপনি ডিসমিস করলে কি হবে। অক্ষয় বললে—'আমি ডিসমিস্ নেব না।"

অদ্ভুত জবাব শুনে অমর দত্ত হেসে ফেললেন। অক্ষয় চক্রবর্তী বহাল রইলেন। গুণীর কদরজানতেন অমর দত্ত। আর অক্ষয় চক্রবর্তীকে বিলক্ষণ ভালও বাসতেন। অক্ষয়বাবুও তা জানতেন অন্তরে অন্তরে।

• • • •

সেকালের থিয়েটর-জগতে নানা ধরণের কৌতুকর ঘটনা ঘটেছে। তাঁরে গিরিশচন্দ্রের "চণ্ড" নামক নাটকের অভিনয়ে চিতোর ও রাঠোর পক্ষে বহু সংখ্যক সৈন্য মহাসমারোহে মঞ্চে নামতো। কর্তৃপক্ষরা যাকে পেতো তাকেই ধরে সৈন্য সাজিয়ে নামিয়ে দিত। উপেন্দ্র মিত্র তাদের শেখাতেন আর মঞ্চের ওপর পাছে বিশৃঙ্খলা ঘটে, এইজন্যে তিনি রাঠোর পক্ষের সৈন্যদের নাম 'রাঠোর' এবং চিতোর পক্ষের সৈন্যদের নাম 'চিতোর' রেখেছিলেন। যে সময় তিনি 'চিতোর' বলে হাঁকতেন সে সময় চিতোর পক্ষীয় সৈন্যরা এবং যখন তিনি 'রাঠোর' বলে হাঁকতেন তখন রাঠোর পক্ষীয় সৈন্যরা মঞ্চে প্রবেশ করত। তারা কেবল কে কোন্ পক্ষের সেইটুকু মনে করে রাখতো।

একদিন উপেনবাবুর বাড়ীতে এক গুড়ওলা গুড় বিক্রি করতে এসেছে। সে বলছে, পাঁচ আনা সের। উপেনবাবু বললেন, "ঠিক দর বল্, চার আনায় বেশী দেব না।"

গুড়ওলা শেষে করজোড়ে বললে,—"আজ্ঞে, আমি ঠিক দর বলেছি, আপনি গুরু, আপনার কাছে কি মিথ্যে কথা বলতে পারি।"

তার কথা শুনে চটে উঠে উপেনবাবু বললেন—"বেটা ছোটলোক, যা মুখে আসে তাই বলিস। আমি তোর গুরু!"

গুড়ওলা ভক্তিসহকারে বললে—"সে কি বাবু, আমায় চিনতে পারছেন না! আমি যে রাঠোর।"

• • • •

বেঙ্গল থিয়েটরে রাজকৃষ্ণরায় রচিত "অনলে বিজলী" নামে একটি নাটকের অভিনয় ঘোষিত হয়েছে।

একদিন সেই থিয়েটরের একজন অভিনেতার সঙ্গে পথে অমৃতলাল বসুর দেখা হল। অমৃতলাল বললেন—"হ্যাঁ হে, তোমাদের থিয়েটরে 'অনলে বিজলী' নামে নাটক হবে বিজ্ঞাপন দেখলাম, তা, বিষয়টা কি?"

অভিনেতা বললেন—"অনলে বিজলী নামটা নাট্যকার একটু ঘুরিয়ে দিয়েছেন, বিষয় হচ্ছে—সীতার অগ্নি পরীক্ষা।"

অমৃতলাল বললেন—"বটে! এইভাবে নাম বদলে বিষয়ের মাহাত্ম্য নষ্ট! দাঁড়াও, আমিও 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নিয়ে একখানা নাটক লিখছি, তার নাম দেব, "বগলে আংতমালা।"

—— —

। দুই ।

টাকা নেবার জন্যে লোক এলো না।

তার পরের দিনও না। তার পরের দিনও না।

জয়নারায়ণবাবু কি করবেন ভাবছেন, এমন সময় বেনারসীলাল সোজা তাঁর কোলিয়ারীতে এসে হাজির!

—'এসো, এসো, বোসো। আমি ভাবলাম তার পরের দিনই আসবে তুমি।'

হাসতে হাসতে মুখুয্যের চেয়ারটাতে বসলো বেনারসীলাল। বেনারসীলালের চেহারাটিও যেমন সুন্দর, হাসিটিও তেমনি।

জয়নারায়ণবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'বৌমা ভাল আছে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার আশীর্বাদে ভালোই আছে। সরমাকে তার কী ভাল যে লেগেছে—খালি খালি বলে আমাকে, নিয়ে চলো।'

—'আনলে না কেন?'

—'সময় পাই না। একা মানুষ, সব দিক দেখতে হয়।'

জয়নারায়ণবাবু জিজ্ঞাসা করলেন,—'কি খাবে বল!'

—'কোলিয়ারীতে কি খাওয়াবেন আপনি? কয়লা!'

এই বলে হাসতে লাগলো বেনারসীলাল।

—'এই দেখুন, আমার খাবার আমি সঙ্গে এনেছি।'

বেনারসীলাল তার পকেট থেকে রূপোর পানের বাটা বের করলে। নিজে একটি পানের খিলি মুখে দিয়ে বাটাটা বাড়িয়ে ধরলে জয়নারায়ণবাবুর হাতের কাছে।

—'আপনি খান দুটো। মিঠে পান। আপনার বৌমা সেজে দিয়েছে।'

পান খেয়েই জয়নারায়ণবাবু বললেন,—'ওঠো।'

—'তার মানে? উঠবো কেন?'

—'বা-রে, যাবে না? তোমার টাকা নেবে না?'

—'না, নেবো না।'

ছোট ছেলে যেমন করে আবদার ধরে, ঠিক তেমনি বুকের চোয়া করে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলো বেনারসীলাল।

জয়নারায়ণবাবু বললেন,—'ওরে বাবা, অত টাকা বাড়িতে রাখতে ভয় করে।'

বেনারসীলাল বললে,—'ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিন।'

—'ও কি আমার নিজের টাকা যে ব্যাঙ্কে পাঠাবো?'

—'হাঁ, ও আপনার নিজের টাকা।'

জয়নারায়ণবাবু বললেন,—'বুঝেছি, তুমি টাকা চাও না, কয়লা চাও।'

বেনারসীলাল বললে,—'চাই।'

—'কিন্তু কয়লা যে আমি আর দিতে পারছি না। আমার ম্যানেজারটি বলছে, এলোপাথাড়ি কয়লা আমি কাটতে দেবো না। কোলিয়ারী নষ্ট হয়ে যাবে।'

বেনারসীলাল বললে,—'বেশ তো, যখন খুশী দেবেন।'

—'কয়লার দর যদি পড়ে যায়?'

বেনারসীলাল বললে,—'আজকের দরে দরটা বেঁধে দিন। লোকসান হয় আমার হবে।'

কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেলেন জয়নারায়ণবাবু।

দর নেমে গেলে অনেক টাকা লোকসান হয়ে যাবে বেনারসীলালের। পাকা ব্যবসাদার মাড়োয়ারী। কি ভাবছে কে জানে। জয়নারায়ণবাবু কিন্তু এ-দোড়ে সম্বরণ করতে পারলেন না। বললেন,—'তা হলে এই কথা রইলো। আমি একটা রসিদ দিয়ে দিই।'

—'ইচ্ছে হলে দিতে পারেন। না দিলেও কোনও ক্ষতি নেই। আপনি আমার টাকা মারবেন না, আমি জানি।'

জয়নারায়ণবাবু ক্যাশিয়ারকে ডেকে একটা রসিদ করে দিতে বললেন। ক্যাশিয়ার চলে যেতেই জয়নারায়ণবাবু আবার বললেন,—'খুব ভালো করে ভেবে রাখো বেনারসী, টাকা শোধ হতে অনেকদিন লাগবে।'

বেনারসীলাল আবার তেমনি হাসি হেসে বললে,—'লাগুক্। আপনার সঙ্গে আমার একটা সম্বন্ধ থাকবে। টাকার রসিদ নিয়ে জয়নারায়ণবাবুকে আরও দুটো মিঠে পান খাইয়ে বেনারসীলাল উঠে দাঁড়ালো।

—'এই পথে আমাকে আসানসোল যেতে হবে। তারপর বাড়ি ফিরে স্নান করবো—খাবো।'

জয়নারায়ণবাবু নিজে সঙ্গে গিয়ে তাকে তার গাড়িতে তুলে দিলেন। মস্ত বড় সেই সুন্দর গাড়িখানা দাঁড়িয়ে ছিল গেটের সামনে।

বেনারসীলাল উঠে বললো। জয়নারায়ণবাবু বললেন, 'বৌমাকে একদিন এনো।'

—'মাকে নিয়ে আপনি একদিন আসুন না!'

—'আমারও সেই এক কথা। সময় পাই না।'

বেনারসীলাল বললে,—'বেশ তবে আপনার বৌমাকেই পাঠিয়ে দেবো। সে নিজে এসে নিয়ে যাবে।'

—'সেই ভালো।'

গাড়ি ছেড়ে দিলে। গুঁড়ো কয়লা-ছড়ানো রাস্তার ওপর দিয়ে গাড়িটা বেরিয়ে গেল চোখের সামনে। জয়নারায়ণবাবু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। ফিরে আসতেই দেখেন, ম্যানেজার বিনয় সেন কি যেন একটা খবর নেবার জন্যে আপিসে এসে ঢুকছেন। জয়নারায়ণবাবুকে দেখেই বললেন,—'নমস্কার!'

প্রতিনমস্কারের ধার ধারেন না জয়নারায়ণবাবু। বললেন,—'ম্যানেজারবাবু, এইখানে একবার বসুন তো দেখি!'

—'কেন?'

জয়নারায়ণবাবু বললেন,—'আমার মোটর কারটা যে কোম্পানীর কাছ থেকে কেনা হয়েছিল—তাদের চিঠিপত্রগুলো কোথায় আছে বলতে পারেন?'

বিনয়বাবু বললেন,—'আছে আমার আপিসে। কেন? কি হবে? গাড়িটা ভালো চলছে না?'

—'না হে না, তা নয়। গাড়িটা আমি বেচবো।'

বিনয় যেন একটু অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন।

—'এই তো সেদিন কিনলেন, এরই মধ্যে বেচে দেবেন গাড়িখানা?'

জয়নারায়ণ বললেন, 'আপনি কিনবেন? কিনুন না!'

বিনয় সেনের বুকে গিয়ে ঠক্ করে বাজলো কথাটা। আর কেউ না জানুক, জয়নারায়ণবাবু তো জানেন বিনয়বাবুর কি অবস্থা! একটি ছেলে গেছে বিলেতে পড়তে, একটি ছেলে টি-বি স্যানিটোরিয়ামে, তিনটি মেয়ে কলকাতায় থেকে কলেজে পড়ছে। মাইনে যা পান—এই সব খরচ চালিয়ে একটি পয়সাও তাঁর থাকে না। মাঝে মাঝে ধার করতে হয় আপিস থেকে।

অথচ সেই জয়নারায়ণবাবুই বলছেন কিনা—গাড়িটা কিনুন না!

বিনয়বাবু চেনেন জয়নারায়ণবাবুকে। চেনেন বেশ ভালো করেই। তাইতেই এই নিষ্ঠুরতম পরিহাসটাকে তিনি আমল দিলেন না। ম্লান একটু হেসে বললেন, 'গাড়ি আমি কিনবো, তবে এ-জন্মে নয়। তারপর বলুন, কি বলছিলেন।'

জয়নারায়ণবাবু বললেন,—'বলছিলাম সেই কোম্পানীকে বেশ ভাল করে ইংরাজীতে একখানি চিঠি লিখে দিন—আমার এই গাড়ীটা বদলে খুব ভালো একখানি গাড়ি আমাকে দিক। তার জন্যে আমাকে কত টাকা দিতে হবে জানায় যেন। গাড়ি কিন্তু ভালো হওয়া চাই।—বেনারসীলালের যেমন গাড়ি ঠিক সেই রকম।'

বিনয় সেন জিজ্ঞাসা করলেন,—'বেনারসীলালের গাড়ির নাম কি?'

—'নাম'? বলেই ভাবতে আরম্ভ করলেন জয়নারায়ণবাবু। চোখ বুজে বললেন,—'দাঁড়ান দাঁড়ান, নামটা সেদিন আমি দেখে নিয়েছি। সি. এ. টি.—উঁহু, বোধ হয় ডি. তারপর—'

অনেক চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু নামটা কিছুতেই মনে করতে পারলেন না। বললেন,—'ধোৎ তেরি! নাম টাম দরকার নেই। লিখে দিন—সব চেয়ে ভালো গাড়ি যা—তাই আমার চাই।'

বিনয় সেন বললেন, 'তার চেয়ে আপনি এক কাজ করুন। নিজেই চলে যান কলকাতায়। যে গাড়ি রয়েছে, এই গাড়িতে চলে যান, কোম্পানীর ঘরে এই গাড়ীটা রেখে দিয়ে নতুন গাড়িতে চড়ে চলে আসুন। নিজে দেখে শুনে পছন্দ করে নিয়ে আসুন, সেইটেই ভালো হবে।'

পরামর্শ মন্দ নয়।

জয়নারায়ণবাবু বললেন,—'সেই ভালো। তা হলে আর চিঠি লিখতে হবে না। যান আপনি।'

বিনয় সেন উঠলেন না। বললেন,—'বেনারসীলাল যখনই এসেছে তখনই আমি জানি।'

—'কী জানেন?' গর্জে উঠলেন জয়নারায়ণবাবু।

আত্মসম্মানে আঘাত লাগলো বিনয় সেনের। তবু তিনি বলতে ছাড়লেন না। বললেন,—'আপনি টাকা নিয়েছেন ওর কাছ থেকে।'

—'হ্যাঁ নিয়েছি। কয়লার এই চড়্‌তি বাজারে টাকা যে না নেয়, সে বোকা। এখন ফির আর আসবে ভেবেছেন?'

—'নাও যদি আসে, তবু আপনাকে চুপ করে থাকতে হবে। কয়লা আপনি দেবেন কোত্থেকে?'

জয়নারায়ণবাবু বললেন,—'দেখুন বিনয়বাবু, এই এতটুকু বয়েস থেকে কয়লা-খাদে নামছি, কয়লাকুঠির দেখে আমার জন্ম, কয়লা কোত্থেকে দেবো আমি জানি।'

বিনয় সেন বললেন,—'যেখান থেকে দেবেন ভাবছেন, সেখানে হাত দেবেন না। তিন নম্বরে পিলারগুলো কেটে নিয়েছেন, বাকি আছে চালের কয়লা। এখন ও পালের খুঁটি সরিয়ে নিয়ে চাল বাড়াই করবেন না, বিপদ হতে পারে।'

জয়নারায়ণবাবু বললেন,—'তা হলে কি আপনি বলতে চান—চালের কয়লা চালেই থাকবে? চার নম্বরের হাজার হাজার 'পিলারে' হাত দেবো না?'

বিনয় সেন মাথা নেড়ে বললেন,—'আজ্ঞে না। এখনও অনেক কয়লা আছে আপনার এই কলিয়ারীতে সারাজীবনেও যা কেটে আপনি শেষ করতে পারবেন না। কয়লার দর বেড়েছে সত্যি, এখন আপনার ইচ্ছে করছে—সব কয়লা একসঙ্গে যদি তুলে ফেলে বেচে দিতে পারেন তো অনেক টাকা আপনার ব্যাঙ্কে জমে যাবে। কিন্তু তা হয় না জয়নারায়ণবাবু। এর একটা নিয়ম আছে। আপনি সেটা জানেন না বলেই এই কথা বলছেন। আমাদের সেটা পড়তে হয়েছে, শিখতে হয়েছে।'

'আপনি জানেন না'—এই কথাটা বলে ফেলেছেন বিনয়বাবু। জয়নারায়ণবাবু সব সহ্য করতে পারেন, কিন্তু কয়লাকুঠি সম্বন্ধে তিনি কিছু জানেন না—এ-কথা সহ্য করবার মত ধৈর্য্য তাঁর নেই। তক্ষুনি তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'রাখুন মশাই আপনার বই পড়া বিদ্যে। ওই তো মাড়োয়ারী, ভাটিয়া—ওরা সব গপাগপ কলিয়ারীগুলো কিনে ফেললে—চাল বাড়াই করলে, পিলার কাটিং করলে, আবার নতুন জায়গাতে কাজও করছে। কী হয়েছে ওদের শুনি? আপনি শুধু ভয়েই মরছেন। পুব-বেঙ্গে বাড়ি, বাপ-চোদ্দপুরুষ কোলিয়ারী কখনও চোখেও দেখেনি, মোটা মাইনে পাবেন বলে মাইনিং পাশ করে ম্যানেজার হয়েছেন, কলিয়ারীর মর্ম আপনি কি বুঝবেন?'

বিনয় সেনের ধৈর্য্য অপরিসীম। জয়নারায়ণবাবুর এত অপমানেও তিনি বিচলিত হলেন না। তিনিও উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'কতকগুলো পালের খুঁটির আর কিছু সহজলভ্য কয়লার লোভে তিন নম্বরের চাল-বাড়াই যদি করেন, মাথার ওপরের সব জায়গাটা ধসে পড়বে। কতোখানি জায়গা জুড়ে কী ভয়াবহ কাণ্ড হবে একবার ভেবে দেখুন।'

জয়নারায়ণবাবুও হটবার পাত্র নন। বললেন,—'ভেবে দেখবার কিছু নেই। আর কারও ধসে পড়লো না, আমারই পড়বে!'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনারই পড়বে! ওখানকার মাথার ওপর পাথরের 'লেয়ার' নেই, নরম মাটি। তার ওপর চার নম্বর গাদেই। ডিনামাইট দিয়ে পিলারের কয়লাগুলো আপনি ছেড়ে নেবেন আমি বুঝতে পারছি। আপনার কোলিয়ারী খুব অপরিষ্কার। ময়লায় আর কয়লায় মিশে গ্যাস হবে। ভগবান না করুন, সেই গ্যাসে আগুন যদি একবার ধরে, এত বড় কোলিয়ারী আপনার পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে।'

জয়নারায়ণবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন।—'এই সব অলুক্ষণে কথা আপনি আমাকে শোনাচ্ছেন?'

—'শোনানো আমার কর্তব্য তাই শোনালাম।'

জয়নারায়ণবাবু বললেন,—'তারি আমার কর্তব্যজ্ঞান! ভীতু কোথাকার! ভয়েই মলো!'

বলতে বলতে এগিয়ে গেলেন তিনি। এগিয়ে যেতে যেতে একবার পিছন ফিরে তাকালেন। সোনা-বাঁধানো লাঠিটা চেয়ারের গায়ে নামিয়ে রেখেছিলেন। সেইটে নেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে বললেন,—'আমার কোলিয়ারীতে আগুন লাগলে আপনি থাকবেন কোথায়? আপনাকেও তো পুড়ে মরতে হবে সেই আগুনে।'

মিষ্টার সেনের চোখ-মুখ তখন আগুনের মত গরম হয়ে উঠেছে। আর তিনি পারলেন না ধৈর্য ধরে থাকতে। টেবিলের ওপর পড়েছিল কোলিয়ারীর নাম ছাপা চিঠি লেখার প্যাড্। সেইটে টেনে নিয়ে বললেন,—'তার আগেই আমি এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি।' এই বলে হুকুমি একটা 'রেজিগ্‌নেশন লেটার' লিখতে বসে গেলেন।

জয়নারায়ণবাবু এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন,—'কি লিখছেন?'

জবাব দিলেন না বিনয়বাবু। লেখা শেষ হলে কাগজটা প্যাড থেকে ছিঁড়ে নিয়ে জয়নারায়ণবাবুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, —'এই নিন্। আমি ছেড়ে দিলাম চাকরি। আপনি লোক দেখুন।'

জয়নারায়ণবাবু চোখ পাকিয়ে তাকালেন মিষ্টার সেনের দিকে।—'আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?'

—'আজ্ঞে না। আপনাকে ভয় দেখাবার মত স্পর্দ্ধা আমার নেই।'

এই বলে চলে যাচ্ছিলেন তিনি। জয়নারায়ণবাবু বললেন,—'চাকরি-বাকরি কোথাও পেয়েছেন নাকি? এদিকে তো শুনি—মাইনে যা পান তাতে আপনার খরচ চলে না!'

কোনও জবাব দিলেন না মিষ্টার সেন।

—শুনুন!

মিষ্টার সেন ফিরে দাঁড়ালেন।—'কী বলছেন?'

জয়নারায়ণবাবু বললেন,—'হট্ করে ছেড়ে দিলেই হলো? আমি এখন হাতে হাতে লোক কোথায় পাবো?'

—'এক মাসের সময় দিয়েছি। পড়ে দেখুন।' বলেই তিনি চলে গেলেন।

কথাটা কিন্তু জয়নারায়ণবাবুর কাছে যেন বিদ্রূপের মত শোনালো। কারণ তিনি যে ইংরেজি পড়তে পারেন না বিনয় সেন তা বেশ ভালো করেই জানেন।

সংবাদটা পৌঁছে গেল বেনারসীলালের কানে।

জয়নারায়ণবাবু নিজেই পৌঁছে দিলেন। গাড়ি নিয়ে তার পরের দিনই তিনি কলকাতায়

যাচ্ছিলেন। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড থেকে হঠাৎ গাড়িটা ঘুরিয়ে তিনি বেনারসীলালের গদীর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন।

বেনারসীলাল ভেবেছিল বুঝি তিনি টাকার কথা কিছু বলতে এসেছেন। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনও কথাই তিনি বললেন না। শুধু বললেন,—'আমার কলিয়ারীর জন্যে ফার্স্ট ক্লাস একজন ম্যানেজার দেখে দিতে পারবে?'

—'কেন? যিনি রয়েছেন তিনি কি থাকবেন না?'

জয়নারায়ণবাবু বললেন,—'না।'

বেনারসীলাল জিজ্ঞাসা করলে,—'কবে চাই?'

মিথ্যা কথা বললেন জয়নারায়ণবাবু। বললেন,—'বিনয় সেনকে আমি এক মাসের নোটিশ দিয়েছি।'

বেনারসীলাল বললে,—'দেখি চেষ্টা করে। না পাই তো কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দেবো।'

'আমি তা হলে নিশ্চিন্ত হয়ে রইলাম।' এই বলে তিনি ড্রাইভারকে বললেন,—'চলো'।

—'সে কি? গাড়ি থেকে নামবেন না?'

—'না। আমার খুব জরুরি একটা কাজ আছে।'

জয়নারায়ণবাবু চলে গেলেন। কোথায় গেলেন, কি জন্যে—কিছুই বললেন না। তিনদিন পরে কলকাতা থেকে ফিরে এলেন জয়নারায়ণবাবু।

দেখা গেল, গাড়ি তিনি কেনেন নি। যে গাড়িতে গিয়েছিলেন সেই গাড়িতেই ফিরে এলেন। কিনতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর মনে হয়েছে—বেনারসীলাল হয়ত কিছু ভাবতে পারে। আপাতত নতুন একজন ম্যানেজারের কথাটাই বেশি বিচলিত করেছে তাঁকে।

এখনকার মত কলিয়ারীর আইন-কানুন এত কড়াকড়ি তখন অবশ্য ছিল না, তবু অভিজ্ঞ একজন ম্যানেজার রাখা ছিল—মাইনস বোর্ডের আইন সঙ্গত দাবী।

বাড়ি এসে শুনলেন বেনারসীলালের স্ত্রী একদিন এসেছিল সরমাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে। সরমা কিন্তু যায় নি।

জয়নারায়ণবাবু জিজ্ঞাসা করলেন,—'যাস নি কেন?'

সরমা তার বাবাকে ঠিক বাঘের মতো ভয় করে। সামান্য কথারও ভালো করে জবাব দিতে পারে না। মাথা হেঁট করে ধীরে ধীরে বললে,—'তুমি বাড়িতে ছিলে না, যাবো কেমন করে?'

—'বৌমা আর কিছু বলে নি?'

সরমা বললে,—'বলেছিল। কোলিয়ারীর ম্যানেজারের কথা কি যেন বলেছিল, আমি ঠিক বুঝতে পারি নি।'

—'বুঝতে পারিস নি?' ধমক দিয়ে উঠেছিলেন জয়নারায়ণবাবু।—'আচ্ছা বোকা মেয়ে তো! যেমন মেয়ে আমার তেমনি জামাই। হাঁদা গঙ্গারাম! কপাল! কপাল! আমি যেমন অদৃষ্ট করে এসেছি।'

এই বলে আফশোষ করতে করতে তক্ষুণি তিনি বেনারসীলালের কাছে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন, কিন্তু যেতে তাঁকে হলো না। চাকর এসে খবর দিলে,—'দু'জন ভদ্রলোক এসেছেন।'

বাইরের প্রকাণ্ড বসবার ঘরে গিয়ে দেখেন—একজন বেনারসীলালের কর্মচারী, আর একজন অপরিচিত ভদ্রলোক।

কর্মচারী জয়নারায়ণবাবুকে প্রণাম করে বললে,—'আপনি ম্যানেজারের কথা বলেছিলেন, বেনারসীলালজি এঁকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

বিধি টাক-মাথা কুঁড়িওলা গোলগাল মানুষটি। গায়ের রং বেশ ফর্সা। কথাবার্তাও বলেন ভালো। প্রথমেই নমস্কার করে বললেন, 'আমাকে কি আপনার পছন্দ হবে? আমি হচ্ছি গিয়ে আপনার দেশোয়ালী মানুষ। কোট-প্যাণ্ট পরা সাহেব—সাচ্চা ম্যানেজার নই। আমার নাম গঙ্গাপদ সরকার। বাজিৎপুরে আমার বাড়ি।'

জয়নারায়ণবাবু বললেন,—'আপনি না করে'-কিস্তে কোথায় কাজ করতেন?'

—'আপনি দেখছি জানেন সবই।

—'কাছাকাছি গ্রামে বাড়ি আপনার—জানি সবই। আপনাকে দেখি নি কোনোদিন, এই যা।'

গঙ্গাপদবাবু বললেন,—'দেখবেন কেমন করে? এ-শালা চাকরির কি ছুটি আছে নাকি? করিয়াতেই জীবনটা কাটিয়ে দিলাম।'

জয়নারায়ণবাবু জিজ্ঞাসা করলেন,—'এখন কি করবেন ভেবেছেন? করিয়ার চাকরি কি ছেড়ে দেবেন?'

—'ছেড়ে দেবেন মানে? ছেলেপুলেরা বড় হয়ে গেছে, একটা নাতনির বিয়ে পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছি, এখন কি আর বাড়ির বাইরে পড়ে থাকা চলে? চাকরিটা ছেড়ে দেবো ছেড়ে দেবো করছিলাম, এমন দিনে ঠাকুর সাহায্য করলেন।'

বলেই তিনি আঙুল দিয়ে তাঁর বাঁ-চোখটা দেখালেন। বললেন,—'এই চোখে ছানি পড়লো। সেই ছানি কাটাতে গেলাম কলকাতায়। সেখানে আমার এক জেঠাইএর বাড়ি তো! বিনতলার বলরাম বোসের নাম শুনে থাকবেন নিশ্চয়ই। মস্ত বড় কাঠের কারবারী। ছানি কাটাতে মাসখানেক দেরি হয়ে গেল। ফিরে এসে দেখি আমার দশ বছরের চাকরি খতম্। অন্য একজন ম্যানেজার চাকরি করছে আমার জায়গায়। মাড়োয়ারী ভাটিয়া—সব সমান ধর্মাই, নিজের স্বার্থটি ছাড়া আর কিছু জানে না ব্যাটারা।'

বেনারসীলালের কর্মচারীটির দিকে তাকিয়ে বললেন,—'দেখিস্ বাবা, ফুট্ করে গিয়ে লাগিয়ে দিস্নি বেনারসীয়াকে।'

জয়নারায়ণবাবু জিজ্ঞাসা করলেন,—'বেনারসীলালকে আপনি চিনলেন কেমন করে?'

—করিয়া-কাতরাপগড়ে ওর তিনটে কোলিয়ারী রয়েছে না! তাই ওকেই বলেছিলাম, তোরা তিন পুরুষ আমাদের দেশে বাস করে তো বাঙালী হয়ে গেছিস, তোরই একটা কোলিয়ারীতে যে না হয় দিনগত পাপক্ষয় করি। তা বেনারসী বলেছিল—শুনে রাখলাম, পরে যদি কোনোদিন দরকার হয়, তো জানাবো। সেদিন দেখি তারই লোক গিয়ে হাজির। বলে, চাটুজ্যের কুঠীতে ঢুকে পড়ো সরকার। তোমার ঘর-বার দুই-ই হবে। এখন দেখুন, আপনার ইচ্ছে। তবে ভাবনা নেই আপনার। আমার কাট্ ক্লাস সার্টিফিকেট।'

জয়নারায়ণবাবু বললেন,—'বাইরে কত দেবেন বলুন।'

প্রবল বেগে ঘাড় নাড়লেন গঙ্গাপদ সরকার। বললেন,—'ওইটি বলবো না কিছুতেই। বেনারসীর সঙ্গে পরামর্শ করে আপনি আমাকে যা দেবেন তাই আমি হাত পেতে নেবো।'

শেষ পর্যন্ত বিনয় সেন যা পেতেন গঙ্গাপদবাবু তার আর্ধেকেরও কম টাকায় রাজী হয়ে গেলেন থাকতে।

[চলবে—]

পুরাতন পাতা

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

[অধ্যাত্ম জীবনের উদ্বোধন]

. . . একদিন হঠাৎ দেবেন্দ্রনাথ সংস্কৃত বইয়ের একটি ছেঁড়া পাতা তাঁহার সামনে দিয়া উড়িয়া যাইতে দেখিলেন। ঔৎসুক্যবশতঃ তাহা তখনি ধরিলেন। সংস্কৃত হইলেও তাহাতে যাহা লেখা ছিল তাহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তিনি শ্যামাচরণ পণ্ডিতকে তাহার অর্থ করিতে দিলেন এবং তখন ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কাজ করিতেন বলিয়া সেখানে তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন। বেলা দশটা হইতে সেখানে তাঁহাকে হাজির থাকিতে হইত এবং ক্যাশ বুঝাইয়া দিতে কখনও কখনও রাত্রি দশটা বাজিয়া যাইত। দ্বারকানাথ ঠাকুর যুবক দেবেন্দ্রনাথকে বিষয়কর্মে পাকা করিবার জন্য এই হিসাবের কাজে তাঁহাকে লাগাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সেদিন ক্যাশ বুঝাইয়া দিবার দেরি সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি তাড়াতাড়ি ছুটি লইয়া বাড়ি ফিরিলেন। শ্যামাচরণ পণ্ডিতের কাছে সেই পাতায় লেখা সংস্কৃত বাক্যের মানে জানিবার জন্য মনের মধ্যে একটা ছটফটানি উপস্থিত হইল। শ্যামাচরণ বলিলেন, তিনি তাহার মানে বুঝিতে পারেন নাই। তিনি অনুমান করিলেন যে, এসব ব্রহ্মসভার কথা ব্রহ্মসভার রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ হয়ত বুঝাইতে পারিবেন। বিদ্যাবাগীশকে ডাকা হইল। তিনি পাতা পড়িয়া বলিলেন—এ যে ঈশোপনিষদের পাতা।

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।

: ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত জগৎ আচ্ছাদন কর। তিনি যাহা দান করিয়াছেন তাহাই উপভোগ কর। অন্য কাহারো ধনে লোভ করিয়ো না।

দেবেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন,—"আমি মানুষের নিকট হইতে সার পাইতে যাচ্ছ ছিলাম, এখন স্বর্গ হইতে দৈববাণী আসিয়া আমার মর্মের মধ্যে সার দিল—আমার আকাঙ্খা চরিতার্থ হইল। আমি ঈশ্বরকে সর্বত্র দেখিতে চাই, উপনিষদে কি পাইলাম? পাইলাম যে, 'ঈশ্বর দ্বারা সমুদয় জগৎকে আচ্ছাদন কর।'...আমি যাহা চাই তাহাই পাইলাম। এমন আমার মনের কথা আর কোথাও হইতে শুনিতে পাই নাই। আহা! কি কথাই শুনিলাম—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—তিনি যখন দান করিয়াছেন তাহাই উপভোগ কর। তিনি কি দান করিয়াছেন? তিনি আপনাকেই দান করিয়াছেন। সেই পরমধনকে উপভোগ কর—আর সকল ত্যাগ করিয়া সেই পরমধনকে উপভোগ কর।.....এ আমার নিজের দুর্বল বুদ্ধির কথা নহে, এ সেই ঈশ্বরের উপদেশ।.....আহা, সেদিন আমার পক্ষে কি শুভ দিন—কি পবিত্র আনন্দের দিন। উপনিষদের প্রতি কথা আমার জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিতে লাগিল। উপনিষদকে অবলম্বন করিয়া আমি দিন দিন আমার গম্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।"

এই উপনিষদের ছেঁড়া পাতা যে কেমন করিয়া তাঁহার কাছে উড়িয়া আসিল, তাহা এক রহস্যের ব্যাপার। দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহন রায়ের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। রামমোহন রায়ের কোন উপনিষদগ্রন্থ তাঁহার বাড়িতে থাকা কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ২৯এ সেপ্টেম্বরের 'বেঙ্গল হরকরা'তে [Bengal Hurkara] প্রকাশিত Historical sketch of Vedantism নামক এক প্রবন্ধ ওই বছরের ১৭৯৯ শকের কার্তিকের তত্ত্ববোধিনীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে এক জায়গায় লেখা আছে—"The Tattwabodhini Sabha owes its birth to its founder's accidentally finding a flying sheet of Rammohan Roy's edition of the Isopanishad"—অর্থাৎ, তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন রায় কর্তৃক সম্পাদিত ঈশোপনিষদের এক উড়ন্ত ছিন্নপত্র দৈবক্রমে আবিষ্কার করায় এই তত্ত্ববোধিনী সভার উৎপত্তি হয়। ইহাকে দৈবঘটনা না বলিয়া উপায় নাই। এবং সেইজন্যই তিনি উপনিষদের বাণীকে দৈববাণী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। এই "দৈববাণী" তিনি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি তো মন্ত্রকে শুধু মনন করেন নাই, তিনি মন্ত্রকে দেখিয়াছিলেন।

• • •

কবি কীট্‌স হোমরের তর্জমা পড়িয়া এক নূতন কল্পলোকের প্রথম আভাস পাইয়া বলিয়াছিলেন যে, কোন জ্যোতিষীর দৃষ্টিতে একটা নূতন গ্রহ যখন হঠাৎ একদিন ভাসিয়া উঠে তখন তিনি যেমন অনুভব করেন, হোমর পড়িয়া তাঁহার তেমনি অনুভব হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে উপনিষদের আবিষ্কার সেইরূপ এক নূতন গ্রহের আবিষ্কারের মত। বোধ হয় তাহার চেয়েও বেশি। কারণ, গ্রহটা বাইরের বস্তু। এ একেবারে নিজের ভিতরকার উপলব্ধির কথাটাকে বাইরে একটা কোন প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা। উপনিষদ যেন তাঁহারি লেখা, তাঁহারি উপলব্ধির ভাষা! এ আবিষ্কারের মত আনন্দের আবিষ্কার আর কিছুই হইতে পারে না!

—অজিতকুমার চক্রবর্তী

এমিল জোলার কাছে একদিন এক তরুণী এসে প্রশ্ন করলেন,—আচ্ছা আপনিই বলুন সত্যিকারের প্রেম কি?

জোলা বললেন,—যে প্রেম মিথ্যে নয়, সেটাই সত্যিকারের প্রেম।

—অর্থাৎ?—বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলেন তরুণী।

—যে প্রেম জীবনের কোন কাজে লাগে সেটার কথাই বলছি।

—কি কাজে লাগে? তরুণী বললেন।

—অর্থাৎ যে প্রেম হাওয়ায় উড়ে বেড়ায় শুধু, চারিদিক রঙীন রেখে সংসারের ভিৎ পত্তন করে।

—সেটা আসবে কোথা থেকে?—তরুণী বললে।

—বিবাহের মধ্যদিয়ে,—গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন জোলা।

The study of literature nourishes youth, entertains old age, adorns prosperity, solaces adversity, is delightful at home, and unobtrusive abroad.—*Cicero.*

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

মার্সেল প্রুস্ত : একজন স্বপ্নতারাতুর ॥

সমীর সেনগুপ্ত

জয়সের মতো, প্রুস্ত-ও আবিষ্কার করেছিলেন যে চেতনা প্রবাহকে প্রতিফলিত করতে গেলে, প্রয়োজন হ'লে উপমা, রূপক, প্রতীক, চিত্রকল্প—এক কথায় যা কিছু কবিতার ভাষা, তার সবই গদ্যে একান্ত প্রয়োজনীয়। এইভাবে, মনোতলের আবহাওয়াকে পুনঃ প্রস্ফুটিত করতে গিয়ে জয়স এবং প্রুস্ত উভয়েই প্রতীকিতার অংশ ব'লে চিহ্নিত হয়েছেন। জয়সের মতো প্রুস্তের রচনাও স্বভাববাদীর সঙ্গে প্রতীকবাদীর রচনার এক আশ্চর্য বিবাহ বলে স্বীকৃত।

প্যারি শহরে প্রুস্তের জন্ম হয় আঠারো শো একাত্তর সনে। তাঁর পিতা ছিলেন খ্যাতিমান চিকিৎসক, মাতা বিখ্যাত ইহুদি পরিবারের কন্যা। পৈতৃক ধনাঢ্যতা তাঁকে অলস জীবনযাপনে অভ্যস্ত ক'রে তুলেছিলো। যুবক প্রুস্ত ছেলে ছেলে বেড়াতেন এক সাল থেকে অন্য সালঁতে, অভিজাত শ্রেণী, গুরুমণি মধ্যবিত্ত ও শিল্পীদের সাহচর্যে। ছোটবেলা থেকেই হাঁপানিতে ভুগতেন তিনি; এবং হয়তো অবচেতনে অসুস্থ হবার ইচ্ছাকে মনে মনে লালন করতেন। মা-বাবার অন্তহীন আশঙ্কায় এবং অসুস্থতা তাঁকে পুরোদস্তুর 'স্পয়েন্ট চাইল্ড' করে তুলেছিলো। অলস এবং দুখী যৌবন কেটেছে তাঁর, মাঝে মাঝে পড়াশুনো করেছেন হয়তো, গ্রামের বাড়িতে কাটিয়েছেন দীর্ঘ বসন্ত, এবং স্বাস্থ্য অনুমোদন করলে প্যারির বোহেমীয় জীবনও যে যাপন করেন নি এমন নয়। একটি ফকিথানায় আনাতোল ফ্রাঁসের সঙ্গে দেখা হলো তাঁর, তিনি প্রুস্তের প্রথম উপন্যাসের ভূমিকা লিখে দিলেন। এই বইয়ে নিখুঁত ছবি পড়েছে প্রথম যৌবনের প্রুস্তের—তাঁর কালের সবচেয়ে আত্মসচেতন ব্যক্তিত্ব, নন্দনতাত্ত্বিক, স্নব [এমন কি], উগ্রতাময়, অদ্ভুত, রক্তের প্রতিটি কণিকা সাহিত্যের মধ্যে নিমজ্জিত। এই সময়ের প্রুস্ত বিষয়ে আনাতোল ফ্রাঁস পরবর্তীকালে বলেছেন: 'তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি সম্পন্ন মনোহারী বুদ্ধিমান এক যুবক।'

মার উপর অত্যন্ত নির্ভর করতেন প্রুস্ত। শোনা যায়, তাঁর তীব্র সংবেদনশীলতা এই মহিলার কাছ থেকেই পেয়েছিলেন তিনি। মা মারা গেলেন উনিশ শো পাঁচ সনে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর বিবরবাস আরম্ভ হ'লো। বুলেভার্দ হুসমানের ছোট নির্জন আসবাববর্জিত কক্ষে [দেয়ালে কর্কের আস্তরণ দেয়া থাকতো যাতে বাইরের শব্দ ঘরে ঢুকতে না পায়] আশ্রয় নিলেন তিনি, আর সেখানেই, ১৯০৯ থেকে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর বিশাল উপন্যাসের অধিকাংশ রচিত হলো। ততদিনে হাঁপানি চেপে ধরেছে তাঁকে; শব্দ এবং আলোর প্রতি প্রচণ্ড অনীহা ছিল তাঁর, ঘুমাই করতেন বলতে গেলে প্রায়; প্রায়ন্ধকার ঘরে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে লিখেছেন অধিকাংশ লেখা, সমস্ত শক্তি লেখার পিছনে ব্যয় করেছেন। শেষ জীবনে লেখাই তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। অনুভূতির নিঃসঙ্গ দুর্গে স্বেচ্ছা-নির্বাসন নিলেন তিনি, নিজের সাহিত্যিক পরীক্ষাগারের জটিল যন্ত্র হয়ে বেঁচে রইলেন। গভীর রাতে, যখন প্যারি পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়তো, রাস্তায় পাহারাওয়ালা আর শেষ রাতে ফুর্তি-সেরে-ফেরা মাতাল ছাড়া আর কেউ থাকতো না, তখন মৃদু, গম্ভীর, সুদূর কোনো নিশাচর জীবের মতো তাঁর কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতেন প্রুস্ত। জনমানবহীন রাস্তায় রোগাক্রান্ত

দেহ টেনে-টেনে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর সাহিত্যকর্মের সমুখীন হ'তে গেলে এইসব তথ্য প্রতি মুহূর্তে মনে রাখতে হবে।

'অতীতের প্রতিভাস' নামক তাঁর সুবিশাল গ্রন্থ ষট মনক্রিফ-কৃত অনুবাদের সাহায্যে ইংরেজি-জানা জগতে প্রবেশ করেছে। মূল ফরাসিতে বইটি প্রকাশিত হয়েছিলো ষোলো খণ্ডে, ১৯১৩ থেকে ১৯২৭-এর মধ্যে; শেষ কয়েকটি খণ্ড প্রুস্ত দেখে যেতে পারেন নি। সাহিত্যিক ছাড়া অন্য কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে বইটি আঠারো শতকের অষ্টম দশক থেকে আরম্ভ করে প্রথম মহাযুদ্ধকাল পর্যন্ত ফরাসি সারস্বত ও উচ্চবিত্ত সমাজের একটি নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। বিভ্রম এবং রুচিশীল অতিকথনের সাহায্যে প্রুস্ত নির্ভুলভাবে দেখিয়েছেন যে সেই সমাজ ধ্বংসোন্মুখ—তার নিজের ভিতর এমন কোন অগ্নিকণা নেই যা তাকে পুনরায় উজ্জীবিত করতে পারে। প্রুস্তকে মরমী বলা হয়, এবং অন্তত আংশিকভাবে এই বিশেষণ সম্ভবত তাঁর প্রতি প্রযোজ্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর পিছুটান ছিল পুরানো বাইবেল-ঘটিত দৈব আধিপত্যে। তাঁর সমাজের দর্শক তিনি, কখনোই অংশভাক্ নন; সন্ত সিমন এবং বালজাকের মতো তিনিও চেয়েছিলেন তাঁর সমাজকে তাঁর সম্পূর্ণ সত্তা প্রতিফলিত করতে, এবং একই সঙ্গে পাশাপাশি তাঁকে দেখতে পাই জৈব প্রণয়ের বিশ্লেষকরূপে তাঁদালের পরে আর কেউ অমন গভীর ও সন্ধেহাতুর পদ্ধতিতে প্রেমের কথা বলেননি। তাঁদালের কেলাসন ধারণার চেয়ে আরো এক ধাপ এগিয়ে তাঁর অনুপস্থিতির ধারণা; তাঁর মতে, প্রেম অসুখের মতোই মানবদেহে সংক্রামিত হয়, তার জন্য বাইরের কোন মানুষ সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। এবং এইদিক থেকে সমকালীন আরো একজন ঔপন্যাসিকের সঙ্গে তাঁর নাম একত্র উচ্চারিত হ'তে পারে—তিনি টমাস মান। মান-ও বিশ্বাস করতেন যে প্রেম নামক অভিজ্ঞতা মৃত্যুর মতোই অজানিতে মানুষের মধ্যে ঢুকে যায়—তার উপলক্ষ হ'তে পারে যে-কোনো কেউ, তরুণী গণবধূ—এমন কি কোন বালক। তাঁদাল মনে করতেন, হ্রদের ধনির ভিতর মরে-যাওয়া গাছের ডালে-ডালে যেমন বিন্দু বিন্দু লবণ জমা হয়; তেমনি করে প্রেমপাত্র বা পাত্রীকে ঘিরে ঘিরে প্রণয়ের উত্তাপ কঠিন হয়ে জমে ওঠে। প্রুস্তের কাছে প্রেম ব্যক্তিগত কল্পনার আরো বহুরূপায়ণ। তা এতদূর কল্পনাশ্রয়ী যে এমন কি প্রেমপাত্রের উপস্থিতি পর্যন্ত তার কাছে বড়ো বেশি, বড়ো স্থূল। শারীরিক অনুপস্থিতি, অগম্যতা, প্রত্যাখ্যান, ঈর্ষা ও সংশয়ের দ্বারা উৎপন্ন কামনা, এই সবই প্রয়োজনীয় তাঁর কাছে, প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যেই এদের প্রয়োজন। প্রুস্তের ভাবনাকে এইভাবে খুলে দেখাতে গিয়ে হয়তো বড়ো বেশি স্পষ্ট করে ফেলা হ'লো। কিন্তু প্রুস্ত একে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে, জটিল করে ব্যবহার ক'রে দীর্ঘ এবং চমকপ্রদ আখ্যানভাগের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে অনেক দূরে নিয়ে গেছেন। এবং হয়তো একই কারণে, সমাজ বিশ্লেষণে অথবা ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যায়, প্রুস্ত যখন স্বজাতি-মৈথুনকে একটি প্রধান উপায় হিসেবে ব্যবহার করেন, তখনও—অন্তত বিষয়টিকে ব্যবহার করবার কায়দায়—তাঁকে জীদের তুলনায় অনেক হালকা বলে বোধ হয়। তার একটা কারণ হয়তো এই যে, তাঁর স্বজাতি-মৈথুনিক প্রধান চরিত্র ব্যারণ দ্য শার্লাস্ প্রধানত কৌতুক চরিত্র।

উপন্যাসের কথক এবং অন্যতম প্রধান চরিত্র মার্সেল-এর মধ্যে প্রুস্ত নিজে অনেকখানি বিধৃত আছেন। তবে কথক এবং লেখক—এরা কতদূর পর্যন্ত এক, এই প্রশ্ন অর্থহীন; যেমন অর্থহীন, প্রুস্তের পরিচিত মহলে অন্য চরিত্রগুলির প্রতিচ্ছবি খুঁজে বেড়ানো। কিন্তু আসল কিছুটা সাদৃশ্য যে আছে, এই তথ্য

উপন্যাসটিকে ব্যক্তিগত ও কাব্যিক হ'য়ে ওঠার মর্যাদা দিয়েছে, একটি সাধারণ স্মৃতিচারণ কখনোই যে সম্মান পেতে পারে না। সময় বিষয়ে প্রুস্তের ধারণা নিয়ে বহু সমালোচনা হয়েছে। তাঁর বিখ্যাত 'সহসা-উদ্ভূত স্মৃতি', যা অতীতের সঙ্গে তুচ্ছ একটি ঐন্দ্রিয়িক মিলের ফলে, আসলে যেটুকু ঘটেছিলো তার চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল ক'রে অতীতকে ফিরিয়ে আনে, সে-বিষয়ে সকলেই অবগত আছেন। যা একদা একটি বিবর্ণ বর্তমানের দ্বারা অধিকৃত ছিলো, লেখক তাকে ইচ্ছে করলে অতীতের আঁধার থেকে তুলে আনতে পারেন। তখন তা হ'য়ে ওঠে একটি নতুন ও বাস্তবতর বর্তমান—এবং কাজে কাজেই, আত্মার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ বিষয়ে তাঁর ধারণার সঙ্গে খানিকটা মিল পাওয়া যায় যুলিসিসের জয়েসের, আরো বেশি ক'রে পাই 'চতুরঙ্গে'র এলিয়েটের। কখকের মন তারিখের প্রতি বিন্দুমাত্র মনোযোগ না-রেখে একবার এগিয়ে আসে, আবার পিছিয়ে যায়। ঘড়ির মুখের উপর যে সময়ের মার্কা দেওয়া থাকে, তার প্রতি তার কোনো আস্থা বা আগ্রহ নেই। বাস্তিক ও মানসিক সময়ের মধ্যে যিনি প্রথম পার্থক্য করেছিলেন, সেই বের্গসঁর কথা মনে রেখে প্রুস্ত মৃত অতীত থেকে তাঁর আত্মার অভিজ্ঞতাকে খুঁড়ে তুলেছেন। যা হারিয়ে গেছে তার ভিতর থেকে চেতনার নির্যাস ছেঁকে তোলার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হ'লো প্রথম খণ্ডের বিখ্যাত সেই চা ও কেকের বর্ণনাটি। কেকের খণ্ডটি চায়ের পেয়ালায় ডুবোতেই একটি মিশ্রিত গন্ধ ছুটে এসে আঘাত করলো কখককে—এক প্রবল আনন্দের বন্যায় ভাসিয়ে দিলো। অবাক হ'য়ে তিনি ভাবলেন, এই গন্ধ এই স্বাদ, কী ক'রে এমন জটিল এক অনুভবকে নাড়া দিলো এরা :—"একথা পরিষ্কার যে আমার জিজ্ঞাসা সেই সত্য চায়ের পাত্রে নেই, আছে আমার নিজেরই মধ্যে……পেয়ালা নামিয়ে রাখলুম আমি, নিজের মনকে পরীক্ষা ক'রে দেখতে প্রস্তুত হলুম ……যে মুহূর্তে প্রথম-চামচে চা মুখে তুলে ছিলুম আমি, সেই মুহূর্তের চিন্তায় নেমে গেলুম……কাজটা, যা মনে হচ্ছে তার চেয়ে অন্তত দশগুণ কঠিন ……আর, যে স্বাভাবিক আলস্য কঠিন প্রচেষ্টা থেকে সর্বদাই বিরত রাখে আমাদের, প্রতিটি পরিশ্রম-সাপেক্ষ কাজ পরিহার করতে মিনতি করে, তা বারে বারে বললো আমাকে, 'নিরস্ত হও, খেয়ে নাও চা-টা, এবং যেসব ভাবনা সহজেই মনের উপর দিয়ে আনমনে গড়িয়ে যেতে পারে সেই সব আজকের দুশ্চিন্তা কিম্বা আগামীকালের আশা নিয়ে সময় কাটাও।' আর তারপর সহসা স্মৃতি ফিরে এলো, আমার মনে পড়লো, কোন স্বাদ কোন গন্ধের স্মৃতি আমাকে আকুল করে তুলেছিলো। সেই রোববার সকালে কোম্ব্রেতে—স্বাদটা হ'লো ম্যাদেলেঁর টুকরোর; সিসিলি লিওঁকে সুপ্রভাত জানাতে যখন সকাল বেলা তাঁর ঘরে যেতুম, একটুকরো দিতেন তিনি আমাকে—তাঁর সোনালি রঙের ভারতীয় চায়ে ভিজিয়ে" ('অতীতের স্মৃতিচারণ', ১৯৩৪ এ প্রকাশিত র‍্যাণ্ডম হাউস সংস্করণের প্রথম খণ্ড, ৩৪-৩৬ পৃষ্ঠা থেকে অনূদিত)। আর এইভাবে স্মৃতিকে যখন বন্দী করলো কখক, তখন সমস্ত অতীত প্রবল বন্যার মতো তার উপর ঝরে পড়তে লাগলো। "রাস্তার উপর সেই পুরানো, ধূসর রঙের বাড়ি, যেখানে থাকতেন সিসিলি; সেই বাড়ি অভিনয় মঞ্চের দৃশ্যপটের মতো ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো, বাড়ির পিছন দিকের উঠোনের সঙ্গে ধীরে ধীরে মিলিয়ে নিলো নিজেকে। আর বাড়ির সঙ্গে-সঙ্গে জেগে উঠলো সেই শহর, সমস্ত সকাল চুপুর সন্ধ্যা নিয়ে, সমস্ত শীত-গ্রীষ্ম-বসন্ত নিয়ে। আর প্রুস্ত আরম্ভ করলেন কোম্ব্রের কাহিনী, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শৈশবের কাহিনী। আর বলার ভঙ্গিতে এটাই প্রমাণ করলেন যে কোনো কিছুই হারায় না, সকল কিছুকেই ধরে রাখে স্মৃতি, লুকিয়ে রাখে সযত্নে, চায়ে ভেজানো একটুকরো কেকের গন্ধে, টুকরো একটি শব্দের উচ্চারণে, অথবা কোনো হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে, প্রেতায়িত আঁধার গহ্বর থেকে উঠে আসবে বলে।

আর সেই সঙ্গে, পরতে-পরতে ওঠে এক ধ্বংসোন্মুখ সমাজের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। তাঁর নায়ক সোহানের বহুবাঞ্ছিত স্মৃতিচারণে ছোট্ট সেই শহরের বর্ণনায়, অদ্ভুত প্রকৃতি পিসিমার কথায়, মায়ের প্রতি বালক-নায়কের অন্ধ ভালোবাসায়, সোহানের বিয়ে অধ্যায়ে, পরিভ্রমণে, আমরা দেখি লোকদের যৌবনে-জরায় -চিরন্তাপিত সময়ের কক্ষে কক্ষে। বের্গসঁ এবং ফ্রয়েডের চিন্তাকে নিজের উদ্ভাবিত রসায়নে মিলিয়ে নিয়ে সময়স্রোতকে যে অবিচ্ছিন্নতার ধারণায় আরোপ করেছেন তিনি, তা তাঁর রচনাকে স্বপ্নলব্ধ গল্পের মর্যাদা দানে করেছে। তাঁর গল্প বলার ভঙ্গির ভিতর থেকে সঠিক সময় সূত্র আবিষ্কার করা কঠিন, এবং অপ্রয়োজনীয়। সমস্ত বিষয়টিকে নিজের মনোমত ক'রে ফিরে সৃষ্টি ক'রে নিয়েছেন তিনি। দীর্ঘ এবং জটিল বাক্যবিন্যাসে তাঁর রচনাশৈলী ভারাক্রান্ত; তা তাঁর স্বচ্ছ ভঙ্গির পক্ষে একান্ত জরুরিও বটে।

'অতীতের স্মৃতিচারণে' ছাড়া আরো কিছু কিছু ছোট গল্প, নকশা, কবিতা ইত্যাদি ছিলো প্রুস্তের, যার বেশির ভাগ তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছিলো। কিন্তু ১৯৭১ সালে প্রুস্ত আর একবার সারা সাহিত্যজগৎকে চমকে দিলেন। তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে একটি অসমাপ্ত দীর্ঘ উপন্যাস খুঁজে পাওয়া গেলো। এ বইটি 'অতীতের স্মৃতিচারণে'র সাথে সাথেই লিখে চলেছিলেন তিনি, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর পঁচিশ বছর পর্যন্ত লোকেরা এর খবর জানতোনা। বইটি লেখা পুরানো ধরণের, এবং এর প্রায় সমস্ত মালমশলা 'অতীতের স্মৃতিচারণে' ব্যবহৃত হয়েছে। ১৯৫২'তে বইটি প্রকাশিত হবার পর প্রুস্ত বিষয়ে অনেক পুরানো ধারণা ভেঙে পড়লো। দেখা গেলো যে যুবক প্রুস্ত, যাকে উদ্দেশ ক'রে 'জব' ইত্যাদি বিশেষণ ছুড়ে দেয়া হতো, তার কতখানি ছিলো কাহিনীরচনার ক্ষমতা। এই বই প্রকাশিত হবার পর প্রমাণিত হ'লো যে প্রুস্ত ইচ্ছে করলে, তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণক্ষমতা ও রচনাশক্তির সমন্বয়ে পুরানো ধরণের উপন্যাস এত ভালো লিখতে পারতেন যে তা তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে গৃহীত হতে পারতো। কিন্তু তাঁর নিজস্ব প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন ব'লে 'জঁ সাঁতেরাল'কে তিনি স্বীকার পর্যন্ত করেননি, এর অস্তিত্বকে গোপন রেখেছিলেন। বইটি আত্মজৈবনিক, যদিও বোঝা যায় প্রুস্তের আন্তরিক চেষ্টা ছিলো যাতে রচনাটি পুরোপুরি কল্পিতকাহিনী ব'লে মনে হ'তে পারে। পুরো রচনাটিকেই তিনি অস্বীকার করেছিলেন; আমাদের সৌভাগ্য, নষ্ট করেন নি। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা প্রকাশিত হবার বহু পরে এই উপন্যাসটির পুনরুত্থান প্রুস্তকে বোঝবার এক দোসরি সুযোগ এনে দিয়েছে। তাঁর একনিষ্ঠ এবং পরিশ্রমী পাঠক এর মধ্যে অনেক কিছু খুঁজে পাবেন। অন্তত বোঝা যাবে, কী একাগ্র সাধনা ছিলো তার, কী প্রবল প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ লিখিত একটি তন্ময় রচনাকে আত্যন্তিক মনস্বিতায় রূপান্তরিত করবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি। একটি আত্মজীবনীর আত্মমনোজীবনীতে পরিবর্তিত হবার সম্পূর্ণ ইতিহাস তাতে লেখা আছে।

একথা প্রুস্ত সর্বদা অস্বীকার করতেন যে তাঁর উপন্যাসটি আত্মজৈবনিক; জীবনের ঘটনাসমূহকে তিনি ব্যবহার করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের এমন ভাবে পালটে দিয়েছেন যে তাদের আসল চেহারা চেনবার উপায় কোনো নেই। "আমার প্রয়োজনীয় সমস্ত মালমশলা আমি নিজে আবিষ্কার করেছি।" উপন্যাসের শেষ অংশে তিনি দেখিয়েছেন, কী ক'রে একজনের হাসির সঙ্গে আরেকজনের মুখ মিলিয়ে তিনি তৃতীয় একজন চরিত্রের জন্ম দিয়েছেন।

বাতিল উপন্যাসটি লিখতে যাত্ত যাকাকালীন একবার ভেনিসে গিয়েছিলেন প্রুস্ত, সেইখানেই

তিনি রাসিনের রচনা আবিষ্কার করেন। রাসিনের 'আমিয়েনদের বাইবেল' ও 'সেসাম ও লিলিজ' অনুবাদ করেন তিনি, এবং রাসিনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। অন্য যারা তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জর্জ এলিয়ট। পিতামাতার মৃত্যুতে এবং হাঁপানির টানে সম্পূর্ণ বন্ধী হলেন প্রুস্ত ; ১৯১৩ সালে বেরোলো 'সোয়ানের পথ', নিজব্যয়ে। যে সব প্রকাশকেরা তাঁর বই ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন বিখ্যাত 'নুভেল রেভ্যু ফ্রাঁসেজ'। তিনি ভেবেছিলেন তিনখণ্ডে উপন্যাস শেষ করবেন, কিন্তু তা ক্রমশই বেড়ে চললো। 'প্রস্ফুটিত লতাবিতানে' নামক দ্বিতীয় খণ্ড তাঁকে এনে দিলো গঁকার পুরস্কার এবং জনতার সবিস্ময় সম্মান। তৃতীয় খণ্ড বেরোলে দেখা গেলো উগ্র পাঠক সমাজ তাঁর অপেক্ষায় ব'সে আছে। উপন্যাসের শেষ অংশ তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে প্রকাশিত হয়, কিন্তু প্রুস্ত সেই বিরল ভাগ্যবানদের একজন, যিনি জীবিতকালেই জনতার স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। পরবর্তী য়ারোপীয় সাহিত্যে তাঁর প্রভাব, বিশেষ করে তাঁর 'সহসা-উদ্ভূত-স্মৃতি'র ধারণা অতি অল্পকালের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম যারা প্রুস্তের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন ভর্জিনিয়া উল্ফ্, এবং উলিয়ম ফকনর।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে মার্সেল প্রুস্তের মৃত্যু হয়।

জার্মানী থেকে চলে যাবার সময়ে জাহাজে আইনষ্টাইনকে সহযাত্রীরা পাগল বলেই ভেবেছিল।

মাথায় ঝাঁকড়াচুল, পোষাক-পরিচ্ছদ আলুথালু, আর প্রায় সব সময়েই বেহালা নিয়ে জাহাজের ডেকের একপাশে বসে আছেন।

কথাটা কাপ্তেনের কানে গেল। তিনি আইনষ্টাইনের কাছে এসে দাঁড়ালেন। —জাহাজের ডেকে পাগলামি করেন কেন? জানেন, এখনি আপনাকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে পারি। আপনার নামটি কি?

—আইনষ্টাইন।

—বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন?—তা' ঠিকই হয়েছে,—আপনার এবার ডেক থেকে সরতে হবে।

—কোথায়?

—জাহাজের সবচেয়ে ভাল ঘরে।

ভাষার প্রাঞ্জলতা ॥

'গিরিশচন্দ্র'

খ্যাতনামা পণ্ডিত ৺দুর্গা মোক্ষদাচরণ সামধ্যায়ী মহাশয় একদিন গিরিশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। নানা প্রসঙ্গের পর সাহিত্য-প্রসঙ্গ উঠিল। পণ্ডিত মহাশয় গিরিশচন্দ্রকে বলিলেন,—'আপনার রচনা এত সরল যে, স্ত্রীলোকের পর্য্যন্ত বুঝিতে কষ্ট হয় না—ইহাই আপনার ভাষার বিশেষত্ব, আমরা লিখিতে বসিলে ভাষাটা সংস্কৃতানুগামী হইয়া পড়ে—সাধারণে সহজে উপলব্ধি করিতে পারে না। কিরূপে প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা যায়—এ সম্বন্ধে আমায় কিছু উপদেশ দিতে পারেন?' গিরিশচন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—'আপনি পণ্ডিত লোক, আপনাকে উপদেশ কি দিব বলুন, তবে একটা কৌশল বলিয়া দিতে পারি।" পণ্ডিত মহাশয় সাগ্রহে বলিলেন—'কৌশল—সে কিরূপ?' গিরিশচন্দ্র বলিলেন,—'আপনার বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের সহিত যেরূপ ভাষায় কথা কহেন, সেইরূপ ভাষায় লিখিবেন; দেখিবেন—সে ভাষা বুঝিতে কাহারও কোন কষ্ট হইবে না এবং বারবার অভিধান খুলিবারও প্রয়োজন হইবে না।'

অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় রচিত
'গিরিশচন্দ্র', হইতে উদ্ধৃত।

প্যারিসের নির্জনপথে ডিসেম্বরের মধ্যরাত্রিতে পদব্রজে চলেছেন অ্যানাটোল ফ্রান্স। দূরত্ব বেশি নয়, তাই পায়ে হাঁটছেন তিনি।

একটা পার্কের পাশে আসতেই চাপা ক্রন্দনধ্বনি শুনতে পেলেন তিনি।

ব্যাপার কি জানবার জন্যে তিনি এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল এক দরিদ্র রমণী কোলে ছোট্ট এক শিশু নিয়ে শীতে কাঁপছে।

অ্যানাটোল ফ্রান্স তখনি নিজের ওভারকোটটি খুলে তার গায়ে জড়িয়ে দিলেন। আর পকেটে যা কিছু ছিল সব তার হাতে গুঁজে দিলেন।

রমণী আতঙ্কে বলে উঠল—আপনার যে এ শীতে কষ্ট হবে মসিয়ে।

অ্যানাটোল ফ্রান্স বললেন,—তোমার এই কথাগুলি আমার সকল কষ্ট দূর করবে বাছা।

ভবিষ্যতের বাংলা উপন্যাস ॥

অরবিন্দ পোদ্দার

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে একটি অভিভাষণে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, "এই অভিশপ্ত, অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুশ সাহিত্যের মত যেদিন সে (বাংলা সাহিত্য) আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ, দুঃখ, বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্যসাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব সাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।" বাংলা উপন্যাসের সম্ভাবনার প্রসঙ্গ আলোচনায় শরৎচন্দ্র এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, সেই সম্ভাবনা চল্লিশ বৎসর পর আধুনিক কালে কোন্ সৃষ্টিসম্ভারে রূপবান হয়ে উঠেছে বা আদৌ বিশ্ব-দরবারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে কিনা, তা ভাববার বিষয়।

রুশ সাহিত্যকে (অতি-সাম্প্রতিক কালের সোভিয়েট সাহিত্যের কথা বলা হচ্ছে না, টলষ্টয়-দোস্তয়েভস্কি পর্যন্ত রুশ উপন্যাসের যে বিবর্তন প্রবাহ তাই আমার পক্ষে স্মর্তব্য) পশ্চাৎপটে স্থাপন করে বাংলা উপন্যাসের আলোচনা ও মূল্যায়ন আজও এক সীমাহীন ধৃষ্টতা। বাংলা কেন, মানসিকতার অন্য অনেক ঐশ্বর্যে উদ্ভাসিত হলেও পৃথিবীর অন্যান্য প্রাগ্রসর দেশও এতাবৎ আমাদের দ্বিতীয় কোন টলষ্টয় উপহার দিতে পারেনি, যিনি মহত্ত্বের নিঃসংশয় আসনে প্রতিষ্ঠিত। টলষ্টয়ের 'ওঅর অ্যাণ্ড পীস্' উপন্যাসে মানুষের অন্তর্লোক ও বাহির বিশ্বের, তার প্রাত্যহিক ঘরকন্নার সীমা ও সার্বভৌম সত্তার যে পরিচয় উদ্ভাসিত, তার সহিত তুলনীয় দ্বিতীয় উপন্যাস পৃথিবীতে নেই। আর, মানবাত্মার অতলস্পর্শী রহস্যের সন্ধানে ডস্টয়েভস্কির প্রজ্ঞা-বিদীর্ণ জিজ্ঞাসা, আলো-অন্ধকারে সেই দুর্গম অভিসার আজও পর্যন্ত আমাদের অনায়ত্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই বিশে শতাব্দীর প্রথমপাদে ফরাসী রূপকার প্রুস্ত বিপর্যস্ত মানব চৈতন্যের বিশ্লেষণে যে অসামান্য নৈপুণ্য ও সাফল্য অর্জন করেছিলেন, সাহিত্যে অনুরূপ সফলতাও একান্ত বিরল। বাংলা উপন্যাসের সম্ভাবনার কথা আলোচনার কালে বিশ্ব-সাহিত্যের এই কীর্তি স্তম্ভগুলোর সম্মুখে আমাদের শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হয়, মনে সংশয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে, তাঁদের কালজয়ী রূপকর্মের পশ্চাৎপটে আমাদের রূপসৃষ্টির ঐশ্বর্য কতটুকু, কতটুকু তার সিদ্ধি!

তাই শুরুতেই আমরা অকপটে স্বীকার করে নিতে পারি, শরৎচন্দ্রের আশা এখনও পর্যন্ত দুরবগাহী স্বপ্নমাত্র, এক নিশ্বাসে বর্ণনীয় উল্লেখনীয় সিদ্ধি বাংলা উপন্যাসের পক্ষে এখনও অনায়ত্ত। বাংলা উপন্যাসের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে কয়েক বৎসর পূর্বে। সাহিত্যের বিচারবিভাগ সাতের পক্ষে এই সময়টা দীর্ঘ নয়; আধার আধুনিক জীবন প্রবাহের দ্রুত রূপান্তরশীল সত্তার পরিপ্রেক্ষিতে বরং রচনাশৈলীর বিস্ময়কর বিন্যাসের নিদর্শন সম্মুখে রেখে বলা যায় একশত বৎসর নিতান্ত অল্পও নয়। শতবর্ষের মধ্যে কোনো বাংলা উপন্যাসে যদি আমরা সমগ্র দেশের চিত্ত সংবেদনার কলরোল শুনতে পেয়ে থাকি, অথবা কোনো উপন্যাস যদি আমাদের জীবনের জটিল আবর্তকে মহাকাব্যের ভোতনায় সত্য করে প্রতিষ্ঠিত করে থেকে থাকে তো তাদের সংখ্যা যে নিতান্তই নগণ্য, তা বলাই বাহুল্য। এ ছাড়া, অধিকাংশে উপন্যাস বলে আখ্যাত রচনা নিছক গল্প-বলা কাহিনীর রূপান্তর মাত্র।

গল্প অবশ্যই উপন্যাস-কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য উপকরণ। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের চিন্তা কর্ম ও ভাবনা অতাত্বিক কাল-সচেতন, বিবর্তমান কালের উপলব্ধি দ্বারা ভয়ঙ্করূপে শাসিত। কোন্ ঘটনার পর কোন ঘটনা ঘটতে পারে বা ঘটে, কোন কথার পর কোন্ কথার অনুবর্তন, অথবা কোন্ ভাবনা কোন্ ভাবনার অনুসারী, তার একটি অস্পষ্ট বা অসংলগ্ন চিত্র এবং সময়ের পারম্পর্যের একটা নিশ্চিত বোধ আমাদের চৈতন্যে সর্বদাই উদ্ভাসিত থাকে। সেইজন্য আমাদের চলনে-বলনে-কথায়, অন্যের সহিত ব্যবহারে, আমাদের সর্ববিধ কর্মে কালস্রোতের নিয়ত বাধ্যমানতার চিহ্ন লক্ষণীয়। কিন্তু, আমাদের দিনলিপিতে সময়ের পারম্পর্য ছাড়াও অন্য অনেক উপাদান আছে যা মানব সত্তার ঐতিহাসিক বিবর্তনের জটিলতা, হৃদয়াবেগের বিচিত্র প্রক্ষেপ, অনুরাগ-বিরাগ প্রেমের সুকুমার প্রকাশের চিত্তর দিয়ে অন্তলাভ করেছে। মানবিক অস্তিত্বের ঐশ্বর্য থেকে আহরিত এমনি একটি সত্য হলো মূল্যবোধ বা প্রেয়সের চেতনা। আমাদের ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা কোন্ লক্ষ্য মণ্ডিত হলে তা মূল্যবান হয়ে উঠে, একটি অনুভব ও তার অভিব্যক্তি কোন্ সত্যের আশ্রয়ে মূল্যবান বলে স্বীকৃত হয়, মানুষে মানুষে মূল্যের বোধ এক কি স্বতন্ত্র, প্রেয়সের ধ্যান স্রষ্টার মানসজীবনে কি প্রভাব বিস্তার করে, ইত্যাদি জিজ্ঞাসায় মতভেদ স্বাভাবিক। কিন্তু, সত্য কথা এই, বিশেষ অভিজ্ঞতা, অনুভব বা আচরণকে আমরা অন্যান্য অভিজ্ঞতা বা অনুভব বা আচরণ অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান বলে গ্রহণ করি, তার নির্যাসটুকু যেন অন্তর্লোকে এক অননুভূতপূর্ব জ্যোতিতে ভাস্বর হয়ে উঠে, মনে হয় তার স্পর্শে জীবন এক অবিচল আশ্রয়ে স্থিতিলাভ করে। প্রেয়সের এই ধ্যান বা মূল্যের এই চেতনাই মানবেতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে, তার সংস্কৃতিকে করেছে বেগবান। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাকে দুটি স্বতন্ত্র অথচ সুষ্টুসঙ্গত ঐক্যের পরিমাণে ওজন করা চলে। একদিকে তা কালের পারম্পর্যের বোধে সীমিত, অন্যদিকে অনুভবের সুগভীর আর্তি অর্থাৎ মূল্যের ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল। একটি অতিসর সাধারণ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক; গল্প উপন্যাসের পৃষ্ঠায় এ ধরণের অভিব্যক্তি প্রায়শ আমাদের হৃদয় ভোলায়, মাত্র এক মুহূর্তের জন্য সে এসেছিল, কিন্তু মনে হলো যেন আলোয় আকাশ ভরে গেল, অথবা বৈষ্ণব কবির সেই যুগযুগ বিগত ক্রন্দন 'তারে এক তিল না হেরিলে যেন শত যুগ মনে হয়'—ইত্যাদি ধরণের অভিব্যক্তির মধ্যে সময় এবং প্রেয়স দুয়েরই স্বাক্ষর বর্তমান।

কালজয়ী উপন্যাস তেমনি কাহিনীর বিবৃতির সমান্তরালভাবে প্রেয়সের বোধকে উজ্জীবিত করে রাখে; গল্প তাকে দেয় সময়ের তরঙ্গে আন্দোলিত হওয়ার আনন্দ, আর প্রেয়সের ধ্যানে হয় তার মহত্তর সত্তার উত্তরণ! প্রেয়সের স্বরূপ কি, সে সম্পর্কে কোনো বিতর্কের অবতারণা না করে শুধু একথা বলাই যথেষ্ট যে, ব্যক্তির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিধিতে মূল্যের চেতনা ও পরিমাণ একরূপ; কিন্তু ব্যক্তিবিশেষও তার বৃহত্তর সামাজিক অথবা মানবিক সত্তার সঙ্গে অন্বয় বা বিরোধের সম্পর্কে সম্পর্কিত। পরিবার বা সমাজ, দেশ বা বিশ্বের বৃহত্তর সত্তায় মূল্যের বোধ ও পরিমাণ সম্পূর্ণ অন্যরূপ। সত্তার এই বৃহত্তর স্বরূপে, জাগতিক ও মানবিক সম্পর্কের সমগ্রতায় উপন্যাস যখন মানুষকে আবিষ্কার করে, তখন শুধু যে সে এক অতলস্পর্শী গভীরতার সন্ধান পায় তা নয়, ব্যক্তির জীবনকেও সমগ্রভাবে রূপান্তরিত করে। সমগ্র দেশ বা বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত ব্যক্তির আত্মোপলব্ধিতে থাকে বৃহত্তর বিশ্ববোধের স্বাদ। পূর্বে টলষ্টয়ের 'ওয়র অ্যাণ্ড পীস্' উপন্যাসে ব্যক্তির বিবিধ মূল্যায়নের কথা উল্লেখিত হয়েছে। আমাদের বাংলা উপন্যাসের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে, রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের

মধ্যে ব্যক্তির ব্যক্তিগত পরিধি ও সার্বভৌম সত্তার একটি নির্বিশেষ সত্তা চিরজাগ্রত; তাই, প্রেয়সের বোধে তাঁদের সমুদয় রচনাই প্রোজ্জ্বল।

উপন্যাসের পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতিতেই সম্ভবত কোনো কোনো সমালোচক উপন্যাসকে মহাকাব্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই তুলনা আংশিক মনে হলেও অস্বাভাবিক নয়। উপন্যাস মহাকাব্যের পর্যায়ে উন্নীত হয় তখনই যখন বিরোধের মধ্যেও জীবনের সমগ্রতাকে তুলে ধরে, খণ্ডিতের মধ্যেও অস্তিত্বের অখণ্ডতার স্বীকৃতি থাকে; এবং যখন জীবনের অবাঞ্ছিত দুর্যৈবগুলোকে অবান্তর প্রেরণার অতি-ব্যাকুলতায় শুধু ব্যক্তির অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে নয় দেশের সমগ্র জনসত্তার হৃদয়-কলরোলে উদ্ভাসিত করা হয়, তখন সত্যসত্যই আমরা মহাকাব্যের অখণ্ড জীবন রস আস্বাদন করি। ব্যক্তি তার ক্ষুদ্রতার মধ্যেও বৃহত্তর সত্তার স্বীকৃতিতেও সুন্দর হয়ে উঠে। টলষ্টয়ের পূর্বোক্ত গ্রন্থ এই অর্থেই প্রকৃত মহাকাব্য।

বাংলার অজস্র উপন্যাস ইমানীং কালে প্রকাশিত হলেও পূর্বআলোচিত বৃহত্তর মহত্তর প্রেয়সের বোধ তাতে কদাচিৎ অভিব্যক্ত দেখতে পাওয়া যায়। অথচ, অত্যন্ত আশার কথা, অন্য দিক থেকে 'মহাকাব্য' রচনার প্রয়াস লক্ষণীয়। সম্প্রতিকালে আয়তনে বিপুল উপন্যাস রচনার একটা অতি-সচেতন প্রচেষ্টা দৃষ্টিগোচর হয়। এই সব গ্রন্থের বৈষয়িক সিদ্ধির দিকটা আপাতত বিস্মৃত হয়ে দেখতে পাই, উনবিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক সংঘাত, শিল্প-নগরী বা আধুনিক মানুষের জীবনসংঘাত ঐসব উপন্যাস-মহাকাব্যের উপকরণ সরবরাহ করেছে। দু-চারটি গ্রন্থ পাঠের অবকাশও হয়েছে। গ্রন্থের বিস্তৃত, আলোচনায় অগ্রসর না হয়ে শুধু এ কথা বলাই যথেষ্ট যে, লেখকগণ যতোটা কলেবর-সচেতন, ততোটা রূপসচেতন নন। আলোকসামান্য প্রতিভার পক্ষেই কেবল একটি যুগান্তব্যাপী জীবনপ্রবাহের শিল্পরূপ বা ভাবানুভূতির ইমারৎ কল্পনা করা সম্ভব। ঐ ইমারৎ কালের পারম্পর্যে যেমন সঙ্গীত তেমনি প্রেয়সের অনুধ্যানে জ্যোতির্ময়। কিন্তু, আলোচ্য উপন্যাসগুলো পাঠে ঐ ইমারতের কোনো অস্পষ্ট ছবিও মনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে নি। বরং এইরূপ একটা অনুভব মানসপটে স্থায়ী হ'তে চেয়েছে, আয়তনে অন্য সব উপন্যাসকে ছাপিয়ে যাওয়ার জন্য লেখকগণ যতোটা কৃতসংকল্প রূপসৃষ্টির নৈপুণ্যের তাঁদের ঠিক ততখানিই অভাব। মহাকাব্য তো যুগযুগান্তরের প্রবাহিত জীবনধারার সৃষ্টিশীল আবর্ত থেকে গড়ে ওঠে, বিবর্তিত হয়। সেই আবর্তকে ইতিহাসের আন্তর বেদনার সমগ্রতায় উপলব্ধি করা, তার আত্মিক সাযুজ্য লাভ করা, বোধের দীপ্তিতে তাকে প্রকাশের বাণী দেওয়ার জন্য যে মনীষা, মননশীলতা, সংযম ও অধ্যবসায় সৃষ্টির ও স্রষ্টার সংযোগী—কোনো বাংলা মহাকাব্যিক উপন্যাস-প্রচেষ্টায় তার কোনো পরিচয় পাইনি। উত্তরণীয় সফলতা অর্জন তাই তাঁদের অনায়ত্ত রয়ে গেল।

কিন্তু, এই অনিবার্য ব্যর্থতা সত্ত্বেও স্বীকার করব, বাংলা উপন্যাসের বিগত আশ্চর্য ব্যাপ্তি ও বিপুলতায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে চলেছে। এমন কি, জৈব গরজ এবং অসুস্থ বিকারগ্রস্ত মানসকুণ্ডলন বাংলা উপন্যাসের বিশাল এক অংশের উপজীব্য হলেও, প্রেয়সের বোধ এবং তৎ-সংক্রান্ত সমস্যার রূপায়ণ বাংলা উপন্যাসে অধিকতর মাত্রায় স্বীকৃত হ'তে চলেছে। সৃষ্টিধর্মী মূল্যচেতনার এই বলিষ্ঠ আবির্ভাব —এর শিল্পমান ত্রুটিপূর্ণ হলেও—উপন্যাসের পক্ষে নিঃসন্দেহে শুভচিহ্ন। বিশ্বসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষণে আলোচিত হওয়ার স্পর্ধা না থাকলেও বাংলা উপন্যাসের সামগ্রিক পরিচয় মনকে এই আশায় আনন্দিত করে যে, বাংলা উপন্যাস দীর্ঘকালের অন্ধকারের আবরণ ছিন্ন করে সার্থকতার সূর্যালোক অঙ্গে ধারণ করতে চাইছে। এ লাভ উপেক্ষার মত নয়।

এ প্রসঙ্গে বলা নিষ্প্রয়োজন, মননশীলতার মানদণ্ডে সম্প্রতি কালের উপন্যাস কুড়ি-পঁচিশ বৎসর আগেকার উপন্যাস থেকে বহু গুণে দক্ষ। এই দক্ষতা একদিকে এনেছে সূক্ষ্ম কারুকারিতা ও সুগভীর মননশীলতা; অন্যদিকে, তাতে লৌকিকের স্পৃহতাও যে কিছুটা না এসেছে তা নয়। এ কথা যে শুধু প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য তা নয়; এমন কি প্রেয়সের বোধে অগুজন রচনাও গভীর মননশীলতায় আকর্ষণীয়। বাংলা উপন্যাসের বিবর্তনে এটাই লাভের দিক।

শরৎচন্দ্রের রচনায় যে অক্ষমতা ও অমনোযোগিতা আমাদের পীড়িত করে, আধুনিক যুগের কোনো শিল্পী কস্মিনকালেও অনুরূপ দুর্বলতার পরিচয় দেবেন না। তাঁদের রচনায় অনেক বেশি শিল্পচাতুর্য, বাগ-বৈদগ্ধ, মননধর্মী বিশ্লেষণের স্বাক্ষর। কাহিনীসূত্রের উন্মোচনে তাঁরা কোনো দুর্ঘটনার আশ্রয় নেন না; আপন অন্তর গহনে তা স্বাভাবিক ধারায় প্রবাহিত হয়। তেমনি আধুনিক কালের কোনো কুশলী উপন্যাসিকই ঘটনাবৃত প্রতিহত করে কোনো চরিত্র সম্পর্কে অকারণ মন্তব্য করতে বসবেন না—যেমন দেখতে পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্র অথবা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে। কারণ, কোনো চরিত্রের অন্তর্নিহিত মাধুর্য বা ক্রূরতার বোধ পাঠকচিত্তে ছড়িয়ে তোলা যদি উপন্যাসিকের কাম্য হয়ে থাকে তো শুধুমাত্র তাঁর ইতস্ততঃ বিচ্ছুরিত মন্তব্যেই তা সিদ্ধ হবে না, যদি না কাহিনীসূত্রের আপন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ওই সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। শরৎচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত তাঁর পূর্বগামী উপন্যাসিক-বৃন্দ রূপকর্মের এই শিল্পসুষমা সম্পর্কে বিশেষ অবহিত ছিলেন না; তাঁরা অবহিত ছিলেন না যে উপন্যাসের বিষয়গত বিবরণে ও চরিত্রায়ণে শিল্পী হিসেবে তাঁদের স্বকীয় অভিমত মনোভঙ্গি ইত্যাদি একান্তই অবাঞ্ছিত। শিল্পীর মানসপট শুধু প্রবাহিত স্রোতধারা বা দর্পণের মত—নিরপেক্ষ প্রতিফলনই তার নিষ্ঠা ও শিল্পদায়িত্ব। শিল্পী যদি এই মৌল প্রত্যয় থেকে অধঃপতিত হন তাহলে শিল্পকর্ম বিঘ্নিত হতে বাধ্য। এবং তাঁদের হাতে হয়েও ছিল। কিন্তু এই সমস্যা সম্পর্কে আধুনিক যুগের উপন্যাসিকদের দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর; তাঁরা শিল্পী, বিচারক নন।

রূপসৃষ্টির আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "সে (আধুনিকতা) বলছে, আর্টের কাজ মনোহারিতা নয়, মনোজয়িতা। তার লক্ষণ লালিত্য নয়, যাথার্থ্য। চেহারার মোহকে মানছে না, মানছে ক্যারেক্টারকে অর্থাৎ একটা সমগ্রতার আত্মঘোষণাকে।……কেবল জোরের সঙ্গে বলতে চায় "আমি দ্রষ্টব্য"। তার এই দ্রষ্টব্যতার জোর হাবভাবের দ্বারা নয়, প্রকৃতির নকলনবিশি দ্বারা নয়, আত্মগত সৃষ্টিসত্যের দ্বারা। এই সত্য বর্ণনৈতিক নয়, ব্যবহারনৈতিক নয়, ভাবব্যঞ্জক নয়, এ সত্য সৃষ্টিগত। অর্থাৎ এ হয়ে উঠেছে বলেই তাকে স্বীকার করতে হয়।" রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিতে আধুনিকতার প্রতি ঈষৎ কটাক্ষ থাকলেও এতে শিল্পকর্মের একটি মৌল সত্য স্বীকৃত। আত্মগত সৃষ্টিসত্যের মহিমায় শিল্প গড়ে ওঠে, বিকশিত হয়। উপন্যাসকে সেই শাশ্বত নিয়মের ঐশ্বর্যে শ্রীমণ্ডিত করার প্রচেষ্টা একালের লেখকদের শিল্প প্রতিজ্ঞা।

বর্তমান কালের অবক্ষীয় সমাজের বস্তুবোধ এবং রুচির অভিব্যক্তি অত্যন্ত স্থূল; তা ছাড়া, সাহিত্যের পাঠকসংখ্যাও বর্ধিষ্ণু। কিন্তু, অধিকাংশ পাঠক যেমন কোনো সৃষ্টির মূল্যবোধে আগ্রহী নয়, তেমনি মননশীলতা ও প্রেয়সের বোধে উজ্জ্বল রূপসৃষ্টির সমাদর করতেও তাঁদের মন অনভ্যস্ত। কারণ, ইদানীং কালে মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় এক জাতীয় রচনার আবির্ভাব হয়েছে, যা ঘুলপৎ ভ্রমণ কাহিনী ও গল্প, বা ভ্রমণ ও উপন্যাস। গভীর কোনো সত্যের আলোকে আলোকিত হওয়া বোধ করি এদের লক্ষ

নয়, তাই এদের নেই কোনো চিরঞ্জয়ী আবেদন। এই সব গ্রন্থে না থাকে উপন্যাসের বিপুল গভীর পরিব্যাপ্ত স্বাদ, না থাকে ভ্রমণ কাহিনীর তথ্য সমৃদ্ধ ইতিহাসের বোধের অনিবার্য দীপ্তি। এই সব গ্রন্থ যেমন যেন কয়েক শো পৃষ্ঠায় ছড়ানো এক তরলতা। মনোজগতের কোন অপ্রতিরোধ্য আবেদন যেমন এদের নেই, তেমনি এদের দ্রুত প্রসারে আতঙ্কিত হওয়ারও সঙ্গত কোনো কারণ বর্তমান নেই। তবু এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে যে, বাংলা উপন্যাস যে মুহূর্তে আত্মগ্লানির লজ্জা অতিক্রম করে দেশের সীমা লঙ্ঘন করে বিশ্বপরিক্রমায় অগ্রসর হতে চলেছে, তখন সস্তা বাজারের লোভে শক্তির অপচয় না ঘটিয়ে সামগ্রিক প্রচেষ্টায় তাকে বিশ্বের প্রাঙ্গণে পৌঁছে দেবার দায়িত্বই রূপস্রষ্টাদের গ্রহণ করা উচিত।

হাল আমলে যে কোনো রচনাই যে শ্রেষ্ঠতার সার্টিফিকেট ঝুলিয়ে বাজারে উপস্থিত হচ্ছে তার কারণ, সাহিত্যের মূল্যায়নের স্থির মানদণ্ডের অভাব। আমরা প্রকৃত অর্থে দেশকে যেমন ভালবাসতে শিখিনি, তেমনি জানিনা সাহিত্যের সমাদর। তাই, বণিকী রুচি আমাদের সাহিত্যের বোধকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অথচ, সাহিত্য যখন সৃষ্টির প্রাচুর্যে অজস্র সম্ভাবনায় আপনাকে প্রায় নিঃশেষ করে দিচ্ছে, তখন সুষ্ঠির মূল্যায়নের প্রয়োজন আত্যন্তিক। রূপের ভুবনে মানুষের যা সৃষ্টি তা অন্তবিধ কর্মের তুলনায় কালজয়ী। তাই, রূপের একটি আপন অন্ত-নিরপেক্ষ জগৎ কল্পনা করা সম্ভব, যেখানে যুগযুগান্তরের সমস্ত সার্থক সৃষ্টিই একই সঙ্গে অস্তিত্বশীল। সেই রসের ও ঐশ্বর্যের জগতে উন্নীত হয়ে বাংলা উপন্যাস রুশ উপন্যাসের সঙ্গে অথবা ফরাসী বা ইংরেজী উপন্যাসের সাথে সহ-অস্তিত্বশীল হ'তে পারবে কিনা, নির্মোহ মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে সে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সাহিত্যের রূপকর্ম কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যে প্রসন্ন হলে সেই সৌন্দর্য-বিশ্বে প্রবেশাধিকার লাভ করে, বিবেকবান সমালোচনা সেই মনের নির্ণায়ক। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, তদ্রূপ শিল্পজ্ঞান আমাদের বাংলাদেশে আজও পর্যন্ত নির্মীত হয়নি। তাই, বাজার-কাটতিকে আমরা সৌন্দর্যের মাপকাঠি রূপে গ্রহণ করে বসে আছি!

অন্য কথায় বলা যেতে পারে, বাংলা উপন্যাসের বিদগ্ধ পাঠকসমাজ আজও অস্তিত্বহীন। অথচ, এই সুদীর্ঘ সময়ে তার অস্তিত্বশীল হওয়া উচিত ছিল। বাংলা উপন্যাসকে যদি ইউরোপের সীমায় পৌঁছে দিতে হয় তাহলে তার পূর্ব সর্ত স্বরূপ বিদগ্ধ পাঠক সমাজের আবির্ভাব সম্ভব করে তুলতে হবে। সেই পাঠকই উপন্যাসকে বৃহৎ সৃষ্টির দায়িত্বে প্রবুদ্ধ করবে, জানাবে—ব্যক্তি বিশেষ নয় মানুষ, ব্যক্তিক সুখদুঃখ নয় মানবিক সুখদুঃখ বেদনাই সাহিত্যের সত্য। ব্যক্তি মানবিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েই সাহিত্যে অমৃতের সন্ধান লাভ করে।

সবল্পভাবে বাংলা উপন্যাস এই মহৎ আদর্শে আজও অনুপ্রাণিত নয়। প্রবন্ধের আরম্ভে শরৎচন্দ্রের যে উক্তি উদ্ধার করা হয়েছে, তাতে তিনি সমস্ত অন্ধ্যজ ও ব্রাত্য মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সাহিত্যে তাদের প্রাণধর্ম করে তোলার মধ্যে বৃহৎ সাহিত্যের আবির্ভাবের আশা প্রকাশ করেছেন শরৎচন্দ্র দুরাকাঙ্ক্ষ ছিলেন; কিন্তু, এও সত্য, দুঃখতাপসহা মানুষের পরমনিধিতে সুখর হলেই কোনো সাহিত্য বৃহৎ হয়ে উঠে না, যদি না রূপকর্ম নিপুণ হয় অর্থাৎ মনোজ্ঞিতা অর্জন করে। অক্ষর আর শব্দের রূপবন্ধনীতে শিল্পসুষমা ছড়িয়ে দেওয়া চাই, নতুবা সাহিত্যে মানুষকে বাঁচানো অসম্ভব। পক্ষান্তরে, এও অনুরূপ সত্য, উপন্যাসের প্রাণধর্ম থেকে মানবিক আকূতি, অনুভূতি, দুঃখ-বেদনার সুতীব্র আশা কোনোমতেই বাদ দেওয়া চলে না। কালের বেদনা ও পরম্পরা আমাদের অনেকের নিকট দুঃসহ বোধ হ'তে পারে, রূপান্তরের মধ্যে আমরা প্রাচীন প্রতি-স্মৃতি বিশ্বাসের বিনাশ দেখে আতঙ্কিত হতে

পারি। তেমনি মানুষও আমাদের অপরিসীম ঘৃণার আধার হ'তে পারে। কাউকে ভয় করার, তার উদ্দেশ্য সংযোগিত হওয়ার, এবং কার্যত তাকে অস্বীকার করার চেষ্টা যদিও বা করা চলে [যেমন সাধক যোগীরা করে থাকেন, বা যেমন সাহিত্যের পৃষ্ঠায় করেছিলেন এই শতাব্দীর গোড়ার দিককার কয়েকজন শিল্পী] কিন্তু মানুষকে বর্জন করে মানুষের উপন্যাস শুধু কল্পনাতীত নয়, অসম্ভব। সুতরাং, মানুষকে উপন্যাসের পৃষ্ঠায় প্রতিনিয়ত আবিষ্কার করতেই হ'বে, তার বিপর্যস্ত চৈতন্যে অথবা শ্রেয়সের ধ্যানে বা কল্যাণের স্বপ্নে। তা যদি করা সম্ভব না হয় তো বন্ধ্যা আকাশে বানুসের কথার ফুলঝুরি সৃষ্টি করা হবে শুধু; এবং বহু জনপ্রিয় সম্ভাবনা অঙ্কুরেই আত্মহত্যা করবে।

উপন্যাসের পৃষ্ঠায় বিশ্ববিহারের স্বপ্নকে যদি সার্থক করে তুলতে হয় তো নতুন বন্দরের পথে দুর্গম সমুদ্রাভিসারে বাংলা উপন্যাসকে অবশ্যই যাত্রা করতে হবে।

বিখ্যাত অভিনেতা দ্যুসি ম্যালিগিরো অনেক রাতে অভিনয়ান্তে বাড়ি ফিরছিলেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল কে একজন তাঁর বাড়ির পাঁচিলের পাশে চুপ করে বসে আছে, যেন কার অপেক্ষা করছে।

চোর নয়ত?—ভাবলেন দ্যুসি। তারপর তার কাছে গিয়ে অভিনয়ের ভঙ্গিতে বললেন,—দেখছ না সব চুপচাপ,—চুরি করবার এ সুযোগ হারিও না বন্ধু,—আমি ত এসে পড়েছি। আগে কোন্ ঘরে ঢুকবে?

—একতলার বড় ঘর,—উত্তর দিল চোর।

এইবার তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—চোর চোর।

সাহিত্য সংবাদ

মফঃস্বলের মুখপত্র ॥

পবিত্র পাল

বিপিনচন্দ্র পালের বয়স তখন বছর তেইশ। কটকের চাকরী ছেড়ে দিয়ে কলকাতা এবং তারপর বন্ধুগণের সহায়তায় শ্রীহট্ট শহরে একটি স্কুলের হেডার হয়ে গেলেন। ১৮৮০ সনের কথা। 'শ্রীহট্ট প্রকাশ' বন্ধ হয়ে গেলে 'পরিদর্শক' সাপ্তাহিক বেরোল। বিপিনচন্দ্রকে সম্পাদক নিযুক্ত করলেন কর্তৃপক্ষ। বিপিনচন্দ্র স্কুল থেকে সামান্য কিছু পেতেন। ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করায় পিতার সঙ্গে তাঁর গোলমাল চলছিল। ফলে আর্থিক সাহায্য তাঁর পিতৃদেব অনেকদিন আগেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এমন অবস্থায় চরম দারিদ্র্যে তাঁর দিন কাটছিল।

'পরিদর্শক' থেকে তিনি কিছুই পেতেন না। স্কুলের কাজে তাঁর প্রচুর পরিশ্রম হত। তার ওপর বিনা বেতনে 'পরিদর্শক' সম্পাদনা করতেন। শুধু নিছক সম্পাদকীয় লিখে ছেড়ে দিতেন না। মন প্রাণ সব কিছু সাপ্তাহিকটির পেছনে ঢেলে দিয়েছিলেন। তখনকার দিনে কম্পোজিটর প্রেসম্যান ইত্যাদি দূর মফঃস্বল শহরে মেলা খুব কষ্টকর ছিল। যে দু' একজন ছিল তাদের দিয়ে কাজ চালাতে হত। ফলে এদের কেউ যদি অসুখ বিসুখে পড়তেন, তবে কাগজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকত, নিয়মিত বেরোত না। ফলে প্রতি পদে পদে বিশৃংখলা পরিলক্ষিত হত। বিপিনচন্দ্র তখন ইতিমধ্যেই সাংবাদিকতার জগতে কিছুদিন কাজকর্ম করেছেন এবং নামডাকও হয়েছে তাঁর কিছু। নব্যচিন্তার জোয়ারে তাঁর যৌবন সমস্ত কষ্টকে স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল। ধক্‌ধক্‌ করে জলছিল তাঁর অন্তর স্বাধীনতার জন্য। সর্বদিক দিয়ে এ যুবক স্বাধীন হবার সাধনায় ব্রতী ছিলেন। এখন তেইশ বছরের যৌবনকে, ফরাসী লেখক জাঁ পল সার্ত্র-এর ভাষায় বলতে গেলে গণ্য করতে হয়, 'prolonged child hood'. সার্ত্রের ভাষায়, "Young people of to-day are uneasy. They no longer recognise their right to be young. It is as though youth were not an age of life, but a class phenomenon. an unduly prolonged childhood, a spell of irresponsibility accorded to the children of the well-to-do."

তখনকার যুবকদের তুলনায় এখনকার যুবকদের কথা ভাবতে গেলে উপরের কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে খাটে।

বিপিনচন্দ্র তাই প্রথমে সম্পাদক হয়ে ঠিক করলেন, প্রেস সম্পর্কে যাবতীয় খুঁটিনাটি কাজ আয়ত্ত করতে হবে। কম্পোজিটরের, প্রেসম্যানের কাজ, প্রুফ রিডিং সব একে একে জেনে নিলেন। উদ্দেশ্য 'পরিদর্শক' যাতে নিয়মিত বেরোয়। প্রেসের কোন কর্মী অসুখ অথবা ঠিকমতো কাজ না চালালে যদি তাকে বরখাস্ত করতে হয় তখন সে সম্ভাব্য শূন্যতা পূরণের জন্য তিনি প্রস্তুত হলেন।

'পরিদর্শক' সে শহরে তথা সমস্ত বাংলাদেশে প্রথম থেকেই নিজস্ব আসন সংগ্রহ করে নিল। ময়মনসিংহ থেকে 'ভারত মিহির', ঢাকা থেকে হিন্দু হিতৈষিণী, চুঁচুড়া থেকে 'সাধারণী' প্রভৃতির মত মফঃস্বল থেকে খ্রীহট্টের 'পরিদর্শক'-ও বাংলার চিন্তাজগতে পাকাপাকি প্রতিষ্ঠিত করল নিজেকে।

উনবিংশ শতাব্দীর বুকে বিজ্ঞাপন পাওয়া ছিল আকাশকুসুম কল্পনা মাত্র। তার কারণ (১) বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা আজকের মত দেখা দেয় নি; (২) শিল্প বাণিজ্য বিন্দুমাত্র উন্নত ছিল না; (৩) সরকার এ সমস্ত স্বাধীনতা-আন্দোলনকারী পত্র পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিতেন না; (৪) তার ওপর মফঃস্বল শহরের বহুবিধ অসুবিধে ছিল; (৫) পাঠকগোষ্ঠী ছিল অকল্পনীয় রকম সীমাবদ্ধ। (৬) সর্বোপরি প্রেসের বিভিন্ন ধরনের অসুবিধে তো ছিলই।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে—অক্ষয় সরকার সম্পাদিত চুঁচুড়া থেকে প্রকাশিত 'সাধারণী', অনাথবন্ধু গুহ সম্পাদিত 'ভারত মিহির', ঢাকার 'হিন্দু হিতৈষিণী', বিপিনচন্দ্র সম্পাদিত—'পরিদর্শক', বিপিনচন্দ্রের পূর্বে 'খ্রীহট্ট প্রকাশ' প্রভৃতি মফঃস্বল বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকায় সাক্ষ্য বহন করে।

বিপিনচন্দ্র আত্মজীবনীতে লিখছেন: 'Though a Malfassil publication the 'Bharat Mehir' had from the very start secured for itself a high place in the Benglee journalism of these day.''

সে একটা দিন গেছে। প্রচণ্ড প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সুদূর মফঃস্বলের বুদ্ধিজীবীদের এ এক গৌরব-কাহিনী। আজ তা স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত।

২।

চিন্তার গতিটা সূত্র পায় সামাজিক ঘটনাস্রোত থেকেই। সামাজিক ঘটনাস্রোত যখন দু'পায় প্রাবিত করে দিয়ে চলতে থাকে, তখন একমাত্র জড়ভরতরাই দেখতে পায় না সে স্রোতের দাপট পায়ে দাঁড়িয়ে থেকে। আমাদের বর্তমান অবস্থা সে জড়ভরতদের থেকে কিছুমাত্র তফাতের নয়।

এখনকার সমাজ ব্যাধিতে ভুগছে। সর্বরকম ব্যাধি। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক, চিন্তাসম্বন্ধীয়। এ ব্যাধিতে সমস্ত বাংলাদেশই বেশি ভুগছে। সেখানে যেখানে মস্ত সৌধের কাহিনীগুলো সার সার দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে এখনটা আরো বেশি কষ্টকর লাগে। দিকভ্রষ্টতা আজ সর্বত্র লক্ষিত।

সমস্যা হল, দিক নির্ণয় করা। সামাজিক কর্তব্যের ও আন্দোলনের দিক নির্ণয় করা। বাংলার অন্তরের স্রোতটি খুবই উন্মুখ হয়ে চলার জন্যে। গতি একবার দিলেই হল। দিক নির্ণয় করাই সে গতি দেওয়ার সামিল। তাহলে আজ যারা দিক্‌ভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট, তাদের পথ একবার নির্ণয় করে দিন কেউ একবার, অমি চলতে শুরু করবে সে আটকে থাকা স্রোত। মুশকিল হল, এই দিক নির্ণয় করা। সামাজিক কর্তব্য ও আন্দোলনের দিক নির্ণয়।

আমার তো মনে হয়, কলকাতা থেকে এখন দৃষ্টি সরিয়ে মফঃস্বলের দিকে মেলে দেওয়া দরকার। কলকাতার অবস্থা মারণরিক জীবনের আফিং খেয়ে ঝিমোনোর অবস্থা। চিন্তা আন্দোলন ঝিমিয়ে

চলেছে। আদৌ কোন আন্দোলন হচ্ছে কিনা সন্দেহ। একটা দ্বিতাবস্থা কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের মনকে মেকী আত্মসন্তোষের মধ্যে মগ্ন রেখে মোহের সৃষ্টি করে চলেছে।

একটি বৃহৎ নগর ও তার আশেপাশের অঞ্চলে একটি বৃহৎ জনমণ্ডলীর সমস্যাকে বিধৃত করে এবং একাকার করে দেখলে দৃষ্টি ব্যাপক হয় না। সমস্যার পথ নির্ণয় ভুলভাবে সম্পন্ন হয়। বিরাট প্রাণচঞ্চল কুমারী মনকে নিয়ে বেদাতি করার মত মফঃস্বলকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে নগর, নিয়ে চলে চিন্তার নিবিড় গলিতে। সেখানে সুস্থ জীবনের প্রবেশাধিকার নেই, সেখানে গেলে সমাজে নিষিদ্ধ সন্তান বলে গণ্য হতে হয়। মফঃস্বলকে নিয়ে কলকাতার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় তাই করছেন। এটা দম্ভ এবং এক ধরণের আন্দোলনের ঘোষণা করে। যোগ্য ব্যক্তিরা কোনদিন দম্ভ দেখান না। বিনীত হয়ে পথ চলেন তারা পথিককে আশ্বাস দিতে দিতে এবং পথ দেখাতে দেখাতে। এ অসহনীয় অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটান দরকার।

মফঃস্বলকে কলকাতায় এনে মুখ থুবড়ে রাখার ফলে অবস্থা দাঁড়িয়েছে :

[১] মফঃস্বলের সমস্যা যেন কলকাতারি সমস্যা।

[২] সেখানকার জনমত যেন কলকাতারি জনমত। জনমত কখনও আকাশ থেকে পড়ে না। যেখানকার অবস্থা যেমন যেমন, সেখানকার জনমত তেমন তেমন গড়ে ওঠে। সব জায়গার প্রাণ-চাঞ্চল্য সে জনমতকে একভাবে গঠন করে না।

[৩] সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রভৃতির মত গ্রামের জীবনে নূতন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অবস্থা উন্নততর হয়েছে, কি হয় নি, সে সম্পর্কে কলকাতার বুদ্ধিজীবীরা অজ্ঞ। অথচ নগরের বাইরে বৃহত্তর এলাকায় ঘটান স্রোতের ওপর সেখানকার সমাজ জীবন অনেকখানি নির্ভর করে। কোন্‌দিকে তা মোড় নেবে এবং কীভাবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

[৪] মফঃস্বলের তরুণ বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্য বলে কিছু নেই এমন একটি ধারণা করে বসে আছে কলকাতা। ফলে তাঁদের সাহিত্যসৃষ্টি, চিন্তা আন্দোলন, সামাজিক ভূমিকাকে উৎসাহ ত দেওয়া হয়ই না, বরঞ্চ তাঁদের বক্তব্যের দুর্বার স্রোত অনুৎসাহের মরুতে দিশা হারাতে বসেছে।

[৫] মফঃস্বলের ভাল কাগজপত্র বলতে কিছু নেই। অথচ কলকাতা থেকে যা যা প্রকাশিত হয়, তাই একচেটে হয়ে মফঃস্বলের জীবনকে অধিকার করে বসে আছে। মফঃস্বল থেকে দৈনিক পত্র বের করতে অসুবিধে থাকলেও, অর্ধ সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকা বের করা অসুবিধেজনক মোটেই নয়।

দুর্গাপুর-আসানসোল বিরাট শিল্পাঞ্চলে একটি দৈনিক পত্র তারা কষ্টকর নয় বলে মনে করি। একটি শক্তিশালী সাপ্তাহিক ত বের করা সেখান থেকে খুব প্রয়োজন।

মফঃস্বল থেকে পত্রিকা প্রকাশ করতে গেলে প্রয়োজনগুলো পূরণ করা দরকার। যেমন,

[১] মফঃস্বলবাসীদের আঞ্চলিক কাগজগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে। নিজ নিজ অঞ্চলগুলোর সমস্যা কলকাতার পত্রিকাগুলোতে যথাযথ মূল্য পায় না যেহেতু, সেহেতু এসম্পর্কে দায়িত্ব-জ্ঞান ও সতর্কতা জাগানো প্রয়োজন।

[২] শিক্ষক, অধ্যাপক, উকিল, ডাক্তার, কলেজের ছাত্র, সাহিত্যসেবী প্রমুখ এবিষয়ে

নেতৃত্বদান করতে পারেন। সামাজিক কর্তব্যের দিকে লক্ষ্য অর্জন এবং সেদিকে অক্লান্তময় আন্দোলনের অগ্রদান প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁদের সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব প্রদর্শন আবশ্যক।

[৩] আঞ্চলিক ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে বিজ্ঞাপন দান করতে হবেই নীতিগত ভাবে।

[৪] বাইরের শিল্পপতিদের পৃষ্ঠপোষকতা যতটুকু হোক না কেন প্রয়োজন।

[৫] সরকারী কর্তৃপক্ষের—প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় বিজ্ঞাপন দিয়ে সহায়তা করতে হবে।

মফঃস্বল-পত্রিকার কথা সামাজিক আন্দোলনের দিকে তাকিয়ে ভাবতে হবে। এবিষয়ে তরুণ দেশহিতব্রতী শিক্ষক, অধ্যাপক, সাহিত্যসেবীদেরই বেশি ভাবা প্রয়োজন। এটা ভাববার সময় এসেছে, কলকাতা বাংলাদেশ নয়। কলকাতার বুদ্ধিজীবীরাই সব নন। তাঁদের বুদ্ধি-চর্চার ওপর অত্যধিক নির্ভরতা নিরাপদ নয়। বুদ্ধি-চর্চার সময় বা সীমানা নেই, অতএব মফঃস্বল থেকে বুদ্ধিজীবীদের আত্মনির্ভরতা প্রয়োজন। সে আত্মনির্ভরতা সামাজিক আন্দোলনের দিকে ধাবিত করতে হবে। নেতৃত্ব তাঁরা নিজেরা সৃষ্টি করুন। এর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন মফঃস্বল পত্রিকার। পরিবর্তনশীল এবং ক্রমআলোড়িত সমাজ-দেহের ব্যাধির নিরাময় করণে সেখানকার তরুণ বুদ্ধিজীবীদেরই এগিয়ে আসাই একমাত্র কামনা।

কড়ের রাত। বিখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী কার্ল অর্ক আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন যে বাড়িতে, সেটি হচ্ছে দুষ্টু ছেলেদের সংশোধনী বিদ্যালয়।

ছেলেদের মধ্যে মহা হৈ-চৈ। কেউ কাউকে মানে না,—অধ্যক্ষের কথাও শুনতে চায় না। সকলে ভদ্রলোকটিকে ঘিরে নানা রকমের হৈ-হল্লা শুরু করে দিলে। কত রকমের দুষ্টুমি।

লোকটি প্রথমটা খুবই বিব্রত বোধ করলো, তারপর ধীরে ধীরে একখানা করুণ গান গাইতে লাগলো। যেমন তার মাদুনে সুর, তেমনি তার মজার কথা। ছেলের দল একেবারে চুপচাপ। যেন কতোই শান্ত শিষ্ট সব।

অধ্যক্ষ এগিয়ে এসে বললেন,—আপনি অসাধ্য সাধন করেছেন,—কে আপনি?

—আমার নাম কার্ল অর্ক। অধ্যক্ষ চমকে উঠলেন।

কিছুদিন পূর্বে টয়েনবি এক জায়গায় বলেছেন যে বিগত কয়েক বছরের মধ্যে এশিয়ার যে দেশগুলি বহুকাল পরে স্বাধীনতা লাভ করলো তাদের মধ্যে ঠিক ইওরোপীয় দেশগুলির মতোই একটা মারাত্মক দোষ দেখা যাচ্ছে। সে হ'লো সীমান্ত নিয়ে বিরোধ। গত কয়েক শ' বছর ধরে ইওরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে এই সীমান্ত বিরোধকে উপলক্ষ্য করে বিভিন্ন সময়ে ছোটো বড়ো অনেক যুদ্ধ হয়ে গেছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ একটু শুভ বুদ্ধিতে ভর করে চললে এই ধরনের বেশির ভাগ যুদ্ধই নিশ্চয়ই এড়ানো যেতো। কিন্তু তাঁরা পারেন নি সে ভাবে চলতে, ফলে যুদ্ধ বেধেছে, এবং প্রতিবার অসংখ্য শান্তিপ্রিয় নিরপরাধ নরনারীকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। টয়েনবি বলছেন যে, এশিয়ার নতুন দেশগুলি [অর্থাৎ এ যুগে যারা স্বাধীনতা লাভ করলো] ঠিক ইওরোপের দেশগুলির মতোই ভুল পথে চলতে আরম্ভ করেছে। ইওরোপের এ সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা তা থেকে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের শিক্ষা হওয়া উচিত ছিলো, কিন্তু তা হয় নি।

এর পরিণাম কি হতে পারে? টয়েনবি সে কথাও বলেছেন। যদিও কথাটা খুব মধুর নয়। টয়েনবি বলছেন যে সীমানা নিয়ে এই বিরোধ খুব বেশিদূর গড়াতে দেওয়া একটা মারাত্মক ভুল হয়ে যাবে। এ জন্যে এশিয়ার অনেক দেশকে আবার হয়তো স্বাধীনতাও হারাতে হতে পারে। প্রত্যক্ষ-ভাবে না হ'লেও পরোক্ষভাবে তো বটেই।

প্রসঙ্গত টয়েনবি বলেছেন যে বর্তমান পৃথিবীর দুটি প্রধান শক্তি, অর্থাৎ রাশিয়া ও আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধবার ক্ষমতা এশিয়াতে এক চীন ছাড়া আর কারোরই নেই। অন্য মহাদেশগুলির পক্ষে যেমন ঠিক তেমনি এশিয়ার পক্ষেও এ কথা সত্যি যে, যে কোনো দেশের সেছনে বড়ো রকমের কোনো সংকট দেখা দিলে হয় রাশিয়া আর না হয় আমেরিকা এসে দাঁড়াবে শেষ পর্যন্ত। কাজেই সীমানার কলহ নিয়ে চীনের হয়তো খুব বড়ো রকমের কোনো বিপদ নাও আসতে পারে। কিন্তু অন্য সকলের পক্ষেই, অর্থাৎ আর ছোটো বড়ো প্রত্যেকটি দেশের পক্ষেই সীমান্ত বিরোধের মধ্যে মারাত্মক অনিষ্টের সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে।

বর্তমান এশিয়াতে প্রকৃত গণতন্ত্র হিসেবে টয়েনবি ভারতবর্ষের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন।

সীমানা বিরোধের প্রশ্নের গোড়ার কথা হ'লো দেশের সার্বভৌমত্ব—এ প্রসঙ্গে টয়েনবির ধারণা যে, বর্তমানের পরমাণু বোমার যুগে এই সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে আমাদের পুরনো প্রচলিত ধারণার কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়ে মানবজাতিকে রক্ষার প্রয়োজনেই একটি বিশ্ব-সরকার সংগঠনের প্রয়োজন। অন্যথায় সভ্যজগতের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

—ভীরুদাজ।

চলতি দুনিয়া

স্বেচ্ছাচারী জীবন [Bohemian life]-যাপন করবার প্রবৃত্তি আজকালকার নরনারীদের মধ্যে বেশ দেখা দিয়েছে। তরুণ-তরুণীরা এতটা সাহেক ধর্মনীতি বা সমাজনীতি মানতেই চায় না,—"the desire to flaunt accepted rules in art, literature, love, social behaviour is greater than ever today." বিশেষত মেয়েদের মধ্যে এই উচ্ছৃঙ্খলতা এতদূর বেড়ে গেছে যে সমাজনীতিবিদেরা বিলক্ষণ শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। শিক্ষিত মহলেও এই উচ্ছৃংখল জীবনযাত্রার প্রতি মোহ কিছুমাত্র কমে নি। বিখ্যাত উপন্যাসলেখিকা Ada Clare এই বন্ধনমুক্ত স্বেচ্ছাচারী জীবনযাত্রাকে প্রায় আদর্শ বলেই মেনে নিয়েছেন। তিনি নিজে কুমারী হয়েও—"she was an unwed mother—and proud of it." এমন কি জন্ম রেজেস্ট্রী অফিসে তিনি ছেলের সঙ্গে নিজেকে এসেছেন—"Miss Ada clare and son." এসব কাণ্ড দেখে সমাজ-ইতিবেত্তারা শুধু এরকম উদ্দাম উচ্ছৃংখলতাকে পাগলামি ছাড়া আর কিছু বলতে চান না,—"social historians like to talk of mad Bohemians." যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কতোদূর যে নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে, আজকালকার এই Bohemian life-এর প্রতি আসক্তিই তার পরিচয় দিচ্ছে। এর পরিণাম ভেবে চিন্তাশীল সমাজসেবীরা শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। —[দি মিরর।

• • •

অনেক মা তাঁদের ছেলেদের সর্বদা চোখে চোখে রাখেন, তাদের আবদার সহ্য করেন আর নিজেদের আদর্শ দিয়ে ছেলেদের চরিত্রগঠন করেন। ছেলেরা ভাবে মা-ই তাদের একমাত্র বন্ধু ও হিতকারিণী। এতে ছেলেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়। ওরা মায়ের কাছে অতিরিক্ত স্নেহ পেয়ে নারীগুণ-সম্পন্ন হয়ে ওঠে,—"whose devotion makes her son effiminate and inhibited ; it is not a healthy sign" অতিরিক্ত স্নেহ দিয়ে যে-সব মা তাঁদের সন্তানকে আঁকড়ে থাকেন তাঁদের অবস্থা শেষে খুবই শোচনীয় হয়ে পড়ে। যে-কোন কারণেই, হঠাৎ আদুরে ছেলেটি মা'র কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারে। তখন "the mother comes across more heartbreak than can be imagined." —[কেমিনা।

• • •

বিজ্ঞানের সাহায্যে উদ্দাম ঝটিকাপ্রবাহকে বশে আনা যায় কি না, এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকমহলে যথেষ্ট গবেষণা চলছে। এই ঝড় নানাভাবে নানারূপে মানব-সভ্যতার ধ্বংসসাধন করে চলেছে। এতে মানুষের দুর্দশার আর শেষ নেই। তবে আশার কথা, মানুষ এখন এ নিদারুণ সমস্যার একটা সমাধান করতে উদ্যোগী হয়ে উঠেছে। "mankind will soon find a solution to one of this worries." আণবিক শক্তি ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে ঝড়ের শক্তি ব্যাহত হতে পারে। এখনকার বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন—"we have advanced to the point where we may soon be able to use chemicals, atomic explosions and other means to break up and destroy hurricanes and other big storms." প্রকৃতির তাণ্ডবলীলার উপর যদি মানুষ তার আণবিক শক্তি প্রয়োগে তাকে বশ্যতা স্বীকার করাতে পারে, তবেই যে জগতের মহাহিতসাধন হবে তাতে সন্দেহ নেই। —[স্বাধা।

যাত্রা গান ॥

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা দেশে একসময়ে যাত্রা গান বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যাত্রা, লোকশিক্ষা ও লোকরঞ্জনের অন্যতম অঙ্গ ছিল। যে সকল যাত্রাগান-রচয়িতাগণ খ্যাতি অর্জন করেছেন তন্মধ্যে নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের নাম সর্বজন পরিচিত। বর্ধমান জেলার বরশী গ্রামে ১২৪৮ সালে নীলকণ্ঠের জন্ম হয়। ইনি কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। তাঁর কবিত্ব শক্তি ছিল প্রশংসনীয়। যাত্রার আসরে তিনি নিজে গান গেয়ে সকলকে মাতিয়ে দিতেন। বর্ধমান জেলায় তাঁর গানগুলি অতিশয় আদৃত হয়। তদানীন্তন ধনী সম্প্রদায়ের গৃহ-উৎসবে নীলকণ্ঠের যাত্রার অনুষ্ঠান আকর্ষণীয় ছিল। ১৩১৬ সালে নীলকণ্ঠ পরলোক গমন করেন। নীলকণ্ঠ-রচিত একটি গানের স্বরলিপি এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হল।

আমি যুক্তি চাইনে হরি,
পড়িয়ে বিপদে তোমার শ্রীপদে
ভক্তি ভিক্ষা করি ॥
(আমি) আসিব যাইব চরণ সেবিব
হইব প্রেম অধিকারী।
আমায় এই দাও প্রসাদ, সেবা অপরাধ
ঘটাও না বংশীধারী ॥

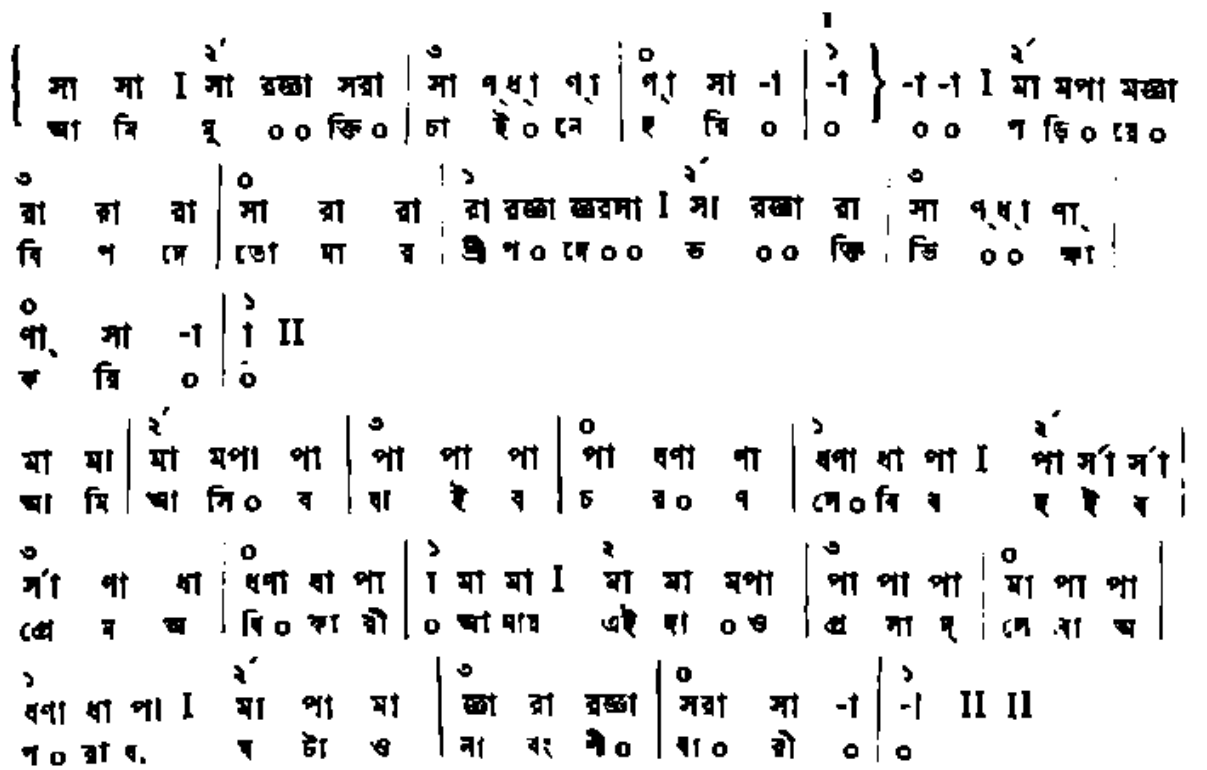

স্বরলিপি—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

একজন আর কয়েকজন

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

শুধু যে সাহিত্যিক প্রতিভাকে স্বীকৃতির আলোকে এনেছেন উপেন্দ্রনাথ তা নয়। জীবনব্যাপী সাধনা তাঁর কার মধ্যে কী গুণ আছে—তাকে বিকাশ করার প্রেরণা দান। কোন গৃহস্থবধূ একদিন কবিতা লিখতেন—আজো যাঁর গোপন খাতাটিতে কবিতার চরণ অনুরঞ্জিত—খ্যাতি যাঁর জীবনে কোনদিনই আসবে না—তাঁকেও জাগিয়ে তুলতে উপেন্দ্রনাথ অগ্রণী। কে নাচতে জানতো—কার কণ্ঠে এখনো কোকিলের সুমিষ্ট স্বর—কার তুলিতে রঙের রেখা সঙ্গীব হতে পারে—সেই সব অখ্যাত অজ্ঞাতদের প্রতি উপেন্দ্রনাথের দৃষ্টি সর্বদাই সজাগ। যার যেটুকু ভালো তাই নিয়ে তাকে সম্মান দেওয়া—এ এক মহৎ শিল্পিমনের গ্রহণকারী শিল্পসত্তা।

দীঘায় চলেছেন উপেন্দ্রনাথ। বাসে বহু সহযাত্রী। একজন গৃহস্থবধূ স্বামী এবং দুটি ছেলে মেয়ে নিয়ে চলেছেন—উপেন্দ্রনাথের সহযাত্রী একই বাসে। স্বামীটি স্থানীয় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ডাক্তার। উপেন্দ্রনাথের সঙ্গী ডাক্তার কজেন্দ্র পালকে দেখে সম্মানের সঙ্গে স্বামীটি এগিয়ে এলেন—'স্যর আপনি!'

ডাক্তার পাল জবাব দিলেন,—'হ্যাঁ, তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছি, সঙ্গে বিখ্যাত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।'

বধূটি তখন এগিয়ে এসে উপেন্দ্রনাথকে প্রণাম জানালেন: 'আপনার লেখার একান্ত অনুরাগিণী। বিদুষী-ভার্য্যা মুখস্থ করে ফেলেছি।'

উপেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন,—'আপনি?'

'আপনি নয়, তুমি। আপনি আমার দাদু।'

'তা হলে আমিও তুমি। বলো, তুমি।'

'তুমি।'

'বেশ, একদিন বেড়াতে এসো দীঘায়, সাদাকোঠিবাসে।'

'নিশ্চয়ই যাবো।'

শ্রীমতী উমা দেবী এলেন। এসেই আসর মাৎ।

'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি গান জানো।'—উপেন্দ্রনাথের কথায় উমা দেবী কিন্তু কিন্তু করছিলেন। উপেন্দ্রনাথ নিজেই তখন গান ধরলেন,—'এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে।'

এরপর আর 'না' করা চলে না। উমা দেবী গাইলেন—রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদের গান।

উপেন্দ্রনাথ বললেন,—'নাচতে হবে। তোমার গান শুনলাম, খুশি হলাম। কিন্তু আমি জানি তুমি নাচতেও পারো।'

'না, কক্ষনো নয়!'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'কী করে জানলেন?'

'আহা, এটুকুও যদি না জানি, তা হলে আর উপেন গাঙ্গুলি হলাম কেন?'

'উপেন গাঙ্গুলি বলতে পারেন কে লিখতে জানে।'

'কে গাইতে জানে, কে নাচতে জানে, উপেন গাঙ্গুলি তাও যে জানে, তার প্রমাণ তুমি নাওনি উষা।' উপেন্দ্রনাথ আবার গান ধরলেন,—'এসো নীপবনে, ছায়াবীথি তলে।'

উষা তখন জননী এবং চিকিৎসকের ঘরণী নন, তাঁর ঘুমন্ত শিল্পী মনে নৃত্যের নব জাগরণ।

উমাদেবীর আমন্ত্রণে দীঘা থেকে তার পূর্বস্থলী গ্রামে একটি পরিচ্ছন্ন মাটির আঙিনায় আমাকে সঙ্গে নিয়ে একদিন উপেন্দ্রনাথ গেলেন। সারা সকাল তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করে পরিতৃপ্ত হলেন। গান শুনলেন আর গোপন খাতাখানি থেকে কয়েকটি লেখা পড়ে তারিফও করলেন।

জীবন থেকে জীবনের শিল্পকে খুঁজে বার করার যে কলাকৌশল—জীবন-শিল্পী উপেন্দ্রনাথের তা সহজাত।

শাদাশিধে পোশাকের, শাদাসিধে গয়নাগাঁটির, সাদাসিধে ভাবভঙ্গির মেয়ে—যাঁকে দেখে মনে হবে আই-এ ক্লাসের, বড়জোর বি-এ ক্লাসের একটি ছাত্রী—তিনি উপেন্দ্রনাথের ভাষায় 'দুর্গার মেয়ে'! কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিন্ডিকুলে এম-এস্-সিতে ফার্স্টক্লাস সেকেণ্ড, ডি. ফিল্, মোরাট মেডালিস্ট এবং ফুলব্রাইট-স্মিথ-মুনড্-স্কলারশিপ হোল্ডার শ্রীমতী রাণী ঘর, বর্তমানে ডক্টর শোভনা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সবিশেষ পরিচিতি লাভ ঘটেছিল উপেন্দ্রনাথের আনুকূল্যে।

আহ্বান সংস্কৃতি পরিষদে উপেন্দ্রনাথ রচিত কৌতুকনাট্য, 'উটরোগ' মহড়া শুরু হয়েছে। আহ্বান সংস্কৃতি পরিষদের তরুণ-সাহিত্যানুরাগী মেম্বারবা আছেন। আর বয়োজ্যেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে আছেন স্বয়ং উপেন্দ্রনাথ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, হরিশুরু দেব এবং কবি কৃষ্ণধন দে। প্রধান মন্ত্রীর ভূমিকায় আছি আমি। এ-ভূমিকায় স্বয়ং উপেন্দ্রনাথের মনোনীত প্রার্থী আমি। নিউ মার্কেটের ক্লক-টাওয়ার সংলগ্ন কলিকাতা করপোরেশনের প্রেস মুপারিন্টেন্ডেন্টের কোয়ার্টার্স এবং তারই খোলা মেলা ছাদে মহড়া জমজমাট।

রাজা আছেন, মন্ত্রী আছেন, রাজবৈদ্য, রাজ পুরোহিত—জমকালো রাজসভা—নর্তকীর নৃত্য, গীতে এবং অভিনয়ের মহড়ায় আসর বেশ জমে উঠেছে। পরিচালক বীরেন পালের উৎসাহের আর সীমা নেই। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় গান গেয়ে আর মোটা চুরুটের ধোঁওয়ায় রাজসভা মুখর করে রেখেছেন। উপেনবাবু বই-এর মহড়া—পবিত্রবাবু যৌবনোচিত উদ্যম সেক্ষেত্রে। কিন্তু রাণী নিয়ে সমস্যা।

উপেন্দ্রনাথ রাজবৈদ্য। তিনি মহড়া শুরু করলেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। রাজমহিষীর ভূমিকায় মনোনীত হয়েছিলেন ডক্টর রাণী ঘর। রাণীর মতন আভিজাত্য তাঁর। আর উপেন্দ্রনাথের কথা ফেলতে পারেন না লেডী ব্রেবোর্ন কলেজের কিন্ডিকুলের অধিকর্ত্রী। শ্রীমতী রাণী ঘর সর্বদিক থেকেই রাণী হওয়ার উপযুক্ত। একটু কিন্তু কিন্তু ছিল—রাণী ঘর ইতিপূর্বে কখনো রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন নি। তিনি সঙ্গীতে সবিশেষ পারদর্শিনী—আর প্রধান অধ্যাপিকাকে অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চে ছাত্রীরা দেখলে মনে করবে কী!

কিন্তু যে-ক্ষেত্রে উপেন্দ্রনাথ রয়েছেন—সেখানে কোন কিন্তুর স্থান নেই। আর এক 'কিন্তু'

এসেই সমস্যার সৃষ্টি করলো। শ্রীমতী রাণী ঘরের বিবাহ স্থির হয়ে গেছে। পাত্র ডক্টর মুখোপাধ্যায় উচ্চশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত এবং সুদর্শন। তিনিও মহড়ায় মাঝে মাঝে উপস্থিত হন।

'উট রোগ' সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই বিবাহের দিন ধার্য হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আসল রাণীর স্থান থেকে নকল রাণীর অপসারণ আর আটকে রাখা যায় না শ্রীমতী রাণী ঘরকে—অন্তত সুবিবেচক উপেন্দ্রনাথ তা সমীচীন-মনে করেন না। সুতরাং নতুন রাণীর সন্ধানে ব্যস্ত হলেন উপেন্দ্রনাথ।

যাঁকে নিয়ে এলেন তাঁকে এক নজরেই চিনেছিলেন তিনি। 'মন্দিরময় ভারত'-এর লেখক অপূর্বরতন ভাদুড়ি উপেন্দ্রনাথের প্রতিবেশি। অপূর্বরতন ভাদুড়িকে বাংলা সাহিত্যে প্রবেশাধিকার দিয়েছিলেন উপেন্দ্রনাথ। একদিন বালিগঞ্জের লেকের ধারে সান্ধ্য-ভ্রমণের পথে অপূর্ববাবুর এক বন্ধু-কন্যাকে দেখে উপেন্দ্রনাথ তাঁকে 'উটরোগ'-এর মহারাণীর ভূমিকায় অভিনয় করার জন্যে অনুরোধ জানালেন। মেয়েটি যেমন খুশি তেমনি অভিনয় দক্ষ। বিখ্যাত নাটকার এবং অভিনেতা 'একমুঠো আকাশে'-প্রণেতা ধনঞ্জয় বৈরাগীর তালিকায় মহারাণীর ভূমিকায় অভিনয় করা অহরীর বর-চেনার শামিল।

রসের ক্ষেত্রে উপেন্দ্রনাথ অহরীর চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছেন—কোথায় কোন্ সম্ভাবনাময় মণিমুক্তো হীরে অহরৎ অনাদরে অবজ্ঞায় উপেক্ষিত। বৈজ্ঞানিক ডক্টর রাণী ঘর ফিজিক্সের গবেষণায় যে প্রতিভাকে ব্যক্ত করেছেন, তা তাঁর এ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন। কিন্তু তিনি যে অত্যন্ত সুগায়িকা, সুরসিকা কবি এবং সাহিত্যপ্রিয়, তিনি যে কুশলী অভিনেত্রী—এ আবিষ্কার উপেন্দ্রনাথের নিজস্ব দৃষ্টি।

উপেন্দ্রনাথ সংরক্ষণশীল নন। বিচিত্রায় তিনি বিচিত্র সাহিত্য-ধর্মীদের সমাবেশ ঘটাচ্ছেন। যত মত তত পথ—উপেন্দ্রনাথ বিচিত্র মতের সমর্থক। ভালোকে ভালো বলতে তিনি মুক্ত-হৃদয়। ভালোকে চিনবার আকাঙ্ক্ষা, নবাগতকে স্বাগতবাদ জানাবার সদিচ্ছা তাঁর চিরদিনের। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রকে সবাই চিনেছিল, কিন্তু 'বেদে'র লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সাহিত্যিক পরিণতির কথা তখনকার দিনে যাঁরা ভেবেছিলেন তাঁরা আধুনিককালের লোক। শশীনাথের লেখক আধুনিক কালের চোখে অচিন্ত্যকুমারকে চিনেছিলেন—তাই 'বিচিত্রা'র সহকারী সম্পাদকরূপে অচিন্ত্যকুমারকে তিনি সাদরে বরণ করে নিয়েছিলেন।

ভাদুবাজার অঞ্চলে মোহনবাগান স্ট্রীটে 'যাযাবর' এবং 'কলরবে'র তরুণ লেখক প্রবোধকুমার সান্যাল তখন বসবাস করেন। কেইবা তখন অনুমান করতে পেরেছিল 'মহাপ্রস্থানের পথে'র সম্ভাবনার বীজ তরুণ প্রবোধ সান্যালের মধ্যে অন্তর্নিহিত।

'অতসী মামী'র অখ্যাত লেখক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বালিগঞ্জ হিন্দুস্থান পার্কের আবাস ভূমিতে যে প্রধান সম্পাদক একদা ছুটেছিলেন ভবিষ্যতের বাংলা-সাহিত্যের সম্ভাবনাকে সমর্থনা জানাতে, তিনিই আর একদিন ছুটেছিলেন মোহন বাগান স্ট্রীটে 'প্রিয় বান্ধবী'র লেখক প্রবোধকুমার সান্যালকে বিচিত্রার আসরে যোগদান করার সাদর এবং সাগ্রহ আমন্ত্রণ নিয়ে।

'রাত্রী দেবতা' তখনো বাংলা-সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করে নি। 'রাত্রী দেবতা'র প্রখ্যাত লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার সাহিত্যিক সমাজে নবাগত। সাহিত্য-সেবক সমিতি তখন জন-জমাট। স্বর্গীয় কর্মযোগী রায়ের গৃহে একদিন সাহিত্য-সেবক সমিতির সাহিত্য অধিবেশন বসেছে।

সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র সেন প্রবেশ করলেন অধ্যাত্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে। তারাশঙ্কর বাবু একটি ছোট গল্প পাঠ করলেন সেদিনের অধিবেশনে। সমাগত সাহিত্যিক এবং সমালোচকবৃন্দ সে গল্পকে নস্যাৎ করতে সমালোচনায় মুখর। লেখক তারাশঙ্কর তখন ভাবছেন, : 'ধরণী দ্বিধা হও'।

সভাপতি উপেন্দ্রনাথ সভাপতির ভাষণ দিলেন। বললেন,—'একটি আবির্ভাবকে দেখে আজ আমি আশ্বস্ত। প্রতিভার উদয় সম্বন্ধে আমি স্বাগতবাদ জানাচ্ছি।' সভার সকলে তখন নতুন দৃষ্টি মেলে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে ফিরে তাকালেন। সাহিত্যিক সৃষ্টির এইরকম আশ্বাসস্থল হলেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

শুধুমাত্র শক্তিশালী লেখকদেরই যে চিনেছিলেন উপেন্দ্রনাথ তা নয়। যাঁরা অপেক্ষাকৃত স্বল্প শক্তিশালী তাঁদের প্রতিও উপেন্দ্রনাথের অকৃপণ অনুরাগ। চারা গাছের সোড়ায় সযত্নে জলসেচনে কোন্ গাছটি যে ফুলে ফলে ভবিষ্যতে ভরে উঠবে—সে-কথা কে বলতে পারে! সাময়িক কালই তো সাহিত্যের শেষ কষ্টি-পাথর নয়!

ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লণ্ডন থেকে ফিরেছেন—প্রাণীতত্ত্বের গবেষণায় কৃতকার্য হয়ে। সুশ্রী সুদর্শন যুবক। যেমন মিষ্টি চেহারা তেমনি মিষ্টি ব্যবহার। উপেন্দ্র-সদনে প্রথম দিন এলেন কিন্তু রুষ্ট হয়ে। রবি ভট্টাচার্যের প্রচণ্ড অভিযোগ—দেশের সম্পাদক মণ্ডলী আজ নবীন লেখকগণের প্রতি বিমুখ। অথচ বিদেশে যে-কোনো লেখকের প্রতি সম্পাদকের কী সাগ্রহ দৃষ্টি!

উপেন্দ্রনাথ তখন গল্প-ভারতীর সম্পাদক। রবি ভট্টাচার্যের অভিযোগ শুনলেন। বললেন, 'লেখা এনেছো?'

রবি ভট্টাচার্য অবাক্! প্রত্যক্ষভাবে তিনি নিজের লেখার কথা বলেন-নি কিন্তু। বললেন,—'একটা ভ্রমণ কাহিনী লেখা আরম্ভ করেছি।'

'কী ধরনের লেখা?'

'ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলতে পারেন, তার সঙ্গে সাংস্কৃতিক ইতিহাসও আছে।'

'সঙ্গে সে লেখা আছে?'

'আছে। প্রাথমিক কিছুটা ভূমিকা।'

'রেখে যাওয়ার অসুবিধে আছে কি?'

'না। তা নেই অবিশ্যি। তবে—'

'তবে কী?'

'যদি দয়া করে একটু শোনেন!'

'পড়ো তা হলে।'

রবি ভট্টাচার্য বিস্মিত। পরের সংখ্যায় গল্প-ভারতীতে লেখা গেল 'উত্তর ভারতের তীর্থে' ক্রমশঃ প্রকাশ্য হয়ে প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয়েছে। ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য পরবর্তী কালে যোগিসঙ্ঘ মৈত্রেয় রূপে বাংলা সাহিত্যে স্থান লাভ করেছেন। আর প্রাণ খোলা হাসিতে উপেন্দ্র-বৈঠক মাতিয়ে রেখেছেন।

অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন মাইতি উপেন্দ্রনাথের অত্যন্ত কাছের জন। এসেছিলেন প্রথমে দূর থেকে—'শৈলপুরী কুমারুন', তাঁর লন্ড প্রকাশিত গ্রন্থ নিয়ে। উপেন্দ্রনাথের ব্যবহারে আকৃষ্ট হলেন। হঠাৎ 'গল্প-ভারতী'র সম্পাদক ডেকে পাঠিয়েছেন তাঁকে।

'কী ব্যাপার?'

'তোমার বই পড়লাম। তোমার লেখার রূপকথার রোমান্স আছে। এইটেই হচ্ছে তোমার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।'

চিত্তরঞ্জন মাইতি বিস্মিত। ঘরে ডেকে সন্দেশ খাইয়ে এমন কথা তো কেউই বলে না। শুধু তাই নয়, গল্প-ভারতীতে লেখার জন্যে করমায়েস দিলেন। সেই থেকেই চিত্তরঞ্জন উপেন্দ্রনাথের আত্মীয়।

একজন লেখক একখানি বই পাঠিয়েছিলেন, সঙ্গে নৈরাশ্য-ত্রাসপীড়িত এক চিত্তের নিবিড় ব্যঞ্জনাময় পত্র। পত্রের একাংশে লেখা: 'এই বইখানিতে নানা ছাপার ত্রুটি থেকে গেছে। একটু ক্ষমা ঘেন্না করে বইখানি পড়বেন এবং আপনার গল্প-ভারতীতে একটু সমালোচনা করবেন—এই বিনীত অনুরোধ। কালব্যাধি ক্যান্সার— টুঁটি চেপে ধরেছে। মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। চির-বিদায়ের পূর্বে বইখানির সমালোচনা যদি প্রকাশিত হয়, কিছুটা শান্তিলাভ করবো।'

বইখানি 'ইয়েলো সিগন্যাল'— কয়েকটি গল্পের সংকলন। লেখক হচ্ছেন দুর্জটি অধিকারী।

সে চিঠির উত্তরে উপেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'গল্প-ভারতীতে পুস্তক সমালোচনা হয় না। কিন্তু যেটুকু করবো স্থির করেছি তা সমালোচনার চেয়ে কম হবে না বলে বিশ্বাস করি। 'ইয়েলো সিগন্যাল' শুধু আদ্যন্ত পড়িই নি,—কতক-কতক পড়েও শুনিয়েছি। আপনার প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ ক্যান্সারই হোক আর যাই হোক, আপনি সেরে উঠুন এবং লেখনী চালান। 'ইয়েলো সিগন্যালে'র প্রস্তুতি পর্বের ইতিহাস জানতে ঔৎসুক্য হয়। একদিনে এ বস্তু হয় না।'

এই চিঠি লিখেই ক্ষান্ত হন নি লেখক এবং মানব-দরদী উপেন্দ্রনাথ। শেষ বৈঠকে এই কাহিনী বিবৃত করে উপসংহারে তিনি লিখেছেন। 'ইয়েলো সিগন্যাল ও দুর্জটিবাবুর চিঠিটা তুলে রাখতে রাখতে মনে মনে প্রার্থনা করলাম, দুর্জটিবাবুর রোগ নির্ণয়ে চিকিৎসক যেন ভুল করে থাকেন, আর একান্তই তা যদি না করে থাকেন, দুর্জটিবাবুকে সারিয়ে তোলবার চিকিৎসা যেন তাঁর অধিকারে আসে।'

———

অপরিমেয় জীবনীশক্তির অধিকারী চার্লি চ্যাপলিন ॥

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আয়ারল্যাণ্ডের সুরম্য উপকূলে ৮৩-তম জন্মদিন পালন করে চার্লি চ্যাপলিন সুইজারল্যাণ্ডে জেনেভা হ্রদের তীরবর্তী তাঁর বাসভবনে ফিরে এসেছেন।

অন্তরে বাইরে তিনি এখন অনেকখানি নমনীয়। মনে হয় যেন শান্তি খুঁজে পেয়েছেন এতদিনে। আজকাল অল্প ঘুমোন। মাথার চুল এখন ধবধবে শাদা। মুখে গোঁফজোড়া অনেকদিনই ফেলে দিয়েছেন। কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে সেই তৃষিত অল-ভলে দীপ্তি এখনো দেখা যায়, যেমন দেখা গিয়েছিল 'গোল্ড রাশ' ছবিতে জুতো চিবনোর সময়।

দশ বছর সুইজারল্যাণ্ডে বসবাস করে চার্লি অনেকখানি বদলেছেন। সে উগ্র মেজাজ আর নেই। আমেরিকার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ্গার বন্ধ হয়েছে। কথায় কথায় মামলায় আর জড়িয়ে পড়েন না।

অক্সফোর্ড তাঁকে উপাধি দেবে। ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ও। এই আসন্ন সম্মান তাঁর জীবনকে যে গুরুত্ব দেবে তা তিনি উপলব্ধি করেছেন।

সুইজারল্যাণ্ডে ৬৯ একর [২০০ বিঘার উপর] জমির উপর ১৪ কামরাযুক্ত বাড়ির চারপাশে বাগান। বাড়ির অলিন্দ থেকে জেনেভা হ্রদ আর মন্ট ব্ল্যাঙ্ক পাহাড়শ্রেণীর শোভা উপভোগ করা যায়।

বৃহৎ পরিবার। ১৩টি ভৃত্য আর ২টি ধাত্রী। স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে চার্লির পরিবারের মেলামেশা নেই। চার্লি তাদের বলেন—নেটিভ। স্থানীয় ফরাসী ভাষাও তিনি কোনদিন রপ্ত করা প্রয়োজন বোধ করেন নি।

কিন্তু তাঁর বাড়িতে অভ্যাগত-আগন্তুকের আসার বিরাম নেই। হলিউডের পুরানো অভিনেতা, নানান দেশের নানা শিল্পী থেকে শুরু করে ভারতের প্রধান মন্ত্রী প্রমুখ বহু গুণী ও মনীষী তীর্থযাত্রীর মতো তাঁর বাড়িতে গিয়েছেন।

যখন এক যেয়ে অস্থির লাগে তখন চার্লি সপরিবারে দেশ ভ্রমণে বেরোন। জেনিস, প্যারিস, লণ্ডন অথবা আয়ারল্যাণ্ডের সমুদ্রতীর। লণ্ডনে যখন যান তখন বস্তির রাস্তা দিয়ে হাঁটতে ভালোবাসেন। এই বস্তির ধারেই তাঁর পিতৃমাতৃহীন অনাথ জীবনের সূচনা, এ কথা বোধ হয় ভুলতে পারেন না।

যখন দেশভ্রমণে বার হন তখন দু'খানা বা তিনখানা এরোপ্লেনে ভাগে ভাগে পরিবারের সকলে যায়। যদি বিমান-দুর্ঘটনা হয় তা হলে সবাই একসঙ্গে মারা যাবে না—সেইজন্যেই এই রকম ব্যবস্থা।

চার্লির আজকে সবচেয়ে খ্যাতি তাঁর সন্তান-উৎপাদন ক্ষমতায়। ৫৪ বছর বয়সের স্ত্রী উনা ১৮ বছরের বিবাহিত জীবনে তাঁকে সাতটি সন্তান উপহার দিয়েছেন। এবং বর্তমানে তিনি পুনরায় সন্তানসম্ভবা। উনা বলেছেন, এবার সহজ স্বাভাবিকভাবেই তিনি সন্তান প্রসব করবেন। উৎসাহভরে

তিনি বলেন, ভবিষ্যতে তাঁর বাচ্চারা স্বাভাবিক নিয়মেই ভূমিষ্ঠ হবে, কোন যান্ত্রিক সাহায্যে নয়।

এই সাতটি সন্তান ছাড়া চার্লির দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত আরও দুটি ছেলে আছে। দু'জনেই মার্কিন দেশের অভিনেতা এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত। বড় চার্লি জুনিয়রের বয়স ৩৬। বাপের সঙ্গে তাদের বিশেষ দেখা সাক্ষাৎ না হলেও তারা তাঁকে ভালোবাসে এবং সুযোগ পেলেই তাঁকে দেখবার জন্যে সুইজারল্যাণ্ডে আসে।

বিখ্যাত নাট্যকার ইউজীন ও'নীলের মেয়ে উনা চার্লির চতুর্থ পক্ষ। এবং তিনিই প্রথম এই উদ্দাম মানুষটিকে বাগে আনতে পেরেছেন। তাঁর অন্তহীন খেয়াল আর অপরিমেয় মেজাজ। দুই-ই নিঃশেষে নিজের আয়ত্তের মধ্যে এনেছেন উনা। স্বামীর প্রতি মুহূর্তের প্রত্যেকটি আচরণ তাঁর যেন আগে থেকেই জানা। বাগানে যখন চার্লি অন্যমনস্কভাবে পায়চারি করেন তখন উনা এগিয়ে গিয়ে গরম কোটটি তাঁর গায়ে চাপিয়ে দেন। আহারে বিহারে নিদ্রায় জাগরণে এই মানুষটির কখন কি প্রয়োজন তা হয়তো তিনি নিজেও জানেন না।

চার্লি কথা বলেন অনর্গল। উনা স্বল্পভাষিণী। স্বামীর প্রতি উনার অনুরাগ প্রায় পূজার মতো।

আলমারি ভর্তি হাল ফ্যাশনের বাহারি পোশাক, কিন্তু উনার সাজসজ্জা অত্যন্ত পাদামাটা। যাতে তাঁকে বয়সে ভারী দেখায়, বয়সে স্বামীর কাছাকাছি বলে মনে হয়, সেজন্যে উনার সাজে ও প্রসাধনে অপার কৃচ্ছ্রতা।

সুন্দরী মেয়ে উনা। ছেলে মেয়েদের মুখে মায়ের আদল আসে। বড় মেয়ে সন্তদেনী জেরাল ডাইন লণ্ডনে নাচের ইস্কুলের ছাত্রী। বাপের তেমন মত ছিল না নাচের ইস্কুলে মেয়েকে ভর্তি করতে। নাচগানের জগতে সুন্দরী তরুণীদের জীবনে যে কতো বিপদ আসে তা তাঁর চেয়ে বেশি ক'জন জানে। বড়ো ছেলে মাইকেলের বয়স ষোলো। জেনেভার আন্তর্জাতিক বিদ্যালয়ে পড়ে। চার্লি মনে করেন, এই ছেলে তাঁর শিল্পী জীবনের যথার্থ উত্তরাধিকারী হবে।

অভিভাবক হিসাবে চার্লির কড়া শাসন। তাঁর হাতের চড় সাত জনের গালেই পড়েছে। ছেলে মেয়েরা সকলেই শান্ত এবং ভদ্র। আন্তর্জাতিক কৃত্রিম সভ্যতার ছোঁয়াচ তাদের গায়ে লাগে নি। ছেলে মেয়েদের নিয়ে ব্যাপৃত থাকলেও ব্যবসায়ে চার্লির শিথিলতা নেই। তাঁর অগণিত ছবির পৃথিবীব্যাপি পরিবেষণ কর্ম তিনি নিজের হাতে পরিচালনা করেন।

অদ্ভুত জীবনীশক্তির অধিকারী এই মানুষটি বর্তমানে আত্মজীবনী লিখছেন। লেখা প্রায় শেষ। বিরাট বই। শিগগিরই প্রথম খণ্ড লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হবে। পাণ্ডুলিপি বারবার পড়ছেন। বারবার বদল করছেন। পাতার পর পাতা ছিঁড়ে ফেলছেন। আবার লিখছেন। সেই সঙ্গে স্মৃতি মন্থন চলেছে অবিরাম। শোনা যায়, একটি চিত্রনাট্যও লিখছেন। মহাকাশ ভ্রমণ নিয়ে একটি হাসির গল্পও নাকি তৈরি করছেন। কিন্তু এইসব বোধ হয় এখনো খেয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ আছে।

১৯৫৭ সনে মুক্তিপ্রাপ্ত তাঁর শেষ ছবি 'এ কিং ইন নিউইয়র্ক' ব্যবসায়ের দিক থেকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। তারপর তিনি যে আর ছবি করবেন তা মনে হয় না।

ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বেড়াতে খুব ভালোবাসেন। গ্রামে যখন সার্কাস আসে তখন তাঁর

দেশ-বিদেশ

সোভিয়েত সাহিত্য ও সমকালীন সমাজ ॥

সোভিয়েত জনসাধারণের সাহিত্য-প্রীতির কথা সুবিদিত। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র সফরে আসত বিদেশীদের চোখে যে দৃশ্যটি সবচেয়ে বেশি করে পড়ে, সেটা হল—বইয়ের দোকানে দোকানে ক্রেতাদের লম্বা সারি, বাসে ট্রামে আর মেট্রোয় বই পড়ছে যাত্রীর দল, পার্কের বেঞ্চিতে বা গাছের তলায় পাঠরত নারী বা বয়সের মানুষ। একথা অসংখ্য বিদেশী পর্যটক সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা লিখতে গিয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

সোভিয়েত জনসাধারণের এই সাহিত্য-প্রীতির আরেকটা খুব বড়ো প্রমাণ হল নতুন প্রকাশিত কোনো সাহিত্যগ্রন্থ সম্পর্কে পাঠকদের আলোচনার আসর। প্রত্যেকটি সংস্কৃতি-ভবনে, ওয়ার্কার্স ক্লাবে, ইস্কুলে কলেজে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, পাড়ায় পাড়ায় গ্রন্থাগারে পাঠাগারে, ছুটি উপভোগের কেন্দ্রে ও স্বাস্থ্যনিবাসে—সর্বত্র নিয়মিতভাবে সাহিত্যের আসর বসে। এইসব সাহিত্য আলোচনা বৈঠকে খুব সাধারণ লোকেরা খোলাখুলি নিজেদের মতামত বলে থাকেন। গল্প উপন্যাস নাটক কবিতা সম্পর্কে নিজেদের বক্তব্য পেশ করেন, সাম্প্রতিকতম উপন্যাস বা অন্য কোনো সাহিত্য-গ্রন্থটি পড়ে তাঁর যা মনে হয়েছে তাই বলেন। বহু ক্ষেত্রে এইসব সভায় স্বয়ং গ্রন্থকার উপস্থিত থাকেন, প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচকরা ও সাহিত্যের শিক্ষক অধ্যাপকরা এইসব আলোচনা-বৈঠকে এসে পাঠক সাধারণের বক্তব্য শোনেন, নিজেদের বক্তব্য শোনান।

তার ফলে, একদিকে যেমন সাধারণ পাঠকদের সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি বাড়ে, রুচি উন্নত হয়,—অন্যদিকে তেমনি সাহিত্যিকরা সরাসরি পাঠক সাধারণের সংস্পর্শে এসে, তাদের মতামত শুনে, তাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে বিশেষভাবে লাভবান হন। ম্যাক্সিম গোর্কি এই ধরনের পাঠক সাধারণের আলোচনা বৈঠককে বলতেন: "সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠ শিক্ষানিকেতন"। গোর্কি প্রায়ই তাঁর নিজের লেখা গল্পগুলি নিরক্ষর শ্রমিক-কৃষকদের পড়ে শোনাতেন এবং তাদের সহজ ভাষায় বলা সরল সমালোচনাগুলি গভীর মনোযোগের সঙ্গে ও শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনতেন। "যাদের নিয়ে গল্প লিখেছি, তারাই তো আমার রচনার শ্রেষ্ঠ বিচারক"—এ কথা তিনি বারবার বলতেন।

সোভিয়েত লেখকরা ও প্রকাশকরা পাঠকদের কাছ থেকে অসংখ্য চিঠি পান। এইসব চিঠিতে বহু পাঠক লেখকের তীব্র সমালোচনা করেন। সোভিয়েত দেশের অতি সাধারণ মানুষ এই যে সচেতন মন নিয়ে সাহিত্যের ব্যাপারে সাড়া দেন, এর পেছনে আছে এই চেতনা যে তাঁরাই হলেন সোভিয়েত সমাজ জীবনের স্রষ্টা। এই সমাজের মানুষদের নিয়ে যাঁরা লিখছেন তাঁদের রচনাবলী এই সমাজ নির্মাতাদের কাছে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ। এই চেতনা থেকেই সোভিয়েত দেশের জনসাধারণ বিপুল আগ্রহ নিয়ে তাঁদের লেখকদের প্রত্যেকটি নতুন রচনা পড়ে থাকেন। এই বিপুলসংখ্যক পাঠক সাধারণের চাহিদা মেটাবার জন্যেই প্রত্যেকটি সোভিয়েত সাহিত্যগ্রন্থ মুদ্রিত হয় লাখো কপি।

শক্তিচালিত জাহাজ চালানো কিংবা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মাত্র একজন মানুষের পক্ষে শুধু কতকগুলি বোতাম টিপে পুরো একটা তৈলখনির সমস্ত কাজ কাজ পরিচালনা করার ব্যাপারগুলি ছিল অনেক দূরের লক্ষ্য। সেদিন সবেমাত্র গড়ে উঠছিল প্রথম যৌথ খামারগুলি অনেক পুরাতন সংস্কার, পুরাতন চিন্তাধারার জটিলতা কাটিয়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে। সেদিন সোভিয়েত কৃষকদের কাছে স্বয়ংক্রিয় কম্বাইন হার্ভেস্টার আর লক্ষ লক্ষ একর অরণ্যাভূমিতে ফসল ফলানো ছিল কল্পনামাত্র। কিন্তু তার সম্ভাবনাটি যে বাস্তব, সোভিয়েত সমাজের নতুন মানুষই যে এইসব ব্যাপারকে খুব শীঘ্র সম্ভব করে তুলবে—তার ইঙ্গিত দিয়েছে এ প্রেরণা জুগিয়েছে ওইসব রচনা। এইসব রচনার মধ্যে দিয়ে সোভিয়েত জনগণ তাদের ভবিষ্যৎকে, তাদের শ্রমের ফলকে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পায়, তাদের সংগ্রামকে জয়যুক্ত করার প্রেরণা পায়।

চার ॥

তারপরে এল তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশরক্ষার জন্যে মরণ আত্মত্যাগের আহ্বান। সমগ্র সোভিয়েত জনগণের সঙ্গে সোভিয়েত লেখকরাও সেদিন একহাতে কলম আর অন্য হাতে বেয়নেট নিয়ে জার্মান ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শামিল হয়েছিলেন। সোভিয়েত জনগণের সেই অতুলনীয় বীরত্ব আর আত্মত্যাগ রূপায়িত হয়ে আছে: সিমনভের "ডেজ অ্যাণ্ড নাইটস্," গ্রস্মানের "দি লিগল্ ইম্মর্ট্যাল," গোর্বাতভের "আন্‌ভ্যানকুইশড," ওভারদোভ্‌স্কির "ভালিলি তেরকিন্," কাদাইয়েভের "দি ইয়ং গার্ড," পলেভয়ের "দি স্টোরি অফ এ রিয়াল ম্যান" ইত্যাদি উপন্যাসে ও গল্প-সংগ্রহগ্রন্থে। এসব বই, পূর্বোল্লিখিত বইগুলির মতোই, সমগ্র বিশ্বে জনপ্রিয় হয়েছে, নানা দেশের ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এসব রচনার মূল্য শুধু যুদ্ধের পটভূমিকায় সাধারণ সোভিয়েত মানুষের ইতিহাস হিসেবেই নয়।

পাঁচ ॥

আজকের দিনের সোভিয়েত সাহিত্যও সমকালীন জীবনকে চিত্রিত করছে সততার সঙ্গে। জি. নিকোলায়েভার উপন্যাস "ব্যাটল অন দি রোড"-এ বর্ণিত হয়েছে একটি বড়ো কারখানার কর্মীদের জীবন। ই. মল্‌চেনকের "এভরি এভরি হোম"-এর বিষয় হল একটি যৌথখামার। অরণ্যাভূমিকে উদ্ধার করার অভিযানে আত্মনিয়োগ করেছে—এই রকম একদল তরুণ-তরুণী চরিত্রায়িত হয়েছে এম. বুবেনকের "ইগল্ স্টেপ" উপন্যাসে। ভি. এক্‌সেনভের "কোলিয়স্" উপন্যাস গড়ে উঠেছে চিকিৎসাবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর একদল তরুণ-তরুণীকে নিয়ে—যারা সদ্য চিকিৎসকের কাজে নিযুক্ত হয়েছে। জি. বেরেক্‌কদের সাম্প্রতিকতম উপন্যাস "মাইটিয়ার দ্যান দি অ্যাটম" এর বিষয়বস্তু হল সোভিয়েত সেনাবাহিনীর লোকদের দৈনন্দিন জীবন। তরুণ লেখক ই. সেমেনভ একটি চমৎকার উপন্যাসে মেরু অভিযাত্রী সোভিয়েত বিজ্ঞানীদলের প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে গবেষণা চালাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মানবিক দিকটিকে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আরেকজন তরুণ লেখক এস. জাবিগিন দুর্গম তাইগা অঞ্চলে একদল ভূতাত্ত্বিকের প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধানের বিষয় নিয়ে অপূর্ব মানবিক আবেদনে ভরা একটি উপন্যাস লিখেছেন।

অনেকগুলি সাম্প্রতিক সোভিয়েত উপন্যাসের মধ্যে মাত্র কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা গেল। এই সবগুলিতেই আজকের দিনের সোভিয়েত জনসাধারণের বহুমুখী কর্মকাণ্ডের এক-একটি

দিককে উপস্থিত করা হয়েছে। সমকালীন সোভিয়েত সমাজের এইসব প্রতিনিধিস্থানীয় মানুষের চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের এইসব নতুন মানুষ জীবনের সবচেয়ে বড়ো চরিতার্থতা খুঁজে পায় সমাজের কল্যাণের জন্যে কাজ করার মধ্যে দিয়ে। সেই সঙ্গে এইসব মানুষের দোষত্রুটির দিকেও লেখকরা চোখ বুজে থাকেন নি। পুরাতন মূল্যবোধকে ও চিন্তাধারাকে কাটিয়ে ওঠার জন্যে এইসব মানুষদের অনেককেই কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে, কেউ কেউ আবার এই সংগ্রামে পরাজয়ও স্বীকার করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষের জয়টাই হল সাধারণ সত্য। সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতার ওপরে জয়ী হচ্ছে উদারতা ও আত্মত্যাগ। সমসাময়িক জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে সোভিয়েত লেখকরা এইসব উপন্যাসে ব্যক্তিজীবনের ও সমাজজীবনের বিরোধিতাগুলিকে, নূতন মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামকে উদ্‌ঘাটিত করতে পিছপাও হননি।

নিকোলায়েভার উপন্যাসে এই সংগ্রাম রূপ পেয়েছে কারখানার প্রধান ইঞ্জিনিয়ার বাখিরফের সঙ্গে কারখানার অযোগ্য ডিরেকটার তালগান্‌-এর সংঘাতের মধ্যে দিয়ে। মলংসেফের নায়ক দিমশাকফকে যৌথখামারের অপদার্থ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে। আক্‌সেনফের উপন্যাসটির মর্মকথা হল—ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বার্থের চেয়ে অনেক বড়ো হল সমাজের স্বার্থ। বেরেজকোর উপন্যাসে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর তরুণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাব্যবস্থার অনেক সমালোচনা আছে।

৩য়

আমাদের কালে সোভিয়েত জনগণ যখন নতুন এক সমাজ গড়ে তোলার কাজকে সম্পূর্ণ করে আনছে—যে-সমাজে "মানুষ মানুষের বন্ধু, সতীর্থ ও ভাই"—তখন লেখকদের আর পাঠকদের কাছে নৈতিক আর আত্মিক বিষয়গুলি হল বিরাট গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বোল্লিখিত সমস্ত উপন্যাসেই কর্মক্ষেত্রে ও ব্যক্তিজীবনে তাই স্বভাবতঃই এইসব নৈতিক সম্পর্কের দিকগুলি বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছে। অনেক উপন্যাসেই প্রধান বিষয়বস্তু হিসেবে এসেছে এসেছে প্রেম, পারিবারিক সম্পর্ক, বিশ্বস্ততা ও সততা। এই ধরণের একটি সাম্প্রতিক উপন্যাস হল এঙ্ক, ভিনদোরাভার "ম্যারিট্যাল হ্যাপিনেস," উপন্যাসটি একটি তরুণীর গুরুতর এক নৈতিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

সমকালীন জীবনকে চিত্রিত করার জন্যে সমসাময়িক ঘটনাবলীকেই আশ্রয় করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। অতীতের ঘটনাকেও উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে অবলম্বন করা যায় যদি সমসাময়িক জীবনপ্রবাহের পটভূমি হিসেবে তার তাৎপর্য থাকে। সমকালীন জীবনের সেই পরিপ্রেক্ষিতকে উপলব্ধি করার সার্থক প্রয়াস হিসেবে তিনটি খুব উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক উপন্যাস হল : বোন্ডারেফের "দি লাস্ট সল্‌ভস," সিমনফের "দি লিভিং অ্যাণ্ড দি ডেড" এবং কাজাকেভিচের "থ্রু নোটবুক।" এই শেষের বইটির একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হলেন লেনিন।

———

বিশ্ব
ব্যঙ্গ
চিত্র

॥ বিশ্ব-ব্যঙ্গচিত্র ॥

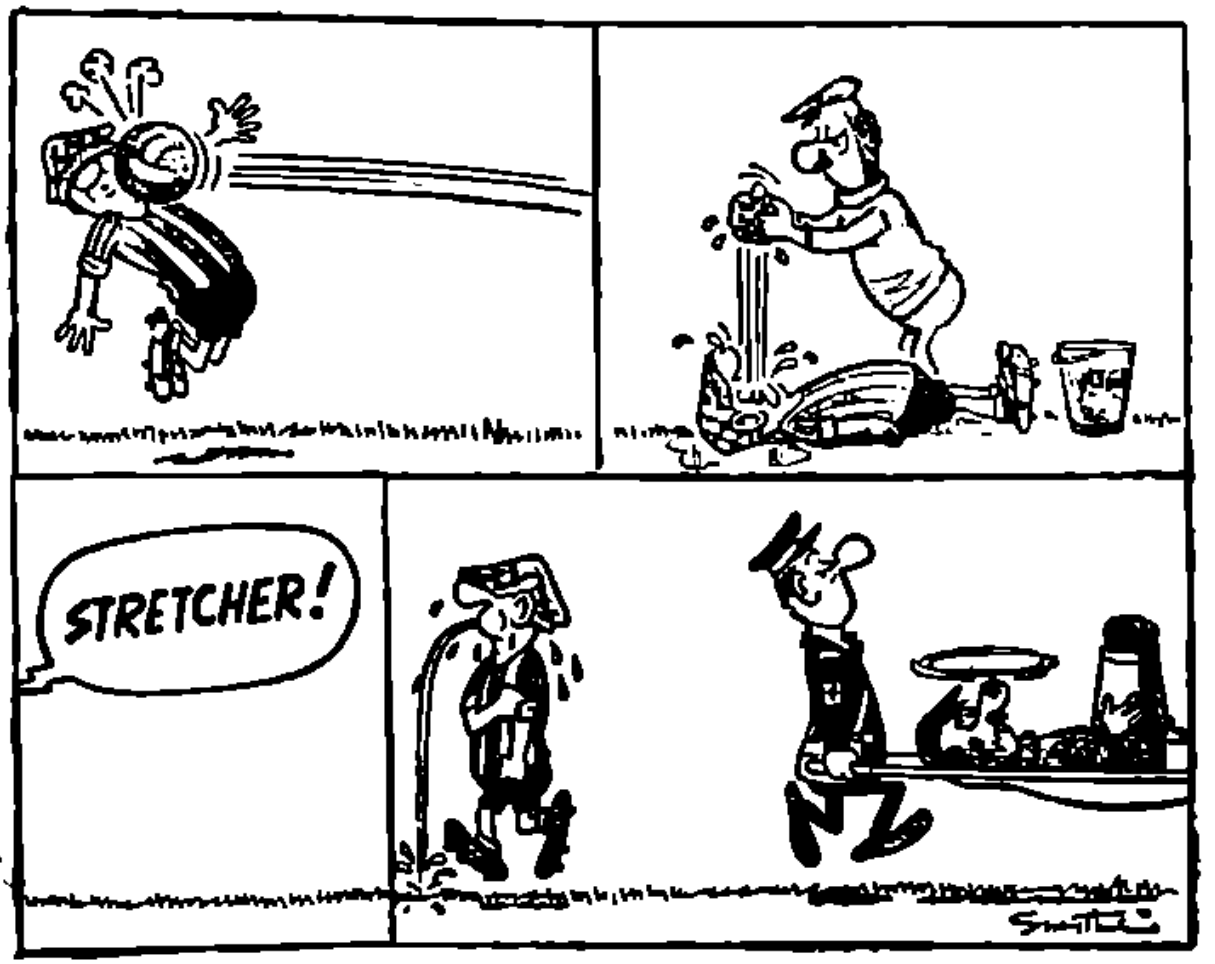

॥ বিশ্ব-ব্যঙ্গচিত্র ॥

সুইডেন

[illegible]

ইংল্যাণ্ড

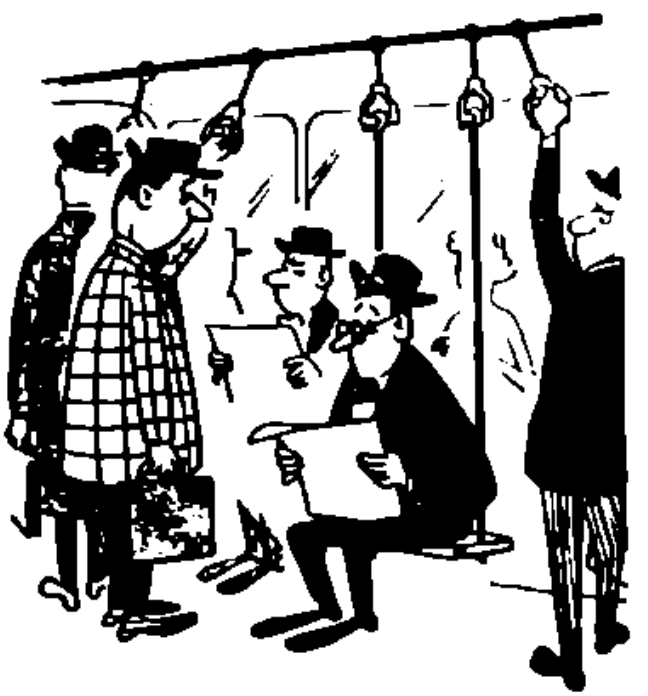

চাই নাই, চাই নাই, ছোট সে তরী।

॥ বিশ্ব-ব্যঙ্গচিত্র ॥

ফ্রান্স

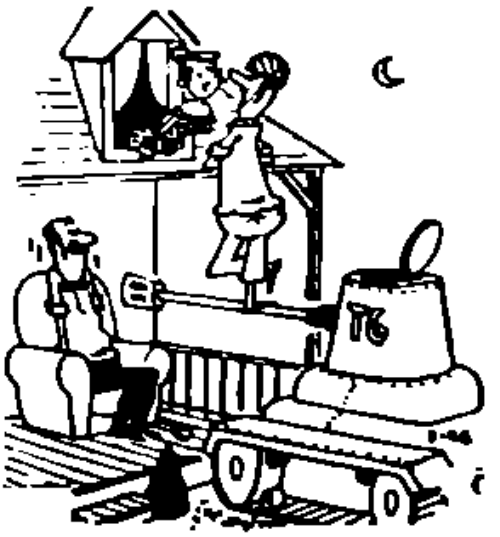

দেখ প্রিয়ে! আমাদের অবাধ যৌনস্বাধীনতা ভোমাকে ধারণার বেশ মধ্যে আছে।

ডেনমার্ক

পিটার, জানোতো আমার কথার কখনও নড়চড় হয় না। ও আমি ঘৃণা করি, কিন্তু আজ বিকালে বড় মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে—কিছুতেই যেতে পারছি না।

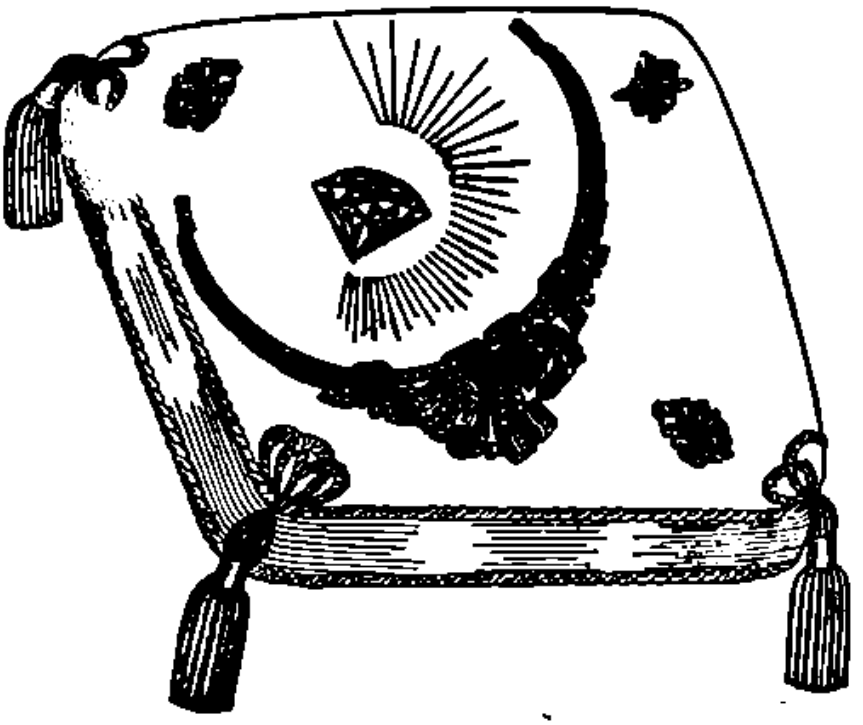

আধুনিকতম রুচির সর্ব্বপ্রকার স্বর্ণ-অলঙ্কার, মণি, মুক্তা, হীরা,
জহরত প্রভৃতির অপূর্ব্ব সম্ভার।
বিবাহ ও উৎসব অনুষ্ঠানে প্রিয়জনকে উপহার দিবার
নানাপ্রকার অভিনব ও চিত্তাকর্ষক অলঙ্কার।

বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্

স্থাপিত ১৮৮২

১-এ, বেণ্টিক ষ্ট্রীট (মার্কেণ্টাইল বিল্ডিংস্), কলিকাতা।

ফোন : ২২-২২৭০

ব্রাঞ্চ :—৮৪, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

ফোন : ৪৭-১২৫৮

আনন্দে উৎসবে...

প্রাত্যহিক প্রয়োজন..

সবার মনোরঞ্জনে...

পরিণামরমণীয়

কেশতৈল

কেশরঞ্জন

কবিরাজ এন,এল, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১

মৃত সঞ্জীবনী সুরা

আয়ুর্ব্বেদোক্ত অমৃত তুল্য মহৌষধ।

গুণে, গন্ধে ও বর্ণে যথাযথ ও শাস্ত্রানুরূপ।

মৃতকল্প ব্যক্তিকেও সঞ্জীবিত করে। বল, বীর্য্য, মেধা, বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করিয়া নূতন জীবন দান করে। সর্ব্বপ্রকার দৌর্ব্বল্যে, কঠিন রোগভোগের পর, প্রসবান্তে ও স্মৃতিশক্তিহীনতায় অমৃতের মত কাজ করে ও স্নায়ুমণ্ডলকে সবল ও সতেজ করিয়া স্বাস্থ্যোজ্জ্বল জীবন দান করে।

মূল্য—৪৲ টাকা পাইট ও ২৷৷০ টাকা কোয়াট

অদ্যাবধি অক্ষুণ্ণ আছর

শক্তি ঔষধালয়—ঢাকা প্রাইভেট লিঃ

শাখাসমূহ : ঢাকা (পূর্ব্ব পাকিস্তান) ও চন্দননগর (ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন)

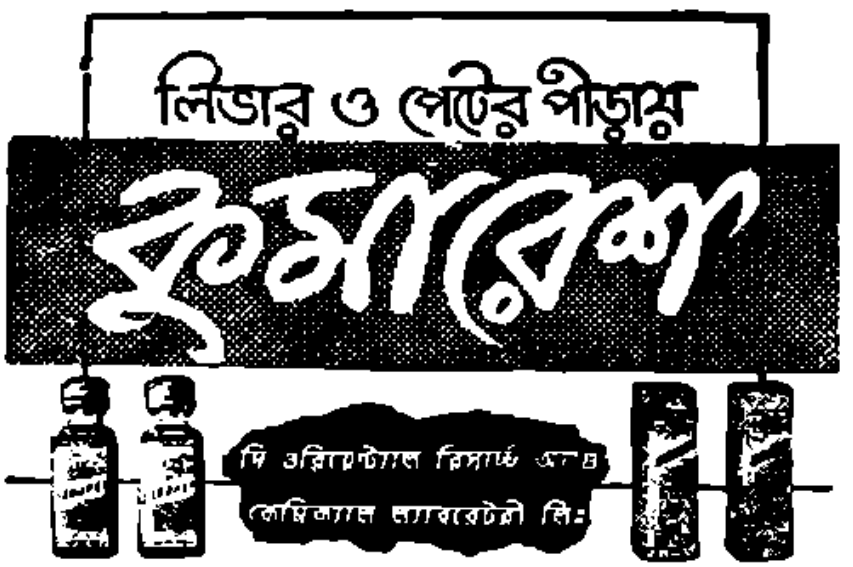

লিলির

রিচ

নোনতা

বিস্কুট

লিলি বিস্কুট কোং.প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

হ্যালডোর কিলিয়ান ল্যাক্‌স্‌নেস ॥

কোনো বিশেষ 'ইডিওলজি' অর্থাৎ রাজনৈতিক প্রত্যয়ে ল্যাক্‌স্‌নেসের ভাবনা চিন্তা পরিচালিত এ ধারণা নেহাতই অমূলক। তাঁর বামপন্থী আনুগত্যের যে কাহিনী আজ পশ্চিমী দুনিয়ায় সুপরিচিত তা ঘটনা নয় রটনা। ল্যাক্‌স্‌নেসের সাহিত্য-কর্মেও তার নিরুত্তাপ শান্ত সংযমী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। 'ওলিম্পিয়ান' বিশেষণটি অবশ্য তাঁর সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। তবে 'ডিটাচমেন্টের' গুণে এই শতকের কথা-সাহিত্যে ল্যাক্‌স্‌নেসের স্থান অনেক উঁচুতে।

ঔপন্যাসিক হিসাবে ল্যাক্‌স্‌নেস স্ক্যানডিনেভিয়ান কথাসাহিত্যে একটি নব রীতির স্রষ্টা হিসাবে সুপরিচিত। পূর্বসূরীদের সাগাপ্রধান রচনারীতির বাঁধা সড়ক ছেড়ে তিনিই প্রথম ইংল্যান্ডের বর্তমানকে তাঁর উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য করলেন। অবশ্য লোকগাথা-উপকথার পরিবেশ একেবারে অনুপস্থিত নয়। এই পটভূমিতে পরবর্তীকালে লিখিত 'হ্যাপী ওয়ারিয়রস' ব্যঙ্গরসিক হিসেবে তাঁর দক্ষতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। বস্তুত ইংল্যান্ডের সেকাল-একাল ধরা পড়েছে ল্যাক্‌স্‌নেসের সাহিত্যে। সমকালীন জীবনের প্রতি তীব্র আসক্তিতে, প্রতীকের ব্যবহারে, বাস্তবের নিরাবরণ খলিষ্ঠ প্রকাশে তিনি হেমিংওয়ের সমগোত্রীয়। প্রসঙ্গত, হেমিংওয়ের 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস' তিনি অনুবাদ করেন।

ল্যাক্‌স্‌নেস প্রচুর লিখেছেন। সতেরো বছরে প্রথম উপন্যাস 'গাইন্ড অব নেচার' প্রকাশিত হয়। সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি বিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধ, কবিতা, ছোটোগল্প, নাটক এবং উপন্যাস, অর্থাৎ সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রেই তাঁর অবদান বিস্ময়কর। তবুও প্রধানত তিনি ঔপন্যাসিক। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ, অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন রচনাগুলি ইংরাজিতে অনুবাদ হয় নি।

তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'সালকা তলকা' প্রকাশিত হয় তিরিশ দশকে। 'সালকা তলকা' উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ অবধি ল্যাক্‌স্‌নেসের সাহিত্য প্রতিভার অভ্রান্ত স্বাক্ষরের পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে। এই উপন্যাসটি মূলতঃ বাস্তবের নিরাবরণ আর বেদনাময় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সালকার কৈশোর থেকে যৌবন আর নারীত্বে উপনীত হবার অনবদ্য রম্য কাহিনী।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্মকথা ॥

১৭৮৫ শক, ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে [সন ১২৫০ সালে, ১লা ভাদ্র তারিখে] তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৭৬১ শকে [১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে] মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' নামে এক সভাস্থাপন করেন, সে সভার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে, শাস্ত্র গ্রন্থ সমূহের মর্ম বাঙ্গালী জনসাধারণের উপযোগী করিয়া দেশে তাহার সুপ্রচার করা। এতৎকল্পে সেই সঙ্গে সঙ্গে 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' নামে একটি পাঠশালাও খোলা হইল —যাহাতে কেবল বাংলা ভাষাই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এ পাঠশালায় আর অন্য কোনও ভাষার অধ্যাপনা হইত না।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে পাদ্রী ডফ্ রেভা রামমোহন রায়ের বিশেষ সাহায্যে স্বপ্রতিষ্ঠিত স্কুলের পত্তন করিলেন। ডফ্ সাহেব তাঁর তেত্রিশ বৎসর খ্রীষ্টধর্ম প্রচার কার্যের [১৮৩০-১৮৬৩] মধ্যে দুইবার য়ুরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করে' অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেন। সেকালে য়ুরোপে ও আমেরিকাতে খ্রীষ্টানেতর ধর্মকে, বিশেষতঃ হিন্দুধর্মকে, অতি জঘন্য-মূর্তিতে চিত্রিত করে' খ্রীষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করলে, তথাকার ধনশীল ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ স্বভাবতই খ্রীষ্টধর্মের সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে, বিস্তর অর্থসাহায্য করতেন। পূর্বাপর প্রায় সকল মিশনরীই এই সহজ উপায়ে আপনাপন ধর্ম সম্প্রদায়ের সাহায্যকল্পে অর্থ সংগ্রহ করতেন। ডফ্ সাহেবও এমন সহজ উপায়ের আশ্রয় গ্রহণে দ্বিধা করেন নাই। ১৭৫৬ শকে [১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে] প্রথমবার স্বদেশে যান এবং সেখানে ১৭৬১শকে [১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে]

দেশ-বিদেশ

লিওনিদ ইলিইচ ব্রেজনেভ

সুপ্রীম সোভিয়েটের প্রেসিডিয়ামের প্রেসিডেন্ট মিঃ ব্রেজনেভ ২১ ডিসেম্বর কলকাতায় আসেন। দমদম থেকে রাজভবনে আসবার পথে নাগরিকগণ বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানান।

লিওনিদ ইলিইচ ব্রেজনেভ ১৯০৬ সালে ১৯ ডিসেম্বর তারিখে উক্রাইনের কামেনস্কোয়ে [বর্তমান নাম দনিয়েপ্রোদ্‌জের্জিনস্ক] জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন ইস্পাত শ্রমিক। ১৫ বছর বয়সে তিনি কর্মজীবনে নাম লেখান। সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনার চর্চা চলল। ১৯২৭ সালে তিনি কুরস্ক থেকে ভূমি সংগঠন এবং উরাল বিদ্যালয় হতে স্নাতক হয়ে বের হন।

লিওনিদ ইলিইচ ব্রেজনেভ

স্নাতক হবার পর তিনি উরাল অঞ্চলে কয়েক বছর কাজ করেন। কখনো ভূমি কমীদের কাজে, কখনো একটি জিলা ভূমি প্রশাসনের সর্বোচ্চদায়িত্ব নিয়ে তিনি নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন। সবশেষে তিনি সমগ্র উরাল অঞ্চলের ভূমি প্রশাসনের সহকারী কর্মাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

১৯৩৫ সালে ব্রেজনেভ মেটালারজিক্যাল ইনষ্টিটিউটে হাতে নাতে কাজ শেখার পাঠ শেষ করেন। তারপর কয়েক বছর ধরে দনিয়েপ্রোদ্‌জের্জিনস্কের একটি লৌহ ইস্পাত কারখানায় ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করেন। এখানেই তিনি শুরু করেন রাজনীতি। ১৯৩৮ সালে তিনি এ শহরের কমিউনিষ্ট পার্টির কার্যকরী কমিটিতে ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন। এভাবে ধীরে ধীরে তিনি রীতিমত এ স্থানীয় পার্টিকর্মী হয়ে পড়লেন। ১৯৪১-৪৫ সালের বিখ্যাত দেশ রক্ষার যুদ্ধে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের মধ্যে রাজনৈতিক কাজ করেছিলেন। যুদ্ধের শেষে ১৯৪৬ সালে উক্রাইনের জাপোরোজিয়ের আঞ্চলিক কমিটির প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। ১৯৪৭ সালে দনিয়েপ্রোপেট্রভস্ক আঞ্চলিক কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক হিসেবে গৃহীত হলেন।

এভাবে সাংগঠনিক কাজে দক্ষতা দেখিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ঊনবিংশ পার্টি কংগ্রেসে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটিতে সদস্য হিসেবে স্বীকৃত হলেন। ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ব্রেজনেভ কাজাকস্থান কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন।

বিংশ ও দ্বাবিংশ পার্টিকংগ্রেসে তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে পুনর্নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ সালের জুন থেকে তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসছেন।

১৯৫০ সালে দনিয়েপ্রোপেট্রভস্ক অঞ্চলের অধিবাসীরা নির্বাচনে ব্রেজনেভকে সুপ্রীম সোভিয়েট ডেপুটি হিসেবে পাঠান। ১৯৫৪ এবং ১৯৫৮ সালে দু'বারই তাঁকে সেখানকার অধিবাসীরা পুনর্নির্বাচিত

ইডেন উদ্যানে স্মরণীয় চতুর্থ টেষ্টম্যাচ

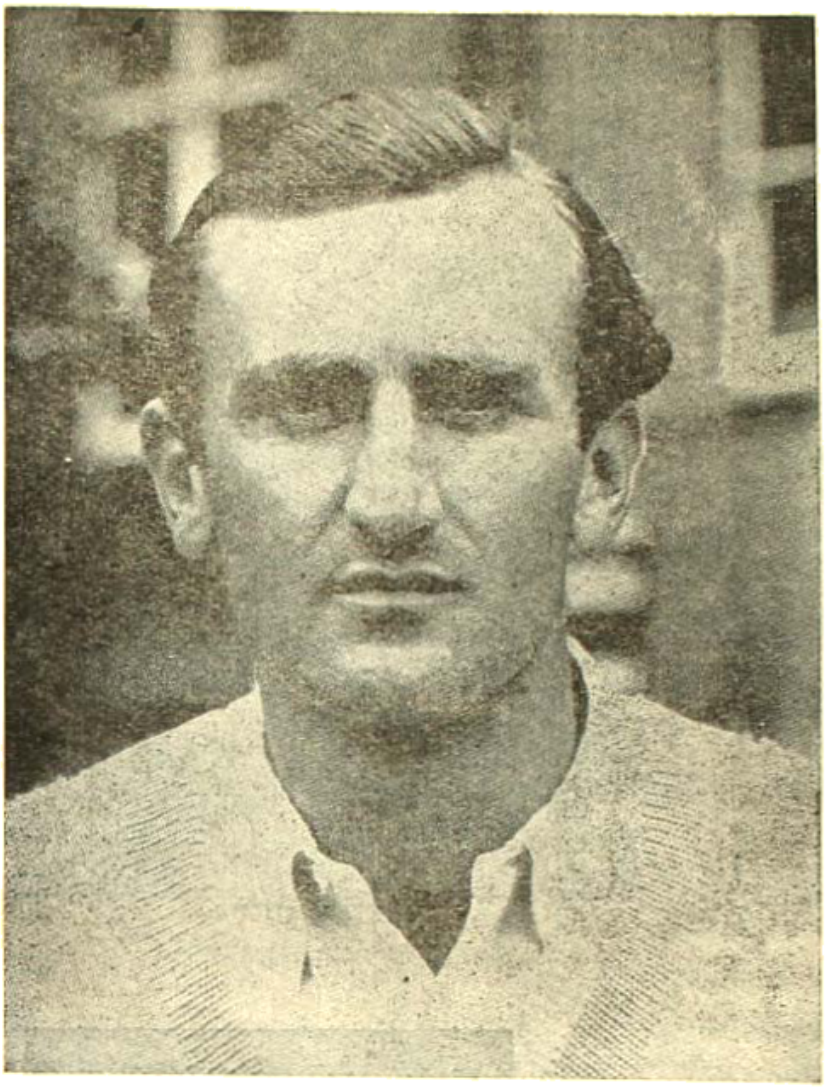

টেড ডেক্সটার

সেলিম আব্বিজ দুরাণী

এম. এল. জয়সীমা

ফারুক ইঞ্জিনীয়ার

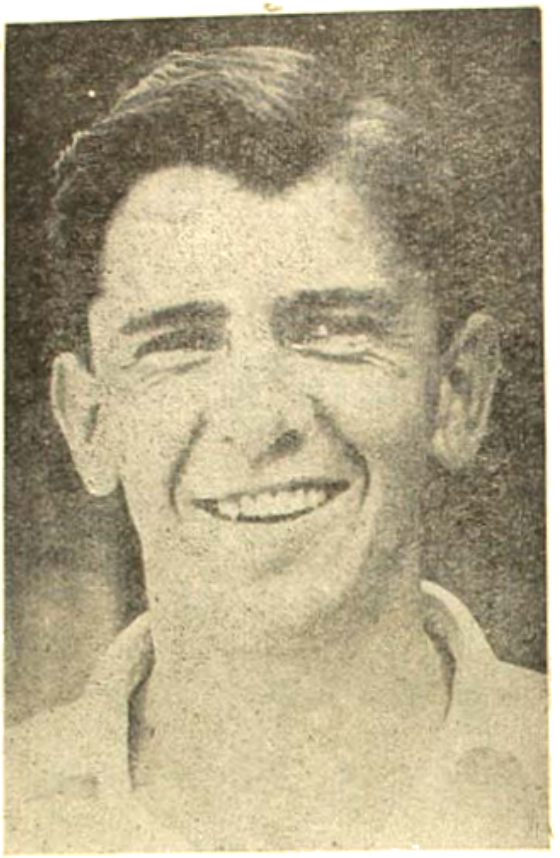

ডেভিড এ্যালেন

নরী কণ্ট্রাক্টর

পলি উমরিগড়

পিটার পারফিট

বেরী নাইট

চারু বোরদে

রমাকান্ত দেশাই

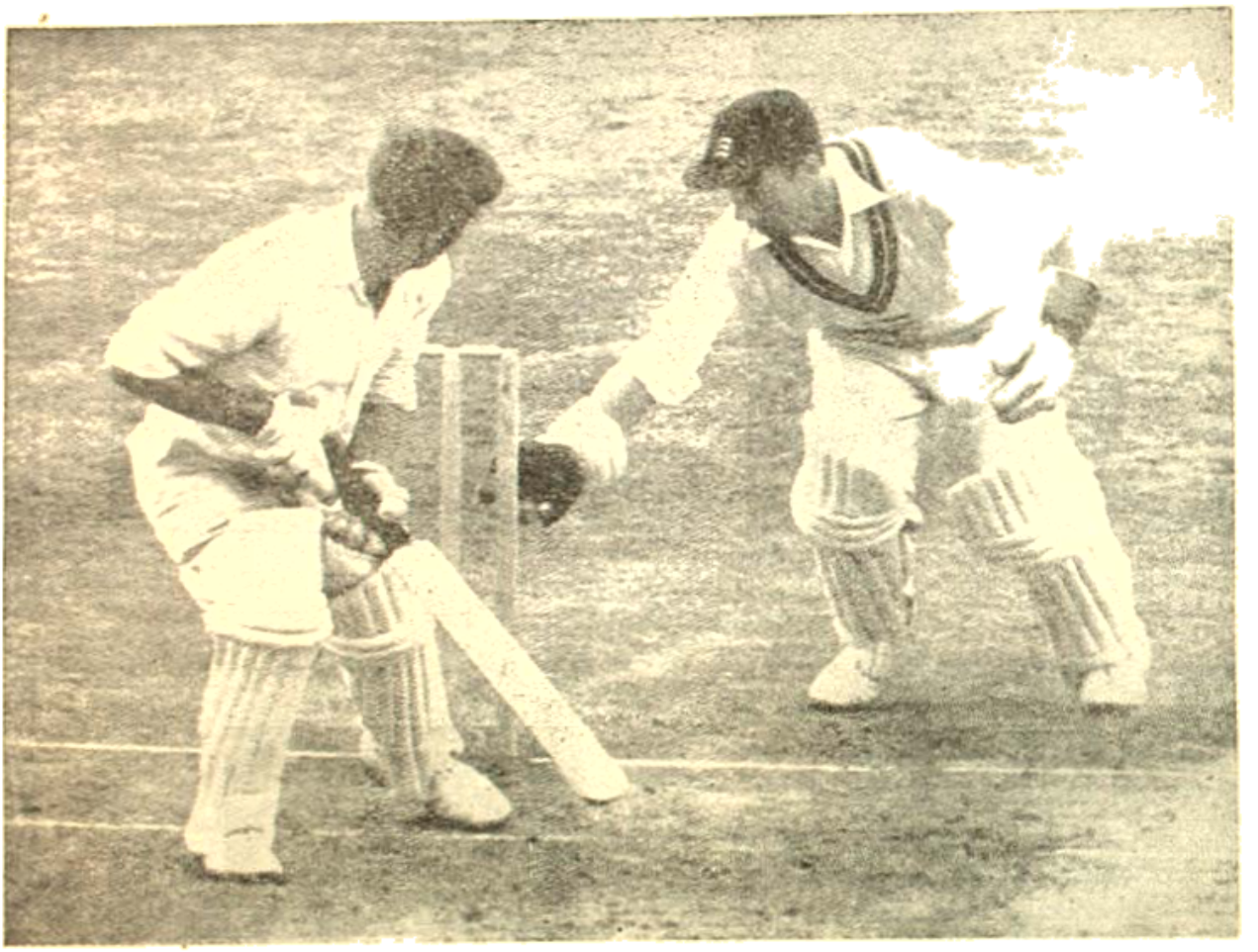

এম. এস. জয়সীমা এম. সি. সি'র প্রখ্যাত উইকেট রক্ষক ও ব্যাটস্‌ম্যান জে. টি. মারের ক্রীড়াপ্রদর্শন

উপরাষ্ট্রপতি ডঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ভারতীয় শিল্পমেলার উদ্বোধন করছেন।

॥ ভারতীয় শিল্পমেলা ॥

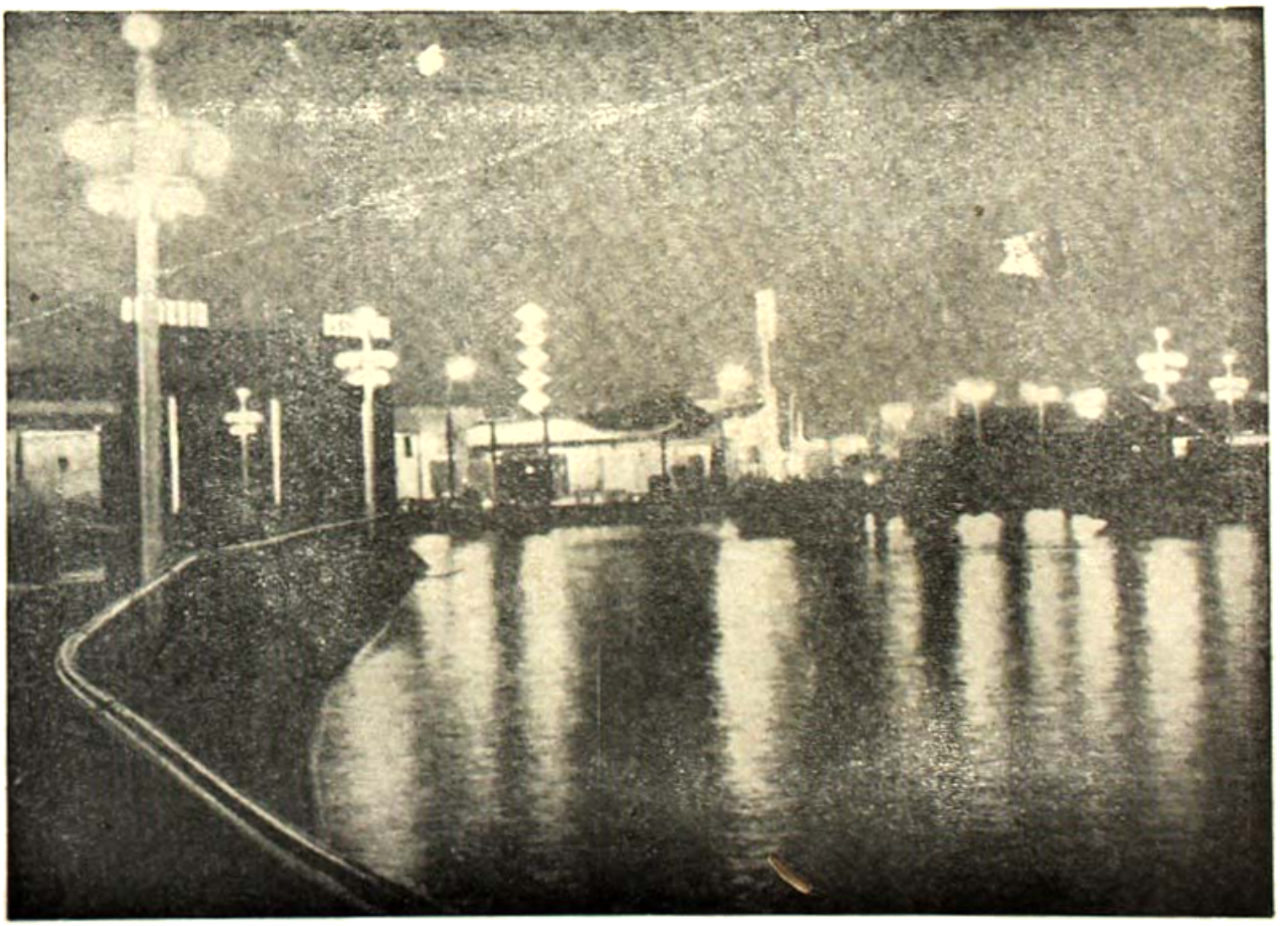

আলোকমালায় সজ্জিত ভারতীয় শিল্পমেলা।

ভারতীয় শিল্পমেলায় রাশিয়ান মণ্ডপে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট শ্রী ব্রেজনেভ।

ভারতীয় শিল্পমেলায় রাশিয়া।

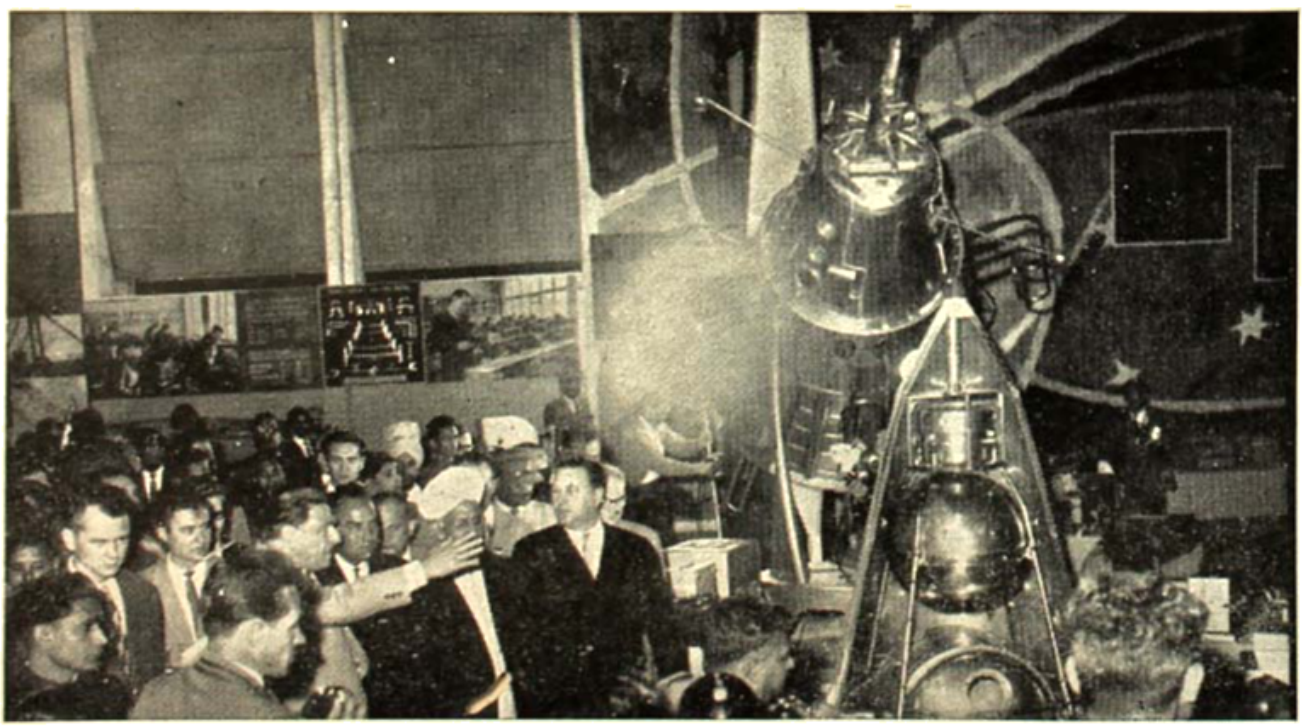

শিল্পমেলায় সোভিয়েট প্যাভিলিয়নে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণকে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত

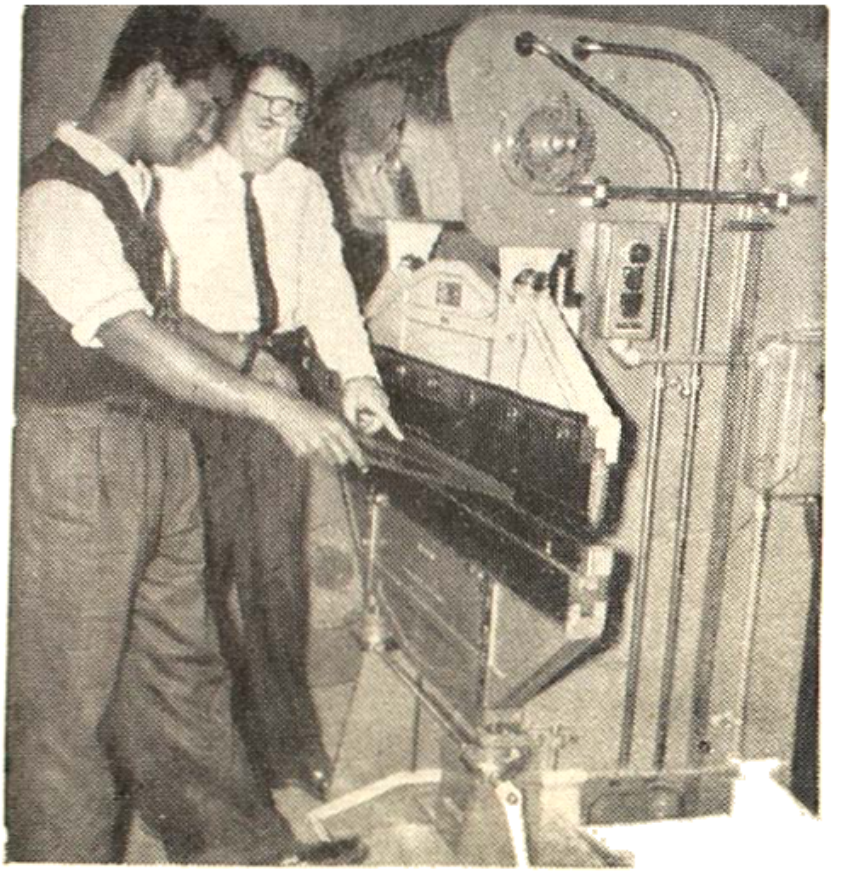

ভারতীয় শিল্পমেলায় আমেরিকা।

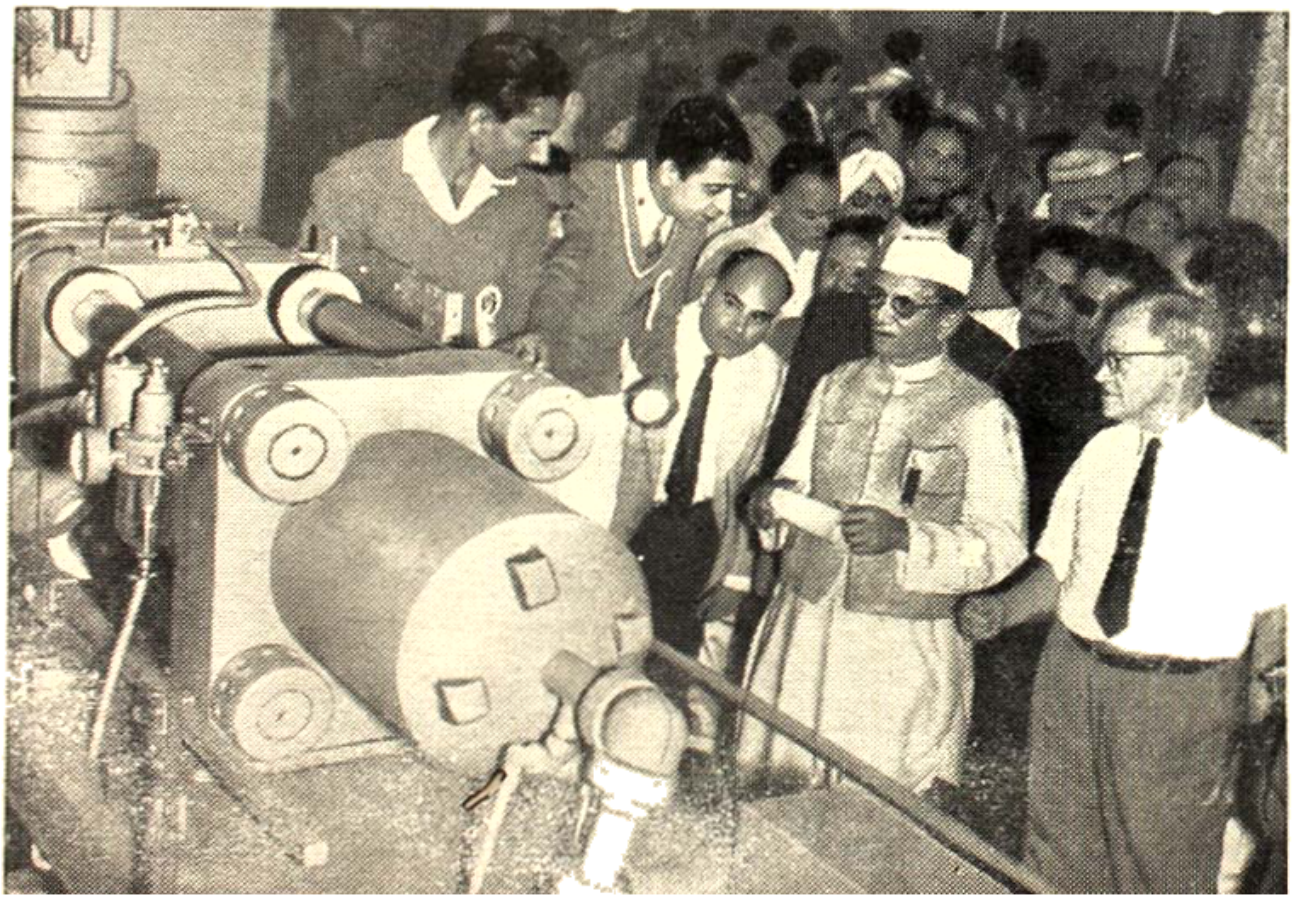

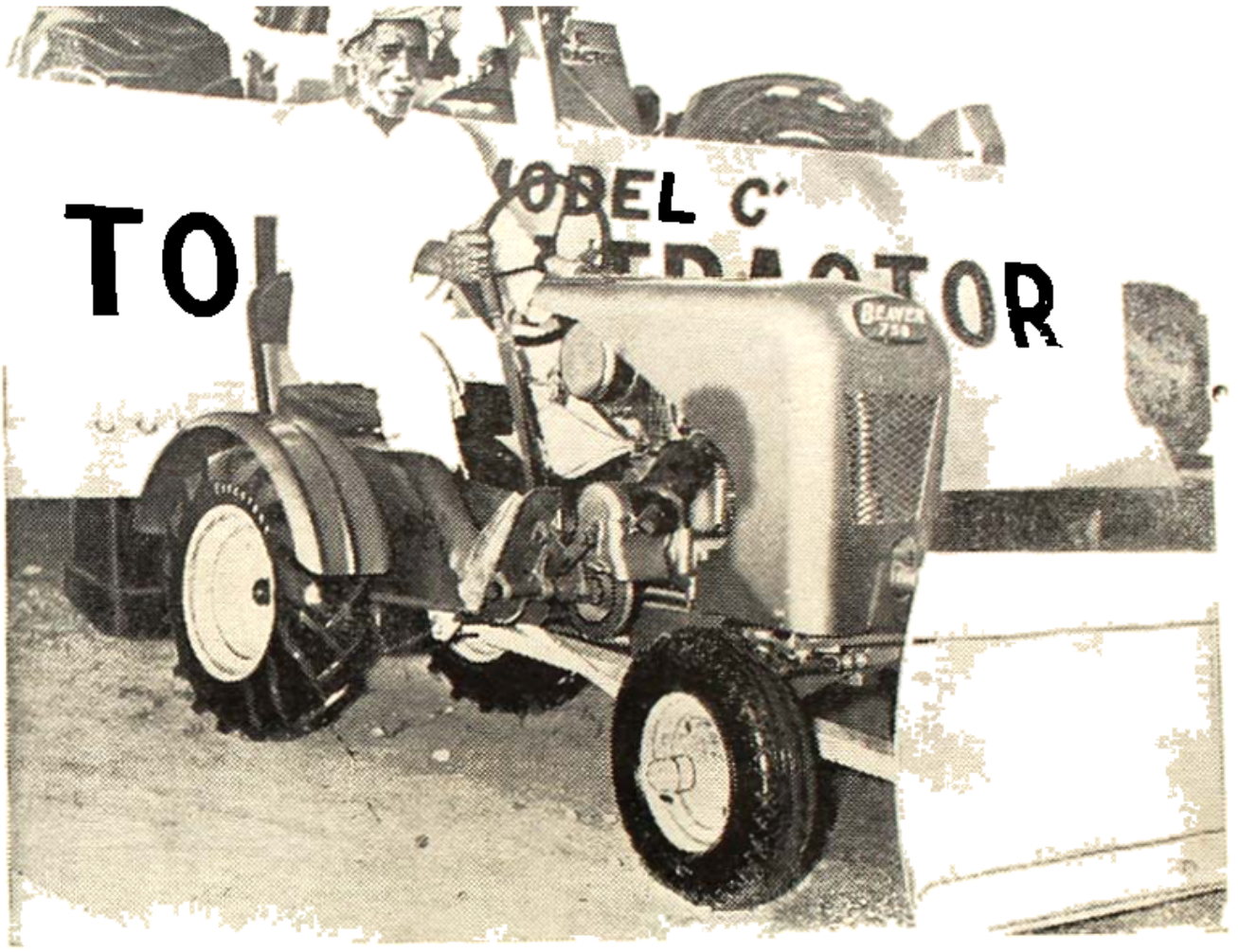

ভারতীয় শিল্পমেলায় আমেরিকা।

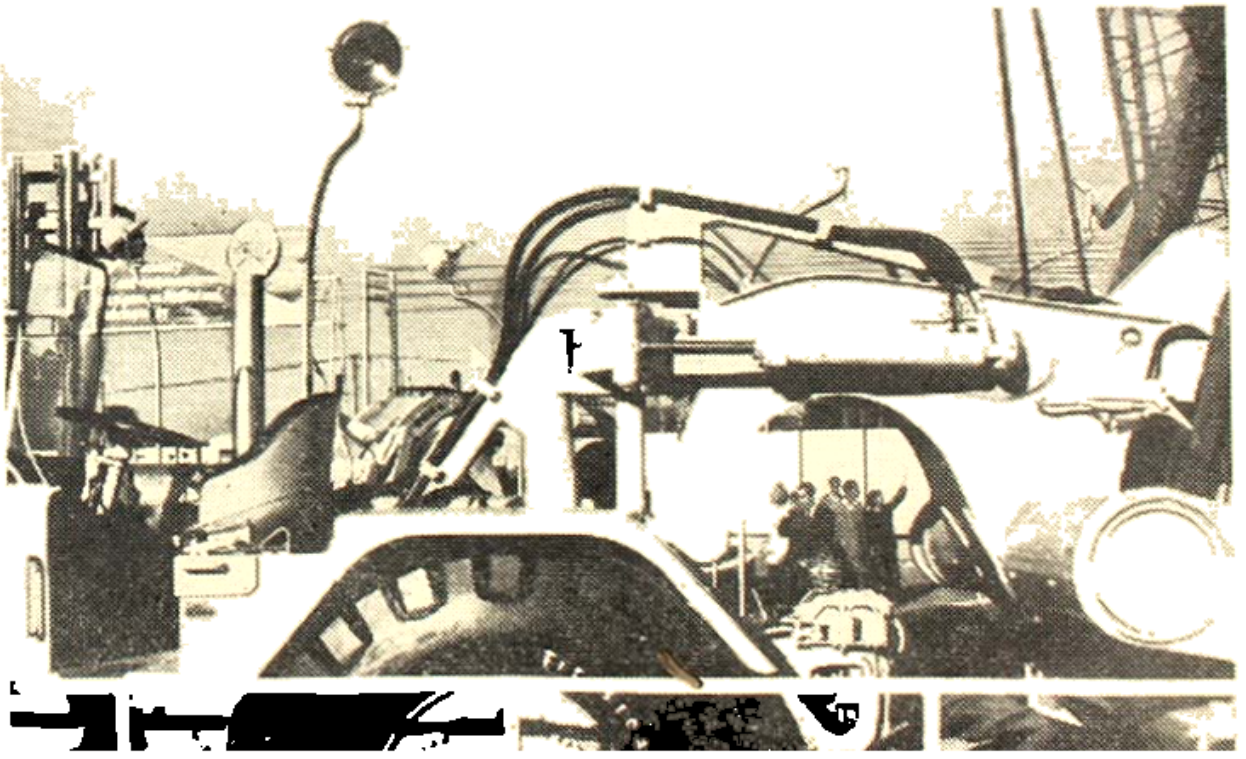

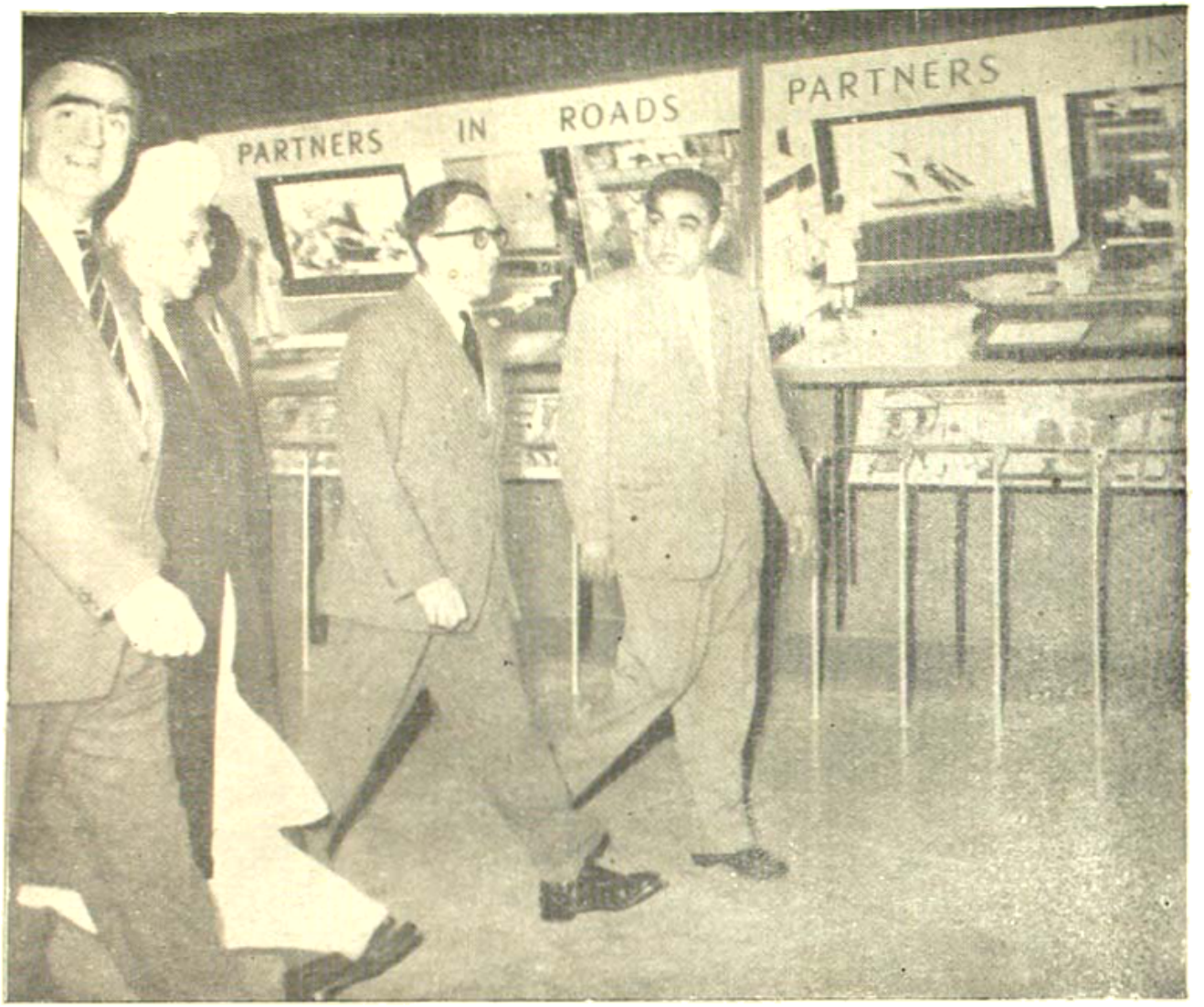

ভারতীয় শিল্পমেলায় ব্রিটেন।

শিল্পমেলার একটি অভিনব আকর্ষণ :—
ব্রিটেনের "এয়ার হাউস"।

ভারতীয় শিল্পমেলায় জার্মানী।

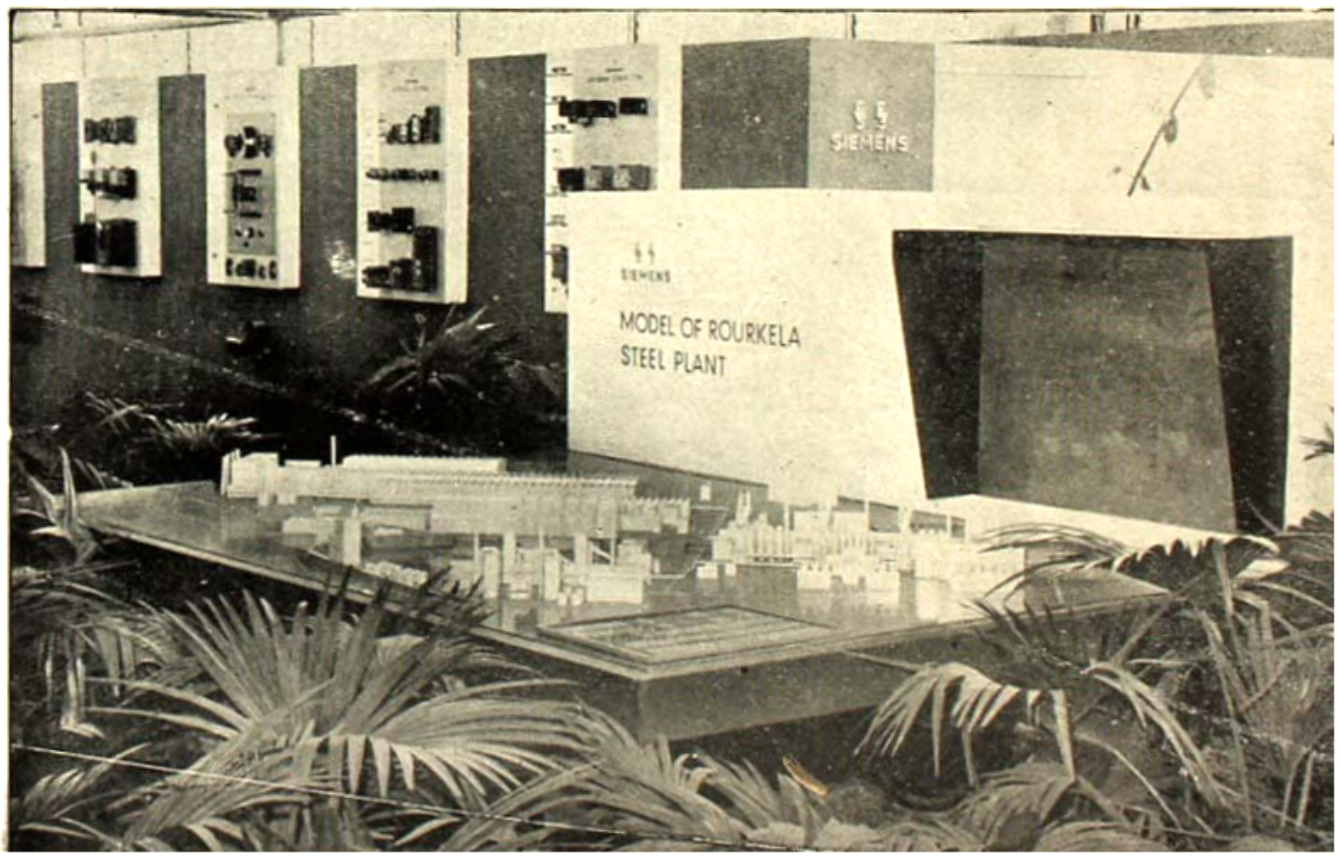

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ [১৮৭৬-১৯৬২]

এই ধর্মসাধনার কেন্দ্র ছিল—টোকিও শহরের নিকট নারার পবিত্র ক্ষেত্র। নারামন্দিরের প্রভাবে রাজারা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হলেন এবং এই নারা যুগে (৭০৮—৭৯৪) জাপানে বৌদ্ধধর্ম অত্যন্ত প্রভাবশালী হইল। ইহার কিছুকাল পূর্বে ভারতের এক ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও ধর্মযাজক তিনি ছিলেন দক্ষিণী ব্রাহ্মণ—তাঁহার নাম বোধিসেন, তিনি শুনেছিলেন—যে চীনদেশে একজন সিদ্ধপুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন—তাঁহার নাম মঞ্জুশ্রী। তাঁহার সহিত মিলনের ঔৎসুক্য নিয়ে ওই দক্ষিণী ব্রাহ্মণ, চীনের ইয়াং-সি-কিয়াং নদীর সমুদ্র-সংগমে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তিনি চীনে এসে শুনলেন যে মঞ্জুশ্রী চীন থেকে জাপানে চলে গেছেন। এই সময় একজন জাপানী বৌদ্ধশ্রমণ তাঁহার নাম মন্তো হিরনারী চীন রাজসভায় জাপানের দূতরূপে বাস করিতেছিলেন। তিনি বোধিসেনকে জাপানে যাইতে অনুরোধ করেন। বোধিসেন আরও কয়েকজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সহিত এক জাহাজে যাত্রা করেন।

প্রথম চিত্র

৮ই আগস্ট ৭০৬ খৃষ্টাব্দে বোধিসেন জাপানের নানিয়া জেলার (বর্তমান নাম ওসাকা) সমুদ্রের উপকূলে জাহাজ হতে জাপানের ভূমিতে পা দিলেন। ভারতের এই প্রসিদ্ধ মহাপুরুষের আগমন বার্তা শুনে—জাপানের সম্রাট সোমু নারা মন্দিরের পুরোহিত গোগিকে পাঠালেন বোধিসেনকে স্বাগত জানাইতে। গোগি ও বোধিসেন পরস্পর কথাবার্তা বলিলেন—তাঁরা তাঁরা মিশ্রিত সংস্কৃত ও জাপানী ভাষায় বোধিসেনকে নারার সুপরিচিত-দেবতার মন্দিরে স্থান দেওয়া হইল। বোধিসেন এই জাপানী মন্দিরের অলৌকিক শুচি পরিবেশে মুগ্ধ হয়ে আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন এবং ভারতের গান গেয়েছিলেন। এই গান শুনে নারার নিকটস্থ বন হইতে উপস্থিত হইলেন আর এক জন বিদেশী যিনি বোধিসেনের সহিত ভারতীয় ভাষায় কথা কহিয়াছিলেন। তাহার পরে নারার সুবিখ্যাত হাইয়ান্-জি মন্দিরে বোধিসেনের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। এই মন্দিরের জাপানী পুরোহিতদের বোধিসেন সংস্কৃত ভাষা শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। বোধিসেন মহাযান শাস্ত্রের "গণ্ড-ব্যূহ-সূত্র" পড়াইতেন এবং অমিতাভ-বুদ্ধের পূজা প্রবর্তন করেন। জাপানের সম্রাট বোধিসেনকে নানা উপাধি ও সম্মানে বিভূষিত করেন।

তাঁহার একটি উপাধি হইল "সোজো" বা "গুরু পুরোহিত"। তাহার পর যখন বৈরোচন-বুদ্ধের বিরাট প্রতিমা নির্মিত হইল—সম্রাট বোধিসেনকে যথাযোগ্য অনুষ্ঠানের সহিত এই প্রতিমা—প্রতিষ্ঠিত করিতে অনুরোধ করিলেন। সেই সময় বোধিসেন জাপানে বৌদ্ধধর্মের নূতন পূজা-আয়তন তোদাই-জি মন্দিরের প্রধান প্রতিষ্ঠাতার সম্মান লাভ করিলেন। বৃদ্ধ বয়সে বোধিসেন আর একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন—তাহার নাম রিখো-সেন্-জি মন্দির। এই মন্দিরে তিনি অনেক শিষ্যের সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধ শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। তাঁহার শিক্ষার ফলে জাপানী অক্ষর মালা "গজুয়োন্" সংস্কৃত অক্ষরের অনুকরণে সুসজ্জিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় চিত্র

ইতিমধ্যে বৌদ্ধধর্ম ভারতের শ্রমণ বোধিধর্মের শিক্ষার মাধ্যমে নূতন রূপ ধারণ করিল—ইনি ছিলেন ধ্যানবাদী বেদান্ত-বাদী সাধক। তিনি বলিতেন বুদ্ধকে মন্দিরের প্রতিমায় পাওয়া যাইবে না—তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে হইবে—নিজ নিজ আত্মার মধ্যে ধ্যানের পথে। এই থেকে এক নূতন বৌদ্ধবাদ উদয় হইল তাহার নাম ধ্যানবাদী সাধনা বা জেন্ বৌদ্ধবাদ [জেন্—ধ্যান]। এই ধ্যান-যানের সঙ্গে সঙ্গে আসিল "মন্ত্রযান"—ধ্যানের পথে উপযোগী "বীজমন্ত্র" অবলম্বন করে অধ্যাত্ম-সাধনা। এই সমস্ত মন্ত্রমালা বিভিন্ন "মণ্ডল" বা নক্সার প্রকোষ্ঠে —সংস্কৃত অক্ষরে লিখিত হইত। সাধকের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি অনুসারে উপযোগী বীজমন্ত্র চয়ন করিতে হইত। জেনবাদী পুরোহিতের হাতে লেখা নানা "ফলক" বা "মণ্ডল" ["জাঃ মন্ত্রার"] পাওয়া গিয়াছে—যাহাতে বীজ মন্ত্রগুলি অতি চমৎকার অক্ষরে লিখিত ও চিত্রিত হইয়াছে। এইসব মন্ত্রমালার "মণ্ডল"—জেন্ সাধনার যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে জাপানের নানা জেনবাদী মন্দিরে। সংস্কৃত ভাষার অক্ষর এইরূপ অপূর্ব সুষমা ও সৌন্দর্যে অলংকৃত হইয়া জাপানে যে রূপ গ্রহণ করেছে মূল ভারতবর্ষে তাহার তুলনা নাই।

জাপানে মন্ত্রযানের সাধনার চাক্ষুষ প্রমাণ স্বরূপ দুইখানি চিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। প্রথমচিত্র—নানা বীজমন্ত্র লিখিত একখানি মণ্ডল চিত্র। দেবনাগরী অক্ষরের অলংকারিক রূপের সহিত জাপানের লিখিত সংস্কৃত অক্ষরের কিছু সাদৃশ্য আছে। জাপানের অক্ষর দেবনাগরী অক্ষরের তুলনায় অধিক অলংকার-ধর্মী ও চিত্তহারী। দ্বিতীয় চিত্র—রেশমে চিত্রিত পদ্মাসনে প্রতিষ্ঠিত ঔঁ-কারের চমৎকার চিত্র। পদ্ম দুইটির পাদদেশ হইল দুইমুখী বজ্র—এই বজ্র একটি প্রস্ফুটিত পদ্মকোরকের মধ্যদেশে প্রোথিত। পদ্মের মধ্যে ঔঁ-কারের চিত্র বিখ্যাত ষড়ক্ষরী মন্ত্র—"ওঁ মণি পদ্মে হুঁ" [মণি পদ্মের অন্তরে হুঁ-কার মন্ত্র"]—এই মন্ত্রের স্তুতি বন্দন করিতেছে। ধর্মসাধনার এইরূপ চিত্রে লিখিত উপকরণ জাপানের অলৌকিক চিত্রকলার অপরূপ নিদর্শন।

উপেন্দ্রনাথ স্মরণে

দু'বছর হল উপেন্দ্রনাথ পরলোক গমন করেছেন। তিনি ইহলোকে নেই, কিন্তু তাঁর অকৃপণ সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে বাঙালা পাঠকসমাজে নিত্য তিনি বিরাজমান। গল্প-ভারতীর সহিতও তাঁর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। উপেন্দ্রনাথের স্মৃতি আমাদের মর্মের মণিকোঠায়।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে উপেন্দ্রনাথ ঐকান্তিক ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন গল্প-ভারতীকে তিনি মনের মতন করে সাজিয়ে তুলবেন রবীন্দ্রস্মৃতি চারণায়। 'গল্প ভারতীর' রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যার বিপুল সার্থকতা তিনি স্বচক্ষে দেখে যেতে পারেন নি। দেশ-বিদেশ অভিনন্দিত 'গল্প ভারতীর রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী' সংখ্যা উপেন্দ্রনাথের রবীন্দ্র অনুরাগ সিঞ্চিত বলেই আমরা বিশ্বাস করি।

উপেন্দ্রনাথ রবীন্দ্র অনুরাগী ভক্ত এবং রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন। 'বিচিত্রা' সম্পাদনাকালে রবীন্দ্রনাথের সহিত উপেন্দ্রনাথের দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ মেলামেশার অনুরাগমণ্ডিত কাহিনী 'স্মৃতিকথা' এবং 'বিগত-দিনের' পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর শেষ পর্যায়ে উপেন্দ্রনাথ রচিত একটি রবীন্দ্র-স্মৃতি কাহিনী মুদ্রিত করে আমরা উপেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বার্ষিক মৃত্যু তিথি পালন করলাম।

অয়ত্ন উপেন্দ্রনাথ!

গল্প-ভারতী সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ "ঘাটির পথ" উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত।

সোভিয়েত প্রজাতান্ত্রিক জর্জিয়ার লোকনৃত্য।

কলাকৌশলের মত তান্ত্রিকদের কলাকৌশলও সুন্দরভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে। প্রত্যেক প্রজাতন্ত্রেই অপূর্ব নাট্যশালা, ঐকতানের গৃহ এবং বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ রহিয়াছে। এইগুলিই প্রকৃত শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞ গড়িয়া তুলিবার পক্ষে সাহায্য করে। উক্ত কলাকুশলীরাই তাঁহাদের শিল্পের মারফত জনগণকে সত্য ও জীবনের অর্থ সম্পর্কে এবং মানবতার উচ্চ নীতিসমূহ সম্পর্কে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। ভারতের বিরাট কলা কৌশলের ক্ষুদ্র একটি অংশ হিসাবে সোভিয়েতের জনগণ আমাদের কলা কৌশলের যে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন তাহাতে আমরা খুবই আনন্দিত। শিল্পের মাধ্যমেই বিভিন্ন দেশের জনগণ

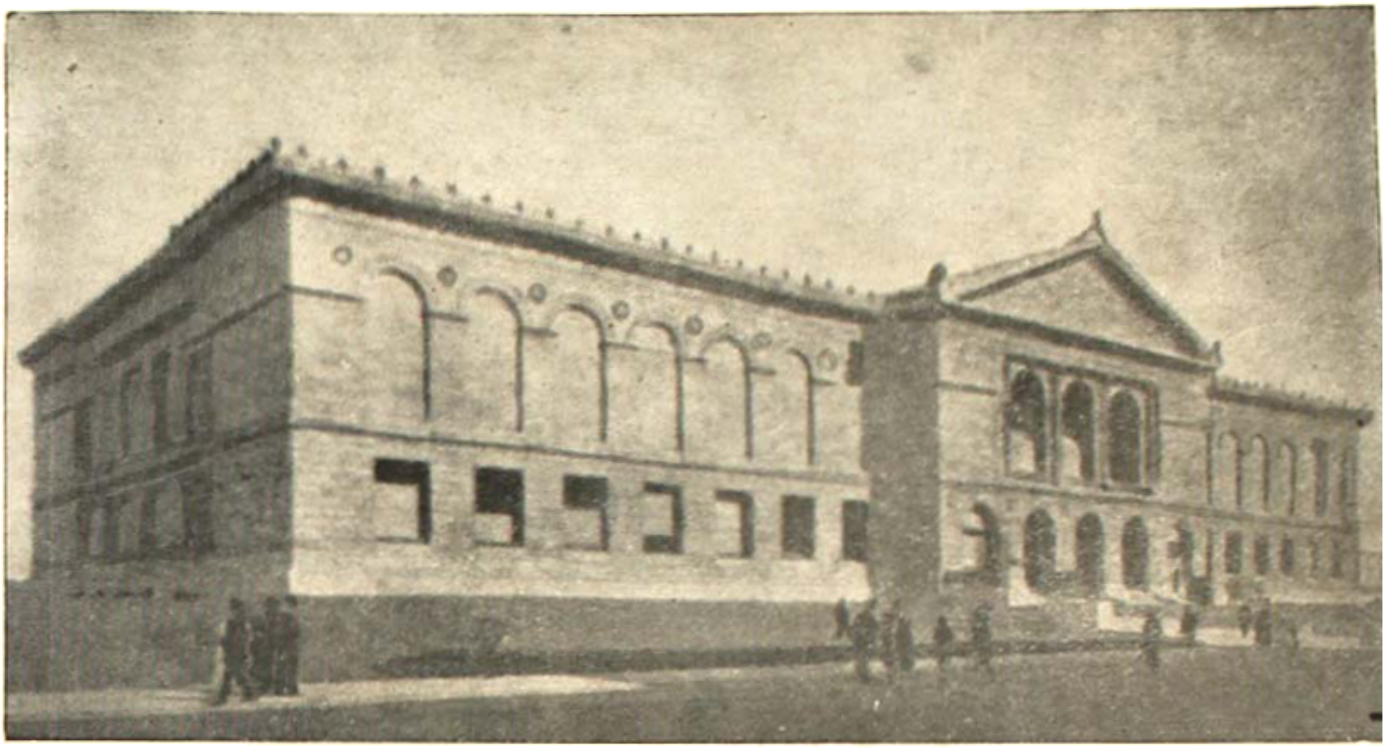

চিকাগোর আর্ট ইনষ্টিটিউট—এখানে চিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল (১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ).

চিকাগোয় 'হেল পরিবারে'র বাড়ী। স্বামী বিবেকানন্দ এই পরিবারের বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিলেন এবং তিনি চিকাগোতে এই বাড়ীতেই বাস করতেন।

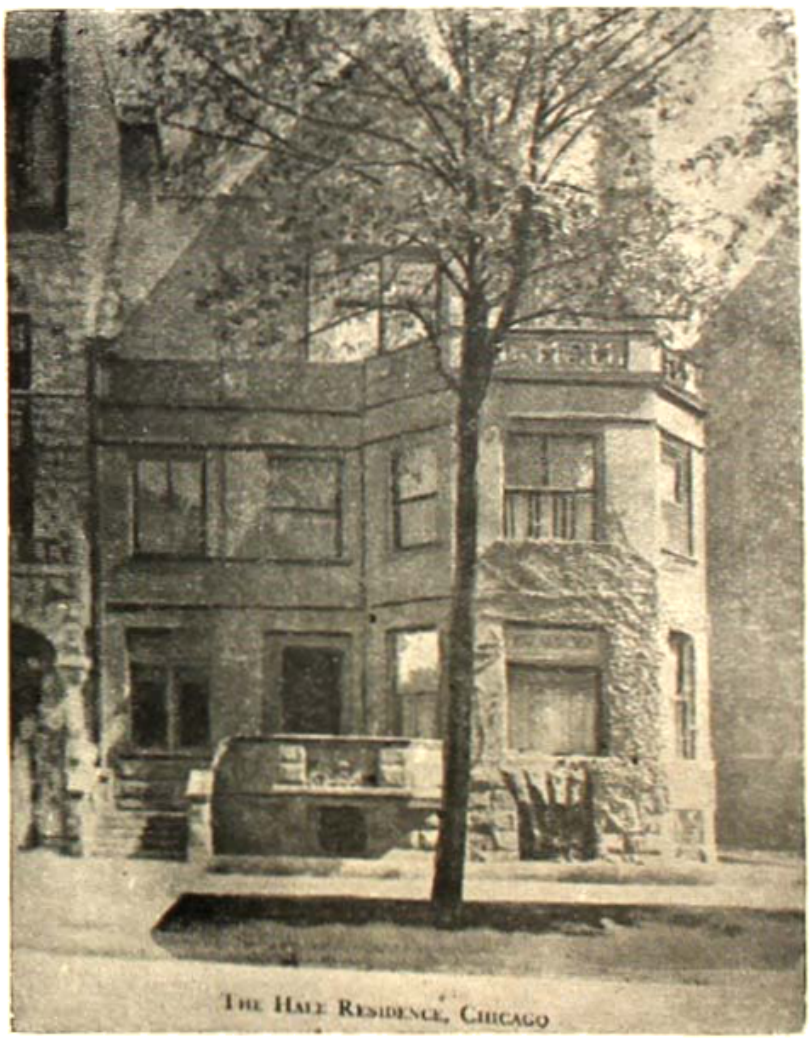

স্বামী বিবেকানন্দ—ফাল্গুন ১৯০০ খৃষ্টাব্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ—নভেম্বর, ১৯০০ খৃষ্টাব্দ।

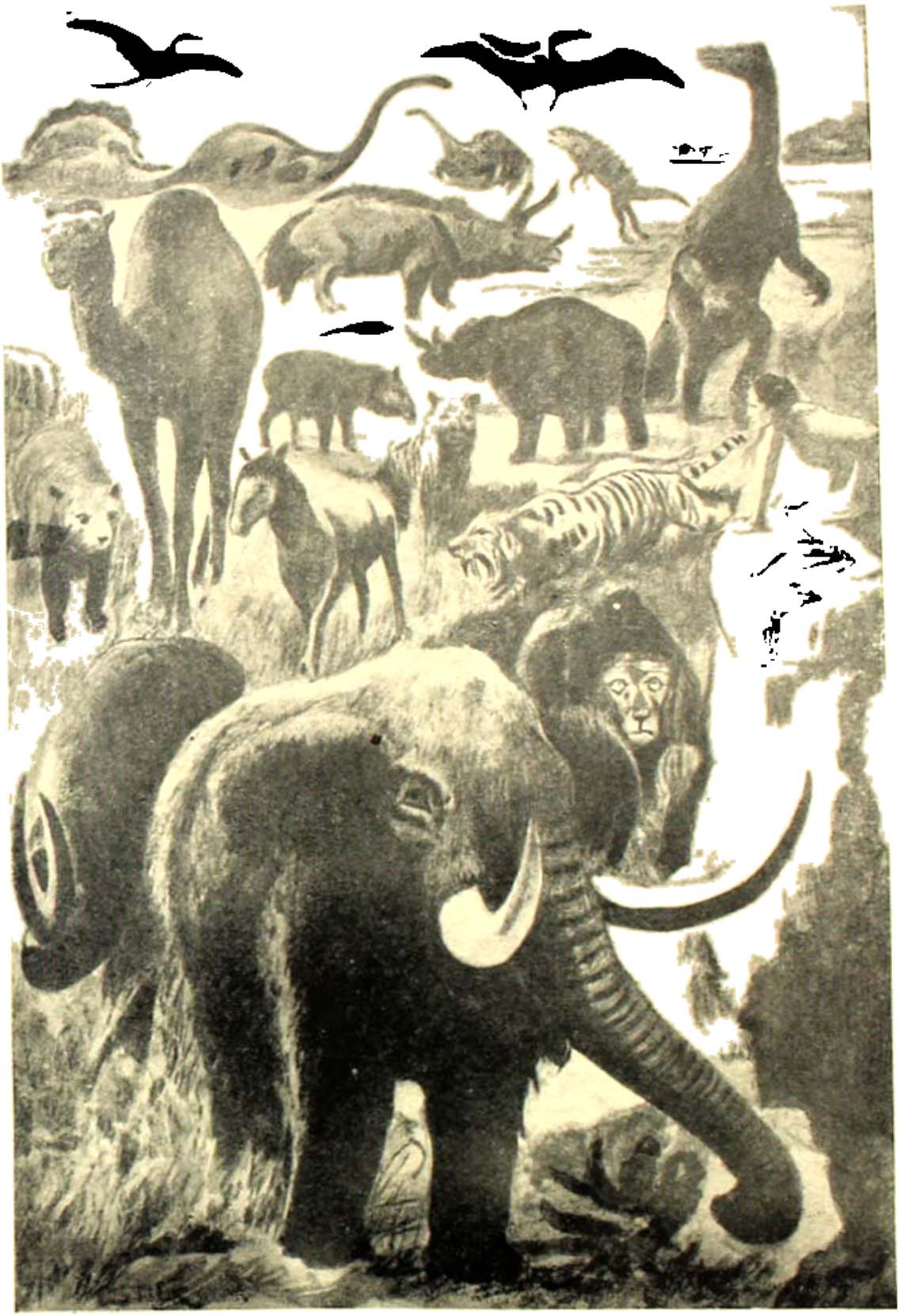

অতীতে কত বিচিত্র জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ ছিল এই পৃথিবী—
কালক্রমে এদের অনেকে অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

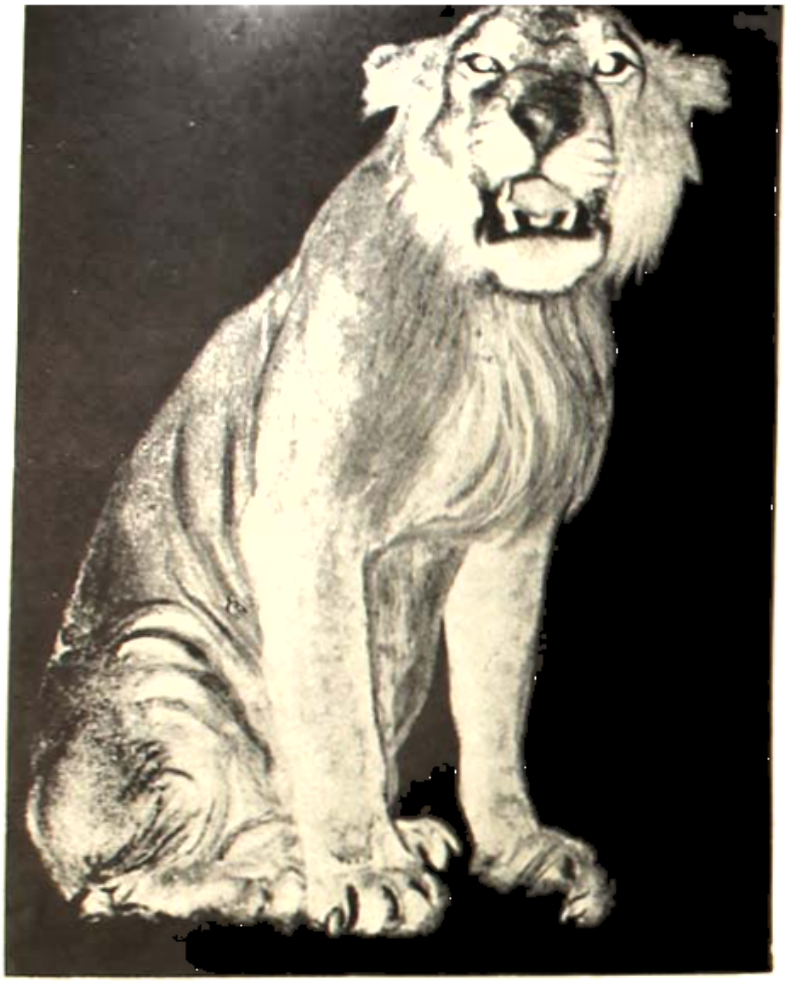

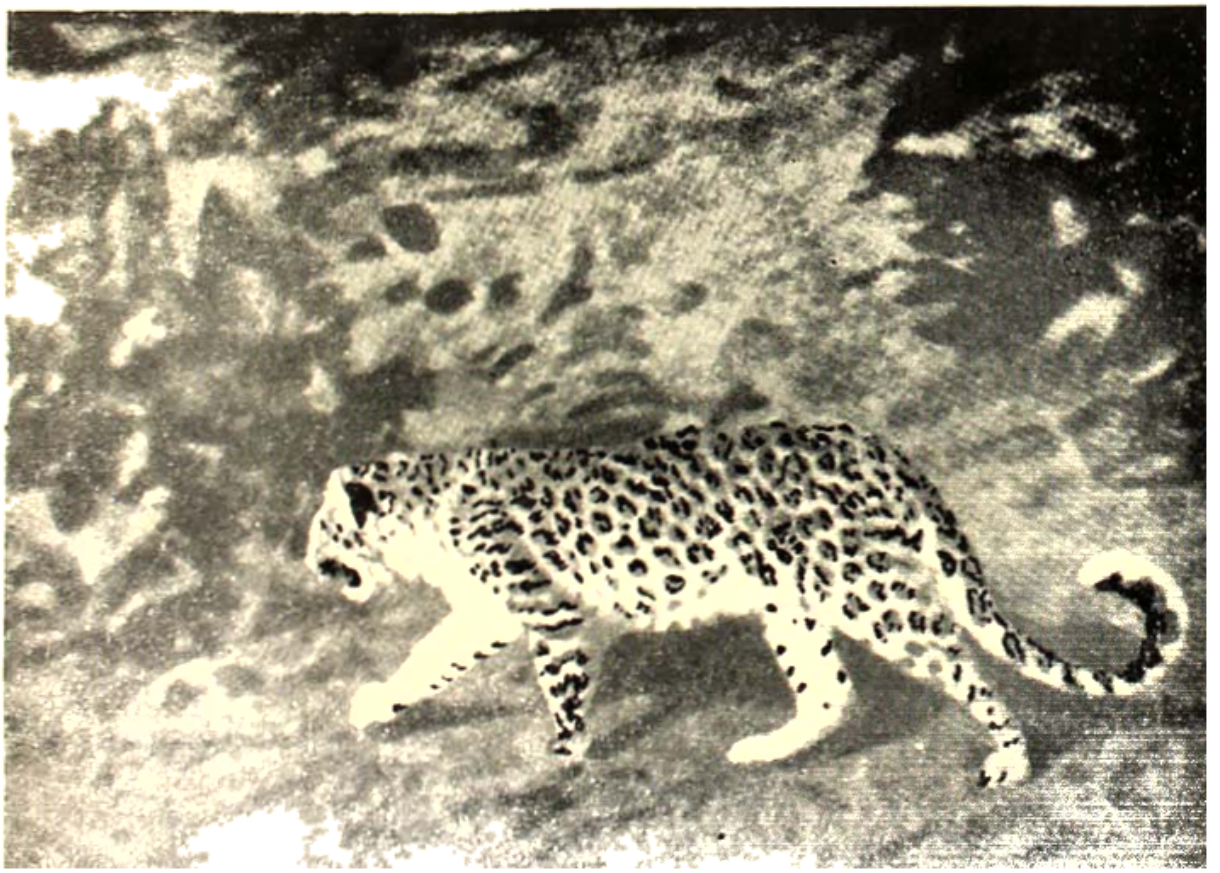

বাঘ তার শিকার।

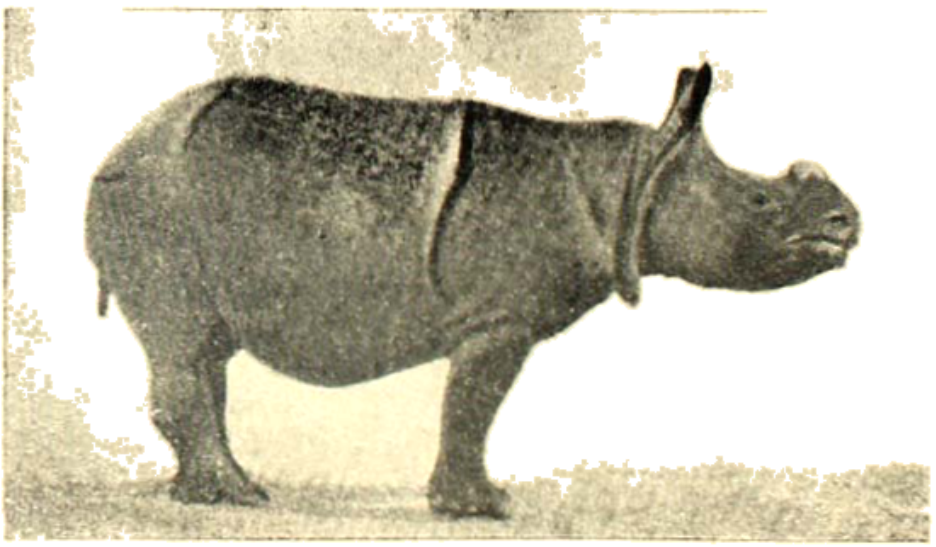

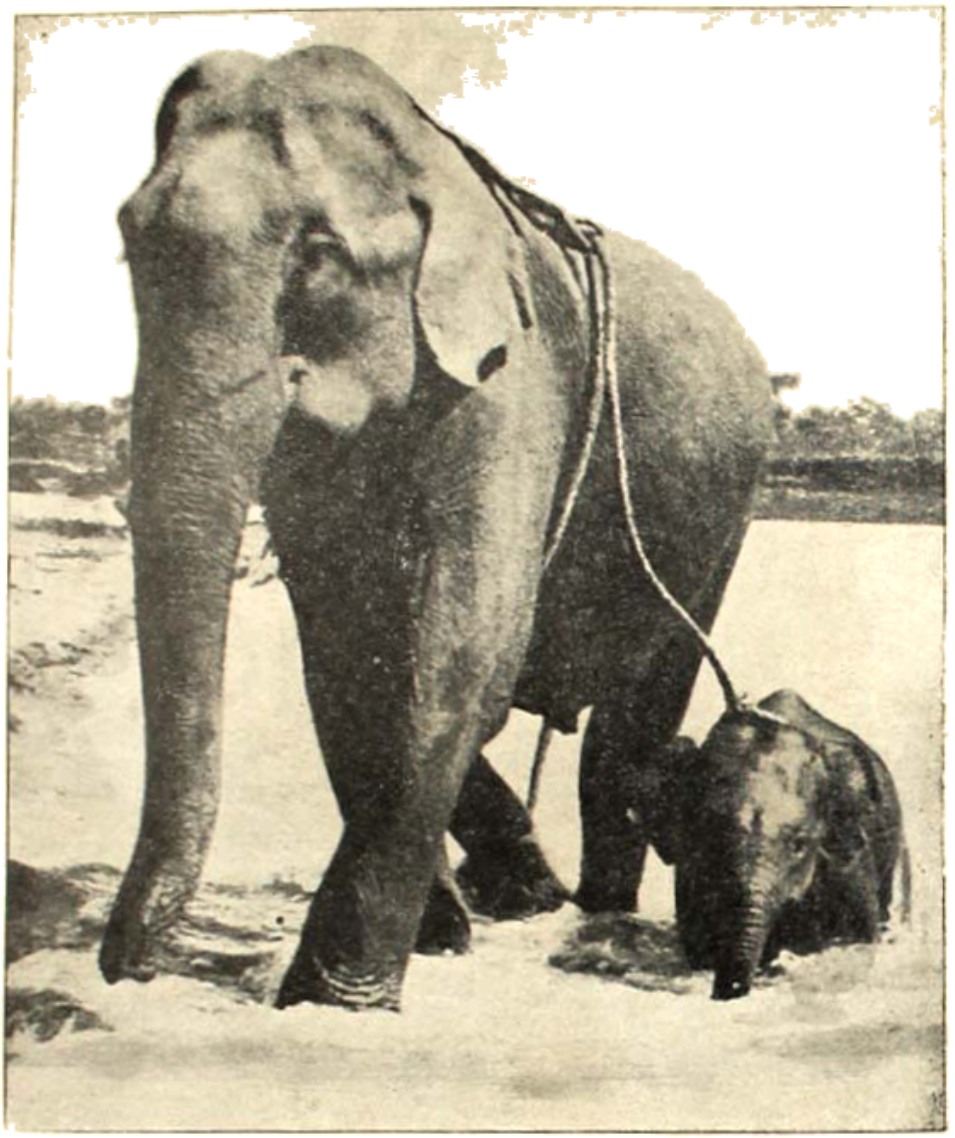

মানুষের প্রয়োজনে হাতী বন্দী হচ্ছে—এদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে

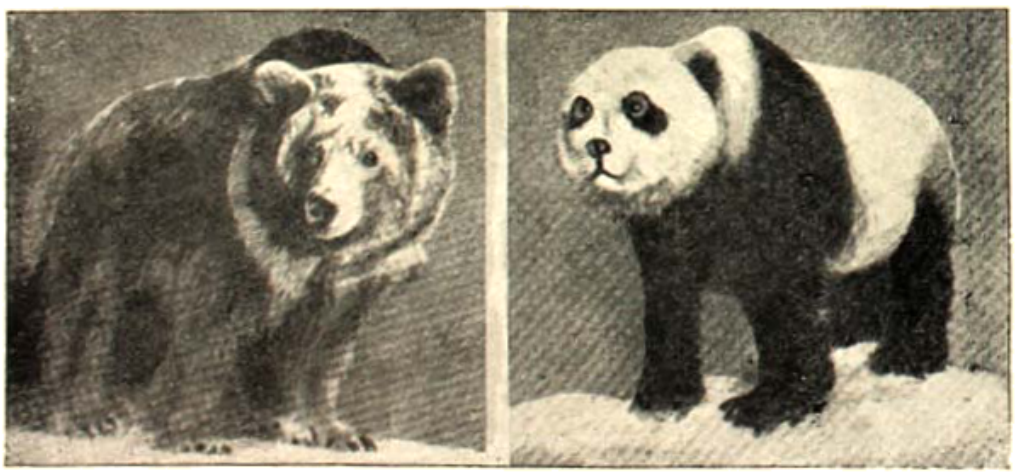

পাণ্ডা ভল্লুক

অধুনা দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডা ভল্লুককে বহু চেষ্টায় রক্ষা করা হচ্ছে।

এই তো মানুষ।

শ্রী সন্ধানী

একান্ন বছর আগের এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি রাশিয়ার এক নগণ্য রেল স্টেশনের ছোট ঘরে শুয়ে লিও টলস্টয় ··· তাঁর জীবন দীপ আস্তে আস্তে নিভে আসছে।

শয্যাপার্শ্বে পুত্র ও কন্যা। তাদের ডেকে তিনি বললেন,—'কেন তোমরা কেবল লিওর দিকে তাকিয়ে রয়েছ? লিও ছাড়াও পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে, অথচ তোমরা কেবল তাকেই দেখছ।'

পুত্র আলেকজান্দ্রা আরো কাছে সরে আসে, শিয়রে মৃত্যুদূত, আলেকজান্দ্রা কান পেতে শোনে টলস্টয়ের অন্তিম কথা: 'সত্য, আমি একে এত ভালবাসি ····· অন্বেষণ ·····সর্বদা অন্বেষণ···'

চিরকালের মত স্তব্ধ হয়ে গেল মানবতার সেই অপরূপ কণ্ঠস্বর।

•

টলস্টয়ের প্রকৃতিতে বিরাজ করত সত্য এবং কল্যাণের আদর্শ। আমাকে সত্য হয়ে উঠতে হবে নিজের কাছে নিজে বিশ্বস্ত, আর এর জন্যে চাই অবিরাম সাধনা, কঠোর পরিশ্রম, ছেষট্টি পরিমার্জনার দ্বারাই আমরা কর্মকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারি সত্যের আলোকে।

সাহিত্য রচনাকে তিনি গান শেখার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলতেন,—'এটা খুব কৌতুকের কথা যে লোকে তোমায় জিজ্ঞাসা করবে, তুমি কি লিখতে চেষ্টা করছ? —অথচ এই প্রশ্নটাকে খুব আশ্চর্যের ভাববে না। অন্যদিকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি পিয়ানো বা বেহালা বাজাতে চেষ্টা করছ? তা হলে এ কথাটা খুব আশ্চর্যের শোনাবে, কেন না এটা তোমাকে শিখতে হবে। আসল কথা হচ্ছে, লেখাটা কেবলমাত্র বুদ্ধিমত্তার দান নয়, অন্যকিছু করতে গেলে তোমায় যেমন পড়াশোনা করতে হয়, এখানেও তাই করতে হবে।'

একদিন আলেকজান্দ্রা ড্রয়ার টেনে বের করলেন। টলস্টয়ের প্রথম দিকের রচনা—'হাউ এ লাভ এওস্' বা ওই জাতীয় কিছু। পড়লেন তিনি। খুব খারাপ লাগল। তাঁর মনে হোল এ যেন কোন হাই-স্কুলের ছাত্রের রচনা।

তখন সবে রেমিংটনের টাইপ রাইটার উঠেছে। আলেকজান্দ্রা দ্রুত শিখে নিলেন টাইপ করতে। টলস্টয়ের রচনা তিনি ডাবল স্পেসে টাইপ করে যেতেন। সকাল বেলায় লিখতে বসতেন টলস্টয়, বেলা একটা অবধি একটানা লিখে যেতেন। আর সেই দিনেই বিকালে বেলায় টাইপ হয়ে যেত তা। পরের দিন সংশোধন করতে বলতেন। তিনি মার্জিনে লিখতেন, দু'সার লেখার মাঝখানটা সংশোধনীতে ভরিয়ে ফেলতেন। এক এক সময়ে গোটা পাতাটাই বার বার লিখতেন, একটা প্রবন্ধ লিখতেই তাঁর এক এক সময় দু'মাস তিন মাস কেটে যেত, আলেকজান্দ্রাকে ত্রিশ চল্লিশ, এমন কি পঞ্চাশ বার অবধি কপি করতে হয়েছে একটি রচনা। ভাষার চিন্তার রূপ দান সম্বন্ধে তিনি ছিলেন এতখানি সতর্ক।

রসে ও লিখন-শৈলিতে যেমন অপরূপ তেমনি প্রাণবন্ত। তাঁর মায়ের সম্বন্ধে কবিতাটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির মধ্যে অন্যতম বলে বিবেচিত হয়েছে।

যেদিন যার সেদিন যখন দেশ ছেড়ে চলে যান তখন তাঁর বয়স মাত্র বত্রিশ। এই অল্প বয়সে তিনি যে কবির শক্তির পরিচয় দিয়ে গেছেন তা আজকের দিনের অনেক সমালোচককে বিস্মিত করেছে। এমন যারা একজন অসৎ চরিত্র যুবকের কলম দিয়ে কী করে এমন উঁচু ভাবের ও জীবনাদর্শের গভীর অনুরাগ রাঙা অনুপম লেখা বেরুলো, তা যেন ভেবেই পাওয়া যায় না। তাঁর মনের গভীরে সকল পঙ্কিলতার উর্ধ্বে যে একটি করুণ কোমল সুকুমার বৃত্তি ছিল তার চরম প্রকাশ দেখা গেছে তাঁর মায়ের সম্বন্ধে লেখা কবিতাটির মধ্যে। এই কবিতায় তিনি ধর্মের প্রতি, মনুষ্যত্বের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় আস্থার স্বাক্ষর রেখে গেছেন—'For in this Faith I choose to live and die'.

ভারত ভ্রমণে নোবেল পুরস্কার বিজয়িনী শ্রীমতী পার্ল বাক

দেশ-বিদেশ

[বাইমার : সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি বিস্মৃতপ্রায় পীঠস্থান—একটি রাজধানীর উত্থান-পতন]

গ্যয়টে-ভবনের একটি বিশেষ কক্ষে পা দিলেই ভুনো লুডোভিসির মস্ত বড়ো মাথাটি চোখে পড়ে। লুডোভিসির শান্ত দৌম্য রূপ দেখে দর্শকের মনে অপূর্ব অনুভূতির সঞ্চার হয়। সত্যি কথা বলতে কি, ভুনো লুডোভিসির অভিজাত সরল মুখচ্ছবি ললিতকলা সমৃদ্ধ প্রাচীন নগরী বাইমারের অসাধারণ ঐতিহ্যের এক অবিনশ্বর স্বাক্ষর হ'য়ে, হের্ডার, গ্যয়টে আর শিলার জার্মানীর এই নগরকে এক

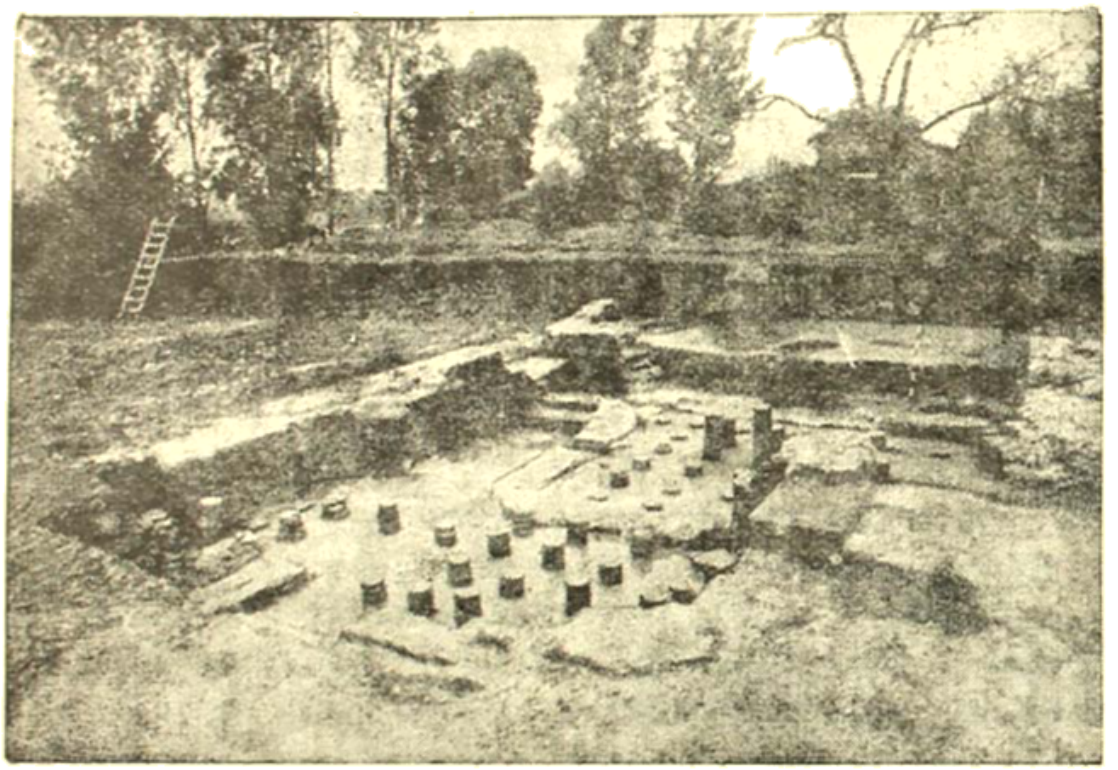

অপূর্ব সাংস্কৃতিক মর্যাদা দান করেছেন। জার্মানীর অসংখ্য নারী পুরুষের মনের পটে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে এই নগরীর ছবি। বাইমারের মাটিতে পা দিলেই মানুষের মনে পড়ে সেই বেলভেডেয়ারের আপীল-এর কথা। ১৮৭১ সনের ১০ই জানুয়ারী তারিখে গ্যয়টে তাঁর ভৃত্য জাইডেলকে লিখেছিলেন: "সামনের ঘরের আপীলকে কাপড় দিয়ে ভালো করে ঢেকে রেখো। এমনি করেই মানুষ এই ধরনের সম্পদের মূল্য বুঝতে শেখে।" ইটালীর বিভিন্ন প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের সামনে দাঁড়িয়ে গ্যয়টে এক সময় দুঃখ ক'রে বলেছিলেন: "বর্বর যা রেখে গেছে নতুন রোমের গৃহনির্মাতা তা ধ্বংস করে ফেলেছে।" বর্তমানে বাইমার নগরীর অতীত গৌরবের কোন নিদর্শনই আর চোখে পড়ে না। জার্মানীর সোভিয়েত অধিকৃত এলাকার অন্যান্য নগরীর মতো বাইমারের বুকেও আজি নেমে এসেছে এক বিষণ্ণ অন্ধকার। বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বছর পরে পুনরায় জাতীয় রঙ্গালয়ের উদ্বোধন উপলক্ষে বাইমারে দেশবিদেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির

ছবি আঁকছে ছোট্ট মেয়ে। (পাশে)

ফারুক চৌধুরী

নরী কন্ট্রাক্টর

পলি উমরিগড়

ডক্টর গ্রীজেক [Dr. Grzimek] আফ্রিকার জঙ্গলে তাঁর প্রিয় জিরাফটির দিকে কেমন স্নেহে দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

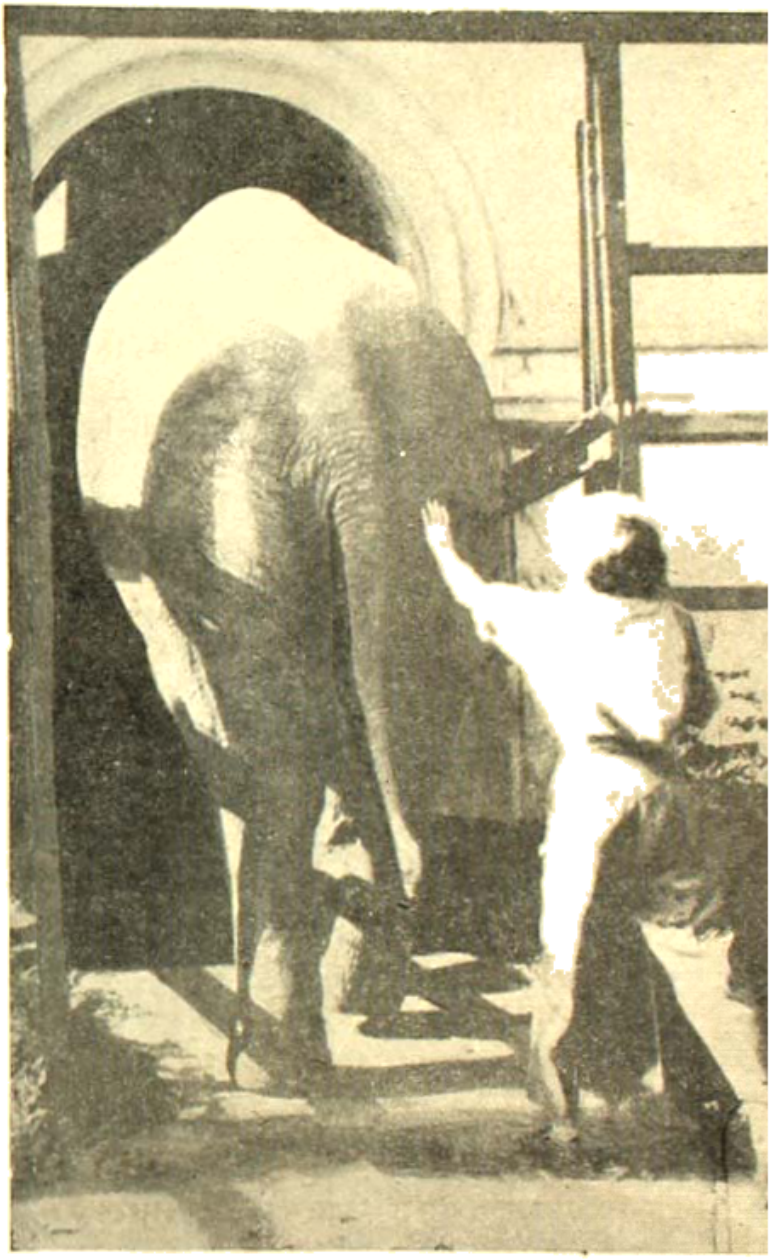

লন্ডনের রয়েল চিড়িয়াখানায় পশুপরিচারিকা উরসুলা হেডিনী 'র দিকে'

[পাশে]

অর্ধ-বানর জাতীয় আফ্রিকার জন্তু প্রাণী। একটি চায়ের কাপে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে।

[নিচে]

হিমালয়ের বৈচিত্র্যময় জন্তু আনন্দের সাথে উরঙ্গুতানের গম্ভীর মুখ গড়ে উঠেছে উরঙ্গুতানের মুখ থেকে সে সতর্কতার সাথে একটি একটি করে আঙুর নিয়ে মনের সাথে ভক্ষণ করে

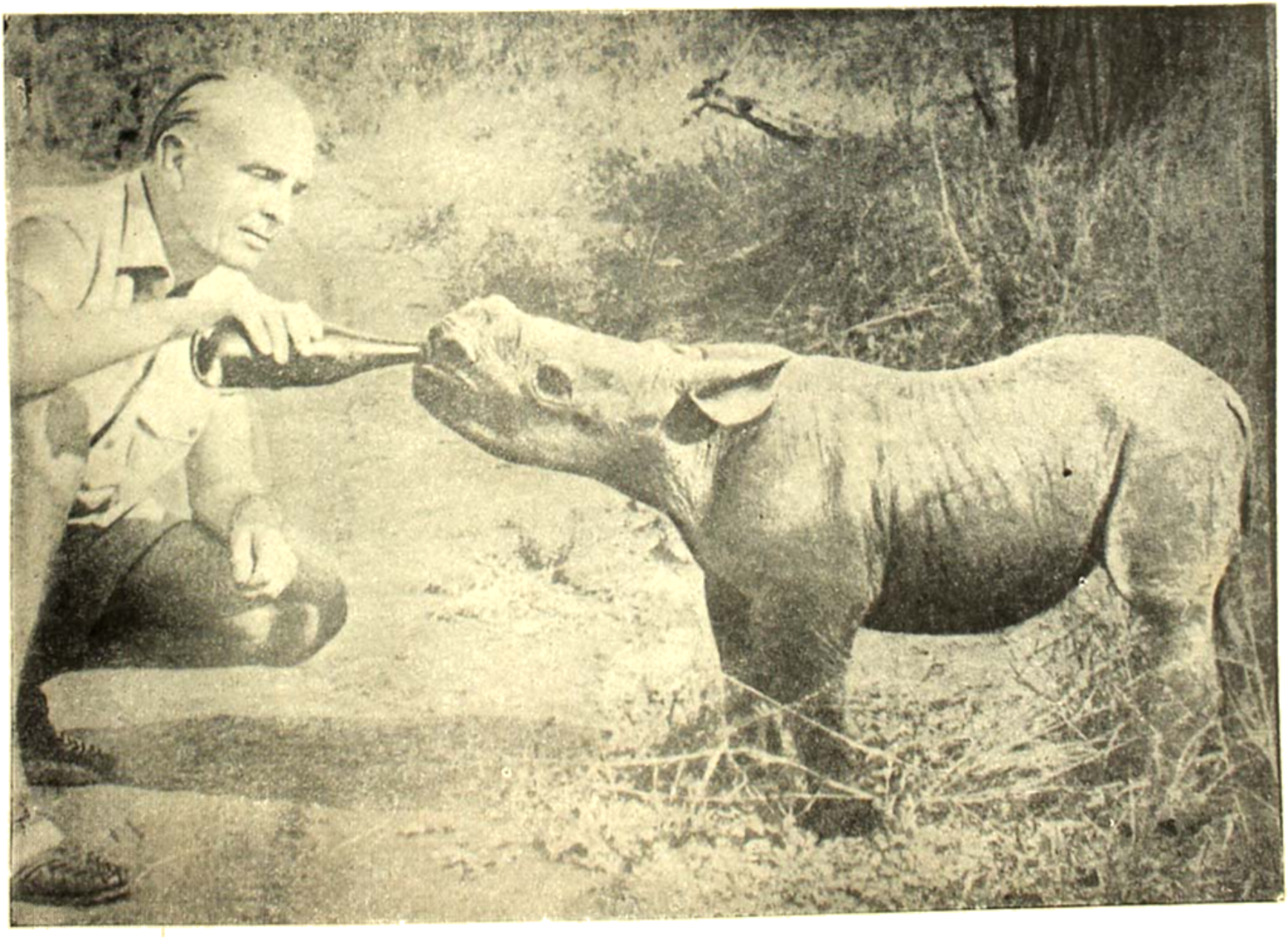

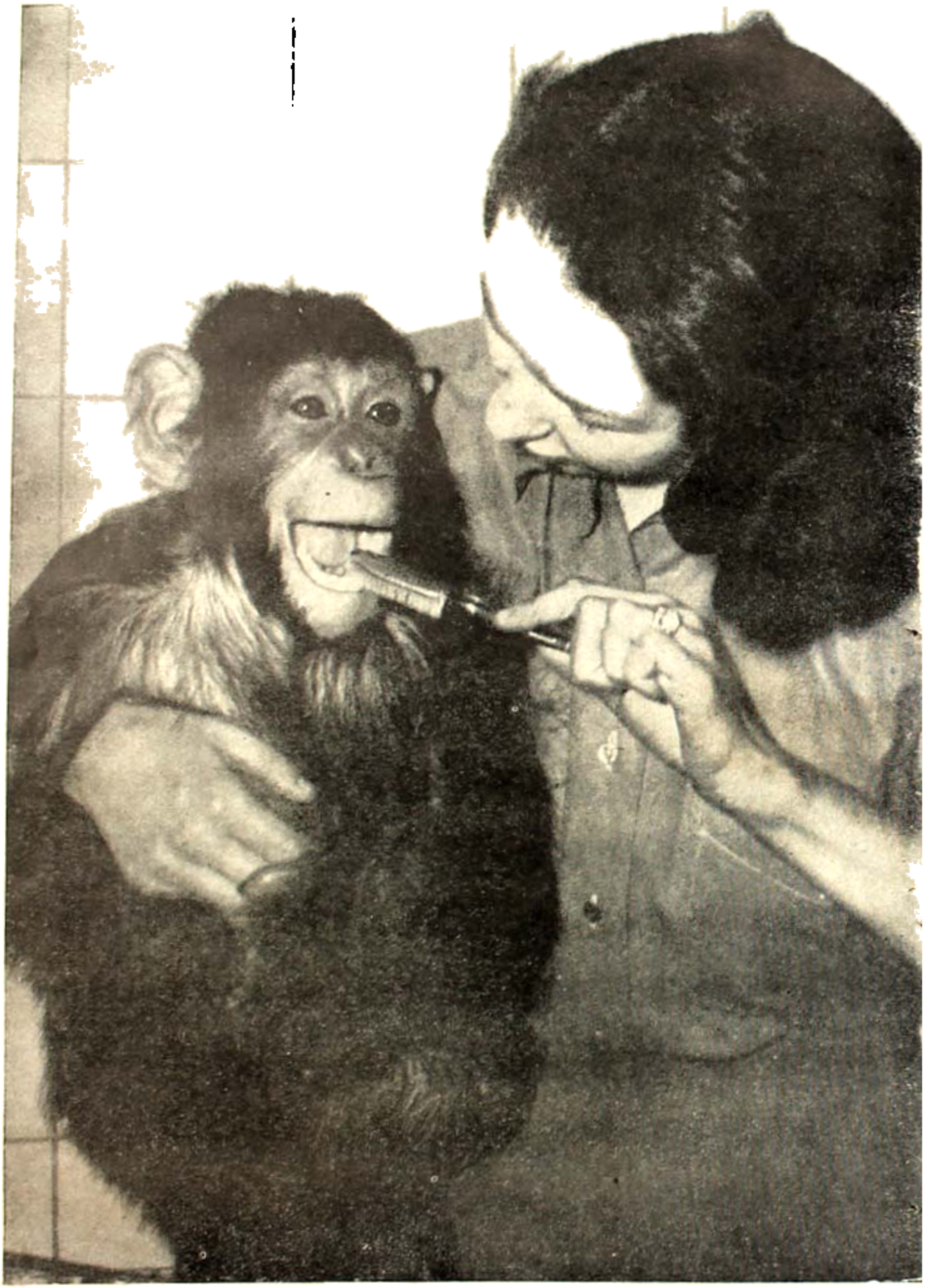

ছতী।
ল,
৬৮

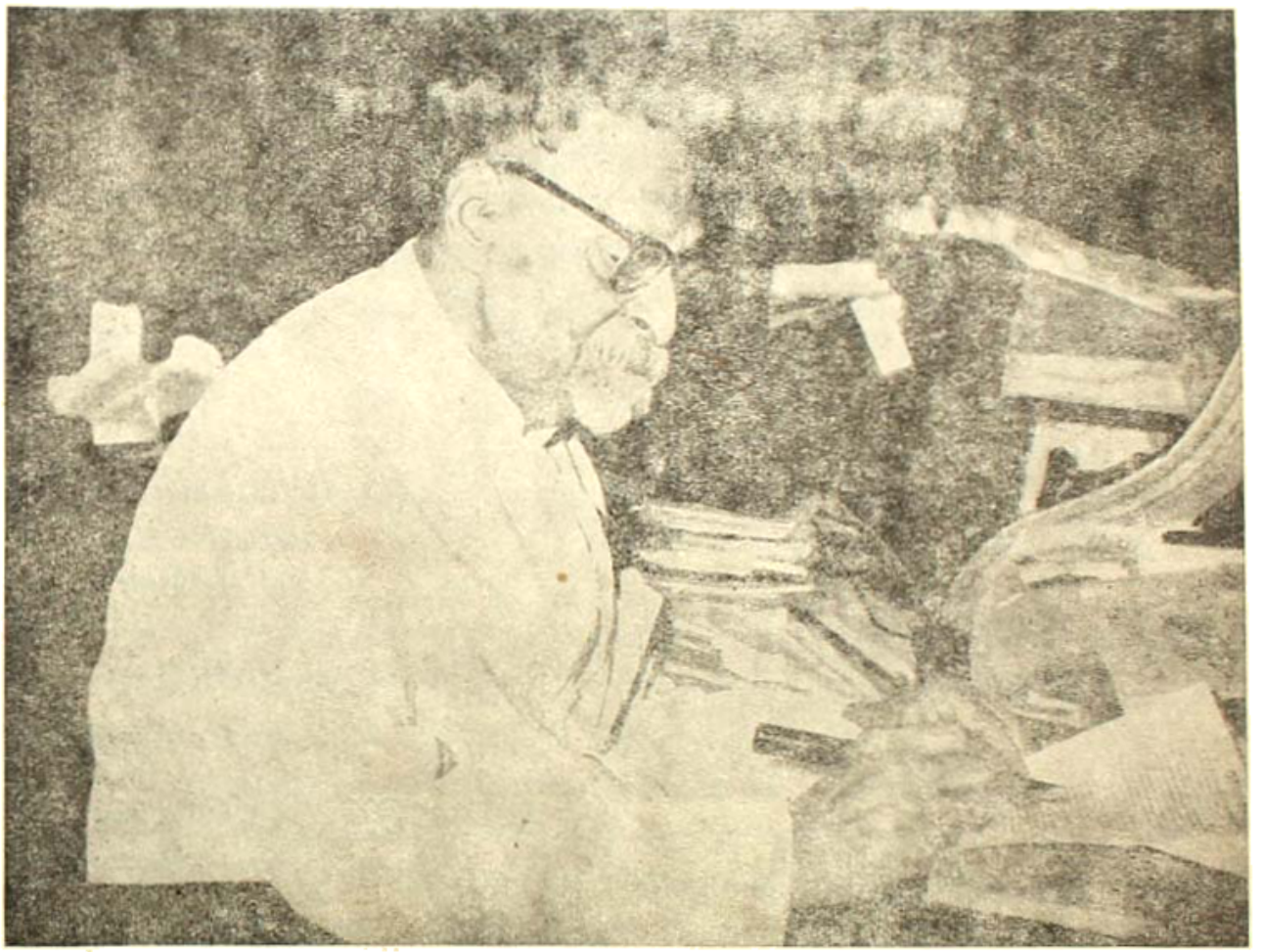

'মানুষের যাহা কর্ত্তব্য তাহাই তাহার ধর্ম'—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

ছবিখানি ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতা ময়দানে তোলা। ছবিতে দেখা যাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব (গোলরক্ষক) ও মোহনবাগান ক্লাব (ডান-প্রান্তরক্ষী) পরস্পরের সম্মুখীন।

কার্টুনিস্ট হারব্লক ॥

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার কথা। এক সংবাদপত্রের মালিক একজন কার্টুনিস্টকে ডেকে পাঠালেন তাঁর অফিসে। অনেক কথাবার্তা হলো। সংবাদপত্রের মালিক তাঁকে দিয়ে কিছু কিছু কার্টুন আঁকাবার কথা পাড়লেন। কার্টুনিস্ট বললেন: দেখুন, এ ব্যাপারে কোনো কনট্রাক্ট করবার আগে আমি বরং আমার খানকতক কার্টুন পাঠিয়ে দেবো আপনাকে, দেখুন যদি ভালো লাগে, তারপরেই না হয়

—আমিও আপনাকে আমাদের কতকগুলি সম্পাদকীয় রচনা পাঠিয়ে দেবো,—কার্টুনিস্টের কথার মাঝেই বাধা দিয়ে বললেন সংবাদপত্রের মালিক, দেখবেন যদি আমাদের আপনার পছন্দ হয়।

এই হলো প্রথম সাক্ষাতের দিনের ঘটনা। সংবাদপত্রের মালিক হলেন ইউজেনী মায়ার, আমেরিকার বিখ্যাত "ওয়াশিংটন পোস্ট"-এর কর্ণধার, আর কার্টুনিস্ট হলেন হার্বার্ট লরেন্স ব্লক—সংক্ষেপে 'হারব্লক'।

হারব্লকের বর্তমান বয়স ঠিক চুয়াল্লিশ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় উনি যেদিন মিঃ মায়ারের সঙ্গে প্রথম দেখা করেছিলেন তখন ওঁর বয়স বছর ২৭।২৮-এর বেশি নয়। কিন্তু অতো অল্প বয়সেও হারব্লক কার্টুনিস্ট হিসেবে নিজেকে কোন্ শ্রেণীতে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা মিঃ মায়ারের ওপরের কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

১৯৪৬ সন থেকে হারব্লক 'ওয়াশিংটন পোস্ট' এবং 'টাইমস হেরাল্ড'-এর সঙ্গে যুক্ত আছেন। ওর আঁকা ছবিগুলি আমেরিকার প্রায় দেড়শ'খানা সংবাদপত্রে নিয়মিত বেরোয়, তা'ছাড়া 'নিউ ইয়র্ক

জার্মানিতে
রবীন্দ্রনাথ

বার্লিনে রবীন্দ্রনাথ

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে
রবীন্দ্র চিত্র প্রদর্শনী।

Illustrirte Zeitung

জাপান যাত্রাকালে রবীন্দ্রনাথ—কালিদাস নাগ ও ক্ষিতিমোহন সেন।

সোভিয়েত রাশিয়ায় রবীন্দ্রনাথ

জীবন আমার এমনি পরশই
এমনি করে শুধু যাক।
আপন মাঝে তোমার দিয়ে
দূর করে সকল বাধা।
সেথায় তোমার গোপন কবি
রচুক আপন ছন্দছবি,
পরশ করুক নৈরবালী
সেথায় তোমার কল্পবাকে॥

ভারত-প্রসঙ্গে

টয়েনবি ॥

নানা দিক থেকে ভেবে দেখলে মনে হয় বিংশ শতাব্দীতে বিস্ময়ের যেন শেষ নেই। যে দিকে তাকানো যাবে বিস্ময়কর ঘটনা, বিস্ময়কর বস্তু যেন আমাদের হতবাক করে দিতে চায়। একদিকে বিস্ময়কর উন্নতি হ'চ্ছে বিজ্ঞানের, শিল্পের, সাহিত্যের, বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে পৃথিবীর নানা দেশের সমাজ ব্যবস্থায়। আবার অন্যদিকে, স্থান বিশেষে রাজনীতি বা ব্যবসার ক্ষেত্রে মানুষ যে নীচতা দেখাচ্ছে তাও রীতিমতো বিস্ময়কর। সব দিক থেকে দেখেই মনে হয় আমরা একটা বিস্ময়ের কাল অতিক্রম করে চলেছি।

শিল্পসাহিত্যের নানা দিকে যে বিস্ময়কর উন্নতি ঘটেছে এ শতাব্দীতে তার বিশদ আলোচনার স্থান এ নয়। আমরা একটিমাত্র বিষয়ের মধ্যে বর্তমানের সংক্ষিপ্ত আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো। সে হ'লো ইতিহাস।

টয়েনবি

প্রাচীনকালে হেরোডোটাস, থুকিদিদেস থেকে আরম্ভ করে প্লুতার্ক, লিভি, ট্যাসিটাস, মম্‌সে পর্যন্ত ইতিহাস-চর্চার যে নজীর পাওয়া যায় তা ইতিহাসের একটা ধরন। সাধারণভাবে ইতিহাস বলতে বা বোঝায় এঁদের প্রত্যেকের লেখাই সে দিক থেকে আদর্শ স্থানীয়।

কিন্তু এ ছাড়া আর এক ধরনের ইতিহাস-চর্চার প্রয়াস দেখা যাচ্ছে আমাদের শতাব্দীতে। যা ইতিহাস তো বটেই, কিন্তু সেই সঙ্গে আরও কিছু। ইতিহাসের কাঠামোয় এটা এক শ্রেণীর দর্শনশাস্ত্র বলা যায়। এ ধরনের অনেক বই-ই এ শতাব্দীতে পাঠকসমাজকে অবাক করে দিয়েছে। তার মধ্যে দু'খানার প্রচার হয়েছে সর্বাধিক। প্রথমতঃ এইচ. জি ওয়েল্‌স-এর 'আউট-লাইন অব হিস্ট্রি'; আর দ্বিতীয় আর্নল্ড টয়েনবি-র 'স্টাডি অব হিস্ট্রি'। ওয়েল্‌স গত হয়েছেন কয়েক বছর আগে, কিন্তু টয়েনবি এখন পর্যন্ত জীবিত আছেন। ওঁর 'স্টাডি অব হিস্ট্রি' বর্তমানে আলোচ্য নয়। যদিও এটুকু বলা যায় যে সাধারণভাবে ইতিহাস পাঠ করবার পরেও যে কোনো বিগত বিশেষ যুগ বা সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় উত্থান-পতন সম্বন্ধে স্টাডি অব হিস্ট্রিতে সে সম্বন্ধে টয়েনবি যা বলেছেন তা পড়তে পারলে যে কোনো পাঠক নতুন আলোক লাভ করবেন। গত কয়েক বছর ধরে সাময়িক প্রসঙ্গের ওপরও মাঝে মাঝে টয়েনবি তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। বর্তমানে এইরকম একটি বিষয়েই আমরা আলোচনা করবো।

মহা উৎসাহে। সবাইকে নিয়ে সার্কাসে গিয়ে তাঁর সে কি চাঞ্চল্য আর উদ্দীপনা। এদিক ওদিক

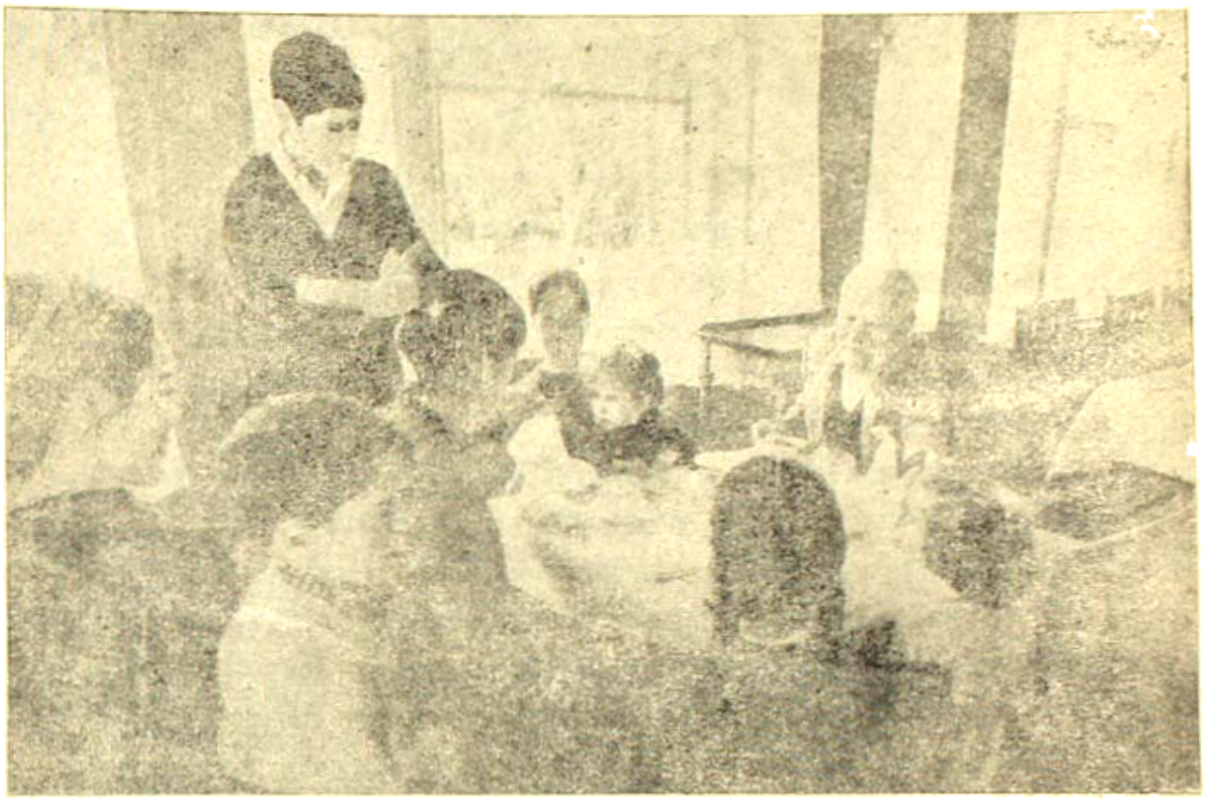

[সপরিবারে চার্লি চ্যাপলিন]

ছুটে বেড়ান। ক্লাউনদের ভেংচি কাটেন। তাদের আবার নানা উপদেশও দেন। এই সময়ে তাঁর দু'চোখে যেন হারানো দিনের আলো ফুটে ওঠে।

বাড়িতে যখন কোন কাজ থাকে না তখন রান্না করতে বসে যান। ধূমপান করেন না। অভ্যাগতরাও তাঁর সামনে ধূমপান করবার সুবিধা পান না। বহু টাকার মালিক হলেও অতিশয় কৃপণ বলে চার্লি চ্যাপলিনের অখ্যাতি আছে।

———

দুই ॥

সোভিয়েত সাহিত্যে: সমগ্র ইতিহাস জুড়ে—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের গোড়ার দিকের বছরগুলি থেকে একেবারে আজ পর্যন্ত—সোভিয়েত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ও প্রতিনিধি স্থানীয় রচনাগুলি সমকালীন সামাজিক সমস্যাবলীকে আশ্রয় করেছে, সমসাময়িক চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তুলেছে,—পাঠক সাধারণের ব্যাপকতম অংশের আত্মিক প্রয়োজন মিটিয়েছে।

বিপ্লবের যথার্থ চিত্রটি নানাভাবে রূপায়িত হয়েছে যেসব গ্রন্থে, সেগুলির মধ্যে প্রথমেই মনে পড়বে শোলোকভের "অ্যাণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ্ দি ডন", আলেক্সি টলস্টয়ের "দি অডিস", ফুর্মানভের "চাপায়েভ", ইভানভের "দি আমার্ড ট্রেন ১৪-৬৯", সেরাফিমোভিচের "দি আয়রন ফ্লাড", অস্ত্রোভস্কির "হাউ দি স্টিল ওয়জ টেম্পার্ড", ফাদেইয়েভের "দি নাইন্টিন" ইত্যাদি উপন্যাসগুলির নাম। বিপ্লবের ও গৃহযুদ্ধের নায়ক-নায়িকাদের চরিত্র ও তাদের পরিবেশ সততার সঙ্গে রূপায়িত হয়েছে এইসব রচনায়। এসব রচনা আজও তাদের সজীবতা হারায় নি। ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগের লেখা হলেও এগুলি স্থায়ী মূল্য অর্জন করেছে এই অর্থে যে এগুলি সমকালীন জীবনকে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করেছে, সমসাময়িক সমাজজীবনে ও সমাজমানসে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে।

তিন ॥

চতুর্থ দশকের বছরগুলিতে সোভিয়েত মানুষের চিন্তার জগতে এক নতুন উপলব্ধি সঞ্চারিত হয়. বিপ্লব-পরবর্তী এক নতুন তরুণ সমাজের আবির্ভাব ঘটে. দেশ জুড়ে গঠন ও নির্মাণমূলক এক বিরাট কর্মযজ্ঞ শুরু হয়। সেই সময়ে সোভিয়েত সাহিত্য জনগণের এই শ্রমবীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানায় এবং নতুন চিন্তাধারা গড়ে তোলায় বিশেষ ভাবে সাহায্য করে: লিওনভের "দি সোৎজ্", শাগিনিয়ানের "হাইড্রোস্টেশন", এরেনবুর্গের "লেকেণ্ড ডে", কাতাইয়েভের "টাইম, অ্যাহেড!" শোলোকভের "তাজিন সয়েল আপ্টার্নড্", ফ্রীমকের "ট্যাঙ্কার দেরবেন্ত্" প্রভৃতি উপন্যাস ও নাটক। এইসব বই নতুন করে পড়তে বসে বা অভিনয় দেখতে দেখতে আমরা ফিরে যাই সেই যুগে যখন সোভিয়েত

ইলিয়া এরেনবুর্গ

জনগণের কাছে আপাতদৃষ্টিতে আর মাত্র ২০-২৫ বছরের মধ্যেই স্পুৎনিক করতে পারা, পারমাণবিক

উৎকৃষ্ট বার্লি বলিতেই লিলি

সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, টাট্‌কা ও স্বাস্থ্যপ্রদ

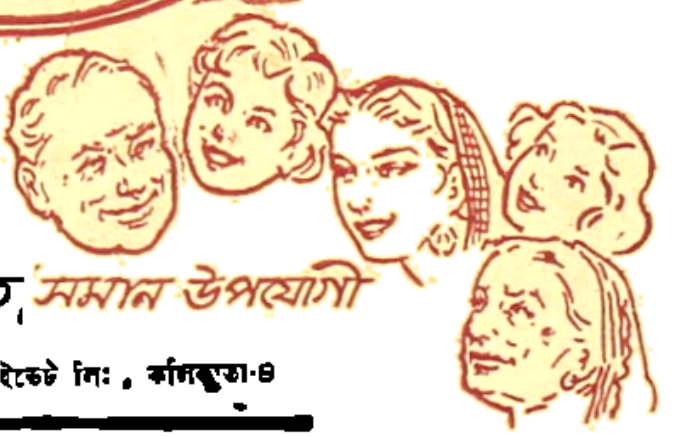

সকল বয়সে ও ঋতুতে সমান উপযোগী

লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৩

Phone : 5
GALPA-BHARATI. Bengali Monthly. Regd. No, C3643. Price Re. 1/- June 1962.

সুঠাম সুন্দর দেহ

12 JUN 1962

গড়ে তুলতে

লক্ষ্মীঘি

অপরিহার্য্য

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী • কলিকাতা - ১১ • ফোন ৪২-৭২৪৩